মাঘ ১৪০৯ ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন

॥১০৫॥

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন : ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● ই-মেল : rmsppp@vsnl.com

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেট

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 : ৩৫ টাকা, অন্যান্য : ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
SP-3	শ্রীরামনাম-সংকীর্তন (স্বামী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-6	শিবমহিমা
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
SP-17	বীরবাণী
SP-18	গীতিবন্দনা
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)
SP-23	ওঠো জাগো
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা
SP-29	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত)
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)
SP-35	আগমনী
SP-36	ভজন সুধা

সদ্য প্রকাশিত ভিসিডি
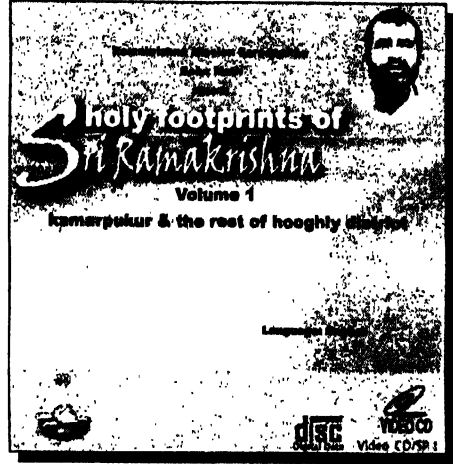
হুগলী জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য পবিত্র তীর্থস্থানের ভিডিও সিডি

ভাষা : ইংরেজি ● সময় : ১ ঘণ্টা ● মূল্য : ২০০ টাকা

অডিও সি. ডি. / মূল্য ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. 80 minutes available. Rs. 250.00

সূচীপত্র

উদ্বোধন ১০৫
১০৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাঘ ১৪০৯ জানুয়ারি ২০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃপথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্।।

অসিতগিরিসমং স্যাদ্ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশপারং ন যাতি।।

ত্রয়ী (অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ), সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন অথবা পশুপতিমত (শৈব সম্প্রদায়ের একটি ধারা) কিংবা বৈষ্ণবদর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মতানুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির রুচিবৈচিত্র্য অনুসারে এক-একটি ধর্মপথ নির্দিষ্ট হইয়া আছে। বিশেষ কোন ব্যক্তি 'ইহাই শ্রেষ্ঠ, উহাই শুভকর' ইত্যাদি চিন্তা করিয়া বিশেষ কোন ধর্মমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। ঐসকল পথের মধ্যে কোনটি সরল (ঋজু), কোনটি বা বক্র। তথাপি আমরা জানি, নদীসমূহের ঋজু-বক্র বিবিধ যাত্রাপথ হইলেও যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি সকল পথের পরম লক্ষ্য, হে দেবাদিদেব মহাদেব-শম্ভো, একমাত্র তুমিই।

ওম্ (অ-উ-ম্)—এই পরম পবিত্র পদটি তিন বর্ণের দ্বারা তিন বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ), তিন অবস্থা (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি), তিন ভুবন (ভূঃ অর্থাৎ মনুষ্যলোক, ভুবঃ অর্থাৎ পিতৃলোক, স্বঃ অর্থাৎ দেবলোক) ও তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। আবার এই ওঙ্কাররূপ সূক্ষ্মধ্বনি দ্বারা, হে শরণদ (যিনি শরণ দান করেন) কৈলাসপতি উমানাথ, তোমারই বিকারাতীত 'এক' এবং তুরীয় অবস্থা এবং তোমারই বিভিন্ন রূপকে প্রতিপাদিত করা হইয়া থাকে।

অসিত গিরি (নীল পর্বত)-মালাকে অনন্ত মহাসমুদ্রের জলে দ্রবীভূত করিয়া যদি লিখিবার কালি প্রস্তুত করা হয় এবং স্বর্গস্থ পারিজাতবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখাটিকে কলম করিয়া ধরণীর পৃষ্ঠতলকে লিখিবার পত্র করিয়া স্বয়ং সারদা সরস্বতী যদি অনন্তকাল তোমার মহিমা লিখিতে থাকেন, হে ঈশ্বর, তবু তোমার গুণের কোন ইয়ত্তা হইতে পারে না।

(পুষ্পদন্ত প্রণীত শিবমহিম্নস্তোত্র, ৭,২৭,৩২)

মনের কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’ গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কারবন্ধন ছিল অল্প। যদিও শ্রীভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে মানুষের ন্যায় শোক, দুঃখ, সুখ, হাসি, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তথাপি তাঁহাদের সংস্কারবন্ধন অতি অল্প থাকে বলিয়া মন সহজেই ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সাধারণ মানুষের সংস্কারবন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়—যেন মোটা লোহার চেন-দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। সেই কারণে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান সেই মন করিতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অল্প-সংস্কার বলিয়া প্রথম দর্শনে মনে হইলেও তাহার লক্ষ লক্ষ জন্মের সংস্কার কেহ দেখিতে পায় না। আধুনিক মনোবিদ্যা-বিশারদগণ মন লইয়া নানাপ্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া মনের চরিত্র সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত লওয়া যায় না। মনের গোড়ার কথা বেদান্তে বিধৃত হইয়াছে। আরো বেশি করিয়া ‘মন’কে বিশ্লেষণ করিয়াছেন মহামুনি পতঞ্জলি। উপনিষদ্ বলিলেনঃ “মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ”—মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মোহগ্রস্ত মন অভিনিবিষ্ট হইলে কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। মন যাহাকে ধরিয়াছে, জড় বা চেতন, ‘তাহাই ইহাকে ছাড়িতেছে না’ বলিয়া কোন অজুহাত চলে না। নিজের মনই ঐ বস্তুকে ছাড়িতে পারিতেছে না, ইহাই চিন্তনীয়। একদা এক ব্যক্তি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। কেহ ঐরূপে ভাসিয়া যাইতে থাকিলে খড়কুটো যাহা পায় প্রাণপণে তাহা ধরিতে চাহে। সহসা একটি ক্ষুদ্রাকৃতি শূন্য ভেলা পাইয়া সে তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং উহার উপর চড়িয়া বসিল। খানিক পরে ত্রাণসামগ্রী লইয়া একটি দল নৌকাযোগে যাইতে যাইতে এই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল এবং নৌকায় তুলিয়া লইল। তথাপি সে ঐ ভেলাটিকে ছাড়িতে পারিল না। নৌকার সহিত বাঁধিয়া লইয়া চলিল। “জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে”। কেহ বলিবেন, ভবিষ্যতে কাহারো উপকারে লাগিবে ভাবিয়া সে ঐ কাজ করিয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যায়, যদি সত্যই সে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ঐ কাজ করিয়া থাকে, সে মহান ব্যক্তি। ঐরূপ ব্যক্তি সমাজে দুর্লভ। ঐ অবস্থায়, তিনদিনের ক্ষুধার্ত, বিধ্বস্ত শরীর-মন লইয়া জলে ভাসিতে ভাসিতেও যদি কেহ অপরের নিমিত্ত ভাবিতে পারে তো সে ধন্য। অধিকাংশ মানুষের প্রবৃত্তি কিন্তু অন্যরূপ। মনের বন্ধনেই তাহারা বাঁধা পড়িয়া থাকে।

সংসারে যাহাকে আমরা ভালবাসা বলিয়া থাকি, তাহাও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থগন্ধে ভরপুর। ঈশ্বর এইভাবেই মনটিকে নির্মাণ করিয়াছেন। মানুষ নিজেকে সর্বাধিক ভালবাসে। নিজের সুখ, নিজের আনন্দ, নিজের নিরাপত্তা, নিজের নাম-যশ, নিজের অর্থসঞ্চয়, নিজের ক্ষমতাপ্রয়োগ—ইহাই তো সংসারের প্রকৃত রূপ। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কিছু ‘আপনজন’ থাকে, যাহারা তাহাকে সাহায্য করে। যখন আর প্রয়োজন নাই, তখন সেইসব ‘আপনজন’ ‘পর’ হইয়া যায়! ইহাই সংসারী মনের চরিত্র। ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সংখ্যায় অত্যল্প। তাঁহাদের মনে ‘দেহাত্মবুদ্ধি’ কম। যাহাদের ‘দেহাত্মবুদ্ধি’ অধিক অর্থাৎ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যাহারা ভাবে ‘ঐ যে আমি’, তাহাদের মনের মূল প্রবৃত্তি—দেহাত্মবোধ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যসত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা দর্পণে স্বীয় শরীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিতে চাহেন না—‘ঐ যে আমি’। এবং এই দ্বিতীয় স্তরের মনের বিবর্তন সাধিত হইয়াই ক্রমশ ভারত-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম, এই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষের ধর্মচেতনা, এই পরার্থপরতা, এই সরল জীবনে উচ্চ চিন্তা (simple living, high thinking), এই ত্যাগ,

১ মাঘ ১৪০৯ ‘উদ্বোধন’ ১০৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ১০৫তম বর্ষে পদার্পণ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতির সেবায় উৎসর্গিত থাকিয়া ‘উদ্বোধন’ আপন পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসরমান। আগামী দিনেও তাঁহাদের আশীর্বাদই হউক ‘উদ্বোধন’-এর পথচলার একমাত্র অবলম্বন।

১০৫তম বর্ষ শুরুর এই পুণ্যলগ্নে ‘উদ্বোধন’-এর সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাই। ‘উদ্বোধন’-এর সঙ্গে তাঁহাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য হউক—এই প্রার্থনা।—সম্পাদক

তপস্যা, ব্রত, পার্বণ ইত্যাদি। অতি সামান্য হইলেও পৃথিবীর সকল দেশেই কিছুসংখ্যক মানুষ থাকেন, যাঁহারা সীমার মাঝে অসীমের আহ্বান শুনিতে পান। সেই সেই দেশে তাঁহাদের 'mystic' বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে তথা হিন্দুধর্মে অতীন্দ্রিয় দিব্যসত্তার উপরেই ভিত্তি করিয়া সমাজ গঠিত হইয়াছে বলিয়া পৃথক করিয়া 'mystic' বলিয়া কিছু নাই। তাই বিদেশীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সবটাই 'mystic' এবং এইভাবেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই স্বামীজী বারংবার বলিলেন—মানব-সংস্কৃতির মহার্ঘ বস্তুর সন্ধান ভারতবর্ষেই বিদ্যমান। পারস্পরিক বিদ্বেষ, হিংসা, প্রাণহানি, বঞ্চনা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের কাহিনী ভারতবর্ষে প্রথমাবধি বিদ্যমান থাকিলেও 'পরিশীলিত মানব-মন'-এর জন্ম এই ভারতবর্ষেই হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যত্র নহে। সাম্প্রতিক কালে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ। আরো ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, যাহা পৃথিবীর অন্য দেশে, অন্য জাতিতে সুদুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ত্যাগ ও সংযমের যে-চিত্র আমরা পাই, পৃথিবীতে তাহার কোন উপমা নাই। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে যে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিকাশ—পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে তাহার কোন তুলনা কোথাও নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, ব্যক্তিত্ব, কর্ম—বুদ্ধি দিয়া ইহারও কোন ইয়ত্তা করা যায় না।

প্রাচীন ভারতে অবশ্য এইরূপ 'মন' কাহারো কাহারো মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। বস্তুত, যে-মনের কথা আসিয়া পড়িল, তাহা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মন। মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ সন্ন্যাসীর এই মানসিক পরিকাঠামো। সন্ন্যাসী শুকের জীবন স্মরণ করুন। তাঁহার সন্ন্যাসীর মন লইয়াই তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই জগতের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন তাঁহার নাই। তাই ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি চলিলেন কাহারো দিকে না তাকাইয়া, কোন কথা না বলিয়া, কাহারো দাবি স্বীকার না করিয়া। পিতা ব্যাসদেব পশ্চাতে ছুটিলেন—পুত্রকে ফিরাইবেন বলিয়া। 'পুত্র' 'পুত্র' বলিয়া ব্যাসদেব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া শুকের পশ্চাতে চলিতেছেন। শুক চলিয়াছেন আপন গতিতে। সন্ন্যাসীর মনে কোন মায়িক সম্বন্ধ নাই। 'এই যে আমি'—বলিলে ঐ মায়িক সম্বন্ধ পিতার সহিত স্থাপিত হইবে বলিয়া তিনি সোজা চলিলেন এক মনে। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো পাথরের মন নহে। মানুষেরই মন। তাই তিনি উত্তর দিলেন—অন্যভাবে। ব্যাসদেব ছুটিতে ছুটিতে শুনিলেন, শুকদেব উত্তর দিতেছেন—বৃক্ষের মধ্য দিয়া—'আমি আছি', ঝরনার মধ্য দিয়া—'আমি আছি', বায়ুর শোঁশোঁ শব্দে—'আমি আছি'। ইহা কি প্রতারণা? না, প্রতারণা নহে, ইহা করুণা। সন্ন্যাসী শুক জানেন, মায়ার প্রতিকার মায়া নহে, বিবেক এবং তত্ত্বজ্ঞানই মায়ার প্রতিকার। ব্যাসের মোহভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে অনুভব করিলেন—জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে। লজ্জা পাইলেন। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইল। তিনি শান্ত মনে ঘরে ফিরিলেন।

শুকদেবের সন্ন্যাসী-মন মায়ানির্মুক্ত, কঠোর—কিন্তু দয়াবিগলিত, কোমল, পেলব। সন্ন্যাসীর মনে দয়া থাকিতে পারে, মায়া নহে। যখন শুকদেব পিতার নিকট বহুদিন পর প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন ব্যাসদেবের পুত্রমোহ দূর হইয়াছে। এখন শুক আসিয়াছেন শিষ্যরূপে, যদিও তাঁহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ শাস্ত্র তাঁহার জীবনে পূর্ণপ্রকাশিত, আপন ঔজ্জ্বল্যে অভিব্যঞ্জিত। তবু তিনি লোকশিক্ষার জন্য গুরুর নিকট দীক্ষা লইবেন। লোক-প্রয়োজনে আত্মব্যাপৃতি সন্ন্যাসীর মনে আসক্তি-প্রণোদিত নহে, দয়াপ্রণোদিত। তাই সন্ন্যাসী মায়াকে বর্জন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও মায়া জয় করিয়া বৃহৎ সংসারে ফিরিয়া আসেন—মানুষের সেবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। মা ভবতারিণীর দর্শনলাভ করিয়াও তিনি লোকশিক্ষার জন্য গুরুর সন্নিকটে পুনরায় তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবোক্ত ভাবসাধনা, বেদান্তসাধনা করিলেন। বিবেকানন্দ তীব্র বৈরাগ্যের দাবদাহে সংসার হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াও পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই অভিঘাতে ভারতবর্ষ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইল—সূচনা হইল এক নবযুগের। এক মরমিয়া সাধক লিখিয়াছিলেনঃ "সন্ন্যাসী যখন আত্মীয়স্বজনের উপর মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মন বজ্রদৃঢ়। আবার সেই তিনিই যখন সর্বভূতে শ্রীহরি রহিয়াছেন জানিয়া নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য দিয়া আবালবৃদ্ধনরনারীর সেবায় লাগিয়া যান, তখন তাঁহার মন পুষ্প অপেক্ষাও কোমল। মমত্ববুদ্ধির উপর দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মনের নাগাল পাওয়া যায় না।... সন্ন্যাসী শ্মশানে-মশানে বেড়াইলেও বুকের ভিতর লতাপল্লবশোভিত অতি সুরম্য এক পুষ্পবাটিকা লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন।"

নিজের জীবনগ্রন্থই সন্ন্যাসীর পুঁজি। শাস্ত্রীয় বিচারপটুতা, শব্দবিন্যাস ও উদ্ধৃতি উদ্গীরণে সন্ন্যাসীর মহত্ত্ব নহে। তাঁহার শক্তি স্বকীয় জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যে। লোকানুরঞ্জন কখনো সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হইতে পারে না। তাঁহার লক্ষ্য সত্য। মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিতকে শুকদেব প্রথমে যে-কথাগুলি বলিলেন তাহা লোকানুরঞ্জক মোটেই নহে। যখন পরীক্ষিৎ বিভ্রান্তের ন্যায় ভাবিতেছেন

—'কি করিব', নানাদিক হইতে আগত পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্, মুনি-ঋষিগণ নানান উপদেশ করিতেছেন, তখন ভিড় ঠেলিয়া শুকদেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন ঃ "মহারাজ, পৃথিবীর শতসহস্র মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য মিলাইয়া আপনার নিজের করণীয় ঠিক করিবার সময় এখন নহে। গৃহমেধি সংসারী লোক কি লইয়া আছে? আহার-নিদ্রা-মৈথুন। দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, ধনসম্পদের মোহে তাহারা আত্মসম্বিতহারা। সম্মুখে মৃত্যু, কিন্তু তাহাদের হুঁশ নাই। দিবারাত্র কতকিছুর পশ্চাতে তাহারা ছুটিতেছে, কতকিছু বলিতেছে, কতকিছু শুনিতেছে, কিন্তু সবই অকাজ, সবই নিষ্ফল। জীবনের পরম শ্রেয়ের পথে এক পা-ও তাহারা অগ্রসর হইতেছে না। নিজেকেও এই দলে ভাবিয়া আপনি প্রবঞ্চিত হইবেন না। সরিয়া আসুন। মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক। আপনি সংসার হইতে মন তুলিয়া, সংসার-সার শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন হউন। বৈরাগ্যের অগ্নিতে ইহকাল, পরকাল, শাস্ত্রাচার, লোকাচার সবই পুড়িয়া ছাই হউক।"

মনের গঠনবৈচিত্র্যই সন্ন্যাসীর জীবনে তাঁহাকে সাহসী করিয়া তুলে। বৈরাগ্যের কথা বলিতে সন্ন্যাসী ভয় পান না। কারণ তাঁহার মনটি তো নির্বেদ রঙে রঞ্জিত। সেই বৈরাগ্য একটি নেতিমূলক ফাঁকা বস্তু নহে। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবৎপ্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। উদাহরণ দিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে। যে-ব্যক্তি পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে পশ্চিমদিক পিছনে রাখিতেই হইবে। কিন্তু পূর্বমুখী স্থিতিটাই তাহার প্রকৃত পরিচয়, পশ্চিমে পিছু ফেরাটি তাহার পরিচয় নহে। "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী..." ইত্যাদি বলা হইয়াছে গীতামুখে। যে-সন্ন্যাসী পরমাত্মাকে সারবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সংসারিগণ যাহা কিছু পরম রমণীয় মনে করে—তাহার প্রতি তিনি তো পিছু ফিরিবেনই। তাই বলা হয়, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য একটি নেতিমূলক ফাঁকা বস্তু নহে। বৈরাগ্যের প্রকৃত চেহারা হইল ঈশ্বরে ঐকান্তিক প্রীতি। ভগবানের জন্য আউল হইয়া যাওয়া যথার্থ সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। সম্পূর্ণ নগ্নদেহে জ্ঞানী শুক পৃথিবীতে বিচরণ করেন। জনসংযোগ তাঁহার নাই। একাকী ভ্রমণরত মহাজ্ঞানী পরমহংস তিনি। তবু মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তিমলগ্নে তিনি ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রয়োজনে সন্ন্যাসী নিজের অভ্যাসবিরুদ্ধ কাজ করিতেও সঙ্কুচিত হন না।

যখন পিতার মৃত্যু হইল তখন বালক শঙ্করের বয়স মাত্র তিন বৎসর। অনাথা বিশিষ্টার এখন নয়নের মণি একমাত্র সন্তান ঐ বালক। তাহার বল-বুদ্ধি-ভরসা সবই যেন ঐ বালক। এবং বালকও একান্তভাবে মাতৃগতপ্রাণ—যখনি সময় মিলে, মাতৃসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখে। এ হেন বালকের মধ্যে যে সন্ন্যাসি-মন বাসা বাঁধিয়াছে তাহা তো তিনি জানেন না! কিন্তু যেদিন জানিলেন, সেদিন বিস্ময়ে, ক্ষোভে, বেদনায় স্তব্ধ—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিশিষ্টা অকূল দুঃখসাগরে ভাসিয়া গেলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ মেধাবী পুত্র কি তখন মাতৃহৃদয়ের এই দুঃসহ আঘাত নিজ অন্তরে অনুভব করেন নাই? তবু তিনি গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, তাঁহার সন্ন্যাসি-মনের তীব্র তাড়নায়। এই মনের চরিত্র কোন্ ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব? শঙ্কর এত নির্মম? স্বার্থপর? বিবেকশূন্য? কাপুরুষ? দায়িত্বজ্ঞানহীন?

না, কোনটিই তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। পরবর্তী জীবন লক্ষ্য করিলে আচার্য শঙ্করের এই মহান নির্গমন উপরি উক্ত কোন বিশেষণেরই যোগ্য নহে। গর্ভধারিণীর জন্য তাঁহার হৃদয়ে কি মহাসিংহাসন তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। শৃঙ্গেরীতে শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা চলিতেছে। সহসা মুখে তিনি মাতৃদুগ্ধের স্বাদ পাইলেন। বুঝিলেন মাতৃদেবী মৃত্যুপথযাত্রী। রহিল শাস্ত্রপাঠ, রহিল শিষ্যবর্গের সুসংসর্গ, রহিল সেখানকার রাজসম্মান। তিনি ছুটিয়া চলিলেন মাতৃসান্নিধ্যে। অপূর্ব শিবস্তোত্র রচনা করিয়া তিনি পশুপতি বিশ্বনাথকে আবাহন করিলেন, মাতৃদেবীর শিবদর্শন হইল। কিন্তু বিশিষ্টা যে কৃষ্ণভক্ত! পুনরায় শঙ্কর ঐকান্তিক ভক্তিমিশ্রিত সুললিত স্তবে জগৎকারণ শ্রীহরির মনোরঞ্জন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন তাঁহার গর্ভধারিণীকে দর্শন দান করেন। বিশিষ্টা দেখিলেন সম্মুখে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু ভুবনমোহন রূপ লইয়া আবির্ভূত! মা বিশিষ্টা দেখিলেন—এ যে সেই অষ্টমবর্ষীয় বালক, তাঁহারই স্নেহের পুত্র শঙ্কর। যে-সন্ন্যাসী একদিন রচনা করিয়াছিলেন ঃ "পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম", তিনিই মাতৃসকাশে আসিয়া ঠিক পূর্ববৎ বালক হইয়াছেন। মাতৃবিয়োগের পর সমস্ত ঊর্ধ্বলৌকিক কার্য নিজে সমাধা করিয়া সন্ন্যাসী শঙ্কর শৃঙ্গেরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সন্ন্যাসীর মনে বৈরাগ্য এবং করুণার যুগপৎ সমন্বয় ঘটে। গৃহত্যাগকালে দ্বিতীয়টি প্রকাশের কোন অবকাশ ছিল না। তাই প্রথমটির অভিব্যক্তি লক্ষিত হইয়াছিল অষ্টমবর্ষীয় শঙ্করের মধ্যে। কিন্তু ইহা রিক্ততার অভিব্যক্তি নহে। তাঁহার সমন্বিত মনের পরিচয় পাইলাম পরবর্তী কালে। সন্ন্যাসীর মন যুগপৎ বর্জয়িতা এবং গ্রহীতা। যাহা ক্ষুদ্র তাহাই বর্জন। অপরদিকে রহিয়াছে সর্বাবগাহী ভূমার

সম্বাহন। সন্ন্যাসী মায়িককে ভুলেন, চিরন্তনকে হৃদয়ে রক্ষা করিয়া।

সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের মনের গঠন কেমন? কথামৃতকার শ্রীম একটি অপূর্ব লেখচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেদিন ছিল ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ সাল। স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে আসিয়াছেন। 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা দেখিতে বসিয়া শত শত ভক্ত নরনারী যত চোখের জল ফেলিয়াছেন হরিনামে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ চোখের জল ফেলিয়াছেন শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য। আজও তাহাই হইল। 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

"মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, 'আহা'। ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আহা' বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ের কাছে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, 'কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো, অধম জনম বৃথা কেটে গেল, বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদ্‌গদ স্বর। গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল।

"...এবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন। শচী মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কেবল নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখা দিয়াছে।"

দেখা যাইতেছে, যেখানে শ্রীভগবানের নামের ও প্রেমের অভিব্যক্তি হইতেছে, সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন। অথচ সাংসারিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি 'অণুমাত্র বিচলিত' হইতেছেন না। সংসারে যাহা দুঃসহ দুঃখের পরিস্থিতি, সন্ন্যাসী-মন সেখানে দুঃখ দেখে না। সন্ন্যাসীর অশ্রু কখনো শোকাশ্রু নহে। উহা সমবেদনার অশ্রু, করুণার অশ্রু। এক ফোঁটা জল চোখের কোণে দেখা গেল। সাধারণ সংসারাবদ্ধ মানুষের বদ্ধমানতার কথা ভাবিয়া সমবেদনায়, করুণায় উহা শ্রীরামকৃষ্ণের আঁখিকোণে সঞ্চিত হইয়াছে। যখন সাধন করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ঠাকুরবাড়ি, মানুষজন সবই ছায়া ছায়া প্রতীত হইয়াছে। বৃদ্ধা জননী, গ্রামদেশে যুবতী স্ত্রীর কথা স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আবার পরবর্তী কালে সেই শ্রীরামকৃষ্ণই ঠিকা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া গ্রীষ্মের দাবদাহে, সময়ে অসময়ে কলিকাতার পথে পথে ভক্তদের বাড়িতে বাড়িতে দেখা করিতে আসিতেছেন, নাচিয়া গাহিয়া অনর্গল কথা বলিয়া আনন্দের হাট বসাইতেছেন। লৌকিক, অলৌকিক, একাত্মতা, সর্বাত্মতার চমৎকার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। মনের রূপান্তরের সাধনাই সন্ন্যাসীর পরম সাধনা। যে-মন জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশে এই জগৎ ও প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ এতদিন ভুলিয়াছিল, সে একদিন সত্য উদ্ঘাটন করিয়া জাগিয়া উঠিবে।

সন্ন্যাসীর মনে আবাহনও নাই, বিসর্জনও নাই। অনন্ত চলার পথে তাহার মন পরম গতিময়তায় সমৃদ্ধ। খেতড়ির রাজসভায় নটীর গান শুনিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মনে প্রতিক্রিয়া হইল। তিনি সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শুনিলেন নটী গাহিতেছে ঃ "প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো/ সমদরশী নাম তিহারো...।" অমনি ফিরিলেন। যেখানে গ্রহণ নাই, সেখানে বর্জনও নাই। শান্ত হৃদয়ে জগদ্‌বস্তুর দ্রষ্টারূপে সেখানে সন্ন্যাসীর অবস্থান। মার্গারেট নিবেদিতা ভারতবর্ষকে স্বদেশভূমি বলিয়া জানিতেন। প্রথমাবধিই কি তাহাই ছিল? না, প্রথমে তিনি ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে আগ্রহী হন নাই। বিবেকানন্দের অসীম প্রয়াস কি ব্যর্থ হইবে? আলমোড়ায় নিজের প্রয়াস বারংবার ব্যর্থ হইতেছে বুঝিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সহসা অন্তর্ধান করিলেন। তিন দিন, তিন রাত তাঁহাকে দেখা গেল না। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, শান্ত, সমাহিত, গ্রহণ-বর্জনের অতীত এক সন্ন্যাসী সত্তা। এদিকে দেখা গেল নিবেদিতার প্রাণের সিংহাসনে ভারতমাতা চিরন্তন স্থান করিয়া লইয়াছেন। ততক্ষণে নিবেদিতা সত্যসত্যই ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতপ্রাণায় রূপান্তরিত হইয়াছেন।

পূর্বকথায় আসি। মনই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনকে সুন্দর করিয়া গড়িবার কৌশল আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবন হইতে শিখিতে পারি। সমাজে সকলের মন একই তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইবে—এমন আশা করা বৃথা। কারণ, বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রাণ। সুতরাং "ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণী" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, অর্গলাস্তোত্র)। স্বীয় মনই ভার্যা। এই 'মন' যদি আমার ইচ্ছানুসারিণী হয় তবেই তাহা 'মনোরমা'। এবং নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চ উচ্চতর সত্যের প্রতি মনের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে মনের রূপচারিত্র্য পরিবর্তন হইতে থাকে। উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় দেখা যায় ঐ মন 'সন্ন্যাসীর মন'-এ বিবর্তিত হইয়া জগতের শোভাবর্ধন করিতেছে। এই 'সন্ন্যাসীর মন'ই মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ❑

সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—**সম্পাদক**

সিদ্ধ ধানের গাছ হয় না, কিন্তু অসিদ্ধ ধানে হয়। জ্ঞানচৈতন্যবিশিষ্ট মানব মরিলে আর জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু অজ্ঞানীকে পুনরায় জন্মাইতে হয়।

*

প্রশ্ন হইল, এ-দেহ যখন অসার ও অনিত্য, তখন সাধু ভক্তেরা এ-দেহের প্রতি যত্ন করেন কেন? [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলিলেনঃ "শূন্য সিন্দুকের কেহ যত্ন করে না কিন্তু যে সিন্দুকে মোহর, টাকা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যসকল থাকে সকলেই তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করে।" যে হৃদয়-কুটীর পুণ্যাশ্রম হইয়াছে, যেখানে ভগবানের নিত্যলীলা প্রকাশিত হইতেছে—সাধু ভক্তগণ সেই হৃদয়াধার এই মলিন দেহকে যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

*

হাট হইতে যতক্ষণ দূরে থাকিবে, ততক্ষণ কেবল হাটের হোহো শব্দ শুনিতে পাইবে, কিন্তু হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর সে-শব্দ শুনিতে পাইবে না। তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইবে কেহ আলু চাহিতেছে, কেহ পটল চাহিতেছে। ঈশ্বর হইতে যতদিন দূরে অবস্থান করিবে, ততদিন কেবল যুক্তিতর্ক ও মীমাংসার কোলাহল-মধ্যে পড়িয়া থাকিবে কিন্তু তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারিলে আর তর্ক-মীমাংসা থাকিবে না, তখন সকলই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

*

চৈতন্যের উদয় হইলে জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না। শরীরের কোন অংশে কাঁটা বিঁধিলে অন্য একটি কাঁটা দ্বারা সেই কাঁটাটি বাহির করিতে হয় এবং ঐ বিদ্ধ কণ্টক বাহির হইলে আর কোন কণ্টকেরও প্রয়োজন থাকে না। অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু চৈতন্যের উদয় হইলে আর জ্ঞানও থাকে না, অজ্ঞানও থাকে না।

*

প্রশ্ন হইল, মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা কিরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইব? [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলিলেনঃ "যাহার গান-বাজনার শখ থাকে সে তক্তা পিটিয়া বাজনা শিখে; মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে ব্যাকুলিত হয়, ভগবান তাঁহার নিকট আপনা হইতে সাধন-প্রণালী প্রকাশিত করেন।"

*

শিশুসন্তানগণ একাকী ঘরের মধ্যে আনন্দে পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। কোন ভয়ও নাই ভাবনাও নাই; কিন্তু যেই 'মা' আসিল, অমনি পুতুল ফেলিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া নিকটে দৌড়িয়া গেল। মানবশিশুগণ! তোমরাও এক্ষণে ধন, মান, যশের পুতুল লইয়া বেশ আনন্দে খেলা করিতেছ, কোন ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যদি একবার সেই মাকে দেখিতে পাও তবে তোমাদিগকেও ঐসকল ফেলিয়া তাঁহার নিকট দৌড়াইতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখিলে আর সংসারের খেলা ভাল লাগিবে না।

*

কুলবধূগণ রজনীতে স্বামীর সহিত কি আলাপ করিয়াছে কাহাকেও বলে না, বলিতে ইচ্ছাও হয় না বরং কোনমতে প্রকাশিত হইলে লজ্জিত হয়, কিন্তু আপন সমবয়স্ক বন্ধুদিগের নিকট সমুদায় প্রকাশ করে, প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হয় এবং বলিয়া আনন্দ পায়। ঈশ্বরের সাধকও কিভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে প্রাণে যে-ভাব হয় অপরের নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না, ব্যক্ত করিয়া সুখ পান না এবং ব্যক্ত করিতে গেলে প্রাণের সে-ভাব থাকে না। কিন্তু অন্যান্য সাধকদিগের নিকট প্রাণ খুলিয়া সেকথা বলেন, বলিয়া সুখ পান এবং বলিবার জন্য ব্যাকুলিত হন।

*

বিষয়লালসা কিরূপে দূর হয়?

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাটবাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন তাঁহাদের আর বিষয়-লালসা থাকে না।

*

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরবক্ষস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি, সাগরেতেই তাহার স্থিতি। উভয় বস্তুত এক; প্রভেদ এই যে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও আশ্রিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র

মিসেস জর্জ ডব্লু হেলকে লিখিত*

[১]

প্রযত্নে, মিসেস জে. জে. ব্যাগলি
অ্যানিস্কোয়াম
২০ আগস্ট ১৮৯৪

মা,

আপনার চিঠিগুলি এইমাত্র আমার হাতে পৌঁছাল। ভারত থেকে কয়েকটি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। অজিত সিংহের[১] চিঠিখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ফটোটি এখনো পৌঁছায়নি এবং ঐ চিঠির তারিখ ছিল ৮ জুন। সুতরাং উত্তর পাওয়ার এখনো সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার খোঁজ করার জন্য আমার বন্ধু কুক অ্যাণ্ড কোম্পানিকে অনুরোধ করেছেন বলে আমি বিস্মিত হইনি। দীর্ঘকাল তাঁকে আমি চিঠি লিখিনি।

মাদ্রাজ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে যে, নরসিংহ[২]কে লেখা তাদের চিঠির উত্তর পাওয়া মাত্র শীঘ্রই তাকে টাকা পাঠাবে। সুতরাং দয়া করে নরসিংহকে একথা জানিয়ে দেবেন। ফটোগুলি আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি—শুধু শেষবার আমার ফিশকিলে থাকাকালীন দুখানি ছাড়া। ল্যাণ্ডসবার্গ[৩] অনুগ্রহ করে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে সম্ভবত ফিশকিলে যাব। 'মেয়রশৌম্'টি[৪] আমি সোজাসুজি পাঠিয়ে দিইনি, সেটি গার্ণসিদের[৫] কাছে রেখে এসেছি। আর সেব্যাপারে তারাও একটি অলস পরিবার।

ভগিনীদের কাছ থেকে আমি সুন্দর সুন্দর চিঠি পেয়েছি।

কথাপ্রসঙ্গে জানাই, আপনাদের মিশনারিরা ভারতের ইংরেজ সরকারের কাছে আমাকে একজন বিক্ষুব্ধরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে ইঙ্গিত করেছেন যে, হিন্দুধর্মের বর্তমান পুনর্জাগরণ সরকারের প্রতিপক্ষে। প্রভু মিশনারিদের আশীর্বাদ করুন। প্রেমে এবং (ধর্মে?) সবকিছুই নির্দোষ।

'শ্রী' শব্দটির অর্থ হলো 'সৌভাগ্যমণ্ডিত', 'আশীর্বাদপূত' ইত্যাদি। পরমহংস হলেন এমন একজন সন্ন্যাসীর উপাধি যিনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরোপলব্ধি করেছেন। আমি আশীর্বাদপূতও নই, লক্ষ্যস্থলেও পৌঁছাইনি; কিন্তু তাঁরা সৌজন্যপরায়ণ—এই হলো মোদ্দা কথা। শীঘ্রই ভারতে আমার ভ্রাতাদের নিকট আমি লিখব। আমি বড়ই কুঁড়ে, তাই দিনের পর দিন আজেবাজে লেখায় ভরা সংবাদপত্রের অংশগুলি পাঠাতে পারি না।

---

* ইংরেজিতে পত্রদুটি যথাক্রমে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর নভেম্বর ১৯৮৯ এবং জুলাই ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১ খেতড়ির মহারাজা, স্বামীজীর অনুরক্ত প্রিয় শিষ্য।

২ রাও বাহাদুর আর. নরসিংহচারিয়া মহীশূর সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

৩ হার লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ। জাতিতে রাশিয়ান। ইহুদি ধর্মভুক্ত ল্যাণ্ডসবার্গ নিউ ইয়র্কের একটি খ্যাতনামা পত্রিকার কর্মী ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং 'স্বামী কৃপানন্দ' নামে পরিচিত হন।

৪ শ্বেতমৃত্তিকার মতো এক খনিজ পদার্থ নির্মিত তামাকসেবনের পাইপ, যার মুখে একটি বাটির মতো বস্তু আছে।

৫ নিউ ইয়র্ক-বাসিনী শিষ্যা, স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য গার্ণসি-পরিবারের সঙ্গে বাস করেছিলেন।

আমি কিছুটা প্রশান্তি চাইছি, কিন্তু মনে হচ্ছে প্রভুর তা অভিপ্রেত নয়। গ্রিণ একরে আমাকে দিনে গড়ে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা কথা বলতে হয়েছে—সেটাই ছিল বিশ্রাম, যদি আদৌ বলা যায়। কিন্তু তা ছিল প্রভুর কাজ, আর সেই কাজ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তি সঞ্চার করে।

অধিক কিছু লেখার নেই এবং এইসকল স্থানে আমি কি বলেছি বা করেছি কিছুই মনে করতে পারছি না। সুতরাং আশাকরি মার্জনা করবেন।

অন্ততপক্ষে আর কয়েকটা দিন এখানে থাকব, এবং তাই মনে হয় আমার চিঠিপত্রগুলি এখানে পাঠিয়ে দিলেই ভাল।

গুরুভার ও বিশাল এক ডাক পড়ে দেখার পর এখন আমার প্রায় হতবুদ্ধি অবস্থা, সুতরাং আমার দ্রুত কুশ্রী লিখনের জন্য মার্জনা করবেন।

আপনার চিরদিনের স্নেহাস্পদ
স্বামী বিবেকানন্দ

[২]

হোটেল বেলভিউ
বেকন স্ট্রিট, বস্টন
১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

মা,

বিশাল প্যাকেটখানা পেয়েছি। আমার কলকাতার মঠ থেকে পাঠানো কয়েকটি অবাঁধা পুস্তিকা এতে আছে। ফোনোগ্রাফ সম্পর্কে আদপে কোন সংবাদ নেই। আমার মনে হয়, এব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধান করার এখন উপযুক্ত সময় হয়েছে।

মিসেস পামার[৬] আমাকে [জেমস] টডের লেখা 'রাজস্থানের ইতিহাস'-এর দুটি খণ্ড উপহার দিয়েছেন। তাঁকে সেটি আপনার প্রযত্নে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। খুকিদের এটি পড়তে খুব ভাল লাগবে এবং তারা পড়ে শেষ করার পর আমি এটিকে আমার সংস্কৃত বইগুলির সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।

আমি আপনাকে টাইপ-করা সংবাদের খণ্ডিত অংশগুলি পাঠাতে মোটেই বলিনি, বলেছিলাম 'ইণ্ডিয়ান মিরর' থেকে কিছুকাল আগে আমি যে কাগজের টুকরোটি পাঠিয়েছিলাম সেটির কথা। টাইপ-করা জিনিসগুলি আপনার পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।

এখানে আমার আর কোন বস্ত্রের প্রয়োজন নেই; সেসব যথেষ্টই আছে। আমার জামার কাফ ও কলার প্রভৃতির বেশ যত্ন নিচ্ছি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্রাদি আমার আছে। শীঘ্রই এর অন্তত অর্ধেক আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে।

ভারতে যাওয়ার আগে আপনাকে লিখব। আপনাকে সময়মত সংবাদ না জানিয়ে আমি পালাব না।

আপনার
বিবেকানন্দ

পুনঃ খুকিদের ও ফাদার পোপকে[৭] ভালবাসা জানাই।

---

৬ আমেরিকার উচ্চবিত্ত মহিলা। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সেখানেই তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন।
৭ শ্রীমতী হেলের স্বামী জর্জ ডব্লু. হেলকে স্বামীজী 'ফাদার পোপ' বলে ডাকতেন এবং তাঁদের কন্যাদ্বয় মেরি ও হ্যারিয়েট হেলকে 'খুকি' বলতেন।

মাঘ ১৩০৯
জানুয়ারি ১৯০৩

উদ্বোধন
আজ হতে ... বর্ষ আগে

হিন্দু সন্ন্যাসী

[আমেরিকায় প্রকাশিত 'সচিত্র বফালো এক্সপ্রেস'-এর প্রতিবেদন]

ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অল্পদিন হইল পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই সংবাদে আমাদের ১৮৯৩ সালের চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার অন্যতম প্রধান আকর্ষণস্বরূপ সেই কিশোর হিন্দু সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠে। ভারত হইতে পাশ্চাত্য-জগতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ সমুদ্র পার হইয়া আগত হিন্দু আচার্য্যগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। সেই সময়ে হিন্দুগণের অতি পুরাতন ধর্ম্মরূপ বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি লোককে এতদূর মোহিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিকাগোর কার্য্য শেষ হইবার পরে তিনি আমেরিকার অনেক সহরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেইসকল স্থানে বেদান্ত সমিতিসকল স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি অনেক পণ্ডিতসমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানাস্থলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অগাধ বিদ্যা ও বক্তৃতা-শক্তিগুণে সর্ব্বত্রই লোকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। স্বামীজী এদেশে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এদেশে আসেন ও নানাস্থানে বক্তৃতা দেন। অনেকের সাগ্রহ নিমন্ত্রণে তিনি তৃতীয়বার আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মঠে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন ও তথায় ৪ঠা জুলাই শরীর ত্যাগ করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মমহাসভার কতকগুলি কর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল, খ্রীস্টধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে সেই সভায় কেবল তামাসার মত দেখান আর খ্রীষ্টধর্ম্মকেই সমুদয় সম্মান দেওয়া। একথা যদি সত্য হয়, তবে যখন এই কিশোর প্রাচ্য প্রতিনিধি আসিয়া কেবল বক্তৃতাশক্তি ও প্রবল যুক্তিবলে ভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে প্রবল নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। বিবেকানন্দ যে শুধু চিকাগো ধর্ম্মসভার একজন মনোমুগ্ধকারী বক্তা ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি এবং অদ্ভুত বুদ্ধি ও ধর্ম্মবলে তাঁহাকে তাঁহার সময়ের একজন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য-পদে উন্নীত করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত অদ্ভুত। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।... কলেজে পড়িতে পড়িতে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় হইল আর ঐ মহাপুরুষ এই কিশোর ছাত্রের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইঁহার একজন শিষ্য হইলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হইলে বিবেকানন্দ একেবারে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং গৃহ ও সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শান্ত প্রকৃতির ব্রাহ্মণগুরুর শিক্ষা ও উপদেশ চিরস্থায়ী করিবার ও নর-নারী সেবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। অনেক বৎসর ধরিয়া কেবল গৈরিক বস্ত্র পরিধান এবং দণ্ড ও ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তথাকার অসংখ্য মন্দির দর্শন ও যাহারা শুনিতে চাহিত, তাহাদের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কখন হয়ত কয়েকদিন ধরিয়া অনশনে থাকিতে হইত। কখন বা প্রবল শীতে, কখন বা প্রবল গ্রীষ্মে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু ইহাই হিন্দুগণের ধর্ম্মশিক্ষার সাধন আর সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারা এইরূপ সাধন করিয়া আসিতেছে। হিন্দুজাতির অদৃষ্টচক্রে নানাবিধ দুঃখ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলেও যে তাহাদের মধ্যে জীবন্ত ধর্ম্মভাব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই জাতি যে এখনও অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্তরূপ তপস্যাকে তাহার অন্যতম কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের একজন উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন, বলিতে হইবে। আপন অদ্ভুত জীবনে নিজ উপদেশ ও শিক্ষার অনেকগুলি যে তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

চিকাগো ধর্ম্মসভায় তাঁহার সফলতা বিশেষ বিস্ময়কর এইজন্য যে, কথিত হইয়া থাকে, এখানেই তিনি প্রথম সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে প্লাটফর্ম্ম হইতে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ বিশেষভাবে প্রস্তুতও হন নাই, কেবল বক্তব্য বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান তাঁহার ছিল।

স্বামীজী শুধু যে দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন রীতিমত পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও তিনি বিদেশে (অর্থাৎ ভারতে) জন্মিয়া বিদেশেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজী গদ্যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একজন ইংরাজ সমালোচকও বলিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত রচনাসকল ইংরাজী ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। এইসকল পুস্তকের অধিকাংশ এখানে ও ইংলণ্ডে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা এবং ভারতীয় দর্শন বিষয়ক।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও তা লাভের উপায়

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি চুলচেরা দার্শনিক বিচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বেশি জোর দিতেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে সমস্যা, তার সমাধানের ওপর। দার্শনিক বিষয়বস্তু তাঁর উপদেশের মধ্যে ভুরি ভুরি আছে, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা গবেষণা করুন, সাধারণ মানুষের তাতে খুব বেশি আগ্রহ নেই। সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ সরল করতে চায়, জীবনের দুঃখ-আঘাতকে কি করে এড়াতে পারে বা সহ্য করতে পারে তার উপায় জানতে চায়। লক্ষ্য করেছি, সাধারণ মানুষ ধর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ না করেই স্বীকার করে নেন এবং সেই ধর্মের প্রবাহ যে তাঁদের জীবনে দেখা যাচ্ছে না, তা অনুভব করে জীবনকে সেই পথে পরিচালিত করার পথ খোঁজেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে বেশির ভাগ আলোচনা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় জীবের চারটি থাক—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। 'বদ্ধজীব' বলতে সংসারী জীবকে বোঝানো হয়েছে। যারা বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করেছে, তাদেরকেই যে সংসারী জীব বলা হচ্ছে তা নয়। 'সংসার' কথাটার শাস্ত্রসম্মত অর্থ হলো—"সংসরতি ইতি সংসারঃ", অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়ে বারংবার গতায়াত করা। গতাগতির এই পরম্পরা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নেই। যাঁরা পথ খুঁজছেন অথচ খুঁজে পাচ্ছেন না, ঠাকুর তাঁদের জন্য পথনির্দেশ করেছেন। বলছেন, বদ্ধজীব মহামায়ার জালে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ এবং সে-বাঁধন এত দৃঢ় যে, মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। আবার অনেক সময় তার চেয়েও দুরবস্থা এই যে, বন্ধনের মধ্যে থেকেও সেই বন্ধনের বোধই নেই। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : "যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে।... যারা [যেসব মাছ] জালে পড়েছে অধিকাংশই পালাতে পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়্‌হড়্ করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।" ('কথামৃত', ১।১।৬) সংসারী জীবরাই এইভাবে বদ্ধ। বাঁধন যে আছে, সেসম্বন্ধে অনুভূতি নেই, বোধ নেই যে বদ্ধ হয়ে আছি। চারদিক থেকে ঘা খাচ্ছি; তবু ভাবছি, এরই মধ্য থেকে এমন সেয়ানা হয়ে চলব যে সব এড়াতে পারব।

কতকগুলি মাছ আছে, যাদের বোধ হয়েছে যে, তারা জালে আটকে পড়েছে। জালের ভিতর ছট্‌ফট্ করছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। চেষ্টা করছে, সফল হচ্ছে না, তবু চেষ্টা করছে। এদেরকে ঠাকুর বলেছেন 'মুমুক্ষুজীব' অর্থাৎ মুক্তিকামী। তারা এই জালের মধ্যে ছুটোছুটি করছে, পালাবার শক্তি নেই।

তার পরের থাক মুক্তজীব—দু-চারটে যারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন : "দু-চারটা ধপাং ধপাং করে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল।" (ঐ) এরা বদ্ধ ছিল, তারপর মুক্ত হলো। আর কতগুলি যারা কখনো জালে পড়ে না, তারা 'নিত্যজীব'। তারা কখনো বদ্ধ হয় না, নিত্যমুক্ত। এই শ্রেণীর জীব খুব দুর্লভ। সংসারে অধিকাংশই জালে বদ্ধ থেকেও কোন বোধ নেই, নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছে। এইখানেই সুখশান্তি খুঁজে পাব—এই আশা করছে। সেই দৃষ্টিতে আমরা সবাই সংসারী।

ঠাকুর বলছেন, এই সংসারী বা বদ্ধজীবদের যদি অন্য পরিবেশে নিয়ে যাও তো তারা অস্বস্তি বোধ করবে। বলছেন, বিষ্ঠার কৃমিকে যদি ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তবে সে মরে যাবে। সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে, কাদায় মুখ গুঁজে ভাবছে—কোন চিন্তা নেই! বন্ধনের অনুভূতি হচ্ছে না। যদিবা কখনো একটু-আধটু অনুভূতি হয়ও, তা এত ক্ষীণ যে তার থেকে বেরোবার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। যারা মুমুক্ষুজীব, তারা এর থেকে উন্নত শ্রেণীর সন্দেহ নেই; জালে বাঁধা অবস্থায় তাদের জীবনটা একটা প্রবল সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চলছে। বন্ধনের অনুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মুক্তির পথ পাচ্ছে না। ঠাকুর গান গাইছেন—

"বিল করে ঘুনি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।।"

(ঐ, ৫।২।২)

মুক্তির পথ যে নেই তা নয়, কিন্তু তার জন্য যে প্রবল চেষ্টা ও আগ্রহ দরকার, তা নেই। এই মুমুক্ষুজীবের ভিতরেও বিভিন্ন স্তর আছে। কারো একটু-আধটু চেতনা হয়তো হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে—না, এইরকম করেই চলে যাবে। অর্থাৎ প্রবল আকাঙ্ক্ষা নেই। যখন মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখনি তাকে ঠিক ঠিক মুমুক্ষা বা মুক্তির ইচ্ছা বলে। তাদেরকেই বলে মুমুক্ষুজীব—যাদের জীবন অস্বস্তিতে, দুঃখে ভরা। যাদের বন্ধনের অনুভূতি নেই, তারাও বরং একরকম করে কাটাতে পারে। কিন্তু যারা মুমুক্ষু, বন্ধনের অনুভূতি রয়েছে অথচ সেই বন্ধন কাটাতে পারছে না, তাদের জীবন দুঃসহ। কিন্তু এই দুঃসহ বেদনাবোধ যদি না থাকে তবে জাল থেকে বেরোবারও কোন উপায় নেই। আবার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি, সাহস ও উদ্যম দু-চারজনেরই থাকে। মুক্তজীবেরা সংখ্যায় অতি অল্প। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন : "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু..." (৭।৩) ইত্যাদি। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দৈবাৎ এক-আধজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। কিসের সিদ্ধি? বন্ধনমোচনরূপ সিদ্ধি, মুক্তিরূপ সিদ্ধি। আবার যারা চেষ্টা করে, তাদের হাজার হাজারের মধ্যে হয়তো এক-আধজন সফল হয়, বাকি সব ঐ জালের ভিতর থেকেই ছটফট করে।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণ একথাগুলি বলছেন, তখন একজন ভক্ত প্রশ্ন করছেন ঃ "মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই?" ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন ঃ "অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—আমাকে ভক্তিবিশ্বাস দাও।" ('কথামৃত', ১।১।৭) তিনি শুধু উপায় আছে বললেন না, বললেন—অবশ্যই আছে। কি উপায়? প্রথম কথা হচ্ছে সদসৎ বিচার—কোন্টা নিত্য আর কোন্টা অনিত্য বিচার করা। সংসারকে অনিত্য বলে যদি বুঝতে পারি, তাহলে সংসারের ভোগে আমরা কখনো মশগুল হয়ে থাকতে পারব না। তাই বিচার করে দেখতে হয়। ভেবে দেখতে হয়, যে-বিষয়গুলিকে ভোগ করতে চাইছি, সেগুলি নিত্য কি অনিত্য? দুদিনের জন্য এসব পেতে পারি, কিন্তু তারপর কি হবে? জালের ভিতরে মুখ গুঁজে কতক্ষণ থাকা যাবে? জেলে শেষকালে হিড়হিড় করে টেনে তুলবে এবং মৃত্যু। বিচার করলে এই কথাটি মনে আসবে। যার জন্য আমরা ছোটাছুটি করছি, সেগুলি নিত্য না অনিত্য, সোজা কথায় এই বিচার করা। প্রত্যেকেই বুঝি অনিত্য, কিন্তু বুঝেও বোঝা হয় না। কারণ, এর মধ্যেই আমরা চিরকাল সুখে থাকব—এই আশা করে বসে আছি। অনিত্যবস্তুর প্রতি এই আকর্ষণই আমাদের ভগবানকে ভুলিয়ে রাখে।

সুতরাং যদি আমাদের জীবনকে আরো সার্থক করতে হয়, তাহলে বিচার করে পরখ করে দেখে নিতে হবে, আমরা যা চাইছি তা নিত্য না অনিত্য। অবাস্তব বস্তুর পশ্চাতে ছুটে ছুটে আমাদের সমস্ত শক্তির অপব্যয় করছি, নিত্যবস্তুর খোঁজ পাচ্ছি না। বিচার করলে মানুষের মনে খানিকটা চেতনা জাগে। তারপর সেই চেতনা যদি গভীরভাবে মনকে নাড়া দেয়, তাহলে আর এই জাগতিক সুখের বস্তুগুলিকে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারব না। যখনি সাংসারিক বস্তুকে প্রিয় বলে, কাম্য বলে মনে করি তখনি বুঝতে হবে যে, বিচারকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি।

সংসারে কি মানুষের সুখ নেই? আছে বৈকি। তা না হলে এত ছুটোছুটি কিসের জন্য? সুখ আছে, কিন্তু সেই সুখ এত ক্ষণস্থায়ী, এত সীমিত যে তাতে মানুষের স্থায়ী তৃপ্তি হতে পারে না। এইজন্য সুখকে ক্ষণস্থায়ী বুঝে আমাদের একে তুচ্ছ ভাবতে হবে। বিচার করে দেখলে দেখব, অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর যে-সুখ, সে-সুখ দুঃখের কারণ। ছোট ছেলে। সে অবোধ, কিছু জানে না। ভাবছে, রসগোল্লা পেলে খুব খাই। তারপর যে তার অসুখ হবে, যেটা এখন সুখের বলে মনে হচ্ছে তা যে দুঃখের কারণ হবে তা সে বুঝছে না। আমরা সকলেই ঐ শিশুর মতো নির্বোধ। যেহেতু আমরা বিচার করে দেখি না কোন্টা নিত্য কোন্টা অনিত্য, কোন্টা প্রকৃতই সুখের, কোন্টা দুঃখের। যাকে কাম্যবস্তু বলছি তা যে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

মৃত্যু কাকে বলে? এই দেহের মৃত্যু মৃত্যু নয়, আদর্শকে ভুলে থাকাই হলো মৃত্যু। শাস্ত্রে বলে, আত্মাকে যখন ভুলে থাকি তখন তা মৃত্যু। যে আত্মাকে ভুলে থাকে, সে আত্মঘাতী। শাস্ত্র বলছেন যে, যারা আত্মঘাতী হয়, নিত্যকে ভুলে অনিত্যতে মগ্ন হয়ে থাকে—তারা অনন্ত নরক ভোগ করে, অনন্ত দুঃখের ভিতরে পড়ে। এই যে চেতনার বিস্মৃতি, অনিত্যবস্তুর ভিতরে স্থায়িভাবে বাসা বেঁধে থাকা—এটাই হলো বদ্ধজীবের চিহ্ন।

বদ্ধজীবের এই বন্ধন অবস্থা থেকে মুক্তির একটা উপায় হলো তার ভিতরে মুমুক্ষা—মুক্তির ইচ্ছা জাগানো। তার উপায় হলো বন্ধনকে বন্ধনরূপে বুঝে নেওয়া। আমরা সংসারে সুখ চাইব, এটাই স্বাভাবিক। দুঃখ কেউ চায় না, সকলেই সুখ চায়। কিন্তু কোন্টা সত্যিকারের সুখ আর কোন্টা আপাতমনোরম তা বুঝতে পারি না। এইজন্যই বিচার দরকার। ঠাকুর বলছেন—সদসৎ বিচার, কোন্টা সৎ কোন্টা অসৎ সেটা বিচার করা। বিচার করে দেখলে যে-বস্তুকে আজ মনোরম বলে মনে হচ্ছে কাল তা বিপরীত রূপে প্রতীত হবে। গীতায় ভগবান বলছেন ঃ "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (৯।৩৩)—এই জগৎটা অনিত্য, দুঃখময়; এখানে এসে আমার ভজনা কর। জগৎ অনিত্য—এ আর নতুন কথা কি! এ তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই অনিত্যের বোধ আমাদের নেই। জগৎকে জানা আছে, কিন্তু সেবিষয়ে মনের চেতনা নেই। ভগবান তাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন, এই সত্যকে জানানোর চেষ্টা করছেন যে, জগৎ অনিত্য এবং দুঃখময়।

বস্তুত, সুখের আবরণ দিয়ে দুঃখই আসে। স্বামীজী বলেছেন ঃ "দুঃখের মুকুট মাথায় পরে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়) সুখকে বরণ করলে তার মাথায় যে দুঃখের মুকুট আছে—সেটিকেও বরণ না করে উপায় নেই। অনেক সময় মনে হয়, এই সংসারে সুখের উপকরণ তো রয়েছে, আমরা চেষ্টা করে তা অর্জন করব। যারা দুর্বলহৃদয়, যাদের উদ্যম নেই, প্রযত্ন নেই, তারা বলবে—না, না, এজগৎটা দুঃখের। এটা হতাশার কথা। মানুষ চেষ্টা করে এর ভিতর থেকে সুখকে সংগ্রহ করতে। যুগ যুগ ধরে মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু এই চেষ্টা সবসময় বৃথা হয়েছে, কখনো সার্থকতা লাভ করেনি।

শুধু এই জগতে নয়, আমরা কল্পনা করি স্বর্গে গিয়ে খুব আনন্দে থাকতে পারব। জগতে যে-সুখ ক্ষণস্থায়ী, স্বর্গে সেই সুখ দীর্ঘকালস্থায়ী। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করে স্বর্গে যাব, ভোগ করব। এই জগতের ভোগে তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই আমরা ভাবছি মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল ভোগ করব। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন, বিচারশীল মানুষ বোঝে যে, স্বর্গ কখনো চিরস্থায়ী হয় না। যা আমার স্বভাবজাত নয়, যা অর্জিত—তার বিনাশ অবশ্যই হবে। সুতরাং স্বর্গের প্রতি যে-লোভ সে-ও বৃথা। এটি বিচারের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে। ঐ বিচারের পর আসে মুমুক্ষুত্ব—মুক্তির ইচ্ছা। তখন ঠাকুর যে-উপায়গুলি বলেছেন সেগুলির কথা ভাবতে হবে। প্রথমে বিচার, তারপর বিচার করে নিত্যকে বুঝে অনিত্যকে তুচ্ছ করে নিত্যের দিকে যেতে হবে। বিচারের পরিণাম এটিই হওয়া উচিত।

তারপর ঠাকুর বলেছেন, যে-মন দিয়ে বিচার করব সেই মনটাই নির্মল নয়, মলিন মন। তাই বিচারের মধ্য দিয়েও আমাদের নির্মলতা আসছে না। বিচার করে মনের শক্তি বৃদ্ধি

হচ্ছে। এইজন্য বলছেন, ভগবানের নাম কর, তাতে মন শুদ্ধ হবে। তখন বুঝতে পারবে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য। দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে। তারপর যখন জগৎকে তুচ্ছ বলে বুঝতে পারবে তখন কি খুঁজবে? ঠাকুর বলছেন, সাধুসঙ্গ। 'সাধু' মানে যিনি ভগবানের পথে পথিক। তাঁর সঙ্গ করবে। সঙ্গ দ্বারা কি লাভ হবে? ক্রমশ বোধ হবে যে, জগতের অতিরিক্ত কিছু সত্যের সন্ধান তাঁরা দিচ্ছেন। এমন বস্তুর সন্ধান দিচ্ছেন যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পেতে পারি না। এটি সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানিব্যক্তিদের সঙ্গের ফলে হয়। তাঁদের জীবনে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই তাঁদের দেখে মানুষ শিখতে পারে।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ একটি সুন্দর গল্প আছে। নিমি রাজার সভায় একজন অবধূত এলেন। তরুণ বয়স, মেধাবী, বুদ্ধিমান। সংসারে তাঁর ভোগের বস্তু কিছু নেই। তবু মুখখানা আনন্দে ভরপুর। রাজা বললেন ঃ "তোমার এত আনন্দ কিসের? যেসব বস্তুতে আমাদের আনন্দ হয়, সেরকম কোন বস্তুই তো তোমার নেই। আবার তোমার যা মেধা ও বুদ্ধি দেখছি তাতে তুমি ইচ্ছা করলে ভোগের বস্তু সব সংগ্রহ করতে পার। কিন্তু সে-চেষ্টা তুমি করোনি, অথচ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছ। তোমার এত আনন্দ কোথা থেকে আসছে?" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "আমার আনন্দ আমার ভিতর থেকে আসে, বাইরে থেকে নয়।" এই যে ভিতরের আনন্দের সন্ধান দেওয়া—এ যাঁরা আনন্দবোধ করেছেন তাঁরাই দিতে পারেন। তাই সেরকম লোকের সঙ্গ করতে হয়। সঙ্গ করলে তখন সেই দিকে দৃষ্টি যায়; বুঝতে পারি, এর বাইরেও একটা জগৎ আছে যেখানে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই ঠাকুর বলছেন সাধুসঙ্গ করতে।

তারপর ঠাকুর বলছেন মাঝে মাঝে নির্জনবাস করতে। সাধুসঙ্গ হলেও চারিদিকের পরিবেশ সেসব কথা ভুলিয়ে দেয়। সেইজন্য মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে মনকে যাচাই করতে হয়—মন, তুমি এই দুদিনের সুখ নিয়েই থাকবে, না নিত্য সুখের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে? নিত্য সুখ যে আমাদের নাগালের বাইরে তা মনে হয় না, কারণ কেউ কেউ যে সেই সুখের আস্বাদন করছেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানী, মায়ামোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের দেখে বোঝা যায় যে, জগতের অতীত একটি সত্তাকে তাঁরা বোধ করছেন। সুতরাং মানুষের সেইদিকে যাওয়ার সাহস হয়। তারপর দীর্ঘকালের সংগ্রাম দরকার হয়। যখন সেই সংগ্রামের পরিপূর্ণতা আসে, পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায় তখন সে মুক্তির স্বাদ পায়, সে মুক্ত হয়।

ঠাকুর বলছেন, কতকগুলি জীব আছে যারা কখনোই মহামায়ার জালে পড়ে না। তারা নিত্যমুক্ত। সেকথা কেবল অবতার এবং তাঁর পার্ষদদের সম্পর্কেই বলা চলে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোধগম্য হয় না। তবে এরকম ব্যক্তি যে আছেন তা বিচার করলে জানা যায় এবং যাঁরা সেরকম বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের সেটা অনুভব হয়। এই যে তাঁদের ধূলিমলিন জগতে আসা তা কেবল আমাদের সন্ধান দেওয়ার জন্য যে, এর বাইরে গেলে অপার আনন্দ—যে-আনন্দ আমাদের সব দুঃখদুর্দশার পারে নিয়ে যাবে। দেবতারাও সেই স্থানে পৌঁছাতে পারেন না। কারণ, তাঁরাও বাসনাবদ্ধ। বাসনা আছে বলেই তাঁরা দেবতা হয়ে আরো ভোগ করতে চেষ্টা করছেন। মানুষের চেয়ে তাঁরা খুব বেশি উঁচু থাকের নন। যে-মানুষ সমস্ত বাসনাকে পরিত্যাগ করেছে, যে-মানুষ নিজের সত্তা, নিজের পূর্ণতা, নিজের নির্মল স্বরূপকে ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে—তার কাছে দেবতারাও তুচ্ছ। 'দেবতা' বলতে আমরা যেসব দেবতাদের পূজা করি তাঁদের বোঝায় না। যাঁদের আমরা অজ্ঞানপূর্বক পূজা করি, তাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে একটু উচ্চস্তরের। আমরা ভাবি, তাঁদের সাহায্যে আমরা ভোগের বস্তু পাব। আসলে আমাদের নিজেদের ভোগবাসনাই তাঁদের প্রতি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা মুক্তি দেবেন না, সেখানে আমাদেরও মুক্তিকামনা লক্ষ্য নয়। কিন্তু বাসনামুক্ত মনে আবার সেই দেবতাকেই আমরা মুক্তিপ্রদরূপে ভাবতে পারি। কাজেই উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুসারে আমাদের দেবতা সম্বন্ধে ধারণা ভিন্নরূপ। এরকম শোনা যায় যে, যাঁদের ছোটখাট দেবতা বলি, তাঁরা আমাদের ছোটখাট বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। আর যিনি দেবাদিদেব—তিনি যিনিই হোন না কেন, তাঁকে যে-নামেই ডাকি না কেন—তিনি আমাদের সেই চরম আনন্দ, পরম মুক্তি যা, তা দিতে পারেন। যখন আমরা তাঁর সন্ধান করি তখন দেবত্বেরও অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যাই।

এই জগতে দেখি, বহু বিত্তশালী, খ্যাতিমান মানুষ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ আনন্দে আছে। ভোগের বস্তু তাদের প্রচুর। কিন্তু সেসব থাকা সত্ত্বেও তারা চিরকাল তৃপ্ত থাকতে পারে না। যত ঐশ্বর্যই থাকুক, যদি সে বুঝতে না পারে যে এই ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী নয়, তাহলে তার সেই সুখ পরিণামে দুঃখের কারণ হয়। জগতের অতীত তত্ত্বের সন্ধান সম্ভব হয় না যদি মনে তীব্র বৈরাগ্য না আসে। আর তীব্র বৈরাগ্য ততক্ষণ আসতে চায় না, যতক্ষণ না আমাদের ভোগলালসা অন্তত আংশিকভাবেও নিবৃত্ত হয়। সেইরকম লোকেদের জন্য ঠাকুর বলেছেন—খেয়ে নে, পরে নে, কিন্তু জানিস এগুলি কিছুই কিছু নয়। তাদের খেয়ে নেওয়া, পরে নেওয়া, কতকটা আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেওয়ার দরকার আছে। বলছেন, যার পেটে অন্ন নেই তার কাছে ভগবানের উপদেশ করে কোন লাভ নেই। কারণ পেটের জ্বালা আগে মেটাতে হবে, তারপর ভগবানের কথা। সংসারের একান্ত প্রয়োজন যেগুলি, সেগুলি অন্তত কতকাংশে যদি না মেটানো যায় তাহলে মন ভগবানের দিকে যায় না। একথাটা খুব ভাল করে বোঝা দরকার। ঠাকুরের কথা—"খালি পেটে ধর্ম হয় না।" স্বামীজী এই কথার ওপর খুব জোর দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা ভোগ অর্জনেই চেষ্টা কর না, তা না করে পড়ে আছ সেই তামসিক অবস্থায়। তোমাদের জগদতীত সত্তায় পৌঁছানোর কোন আশাই নেই। উদ্যমী হতে হবে, প্রথমে নিজের প্রয়োজন কতকাংশে মিটিয়ে তারপর ভগবানের দিকে যেতে হবে।

বিরল কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই জগতের কোন ভোগের দিকে দৃষ্টিই দেননি। একেবারে সেই হোমাপাখির মতো জন্মেই ওপরের দিকে চোঁচা দৌড়। ঠাকুর বলছেন ঃ "বেদে আছে

হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সে আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।" ('কথামৃত', ১।১।৭) কিন্তু সেরকম লোক কজন?

অনেকেই বলেন, সংসারের চাপে ব্যস্ত, ধর্ম করার অবকাশ কই? 'সংসারের চাপে ব্যস্ত থাকা'—এই কথাটির একটু তাৎপর্য আছে। যদি সাংসারিক অভাবগুলি এত তীব্র হয় যে, তা সমস্ত মনকে কেড়ে নিচ্ছে, তাহলে ভগবানের দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য একটু-আধটু অভাবপূরণ করে নেওয়া দরকার। জীবনযাত্রাকে অপেক্ষাকৃত সহজ সরল করার চেষ্টা করা দরকার। তারপর উচ্চতর তত্ত্বের কথা চিন্তা করার অবকাশ আসবে।

এই কথাটি বলছেন ঠাকুর, যিনি নিজে মুহুর্মুহু সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে যেতেন। তাঁর কথা আ-সাধারণ সকলের জন্য। তাঁর মতো এককথায় সমাধিমগ্ন হয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, তা তিনি জানতেন। তাই তাদের বলছেন—খেয়ে নে, পরে নে, যা সামান্য কিছু ভোগ করার করে নে। তারপর তাঁর দিকে যাবি। এই যে সামান্য ভোগ করতে বলছেন, তার মানে এই নয় যে, ভোগের দিকে যেতে তিনি আমাদের উৎসাহিত করছেন। বলছেন, ভোগ কর তবে বিচারসংযুক্ত ভোগ, বিচার করে দেখ এতে কি আছে এবং তারপর বিচার করে ত্যাগ কর।

তৃষ্ণা মেটানোর উপায় হচ্ছে ভগবৎপ্রেমের অমৃতপান। সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি করলে তবে ভোগের তৃষ্ণা যায়, তার আগে নয়। তৃষ্ণার এই একান্ত নিবৃত্তির পূর্বে মানুষের প্রয়োজন হলো প্রস্তুতির। অর্থাৎ এই সংসারের ভিতরে যে-স্তরে সে আছে তা থেকে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। এক কথাতেই একেবারে সর্বস্বত্যাগ—এ হয় না। আমাদের পক্ষে কখনো তা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে বিচারসংযুক্ত ভোগের ভিতর দিয়ে ত্যাগের পথে যেতে হয়। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে অন্তত একেবারে ভোগের নিন্দা করা হয় না। ভোগ করতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সংযমপূর্বক ভোগ। সংযমপূর্বক ও বিচারসংযুক্ত ভোগ যদি না হয় তো সে-ভোগ আমাদের চিরকাল বিষয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। সেইজন্য বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করতে হয় এবং বিচার তখনি করা সম্ভব যখন ভোগের লালসা তত তীব্র নয়। লালসা না কমলে বিচারও আসে না।

ধরা যাক, কারো একমাত্র পুত্র বিছানায় পড়ে আছে, দারুণ সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত। তাকে যদি বলি—এসব অনিত্য বস্তু, এনিয়ে ভেবে কি হবে? তখন সেই মন কি ভগবানের দিকে যাবে? সে কি তখন তার সন্তানকে অনিত্য বলে বোধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুরঘরে বসে চোখ বুজে থাকবে? তা পারবে না। তখন তাকে বলতে হবে যে, যা করলে রোগের উপশম হয় তাই কর। চেষ্টা কর এবং সর্বোপরি ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর কর—দুইই বলতে হবে। তাছাড়া সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর নির্ভরতা—এ কাদের আসে? যারা নিজেদের ভোগ-আকাঙ্ক্ষাকে কতকটা নিবৃত্ত করেছে, তাদেরই আসা সম্ভব।

কাজেই ঠাকুর সকলকে সর্বস্বত্যাগের কথা কখনোই বলেননি। বলেননি—সবাই ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাও। তিনি বলেছেন, সংসারে থেকেও হয়, সংসার ত্যাগ করেও হয়। কারো পক্ষে সংসারত্যাগ বিহিত, কারো পক্ষে সংসারের ভিতরে থেকে সেই ধর্মপথে চলা বিহিত। অবস্থা বুঝে, অধিকারিভেদে বিচার করতে হবে। যে-ভগবান বলছেন সর্ব বৈরভাব ত্যাগ করতে হবে, সেই ভগবানই আবার অর্জুনকে বলছেন, যুদ্ধ কর। কেন এইরকম বলছেন? বুঝতে হবে অধিকারিভেদ। সুতরাং সংসারে আমরা যে-অধিকার পেয়েছি, যে-স্তরে আছি—সেখান থেকেই আমাদের এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেবল একা ভোগ করলে হবে না, জগতের সকলের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে হবে। সর্বশাস্ত্রের সার গীতায় এই কথা বলা হয়েছে। আমার যেমন সুখ-দুঃখ, তেমনি জগতের অপর সকলেরও সুখ-দুঃখ আছে, তা বুঝে আমাদের চলতে হবে। এইভাবে চললে তবে সকলের সঙ্গে আমাদের আত্মার ঐক্য বুঝতে পারব। তখন নিজেরা কল্যাণলাভ করব এবং জগতের কল্যাণলাভের পথও প্রশস্ততর করব।

ঠাকুরের উপদেশ অনেকসময় আমরা ভুল বুঝি। মনে করি তিনি বোধহয় শুধু ত্যাগের কথাই বলেছেন। অবশ্যই বলেছেন। যাকে বলে জোর দিয়েই তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলেছেন: "ত্যাগ ছাড়া হবেনি বাপু।" কিন্তু কৌপীন পরে সংসার থেকে বেরিয়ে যাওয়া—সেটাই কি ত্যাগ হলো? ত্যাগ মানে অন্তরে ত্যাগ। সংসারীদেরও অন্তরে ত্যাগ করতে হবে; তা না হলে হবে না। আর সন্ন্যাসীরা অন্তরে বাইরে দুভাবেই ত্যাগ করবে। অধিকারিভেদে এমন ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলেছেন—এটুকু মনে রেখে আমাদের যার যা সামর্থ্য আছে সেই অনুসারে নিজের নিজের স্তর থেকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে হবে পরম লক্ষ্যে। লক্ষ্যে পৌঁছালে দেখব যে, সন্ন্যাসী আর সংসারী একই গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হবে যখন, তখন সে সকলের ভিতর ভগবানকে দেখবে। সুতরাং সকলের সুখে তার সুখ, সকলের দুঃখে তার দুঃখ। এই যে সর্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি—এইটিই হলো শাস্ত্রের, সাধনার শেষকথা এবং তার আরম্ভ যে যেখানে আছে সেখান থেকেই তাকে শুরু করতে হবে।

শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ধীরে ধীরে আমাদের এই পথে অগ্রসর করেন।* ❑

*** ১০ এপ্রিল ১৯৮৩ বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি।**

এই বিশেষ নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *কিন্তু যে-ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত (আত্ম-রতি), আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কর্তব্য নাই।*

(তাই) আত্মজ্ঞানীর ইহজগতে কর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। আবার কর্ম না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় (দৈনন্দিন কর্মজাত সঞ্চিত পাপ—যাহার জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। ১৩নং শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য) হয় না। ইহা ছাড়া ব্রহ্মাদি হইতে শুরু করিয়া স্থাবর পর্যন্ত কোন প্রাণীর সহিত তাঁহার প্রয়োজন নাই বা প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই।

ব্যাখ্যা ঃ যে-ব্যক্তি নিজেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র অনুভব করেন, তিনি নিজের ভিতরেই এত আনন্দ লাভ করেন যে, বাহ্য বিষয় ভোগ করিবার কোন চিন্তাই তাঁহার মনে ওঠে না। এবং যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে, তিনি যদি কোন কর্ম করেন তাহাতে বিন্দুমাত্র অভিসন্ধি থাকে না। কিংবা সংসারী ব্যক্তি যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করে, তাহা না করিলেও তাঁহার কোন অপরাধও হয় না। কারণ, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার তো কোন সম্পর্ক নাই।

দীর্ঘদিন সৎপথে না থাকিলে, সু-অভ্যাস না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। কাজেই জ্ঞানীর পক্ষে অন্যায় কার্য করা অসম্ভব। সাধারণ মানুষ দশ বৎসরের চা-খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। জ্ঞানী কি করিয়া আজীবন যাহা অভ্যাস করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন এবং কুপথে চলিবেন? ইহা কল্পনা করাই হাস্যকর। তবে দেখা যায়, কখনো কখনো জ্ঞানী ব্যক্তি (হয়তো খেলার ছলে) কোন সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন। বুঝিতে হইবে তাহা পরোপকারের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের গৃহে 'চচ্চড়ি' খাইয়াছিলেন—যদিও কেশব অব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিলাতে গিয়া ম্লেচ্ছদের সহিত খাইতেন। মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজীর দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাকে কোন পাপ কখনো স্পর্শ করিবে না।"

জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তে কোন দেনা-পাওনা, লেন-দেন নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে পরোপকার বৃত্তি উঠে কেন? ইহার উত্তর এই ঃ জ্ঞানী বা কোন কোন সিদ্ধ পুরুষের চিত্তে কিঞ্চিৎ 'দয়া' অবশিষ্ট থাকে। ঐ দয়ার প্রেরণাতেই তাঁহারা সামান্য পরোপকার মাত্র করিয়া থাকেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।।১৯।।

শ্লোকার্থ ঃ *অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা নিত্যকর্ম (পঞ্চযজ্ঞাদি নিত্যকর্ম—যাহা না করিলে 'প্রত্যবায়' হইবে) অনুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ পরমবস্তু প্রাপ্ত হইবে।*

ব্যাখ্যা ঃ দেহাত্মবুদ্ধির সাহায্যে সংসারভোগ করিবার ইচ্ছা দূর হইয়া গেলেই মানুষ নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। সুতরাং যাহাদের নির্জনে নিদিধ্যাসন করিবার বিশেষ বাধা আছে অথবা যাহাদের যোগশিক্ষার জন্য সদ্গুরু লাভ সম্ভব হয় না, তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম থাকিয়া কর্ম করিতে করিতেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

[**মন্তব্য ঃ** দেহাত্মবুদ্ধি = এই শরীরই আমি—এই বোধ। নিদিধ্যাসন = ধ্যান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "ধ্যান করবে মনে বনে কোণে।" সংসারের নানা অসুবিধার কারণে এইরূপে ধ্যান করা অনেকের সম্ভব হয় না। তাহাদের জন্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী বলিতেছেন—তাহারা

নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, দেহাত্মবুদ্ধি ঘুচিয়া যাইবে।—সম্পাদক]

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।

শ্লোকার্থ ঃ *জনক, অশ্বপতি প্রমুখ রাজর্ষি নিষ্কাম কর্ম করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং [হে অর্জুন,] লোকসংগ্রহের নিমিত্তও তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত।*

ব্যাখ্যা ঃ জনক প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ অসম্ভব মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইতে দিতেন না। সেই কারণে কর্মের মধ্যেও তাঁহাদের ব্রহ্ম-নিদিধ্যাসন সম্ভব হইত। তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়গণও ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং 'জ্ঞান' সম্পর্কে তাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু এখনকার মুমুক্ষুগণ শুধুই ভক্তির কথা একটু-আধটু জানেন, জ্ঞানের কথা কেহ কিছুই জানেন না বলিলেও বোধহয় বেশি বলা হয় না। কারণ, আত্মজ্ঞানের রহস্য বই পড়িয়া বুঝা সম্ভব নহে। আত্মজ্ঞান একটি 'যথার্থ বিজ্ঞান' (exact science)। যাঁহারা এই বিষয়ে দীর্ঘকাল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে না শুনিলে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণাই হয় না। সেই কারণেই "তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন..." ইত্যাদি শ্লোকে পরিপ্রশ্নের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বারংবার প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানীর নিকট হইতে সদুত্তর লাভ করিয়া নিজের সংশয় নিরসন করিতে হয়।

[**মন্তব্য ঃ** শ্রীশঙ্করাচার্য এবং তাঁহার পরবর্তী যুগে জ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণের মত হইল, নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে মুমুক্ষু সাধক জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ গীতার উপরি উক্ত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, কর্ম একটি 'অন্য নিরপেক্ষ' মুক্তিমার্গ। নিষ্কাম কর্ম বা নিঃস্বার্থপর কর্ম, কামনা-বাসনাবিহীন কর্মই মুক্তিপ্রদ। অর্থাৎ কেবলমাত্র 'কর্মযোগ' অবলম্বন করিলেই মুক্তিলাভ সম্ভব। বস্তুত, নিষ্কাম কর্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে কোনরূপ জ্ঞানব্যবধান না থাকায় তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—ইহাই অভিপ্রেত।

লোকসংগ্রহ = মানুষকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে এবং স্বধর্মে নিয়োজিত করা। এইজন্যই অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষগণ যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

অশ্বপতি = মহাভারতের বনপর্বে অশ্বপতির উল্লেখ আছে। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্মিক রাজা বাস করিতেন। নিঃসন্তান রাজা সন্তানলাভের জন্য সাবিত্রীর আরাধনা করেন। সাবিত্রীদেবীর বরে তিনি এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাহার নাম রাখেন 'সাবিত্রী'। দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হয়। অকালে সত্যবান প্রাণত্যাগ করিলে স্বীয় সতীত্বের মহিমায় সাবিত্রী সত্যবানকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনেন।—সম্পাদক]

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।

শ্লোকার্থ ঃ *কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে।*

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন্‌টি কর্তব্য এবং কোন্‌টি অকর্তব্য নির্ণয় করা মোটেই সম্ভব হয় না। তাই সবদেশেই দেখা যায়, চিরকাল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যাহা করেন, বলেন, সাধারণ মানুষ তাহাই অনুসরণ করে। সর্বদাই দেখা যায় পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আহার-বিহার, এমনকি খেলাধূলায় পর্যন্ত সর্বসাধারণ বড়লোকের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইওরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ফ্রান্সের নকল করে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকমাত্র সর্বতোভাবে ইংরেজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে (অতি সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়)! তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে সর্বসাধারণে কল্যাণপ্রদ করিয়া আদর্শ স্থাপনের উপদেশ দিতেছেন। [ক্রমশ] ।।চার।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১৭

পাশাপাশি ঃ (১) আমড়া, (২) ভাব, (৩) কাম, (৫) করাল, (৬) রণ, (৭) দেব, (৯) ওসাকা, (১১) বিন্দু, (১২) কাক, (১৩) নবাই, (১৫) চারা, (১৭) বার, (১৮) দুর্বল, (১৯) বীর, (২০) তরী, (২১) ঘোষণা।

ওপর-নিচ ঃ (১) আম, (২) ভালবাসা, (৩) কামিনীকাঞ্চন, (৪) প্রাণ, (৫) কর্ম, (৬) রব, (৭) দেশলাই, (৮) বন্দুক, (৯) ওকাকুরা, (১০) কামারপুকুর, (১১) বিকাশ, (১৪) বাহাদুরী, (১৫) চার, (১৬) খোল, (১৭) বাবা, (১৯) বীণা।

শব্দচেতনা ১৭-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

স্বামী কৈবল্যানন্দ, গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র বসাক, তপতী দেবী, দিলীপকুমার মৌলিক, রত্না ঘোষ, মহাদেব নন্দী, অলক পালচৌধুরী, মুক্তি সেন, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন বসাক।

বিবেকানন্দের সমাজভাবনা ও 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'

পূর্বা সেনগুপ্ত

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই নবগঠিত বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো এক ভবিষ্যদ্বাণী—"এই বিবেকানন্দ কি করে গেল তা বুঝতে আরেকটি বিবেকানন্দের প্রয়োজন। ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণে আমি দেড়হাজার বছরের খোরাক রেখে গেলাম।"[১] দেড়হাজার বছরের সভ্যতার উপাদান হেলাফেলার বস্তু নয়। আমাদের কাছে অকল্পনীয় এক ভাবসমষ্টি, এক ভাবগঙ্গার স্রোত।

কালের অমোঘ নিয়মে অতি অল্পবয়সে (মাত্র ৩৯ বছরে) এই সন্ন্যাসীর জীবনাবসান হয়। বেলুড় মঠ গঠন করে ভারতীয় সমাজে একটি মৌলিক সঙ্ঘের সৃষ্টি করে গেলেন তিনি। তাঁর ভাবগঙ্গা বহনের দায়িত্ব রেখে গেলেন তাঁর সন্ন্যাসী-ভ্রাতা ও শিষ্যদের কাছে। একদা তিনি বলেছিলেন ঃ "I am a voice without form."—আমি একটি বাণীশরীর। এই বাণীশরীরকে প্রকাশ করার মাধ্যমরূপে তিনি কেবল ভক্তদের রেখে যাননি, রেখে গিয়েছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয় 'উদ্বোধন' পত্রিকাকেকেও।

এই পত্রিকা একটি পত্রিকামাত্র নয়, ভাবপ্রচারের এক শক্তিশালী মাধ্যম। সন্ন্যাসী সঙ্ঘের পত্রিকার কথা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। বৌদ্ধসঙ্ঘের ইতিহাস উন্মোচন করলে আমরা দেখব, বুদ্ধের দেহরক্ষার বহু বছর পর সারনাথে প্রথম বৌদ্ধসম্মেলন হলো। তখনি প্রথম বৌদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি হলো, লেখা হলো 'ত্রিপিটক'। কিন্তু সময় ভাবের মধ্যে ভিন্নতার সৃষ্টি করে। তাই বৌদ্ধধর্মকে 'হীনযান' ও 'মহাযান'—এই দুইভাগে বিভক্ত হতে হয়েছে। খ্রিস্টীয় সাহিত্যের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ। খ্রিস্টের তেরোজন শিষ্যের ভিন্ন ভিন্ন খ্রিস্টীয় বাণীর সঙ্কলন আমরা পাই। একটি ধর্মান্দোলন দাঁড়িয়ে থাকে তার ভাবগত ক্ষেত্রের ওপর। এই ভাবগত দিকটির একটি নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের ধর্মেতিহাসে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহান ধর্ম-প্রচারকদের ক্ষেত্রে পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস আমরা পাই না, যদিও তাঁদের লিখিত মহান গ্রন্থের দেখা পাই।

যুগপটভূমির ভিন্নতায় যুগাবতারের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও ভিন্নতা আসে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করলেন, সেই ভাবান্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তার আধুনিকতা। চার্টার অ্যাক্টের পর খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতে আগমন ও উইলিয়াম কেরির পত্রিকা প্রকাশ[২] ভারতবর্ষে আধুনিক চিন্তার ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করে। পত্রিকার মাধ্যমে জনমনের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি ভারতবর্ষ সহজেই গ্রহণ করে নেয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই আধুনিকতাকে একটি প্রয়োজনীয়তা বলে মনে করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'ব্রহ্মবাদিন' এবং বাঙলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।[৩] একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রকাশিত পত্রিকার ভূমিকা অন্য পত্রিকা থেকে কিছুটা ভিন্ন হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'উদ্বোধন' পত্রিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, কেমন করে এই পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারাকে জনগণের কাছে তুলে ধরবে তা নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা বিবেকানন্দ করেছিলেন। একটি সঙ্ঘের পত্রিকা কেবলমাত্র সেই সঙ্ঘকে প্রকাশ করে না, সেই আন্দোলনের প্রতি সমাজের মনোভাবকেও প্রকাশ করে। এই দিক দিয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী। একদিকে সে সঙ্ঘের সদস্যদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারাকে প্রচার করছে, অপরদিকে সমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে সঙ্ঘকে তুলে ধরেছে। দ্বিতীয়ত, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে 'উদ্বোধন' পত্রিকার গুরুত্ব ও চরিত্রকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে 'উদ্বোধন'-এরও একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। তৃতীয়ত, 'উদ্বোধন' শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ভাবকে প্রচার করুক, সঙ্ঘের নিজস্ব সংবাদ প্রচার করুক—এটা বিবেকানন্দ চাননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষকে প্রচার করুক, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে উঠুক। সেদিক দিয়ে তিনি 'উদ্বোধন'-এর জন্য একটি বৃহত্তর পটভূমিকা রচনা করেছিলেন।

কেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার এত গুরুত্ব? কারণ, এই পত্রিকার পথরেখা স্বয়ং বিবেকানন্দ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষে তার 'প্রস্তাবনা'[৪] রচনার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন পত্রিকার ভাবপ্রচারের ধরন, তার পরিধি ও বিস্তৃতি।

আমরা আগেই বলেছি যে, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছিলেন। তাই তাঁর আলোচনায় ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাস যেমন বিবৃত হয়েছে, ঠিক সেই সমান গুরুত্বে বিবৃত হয়েছে ভারত তথা বিশ্বের সামাজিক ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণ কেবল ভারতবর্ষের যুগসন্ধিক্ষণ ছিল না। সমগ্র বিশ্বের সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। এই পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল শিল্পবিপ্লব। যান্ত্রিক উন্নতি মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সামাজিক সম্পর্কে ভিন্নতা এনে দিয়েছিল। সমাজের ওপর যন্ত্রের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর

নবজাগরণের প্রায় প্রত্যেক পুরোধা পুরুষই লক্ষ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রক্তকরবী'র মাধ্যমে যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতাকে তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় বলেছেন ঃ "লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে; ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বহু-বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে, রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।"[৫] বিবেকানন্দ-লিখিত এই 'প্রস্তাবনা'য় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যান্ত্রিক উন্নতির ফলে এবং বিদেশী সংস্কৃতির প্রবেশের ফলে ভারতের সমাজ-কাঠামোর মূলে যে-পরিবর্তনগুলি সাধিত হচ্ছে সেগুলি কি কাম্য? কাম্য হলে কেন কাম্য?—এ হলো 'উদ্বোধন'-এর আলোচনার বিষয়।

সমাজের মধ্যে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যখন সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তখন সেই পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই দুটি দিককে নিরপেক্ষভাবে বিচার, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে হবে। সামাজিক ঘটনার এই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মধ্যেই কিন্তু বিজ্ঞানের মূল সুর লুকিয়ে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিবেকানন্দ সামাজিক পরিবর্তনের কোন ঔচিত্যকে নির্দেশ করেননি, স্থাপন করেননি কোন ধর্মগুরুর নীতিবোধকে। তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণে এ এক অনন্য দিক। তাঁর লিখিত এই 'প্রস্তাবনা' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায়, সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির কথা।[৬] যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতি ইওরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীতে এনেছিল সামাজিক পরিবর্তন। পুরনো যা ভেঙে যাচ্ছিল, দ্রুত তৈরি হচ্ছিল সামাজিক সম্পর্কের নতুন রূপ। সমাজচিন্তকরা দেখলেন, এই নতুন সামাজিক সম্পর্ককে নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। তাই জন্ম হলো একটি নতুন বিষয়—'সমাজবিজ্ঞান'। সমাজবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সামাজিক ঘটনাকে 'Involvement' দ্বারা বিশ্লেষণের যে-ধারা, তা কিন্তু বিবেকানন্দের সমাজ-বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যায়। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ যে ভারতীয় সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন, সেই সমাজে বিদেশী শাসন এক নতুন পরিবর্তন এনেছে—একদল ভারতের প্রাচীন সমাজকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন, আবার অন্যদল নতুন কিছু করার আনন্দে ভাঙনের তাণ্ডবে মশগুল। দুইপক্ষের কাছেই রয়েছে কিছু যুক্তি কিছু বক্তব্য[৭]; কিন্তু তার মধ্যে কোন্‌টি কাম্য, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়—এবিচার তখনি সঠিক হবে যখন তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হবে। 'উদ্বোধন'-এর আলোচনায় এই নিরপেক্ষতাকে, এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতিকে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এই নতুন ভারত কেমন হবে? 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় তিনি লিখেছেন, ভারতের শক্তি পুনঃপ্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু "প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে? পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট-বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে, বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপধারণ করিবে, অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন (বৈবাহিক) সম্বন্ধ মনুক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃপ্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় একবর্ণ-মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এসকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমনকি একই দেশে জাতি এবং বংশ-ভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরো দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।"[৮]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুরনো আচার এবং বর্তমানের নানা রীতিনীতি—এ-দুটির মধ্যে কোন্‌টাকে আমরা বেছে নেব? এ এক বিরাট সমস্যা নিঃসন্দেহে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতের এই সমস্যাটিকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ। কিন্তু তিনি কোনকিছুকে নিজের পছন্দ বলে চাপিয়ে দিতে চাননি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আধুনিকতা, সুস্থ পরিবর্তন তিনি পছন্দ করতেন। যুগ-পরিবর্তন ও যুগ-প্রয়োজনের এমন সুন্দর উদাহরণ বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন খুব সহজভাবেই আসতে পারে, সামাজিক ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলতে আমরা কি বুঝি? কোন সামাজিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কয়েকটি লক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।[৯] প্রথমত, কোন সামাজিক

ঘটনাকে সেই সমাজের কাঠামো অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোন সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাকে বিশ্লেষণ করতে হলে সেই প্রথার উৎপত্তির কারণ অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত প্রদান করতে হবে। তৃতীয়ত, কোন মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণ করা যাবে না। চতুর্থত, কোন সামাজিক ঘটনা শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না। প্রতিটি সামাজিক উপস্থিতির একটি যুক্তিসম্মত উৎপত্তিস্থল রয়েছে। সেই মূলে প্রবেশ না করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। পঞ্চমত, সমাজের কোন ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানী 'উচিত' বা 'অনুচিত' বলে নির্দেশ করতে পারে না। এটি সমাজ-দার্শনিকের কাজ। সমাজবিজ্ঞানী সমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক—দুটি ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দেন। দুটিকেই স্বাভাবিক বলে মনে করেন। বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত হয়ে সমাজক্ষেত্রে যখন নতুন কাঠামো (pattern) গড়ে ওঠে, সমাজবিজ্ঞানী সেই নিয়মটিকে বা কাঠামোটিকে চিহ্নিত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই। যেমন, তিনি সমাজের মৌলিকতার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক নিয়মনীতি যে এই মৌলিকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা বহুবার বহু রচনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি একদা বলেছিলেন, কোন আপেল গাছকে বিচার করতে হলে ওক গাছের উপমা আনা চলবে না। প্রসঙ্গত, তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি সভ্যতার মৌলিকতাকে স্বীকার করে সমাজবিশ্লেষণমূলক আলোচনা, যার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আবার তিনি কখনোই কোন প্রথার তাৎকালিক নেতিবাচক ভূমিকাকে বড় করে দেখেননি। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের থেকে এইজন্যই তিনি উর্ধ্বে ছিলেন। জাতিভেদপ্রথা, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রথার তাৎক্ষণিক কুফলকে স্বীকার করলেও আবেগের বশে তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাননি। তিনি সংস্কারকদের কাছে জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তির কারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন' রচনার প্রথমেই বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, শূন্য থেকে কোন বস্তুর জন্ম হতে পারে না।[১০] সামাজিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিত নির্দিষ্ট করার পরিবর্তে বিবেকানন্দ সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন। সমাজবিশ্লেষণে 'মূল্যবোধ', 'আদর্শ' প্রভৃতি কথাগুলির কোন অর্থ হয় না। একটি সমাজে যা অপরাধ, অন্য সামাজিক বন্ধনে তাই শুভ বলে মেনে নেওয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে বিবেকানন্দ দক্ষিণদেশে মামা-ভাগনির বিবাহ, হিমালয় অঞ্চলে এক কন্যার বহু পতি বরণ ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। আবার সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠা নতুন কাঠামোকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং আমরা দেখছি, বিবেকানন্দের বিশ্লেষণের মধ্যে এক মহান ভারসাম্যতা রয়েছে। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সমাজচেতনাকে মিশিয়ে দেখেননি, তবে সমাজচেতনা যে ধর্মীয় চেতনার (ধর্মীয় মূল্যবোধ নয়) ওপর নির্ভরশীল—একথাও আমরা তাঁর মতামত থেকে জানতে পারি। একটা কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, বিবেকানন্দকে কতখানি সমাজদার্শনিক (Social Philosopher) বলা যায়—এবিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তিনি ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে দর্শনকে টেনেছেন। মানুষ গঠনের ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবধারাকে এনেছেন। কিন্তু সমাজচিন্তায় তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সমাজ-দার্শনিকের থেকে বেশিমাত্রায় সমাজবিজ্ঞানী (Sociologist) করে তুলেছে।[১১]

শতবর্ষ-প্রাচীন 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বিবেকানন্দের স্বহস্তে লিখিত 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা' এই প্রসঙ্গে এক পৃথক মনোযোগের দাবি করে। এই লেখাটিতে তাঁর যে-সমাজচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে, এককথায় তা অভিনব। বিশ্বের কাছে একটি নতুন সমাজের পরিকল্পনা গড়ে তোলার সময় তিনি সুদক্ষ শিল্পীর মতো একবার ভারত এবং একবার বিশ্বের সমাজভাবনা ও সমাজকাঠামোর চিত্রকে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেছেন। তিনি সমাজ ও সমাজপদ্ধতিকে সামাজিক কাঠামো (social structure) ও সামাজিক ইতিহাসের (social history) নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে গেলে 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা' ভারতীয় সমাজতত্ত্বের একটি মূল্যবান দলিল।

'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা' পরবর্তী কালে 'বর্তমান সমস্যা' নামে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। প্রস্তাবনাটির প্রথমেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে অতি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন বিবেকানন্দ—যে-সমাজের মধ্যে ছিল অতিদৃঢ় একটি সমাজকাঠামো। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আমরা ভীষ্মের মুখ থেকেই এক দৃঢ় সমাজব্যবস্থার ছবি পাই। সেই দৃঢ় সমাজপদ্ধতির চিত্র বারংবার তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ব্রাহ্মণশাসিত সংস্কৃতি। ভারতবর্ষকে প্রধানত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন বিবেকানন্দ—ব্রাহ্মণশাসিত, ক্ষত্রিয়শাসিত, বৈশ্যশাসিত এবং শূদ্রশাসিত ভারতবর্ষ।[১২] তিনি প্রাচীন ভারতের সামাজিক চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবেঃ "আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে, শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশি। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক।"[১৩]

প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ সর্বদাই দুটি সভ্যতা ও সমাজকে পাশাপাশি আলোচনা করেছেন—একটি

ভারতীয় আর্যসভ্যতা, অন্যটি পাশ্চাত্য গ্রিক সভ্যতা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি মূল্যবান প্রবন্ধগুলিতে আমরা এই দুই মহান ও বিপরীত চরিত্রবিশিষ্ট সভ্যতার আলোচনা পাই। বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় বলেছেন ঃ "ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ।"[১৪] প্রাচীন ভারতের এই গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন আমরা নানা মূল্যবান সাহিত্য, সঙ্গীত ও গ্রন্থের মধ্যে লাভ করি। আর্যজাতি এশিয়া মাইনরের কোন স্থান থেকে এদেশে এসে বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, না আর্যজাতির আদি নিবাস এই ভারতবর্ষেই ছিল—এ নিয়ে বিবেকানন্দ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি এই 'প্রস্তাবনা'য় সংশয় প্রকাশ করলেও 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে আর্যগণ বহির্ভারত থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতীয় মূল অধিবাসী অনার্যদের পরাজিত করে ভারতে এক বিরাট সভ্যতার বিস্তার করেছিল—এই মতকে স্বীকার করেননি।

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রিক সভ্যতার কথাও উল্লেখ করেছেন—"ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে 'যবন' বলিত। ইঁহাদের নিজ নাম—গ্রিক।"[১৫] গ্রিকজাতির অভ্যুদয় মানবসমাজের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কারণ, গ্রিকদের দর্শন, সৃষ্টি সবই ছিল ইহজগৎকেন্দ্রিক। জাগতিক ক্ষেত্রকে সুন্দর করে তোলার নানাবিধ উপায় গ্রিকদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ফলবতী হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যেদেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রিসের ছায়া পড়িয়াছে।"[১৬]

গ্রিক ও ভারতীয় সভ্যতার দুই বিপরীতমুখী চরিত্রকে বিবেকানন্দ সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট করেছেন—"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।"[১৭]

'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় তিনি দৃঢ় ভাষায় আবার উচ্চারণ করেছেন তাঁর অমোঘ সাবধানবাণী—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আচরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[১৮] [ক্রমশ]

সূত্র

১ মহাপ্রয়াণের দুদিন আগে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "এই বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড়হাজার বছর ধরে চলবে—তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে করো না এটা আমার কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১)

২ বাঙলায় প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

৩ 'প্রবুদ্ধ ভারত' ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে, 'ব্রহ্মবাদিন' ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এবং 'উদ্বোধন' ১৮৯৮ (১৩০৫-এর ১ মাঘ) খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩৪

৫ ঐ, পৃঃ ৩৪

৬ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৭ দ্রঃ ইউরোপ পুনর্দর্শন—তপন রায়চৌধুরী

৮ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২

৯ Methods of Social Research—Kenneth D. Bailey, pp. 303, 324-329

১০ 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

১১ বিবেকানন্দ সমাজের ভাবগত মৌলিকতা ও ভাবগত পার্থক্যকে স্বীকার করেছেন।

১২ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২২১-২৪৯

১৩ ঐ, পৃঃ ২০৯

১৪ ঐ, পৃঃ ২৯

১৫ ঐ, পৃঃ ৩০

১৬ ঐ

১৭ ঐ, পৃঃ ৩১

১৮ ঐ, পৃঃ ৩৩

বন্দে শ্রীবিবেকানন্দম্

(উপজাতি ছন্দ)

জ্যোতির্ময় নন্দশর্মা

শ্রীরামকৃষ্ণস্য কৃপাসুশক্ত্যা
দত্তোপনামা হি নরেন্দ্রনাথঃ।
বভৌ জগদ্বন্দিত-কীর্ত্তিবৃন্দঃ
স বিশ্বনাথাত্মজবিশ্ববন্ধুঃ।।১।।

গুরোস্তপঃ-সার্থকসুদিব্যহস্ত-
স্পর্শেণ বুদ্ধো বুধবর্গসূর্য্যঃ।
স ভারতীয়ো যুগধর্মবক্তা
তথাদিরাধ্যাত্মিক-রাষ্ট্রদূতঃ।।২।।

সন্ন্যাসদীপ্তঃ শিবসেবয়া যো
জীবেষু সপ্রেমমনাঃ প্রসিদ্ধঃ।
যো ভারতস্যানুপমঃ সুনেতা
বীরেশ্বরো জাগরণাগ্রদূতঃ।।৩।।

ধর্মস্য মালিন্যনিরাসতঃ সতঃ
প্রকাশ্য রূপঞ্চ সনাতনং শিবম্।
যো বিগ্রহঃ প্রাণযুতো বিচক্ষণঃ
স্থৈর্য্যং চকারাখিলভারতাত্মনঃ।।৪।।

ওজস্বি-তেজস্বি-মনস্বিমুখ্যো
দয়াম্বুধির্বাগ্মিবরো মহেচ্ছঃ।
আশ্চর্য্যকর্মাখিলরম্যধর্মা-
গ্রিমোঽনুরাগী চ মনুষ্যধর্মে।।৫।।

যো ভারতীয়েষু জনেষু বিস্মৃতিং
দৃষ্ট্বা গুণানাং নিজধর্মসংস্কৃতেঃ।
মোহঞ্চ দুঃখী কৃতবান্ প্রবোধনং
গ্রন্থৈস্তথাহ্বানসভাসুভাষণৈঃ।।৬।।

শ্রীসারদামাতৃবরাং বিচিন্তয়ন্
দুর্গাং সজীবাং ভুবনেশ্বরীসুতঃ।
তদাজ্ঞয়া যো বিদধৌ সুমঙ্গলং
কর্মব্রজং স্ত্রীষু সভক্তিসাদরঃ।।৭।।

শ্রীবুদ্ধসত্যং নয়মার্গ-শোভনং
বেদান্তবোধং খলু শঙ্করপ্রভোঃ।
চৈতন্যবাণীং হরিভক্তিনির্মলাং
গীতাদিশাস্ত্রাণি গুরোঃ কথামৃতম্।।৮।।

সুদূরদেশেষু যুবা প্রচার্য্য যঃ
সসর্জ চিত্তেষু সতাং সুবিস্ময়ম্।
জগদ্‌গুরোর্জন্মভুবঞ্চ ভারতং
পদে প্রতিষ্ঠাপততাঞ্চ গৌরবম্।।৯।।

তং নৌমি নারায়ণসংজ্ঞিতং মহা-
জনং মনুষ্যাতুলবান্ধবং বরম্।
ব্রহ্মজ্ঞমুক্তং তরুণং মহাদ্ভুতং
সৎকর্মযোগস্থ-মহোদ্যমান্বিতম্।।১০।।

ভারতীং যস্য চ শ্রুত্বা দেশপ্রেমপ্রদায়িনীম্।
আপুঃ শক্তিং সমুৎসাহং পুত্রা ভারতমুক্তয়ে।।১১।।

সৎশিক্ষা-সদ্‌গুণোল্লাসিপূর্ণমানবলব্ধয়ে।
নারীজাতেঃ সুশিক্ষায়ৈ পূজায়ৈ ব্যগ্রমানসম্।।১২।।

তং বন্দে মহিমোদ্দীপ্তং বিবেকানন্দভাস্করম্।
সৌভাগ্যাদুদিতং প্রাচ্যে ভাস্বরং ভারতাম্বরে।।১৩।।

পরিব্রাজক! আচার্য্যবর্য্য! শ্রীযুগনায়ক!
প্রাচ্যপাশ্চাত্যসংযোগং বন্দে ত্বাং নরদৈবতম্।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ কৃপাশক্তিতে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র বিশ্ববন্ধু নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার জগদ্বন্দিত কীর্তিসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হইলেন।১ শ্রীগুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যহস্তের সার্থক স্পর্শ পাইয়াই নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ মনীষী, যুগধর্মবক্তা এবং ভারতের সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত হইলেন।২ যিনি সন্ন্যাসধর্মে তেজস্বী এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিয়া 'প্রেমিক-হৃদয়'রূপে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বীরেশ্বর, বীরপুরুষ। তিনি ভারতবর্ষের অসাধারণ শ্রেষ্ঠ নেতা এবং নবজাগরণের অগ্রদূত।৩ অখিল ভারতাত্মার সজীব মূর্তি এই বিচক্ষণ মহাপুরুষ ভারতীয় সৎ ধর্মের মালিন্য দূর করে সনাতন মঙ্গলরূপটি প্রকাশ করিয়া সেই ধর্মকে সুস্থির করিলেন।৪ তিনি ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ ওজস্বী, তেজস্বী ও মনস্বী অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি। দয়ার সাগর, বাগ্মিপ্রবর ও মহানুভব এই মহাত্মার বিশেষ অনুরাগ ছিল মানবধর্মের প্রতি, যে-মানবধর্ম সকল সুন্দর ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৫ ভারতীয় জনগণ নিজ ধর্মসংস্কৃতির সদ্‌গুণসমূহ বিস্মৃত হইয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সকলকে আহ্বান করিয়া সভায় তেজঃপূর্ণ ভাষণ দিয়া ও গ্রন্থসমূহ লিখিয়া আত্মবিস্মৃত ভারতবাসিবৃন্দের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিলেন।৬ ভুবনেশ্বরী দেবীর পুত্র এই মহামানব স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মহাজননী শ্রীসারদামণিকে সজীবা দুর্গা ('জীবন্ত দুর্গা') জ্ঞানে তাঁহার আজ্ঞায় জগতের মঙ্গলজনক বহু সৎকর্ম সম্পাদন করেন।৭ তিনি যুবক বয়সেই সুদূর বিদেশে গিয়া ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের আর্য্যসত্য ও নীতিমার্গ, শঙ্করাচার্যের বেদান্তজ্ঞান, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি, গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বাণী এবং তাঁহার শ্রীগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত প্রচার করিয়া সুধীজনসমূহকে সুবিস্মিত করিলেন। ইহার দ্বারা আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা জগদ্‌গুরুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহার গৌরব দেশবিদেশে বিস্তৃত হইল।৮, ৯ শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে 'নারায়ণ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, যিনি তরুণ বয়সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে মুক্ত হইয়াছিলেন—সেই মানবজাতির পরম মিত্র, মহোদ্যমী, কর্মযোগী, অতি অদ্ভুত মহাজন বিবেকানন্দ স্বামীজীর আমি স্তব করিতেছি।১০ তাঁহার স্বদেশপ্রেমদায়িনী বাণী শ্রবণে ভারতমাতার পুত্রগণ দেশজননীর মুক্তিসংগ্রামের জন্য শক্তি ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন।১১ জগতের মনুষ্যগণ যাহাতে সৎশিক্ষা ও সদ্‌গুণাবলী লাভ করিয়া পরিপূর্ণ মানব হইতে পারে এবং নারীগণ যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করেন এবং সকলের পূজনীয় হন সেইজন্য স্বামীজীর হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল থাকিত।১২ ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য যে, প্রাচ্য দেশ ভারতবর্ষের আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সমুদিত হইয়া স্বামীজী নিজ মহিমায় উদ্দীপ্ত হইলেন। আমি স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি।১৩ হে পরিব্রাজক আচার্যশ্রেষ্ঠ! হে যুগনায়ক! হে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয়ভূমি! আপনি নরদেবতা—আপনার শ্রীচরণে প্রণতি জানাই।১৪

শতাব্দীর সাক্ষী 'উদ্বোধন'

ফণীন্দ্রমোহন রায়

একটি বর্ণময় জীবন—
স্বামীজী প্রবর্তিত, পুত্রস্নেহে গড়া, স্মৃতি দিয়ে ভরা
কালের কপোলতলে উজ্জ্বল নক্ষত্র এক,
মাস বছর শতাব্দী দিয়ে যাবে না ধরা।

ঠাকুর সারদা স্বামীজী রাখাল কালী বাবুরাম
যোগেন শরৎ শশী... আরো কত অন্তরঙ্গ মহাজীবন
সেখানে পার্ষদরা নীরবে করে বিচরণ।
ত্যাগী গৃহী শিষ্যের আনাগোনা,
মহাগ্রন্থ 'কথামৃত'-এ না বলা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা
ঠাকুরের করুণার বিবরণ সারদার মাতৃস্নেহের—
জীবন্ত কাহিনী, স্বামীজীর উজ্জ্বল দেশপ্রেম
এসব অঙ্গরাগ হয়ে শোভা বৃদ্ধি করছে
'উদ্বোধন'-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

সারি সারি সাজানো সাহিত্য কাব্য ধর্ম দর্শন
ইতিহাস ভ্রমণকাহিনী—
বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, ক্রীড়াজগতের জয়তিলক
প্রতিফলিত হয় বিজয়ীর জয়বার্তা 'উদ্বোধন'-এ
যাত্রাপথে আরো কত মহাভোজের সম্ভার নিয়ে
সে চলেছে ছুটে অমর্ত্য লোকে দুর্জয় গতিতে—
আগামী আরো কত সহস্রাব্দের সন্ধানে।
'উদ্বোধন', তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনের আপনজন
আর ভক্তজনের প্রাণের স্পন্দন।

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ

মুক্তি সেন

বিশ্বপথিক, করুণায় তব
প্লাবিত করেছ বিশ্ব
সাহস দিয়েছ, দিয়েছ প্রেরণা
অন্তরে যারা নিঃস্ব।

হিমালয় হতে কন্যাকুমারী
ভ্রমিয়া পদব্রজে
ভারতাত্মায় জাগায়েছ তুমি
ছিল যে নিদ্রামাঝে।

বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেছ
বিশ্বের দরবারে
অতুল অনন্ত সম্পদ আছে
ভারতের ভাণ্ডারে।

দুহাত বাড়ায়ে আছে তাঁর দেশ
সবারে বিলাতে ধন
কোন ধর্মে সে ভাবে না তো পর
সবাই আপনজন।

এস বিশ্ববাসী, প্রাণভরে কর
সে-অমৃত পান
স্বমহিমা মাঝে বিরাজে ভারত
ধর্মে সে সুমহান।

ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি

অমিতাভ গুপ্ত

সমস্ত বীজ আগলে রাখবেন মা
মহাপ্রলয়ের
লগ্নে, যেমন করে ন্যাতাক্যাতার হাঁড়িতে সবকিছু
আগলে রাখেন ঘরের গিন্নি—বললেন রামকৃষ্ণদেব।

আজ আর নেই সেকালের গৃহকর্ত্রী
রেফ্রিজারেটরে এখন বড় জোর দিন সাতেকের রসদ
যুগযুগান্তের জন্য কিছুই রইল না?

হাসলেন রামকৃষ্ণদেব
সারদারও চোখদুটি ধ্যাননিস্নিগ্ধ হলো

দেখলাম তাঁদের হাতের মুঠি
ভরে আছে
পূর্ণ গহ্বরে আর কৃষ্ণরাধিকায়।

শুভবোধে ঋদ্ধ হোক

মোহিত চক্রবর্তী

এ সুখের নীড় থেকে খসে যাক সব মোহজাল,
লাভ-লোভ-ঐশ্বর্যের দর্পিত বিশাল প্রাকার
ক্রোধ-অহঙ্কার দেখে ক্রূর হাসে নিত্য মহাকাল,
ভেদবুদ্ধি দীনতায় জর্জরিত মায়ার সংসার।

আনন্দে স্বর্গলোক, বিনয়ে হৃদয় শুচি হোক,
শুভবোধে ঋদ্ধ হোক অনুক্ষণ এই প্রাণ-মন,
সাধন-ভজনে হোক এ ভুবন মহামৃতলোক,
শিবজ্ঞান জীবলোকে আনুক অমল স্পন্দন।

তাথৈ তাথৈ নাচে প্রতিমায় সত্যসুন্দর,
রূপ-বর্ণ-গন্ধময় এ ধরায় নিত্য নবরূপে
অমৃতের চিন্ময়ী সত্তা খোঁজে কম্বু কণ্ঠস্বর,
প্রাণ হতে প্রাণ জাগে শুদ্ধতায় চৈতন্যের ধূপে।

মাভৈ মাভৈ রবে প্রার্থনার বাণী শুভক্ষণে
এনে দিক ভক্তিযোগ হৃদয়ে হৃদয়ে জনে জনে।

পদ্মাসনা ভারতী

কৃষ্ণা সেন

"যা কুন্দেন্দুতুষারহার ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।।
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মা পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।।"

—যিনি কুন্দকুসুম, চন্দ্রমা ও মুক্তামালাতুল্য শুভ্রা, শ্বেত-পদ্মাসীনা; যিনি শ্বেতাম্বরা, বীণাবরদণ্ডে শোভিত যাঁর হস্ত; যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক সদা বন্দিতা, সেই অশেষ জড়তাবিনাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

হংসারূঢ়া দেবী সরস্বতী সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। তাঁকে স্মরণ করেই সর্ববিদ্যার সূচনা। 'সরস্' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জ্যোতি'। এই জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, সর্বতমোরাশি অপনীত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ —এই তিন ভুবন মিলেই সমগ্র জগৎ। বাগ্দেবী সরস্বতী ভূঃ বা ভূলোকে ইলা, ভুবঃ বা অন্তরিক্ষে সরস্বতী এবং স্বঃ বা স্বর্গলোকে ভারতী। বেদে আবার সরস্বতীকে সম্বোধন করা হয়েছে কোথাও দেবীতমা অর্থাৎ দেবীশ্রেষ্ঠা, কোথাও অম্বিতমা অর্থাৎ মাতৃশ্রেষ্ঠা, কোথাও আবার নদীতমা অর্থাৎ নদীশ্রেষ্ঠা বলে। তিনি দিব্য-জ্যোতিস্বরূপা, তাই দেবীতমা। মায়ের মতো তিনি আমাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানপথে পরিচালনা করেন, তাই তিনি অম্বিতমা। আবার সন্তান-বাৎসল্যে ইনিই নিত্য নাদময়ী, বাঙ্ময়ী, সঙ্গীতময়ী, পরম রসময়ী, কাব্যকলনাদিনী; তাই এই রসতমা সরস্বতী নদীতমা।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 'সরস্বতী' নদীর অস্তিত্বের কথা আমরা পড়েছি। এরই উপকূলে শোনা যেত নিত্য সামগান—এখানেই হয়েছিল অধ্যাত্মদৃপ্ত আর্য ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। দেবী সরস্বতী নদীরূপা হয়ে তাঁর পবিত্র পরশে আর্য ঋষিদের জীবনকে স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলেছিলেন। বাগ্দেবী সরস্বতী বাক্য এবং মেধার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বেদে সরস্বতীর যে-স্তব, তাতে তাঁর দুটি রূপের প্রকাশ। ভাষ্যকারদের অনুসরণ করলে ধারণা করা যেতে পারে, জ্যোতিরূপে যিনি দেবী, দ্রবময়ীরূপে তিনিই নদী। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা দেবী নদীরূপে স্থূলবিগ্রহরূপা। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীই ছিল দেবী সরস্বতীর প্রকটিত রূপ। কিন্তু ক্রমে যখন আর্যরা সরস্বতীর উপকূল ছেড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সাকার প্রতীকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই প্রতীকের প্রয়োজনেই সরস্বতীর মৃন্ময়ী প্রতিমার সৃষ্টি, যাঁর পূজা আজ ঘরে ঘরে।

দেবী সরস্বতীর জ্যোতি আর নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা—এই দুয়ের সমন্বয়ে দেবী সর্বশুক্লা। সামগায়কেরা বীণাযন্ত্রের তান, লয় সংযোগে দেবতাদের বন্দনা করতেন, তাই দেবীর শ্রীকরপদ্মে মোহন বীণা—তিনি বীণাপাণি। ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদানুধ্যায়ী মুনি-ঋষিদের কণ্ঠনিঃসৃত ওঙ্কারনাদে এবং বিদ্যার্থীদের প্রশ্নোত্তরে মুখরিত ছিল সরস্বতী-বিধৌত তটভূমি। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ নিয়ে কত সাধনা, কত রচনা, কত চর্চা! তাই সরস্বতী 'পুস্তকশ্রী'—মস্যাধার, লেখনী ও পুস্তক তাঁর কাছে। তাঁর আশীর্বাদেই কবির কাব্য, গ্রন্থ-কারের গ্রন্থ প্রণয়ন, গায়কের নিখুঁত স্বরক্ষেপণ, সকল কলায় পারদর্শিতা।

দেবী যে শ্বেতপদ্মাসনা ও হংসবাহিনী, তার পিছনেও নদী সরস্বতীর আভাস। সরস্বতী নদীর দুকূলে প্রস্ফুটিত থাকত রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম আর জলে সঞ্চরমান শ্বেত রাজহংস। দেবী তাই পদ্মাসনা ভারতী এবং মরালবাহনা। 'দেবীভাগবত'-এ আছে, দেবী সরস্বতী বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী। বোধস্বরূপিণী এই দেবী সকল সংশয় ছেদন করেন এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন। তিনিই সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণস্বরূপা।

কোন কোন পুরাণমতে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তিনজনেই শ্রীহরির পত্নী। পারস্পরিক অভিশাপের ফলে তিনজনকেই নদীরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হতে হয়। কোন পুরাণে আবার সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নী বলে উল্লেখ করা

হয়েছে। 'দেবীভাগবত' দুটি মতের সমন্বয় করে বলেছেন, সরস্বতী অংশে হরিপ্রিয়া, অংশে ব্রহ্মাপত্নী, অংশে নদীরূপা। আবার 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে আমরা পাই অষ্টভুজা মহাসরস্বতীকে। তিনি গৌরাঙ্গী, অষ্টভুজে বাণ, কার্মুক, শঙ্খ, চক্র, হল, মুষল, শূল ও ঘণ্টা ধারণ করে আছেন। তিনি অসুররাজ শুম্ভকে বলছেন ঃ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?" 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা সরস্বতীকে সৃষ্টি করে বলেন ঃ "তুমি কবিদের মুখে অধিষ্ঠান কর।" সরস্বতী বলেন ঃ "একা আমি বহুর রসনায় কিভাবে বিরাজ করব?" ব্রহ্মা তাঁকে ভূমণ্ডল পর্যটন করে উপযুক্ত আধার বেছে নিতে বলেন। তিনি যাঁকে আধাররূপে নির্বাচন করবেন, তিনিই আদিকবিরূপে পরিচিত হবেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেই নব নব প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে। এরপর ত্রেতাযুগের আদিতে দেবী বাগেশ্বরী তমসা নদীর তীরে বাল্মিকী মুনিকে দেখতে পান। ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে ঋষিচিত্ত যখন দুঃখানলে দগ্ধ, ঠিক সেইসময় বাগ্দেবী তাঁর কণ্ঠ আশ্রয় করলেন। ঋষির বেদনা প্রকাশিত হলো এক কাব্যময়রূপে ঃ

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

শোক থেকে জন্ম, তাই এর নাম হলো 'শ্লোক'। এই শ্লোকমুখেই রচিত হয়েছে অমর মহাকাব্য 'রামায়ণ', যার জন্মলগ্নে রয়েছে ঋষির বেদনা ও দেবীর প্রেরণা।

'গরুড়পুরাণ'-এ সরস্বতীর অষ্টশক্তি—শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। তন্ত্রে এই শক্তি হলো যোগ্যা, সত্যা, বিমলা, জ্ঞানা, বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও প্রজ্ঞা। তন্ত্রমতেও সরস্বতী বাগীশ্বরী। এঁকে বলা হয় 'মাতৃকা সরস্বতী', তন্ত্রোক্তা তারা দেবীকে বলা হয় 'নীল সরস্বতী'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দেবী সরস্বতী কেন 'কুন্দেন্দুতুষার-হারধবলা'? শ্বেতবর্ণের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দেবী সরস্বতী শুদ্ধজ্ঞানময়ী, জ্যোতিরূপা। তাই তাঁর অধিষ্ঠান শুভ্র কমলাসনে, তাঁর বাহন শুভ্র হংস। কুন্দ, ইন্দু ও তুষারের সঙ্গে তুলনা করা হলেও কোটি ইন্দুর থেকেও দেবী দীপ্তিময়ী, তুষার ও কুন্দকুসুমের শুভ্রতা তাঁর সত্ত্বময় প্রকাশের কাছে নিঃসন্দেহে নিষ্প্রভ। দেবী 'বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা'। এই বীণাযন্ত্রে সঙ্গীতের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয় নাদ। সকল সঙ্গীত ও নাদের জননী বাগ্দেবীর শ্রীকরকমলে তাই এই প্রতীকচিহ্ন বীণা। দেবীর এই বীণার আলাপের সঙ্গে সাধকের জীবনের সুর যখন মিলে যাবে, তখনি উদ্ভাসিত হবে জ্ঞানালোক। আবার সেই সুরে সুর না মিললে, চিত্ত ভরে না উঠলে জীবন হয়ে উঠবে ছন্দহীন, এলোমেলো।

সরস্বতী 'শ্বেতপদ্মাসনা', 'সকলবিভবদাত্রী' এবং 'নিঃশেষজাড্যাপহা'। আত্মিক জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র 'আমি'টা বীণাবাদিনীর শতদলের মতো পূর্ণতায় বিকশিত হয়। সরস্বতীর কৃপাস্পর্শে সকল তমোর ঘটে অবসান, নব নব রূপে বোধশক্তির প্রকাশ হয়। জীবনে আসে এক পরম পাওয়ার শুভক্ষণ। এখানেই সকল বিভবসিদ্ধি। আত্মিক বিকাশের সহায়িকা বলেই দেবী সরস্বতী বিকশিত পদ্মে আসীনা; ঐহিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের দেবী বলেই সরস্বতী 'সকলবিভবদাত্রী', অবিদ্যার শেষ কণাটুকুও অপসারিত করেন বলে তিনি 'নিঃশেষ-জাড্যাপহা'। আর এই কারণেই জাড্যময় শীত ঋতুর অবসানে বসন্তপঞ্চমীতে হয় সরস্বতীর আবাহন। শীতের কুহেলি দূরে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে তখন শোনা যাচ্ছে আনন্দ আর নবজীবনের স্পন্দন। এই আনন্দের সাড়া পাখির কলকাকলিতে, সমীরণে, নব কিশলয়ে, প্রকৃতির শ্যামলিমায়। তাই জ্ঞানদায়িনী জননী আবির্ভূতা হন এই বিশেষ তিথিতে।

সরস্বতীর বাহন কেন শ্বেত হংস? জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সর্বত্র হংসের গতি। তেমনি জ্ঞানস্বরূপা চিন্ময়ী দেবী সরস্বতীর প্রকাশ স্থলে, জলে, অনলে, অনিলে সর্বত্র। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই ঊর্ধ্ব সপ্তলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল—এই নিম্ন সপ্তলোক সবকিছুকে তিনি আবৃত করে আছেন। হংসের ত্রিগতির মধ্যে এই সর্বলোকব্যাপিত্বের আভাস। আবার নীলাকাশে উড্ডীয়মান হংসের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সে একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হংসের মতো সাধকও ধ্যানের আসনে নিশ্চল, কিন্তু মন তাঁর ছুটে চলেছে সাধনার উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিতে। জ্ঞানীর মতো হংসও পারে অসার বস্তু ছেড়ে সার বস্তুকে বেছে নিতে। জলে বিচরণ করা সত্ত্বেও জল তার গায়ে লাগে না। জ্ঞানী সাধকও দেবীকৃপায় সংসারে থেকেও সংসারে জড়িয়ে পড়েন না, তিনি কর্ম করেও অকর্তা, দেহে থেকেও দেহবোধরহিত।

ধ্যান, প্রণামমন্ত্র ও স্তবমালা থেকে দেবী সরস্বতীর যে-পরিচয় আমরা পাই তা সংক্ষেপে এই। দেবী সরস্বতী যাবতীয় যজ্ঞের আধার। বাগ্দেবীরূপে তিনি প্রিয় ও সত্য বাক্যের প্রেরয়িত্রী। পরমাত্মরূপিণী দেবী সরস্বতীর তত্ত্ব অনন্ত, অসীম। স্বরূপের ভাবে তিনি নিরাকারা, নির্গুণা, নিষ্ক্রিয়া, আবার তটস্থলক্ষণে তিনি সাকারা, সগুণা, সক্রিয়া। দেবীর করুণা ছাড়া কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হয়ে ওঠে না। পতিতপাবনী পাপনাশিনী দেবী মানবহৃদয়কে জ্ঞানালোকে শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ করেন। তাই—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।"

—ভদ্রকালীকে নিত্য নমস্কার, দেবী সরস্বতীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার এবং বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্তাদি বিদ্যাস্থানকেও নমস্কার। ❑

মহারাজের স্মৃতি

বশীশ্বর সেন*

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

['বেদান্ত অ্যাণ্ড দ্য ওয়েস্ট'-এর ১৪২তম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

পঞ্চাশ বছরেরও অধিক পূর্বে (১৯০৬ সাল) আমি মহারাজকে প্রথম দেখি হাওড়া স্টেশনে। তিনি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজ থেকে ফিরছিলেন। আমরা ছাত্ররা ঠিক করলাম, গাড়ি থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিজেরাই তা টেনে নিয়ে যাব গন্তব্যস্থলে। আমি এখনো অনুভব করি আমার মাথায় তাঁর আশীর্বাদপূত হাতের স্পর্শ—যখন আমি তাঁর পদধূলি নিয়েছিলাম। 215916

তারপর মহারাজকে দেখি ১৯১০ সালে। তিনি এসেছিলেন আমার গুরু স্বামী সদানন্দকে দেখতে বোসপাড়া লেনে। সিস্টার নিবেদিতা ঐ বাড়ি ভাড়া করেন, যাতে বিভূতি ঘোষ, আমার ভাই টাবু ও আমি স্বামী সদানন্দের শেষ অসুখের সময় সেবা করতে পারি। মহারাজ বললেন ঃ "আমি ভুবনেশ্বরে মঠ তৈরি করার জন্য একখণ্ড জমি কিনেছি।" স্বামী সদানন্দ হাতজোড় করে উত্তর দিলেন ঃ "মহারাজ, আমি ঐ মঠের দারোয়ান হতে চাই।" মহারাজ সস্নেহে বললেন ঃ "বাছা আমার, আগে সেরে ওঠ।" এই পাঁচটি শব্দ এমন মধুর, স্নিগ্ধ ও প্রেমপূর্ণ ছিল যে, তা শোনামাত্র আমাদের হৃদয় প্রায় গলে গেল।

লোকে আমাদের তিনজনকে 'সদানন্দের কুকুর' বলত এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুরা আমাদের তিনজনকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। ১৯১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী সদানন্দের দেহত্যাগের পর মহারাজকে বেলুড় থেকে কলকাতায় আসতে প্রায়ই দেখতাম। তিনি বলরাম মন্দিরে, কখনো মায়ের বাড়িতে থাকতেন—যা ৮নং বোসপাড়া লেনে আমার বাড়ির কাছে। আমি তখন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করি, তাই ইচ্ছামত মহারাজের কাছে যেতে পারতাম না। ঐজন্য মহারাজ আমার নাম দিয়েছিলেন—'Season flower'।

অতি সামান্য সেবাও যদি কেউ প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে করত, মহারাজ কখনো তার স্বীকৃতি দিতে ভুলতেন না। একবার আমাকে তাঁর জন্য এক ছিলিম তামাক সাজতে বলা হলো। তাঁর তিন সেবক আমাকে তাড়াতাড়ি করার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন, কিন্তু যতক্ষণ না তামাক সাজা ঠিক ঠিক হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তা দিতে রাজি হলাম না। তারপর তামাক সাজা শেষ হলে মহারাজ গড়গড়ায় টান দিয়ে আমার পিঠে স্নেহভরে এক চাপড় মেরে বললেন ঃ "তুই যদি আমাকে এরকম এক ছিলিম তামাক দিস, তাহলে আমি তোকে সন্ন্যাস দেব।"

অন্য একসময় আমি আমার জন্মস্থান বিষ্ণুপুর থেকে মহারাজের জন্য একটা বড় মাছ নিয়ে যাই। ট্রেন বিলম্ব হওয়ায় আমি বলরাম মন্দিরে যখন মাছ নিয়ে পৌঁছালাম, তখন একজন সেবক বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বললেন ঃ "তোমার মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ আরেকজন ভক্তও মাছ নিয়ে এসেছিলেন, তার অনেকটা আমরা বিলিয়ে দিয়েছি।" ভগ্নহৃদয়ে আমি মহারাজের কাছে গেলাম। তিনি প্রথমেই বললেন ঃ "বশী, তুই বিষ্ণুপুর থেকে আমার জন্য কি এনেছিস?" ভয়ে ভয়ে বললাম ঃ "মহারাজ, আমি একটা মাছ এনেছি। কিন্তু আপনার সেবকরা বললেন যে, আপনার আজ মাছের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আপনি বেশ কিছু মাছ বিলিয়ে দিয়েছেন।" মহারাজ তখনি বললেন ঃ "বিষ্ণুপুরের মাছ খুব ভাল।" সেবকদের ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ "বশীর মাছ ভালভাবে পরিষ্কার করে রান্না কর, আর কেউ যেন এ থেকে কিছু সরিয়ে না নেয়।" আমি খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম।

ডাঃ কাঞ্জিলাল মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবেন। তিনি আমাকে একটা ছাতা ও একজোড়া চটি কিনতে বললেন, কারণ তিনি তা মহারাজকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দেবেন। আমি

---

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ভারতের অন্যতম অগ্রণী কৃষিবিজ্ঞানী বশীশ্বর সেন (১৮৮৭-১৯৭১) জগদীশচন্দ্র বসুর পরিচালনায় বারোবছর গবেষণা করেন। কিছুদিন তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা করেছিলেন। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের কৃষি গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষণাকেন্দ্র 'বিবেকানন্দ রিসার্চ ল্যাবরেটরি'। উন্নত প্রজাতির ভুট্টা, ধান ও গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ল্যাবরেটরি বিশেষ সাফল্য লাভ করে। 'পদ্মভূষণ' উপাধি ও 'ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশন অ্যাওয়ার্ড'প্রাপ্ত শ্রীসেন ভারত সরকারের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা, ইংল্যাণ্ডের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি ও আমেরিকার বোটানিক্যাল সোসাইটির সভ্যও ছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই শ্রীশ্রীমা ও একাধিক শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কলেজে পড়ার সময় প্রায়ই তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি আসতেন। ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিস্টিন ও মিস ম্যাকলাউডের স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি।—**সম্পাদক**

কলকাতার বাজার থেকে সবচেয়ে সেরা ছাতা কিনলাম এবং ন্যাশনাল ট্যানারির মালিক স্যার নীলরতন সরকার রাজি হলেন কারখানার উৎকৃষ্ট চামড়া দিয়ে চটি তৈরি করে দিতে। দীক্ষান্তে মহারাজ বেলুড় মঠের পূর্বদিকের দোতলার বারান্দায় এলেন। আমরা সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ছাতার দাম শুনে তিনি বিস্ময়ে বললেন ঃ "২৫ টাকা! এ-টাকা দিয়ে তো একখানা গয়না কিনতে পারা যায়!" কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় দক্ষিণা চটিজুতো পেয়ে মহারাজ খুব খুশি হলেন। তিনি সবসময় তা ব্যবহার করতেন। তিনি বারবার বললেন ঃ "বশী, তোর কেনা চটি বেশ আরামদায়ক।"

একদিন মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাড়ি কামাতে পারব কিনা। আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি পারব।" আমার মনে হয়েছিল, যদি আমি হঠাৎ ক্ষুর দিয়ে একটু কেটে ফেলি তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। বোস ইনস্টিটিউটে যাওয়ার পথে আমি রোজ মহারাজকে কামাতে যেতাম। মেঘলা দিনে তিনি দাড়ি কামাতে চাইতেন না। একদিন সকালে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি সোজা কাজে চলে গেলাম এই ভেবে যে, আজ মহারাজ আমার সেবা নেবেন না। আমি রাতে গিয়ে দেখলাম, মহারাজ তাঁর মুখে হাত ঘষছেন এবং মুখ দিয়ে 'উঃ!' শব্দ করলেন। আমি উচিত শিক্ষা পেলাম। বুঝলাম মহারাজের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। বলরামবাবুর বাড়ির একটা ছোট মেয়ে মহারাজের সচিব স্বামী শঙ্করানন্দকে জিজ্ঞাসা করে ঃ "মহারাজের নাপিত এত সুন্দর পোশাকে আসে। ও অত দামী পোশাক কোথায় পায়?" স্বামী শঙ্করানন্দ তাকে বলেন ঃ "ও হলো বড় মহারাজের নাপিত। তাই ওর অত দামী পোশাক।" আমি আরেকটা নতুন নাম পেলাম—'বড় মহারাজের নাপিত'।

আমি মহারাজকে ম্যাসাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি খুব জোরের সঙ্গে ম্যাসাজ পছন্দ করতেন। যারা নরম হাতে ম্যাসাজ করত, তিনি বলতেন ঃ "ওরা আমাকে এমন ম্যাসাজ করে যেন পোষা বেড়ালের গায়ে হাত বোলাচ্ছে।" তিনি আমার হাতের বুড়ো আঙুলটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিয়ে জানাতে চাইতেন তাঁর কতটা শক্তি আছে। আমি নিজের হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। পরে একদিন হঠাৎ মনে হলো, আমার ঐরকম চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা। আমি শেষে জোর করে হাত টেনে নেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম, এতে মহারাজ আমার প্রতি একটু মধুরভাবে হেসেছিলেন। পরে আমি যখনি মহারাজের হাত ম্যাসাজ করতাম, তিনি আমাকেও একটা জোরে চাপ দিতেন।

একদিন আমি ম্যাসাজ করছি, তখন তিনি সাধনার কথা বললেন ঃ "তুই কি মনে করিস যে, ভগবানলাভের জন্য কোন নির্দিষ্ট মূল্য আছে যে, এত তপস্যা, এত জপ, এত দান করলে তাঁকে পাওয়া যাবে? জোর করে তাঁর দর্শন আদায় করা যায় না।" আমি তখন নিয়মিত সাধনা করতাম না। তারপর মহারাজ বললেন ঃ "তুই যদি নিয়মিত ধ্যানজপ অভ্যাস না করিস, অনুভূতি এলে ধরে রাখতে পারবি না।"

একদিন মহারাজ জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন—যাতে বাইরের উত্তেজনা উদ্ভিদের প্রাণে সাড়া দেয়। তিনি যখন বোস ইনস্টিটিউটে এলেন, আমরা উদ্ভিদের ওপর পরীক্ষা করে দেখালাম এবং তিনি খুব আগ্রহভরে সব দেখলেন। সেদিন সারা সন্ধ্যা তাঁর মন গবেষণাগারে যা দেখেছিলেন তাতেই নিবিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "কখনো কখনো ঠাকুর ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন না। তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাসহীন জায়গায় পা ফেলতে ফেলতে যেতেন, যাতে ঘাসের ব্যথা না লাগে। তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারতাম না যে, ঘাসেরও সংবেদনা আছে। কিন্তু আজ যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম যে, ঠাকুরের দর্শন ও অনুভূতি বাস্তবিক সত্য।" একটু পরে তিনি বললেন ঃ "তোর এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়িস না। তুই এর দ্বারা সবকিছু পাবি।"

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে দুঃসংবাদ এল—মহারাজের কলেরা হয়েছে। খবরের সত্যতা জানার জন্য বলরাম মন্দিরে ছুটে গেলাম। তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম। তিনি যদিও অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, কিন্তু বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে ওখানে?" পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আমি কি হাওয়া করব?" তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ।" তাঁর অনুমতি পেয়ে আমি অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেলাম।

শরীরত্যাগের দুদিন আগে মহারাজ দিব্যভাবে ছিলেন এবং উপস্থিত সকলের প্রতি প্রচুর আশীর্বাদবর্ষণ করলেন। সেই প্রথম তাঁর মুখ থেকে শুনলাম তিনি কে এবং তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল। সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য মহারাজের জীবনীকারেরা বর্ণনা করেছেন, তাই আমি আর বললাম না। সেসময় যে পরমানন্দ আমরা অনুভব করেছিলাম, এতকালের ব্যবধানেও তা ম্লান হয়ে যায়নি। তিনি আমাদের হৃদয় ভরপুর করে দিয়ে গেছেন।

শরীরত্যাগের একঘণ্টা আগে মহারাজ কথা বলা বন্ধ করলেন। মনে হলো তিনি নিজেকে কোন এক অজ্ঞাত রাজ্যে তুলে নিয়েছেন, যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি মৃদুভাবে তাঁর দেহে হাত বোলাচ্ছিলাম এবং ভাবছিলাম যে, তিনি কি এখনো মনে রেখেছেন তাঁর সেই ক্রীড়াচ্ছলে বুড়ো আঙুলের চাপ? সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম—সেই মৃদু কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ চাপ—আমার প্রতি মহারাজের শেষ দান। ❑

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থের শতবর্ষ

নিতাই নাগ

স্বামী বিবেকানন্দের একটি অসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশের একশো বছর অতিক্রান্ত হলো। গ্রন্থটির অসাধারণত্ব হলো, এটি বাঙলা গদ্যসাহিত্যের একটি মাইলস্টোন, একটি বিস্ময়কর কীর্তি এবং বিবেকানন্দের বাঙলা ভাষাশিল্পের ক্ষেত্রে মৌলিকতার অবদানসমৃদ্ধ। ১৩০৬ থেকে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশ পাওয়ার পর ১৩০৯ সালে এটি মুদ্রিত গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি হলো সুধীবর্গ কর্তৃক বহু-প্রশংসিত—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য—সর্বক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটা নতুনত্ব। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সমুজ্জ্বল। তিনি স্বীয় ভাব প্রকাশ করে একদা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "ভাষাকে করতে হবে যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" বাঙলা ভাষা সেসময়ে সংস্কৃতের গদাইলস্করী চাল অনুসরণ করে অস্বাভাবিক, কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। স্বামীজী বাঙলা ভাষার মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ, মৌলিক অভিব্যক্তি। এজন্য জীবনকালের শেষ তিনবছর মৌলিক গদ্যরচনার পথপ্রদর্শক হয়ে রচনা করেছিলেন মোট চারটি গ্রন্থ—'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রন্থ জাহাজে অথবা বিদেশে থাকাকালীন লিখেছেন; শেষোক্ত আলোচ্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি লিখেছেন স্বদেশে ফিরে বেলুড় মঠে বসে।

বাঙলা ভাষাশিল্পের অঙ্গনে চলিত গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, প্রথম গ্রন্থ হলো শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরির কথোপকথন। এরপর কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনা করলেও তা সাধুভাষার বেষ্টনী অতিক্রম করতে পারেনি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেননা এ-ভাষা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।... এবং হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর।"

স্বামীজী চলিত গদ্যভাষার দৈন্য দূর করার জন্য নিজে কলম ধরলেন। তবে চলিত গদ্যরচনার অনবদ্য প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ চারটি গ্রন্থের মধ্যে সার্থকতম গ্রন্থ হলো এই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। কারণ, আগের রচনাতে তাঁর ভাষা বঙ্কিমের প্রভাব অথবা সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ে দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেনি। এভাবে স্বামীজী বাঙলা গদ্যের যে একটা বিশেষ রীতির প্রবর্তক হলেন তা হলো মৌখিক গদ্যরীতি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর গদ্যে তৎসম শব্দ থাকলেও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশি। আর আছে বাঙলা বাগ্ধারার প্রয়োগ, কলকাতার কথ্যভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ গঠন। এছাড়া নতুন অন্বয় সৃষ্টি, ভাষার মধ্যে সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি এনে ভাষাকে তিনি শিল্পসুষমামণ্ডিত করেছেন। পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী চলিত ভাষায় নতুন জোয়ার আনার চেষ্টা করলেও সাধুভাষার কৃত্রিমতাকেই অন্য নামে অন্য রূপে বাঙলা ভাষাশিল্পের অঙ্গনে উপস্থিত করেছিলেন। দুঃখের বিষয় হলো, স্বামীজীর প্রদর্শিত চলিত গদ্যরীতি আর পরবর্তী কালে বিশেষভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়নি। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী বাঙলা ভাষার আদর্শ হিসাবে কলকাতার কথ্যভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙলা ভাষায় রকমফের দেখা গেলেও কলকাতার ভাষাতেই বেশি বাঙালি কথা বলে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর বিষয়বস্তু স্বামীজী আলাপ-চারিতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যায়, স্বামীজী যেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক এবং তাঁর গুরুভাইদের উদ্দেশ করে লিখেছেন। এতে দর্শন, সমাজ ও ইতিহাস—এই তিনটি দিক দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনদর্শন ও উভয়ের মৌলিক পার্থক্য, এরপর সামাজিক পটভূমিকায় উভয়ের দৈনন্দিন জীবনধারা এবং পরিশেষে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দুটি সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। স্বামীজীর মতে, প্রত্যেক জাতিরই একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে এবং জাতির জীবন, আচার-আচরণ সমস্ত কিছু ঐ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। প্রাচ্য তথা ভারতের জাতীয় উদ্দেশ্য হলো ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, পারমার্থিক স্বাধীনতা, মুক্তি তথা মোক্ষমার্গ। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জাতীয় উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা তথা ভোগমার্গ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৈনন্দিন জীবনধারার আলোচনা প্রসঙ্গে পোশাক ও ফ্যাশান, পরিচ্ছন্নতা, আহার ও পানীয়, বেশভূষা ও রীতিনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

খ্রিস্টধর্ম, ক্রুশেড, চার্চের বিরোধিতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ, নানা জাতির উন্মেষপর্বে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান উন্নত অবস্থায় অগ্রগতি, রেনেসাঁ বা নবজন্ম, সমাজের ক্রমবিকাশ, উভয় সভ্যতার তুলনা, ইওরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে ফ্রান্সের কথা বিবৃত হয়েছে।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর বিভিন্ন কাগজপত্রের মধ্যে একটি অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গেলে তা 'পরিশিষ্ট' নামে গ্রন্থে যুক্ত হয়। স্বামীজীর অকস্মাৎ দেহত্যাগে গ্রন্থের অঙ্গহানি না ঘটলেও মনে হয় স্বামীজী শরীরে থাকলে হয়তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে আরো কিছু লিখতেন।

নাম অনুল্লেখ করে স্বামী সারদানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের মধ্যে যে-সত্য আছে এবং উভয়ে উভয়ের সদ্‌গুণ গ্রহণ করলে কিভাবে উভয়ের উন্নতি হবে তা গ্রন্থটির মূল বক্তব্য বলে ঘোষিত হলেও এর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হাস্যরসের মাধুর্য আমাদের কম চমৎকৃত করে না। দু-একটি নমুনা তুলে ধরলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে—

"প্রথমে একটা তামাশা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর।... আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রুনাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হলো; ওরা—ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।... আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগতজলমতি-তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্' গাচ্ছি;... গীতার উপদেশ শুনলে কে? না ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না কৃষ্ণের বংশধরেরা!!"

পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে স্বামীজীর সরস মন্তব্য—"সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত তো ছেলেমানুষ।" আবার রীতিনীতি প্রসঙ্গে হাস্যরস—"ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢকঢক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম—এদেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, তো সে বেয়াদপির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড়ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশীই হন না; কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড়ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?"

পত্রসাহিত্যের রচনারীতির মধ্য দিয়ে মৃদু হাস্যরসের মাধ্যমে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এক উচ্চাঙ্গ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর গবেষণাধর্মী 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে একথার যথার্থতা সমর্থন করেছেন—"ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগভঙ্গি, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যান সত্যের মিশ্রণে বাঙলা গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শ সৃষ্টির নিদর্শনরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।"

সাহিত্যসাধক ও সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থটি পড়েননি শুনে বিস্ময়প্রকাশপূর্বক গ্রন্থটির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ একদা যা বলেছিলেন, তা গ্রন্থটি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে—"আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের বইখানি পড়বেন। চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।" ❑

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়
২। 'উদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা—কুমুদবন্ধু সেন, উদ্বোধন : শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন, উদ্বোধন কার্যালয়
৩। বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, করুণা প্রকাশনী
৪। বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী প্রকাশনী

অনুষ্ঠান-সূচী : ফাল্গুন ১৪০৯
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য : **স্বামী অদ্ভুতানন্দ**
মাঘী পূর্ণিমা
৩ ফাল্গুন, রবিবার
(১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)
শ্রীরামকৃষ্ণদেব
ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া
২০ ফাল্গুন, বুধবার
(৫ মার্চ ২০০৩)
শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব
২৪ ফাল্গুন, রবিবার
(৯ মার্চ ২০০৩)

পূজাতিথি-কৃত্য : **শিবরাত্রি**
মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী
১৬ ফাল্গুন, শনিবার
(১ মার্চ ২০০৩)

একাদশী : ১৪, ২৯ ফাল্গুন
বৃহস্পতিবার, শুক্রবার
(২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৪ মার্চ ২০০৩)

স্বামীজী স্বয়ং মহাদেব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথকে 'স্বামী বিবেকানন্দ' করেছিল, তাঁর জীবনের পথ ঘুরিয়ে দিয়েছিল—এমন সিদ্ধান্তে হয়তো আসা যায়। ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস। নরেন্দ্রনাথ তখন আঠারো বছর বয়সের এক দিব্যসুন্দর যুবক। এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন। ছোটখাট একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। কিন্তু একজন গায়কের তো প্রয়োজন। পরমহংসদেব স্বয়ং সুগায়ক। অমন গান সাধারণ মানুষ গাইতে পারবে না। তিনি কথা বলেন, সেই কথা মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য গান করেন। তখন তাঁর সমাধি হয়। গান ছাড়া ধর্মকথা হয় কি করে!

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ডস্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। পয়সা ছিল, শান্তি ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন তিরিশ। বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত আর মনোমোহন মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গিয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই অভিভূত। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তিনি হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়।

পাড়ার ছেলে নরেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। নামকরা অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। অনেক গুণ তার। তার মধ্যে একটি গুণ হলো—গায়ক। অসাধারণ গলা! ওস্তাদের কাছে তালিম নেয়। পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা আছে। নরেন্দ্রনাথ এলেন পরমহংসদেবকে গান শোনাতে। প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছিলেন কলেজে। বলেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'এক্সকার্শন' কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির মনকে অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যেত। হেস্টি বলেছিলেন : "মনের পবিত্রতা, বিষয়-বিশেষের প্রতি একাগ্রতার ফলে এই অনুভূতি আসে।" তিনি ছাত্রদের বোঝাচ্ছেন 'এক্সট্যাসি' কাকে বলে, যার বাঙলা হলো 'সমাধি'। তিনি বললেন—এই অবস্থা অতি দুর্লভ, বিশেষত আধুনিক কালে। আমি একজন মাত্র এমন ব্যক্তিকে দেখেছি—তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

দুজনে পরস্পরকে সেই সন্ধ্যায় দেখলেন। এই সেই 'তিনি', যাঁর কথা হেস্টি সাহেব ইংরেজি ক্লাসে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বললেন, দক্ষিণেশ্বরে একদিন এসো।

রামচন্দ্র দত্ত, সকলে তাঁকে 'রাম-দাদা' বলতেন। নরেন্দ্রনাথের পিতার এক আত্মীয়। আশ্রিত। তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে বললেন—তুমি বিয়ে করতে চাইছ না, বিয়ে করবে না বলছ। 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছ। তাই প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানতে হলে, ঈশ্বরলাভ করতে হলে তোমাকে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে যেতেই হবে। আর সময় নষ্ট করো না।

একদিন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে করে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। এটি এক পরম সাক্ষাৎকার। 'প্রভিডেন্সিয়াল'। বন্ধুরা সেদিন অনেকেই ছিলেন, তবে জীবনের মোড় ঘুরে যাবে যুবক নরেন্দ্রনাথের। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে ঝুলত একটি সুন্দর তানপুরা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "হ্যাঁরে, একটা গান হবে না!"

গান নরেন্দ্রনাথের রক্তে। গানের জগতে তিনি বিভোর হয়ে যান। তিনি কোনরকম দ্বিরুক্তি না করে তানপুরায় সুরে বেঁধে গাইলেন ব্রাহ্মসমাজাদৃত সেই বিখ্যাত গান—"মন চল নিজ নিকেতনে"। গান শুনতে শুনতে পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হলেন। সমাধি। এই 'এক্সট্যাসি'র কথাই হেস্টি সাহেব ইংরেজি ক্লাসে বলেছিলেন।

সেইসময় এই বঙ্গের সঙ্গীত পরিমণ্ডল কেমন ছিল? তখন একেবারে রমরমা অবস্থা। একদিকে পদাবলী কীর্তন, সহজিয়া গান, বাউল গান, রামায়ণ গান, ঝুমুর, তরজা, হাফ-আখড়াই, কথকতা, শ্যামাসঙ্গীত, বাঙলা টপ্পা, টপখেয়াল। অপরদিকে অভিজাত হিন্দুস্থানি ক্ল্যাসিক্যাল গান। বাঙলা সঙ্গীতের জগৎ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। কাদের দানে? রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, দেওয়ান রঘুনাথ, নিধুবাবু, মধুকান, গোবিন্দ অধিকারী। সকলেই ভক্তসাধক। এঁদের পাশাপাশি চলেছে চারণ কবিদের যুগ। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের দুকূলপ্লাবী স্রোতে অবগাহন করছেন নির্মল আনন্দে। পিতা বিশ্বনাথ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। নিধুবাবুর টপ্পা খুব সুন্দর গাইতেন। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীরও অসাধারণ প্রতিভা ছিল। বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারিদের ভজনগান একবার মাত্র শুনে সুর, তাল, লয়ে অবিকল গাইতে পারতেন।

দত্তবংশের অমৃতলাল দত্ত, ডাকনাম 'হাবুবাবু'। সঙ্গীত জগতে তিনি চিরস্মরণীয়। বংশীবাদক-রূপে বিখ্যাত। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে অমৃতলালের কাছেই তালিম নিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আরো কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কুমিল্লার হরিহর রায় তাঁদের অন্যতম। অমৃতলালের ভাই সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু)-ও সমসময়ের এক বিখ্যাত

যন্ত্রশিল্পী ছিলেন। এঁদের সকলের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়েছে। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ, সেইরকম তাঁর স্মৃতি। যেকোন গান শোনামাত্রই তাঁর আয়ত্তে। পিতা বিশ্বনাথ পুত্রের এই প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন। শুরু হলো নরেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষা। তখন তিনি প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র।

বেণী গুপ্ত সেকালের কলকাতার এক নামকরা ওস্তাদ ছিলেন। তিনি তালিম পেয়েছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর কাছে। নরেন্দ্রনাথ প্রায় পাঁচবছর বেণীবাবুর কাছে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। বেণীবাবু যন্ত্রেও সমান পারদর্শী ছিলেন। শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যন্ত্রসঙ্গীতেও পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের আরেক সঙ্গীতগুরু হলেন কাশী ঘোষাল। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে গানের সঙ্গে পাখোয়াজ আর তবলা সঙ্গত করতেন। নরেন্দ্রনাথ এই গুণীর কাছে পাখোয়াজ আর তবলা শিক্ষা করেছিলেন।

বেণী ওস্তাদের বাড়ি ছিল উত্তর কলকাতায় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ির কাছে। ঐ পাড়াতেই ছিল বিখ্যাত অম্বু গুহের বাড়ি ও কুস্তির আখড়া। নরেন্দ্রনাথ ব্যায়াম ও কুস্তি করতেন। তিনি বেণীবাবুর খবর পেয়েছিলেন এই আখড়ার সংযোগেই। কুমুদবন্ধু সেন লিখছেনঃ "বেণী ওস্তাদের বাড়িতে একটি হাফ-আখড়াইয়ের দল ছিল। স্বামীজী তখন অম্বু গুহের কাছে রীতিমতো কুস্তি-আদি ব্যায়ামশিক্ষা করছেন। রাখাল মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। অম্বু গুহের পাড়ায় কেন, প্রায় বাড়ির কাছেই ছিল বেণী ওস্তাদের বাড়ি। কাজেই আখড়ার কাছাকাছি হওয়ার জন্য কুস্তি শেখার পর নরেন্দ্রনাথ গান শিখতে যেতেন বেণী ওস্তাদের কাছে।"

একটি তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে—নরেন্দ্রনাথ এই বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে প্রায় বারোবছর সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা শিক্ষা করেছিলেন। তারপর তিনি ওস্তাদের সঙ্গীতগুরু আহম্মদ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি শিখলেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে ছাত্রাবস্থাতেই আয়ত্ত করেছিলেন বহু ধ্রুপদাঙ্গের গান, ভজন, বাঙলা টপ্পা আর টপখেয়াল।

সেকালের যুক্তপ্রদেশের (ইউনাইটেড প্রভিন্স) বান্দা সিটির অন্তর্গত কলাবৎ মহল্লার গায়কবংশীয় ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর পিতা ছিলেন ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী। গোয়ালিয়র আর দাঁতিয়ার মহারাজদের বৃত্তিভোগী। বংশানুক্রমে তাঁরা এই বৃত্তি পেয়ে এসেছেন। আহম্মদ খাঁর ছোটভাই মহম্মদ খাঁ জীবনের শেষভাগে রেওয়ার দরবারে একহাজার টাকা বৃত্তি নিয়ে থাকতেন। জীবনের প্রথমদিকে ছিলেন গোয়ালিয়রে দৌলত খাঁ সিন্ধিয়ার দরবারে।

আহম্মদ খাঁ ছিলেন লখনৌয়ের শঙ্কর খাঁর বড় ছেলে। এঁরা দুই ভাই—আহম্মদ খাঁ আর মহম্মদ খাঁ। এঁদের বংশ এখন লুপ্তপ্রায়। এই বংশের শেষ ওস্তাদের নাম দেলাবর খাঁ। আহম্মদ খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয় খেয়ালী, সেকালে। কিছুদিন আন্দুল রাজবাড়িতে ছিলেন সভাগায়ক হিসাবে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি সবই জানতেন, শেখাতেন। বারাণসীতেও ছিলেন কিছুকাল। জীবনের শেষের দিকে কলকাতায়। শাহ সদারঙ্গের ঘরানার ওস্তাদ ছিলেন তিনি। স্বামীজীর গানে ছিল এই ঘরানারই সঙ্গীতধারা ও গায়কী।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করে জেনেছিলেন—"তাঁর ভাণ্ডারে বাঙলা গান মাত্র দু-চারটি"। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বেশ কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত আয়ত্ত করেছিলেন। তার তালিকাও আছে। সেই তালিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে একটি ভাড়াবাড়িতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছেন। ১৮৮৫ সাল, ২৭ অক্টোবর। সেদিন মঙ্গলবার। নরেন্দ্রনাথ একের পর এক অনেক গান গাইলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি ছিল—"এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

১৮৮৩ সাল, ৭ এপ্রিল। পরমহংসদেব তখন সুস্থ। বলরাম মন্দিরে এসেছেন। নরেন্দ্রনাথ অনেক গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি গেয়েছিলেন, সেটি হলো—"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে"। গুরু নানকের একটি হিন্দি ভজনের প্রথম কয়েকটি লাইন রবীন্দ্রনাথ বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন। মূল হিন্দিটি বড় সুন্দর। জয়জয়ন্তী রাগে, ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। "গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপকবনে/ তারকামণ্ডলা জনক মোতি/ ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে/ সগল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি/ ক্যায়সী আরতি হোয়ে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি/ অনাহদ শব্দ বাজন্ত ভেরী।"

মূলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি আমরা মিলিয়ে নিতে পারি। ১৮৮৫, ১৪ জুলাই। বলরাম মন্দির। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবকে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি শোনাচ্ছেন—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" আলাহিয়া ঝাঁপতাল। সেদিন এই গানটি দিয়ে শুরু করে নরেন্দ্রনাথ পরপর ছটি গান গেয়েছিলেন।

রবিবার, ১৮৮৪ সাল, সেপ্টেম্বর মাস। দক্ষিণেশ্বর। পরমহংসদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম দৈবী

সাক্ষাৎকারের তারিখটি ছিল—১৮৮১ সাল, নভেম্বর মাস। ঐ বছরেই এফ. এ. পরীক্ষা। নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। আর এই ১৮৮৪ সাল! নরেন্দ্রনাথের চুরমার হয়ে যাওয়া বছর। বয়স একুশ। বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। পিতা বিশ্বনাথ হঠাৎ পরলোকে চলে গেলেন। সংসার, আশ্রয়, নিরাপত্তা সব হারিয়ে গেল ভোজবাজির মতো।

এই মন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শোনাচ্ছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। তাঁর মুখমণ্ডলে সদাসর্বদা এক অলৌকিক জ্যোতি খেলা করত। তাঁর চুল ছিল অসাধারণ। সেই চুল অবিন্যস্ত। পদ্মপলাশ লোচনে দুঃখের স্থান অধিকার করেছে অনন্তের ছায়া। বেশভূষার দিকে সামান্যতম নজর নেই। কোনকালেই ছিল না। আর কয়েক বছর পরেই এই দিব্যমূর্তি আধ্যাত্মিকতায় উদ্ভাসিত করবেন বিশ্বমণ্ডল। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। পরিধানে গেরুয়া গাউন। কোমরে বাঁধা ট্যাসেল। পায়ে অ্যাঙ্কল বুট।

নরেন্দ্রনাথ গাইলেন ঃ "দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন,/ জগৎপতি হে কৃপা করি সেথা (হেথা, গীতবিতান অনুসারে) কি করিবে আগমন।" পরমহংসদেব বসেছিলেন খাটে। গান শুনতে শুনতে ভাবাবেশে মেঝেতে নেমে নরেন্দ্রনাথের পাশে এসে বসলেন।

বরানগর মঠে সারদাপ্রসন্ন, পরে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কি সাধন করা যায় ভাই?" নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দুটি গান গেয়ে শোনালেন। তার আগে বললেন ঃ "শুধু তাঁর নাম কর। ঠাকুরের গান মনে নেই?" প্রথমে গাইলেন ঃ "নামেরি ভরসা কেবল।" তারপরে রবীন্দ্রনাথের এই গানটির দুটি চরণ—

"আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন—
পদে পদে হয়, পিতা, চরণস্খলন।।"

ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়িতে রয়েছেন কণ্ঠক্ষতের চিকিৎসার জন্য। নরেন্দ্রনাথ একের পর এক গান শোনাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাইলেন ঃ "মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।"

কলেজের ক্লাসে অধ্যাপক আসতে দেরি করলে বন্ধুরা নরেন্দ্রনাথকে গান করার জন্য চেপে ধরতেন। জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ। ক্লাসে প্রায় দুশো ছাত্র। সেদিন কোন কারণে ইংরেজ অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকতে দেরি করেছেন। নরেন্দ্রনাথ গান ধরেছেন। অধ্যাপক বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছেন। গান শেষ হওয়ার পর ক্লাসে ঢুকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

নরেন্দ্রনাথ খুব আমুদে ছিলেন। যেখানেই থাকতেন রঙ্গরসিকতায়, গানে, গল্পে জমিয়ে তুলতেন। পরীক্ষাভীতি তাঁর ছিল না। পরীক্ষা সামনে। নরেন্দ্রনাথ তাঁর চার-বাই-আট টঙের ঘরে মন দিয়ে পড়ছেন। বেলা এগারোটা। এক বন্ধুর আগমন। বন্ধু বললে ঃ "ভাই! রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।" গানের প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়ে গেছে। সেতারে সুর বেঁধে বন্ধুকে বললেন ঃ "বাঁয়াটা নে।" বন্ধু বললে ঃ "আমি তো বাজাতে জানি না। স্কুলে টেবিল চাপড়ানো পর্যন্ত আমার বিদ্যে।" নরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাকে বোল ও ঠেকা শেখাতে বসলেন ঃ "পারবি, পারবি, এমন কিছু কঠিন নয়।"

শুরু হলো গান। তাল কাওয়ালি। তারপর একতালা, তারপর আড়াঠেকা, মধ্যমান, এমনকি সুর ফাঁকতাল। এক-একটি তালে গান ধরার আগে বন্ধুকে বোল-সহ ঠেকাটি শিখিয়ে দিচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব শিক্ষা-পদ্ধতিতে সেই বন্ধু একদিনে অতগুলি তাল শিখে ফেললেন। দুজনেই গানে মশগুল। যখন হিন্দি গাইছেন, তখন বন্ধুকে মানেটা বলে দিচ্ছেন। রাত দশটার সময় হুঁশ হলো দুজনের।

হরিদাস তাঁর সহপাঠী। গরিবের ছেলে। বি. এ. পরীক্ষা। মাইনে, ফি কিছুই জোগাড় হয়নি। নরেন্দ্রনাথ আশা দিলেন—ব্যবস্থা একটা হবেই। কলেজের বৃদ্ধ কেরানি রাজকুমারবাবুকে অনুরোধ করলেন নরেন্দ্রনাথ। তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন। সেদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ সিমুলিয়ার বাজারের পাশের একটা গলিতে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অদূরেই একটি গুলির ঠেক। রাজকুমার এই নেশায় আসক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই গোপন খবরটি জানতেন। অন্ধকারে গুটি গুটি এক ছায়ামূর্তি। নরেন্দ্রনাথ সেই মূর্তির সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলেন। বুক চিতিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছেন পথ আটকে।

মূর্তি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ঃ "কিরে দত্ত, এখানে কেন?" নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর গলায় বললেন ঃ "কেন আর কি, আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার কথা না রাখেন তাহলে আমিও কলেজে আপনার কথা রটাব, কলেজে টেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাফ করলেন, আর ও বেচারার কেন করবেন না।?"

নরেন্দ্রনাথের গম্ভীর মুখ, বলার ভঙ্গি দেখে রাজকুমার ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। আদর করে নরেন্দ্রনাথের গলা জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "বাবা! রাগ করিস কেন? তুই যা বলছিস তাই হবে। তুই যখন বলছিস, আমি কি তা না করে পারি?"

"তবে কেন সকালবেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন?"

"কি জানিস দত্ত, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে, তখন কাকে রেখে কাকে দেব বাবা? এসব কথা আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলেমানুষ, তাই এসব বুঝিস না। আমি কথা দিচ্ছি, তুই নিশ্চিন্ত হ। হরিদাসের মাইনের টাকাটা মাফ হবে, তবে ফি-র টাকা তো আর মাফ হয় না! সেটার একটা ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে।"

পরের দিন সকালে সিমুলিয়ার পথ অপূর্ব এক দৃশ্যের সাক্ষী হলো। হরিদাসের বাড়ি চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। সূর্য তখনো ওঠেনি। নরেন্দ্রনাথ বন্ধু হরিদাসের বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়ছেন, আর ভৈরব রাগে গাইছেন—

"অনুপম মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।"

গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। হরিদাস দরজা খোলা মাত্রই, নরেন্দ্রনাথ মহা উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বললেন: "ওরে খুব ফূর্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে। তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।"

বি. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন। নরেন্দ্রনাথ উঠেছেন খুব ভোরে। রাস্তায় নেমেছেন, মর্ণিং ওয়াক। হঠাৎ মনে হলো, দেখি দুই বন্ধু হরিদাস আর দাশরথি (সান্যাল, পরবর্তী কালে হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকিল) কি করছে? দুই বন্ধু তখনো শয্যায়। নরেন্দ্রনাথ উঁচু গলায় গান ধরেছেন ভৈরবীতে—"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।"

পরীক্ষার পড়া, রিভিসান ইত্যাদি সব মাথায় উঠল। গানের পর গান। চলল সকাল নটা পর্যন্ত। "নরেন তোমার পরীক্ষা!"

"সেইজন্যেই তো গান! গান গেয়ে মাথাটা সাফ করে নিচ্ছি।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনও তাঁর সঙ্গে পড়তেন। অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে লিখছেন: "বিবেকানন্দ দীপুদাদার class friend ছিলেন। তখন দুজনেই পড়তেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। আমাদের বাড়িতে এলে দীপুদাদা 'কে হে, নরেন?' বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালবাসা।" রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি তিনি প্রায়ই গাইতেন, সেটি হলো,—"(তাঁরে), আরতি করে চন্দ্র-তপন...।"

ঠাকুর বলতেন: "নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি খেলা করছে।" এর ব্যাখ্যা কি? স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে স্বামীজীর একটি নোটবুক ছিল। সেই খাতায় তিনি লিখেছিলেন: "সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব।" সঙ্গীতের স্রষ্টা স্বয়ং মহাদেব। স্বামীজী স্বয়ং মহাদেব। ❑

> এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—**সম্পাদক**

প্রসঙ্গ 'মহাভারতের চরিত্রচিত্রণ'

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যায় 'মহাভারত ঃ চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা'র সূচনাতেই প্রবন্ধকার শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন, তাঁর কিছু বক্তব্য 'ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের লালিত ধারণার কোমলাঙ্গে আঘাত' দিতে পারে। ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত পাঠের সুবাদে এই পত্রলেখকের মনে হয়েছে, কারো কোমলাঙ্গে আঘাত লাগুক বা না লাগুক, অন্তত মহাভারতের মহাকবি যদি এটি পড়েন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর মনে আঘাত লাগবে। যে-ভাবনা নিয়ে তিনি এই কাব্যের চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তার অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রবন্ধকারের কলমের আঁচড়ে। উদাহরণস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের কথাই ধরা যাক।

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক আহূত হয়ে যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়া অবশ্যই 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পথ খুলে দিয়েছিল', কিন্তু তিনি অক্ষক্রীড়ায় অংশ না নিলেও কি যুদ্ধকে ঠেকানো যেত? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৌরব-সভায় বিশ্বরূপ দেখিয়েও দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে পারেননি; ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারীর কা কথা! যে লোভী, হিংস্র দুর্যোধন সেই বাল্যকাল থেকেই নানা উপায়ে পাণ্ডবদের মেরে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনি শকুনি ও কর্ণের শক্তিকে হাতিয়ার করে পরে অবশ্যই পাণ্ডবনিধনে ব্রতী হতেন। রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব বলেছিলেন, এই যজ্ঞবিঘ্নের ফল ফলবেই এবং তাঁকে 'উপলক্ষ্য' করে তেরোবছর পর এক মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবে। যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন, কখনো জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কারো সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্ব-বিবাদে যাবেন না, নিজে শত কষ্ট স্বীকার করেও যে যা চাইবে, তাকে তাই দেবেন; কিন্তু যুদ্ধ কিছুতেই নয়। তাঁর এই মহানুভবতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা তখন কেউই দেয়নি।

সেকালে ক্ষত্রিয়রীতি ছিল—চ্যালেঞ্জে আহ্বান করলে তা গ্রহণ করতেই হতো। স্বামী বিবেকানন্দের মতে—"প্রাচীন ভারতে এরকম নিয়ম ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয় যুদ্ধে আহূত হলে সর্altবিধ ক্ষতি স্বীকার করেও মানরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হতো। এই কারণে দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হয়ে ক্রীড়া করলেই মানরক্ষা হতো এবং অসম্মত হলে তা অত্যন্ত অযশস্কর বলে পরিগণিত হতো। রাজা যুধিষ্ঠির সর্altবিধ ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ হলেও পূর্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হতে হয়েছিল।"(দ্রঃ 'Complete Works', Vol. IV, p. 84)

ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসাবে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতসভায় আমন্ত্রণ জানাতে এলে প্রথম যিনি এর বিরোধিতা করে ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠির। বিদুরকে তিনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন, এই দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর মত আছে কিনা। কিন্তু একজন 'ডিপ্লোম্যাট'-এর মতো বিদুর জানান, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে এসেছেন, তাই দ্যূতক্রীড়া নিন্দনীয় হলেও যুধিষ্ঠিরের যাওয়ার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে পারবেন না। আর কৃষ্ণ তো তখন শাল্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। তাই যুধিষ্ঠির নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা হিসাবে তখন কাউকেই পাননি। তিনি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ও জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ স্মরণ করেই দ্যূতসভায় যান। সেখানে উপস্থিত হয়েও তিনি এই অক্ষক্রীড়ার নিন্দা করেন এবং একথাও বলেন, দুর্যোধনের হয়ে শকুনির খেলা অনৈতিক। তখন কিন্তু কেউই যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেননি। শকুনি এবং ধৃতরাষ্ট্র এটাকে নিছক খেলা বলে যুধিষ্ঠিরকে প্রণোদিত করেন। (সভাপর্ব, ৫৯ অধ্যায়) এর মধ্যে যাঁরা তাঁর দ্যূতাসক্তিকে খুঁজে পান, হয় তাঁরা মহাভারত পড়েননি, নয়তো একজন নেশাগ্রস্ত জুয়াড়ির সঙ্গে 'রাজর্ষি'র তফাত বুঝতে পারেন না। যুধিষ্ঠির যদি জুয়াড়ি হতেন, তাহলে প্রথমবার ঐরকম চূড়ান্ত অপমানের পর দ্বিতীয়বার খেলতে যাওয়ার সাহস করতেন না। নেশার ঘোর অনেক আগেই ছুটে যেত। তাছাড়া দ্বিতীয়বার খেলতে যাওয়ার আগে তিনি যে রামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগ ধরতে যাওয়ার মতো কালের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলেন, তাতেও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। মহাভারতে আমরা বেশ কয়েকবার যুধিষ্ঠিরের এই দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। যেমন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক শিরশ্ছেদের পূর্বেই দ্রোণাচার্যের যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের দৃশ্যটি শ্রীকৃষ্ণ, দিব্যচক্ষু-প্রাপ্ত সঞ্জয় এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত আর যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

কোন নারীকে পণে জিতলে তার বস্ত্রহরণের অধিকার কি বিজয়ী পক্ষের থাকে? নিশ্চয়ই নয়। আর এ হেন বিকৃত-মস্তিষ্কদের হাতে একজন সরল ভদ্র মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শঙ্করীবাবু ঠিকই বলেছেন, যুধিষ্ঠির "আপন মাংসে বৈরী হরিণী", তবে তা লোভী, হিংস্র শ্বাপদগণের দৃষ্টিতে; শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুরের দৃষ্টিতে নয়।

লেখক বিস্মিত হয়েছেন যুধিষ্ঠিরের উক্তির মধ্যে দ্বিচারিতা লক্ষ্য করে। তিনি যে বনবাসের কৃচ্ছ্রতা, শাস্ত্রচর্চা, ব্রাহ্মণ-সান্নিধ্য বিশেষ পছন্দ করেন, তা একবার অকপটে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তিনি এর বিপরীত কথাও বলেন—তাঁদের মতো দারিদ্র্যদশায় পড়লে মানুষ ক্রীতদাস হয়, পাগল হয়, আত্মহত্যা করে। আমার কিন্তু মনে হয়, যুধিষ্ঠির অন্তরের দিক থেকে খুব পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন, ধর্মের নামে ভণ্ডামি তিনি করেননি। একদা ইন্দ্রপ্রস্থের অধীশ্বর—তামাম ভারতবর্ষের রাজারা মস্তক ভূলুণ্ঠিত করে যাঁকে প্রণাম করতেন, সেই চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠির নিঃস্ব ভিখারির মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনদিন অনশনে, কোনদিন অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছেন। এ অবস্থায় তিনি যদি বলতেন—আমি সুখী, তবে অবশ্যই তিনি ভণ্ড ধার্মিকের আখ্যা পেতেন। তাই তিনি যা বলেছেন তা খুব স্বাভাবিক কথা। আর জন্মের পর দীর্ঘ আঠারো বছর যিনি শতশৃঙ্গ পর্বতে আশ্রমিক পরিবেশে কৃচ্ছ্রতা, বেদচর্চা ও ব্রাহ্মণ-সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন, তা তাঁর ভাল লাগতেই পারে—কিন্তু তা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, পরাজিত ব্যক্তির মতো নয়। ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন মানসিক অবস্থায় উক্ত দুটি কথা স্থান-কাল-পাত্রের সাপেক্ষে বিচার না করলে প্রকৃত সত্য অধরাই থেকে যাবে।

শঙ্করীবাবু লিখেছেন, বীরত্বের ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের ঘাটতি ছিল। এপ্রসঙ্গে জানাই, দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর যতবার যুদ্ধ হয়েছে, ততবার তিনিই জিতেছেন। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে তিনি একবার এমন ভয়ানক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন যে, আচার্য স্তম্ভিত হয়ে যান। অবশ্য হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির বেশ কয়েকবার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তবে এক্ষেত্রে 'রেকর্ড'টি তাঁর নয়—অঙ্গরাজ কর্ণের। আবার ভীষ্মের ব্যূহরচনার প্রত্যুত্তরে তিনিই নিত্যনতুন ব্যূহরচনা করেছেন। রথযুদ্ধে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। অর্জুন জানিয়েছেন, তাঁর এই জ্যেষ্ঠভ্রাতা এক দক্ষ অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির তেজঃস্বরূপ, দৃষ্টি দ্বারা তিনি সকলকে বশীভূত করতে পারেন। (বিরাটপর্ব, ২৭।৯) ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ভয় পেতেন তাঁর এই দৃষ্টির জন্যই। ভীষ্ম জানিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করবেন। (উদ্যোগপর্ব, ১৬৯।৩) হয়েওছিল তাই, সেকথা জানিয়েছেন মহর্ষি ব্যাস। ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন : "দৃষ্টিমাত্রেই আপনি অপরকে ভস্ম করতে পারেন। ভীষ্ম আপনার ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতেই দগ্ধ হয়েছেন।" (ভীষ্মপর্ব, ১২০।৬৮) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দু-পক্ষের যেসকল মহাবীরের মৃত্যু হয়েছিল, একজন বাদে বাকি সকলেই অনৈতিক উপায়ে—ভীষ্ম, অভিমন্যু, জয়দ্রথ, দ্রোণ, ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হন একজনই—কৌরব-সেনাপতি মদ্ররাজ শল্য। হন্তারক? যুধিষ্ঠির। তাই মনে হয়, ভূতলশায়ী ভগ্ন-উরু দুর্যোধনকে যখন বারংবার পদাঘাত ও ভর্ৎসনা করছিলেন ক্রোধান্ধ ভীম, তখন তাঁকে নিরস্ত করার যোগ্যতা ছিল শুধু যুধিষ্ঠিরেরই। শঙ্করীবাবু মন্তব্য করেছেন : "যুদ্ধজয় নিশ্চিত হওয়ার পর নিরাপদ অবস্থান থেকে [যুধিষ্ঠির] ভীমকে নিন্দা করেছেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য।" আদপে তা নয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ধর্মকথা শোনানোর মতো ব্যক্তিত্বহীন তিনি কোনদিনই ছিলেন না। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক দুর্যোধন পদমর্যাদার জোরেই বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অন্যায়ভাবে পরাজিত করে মনের আক্রোশে তাঁর মাথায় পদাঘাত করে যাওয়া কখনোই ক্ষত্রিয়জনোচিত হতে পারে না। এঘটনায় কৃষ্ণ-সহ সকলেরই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। তাই এগিয়ে এসে ভীমকে থামানোর দায়িত্বটা নিতে হয়েছিল যুধিষ্ঠিরকেই—যিনি সৌজন্য ও শিষ্টাচারটা ভাল বুঝতেন।

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু সহর্ষে মন্তব্য করেছেন, মানুষ পশুদের মাংস ভক্ষণ করেই থাকে। দুর্যোধন-বধ প্রসঙ্গে তিনি অবতারণা করেছেন স্বামীজীর ওজস্বী আহ্বানকে। শুনলে লজ্জা পাবেন, ভীম তাঁর এই কর্মের জন্য লজ্জিতই হয়েছিলেন এবং গান্ধারীর কাছে নানা অজুহাত খাড়া করে কম্পিতকলেবরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। অবশ্য যুধিষ্ঠিরও গান্ধারীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধের সমস্ত দায় আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে, সকল পাপাত্মার কৃত অপরাধ নিজের বলে গ্রহণ করে তিনি গান্ধারীকে বলেছিলেন : "আমিই এই সর্বনাশের হেতু। আমাকে আপনি অভিশাপ দিন।" (স্ত্রীপর্ব, ১৫।২৬) এটাই মনে হয় উত্তর প্রজন্মকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার, কারণ এতে আছে বিশ্বকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে নির্মল পবিত্র করার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

প্রবন্ধকার যুধিষ্ঠিরের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা যে অসম্পূর্ণ, সেটা বোঝা যায় তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনুপস্থিতি দেখে। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে বন্দী দুর্যোধনকে মুক্ত করে দিয়ে তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় রেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমুচ্চ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন, যুধিষ্ঠিরকে তিনি অভিহিত করেছেন একজন যথার্থ মহাপুরুষ-রূপে—যিনি সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরভক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন। ('কথামৃত', অখণ্ড সং, পৃঃ ৫৫১, ৬৭) দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি শঙ্করীবাবু মাত্র অর্ধপঙ্‌ক্তিতে শেষ করেছেন। সেটি হলো যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ, যেখানে প্রমাণিত হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের ধর্ম পুঁথির ধর্ম নয়—জীবনের প্রতি মুহূর্তে আচরিত যথার্থ মানবধর্ম। একই পরিস্থিতিতে শক্তিশেল বাণে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে দেখে রামের কি অবস্থা হয়েছিল তা এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ঘটোৎকচের মৃত্যুর ফলে কর্ণের একাঘ্নী বাণের হাত থেকে অর্জুন বেঁচে যাওয়ায় কৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তা পারেননি, কারণ অর্জুনের রক্ষা পাওয়ার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি মর্মান্তিক ছিল ঘটোৎকচের মৃত্যু। যখন সামান্য একটা কুকুরের স্বর্গলাভের জন্য তিনি নিজের মুক্তিকে উপেক্ষা করেন, তখন মনে পড়ে যায় স্বামী বিবেকানন্দের কথা—যিনি একটা কুকুরেরও মুক্তির জন্য হাজারবার জন্ম নেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই অসাধারণ হৃদয়, আকাশসম উদারতা ও মহান ধর্মভাবের জন্যই স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে তাঁর উপমাই দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন, ধর্মরূপ মহাবৃক্ষ যুধিষ্ঠিরের এক-একটা অঙ্গ হলো তাঁর চার ভাই, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং তিনি স্বয়ং। (উদ্যোগপর্ব, ২৯।৫৩) তাঁর স্বরূপ বোঝার জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট। কৌরব-সেনাপতি কর্ণ রণক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছেন যুধিষ্ঠিরের। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ভগ্নরথ, নিঃশেষিত অস্ত্র, আহত যুধিষ্ঠির ফিরে চললেন শিবিরের পথে। বিদ্রূপ করতে করতে কর্ণ তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন : "অনেক হয়েছে, আর যুদ্ধ করো না। ওটা তোমাকে মানায় না। তুমি ঘরে গিয়ে ঘুমোও।" এরপরেই ব্যাসদেব জানাচ্ছেন, এসবই ছিল কর্ণের অছিলা মাত্র। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অপমান করতে করতে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন নিজেকে শুদ্ধ করে নেওয়ার জন্য—"পবিত্রী-কর্তুমাত্মানং স্কন্ধে সংস্পৃশ্য পাণিনা।" (কর্ণপর্ব, ৪৯।৫২)

যাঁকে স্পর্শ করলে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়, তিনি তবে কে?

অধ্যাপক বসু সোচ্ছ্বাসে জানিয়েছেন, একালের কোন কবি 'অট্টহাস্য-সহ' পঞ্চস্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার-নীতির যে-তালিকা দিয়েছেন, তাতে দ্রৌপদীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পেয়েছেন যুধিষ্ঠির। হাস্য সংবরণ করে জানিয়ে রাখি, উক্ত কবি যুধিষ্ঠিরকে বুঝতে গিয়ে বোধহয় তাঁরই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শন করেছেন।

অরিন্দম দাস
কলকাতা-৭০০ ০০৩

❋ ❋ ❋

১৪০৯-এর শারদীয় 'উদ্বোধন'-এ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'মহাভারত ঃ চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা' প্রবন্ধটি পড়লাম। এমন অসামান্য একটা লেখা উপহার দেওয়ার জন্য লেখক এবং পত্রিকা-সম্পাদককে ধন্যবাদ। লেখকের বক্তব্য কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কেউ-বা ঘোর অপছন্দ করতে পারেন। কিন্তু এইরকম লেখাই আমাদের ভাবনার স্থবিরতাকে নাড়িয়ে দেয় বারবার। স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যে চলমানতার কথা বলতেন, ভাবনার চলমানতাও নিশ্চয়ই তার মধ্যে পড়ে। লেখকের বক্তব্য মানা, না-মানা তো সেই চলমানতারই অঙ্গ।

আমার এই চিঠি অবশ্য আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশের জন্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যে-বিতর্কের কথা শঙ্করীবাবু বলেছেন, কেবল সেই অংশটুকু নিয়েই দু-চারটে কথা বলার আছে।

৭১৯ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়ে শঙ্করীবাবু জানিয়েছেন ঃ ''রবীন্দ্রনাথের এই রচনার হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র'।'' সসঙ্কোচে বলতে হচ্ছে, এই তথ্যটি সঠিক নয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনাটির সঙ্গে এই বিতর্কের কোন যোগ নেই। 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৯১) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'হিন্দুধর্ম'ই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'এই রচনার লক্ষ্য'।

কিন্তু 'এই রচনা' মানে কোন্ রচনা? শঙ্করীবাবু কোন সূত্র দেননি। ফলে আগ্রহী পাঠক, যিনি বিতর্কটা আরেকটু বিস্তারে জেনে নিতে চাইবেন, তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন। অবশ্য সূত্রটা পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পালটা জবাবী প্রবন্ধ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' শীর্ষক লেখায় (যার নাম-ঠিকানা জানিয়েছেন শঙ্করীবাবু)। সেখান থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের সেই রচনাটির শিরোনাম—'একটি পুরাতন কথা'। রবীন্দ্র-রচনাবলী খুলে এই লেখাটা পড়তে গিয়ে অবশ্য পাঠকের বিভ্রান্তি বহুগুণ বেড়েই যাবে, কেননা সেখানে তিনি খুঁজে পাবেন না শঙ্করীবাবু (এবং বঙ্কিমচন্দ্র)-উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলি। আসলে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'একটি পুরাতন কথা' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন এর বিতর্কিত পঙ্ক্তিগুলি। ছোট এই তথ্যটি পাদটীকায় জানিয়ে দিলে পাঠকের সুবিধা হতো।

'একটি পুরাতন কথা'র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ...' প্রবন্ধ। এপ্রসঙ্গে শঙ্করীবাবুর ভাষ্য—''ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা নয়, কৃষ্ণের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।'' এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে এই জবাবী প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জন্যও লড়েছেন। নাহলে রবীন্দ্রনাথ কাকে কখন 'ইতর' বলেছেন কিংবা আদি ব্রাহ্মসমাজের আর কে কে কবে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'গালিগালাজ' করেছেন, তার ফিরিস্তি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আর এইখানেই বলে নেওয়া উচিত—যা শঙ্করীবাবু বলেননি, হয়তো অবকাশ ছিল না বলেই বলেননি—'আদি ব্রাহ্মসমাজ...' প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ফের একখানা নিবন্ধ লেখেন। 'ভারতী'র পৌষ ১২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত সেই প্রবন্ধের শিরোনাম 'কৈফিয়ৎ'। চমৎকার সেই প্রবন্ধের উল্লেখও 'উদ্বোধন'-পাঠকদের সামনে থাকা ভাল, নয়তো রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ অন্যায় করা হয়।

জয়দীপ ঘোষ

উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩ ১৪৪

❋ ❋ ❋

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'মহাভারত ঃ চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ ''মহামতি ব্যাসদেব যিনি নিজ জন্মের কলঙ্ককথা অবিচলিতভাবে বলে যেতে পারেন, তিনি কি কোন তথ্য উদ্ঘাটনে কুণ্ঠিত হতে পারেন? ব্যাসদেব কিছুই গোপন করেননি। নির্বিকার নিরাসক্ত তাঁর বস্তুজ্ঞান এবং সত্যবোধ।'' আমরা যদি ব্যাসদেবকে, তাঁর সত্যবোধকে সত্যসত্যই বিশ্বাস করে থাকি, তাহলে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রটিকে 'পাতকী' বলা যায় কি? আমার তো মহাভারতের তেমন কোন ঘটনা মনে পড়ছে না।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কাণ্ডটি আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর আগেকার। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত স্বামীজীর উক্তি স্মরণ করি। 'মহাভারত' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ ''সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল যে, বহুপতিত্ব সমাজের অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিত। ইহা সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্তী আভাস।'' তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ ''দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশে এক স্ত্রীলোকের বহুপতিত্ব প্রথা [এখনো] প্রচলিত আছে। হিমালয় ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারের ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে আমি একদিন তাহাদের কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু-সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ। এটি আমার উপভোগ্য, অন্যের নয়—একরূপ ভাব কি অন্যায় নহে?' আমি তো শুনিয়া অবাক।'' ('স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন')

স্বামীজীর কালেও ভারতবর্ষে যদি ঐ বহুপতির প্রথা চালু থাকে, তাহলে সেই কোন্ মহাভারতের যুগে এই প্রথা চালু থাকা আর বেশি কথা কি? যতদূর জানি, এদেশে পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা চালু হওয়ার অন্যতম কারণ পুরুষদের তুলনায় নারীদের আনুপাতিক হার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া। এর বিপরীত হওয়াও তো বিচিত্র নয়। সামাজিক প্রয়োজনেই কি মহাভারতের যুগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্রৌপদী ছাড়াও এমন উদাহরণ মহাভারতে আছে। এই দিকটি ভুলে মহাভারতের কালের এক স্মরণীয় চরিত্র নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়

মাণ্ডরা, বাঁকুড়া

২০০২-এর ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভারতীয় যৌবন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলে নারী অবলা, রান্নাঘরেই তাঁরা অধিক স্বচ্ছন্দ? অন্তত খেলাধূলার বিশ্বসমাজে সাম্প্রতিক কালে তারাই তো ভারতের মুখরক্ষা করেছে, গৌরব বাড়িয়েছে—এমন নজির ভুরিভুরি। এই তো সেদিন তুরস্কের আন্তালাতে বিশ্ব বক্সিংয়ের আসরে মেয়েদের ৪৮ কিলো বিভাগে ভারত-ললনা মেরিকম সোনা পেয়ে চমকে দিয়েছে সকলকে। অনেকটা ধূমকেতুর মতো উঠে এসে নিজের রঙ ছড়িয়ে ভারতের ক্রীড়া-ইতিহাসে এক আশ্চর্য রূপকথার জন্ম দিয়ে গেল মেরিকম। ইদানিংকালে কোন ভারতীয় পুরুষ যা করে দেখাতে পারেনি, তা কি অনায়াসলব্ধ দক্ষতায় সে করেছে, ভাবলেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের যুগপৎ অবতারণা হয়।

শুধু মেরিকমই বা কেন, কয়েক মাস আগে বুসান এশিয়াডে ভারতের মোট অর্জিত সোনার সিংহভাগই এসেছে মহিলা অ্যাথলিটদের কৃতিত্বে। অঞ্জু জর্জ, সুনীতা রানী, সোমা বিশ্বাস, সরস্বতী সাহা, নীলম জে. সিংহ, বীনামল-সহ ভারতের মহিলা রিলে দল ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে মহিমান্বিত করেছে বুসানের ট্র্যাকে। তাদের সঙ্গে অবশ্যই নাম করতে হয় বাহাদুর সিংহ, শক্তি সিংহ ও ৪×১০০ রিলের ভারতীয় পুরুষ অ্যাথলিটদের কথাও। গত এশিয়াডে ভারতের এগারোটি সোনার মধ্যে সাতটিই অর্জিত অ্যাথলেটিক্স থেকে। সুনীতা রানীর সোনাটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বহুদিন টালবাহানার পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কয়েক যুগের মধ্যে এশিয়াডের (বিদেশের মাঠে) সার্বিক মানদণ্ডে এটা সর্বোত্তম পারফরমেন্স। অ্যাথলিটরা ছাড়াও টেনিসের বিখ্যাত ডাবলস জুটি লিয়েণ্ডার পেজ-মহেশ ভূপতি, কবাডি দল প্রত্যাশামতোই সোনা জিতেছে। তবে পুরুষদের হকি টিমের চমকপ্রদ খেলা ফাইনালের পদস্খলনে সামান্য হলেও বিবর্ণ হয়েছে।

দাবায় ভারত ইদানিংকালে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। বিশ্বনাথন আনন্দের তুঙ্গস্পর্শী সাফল্যে উদ্দীপিত এদেশের যুবসমাজ। দাবা এখন ক্রিকেটের মতো না হলেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ভূভারতে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এর প্রসার ও ব্যাপ্তি। ফলশ্রুতি, কয়েক বছরের মধ্যেই একাধিক গ্র্যাণ্ডমাস্টারের অভ্যুদয়। দিব্যেন্দু বড়ুয়া, কে. শশীকিরণ, পি. হরিকৃষ্ণ, অভিজিৎ কুন্তে, প্রবীণ থিপসে, ডি. ভি. প্রসাদ, সূর্যশেখর গাঙ্গুলির পর লাইনে অপেক্ষারত আরো বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান দাবাড়ু। মেয়েদের মধ্যে আবার কোনেরু হাম্পি এক অনন্য কৃতিত্বের অধিকারিণী। সবচেয়ে কম বয়সে উইমেন গ্র্যাণ্ডমাস্টারের পাশাপাশি পুরুষদের বিভাগে গ্র্যাণ্ডমাস্টারও বটে অন্ধ্রপ্রদেশের এই মেয়েটি। সে ভেঙে দিয়েছে অসামান্য কুশলী হাঙ্গেরিয়ান দাবাড়ু জুডিথ পোলগারের বিশ্বরেকর্ড। জুনিয়ার বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে তরুণ সূর্যশেখরের ব্রোঞ্জজয়ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে দাবা অলিম্পিয়াডে প্রাথমিক পর্বে যেরকম খেলেছে ভারত, উত্তরপর্বে সেই দাপট বজায় রাখতে পারেনি আনন্দ, দিব্যেন্দু-বিহীন তরুণ তুর্কিরা। কোনেরু হাম্পি, সাই বিজয়লক্ষ্মীরা সারা বছর সার্কিটে যে-খেলাটা খেলে, তার ধারে কাছে ছিল না স্লোভেনিয়ার শৈলশহর ব্লেডে। তাই গত অলিম্পিয়াডের অর্জিত সুনাম এবার অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

ভারতের গৌরবগাথার অনেকটাই হকিকে ঘিরে প্রতিফলিত। টানা অর্ধশতাব্দীর একাধিপত্যের অবসান হয় ন্যাচারাল টার্ফের পরিবর্তে অ্যাস্ট্রো টার্ফ ও পলিগ্রাস এসে যাওয়ায়। গত শতকের আটের দশক থেকে ভারতের পিছু হটা শুরু হয় সারফেসের পরিবর্তন হওয়ায়। নতুন শতকের প্রারম্ভে আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছেন গগন অজিত, দীপক ঠক্কর, প্রভজ্যোৎ সিংহরা। ২০০১-এ অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে বিশ্ব যুব হকিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয় এই তিনজনের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের ওপর ভর করে। এঁরাই বুসান এশিয়াডে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ধনরাজ পিল্লাই, দিলীপ টিরকের সঙ্গে চমৎকার সঙ্গত করে হকির পুরনো গরিমা অনেকটাই ফিরিয়ে এনেছেন। পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে হারাতে যে-খেলাটা খেলেছিলেন তাঁরা, তা দেখে বয়স্ক হকিপ্রেমীরা নস্টালজিক হয়ে তুলনায় টেনে আনেন স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল তারকাদের। ধনরাজকে আর হয়তো সেভাবে পাবে না ভারতীয় হকি, এই তরুণরাই ভারতের ভবিষ্যৎ। স্বনির্ভর হয়ে পরের অলিম্পিকে ভারতকে কতদূর টানতে পারে এরা, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে হকিমহলে।

এশিয়াডে সেভাবে দাগ টানতে না পারলেও বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ কিন্তু সারাবছর খবরের শিরোনামে থেকেছে। অঞ্জলি বেদপাঠক ভাগবৎ, আলি কামার, সোনামচা চানু প্রমুখ এবং মহিলা হকি খেলোয়াড়রা এশিয়াডের মাসখানেক আগে ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ গেমস মাতিয়ে এসেছে। অঞ্জলি এবছর ধারাবাহিক ভাল পারফরমেন্স দেখিয়ে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। মহিলা শুটিংকে জাতে তুলে দিয়েছে সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত অঞ্জলি। যশপাল রানা, অভিনব বিন্দ্রাও সার্কিটে

উজ্জ্বল। যশপাল কমনওয়েলথে সোনা পেয়েছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অভিনব এধরনের বড় ইভেন্টে কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বক্সিংয়ে আলি কামার, মহিলাদের শক্তি উত্তোলনে কুঞ্জুরানী দেবী, সোনামচা চানু আর মহিলাদের হকি টিমের কীর্তিতে উদ্ভাসিত ভারতীয় ক্রীড়াজগৎ। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের চতুর্থ স্থান প্রাপ্তি যেকোন মাপের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একথা সত্যি, কমনওয়েলথে উজ্জ্বল এমন অনেকেই বুসান এশিয়াডে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ব্যাপারে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বুসানের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁদের দৃপ্ত পদচারণা আগামী দিনের আলোকবর্তিকা।

এবছরটা অবশ্য ভাল যায়নি লিয়েণ্ডার পেজ-মহেশ ভূপতির বিখ্যাত জুটির। এশিয়াডে সাফল্য অবশ্যই এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সার্কিটে তাদের একসঙ্গে খেলতে দেখা যায় না। আর ফল ভুগতে হচ্ছে ভারতীয় ডেভিস কাপ টিমকে। তাদের মতোই বছরটা মুখ ঘুরিয়ে থেকেছে ব্যাডমিন্টনের গোপীচাঁদের কাছ থেকে। টেবিল টেনিসেও বড় মুখ করে বলার মতো কোন ঘটনা নেই।

অলিম্পিক, এশিয়াডের মতো ইভেন্টে স্থান না পেলেও ক্রিকেট এদেশে এখন সব বয়সের মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রধান মাধ্যম। ইংল্যাণ্ডে তিনদেশীয় একদিনের সিরিজের ফাইনালে ইংল্যাণ্ডকে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় হারিয়ে কাপ জেতাটা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বব্যঞ্জক ঘটনা। আর শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত আই. সি. সি. চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যুগ্মজয়ী হলেও টুর্ণামেন্টের শুরু থেকে যেরকম দাপট দেখিয়েছে এবং ফাইনালে পরিত্যক্ত ম্যাচ-দুটিতে যেভাবে আয়োজক দেশকে কোণঠাসা করে রেখেছিল, তাতে শেষপর্যন্ত ট্রফি-হাতে ভারত অধিনায়ক সৌরভকেই দেখবে বলে দেশ-বিদেশের বহু ক্রীড়ামোদি মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন। তবে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে টেস্টে ২-০ ফলাফলে হারালেও একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৩-৪ ব্যবধানে পরাজয় আমাদের আশাহত করেছে। আবার নিউজিল্যাণ্ডে টেস্টে ২-০ পরাজয়ের পিছনে সেখানকার অত্যধিক ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও পিচের খামখেয়ালী আচরণকে দায়ী করলেও ভারতের বিখ্যাত ব্যাটিং লাইন-আপের এভাবে ভেঙে পড়াটা মেনে নেওয়া যায় না।

ক্রিকেটের পাশাপাশি আরেক জনপ্রিয় খেলা ফুটবলে ভারত হতাশার অন্ধকার বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে চলেছে। ভিয়েতনামে এল জি কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা এক যুগসন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে ভারতীয় ফুটবলকে। প্রায় তিন দশক পরে কোন আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মর্যাদাই আলাদা। বাইচুঙ ভুটিয়ার ইংল্যাণ্ডে খেলাটা ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে আশীর্বাদ, কারণ বাইচুঙ নিজে যেমন পরিশীলিত হয়েছে, তেমনি সতীর্থ, সহযোগী খেলোয়াড়দের মনেও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। উদ্দীপ্ত ভারতীয় ফুটবলাররা তাদের সম্পর্কে আশাবাদী করে তুলেছে হাল ছেড়ে দেওয়া ফুটবল সমাজকে। এল জি কাপ জেতার পর এশিয়াড ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার ঘটনা ভারতীয় ফুটবলে এক সোনালি রেখার দিকচক্রবাল। বাইচুঙ, আলভিটো-ডি কুনহার মতো প্রতিভাবান ফুটবলাররাই পারে সেই দিকচক্রবালকে ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখাতে। ❑

সাইয়ে বনবাসী-র তীরন্দাজী

বিশেষ প্রতিনিধি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া আজ অলিম্পিকে মহাশক্তিধর হয়ে উঠেছে তাদের জাতিগত ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে লালন করে। দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বে আদিবাসীরাই দেশের ক্রীড়া-সংস্কৃতির অন্যতম ভরকেন্দ্র। আমাদের দেশেও যেসব অজস্র প্রতিভা লুকিয়ে আছে দুর্গম জঙ্গলে, পাহাড়ে, প্রত্যন্তে—তাদের সঠিক পরিচর্যা হলে ভারতও জগৎসভায় মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত হতে পারে। আর ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সাংগঠনিক দক্ষতা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে বনবাসী বা আদিবাসীদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার কাজে এগিয়ে এসেছেন রাষ্ট্রীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। কল্যাণ আশ্রমের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার পরিচালনায় তৃতীয় সারাভারত বনবাসী তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কলকাতার সাই কমপ্লেক্সে।

১৭টি রাজ্যের প্রায় ১৫০ জনের মতো তীরন্দাজ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। 'অনূর্ধ ১৪' ও 'অনূর্ধ ১৮'—এই দুই বিভাগে যথাক্রমে ২০/৩০ মিটার ও ৩০/৪০ মিটার দূরত্বের তীর ছোঁড়া প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে রাজ্য হিসাবে মণিপুর শীর্ষস্থান দখল করেছে। বাংলার ছেলেমেয়েরাও কলকাতার সাই কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পূর্ববর্তী আসরের তুলনায় ভাল পারফরমেন্স করেছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে প্রায় ৫০ জন প্রতিভাবান বনবাসী তীরন্দাজকে সর্বভারতীয় সাই সংস্থা নির্বাচিত করেছে। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতাকে সফল করতে ভারতীয় তীরন্দাজি ফেডারেশন ও সাই কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগামী বছর গুজরাটের গান্ধীনগরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে ভারতীয় তীরন্দাজি ফেডারেশন ও সর্বভারতীয় সাই সংস্থা একযোগে জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। এছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা সারা বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য পৃথক অলিম্পিকের আয়োজন করতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। ❑

আদি শঙ্করাচার্য

শিশু ও কিশোর বিভাগ

কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রবেশ করেছেন শুনে আচার্য শঙ্কর তাড়াতাড়ি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, বিপুল পরিমাণ তুষের স্তূপের ওপর কুমারিল ভট্ট বসে আছেন। নিচে আগুন দেওয়া হয়েছে।

জ্বলন্ত আগুনের মতো উজ্জ্বল আচার্য শঙ্করকে দেখে কুমারিল চিনতে পারলেন। তাঁর কথা আগেই তিনি শুনেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তাঁকে দেখে কুমারিলের আনন্দ হলো।

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

‘নির্ব্বাণ-পদাবলী’ ও সাধক কবি রামলালদাস দত্ত

অপরেশ দত্ত

বাংলার বিভিন্ন ভক্তিগীতি-সঙ্কলন গ্রন্থে আমরা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক, কবীর প্রমুখ সাধক কবিদের বহু ভক্তিগীতি পাই। এসমস্ত সঙ্কলনে উনবিংশ শতকের সাধক কবি রামলালদাস দত্তেরও কিছু ভক্তিগীতি পাওয়া যায়। তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা ইতিপূর্বেই হয়েছে ‘উদ্বোধন’-এর গত শারদীয়া ১৪০২ সংখ্যায় (‘স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোকে সঙ্গীতাচার্য সাধক রামলালদাস দত্ত’ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রামলালদাস রচিত ভক্তিগীতিগ্রন্থ ‘নির্ব্বাণ-পদাবলী’।

অনুসন্ধান করে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’-এ ‘নির্ব্বাণ-পদাবলী’ গ্রন্থটি যখন পাওয়া গেল, তখন গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট, আখ্যানপত্র, ভূমিকা, সূচীপত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও লুপ্ত। এই গ্রন্থটির তিনটি খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। জাতীয় গ্রন্থাগারেও এই গ্রন্থটি একই অবস্থায় অর্থাৎ প্রচ্ছদপট, আখ্যানপত্রবিহীন অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

রামলালদাস দত্তের ভক্তিগীতি অনুসন্ধানের প্রধান প্রেরণা হলো জনশ্রুতি। উনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ‘রাম দত্তের’ (এই নামেই তখনকার প্রাচীন ব্যক্তিরা তাঁকে একডাকে চিনতেন) যেসব গান সেসময় লোকের মুখে মুখে ফিরত, তার কয়েকটির প্রথম কতকগুলি পঙ্ক্তি এইরকম—

(১) অকারণ মন আশা করো না।
অনিত্য সুখেতে কভু মজো না।
যতই করিবে আশা, মিটিবে না সে পিপাসা
অপার সে আশানদী তুমি কি তা জান না।

(২) আমার যাকিছু ভরসা তুমিই মা।
আমি যে অধম অতি নিরন্তর মন্দমতি,
আমার বলিতে ভবে তুমিই কেবল আছ মা।

(৩) উঠগো করুণাময়ি খোল মা কুটিরদ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।

(৪) দেহী দেবী দরশন।
দুঃখ দিও না দীনে, দীনদয়াময়ী দনুজদলনী
দেবদেবহৃদয়ধন।

(৫) বারবার যে দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।

(৬) মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর।
সে যে আমার তোমার মা শুধু নয়,
জগতের মা সবাকার।

রামলালের পৌত্র কৃপানাথ দত্ত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি সঙ্গীতানুরাগীও ছিলেন। ‘নির্ব্বাণ-পদাবলী’ যে রামলালদাসের রচিত ভক্তিগীতি গ্রন্থ এবং ‘দীন রাম’ ভণিতা যে তাঁরই—একথা তাঁর সূত্রে জানা গেছে। রামলালদাসের কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ নারায়ণ দত্ত এবং কন্যা সুশীলাদেবীও এই কথা সমর্থন করেন। এছাড়া উত্তরপাড়া-ভদ্রকালী অঞ্চলের ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই রামলালদাস দত্তকে সাধক ও ভক্তিগীতিকার হিসাবে চিনতেন। ‘নির্ব্বাণ-পদাবলী’ যে রামলালদাস দত্তের রচিত সেকথা এঁরা জানতেন এবং অনেকেই তাঁকে জীবদ্দশায় দেখেছেন বলেও দাবি করেন। রামলালদাসকে সাধক, ভক্তিগীতিকার ও যাত্রানুষ্ঠানের সঙ্গীতকার হিসাবে অনেকে শ্রদ্ধা করতেন। শোনা যায়, পূজ্যপাদ ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দজী) বেলুড় মঠে তাঁর গান শুনেছেন। কলকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রয়াত অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীও এক সাক্ষাৎকারে রামলালদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাইচাঁদ বড়াল বলতেন যে, রামলালদাসকে তাঁদের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাড়িতে আয়োজিত সঙ্গীতের আসরে দেখেছেন। এখানে উল্লেখ্য, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘আমার দেখা লোক’ গ্রন্থে ‘নাথু খাঁ’ শীর্ষক প্রবন্ধে রামলালদাসের উল্লেখ করেন ও পাদটীকায় তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: “সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কোন্নগরের নিকট ভদ্রকালী-নিবাসী ‘দীন রাম’ ভণিতা-সংযুক্ত ভক্তিপরিষিক্ত গানসমূহ ইঁহার বিরচিত।”

বাষট্টি বছর আগে ‘সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা’ পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৪৭, ১৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশিত ‘সঙ্গীতাচার্য

সাধক রামলাল দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে জহরলাল বসু মন্তব্য করেন ঃ "তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' দুই ভাগ 'নাদ চন্দ্রিকা' এবং 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা' এখনো অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই অমূল্য গ্রন্থ আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।"

প্রসঙ্গত, জহরলাল বসু তাঁর প্রবন্ধে কোথাও রামলাল নামের পর 'দাস' সংযুক্ত করেননি, অর্থাৎ কোথাও তাঁকে 'রামলালদাস দত্ত' বলেননি। তবে 'রামলাল দত্ত' ও 'রামলালদাস দত্ত' একই ব্যক্তি। কারণ, তাঁর রচিত ভক্তিগীতিগ্রন্থ 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'র উল্লেখ গ্রন্থকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, জহরবাবু লিখেছেন ঃ "একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার "তনয়ে তার তারিণী" গানখানি আমার বড়ই ভাল লাগে'...।" এই 'তনয়ে তার তারিণী' গানটি 'শাক্ত পদাবলী' (অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১০ম সং), 'বাঙালীর গান' (দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত এবং ১৩১২ সালে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত) এবং আরো অনেক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে এবং এর রচয়িতা হিসাবে রামলালদাস দত্তের নামই পাওয়া যায়।

❋ ❋ ❋

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত এই ভক্তিগীতিগ্রন্থের প্রতিটি খণ্ডের প্রতিটি পৃষ্ঠার ওপরেই 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' লেখা আছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৯৯টি গান রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু গান প্রথম খণ্ড থেকে পুনরুক্ত হয়েছে এবং কিছু নতুন গানও সংযোজিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় খণ্ডে গানের সংখ্যা ১১৬। তৃতীয় খণ্ডটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় খণ্ড থেকেই কিছু কিছু গান পুনঃসঙ্কলিত হয়েছে এবং নতুন কিছু গানও সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে গানের সংখ্যা ৬১।

প্রত্যেকটি গানের ওপর সুর ও তাল দেওয়া আছে। সমস্ত গানেই রামলালের ভণিতা 'রাম' বা 'দীন রাম' পাওয়া যায়। দু-একটি গানে 'সেবক রামলাল' ভণিতাও আছে। 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'র গানগুলিতে তিনিই সুর ও তাল সংযোজিত করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতিটি গানের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে। অন্য দুটি খণ্ডে ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়নি। প্রথম খণ্ডের শেষতম গানটির নিচে লেখা আছে—'প্রথম পাঠ সমাপ্ত'। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষতম গানটির পরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"সত্য, দয়া, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, ক্ষমা, যুক্তাযুক্ত বিচার, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান, যথোচিত জপ, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী ব্যক্তিদিগের সেবা, অল্পে অল্পে প্রবর্তক কর্ম হইতে নিবৃত্তি, মনুষ্যদিগের নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি, বৃথা কথোপকথন হইতে ক্ষান্তি, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান, যাহার যেরূপ প্রাপ্য তদনুসারে প্রাণিদিগকে আহার দান, প্রাণিসমূহে বিশেষত মনুষ্যজাতিতে আত্ম ও দেবতা বোধ এবং মহতের গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও কর্ম শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ; শ্রীকৃষ্ণের সেবা, অর্চনা ও দাস্য, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ—এই ত্রিংশৎ লক্ষণসম্পন্ন পরমধর্ম দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান তুষ্ট হন।" নিচে লেখা আছে—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।"

সবশেষে লেখা—"আশার নিবৃত্তিই শান্তি" "শান্তি"।

তৃতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় শেষতম গানের পর কিছু লেখা নেই। পরপৃষ্ঠায় কিছু শব্দগত 'শুদ্ধি অশুদ্ধি'র উল্লেখ আছে।

'নির্ব্বাণ-পদাবলী'র এই তিনটি খণ্ডকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের অন্যতম রত্নাগার বলা যায়। এখানে সাধক কবির ভাষাতীত ভাবের সঙ্গে ভগবৎপ্রেমোদ্দীপক সুচারু ভাষার মণিকাঞ্চনযোগে প্রতি গানে সৃষ্টি হয়েছে ভগবৎপ্রেমরস যা চণ্ডী, বেদ, গীতা, উপনিষদের ভাবরসে পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধ।

এপ্রসঙ্গে অপর একটি মূল্যবান তথ্যকে প্রমাণস্বরূপ স্থাপন করা যেতে পারে। জাতীয় গ্রন্থাগারে "AUTHOR CATALOGUE"-এ আছে—

RAMLALADASA
নির্ব্বাণ-পদাবলী [NIRVANA-
PADAVALI. Devotional Songs, Calcutta,
The author, 1894] 21 cm.
Imperfect, wanting the title page.

এখানে লক্ষণীয়, প্রথমে রামলালের নাম দেওয়া আছে—'RAMLALADASA'। 'দত্ত' পদবির এখানে উল্লেখ নেই। একটি সালের উল্লেখ আছে—'1894'। এই সালটি দেখে মনে হয়, গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯৪ এবং 'Imperfect, wanting the title page'-এর উল্লেখ দেখে বোঝা যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারেও এই 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট, আখ্যানপত্র প্রভৃতি নেই। কোন প্রকাশকের নামও দেওয়া নেই।

'নির্ব্বাণ-পদাবলী'র অন্তর্গত বেশ কিছু গান ভক্তিগীতির বিভিন্ন সঙ্কলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন—'প্রার্থনা ও সঙ্গীত' (রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, ১২শ সং), 'সঙ্গীত সংগ্রহ' (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ১০ম সং), 'শাক্ত পদাবলী' (চয়ন) (অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, ১০ম সং), 'বাঙালীর গান' (দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩১২), 'আমাদের গান' (রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ১১শ সং, ১৯৯৪) এবং 'স্তব প্রার্থনা সঙ্গীত' (উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং)।

❋ ❋ ❋

কিছু সঙ্কলনগ্রন্থে রামলালদাস রচিত কয়েকটি গান 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'র তিনটি খণ্ডে ভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এবং অনেকে মনে করেন, 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'তে প্রকাশিত গানগুলিই শুদ্ধ। আরো লক্ষণীয়, তাঁর 'দীন রাম' ভণিতাটুকুও ঐসব গ্রন্থের গানে অনুপস্থিত। 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাপ্ত সুর, তাল ও বানান-সহ একটি গান হুবহু নিচে দেওয়া হলো—

ভৈরবী, দ্রুত একতালা

জয় জয় জগবন্দিনি।
দেবী দুঃখহারিণি তারিণি মহেশহৃদয়বাসিনি।

সুরাসুর নর সবার পূজিতা আগম-নিগম সৃজনকারিণি,
খগেন্দ্র মহেন্দ্র উপেন্দ্রাদি আছে চরণে পড়িয়ে দিবসরজনী
নীলবরণি নগেন্দ্রনন্দিনি নগ্নবাসা ঘোরনিনাদিনি,
সুখদা মোক্ষদা জ্ঞানদা বরদা তুমি গো অন্নদা জয় নারায়ণি।
জগৎধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগজ্জন-মনোমোহিনি,
মহাকালী মহামায়া জয় জয় মহিষাসুরমর্দিণি।
ভৈরবি ভবানি ভূভারহারিণি আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে তোমারে ডাকিলে কোলে লও তুলে তুমি গো তখনি।
বলিতে তোমার মহিমা অপার সাধ্য কার তিন ভুবনে ভবানি,
মা মা বলে তোমার চরণে পড়ে সবে তাই মা বলিয়ে জানি।
গুরুমুখে শুনি তুমি গো ভবানি ভুবন ভিতরে দীনতারিণি,
দীন রাম জপে কালী কালী কালী, তার তার তার পতিতোদ্ধারিণি।

এই গানটি 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও (পৃঃ ৯) পুনরুল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'তে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯) ভিন্ন আকারে গ্রথিত আরেকটি গানের উল্লেখ করা হলো। গানটি শ্রীশ্রীমায়ের প্রিয় গানগুলির অন্যতম।

পিলু-যৎ

উঠ গো করুণাময়ি খোল মা কুটিরদ্বার,
আঁধার হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার,
দয়াময়ী হয়ে আজি এ কী হেরি ব্যবহার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
মা মা বলে হইল মোর দেহ অস্থিচর্মসার।
ধ্বনি-বর্ণ-তাল লয়ে, তিন গ্রাম বসাইয়ে,
এত ডাকি তবু নিদ্রা ভাঙে না কি মা তোমার।
খেলায় মত্ত ছিলাম বলে বুঝি মুখ বাঁকাইলে,
চাও মা বদন তুলে, খেলিতে যাব না আর।
রাম বলে ত্যজি তোরে, যাইব কার কাছে আর,
মা বিনা কে লবে এই অকৃতি অধমের ভার।

'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে রামলালদাস রচিত ৩টি গান পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'উঠ গো করুণাময়ী' (পৃঃ ১২৯) গানটিতে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। তাঁর রচিত 'মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর' (পৃঃ ৯১) গানটির রচয়িতার স্থানে লেখা আছে—'অজ্ঞাত'। 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ৩৩) এই গানটি পাওয়া যায়। গানটি হুবহু নিচে দেওয়া হলো—

মুলতান-কাওয়ালি

মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর
সে যে আমার তোমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার।
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হতে, ব্রাহ্মণাদি যত জেতে,
মা বলে যে ডাকে কভু হয় না নিষ্ফল তার।
মা যদি নিদয়া হতো, তবে কি আর প্রসবিত,
পৃথিবী শুকাত, হতো অন্ন বিনা হাহাকার।
অঙ্গে দরদর ধারে যবে স্বেদবিন্দু ঝরে
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে নিরন্তর।
ছেলের মুখে মা মা বাণী শুনবে বলে ভবরানী,
লুকয়ে থেকে শুনে, পাছে দেখিলে ডাকে না আর।
রাম বলে এস সবে, ডাকি সদা মা মা রবে,
(মায়ের) আশ মিটিলে নেবে কোলে দেখব ভবের পারাবার।

'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে রামলালদাস রচিত আরেকটি গান পাওয়া যায়—'মোরে দেহি দেবী দরশন'। 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই গানটি রয়েছে। গানটির সুর ও তাল—'কাফি-সিন্ধু, কাওয়ালি'। কিন্তু 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থে এই গানটির সুর ও তাল—'ভৈরব দ্রুত একতালা'। 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'তে এই গানটি হুবহু এরকম—

ভৈরব, দ্রুত একতালা

দেহী দেবী দরশন

দুঃখ দিও না দীনে, দীনদয়াময়ী দনুজদলনী দেবদেবহৃদয়ধন।
দীন তারিণী মম দিন আগত দেখি,
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানি না জননী আর কতদিন আছে বাকি,
দিনে দিনে আসি কর দীনের দুঃখমোচন।
জানি গো তব চরণ অপারের সুখতরী
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাশরি,
তাই মা তোমার তরে আকুল প্রাণে নেহারি
লুকায়ে থেকো না কর দ্রুতপদে আগমন
সভয়ে ডাকি অভয়ে। কর মা অভয়দান
ভবভয় হতে দীন রামে কর পরিত্রাণ
তুমি বিনা শিবে কে করিবে দুঃখ অবসান,
কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা নহে কখন।

* * *

উনবিংশ শতকের সপ্তম দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত যেসমস্ত যাত্রাদল বা অপেরা রামলালদাসকে সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রণ করত, তাদের মধ্যে অন্যতম 'বালী আদিসখা সঙ্গীত সমিতি'। এই দলের 'শকুন্তলা' নাট্যে তিনি বহু সঙ্গীতরচনা ও সুরসংযোজনা করেন। ১৯৭৬ সালে বালী পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের (তখন তাঁর বয়স ৮২-র উর্ধ্বে) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই যাত্রাগোষ্ঠীর সঙ্গে রামলালদাস দত্তের যোগাযোগের কথা জানা যায়। তিনি বাল্যকালে রামলালদাসকে দেখেছেন ও তাঁর গান শুনেছেন।

বালী বাদামতলার কাছে হাজরাপাড়া-নিবাসী বিশিষ্ট সেতারবাদক অপরেশ চট্টোপাধ্যায় (কড়াইবাবু) 'বালী আদিসখা সঙ্গীত সমিতি'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। 'শকুন্তলা'য় রামলালদাসের সঙ্গীতরচনা ও সুরসংযোজনার কথা তিনিও উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত 'শকুন্তলা' যাত্রাভিনয় (২২ ফাল্গুন ১৩২২, শনিবার) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি প্রচারপুস্তিকার আখ্যানপত্রে 'স্বর্গীয় রামলালদাস দত্ত কর্তৃক গীত রচিত ও সুর প্রদত্ত' কথাগুলি লেখা আছে দেখা যায়। এই পুস্তিকাটিতে একটি গানও লিপিবদ্ধ আছে। গানটি অপরিবর্তিতভাবে উদ্ধৃত করা হলো—

অনন্তনাগভূষণ দেবদেব দিগম্বর
সুরাসুর প্রপূজিত ত্রিতাপ সংহর হর।

জ্বলিত পাবক ভালে ধ্বক ধ্বক নিরন্তর,
জগৎগুরু পরাৎপর ত্রিলোকতাত ঈশ্বর।
শ্মশান পাংশু চন্দন, চর্চ্চিত সুঅঙ্গ তায়,
কনক ভাঙে মগ্ন তনু ঢুলু ঢুলু নয়নত্রয়।
গিরিজাপতি ত্রিশূলধর গিরিজা সাধে উক্ষোপর,
বিরিঞ্চি বিষ্ণু বন্দিত জয় জয় মহেশ্বর।

এই গানটি 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। সেখানে 'মগ্ন' স্থানে 'মগন' আছে। রাগ ও তাল স্থানে 'খট্‌ভৈরব' ও 'ঝাঁপতাল' লেখা আছে।

অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্ত পদাবলী' গ্রন্থে রামলালদাস দত্ত রচিত মোট ৫টি গান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩টি গান 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থে রয়েছে—

(১) অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী
মোহন মুরতিধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।
(২) (আমার) মা নয় সামান্য মেয়ে।
আছে আঁধারে আলো করিয়ে।।
(৩) বারবার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।

'নির্ব্বাণ-পদাবলী' ও 'শাক্ত পদাবলী'—উভয় গ্রন্থে এই গানগুলির বিশেষ হেরফের হয়নি।

'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে 'রামলালদাস দত্ত' শিরোনামায় রামলালদাসের পরিচিতি-সহ ১০টি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (পৃঃ ৯৪৫) সঙ্কলক দুর্গাদাস লাহিড়ী পরিচিতিতে লিখেছেন ঃ ''ইঁহার নিবাস ফরাসী চন্দননগর। কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কণ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন এবং ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কে চাকরি করিতেন। সম্প্রতি ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। ইঁহার রচিত গীতগুলি সুললিত ও অতি মধুর। বিশেষত যখন ইঁহার নিজ কণ্ঠে গীত হয় তখন সকলেই মুগ্ধ হয়।'' 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে রামলালদাস রচিত কয়েকটি গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলি এরকম—

খাম্বাজ-ঠুংরী

শ্বেতবরণা বীণাপাণি
শুভ্রবসন পরিধানা শুক্লাভরণ ভূষিতা,
সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী।

খাম্বাজ-ঠুংরী

বারবার যে দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব জেনেছি গো দুঃখহরা।

এখানে লক্ষণীয়, দুর্গাদাস রামলাল প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ ''ইঁহার নিবাস ফরাসী চন্দননগর।'' মুকুন্দ দেব লিখেছেন ঃ ''সুপ্রসিদ্ধ গায়ক কোন্নগরের নিকট ভদ্রকালী-নিবাসী।'' প্রকৃতপক্ষে দুর্গাদাসের আলোচিত 'রামলালদাস দত্ত' এবং মুকুন্দদেবের আলোচিত 'রামলাল দত্ত' অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর প্রকৃত আদিনিবাস ভদ্রকালী। দুর্গাদাস যেসময় 'রামলাল' প্রসঙ্গে লেখেন সম্ভবত সেইসময় রামলাল ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কে চাকরি উপলক্ষ্যে চন্দননগরে জমিদার যোগীন বসু প্রদত্ত আবাসগৃহে থাকতেন।

ভৈরবী-ঠুংরী

দীনজন-দুখহারিণী ভবরাণী জগতমাতা ভবানী।
জয় বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বেশ্বরী অপার আনন্দদায়িনী।।

কালাংড়া-কাওয়ালী

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।।
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই কালা আমার মা কালী।।

মুলতান-পোস্তা

যদি এসেছ মন এ সংসারে, ভাবনা কি আর আছে তার।
সদা জয় কালী জয় কালী বলে সুখে কর এ সংসার।।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নির্ব্বাণ-পদাবলী'তেও এই গানগুলি পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে প্রকাশিত 'আমাদের গান' গ্রন্থে রামলালদাসের নিম্নোক্ত গানগুলি পাওয়া যায়—(১) 'উঠ গো করুণাময়ী'। সুর ও তাল—পিলু যৎ। (২) 'জয় জয় জগবন্দিনী'। সুর ও তাল—ভৈরবী একতালা। (৩) 'মাকে দেখব বলে ভাবনা'। সুর ও তাল—ভীমপলশ্রী-কাওয়ালী। (৪) 'মোরে দেহি দেবী দরশন।' সুর ও তাল—কাফি-সিন্ধু-কাওয়ালী।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ''তখন উত্তরপাড়ার রাম দত্তের গান 'তনয়ে তার তারিণী', এদিকে এই গানটিই তখন অত্যন্ত বেশি প্রচলিত ছিল, তাছাড়া 'হে দুঃখহারী কর নিস্তার, সহে না আর', 'কে তুমি হে তরুবর'—এইরকম কয়েকখানি গান অনেকেই খুব গাইত শুনেছি।'' (পৃঃ ২৯৬) ঐ গ্রন্থেই আরো পাওয়া যায় ঃ ''তখন বালীর রামচন্দ্র দত্তমশাইয়ের কয়েকখানি গান খুব বিস্তৃতভাবেই প্রচার হয়েছিল বাঙালী সমাজে। তার মধ্যে—'তনয়ে তার তারিণী', 'হে দুখহারী কর নিস্তার', 'কে তুমি হে তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে', 'উঠ গো করুণাময়ি খোল গো কুটিরদ্বার,/ আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার' ইত্যাদি গান তখন খুবই চলছে।'' (পৃঃ ৪৬৩) প্রমোদকুমারের গ্রন্থে দুই স্থানে দুরকম কথা একই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে। 'উত্তরপাড়ার রাম দত্ত' এবং 'বালীর রামচন্দ্র দত্ত' একই ব্যক্তি। কারণ, উভয় স্থানেই উল্লিখিত একই গান তার প্রমাণ।

রামলালদাস দত্তের 'নির্ব্বাণ-পদাবলী' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে ও বিভিন্ন ভক্তিগীতি সঙ্কলনগ্রন্থে তাঁর রচিত যে গানগুলি পাওয়া যায়, তাছাড়াও আরো বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন। সেসমস্ত অমূল্য ভক্তিগীতি বহু অনুসন্ধান করে অতি অল্প কিছু পাওয়া গেলেও অধিকাংশই পাওয়া যায়নি। এই সাধক কবির ভক্তিগীতিগুলি সঙ্গীতজগতের মূল্যবান সম্পদ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক, মদন, কবীর, নানক প্রমুখ সাধক কবিদের ভক্তিগীতির মতোই এগুলি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারার মহান প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দাস দত্ত' পদবিটি তিনি ব্যতীত অপর কেউ ঐ বংশে ব্যবহার করেননি। ১৪০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ আমার মন্তব্যও এই সুযোগে সংশোধন করে নিচ্ছি। অপরাধ মার্জনীয়। ❑

লোকশিক্ষায় মিউজিয়ামের ভূমিকা

দিলীপকুমার রায়

মিউজিয়াম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণা আজ সমগ্র বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আগে সাধারণভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলে মিউজিয়াম বলতে বুঝত যাদুঘর বা বিভিন্ন দুর্লভ শিল্পবস্তুর সংগ্রহশালা—যেখানে অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য দর্শকসমাগম হয়। শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে মিউজিয়াম রূপান্তরিত হয়েছে এক নতুন ধরনের শিক্ষামন্দিরে। এই মন্দিরে দলে দলে মানুষ আসে কোন দেবতাকে দর্শনের জন্য নয়, বরং পৃথিবীর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত ও বিশেষভাবে সজ্জিত প্রাকৃত ও কৃত্রিম শিল্পবস্তু বিষয়ে সরাসরি জ্ঞানলাভ করতে। বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে মিউজিয়াম হচ্ছে এমনই একটি অনন্যসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সুসংবদ্ধ সংগঠন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড় বা জীবিত, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক শিল্পবস্তুসমূহ ও মানবজাতি সম্পর্কিত নানা তথ্য যত্ন সহকারে সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকের সামনে পর্যবেক্ষণ ও চর্চা বা অধ্যয়নের জন্য প্রদর্শিত হয়।

সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে এবং লোকশিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনে আধুনিক মিউজিয়ামের কর্মক্ষেত্র বর্তমানে নানাভাবে ও নানাদিকে বিস্তারলাভ করেছে। আধুনিক মিউজিয়াম আজ আর কোন নির্দিষ্ট অট্টালিকার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। জ্ঞানভাণ্ডারের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য আলাদা আলাদা মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে প্রাণী-উদ্যান, উদ্ভিদ-উদ্যান, তারামণ্ডল ভবন, জলজ প্রাণী-উদ্ভিদ ইত্যাদির সংরক্ষণের কৃত্রিম আধার (aquarium), গ্রন্থাগার, মহাফেজখানা, প্রাচীন নবাব-মহারাজা-জমিদার ইত্যাদির গৃহে সঞ্চিত মূল্যবান বস্তুসমূহ, মঠ-মিশন, মন্দির-মসজিদ-গির্জা ইত্যাদির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ যেমন মিউজিয়ামের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেরূপ পৃথিবীব্যাপী ছোট-বড় বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয়েছে বহু ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কিত মিউজিয়াম। যেমন—গান্ধী মিউজিয়াম, নেতাজী মিউজিয়াম, রবীন্দ্র মিউজিয়াম, রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম, চারুকলা মিউজিয়াম, প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত মিউজিয়াম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মিউজিয়াম, স্বাস্থ্য মিউজিয়াম, বাণিজ্য মিউজিয়াম, প্রতিরক্ষা মিউজিয়াম, পুলিশ মিউজিয়াম, রেল মিউজিয়াম, ডাকবিভাগ সংক্রান্ত মিউজিয়াম, বন্দর মিউজিয়াম, পুতুল মিউজিয়াম, হাই-টেক মিউজিয়াম, বাল সংগ্রহালয় ইত্যাদি।

শিক্ষার বিস্তার বলতে যদি বোঝায় তথ্যভিত্তিক অধ্যাপনা বা উপদেশের মাধ্যমে কিছু তথ্য এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চালিত করা, তাহলে বর্তমানে এক-একটি বিষয়ের মিউজিয়ামকে এক-একটি তথ্যগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মিউজিয়ামে প্রদর্শিত তথ্য ও প্রামাণ্য দলিলপত্রাদি দর্শকেরা দেখে-শুনে ও বিচার করে সম্যক জ্ঞানলাভের সুযোগ পেতে পারে। এর ফলে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসাধারণ বা দর্শকেরা যে-জ্ঞান লাভ করে, তা গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি পাঠ করে বা শ্রেণীকক্ষে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। স্বাধীন দেশের যেকোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির সার্বিক অগ্রগতি অসম্ভব। প্রকৃত শিক্ষার মর্ম হলো সকল শিক্ষার্থীর কাছে যুক্তিনির্ভর প্রকৃত তথ্য প্রদান এবং মূল্যবোধ ও পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করা। সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিবিড় সম্পর্ক ও যথেষ্ট পরিমাণ ফলপ্রসূ শিক্ষাদান-সহায়ক সাজসরঞ্জাম—যা প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্পর্শ ও ইচ্ছামতো নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে। বর্তমানে এসকল আধুনিক বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহালয়ে—যেখানে শিক্ষামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এসকল সহায়ক সরঞ্জাম সহজলভ্য। ফলে একটি আধুনিক সংগ্রহালয় কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরী, প্রযুক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের যেকোন জটিল প্রশ্ন কৌতূহলী দর্শকদের কাছে সহজবোধ্যভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম। তাছাড়া দর্শকদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি বিচার না করে সকল মিউজিয়াম-কর্মীর অন্তরে একটি নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগরূক থাকা প্রয়োজন। এইখানেই লোকশিক্ষায় মিউজিয়ামের সার্থকতা।

শিক্ষাসংক্রান্ত যেকোন কর্মকাণ্ডের সূচনা করতে হলে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের প্রধান অন্তরায় বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাসূচীর ব্যবস্থা করা। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ কিভাবে করতে পারেন, তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন—মিউজিয়াম শিক্ষাকৃত্যকের অধীন কোন সংগঠন না হওয়া সত্ত্বেও কি কারণে ও কি উপায়ে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচী পরিচালনা

করবে? মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত বস্তু ও তথ্যসমূহের আর্থিক মূল্য যাই হোক না কেন, নান্দনিক মূল্য অনেক বেশি এবং আরো বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর কৌতূহলী দর্শকদের কাছে সেগুলি প্রকৃত তথ্য ও ব্যাখ্যা-সহ প্রদর্শন করা। এইসব সংগৃহীত জড় বা জীবিত বস্তুসমূহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বহু স্মৃতিবিজড়িত মূল্যবান ইতিহাস, যা কেবলমাত্র মিউজিয়াম-শিক্ষকরাই প্রকাশ করতে পারেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই গ্যালারিতে প্রদর্শিত বস্তুসমূহ দর্শকদের অন্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনুষ্যসৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সঞ্চারিত হবে। দর্শকগণ চিন্তা ও ধারণা করতে পারবে প্রকৃত তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার অন্তর্নিহিত ভাবসমূহ। এই মিউজিয়াম-শিক্ষার মাধ্যমে যেকোন জটিল বিষয়কে দর্শকদের কাছে মনোগ্রাহী করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, এমনকি অনাগ্রহী জনগণের মধ্যেও প্রাথমিক জ্ঞান পরিবেশন করে আনন্দবর্ধন করা সহজেই সম্ভব। উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী ও গবেষক মহলে প্রদর্শিত বস্তু ও তথ্য আরো গভীর ও অনুপুঙ্খ জ্ঞানলাভের বাসনাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করবে। সুপরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠিত শিক্ষামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে মিউজিয়াম-শিক্ষক সর্বশ্রেণীর দর্শকদের সামনে নতুন নতুন জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারেন এবং সেইসঙ্গে জনশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন, বিশেষ করে যেসব দেশে জনশিক্ষার হার অতি নগণ্য বা অতি নিম্নমানের।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয়—মিউজিয়ামের মাধ্যমে শিক্ষামূলক সেবার পরিকল্পনা কাদের জন্য? মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে মিউজিয়াম পরিচালনা করার জন্য যাকিছু করে থাকেন তা সবই কোন না কোনভাবে শিক্ষাপ্রদ। আধুনিক যেকোন বিষয়ভিত্তিক মিউজিয়ামে সংগৃহীত শিল্পবস্তুর প্রদর্শন, প্রদর্শনীকক্ষে কোন নির্দিষ্ট তথ্য, ইতিহাস বা ভাব প্রকাশের জন্য পরিকল্পিতভাবে বিন্যাস, মিউজিয়াম-কর্মীর আন্তরিক ব্যবহার, প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের সস্তা অথচ সুন্দর চিত্তাকর্ষক পুস্তক, প্রচারপত্র, দৃষ্টিনন্দন পোস্টকার্ড ইত্যাদি সবই জনশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ও লোকশিক্ষা প্রসারে সহায়ক।

তৃতীয় বিচার্য বিষয়—মিউজিয়ামে শিক্ষকতার দায়িত্ব কারা গ্রহণ করবেন? স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে এই কঠিন দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। সাধারণ দর্শকদের জন্য মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক বা ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা কোন বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য যত্নসহকারে শিল্পবস্তু সংগ্রহ, নির্বাচন, পরিচয়লিপি প্রস্তুত ও অর্থবহভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম; এমনকি বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের কৌতূহল সাফল্যের সঙ্গে মিটাতেও সক্ষম। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত দর্শকদের আকৃষ্ট করতে এবং গবেষকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে যথেষ্ট সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর দর্শকদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের শিক্ষণপ্রণালীতে অর্জিত কুশলতা ও মানসিক প্রস্তুতি। দর্শকদের কাছে মিউজিয়াম-শিক্ষকদের বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও গঠনোপযোগী। বিষয়ভিত্তিক মিউজিয়ামে গবেষকদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শ্রেণীর মৌলিক উপাত্ত (data) এবং বিশেষত্বপূর্ণ জ্ঞান ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। আধুনিক শিক্ষণবিজ্ঞান ও শিক্ষণপ্রণালীতে অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা দর্শকমনে বিভিন্ন চিন্তাধারা উদ্দীপিত করা, অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করা এবং প্রদর্শিত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করাই মিউজিয়াম-শিক্ষকের কর্তব্য। সাধারণ শিক্ষক থেকে মিউজিয়াম-শিক্ষকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যেহেতু মিউজিয়ামে কর্মরত, সেজন্য মিউজিয়ামে প্রদর্শিত সব বস্তু ও তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত এবং অশিক্ষিত দর্শকদের কাছে তা সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করতে বিশেষ পারদর্শী হবেন। মিউজিয়াম-কর্মীদের মধ্যে সেইসব ব্যক্তির মিউজিয়াম-শিক্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয়—যাঁদের তথ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য উপকরণ-নির্ভর শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা (Museology) একটি পাঠ্যবিষয় হিসাবে পরিচিত, কিন্তু ভারতে মাত্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ আছে। অথচ গবেষকদের জন্য মিউজিয়াম-গ্রন্থাগারিকের সাহায্য অপরিহার্য, কারণ তিনিই পারেন প্রদর্শিত বস্তুগুলির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে। সুতরাং মিউজিয়াম-শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা হিসাবে প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা ও গ্রন্থাগারবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ বিচার্য বিষয়—মিউজিয়াম কি শিক্ষাদানের পক্ষে উপযুক্ত স্থান? মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে স্থাননির্বাচন করা একটি সমস্যা মনে হলেও মিউজিয়াম-শিক্ষকের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়। শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী মিউজিয়ামের চৌহদ্দির মধ্যে বা বাইরে যেকোন স্থানে ও যেকোন সময়ে পরিচালনা করা সম্ভব। শিক্ষাসূচী রূপায়ণের জন্য প্রদর্শনীকক্ষ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। এই স্থানে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন বস্তু এমনভাবে প্রদর্শিত হয়, যাতে

বিষয়টিতে নিরক্ষর দর্শকদের মনেও একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সেই বিষয়ে আরো জানার ইচ্ছা হয়। শিক্ষিত দর্শকদের সুবিধার জন্য প্রতিটি প্রদর্শিত বস্তুর সঙ্গে একটি পরিচিতিপত্র (label) সংযোজিত থাকে। এই পরিচিতিপত্রে বস্তুটি সম্বন্ধে বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ নানা তথ্য পরিবেশিত হয়। কৌতূহলী দর্শকদের কাছে এই পরিচিতিপত্র অপরিহার্য অথচ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল, কারণ এটি দর্শকদের কৌতূহলী মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না—যেহেতু বস্তুগুলির মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (chain reaction) বিদ্যমান। তবুও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, পরিচিতিপত্র অনুসন্ধিৎসু দর্শকদের এবং গবেষকদের মিউজিয়ামের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকের কাছে যেতে প্ররোচিত করবে আরো যুক্তিনির্ভর তথ্যসংগ্রহের জন্য। আধুনিক মিউজিয়ামে পরিচিতিপত্রের নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা হ্যাণ্ডবিল, ভাঁজকরা পরিপত্র (circular), স্বয়ংসম্পূর্ণ সংযোজনপত্র, বিষয় ও বিভাগ অনুসারে সজ্জিত তালিকা ইত্যাদির দ্বারা মেটানো সম্ভব। এইসব বস্তু আকর্ষণীয় কাগজ, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিতরণ করেন।

যেসব মিউজিয়ামে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে গাইড-লেকচারারের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিটি গাইড-লেকচারারের তাই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হওয়া প্রয়োজন। মিউজিয়াম-শিক্ষার জন্য প্রধানত ত্রিমাত্রিক বস্তুসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; কিন্তু যখন কোন বিশেষ কারণে পূর্বনির্দিষ্ট বস্তুসকল প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন বিভিন্ন প্রকার সহজ বহনযোগ্য বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার যখন মিউজিয়াম-শিক্ষক মনে করেন, প্রদর্শনীকক্ষে স্থানসঙ্কুলান সম্ভব নয় তখন শিক্ষাসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ড সুপরিসর ভাষণকক্ষে বা উপযুক্ত কোন স্থানে সম্পাদন করেন। আবার লোকশিক্ষার প্রয়োজনে অনেক সময় বিভিন্ন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিউজিয়াম-প্রেক্ষাগৃহে বা কোন সাধারণ মঞ্চে জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবেশ দূষণ, স্বনিযুক্তি প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে গণোপযোগী, ফলপ্রসূ বক্তৃতা, আলোচনাসভা, বিতর্কসভা ইত্যাদির ব্যবস্থাও করতে পারেন।

মিউজিয়ামের শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য সবসময় দর্শকদের মিউজিয়ামে আসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে মিউজিয়াম-শিক্ষকদের পাঠিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিল্পবস্তু প্রদর্শনের নিমিত্ত ও সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত গ্রামগঞ্জের ক্লাবঘর, সঙ্ঘভবন, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাদানকেন্দ্র, মেলা-প্রাঙ্গণ প্রভৃতি স্থানেও অস্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন। অতএব প্রয়োজনের যৌক্তিকতা বিচার করে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে মিউজিয়ামের চৌহদ্দির মধ্যে কিংবা বাইরে যেকোন স্থানে যেকোন সময়ে জনশিক্ষা-মূলক কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু এই-সকল পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মিউজিয়াম-শিক্ষকের নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, মনন-ক্ষমতা, স্বতঃপ্রণোদিত কর্মোদ্যম ও সহজাত দক্ষতার ওপর।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মিউজিয়ামে শিক্ষামূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা তখনি করা হয় যখন দর্শকরা তা গ্রহণ করতে সমর্থ। কিন্তু সেই সঠিক সময়টি আগে থেকে নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব নয়। তবুও একজন দক্ষ মিউজিয়াম-শিক্ষক তাঁর সহজাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আগে থেকেই আন্দাজ করে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাসূচী-পরিকল্পনা করতে সক্ষম। অনুকূল পরিবেশ এবং বিশেষ তাৎপর্যময় ঘটনা ও অনুষ্ঠানসমূহের সুযোগ গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দর্শকদের আকর্ষণ করেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষ মিউজিয়াম-শিক্ষকের কাছে কোন সমস্যাই নয়। সেই দর্শক নিজের ইচ্ছামতো ও পছন্দমতো সময়ে মিউজিয়াম দর্শনে আসে। কিন্তু যখন দলবদ্ধভাবে স্কুল, কলেজ বা কোন সংগঠন থেকে দর্শকরা আসে, তখন মিউজিয়াম-শিক্ষকের কাছে নানা ধরনের সমস্যা উপস্থিত হয়। এই দলবদ্ধ দর্শকদের জন্য প্রয়োজন আগে থেকে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। দলে থাকে বিভিন্ন বয়সের দর্শক, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বুদ্ধির বিকাশ কখনোই সমান হয় না। ফলে কোন্ সময়টি কার পক্ষে উপযুক্ত, তা নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর। এই অবস্থায় মিউজিয়াম-শিক্ষককে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় দলনেতার সিদ্ধান্তের ওপর।

মিউজিয়াম-শিক্ষক হচ্ছেন দর্শক ও প্রদর্শিত শিল্পবস্তুর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। কিভাবে এই যোগাযোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব? দর্শকদের মনে মিউজিয়াম দর্শনে আগ্রহ সৃষ্টি করে প্রদর্শিত বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত ভাব ও অর্থই বা কিভাবে মিউজিয়াম-শিক্ষক প্রকাশ করবেন? এই দুরূহ কাজটির সমাধান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মিউজিয়াম-শিক্ষকের নিজস্ব যোগাযোগের পদ্ধতি ও

দর্শকদের মানসিক অবস্থার ওপর। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুফল পেতে হলে মিউজিয়াম-শিক্ষাকর্মীদের প্রধান অথচ সহজতম কর্তব্য হলো প্রদর্শিত বস্তুগুলি উপযুক্ত লেবেল-সহ প্রদর্শনীকক্ষে খুবই সাধারণ কিন্তু উপযুক্ত দৃষ্টিনন্দন পরিবেশে প্রদর্শন করা। অনেক সময় সাধারণ দর্শকের কাছে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হতে পারে। কোন কোন দর্শকের হয়তো আরো কিছু তথ্য জানার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রদর্শনীকক্ষে প্রদর্শিত লেবেল-সহ এক বা একাধিক সামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ দর্শকদের মনে কোন বিশেষ রেখাপাত করবে না; কিন্তু অনেক দর্শকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে যে, কারা কখন কেন এইসব পোশাক পরিধান করত, তাদের জীবনধারা কিরকম ছিল, এই ধরনের পোশাকের কি কি সুবিধা বা অসুবিধা, সামরিক পোশাকের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি নানা প্রশ্ন-পরম্পরা। দর্শকদের কৌতূহল মেটানোর জন্য মিউজিয়াম-শিক্ষককে ভাবনাচিন্তা ও বিবেচনা করে নানা ধরনের মডেল, ম্যাপ, চার্ট, ফটোগ্রাফ, রঙিন ছবি, স্কেচ প্রভৃতি সরঞ্জামের সাহায্য গ্রহণ অবশ্য-প্রয়োজন। এর ফলে প্রদর্শিত বস্তুর গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাবে, সেরকম দর্শকগণও মিউজিয়াম দর্শনে উৎসাহিত বোধ, করবে।

উন্নত ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাসূচী অনুযায়ী যথাযোগ্য প্রশিক্ষণের জন্য একজন মিউজিয়াম-শিক্ষক সর্বপ্রথম দর্শকদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রদর্শনকক্ষে প্রবেশ করার আগে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে কি কি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু দেখতে পাওয়া যাবে তার বর্ণনা দেন। পরে দর্শকদের ইচ্ছামতো সেইসব বস্তু পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে তাদের মনে যেসব প্রশ্ন ওঠে, তার যথাযথ উত্তর দেন বা কোথায় তা পাওয়া যাবে তার সন্ধান দেন। পরিশেষে দর্শকদের সম্মিলিত করে প্রদর্শিত বস্তুগুলি সম্বন্ধে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে প্রতিটি দর্শক নিজ নিজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পায় এবং মিউজিয়াম-শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। প্রতিদিন যত বেশি দর্শক মিউজিয়াম দর্শনে আকৃষ্ট হবে ততই প্রমাণিত হবে মিউজিয়াম-শিক্ষার সাফল্য ও মিউজিয়াম-শিক্ষকের কৃতিত্ব।

অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য নিয়ন্ত্রিত সূচী অনুসারে মিউজিয়াম দর্শন সাধারণত খুব ফলপ্রসূ হয় না। অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনতে কোন আগ্রহ অনুভব করে না। তাদের সর্বদা ইচ্ছা করে নিজেদের পছন্দমতো বিভিন্ন গ্যালারিতে ঘুরে বেড়াতে ও নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হলো নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা। বস্তুত, মিউজিয়ামের দুর্লভ ও অমূল্য সম্পদের প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্কদের আকৃষ্ট করা খুবই কষ্টসাধ্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকরা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশার মাধ্যমে তারা মিউজিয়ামের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করতে ও সেই সুযোগে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বেশি আগ্রহী হয়। এর জন্য আধুনিক মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ 'Please Touch Me', 'Museum Games', 'Light and Sound' ইত্যাদি বিভিন্ন নতুন ধরনের কর্মসূচীর প্রবর্তন করেছেন এবং তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। সাধারণত মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বহুমূল্য দুর্লভ বস্তু দর্শকদের স্পর্শ করতে নিষেধ করে, কিন্তু আসল বস্তুটির অনুকৃতি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ থাকে তাহলে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী বাস্তবিকই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ মিউজিয়াম-শিক্ষক দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক শিল্পবস্তুর পরিবর্তে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাসহায়ক বস্তুর সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে পরিবেশন করতে পারেন। শিক্ষাসংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানসূচী পরিকল্পনা করার সময় সর্বদা দর্শকদের বয়স ও বোধশক্তির কথা বিবেচনা করতে হয় এবং স্মরণ রাখতে হয় যে, বস্তুগুলি যেন দর্শকমনে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শ্রাব্য-দৃশ্য যন্ত্রাদি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে বস্তুগুলি দর্শকদের কাছে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে। লোকশিক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনে মিউজিয়ামে সংগৃহীত বস্তুগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মিউজিয়াম-শিক্ষককে পরিচালিত করার উপযুক্ত কোন ব্লুপ্রিন্ট বা নির্দেশ-পুস্তিকা আজও প্রকাশিত হয়নি। প্রতিটি আধুনিক মিউজিয়াম-শিক্ষক সহজাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন নমনীয় পন্থা অনুসরণ করে থাকেন।

আজও ভারতের প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিধিসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। সর্বশ্রেণীর জনগণকে দ্রুত শিক্ষিত করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আক্ষরিক শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে প্রথাবহির্ভূত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার বেশি প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য মিউজিয়ামের ভূমিকা অতুলনীয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচিত বিধিবদ্ধ ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একটি করে ছোট মিউজিয়াম নামক অনানুষ্ঠানিক

শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা। নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করে তুলতে যেমন প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেরকম অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে সর্ববিষয়ে শিক্ষিত করতে এবং তাদের ঔৎসুক্য ও জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট-বড় মিউজিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। এক-একটি গ্রামীণ মিউজিয়ামের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে উন্নত ধরনের শস্য, শাকসবজি, ওষধি ও ফলমূল চাষ, মৎস্য, পশু-পক্ষী, মৌমাছি, রেশমকীট ইত্যাদি পালন, গ্রামভিত্তিক কুটিরশিল্প স্থাপন, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ, বনসৃজন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্র পরিচালন-ব্যবস্থা, জমিজমা সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে অতি সহজে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। কিন্তু মিউজিয়াম-শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষানুরাগী জনদরদী শিক্ষক। ভারতবর্ষে এমন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব। সেইজন্য দেশের প্রতিটি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা (Museology) পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন। ❑

বিঃ দ্রঃ ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বেলুড় মঠের 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির'-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

শব্দচেতনা ১৯

'উদ্বোধন'-এর নতুন বর্ষ উপলক্ষ্যে নিবেদিত এক বিশেষ শব্দছক

সহায়ক গ্রন্থ : 'উদ্বোধন' : শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন এবং 'উদ্বোধন' ১০৪তম বর্ষ

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম চৈত্র ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি : (১) 'উদ্বোধন'-এ যিনি 'বিলাতযাত্রীর পত্র' লিখেছিলেন, (৪) 'আমায় তুমি ——ও গো নাথ' (কবিতা), (৫) 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন এক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, —— চৌধুরী, (৬) আশ্বিন মাসে কততম সংখ্যা প্রকাশিত হয়?, (৭) 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন এক বিখ্যাত কবি কালিদাস ——, (৮) প্রখ্যাত শিল্পী, 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন ——লাল বসু, (৯) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পূজনীয় অধ্যক্ষ, অতীতে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক ছিলেন, (১৩) ১০৪তম বর্ষে একটি 'কথাপ্রসঙ্গে'র শিরোনাম, (১৪) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ লিখিত একটি অসাধারণ রচনা, (১৫) এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের লেখা একসময়ে 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো, (১৮) 'মাকে ——' (কবিতা), (২০) স্বামী প্রজ্ঞানন্দ রচিত একটি সম্পাদকীয়, (২১) 'থ্যালাসেমিয়া : এক —— সংক্রান্ত রোগ', (২২) '—— রোগে ভেষজের ব্যবহার'।

ওপর-নিচ : (১) 'উদ্বোধন'-এর অবশ্যপাঠ্য একটি বিভাগ, (২) 'উদ্বোধন'-এর ঠিকানা : '——কৃষ্ণ স'হা লেন, (৩) শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান, যিনি 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন, (৪) 'উদ্বোধন'-এর সদ্যপ্রয়াতা এক প্রবন্ধ-লেখিকা, (৯) 'ধর্ম ——' (কবিতা), (১০) এই শাস্ত্র নিয়েও 'উদ্বোধন'-এ আলোচনা হয়, (১১) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে 'উদ্বোধন'-এ লিখেছেন, (১২) 'তোমাকে ——' (কবিতা), (১৪) রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তা 'উদ্বোধন'-এর এক বিশিষ্টা লেখিকা, (১৬) এই তামিল লেখকের কবিতার অনুবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে, (১৭) 'উদ্বোধন'-এর সাম্প্রতিক সংযোজিত একটি বিভাগ, (১৯) টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিবৃত্ত যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

অরিন্দম দাস

সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রবণমঙ্গলম্
সঙ্কলন ও পাঠ ঃ
দীপক গুপ্ত
সঙ্গীত ঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ
প্রকাশক ঃ গাথানি
ময়ূর ক্যাসেটস প্রাঃ লিঃ
২ টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতকে ঈশ্বরসাধনার সহায়ক-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রার্থনার মন্ত্র। সঙ্গীত শ্রবণে তিনি সমাধিস্থ হতেন। আলোচ্য '**শ্রবণমঙ্গলম্**' শীর্ষক ক্যাসেটটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সঙ্গীতময় জীবনেরই পরিচয় বহন করে।

ক্যাসেটটি শ্রবণকালে শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এর দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। ক্যাসেটটির বিষয়বস্তুর মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছয়জন মনীষীর সাক্ষাৎকার। এঁরা হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাঠক দীপক গুপ্তের এই সঙ্কলন ও 'কথামৃত' থেকে নির্বাচিত অংশগুলির পাঠ প্রশংসার দাবি রাখে। কথোপকথন পাঠে উচ্ছ্বাস নেই। শান্ত, সংযত অথচ ঈশ্বরীয় ভাবোদ্দীপক।

উল্লিখিত সাক্ষাৎকারগুলিতে ব্যবহৃত গানগুলি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গীত। তুলনামূলক বিচারে সাক্ষাৎকারগুলির পাঠ ক্যাসেটটিতে অধিকতর আকর্ষণীয়। ক্যাসেটের সর্বশেষ গানটি ('তোমার নামটি লেখা') ক্যাসেটের বিষয়বস্তুর বহির্ভূত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রোতাদের অন্তরের আকুলতাকে বিশেষভাবে জাগিয়ে তোলে। 'সর্বধর্মস্থাপকম্'—এই প্রারম্ভিক স্তোত্রের পাঠ সার্থক।

বিষয়বস্তু সঙ্কলনের মাধ্যমে দীপক গুপ্ত বিশিষ্ট মনীষীদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার তুলে ধরে উনবিংশ শতাব্দীর এক যুগসন্ধিক্ষণকে শ্রোতাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে ক্যাসেটটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। ❑

ত্রিবেণীসঙ্গমে সঙ্গীতাঞ্জলি

শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গান
রুবী গুপ্ত
প্রকাশক ঃ
বিটোভেন রেকর্ডস
১৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭২
মূল্য ঃ ৩৫ টাকা

রম্য দৃশ্য ও মধুর শব্দ মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তার অন্তরে রসবোধ জাগিয়ে তোলে। সঙ্গীতে নিহিত থাকে শব্দ, সুর, ছন্দ ও কণ্ঠমাধুর্যের একীভূত মিলন। সব সাঙ্গীতিক উপাদানগুলি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "যাহা ভাবহীন, প্রাণহীন সে-সঙ্গীত পরিত্যাজ্য।" সেদিক থেকে বিটোভেন রেকর্ডস প্রকাশিত '**শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গান**' ভক্তিগীতির একটি অপূর্ব সঙ্কলন। রুবী গুপ্তের গাওয়া গানগুলি পরিপূর্ণভাবে ভক্তিভাবোদ্দীপক।

গায়িকা রুবি গুপ্তের কণ্ঠ সুমিষ্ট, ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। তাঁর কণ্ঠ সপ্তসুরের সীমায় অতি সহজভাবেই যেতে পারে। প্রচলিত সুরে গীত চারটি গান সুনির্বাচিত। শোনামাত্রই গানগুলি শ্রোতাদের মনে গভীর ভক্তিভাব সঞ্চারিত করে। এককথায় বলা যায়, গানগুলি অধ্যাত্মভাবে স্নিগ্ধ।

প্রথমে 'গুরুবন্দনা'য় সুর-সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছে। স্বামী প্রেমেশানন্দ রচিত 'বঙ্গহৃদয় গোমুখী হইতে' সঙ্গীতটিতে আরোপিত হয়েছে অধ্যাত্মভাবোদ্দীপক প্রচলিত সুর। একতালে নিবদ্ধ এই গানটি শান্ত, ভক্তিভাব-স্নিগ্ধ। দ্বিতীয় গানটি স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত ও প্রচলিত সুরে গীত—'মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই'। গানটির পরিবেশনে কথা, ছন্দ ও ভাব একত্রিত হয়েছে। মায়ের আগমনে আনন্দের ভাব গানটিতে পরিপূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় গান 'তুমি রামকৃষ্ণের নয়নমণি'র রচনা ও সুর সংযোজনা করেছেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ। গানটির কথায় রচয়িতার হৃদয়াবেগ উৎসারিত হয়েছে। গানটিতে তাঁর সুর-সংযোজনাও ভাবানুগ। পরের গান 'হাতে হাতে তালি দিয়ে বল রামকৃষ্ণ নাম' স্বামী সর্বগানন্দ রচিত ও সুরারোপিত। এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ-

বন্দনার একটি অনবদ্য ও প্রাণস্পর্শী প্রকাশ। গানটিতে হৃদয়ের আবেগ ও মনের কথা এক হয়ে মিশে গেছে।

ক্যাসেটের দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয়েছে মার্গসঙ্গীত-ভিত্তিক 'সারদাস্তোত্র' দিয়ে। গানটির ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে অনন্তরূপিণী মাতৃমূর্তি মনশ্চক্ষে জেগে ওঠে। এর পরের গানটি হলো 'কাঠুরে তুই দূর বনে যা'। গানটির রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন। গায়িকার সুকণ্ঠ গানটির ভাবরূপকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। পরের গানটি স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর'। চিত্রধর্মী কথায় প্রচলিত সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। গানটিতে ভক্তিভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আনন্দ চক্রবর্তী রচিত ও সুরারোপিত 'ভুলো না ভুলো না সারদাচরণ দুটি' গানটি সুর-সংযোজিত হয়ে যেন নবরূপ লাভ করেছে। সবশেষে গায়িকার কণ্ঠে গীত হয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম'। যন্ত্রানুসঙ্গ গানগুলির ভাবকে যথাযথ রক্ষা করেছে। ❑

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

পারিজাত পুষ্পে শ্রীহরির আরাধনা
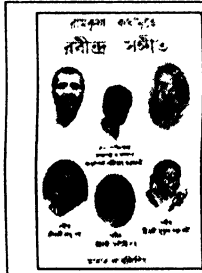
রামকৃষ্ণ-কথামৃতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত
রচনা, পরিচালনা, ভাষ্যপাঠ ও সংলাপ :
পরিমল চক্রবর্তী
প্রকাশক : তপন সাহা
মাদার পাবলিশিং
২৭ স্টেশন রোড, কলকাতা-৪৯
মূল্য : ৩৫ টাকা

সাধনার একটি অঙ্গ সঙ্গীত। শ্রীশ্রীঠাকুর সুগায়ক এবং সঙ্গীতরসিক ছিলেন। তাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পাতায় পাতায় সঙ্গীতের ছড়াছড়ি। ঠাকুর নিজে যেমন গেয়েছেন, তেমনি স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) এবং অন্যান্য ভক্তও গেয়েছেন বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত গান।

স্বামীজী অন্যান্য গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতেন। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির সঙ্কলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'কথামৃত'-এ উল্লিখিত রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলিকে সঙ্কলিত করে প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সেদিক থেকে এই সঙ্কলন অভিনব। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক গানের প্রসঙ্গগুলিকে যথাযথ উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যন্ত প্রশংসনীয় এই প্রচেষ্টা।

অবশ্য ক্যাসেটটির কতকগুলি মারাত্মক সমস্যা আছে। এককথায় বলা যায়, সঙ্কলনকর্ম এবং ভাষ্যরচনা যতটা যত্নসহকারে করা হয়েছে, বাকি কাজগুলি করার ক্ষেত্রে ততটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। ক্যাসেটের 'ইন্‌লে কার্ড'টি দেখেই প্রথমে খটকা লাগে। সেখানে প্রায় একই সারিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, অধ্যাপক পরিমল চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়েছে। সাধারণত শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সমান্তরালে কোন ছবি ছাপা হয় না। যেকোন ভক্তের চোখে তা দৃষ্টিকটু ঠেকবেই। দ্বিতীয়ত, শ্রীশ্রীঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝে অধ্যাপক চক্রবর্তীর ছবি দেখে মনে হয়, তাঁর গুরুত্বই অধিক। এটা শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, হাস্যকরও বটে।

ক্যাসেটটির রেকর্ডিঙের মান প্রশংসার দাবি করতে পারে না। সম্ভবত এটি কোন স্টুডিও রেকর্ডিং নয়। তাছাড়া রেকর্ডিঙের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। তাই কিছু স্বরক্ষেপণের সময় মাইক্রোফোনে অতিরিক্ত বায়ুর আঘাতজনিত শব্দ শোনা যায়। তাছাড়া ক্যাসেটের ফিতেও (tape) নিম্নমানের। এপ্রসঙ্গে বিশেষ করে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটির উল্লেখ করা যায়। 'এ কী এ সুন্দর শোভা' গানটির মাঝের কিছু অংশ অনুপস্থিত।

রেকর্ডিঙের এর মান খারাপ হওয়ার জন্যই হোক বা অন্য যেকোন কারণেই হোক, অনেক শব্দ ঠিকমতো শোনা যায় না। তাছাড়া ভাষ্যপাঠের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভুল উচ্চারণ কানে লাগে। সর্বোপরি ভাষ্যপাঠের কণ্ঠস্বর যদি আরো ভাল হতো তাহলে নিশ্চয় শ্রুতিমধুর হতো। ভাষ্যপাঠের সঙ্গে সর্বক্ষণ একটি স্প্যানিশ গীটারের শব্দ শ্রুতিসুখকর হয়নি। এখানে ভাইব্রোফোন জাতীয় কোন যন্ত্র ব্যবহার করলে মনে হয় ভাল হতো।

এত কিছু সমস্যার দরুন গানগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। রেকর্ডিং ভাল মানের হলে বলা সহজ হতো। আপাতভাবে মনে হয়, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর এবং গায়কী খারাপ নয়। বিশেষ করে দেবশ্রী দত্তের গায়কী অনেক পরিণত বলেই মনে হলো।

উপরি উক্ত সমস্যার কারণে আপাতদৃষ্টিতে এই সুন্দর সঙ্কলনটির গুরুত্ব কমে গেছে। তাই যাঁরা ক্যাসেটটির প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা যদি সমগ্র ক্যাসেটটির ত্রুটিগুলি দূর করে এটি পুনঃপ্রকাশনার ব্যবস্থা করেন, তাহলে অন্তত সঙ্কলন হিসাবে ক্যাসেটটি সঙ্গীতপিপাসু, জিজ্ঞাসু এবং ভক্তমানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারবে। ❑

গৌতম মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির ২০০১-২০০২ সালের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বেলুড় মঠে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০২, রবিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে Petaling Jaya, Malaysia-তে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন এবং তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য International Human Resource Development Centre-এর উদ্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি সম্প্রতি UNESCO রামকৃষ্ণ মিশনকে ২০০২ সালে সহিষ্ণুতা ও অহিংসার ভাব বিস্তারের জন্য সম্মানিত করার উদ্দেশে নির্বাচিত করেছে।

বিগত বছরে কলকাতার বরানগরে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। এখানেই ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম মঠ শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের হবিগঞ্জ কেন্দ্রে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদিত হয়েছে। বিগত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রায় ৮০০টি গ্রামের প্রায় ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছেন। দুবছর আগে ওড়িশাতে যে বৃহৎ পুনর্বাসন কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছিল, তার শেষ পর্যায়ে বাকি ২৪টি বাড়ি ও ২টি বিদ্যালয় তথা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হওয়ার পর সমাপ্ত হয়েছে। এর থেকেও বৃহৎ যে পুনর্বাসন কার্য গতবছর গুজরাটে শুরু হয়েছিল, সেই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ২৮২টি বাড়ি ও ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্যাদির জন্য ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ১০৮টি ডিস্পেনসারি-সহ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার জন্য ৩০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ হাজার। বিগত বছরে শিক্ষাখাতে মোট খরচের পরিমাণ ৭৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে ৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির

ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে যত ধর্মান্দোলন হয়েছে, সেগুলি কোন না কোন অবতারপুরুষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এর ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এখনো জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন আছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং উপদেশ দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্মিক আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায়, এই ভাবতরঙ্গ দেড়হাজার বছর ধরে বিশ্বকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবৎ জীবন এবং ত্যাগ ও সত্যের ওপর তাঁর প্রভাবশালী উপদেশগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষত কয়েকজন যুবকের মধ্যে ত্যাগের অগ্নিশিখা এবং ভগবদ্ উপলব্ধির ইচ্ছা জাগ্রত করেছিল। ঠাকুরের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে এই যুবকেরা বিশ্বের কল্যাণের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র তেজস্বী নরেন্দ্রনাথের ওপর এই যুবকদের নেতৃত্বদানের দায়িত্ব পড়েছিল। পরবর্তী কালে এই যুবকেরাই তরুণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা করেন। এছাড়াও কয়েকজন উৎসর্গীকৃত গৃহী ভক্ত-শিষ্য তাঁর এই মহাব্রতে সাহায্য করেছিলেন। ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামী বিবেকানন্দ বহুজনের কল্যাণের জন্য এই ভাবান্দোলনকে একটা আকার দিতে সাধু ও গৃহী ভক্তদের নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ ও সুদৃঢ় সহযোগিতা এবং ঠাকুরের দৈবী ইচ্ছা এই ভাবান্দোলনকে শক্তিপ্রদান করেছিল।

এই ভাবান্দোলনের মুখ্যপুরুষদের স্মৃতিরক্ষা এবং তাঁদের মহান কীর্তিগুলিকে সুরক্ষিত করে জনসাধারণের দর্শনার্থ স্থাপন করা হয় 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির'। ১৩ মে ১৯৯৪ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বেলুড় মঠের পুরনো মিশন অফিসে এই সংগ্রহমন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই সংগ্রহালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদের ব্যবহৃত বস্তু প্রদর্শিত হয়।

পরবর্তী কালে দর্শনার্থীদের ভালভাবে দেখা ও স্মৃতিচিহ্নগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখার জন্য জায়গার অভাব অনুভূত হতে থাকে। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে এক মনোরম পরিবেশে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে আরো সুন্দরভাবে প্রদর্শনের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ নতুন সংগ্রহালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ৭ মে ২০০১ বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দির'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

দর্শনার্থিগণ সংগ্রহমন্দিরে প্রবেশের আগে বাঁদিকে ঠাকুরের সময়কার প্রাচীন কলকাতার দৃশ্য এবং ডানদিকে কামারপুকুরে
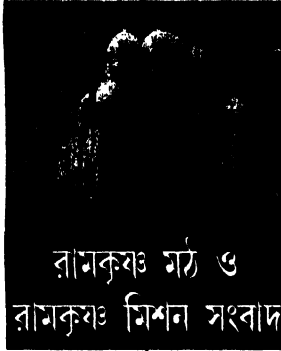
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থল ও স্মৃতিপূত স্থানগুলির মডেল দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সংগ্রহালয়ের ভিতরে প্রবেশ করলে দর্শনার্থীরা বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক কিছু দৃশ্য দর্শন করতে পারবেন। ভবনের শেষের দিকে একটি গৃহে ১৯১০ সাল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেসকল ভাবাদর্শ কার্যে পরিণত হয়েছে, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবান্দোলন কিভাবে ভারতে ও বিদেশে প্রসারলাভ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ভি.ডি.ও.'য় উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন দর্শক আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে এই সংগ্রহালয় পরিদর্শন করলে তিনি কেবল এই মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ উপস্থিতিই অনুভব করেন না, সেইসঙ্গে আরো শক্তিসম্পন্ন চেতনাও অনুভব করেন। [এই সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় 'লোকশিক্ষায় মিউজিয়ামের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য]

উৎসব-অনুষ্ঠান

নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে গত ৯ নভেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত বাতানুকূল সভাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত আশীর্বচন প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজও বক্তব্য রাখেন। ঐদিন পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ আশ্রমস্থ মন্দিরে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন।

রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে গত ৯ ও ১০ নভেম্বর ২০০২ প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের শেষ পর্যায়ের সাধারণসভা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল এম. রামা জয়েস, ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ ইন্দার সিং নামদারী এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি ভাষণ দেন।

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৩ নভেম্বর ২০০২ জগদ্ধাত্রীপূজার দিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত সভাকক্ষ 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সৎসঙ্গ ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি সভা আয়োজিত হয়। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এই সভায় পৌরোহিত্য করেন।

হীরকজয়ন্তী বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

একটি প্রতিবেদন

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভারতবাসী যখন একদিকে প্রাচীনপন্থী স্বদেশী শিক্ষাধারা এবং অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার টানাপোড়েনে দ্বিধান্বিত, তখনি স্বামী বিবেকানন্দ এক নতুন জীবনদায়ী শিক্ষাব্যবস্থার কথা বললেন—যে-শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে মানুষের জীবনে এনে দেবে চরিত্রবল, পরার্থপরতা ও সাহসিকতা; আবার অন্যদিকে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে। স্বামীজী তাঁর এই মৌলিক শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। তাদের মধ্যে অন্যতম এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনের সর্বপ্রথম উদ্যোগ হলো স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভূত 'বিদ্যামন্দির'। ১৮৯৮ সালের একদিন তিনি স্বীয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বেলুড় মঠ-সংলগ্ন জমি দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ "ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে।... প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে।" স্বামীজী কালোপযোগী যুক্তি ও বিজ্ঞানচেতনা-নির্ভর উদার ভাবনাচিন্তার ভিত্তিতে সনাতন ভারতীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভাবী 'বিদ্যামন্দির'-এর পাঠ্যসূচীতে ব্যাকরণ, দর্শন ও শাস্ত্রচর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও 'রাজভাষা' অর্থাৎ ইংরেজিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যুগপ্রয়োজনে পাঠ্যক্রমে সম্ভাব্য পরিবর্তনকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন এই বিদ্যামন্দিরে আচার্য-সমীপে বসবাস করে বিদ্যার্থীরা প্রাচীন ভারতীয় 'গুরুকুল' প্রথায় প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

শুভ সূচনা ঃ এর প্রায় চার দশক পরে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৩৯ সালের ২৩ মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সভা (Governing Body) স্বামীজীর স্বপ্ন সাকার করতে বেলুড় মঠ-সংলগ্ন জমিতেই **'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির'** নামে একটি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। স্বামীজীর শিষ্যা মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বপ্রথম আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৪০ সালের ৩১ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ। ১৯৪১ সালের ৪ জুলাই, স্বামীজীর মহাসমাধির দিন বিদ্যামন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দজী মহারাজ। ইতিমধ্যে ঐ বছরই 'রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ' নামে একটি নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপন করে তার ওপর বিদ্যামন্দিরের পরিচালন-ভার অর্পণ করেন মিশন কর্তৃপক্ষ। সারদাপীঠের প্রথম সম্পাদক হিসাবে স্বামী বিমুক্তানন্দজী এবং বিদ্যামন্দিরের প্রথম

অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী তেজসানন্দজী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মাত্র ২৩ জন ছাত্র নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ইন্টারমিডিয়েট আর্টস কলেজ হিসাবে শুরু হয় বিদ্যামন্দিরের অভিযাত্রা।

শুরুতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সঙ্কেত আচ্ছন্ন করে বিদ্যামন্দিরের যাত্রাপথ। নিদারুণ অর্থসঙ্কট ও যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্য দিয়ে কুশলী নাবিকের মতো বিদ্যামন্দিরের তরিখানি বেয়ে নিয়ে চলেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী এবং স্বামী তেজসানন্দজী। স্বাধীনতার পরে আসে দেশবিভাগ-জনিত উদ্বাস্তু সমস্যার ঢেউ। এসব সত্ত্বেও প্রথম শিক্ষাবর্ষ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাতালিকায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা সাফল্যের নিদর্শন রাখতে শুরু করে। ছাত্রাবাসে স্থানসঙ্কুলান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যামন্দিরের সূচনা হয় একটিমাত্র ছাত্রাবাস ('ইস্ট হস্টেল', বর্তমানে 'শ্রীভবন') এবং একতলা কলেজ-ভবন নিয়ে। তাই ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে একে একে গড়ে ওঠে 'ওয়েস্ট হস্টেল' বা 'বিদ্যাভবন' (১৯৪৫ সালে), 'সাউথ হস্টেল' বা 'বিনয় ভবন' (১৯৬২ সালে) এবং 'বিবেক ভবন' (১৯৬৫ সালে)। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ শিক্ষাবর্ষে যথাক্রমে ইন্টারমিডিয়েট কমার্স ও আই. এস. সি. কোর্স চালু হয়। ১৯৬০ সালে ইন্টারমিডিয়েট শাখা বন্ধ করে চালু হয় কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক স্তরের শিক্ষাক্রম। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে সাময়িকভাবে যথাক্রমে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে পাশ কোর্স এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি আর্টস কোর্স পড়ানো শুরু হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে চালু হয় কলা ও বিজ্ঞান শাখা-সহ উচ্চমাধ্যমিক (+২) শিক্ষাক্রম। ১৯৯৪ সালে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম চালু হয় দুটি বিভাগে। বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিকে কলা ও বিজ্ঞান শাখা-সহ স্নাতক স্তরে বাঙলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগগুলিতে সাম্মানিক (Honours) এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি—এই দুটি বিভাগে মেজর (Major) নিয়ে সর্বমোট ১২টি বিভাগে প্রায় ৫৫০ জন ছাত্র এই পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠানে জীবন গড়ার শিক্ষালাভ করে। এখানকার ছাত্রদের অধিকাংশই আসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। বর্তমানে ৪৫ জন স্থায়ী ও কয়েকজন সাম্মানিক এবং আংশিক সময়ের অধ্যাপক বিদ্যামন্দিরের বিভিন্ন বিভাগে পাঠদান করেন। প্রায় ৫০ জন শিক্ষাকর্মী আছেন।

সার্বিক পরিকাঠামো : শিক্ষাগত সাফল্যের দিক থেকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা বরাবরই অগ্রবর্তী। এর জন্য ছাত্রদের মেধা ও অধ্যবসায়ের পাশাপাশি শিক্ষার সুন্দর পরিকাঠামো, রাজনৈতিক কোলাহলমুক্ত নিয়মানুবর্তিতা, শান্ত আশ্রমিক পরিবেশ এবং নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাপকদের কঠোর পরিশ্রমের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাসংক্রান্ত পরি-কাঠামোর এক অনন্য সম্পদ হলো এর গ্রন্থাগারটি। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে স্থাপিত 'বিরজানন্দ বিজ্ঞান ভবন' এবং 'বিশুদ্ধানন্দ বিজ্ঞান ভবন'-এ রয়েছে যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের দুটি সমৃদ্ধ গবেষণাগার। এছাড়া ১৯৮৯ সালে চালু হয় একটি কম্পিউটার ইউনিট। ১৯৯১ সালের ৪ জুলাই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সূচনাপর্বে একটি নতুন ছাত্রাবাস—'শ্রদ্ধাভবন'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ১৯৯৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন হয় বিদ্যামন্দিরের নিজস্ব অডিটোরিয়াম—'বিবেকানন্দ সভাগৃহ'-এর। ছাত্রদের বহুমুখী জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্ত করতে নিয়মিতভাবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, দ্বিবার্ষিক শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, সাপ্তাহিক সেমিনার এবং বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় বিদ্যামন্দিরে। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে ছাত্রদের কম্পিউটার-সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় শুরু হয়েছে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ইউনিট।

স্বামীজী এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন, যাতে বিদ্যার্থীর হৃদয়, হস্ত এবং মস্তিষ্কের সুসমন্বিত বিকাশ ঘটে। বিদ্যামন্দিরেও ছাত্ররা প্রথাগত পাঠ্যসূচীভিত্তিক লেখাপড়ায় ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বহুমুখী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ পায়। ছাত্রদের মজবুত শরীর গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে জিমনাসিয়াম—'বিকাশ ভবন'-এর উদ্বোধন হয়, পরে অবশ্য তা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া বিদ্যামন্দিরের নিজস্ব মাঠে নিয়মিত ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলা এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয়। ২০০০ সাল থেকে বিদ্যামন্দিরের মাঠে জেলাস্তরের আন্তঃকলেজ ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাবছর ধরে আয়োজিত হয় বর্ষবরণ ও রবীন্দ্রজন্মোৎসব, শারদোৎসব, ভ্রাতৃবরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান। ১৯৪৯ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছর 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা' প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই পত্রিকায় এবং প্রায় ১৫টি হাতে লেখা দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন রাখে। ১৯৫৯ এবং ১৯৭০ সালে বিদ্যামন্দিরে যথাক্রমে এন. সি. সি. এবং এন. এস. এস. কার্যক্রম চালু হয়। এই দুটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা একদিকে যেমন শৃঙ্খলাপরায়ণতার শিক্ষা পায়, অন্যদিকে তেমনি তারা জাতীয়তাবোধ এবং সমাজচেতনার পাঠ লাভ করে। এন. এস. এস.-এর স্বেচ্ছাসেবী ছাত্ররা নিয়মিতভাবে স্থানীয় দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পাঠ দান করে এবং প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় স্থানীয় দুঃস্থ মানুষদের কিছু নতুন জামাকাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শুধু তাই নয়, যখনি ডাক পড়ে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশবিভাগের পর বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু-শিবির পরিচালনা থেকে ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যাত্রাণ অথবা উৎসবাদিতে বেলুড় মঠে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বপালন—সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

বিদ্যামন্দিরের এই 'জীবনে জীবনযোগ'-এর শিক্ষার মশালটি সমাজের বৃহত্তর বৃত্তে নিয়ে যেতে ১৯৮৬ সালে তৈরি হয়েছে 'বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ'। এই সংগঠনটি

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে প্রাক্তনীদের সংযোগসাধনের পাশাপাশি পরিচালনা করছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। এছাড়া প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের এক-একটি জেলায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস' পরিচালনায় বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে প্রাক্তনী সংসদ যৌথভাবে অংশ নিচ্ছে। ১৯৯৮ সালে প্রাক্তনী সংসদ স্বামী তেজসানন্দজীর একটি মূল্যবান রচনা-সঙ্কলনও প্রকাশ করেছে। বর্তমানে এই প্রাক্তনী সংসদের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৯০০।

বিদ্যামন্দির অনন্য ঃ স্বামীজীর মতে, মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশসাধনই হলো শিক্ষা। বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা সেই আত্মশক্তি বিকাশের পাঠ গ্রহণ করে প্রাত্যহিক প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনায়। ছাত্ররা ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের শিক্ষা লাভ করে নিয়মিত 'আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার' ক্লাসে। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে এই সচেতনতা জাগ্রত করতে প্রতিবছর একটি দিবসব্যাপী আলোচনাচক্রও আয়োজিত হয়।

বিদ্যামন্দিরের জীবনের সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দিকটি হলো, একদিকে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং অন্যদিকে অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের এক ব্যতিক্রমী নিবিড় 'পারিবারিক' সম্পর্ক। এর ভিত গড়ে উঠেছিল সেই প্রথম যুগে স্বামী তেজসানন্দজীর নেতৃত্বে কয়েকজন প্রেমিক সাধু এবং কৃতী অধ্যাপকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। এই ধারারই সূত্র ধরে ১৯৯৯ সালে দুঃস্থ-মেধাবী ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য নিজেদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের একটি অংশ দিয়ে অধ্যাপকেরা গড়ে তুলেছেন একটি ফাণ্ড। তাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছেন আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি।

এখানে নবীনরা 'বিদ্যার্থী ব্রত ও ভ্রাতৃবরণ' উৎসবের মধ্য দিয়ে এক নতুন জীবনে প্রবেশের অঙ্গীকার নেয় আর প্রবীণদের দ্বারা বৃত হয় 'বিদ্যামন্দির পরিবার'-এ। তাই বাড়ি ছেড়ে সশঙ্কচিত্ত কোন কিশোর যে বিদ্যামন্দির-প্রাঙ্গণে পা রাখে, পাঠশেষে বিদায়বেলায় সেই বিদ্যামন্দিরের স্মৃতিই হয়ে ওঠে তার জীবনের মহার্ঘ সম্পদ, চলার পথের আলোকবর্তিকা।

বিদ্যামন্দিরের আরেক ঐশ্বর্য হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের 'গোমুখ'—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়—বেলুড় মঠের সান্নিধ্য। বিদ্যামন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের দিন শ্যামলাতাল আশ্রম থেকে তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন ঃ "নবারব্ধ বিদ্যামন্দিরের উজ্জ্বল সাফল্যের পথে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কৃপা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আমারও প্রার্থনা রহিল।" সেই জন্মলগ্ন থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সঙ্ঘাচার্যগণ এবং অন্যান্য দিক্‌পাল সন্ন্যাসীদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা এবং সস্নেহ অভিভাবকত্বে বিদ্যামন্দিরের চলার পথ হয়েছে সুগম। বিশেষত, পরিচালন পর্ষদের সভাপতিরূপে স্বামী নির্বেদানন্দজী, স্বামী আত্মবোধানন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, স্বামী সন্তোষানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী নির্জরানন্দজী প্রমুখ বিশিষ্ট সন্ন্যাসিবৃন্দ বিদ্যামন্দিরের গৈরিক আদর্শের দীপশিখাটিকে অম্লান রেখেছেন। তাই বিদ্যামন্দির একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়, এক ব্যতিক্রমী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত।

হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপন ঃ ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উপস্থিতির ছয় দশক পূর্ণ করল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির। তাই নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো তার হীরকজয়ন্তী। হীরকজয়ন্তী উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২০০১ সালের ৪ জুলাই—বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবসে। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক এবং বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ এবং বিদ্যামন্দিরের প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনী ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ২২ জানুয়ারি ২০০২ হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিনই 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা'র বিশেষ হীরকজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে বিদ্যামন্দিরে দুটি জাতীয় স্তরের সেমিনার আয়োজিত হয়। ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০০২ অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনারটির আলোচ্য বিষয় ছিল 'হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অফ কোয়াণ্টাম থিয়োরি'। অন্যদিকে 'টুয়ার্ডস আ ডেফিনেশন অফ ইণ্ডিয়াননেস ঃ ক্রশ ডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভস' বিষয়ক কলা বিভাগের সেমিনারটি আয়োজিত হয় ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২। দুটি সেমিনারেই বহু বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ্ বক্তব্য রাখেন। কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এতে যোগ দেন।

৪ জুলাই ২০০২ হীরকজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহ্। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান এপিক কালচার সেণ্টার'-এর পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে 'বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার—২০০২' তুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ঐ সংস্থার কুশীলবরা বিদ্যামন্দিরের 'বিবেকানন্দ সভাগৃহ'-এ স্বামী বিবেকানন্দের ওপর একটি যোগনাটিকা উপস্থাপন করেন। এদিন বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের হীরকজয়ন্তী স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

ভবিষ্যভাবনা ঃ বিদ্যামন্দিরের রজতজয়ন্তীর প্রাক্কালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে প্রথম সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজী বিদ্যামন্দিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরণ প্রসঙ্গে আশা প্রকাশ করে লিখেছিলেন ঃ "নদী সাগরে যাইয়া মিলিত হইবে।" ("The river will mingle with the sea.") কিন্তু এই হীরকজয়ন্তীর পর্ব-শেষেও তা সম্ভব হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের কাঙ্ক্ষিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে গতানুগতিক ধাঁচের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই তিনি চাননি। স্বামীজী বেলুড় মঠকে এক 'মহাসমন্বয়ক্ষেত্র' করে তুলতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, এই মঠেই গড়ে উঠবে অন্নদান, বিদ্যাদান ও সর্বোপরি জ্ঞানদানের কেন্দ্র এবং এখান থেকে অনন্ত নব নব ভাবরাশি জগৎকে প্লাবিত করবে। ১৯০২ সালের ২ জুলাই, মহাসমাধির দুদিন আগে স্বামীজী বলেছিলেন : "এই বেলুড় মঠে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড়হাজার বছর ধরে চলবে—তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে করো না, এটা আমার কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর এই অমোঘ বাণীর সার্থক রূপায়ণের পথে বিদ্যামন্দিরের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক—এই প্রার্থনা। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ তাঁর জীবনী আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ যিশুখ্রিস্টের জীবনী এবং 'বাইবেল' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। ৩০ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়। সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী ও বাণী পাঠ করেন স্বামী জপপ্রিয়ানন্দজী।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সকালে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী। পরিবেশিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের কালীকীর্তন এবং অভিনীত হয় সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপালা 'শ্রীকৃষ্ণ নিমাই'। এছাড়া ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন চন্দন রায় এবং তপন সিনহা ও সহশিল্পিবৃন্দ। উৎসবের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র ইন্টারনেট-এ দেওয়া হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে ভোর ৪টা ৩০ থেকে রাত্রি ৯টা ৩০ পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) : গত ২৪ জুলাই ২০০২ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরে ২৮ জুলাই একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বক্তৃতাসভায় বহু ভক্ত, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বিহার) : গত ১৬ অক্টোবর ২০০২ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সমবেত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিদ্যালঙ্কা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ২৭ অক্টোবর ২০০২ ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি 'কিশোরী স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ শিবির'-এর আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'আজকের পৃথিবীতে কিশোরী স্বাস্থ্যের গুরুত্ব', 'কিশোরী বয়সের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন'। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডাঃ শিপ্রা রায়চৌধুরী। স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন ডাঃ অচলা দত্ত, ডাঃ স্বাগতা সোম, ডাঃ তারকনাথ তরফদার প্রমুখ। রক্তাল্পতা ও কৃমির জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছাত্রীদের 'সবার স্বামীজী', 'বয়ঃসন্ধি' এবং চিকিৎসকদের 'বন্ধু বিবেকানন্দ' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা) : গত ২৮ অক্টোবর ২০০২ নিবেদিতার ১৩৬তম জন্মদিন পালিত হয়। এই দিনের তাৎপর্য আলোচনা করেন মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, গৌতম দাস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রণব রায়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা) : গত ২৮ অক্টোবর ২০০২ নিবেদিতা উদ্যানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা, স্থানীয় পুরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করা হয়। 'রামকৃষ্ণ শরণম্' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা) : গত ৪ নভেম্বর ২০০২ কালীপূজার রাত্রে ঠাকুরের 'বরাভয় লীলা' উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃতের গান' পরিবেশন করেন বেহালার সুরপীঠ গোষ্ঠী। বিশেষ পূজা করেন স্বামী হরনাথানন্দজী। পূজাশেষে উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চালন্তি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বালেশ্বর, ওড়িশা) : গত ৯ ও ১০ নভেম্বর ২০০২ ওড়িশা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে স্বামী উরুক্রমানন্দজী, স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী, স্বামী নিগমাত্মানন্দজী ও স্বামী দীনেশানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে ১০টি আশ্রমের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মোহনপুর বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ১০ নভেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনাসভা,

প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বলভদ্রানন্দজী 'স্বামী বিবেকানন্দকে আজ আমাদের কেন প্রয়োজন?' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে স্বদেশ ও মানুষ' বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপক সুকৃৎ নাগ। সম্মেলনে ১৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সেবাব্রত

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর): গত ৮ অক্টোবর ২০০২ শারদীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে ৭১ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র এবং ২ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রকে স্বামীজীর বই ও ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়।

মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ১৩ অক্টোবর ২০০২ দুর্গাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ৮৪ জন দরিদ্র নরনারীকে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। উপস্থিত ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাগরপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (মুর্শিদাবাদ): গত ১৪ অক্টোবর ২০০২ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ২৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ৩ নভেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বামী শ্যামলানন্দজী এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। ১১৭ জন রক্তদান করেন। এদের মধ্যে ২০ জন মহিলাও ছিলেন।

গোবরডাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ৩ নভেম্বর ২০০২ কালীপূজা উপলক্ষ্যে ২৫০ জন দুঃস্থ আদিবাসী শিশুর মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দজী, অধ্যাপক নীরেন্দ্রলাল গুহ, পৌরপিতা বাসুদেব চ্যাটার্জি ও সমাজসেবী অঞ্জনকুমার ভট্টাচার্য। আদিবাসীনৃত্য, বাউলগান ও ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা): গত ৩ নভেম্বর ২০০২ ডাঃ প্রকাশ মল্লিক জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের নানা বিষয়ে সুপরামর্শ দান করেন। ঐদিন প্রায় ৫০ জন রোগী উপস্থিত ছিলেন।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান): গত ১৩ নভেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, এলাহাবাদ-নিবাসী দিলীপকুমার মুখার্জি গত ১৮ জুন ২০০২ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)-নিবাসী বেলারানী ঘোষ গত ২৩ জুন ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বাঁকুড়া-নিবাসী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় গত ৮ জুলাই ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ছিলেন গুরুগতপ্রাণা।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ধর্মনগর (ত্রিপুরা)-নিবাসী সতীন্দ্রকুমার সেন গত ১৬ জুলাই ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও কৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, করিমগঞ্জ (অসম)-নিবাসী শৈলেন্দ্রশেখর দত্ত গত ২০ জুলাই ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন। শিলচর, করিমগঞ্জ আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, করিমগঞ্জ (অসম)-নিবাসী সীমন্তিনী দে গত ৭ আগস্ট ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। তিনি নিয়মিত 'উদ্বোধন' পাঠ করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, মধ্যমগ্রাম বসুনগর (কলকাতা)-নিবাসী অনুশ্রী ঘোষ গত ১০ আগস্ট ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

১৪০৯ বঙ্গাব্দের পৌষ (ডিসেম্বর ২০০২) মাসে একদিকে শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম আবির্ভাব উৎসব, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (জুলাই ১৯০২) পর শততম বর্ষ অতিক্রান্ত। ভারতবর্ষের শেষ শিলাখণ্ডে দেবী পার্বতী একপায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য। অন্যদিকে শ্রীশ্রীমায়ের অমানুষী তপস্যার কথাও আমরা জানি। ঐ শিলাখণ্ডে দেবী পার্বতীর পদচিহ্ন দর্শন মানসে স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে সেখানে পৌঁছে তিনদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ঐ সময়েই তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিল, ভারতবর্ষের উত্থানের উপায় হলো যথার্থ শিক্ষা। এবং সেই শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। স্বামীজী সেখানে আরো অনুভব করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠবে। সেই শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম ধারা হলো আঞ্চলিক ভাষায় 'পত্রিকা' প্রকাশ যা মানুষকে অনবরত জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাই আজ 'উদ্বোধন' জাতির জেগে ওঠার হাতিয়ার। প্রচ্ছদপটে শ্রীশ্রীমায়ের ও দেবীর পদচিহ্ন মুদ্রিত। কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে নির্মিত বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের পশ্চাতে সূর্যোদয়ের দৃশ্য। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: ব্রহ্মচারী অনুরাগচৈতন্য

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে
উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও ক্যাসেট

শ্রীরামের অনুধ্যান
স্বামী গীতানন্দ • মূল্য : ৭০
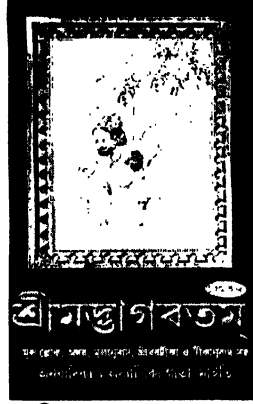
শ্রীমদ্ভাগবতম্ (প্রথম স্কন্দ)
অনুবাদিকা : গীতা মাইতি • মূল্য : ১৫০
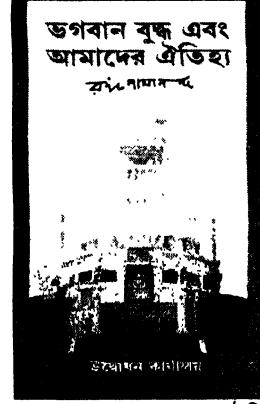
ভগবান বুদ্ধ এবং আমাদের ঐতিহ্য
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ • মূল্য : ১০.০০
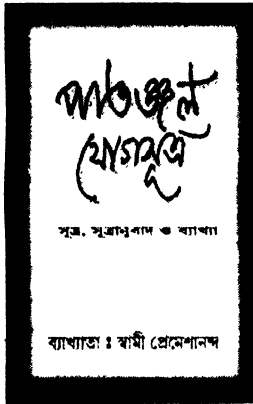
পাতঞ্জল যোগসূত্র
ব্যাখ্যাতা : স্বামী প্রেমেশানন্দ • মূল্য : ১৫
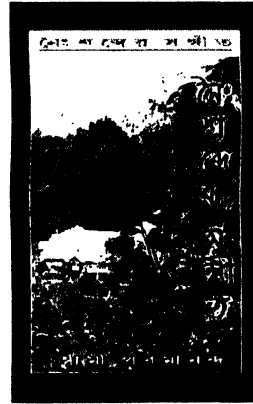
নৈঃশব্দের সঙ্গীত
স্বামী পরমানন্দ • মূল্য : ১০
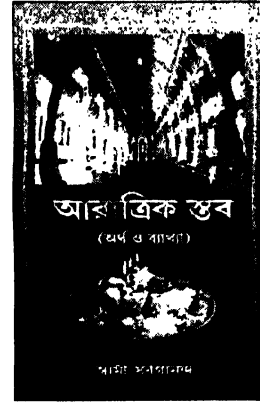
আরাত্রিক স্তব (অর্থ ও ব্যাখ্যা)
স্বামী সর্বগানন্দ • মূল্য : ১০

ক্যাসেট

ও দুটি চরণ সার [UD-021]
স্বামী সর্বগানন্দ • মূল্য : ৩৫

SIDE A : ও দুটি চরণ সার
ধরা দিতে এসে
মাকে দেখব বলে ভাবনা
ব্রহ্মময়ী মা সারদা

SIDE B : যতনে হৃদয়ে রেখো
হৃদি বৃন্দাবনে আমারি কারণে
জয় সারদা জগজ্জননী

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী সর্বগানন্দের অন্যান্য ক্যাসেট

UD-006	দিব্য গীতি (হিন্দি ভজন)	মূল্য : ৩৫
UD-014	স্তবমালা—১	,,
UD-015	স্তবমালা—২	,,
UD-016	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্	,,
UD-019	চিদানন্দ সিন্দুনীরে	,,

ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হলে সরাসরি "ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩"—এই ঠিকানায় লিখুন।

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দুর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**
  কাঁকুড়গাছি, ফোন : ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
  হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন : ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন : ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ** ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন : ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
  ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন : ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স**
  ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক** ❑ সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র** ❑ চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ২৪৬৭-১১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স**, ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল**
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫
  ফোন : ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
  ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন'**, জীবনকুমার ভট্টাচার্য
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী** ❑ স্বত্বাধিকারিণী : সুচিত্রা চ্যাটার্জি
  ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫
  ফোন : ২৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট
  কলকাতা-৫, ফোন : ২৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড
  কলকাতা-৫০, ফোন : ২৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা**
  ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন : ২২১৮-১২৮৫
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**
  প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড
  ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮
  ফোন : ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, ২নং এয়ারপোর্ট গেট
  পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন : ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন : ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক)
  ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১
  ফোন : ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভুপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন : ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
  সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫
  ফোন : ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস**
  ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া
  কলকাতা-৮১, ফোন : ২৫১২-৫৭৪৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর**
  প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা
  কলকাতা-৪৯, ফোন : ২৫৪১-০১২২

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ
পশ্চিমবঙ্গ

ফোন ঃ (০৩৫১২) ২৫২৪৭৯/২৫২৮৫০

সুধী,

১৯১৪ সালে জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর সম্মতিক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ মালদায় শুভপদার্পণ করেন। তাঁরই প্রেরণায় এই অঞ্চলে এক মহৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, যার ফলস্বরূপ ১৯২৪ সালে **রামকৃষ্ণ মঠ, মালদহ** আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী কালে মঠের সঙ্গে 'মিশন' যুক্ত হয়ে বিগত ৭৮ বছর ধরে এতদঞ্চলে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য নানা জনসেবামূলক কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলেছে।

প্রসঙ্গত সানন্দে জানাই, এই আশ্রম-পরিচালিত রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের দুজন ছাত্র ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে শিক্ষাজগতে এই আশ্রমের তথা রামকৃষ্ণ মিশনের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু এই আশ্রমস্থ প্রাচীন বাড়িগুলি বিগত কয়েক বছরের বন্যায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। সমস্ত বাড়ির ছাদের অবস্থা ততোধিক করুণ এবং জল পড়ে। এমতাবস্থায় উক্ত বাড়িগুলির আশু সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অর্থাভাবে সংস্কার করা যাচ্ছে না। এই সংস্কারকাজ সম্পাদন করতে এবং আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আমাদের আনুমানিক প্রয়োজন ঃ **২½ (আড়াই) কোটি টাকা।**

এই কাজে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাই। অনুগ্রহ করে যেকোন দান নগদ, মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌-এ **"RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, MALDA"**—এই নামে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি।

আপনার আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত।

সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্তভাবে প্রার্থনা করি। ইতি

বিনীত

স্বামী দিব্যানন্দ, সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ-৭৩২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম

রেজিঃ অফিস—বাগআঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া

যোগাযোগ-কেন্দ্র ঃ

সুধাময় বসু ❑ ৫৭ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন ঃ ২২৪১-৬২৮৬

ভোলানাথ ঘোষ ❑ ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬, ফোন ঃ ২৩৬০-১২৬৬

(রাত্রি ১০টার পর, সকাল ৯টার মধ্যে)

পীযূষকান্তি রায় ❑ ফোন ঃ ২৫৭৬-১১১৬

আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও কলকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানে **বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম** ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত এবং রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড় মঠ) উপদিষ্ট মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের পর্যবেক্ষণভুক্ত একটি জনসেবামূলক ধর্মীয় সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য হইয়া আসিতেছে। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবক শিক্ষণমন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রামসেবা সংস্থা বেলুড় ও বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সহযোগিতায় ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করিয়া তুলিবার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। প্রায় বৎসরখানেক কেন্দ্রটি সাফল্যের সহিত চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া দুই শতাধিক বৎসরের জরাজীর্ণ দুর্গামণ্ডপটিকে **শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে** রূপদানের কাজ কতিপয় সহৃদয় ভক্তদের প্রায় দুই লক্ষ টাকা দানে সমাপ্তির মুখে। শুধুমাত্র মেঝে ও দেওয়ালে রঙের কাজ বাকি আছে। সাধুনিবাস, অফিসঘর ও ভক্তদের বিশ্রামকক্ষ-সহ ১৪০০ বর্গফুটের একটি দুইতলা '**মাধবানন্দ-দয়ানন্দ ভবন**'-এর প্লিন্থ (plinth) অবধি নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে। আর্থিক অভাবে ঐ কাজগুলি বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী হাতে নেওয়া ও পরিকল্পিত কাজের রূপায়ণে আমাদের প্রয়োজন ৩০ লক্ষ টাকা।

	কাজ	আনুমানিক ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
১)	নাটমন্দির-সহ ঠাকুরের গর্ভমন্দিরের মেঝে এবং রঙের কাজ	২ লক্ষ টাকা	আরব্ধ কাজ অর্থাভাবে বন্ধ।
২)	'মাধবানন্দ-দয়ানন্দ ভবন' (দুইতলা) নির্মাণ	১০ লক্ষ টাকা	'প্লিন্থ' অবধি কাজ হইয়াছে।
৩)	পূজ্যপাদ মহারাজদের জন্মভিটা সংরক্ষণ	২ লক্ষ টাকা	(পরিকল্পিত)
৪)	ঠাকুরসেবা ও আশ্রম পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গঠন	১০ লক্ষ টাকা	(পরিকল্পিত)
৫)	সীমানা প্রাচীন নির্মাণ	৪ লক্ষ টাকা	(পরিকল্পিত)
৬)	প্রশিক্ষণকেন্দ্র পুনঃপ্রবর্তন ও স্থায়িভাবে পরিচালনা	২ লক্ষ টাকা	পুনঃপ্রবর্তনের কথা চলিতেছে।
		৩০ লক্ষ টাকা	

এই মহৎ উদ্দেশ্য রূপায়ণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য বিনম্র আবেদন জানাই। ২৫ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্বে দাতাদের ক্ষেত্রে স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দানের অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফট্ "**বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**"-এর অনুকূলে এবং **আশ্রম সভাপতি, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা**-৭০০ ০০৬—এই ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত

ভোলানাথ ঘোষ, সভাপতি

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম

দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ
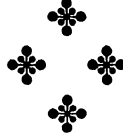
ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী
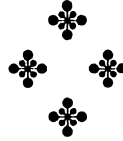
বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা
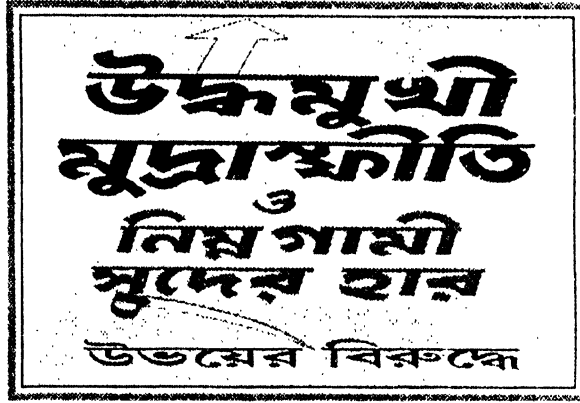
পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্রাঞ্চে ভাঙ্গানো যায়

মেয়াদ	সুনিশ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি	জমারাশি
২½ বৎসর	• ১ম বৎসর - ৮.৫% • ২য় বৎসর - ৯.৫% • ২য় বৎসরের পর - ১০.৫%	ন্যূনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো উর্দ্ধরাশি

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্য্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

* *শর্তসাপেক্ষে*

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্তী যেকোনো পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন

পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ

★

আস্থার প্রতীক

Estd 1932

Website-http

গত আর্থিক বৎসরে
নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০ লক্ষ

This is further to the statutory advertisement published in THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 2554-2248, 2554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.net
udbodhan@vsnl.com

Vol. 105
No. 1
JANUARY
2003

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003

ISSN 0971-4316
R N 8793/57
Postal Regn. No.
MM&PO/WB/RNP-15/2003

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০্ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়। প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'** এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❏ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।
❏ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

উদ্বোধন ॥১০৫॥
১০৫তম বর্ষ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৪০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই।... প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।... তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হলো। ... ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ হন।

* * *

তিনি আর নাম তফাত নয়।... তাই তাঁর নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়; আর যেসব জিনিস দুদিনের জন্য—যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায় প্রার্থনা কর।

* * *

তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপপাখি; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণকীর্তনে চলে যায়।

* * *

কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায় অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণকীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহদর্শন। মন অর্থাৎ তাঁর ধ্যান-চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ-মনন করা। বাক্য অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নামগুণকীর্তন—এইসব করা।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

"ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।"

ইহাই শ্রীভগবানের স্বমুখের মহান আশ্বাসবাণী। তাঁহার সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের রণভূমি। অর্জুন তাঁহার বাণী শুনিয়া বিমোহিত হইয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ "হে কৌন্তেয়, প্রতিজ্ঞা কর অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে জান আমার ভক্তের বিনাশ নাই।" যে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিরসে নিজেকে সিক্ত করিয়াছে, সে তো অমৃতস্বরূপ হইয়াছে! শ্রীশ্রীমা একদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ঃ "বিধির সাধ্য নাই আমার সন্তানকে রসাতলে দেয়।" কখনো কখনো কাহারো মনে হইতে পারে —'আমার আর আশা নাই।' তাহাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান বলিলেন ঃ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এক-পা অগ্রসর হইলে ঈশ্বর দশ-পা নিকটে চলিয়া আসেন। 'স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য'—এই ধর্মের অল্প পালনেই 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—মহাভয় হইতে মানুষ ত্রাণলাভ করে। মহাভয় আর কিছুই নহে, উহা মৃত্যুভয়। এই মৃত্যুই তো মানুষকে সর্বদা শাসন করিতেছে। যতই ভাবি না কেন, আমরা 'আমি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অচ্ছেদ্য', তবু যখন সত্যই মৃত্যু আসিয়া দুয়ারে করাঘাত করে, তখন সব তত্ত্বকথা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়! তখন 'আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি। কখনো কখনো 'আমায় বাঁচাও' উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পাইয়া যায়! সেই মহৎ-ভয় হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কি উপায়, তাহাই শ্রীভগবান সহজ করিয়া বলিয়া গেলেন— "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।"

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ময় সচ্চিদানন্দ আত্মবস্তুই মানুষকে সর্বনাশের পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— মানুষ নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ভ্রমণ করে, কখনোই মিথ্যা হইতে সত্যে নহে। যতই পাণ্ডিত্যের বিকাশ মানুষের মধ্যে হউক না কেন, যতই তাহার মন দুর্বলতাগ্রস্ত হউক না কেন, 'মানুষ' হইয়া সে জন্মলাভ করিয়াছে—ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে ঈশ্বর-বিধানেই তাহার একটি 'সার্টিফিকেট' লাভ হইয়া থাকে। ঐ 'সার্টিফিকেট'-এ বলা হইয়াছে—সে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর-চিন্তা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে, কিংবা ইচ্ছা করিলে সে নিজের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে সে প্রকৃতির অধীন হইয়াও প্রকৃতির সীমানা অতিক্রম করিয়া মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক মহান রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। পুরুষ কি নারী—কিছুতেই তাহার এই মূল গুণগত চরিত্রের ব্যত্যয় হয় না। যে সেই 'সার্টিফিকেট'-এর কথা শোনে নাই, কিংবা শুনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছে, গুরুত্ব দেয় নাই—তাহার মধ্যে রজো-তমোগুণের আধিক্যহেতু সংসারযাতনা তীব্রতর হইয়া উঠে ঠিকই, কিন্তু তাহার স্বরূপ তো আর পরিবর্তিত হইতে পারে না! সে যে স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।

"ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে?"—শ্রীরামকৃষ্ণ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন। সংসারভারে নিপীড়িত মানুষের বাঁচার উপাদান ভক্তি বিনা আর কী হইতে পারে? আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি কর্মজ সুখ মানুষকে কিছুদিন পর্যন্ত প্রলোভিত করিলেও এক বিশেষ মুহূর্তে মানুষের মনে এই সবের অসারতা স্বতই উদ্ঘাটিত হয়। তখন চলার পথের পাথেয়স্বরূপ মানুষের সামনে ভক্তির ডালি লইয়া স্বয়ং ঈশ্বরাবতার উপস্থিত হন। তাঁহার তো নিজের স্বার্থ বলিয়া কিছু নাই। তিনি সংসারতাপদগ্ধ মানুষের জন্য সদা রোরুদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পঞ্চবটীমূলে গড়াগড়ি দিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন ঃ "মা আমায় এখনো দেখা দিলিনি, আমি কি অপরাধে অপরাধী যে তোর দর্শনে বঞ্চিত থাকব?" ইত্যাদি, তাহা কি নিজের জন্য? নিজের জন্য তিনি ক্রন্দন করেন নাই। তাঁহার এই ক্রন্দন, এই পরম ব্যাকুলতা কেবলমাত্র সংসারতাপ-সন্দগ্ধ ভক্ত-মানসে কিঞ্চিৎ চৈতন্য ও ভক্তির প্রলেপ লাগাইবার জন্য। তাঁহার জীবনের তীব্রতম দুঃসহ যন্ত্রণাময় সাধনা কেবল অপরের জন্য বৈ তো নয়! 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে শ্রীম লিখিয়াছেন ঃ "ঠাকুর মার কাছে করুণ গদগদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কী আশ্চর্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—'মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর! সব ত্যাগ করিও না মা! আচ্ছা, শেষে যা হয় কর! মা, সংসারে যদি রাখ তো এক-একবার দেখা দিও! না হলে কেমন করে থাকবে?' "

সত্যই তো নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর, ত্রিগুণাতীত শুদ্ধচৈতন্য সত্তার নরশরীর ধারণের কোন কার্যকারণ

সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। 'করুণা'ই একমাত্র উপাদান যাহার সাহায্যে জগৎপিতা রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন। যাহাকে ভাগবতাদি গ্রন্থে 'যোগমায়া' বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহাকেই সিদ্ধ কবি বলিয়াছেন 'করুণাবায়ু'! কবি গাহিলেন—"অরূপসায়রে লীলা লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়/ আদি অন্তহীন অখণ্ডে বিলীন মায়ায় ধরিলে মানবকায়।" জগতে আসিয়া ভক্তের চলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন তিনি। বলিয়াছেন: "আমি ভাবে বলেছি—মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।" ভক্তের আন্তরিকতাই তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত করাইবে। আন্তরিকতা না থাকিলেও ভক্তাধীন ঈশ্বর জোর করিয়া ভক্তকে নিকটে ডাকিয়া লন। "মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন—'মহিন্দর! মহিন্দর!' মাস্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি)—বোস না, একটু শোন। কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।" পরমকারুণিক প্রভুর কৃপা কিভাবে ভক্তের উপর বর্ষিত হয় তাহা দুর্বোধ্যই বটে!

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বিভিন্ন স্থানে আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন। যখন তিনি অপ্রকট হইলেন তখন তাঁহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। মুখে 'পারবোনি' 'পারবোনি' বলিলেও তাঁহার অন্তরের আগ্রাসী মাতৃত্ব তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিবে কেন? "সন্তানের ধুলোকাদা ঝেড়ে আমাকেই তো কাছে টেনে নিতে হবে।" শ্রীশ্রীমায়ের আরেকটি অসাধারণ উক্তি—"আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা। আর কেউ না থাক জানবে তোমার একজন মা আছে।" দুর্বলতা মানুষের সহজাত। ঈশ্বর মনুষ্যসৃষ্টির আদিতেই ষড়্‌রিপু নামক দুর্বলতা দিয়াছেন। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী সকলের মনে কোন না কোন সময়ে দুর্বলতা আসিতে পারে। ইষ্টচরণে শরণাগতিই তখন শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীশ্রীমায়ের জনৈক সন্ন্যাসী সন্তান স্মৃতিচারণ করিয়াছেন—

> "একদিন উদ্বোধনে চন্দন ঘষছি, মা উত্তরদিকের দরজার ধারে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মুখ করে মালাজপ করতে বসছেন। কেউ নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: 'মা, মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়ে পড়ে কেন?' তিনি শুনেই মালা রেখে বললেন: 'ওদিকে নজর দিও না, কার মনে দুর্বলতা না আসে এক ঠাকুর ছাড়া? আজ পর্যন্ত এমন কোন মহাপুরুষ জন্মেছেন কি, যাঁর মনে কখনো কোন দুর্বলতা ওঠেনি? যদি শুধরোবার চেষ্টা থাকে, যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, আমার মনে দুর্বলতা উঠেছে—তাহলে ঐ জিনিসটাই একটা মস্ত শিক্ষা; মহামায়া খুশি হয়ে তখন তাকে পথ ছেড়ে দেন। মানুষ কিছুদিন ভাল থাকলেই মনে করে—আমার সব হয়ে গেছে, আরো উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। কিন্তু বিবেকীর মনেও মাঝে মাঝে দুর্বলতা দিয়ে ঠাকুর স্মরণ করিয়ে দেন যে, এখনো সাধনা শেষ হয়নি, ভূত-প্রেত সব ওত পেতে চারপাশে বসে আছে, সুবিধে পেলেই ঘাড়ে চেপে বসবে। এতে হয় কি—অহঙ্কার নষ্ট হয়। যতদিন বাঁচবে সাবধানে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকবে, অহঙ্কার হলেই ঐসব হিজিবিজি মনে উপস্থিত হবে। শেষপর্যন্ত শরণাগতির ভাব নিয়ে থাকতে হয়। ঠাকুর একবার নিজের শরীরের কামের বেগ ধারণ করে দেখালেন, জীবের অহঙ্কার করবার কিছুই নেই।' "

পরবর্তী সময়ে ঐ সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন: "ভগবানের বিচার নিক্তিধরা, একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু তাঁর দয়ারও আবার শেষ নেই।" তবে সেই দয়া বুঝিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকলকে শাণিত করিবার আবশ্যকতা আছে! অবশ্য তাহাও মা স্বয়ং শিখাইতেছেন—"দেখ, মনটাকে দুভাগ করতে হয়; একটা যেন বিবেকী, আরেকটা যেন অবিবেকী—ছেলেমানুষের মতো। বিবেকী মনটা বাপ-মার মতো সর্বদা অবিবেকী মনটার পিছনে লেগে থাকবে। একটা কিছু আবোল-তাবোল করলেই তাকে শাসন করবে, গালমন্দ করবে; দেখনি, বাপ-মা যেমন দুষ্টুছেলেটাকে বকে-ঝকে। দেখবে, এইরকম কিছুদিন অভ্যাস করলেই মনটা শায়েস্তা হয়ে আসবে। কিন্তু অবিবেকী মনে যদি একটা বিষয়ে বহুদিনের অভ্যাসের ফলে দৃঢ়সংস্কার জন্মে যায়, তাহলে শত তিরস্কারেও সেটা যেতে চায় না। তখন ঐ দুর্বল মনের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, নইলে আর কোন উপায় নেই।"

সংসারে আমাদিগকে তো থাকিতেই হইবে। শত প্রতিকূলতার মধ্যে ভক্তের বিচরণ। তথাপি যথার্থ ভক্ত অকুতোভয়। অন্তরের দিব্য-প্রত্যয়ই তাহার নির্ভীকতার উপাদান। ভক্তের অন্তরে সর্বদা অনুরণিত হইতে থাকে—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।" ❑

সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

সাধকের কোনরূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?

ভেক ধারণ ভাল। গৈরিক পরিধান করিলে [খানিক বৈরাগ্য আসে] ও খোল করতাল লইলে মুখে খেয়াল টপ্পা আইসে[,] না[?]। কালাপেড়ে ধুতি পরে চুল বাঁকিয়ে, ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইলেই নিধুর টপ্পা গাইতে ইচ্ছা হয়।

*

এক-একবার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন?

. বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখতে হয়। সাধন চাই।

*

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট; তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন?

হাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন হরণ করেন।

*

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপে চিকের ভিতরে যাইয়া তাঁহাকে দেখেন।

*

ঈশ্বরকে কিপ্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙামুড়ো রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়, তদ্রূপ ধৈর্যের সহিত সাধন চাই।

*

সকল মনুষ্যই কি ভগবানকে দেখিতে পাইবে?

কোন জীবই একেবারে উপবাসী থাকে না, তবে কিনা কেহ নটার সময়, কেহ দুটার সময়, কেহ-বা সন্ধ্যার সময় আহার করে। সেইরূপ সকলে কোন না কোন সময় ভগবানকে দেখিবে।

*

মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কর্তব্য নহে। রজনীযোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগনমণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে, কিন্তু দিবাভাগে সেই তারকাবৃন্দ দৃষ্ট হইল না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না?

*

লীলা অবলম্বন না করিলে নিত্যবস্তু জানিবার উপায় নাই।

*

কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে। একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ইহার কোন স্থানে আম্রের সার, কোথাও বা লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষসকল যথানিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোথাও বা গোলাপ, বেল, জাতি, চম্পক প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্‌সমূহ সুবাসিত করিতেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণসুখ পরিবর্ধিত করিতেছে, কোথাও বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ জন্তুসকল অবস্থিতি করিতেছে ও স্থানে স্থানে নানাবিধ পুত্তলিকা সংস্থাপিত রহিয়াছে। দর্শক উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে? তাহার কি এমন মনে হইবে যে, এই উদ্যান আপনি হইয়াছে? ইহার কেহ সৃষ্টিকর্তা নাই? তাহা কখন নহে। সেইপ্রকার এই বিশ্বোদ্যানে যেস্থানে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে তাহা বাস্তবিক স্বভাব কর্তৃক নহে, বিশ্বকর্মার স্বহস্তের সৃজিত পদার্থ।

*

এই বিশ্বোদ্যান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা এমনকি যোগী ঋষির পর্যন্ত মনাকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত?

*

ঈশ্বর মন-বুদ্ধির অতীত বস্তু এবং তিনি মন-বুদ্ধিরই গোচর হইয়া থাকেন। যেস্থানে মন-বুদ্ধির অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে তথায় বিষয়াত্মক এবং যেস্থানে উহাদের গোচর কহা যায়, তথায় বিষয়বিরহিত বলিয়া জানিতে হইবে।

*

ঈশ্বর এক। তাঁহার অনন্ত শক্তি।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

আজ হতে উদ্বোধন একশো বছর আগে

ফাল্গুন ১৩০৯
ফেব্রুয়ারি ১৯০৩

বেলুড় মঠে

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

মর্ত্তধামে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাণ্ডার হইতে জ্যোতিঃকণা পড়িয়াছিল, উহা আবার নিজধামে প্রত্যাগত। যখন উহার আবির্ভাব হয়, তখন কেহ জানিতে পারে নাই। বোধ হয়, স্বর্গধামে দেবতারা উৎসব করিয়াছিল; আর আনন্দ করিয়াছিল এক অপূর্ব্ব বালক। যখন বালকশরীরের ভিতর দিয়া সেই অপূর্ব্ব শক্তি একটু উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, তখন ক্ষুদ্রদৃষ্টি বাসনামুগ্ধ জীব ভাবিয়াছিল, এ কোথাকার এক ত্রিপণ্ড্র [ডেঁপো] বালক !... যাহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছে বা যাহাদিগকে তিনি কৃপা করিয়া একটু চিনাইয়াছেন, তাহারাই জানে, কি বস্তুর সঙ্গে আমরা একত্র বাস করিয়াছি। তাঁহার জন্ম অর্থাৎ শরীরধারণে জগতের পরম লাভ হইয়াছে, তাই তাঁহার জন্মোৎসবে সমগ্র জগৎ এত কোমর বাঁধিয়া উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে। বিরহের নবীন অশ্রু আজ ক্ষণকালের জন্য মুছিয়া সমগ্র জগৎ তাঁহার জন্মোৎসবে এত আনন্দ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" তাঁহার আবির্ভাব। ৬ই মাঘ তাঁহার জন্মতিথিদিবস। সেদিন যে-শক্তির অনুপ্রাণনে তিনি জগতে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইল। আমাদের স্বামীজি তাঁহার নিজের পূজার বিরোধী ছিলেন, তাই তাঁহাকে পূজা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও আকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখিয়া কেবল তাঁহার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ ধরিয়া দিলাম ও পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলাম। তাঁহার শয্যাগৃহ ফুলশয্যায় সজ্জিত হইল। সেই পরম প্রেমিকবরের যেন বাসর-সজ্জা রচনা হইল। তাঁহার শুভ জন্মতিথি পূজা হইল।...

তিনি বেদ, উপনিষৎ, গীতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাই তাঁহার প্রিয় গুটি কয়েক বৈদিক সূক্ত, অতি প্রিয় কঠোপনিষৎ ও সমগ্র গীতা তাঁহাকে শুনাইলাম। এদিকে ভোগ আরতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন।

প্রসাদ পাইয়া অনেক ভক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে ব্রহ্মচারিগণ মহানিশীথে মহাশক্তির আরাধনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপরদিকে ভগবৎসঙ্গীতের লহরী ছুটিতেছে। আমরা একটু বিশ্রাম করিলাম। ঠাকুরের নিত্য আরতি ও ভোগসমাপনান্তে পূজা আরম্ভ হইল। যে মহাশক্তি-সাধনায় তাঁহার জীবন কাটিল, তাহার কি একবিন্দুও উদ্বোধন করিতে পারিয়াছিলাম? জানি না, কিন্তু যথাসাধ্য উপচারে ও যথাশক্তি পূজা করিয়া মহামায়ার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোমান্তে উষাকালে সকলে মিলিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

তৎপরের রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। নানাস্থানে স্বামীজির ফটো লিথো প্রভৃতি চিত্রাবলি অতি মনোহরভাবে সজ্জিত হইয়া দর্শকগণের মনে তাঁহার সেই উৎসাহদীপ্ত মুখ জাগাইয়া দিতেছিল। প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমপ্রদর্শিত শত শত প্রলোভনে অনাকৃষ্ট ভাব, যমমুখ হইতে মৃত্যুর রহস্য ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হইল। পরে অদ্বিতীয় ধ্রুপদগায়ক বাবু কাশীনাথ সুকুল, বাবু কেশব মিশ্র, সাধকবর রামলাল দত্ত মহাশয় এবং অঘোরবাবু সমস্ত দিবস ধরিয়া সুমধুর গীতে সমাগত দর্শকবৃন্দের তৃপ্তিসাধন করিলেন। শালখিয়ার ভক্তবৃন্দ স্বামীজির গুণানুবাদ গীতে সকলকে পরমানন্দ দিলেন। জলতরঙ্গ বাদ্যও অতি দক্ষতার সহিত বাদিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল। স্বামীজি নিজে একজন অদ্বিতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে ধ্রুপদগানের বিজ্ঞান ও কীর্ত্তনের ভাবপ্রকাশ (Expression)—এই দুই একত্রীভূত করিয়া সঙ্গীতজগতে যুগান্তর উপস্থিত করা তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্য ছিল।

এদিকে গান চলিতেছে, ওদিকে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় ৪।৫ শত ভক্ত সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রসাদ পাইলেন। এইবার স্বামীজির কথিত সেই "দরিদ্র অনাথ নারায়ণগণ" সমাগত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যগণ এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কোমর বাঁধিয়া উৎসাহের সহিত এইসকল নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রায় ১৫০০।২০০০ অনাথকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল।

এই মহোৎসব হইতে শিখিলাম কি? শিখিলাম—অগ্নি এখনো নিভে নাই, বরং আরো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা করযোড়ে তাঁহার নিকট কেবল এই প্রার্থনা করি, হে শক্তিস্বরূপ, আমাদিগকে শক্তি দাও; হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বল দাও; হে ওজঃস্বরূপ, আমাদিগকে ওজঃ দাও, বীর্য্য দাও; যেন তোমার শিক্ষা, তোমার উপদেশ নিজ নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া সমগ্র জগতে ছড়াইতে পারি!

শুধু বেলুড়ে নয়, ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে উৎসববার্ত্তা আসিতেছে। এপর্য্যন্ত মান্দ্রাজ, কলম্বো, বাঙ্গালোর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে উৎসবের বার্ত্তা পাইয়াছি। আজ দেখিতেছি, সমগ্র জগৎ আনন্দগানে পূর্ণ।

[স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বেলুড় মঠে স্বামীজীর এটিই প্রথম জন্মোৎসব পালন।—সম্পাদক]

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী শিবানন্দের দুখানি পত্র

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Hathiramjee Mutt
Ootacamund (Madras)
14.6.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমরা ৪ঠা জুন এই পর্বতে আসিয়াছি। অতি রমনীয় (রমণীয়) ও শীতল(।) ৮০০০ ফিট সমুদ্রতীর হইতে উপরে। ইহা মাদ্রাজ গভর্নরের গ্রীষ্মনিবাস।

তুমি ঝিনাদহে এক মাসের জন্য একটী কাজ পাইয়াছ শুনিয়া আনন্দ হইল(।) এইরূপ অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতে করিতে একটা স্থায়ী কাজ তাঁর ইচ্ছায় হইয়া যাইবে। বাংলাদেশে পল্লীগ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয় তার সন্দেহ নাই। তবে গ্রামের যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, রোজগার করেন তাঁরা সকলেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যদি চলিয়া যান তাহলে গ্রামগুলি সব ক্রমে ধ্বংস হইয়া যাইবে(,) প্রায় গিয়াওছে। সেইজন্য আমার মনে হয় তোমাদের মত বুদ্ধিমান লোক যাঁরা স্বামীজির পুস্তকাদি পড়িয়াছেন ও চিন্তাশীল ও হৃদয়বান(,) তাঁরা গ্রামে কষ্ট করিয়া থাকিয়া যাহাতে sanitation ভাল হয়(,) প্রতিবাসীদের সহিত বন্ধুভাবে পরামর্শ করিয়া যদি কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন সেজন্য চেষ্টা করা খুব ভাল। যেমন malariaর সময় জলটা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া filter করিয়া খাওয়া (বা কোন epidemic এর সময়) মসারি (মশারি) ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি যা তোমরা জান ও শিখিয়াছ নিজেরা তাহা করিয়া অপরকেও ঐরূপ করিতে শিখান(—)এরূপ করিলে বোধ হয় গ্রামগুলির কিছু উন্নতি (স্বাস্থ্যসম্বন্ধ) হইতে পারে। অবশ্য লোকের সহিত খুব মিত্রভাবে পরামর্শ করিয়া না করিলে উহা সম্ভব নয়। যাহোক চিন্তা করিয়া দেখিও। স্ত্রীকে বাড়ী নিয়া আসা সম্বন্ধে তুমি যেরূপ ভাল বুঝিবে করিও। তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে। এ স্থান খুব স্বাস্থ্যকর(।) শরীর আমাদের সকলেরই ভাল তবে আমার বৃদ্ধ শরীর(,) সর্দ্দি ও বাত কিছু কিছু লেগেই থাকে(,) তবে কষ্টদায়ক নয় ঠাকুরের কৃপায়। এখানেও কতকগুলি স্থানীয় শিক্ষিত এবং ধনী ধার্মিক ব্যক্তি ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ করিতেছেন(।) নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঠাকুর কোথায় কিরূপে যে তাঁর মহিমা প্রকাশ করিতেছেন(,) আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত(।) তিনি যুগাবতার(,) যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে তাঁর আবির্ভাব সাঙ্গোপাঙ্গ।

ইতি
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Hathiramjee Mutt
Ootacamund
7.7.26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার ২খানি পত্রই ক্রমে ক্রমে পাইয়াছি। এত চিঠি আমার কাছে আসে যে(,) সব উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি যে দুঃখী-রোগী-নারায়ণের কথা লিখিয়াছ(,) আমার দ্বারা তাঁর কিছুই হওয়া সম্ভব নয়(।) ৺কাশী সেবাশ্রমের সেক্রেটারীকে এবিষয় তোমাকে লিখিতে হইবে(।) সেখানে তাঁর স্থান হইবে কি না এসব কাশী হইতেই জানিতে পারিবে(।) তাঁরা রোগীকে নিতে পারিবেন কি না সবই লিখিবেন। যদি তুমি কাশীতে তাঁদের লেখ, এরূপ লিখিতে পার যে তুমি আমায় এ বিষয়ের জন্য লিখিয়াছিলে এবং আমি তোমাকে ৺কাশীতে তাঁদের লিখিতে বলিয়াছি। তারপর কনখল সেবাশ্রমেও লিখিয়া দেখিতে পার(।) Supdt. R. K. M. Sevashram, Kankhal, P.O. Dt. Saharanpur, U. P.—এই ঠিকানায়ও ঐরূপভাবে লিখিতে পার। তারপর প্রভুর যা ইচ্ছা।

আন্তরিক প্রার্থনা করি ঠাকুরের অবতারত্বে তোমার পূর্ণ বিশ্বাস হউক। তোমাকে তিনি ভক্তি জ্ঞান প্রেম দিয়া পূর্ণ করুন(।) আমার শরীর একপ্রকার(।) মোটের (ওপর) তাঁর কৃপায় ভাল। এখানে monsoon আরম্ভ হয়েছে তবে বড় weak(,) বেশি বৃষ্টি হইতেছে না—ঝড় খুব দিনরাত বহিতেছে সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি(।) এখানে এই রকমই হয় তবে বৃষ্টিটা এবার কম। সেটা বড়ই খারাপ এখানকার লোক সব বলিতেছে। তবে হবার আশা আছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। শুনেছি Jhenidah বড় malarious জায়গা। তুমি কেমন আছ(?) শুনেছি কলকাতায় কালাজ্বর চিকিৎসার হাসপাতাল হয়েছে কোন জায়গায়? Hospital for tropical diseases একটী হয়েছে। তুমি কলকাতায় খোঁজ লইও। লোকটির ঠাকুরের কৃপায় একটী উপায় হইলে আমি খুব বড় কৃতার্থ হইব(।)

ইতি
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারতীয় চিকিৎসাবৃত্তি

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকমণ্ডলী, সহকারিবৃন্দ এবং এই সেবাকেন্দ্রের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আজ আমি খুবই আনন্দিত। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শ'। প্রশ্ন হলো, আপনারা যে-সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক কী? এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিশ্চয়ই আপনাদেরই গ্রহণ করতে হবে। আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য আপনাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি মাত্র।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, অন্যান্য অনেক দেশই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, কি নিদারুণ সমস্যা তাদের দেশ ও জাতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। আমাদের মূল সমস্যা নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা। তবু তাদের সমস্যাগুলির তুলনায় আমরা অতি সহজেই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু তাদের সমস্যাগুলির মূল অনেক গভীরে নিহিত। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী কার্ল ইয়ুম রচিত 'Modern Man in Search of a Soul' গ্রন্থে এই সমস্যার বিষয়টি অতি চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যবাসীদের কণ্ঠে আজ করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছেঃ 'আমাদের দেহ সবল, কিন্তু আমাদের আত্মা [আত্মজ্ঞান] অতি দুর্বল।' এর পাশাপাশি প্রবল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দৌর্বল্য ও অনগ্রসরতা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এই 'অমর ভারত'-এর অমূল্য সম্পদ হলো তার 'সবল আত্মা'। আমাদের সমস্যা হলো আমাদের এই অতি দুর্বল শরীর 'আত্মজ্ঞান' লাভের পথে বিশাল প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। আমাদের সেই শুদ্ধ আত্মার গভীরে সমাহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত সবল দেহ কিভাবে লাভ করা যায়, তার উপায় সন্ধান করতে হবে—যে-'আত্মা'র একালে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। যেহেতু সুস্থ দেহ গঠন অপেক্ষা আত্মজ্ঞান লাভ করা কঠিনতর, অতএব বলা যেতে পারে যে, আমাদের প্রার্থিত কাজটি তুলনায় অনেক সহজ। আজ দেখা যাচ্ছে, মানুষের আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য পাশ্চাত্যের মানুষও প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশের মতো সেখানকার মানুষ ব্যাধি-কবলিত নয় সত্য, কিন্তু স্নায়বিক, মানসিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন অজ্ঞাত সমস্যা তাঁদের আজ জর্জরিত করে দিচ্ছে। তাঁদের প্রভূত ধনসম্পদ, সুযোগ-সুবিধা এবং জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম আছে; কিন্তু মনে তাঁদের শান্তি নেই, সুখ নেই। আজ পাশ্চাত্য দেশগুলির অধিকাংশ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং সভায় এই সমস্যাটি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার একটি মন্তব্য করেছিলেন, যেটি আজ সমগ্র পাশ্চাত্য নরনারীর কাছে চরম সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেনঃ "মানুষ যখন নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির শিখরে অবস্থান করে, তখন সে অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু তখন সে নিজের কাছেই এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ হয়ে ওঠে।" দেখা যাচ্ছে, আজ পাশ্চাত্য দেশসমূহে মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমাদের সমস্যাগুলি বাহ্য, যেমন দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্যের সমস্যাগুলি আন্তর। ঐ সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞান। ফলে সেখানে মানসিক চাপ, দুঃখ, আত্মহত্যা, অপরাধ, কর্মে অনীহা, শিশুনিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনাগুলির আধিক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি আজ সুস্পষ্ট যে, এই ঘটনাগুলি তাঁদের হৃদয় তথা আত্মা সম্বন্ধে অপরিণত বোধের লক্ষণ। নিরুপায় হয়ে তাঁরা ব্যাকুলভাবে ঐ সমস্যাগুলির গভীরে প্রবেশ করে সেগুলি প্রতিকারের পথ অনুসন্ধান করে চলেছেন। ঠিক এরূপ একটি পটভূমিকায় আজ তাঁরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে, তার শাশ্বত ঐতিহ্যের দিকে, যা একালে মূর্ত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে।

রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজী সম্বন্ধে সুন্দর দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতি মনোহর শব্দসমূহের প্রয়োগে তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব এক চিত্র তুলে ধরেছেন। তার অংশবিশেষ এরকমঃ আমি ইওরোপবাসীদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ নামে পরিচিত এক ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করতে চাই, যাঁর ঐশ্বরিক মহিমা সম্বন্ধে তাঁরা কোনরূপ ধারণা করতে

অক্ষম। তিনি প্রথম শরতের একটি ফলের মতো; তিনি আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এক নব ভাষ্যকার এবং ভারতীয় সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো সদা আনন্দময়।... আমি তাঁকে উপস্থিত করতে চাই একালের নিদ্রাবিঘ্নিত ইওরোপ-বাসীদের মানসপটে। আমি সমগ্র ইওরোপবাসীদের ওষ্ঠপুটে তাঁর অমৃততত্ত্বের রসমাধুর্যের আস্বাদ দিতে চাই।

তিন কোটি মানুষ দুহাজার বছরব্যাপী যে অধ্যাত্মজীবন যাপন করে চলেছেন, তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবহিত করানোর জন্য রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কী সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন! সমগ্র পাশ্চাত্য যে আজ ভারতীয় অধ্যাত্মসম্পদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করছে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

ভারতীয় অধ্যাত্মভাবটি একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর দেহধারণের ফলে দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এই মহান আচার্যগণের নিকট আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের যাবতীয় যন্ত্রণার মূল নিহিত আছে তাদের মানবিক গঠনতন্ত্রের মধ্যে। অপরদিকে, আমাদের দেশের সমস্যাগুলি সর্বাংশে বাহ্য, আমাদের সংগ্রাম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চাই শক্তির মূলতত্ত্ব, নির্ভীকতা, শান্তি এবং অন্তরে পরিপূর্ণতা লাভের আনন্দ উপলব্ধি করতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করলে উপরি উক্ত সমস্যাগুলি দূর করার উপায় জানা যায়। সমগ্র মানবসমাজকে আশীর্বাদ করার জন্য, তাদের নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি ও মানবসত্তার আধ্যাত্মিক পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করতে এবং পরিশেষে এই পথে যাবতীয় বাহ্য সমস্যার সার্থক সমাধানের পথসন্ধানে সাহায্য করার জন্যই তিনি জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজী সমগ্র মানবসমাজের নিকট আজ পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা কোন বিশেষ সম্প্রদায় অথবা জাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হননি, তাঁদের অভ্যুদয় হয়েছিল সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলসাধনের জন্য। মানুষ আজ অভূতপূর্বভাবে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামক মহান গ্রন্থটি আজ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। অল্পদিন হলো জার্মান ভাষায় সেটি প্রকাশিত হয়েছে। ডাচ ভাষায় সেটি মুদ্রণের অপেক্ষায় এবং জাপানি ভাষায় সেটি পরিসমাপ্তির পথে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থটি আজ সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে গভীর প্রশান্তি এবং প্রবল শক্তিসঞ্চার করছে।

ধনসম্পদের প্রাচুর্য সম্বন্ধে আমেরিকা চিরপরিচিত, কিন্তু এই ধনসম্পদ মনের স্থায়ী শান্তি এবং পরিপূর্ণতা লাভের পথে তাকে কোন সাহায্যই করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর মধ্যে এই প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছেন—ধনসম্পদ শুধু ইন্দ্রিয়সুখ দিতে পারে, কিন্তু অমরত্ব (আত্মজ্ঞান) দিতে পারে না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' -এ শ্রীরামকৃষ্ণ সেরকম বলেছেন, 'কাঞ্চন' থেকে ঐহিক সুখ লাভ হয় মাত্র। বারবার তিনি সাবধান করেছেন, 'কাঞ্চন' কখনো স্থায়ী শান্তি এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির আনন্দ প্রদান করতে পারে না। আজ পাশ্চাত্যবাসীরা ধীরে ধীরে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারছেন, ধনসম্পদ কখনো যথার্থ মঙ্গলসাধন করতে পারে না। একথা আজ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মানুষ তার মানবিক সত্তার গভীরে নিহিত অধ্যাত্মসম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর মূলসুরটিই হলো ঃ প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাটি ঐশীভাবাপন্ন। আমাদের জীবনে এই দিব্যভাবের উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং মানুষে মানুষে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 'ধর্ম' এবং 'আধ্যাত্মিকতা'-এর এটিই হলো সারকথা।

ধর্মের মহান ভাব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। বেদান্ত-বর্ণিত সনাতন ধর্মের এটিই হলো মূল ভাব। আমাদের দেশ এটি বিস্মৃত হয়েছিল। আর বিশ্বের অন্যান্য দেশ এই সত্যটি সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। যদিও সৃজনশীল ধর্ম, প্রাচীনপন্থী ধর্ম, প্রতিষ্ঠানগত ধর্ম প্রভৃতি ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ছিল, কিন্তু মানুষের অধ্যাত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ এবং তার অন্তরের ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করার জন্য যে-ধর্মের প্রয়োজন—সেটি যথ,যথভাবে বিকাশলাভ করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে ধর্মের সেই ভাবটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই মহান সাধক সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। তিনি দেবী ভবতারিণীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন ঃ মা, জগতে এখন ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। কৃপা কর, যেন আমার মুখ দিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে নতুন কোন ব্যাখ্যা উচ্চারিত না হয়। এর পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মচেতনাটিকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হলেন। তাঁর শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হলো সেই আশীর্বাণী—"তোমাদের চৈতন্য হোক"। এই চৈতন্যলাভই

হলো ধর্মপথের একমাত্র পাথেয়, যেটি ব্যতিরেকে ধর্ম অসম্পূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখেছিলেন ঃ 'ধর্ম' শব্দটি এখন প্রাণহীন এবং উপহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য স্বামীজী বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন চরিত্রগঠনের ওপর। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের আধ্যাত্মিক গুণমানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, 'ধর্ম' থেকে এই আধ্যাত্মিক পুষ্টি কিভাবে লাভ করা যায়?

পুষ্টি এবং পুষ্টিকর খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝি? শারীরিক পুষ্টির বিষয়টি সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবহিত আছেন। আমরা সকলেই চাই যে, আমাদের সন্তানসন্ততিরা শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠুক। শারীরিক পুষ্টি এবং পুষ্টিবিজ্ঞান একটি বৃহৎ আলোচনার বিষয়, অনুরূপভাবে অপর একটি বিজ্ঞান আছে, যেটিকে বলা হয় আত্মা ও আধ্যাত্মিক চেতনার পুষ্টিসাধনের বিজ্ঞান। মানুষের জীবনে আজ শরীরগত বিভিন্ন অপুষ্টি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তারই প্রভাবে মানুষের আত্মাতেও প্রকটিত হয়ে উঠছে নানারকম বিকৃতির লক্ষণ। আবার দেখা যাচ্ছে, একদিকে দৈহিক পুষ্টির অভাবে, বিশেষত ভারতবর্ষের মতো দেশগুলিতে, মানসিক ব্যাধির প্রকোপ যেরকম বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক পুষ্টিও একপ্রকার মানসিক বিকৃতির জন্ম দিচ্ছে। এটিকেই বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক অপুষ্টি। আধুনিক পাশ্চাত্যের দেশগুলি এবং ভারতবর্ষের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়গুলি এই আধ্যাত্মিক অপুষ্টির শিকার। তারই পরিণতিস্বরূপ আমাদের সমাজে আজ কর্তব্যে অনীহা, মদ্যপান, অন্যান্য মাদকাসক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এসব তো বহুকাল ধরেই প্রচলিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় কিভাবে? শুধুমাত্র শিল্প, প্রযুক্তি, প্রচার, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির মান উন্নত করে কি সে-কাজ করা সম্ভব? এটিই আজ আমাদের কাছে প্রধান 'চ্যালেঞ্জ'। পাশ্চাত্য দেশের বহু অভিজ্ঞ চিন্তাবিদ্ আজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এর কোনটিই আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়কে রোধ করতে সক্ষম নয়। একমাত্র মানুষের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মশক্তির উন্মেষই পারে সভ্যতার এই অবক্ষয়কে রোধ করতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে আমরা বারবার একটি উপদেশ শুনতে পাই—"কাম-কাঞ্চন ত্যাগ"। অর্থাৎ কাম ও অর্থের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ। এটিই হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিলাভের সোপান-স্বরূপ। আধুনিক সমাজে আমরা আজ ইন্দ্রিয়সুখ ও অর্থের লিপ্সায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন ঃ এই পথ ভ্রান্তির পথ। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন, আমাদের অন্তরেই এক প্রবল শক্তি নিহিত আছে। আমরা একটি জৈবপ্রণালী অথবা শুধু জন্মচক্রের যন্ত্রস্বরূপ নয়। এটি একটি ভিত্তিমাত্র, যার ওপর ধর্মের বিজ্ঞান এবং নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা আমাদের প্রবল শক্তিসম্পন্ন ও অধ্যাত্মভাব-সমৃদ্ধ প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে এক সুমহান বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারি। একালে এই বিশেষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহধারণ।

কয়েক বছর পূর্বে আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম, আমাদের বোস্টন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ আমাকে একটি ঘটনার কথা বললেন। ঘটনাটি খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ এই ঘটনাটির গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন ধর্মজীবনের মহামন্ত্রস্বরূপ 'কাম-কাঞ্চন ত্যাগ'-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঘটনাটি এরকম—কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক স্বামী সর্বগতানন্দের নিকট এসে বলেন ঃ "মহারাজ, পড়বার জন্য আমাকে কোন গ্রন্থ দিতে পারেন?" তিনি অধ্যাপককে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ('The Gosple of Sri Ramakrishna') গ্রন্থটি পড়তে দিলেন। অধ্যাপক গ্রন্থটি নিয়ে চলে গেলেন; কিন্তু অল্প কয়েকদিন পর তিনি মহারাজকে এসে বললেন ঃ "এই নিন, আপনার পুস্তক ফেরত নিন।" সর্বগতানন্দ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি ব্যাপার, গ্রন্থটিতে কি পড়লেন?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "গ্রন্থটির সর্বত্রই শুধু 'কাম' ও 'কাঞ্চন' বর্জনের কথা। পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার এজাতীয় গ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই।" মৃদু হেসে সর্বগতানন্দ তাঁকে বললেন ঃ "আচ্ছা, গ্রন্থটিতে কি আর কোন বিষয়ে কিছু লেখা নেই? বেশ তো, আপনার অপছন্দের অংশগুলি বাদ দিয়ে অন্য বিষয়গুলি পড়ুন না, দেখবেন ভাল লাগছে।" অধ্যাপক গ্রন্থটি নিয়ে ফিরে গেলেন এবং সেটি পাঠ করলেন। কয়েক মাস পর তিনি আবার ফিরে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনার নিকট এই গ্রন্থ কয়খণ্ড আছে?" সর্বগতানন্দ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ঃ "কেন, আপনি কি সেগুলি নষ্ট করে ফেলতে চান?" অধ্যাপক জবাব দিলেন ঃ "গত সপ্তাহে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে।" এরপর তিনি সেই ঘটনাটি বিবৃত করেন, যেটি, আমার মনে হয়, আপনাদের সকলের নিকটই গভীর অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। তিনি একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে অনেক বিশিষ্ট অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের

মধ্যে একজন ভাষণ প্রদানকালে হঠাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন ঃ "আজ আমেরিকার প্রধানতম সামাজিক ব্যাধি কি? কোন্ ব্যাধি আজ আমাদের চরম সর্বনাশ করছে? সেই সামাজিক ব্যাধিটিকে নির্মূল করার উপায় আজ আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে।" ক্ষণকাল পরেই তিনি বললেন ঃ "আমেরিকায় আজ আমরা দুটি ব্যাধির শিকার, দুটি মহাপাপে আচ্ছন্ন। সেই দুটি হলো, ডলার-বৃদ্ধির নেশা এবং কামজ তাড়না। এদুটিই আজ আমাদের প্রধান সমস্যা এবং আমাদের অবিলম্বে অতি অবশ্যই এই দুই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে হবে।" দর্শকাসনে উপবিষ্ট সেই অধ্যাপক ভাষণ শুনছিলেন। এই শব্দকয়টি শোনামাত্র চকিতে তাঁর চিত্তে জাগ্রত হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী। এই সমস্যাটির কথাই তো তিনি অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন—"কাম-কাঞ্চন ত্যাগ"।

সমগ্র মানবসমাজ আজ 'কাম' ও 'কাঞ্চন'-এর নেশায় আচ্ছন্ন। অতএব তিনি সর্বগতানন্দকে বললেন ঃ "আমি আমার প্রত্যেক অধ্যাপক বন্ধুর নিকট এই গ্রন্থের একটি করে খণ্ড পৌঁছে দিতে চাই। তাঁরা এই গ্রন্থটি পাঠ করুন, কারণ এই গ্রন্থটি পাঠ করে যে-জ্ঞান লাভ হবে, তা আমাদের দৈনিক ব্যবহারিক জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষ ইন্দ্রিয়সুখের অধীন, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু এটিই তো মানবজীবনের একমাত্র দিক নয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান, কিন্তু পার্থক্য হলো—মানুষ ধীশক্তির অধিকারী, যার সাহায্যে সে তার সকল প্রবৃত্তির অভিমুখ উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন যেন ঐ ইন্দ্রিয়গত সুখের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এই বন্ধন থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে যাবতীয় সমস্যা। এই সমস্যা আধুনিক সভ্যতাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে ফেলছে। পূর্বে কিন্তু এজাতীয় সমস্যাগুলি এত প্রবল আকার ধারণ করেনি। আজ আমাদের সম্মুখে উন্নতমানের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রচারব্যবস্থা বর্তমান; আর তারই সঙ্গে সহাবস্থান করছে জীবন তথা নিজেদের ভোগ করার পর্যাপ্ত তাগিদ। পরিণামে দেখা যাচ্ছে, আমরা জীবনকে উপভোগ করার পরিবর্তে জীবনই আমাদের ভোগ করে চলেছে।

জীবনকে একটি পরিভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি শিশুকে ঘোড়ায় চড়া উপভোগ করার জন্য একটি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হলো। শিশুটি জানে না, ঘোড়াকে কিভাবে চালনা অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। চলতে চলতে ঘোড়াটি হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ছুটতে লাগল। তার পিঠে বসা শিশুটি ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। আজ মানুষের অবস্থাও এইরকম। জগৎ আজ উন্মত্তের মতো তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে, আর আমরা, এই জগতে বসবাসকারী মানুষ, ক্রমশ ভীতির শিকার হয়ে উঠছি। ঐ শিশুটি জানে না, সেই উন্মত্ত ঘোড়াটিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং তাকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াটি তার এই ভ্রমণ খুবই উপভোগ করলেও শিশুটিকে ঐ ভ্রমণরূপ ব্যাধি থেকে উদ্ভূত ভীতির শিকার হতে হচ্ছে। এই শিশুটিই হচ্ছে আধুনিক যুগের মানুষের প্রতীক। মানুষ তার করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে দিশাহারা হয়ে পড়ছে। এই মুহূর্তে সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করতে পারে বেদান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী, যার মূল কথা হচ্ছে 'সহনশীলতা' অভ্যাস করা এবং ঐ উন্মত্ত ঘোড়ারূপ জগতের তীব্রগতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল শিক্ষা করে জীবনের প্রকৃত রস যথার্থভাবে আস্বাদন করা, জীবনকে আনন্দময় করে তোলা। যাঁরা প্রবল আত্মশৃঙ্খলা-পরায়ণ, শুধুমাত্র তাঁরাই জীবনকে ধর্ম-নির্দেশিত সঠিক পথে উপভোগ করতে সক্ষম হন; অন্যথায় জীবনের অপরাপর নিম্নগামী প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করতে হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আপনারা এই হাসপাতালে শারীরিক তথা মানসিক-ভাবে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন। এখানে একটি প্রসূতিবিভাগও বর্তমান, যেখানে নিত্য নতুন নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করছে। ঐ সদ্যোজাত শিশুগুলির মুখের দিকে একবার গভীরভাবে দৃষ্টি রাখুন। তাদের চোখগুলি খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। দেখবেন, সেই চোখগুলি কী দারুণ গভীর! আপনাদের চারপাশের অন্যান্য সাধারণ চোখগুলি লক্ষ্য করুন। দেখবেন সেগুলি গভীরতাহীন, ঠিক যেন পুতুলের চোখের মতো। ঐ দৃষ্টি থেকেই একটি জীবন্ত শিশুর মধ্যে নিহিত যাবতীয় সম্ভাবনার প্রকৃতি, সেই সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত এবং শিশুটির মধ্যে জন্মসূত্রে পুঞ্জীভূত বিবিধ শক্তির পরিব্যাপ্তির স্বরূপটি আমাদের উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। আগামী দিনে সে হয়তো একজন শক্তিশালী মহম্মদ আলি অথবা একজন আইনস্টাইন অথবা একজন মহাত্মা গান্ধী হয়ে উঠতে পারে। সে হয়ে উঠতে পারে একজন 'বুদ্ধ' অথবা একজন 'রামকৃষ্ণ'। যে-শিশুটি আজ আপনাদের প্রসূতিবিভাগে জন্মগ্রহণ করল, তার মধ্যে এইসকল সম্ভাবনাই নিহিত আছে। আমরা আজ সেই 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করব, যা মানুষের অন্তর্নিহিত বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী

বিবেকানন্দের ভাবধারার মধ্যে আমরা এই বিজ্ঞানেরই প্রতিফলন দেখতে পাই—'মানুষের অন্তর্নিহিত সম্পদের বিকাশের বিজ্ঞান'। মানুষকে যদি আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে তার যোগ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি, একমাত্র তখনি আমরা এই বিশেষ বিজ্ঞানের গভীরতা প্রত্যক্ষ করতে পারব। একথাগুলি কিন্তু আমার নয়, এগুলি বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী স্যার জুলিয়েন হাক্সলির। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ আছে সত্য, কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অবশ্যকর্তব্য এবং সেটি হলো মানবশক্তির গভীরে নিহিত সম্ভাবনার রহস্য উন্মোচনের বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগগুলির প্রভূত চর্চার ফলে প্রাকৃতিক শক্তির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। সেই শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মানবকল্যাণে প্রয়োগ করা যায়, সেসম্বন্ধেও আমরা সম্যক জ্ঞানলাভ করেছি। বলা যেতে পারে, আধুনিক সভ্যতার এটি একটি অন্যতম মহামূল্যবান অবদান। কিন্তু একটি শিশু তথা পরিণত মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা আজও অজ্ঞ। আমরা আজও শুধু শারীরিক প্রবৃত্তিগুলির ক্রীতদাস হয়ে আছি। এই প্রবৃত্তিগুলির 'মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার' জন্যই এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। অর্থাৎ এই প্রবৃত্তিগুলিকে আমাদের দাস-এ পরিণত করতে হবে। আমাদের আন্তর শক্তিকে আজ মানুষের কল্যাণসাধন ও নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োগ করতে হবে। এই মানবশক্তি বিকাশের বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানুষকে সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত করে তাকে সার্বিক স্বাধীনতা প্রদান করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞানের এই বিভাগটি আজও আশানুরূপ গুরুত্বলাভ করেনি। স্বয়ং স্যার হাক্সলি স্বীকার করেছেন, বিজ্ঞানের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির গভীরে আজও আমরা প্রবেশলাভ করতে পারিনি। আশার কথা, দেরিতে হলেও ধীরে ধীরে এই বিষয়টি আজ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করছে।* [ক্রমশ]

---

* কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে গত ২৩ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পূজ্যপাদ মহারাজের 'Sri Ramakrishna and Indian Medical Profession' শীর্ষক এই বক্তৃতার অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সাধু চারপ্রকার

কোন একসময়ে জনৈক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ "সাধু কত রকমের?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "সাধু চারপ্রকার। আঙুর, বাদাম, বের (কুল) এবং সুপারির ন্যায়।"

আঙুর—আঙুরের ভিতর এবং বাহির সর্বত্র কোমল এবং রসপূর্ণ। সেরকম যে-সাধুর অন্তর ও বাহির কোমল ও সদা আনন্দময় তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট সাধু।

বাদাম—বাদামের যেমন ওপরে কঠিন আবরণ কিন্তু ভিতরে তৈলপূর্ণ সুমিষ্ট কোমল শাঁস, তেমনি কোন কোন সাধু বাহিরে কর্কশ কিন্তু ভিতরে অতি কোমল প্রকৃতির। এঁরা মধ্যম শ্রেণির সাধু।

বের (কুল)—বের বা কুল যেমন ওপরে কোমল মিষ্ট শাঁস কিন্তু ভিতরে বীজ কঠিন, তেমনি কোন কোন সাধু ওপরে অতি কোমল কিন্তু ভিতরে কঠোর প্রকৃতির। এঁরা অধম শ্রেণির সাধু।

সুপারি—সুপারি যেমন বাহিরে ভিতরে সর্বত্রই অতি কঠিন, তেমনি কোন কোন সাধু অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই সর্বাবস্থায় কর্কশ। এঁদের নিকৃষ্ট শ্রেণির সাধু বলা যেতে পারে। ❑

✡ ✡ ✡

মিত্রতা

দুধ ও জলের কিরূপ মিত্রতা! বিপদকালেই মিত্রের পরিচয়। নিজের প্রাণ দিয়েও একে অপরকে রক্ষা করে। দুধে জল মেশালে দুধ জলকে আপনার করে নেয়। নিজের গুণ ও রূপ তাকে দেয়। একই দামে বিকায়। আগুনে চড়ালে মিত্র দুধকে বাঁচাবার জন্য জল নিজে বাষ্পাকারে উড়তে আরম্ভ করে। মিত্র জলের বিচ্ছেদ সহন করতে না পেরে দুধ তখন জল-সহ মিলিত হওয়ার জন্য, পাত্রত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে উথলে ওঠে। তখন আবার জলের ছিটা দিলে দুধ শান্ত হয়। মিত্রকে ফিরে পেয়ে শান্ত হয়। ❑

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে পার্থ, দেখ, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে আমার কোন কর্তব্যকর্ম বলিয়া কিছু নাই। কারণ, আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তুও কিছু নাই। তথাপি আমি লোককল্যাণ করিবার জন্যই সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। কর্মত্যাগ করি নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ ঈশ্বর স্বয়ং ত্রিগুণাতীত। তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় এই জগৎ সৃষ্ট। তাই এই জগতের বৃদ্ধি বা হ্রাসে তাঁহার বিন্দুমাত্র লাভ বা লোকসান নাই। তথাপি তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া সাধারণের ন্যায় কর্মে ব্যাপৃত থাকেন, যাহাতে তাঁহার আদর্শ অন্যে অনুসরণ করিতে পারে।

[**মন্তব্য ঃ** প্রশ্ন উঠিতে পারে, অপ্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য দুটিই তো একই কথা। তাহা হইলে শ্রীভগবান একই কথা দুইবার কেন বলিলেন? তাহার উত্তর—দুটি একই কথা নহে। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। অপ্রাপ্ত বস্তু কাহারো জীবনে অনেক কিছুই থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তালিকায় সবই যে তাহার প্রাপ্তব্য বা প্রাপণীয় হইবে তাহা নহে। হিন্দুধর্মে অধিকারবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কেহ নিজের অধিকারের বহির্ভূত কিছু পাইবার যোগ্য নহে। যদি লোভবশত অনধিকার চর্চা কেহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাপ্তবস্তুর যথাযথ ব্যবহার না জানা থাকায় ঐ বস্তুর দ্বারা সমাজের সার্বিক কল্যাণ কিছুই সাধিত হয় না।—**সম্পাদক**]

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে পার্থ, যদি আমি অনলস হইয়া শুভকর্মে প্রবৃত্ত না হই, মনুষ্যগণ তাহা হইলে আমার অবলম্বিত পথেরই সর্বপ্রকারে অনুবর্তী হইবে, অর্থাৎ অলসভাবে কর্মত্যাগ করিবে।*

ব্যাখ্যা ঃ 'কর্মণি অতন্দ্রিতঃ' অর্থাৎ অতন্দ্র কর্মে ব্যাপৃত। কর্মের দ্বারাই মানুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। কর্মেই মানুষ ঠিক থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই যদি নিজ নিজ কর্মে সচেতন হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্দশা হইতে পারে না। চতুর্বর্ণের মানুষ যদি নিজ কর্মে সচেতন না হয়, তাহা হইলে চিত্রটি কেমন দাঁড়ায়? ব্রাহ্মণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ক্ষত্রিয়গণ যদি ভীরু হয়, বিদেশীর আক্রমণে পলায়ন করে, বৈশ্য যদি শঠ হয় এবং শূদ্র যদি অলস হয়, তাহা হইলে যাহার হৃদয়ে-দেহে সামান্য বল রহিয়াছে, সে আসিয়া দেশকে লুটিয়া লইয়া দেশবাসীকে পরাধীনতার পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। তখন গোটা দেশ সেই বহিরাগতের পদলেহন করিতে থাকে। মুসলমান ও ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী-সম্পৃক্ত ভারতবর্ষের বিষাদপূর্ণ ইতিহাস স্মরণ কর। ভারতবর্ষের প্রজাগণকে মুসলমান শাসকবর্গ পশু করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজগণ কেরানি তৈরির জন্য জেলায় জেলায় স্কুল বানাইয়াছিল। জাতীয় ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছিল। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে মানুষ ধরিয়া চা-বাগানের কুলি করিয়া লইয়া যাইত। রাজপুতগণকে ধরিয়া সৈন্যদল বৃদ্ধি করিত। ম্যাজিস্ট্রেটের লাথিতে মরিয়া গেলে বলিত—'হার্টফেল' করিয়াছে!

আমাদের দেশের এইরূপ চিত্র হইত না, যদি ব্রাহ্মণগণ ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হইত, ক্ষত্রিয়গণ বীর হইত, বৈশ্যগণ সদুপায়ী ও সাহসী হইত এবং শূদ্রগণ কর্মঠ হইত। বস্তুত, বৃত্তি হইল ধর্মরক্ষার আসল উপায়। বৃত্তি ঠিক থাকিলে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকে না।

[**মন্তব্য ঃ** বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী চার বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; চার আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। চার বর্ণ জন্মগত নহে, গুণ ও কর্মগত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিলেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে

চার বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতেই এই চার বর্ণ সমাজে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছে বলিয়াই জাতক ব্রাহ্মণ হইবে—এমন কথা নাই। আবার শূদ্রকুলে জন্মিয়াছে বলিয়া সে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না—এমন কথাও নাই। তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দকে অব্রাহ্মণ বলিতে হয়। অথচ গুণ-কর্মের যে-সংজ্ঞা শ্রীভগবান গীতামুখে দিয়াছেন (অষ্টাদশ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক), তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বের ব্রাহ্মণকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। গুণ (quality) এবং কর্ম (অর্থাৎ পূর্বজন্মাগত সংস্কার) অনুযায়ী বর্ণব্যবস্থা প্রাচীন যুগে বলবৎ ছিল। ক্রমশ জন্মগত জাতিবিভাগ এবং ধর্ম-সম্প্রদায়গত জাতিবিভাগ প্রবলতর হইয়া সমাজে সঙ্কর জাতের সৃষ্টি হইল এবং সমাজে বহুবিধ পাপ অনুপ্রবিষ্ট হইল।—**সম্পাদক**]

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

শ্লোকার্থ ঃ *আমি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) যদি কর্ম না করি, তবে লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে এইসকল লোক উৎসন্ন (বিনষ্ট) হইবে। তখন আমি বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেইজন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব।*

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণসঙ্কর (বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ) উপস্থিত হইলে Trade Guild (বৃত্তি-বন্ধন) নষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাপ, খুড়ো, পিসে সকলেই নাপিত। তাহারা পরস্পর পরস্পরের শ্রেয় এবং প্রয়োজন (interest) কি তাহা বুঝে এবং সেইভাবে চলে। হঠাৎ guild (সংগঠন) ভেঙে যাওয়ায় এক ব্রাহ্মণ নাপিত হইল। স্বাভাবিকভাবেই সে অন্যদের ঠকাইয়া বেশি লাভ করিতে চাহিবে। বাকিদের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলিতেছিল, তাহার সাম্য নষ্ট হইবে।

আজকাল guild system (বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন) কিছু হইয়াছে, যেমন Trade Union ইত্যাদি। যেমন রিক্সাওয়ালার ট্রেড ইউনিয়ন। সকলে মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট ভাড়া ঠিক করিয়াছে। ইহার ফলে কেহ অন্যদের ঠকাইয়া নিজে বেশি লাভ করিতে পারিবে না।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে ভারত (হে অর্জুন), অজ্ঞানিগণ আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম করেন, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হইয়া লোকশিক্ষার জন্য সেইরূপ কর্ম করিবেন।*

ব্যাখ্যা ঃ যাহার আসক্তি যত কম, তাহার কার্য তত উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়। আসক্ত লোকের মন এক বিষয়ে কখনো স্থির থাকে না। কোন এক বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বহুদিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অনাসক্ত ব্যক্তির মন সম্পূর্ণ একাগ্র থাকায় তিনি যে-কার্যে মন দেন, তাহা অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। তাই অনাসক্ত ব্যক্তির দ্বারা কৃত কার্যই মানুষের নিকট আদর্শ-স্বরূপ এবং সেই আদর্শ ধরিয়া চলিলে মানুষ ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতে পারে। তাহা না হইলে যেন-তেন প্রকারে এলোমেলোভাবে কর্ম করিলে তাহা মানব-মনের উন্নতি-সাধক হয় না। সেইজন্যই শ্রীভগবান অনাসক্ত জ্ঞানিগণকে লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করিতে উপদেশ বা অনুরোধ করিতেছেন।

[**মন্তব্য ঃ** বস্তুত, অনাসক্ত মন যত সহজে একাগ্র হয়, আসক্তিযুক্ত মন তাহা হয় না। স্বামী প্রেমেশানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক প্রবীণ সন্ন্যাসী ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার যখন বৃদ্ধাবস্থা, তখন তিনি একদিন দেখিলেন সারগাছি আশ্রমের এক কর্মী বাগানে কুঠার লইয়া কাঠ কাটিতেছে। কুঠারাঘাত পর পর দুইবার কখনো এক স্থানে পড়িতেছে না। কাজেই যত সময় লাগিত তাহার অধিক সময় লাগিতেছে। বৃদ্ধ মহারাজ তাহার হাত হইতে কুঠার লইয়া চার-পাঁচবারেই কাষ্ঠখণ্ডটি দুভাগ করিলেন। পরে বলিয়াছিলেন, যখন কাঠ কাটিতেছিলাম তখন অন্য চিন্তা আমার মনকে অধিকার করে নাই বলিয়া কুঠারাঘাত প্রতিবারই একই স্থানে পড়িতেছিল।—**সম্পাদক**]

[ক্রমশ] ।।পাঁচ।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১৮

পাশাপাশি ঃ (১) ভগবতী, (৩) নবাসন, (৬) বারো, (৭) কামনা, (৯) শিব, (১২) কপাল, (১৩) বরদা, (১৭) বুদ্ধি, (১৮) রঙ্গন, (১৯) আম, (২২) মহামায়া, (২৩) আমজাদ।

ওপর-নিচ ঃ (১) ভগবান, (২) বল, (৪) বালা, (৫) নহবত, (৮) মগ্ন, (১০) জপাৎ, (১১) সারদা, (১৪) বাবুরাম, (১৫) রঙ্গ, (১৬) রামনাদ, (২০) ক্ষমা, (২১) কাম।

শব্দচেতনা ১৮-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

দিলীপকুমার মৌলিক, নন্দদুলাল ঘোষ

গুরুভাইদের সঙ্গে

স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে তাঁর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর সঙ্গে তাঁকে একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন ঃ "এর নাম—চৈতন্য।" মহাপুরুষজীর সেদিন মাতোয়ারা ভাব। অমনি বলে উঠলেন ঃ "এখন আর পৃথক চৈতন্য দেখি না, সব এক চৈতন্য।" মঠের ভিতর দিকের বেঞ্চে উঠানের দিকে মুখ করে তিনজনে বসলেন। মহাপুরুষজীকে একটি নতুন তুলোর জামা পরানো হয়েছিল। শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি ছিল। একজন ফটো নিয়েছিলেন। আশেপাশে অনেক ভক্ত দাঁড়িয়ে। ঐ ফটোটি কোন কোন বইতে ছাপা হয়েছে। (স্বামী শিবানন্দ স্মৃতিকথা—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ২য় ভাগ)

* * *

সেদিন ছিল পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজের) শুভ জন্মোৎসব। তাই সেই উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে গিয়াছেন। 'উদ্বোধন' হইতে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী মহারাজও সেই উপলক্ষ্যে তথায় গিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ-শিষ্য ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস অন্য কয়েকবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সঙ্গে যাইলেও এইবার কিন্তু সে অন্যদলের সহিতই গিয়াছিল ও তথাকার আনন্দোৎসব বেশ ভালভাবেই উপভোগ করিয়াছিল। ঐদিন উৎসবান্তে দুটি গ্রুপফটো তোলা হয়। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ও স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ—এই তিন মহাপুরুষের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের লইয়া ঐ ফটো তোলা হইয়াছিল। সারাদিন আনন্দ উৎসবের পর এইবার ফিরিবার পথে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পূজনীয় শরৎ মহারাজের গাড়িতে করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ফিরিবেন। গাড়িতে উঠিবেন, এমন সময় দেখিলেন জ্ঞান মহারাজ (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য) শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ-সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা (pamphlet) একেবারে বিনামূল্যে না দিয়া চার পয়সা করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেশ রহস্য করিয়া অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন ঃ "জ্ঞান মহারাজ! ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছাড়।" পূজনীয় শরৎ মহারাজও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।" জ্ঞান মহারাজ তখন তাঁহাদের ঐ কথায় বেশ রহস্য অনুভব করিয়াছিলেন।

অতঃপর ঐ গাড়ি করিয়া তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমিতিভবনে আসিয়া ঐ রাত্রে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শিষ্যকে বলিলেন ঃ "দেখলাম মহাপুরুষকে বাহ্যান্তরে পেয়েছে।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন ঃ "বাহ্যান্তরে পাওয়া মানে জানিস? অর্থাৎ কিনা সিদ্ধাবস্থা।" শিষ্য বলিল ঃ "বেলুড় মঠের মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র দেহাস্থিপূর্ণ সেই 'আত্মারামের কৌটা'টি দেখলাম। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল তা মাথায় স্পর্শ করে প্রণাম করি।" শুনে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ বলিলেন ঃ "ও! আমাকে বললি না কেন? আমি তোর মাথায় ঠেকিয়ে দিতুম।"

(মহাপুরুষ সংশ্রয়—ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস)

* * *

সম্ভবত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজ মঠে এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এক আনন্দের পরিবেশ। উভয়ে পরস্পরকে পেয়ে যেন পরমানন্দময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দিব্য-সান্নিধ্য অনুভব করতে লাগলেন। পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপের পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী তাঁর শিব-স্বভাবসুলভ প্রাণখোলা কথায় নিজ অন্তরের গভীর ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করলেন। বললেন ঃ "শরীরটা বৃদ্ধ হয়েছে। নানা রোগ। কিন্তু আমি ভাল আছি। কোন দুঃখ-ক্ষোভ নাই। অনন্ত করুণাময় ঠাকুর একেবারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন—তাঁর জ্ঞানভক্তির অতুল ঐশ্বর্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর ভিতরকার সব তিনি, আমি নেই। সব তাঁর ইচ্ছা, তিনি যতদিন খেলবেন এ খোলটা (দেহটা) দিয়ে। তিনি রাখলে থাকতে হবে, ডাকলে যেতে হবে। এ জীবজগৎ তাঁর লীলা, আমরাও তাই। তা ভাই কালী, তুমি কেমন আছ? তোমার শুনছি পায়ে আবার গরম জল পড়ে পুড়ে গিছিল? তোমার অনেকবার পায়ের কষ্ট হয়েছে। একবার পরিব্রাজক অবস্থায় সৌরাষ্ট্রে খালিপায়ে চলে পায়ে রিংওয়ার্ম (পোকা) হয়েছিল। তারপর আমেরিকায় আরেকবার পা পুড়ে গিয়েছিল। সব এসে পা ছোঁয় তাই

এইসব। তা কিন্তু ঐ পা পর্যন্ত লাগে (পাপতাপ), এর ওপরে উঠতে পারে না।"—এই বলে উভয় গুরুভ্রাতা বেশ বালকের মতো উচ্চহাস্য করলেন। এঁদের কথাবার্তায় পরস্পরের প্রতি কী গভীর ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পেল! গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কী শ্রদ্ধা, কী ভালবাসা, কী সরল সাবলীল ব্যবহার! (শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ—স্বামী ধর্মেশানন্দ, ৩য় খণ্ড)

* * *

১৩২৯ সালে শিলং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পুরাতন মঠবাড়ির পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ঘরের সংলগ্ন সিঁড়ির দক্ষিণপার্শ্বে যে বড়ঘরটি আছে, তাহাতে কাশ্মীর ও তিব্বতে যাইবার প্রাক্কালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রভাতে যখন তিনি চা-পান করিতেছিলেন, তখন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজজী তাঁহার কাপড়ের জুতাটি পায়ে দিয়া হাতজোড় অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দজীর ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে চমকিত ও বিমুগ্ধ হইয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ঃ "এ কী তারকদা! মহাপুরুষ আপনি?"—এই উচ্চারণ করিয়া ভাববিহ্বলে মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন ঃ "ভাই কালী, মায়ের স্তব পাঠ করছিলাম।[১] যখনি মায়ের স্তব পাঠ করি তখনি কী এক আনন্দে ডুবে যাই! যাঁর কণ্ঠ হতে এমন স্তব—এমন সুন্দর মধুর স্তব নিঃসৃত হয়েছে, তাঁকে দর্শন ও তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য আমি আজ এখানে এসেছি। তাই ভাই তোমার কাছে এসেছি।" তখন পরস্পরের দৃষ্টিতে যে-ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন, বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। একদিন প্রাতঃভ্রমণ করিয়া তিনি ঠাকুরঘরের (পুরাতন ঠাকুরঘর) কাছে আসিয়া করজোড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন, সেইসময় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের জানালার রড ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামী অভেদানন্দের প্রণাম করা দেখিতেছেন আর সম্মুখে বরিশালের এক যুবক ভক্তকে বলিতেছেন ঃ "দেখ, দেখ, কালীভাই কেমন ঠাকুরকে প্রণাম করছে। ওর চালচলন, কথাবার্তা সব স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) মতো।" (যেমন শুনিয়াছি—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ)

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ (খোকা মহারাজ) তখন 'উদ্বোধন'-এ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। তাই শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন। কয়েকজন ভক্তের সহিত গাড়ি করিয়া স্বামীজী মহারাজ [স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ] তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সকলে পরম উৎসাহে তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন। ভক্তদের মধ্যে একজন স্বামী সুবোধানন্দজীকে চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন ঃ "অসুস্থ শরীরে কি প্রণাম করতে হয়?" ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের ইহা পূর্বেই জানা ছিল। তাই সে কিছু দূর হইতেই প্রণাম জানাইয়াছিল। খোকা মহারাজ তখন দোতলার মেঝেতে শায়িত ছিলেন।

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ তখন উপস্থিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "Temperature কত?" একজন ভক্ত—"এই ৯৯°-র মতো।" স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার শিষ্য ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে বলিলেন ঃ "দেখ তো হাতটা।" পূজনীয় খোকা মহারাজ তখন বালকের ন্যায় হাত আগাইয়া দিলেন ও একদৃষ্টে ডাক্তারকে দেখিতে লাগিলেন।

পূজনীয় খোকা মহারাজ বলিতেছেন ঃ "ঠাকুর এসেছিলেন। তার আগে দেখি—মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এসে বললেন, 'উনি (ঠাকুর) এসেছেন।' তাকিয়ে দেখি মাথার কাছে ঠাকুর। বললেন, 'খোকা! একটু ভোগ ছিল, তা কেটে গেল।' আমি বললাম, 'তা শরীর থাক আর যাক সে তোমার ইচ্ছা।' " একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) কি এসেছিলেন?" খোকা মহারাজ—"হ্যাঁ! তবে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।" অতঃপর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিলেন ঃ "তা ঠাকুর তো বলেছিলেন, তিনি সবসময়ই দেখবেন।" খোকা মহারাজ—"হ্যাঁ! এখন তাই দেখিয়ে দিচ্ছেন।" এইরকম নানা কথাবার্তার পর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এইবার বিদায় লইলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজকে দেখিয়া পূর্বপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন ঃ "তোমাকে যখন ডাকলাম আমেরিকায়—গেলে না তো—গেলে এই আর কি সব দেখেশুনে আসতে পারতে।"

এইবার গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ির মধ্যে শিষ্য স্বামীজী মহারাজকে [স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজকে] বলিলেন ঃ "খোকা মহারাজের এত অসুখ, শরীর এত খারাপ কিন্তু মুখখানা কেমন উজ্জ্বল! টলটল করছে।"

স্বামীজী মহারাজ গম্ভীর হইয়া বললেন ঃ "হুঁ হুঁ বাবা! হাজার হলেও ঠাকুরের ছেলে।" (মহাপুরুষ সংশ্রয়—ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস) ❑

সংগ্রাহক ঃ নারায়ণচন্দ্র গুহরায়[২]

---

১ স্বামী অভেদানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্র—"প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং..." ইত্যাদি।

২ ঝাড়গ্রাম-নিবাসী, স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

সংস্কারের শেষকথা ঃ "যত মত তত পথ"

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

সংস্কারের অর্থ

'সংস্কার' শব্দটির অনেক রকম অর্থ প্রচলিত আছে—(১) ভুল সংশোধন। (২) জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রবেশ ও উত্তরণ, যথা—নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি হিন্দুমতের দশবিধ অনুষ্ঠান বা দশকর্ম-সংস্কার। এইরকম সংস্কার পৃথিবীর সকল জাতি ও শ্রেণির মধ্যে অবশ্যপালনীয় হয়ে থাকে বা আছে। (৩) পরিমার্জন, পরিবর্ধন ইত্যাদি। যেমন পুস্তকের নবতর সংস্করণ, দেহসংস্কার, জীর্ণসংস্কার ইত্যাদি। এবং (৪) একধারণা, বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রবৃত্তি, ঝোঁক, ধর্মবিশ্বাস।

এই নিবন্ধে চতুর্থ অর্থটিই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

মৌলিক যোগসূত্র

সংস্কারের এই আপাত বিভিন্ন অর্থগুলির মধ্যে মৌলিক যোগসূত্র হলো—পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও শুদ্ধিক্রমেই একদিন পুরনো বদ্ধমূল সংস্কারের স্থলে নবসংস্কার জন্মায়। তবে চতুর্থ অর্থ যে বদ্ধমূল ধারণা বা বিশ্বাস, তাও যে শুদ্ধি, পরিমার্জন-ক্রমেই উৎপন্ন হয়েছে তা মনে হয় না। ব্যক্তি এবং সমাজের শান্তিময় জীবনযাপন-পন্থার সন্ধান করতে করতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে তৎকালীন জ্ঞানী মনীষীরা ইতিহাসের পর্বে পর্বে সুস্থ শান্ত জীবননীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তারই ফলে জীবনধারায় নবচেতনার প্রবর্তন বা সংযোজন ঘটেছে। সেই ধারা বহু লোকের সম্মতিক্রমে যখন দৃঢ় ধারণায় পর্যবসিত হয়, তখনি তাকে বলা হয় 'সংস্কার'। অর্থাৎ ধারণারূপে বদ্ধমূল যে সংস্কার ছিল, তা যে একদিন সংস্কার করে অর্থাৎ পরিমার্জন ও সংশোধনের পথেই এসেছিল তা কি অস্বীকার করা যায়? বদ্ধমূল যে সংস্কার ছিল, তা-ই নব সংশোধনের পথে নতুন সংস্কার সৃষ্টি করেছে।

সংস্কারের জন্ম

সংস্কার কি করে কোন্ পথে এসে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে? এর দুটি কারণ মনোবিজ্ঞানীরা দেখান। একটি হলো বংশগতি (Heredity) এবং দ্বিতীয়টি হলো সামাজিক উত্তরাধিকার (Social Heritage)। জন্মের নয় মাস পূর্বে ভ্রূণাবস্থার সূত্রপাত থেকে জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে কিছু মানসিক প্রবণতা বা কারণ-বীজ জন্মায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সেগুলি তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষক হয়। এইগুলি বীজরূপে থাকে, যথা অহংবোধ, ভালবাসা, জিজ্ঞাসা, চঞ্চলতা, একগুঁয়েমি এবং পছন্দ ও অপছন্দের বিবেক। এইগুলিই শিশুতে শিশুতে মাত্রায় মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুদের পরিবেশেও তফাত থাকে। এই পারিপার্শ্বিক কারণ তার বংশগত কারণের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসকে প্রস্ফুটিত করে। এই ব্যক্তিত্ব-বীজের পার্থক্য ও পরিবেশের পার্থক্যের কারণ কি? পার্থক্যের কারণ নিয়ে আর কেউ তেমনভাবে ভাবেননি, ভেবেছেন ভারতের মুনিঋষিরা। বললেন—গতজন্মের কর্মফল। প্রতিজন্মের কর্ম থেকেই দেহ ও মন নব নব সংস্কারসম্পন্ন হয়। প্রতিজন্মের অভিজ্ঞতায় মনের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। আত্মা অবিনাশী, দেহ বিনাশশীল। শিশু যে-পরিবারে জন্মেছে, যে-সমাজে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে, যে আচার-ব্যবহার, ভালমন্দ জ্ঞান পরোক্ষে শিখেছে—সেগুলি তার মজ্জাগত হয়ে সংস্কারের রূপ নেয়। একে বলা যায় অর্জিত সংস্কার। সামাজিক উত্তরাধিকারও বলা যেতে পারে। এইরকম অর্জন সারাজীবন ধরেই চলতে পারে। তবে বংশগত প্রবণতার আনুকূল্যে সামাজিক সংস্কার অর্জনের মাত্রা ও দোষগুণ ব্যক্তিবিশেষে পৃথক হয়। এইসব শক্তির বিকাশে ব্যক্তির ব্যবহার, রীতিনীতি, আচার-বিচার, ঐতিহ্য, রুচি অবচেতন মনে বাসা বাঁধে। ধর্মবোধও এইরকম আরেকটি অবচেতন বা sub-consious রূপে থাকে। অর্জিত ধারণা যা সমাজ, প্রাচীন শাস্ত্র বা কোন মনীষীর কাছ থেকে অভিমত-রূপেই পাওয়া যায়, তা সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এইভাবে কিংবদন্তি অথবা কল্পিত অশরীরী শক্তিধরের অস্তিত্ব-কাহিনী থেকে কিংবা কাকতালীয় ঘটনাপরম্পরার সামান্যীকরণ (Generalisation) থেকে কতকগুলি ধারণা মনে বাসা বেঁধে বিশ্বাসের রূপ নেয়। যেমন ভূতপ্রেত, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু দুর্বল চিত্তেই আশ্রয় করে। অবশ্য এগুলিকে সংস্কার বলা ভুল।

তবে এইরূপ বিশ্বাস অর্জন যেমন পরিমার্জন ও সংযোজনের জন্যই মনকে এসে অধিকার করে, তেমনি দেশ-কাল ও অবস্থাভেদে এবং জ্ঞানের প্রসারে পুরনো ধর্মাচার ও সদাচারের পরিবর্তনও হতে পারে, হয়ও। এই পূর্বার্জিত যে-ধারণাগুলি সংস্কাররূপে মনকে অধিকার করেছিল, যুগ ও কালোত্তীর্ণ জ্ঞানের সঙ্ঘাতে তার পুনঃসংস্কার হতেই পারে। সমাজসম্মত আচার-বিচার-ব্যবহার, জাতকর্মাদি সংস্কার অনুসারেই মানুষে করে। একে বলে 'সদাচার'। এও ধর্মের একটি অংশ বলে মানা হয়। ধর্মের অন্য অংশ হলো অধ্যাত্ম বা ঈশ্বরের শরণাগতি ও উপলব্ধি। তাতে থাকে শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় কর্ম। এগুলিতে বিশ্বাস ক্রমে সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। দেশ, কাল ও ব্যক্তির বৃত্তি ও অবস্থার পরিবর্তনে এই 'হৃদিস্থিত' সংস্কার পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে হতে পারে।

তখন তৎকালীন জ্ঞানী ঋষিগণ প্রচলিত সংস্কারের পরিবর্তন ঘটান। এইভাবেই দেশে দেশে সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম-ধারণা, ধর্মাচার ও সদাচারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সংরক্ষণ-মনস্ক সমাজ (Fundamentalist), যার মধ্যে বিদ্বান শিক্ষকও থাকতে পারেন, যুগ ও অবস্থা-উপযোগী সদাচার ও ধর্মাচারের পরিবর্তন মেনে নিতে চান না। কেউ অচল দৃঢ়বিশ্বাসে (Fanaticism বশে), কেউ বা পাটোয়ারী বুদ্ধিতে এই সংস্কারবিরোধী হন। তাঁদের ও তাঁদের অনুবর্তী সাধারণ লোকেদের বলা হয় 'মৌলবাদী' অর্থাৎ প্রচলিত সংস্কারের সংস্কারবিমুখ ধর্মান্ধ। তখন দেশ-কাল-পাত্রের বিচারে অযৌক্তিক ঐ পুরনো সংস্কার চিহ্নিত হয় 'কুসংস্কার' বলে।

কুসংস্কার ছিল কেন

অনেক সুসংস্কার যুক্তিবিচারসম্পন্ন হয়েই হৃদয়ে বাসা পেয়েছিল একদিন। পরে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে অথবা গুরু, পুরোহিত ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বার্থ-সাধক যান্ত্রিক প্রথায় পর্যবসিত হয়ে কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সহমরণকে আজ বলা হচ্ছে 'কুসংস্কার'। এটি বরাবরই সাধারণে প্রচলিত যে ছিল তা নয়। কিন্তু রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনুর, যুগ্মমরণ-যাত্রা স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শনরূপে মহিমান্বিত ছিল। তাই বহু নারী অসহ্য বিরহ-জ্বালায় এইরকম স্বেচ্ছায় আত্মদান যে করতেন তার ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। তবে সমাজে সাধারণ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায় না, অর্থাৎ প্রচলন যে খুব বেশি ছিল তা বলা যায় না। ধর্মের ব্যভিচার অনেক ক্ষেত্রে যেমন খুবই হয়, তেমনি সতীদাহের ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে সতীর সহ-স্বেচ্ছামৃত্যুর কামনা যদিও ছিল না, তাকে বাধ্য করা হতো, তাই তা নিশ্চয় সংস্কার-অন্ধতা।

আরো একটি উদাহরণ। সকল শক্তির আধাররূপে কোন জড় বস্তুতে বা মূর্তিতে দেবত্ব আরোপ করে তার কাছে মঙ্গল ও আত্মশক্তির উদ্বোধন কামনা পৌত্তলিক বলে খ্রিস্টান ও মুসলমানের চোখে দেখা দিল। হিন্দু ব্রাহ্মদের চোখেও এটি ছিল একটি কুসংস্কার। কিন্তু সকল শক্তির আধাররূপে বিশ্বদেবের কল্পনা তো সহজ নয়। তাদেরও স্মারক প্রতীক একটা চাই-ই। খ্রিস্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মরা যে বাণীরূপ দিয়ে অধরার ধ্যান করেন বা অনুধাবনের চেষ্টা করেন, সেই বাণীরূপও কি বাস্তব আধার নয়? তিনি তো সকল মতেই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, অবাঙ্‌মনসোগোচর। তাঁর অনুধাবন জড় প্রতীক ছাড়া সম্ভব নয়। তাই পৌত্তলিকতা-বিরোধী খ্রিস্টানকে ক্রুশবিদ্ধ যিশু ও শিশু-যিশুক্রোড়ে মেরিমাতার কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনাও করতে হয়। মুসলমানদেরও পশ্চিমদিকে কাবার দিকে মুখ করে বসে ও দাঁড়িয়ে নমাজ পড়তে হয়, হজে গিয়ে কাবার শিলাস্তূপে চুম্বন করতে হয়। তবে এইসব পূজা, ধ্যান ও কৃত্যের যা মুখ্য উদ্দেশ্য তা ভুলে যদি যান্ত্রিক কৃত্যকেই সর্বস্ব করা হয়, তখনি তা হয় মূলাহীন সংস্কার বা কুসংস্কার। সংস্কারেরও সংস্কার তাই যুগে যুগে করতেই হয়। তাই তো খ্রিস্টান ধর্মাচারে ও ধারণাতেও যুগে যুগে পরিবর্তন এসেছে। এসেছে ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টান্ট, লুথেরান, ইউনিটেরিয়ান, কোয়েকার ইত্যাদি এবং মুসলমানদেরও এসেছে প্রধান সিয়া ও সুন্নী, পরে আরো সংস্কৃত হয়ে বাহাই, খোজা, সুফী ইত্যাদি। যখনি ধর্মধারণা বা আচারাদি তার উদ্দিষ্ট মর্ম হারিয়ে ফেলে নিছক যান্ত্রিক অনুশীলনে পর্যবসিত হয়, তখনি মনীষীরা এসে তাকে যুগোপযোগিভাবে সংস্কৃত করেন। তখন মৌলবাদীরা আপত্তি জানায়, বোঝে না যে মর্ম হারিয়ে গণ্ডিবদ্ধ সংস্কার সত্যই হয়ে গেছে কুসংস্কার।

গোষ্ঠীধর্ম

সমভাবাপন্ন ব্যক্তিরা একত্র মিললে গোষ্ঠী তৈরি হয়। গোষ্ঠীবদ্ধতার কারণ হতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশ, যথা গ্রাম, দেশ ইত্যাদি। হতে পারে জৈবিক, যথা পুরুষ ও নারী। হতে পারে সাংস্কৃতিক পরিবেশ, যথা আচার, ব্যবহার, ধর্ম। এই শেষোক্ত সাংস্কৃতিক যে-ধর্ম, তাও একটি শক্তিমান গোষ্ঠীসংগঠক। গোষ্ঠীভুক্ত সভ্যরা একই গোষ্ঠীস্বার্থ, গোষ্ঠী-মর্যাদা ও গোষ্ঠীলক্ষ্যের সমান সতর্ক অংশীদার। ধর্মগোষ্ঠী-ভুক্ত মৌলবাদী লোকেরাই তাদের নিজেদের ধর্মাচার ও সমাজ আঁকড়ে বসে থাকে। যখন তাঁদেরই ধর্মের সাধক-মনীষীরা সংস্কারের উপযোগী পরিবর্তন আনতে চান, তখন মৌলবাদীরা এই পরিবর্তনকে খোদার ওপর খোদকারি বলে চিৎকার করে, নিজেদের প্রচলিত ধর্ম ও আচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরের ধর্মকে নিকৃষ্ট মনে করে। এ আরেকরকম কুসংস্কার। এরাই সংস্কারান্ধ হয়ে বারবার ধর্মযুদ্ধ করেছে এবং করে।

"যত মত তত পথ"

সব ধর্মের, ধর্মাচারের ও সদাচারের উদ্দেশ্য কিন্তু একই, তা হলো পরমপিতার পরম জ্ঞানে সমাধি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আজকের বৈজ্ঞানিক সন্দিগ্ধতার যুগে ভারতবর্ষে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দেখালেন যে, সকল ধর্মাচার আশ্রয় করেই (যেমন বৈদিক, তান্ত্রিক, মুসলিম ইত্যাদি) সিদ্ধিলাভ করা যায়। সিদ্ধিলাভ সব পথেই হয়। তাই তিনি বললেন ঃ "যত মত তত পথ।" তবে সকল মতের উদ্দিষ্ট আদর্শকে ভুললে চলবে না। বললেন ঃ "কি জান? মন চাই, বিশ্বাস চাই। একটা কথা আছে না? গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হলো,/ একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।" সেই এক কে? মন। গুরু, শাস্ত্র পেয়েছ, ভগবানের কৃপা পেয়েছ। এখনো 'একের দয়া' কি?—মনের দয়া। তাহলেই হলো। "এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা।" ❑

বিশেষ আলোচনা

বিবেকানন্দের সমাজভাবনা ও 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'

পূর্বা সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

'সত্ত্বগুণ' আর 'তমোগুণ' শব্দের মধ্যে সমগ্র জাতির মানসিকতাকে তুলে ধরা বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব। পরিব্রাজক অবস্থায় গণচেতনার সঙ্গে তাঁর যে সংযোগ ঘটেছিল, সেই সংযোগের মাধ্যমে তিনি বুঝেছিলেন ভারতীয় জনমনের অবস্থাটি। পরিব্রাজক অবস্থায় তৎকালের সাধুসমাজের মধ্যেও এই তমোগুণের আধিক্য দেখেছিলেন স্বামীজী। হিমালয়ের পথে ঘোরার সময় তিনি ও স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখতে পান, একটি সাধু ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে থাকলেও চাদরের আড়ালে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বিবেকানন্দ এই দৃশ্য দেখে ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন: "ওরে! এখানে এসে বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে—কম নয় তো! দে বেটার কাঁধে লাঙল জুড়ে, তবে যদি ওর কোনকালে কিছু হয়!"[১৯] অলসতাকে বৈরাগ্যের আবরণে প্রকাশ করার বহু নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তিনি সন্ন্যাসীদের নানা সামাজিক কর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। সত্ত্বগুণের ধুয়ো তুলে অর্থাৎ ধর্মের অজুহাত দিয়ে একটি অলস জড়প্রায় সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল ভারত। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থসথসে জেলিমাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কিনা দেখব। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব—একেবারে সম্পূর্ণ নতুন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।"[২০] এই সতেজ নবীন ভারতবর্ষের জন্য তিনি চেয়েছিলেন রজোগুণের উন্মেষ।

বিবেকানন্দ যে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের কথা উল্লেখ করলেন, এর এক বিশেষ অর্থ আছে। সামাজিক শোষণের কথা অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন। উচ্চশ্রেণির জন্য সমস্ত মানুষ শোষিত হবে কেন?—এ-প্রশ্ন স্বামীজীও করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্রের কথা বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেউ বলেছেন বলে আমরা জানি না। উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষ কয়টি হয়? তাঁদের জন্য সমস্ত মানবজাতির ওপর বৈরাগ্যের দায়িত্বকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এই কারণেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে (হইবার) আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবেই পরম কল্যাণ।"[২১]

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সমাজ-জীবনের গতানুগতিকতা থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী চরিত্র খুবই অল্প। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জীবের প্রতি অহিংসা ও সহানুভূতির প্রকাশ দেখি। বিবেকানন্দ এই অহিংসা ধর্মকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অনুসরণীয় বলে মনে করেননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মতো আশ্রমভেদে ধর্ম নিরূপণের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সামাজিক পটভূমিকায় গীতার দর্শন প্রচার করেছিলেন, সেই সমাজব্যবস্থায় চতুরাশ্রম ও চতুর্বর্ণের কাঠামো সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক পটভূমিকায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রূপ ছিল ভিন্ন ও ভঙ্গুর। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের আধ্যাত্মিক অধিকারিভেদে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কর্তব্য নিরূপণ করেছেন। বিবেকানন্দ স্পষ্টভাষায় বললেন, সন্ন্যাসীর কর্তব্য অহিংসা, কিন্তু গৃহীর তা কর্তব্য হতে পারে না। তাকে কেউ একটি চড় মারলে সেই আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত দেওয়াই উচিত। কর্মযোগের আলোচনায় বিবেকানন্দ 'নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়'[২২] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য সামাজিক ধর্মবোধ এক হতে পারে না। এদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য, কারণ মানুষের মধ্যেই একটি সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। মৃণালিনী বসুকে একটি চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছেন: "বহুর জন্য একের সুখ—একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে-বেঁধে প্রীতি কি হয়? চিরভিখারির ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ?... সমাজের জন্য যখন নিজের সমস্ত সুখেচ্ছা বলি দিতে পারবে, তখন তো তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে। সে ঢের দূর।"[২৩]

আগে একের জন্য ত্যাগ করলে তবে বহুর জন্য ত্যাগ করতে পারা যায়। আমরা নিজেদের মধ্যে এই বিবর্তনকে স্বীকার না করে অপরের আদর্শকে অনুকরণ করতে চাই। বিবেকানন্দ এই অনুকরণের পরিবর্তে বিবর্তনকে স্বীকার করতে বলছেন। তৎকালের ভারতবাসীর সত্ত্বগুণের ছদ্মবেশ ধরে অশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় তমোগুণী হয়ে ওঠা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সমাজচেতনার মধ্যে এই ফাঁকিটি নির্ণয় করা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু যুগপরিবর্তনের ধারাটিকে বিবেকানন্দ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সেযুগে কালাপানি পার হলে ধর্মচ্যুত হতে হতো—যে সামাজিক শাস্তির রূপ স্বয়ং বিবেকানন্দ নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই যুগে দাঁড়িয়ে তিনি শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন: "তোরা বিদেশে গিয়ে ব্যবসা কর, কিছু না পারিস বেনারসি কেটে স্কার্ট প্রস্তুত কর।"[২৪] কিংবা "বিদেশে দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা খুব ভাল চলবে—তাই নিয়ে গিয়ে বিক্রি কর।"[২৫] বিদেশে অড়হর ও মসুর ডালের স্যুপের ব্যবসার পরিকল্পনা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা পাই। তিনি এই

বৈপ্লবিক চিন্তা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিপুষ্টি লাভের জন্য প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। যুগের সাথে তাল রাখতে, বিশ্বের অর্থনীতির সঙ্গে তাল রাখতে ভারতকে যন্ত্রশিল্পে উন্নত হতে হবে, কারিগরি শিল্পে উন্নত হতে হবে, তাই তিনি শিকাগো বক্তৃতার আগেই আমেরিকার এক বক্তৃতাসভায় বলেছিলেন, তাঁর বিদেশ আগমনের উদ্দেশ্য এমন এক সঙ্ঘ প্রস্তুত করা, যে-সঙ্ঘের সদস্যগণ ভারতের শ্রমশিল্প ও কারিগরি শিল্পের উন্নতি করতে পারবে।[২৬] 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য় তিনি বললেনঃ "চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[২৭]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যা আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন ঃ "ভারতের আদর্শ ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বা বহির্মুখী। পাশ্চাত্য এতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতিও সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।"[২৮] আবার ১৮৯৪-এর ১৯ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে মাদ্রাজী ভক্তগণের উদ্দেশে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইওরোপের সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন।"[২৯] আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা বিবেকানন্দের এই দুটি উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, ভারত ও ইউরোপের সভ্যতার মূলগত পার্থক্যের সমন্বয়ে তিনি এক নতুন ধারার সৃষ্টি চাইছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিবেকানন্দের এই স্বপ্ন, এই ইচ্ছা তাঁর আবেগ থেকে উৎসারিত। কিন্তু না, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন দেখে নতুন সৃষ্টির যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার পিছনে ছিল বিরাট ঐতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন। তিনি জানতেন, দুই বিপরীত ভাবের সভ্যতার যখন মিলন হয়, তখনি একটি বিরাট পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় সমাজজীবনে। তিনি 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় বলছেন ঃ "সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনি জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সম্প্রসারিত [হয়] এবং মানব-মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে নতুন এক সমাজচেতনা ও ধর্মচেতনার বিস্তার 'উদ্বোধন' পত্রিকার উদ্দেশ্য—জানিয়েছেন বিবেকানন্দ। এই উদ্দেশ্যলাভের জন্য তিনি প্রথমে দুই সভ্যতার সম্মেলনের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তারপর উনবিংশ শতাব্দীর তমোগুণে সমাচ্ছন্ন ভারতের সম্যক ছবিটি স্মরণ করিয়ে ভারতকে কর্মের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হতে বলেছেন। কিন্তু দুটি সভ্যতার মিশ্রণের ফলে যে নতুন সামাজিক ভাব বেরিয়ে আসবে, তার সম্বন্ধে কিছু বলেননি। কারণ, তিনি সচেতন গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি বিকাশে বিশ্বাস করতেন। তিনি শুধু আমাদের সাবধান করেছেন ঃ "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"[৩০]

দুটি সভ্যতার সংমিশ্রণে অনুকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাহলেও কূপমণ্ডূকতাকে ধ্বংস করে আদানপ্রদান প্রয়োজন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর এই মনোভাব স্মরণ করে লিখেছেন ঃ "মনে রাখিতে হইবে, ভারতের অতীতের কেবল পুনরুজ্জীবন অথবা পুনঃসংস্থাপন স্বামীজীর একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না।... তিনি নিজে চাহিতেন, ভারতের প্রাচীন শক্তির নূতন প্রয়োগ, এই নূতন যুগে তাহার কল্পনাতীত বিকাশ। তিনি 'ডাইনামিক রিলিজন' অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ধর্ম দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন।"[৩১] 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় এইভাবে তাঁর সমাজভাবনার মূলসূত্রটি তুলে ধরেছেন বিবেকানন্দ। ❑ [সমাপ্ত]

সূত্র

১৯ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ৭০
২০ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩
২১ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩
২২ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭
২৩ ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২
২৪ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পৃঃ ১১৫-১১৬
২৫ ঐ
২৬ 'বাণী ও রচনা', ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬
২৭ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২
২৮ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৮
২৯ ঐ, পৃঃ ৪১
৩০ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৩৪
৩১ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা (স্বামী মাধবানন্দ অনূদিত), পৃঃ ২০১

মরিশাসে ছয়দিন

স্বামী স্মরণানন্দ

আমন্ত্রণ এসেছিল ডারবানের 'রামকৃষ্ণ সেণ্টার অফ সাউথ আফ্রিকা' থেকে। সেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল ৩ মে ২০০২। ভাবলাম, মরিশাস হয়েই যাই না কেন! কারণ, এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলছে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কলকাতা থেকে ২৫ এপ্রিল মুম্বাই পৌঁছে পরদিন সকালে এয়ার মরিশাসের বিমান ধরলাম।

মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী সম্বন্ধে লেখার আগে এই অবিশ্বাস্য সুন্দর দ্বীপটি সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া দরকার।

মরিশাস একটি ছোট্ট দ্বীপ। আয়তনে ২০৪০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে এটি ৬৫ কিলোমিটার বিস্তৃত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪৫ কিলোমিটার। এই দ্বীপটির অবস্থিতি আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বকূলের কাছে এবং মাদাগাস্কার থেকে ৮০০ কিলোমিটার পূর্বে। ভারত মহাসাগরের বুকে মুক্তার মতো এই দ্বীপটি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। প্রধান শহরগুলি হলো রাজধানী পোর্ট লুইস, দেশের মধ্যভাগে মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত ভ্যাকুয়াস, কিয়োরপাইপ ও ফিনিক্স।
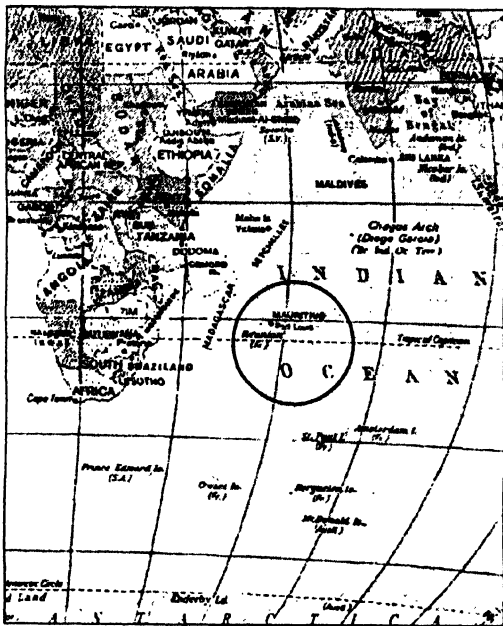
মরিশাস

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই দ্বীপটি ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ, বসতিহীন ও নিরুপদ্রব। ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকা যাওয়ার পথে নাবিকরা কখনো কখনো কিছুক্ষণের জন্য এখানে থামত।

ওলন্দাজরা অর্থাৎ নেদারল্যাণ্ডসের অধিবাসীরা প্রথম স্থায়িভাবে এখানে বসবাস শুরু করে। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপটি অধিগ্রহণ করে ও তাদের দেশের শাসনকর্তা মরিস ভ্যান নাসান-এর নামে দ্বীপটির নামকরণ করে 'মরিশাস'। যদিও ঐ দ্বীপে তারা কিছু ফল ও সবজির চাষ করেছিল, তবুও তা সেকালের সামান্য জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। মাদাগাস্কার থেকে নিয়ে আসা ক্রীতদাসের সংখ্যা ৩০০-র বেশি ছিল না। ওলন্দাজরা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বন্য জন্তু শিকার করত। সেইসময় 'ডোডো' (ওড়ার ক্ষমতাহীন) নামে একপ্রকার পাখি প্রচুর সংখ্যায় এই দ্বীপের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। ওলন্দাজরা তাদের এত বেশি সংখ্যায় মারতে শুরু করল যে, এই পক্ষীকুল একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই ঘটনা থেকেই ইংরেজি ভাষায় এক বিশেষ অভিব্যক্তি 'as dead as dodo'-র উৎপত্তি। পরবর্তী কালে ওলন্দাজরা আখের চাষ শুরু করে। এই চাষই বর্তমানে মরিশাসের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ওলন্দাজরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে। তাদের জায়গায় আসে ফরাসিরা ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে। তারা এই দ্বীপের নামকরণ করে 'Ile de France'। তাদের শাসনাধীনে মরিশাসের সর্বতোমুখী অগ্রগতি হতে থাকে। কৃষি, আখচাষ, চিনিশিল্প, শিক্ষা ইত্যাদিতে অগ্রগতি হয়। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে যাওয়া-আসার জন্য এই দ্বীপের গুরুত্ব ফরাসি ও ইংরেজ উভয় পক্ষেরই নজরে আসে। তাই ফরাসিদের থেকে এই দ্বীপ জয় করতে ইংরেজরা অনেকবার চেষ্টা করে। অবশেষে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে তারা মরিশাসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে সফল হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণ ও চুক্তি সাক্ষর করার সময় মরিশাসে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ফরাসিরা ইংরেজদের সম্মত করিয়েছিল। কাজেই এখনো পর্যন্ত এই দ্বীপে ফরাসি ভাষার প্রচলন রয়েছে। এখানে ফরাসি ভাষায় খবরের কাগজ আছে। কিন্তু ইংরেজিতে একটিও খবরের কাগজ নেই!

জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যানের (demographically) দিক থেকে ফরাসি ও ইংরেজ শাসকদের সময় এই দ্বীপে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ফরাসিরা তাদের খামারবাড়িতে কাজ করার জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের ধরে এনেছিল। আর ইংরেজরা ভারতীয় শ্রমিকদের এনেছিল আখের খেতে ও চিনিকলের সমস্ত কাজ দেখাশোনার জন্য। এখনো এই দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হলো চিনি।

বর্তমানে মরিশাসের জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন বা ১২ লক্ষ। এর মধ্যে রয়েছে ৬৮% ইন্দো-মরিশিয়ান (হিন্দু ৫২%, মুসলিম ১৬%), ২৭% ইওরোপীয়ান-আফ্রিকান এবং মিশ্র ইওরো-আফ্রিকান, আর ৫% হলো চিনা। এদেশের অধিবাসীরা ইংরেজি, ফরাসি এবং ক্রিয়োলে (আফ্রিকান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষা) কথাবার্তা বলে। দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে ক্রিয়োলের ব্যবহার খুব রয়েছে। হিন্দি ভাষার চর্চা ও সংরক্ষণ ভোজপুরী-বংশোদ্ভুত ব্যক্তিদের মাধ্যমে হচ্ছিল। কিন্তু আজকাল অন্যান্য অনেক ভাষা শেখার ফলে নতুন প্রজন্ম হিন্দি প্রায় ভুলতেই বসেছে। অল্পস্বল্প তামিল ও তেলেগু ভাষাও এখানে চলে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়। চুক্তিনামাভুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়। মরিশাস স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শিউসাগর রামগুলাম। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মরিশাস সাধারণতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলেও স্বাধীনতালাভের পর থেকে এই দেশ বিভিন্ন দিকে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। পর্যটনব্যবস্থার জন্য ও চিনি, পশমি পোশাক, চা ইত্যাদি রপ্তানির ফলে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। আর এই দেশ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির মতোই তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি অর্থাৎ মাদকাসক্তি ইত্যাদি নিয়েই এগিয়ে চলেছে।

(২)

মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ধরে খ্রিস্টানরা ইন্দো-মরিশিয়ান সম্প্রদায়ের লোক-জনদের, বিশেষত তামিলদের ভীষণভাবে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। ধর্মান্তরকরণ রোধের জন্য তামিল নেতাদের একটি সমিতি তৈরি করা হয় যাতে ঐ সমিতির সভ্যগণ তৎকালীন সমস্যাটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে যথোপযুক্ত সমাধানসূত্র বাতলে দিতে পারেন। কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দুও এর সদস্য ছিলেন। এই দলটি হিন্দুধর্মের সমর্থক জন ডি. লিনজেন কিলবর্ণ নামে একজন ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই ভদ্রলোকই হিন্দুদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে নিষেধ করে তাদের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলেন এবং একজন সন্ন্যাসীকে মরিশাসে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাতে পরামর্শ দেন। সেখানকার হিন্দুরা রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনে অনুরোধ পাঠালেন মরিশাসে হিন্দুধর্মের একজন প্রচারক পাঠানোর জন্য। তারই ফলে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামী ঘনানন্দ মরিশাস পৌঁছালেন। তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও জোরালো বক্তা। সমস্ত দ্বীপটির ইন্দো-মরিশিয়ান সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁকে খুব আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। তাঁর বক্তৃতাবলী বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

ধীরে ধীরে স্বামী ঘনানন্দ দ্বীপটির বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে তিনি ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। তার ফলে এই দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে তিনি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন এবং আর. জি. দেশাই অ্যাণ্ড কোং-এর উদার সহায়তায় তিনি ১৫ ক্যান্টন্স, ভ্যাকোয়াস-এর সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশনের মূল কেন্দ্রটি এখানেই অবস্থিত।
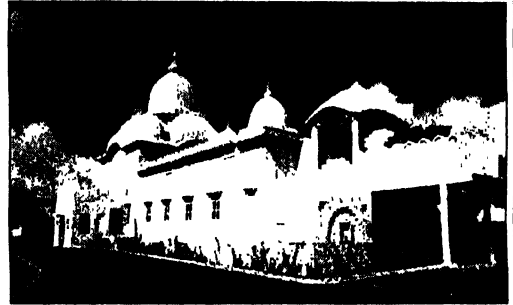
শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, মরিশাস

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দ ইংল্যাণ্ডে চলে যান সেদেশে নতুন কেন্দ্র 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার' শুরু করার জন্য। তবে তাঁর ওদেশে চলে যাওয়ার আগেই মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দের জায়গায় এলেন স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ। তিনিও তাঁর পূর্বসূরিদের প্রবর্তিত কার্যাবলী খুবই আগ্রহের সঙ্গে পরিচালনা করেন। একজন পণ্ডিত ও ভাল বক্তা হিসাবে তাঁকে মরিশাসের অধিবাসিগণ খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর কৌতুকবোধ ও মানুষজনের সঙ্গে হাসিখুশিপূর্ণ মেলামেশা তাঁকে ভক্তদের খুব কাছের মানুষ করে তুলেছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রচারকার্য চালু রাখার জন্য সেদেশে চলে যান।

স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দের স্থলাভিষিক্ত হন স্বামী কৃতানন্দ। তিনিও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬ নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উৎসর্গীকৃত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অপরানন্দ আশ্রমে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। এখনো প্রত্যেক বছরই দুর্গাপূজা হয়।

১৯৭৯ পর্যন্ত এখানে অনেক সন্ন্যাসী আসেন ও চলে যান। স্বামী বলরামানন্দ মরিশাস কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও দক্ষ ব্যক্তি। তাঁর সময়েই এই কেন্দ্রের কার্য বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয় ও ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অন্যতর সহাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ স্বামী বলরামানন্দ দেহত্যাগ করেন।

মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষরূপে স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৮৭-র জুলাই মাসে। তিনি সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলেছেন। বর্তমানে এই কেন্দ্রটি স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়।

(৩)

ভ্রমণবৃত্তান্ত

২৬ এপ্রিল ২০০২ মুম্বাই থেকে সকাল ৯.০৫-এ এয়ার মরিশাসের বিমানে রওনা দিয়ে মরিশাসের সময় দুপুর ১.৩৫-এ সেখানে পৌঁছাই। উড়ানের সময় ৬ ঘণ্টা। মরিশাসের সময় ভারতীয় সময়ের চেয়ে ১½ ঘণ্টা পিছিয়ে।

স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ ও আশ্রমের পরিচালন সমিতির সম্পাদক কিশোর গুঞ্জাধর আমাকে নিয়ে যেতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন। মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশন খুবই পরিচিত ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। কাজেই বিমানবন্দরে অভিবাসন (immigration) ও শুল্ক-সংক্রান্ত ছাড়পত্র পেতে অসুবিধা হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ২২ কিলোমিটার দূরবর্তী ভ্যাকোয়াসে আমাদের মূল কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল।

চমৎকার রাস্তা সুদৃশ্য আখের খেতের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। দিগন্তে বিভিন্ন আকৃতির ঊষর ঘোরবর্ণ আগ্নেয়শিলা-সহ ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। এসবেরই উৎপত্তি হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি তাদের এই আকারে পরিবর্তিত করেছে।

আশ্রমে পৌঁছানো মাত্রই ওখানকার টেলিভিশনের একটি দল ৩ মিনিটের জন্য আমার এদেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার নিল। যদিও ৩ মিনিটের জন্য এই সাক্ষাৎকার ছিল, আসলে একটু বেশি সময়ই লাগল। আবহাওয়া ছিল শীতল ও মনোরম। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল শুরু হচ্ছে। মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সামান্য কিছু আলোচনা হলো।

মন্দিরে গিয়ে দর্শন ও প্রণামের মাধ্যমে শুরু হলো পরের দিনটি—২৭ এপ্রিল। শীতল প্রাণজুড়ানো বাতাস বইছিল। কোনরকম দূষণ নেই! সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, ফুল ও গাছপালা-সহ আশ্রমের দৃশ্যটি অতি মনোরম। কেউ কেউ বললেন ঃ "আপনি ভাগ্যবান। আবহাওয়া এখন খুব ভাল।

মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশন

মাঝেমাঝেই এখানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়ে থাকে।" বাস্তবিকই যে ছয়দিন মরিশাসে ছিলাম, কখনো সাময়িক ঝিরঝির বৃষ্টি ছাড়া বেশি বৃষ্টি হয়নি।

সকালে গেলাম 'গঙ্গা তালাও'-এ। পাইনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুব কম। ঐ জায়গায় পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। যাওয়ার পথে পড়ে এক বিশাল হ্রদ। সমস্ত দ্বীপটির জলের চাহিদা মেটায় এই হ্রদ।

নিচু পাহাড়গুলির মধ্যভাগে অবস্থিত একটি ছোট হ্রদ হলো 'গঙ্গা তালাও'। জনৈক ব্যক্তি ভারত থেকে গঙ্গাজল নিয়ে এসে এই হ্রদে ফেলেছিলেন। তাই এর নাম 'গঙ্গা তালাও'। কয়েকটি মন্দিরও রয়েছে এখানে। প্রধান মন্দিরটি 'মরিশাসেশ্বর'-এর নামে উৎসর্গীকৃত। অন্য মন্দিরগুলিতে রয়েছেন গণেশ, গায়ত্রী, কালী, লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি। আর খাড়া পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন হনুমানজী। সমুদ্রতল থেকে এই জায়গার উচ্চতা প্রায় ১,৫০০ ফুট।

আশ্রমে ফেরার পর 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্মধারা' বিষয়ে টেলিভিশনের জন্য একটি ৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকার দিতে হলো। সন্ধ্যায় কিশোরের বাড়ির কাছেই রাজীব গুঞ্জাধরের বাড়িতে সৎপ্রসঙ্গ হলো। সামিয়ানার নিচে বসার জন্য চেয়ার দেওয়া ছিল। প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ সমবেত ভজনগান পরিচালনা করেন। আমি প্রায় ৪০ মিনিট বললাম। উপস্থিত সকলের রাজীবের বাড়িতেই রাত্রের আহারের ব্যবস্থা ছিল।

পরদিন রবিবার আশ্রমে অধ্যাত্ম-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রায় ৩০০ জন যোগদান করেছিলেন। কয়েকজন মহিলা ভক্ত সকাল থেকে সকলের জন্য রান্না

ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেন। দুপুরে সবাই প্রসাদ পেলেন। ভক্তদের এক চমৎকার সমাবেশ! তাঁরা ভজনানন্দও উপভোগ করেছিলেন।

বিকালে যাই পোর্ট লুইসে। এখানেও অফিস টাইমে রাস্তায় যানজটের সমস্যা রয়েছে। মরিশাসে অফিস ছুটি হয় ৪টে নাগাদ। তাই অফিস-ফেরত যাত্রীদের গতি ছিল বিপরীত দিকে।

সন্ধ্যায় যাই সেন্ট জুলিয়েন ডি. হটম্যান গ্রামে। এখানে আশ্রম একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। প্রায় ১০০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ভজন ও কিছু আলোচনার পর আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। রাত্রে আহারের ব্যবস্থা আশ্রমেই ছিল।

পরদিন সকালে স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ আমাকে মরিশাসের রাষ্ট্রপতি কার্ল হফম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য নিয়ে যান। তিনি ক্যাথলিক। চা-পান করতে করতে আমরা যুবসম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। যুবসমাজের মধ্যে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ মাদকাসক্তির সমস্যা বিষয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি মনে করেন, এই সমস্যার মোকাবিলায় বাবা-মায়েদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সন্তানদের প্রতি তাঁদের আরো নজর দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে আধুনিকতার অমঙ্গলজনক বিষয়গুলিও তাদের জীবনে প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আমরা শপিং প্লাজা দেখতে গেলাম। এখানে গাড়ি রাখার কোন সমস্যা নেই। আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশের শপিং ম্যালেরই অনুরূপ। যেন একটুকরো আমেরিকা এখানে তুলে আনা হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে কিয়োরপাইপ শহরের কাছে একটি আগ্নেয়গিরির মুখ দেখতে গেলাম। এটি একটি পর্যটনকেন্দ্র।
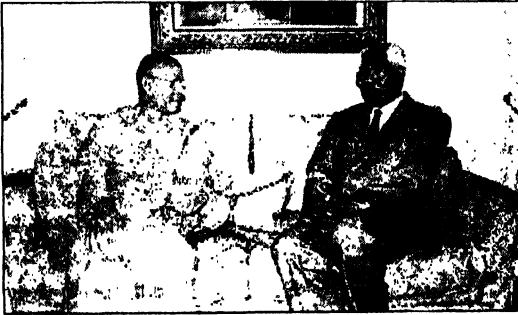
মরিশাসের রাষ্ট্রপতি কার্ল হফম্যানের সঙ্গে লেখক

বিকালে আবার যাওয়া হলো 'গ্র্যাণ্ড বে'। এটিও একটি জনপ্রিয় পর্যটন ও বিহারস্থান। সেখান থেকে গেলাম প্যাম্পেলমাউসেসের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। যদিও বাগানটি খুব বড় নয়, কিন্তু এটিকে খুব সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এখানেই আমরা অতিকায় 'ব্রাজিলিয়ান লিলি' দেখলাম। এই গাছের পাতাগুলি এক-একটি বিশালাকৃতি থালার মতো। তারপর পৌঁছালাম 'লং মাউন্টেন'-এ। এখানে 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এ একটি অধ্যাত্ম-শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১০০-র বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়টি দেখাশোনা করেন সারদা গুলাম নামে এক ভক্ত। নৈশাহারের পর রাত সোয়া ১০টা নাগাদ আশ্রমে ফিরলাম।

পরদিন ৩০ এপ্রিল ভোর হলো সামান্য বৃষ্টিপাত-সহ ঝোড়ো আবহাওয়া নিয়ে। সম্ভবত আমাকে মরিশাসের ভয়াবহ দিকটির সঙ্গে পরিচিত করার জন্যই! যেসব পর্যটক এই দ্বীপ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন, তাঁরা এর খামখেয়ালী আবহাওয়া সম্বন্ধে অবহিত নন।

সকাল ৮½টা নাগাদ 'ইন্দিরা গান্ধী উচ্চ বিদ্যালয়'-এ গেলাম। এটি ছেলেদের বিদ্যালয়। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা এর অধ্যক্ষা। সরকার থেকেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হয়। 'জীবন ও জীবন-যাত্রার জন্য শিক্ষা' বিষয়ে ছাত্রদের কাছে প্রায় ২৫ মিনিট বললাম।

এখান থেকে আমরা এই দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত 'ব্লু বে' নামে এক অতি মনোরম সমুদ্রতটে গেলাম। সেখান থেকে সোয়া ১২টা নাগাদ আশ্রমে ফিরলাম। সন্ধ্যারতির আগে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশে প্রায় আধঘণ্টা বললাম। যেহেতু পরদিনই আমার দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা, তাই ভক্তদের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার বিদায়গ্রহণের মতোই হলো।

১ মে হাতে যথেষ্ট সময় ছিল মরিশাসের সর্বোচ্চ স্থান দেখতে যাওয়ার জন্য। স্থানটি একটি ঝরনা-সহ 'ব্ল্যাক রিভার গিরিসঙ্কট'—সমুদ্রতল থেকে ২,৭৬০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রশান্ত অরণ্যরাজি-পরিবেষ্টিত পর্বতমালা, অদ্ভুত আকার-বিশিষ্ট প্রস্তরসকল ও তার সামনে অবস্থিত উপত্যকা—এইসব একত্রিত হয়ে এখানকার দৃশ্যপট খুবই আকর্ষণীয়। ১ মে ছুটির দিন হওয়ায় চড়ুইভাতির জন্য লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। বাসভর্তি নারী-পুরুষ-কচিকাঁচারা। এই সময় গাছে পেয়ারা পাকে। তাই তাদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছিল পাকা জংলী পেয়ারা সংগ্রহের জন্য। তারা এই ফলগুলি জেলি তৈরির জন্য ব্যবহার করে।

২ মে দুপুরে আশ্রমে ২৫-৩০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ তাঁদের নিজেদের দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। দুপুর ২.৩০টা নাগাদ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আবেষ্টনীতে মাত্র দুজনের যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এখানে অপেক্ষা করার সময় আমাদের চা পরিবেশন করা হলো। দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম শহর জোহানেসবার্গের উদ্দেশে বিমান উড়ল বিকাল ৪.২০ মিনিটে। মরিশাস থেকে আকাশপথে সেখানে পৌঁছাতে ৪½ ঘণ্টা লাগে। ❑

তোমার জমিদারি

বাসুদেব ভট্টাচার্য

হতে পার জমিদার, পাইক পাঠিয়ে দিকে দিকে
আধিপত্য বিস্তারের এ কোন্ ধরন?
কৈবর্তের পুরোহিত, অশিক্ষিত, তবু কোথা শিখে
চাতুরীর ইন্দ্রজালে সব জমি আয়ত্তীকরণ!

পরনের কাপড় তো খসে খসে পড়ে,
ধুলোয় লুটায় দামি শাল,
বিশ্বাসী জনের তবু আসলটা সুদ-সুদ্ধ ধরে
বদলিয়ে কী কৌশলে কর নাজেহাল?

খাসতালুকের সঙ্গে সসাগরা পৃথিবীটা জুড়ে
জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে করে নেবে পূজা?
সাবধান হে সংসারি! চিনে রাখ পাগল ঠাকুরে!
জাতে সে মাতাল তবু তালে ঠিক সোজা।

আমি কি খাতক! কোন দেনা আছে বাকি?
কেন বেঁধে নিয়ে যায় তোমার পেয়াদা?
আমি কি তোমার প্রজা, যা খুশি করবে তুমি নাকি!
এই একনায়কত্বে কেউ কি দেওয়ার নেই বাধা!

বিদ্রোহী হব না আমি? এতটুকু জমি ছিল বুকে,
সেটাও ছিনিয়ে নিয়ে জবরদখল!
কোন্ ভাষে নিন্দা করি! বলা যে হয় না শেষ-মুখে,
একবার মুখোমুখি দেখা দিয়ে, হে প্রভু, জানাও তুমি কতটা সফল?

মৃত্যুর মুখোমুখি

নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চলছে জন্মের ক্ষণটি থেকে।
বারবার শস্ত্রসম্পাত করে মৃত্যু ভেবেছিল
সেই জিতবে, আমি হারব।
মূর্খ জানে না, 'আমি' মৃত্যুঞ্জয়।
"কিংমূর্খ, শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ"?
'আমি' এই দেহটা নই, আমি সেই শাশ্বত সত্তা—
যা সবকিছু হয়েছে, সবকিছুতে অনুস্যূত,
আবার সবকিছু হয়েও সর্বাতিরিক্ত।
সবকিছু তাতেই আছে—
"অজীব্যঃ সর্বভূতানাম্"।
মৃত্যু জানে না, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই,
বিকার নেই, আমার সত্তা "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"—
আমি ষড়্‌দোষশূন্য, আমার বন্ধন নেই, মুক্তি নেই—
আমি নিত্যমুক্ত—
দেহে থেকে মুক্তির সুখ আস্বাদ করতে জন্মধারিত।
আমি তাই "যস্মাৎ বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"।
'নৈরাশ্যে'র সুখসাগরে ডুবে একটি ইচ্ছাই
জেগে থাকছেঃ 'ফিরে ফিরে গাই, কারে বা ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।' 'জনমে জনমে
দয়ানিধে!' 'দাস তোমা দোঁহাকার।'

উত্তরণ

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

বিষয় আর ইন্দ্রিয়সুখ
যশ আর প্রতিষ্ঠা
দেহে-মনে রইলে মেখে
এই শূকরী-বিষ্ঠা—
জীবনে তাই বিপদ সংশয়।

বস্তু-উর্ধ্বে পরমাপ্তি
চিত্ত কর শুদ্ধ, স্থির,
হংস-মন ক্ষীরাহরণ
তবেই করে ছাড়িয়া নীর—
দেখান কৃপা যদি জ্যোতির্ময়!

বিরহ-ধূপ হৃদয়ে জ্বাল
তুচ্ছ কর সব স্থূলতা
পরমপদকমল তরে
জাগাও মহা আকুলতা—
লক্ষ্য ঐশ্বরিক আশ্রয়!

অমৃতকথা

মৃণাল মোদক

যে আমাকে ডুবতে দেয় না
সে আর কেউ নয়,
পিছনে বাঁধা আমারই শোলা।

যে আমাকে দেখতে দেয় না
সেও এক ছায়া,
মায়াবী রঙিন সীতারও আড়াল।

যে আমাকে বুঝতে দেয় না
সে আমার 'আমি',
গল্পে ভোলানো এক আশ্চর্য সঙ্কলন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণে

সামসুজ জামান

তোমার অমৃতবাণী দিকে দিকে হোক সুরভিত—
হে উদার, মঙ্গলময়!
তোমার অমৃতবাণী জাগাক মঙ্গলগান সকলের প্রাণে
পৃথিবীর পাপ হোক ক্ষয়।।
যত পাপ, যত তাপ, আছে যত রাগ-দ্বেষ
তোমার সুরের মায়াজালে।
যেন ভুলে যেতে পারি যত আছে অবিশ্বাস
তুমি যে 'অরুণ' চক্রবালে।।
সত্যই জীবনের সব, সত্য হোক জীবন-তপস্যা,
সত্য হোক আসল ঈশ্বর।
ভক্তি থেকে বৈরাগ্য, বিবেক, প্রেম-ভাব
টাকা মাটি, মাটি টাকা, সংসার নশ্বর।।
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব এক—
যত মত তত আছে পথ।
কারো কভু নিন্দা নয়, অহঙ্কার মায়া ছেড়ে
ধ্যানে জ্ঞানে হতে হবে সৎ।।
বাসনাকে কর ত্যাগ, মোহমুক্ত কর মন,
বেঁধো নাকো ভোগের বন্ধনে।
হৃদয়মন্দির মাঝে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা কর,
ধ্যান কর মনে-কোণে-বনে।।
তোমার পদাঙ্ক ধরে চলেছেন কত ভক্তজন
গিয়েছেন মা সারদা, বিবেকানন্দ।
এভাবেই তৃপ্ত হবে কলুষ এই ধরাখানি
ভরে যাবে অমৃত সুগন্ধ।

নতুন যুগের সূর্য ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ

শেখ সদরউদ্দীন

পুব গগনের তমস নাশে, নতুন যুগের সূর্য ওঠে,
দিকে দিকে আলোক ছড়ায়, মনের বনে পুষ্প ফোটে।
মৌমাছি-মন গুঞ্জরনে মধু লোটে ফুলে ফুলে,
চিদানন্দে বইল পবন, উঠল হৃদয় দুলে দুলে।
আলোর ঝালর নামিয়ে দিয়ে নবীন প্রাণের সূর্য হাসে—
প্রেমের পাখি কলতানে নীলাকাশের বুকে ভাসে।
আলোর বাণী বুকে নিয়ে দিগ্বিদিকে বাতাস ছোটে—
পুব গগনের তমস নাশে, নতুন যুগের সূর্য ওঠে!

অন্ধমানুষ পড়েছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে—
উঠল জেগে নতুন সূর্য, হানল আঘাত বন্ধ দ্বারে!
চেতনহারা পেল চেতন, অজ্ঞানীরা জ্ঞানের আলো,
দূরে গেল আঁধার রাতে মনের কোণের জমা কালো।
জাতিধর্মভেদের প্রাচীর রচেছিল যে-ব্যবধান···
আলোর ঘায়ে পড়ল ভেঙে অতি বিশাল সে-প্রাচীরখান!
পাপী-তাপী অনুতাপে জ্যোতির্ময়ের পদে লোটে—
পুব গগনের তমস নাশে, নতুন যুগের সূর্য ওঠে!

তাঁরই পায়ের পরশ নিয়ে 'বিবেকবাণী' উঠল জেগে—
সনাতন সেই ধর্মমতের পুণ্যবাণী ছুটল বেগে।
যত মত আর তত পথ-এর দিশা পেল বিশ্ববাসী—
মাটি টাকা, টাকা মাটি-র মতাদর্শে মোহ নাশি।
সূর্য যেমন নিজে জ্বলে আলো ছড়ায় ধরণীতে—
তেমনি আলো, পরমহংস ছড়িয়ে দিলেন মানব-হিতে।
'কল্পতরু'র কৃপা পেতে একসাথে আজ সবাই জোটে—
পুব গগনের তমস নাশে, নতুন যুগের সূর্য ওঠে!

ফিরে পাব নিজেকে হারিয়ে

প্রীতি ভট্টাচার্য

এখন আমি সবকিছুই ভুলতে চাই
এমনকি নিজেকেও—বাল্যকালের
সেই ফুল হয়ে ফুটে ওঠা, যৌবনের
ঝরে ঝরে পড়া, শুকনো পাপড়ি যত
প্রৌঢ় চেতনার দুপায়ে মাড়িয়ে চলে
যেতে চাই অনন্ত আলোকের দেশে।

শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে চলে যাব
অসীম আকাশে সুখে—সব বন্দিদশা
পার হয়ে, সমস্ত প্রাচীর ভেঙে ভেঙে—
আলোর আকাশে স্নান করে খুঁজে পাব
একদিন নিজেকেই সব মানুষের
বুকের গভীরে—নিজেকে হারিয়ে, ভুলে।
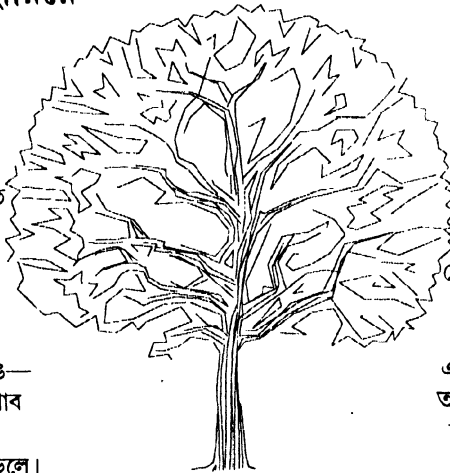
বন্ধু বন্দির

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

তপ্ত জীবনের শান্তি সুবিমল
তোমার 'কথামৃত' নয়নে ঝলমল
তোমার অনুপম মূর্তি মনোহর
বন্ধু বন্দির অকূল সুন্দর।
এ-মন ভয়াতুর, এ-মন শোকাহত
তবুও তুমি ছিলে, রয়েছ অবিরত
কুহেলি বিমলিন জগতে চিররবি
দিশারী অতুলন হে মহান কবি!

শিবের বিয়ে

শান্তনু মুখোপাধ্যায়

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান,
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান
আর এক কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ি যান।"

শিবঠাকুরের বিয়ে! সে আর ছেলে-ভুলানো ছড়া নয়। টাপুর টুপুর বৃষ্টির দিনে নয়, শেষ ফাগুনের হাওয়ায় রাঙামাটির ধুলো উড়িয়ে বর শিব আসেন সিদ্ধপীঠ বীরভূমের মহম্মদবাজারের অদূরে রায়পুর গ্রামে। গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা দেবদেবীর বিবাহ অনুষ্ঠান যেভাবে সম্পন্ন করেন তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শিবচতুর্দশীতে শিব ও পার্বতীর বিবাহ বর্তমানে এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিবের বিবাহের উৎসসন্ধানে প্রথমেই মনে পড়ে রায়পুর গ্রামের এক নির্জন প্রান্তে অবস্থিত শঙ্করানন্দ আশ্রমের কথা। শঙ্কর গোস্বামী বা শঙ্করবাবার নাম অনুসারে এই আশ্রম। শঙ্করবাবা ছিলেন শিবের উপাসক। প্রচলিত আছে, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে তিনি রায়পুর জঙ্গলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভক্তবৃন্দ সেখানে বেলগাছের নিচে পাথরের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবচতুর্দশীর দিন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সময় শঙ্করবাবা জাঁকজমকপূর্ণভাবে শিবের বিবাহের প্রবর্তন করেন। সে-অনুষ্ঠানে তিনি এক বিরাট যজ্ঞেরও আয়োজন করেছিলেন।

সুতরাং এখানে শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান ১০৪ বছরের প্রাচীন। শিব ও পার্বতীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্দশী ও অমাবস্যার সন্ধিক্ষণে। বিবাহ অনুষ্ঠান রাত্রে আয়োজনের জন্য অনেক সময় তা অমাবস্যা তিথিতে নিশিকালে ঘটে। আগে থেকেই বরযাত্রী ও কনেযাত্রী স্থির করা থাকে। সেই অনুসারে মন্দিরের পূজারী আগেই নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে থাকেন। বিবাহ পরিচালনার জন্য পুরোহিত ও ভাণ্ডারি তাঁদের স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন। মূল মন্দিরে নিত্য পূজিত হন শিবলিঙ্গ। বিবাহ অনুষ্ঠানের শিব ও পার্বতী সারাবছর নন্দী-ভৃঙ্গী-সহ বৃষপৃষ্ঠে মূল মন্দিরে অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য, শিব-পার্বতীর মূর্তি মৃত্তিকানির্মিত। রঙ ও তুলির টানে এঁদের সজ্জিত করা হয় বিবাহের পূর্বদিন।

সমগ্র বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় শিবমন্দির-সংলগ্ন 'ডাঙ্গাল'-এ। সেখানে প্যাণ্ডেল বেঁধে ছাদনাতলা ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। শিবমন্দির থেকে শিব-পার্বতীর মূর্তি মহাসমারোহে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়। স্ত্রী-আচারের ব্যবস্থা ও পালনে থাকেন চারজন উপবাসী এয়োস্ত্রী। নিকটস্থ পুকুর থেকে 'কুনকলসী' করে জল আনা হয়। 'পাটপেছে' (চারকোণা চালুনি)-তে ধানসমেত খৈ রাখা হয়। চারটি ছোট মাটির ঘটে মাষকলাই, চাল, ভাঙা ভাঁড়, শুকনো হলুদ ও হরীতকী থাকে। এছাড়াও চারটি হাঁড়িতে রঙ দিয়ে প্রজাপতি, সানাই ইত্যাদি চিত্রিত করে ছাদনা-তলায় রাখা হয়। পিতলের পাত্রে দুধ, ঘি, বকনাগরুর গোবর, আয়না, চিরুনি, কাজললতা, যব, কালো তিল, আমলা-বাসলা বাটা, হলুদ, সিঁদুর সহযোগে ডালা বা কুলো প্রস্তুত করা হয়। একে বলে 'গন্ধের সাজ'। চারজন এয়োস্ত্রী কোমরে কলসি ও মাথায় ডালা নিয়ে ছাদনাতলায় প্রবেশ করেন। এই ডালা শিব-পার্বতীর কপালে ঠেকিয়ে বরণ করা হয়। শুধুমাত্র উপবাসী সধবা'রাই এই ডালা ধরার অধিকারিণী হন। এরপর পুরোহিত ও ভাণ্ডারির উপস্থিতিতে দুধ, ঘি, গঙ্গাজল, মধু, আমলাবাসলা দিয়ে শিবকে স্নান করানো হয়। এলুনি (আলপনা) দেওয়া হয় কাঠের তক্তায়, যার ওপরে বৃষপৃষ্ঠে আসীন শিব ও পার্বতী। ছাদনাতলায় দুটো পিঁড়ি থাকে। শাড়ি, ধুতি, দই, মিষ্টি, ফেনি (বড় বাতাসা) প্রভৃতি বিয়ের অঙ্গ। বর শিব ও কনে পার্বতীর হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় হলুদ সুতো। এরপর শুভদৃষ্টি, সাত পাকে ঘোরা দেখে মনে হয়, পার্বতী যেন আমাদেরই ঘরের দুহিতা, বিয়ের পর সে যাবে শ্বশুরবাড়ি কৈলাসে। বাদ্যকাররা তখন বাদ্যে সুর তুলে প্রকৃত বিয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। উলু ও শঙ্খরবে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুরোহিত কন্যাসম্প্রদান পর্ব সমাধা করেন। বর ও

রায়পুরের শঙ্করানন্দ আশ্রমে নন্দী-ভৃঙ্গী-সহ শিব-পার্বতী

কনের সরা খেলায় মনে হয় পার্বতীপুরের পার্বতীর সঙ্গে কৈলাসনগরের শিবের বুদ্ধির খেলা বেশ জমে উঠেছে। বিবাহের শেষে উপবাসী, অতিথি ও বরযাত্রীদের লুচি, মিষ্টি সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। এরপর (বাসরে) হরিনাম-সঙ্কীর্তন চলে। শৈব ও বৈষ্ণব মত এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ভোর হলে বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আকাশে-বাতাসে যখন উচ্চারিত হয়—'জয় জয় অনাদি আদি পার্বতীপতি ঈশ্বর', তখন আবালবৃদ্ধবনিতার একত্রে আনন্দ করার দৃশ্য মনে রাখার মতো। লোকাচার মেনেই রায়পুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিবাহযোগ্যারা শিবের বিয়ের পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শিবের বিয়ে অনুষ্ঠানের সার্থকতা এখানেই যে, সমাজের ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সম্প্রদায় ও আদিবাসী শ্রেণি—সকলেই চারদিন একত্রিত হয়ে এক মিলনমেলায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। ছড়া-ছন্দ, লোককথার শিব আমাদের আত্মীয় হয়ে উঠে বিবাহের অনুষ্ঠানে ধরা দেন—এই পরম বিশ্বাসে গ্রামের মানুষেরা পা ফেলেন আগামীর পথে। ❑

শব্দচেতনা ২০

শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত

■	১	■	২			৩		■	৪
৫		■		■	■		■	৬	
	■	৭	■	৮	৯		■		■
■	■	১০		■		■	■	■	১১
১২	১৩	■	■	■	১৪		■	১৫	
১৬		■	১৭	১৮	■	■	■	১৯	
	■	■	■		■	২০	২১	■	■
■	২২	■	২৩			■		■	২৪
২৫		■		■	■	২৬	■	২৭	
	■	২৮					■		■

পাশাপাশি ঃ (২) শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামহ (৫) এই সেজে গদাধর যাত্রার আসরে নেমেছিলেন (৬) "হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব —— পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।" (৮) শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে বলেছিলেন ঃ "এখানে ——ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।" (১০) "চৈতন্যতে জগৎ —— রয়েছে।" (১২) "—— কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি।" (১৪) এটি ধরাতে অনেকে লণ্ঠন-হাতে অন্যের বাড়িতে যায়! (১৫) "পুকুরে —— ফেলবে না, ছিপ নিয়ে বসে থাকবে না; মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কী হাঙ্গাম!" (১৬) থিয়েটার দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন, (১৭) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় গান ঃ "জীব —— সমরে।" (১৯) "সাধ ছিল, মাকে বলেছিলাম, 'ভক্তের —— হব'।" (২০) হাতির কানে হাত দিয়ে অন্ধব্যক্তি হাতিকে এমনই মনে করেছিল। (২৩) "কেবল পাপ আর ——, এইসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।" (২৫) "চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে —— বলে।" (২৭) "যিনি সৎ, তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আরেকটি নাম ——।" (২৮) "ঈশ্বরের নামগুণগান করে যে-আনন্দ, তার নাম ——।"

ওপর-নিচ ঃ (১) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় একটি গান ঃ "—— কি ভেবে পরান গেল।" (২) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে টাকা এর তুল্য। (৩) "ও রা জু আ"—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর উদ্দেশে বলেছিলেন, (৪) শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলেছিলেন ঃ "সেই যে —— খুললে ফসফস করে উঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" (৫) শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো, (৬) শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন ঃ "তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে —— করলে কি হয়?" (৭) "ঈশ্বরই কর্তা। আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় —— করো।" (৯) খোলের বোল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। (১১) "শ্রীমতী কৃষ্ণকে ——র মন্দিরে ধরবার জন্য তাঁর দ্বারে গিছলেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই।" (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে শ্রীচৈতন্যের দলে দেখেছিলেন, (১৩) "——লীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়হুড় করে পড়ছে।" (১৫) "ফুটপাতের গাছ, যখন —— থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।" (১৮) সাগরের কাছে এটি বেশি দেখা যায়। (২১) "অসৎ —— দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে খঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।" (২২) "সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকাফুলের মতো ——শূন্য হয়।" (২৩) "মোসলমানেরা দেখো, সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে ——টি পড়বে।" (২৪) "সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে। নিজেদের —— ঠিক বুঝতে পারে না।" (২৫) এর হাঁড়িতে মাখন রাখলে তা নষ্ট হতে পারে। (২৬) "কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই।/ মনের —— হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই।" (২৭) "—— যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই ——।"

অরিন্দম দাস

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

৫

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—**সম্পাদক**

প্রসঙ্গ বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় নির্মলকুমার রায় রচিত 'বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' শীর্ষক সচিত্র নিবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। এপ্রসঙ্গে সামান্য স্মৃতিচারণ করতে এই পত্র লিখছি।

শ্রীরায়ের প্রতিবেদনের এক জায়গায় (পৃঃ ৭০৬) শ্রীমা সারদাদেবীর একখানা ফটো ছাপা হয়েছে, যার নিচে লেখা হয়েছে—"নিজের ঘরে ঠাকুরকে পূজা করছেন শ্রীশ্রীমা"। ঐ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সেই বিখ্যাত রুপোর সিংহাসনটি এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আসনে উপবিষ্ট ফটোখানি। ১৯৮২ সালে যখন বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে যাই তখন প্রথমেই নজরে পড়ে, সেই রুপোর সিংহাসনটি সেখানে নেই এবং সে-জায়গায় স্থান পেয়েছে একটি কাঠের সিংহাসন। বাল্যকাল থেকে ঐ রুপোর সিংহাসনটি দেখে অভ্যস্ত, ফলে এই পরিবর্তনের কারণ জানার কৌতূহল হয়। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী নিরাময়ানন্দজীর (বিভূতি মহারাজ) কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করি, কেন এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে? পূজনীয় মহারাজ জানালেন, ১৯৭৯ সালে যখন তিনি মুম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যান, তখন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। ঐ পদে তিনি বৃত ছিলেন ১৯৭৯-১৯৮১। সেই সময়ে তিনি এই পরিবর্তন করেন। ১৯৮৩ সালে পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী নিউ দিল্লি আশ্রমের সচিব হয়ে আসেন। তখন একদিন তাঁর কাছে ঐ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানতে পারি, রুপোর সিংহাসনটি কালো হওয়ার ফলে কলকাতার একাধিক নামি জুয়েলার্সকে দেখানো হয়। দুঃখের বিষয়, কেউই সিংহাসনটির সাবেকি জেল্লা ফিরিয়ে আনতে পারবে না বলে রায় দেন। তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, সিংহাসনটি আদতে রুপোর নয়, জার্মান সিলভার ধাতুতে নির্মিত। তখন পূজনীয় মহারাজ শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী কাঠের সিংহাসনটি তৈরি করান এবং শ্রীশ্রীমায়ের নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ঐতিহাসিক ফটোটি স্থাপন করেন। রুপোর সিংহাসনটি পাশের ঘরে (পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ঘরে) সযত্নে রক্ষিত হয়। বর্তমানে ঐ রুপোর সিংহাসনটি বেলুড় মঠের নবনির্মিত 'রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির'-এ স্থান পেয়েছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যে-ফটোটি পূজা করেছিলেন, সেই ফটোটি বর্তমানে ঐ কাঠের সিংহাসনে বিরাজমান। এই ঐতিহাসিক ফটো প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী নিজেই বলেছেন ঃ "ওখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম কখানি যেমন উঠানো হয়। একখানি সে-ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি কালো (deep) ছিল—ঠিক যেন কালীমূর্তিটি, তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে-ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাওয়ার সময় ওখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম। নহবতের নিচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন, ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?'... তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই। সে-ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল না। এখানি আমারই রইল।" এই ফটো শ্রীশ্রীমা আজীবন পূজা করে এসেছেন এবং কখনো কাছছাড়া করেননি। ১৯৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, সেবক ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী (রামময় মহারাজ) আমার গৃহে শুভাগমন করেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা আজীবন এই ফটো পূজা করে এসেছেন এবং কখনো কাছছাড়া করেননি। জয়রামবাটী বা তীর্থভ্রমণে বেরিয়েও তিনি এই ফটোটি কাপড়ে মুড়ে একটি টিনের বাক্সে (স্টিলের সুটকেস নয়) করে নিয়ে যেতেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, সম্ভবত ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে যখন শ্রীশ্রীমা পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সন্দর্শনে যান, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের এই ফটোখানাই তাঁর বস্ত্রাঞ্চল থেকে বের করে তিনি ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়েছিলেন, কারণ শ্রীশ্রীমা বিশ্বাস করতেন 'ছায়া কায়া সমান'।

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

প্রসঙ্গ 'ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব'

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর 'ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব' নিবন্ধে অনেক নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত হলেও সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করেছেন—'গবেষণাধর্মী এই নিবন্ধে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সর্বত্র একমত নই'। বস্তুত, আমাদেরও মনে হয় 'অ্যামোনাইট'-এর জীবাশ্মকে শালগ্রাম-রূপে বেছে নেওয়ার পিছনে অনেক কিছুই অজ্ঞাত ও অনালোকিত থেকে গেছে। এবিষয়ে যদি কেউ আলোকপাত করেন তাহলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হব। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

পশুপতি মিশ্র
নয়াবসান, গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর-৭২১৫০৬

উপরি উক্ত পত্রের উত্তর হিসাবে আমরা 'উদ্বোধন'-পাঠক বিমানবিহারী রায়ের পত্র সন্নিবেশিত করলাম। তাছাড়া 'অ্যামোনাইট' জীবাশ্মকে শালগ্রাম শিলার সৃষ্টির কারণ হিসাবে দেখানো হলেও তা এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।—**সম্পাদক**

আর্যদের ভারত-আগমন প্রসঙ্গে

আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে 'উদ্বোধন' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে পরিচালিত এবং এর লেখক-পাঠককুলও অল্পবিস্তর এই আদর্শের অনুগামী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর 'ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "ভারতে অধিকার বিস্তারের সূচনায় তারা (আর্যরা) সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও জয়লাভে সমর্থ হয়েছিল, কারণ তাদের হাতে ছিল উন্নততর প্রযুক্তি—যথা লৌহনির্মিত অস্ত্র এবং গতিসম্পন্ন অশ্বচালিত রথ। গঙ্গা অববাহিকায় দ্বিতীয় নগরসভ্যতা স্থাপন পর্যন্ত এই সুবিধা বলবৎ ছিল। অপরদিকে যাদের পরাজিত করে প্রথমে সিন্ধু উপত্যকার এবং পরে গঙ্গা অববাহিকার দখল নেওয়া সম্ভব হয়েছিল—সেই অনার্য ভারতবাসী মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না।" বলাই বাহুল্য, এধরনের বক্তব্য কোন বিচ্ছিন্ন বক্তব্য নয়—আর্যতত্ত্ব-কেন্দ্রিক প্রচলিত ভারত-ইতিহাসেরই বক্তব্য। তবুও 'উদ্বোধন'-এর ন্যায় পত্রিকায় আর্যতত্ত্বের এ হেন উল্লেখ চোখে পড়ায় এই চিঠি লিখতে বাধ্য হলাম।

ইতিহাসের পাঠক হিসাবে দেখেছি যে, ম্যাক্সমুলার-পূর্ববর্তী ইঙ্গ-স্কট-জার্মান ইণ্ডোলজিস্টদের কেউ আর্যজাতির সংবাদ জানতেন না। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর ম্যাক্সমুলারই প্রথম আর্যজাতি-তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। সূত্রপাত থেকেই পণ্ডিতগণের একাংশ এই তত্ত্ব স্বীকার করেননি, এমনকি স্বয়ং ম্যাক্সমুলার পর্যন্ত পরে তাঁর এসম্পর্কিত মত পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ম্যাক্সমুলার মত বদলালেও তাঁর এদেশীয় অনুগামিগণ মত বদলাননি। তাঁরা ক্রমে 'আর্য-আগমন' এবং 'আর্যদের বহির্গমন'—এই বিপরীতমুখী মতের অনুগামী হিসাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। আর্য-আগমন তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে আবার আর্যজাতির উদ্ভবস্থল সম্বন্ধে সাধারণ ঐকমত্য নেই। এসম্পর্কে কমপক্ষে কুড়িটি মত আছে এবং প্রতিটি মতের প্রবক্তাই স্বমত প্রতিষ্ঠায় বাকি উনিশটি মত খণ্ডন করেছেন। দ্বিতীয়ত, ভাষার নিরিখে অধিবসতি বিচারে একদা দুটি তরঙ্গে ভারতে আর্য-আগমনের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল। পরে ভাষাতত্ত্ববিদরা এই দুই তরঙ্গের মতবাদ বাতিল করে দিয়েছেন। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক-দের একাংশ আর্যদের তাম্র এবং লৌহ ব্যবহারকারী হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় আগত 'আর্য' বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

তৃতীয়ত, ভারতে 'আর্য' অভিহিত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সাধারণ কোন শারীরিক বৈশিষ্ট্য মেলেনি। তাই এদের ইন্দো-আর্য এবং আর্য-দ্রাবিড়ীয় রূপে বিভক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, সিন্ধু তথা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসাবে আর্য-দ্রাবিড় সঙ্ঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। অথচ এই সঙ্ঘর্ষ তদর্থে আর্য-আক্রমণ ও হরপ্পা সংস্কৃতির ধ্বংস—এর কোনটিরই কাল সম্পর্কে কেউ সঠিক আলোকপাত কিংবা এদুটি ঘটনাকালের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে সক্ষম হননি। বরং হরপ্পা সংস্কৃতির অবক্ষয় ও অবসান সম্পর্কিত মতামতের অধিকাংশই বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক কারণের সাক্ষ্য দেয়। পার্গিটারের মতে—"উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে আর্য আক্রমণের, বা পশ্চিম থেকে পূর্বে আর্যদের অগ্রগতির কোন উল্লেখ ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই। বরং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আর্যদের বহির্গমনের উল্লেখ পুরাণসমূহে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের নদীস্তুতিতেও এই পৌরাণিক ঐতিহ্যের সমর্থন মেলে।... খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর্যদের বহির্গমনের প্রমাণ মেসোপটামিয়ার লিপিসমূহেও (যেখানে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রমুখের উল্লেখ আছে) পাওয়া যায়।" (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—সুনীল চট্টোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪) এছাড়া অবিনাশচন্দ্র দাশ, গণনাথ ঝা, ডি. এস. ত্রিবেদ, এল. ডি. কাল্লা প্রমুখ অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী আর্যরা ভারতেরই মানুষ।

পঞ্চমত, আর্য-আগমন তত্ত্বের অনুগামীদের ধারণায়, আর্য-পূর্ব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষও ভারতে বহিরাগত। প্রাক্-আর্য যুগে দ্রাবিড় জাতি সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দ্রাবিড় জাতিকে আবার প্রাক্-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়—দুই ভাগে ভাগ করে প্রাক্-দ্রাবিড়দের ভারতের আদি বসবাসকারী বলা হয়েছে। দ্রাবিড়দের মধ্যে এখন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও মেডিটারেনিয়ান জাতির মিশ্রণ দেখা যায় বলে দ্রাবিড়গণও জাতিগতভাবে একটি মিশ্র জাতি। এককথায়, ইংরেজদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশে ভারতবর্ষকে নৃতাত্ত্বিক স্বর্গরাজ্য-রূপে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। অথচ প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী কীথ বলেন ঃ "বিভিন্ন জাতি ভারতের মাটিতেই বিকশিত হয়েছিল এবং ভারতের এই অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী কোনমতেই বহিরাগতদের নিয়ে সৃষ্টি হয়নি।" ষষ্ঠত, আর্যদের আবির্ভাবের নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি ভারতে আর্য-আগমন তত্ত্ব জোরালোভাবে খণ্ডিত হয়ে চলেছে। তা দৃষ্টে এ-তত্ত্বে বিশ্বাসী অনেক পণ্ডিত 'ভারত থেকে আর্যদের বহির্গমনেরও' প্রমাণ নেই বলে মুখরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাঁদের মতানুযায়ী আর্যতত্ত্ব এখন 'আর্য-সমস্যা' নামক একটি সমস্যা।

পরিশেষে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক অসাধারণ তুলনামূলক প্রবন্ধে ব্যক্ত স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য এপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী বলেছেন ঃ "ঐ যে ইওরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ওসব আহাম্মকের কথা, আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐসব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।" (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩) তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তারা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি?" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৬৪)

বিমানবিহারী রায়
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩ ২২২

রচয়িতার নামোল্লেখ প্রয়োজন

আমার বাবা স্বর্গত অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৫৩) হাওড়ার একজন বিশিষ্ট গায়ক, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীতগুরু ছিলেন। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর থেকে ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে সঙ্কলিত—'স্মরণ কর ভয়হরণ রাম, গাও রামকৃষ্ণ নাম' এবং 'বাণীরূপে রহিয়াছে মুরতি ধরি, রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি' গানদুটিতে লেখকের কোন নামোল্লেখ নেই। এই গানদুটি অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। এই তথ্য তাঁর রচনাগুলির একটি সঙ্কলন 'গ্রাম, গীতি-আলেখ্য ও কবিতা সংগ্রহ' (পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ২১) থেকে জানা যায়।

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়
ইডেন হসপিটাল রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

'উদ্বোধন' সকলের জন্য : একটি অভিজ্ঞতা

বিগত প্রায় ৩২ বছর যাবৎ আমি 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি আমাকে সজীবতার আশ্বাস দেয়। প্রত্যেক বছর এর নবীনতর এবং হৃদয়গ্রাহী প্রচ্ছদ মনকে নতুন করে প্রাণিত করে। 'উদ্বোধন'-এর কোন সংখ্যাই আমি হারাতে চাই না। উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায় বসে থাকি কখন ডাকপিয়ন এসে নতুন সংখ্যাটা দিয়ে যাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেশির ভাগ সময়েই আমাকে হতাশ হতে হয়। বিশেষত শারদীয়া সংখ্যার বেলায়। এই বিশেষ সংখ্যাটি থেকে থেকেই ডাকঘর থেকে বেপাত্তা হয়ে যায়! আজকাল প্রশাসনের সর্বত্র অকর্মণ্যতা আর উদাসীনতার প্রতিযোগিতা চলছে। তাই জানি, প্রতিবাদ নিষ্ফল।

তবু সব আলো নিভে যায়নি, এও জানি। কিছুদিন আগে আমাদের এলাকায় এক নতুন ডাকপিয়ন এসেছেন। তিনি অতি যত্নে একেবারে সময়মতো 'উদ্বোধন'-এর প্রত্যেকটি সংখ্যা আমার বাড়িতে পৌঁছে দেন। এমনকি সময় পেলে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত নানা লেখা নিয়ে তিনি কথা বলতে থাকেন। তাঁর গভীর চিন্তাশক্তি আমায় মুগ্ধ করে, এবং বিস্মিতও। কীভাবে এত খবর রাখেন ইনি? কোন্ সূত্রে জানলেন এত সব? একদিন সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেসই করে বসলাম : "আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত?" তিনি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন : "আমি মুসলমান। আমার ধর্মই আমাকে সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে। আমি 'যত মত তত পথ'-এই বিশ্বাস করি।"

আজকের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির এই অশান্ত দিনে এই অসাধারণ মানুষটির কথা 'উদ্বোধন'-এর সমস্ত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই চিঠির অবতারণা।

সুতপা ভট্টাচার্য
গোবিন্দপল্লী, হোজাই, নগাঁও, অসম

প্রসঙ্গ 'সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে নেতাজী'

শরতের হাওয়ায় যখন কাশবনে লাগে দোলা, শিউলি-টগর নবরূপে সজ্জিত হয়ে দেবী দশভুজাকে বরণ করতে প্রস্তুত, সেইসময় মহামায়ার আগমনবার্তা বহন করে প্রকাশিত হলো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাব ও বাণীশরীর' 'উদ্বোধন' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৯। আগের প্রতিটি সংখ্যার মতো এই সংখ্যাটিরও গুণগত মান ও ঐতিহ্যকে অটুট রয়েছে। এই সংখ্যার প্রতিটি রচনা যেন দেবীপূজার এক-একটি উপচার। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এই সংখ্যায় মুদ্রিত স্বামী বিবেকানন্দের দুটি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখিত 'সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটি প্রস্তুত হয়েছে স্বামী ভাস্বরানন্দ মহারাজ লিখিত একটি স্মৃতিকথাকে নির্ভর করে। এই স্মৃতিকথাটির প্রকাশস্থল হিসাবে পাদটীকায় বলা হয়েছে : "স্বামী ভাস্বরানন্দের স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়েছিল রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে।" (পৃঃ ৭৩৩)

পত্রলেখকের মতে, পাদটীকায় উল্লিখিত তথ্যটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখিত উল্লিখিত স্মৃতিকথাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধন' (৫১তম বর্ষ, ১৩৫৫) পত্রিকায় 'শোনানে নেতাজী' শিরোনামে, মাঘ (পৃঃ ৭-১১) ও ফাল্গুন (পৃঃ ৬২-৬৭) দুই সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে। উল্লেখ্য, এই স্মৃতিকথাটি সাধুভাষায় লিখিত। কিন্তু, শ্রীচক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে এই স্মৃতিকথা থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা চলিত ভাষায় লিখিত। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে মূল পাঠের পার্থক্য পত্রলেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

সৌরেন সমাজদ্দার
দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯

প্রসঙ্গ 'এখন ডি. গুপ্ত'

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় 'এখন ডি. গুপ্ত' নামক নিবন্ধটিতে একটু সংশোধন প্রয়োজন। ৬৭৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে আছে—"কিন্তু এই কর্মের সঙ্গে আমাদের 'অহঙ্কার' বা 'আমিত্ব বুদ্ধি' এসে গেলে অর্থাৎ এটা 'আমার' কাজ, 'আমি' করেছি—এই 'অহং' বুদ্ধি থাকলেই সেটা কর্ম। এই দুই না থাকলে যা থাকে তা অনির্বচনীয়, তা পূর্ণ জ্ঞানেরই সমান।" এটি হবে—"প্রতিটি কর্মের সঙ্গে আমাদের 'অহঙ্কার' বা 'আমিত্ব বুদ্ধি' এসে যাবেই। অর্থাৎ এটা 'আমার' কাজ, 'আমি' করছি। ফলটাও ভোগ করব 'আমি'। এই 'আমি' মানে নাম ও রূপ সচেতনতাও। তাই ফলের আকাঙ্ক্ষা আর এই 'অহং' বুদ্ধি থাকলেই সেটা কর্ম। এই দুই না থাকলে যা থাকে তা অনির্বচনীয়, তা পূর্ণ জ্ঞানেরই সমান।"

শিবতোষ বাগচী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২

আদি শঙ্করাচার্য ১৪

শিশু ও কিশোর বিভাগ

"আদেশঃ"

নরেন্দ্রকুমার নাথ

নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু শিষ্যকে বা শিষ্য গুরুকে অথবা কোন সাধককে অভিবাদন বা প্রত্যভিবাদন করার সময় সোজা হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে 'আদেশঃ' শব্দটিকে তিনবার উচ্চারণ করতে দেখা যায়। শ্রীগোরক্ষনাথ প্রণীত 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে 'আদেশঃ' শব্দের ব্যাখ্যা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

"আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারতঃ।
ত্রয়ানামেক সংভূতিঃ আদেশঃ পরিকীর্তিতঃ।।"

'আদেশঃ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে এখানে আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক 'সংভূতি' অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বলা হয়েছে। সংভূতির দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং গুরুকে, শিষ্যকে অথবা কোন সাধককে 'আদেশঃ' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করতে হয়। গুরু বা শিষ্য তো ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম মুক্ত এবং শাশ্বত। তিনি আছেন অনলে, অনিলে, নভোনীলে, সলিলে, তরুলতায়, তারকায়, সূর্যে; তিনি আছেন সমস্ত ভূমণ্ডলে। তাই তাঁকে যাঁরা জানেন, তাঁরা ব্রহ্মই হয়ে যান—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতুর বয়স বারো বছর পূর্ণ হয়েছে। উপনয়নের পরেও তিনি গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করতে যাননি। তিনি কেবলই অরণ্যের মধ্যে খেলাধূলায় মেতে আছেন। পিতা পুত্রকে বললেন ঃ "হে বালক, কিশোরকাল হলো ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নেওয়ার সময়। তুমি গুরুকুলে গুরুর নিকট গমন কর। সেখানে গিয়ে সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা গুরুকে পরিতৃপ্ত করে বেদবিদ্যা লাভ কর। ঋষিরাই প্রকৃত 'বিদ্বান'। কারণ, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর।"

শ্বেতকেতু প্রসিদ্ধ ঋষিবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ সকলেই ব্রহ্মবিদ্। শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যয়ন না করলে ব্রহ্মবিদ্ হতে পারবেন না। যিনি ব্রহ্মবিদ্ হতে পারেননি, তিনি ব্রাহ্মণ হবেন কি করে? ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিলেই তো আর ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তিনি হতে পারেন ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রাহ্মণ। নচেৎ তাঁকে বলা হবে 'ব্রহ্মবন্ধু'। ব্রহ্মবন্ধু হওয়া নিন্দনীয়। যার সংযম নেই, তপস্যা এবং ব্রহ্মজ্ঞান নেই—সে নিজের গুণ ও কর্মের দ্বারা নিজের পরিচয় দিতে পারে না। কেবল বংশনামে যার পরিচয় হয়, সে যে লোকের কাছে কৃপার পাত্র! তার জীবন মূল্যহীন।

শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গমন করে অভিমান ভরে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বারো বছর শেষ হয়ে গেল। সব বিদ্যাই তিনি শিখেছেন। এবার পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। গৃহে ফিরে তিনি পিতাকে

নাথধর্মের প্রবর্তনকাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। প্রচলিত তথ্যাদি থেকে ধারণা করা হয় যে, ঐ ধর্ম খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 'নাথ' শব্দটি নাথ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরুগণ বা সিদ্ধাচার্যগণের উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মহাদেবই নাথ গুরুগণের আরাধ্য বা আদর্শ এবং সকল নাথ শাস্ত্রকাহিনীতেই স্বয়ং মহাদেবকে এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধ গুরুরূপে আদি অর্থাৎ 'আদিনাথ' বলে গ্রহণ করা হয়েছে। নাথ সম্প্রদায় শৈব-যোগী সম্প্রদায়রূপেই খ্যাত। নাথযোগীর মাথায় জটা, সর্বাঙ্গে ছাই-ভস্ম, কানে কড়ি ও কুণ্ডল, গলায় সুতা বা সেলীতে কাঠের নাদ গাঁথা, বাহুতে রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল, পায়ে নূপুর, কাঁধে ঝুলি ও কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের কুলবৃক্ষ বকুল, বিশিষ্ট আহার কচুশাক।

নাথ সম্প্রদায় নামে খ্যাত ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও সম্প্রদায়ভুক্ত সিদ্ধ যোগী এবং তাঁদের রাজ-শিষ্যগণকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে কতকগুলি লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী। এগুলিকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অনেক সাহিত্যও রচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বাঙলা ভাষায় যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা 'নাথসাহিত্য' নামে পরিচিত। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের উপজীব্য প্রধানত দুটি কাহিনী বা উপাখ্যান। প্রথমটি হলো গুরু মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথকে নিয়ে। অপরটি হলো মানিকচন্দ্র (বা মাণিক্যচন্দ্র) রাজা, তাঁর স্ত্রী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে নিয়ে। উভয় উপন্যাসেরই মুখ্য প্রতিপাদ্য হলো যোগের সাহায্যে মৃত্যুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ। হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি সর্বভারতীয় সাহিত্যে এই ধর্মে প্রচলিত উপাখ্যানগুলির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই নাথধর্ম একটি সর্বভারতীয় ধর্ম-রূপে পরিচিতিলাভ করেছে।

প্রণাম করলেন। তাঁর মনে হলো তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ নেই। তিনি বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত, উদ্ধত এবং অবিনীত। পুত্র বিদ্যার প্রকৃত অনুশাসন লাভ করতে পারেনি দেখে পিতার দুঃখ হলো। পুত্রের কাছে বিদ্যা তখন ভারবাহী বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। পিতা তখন বললেনঃ "হে পুত্র, তুমি কি 'আদেশঃ' শব্দের অর্থ অনুধাবন করেছ?" শ্বেতকেতু নত হয়ে বললেনঃ "না পিতা, আচার্য আমাকে এবিষয়ে কিছু বলেননি। আপনি আমাকে 'আদেশঃ' শব্দের অর্থ বলুন।" 'আদেশ' অর্থাৎ 'আদিশ্যতে যঃ ইতি'—যা আদিষ্ট হয় সেই একমাত্র গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, প্রশ্ন দ্বারা ও সেবা দ্বারা লাভ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, 'আদেশঃ' অর্থাৎ 'যেন আদিশ্যতে ইতি'—যার দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬।১।৩)-এ বলা হয়েছে—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।।"

যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি (হয়), অমতম্ মতম্ ভবতি, অবিজ্ঞাতম্ (অনিশ্চিত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ ভবতি। (সেই আদেশটি জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?—যার জ্ঞানে [যৎসহায়ে] অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়।)

শ্বেতকেতু সে-বিদ্যা লাভ করতে পারেননি। তাঁর বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হলো। চার বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গ তুচ্ছ; কারণ ঐ বিদ্যা দ্বারা 'আদেশঃ' যে কি তা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়।

"মথিত্বা চতুর্বেদান্ সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ।।"

(জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫১)

অর্থাৎ চার বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করে সাধক সারভাগ পান করেন এবং পণ্ডিতরা কেবল ঘোল পান করেন। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু কেবলমাত্র তক্র অর্থাৎ ঘোল পান করে গৃহে ফিরে এসেছেন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

(মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।২।৩)

অর্থাৎ অয়মাত্মা (এই আত্মা), প্রবচনেন (শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা), ন লভ্যঃ (লভ্য নন), ন মেধয়া (বুদ্ধি বা বিচারশক্তির দ্বারা নয়), বহুনা (বারবার), শ্রুতেন ন (শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা নয়)। (আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না। মেধা বা প্রভৃত বিদ্যা দ্বারাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না।)

বিদ্যা দুপ্রকার—পরা এবং অপরা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ বিদ্যা), কল্প (আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থবিদ্যা), ছন্দ ও জ্যোতিষ—এসবই অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। পরমপুরুষ বা ব্রহ্মকে লাভ করতে পারলে সমুদয় লভ্য হয়। তখন আর কিছু লাভ করার থাকে না। ব্রহ্মকে যে-বিদ্যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়—তা-ই পরাবিদ্যা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং অন্য সব বিদ্যা, এমনকি বেদবিদ্যাও অপরা। তাই 'আদেশঃ' শব্দ উচ্চারণ করে এই পরাবিদ্যার কথাই নাথধর্মের সাধকরা বলে থাকেন। ❑

এই নিবন্ধটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২১ তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গ্রাহকদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, **পত্রিকা সময়মতো না পেলে** পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হবে না।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

ঝামাপুকুরে শ্রীম-র ঠাকুরবাটী (কথামৃত ভবন)

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে। (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'শ্রীম-র ঠাকুরবাটী' বা 'কথামৃত ভবন'—**সম্পাদক**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত অন্তরঙ্গ গৃহী পার্ষদ এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহধন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৫৪-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) নাম আজ সর্বজন-বিদিত। তাঁর মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর প্রসার আজ বিশ্বব্যাপী। উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁর বাসভবনে (১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬) শ্রীশ্রীমা বহুবার অবস্থান করেছেন।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর স্কুল তথা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার-রূপে 'মাস্টারমশায়' এবং 'কথামৃত'-প্রণেতারূপে 'শ্রীম' ছদ্মনামেই বিশেষ পরিচিত। উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাস লেনের পিতৃগৃহে তাঁর জন্ম। পরে ঝামাপুকুরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িটি কিনে তাঁর পিতা মধুসূদন গুপ্ত সেখানে চলে আসেন এবং বর্তমানে সেটাই 'শ্রীম-র ঠাকুরবাটী' বা 'কথামৃত ভবন' নামে পরিচিত।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে 'কথামৃত'-সূত্রে জানা যায়ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁহার সন্তানগণ বরাহনগরে একটি মঠ স্থাপন করেন।... ১৮৯০ হইতে ১৮৯৩ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক হইয়া রহিলেন, তাঁহার দেখাদেখি অন্য গুরুভাইদের কেহ কেহ তপস্যার জন্য হিমালয় বা উত্তরখণ্ডে চলিয়া গেলেন। এইসময় মহেন্দ্রনাথ ডায়েরিগুলির মধ্যে ডুবিয়া দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা এবং শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করিয়া কাটাইয়া দিতেন। মনের মধ্যে যখনই দ্বন্দ্ব আসিত, মায়ের নিকটই শরণাগতি স্বীকার করিতেন। এইসময় মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতেন।

"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও মহেন্দ্রনাথের বাটীতে কখনো পক্ষাধিক, কখনো-বা মাসাধিক কাল বাস করিয়া যাইতেন। ৺ঘট-প্রতিষ্ঠা করিতে ঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমা মহেন্দ্রনাথের বাটীতে আসিয়া নিজহস্তে 'ঘট-স্থাপনা' ও পূজা ব্যবস্থা করেন। তখন হইতেই শ্রীম-র বসতবাটী 'ঠাকুরবাড়ি' নামে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।...

"১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য টাকা পাঠাইতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও কোনকিছুর প্রয়োজন হইলে মহেন্দ্রনাথকে জানাইতেন।...

"একদিন শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে শ্রীম তাঁহাকে 'কথামৃত' শুনাইয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীম-কে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমার মুখে ঐসকল কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐসমস্ত কথা বলিতেছেন।' এবং ঐ পুস্তক প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন।"[১]

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীশ্রীমা এই ভবনে
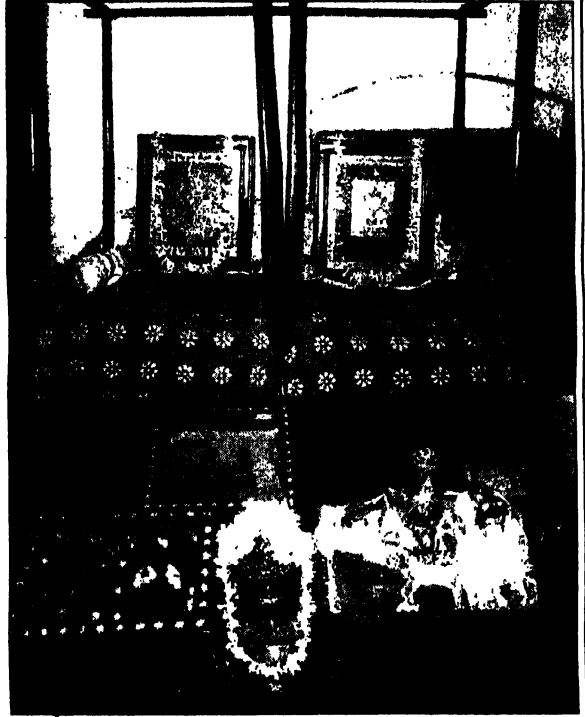
কথামৃত ভবনে ঠাকুরঘর

অবস্থান করতে শুরু করেন ৪ মার্চ ১৮৯০ থেকে। সেবার তিনি একুশ দিন ছিলেন। এর কিছুদিন পর ২ এপ্রিল তিনি পুনরায় এই গৃহে আসেন এবং আনুমানিক দশদিন অবস্থান করেন। তৃতীয় তথা শেষবারের মতো তিনি এই গৃহে অবস্থান করেন ১৮৯৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে-র মাঝামাঝি পর্যন্ত।

শ্রীম-র ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ অবস্থান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরো জানা যায়ঃ "কলকাতায় এলে

এই ঠাকুরবাটীর দোতলার একটি ঘরে শ্রীশ্রীমা কখনো কখনো থাকতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশে ১৮৮৮ সালের ৬ অক্টোবর, শনিবার (২১ আশ্বিন ১২৯৫) এই ঘরে মঙ্গল-চণ্ডীর ঘট ও শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটস্থাপনের সময়ই শ্রীম-র মনে 'কথামৃত' রচনার অনুপ্রেরণা জাগে। এই ঘরে শ্রীশ্রীমা বহু ভক্তকে দীক্ষাদানও করেছিলেন। 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগ শেষ করে এই ঘরেই শ্রীম 'গুরুদেব, মা, আমায় কোলে তুলে নাও'—এই শেষবাক্য উচ্চারণ করে মহাসমাধিলাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দ এই ঘরেই বহুবার মিলিত হন শ্রীম-র সঙ্গে। এই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাঞ্জাবি, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, চুমকি ঘটি, শ্রীম-কে ঠাকুরের উপহার দেওয়া 'চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন দলের ছবি' ও শ্রীম-র ব্যবহৃত পাদুকা ভক্তজনের দর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে। একটি কাচের বাক্সে সংরক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র কেশ ও নখ, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত জপের মালা, সিঁদুর কৌটা ও চরণচিহ্ন নিত্য পূজিত হয়।
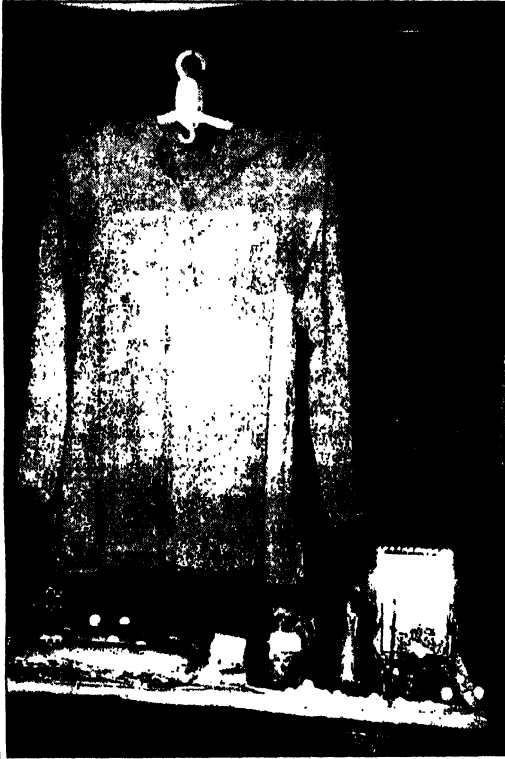
কথামৃত ভবনের ঠাকুরঘরে রক্ষিত ঠাকুরের ব্যবহৃত পাঞ্জাবি, তার তলায় মোলেস্কিনের র‍্যাপার, মায়ের ব্যবহৃত ঘটি, ঠাকুরের ব্যবহৃত চুমকি-ঘটি এবং 'কথামৃত' রচনাকালে ব্যবহৃত শ্রীম-র দোয়াতদানি।

"দীর্ঘকাল ধরে এই ঠাকুরবাটীতে প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীম-র জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর দিন এ-গৃহে মহাসমারোহে মা চণ্ডীর ঘট পূজা হয়।

প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় দর্শনের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামের পর বিকালেও মন্দির পুনরায় খোলা হয়।"[২]

এই বাড়িতে এসে যোগাযোগ করে আরো জানা যায় যে, পুরনো কাঠের সিঁড়ি (যা এখনো বর্তমান) বেয়ে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীম প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ বাটীর তিনতলায় অবস্থিত যে-ঠাকুরঘরে আসতেন, সেই ঠাকুরঘর-সংলগ্ন ছাদের একটি বেদিতে (যা এখনো বর্তমান) বসে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী প্রমুখ ধ্যান করতেন। এমনকি, শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে রোপিত একটি গুলঞ্চ ফুলের গাছ এখনো বর্তমান। কোন একসময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বর থেকে এই গাছের চারা এনে রোপণ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই বাড়িটি মন্দিররূপে এক মহাতীর্থ। ❑

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, ১৫শ সং, ১৩৮৪, শেষাংশে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

২ 'উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪০৮, পৃঃ ৭৩৭-৭৩৮, দীপক গুপ্ত রচিত 'প্রসঙ্গ শ্রীম-র ঠাকুরবাটী (কথামৃত ভবন)' দ্রষ্টব্য।

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ চৈত্র ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
দোলপূর্ণিমা
৩ চৈত্র, মঙ্গলবার
(১৮ মার্চ ২০০৩)

স্বামী যোগানন্দ
ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী
৬ চৈত্র, শুক্রবার
(২১ মার্চ ২০০৩)

রামনবমী
চৈত্র শুক্লা নবমী
২৭ চৈত্র, শুক্রবার
(১১ এপ্রিল ২০০৩)

একাদশী ঃ ১৩, ২৯ চৈত্র
শুক্রবার, রবিবার
(২৮ মার্চ, ১৩ এপ্রিল ২০০৩)

*ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি, বস্টন-এর অধ্যক্ষ **স্বামী সর্বগতানন্দজী মহারাজ**।—সম্পাদক*

প্রশ্ন : *স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "এখনো তোর অবিশ্বাস? যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"—একথার তাৎপর্য কী?*

*—**প্রণব ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া***

উত্তর : আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে, 'বেদান্ত' বলতে কী বোঝায়? 'বেদান্ত' বলে যে, আমরা সত্যবস্তুর আপাত-প্রতীয়মান রূপ দেখি। কিন্তু সত্যবস্তু হলো সর্বত্র-বিরাজিত প্রেমময় এক সত্তা। আসলে, সত্য হচ্ছে একটি আলো—আমাদের পরিচিত জড় আলো নয়; এমন এক আলো যা সবকিছুর স্বরূপকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। এ হলো জ্ঞানের আলোক। এই আলোর দুটি ধর্ম আছে—প্রথমত চেতনাসম্পন্ন, দ্বিতীয়ত প্রেমময় সত্তা। তাই প্রেম ও চৈতন্য হলো সর্বব্যাপী সত্তার দুটি বিশেষত্ব, এবং বেদান্তই এই সত্তার একমাত্র ব্যাখ্যাতা। চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে জ্ঞানের আলোকের মধ্য দিয়ে। তাই প্রথম পদক্ষেপ হলো জ্ঞান; দ্বিতীয়—ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের জন্য আবির্ভূত। তিনি নিজেই যেমন বলেছেন, ভক্তিহিমে সাগরের জল জমে বরফ হয়ে যায়। অর্থাৎ জল সাকার রূপ ধারণ করে; কিন্তু সূর্যের উত্তাপে আবার সেই নাম-রূপ গলে সাগরজলে মিশে যায়। অবতারেরা এইভাবেই জগতের মঙ্গলের জন্য আসেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিপুল শক্তির বিকাশ ঘটান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শক্তি আছে, যেমন মোজেস বলেছিলেন—"ঈশ্বর নর-নারী সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজেরই আদলে।" তাই প্রত্যেকের মধ্যেই শক্তি আছে; তবে ভক্তহৃদয়ের প্রেমের গুণে সেই নিরাকার সত্তা ভক্তের মনোমতো রূপ পরিগ্রহ করেন—শ্রীরামরূপে, শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

প্রশ্ন : *স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সনাতন ধর্ম কী? অন্য ধর্ম থেকে এই ধর্মের পার্থক্য কোথায়?—**তন্ময় বসাক, বাঁশবেড়িয়া***

উত্তর : বেদান্তই হলো সনাতন ধর্ম। প্রথমে বেদান্ত ছিল একটি দর্শন—বেদের অন্ত বা অন্তিম অংশ। 'বিদ্' অর্থে জ্ঞান, 'বেদ' অর্থে জ্ঞানসমুদ্র এবং 'বেদান্ত' অর্থে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বোঝায়। এই প্রজ্ঞা আসে স্বপ্রকাশ সত্যবস্তু থেকে। সনাতন ধর্ম বলে—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, জ্ঞানিগণ তাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এই একই মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"যত মত তত পথ।" অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ধর্মের কথা বলেছেন, তা সনাতন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক যুগে সনাতন ধর্ম বলতে যা বুঝতে হবে, তার যথাযথ ব্যাখ্যা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পাই।

সনাতন ধর্মের অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হতে হবে—(১) ব্যক্তিনিরপেক্ষতা, (২) সার্বজনীনতা এবং (৩) চিরন্তন। স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম একটি বিজ্ঞান যা জড়বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি 'বিজ্ঞানভিত্তিক'। কারণ, বিজ্ঞান কাজ করে এমন সব বস্তু বা নীতি নিয়ে, যেগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন। কিন্তু বিজ্ঞান নিত্য বা শাশ্বত বস্তু নিয়ে কাজ করে না। আইনস্টাইন বলেছিলেন—"প্রকৃতি তার সব রহস্য আমাদের কাছে উন্মোচন করে না। আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের প্রযুক্তি-কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু আবিষ্কার করি। ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো আরো তথ্য পাবে এবং উন্নততর প্রযুক্তি-কৌশল ব্যবহার করে আরো বেশি কিছু আবিষ্কার করবে।" তাই, এই দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শাশ্বত নয়।

অতএব অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সনাতন ধর্মের পার্থক্য রয়েছে এই মূলগত দিক দিয়ে—অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা, সার্বজনীনতা ও নিত্যতার ব্যাপারে। কোন ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিশেষ কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে। ইতিহাসের পাতা থেকে সেই ব্যক্তি মুছে গেলে ঐ ধর্মও শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সে-ধর্ম সনাতন ধর্ম হতে পারে না। কোন ধর্ম হয়তো বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বাইরের কারো ক্ষেত্রে নয়। তখন আমরা বলি, ধর্মটি সার্বজনীন নয়। আবার কোন কোন ধর্ম এমন সব বস্তু নিয়ে কাজ করে যেগুলি চিরকালের নয়—ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য।

প্রশ্ন : *এখনকার দিনে যেখানে অসততাই নীতি, স্বার্থপরতাই কাজের ধারা, ভণ্ডামিই কার্যসিদ্ধির উপায়, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ —"যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন" অনুসরণ করে কিভাবে সত্য, ধর্ম, ন্যায়ের পথে থাকা যায়?*

*—**অমৃতা বসু, কলকাতা-৯৩***

উত্তর ঃ সত্য যে এক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের ব্যবহার এক-এক স্তরে এক-এক রকম। মানুষে মানুষে সম্পর্কও নানান রকম। তাই স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে বিচার করতে হয়—"যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" আর 'সমদৃষ্টি'কে ভুলভাবে ব্যবহার করে যদি এই নীতি লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে সমাজ ভেঙে পড়বে। চাণক্য-নীতিশাস্ত্রে রয়েছে—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ/ প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।।" অর্থাৎ সন্তানকে পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত সযত্নে লালনা করবে। তার পনেরো বছর পর্যন্ত তাড়না (দরকার হলে প্রহার) করবে। সন্তানের যখন ষোল বছর বয়স হবে তখন তার সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করবে। শিক্ষার জন্য এটি প্রয়োজন এবং সমাজে এর রূপায়ণ হওয়া দরকার।

এখন, তোমার মনে যে-প্রশ্নটি আছে সেটি হলো—তোমার উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটির অপব্যাখ্যা হতে পারে এবং তা থেকে অ-সততা বা শঠতা জন্ম দিতে পারে অসততা বা শঠতার। অপব্যাখ্যার প্রশ্ন ওঠে তখনি যখন মনে কোন দুর্বলতা থাকে। মনে যদি কোন আসক্তি, স্বার্থপরতা বা দুর্বলতা না থাকে, মন যদি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, তবে ঐ একই উক্তির ব্যাখ্যা অন্যরকম হবে এবং ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ সহজেই অনুসরণ করা যাবে।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী বলেছেন—"রামকৃষ্ণাবতারের আবির্ভাব হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছে।" একথার তাৎপর্য কী?*

—প্রিয়ঙ্কু চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা

উত্তর ঃ ঠাকুর প্রথম থেকেই এই একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রচলিত 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা'য় জগতের আদৌ কোন কল্যাণ হয় কিনা। তিনি বললেন, হয় না। অন্যদিকে, তিনি নিজে ছিলেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং চাইতেন যে, মানুষও সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক। এই সার্বিক নিষ্ঠাই হলো সত্যযুগের লক্ষণ। অর্থাৎ 'মন-মুখ এক করে' কাজ করা। ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়", এবং এই লক্ষ্যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল থেকেছেন। তাই যে-সাধনাতেই তিনি ডুব দিয়েছেন, তাতেই সফল হয়েছেন ও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমেরিকায় আমি যখন একবার ক্যাথলিক চার্চের ফাদারদের সঙ্গে একটি সভায় একথা বলেছিলাম, তখন তাঁদের একজন উঠে এসে আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। পরের দিন তিনি তাঁর চার্চের সামনে একটা পোস্টার লাগিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিলেন ঃ "অন্য মহাদেশ আবিষ্কার করতে চাইলে আগে নিজের কূলকে দৃষ্টির বাইরে পাঠাও!" আধুনিক যুগে সাধারণত এই নিষ্ঠার অভাব আছে। আমরা কতকগুলি রীতিনীতি মেনে চলি, কিন্তু তাতে নিষ্ঠা থাকে না।

ঠাকুর আমাদের আরেকটি জিনিস শিখিয়েছেন, সেটি হলো দ্রষ্টাকে দর্শন করতে শেখা। আধুনিক বিজ্ঞান দৃষ্টবস্তুকে (অর্থাৎ যা দেখা হচ্ছে তাকে) নিয়ে কাজ করে। কিন্তু সনাতন ধর্ম আমাদের দ্রষ্টাকেও বিবেচনা করতে শেখায়। এটি সত্যযুগের আরেকটি লক্ষণ।

এইজন্য পৃথিবীখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেছিলেন—"আধুনিক সভ্যতার একটি পাশ্চাত্য সূচনা আছে; কিন্তু একে যদি বাঁচতে হয় তবে একমাত্র পথ হলো ভারতীয় পথ; গান্ধীর অহিংসা এবং সর্বধর্মের প্রতি রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা।" রকফেলার ফাউণ্ডেশন ১৯৫১ সালে আর্নল্ড টয়েনবিকে সারা পৃথিবী ঘুরে তাঁর গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড' পর্যালোচনা করার জন্য স্পনসর করেছিল। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বস্টনে এসে প্রকাশ করলেন তাঁর গ্রন্থ—'রি-কনসিডারেশন'। আমি এক সভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"এই মূল্যবান 'হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' লিখে আপনার কী অনুভূতি হয়েছে?" তিনি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—"আমরা অনেক জিনিস জানি, কিন্তু কিছু শিখি না।" আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়েও আমরা শিখি না। ঠাকুর এসেছিলেন আমাদের শিক্ষিত করতে নয়—জ্ঞানী করতে, এমন মানুষ তৈরি করতে যারা শিক্ষাকে মনে রেখে দক্ষতার সঙ্গে জীবনে তা প্রয়োগ করবে।

প্রশ্ন ঃ *অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন 'দীক্ষা' নিয়েছ কিনা। যদি মন ঠিক থাকে তো দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?*

—রাজু সাধুখাঁ, গোবরডাঙা

উত্তর ঃ 'কথামৃত'-এ ঠাকুর একজায়গায় বলছেন ঃ "আমি দীক্ষা দিই না।" এই উক্তিটি পড়ে আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। তাহলে কী করে তাঁর সাক্ষাৎ সন্তানেরা তাঁর 'শিষ্য' হয়েছিলেন? এঁরা যে ঠাকুরের শিষ্য, তার কি কোন প্রমাণ আছে? আমি স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছে গিয়ে একথার অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—"ঠাকুর সেভাবে কখনো আমাদের 'মন্ত্র' দেননি। কিন্তু তিনি আমাদের কখনো কখনো ডেকে পাঠিয়ে তাঁর ঘরে থাকতে বলতেন। তারপর কোন এক উপযুক্ত অবসরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার?' ইত্যাদি। তারপর তিনি আমাদের স্পর্শ করতেন ও গুরুরূপে সকল বাধা অপসারণ করে দিতেন। আর এইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেত।" আজকাল এইধরনের 'শাম্ভবী দীক্ষা'র প্রচলন নেই, কিন্তু 'মান্ত্রী দীক্ষা' আছে এবং সেটিই শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বার উন্মোচনের পদ্ধতি।

তুমি যে বলছ, 'যদি মন ঠিক থাকে'—ওটা একটা ওপর-ওপর কথা; কেবল জড়জগতের সঙ্গেই এর সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক জীবনে তোমার এই কথা প্রযোজ্য নয়। তুমি একজন সুনাগরিক হতে পার, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে হয়তো তুমি কিছুই জান না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করতে গেলে দীক্ষা হলো প্রয়োজনীয় একটি তোরণদ্বার। ❑

পাশ্চাত্য-দর্শন প্রতিবাদী স্বামী বিবেকানন্দ

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার প্রসূতি ভারতবর্ষ। গ্রিস দেশের সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আবির্ভাবের অন্তত সাড়ে চারহাজার বছর আগেই ভারতের আর্য ঋষিরা ঋগ্বেদ রচনা করেন। জার্মান পণ্ডিত জন শ্লেভার, ওগুেনবার্গ, উইন্টারনিজ, এমনকি ম্যাক্সমুলারও ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টিকালকে খ্রিস্টজন্মের দেড়হাজার বছরের বেশি বলতে দ্বিধা করেছেন। ইওরোপীয় ভারত-তত্ত্ববিদেরা আর্যদের বলেছেন 'বিদেশী'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঞ্জাবে সিন্ধুনদতীরে মহেঞ্জোদারো নগরীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কারে। রেডিওকার্বন পরীক্ষায় জানা যায়, সিন্ধুসভ্যতার বয়স অন্তত সাড়ে পাঁচহাজার বছরের অধিক পুরনো।

সাড়ে চারহাজার বছর আগে আর্য ঋষিরা ভারতের সকল ধ্যানধারণার আকর বেদ রচনা করলেন কেমন-ভাবে? পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে, খ্রিস্টজন্মের মাত্র হাজার দেড়েক বছর আগে আর্যরা হিমালয়-গিরিপথে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। মধ্য-এশিয়া ও কাস্পিয়ান হ্রদতীরভূমি থেকে যাযাবর, অসভ্য, বর্বর, পশুচারণকারী একদল মানুষ উর্বর ভূমির সন্ধানে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে খ্রিস্টজন্মের হাজার থেকে দেড়হাজার বছর আগে। এরাই আর্য। এদের সৃষ্ট বেদ 'চাষার গান'। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্‌দের এমনই অভিমত। প্রতিবাদ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। "বেদ সত্যই ঋতম্ভরা মহাপ্রজ্ঞার অনন্ত আকর।... (অথচ) ইওরোপীয় পণ্ডিতদের মতে বেদকে অর্ধসত্য উপাসনার প্রাচীন পুস্তকরূপে ফেলিয়া রাখিতে হয়।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুগভীর ও সুবিস্তৃত অধ্যয়নের দ্বারা এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"আর্যদের নিবাস ছিল উত্তর ভারত। তাই উহার নাম ছিল আর্যাবর্ত। আর্যগণ বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই।" সুপণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি ও তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন—আর্যরা বিদেশী নন, ভারতেরই অধিবাসী।"

বেদের সার উপনিষদে আর উপনিষদের নির্যাস গীতা, যা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠে উচ্চারিত। বেদান্ত-সিদ্ধান্তই সর্বকালের চিন্তাজগতে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই বেদান্ত অস্ত্রেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-আগত বস্তুবাদী দর্শনকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আরবভূমি-আগত প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ভারতের তপোবনের মনীষাদীপ্ত শান্ত, নিশ্চিন্ত পুণ্যভূমি বিমোথিত ও কলুষিত হলো, যেদিন আরবীয় মহম্মদ বিন কাসিম 'কাফের' হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করে 'জিজিয়া' কর ধার্য করলেন (৭১২ খ্রিস্টাব্দে)। এরপর গজনীর দস্যু মামুদ সোমনাথ-মন্দির ধ্বংস ও বিগ্রহ চূর্ণ করলেন এবং সেই প্রস্তর গজনীর মসজিদের সিঁড়িতে বসালেন ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ—এই ৫৬৫ বছরে ভারতে বিভিন্ন মঠ, মন্দির, কয়েকশ বিগ্রহ বিচূর্ণ হয়েছে। সোমনাথের মন্দির ছাড়া মথুরার কৃষ্ণমন্দির, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, নালন্দা, বিক্রমশিলার মতো এশিয়াবিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রগুলি হয়েছে ভস্মীভূত। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁর দুই পুত্র—গাজী খাঁ ও দিলওয়ার খাঁর আমন্ত্রণে বাবর ভারত আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত হন, দেহে আশিটি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে রাজপুতবীর রানা সঙ্গ বাবরের সুচতুর কৌশলে নিহত হন।

ভারতের বুকে এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল তৈমুরলঙ্গ (১৩৯৮), নাদিরশাহ (১৭৩৮) ও আবদালির (১৭৬১) বর্বর ও নৃশংস অত্যাচারে। বখতিয়ার খিলজী নালন্দা ধ্বংস এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁথি ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট করায় সুপ্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তা ও মননে ছেদ

পড়ে। আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষ রাত্রে স্ত্রীকন্যা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না। এসব কথা লিখে গেছেন আলবেরুণীর মতো সুপণ্ডিত ও একালের ঐতিহাসিক হাবিব। সাম্প্রদায়িকতার বীজ এইসময় থেকেই উপ্ত। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দু-ভারত মাথা তোলে। রাজপুত রানা প্রতাপসিংহ, মারাঠা বীর শিবাজী আর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) গৌড়রাজ্যের স্বাধীন নরপতি হন। মুসলমানরা ভারতকে বলত 'দার উল-হার্ব' (যুদ্ধক্ষেত্র, শত্রুর দেশ)। এদেশকে 'দার-উস-সালাম' বা শান্তির দেশ করাই তাদের 'ফর্জ' (কর্তব্য)। ইসলাম মানে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ। তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান। আল্লার যে প্রত্যাদেশ (ওহি), তাই কোরান। কোরানের পাঁচটি স্তম্ভ—(১) কলমা, (২) হজ, (৩) জাকৎ, (৪) নামাজ ও রোজা এবং (৫) জেহাদ। জেহাদের কথা হলো বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিনাশ করে আল্লার ধর্ম পত্তন। ভারতবর্ষ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সাকার, নিরাকার উভয়কেই স্বীকার করে। তার ধর্মযুদ্ধ (যেমন কুরুক্ষেত্রে) অধর্মের বিরুদ্ধে, বিধর্মীর বিরুদ্ধে নয়। বিধর্মী হলেও এখানে ধার্মিক হতে বাধা নেই।

ভারতীয় হিন্দু তাই উপনিষদের নিরাকার একেশ্বরবাদী, আবার পৌরাণিক সাকার দেবদেবীর পূজারী। ভারতবর্ষে আছেন ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব বৌদ্ধ, জৈন, এমনকি নাস্তিক্যবাদী চার্বাকপন্থীরাও। ভারতবর্ষ ধর্মের মহামিলনের ক্ষেত্র। অন্য ধর্মেও সত্য আছে বলে তার বিশ্বাস। তাই পরম সহিষ্ণুতায় সে আশ্রয় দিয়েছে রোমান অত্যাচারে পলাতক ইহুদিদের আর মুসলমান-ভয়ে ভারতে শরণার্থী পারসিদের। শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ একথার উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মানুষেরা উচ্চবর্গীয় আর্যদের কাছে শূদ্ররূপে বর্ণাশ্রমে গৃহীত হয়েছিল। কর্মভেদ তখন জাতিভেদ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কালক্রমে পুরোহিতদের নির্বুদ্ধিতায় ও পীড়নে হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, চণ্ডালেরা 'অস্পৃশ্য' হয়ে চরম অবমাননার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। এই তথাকথিত নিম্নবর্গীয়গণ সামাজিক মর্যাদালাভের প্রত্যাশায় প্রথমে বৌদ্ধ, পরে ইসলামী সাম্যদর্শী সমাজে আশ্রয়গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য ইসলাম দেয় না, তাই তারা 'আতরাফ'-রূপে গণ্য হয়, আসরাফ বা অভিজাত হিসাবে নয়। 'আতরাফ' অর্থে নিচু বা বাজে লোক। ইসলামী তরবারি দ্রুত ধর্মান্তরকরণের কাজে তৎপর হয়। ভারতবর্ষ হয়তো মিশর, পারস্য, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়ার মতো পুরোপুরি ইসলামী আগ্রাসনে চলে যেত, কিন্তু তাকে রক্ষা করে পূর্বভারতে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব, উত্তর ভারতে নানক ও মধ্য-দক্ষিণ ভারতে রামদাস, কবীর, দাদূ, নামদেব প্রমুখ সাধুদের দার্শনিক মতবাদ ও উদার ধর্মাদর্শ। অবশ্য স্পেনই একমাত্র দেশ যা ইসলামী আগ্রাসন ব্যর্থ করেছে প্রায় আটশো বছর পরে (৭১২-১৪৯২)। তবে ভারতদেহ ছিন্ন করে গঠিত হয়েছে ইসলামী পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (১৯৪৭)।

ভারতবর্ষের দেবতা এক বিচিত্র কৌশলে ভারতকে রক্ষা করলেন। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বণিকের 'মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল'। ভারতের সম্পদ বিদেশী ইংরেজ বণিকের জাহাজে ইংল্যাণ্ডযাত্রা করল, আর খ্রিস্টান পাদরিরা 'হিদেন' মূর্তিপূজকদের (হিন্দু) আলোয় আনার 'পুণ্য কর্তব্য' নিয়ে ভারতে এলেন।

ইংরেজ মঠ, মন্দির, বিগ্রহ ভাঙল না, বরং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষা করল। কিন্তু পাদরিদের নির্দয় লক্ষ্য হলো বহু শতাব্দী ধরে কুসংস্কার আর কদাচারে নিমগ্ন হিন্দুধর্ম ও সমাজ। বেদ, উপনিষদ্ তখন বিস্মৃতির অতলে। ধর্ম তখন, বিবেকানন্দের ভাষায়, 'ভাতের হাঁড়িতে'। লোকাচার করছে রাজত্ব। ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩৩)-শিষ্য হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দুধর্মকে করছে হেয়জ্ঞান। মানব মল্লিক নামে জনৈক ছাত্র তো বলেই বসল: "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

এমন সময় রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ইসলামী 'মোতাজেলা' দর্শন ও উপনিষদের একেশ্বরবাদকে অবলম্বন করে প্রচার করলেন ব্রাহ্মধর্ম। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মমন্দির (১৮২৮)। ঈশ্বর-অন্বেষী মানুষটির বুকে বেজেছিল পরাধীনতার বেদনা। তাঁর কথা—"আমাদের অধঃপতনের কারণ আমাদের অতিরিক্ত সভ্যতা। এমনকি পশুপক্ষী-হত্যায়ও আমাদের পরাঙ্মুখতা। জাতিবিচার আমাদের ঐক্যবদ্ধতার বেজায় পরিপন্থী। কিন্তু হিন্দুদের মতো পরমতসহিষ্ণু ও উদার জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁরা সব জাতি ও সম্প্রদায়কে ঈশ্বরানুগ্রহলাভের সমান অধিকারী মনে করেন।"

ইওরোপীয় চিন্তা-দর্শন

ষোল বছর বয়সে রামমোহন পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারত-পরিক্রমা করেন ও তিব্বতে গমন করেন। ঠিক এই সময় ফরাসি বিপ্লবে সারা ইওরোপ আন্দোলিত হয় (১৭৮৯)। এই বিপ্লবের মন্ত্রদাতা ভলটেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ও দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। রুশোর 'Le Contract Social' গ্রন্থটি পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে তুমুল আলোড়ন তোলে ও শেষাবধি ফরাসি বিপ্লবের কারণ হয়। রুশোর পুঁজি (Capital) ও জমি (Land) সম্পর্কে ধারণার ব্যাখ্যাতা ওয়েন লুইস ও ক্যাবেট প্রমুখ দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম 'কমিউনিজম্' শব্দটির প্রবক্তা। তবে লুইস ও ব্লেন বলেন, শ্রম অনুযায়ী সম্পদের বিভাগ হওয়া উচিত। পরে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এই তত্ত্বের নবরূপায়ণ করেন তাঁর 'দাস ক্যাপিট্যাল' (১৮৫৯) গ্রন্থে। এঙ্গেলসের সহযোগিতায় তাঁর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য দার্শনিক হেগেলের 'ডায়ালেকটিক্স' (১৭৭০) পরবর্তী কালে মার্কসীয় তত্ত্বের অনুপ্রেরকের কাজ করেছিল। এসম্পর্কে দার্শনিক কাণ্টের অজ্ঞেয়বাদেরও (১৭২৪) একটা ভূমিকা আছে।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহকে নব্য ভগীরথের মতো আনয়ন করেন রামমোহন রায়। ফরাসি বিপ্লবের বাণী 'Freedom, Equality & Fraternity' (স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব) পাঠ করে তিনি উদ্দীপিত হন। সেই ভাবাদর্শ তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করাতে সচেষ্ট হন। এছাড়া আসে দার্শনিক কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)-এর 'Great Man Personality Theory' (মানবসভ্যতার নিয়ন্ত্রক শ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব)। এরপর ঝড় তোলেন ফরাসি দার্শনিক কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) 'হিতবাদী' তত্ত্ব ও জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) 'ইউটিলিটারিয়ানিজম্' তত্ত্ব। মিলের তত্ত্বে কোঁতের সর্বজনকল্যাণে ত্যাগাদর্শ গৃহীত হলেও মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত, তা সমষ্টির ঊর্ধ্বে স্থাপিত। মানবকল্যাণে যেকোন কর্মই ন্যায়সঙ্গত ও উপযোগী বলে তিনি প্রচার করেন। চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) প্রাণীর বিবর্তনতত্ত্ব পুরনো ধারণাকে পুরোপুরি টলিয়ে দেয়।

অখণ্ড বঙ্গে হিন্দুরা তখন খ্রিস্টান পাদরিদের দ্বারা আক্রান্ত। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নিরাকার, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্ররোচিত নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) আচারসর্বস্ব ধর্মের সমর্থন করতে গিয়ে নৃশংস সতীদাহ প্রথা রদ আইন (১৮২৯) ও বিধবা বিবাহ আইনের (১৮৫৬) বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬৯-১৬২৬) ও রোজার পেইনের প্রগতিমূলক ভাবনাচিন্তা পৌঁছেছিল এদেশে। তবে মিল, বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), কোঁতের নিরীশ্বরবাদী চিন্তা এদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত মনকে বেশি প্রভাবিত করে। বিশেষ করে হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)-এর অজ্ঞেয়বাদ তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি মিল, বেন্থাম, স্পেন্সারের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি সবই ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয়ী করে। অনেকের ধারণা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। তবে তিনি বার্টাণ্ড রাসেলের গোত্রীয় নন। কারণ ব্যক্তিজীবনের চারিত্রিক পরিশুদ্ধতায় বিদ্যাসাগর বিশ্বাসী ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩০-১৮৭২) ছিলেন 'হিতবাদী' তত্ত্বে অনুপ্রাণিত।

বঙ্কিমচন্দ্র রুশো ও কোঁতের প্রভাবে লেখেন তাঁর মনীষাদীপ্ত অসাধারণ গ্রন্থ 'সাম্য'। পরে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা-রূপে লেখেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। মানবিক বৃত্তির সামঞ্জস্যের অনুশীলন তখন তাঁর আরাধ্য। 'সাম্য' গ্রন্থের মুদ্রণ তিনি বন্ধ করে দেন। তবে 'অনুশীলন' শব্দটি বিপ্লবী দলের নামকরণে গৃহীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব

সাড়ে পাঁচশো বছরের (১১৯২-১৭৫৭) ইসলামী আগ্রাসন ও পীড়নে যখন সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ যখন বিপর্যস্ত, আত্মবিস্মৃত—বেদ, উপনিষদের বাণী ভুলে লোকাচারের দাসত্ব করছে, তখন এল ইংরেজ। ভাষার আধারে নিয়ে এল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-দর্শন। [অবশ্য আরবি অনুবাদে ভারতের গণিত, বিজ্ঞান ইওরোপে পৌঁছেছিল কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে তুর্কি আক্রমণে পলাতক পণ্ডিতদের দ্বারা (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। ফলে ইওরোপের নবজাগরণ ঘটে।] প্রায় সাতশো বছরের স্থাণু সমাজদেহে ভারতবর্ষে গতিশীলতার সৃষ্টি হয় পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তার সংঘাতে।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আইন-উপদেষ্টা মেকলে (১৮০০-১৮৫৯)-র উদ্ধৃত উক্তিঃ "ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন অকিঞ্চিতকর", তরুণ ছাত্রদের হিন্দুসমাজকে অবজ্ঞা করতে শেখায়। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রই খ্রিস্টান হয়ে যান। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মধুসূদন অন্যতম। হিন্দুধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা পুরোহিতদের অবজ্ঞায় বৌদ্ধ ও পরে মুসলমান হয়ে যায়। এরপর পাদরিদের প্রচারে খ্রিস্টানীকরণ। পরে দেখা গেল, শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা ব্রাহ্ম হচ্ছেন। দেশ ও ধর্মের এমন বিপর্যয়ের লগ্নে হুগলী জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্কুল-কলেজের কেতাবী বিদ্যা তাঁর ছিল না। ছিল না অর্থ-বৈভব। সম্বল ছিল অকপট ঈশ্বরবিশ্বাস। তাঁর আকর্ষণে ধরা দিলেন স্পেন্সার, মিল, বেন্থাম-পড়া নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব সংশয় নিরসন করে তাঁকে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের তরবারি

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বেদান্ত-খড়্গে পাশ্চাত্যের একদেশদর্শী জড়বাদী দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে খণ্ডন করেন। তাঁরা আচার্য ও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ সিদ্ধান্ত "একপেশে হোসনে" জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বীজমন্ত্র ছিল। কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল'-এর সিদ্ধান্ত—'অর্থই মানবসমাজ ও সভ্যতার নিয়ামক', সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের অভিমত—'কামনাশক্তি জগৎসংসার তথা মানবজীবনের গতিপথ প্রদর্শক ও পরিচালক' কিংবা কার্লাইলের ধারণা—'প্রচণ্ড ওজঃশক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বই মানবসমাজকে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো চালিত করে'—এগুলিকে বিবেকানন্দ একপেশে বলে মনে করতেন। মানবসভ্যতার দ্বার উন্মোচনের চাবিকাঠি বহুবাদী চিন্তার মধ্যে নিহিত বলেই স্বামীজীর ভূয়োদর্শী অভিমত। একদেশী চিন্তা সত্যান্বেষণে অচল।

প্রাণীর বংশগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রেগর মেণ্ডেলের (১৮২২-১৮৮৪) 'বংশগতির তত্ত্ব' রাশিয়ার স্ট্যালিন বাতিল করেছিলেন সোভিয়েত অজ্ঞেয়বাদী টি. ডি. লাইশেঙ্কোর (১৮৯৮-১৯৭৩) একপেশে 'স্কুল অফ জেনেটিক থট'কে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু একজন মানুষের ক্ষেত্রে শুধু পরিবেশই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক—এই মতবাদ অচল প্রমাণিত হয়েছে। বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। এধারণাটিও স্বামী বিবেকানন্দের। বীজ থেকে জল, বাতাস ও উত্তাপের সংস্পর্শে যে-শিশুবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তা বীজকে বিনষ্ট করে নয়।

বীজের মধ্যে যে প্রাণশক্তি (ব্রহ্ম-চৈতন্য) বর্তমান, তারই রূপান্তর অঙ্কুরে। ব্রহ্ম (চৈতন্য) বিলসিত—জড়, বৃক্ষ ও জীবে। জড় আবার চৈতন্যে সতেজ, স্ফুরিত হতে পারে। অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ তারই প্রমাণ।

অদ্বৈতবেদান্তের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ একপেশে মতগুলিকে অসার প্রতিপন্ন করেন। কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক ছাঁচে গড়া সোভিয়েত রাশিয়ার বিচূর্ণ হওয়া, মাও-সে-তুং-এর লাল চিনের চিরস্বাধীন তিব্বত-গ্রাস (১৯৫০) ও শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পুঁজিবাদী পথগ্রহণের মধ্যে স্বামীজীর ব্যাখ্যা প্রমাণিত। বেজিঙের তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে তিনহাজার ছাত্রহত্যার (১৯৮৯) মধ্যে প্রমাণিত একপেশে মত কত ভয়ানক। সোভিয়েত-অনুগত যারা এতদিন স্বামী বিবেকানন্দকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে কটূক্তি করেছিল, সেই পণ্ডিতজনদের কণ্ঠে এখন বিবেকানন্দ-বন্দনা। রাশিয়ায় বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, রাশিয়ান ভাষায় লক্ষ লক্ষ কপি স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ ও পত্রাবলী বিক্রি হচ্ছে।

চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনতত্ত্ব' বিবেকানন্দ স্বীকার করেননি। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ও 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' প্রাণিজগতের নিম্নতর পর্যায়ে ক্রিয়াশীল হলেও মানবিক উচ্চতর স্তরে সত্য নয়। তাহলে বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হতো।

বনের বেদান্তকে মানব-সংসারে প্রয়োগ করেছেন স্বামীজী। এ-বোধের বীজ অবশ্য তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"—এ ঋতবাণীও শ্রীরামকৃষ্ণের। যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য বিবেকানন্দের বেদনাবোধও বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বের ফলশ্রুতি। পীড়িত, বঞ্চিতদের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা কোন রাজনৈতিক স্বার্থ-প্রণোদিত নয়। 'মুচি, মেথর আমার রক্ত, আমার ভাই' বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন এই ত্যাগিশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে : "I travelled years all over India, finding to way to work for my countrymen and that is why I went to America... who cared about this Parliament of Religion. Where my own flesh and blood sinking everyday and who cared for them."

বেদান্তের সত্য 'সর্বজীবে ব্রহ্ম বর্তমান'—এই বোধে মনুষ্যজীবন উদ্ভাসিত হলেই জগৎসংসারের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

- ঋগ্বেদ
- স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড
- পরিব্রাজক—স্বামী বিবেকানন্দ
- মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা—ডঃ অতুল সুর, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
- আমরা কি বিদেশী (প্রবন্ধ)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী এবং 'শিশির' পত্রিকা, ২০ ভাদ্র ১৩৩২
- ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
- রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বাক্ষরতা প্রকাশনী
- বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, নিউ দিল্লি
- ফেরিস্তা : মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস—ডঃ শহীদুল্লাহ (Re. Histry of Eliot & Dowson)
- The Artic home in Vedas (Orion)—Balgangadhar Tilak
- Advanced History of India—R. C. Mazumder, Mcmillan Co., London
- Encyclopedia, Vol. I, 5th Edn.
- Early Medieval Histry of India—A. B. Pandey, Central Book Deph., Allahabad
- Thus Capital—Karl Mark, Penguine
- Mendals Principles of Heridity—William Bateson Defence, Cambridge University
- The Lycenco affair—David Jeravsky, Harvard University Press

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।

প্রতি মাসে আমাদের দপ্তরে উৎসব-সংবাদ এত বেশি আসে যে, সেগুলি প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাতে স্বাভাবিকভাবে সংবাদ-মূল্যও হ্রাস পায়। তাই সাধারণভাবে বছরে কোন সংস্থার ২টির বেশি সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আশা করি প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

—সম্পাদক

'ওমনিসনিক' শব্দের পরবর্তী পদক্ষেপ 'জাইরোসনিক'

বিগত পৌষ ১৪০৮ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ 'শব্দজগতে বিপ্লব আনলেন বাঙালি বিজ্ঞানী' শীর্ষক বিজ্ঞান-সংবাদে বিজ্ঞানের জগতে নতুন সংযোজন হিসাবে 'ওমনিসনিক' (Omnisonic) শব্দের আবিষ্কারের কথা বলেছিলাম। সম্প্রতি এই নতুন আবিষ্কার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন তুলেছে। ইতোমধ্যেই ঐ 'Omnisonic' শব্দ নিয়ে বহু সংবাদ 'Times of India', 'Hindusthan Times', 'The Telegraph' ইত্যাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে; BBC দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছে গবেষক সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কলকাতা দূরদর্শন এবং জার্মান টেলিভিশন-এও এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এর পেটেন্ট-এর জন্য আবেদন গৃহীত হয়েছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল, এই ঘূর্ণায়মান শব্দ (Omnisonic) একটা বিনোদনের উপকরণই হবে। লতা মঙ্গেশকরের একটি পুরনো ক্যাসেটের গান এই পদ্ধতিতে মেরামত করে (অর্থাৎ mono-recording সত্ত্বেও যন্ত্রাংশকে কোথাও কোথাও নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করে) গাথানী রেকর্ডস কোম্পানি কিছুদিন আগে সেটি বাজারে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি এই নতুন শব্দাবিষ্কারের প্রয়োগক্ষেত্র সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিক রোগমুক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এমন কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যে, মনে হয় এই নতুন আবিষ্কার মানুষকে অতীন্দ্রিয় রসে আপ্লুত করতে পারে। কোন বিশেষ একটি রোগের জন্য একটি বিশেষ ধরনের প্রয়োগের প্রসঙ্গ এখানে নেই। এই ঘূর্ণায়মান শব্দতরঙ্গ মানুষের ওপর আপতিত (irradiated) হলেই তার সমগ্র সত্তাকে সে প্রভাবিত করে এবং তার ব্যক্তিত্বের একেবারে গোড়ায় গিয়ে তার ইতিহাস ধরে ধরে তাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়। রোগ আপাতদৃষ্টিতে কখনো বৃদ্ধি পায়। হয়তো ২০ বছর আগেকার রোগ ফিরে আসে, কিন্তু ক্রমশ সেই রোগ নির্মূল হয়ে যায়। সজলবাবুর ভাষায় এটিকে বলা হয় 'Gyrosonic radiation'—ঘূর্ণায়মান আপতনক্রিয়া। তিনি এর ভারতীয় নামকরণ করেছেন 'সুদর্শন ক্রিয়া'। 'সুদর্শন' শব্দটি যেমন একদিকে বোঝায় শ্রীকৃষ্ণের 'সুদর্শন' চক্র, যা কিনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত আবর্তনের প্রতীক, তেমনি এটি সু-দর্শনও বটে, অর্থাৎ সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়ার একটি ক্ষমতা বিশেষ। একটা অবোধ্য, অধরা বস্তুকে যেন দেখা যায়। যখন একটা ঢাকের শব্দ কিংবা পাখোয়াজের 'টুকরো' হেডফোনের মাধ্যমে শোনার সময়ে মাথার চারিদিকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরতে

"জৈব বৈদ্যুতিক বিশ্ব" ঃ বিজ্ঞানীদের মতামত

জৈব ক্ষেত্রে (biological field) 'বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয়' প্রভাব কেমন হয় তা নিয়ে বহু গবেষণা চলছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ এ. এস. প্রেসম্যান-এর মতে, মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (fields) সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম। এবং মানুষের শারীরিক ক্ষেত্র অত্যন্ত জটিল বলে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় প্রভাবও অত্যন্ত প্রবল। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিস, পারস্য, চিন, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে মানুষের রোগারোগ্য ব্যাপারটা আত্মা (spirit), মন ও দেহের যৌথ প্রক্রিয়াত্মক। একটিকে বাদ দিলে অন্যগুলি অবাস্তব।

থিয়োফ্রেসটাস (১৪৯৩-১৫৪১ খ্রিঃ) বলেছিলেন, গ্রহ, চুম্বক এবং বৃক্ষলতাদি মানুষকে একটা সর্বব্যাপী অদৃশ্য বস্তু দ্বারা প্রভাবিত করে।

'আধুনিক ঔষধ'-এর জনক হিপ্পোক্র্যাটিস-এর মতে, পরিবেশের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়। যে-দ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই 'কস্' দ্বীপে তিনি লক্ষ্য করেন, পৃথিবীর নিজস্ব একটি রোগারোগ্য-কম্পন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আছে। [আমরা বোধহয় তাকে নষ্ট করে ফেলেছি।] ভিক্টর বিসলের 'Subtle-body healing' দ্রষ্টব্য।

ডঃ নর্ডেনস্ট্রম 'Biologically closed Electric Circuits : Clinical and Experimental and Theoretical Evidence for an Additional Circulatory System' গ্রন্থে দাবি করেন, মানুষের শরীরের ভিতরে একটি অজ্ঞাত বৈদ্যুতিক বিশ্ব রয়েছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকাশ হয় যখন শরীরে কোন আঘাত লাগে কিংবা টিউমার হয় অথবা ইনফেকশন হয়। ধমনীর মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়। শরীরাভ্যন্তরস্থ এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা শরীরের মধ্যে একটা সাম্য ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করে। অর্থাৎ এইভাবে আঘাত, ইনফেকশন, টিউমার ইত্যাদির আরোগ্যের জন্য শরীরের একটি নিজস্ব বৈদ্যুতিক প্রয়াস সর্বদা আছেই। এই প্রয়াসকে খর্ব করার চেষ্টা থেকেই ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়।

থাকে, তখন যেন পরিষ্কার ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় যে, যিনি পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন, তিনি যেন শ্রোতার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বাজাচ্ছেন।

সুস্থ মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও ক্রিয়াসমূহ তখনি সব ঠিকঠাক চলে, যখন মস্তিষ্কের অণু-পরমাণুর সঠিক ঘূর্ণন সম্ভব হয়। বিজ্ঞানের একটি সর্বজনবিদিত সত্য হলো—সমস্ত পরমাণু নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে বা 'spin' করে চলেছে। মানুষের শরীরেও যত পরমাণু আছে—জৈব কিংবা অজৈব—সবই নিজের অক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। এই ঘূর্ণন যখন সঠিক হয় তখনি মানুষের শরীরাভ্যন্তর্গত সব কয়টি যন্ত্র ঠিকঠাক চলে। শব্দকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে যেমন ইচ্ছা কৌণিক বেগ দান করার বিশেষ প্রক্রিয়া শব্দবিজ্ঞানী সজল বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, পৃথিবীতে সমস্ত পরমাণু (বা তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণা) সর্বদাই ঘূর্ণায়মান। গোটা পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। আরো বৃহদাকারে দেখা যায়, সূর্য তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে (অর্থাৎ নয়টি গ্রহ এবং গ্রহাণু ইত্যাদি) ঘূর্ণায়মান, যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'precession and nutation', যার ফলে '1st point of Aries'-এর স্থান পরিবর্তন ঘটে। আবার সূর্য যে-পরিবারভুক্ত অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথ, এই গ্যালাক্সি—সেটিও নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। কাল, মহাকাল সবই ঘুরছে। চক্রাকারে এই আবর্তনই প্রতীক আকারে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এই মহাজাগতিক ঘূর্ণন কিংবা আণবিক ঘূর্ণন যদি কখনো স্তব্ধ হয়ে যায়, সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। মানুষের উচিত এই মহাজাগতিক ঘূর্ণনের সঙ্গে নিজের অন্তরের ঘূর্ণন-চরিত্রকে মিলিয়ে নেওয়া।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, biological clock-এর আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আর সেই কাজটাই করে দেয় 'Gyrosonic Radiation' অদ্ভুত কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। যে 'immune defence' বা রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা মানুষের আছে, তার ক্ষয় হয়ে যাওয়ার মূল কারণ সঠিক আবর্তনের অভাব। 'Gyrosonic Radiation' কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়। আর বলপূর্বক শরীরের প্রতিটি কণার আবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে 'immune defence' বাড়িয়ে তোলে। ফলে মন এবং শরীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং সাম্যাবস্থা দুটিই ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে শব্দ যে আলোর তরঙ্গের চেয়েও শক্তিশালী তা প্রমাণিত হলো। অথবা ভাবা যেতে পারে, 'electromagnetic' তরঙ্গ শব্দেরই একটি বিশেষ অবস্থা বা বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। 'Gyrosonic Radiation' নামটি খুব উপযুক্তই হয়েছে বলব। কারণ এই শব্দতরঙ্গ একটা 'electromagnetic' ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যা মানুষের শরীরে কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে ঢুকতে না পেলে (অর্থাৎ যেমন দেখা গেছে বধির মানুষের ওপর প্রয়োগ করে) ত্বকের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে 'transduced' হয়। শরীরে সেই 'field' প্রবেশ করে তার DNA-র অভ্যন্তরে যদি কিছু অসামঞ্জস্য থাকে তা মেরামত করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে না বোঝা গেলেও ক্রমশ বোঝা যায় যে, শরীর-মনে একটা পরিবর্তন আসছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এখনো পর্যন্ত প্রায় চারহাজার রোগীর ওপরে এই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অধ্যাপক গবেষক ডঃ আর. চৌধুরীর মতে এই 'Gyrosonic Radiation' বাস্তবিকই একটি 'crisis care' বা আপৎকালীন সুরক্ষা। ক্যান্সার, অটিজম্ (শিশুর মানসিক বৈকল্য), আর্থারাইটিস, স্পণ্ডেলাইটিস, গুরুতর মানসিক চাপ, অবসন্নতা, মাইগ্রেন, দৃষ্টিহীনতা

ইয়েল ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিন্-এর ডঃ হ্যারল্ড এস. বার এবং ডঃ লিওনার্ড র‍্যাভিজ মানুষের শরীরাভ্যন্তরে বহু জটিল [illegible] গবেষণাপত্র প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের একটি 'L-Filed' বা 'জীবন-ক্ষেত্র' আছে—[illegible] শক্তির (energy) এক বিশেষ উচ্চতর প্রকাশ আমাদের [illegible] 'electro-magnetic spectrum' (বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় সীমানা)-কে অতিক্রম করে যায়।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় কথাটি বললেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Material Science-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক উইলিয়াম টিলার। তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিধ্বনি করে বললেন, [illegible] পদ্ধতিতে শক্তি গ্রহণ ও বর্জন করে। এবং যে-তরঙ্গ [illegible] ও [illegible] সঙ্গে যুক্ত—তারও জ্যামিতিক, আবর্তন এবং বিকিরণগত [illegible]। মানুষ এইভাবে নিজের চতুর্দিকে একটি জটিল তরঙ্গ বিকিরণ [illegible] শক্তি (energy)-ও বিকিরিত হয়। মানুষের পরিচালক সাতটি [illegible]-এর কথা বলেন ডঃ টাইলার। যথা, স্থূলশরীর (physical body), [illegible] (etheric body), অতি-প্রাণিক বা আবেগমূলক শরীর (astral or emotional body), অতীন্দ্রিয় মানসিক শরীর (intuitive mind body), বুদ্ধিযুক্ত মানসিক শরীর (intellectual mind body) এবং জীবাত্মামূলক মানসিক শরীর (spiritual mind body)। সবশেষে শুদ্ধ আত্মা (pure spirit)। তিনি আরো বলেন, মানুষের [illegible] একটি বিশেষ ব্যাপার হলো চক্র-ব্যবস্থা (chakra system)। তাঁর মতে মানুষের [illegible] বরাবর একগুচ্ছ চক্রাকার 'ঘূর্ণি' বিদ্যমান, যাদের এক-একটি [illegible] বলে অভিহিত করা যায়। এবং এই শক্তিকেন্দ্রগুলি (energy centers) [illegible] শক্তি আদানপ্রদান করে থাকে। আমাদের ষট্‌চক্রের কথা এবং [illegible] থেকে শিষ্যের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের ব্যাপারটিই যেন ডঃ টাইলার বলে গেলেন।

ইত্যাদি দীর্ঘদিনের কোন অসুখে এই শব্দতরঙ্গ অদ্ভুতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যার সবটাই ইতিবাচক।

তিনি আরো জানান যে, আর্থারাইটিক রোগীর ওপর এই শব্দ প্রয়োগ করে মন্ত্রের মতো কাজ পাওয়া গেছে। দৃষ্টিহীন ক্রমশ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। মানসিক হতাশায় জর্জরিত মানুষ ফিরে পেয়েছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। ক্যান্সাররোগীর যন্ত্রণা উপশম করে তাকে কষ্টহীন মৃত্যুবরণ করতে সাহায্য করেছে এই শব্দ। কোমা অবস্থার উন্নতি ঘটেছে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে। তারা উঠে বসতে পেরেছে, কথা বলতে পেরেছে। উত্তর ২৪ পরগনা-নিবাসী নবমিতা দাস, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-নিবাসী রাজীব দে, সুশান্ত ব্যানার্জি, দীপক আচার্য প্রমুখ রোগীর ব্যাপারে যখন ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন, তখনি তাদের সম্মুখে আশার প্রদীপ নিয়ে হাজির হয়েছে জাইরোসোনিক শব্দতরঙ্গ।

এই ধরনের চিকিৎসাকে 'Alternative Medicine'-এর পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, এর পদ্ধতি সাধারণ চিকিৎসাপদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। একজন রোগীকে অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছিল কোমা অবস্থায়। সেই রোগীর কোনই উপকার হয়নি। জাইরোসনিক দেওয়ার পর দেখা গেল তার উন্নতি হচ্ছে এবং সে ক্রমশ চোখ মেলে তাকিয়েছে, কথা বলতে চেষ্টা করছে। ডঃ রাঘবেন্দ্র ঘটনার ব্যাখ্যা করে জানান যে, এই শব্দ রক্তের কোষের মধ্যে ঢুকে 'oxygenation'-এর জন্য তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বলেই অক্সিজেন এবং স্যালাইনে তার উপকার হলো। এই কাজটি কোন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দ্বারা সম্ভব নয়। অ্যালোপ্যাথিক কিংবা হোমিওপ্যাথিক দুটিই 'sympto-matic' বা রোগলক্ষণাত্মক চিকিৎসাপদ্ধতি। যাইহোক, সে অন্য প্রসঙ্গ। সর্বত্রই দেখা যায়, রোগ সারানোর জন্য বহিরাগত 'energy' যোগান দেওয়া হচ্ছে—অ্যালোপ্যাথিক কিংবা হোমিওপ্যাথিক কিংবা আয়ুর্বেদিক ওষুধের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে 'chemical energy' ক্রমে 'biological energy'-তে এবং শেষে 'electrical energy'-তে রূপান্তরিত হয়। জাইরোসনিক সবসময়ে 'E to E mode'-এ কাজ করে, অর্থাৎ 'electrical energy' স্তরেই তার প্রক্রিয়া চলে। এই চিকিৎসা তাই এত আশু ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

দেখা গেছে, 'liquid crystal' (তরল কেলাস)*-এর ওপর এই 'Gyrosonic' শব্দের প্রভাব বেশি। মানুষের শরীর একটি 'liquid crystal' ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ওপর ঘূর্ণায়মান শব্দতরঙ্গের অভিঘাতে 'pieozo electricity' (জৈব-চৌম্বকীয় বিদ্যুৎ) তৈরি হয়। যেকোনরকম 'mechanical vibration' (যান্ত্রিক আন্দোলন) থেকেও এধরনের বিদ্যুৎ 'liquid crystal'-এর মধ্যে তৈরি হয়। এই বিদ্যুৎতরঙ্গ শরীরে কোষগুলিকে 'forced vibration'-এর দ্বারা 'নিজস্ব অবস্থায়' (own true state-এ) ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। এই 'নিজস্ব অবস্থায়' ফিরে আসার পদ্ধতি যত নিখুঁত হবে ততই মানুষের মন ও শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শব্দ নিয়ে বেশি কাজ এখনো হয়নি। শব্দাণুর ঘূর্ণন (lower and higher spin-fields-এ তাকে 'sonon' বলে অভিহিত করলে মন্দ হয় না) যে সবসময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হবে—এমন কথা নেই। শব্দই সূক্ষ্মতম বস্তু বলে উপনিষদ্-পুরাণাদিতে বলা হয়েছে। আকাশে শব্দ পরিব্যপ্ত রয়েছে ('শব্দঃ খে' ইত্যাদি, গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৮নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শব্দের দুইপ্রকার চরিত্র হতে পারে—'Asymptotic' এবং 'Non-asymptotic' অর্থাৎ কোন কোন শব্দ স্বাধীনভাবে অনন্তের দিকে ছুটে চলে, কোন শব্দ আবার একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। সজলবাবু তাঁর কম্পিউটারে পরীক্ষা করে দেখেছেন, 'Asymptotic unbounded' শব্দগুলি ঘূর্ণনকে সমর্থন করে। কিন্তু 'Non-asymptotic' শব্দ ঘূর্ণনকে 'support' করে না। ঘণ্টার 'টং' শব্দের উপমা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে আমরা পাই। ঠাকুর বলছেন: "তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'। আমি উপমা দিই ঘণ্টার 'টং' শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম।" (অর্থাৎ extended asymptotically) এই 'free vibration' তত-যন্ত্র, শিসু-যন্ত্র অথবা তারযন্ত্রের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সঙ্গীতের জগতেও এই 'Gyrosonic' একটি অভিনব এবং বিপ্লবাত্মক সংযোজন। এবং চিকিৎসাজগতে, সজলবাবুর ভাষায়, এটি একটি 'Total potency value-medicine' অর্থাৎ পূর্ণসম্ভাব্য বস্তুবাদী চিকিৎসাপদ্ধতি'। এখানে 'বস্তু' অর্থে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাই বস্তু অর্থাৎ আত্মবস্তুর কথাই বলা হচ্ছে।

প্রতিবেদক: স্বামী সর্বগানন্দ

---

* Liquid Crystal বা তরল কেলাস: এই কেলাসের উপাদান-কণাগুলি সাধারণ তরলের চেয়ে অনেক বেশি সুগঠিতভাবে বিন্যস্ত এবং কঠিন কেলাসের দিকে পরিণতি লাভ করার চেষ্টা করে। সুতরাং কঠিন কেলাসের বেশ কিছু optical property তরল কেলাসে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তারল্য থাকায় সেই optical property-কে প্রয়োজনমতো পরিবর্তনের সুযোগ আছে। সামান্য বৈদ্যুতিক impulse-এর দ্বারা একে 'কালো' করা যায়। ফলে পারিপার্শ্বিক নিরপেক্ষ কেলাসের তুলনায় একে পৃথক করা সম্ভব হয়। ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি যন্ত্রে তরল কেলাসের বহুল ব্যবহার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর অনুধ্যান

জলধিকুমার সরকার
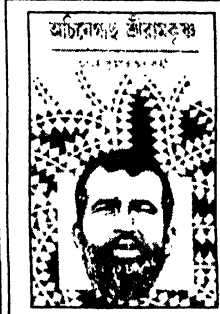
অচিনেগাছ শ্রীরামকৃষ্ণ
অপূর্বকুমার চক্রবর্তী
প্রকাশক ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭
মূল্য ঃ ৬৫ টাকা
পৃঃ ৮+১৬২
প্রকাশকাল ঃ ২০০১

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র ওপর ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর কয়েকটি ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে লেখক তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থ **'অচিনে গাছ শ্রীরামকৃষ্ণ'**-এ দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং মানুষরূপী ভগবান এবং শ্রীমা তাঁর লীলাসঙ্গিনী। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাতে তাঁর গুরুভাব, ঐশীভাব ও সখ্যভাবের স্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়। শ্রীশ্রীমাকে আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ পল্লীরমণী বলে মনে হলেও তিনি আসলে দশমহাবিদ্যা-স্বরূপা। লেখকের মতে, কথামৃতকার শ্রীম যে 'অচিনে গাছ শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপাতে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ 'কলিকালে নারদীয় ভক্তি' এবং তিনি যে একাধারে 'অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ'—এদুটির ওপর লেখক বিশেষ জোর দিয়েছেন। গ্রন্থে অঘোরমণি দেবী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন এবং ঋষি অরবিন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য—"গত পাঁচহাজার বৎসরের সাধনার ফলস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ ঘটিয়েছে এই মর্ত্যের মাটিতে।"—স্বভাবতই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

গ্রন্থটিতে লেখকের পড়াশুনার পরিধি এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ওপর প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কোন কোন জায়গায় বক্তব্যে জড়তা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—"এই রামকৃষ্ণলীলায় তাঁহার লীলাশক্তি ভগবানের অপ্রকটের প্রায় ৩৪ বৎসর লীলা প্রলম্বিত করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৬২) ছাপায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যায় ভুল বাদ দিলেও গ্রন্থটির মস্ত বড় গলদ হচ্ছে তথ্যসূত্রের অভাব। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—"বাবু, নিজের কাপড়ই ভাবাবেশে সামলাতে পারিনে, তা আর স্ত্রীকে কি করে সামলাব। তাই মা বলে পূজো দিলাম।" (পৃঃ ৮৮) শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজা সম্বন্ধে ভক্তদের ধারণা এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'তে বর্ণনা ঠিক এইরকম নয়। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে লেখক এইসব বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।❑

সংহতির সদর্থক সমাচার

অসীম মুখোপাধ্যায়
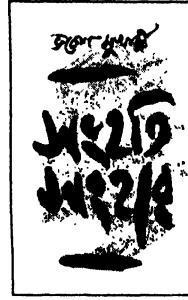
সংহতি সংহার
ভবেশ মুখার্জ্জি
প্রকাশক ঃ
ভবেশ মুখার্জ্জি
সি. এফ. ৫১, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৬৪
মূল্য ঃ ১২ টাকা
পৃঃ ৬+৭৩
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩

'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', 'বিবিধের মাঝে মিলন' ইত্যাদি আপ্তবাক্যগুলি আজ অপব্যবহারের ফলে জীর্ণ হয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্তঃসারশূন্য শ্লোগানে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু মনীষীদের মিলনের মধুর স্বপ্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এমন করে ভেঙে খানখান হয়ে গেল কেন? কেন আজ কাশ্মীরে, অসমে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বনাম কেন্দ্র, রাজ্য বনাম রাজ্য, অঞ্চল বনাম রাজ্য, ধর্ম বনাম ধর্ম, উন্নত বনাম অনুন্নত, জাতি বনাম উপজাতি—হাজারো বিভেদে, আত্মঘাতী দাবি-দাওয়ায়, প্রত্যাশা-হতাশায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইছে সুপ্রাচীন ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ ভারতবাসী? অতি প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন ভবেশ মুখার্জি তাঁর **'সংহতি সংহার'** নামে ৭৩ পৃষ্ঠার গ্রন্থে। পেশার প্রাচীর পেরিয়ে, সমাজ-সচেতন মানুষ হিসাবে, আপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখক জ্বলন্ত এই জাতীয় সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই সৃজনশীল উদ্যোগকে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ জানাতে হয়।

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার অন্তরায় অসংখ্য। সেক্ষেত্রে সঙ্ঘাতের কারণ ও সংহতির স্বতঃসিদ্ধ পথ খুঁজে পেতে শ্রীমুখার্জি প্রচলিত পথ ধরেই এগিয়েছেন। ধর্ম নয়, ধর্মমোহই যে অধর্ম, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘাতের অন্যতম কারণ, তা তিনি নিপুণভাবে নির্ণয় করেছেন। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বণ্টনের বৈষম্যের মধ্যেই যে বিভেদের বীজ লুকিয়ে রয়েছে, তা তাঁর পাণ্ডিত্য-বর্জিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বহুরূপী বিভেদের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক বিস্ময়করভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিধ্বংসী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছেন। ফলত তাঁর যুক্তি মধ্যপথেই খেই হারিয়েছে। আর উপায়ান্তর না দেখে তিনি আধ্যাত্মিকতার জগতে আশ্রয় নিয়েছেন। সে-কারণেই সচেষ্টতা সত্ত্বেও তাঁর আলোচনা সাধারণের সীমারেখা ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। এছাড়াও অগণন বানান বিপর্যয় এবং অসংযত বাক্যবিন্যাস পুস্তকটির

অনায়াস পাঠের অন্যতম অন্তরায়। সংহতির সুবৃহৎ স্বার্থে আলোচ্য পুস্তকটির অনুপুঙ্খ পরিমার্জনা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিশদ আলোচনা আশু প্রয়োজন। ❑

যুগাবতারের চরণচিহ্ন ছুঁয়ে

শুভ্রকান্তি দে
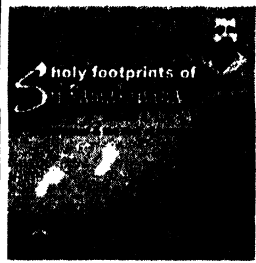
Holy Footprints of Sri Ramakrishna (Vol. 1)
Kamarpukur & the rest of hooghly district
Published by :
Ramakrishna Mission Saradapith, Belur Math Howrah-711 202
Price : Rs. 200.00

রত্নগর্ভা এই বাংলা। বহু মহামানবের জন্ম ও কর্মের প্রবাহে, তাঁদের কীর্তির গৌরবচ্ছটায় বাংলার মাটি ধন্য হয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। এর পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের স্মৃতিচিহ্নসমূহ। এমনই এক পবিত্রভূমি হুগলি জেলা। কারণ, তার মাটি স্বর্গতুল্য হয়েছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। তবে শুধু যুগাবতারের জন্মভূমি কামারপুকুরই নয়, তাঁর দৈবী চরণ এ-পৃথিবীর যে-যে স্থানকে স্পর্শ করেছে, সেই সেই স্থানই হয়ে উঠেছে তীর্থক্ষেত্র। ভক্তদের কাছে এইসকল স্থান ভ্রমণ ও দর্শন একপ্রকার সাধনার সমান। কিন্তু যাঁদের সে-সুযোগ নেই কিংবা যাঁরা ঘরে বসে এইসকল স্থানের পুণ্যস্মৃতির অনুধ্যান করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ নিবেদন করেছেন এক নতুন ভিসিডি **"Holy Footprints of Sri Ramakrishna (Vol. 1)"**। এই প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে কামারপুকুর ও হুগলি জেলার অবশিষ্ট স্থানসমূহের বিবরণ।

হুগলি, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম কামারপুকুরের নামের উৎস গ্রামের বাসিন্দা কর্মকারদের 'কামার' ও স্থানীয় জলাশয় 'পুকুর'। এরই বর্ণনা দিয়ে ও সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আগমনের ইতিহাস বিবৃত করে ভিসিডি-টির পথ চলা আরম্ভ হয়েছে। ধর্মপ্রাণ সুখলাল গোস্বামীর দেওয়া কয়েকটি চালাঘর ও লক্ষ্মীজলার কিছুটা জমি নিয়ে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরে বাস করতে শুরু করেছিলেন। এরপর ঘটনাক্রমে এসেছে যুগীদের শিবমন্দির —যার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-ইতিহাস জড়িত, রঘুবীরের মন্দির, শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নঘর ও বৈঠকখানা এবং তাঁর জন্মগ্রহণের স্থান—যেখানে বর্তমান মন্দিরটি অবস্থিত। বেদির সামনের দিকে ঠাকুরের জন্মগ্রহণকালীন পরিবেশের উল্লেখ করে একটি ঢেঁকি, চুল্লি ও প্রদীপ খোদিত আছে—তাও দেখানো হয়েছে। ক্রমে ক্যামেরা এগিয়ে গেছে হালদারপুকুর, লাহাদের পাঠশালা, চিনু শাঁখারির বাস্তুভিটা, সীতানাথ পাইনের বাড়ি, ধনী কামারনির বাস্তুভিটার দিকে। সেইসঙ্গে প্রতিটি স্থানের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত ইতিহাসের বর্ণনা চলেছে সুন্দরভাবে। প্রসঙ্গক্রমেই এসেছে ভূতির খাল, বুধুই মোড়লের শ্মশান ও কামারপুকুর চটি (পান্থনিবাস), মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরের কথা। এপর্যায়ে ক্যামেরার চোখ থেমেছে মানিকরাজার আমবাগানে।

এসেছে আনুড়ের 'বিষলক্ষ্মী' বা বিশালাক্ষির কথাও—যেখানে যেতে যেতে আটবছরের বালক গদাধর ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। এসেছে ঠাকুরের বোন সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ি গৌরহাটী, গড় মান্দারণের কথাও। পরবর্তী পর্বে পাচ্ছি ঠাকুরের চরণচিহ্নপূত আঁটপুর, ফুলুই-শ্যামবাজার, বেলডিহা, বালী-দেওয়ানগঞ্জ, কয়াপাট-বদনগঞ্জ, তেলোভেলোর মাঠ, তারকেশ্বর শিবমন্দির, মাহেশের রথযাত্রা, কোন্নগর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, নবাইচৈতন্যের বাড়ি, ভদ্রকালীর সূর্যকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি প্রভৃতির কথা ও দৃশ্য। এসব স্থান কোন-না-কোন সময়ে অমৃতপুত্রের চরণস্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছে।

এক ঘণ্টার এই ভিসিডি-টি গঠন পরিকল্পনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে। মন্দার মিত্র ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের তৈরি চিত্রনাট্য অনুযায়ী দেবজিৎ বিশ্বাসের পরিচালনা মনে দাগ কাটে। স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ ও সহযোগীদের স্তোত্রপাঠ এবং আবহসঙ্গীত একে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাছাড়া প্রচুর স্থিরচিত্র, কিছু স্ক্রিন-সেভার এবং চিত্রনাট্য এই ভিসিডি থেকে আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি। 'ইন্‌লে কার্ড'-এর পরিকল্পনাও যথাযথ। বস্তুত, এটি প্রায় একটি মাল্টিমিডিয়ার স্তরে উন্নীত হয়েছে বলা চলে।

তথ্যচিত্রটির ভাষা ইংরেজি। হয়তো বাংলার বাইরে দেশ-বিদেশের বিপুল ভক্তগোষ্ঠীর কথা ভেবেই করা হয়েছে। আপামর বাঙালি দর্শকের জন্য ধারাভাষ্যটি বাঙলায় হলে ভাল হতো। পরবর্তী কালে বাঙলায় অনূদিত ভিসিডি দেখার আশা রইল। সেইসঙ্গে দু-একটি দৃশ্যের প্রতি পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বেশে জনৈক অভিনেতার উপস্থিতির মাধ্যমে (যে-অভিনেতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আকারগত সাদৃশ্য খুব সামান্যই মনে হয়) ইতিহাসের সঙ্গে ভাব-কল্পনার যে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা অনেকটাই অসঙ্গতিপূর্ণ। আবার মাহেশের রথযাত্রায় ঠাকুর-রূপী অভিনেতার জয়ধ্বনির দৃশ্যের পাশেই ছাতার বিজ্ঞাপন অথবা শেষ দৃশ্যে কীর্তনানন্দে ঠাকুরের চলার পথের পাশে আধুনিক পোশাক পরিহিত মানুষজনের উপস্থিতি চোখকে পীড়া দেয়।

তবুও সব মিলিয়ে **"Holy Footprints of Sri Ramakrishna"** নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের এক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অবলম্বনেও এইরকম ভিসিডি প্রকাশিত হলে আমাদের ভাল লাগবে। যুগাবতারের চরণচিহ্ন ছুঁয়ে আরো বহু পথ পরিক্রমার আশায় দর্শক-মন পিপাসার্ত হয়ে রইল। ❑

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম, রায়পুর

মধ্যভারতে ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে অবস্থিত **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম** আজ বহুমুখী সেবাকার্যে নিরত। এই আশ্রমের বীজ পঞ্চাশের দশকে রায়পুরে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি'র মধ্যে নিহিত ছিল। ১৯৫৮ সালে রায়পুরের শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভক্তগণ আশুতোষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই সমিতি গঠন করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও কার্যপদ্ধতি প্রচার। ১৯৫৯ সালে স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ সেবাসমিতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রদত্ত জমিতে সেবাসমিতি স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান আশ্রমটি এই জমিতেই গড়ে উঠেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কৈশোরের দুবছর (১৮৭৭-১৮৭৯) রায়পুরে অতিবাহিত করেছিলেন। রায়পুর শহরে তাঁর ঐতিহাসিক অবস্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ১৯৬৩ সালে স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে আশ্রম-সংলগ্ন আরো কিছু জমি আশ্রমকে দান করেন। বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম চার একর জমির ওপর অবস্থিত। ১৯৬৮ সালের ৭ এপ্রিল রামনবমীর পুণ্য তিথিতে এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অঙ্গীভূত হয়।

রায়পুরের রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ আশ্রমে বর্তমানে একটি অতি সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির আছে। মন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্তি। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজার্চনা ও প্রার্থনা সম্পন্ন হয়। এছাড়া প্রত্যেক একাদশীতে সন্ধ্যারতির পর রামনাম-সঙ্কীর্তন এবং প্রতি রবিবার বিকালে ধর্মালোচনার আসর বসে। এই আশ্রমে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জনসভায় বক্তৃতা দান করেন। জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও তুলসীজয়ন্তী ছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও ভারতের মহান সন্তানদের জন্মজয়ন্তী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়।

এই আশ্রম থেকে 'বিবেক-জ্যোতি' নামে একটি ত্রৈমাসিক হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে প্রকাশিত এটি মিশনের একমাত্র হিন্দি পত্রিকা। পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ও লেখকদের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করা হয়। বর্তমানে এই পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ১৩,০০০। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাকে মাসিক পত্রিকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

১৯৬৩ সালে ৩০০ পুস্তক নিয়ে 'বিবেকানন্দ স্মৃতি গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে পুস্তকের সংখ্যা ৪১,০০০ এবং গ্রাহকের সংখ্যা ১,২০০। অধ্যয়নকক্ষে ১২টি সংবাদপত্র ও ৯৪টি পত্রিকা (হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত, বাঙলা প্রভৃতি ভাষায় লিখিত) সংরক্ষিত আছে। প্রতিদিন অন্তত ২০০ পাঠক ঐ অধ্যয়নকক্ষে জ্ঞানচর্চা করেন।

এই আশ্রম শিক্ষাপ্রসারের জন্য 'বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন' স্থাপন করেছে। আমাদের দেশের অনেক দরিদ্র ছাত্র অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। স্বামীজীর মতে, শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতি শক্তিলাভ করে। তাঁর আদর্শ
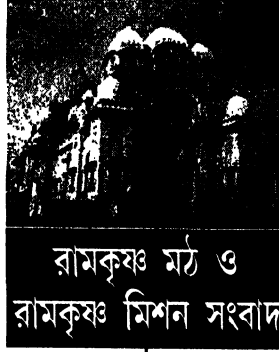
রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম

অনুসরণ করে বিদ্যার্থী ভবনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী দরিদ্র ছাত্রদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বহন করে আশ্রম। বর্তমানে এই বিদ্যার্থী ভবনে থেকে ২০ জন ছাত্র বিভিন্ন কলেজে (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, কমার্স, আর্টস কলেজসমূহে) উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। ৭ জন মেধাবী বিদ্যার্থীকে বৃত্তিদান করা হয়। আশ্রম ভবিষ্যতে ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিদ্যার্থী ভবনে রেখে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ১৯৯০ সাল থেকে বিনা খরচে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি, বিজ্ঞান ও অঙ্কের কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে কোচিং ক্লাসে ১২৫ জন ছাত্র রয়েছে। স্থির হয়েছে, পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০০ জন দরিদ্র ছাত্রকে বিনা খরচে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল শিক্ষার মধ্য দিয়ে যথার্থ মানুষ গঠন করা। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আশ্রমে 'বিবেকানন্দ বালক ও যুবক সঙ্ঘ' গঠন করা হয়েছে। প্রতি রবিবার সকালে এই সঙ্ঘের অধিবেশন বসে। ৯-১৫ বছরের বালকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও শরীরচর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৬-৩০ বছরের যুবকদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশসাধনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়।

রায়পুর আশ্রম শিক্ষামূলক কার্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজেও সদা ব্যস্ত। আশ্রমের 'বিবেকানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়'-এ বহু বিভাগ আছে, যেমন—(১) ওষুধ বিভাগ, (২) দন্ত বিভাগ, (৩) নেত্র বিভাগ, (৪) ছোট শল্যচিকিৎসা বিভাগ, (৫) স্ত্রীরোগ বিভাগ, (৬) অস্থিরোগ বিভাগ, (৭) ই. এন. টি. বিভাগ, (৮) চর্ম বিভাগ, (৯) মানসিক রোগ বিভাগ, (১০) ফিজিও-কাম-ইলেকট্রোথেরাপি বিভাগ, (১১) এক্সরে বিভাগ এবং (১২) প্যাথলজি বিভাগ। 'বিবেকানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিদিন (ছুটির দিন ব্যতীত) খোলা থাকে এবং ৩৫ জন চিকিৎসক, সার্জন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনা বেতনে রোগীদের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। আশ্রমে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ও আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় (ছুটির দিন ব্যতীত) এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি খোলা থাকে।

রায়পুর আশ্রম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সময় ত্রাণকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। আশ্রমের সঙ্গে একটি ডেয়ারি, ফুলবাগিচা ও সবজি বাগান আছে।

রায়পুরের রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ আশ্রম সুনিপুণভাবে দুর্গত, পীড়িত ও দরিদ্র মানুষের সেবায় নিযুক্ত। আশ্রম তার সেবামূলক কাজের পরিধি আরো বিস্তারে আগ্রহী।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২, বৃহস্পতিবার মহা সমারোহে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। প্রায় ২৭,৬০০ ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ মঠ, বরানগর (কলকাতা-৩৬) : গত ২১-২২ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঠের বার্ষিক উৎসব ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব আয়োজিত হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' পাঠ, তরজা গান ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সনাতনানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী (উত্তর প্রদেশ) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, স্তবপাঠ ও সঙ্গীত এবং সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী। প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সুদামানন্দজী এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অলোকানন্দজী, অধ্যাপিকা ঊর্মিলা সিংহ ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সন্ধ্যারতির পর সেতারবাদন পরিবেশন করেন রুদ্রশঙ্কর চক্রবর্তী।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (উত্তর প্রদেশ) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভজন পরিবেশন করেন অজয় চ্যাটার্জি। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত ও বিধবাকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ১,০০০ দরিদ্র বিধবার মধ্যে কাপড়, তেল, সাবান, চাদর ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার ও আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অমৃতরূপানন্দজী, স্বামী হরিদেবানন্দজী, স্বামী শ্রীবাসানন্দজী প্রমুখ।

বারাসত রামকৃষ্ণ মঠ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৬-৩০ ডিসেম্বর ২০০২ পাঁচদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ৪,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রমানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী সুবীরানন্দজী ও স্বামী সুপর্ণানন্দজী। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী দিব্যানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূতানন্দজী। তৃতীয় দিনের সভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। চতুর্থ দিনে 'রামচরিতমানস' এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। পঞ্চম দিনে বিশেষ পূজা, পাঠ, ৫,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দেন স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মিশনের শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তি

পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা, আনন্দ ও শান্তি আনয়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকায় রামকৃষ্ণ মিশনকে 'ইউনেস্কো' ২০০২ সালের 'মদনজিৎ সিং' পুরস্কার প্রদান করেছে। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ৮ জানুয়ারি ২০০৩ ভজন, বিশেষ পূজা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়।

জাতীয় যুবদিবস পালন: গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ আলোচনা, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। সকালে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দের বৈদিক স্তোত্রপাঠ এবং সমবেত কণ্ঠে 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠের পর স্বাগত-ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী জপপ্রিয়ানন্দজী, সোমনাথ বাগচি, জয়ন্ত কুশারি ও ডঃ গৌতম মুখার্জি। প্রশ্নোত্তর আসর পরিচালনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন স্বামী সনকানন্দজী। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী। এদিন প্রতিযোগীদের সকালে টিফিন ও দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ডানকুনি ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র (হুগলি): গত ২৮ অক্টোবর ২০০২ ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা ও নিবেদিতার বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণাজী। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'গীতা' পাঠ করেন যথাক্রমে সৌরীন চৌধুরী ও গদাধর গোস্বামী। স্তবপাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা তৎগতপ্রাণাজী এবং জয়া বসুরায় ও মনীষা নন্দী। কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। এদিন ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে নববস্ত্র ও পাঠসামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ১৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম): গত ১৩ নভেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী।

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থ সেবায়তন (বীরভূম): গত ১৩ নভেম্বর ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবায়তনের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবনাথানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শুভ্রা মুখার্জি, স্বপ্না দত্ত ও চন্দনা ব্যানার্জি। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী আনন্দ গিরি, স্বামী বাগীশানন্দ পুরী প্রমুখ। সন্ধ্যারতির পর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ পুরী। উৎসবে আগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ১৫-১৬ নভেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শম্ভুলাল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা মণ্ডল, বিথিকা সরকার। ধর্মসভায় ভাষণ দেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দজী, ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল ও রণজিৎ ঘোষ। এদিন প্রায় ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন রক্তদান শিবিরে ২৫ জন মহিলা-সহ ৯০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী প্রত্যেককে একটি করে শ্রীশ্রীমায়ের ফটো ও স্বামীজীর বই দেওয়া হয়।

টিকাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (ওড়িশা): গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী দীনেশানন্দজী,

স্বামী দ্বিজেন্দ্রানন্দজী, স্বামী জীবেশানন্দজী ও সুধাকর সামন্তরায়। সভাশেষে ৪০ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ইউনিফর্ম ও ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে খাওয়ানো হয়।

বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, অযোধ্যা (হাওড়া): গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও মানবসেবা'। আলোচক ছিলেন স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। আলোচনাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক কাজল বৈতালিক। অংশগ্রহণকারী সকল যুবপ্রতিনিধিকে একটি করে স্বামীজীর ছবি ও 'মনীষীদের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ৬০০ যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বীরভূম): গত ২২ নভেম্বর ২০০২ আশ্রমের নবনির্মিত বিবেকানন্দ চিকিৎসা-কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং ১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দেবময়ানন্দজী। পরদিন বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী।

সুন্দরবন ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ও একটি যুবসম্মেলন গত ২৩-২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (উত্তর চব্বিশ পরগনা)।** সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল 'যুবসমাজের অবক্ষয়রোধে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা'। সভাপতিত্ব করেন টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী এবং আলোচনা করেন স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী। সম্মেলনে ৩৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, ঘাটমুড়া (পশ্চিম মেদিনীপুর): গত ২৪ নভেম্বর ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। বিষয় ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারায় ভারতবর্ষকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য'। আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী বিশ্বধিপানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশানন্দজী। সম্মেলনে ৬০১ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পরে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় 'রানী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বসিরহাট শ্রীসারদাদেবী সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ১ ডিসেম্বর ২০০২ একটি ছাত্রীসম্মেলনের আয়োজন করা হয় বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে। সঙ্গীত, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নাটক ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। সম্মেলনে ৩৫০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল।

শ্রীশ্রীশঙ্কর ধর্ম প্রতিষ্ঠান (কলকাতা-২৯): গত ৭ ডিসেম্বর ২০০২ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বৈদিক স্তবপাঠ করে বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দিরের ছাত্ররা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সম্প্রদায়। আবৃত্তি করেন প্রদীপ ঘোষ ও পৃথা ঘোষ। 'স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩): গত ৮ ডিসেম্বর ২০০২ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে 'স্বামীজীর ভাবাদর্শে শিক্ষা ও সেবা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তরূপানন্দজী, অধ্যাপক অমিতাভ সেন, ভূপালচন্দ্র সেনশর্মা ও নির্মলচন্দ্র গুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক মদনমোহন মণ্ডল।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৪৭): গত ৮ ডিসেম্বর ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনের বিষয় ছিল পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত ধ্যান ও আলোচনা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল, সুব্রত চক্রবর্তী ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী ও স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন স্বামী স্বগতানন্দজী। সম্মেলনে ১৩৫ জন ভক্ত যোগদান করেন।

নামখানা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা): গত ১৫ ডিসেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুব-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বুলবুল চক্রবর্তী, সুশান্তকুমার দত্ত ও গোপা মুখোপাধ্যায়। আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী, তরুণ গোস্বামী, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও শুভ্রাংশুশেখর দাস। সম্মেলনে ৪৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২২ ডিসেম্বর ২০০২ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব এবং ভাষণ ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। আলোচনা ও পাঠাদিতে অংশগ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বিশ্বধিপানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানেন্দ্রানন্দজী। পরে বসিরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চলমান পাঠচক্র কর্তৃক 'শ্রীমা সারদাদেবী' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সম্মেলনে ৪২৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড়খণ্ড রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (ঝাড়খণ্ড): গত ২২-২৪ ডিসেম্বর ২০০২ পরিষদের সম্মেলন

আয়োজিত হয় **ধানবাদ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (রাঁচি, ঝাড়খণ্ড)**। বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন রাঁচি মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শশাঙ্কানন্দজী, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজী, জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী এবং পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মঙ্গলানন্দজী।

বি. গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া): গত ২২-২৯ ডিসেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী পুরাতনানন্দজী ও স্বামী আত্মবোধানন্দজী।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া): গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ও মহাদেব সিং। প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সভান্তে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৬০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর বিনাব্যয়ে ২৯ জন দুঃস্থ মানুষের চক্ষুচিকিৎসা করা হয়।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-২৮): গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গিরিশাত্মানন্দজী।

ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চন্দ্রানী মুখার্জি, সনৎ সিংহ প্রমুখ। 'আমাদের মা সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে 'ইছাপুর সাধনতীর্থ'। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী পুরাণানন্দজী ও ব্রহ্মচারী সুমন।

নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২৫, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, নাটক, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ ও বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৫০৫টি কম্বল, ১২টি ধুতি ও ৮টি চাদর বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০-র বেশি ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনে বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজ, স্বামী সত্যদেবানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণাজী। ২৮ ডিসেম্বর রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক গৌতম মিত্র, অধ্যাপক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য ও গৌরী ঘোষ।

খড়দহ অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২৫-৩০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন** আশ্রমে। শিবিরের উদ্বোধন করে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল মনঃসংযোগ, চরিত্রগঠন ইত্যাদি। ভারতের ৯টি রাজ্য থেকে প্রায় ১,২০০ যুবক শিবিরে যোগদান করেছিল। ইংরেজি, হিন্দি ও বাঙলা ভাষায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২২১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে এবং একটি শোভাযাত্রা অঞ্চল পরিক্রমা করে। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সরিষা আশ্রমের সম্পাদক স্বামী রাজীবানন্দজী।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (পূর্ব মেদিনীপুর): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বৈদিক স্তোত্র, 'গীতা', 'মায়ের কথা' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়।

সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রম (বাঁকুড়া): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বেদপাঠ, শোভাযাত্রা, ভজন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ১১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (হাওড়া): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে গত ৩ জানুয়ারি ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে 'সুরপীঠ' গোষ্ঠী। ১০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ২০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ইমামবাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (হুগলি): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা): গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত জপ-ধ্যান এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বলরাম পাল, পিয়ালী ভট্টাচার্য ও অলোক নস্কর। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন শতদল সাধুখাঁ ও শিখিধ্বজ পট্টনায়ক। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বোধসারানন্দজী।

বিধাননগর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬৪) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বৈদিক স্তোত্র ও 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' পাঠের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অসীম জানা। 'মায়ের কথা' পাঠ করেন মালতী হালদার।

জগদলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ (বস্তার, ছত্তিশগড়) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ পূজা, পাঠ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'মায়ের কথা' পাঠ করেন অনন্তকুমার বিশ্বাস। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আলোক ব্যানার্জি, প্রতিমা রায়চৌধুরী ও গীতা বিশ্বাস। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সেবাব্রত

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র (হুগলি) : গত ২২ ডিসেম্বর ২০০২ একটি চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে ২০৪ জনের চোখ পরীক্ষা করে ৩৬ জনকে চশমা ও ৭৬ জনকে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ২৫ জনের ছানি অপারেশন করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বাণী বিশ্বাস গত ৮ মে ২০০২ কলকাতায় নিজ বাসভবনে পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সল্ট লেক-নিবাসী অশোককুমার মিত্র গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অনুরাগ এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য পরিচিত জনেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা শান্তমতী পাল গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মানসিক দৃঢ়তা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর ভক্তি-বিশ্বাস ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী নীহারিকা মুখোপাধ্যায় গত ১৯ অক্টোবর ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ছিলেন সহজ-সরল, সেবাপরায়ণ ও ধীর-স্থির প্রকৃতির। তিনি মরণোত্তর চক্ষুদান করে গেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা পুষ্পা সেন গত ২৪ অক্টোবর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। সহৃদয় ব্যবহার, সেবাপরায়ণতা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অবিচল ভক্তি ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এক বিশিষ্ট ভক্তের জীবনাবসান

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর কলকাতার লক্ষ্মী দত্ত লেন-নিবাসী ব্রহ্মগোপাল দত্ত গত ৭ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছরেরও অধিক। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ও বিবেকানন্দ-পরিকর কিরণচন্দ্র দত্তের চতুর্থ পুত্র। শৈশব থেকেই পিতার সঙ্গে 'উদ্বোধন' এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যাতায়াতের সুবাদে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণস্পর্শ করে তাঁর আশীর্বাদধন্য হয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দশজন সন্ন্যাসি-শিষ্য—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূতসান্নিধ্য ও স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। সেইসব স্মৃতিকথা তিনি তাঁর 'স্মৃতিচয়ন' গ্রন্থে এবং 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। সুতরাং ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মবর্ষ। সেই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রয়াস করা হচ্ছে। কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের যুগাচার্যোচিত উপলব্ধি শ্রীশ্রীজগজ্জননীর কৃপায় ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করছে। বিগত মাঘ সংখ্যার 'উদ্বোধন' প্রচ্ছদের সন্ততি বর্তমান প্রচ্ছদে লক্ষিত হয়। কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের দৃশ্য ক্ষুদ্রাকারে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে নির্মিত জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির এবারের মূল বিষয়বস্তু। এখানেই আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎকল্যাণবাসনায় মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। **স্বামী বিবেকানন্দ**

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ, নিত্যসিদ্ধ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মস্থান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগিগণের কাছে এক বিশিষ্ট তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে পূজাদির ব্যবস্থা হয়েছে বিগত ১৯৫৭ সাল থেকে। ১৯৮৬ সাল থেকে উক্ত পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কার্যধারা বিস্তার করেছে, ফলে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

এই আশ্রমের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ-সহ প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসিগণ যোগদান করে আসছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অঙ্গীভূত হবে।

যতদিন না সেই অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন আশ্রমের সেবক ও ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করে রাখার উদ্দেশ্যে আশ্রম-সংলগ্ন ৪২ কাঠা জমি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই আবেদনে অসংখ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী সমবেতভাবে তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন। সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা উক্ত অর্থ জমির মালিককে বায়না হিসাবে প্রদান করেছি। উক্ত জমি ক্রয়ের নিমিত্ত আরো চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে আবার বিনম্র আবেদন, আপনাদের দানে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের নামাঙ্কিত আশ্রমটি বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক আরাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠুক।

যেকোন দান **"Sree Ramakrishna Niranjanananda Ashrama"** নামে চেক/ড্রাফট্ বা মানি অর্ডারের মাধ্যমে **বিষ্ণুপুর, পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫১০**—এই ঠিকানায় পাঠাবেন। সকল প্রকার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে।

নিবেদক

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম

কর্মপরিষদের পক্ষে

সভাপতি ঃ ডাঃ সুধীরকুমার রাহা

সম্পাদক ঃ জয়দেব বিশ্বাস

উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষে

সভাপতি ঃ স্বামী সনাতনানন্দ

অধ্যক্ষ, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

সহ সভাপতি ঃ স্বামী মুক্তিকামানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত

আনন্দ সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মর্মরমূর্তি স্থাপন-কল্পে বড়িষা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘে মহান যজ্ঞের আহ্বান। এই সংস্থা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বোর্ড অফ ট্রাস্টের অধীন। ১৯৬০ সাল থেকে পূজিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটবিগ্রহ আগামী ১০ মার্চ ২০০৩ সোমবার মর্মরমূর্তিতে রূপান্তরিত হবে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। উক্ত উৎসব ১০ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত চলবে। এই বিরাট আত্মিক যজ্ঞে সর্বসাধারণের উপস্থিতি ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত সেবক
হলধর চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ
৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৮
ফোন ঃ ২৪৪৬-০৬৮৮

জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম** ❑ বেলুড় মঠ
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- **নির্মল ঘোষ**, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন : ২৬৫৪-৪০৪৫
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**
  ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন, কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা**, গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- **সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল, পিন-৭১১ ৩১৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর
  পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন, পিন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্ট : অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন : ২৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর
  পিন : ৭১১ ২০৫, ফোন : ২৬৫৯-১১৪৪
- **শ্রীদীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চককাশী, থানা : বাউড়িয়া, পিন : ৭১১ ৩০৭
  ফোন : ২৬৬১-৮১১২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**, দেউলপুর, হাওড়া
- **দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর, পিন-৭১১ ৪১১
  ফোন : ২৬২৯-০০৮৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মিশন**
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন
  পিন-৭১১ ১০৩ ফোন : ২৬৬৮-০০১৪

জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : ২৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : ২৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প
  হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন : ৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির**
  গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**
  গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম : বরুণা (ভুটা), পোঃ ভুটা, থানা : দাসপুর

হিন্দুধর্মের কয়েকটি দার্শনিক শব্দের ব্যাখ্যা

মন্তব্য : যেকোন বস্তুকে জানতে গেলে মানুষ এই তিন প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু পরমাত্মা প্রমাণাতীত।

দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 2554-2248, 2554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.net
udbodhan@vsnl.com

Vol. 105
No. 2
FEBRUARY
2003

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
MM&PO/WB/RNP-15/2003

হয়েছে কি? আপনার নবীকরণ কিংবা গ্রাহকভুক্তি না হয়ে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র : ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয় প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❏ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❏ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৫ ॥

চৈত্র ১৪০৯ ৩য় সংখ্যা

১০৫

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

ইয়ে অন্দর কী বাত্ হ্যায়!
LUX®
cozi™

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) **উদ্বোধন ১০৫তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** পড়া একান্ত প্রয়োজন।

✡ **'উদ্বোধন'** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। **স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **'উদ্বোধন'**-এর সেবায় ছয়টি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য পাঁচটি যথাক্রমে **'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী গম্ভীরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥
১০৫তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা চৈত্র ১৪০৯ মার্চ ২০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Kolkata-700 003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Editor's Name	Swami Sarvagananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Name & Address of Individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711 202 West Bengal

Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Smaranananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	,, ,,	do
Swami Bhajanananda	,, ,,	do
Swami Srikarananda	,, ,,	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda	Trustee	do
Swami Gautamananda	,,	do
Swami Gitananda	,,	do
Swami Mumukshananda	,,	do
Swami Prabhananda	,,	do
Swami Tattwabodhananda	,,	do
Swami Vagishananda	,,	do
Swami Vandanananda	,,	do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 2003

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

আদৌ কর্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্‌যদ্‌ বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

প্রথমে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে আসক্তির জন্য মাতৃগর্ভস্থিত আমাকে পাপ ব্যথিত করেছে। মায়ের বিষ্ঠা ও মূত্ররূপ অপবিত্র বস্তুমধ্যে গর্ভের অগ্নি আমাকে অত্যন্ত সিদ্ধ (পীড়িত) করেছে। সেখানে যে যে দুঃখ সতত ব্যথা দিয়ে থাকে, তা কে বর্ণনা করতে পারে? সেজন্য হে শিব, হে শিব, হে শিব, হে শ্রীমহাদেব, হে শম্ভু! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

* * *

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতাঃ শত্রবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদ্‌রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

বাল্যে আমার অত্যন্ত দুঃখ ছিল। তখন শরীর মলে লিপ্ত ও স্তনপানে পিপাসা হতো। ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর কোন ক্ষমতা ছিল না, সেজন্য কর্মফলজাত মশকাদি শত্রুরা আমাকে যন্ত্রণা দিত। নানা রোগ থেকে উৎপন্ন দুঃখে ক্রন্দনপরবশ হয়ে আমি তখন শঙ্করকে স্মরণ করিনি। সুতরাং হে শিব, হে শ্রীমহাদেব, হে শম্ভু! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

* * *

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ:
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥

দেখতে দেখতে প্রতিদিন আয়ু নাশ হচ্ছে, যৌবনও ক্ষয় হচ্ছে! গত দিন ফিরে আসে না, (কারণ) কাল জগতের সংহারক। লক্ষ্মী (সৌভাগ্য) জলের ন্যায় চঞ্চলা, আর জীবন বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির; সেজন্য হে শরণদ—শরণাগতবৎসল! তুমি এখন শরণাগত আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র, ১-২, ১৩)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

১৮৯৪ সালের জুন-জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে 'সংগঠন' কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ

> "Organisation শব্দের অর্থ Division of Labour (শ্রমবিভাগ)। প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করে এবং সকল কাজ মিলে একটি সুন্দর ভাব হয়।"

বস্তুত, ঐসময় আমেরিকা হইতে বারংবার পত্রাঘাত করিয়া স্বামীজী ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৯৭ সালের ১লা মে বলরাম-মন্দিরে আয়োজিত একটি সভায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল। সদ্যোজাত ঐ সংগঠনকে একটি কোমলাঙ্গ শিশুর ন্যায় অতি আদরের সহিত পরিপালনের ইচ্ছা স্বামীজীর অন্তরে বলবতী থাকিলেও তিনি একথা বিলক্ষণ জানিতেন যে, এই সদ্যোজাতের চলার পথটি মসৃণ নহে। সুতরাং এমন কিছু নিয়মের নিগড়ে তিনি উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন যে, সঙ্ঘের প্রাণশক্তি যেন উহার চলার পথে সহসা নিঃশেষিত না হইয়া যায়। কারণ, এই সঙ্ঘ জগতের কল্যাণদীপ হস্তে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সহস্রাধিক বর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহক হইয়া জাগরূক থাকিবে—এই দূরদর্শন স্বামীজীর হইয়াছিল।

উক্ত পত্রে স্বামীজী আরো লিখিলেন ঃ

> "Life is ever expanding, contraction is death. (জীবনের অর্থ চির সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনই মৃত্যু।) যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সে-ই রামকৃষ্ণের পুত্র। ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহাসন্ধিপূজার সময়ে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সে-ই আমার ভাই, সে-ই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পার—তফাৎ হয়ে যাও, এই বেলা ভালয় ভালয়।... তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি।... Onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও), নামের সময় নাই... দেখা যাবে পরে। এখন এ-জন্মে অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর মহান আত্মার। এই কার্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।... যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী—তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক।"

অসাধারণ এই চিঠিতে ভাবপ্রচার এবং সঙ্ঘের আদর্শের মূল কথাটি নিজস্ব অননুকরণীয় ভাষায় বজ্রদৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বামীজী লিখিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আরো দশটি সঙ্ঘ বা সংগঠনের ন্যায় নহে। ইহার স্বতন্ত্র চারিত্র্য রহিয়াছে। এই সঙ্ঘের মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। এবং বেদান্তই আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মুখপত্র। যদি কেহ এই সঙ্ঘকে সংজ্ঞায়িত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সূর্যের সহিত ইহা তুলনীয়। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের লইয়া গঠিত এই সঙ্ঘ যেন সূর্যের দেহ। লক্ষ লক্ষ অনুরাগী ভক্ত সেই সূর্যের রশ্মিস্বরূপ। যদি কেহ এই সংগঠনকে 'ব্যাচেলার্স ক্লাব' মনে করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। মানুষের চৈতন্যরূপী স্ব-স্বরূপের বিকাশ সাধনই এই সঙ্ঘের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহিত যুক্ত সকল অনুরাগী ও ভক্তেরও একমাত্র লক্ষ্য চিৎ-স্বরূপ আত্মার বিকাশ সাধন। এবং "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য" এই সঙ্ঘ দায়বদ্ধ। স্বামীজীর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের তিনপ্রকার শরীর গুরুভ্রাতাগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। প্রথম শরীর—শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীর (যাহা এখন আমরা ফোটোগ্রাফে দেখিয়া থাকি)—রক্তমাংসের, হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের, মান-অপমানের পেটিকাবদ্ধ আমাদের ইষ্টমূর্তি। দ্বিতীয়ত, বিভুরূপে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজিত। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং ইহার পশ্চাতে ব্যক্ত-অব্যক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় শরীর। আর তাঁহার তৃতীয় শরীরটি এই 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'—যাহার মাধ্যমে তাঁহার অনন্ত ভাব, অনন্ত ত্যাগ, অনন্ত করুণা, অনন্ত পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। যাহারা এই সঙ্ঘভুক্ত, তাহারা প্রত্যেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক ভক্ত নরনারীর একটি দায়বদ্ধতা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ অঙ্গের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে

শ্রীরামকৃষ্ণের সুখলাভ হয় এবং ঐ অঙ্গেরই আধ্যাত্মিক অপকর্ষে তাঁহার শরীরে বেদনার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

এই কথা শুনিয়া মনে মনে আত্মসমালোচনামূলক একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। বর্তমানে সূর্যের দেহ এবং তাহার রশ্মিস্বরূপ যে-সঙ্ঘরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিংবা এই ভাবধারার বাহিরের কেহ যেভাবে এই বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহাতে কি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি যথার্থই প্রকটিত হইতেছে? তিনি জগতে তাঁহার ভাবমূর্তি প্রকট করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। সুতরাং পরমকারুণিক শ্রীভগবানের কৃপায় যদি সেই ভাবমূর্তি সঙ্ঘের মাধ্যমে সারা জগতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাহার কৃতিত্ব তাঁহারই। কিন্তু তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সেই দায় কি আমাদিগের সকলের উপর বর্তাইবে না? 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ "ভক্ত যদি এক-পা এগিয়ে যায়, ভগবান দশ-পা এগিয়ে আসেন।" এই এক-পা অগ্রসর হইতেও যদি কেহ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দায় ভগবানের উপর অর্পণ করিবার অধিকার আমাদের আছে কি? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীর জীবন, আচার-আচরণ এমন হইবে যে, যেকেহ তাহার সান্নিধ্যে আসিবে তাহারই হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য স্বতই অনুভূত হইবে। এবং এইরূপে সকল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত যখন স্বীয় প্রেমবিধৌত, পবিত্রতা-নিস্যন্দী, জ্বলন্ত পাবকসদৃশ জীবন ও ব্যক্তিত্ব সহায়ে সমাজে আপতিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে জগৎকল্যাণে সক্রিয় হইয়া উঠিবেন, তখনি স্বামীজী-প্রদত্ত মহামন্ত্র "Be and Make" (হও এবং গড়ো) আপনা-আপনি ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে অবশ্যই।

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ঃ

> "আমি বিশ্বাস করি [শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-লগ্নে], সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।"

স্বামীজীর তিরোধানের পর এক শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা কী চিত্র দেখিতেছি? একদিকে জড়বাদী বিজ্ঞানের দুর্নিবার জয়যাত্রা, তাহার সহিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক মতাদর্শের মিছিল, অপরদিকে যেন স্বামীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। বুদ্ধিজগতে যে-বিপ্লব আসিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের দ্রুত প্রসার কখনো প্রত্যক্ষ হইতেছে, কখনো বা সকলের অলক্ষ্যে বসন্তের শিশিরবিন্দুর ন্যায় মনোপুষ্পের বিকাশলাভে তৎপর রহিয়াছে। ফলত, দুর্বার গতিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা ঠাকুর-স্বামীজীর নামে মাতিয়া উঠিতেছে। দিকে দিকে উৎসবের মিছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য অবিশ্বাস্য গতিতে সমৃদ্ধ হইতেছে। গোঁড়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও স্বামীজী প্রবর্তিত 'সেবাদর্শ' ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ক্রমশ স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত আদর্শকেই জাতীয় অবক্ষয়ের একমাত্র প্রতিষেধকরূপে ভাবিতে শুরু করিয়াছে। এই মহাসন্ধিক্ষণে আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব, কর্তব্য, চরিত্র, লোকব্যবহার ইত্যাদি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সেবিষয়ে আরো একবার অনুস্মরণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার সূত্রপাত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আরো দশটা সঙ্ঘের ন্যায় নহে। সরকারি ভাষায় মিশন একটি 'NGO' (Non Government Organisation বা বেসরকারি সংগঠন)। আক্ষরিকভাবে ইহা সত্য হইলেও অক্ষরের পশ্চাতে আরো অনেক কথা রহিয়া গিয়াছে। এবং সেই সমস্ত কথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সকল 'NGO'-র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একটি 'NGO' নহে। ইহা একটি 'তত্ত্ব'। ['কথাপ্রসঙ্গে', জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ দ্রষ্টব্য] রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেই তত্ত্বের সিংহমুখ। এবং এই ভাবান্দোলনের সহিত যুক্ত সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগঠনও সেই একই তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশক যন্ত্রস্বরূপ। এই কথা স্মরণ রাখিয়া বর্তমানে সংগঠন পরিচালনার কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করিব। মজার ব্যাপার হইল, বিগত বিশ-ত্রিশ বৎসরে যে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের যেসকল সমস্যা প্রতিনিয়ত বিব্রত করিয়া রাখে, একশত বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সেই সমস্ত সমস্যার উল্লেখ করিয়া তাহার সমাধান দিয়াছেন। স্বামীজী নিজের সমসাময়িক বাস্তব-সংস্কৃতি অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর ছিলেন বলিয়া আজ যেসকল সমস্যা আমাদের পীড়িত করিতেছে তাহা তাঁহার নিকট নূতন কিছু ছিল না। এখন আমাদের কর্তব্য স্বামীজী নির্দেশিত সমাধান সঠিক জানা ও কার্যে পরিণত করা। এইভাবেই 'কার্যে পরিণত বেদান্ত'-এর মাধ্যমে জাতি ক্রমশ মহান, মহনীয়, মহনীয়তর, মহনীয়তমে পরিণত হইবে। [ক্রমশ]

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলে বহু হইয়া পড়ে। যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা যায়? বর্ণ, দাহিকাশক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে অগ্নি বলে। কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নেয় বর্ণ অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথবা অগ্নি এবং দাহিকাশক্তি কিংবা অগ্ন্যুত্তাপ অগ্নি হইতে পৃথক নহে। অগ্নি বলিলে ঐসকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি অভেদ।

*

শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।

*

অরণ্যে যখন কোনপ্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার সৌরভ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া সকলের নিকট সমাচার প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প স্বয়ং কোথাও গমন করে না কিন্তু তাহার সৌরভ-শক্তিই তাহার পরিচায়ক। সেইরূপ শক্তিই ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ করিয়া দেয়।

*

যে-শক্তি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে আদ্যাশক্তি বা ভগবতী কহে। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী তাঁহারই নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং চৈতন্যপ্রদায়িনী শক্তি জন্মিয়া থাকে। এক বৃক্ষের একটি ফুল হইতে একটি ফল উৎপন্ন হইল। তাহার কিয়দংশ কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অন্যান্য আকারে পরিণত হইয়া যাইল। যেমন বেল। ইহার বহির্যাবরক বা খোসা আভ্যন্তরিক কোমলাংশ বা শাঁস এবং বিচি ও সূত্রবৎ গঠনগুলি এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সেইপ্রকার চৈতন্যশক্তি হইতে জড়ের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

*

ব্রহ্মের দুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা সাক্ষীস্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদবাচ্য। আর যেসময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়।

*

ব্রহ্মের সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্ত অবস্থাও আছে।

যেমন ঘণ্টার ধ্বনি। প্রথমে যে-শব্দ হয় তাহাকে ঢং বলে, পরে সেই শব্দ যেরূপে ক্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যেপর্য্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে সাকার কহে। বাক্যের অতীত কিন্তু উপলব্ধির অধিকার পর্য্যন্ত নিরাকার, তাহার পরের অবস্থা বাক্য এবং উপলব্ধির অতীত, ইহাকে তৃতীয়াবস্থা কহা যায়।

ওঁকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় সাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তৎপরে সাকার নিরাকারের অতীতাবস্থা।

সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল।

যেমন বরফ এবং জল। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ অবস্থা। একটি কঠিন আকারবিশিষ্ট এবং অপরটি তরল ও আকারবিহীন। জলের এই পরিবর্ত্তন উত্তাপ ও তাহার অভাব হিমশক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেইপ্রকার সাধকের, জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যূনাধিক্যে ব্রহ্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের সাকার রূপ জড়পদার্থসম্ভূত অর্থাৎ কাষ্ঠ, মৃত্তিকা কিংবা কোনপ্রকার ধাতুবিনির্ম্মিত নহে। তাঁহার রূপ যে কি এবং কি পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় তাহা বচনাতীত। সে-পদার্থ জড়জগতে নাই যে তাহার দ্বারা উল্লেখিত হইবে। জ্যোতিঘন [জ্যোতির্ঘন] বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু সে যে কিপ্রকার জ্যোতি তাহা চন্দ্র, সূর্য্যের জ্যোতির সহিত তুলনা হইতে পারে না। ফলে তাঁহার রূপ অনুপমেয় এবং বচনাতীত। যদ্যপি তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার তুলনা তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিতে হয়।

*

বিচার দুইপ্রকার—অনুলোম এবং বিলোম। যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ। ইহাকে বিলোম এবং মাঝ হইতে খোল—ইহাকে অনুলোম কহে। যেমন বেল। ইহা খোসা, শাঁস, বিচি, আঠা এবং শিরার সমষ্টি এই বিচারকে বিলোম বলে। অনুলোম দ্বারা উহাদের এক সত্তায় উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্র

[illegible]

অ্যানিস্কোয়্যাম
২৩ আগস্ট ১৮৯৪

মা,

ফটোগুলি গতকাল নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে। হ্যারিসনের আমাকে আরো দেওয়া উচিত ছিল কি না—এবিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারছি না। ফিশকিলে[1] তাঁরা আমাকে মাত্র দুটি পাঠিয়েছিলেন—তাও আমি যে-ভঙ্গিটির জন্য নির্দেশ করেছিলাম সেটি নয়।

সম্ভবত এতদিনে নরসিংহ তার পাথেয় পেয়ে গেছে। তার পরিবার তাকে অর্থ দিক বা না দিক, এটা সে শীঘ্রই পেয়ে যাবে। মাদ্রাজের বন্ধুদের আমি লিখেছি এব্যাপারে খোঁজ নিতে এবং তারা লিখেছে খোঁজ নেবে।

সে যদি একজন খ্রিস্টান বা মুসলমান বা তার উপযোগী অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হয়ে যায়, তবে আমি খুবই খুশি হব; কিন্তু আমার আশঙ্কা, একটা সময় আসবে যখন আমার বন্ধুর পক্ষে কোনটিই উপযোগী হবে না। শুধু সে যদি খ্রিস্টান হয় তবে ভারতেও সে পুনরায় বিবাহ করার সুযোগ পাবে, সেখানকার খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা তা অনুমোদন করে। আমি একথা জেনে খুবই দুঃখিত যে, 'হীনধর্মাবলম্বী ভারতের দাসত্ববন্ধন'ই এইসকল অনিষ্টের কারণ। 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। সুতরাং আমরা এতাবৎকাল অজ্ঞ ও অন্ধের মতো আমাদের অশেষ দুঃখযাতনাক্লিষ্ট, ধর্মগত কারণে নির্যাতিত, সন্তুতুল্য বন্ধু নরসিংহের প্রতি দোষারোপ করছিলাম, যেখানে প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় অনর্থ ঘটেছে 'হীনধর্মাবলম্বী ভারতের দাসত্ববন্ধনে'র ফলে!!!!

কিন্তু শয়তানকে তার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে এই 'হীনধর্মাবলম্বী ভারত' তাকে টাকা যুগিয়ে যাচ্ছে—বারেবারে মজার খেলা খেলবার সুযোগ দিতে। আর এবারও 'হীনধর্মাবলম্বী ভারত' আমাদের 'আলোকপ্রাপ্ত' ও ধর্মগত কারণে নির্যাতিত বন্ধুকে তার বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্ত করবে বা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে এবং 'খ্রিস্টান আমেরিকা' কিন্তু তা করেনি!! মিসেস স্মিথের পরিকল্পনা মোটের ওপর মন্দ নয়—নরসিংহকে খ্রিস্টের একজন মিশনারিতে পরিণত করা। কিন্তু জগতের দুর্ভাগ্য এই যে, বহুবার খ্রিস্টের পতাকা এইসকল ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আমি সবিনয়ে যোগ করব যে, সেক্ষেত্রে সে হবে স্মিথিয়ান আমেরিকান ক্রিশ্চিয়ানিটির একজন মিশনারি, খ্রিস্টের নয়! পুরোদস্তুর ছলনা। প্রভু যিশুকে প্রচারের জন্য ঐ বস্তু!!! তাঁর পতাকা তুলে ধরার জন্য কি তাঁর লোকের অভাব? ছ্যা! এই ভাবনাটাই আপত্তিকর। ভারতের মঙ্গলসাধনই বটে! আপনাদের বদান্যতাকে সাধুবাদ এবং আপনাদের কুকুরকে ফিরিয়ে আনুন—ভবঘুরে ব্যক্তিটি যেমন বলেছিল। এইসকল কুশলী কর্মীদের আমেরিকার জন্য রেখে দিন। নিজেদের সমাজকে রক্ষা করার জন্য এইসকল হীন-ব্যক্তিদের সঙ্গ হিন্দুগণকে বর্জন করতে হবে। আমি নরসিংহকে খ্রিস্টান হওয়ার জন্য প্রাণখুলে পরামর্শ দিই—মাপ করবেন, মার্কিনীপনাতে দীক্ষিত হতে—কারণ আমি নিশ্চিত যে, দরিদ্র ভারতে এমন একটি রত্নের ক্রেতা জুটবে না। দাম পাওয়া যায় এমন সবকিছুই তার কাছে স্বাগত। আপনি যাঁর নাম করেছেন সেই ভদ্রলোককে আমি খুব ভাল করে জানি এবং তাঁকে আমার সম্পর্কে আপনার খুশিমতো যেকোন সংবাদ জানাতে পারেন। আমি কাগজের

---

* ইংরেজিতে লেখা এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর গত ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ সংখ্যার ৬৯-৭১ পৃষ্ঠায় এবং 'Complete Works'-এর ৯ম খণ্ডের (২য় পুনর্মুদ্রণ) ৩২-৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

১ নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত একটি মনোরম স্থান। ডঃ এবং শ্রীমতী গার্ণসের অতিথি হয়ে স্বামীজী এখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

টুকরোগুলি[২] পাঠাতে আগ্রহী নই এবং আমার জন্য ঢক্কানিনাদেরও অপেক্ষা করি না। আর ভারতের এইসকল বন্ধু খবরের কাগজের বাজে বকবকানি নিয়ে আমাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে। তাঁরা খুবই অনুরাগী, বিশ্বস্ত ও পূতচরিত্র বন্ধু। এখন এই কাগজের কর্তিতাংশগুলির মধ্যে অধিকাংশ আমার কাছে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর 'বস্টন ট্র্যান্সস্ক্রিপ্ট'-এর একটি টুকরো পেয়েছি। এটি আপনাকে পাঠাচ্ছি। জনসমক্ষে প্রকাশিত এই জীবন বিরক্তিকর। আমি যেন ক্ষেপার মতো হয়ে গিয়েছি। কোথায় যে পালাই! ভারতে আমি এখন সাংঘাতিকভাবে পরিচিত মানুষ—জনতা আমাকে অনুসরণ করবে এবং আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দেবে। ল্যাণ্ডসবার্গের কাছ থেকে একখানা ভারতীয় ডাক পেয়েছি—এক আউন্স নামযশ ক্রয় করতে হয় এক পাউণ্ড শান্তি ও পবিত্রতার বিনিময়ে। এই ব্যাপারটা আগে আমি কখনো ভেবে দেখিনি। জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণরূপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। নিজের সম্পর্কেও আমি বীতস্পৃহ। প্রভুই আমাকে শান্তি ও পবিত্রতার পথ দেখাবেন। হ্যাঁ মা, আমি আপনার কাছে স্বীকার করি যে, কোন মানুষই—এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও—জনজীবনের এমন বাতাবরণে বাস করতে পারে না, যেখানে প্রতিযোগিতারূপী শয়তান তার হৃদয়ের প্রশান্তির মধ্যে মাথা গলায় না। যাঁরা মতবাদবিশেষ প্রচার করার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত, তাঁরা কখনো এইটি অনুভব করেন না, কারণ ধর্ম কী বস্তু তাঁরা কখনোই জানেন না। কিন্তু যাঁরা পার্থিব জগতের পরিবর্তে শুধু ঈশ্বরকামী, তাঁরা অবিলম্বে অনুভব করেন যে, নামযশের প্রতিটি কণিকা তাঁদের পবিত্রতার বিনিময়ে মেলে। পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ থেকে এবং লাভ বা নাম-যশের প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা থেকে এই ব্যাপারটি অনেক অনেক দূরে। প্রভু আমাকে সাহায্য করুন। আমার জন্য প্রার্থনা করুন, মা। আমি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। হায়, পৃথিবীটা কেনই বা এমন হলো যে, কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিজেকে সামনে না এনে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না! কেন সে সঙ্গোপনে, অগোচরে এবং অলক্ষ্যে কাজ করতে পারে না! পৃথিবী এখনো পৌত্তলিকতাকে ছাড়িয়ে এক পা-ও এগিয়ে যায়নি। তারা কোন ভাবধারা নিয়ে কাজ করতে পারে না, কোন ভাবধারা অনুযায়ী চালিত হতে পারে না! তারা চায় কায়াকে—ব্যক্তিবিশেষকে। আর, যে-ব্যক্তিই কিছু করতে চাইবে তাকেই জরিমানা দিতে হবে; কোন আশা-ভরসাই নেই। এই দুনিয়াতে কত না জঞ্জাল! শিব! শিব! শিব!

প্রসঙ্গত জানাই, টমাস এ. কেম্পিসের [গ্রন্থের] একটি চমৎকার সংস্করণ আমি পেয়েছি। ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে আমি বড়ই ভালবাসি। 'যবনিকার অন্তরালে'র এক অপরূপ চকিতদর্শন তিনি লাভ করেছিলেন—মুষ্টিমেয় মানুষই আজ পর্যন্ত তা পেয়েছেন। অহো, সেই হলো ধর্ম। জাগতিক ভণ্ডামি নেই। নির্বোধের মতো দ্বিধা, লম্বা লম্বা কথা, অনুমান —'আমি অনুমান করি', 'আমি বিশ্বাস করি', 'আমি মনে করি' ইত্যাদির কোনটাই নয়। তারা যাকে সুন্দর পৃথিবী আখ্যা দেয়— সেই চিত্রিত ভণ্ডামির রাজ্য থেকে টমাস এ. কেম্পিসের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আমার কতই না অভিলাষ—দূরে বাইরে, সীমানা ছাড়িয়ে—যা শুধুমাত্র উপলব্ধি করা যায়, কখনো প্রকাশ করা যায় না।

এই হলো ধর্ম। মা, ঈশ্বর আছেন। সেখানেই সকল সাধুসন্ত, ধর্মগুরু ও অবতারগণ মিলিত হন। বাইবেল ও বেদের সৌধ—ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পকৌশল, প্রতারণা ও মতবাদের পরপারে, যেখানে পরিপূর্ণ আলোক, পরিপূর্ণ ভালবাসা, যেখানে এই জগতের পূতিগন্ধ কখনো পৌঁছাতে পারে না। আঃ! কে আমাকে সেথায় নিয়ে যাবে? এব্যাপারে আপনি কি আমার সমব্যথী, মা? নিজের চাপানো শত-বন্ধনের বেষ্টনীতে আমার অন্তরাত্মা এখন মর্মন্তুদ আর্তনাদ করছে। ভারতবর্ষ কার? কে-ই বা তোয়াক্কা করে? সবকিছুই তাঁর। আমরা কী? তিনি কি মৃত? তিনি কি নিদ্রিত? তিনি—যাঁর আদেশ ব্যতিরেকে একটি পাতাও নড়ে না, একটি হৃদ্‌যন্ত্রও স্পন্দিত হয় না, আমার নিজের আত্মার থেকেও যিনি নিকটতর। এটা অর্থহীন ও মূর্খতা—ভাল বা মন্দ কিছু করতে যাওয়া। আমরা কিছুই করি না। আমার অস্তিত্বহীন। পৃথিবী অস্তিত্বহীন। তিনি আছেন, তিনি আছেন। শুধু তিনিই বর্তমান। অন্য কেউ নেই। তিনিই বিদ্যমান।

ওম্—যে একের দ্বিতীয় নেই। তিনি আমাতে, আমি তাঁতে। আলোক-সমুদ্রে আমি এক টুকরো কাঁচের মতো। নাহং, নাহং। ত্বমেব, ত্বমেব, ত্বমেব।

ওম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আপনার চির স্নেহাস্পদ

বিবেকানন্দ

---

২ স্বামীজী সংবাদের 'পেপার কাটিং'-এর কথা বলছেন। তিনি মূলত সেই 'পেপার কাটিং'গুলির কথাই বলছেন, যেখানে তাঁর আমেরিকার কর্মসূচীকে ভারতের হিন্দুসমাজ সমর্থন করেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

শ্লোকার্থ ঃ *জ্ঞানিগণ কর্মাসক্ত হইয়া জ্ঞানহীনগণের বুদ্ধিভেদ (অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রাট) জন্মাইবেন না। তাঁহারা (জ্ঞানিগণ) সচেতনভাবে সকল কর্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানহীনগণকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবেন।*

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম না করিলে এই জগতের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার ফলে সাধক জগৎ সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না। 'এই জগৎ হেয়'—ইহা না জানিয়া কর্মত্যাগ করিলে পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় কর্মে প্রবিষ্ট হয়। এই কথাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯তম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন। মানুষের কোন উপকার করিতে হইলে তাহাকে হিতকর্মে নিযুক্ত করা উচিত। জ্ঞানীরা নিজে কর্ম করিয়া দেখাইলে তবে লোকের কর্মের ওপর শ্রদ্ধা জন্মাইবে।

হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কামী মানুষের জন্য সকাম কর্ম এবং নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিকামী মানুষের জন্য নিষ্কাম কর্মের বিধান আছে। যথোচিত কর্ম করিলে কাহারো কাহারো 'সংসার হেয়' —এই বোধ জন্মায়। কিন্তু যাহাদের এই বোধ জন্মায় নাই, তাহাদিগকে জ্ঞানের প্রলোভন দেখাইলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে সন্ন্যাস, সর্বত্যাগ প্রভৃতি যখনি অধিক চর্চা শুরু হইয়াছে, তখনি তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজের অধঃপতন হইয়াছে। যখনি সমাজ ভিক্ষান্নজীবীকে পূজা করিতে শুরু করে, তখনি দেখা যায় সংসারের হাঙ্গামা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তমোগুণী লোক এবং পরম আয়েশে থাকিবার জন্য সত্ত্বগুণী লোক সংসার-ত্যাগের অভিনয় করিতেছে।

বর্তমানে [অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে] ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই দেখা যায় সহস্র সহস্র লোক পরান্নে জীবনধারণ করিবার জন্য ত্যাগী সাজিয়া বেড়াইতেছে। ত্যাগীদের আশ্রমে সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডারের সংবাদ [হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে] যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—বৈরাগ্যহীন লোকের সংসারত্যাগ সমাজের পক্ষে কতখানি অহিতকর। বৌদ্ধযুগে ঢালাও সন্ন্যাস দিবার পদ্ধতির নিন্দা করিয়াছিলেন স্বামীজী। যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গী, তাহাকে জোর করিয়া নিবৃত্তিমার্গী করিলে সমাজের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, কামকাঞ্চনাসক্ত মানব-মন আবেগতাড়িত হইয়া সন্ন্যাসবিধি-বহির্ভূত কর্ম করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই কারণেই রামকৃষ্ণ মিশনের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার (Transparency in Accounts) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কোনপ্রকার জাগতিক ambition-যুক্ত (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) মানুষের সন্ন্যাসগ্রহণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *প্রকৃতিগত গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) মন-শরীর-ইন্দ্রিয়রূপ সঙ্ঘাত (body-mind complex)-এ পরিণত হইয়া লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু যাহার চিত্ত অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়াছে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তি 'আমিই কর্তা'—এইরূপ মনে করে।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সমগ্র সত্তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত স্থূল, দেহ, মন, বুদ্ধি-সমন্বিত 'কাঁচা আমি'। দ্বিতীয়ত আনন্দময় কোশাবৃত (পঞ্চকোশ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) চেতন 'পাকা আমি' এবং তৃতীয়ত অবিমিশ্র চিৎ, ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্যমনাতীত, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত আত্মা। যখন আমরা দেহ-মন-বুদ্ধিতে 'আমি' বোধ করি, তখন আমাদের নিজস্ব জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেরণায় কাজ করি। সেই 'আমি' ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহাকেই বলা হয় 'কাঁচা আমি'। অপর একটি অবস্থায় মানুষ নিজেকে এক আনন্দময় সত্তা বলিয়া বোধ করে। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সাক্ষিমাত্র হইয়া সাধক ক্রমশ জ্ঞানী, ভক্ত, সিদ্ধ কিংবা জীবন্মুক্তে পরিণত হয়। আর যখন কোন উপাধিই থাকে না, মানুষ নিজেকে কেবল চিৎ-রূপে অনুভব করে, তখন সে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। এই অবস্থার অপর নাম 'ব্রহ্মনির্বাণ'। (দ্রঃ গীতা, ২।৭২)

'চিৎ' অর্থে যাহাকে সাধারণভাবে আমরা 'চেতনা' বা 'হুঁশ' বলি, তাহা নহে। এই দেহ-মন সঙ্ঘাতের পশ্চাতে চিৎ বর্তমান। ফলে দেহ-মন সঙ্ঘাতের মধ্যে সামান্য জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। তাহাকেই সাধারণভাবে আমরা চেতনা বলিয়া থাকি। যেমন আতসকাঁচে রৌদ্র পড়িলে কাঁচের ঔজ্জ্বল্যের সহিত উষ্ণতাও অনুভব করা যায়—সেইরূপ।

মানুষের জীবন দুইভাগে বিভক্ত। যখন সে জড়বস্তুর দ্বারা নির্মিত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকেই 'আমি' বোধ করে, তখন সে সংসারের সুখ-দুঃখরূপ দোলায় দুলিতে থাকে। কিন্তু যখন সে নিজেকে চৈতন্যাংশ বোধ করে, তখন পরমানন্দে এবং ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া থাকে।

পুণ্যকার্য অর্থাৎ উপাসনা ও পরোপকারকার্য করিতে করিতে মানব-মন নির্মল হয়। সংসারের প্রকৃত স্বরূপ তখন সে ভালভাবে বুঝিতে পারে। প্রত্যেক কার্যে তাহার দক্ষতা প্রকাশ পায়। ইহার সহিত কথঞ্চিৎ শুদ্ধতা লাভ করিলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি হয়। তখন চিকীর্ষাবৃত্তি বা কর্মপ্রবণতা দারুণ বৃদ্ধি হয়। ইহাই রজোগুণের চিহ্ন। আর যখন শরীর-মন-বুদ্ধি আরাম চাহে, অথচ তাহা লাভ করিতে কোনরূপ উদ্যম লইতে অনিচ্ছুক থাকে, সেই অবস্থাকেই তামসিক অবস্থা বলা হয়। অবশ্য এইসব অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মেই আসিতে থাকে। যেমন চিকিৎসার দ্বারা চিকিৎসক রোগ-নিরাময় করেন, ঠিক তেমনি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে এই দেহ-মনরূপ কলের ভিতরে যেকোন গুণের বিকাশ করা সম্ভব হয়। ইহাতে শ্রীভগবানের ইচ্ছা বা কৃপার প্রসঙ্গ তোলাই অনাবশ্যক। টক খাইলে দাঁত টকে; টক ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন কেন?—তুমি টক খাইলে কেন? আসলে তোমার অহঙ্কার এবং তজ্জনিত সত্ত্বরজোতমো-গুণোচিত বাসনা-কামনাই তোমার দুঃখের কারণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

[মন্তব্য : কর্ম দুইপ্রকার। লৌকিক এবং বৈদিক। বেদে (অর্থাৎ শাস্ত্রে) কিছু কর্মকে বলা হইয়াছে 'বিহিত কর্ম' অর্থাৎ করণীয়, কিছু কর্ম 'নিষিদ্ধ' অর্থাৎ অকরণীয়। এইসব কর্ম বৈদিক কর্ম। কিন্তু এমন বহু কর্ম আছে, সেগুলির উল্লেখ শাস্ত্রে নাই। সেইসব অনুল্লিখিত কর্মের মধ্যে কিছু বিহিত এবং কিছু নিষিদ্ধ কর্ম আছে, যেগুলিকে বলা যায় 'লৌকিক কর্ম'। অতএব লৌকিক কর্ম যেমন অনিষিদ্ধ, তেমনি অবিহিতও বটে। কিভাবে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম সম্পাদিত হয়, সেবিষয়ে শ্রীভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে (শ্লোকসংখ্যা ১৩-১৬ দ্রষ্টব্য) সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।—সম্পাদক]

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

শ্লোকার্থ : *হে মহাবাহো [হে অর্জুন], সত্ত্বগুণের পরিণাম আমরা দেখিতে পাই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়তে। আর তমোগুণের পরিণাম দেখিতে পাই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়েতে। কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ। গুণবিভাগ এবং কর্ম-বিভাগের এই যথার্থ তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন।*

ব্যাখ্যা : ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং তাহাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সবই জড় বৈ চেতন নহে। 'আমি' স্বরূপত চিৎ। সুতরাং দেহাদির সহিত চিৎস্বরূপ আমার কোন সম্পর্ক নাই। জ্ঞানীরা ইহা বুঝিতে পারেন বলিয়া কোন বিষয়ে তাঁহাদের আসক্তি জন্মিতে পারে না। তবে জ্ঞানীদেরও পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু বৈষম্য থাকে। উহা তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সংস্কারবশত, স্বরূপবশত নহে। ফলে অজ্ঞব্যক্তিগণ মনে করে, জ্ঞানীদেরও পছন্দ ও অপছন্দ (likes and dislikes) আছে। যেমন আমরা জানিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ জিলাপি খাইতে ভালবাসিতেন। স্বামীজী লঙ্কা পছন্দ করিতেন। ইহা তাঁহাদের দেহের সংস্কার মাত্র। ব্রহ্মের একটি অদ্ভুত শক্তি আছে। এই শক্তির সাহায্যে তিনি নিজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া সূর্য-চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-পতঙ্গরূপে প্রকটিত হন। সেই শক্তির নাম 'মায়াশক্তি' অথবা 'আবরণী শক্তি'। তিনভাবে সেই শক্তি ক্রিয়মাণ হইয়া উঠে—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ। এই তিন ক্রিয়াশক্তির অপর নাম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। কিন্তু ইহারা 'চিৎ' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া ইহাদের ক্রিয়াকলাপ (functions) জ্ঞানীদের বিচলিত করিতে পারে না।

[মন্তব্য : যদিও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ কখনো পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে না, তথাপি প্রাধান্যবশত বস্তুর মধ্যে উহাদের বিভিন্ন প্রকাশ ঘটে। চক্ষু বা কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সকল—যাহা আমরা স্থূলচক্ষে দর্শন করি, বস্তুত তাহা বাহ্য যন্ত্রমাত্র। প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি মানুষের সূক্ষ্মশরীরের অংশবিশেষ। যখন বলা হইতেছে, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল সত্ত্বগুণের পরিণাম, তাহার অর্থ—ঐসকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বর্তমান। তেমনি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ে রজোগুণের এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত পঞ্চবিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে তমোগুণের প্রাধান্য বিদ্যমান। কিন্তু আত্মাতে কোন গুণের বিদ্যমানতা নেই। সুতরাং 'আমি আত্মা'—এই বিচারকালে সাধক কার্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপ এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিলে তাহাই 'গুণবিভাগ'। এবং 'আমি যেহেতু কর্মবর্জিত আত্মা', অতএব দেহেন্দ্রিয়জনিত সকল কর্ম হইতে 'আমি' পৃথক, দ্রষ্টাস্বরূপ—এই ভাবনাই কর্মবিভাগ। ইহাকেই শ্লোকের মধ্যে 'গুণকর্মবিভাগ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ গুণ ও কর্ম হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া অনুভব করেন ও আত্মার সাক্ষাৎকার করেন।—সম্পাদক] [ক্রমশ] ।।ছয়।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

চৈত্র ১৩০৯
মার্চ ১৯০৩

সাধন-প্রাণায়াম

(স্বামী শিবানন্দ)

'সাধন' শব্দে ভগবানলাভ বা আত্মজ্ঞানলাভ করবার উপায়। ভক্তিপথের পথিক হউন বা জ্ঞানপথের পথিকই হউন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত কেহ ইষ্টলাভ কত্তে [করতে] সক্ষম হন না। ভক্তিপথের পথিক, যাঁদের কেবল দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন, যাঁরা বিশ্বাস করেন—ভগবান বিভিন্ন মূর্ত্তিতে গোলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোকাদিতে বাস করেন আর যাঁদের লক্ষ্য—দেহান্তে ভগবৎকৃপায় নিজ নিজ ইষ্টলোকে গমন, সাধন তাঁদেরও অবশ্যই কত্তে হয়। তাঁদের অবশ্যই পূজা, অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, ভগবৎকথা পাঠ, ভগবৎ প্রসঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই কত্তে হয়। তাঁরা একটু সাধনে অগ্রসর হইলেই নির্জ্জনবাসপ্রিয় হন এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয়াদি রোধ করে আপনাপন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হন। তাঁরা কেবল একেবারে ভগবান [-এ] লয় প্রাপ্ত হতে চান না, সেব্যসেবক ভাব বজায় রাখতে চান।...

জ্ঞানপথের পথিক, যিনি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বা 'নেতি নেতি' বলে থাকেন এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই উপলব্ধি যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি 'গুরু বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস', 'ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ কর্ম্মফলভোগেচ্ছা না রাখা' এবং 'শম', 'দম', 'তিতিক্ষা', 'উপরতি' প্রভৃতি সাধন করেন। উপরোক্ত ভগবানের আবাসস্থান স্বর্গাদিতে গমন এবং সুখভোগ ইত্যাদি তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাঁর মতে ঐসকলও অনিত্য এবং মনোরাজ্যের অন্তর্গত। জ্ঞানী চান মনেরও বাহিরে যেতে, 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অবস্থা লাভ কত্তে।

... যিনি যেপথেই ভগবান লাভের জন্য যান না কেন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। শাস্ত্রেও নানাবিধ উপায় কথিত আছে। প্রাণায়াম এই উপায়সকলের মধ্যে অন্যতম।...

প্রাণায়াম শব্দ বুঝা অতি সহজ,—এত সহজ যে, বুঝাইয়া দিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা প্রত্যহ সকলেই অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম করিয়া থাকি আর ইহা অভ্যাস করাও অতি সহজ।... কোন এক বিশেষ বিষয়ে মন সংযত হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য স্বভাবতই রুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয় বা প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়। আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা দরকার,—যখনি ঐরূপ নিবিষ্টচিত্তে পাঠের সময় বা গণিত সমস্যা সমাধানের সময় শ্বাস ধীরে ধীরে বইছে কিনা লক্ষ্য করতে থাক, যখন সেই পাঠ বা অঙ্কের দিকে মন থাকবে না, শ্বাসের দিকে মন আসবে, তখনি দেখবে, উহা আবার ক্রমশঃ সহজ ভাব ধারণ কর্ব্বে [করবে]।... দেখা যায় এই যে, মন কোন একটা ভাবে একেবারে মগ্ন হলে প্রাণবায়ু আপনা হতেই কতকটা রুদ্ধভাব ধারণ করে। আর ভাবই মুখ্য, প্রাণনিরোধ গৌণ। এইরূপে প্রাণায়াম আমরা নিত্যই অজ্ঞাতসারে করে থাকি।...

এখন সাধনপথের প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম কল্লেই [করলেই] কি ভগবানলাভ বা আত্মানুভূতি হয়? না, কখনই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, মায়ের শিশুসন্তানের উপর যেরূপ টান, সতী স্ত্রীর পতির উপর যেরূপ টান, কৃপণের ধনের উপর যেরূপ টান—ঐরূপ টান ভগবানের জন্য যখন কাহারো ভাগ্যক্রমে ঘটে, তখন তাহার অতি অল্প সময়ের মধ্যে বস্তুলাভ হয়। যখনি কারু হৃদয়ে ঐ ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়, তখনি তার প্রাণবায়ুর অবস্থা রুদ্ধভাব ধারণ করে। ঐ অবস্থাতে সাধক জপ, ধ্যান, গান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি যা করেন, তাই অতি সংযম ও বিশেষ অনুরাগ ও প্রেমের সহিত সাধিত হয় এবং প্রাণবায়ুর ঐরূপ অবস্থাকেই প্রাণায়াম বলে। নতুবা অনুরাগ নাই, টান নাই, প্রেম নাই, শুধু শ্বাসরোধ এবং অতি ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ কল্লে জ্ঞানভক্তিলাভের কোন সুবিধা হয় না। যোগদর্শনে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এবং 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' সূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং সেই নিরোধ সময়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মার স্বীয়রূপে অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান হয় বলা হয়েছে এবং এই অবস্থা লাভ করবার নানা উপায় ক্রমে ক্রমে বলা হয়েছে। যাঁরা স্বস্বরূপ অনুসন্ধানে অনুরাগী, কেবল তাঁদের জন্যই ঐসকল উপায় বলা হয়েছে। যাঁরা সদ্‌গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুমুখবিনিঃসৃত শাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ এবং মনন দ্বারা চিত্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন, তাঁদের স্বরূপের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাঁরা তখন ক্রমশঃ ধ্যানে নিমগ্ন হতে থাকেন এবং তাঁদের প্রাণায়াম আপনা হইতে হয়। নতুবা অশুদ্ধ চিত্তে স্বরূপ কি পদার্থ ও স্বরূপের জ্ঞানই বা কিরূপ, ইত্যাকার সংশয় সদাকাল থাকে। স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সমাধি হয়—উহা প্রাণায়ামের পরাকাষ্ঠা, তখন আর ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা—এ তিনের পার্থক্যবোধ থাকে না।

এখন সারকথা এই যে, হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নাম জপ ও স্মরণ মনন কল্লে প্রাণায়াম আপনা হতেই হয়। ফল আধ্যাত্মিক জীবনে অপরিমেয়। ব্যবহারিক জীবনে (Practical life) মনঃশক্তিবৃদ্ধি, চরিত্রের শুদ্ধতা, চিত্তের প্রসার, দয়া, দৃঢ়ব্রততা অর্থাৎ ঈশ্বরকৃপায় তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তাঁর ভক্তে সঞ্চারিত হয়, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সহজ উপায় এপথে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ পাওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সৎসঙ্গ পাওয়া ভগবানের বিশেষ কৃপা। শ্রুতিও বলছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' তাঁকে বিশেষরূপে জানবার জন্য সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হস্তে বেদপারদর্শী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারতীয় চিকিৎসাবৃত্তি

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আজ আমরা মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্র এমনকি জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্ক নিয়েও গভীর গবেষণা করছি। মস্তিষ্কের গভীরের রহস্য উন্দঘাটন করার উদ্দেশে প্রায় সমগ্র বিশ্বে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। সকলকে আজ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করি, অনুভব করতে পারি তার স্নায়ুতন্ত্রও। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই আপাতপ্রত্যক্ষ গঠনতন্ত্রের মধ্যে যে-শক্তি বিধৃত হয়ে আছে, সেগুলি ব্যতীত আরো কিছু শক্তির প্রভাব মানুষের জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এখন প্রশ্ন জাগে, মস্তিষ্কের ওপর 'মন'-এর কোন প্রভাব আছে কিনা? দেখা যায়, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারকালে অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীর একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার জন্য রোগীকে কোন অতিরিক্ত যন্ত্রণার ভার বহন করতে হয় না। এটিই হলো সেই ইঙ্গিত যোগসূত্র, যার সাহায্যে চিকিৎসক ঐ বিশেষ রোগী সম্বন্ধে নানারকম তথ্য আহরণ করেন। ঐ তথ্যগুলি থেকে চিকিৎসক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মস্তিষ্ক-রূপ যন্ত্রটির গভীরে শুধু একটি 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ'ই নেই, আছেন একজন 'টেলিফোন অপারেটর'ও। অর্থাৎ শুধু মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটির অস্তিত্ব নেই, তার অন্তরালে আছেন একজন 'যন্ত্রী'—যিনি মস্তিষ্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একমাত্র তিনিই মানবজীবনের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রকৃত নিয়ামক। এইভাবে বৈজ্ঞানিকগণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যার থেকে লাভ করা গেছে আরো কিছু মূল্যবান অনুসিদ্ধান্ত। এটি এক মহামূল্যবান সত্য—যেটি উপনিষদের ঋষিগণ, বুদ্ধদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো সাধকগণ গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। আজ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হচ্ছে 'মানবশক্তি-সম্পদ'-এর বিজ্ঞান।

আপনাদের, আমার অথবা ঐ সদ্যোজাত শিশুটির মধ্যে কী শক্তি নিহিত আছে, সেটি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে আপনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। এই কৌতূহল নিবৃত্তির পথের সন্ধান পাওয়া যাবে উপনিষদে, শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে এবং একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর মধ্যে। স্মরণ রাখবেন, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে আপনি সমগ্র মানুষের বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় একটি বিশাল বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এটি কোন বাহ্য পূজানুষ্ঠান করার সমতুল নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে কোনদিনই অনুমোদন করেননি। 'আচারসর্বস্ব' ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বারবার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কানতুলসে' মানুষ থেকে সর্বদা সাবধান থাকতে। কারণ এটি আচারসর্বস্ব বাহ্য ধর্মের দৃষ্টান্ত। এই ভাবে কোন নতুন শক্তি অথবা চরিত্রের কোন নতুন মাত্রা কিংবা মানুষের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ প্রভৃতি কিছুই লাভ করা যায় না। এজাতীয় আচরণে কোন আত্মিক বিকাশও ঘটে না। ধর্মবিজ্ঞানের মূলকথা হলো আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধিলাভ করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে একটিই প্রশ্ন করতেন যে, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর কোন অনুভূতি লাভ হয়েছে কিনা। অধ্যাত্মভাব সুসমৃদ্ধ হলেই মানুষ নব নব শক্তি লাভ করে।

মানুষের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করি পেশীশক্তি। আবার শক্তির পরিমাপক হচ্ছে 'অশ্বশক্তি' (Horse power) নামক একক। অতএব ঐ পেশীশক্তি হলো কয়েক একক অশ্বশক্তির সমতুল, তার অধিক কিছুই নয়। কিছুটা পরিশ্রমের ফলে ঐ পেশীশক্তি অশ্বশক্তির পরিমাপে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে; কিন্তু আধুনিককালে সেই শক্তির কোনই মূল্য নেই। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এরকম ভয়ানক শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব যা লক্ষ একক অশ্বশক্তির তুল্য। অতএব মানুষের এই ক্ষুদ্র পেশীশক্তির কী মূল্য আছে? এটি অতি সাধারণ একটি শক্তি। তবু সুস্থ সবল জীবন ধারণের জন্য পুষ্টিবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করে শরীরের বল বৃদ্ধি করা অবশ্যই কর্তব্য।

মহাভারতে মানুষের তিনটি বিশেষ শক্তি বা বলের কথা বলা হয়েছে—'বাহুবলম্', 'বুদ্ধিবলম্' এবং 'আত্মবলম্'। এই ত্রিশক্তিই অপরাপর সকল শক্তির উৎসস্থল। প্রথমেই আলোকপাত করা হয়েছে 'বাহুবলম্'-এর ওপর, যেটিকে আমরা বলেছি 'পেশীশক্তি'। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, অন্যান্য শক্তির তুলনায় এই শক্তি অতি তুচ্ছ, নগণ্য। একটি বলদ, অশ্ব অথবা রকেটের মধ্যে

এই শক্তিই কয়েকগুণ মাত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'বুদ্ধিবলম্' হচ্ছে শক্তির এক অনবদ্য প্রকাশ। আধুনিক সভ্যতা এই 'বুদ্ধিবলম্'-এর পরিণতিস্বরূপ। আমরা সকলেই গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। গভীর মনঃসংযোগ এবং ইতিবাচক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে মানুষ আজ জগতের অনেক সত্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে। একেই বলা হচ্ছে 'বুদ্ধিবলম্'। আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'বুদ্ধিবলম্'-এর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা আজ আমাদের অশান্তি, পীড়া ও দুঃখদুর্দশার শিকার করে তুলছে এবং মানুষের মধ্যে নানারকম চিত্তবৈকল্যের জন্ম দিচ্ছে। এই বলের ওপর মাত্রাধিক নির্ভরতা মানুষের দুর্বলতার লক্ষণ এবং সেই কারণে সমগ্র জগৎ জুড়ে চিন্তাবিদ্গণ আজ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। বস্তুত, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁরা এই 'বুদ্ধিবলম্'-এর ওপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় এর কুফল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের থেকে তাঁরাই অধিকতর সরব। এর প্রধান কারণ হলো, মানবিক সত্তার গভীরে যে প্রবল শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার সঙ্গে তাঁদের কোন সংযোগ নেই। আর সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকেই মহাভারত বলছেন—'যোগবলম্' অথবা 'আত্মবলম্'। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই প্রবল শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে। তার তুলনায় পেশীশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি অতি দুর্বল।

মানুষের শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি-বৃদ্ধির প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অধ্যাত্মক্ষেত্রেও (আত্মবলম্) যেন উন্নতি ঘটতে থাকে। আমাদের চারপাশের এই ঐহিক জগতের মোকাবিলা করার জন্য যে বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করা হয়, তার উৎসস্থল ঐ 'যোগশক্তি' [যোগবলম্]। সেই কারণেই সমগ্র আধুনিক সভ্যতা ঐ 'যোগবলম্' বা 'আত্মবলম্'-এর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন হলো, 'যোগবলম্'-এর অর্থ কি? অলীক কল্পনা এবং অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর পাশ্চাত্য ধর্ম এবিষয়ে কোন আলোকপাত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ঠিক এমন এক পটভূমিকাতেই প্রয়োজন বেদান্ত সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা—যে-বেদান্তকে প্রশ্ন করা চলে, যার সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। মনের যাবতীয় সংশয় নিরসনের জন্য এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং বেদান্ত কর্তৃক সেগুলির উত্তরপ্রদান পর্বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বেদান্তরূপ বিজ্ঞান। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলিও সম্মিলিত-ভাবে একটি বিজ্ঞান বিশেষ। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিত্যই কত প্রশ্ন করে উত্যক্ত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং তাঁকে বলেছিলেন : "নরেন, ঋণের অর্থ ফেরত লওয়ার সময় মহাজন যেরূপ প্রতিটি মুদ্রা পরীক্ষা করে নেয়, তুইও সেরূপ আমাকে পরীক্ষা করে নিবি। আমি যা বলি, সব মেনে নিবি না।" বুদ্ধদেবও একই কথা বলেছিলেন। উপনিষদের ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য প্রমুখ সকলেই একই কথা বলে গেছেন। একটু অনুধ্যান করলেই উপলব্ধি করা যেতে পারে, মানব-সম্পদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের কী গভীর একটি বিজ্ঞান আমাদের দেশে, আমাদের বেদান্তে, আমাদের সনাতন ধর্মে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণীর মধ্যে নিহিত আছে।

দুঃখের বিষয়, এগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করার মতো অন্তর্দৃষ্টি আমাদের নেই। সেইজন্যই সমাজে অশান্তি, অপরাধ, কর্মে অনীহা, দুর্নীতি, সামাজিক দুষ্কর্মের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, মানুষ যত বেশি তথাকথিত শিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে, তত বেশি সে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তার কারণ, এখনো তার অন্তরের গভীরে নিহিত সেই প্রবল শক্তির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একমাত্র মানুষেরই সেই শক্তির পরিচয় লাভ করার শারীরিক ক্ষমতা আছে, অন্য কোন জীবের নেই। বস্তুত, অন্যান্য জীবের এই লৌকিক জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণাই তৈরি হয় না। অতএব বলা যেতে পারে, মানুষের শক্তি দ্বিমাত্রিক—সে যেমন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আবার একইভাবে সে তার অন্তরের অন্তস্তলে মানবজীবনের সেই প্রার্থিত পরিপূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দ্বিতীয় শক্তিটির ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনা করে তিনি এই বিষয়ে 'বিজ্ঞানী' [বিশেষরূপে জ্ঞানী] হয়ে উঠেছিলেন।

উপনিষদে দুটি বিদ্যার কথা বলা আছে—পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং অপরাপর যাবতীয় জ্ঞানলাভের উপায়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় সেগুলিকে বলা যায়—ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান। আমাদের সনাতন ধর্মে এই দুটি জ্ঞানেরই উল্লেখ আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে-বিজ্ঞান, সেটি আমাদের ঐহিক সুখ প্রদান করতে পারে মাত্র। তার সাহায্যে একটি সুন্দর বাসগৃহ, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, মূল্যবান অলঙ্কারাদি, উত্তম আহার ইত্যাদি লাভ করা যায়। কিন্তু এগুলি কি কোন স্থায়ী আনন্দের সন্ধান দিতে পারে? আনন্দের কথা, অতি ধীরে ধীরে আজ কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তরটি হলো—এগুলি জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের সহায়ক হলেও কখনো কোনরকম স্থায়ী আত্মিক শান্তি প্রদান করতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকেই আইনস্টাইন সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেনঃ "বিজ্ঞান প্লুটোনিয়ামের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে সফল হলেও তা কখনো মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন করতে পারে না।" আমরা কিভাবে একজন স্বার্থপর মানুষকে নিঃস্বার্থ করে তুলতে পারি? আমরা মানুষকে তার মানসিক পীড়া থেকে কিভাবে মুক্তি দিতে পারি? বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা যন্ত্রের অধিকতর উন্নতিসাধন করে একাজ করা সম্ভব হবে কি? প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ মহৎ হলেও এই পথে এই কাজে কোন সাফল্য লাভ করা যায় না। আধুনিক মনোবিদ্‌গণ হয়তো এই কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন মাত্র, কিন্তু ঈপ্সিত ফল লাভ হবে না।

এই সত্যটি সদাই স্মরণ রাখতে হবে, 'প্রতিকার' অপেক্ষা 'প্রতিরোধ' অধিকতর ফলপ্রদ। প্রশ্ন হলো, অসৎ প্রবৃত্তির প্রতি মনের আসক্ত হওয়া, নানান পীড়ার শিকার হওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়? এই প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলে মানুষের মৌলিক শক্তিসমূহকে প্রকাশ করার শিক্ষা দিয়েছেন একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং অতীতে আমাদের সনাতন ধর্ম, আমাদের বেদান্ত। গাছের পাতায় জল ঢাললে গাছ পুষ্টিলাভ করে না, তার জন্য প্রয়োজন তার গোড়ায় জল ঢালা। আধুনিক সভ্যজগতে মানুষের মধ্যে এই সার্বিক পুষ্টির অভাবপূরণের তাগিদ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জাগতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, তবু মানুষের মনে পরিতৃপ্তির অভাব কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এই অভাববোধের লক্ষণ আজ সুস্পষ্ট। আর এই অভাবপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হলো সেই তৃতীয় শক্তি—'আত্মবলম্' বা 'যোগবলম্'।

আমাদের ধর্মের অবস্থান কোন সুদূর অন্তরিক্ষে নয়, অথবা আমাদের দেবদেবীগণও সেখানে অধিষ্ঠিত নন। ধর্মের স্থান মানুষের হৃদয়ে। মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে শক্তির এক অমূল্য সম্পদ। সেই কথাই বলে গেছেন শঙ্করাচার্য তাঁর কঠ উপনিষদের ভাষ্যে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে অতি সুন্দর ভাষায় তিনি সেখানে বলেছেন, মানবশক্তি-সম্পদ তিনটি উন্নত মানের বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত—ক্ষমতা, ব্যাপ্তি এবং অন্তর্মুখিনতা।

এই ভাষ্যটি থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? আমাদের পেশীশক্তিকে সংস্কৃতে বলা হয় 'স্থূল' শক্তি, কারণ মানুষের সত্তার গভীরে অনুসন্ধান করলে আমরা আরো সুনির্দিষ্ট, পরিব্যাপ্ত ও সুগভীর এক শক্তির সন্ধানলাভ করতে পারি। মানুষের দেহের বহিরাংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি মানুষের পেশীসমূহ। তার ঠিক নিচের স্তরেই আছে 'তন্তু'। 'তন্তু' আকারে অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু পেশীর থেকে অধিকতর শক্তিশালী। তন্তু ছিন্ন হলে পেশীর মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তন্তুর তুলনায় পেশী স্বরূপত স্থূল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল। আরো গভীরে ডুব দিলে পাওয়া যাবে মানুষের মন, তারও গভীরে 'আত্মা'। ঐ আত্মা আঘাতপ্রাপ্ত হলে মানুষের পেশী, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি সকলই অচল হয়ে যায়। সেই কারণেই শক্তির মাপকাঠিতে আত্মা অধিকতর সুনির্দিষ্ট, অধিকতর ব্যাপক। অতএব এই বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধ্যান করলে এই সত্যটিই সুস্পষ্ট হয় যে, মানুষের বাহ্য গঠনতন্ত্রের অন্তরালে অধিকতর সুনির্দিষ্ট, অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর গভীর এক শক্তির অস্তিত্ব আছে। সেই শক্তিকেই বলা হয় 'আত্মা'। ঐ অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্য, দিব্য সত্তার অস্তিত্ব প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত। আর এই আত্মাই হলো সেই অসীম শক্তির উৎসস্থল। উপনিষদে বলা হয়েছে, মানুষের প্রকৃত শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে তার আত্মার মধ্যে—তার পেশী অথবা তন্তু, এমনকি তার মনের মধ্যেও নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যিশুখ্রিস্ট বা বুদ্ধদেব যে প্রবল শক্তির আধার ছিলেন, তার উৎসস্থল কোথায়? তাঁরা কোনরকম শাস্ত্রাদি পাঠ করেননি; পরন্তু তাঁদের জীবনযাত্রার প্রকৃতিও ছিল অতি সাধারণ মানুষের মতো। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, তাঁদের শক্তি উৎসারিত হয়েছিল তাঁদের অন্তরের উপলব্ধির গভীরতা থেকে। উপনিষদ্ এই বিষয়টির ওপরই আলোকপাত করেছেন। একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র মানবসমাজকে এই শিক্ষাই দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেনঃ প্রত্যেক মানুষকে তার 'যোগবলম্' বা যোগশক্তির উন্মেষ ঘটানোর জন্য সাধনা করতে হবে। কারণ দেখা গেছে, কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে পেশীশক্তি কোনরকম সাহায্য করতে অক্ষম। মানুষের জীবনে মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মাঝে 'বুদ্ধিবলম্'ও কোনরূপ সাহায্য করতে পারে না। সেইসময় নিজের অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত সেই অসীম শক্তির সন্ধান করতে হবে, সেই শক্তিকেই জাগ্রত করে তুলতে হবে। দেখা গেছে, অনেক সময় কোন বিশেষ সমস্যা মানুষকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। যেহেতু অন্তরের গভীরতম প্রদেশের শক্তি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, তাই পেশীশক্তি এবং বুদ্ধিশক্তির ওপর নির্ভরশীল কোন মানুষ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে, সে ঐ সমস্যা থেকে মুক্ত হতে

পারবেই। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

আধুনিক সভ্যতা নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু এই সভ্যতা অতিমাত্রায় জড়বাদের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ আজ জড়বাদের শিকার। সোপেনহাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন ঃ "আজ মানুষ যখন তার অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে, তখন কিন্তু সে নিজের কাছেই এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ হয়ে উঠছে।" বাস্তবে আজ ঠিক তা-ই ঘটছে। মানুষ নিজের কাছেই এক বিশাল সমস্যাস্বরূপ। এখন এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? উপায় হলো, নিজের অন্তরস্থিত সেই প্রবল শক্তির স্পর্শলাভ করার জন্য আন্তরিক হওয়া। সেই শক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্য কঠোর সংগ্রাম করা। একমাত্র তখনি প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করা যাবে। সেই মুহূর্তে মানুষ গভীর পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার আস্বাদ লাভ করবে। সকলের সঙ্গে একটি একাত্মভাব গড়ে উঠবে, নিজেকে সমগ্র মানবসমাজের 'দাস' বলে বোধ হবে, মানুষের কল্যাণচিন্তায় একনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ধর্মের সাহায্যে মানবশক্তির সম্ভাবনার বিজ্ঞান এবং সেই সম্ভাবনাগুলি বিকাশের উপায় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ হলে মানুষ এক অতি উচ্চাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

শুধু জড়বিজ্ঞানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লে তার কি পরিণতি হতে পারে? পূর্বে বহু স্থানে বিভিন্ন বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছি, বিজ্ঞান আমাদের সুন্দর গৃহ দিতে পারে, বাতানুকূল যন্ত্র তথা রেফ্রিজারেটর দিতে পারে, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি বহু ভোগ্যবস্তু দিতে পারে। আপনি আপনার গৃহের একটি সুন্দর নামকরণও করলেন—'শান্তিকুঞ্জ', কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে প্রকৃত চিত্রটি কিরকম? আপনি অনিদ্রা রোগ, মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন দুঃখযন্ত্রণায় আক্রান্ত। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ঠিক এই অবস্থায় কী সাহায্য করতে পারে? কিন্তু আপনি যদি ইতিপূর্বে আলোচিত সেই 'অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান'টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, তাহলে আপনি এক অতি উন্নত অবস্থার সন্ধান লাভ করবেন, অন্তরে অনুভব করবেন অনন্ত পবিত্রতা, প্রেম ও শান্তির স্পর্শ। আপনি যদি এই মহিমময় অনুভূতি আপনার চতুষ্পার্শ্বের সকল মানুষের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হন, দেখবেন, আপনি এক প্রবল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছেন। এটি এক বিশেষ বিজ্ঞানস্বরূপ, যার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য আজ সমগ্র বিশ্ব উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। এই বিজ্ঞানকে বলা হয়ে থাকে 'বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ'। এটি কোন নতুন ধারণা নয়। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'পরাবিদ্যা'। উপনিষদে যাকে 'সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে সেই বিদ্যারই অনুশীলন করেছেন। সকল বিদ্যার মূলকথা হলো 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'আত্মবিদ্যা'। এই অনুপম বিজ্ঞান সকল মানুষের হৃদয়েই নিহিত আছে। যদি সেটি উপলব্ধি করা যায়, তাহলেই প্রকৃত মঙ্গল। অন্যথায় মানুষ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়তে থাকবে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন আমি বক্তব্য রাখি, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের প্রশ্ন করি ঃ আপনারা সকলেই অতি উচ্চস্তরের মেধাশক্তির অধিকারী, আপনারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে এসেছেন এবং এখানে আপনারা সকলেই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে আসীনও আছেন। মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনাদের দশহাজার টাকা উৎকোচ দিতে চাইল; আপনারা কি বলতে পারেন, ঐ উৎকোচগ্রহণের লোভ সংবরণ করতে হলে আপনাদের কোন্ শক্তিটি প্রবলভাবে জাগরিত হওয়া প্রয়োজন? আপনাদের পেশীশক্তি অথবা মেধাশক্তি কি এবিষয়ে কোনরকম সাহায্য করতে পারে? না, এগুলির কোনটিই কোন সাহায্য করতে পারে না। পরন্তু ঐ মস্তিষ্কশক্তি হয়তো আপনাকে ঐ উৎকোচ গ্রহণ তথা দুর্নীতির প্রশ্রয়দানে প্ররোচিত করবে। দেখা যাচ্ছে, বর্তমান ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণই সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত। তাহলে প্রকৃত অবস্থাটি কী? মানুষের মস্তিষ্কস্তরের ওপর শিক্ষার প্রভাব প্রবল, আর এইজাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকা অতি দুর্বল। বস্তুত, মস্তিষ্কস্তরে যেকোন প্রলোভনই বিশাল সমস্যাস্বরূপ। তখন একমাত্র উপায় হলো অন্তরের আরো গভীরে ডুব দেওয়া। তখন মানুষের অন্তরের গভীরে বিরাজমান ঐ আত্মার শরণাপন্ন হতে হবে। তখনি প্রকৃত শক্তির উন্মেষ ঘটবে। মনে হবে, এসব অতি তুচ্ছ, একান্ত নিষ্প্রয়োজন। এইভাবে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে মনকে বোঝাতে হবে, মানুষের জীবনে যে-বস্তুটি একান্তভাবে কাম্য, তা অর্থের থেকে বহুগুণ অধিক মূল্যবান। তখনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে, ঐ অর্থ সম্পূর্ণ মূল্যহীন।* [ক্রমশ] (দুই)

---

* কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে গত ২৩ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পূজ্যপাদ মহারাজের 'Sri Ramakrishna and Indian Medical Profession' শীর্ষক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি

দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত যে তথ্যের (legendary data) সূত্র ধরে স্বামী বিবেকানন্দের এই জগতে আগমনের হেতু আমরা জেনে থাকি, তাতে আমরা দেখতে পাই অখণ্ডের রাজ্যে একটি দেবশিশু সপ্তর্ষিমণ্ডলের একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন: "আমি যাচ্ছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।" বিশ্বাসী ভক্তগণ মনে করেন, এই দেবশিশু হলেন তিনিই—যিনি জগদ্বাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। (গীতা, ৪।৮) তাঁরা এও মনে করেন, সেই দেবশিশু তাঁর কাজের জন্য ঐ ঋষিকে ধরায় আনতে চেয়েছিলেন।

বাস্তব ঘটনাতেও আমরা দেখতে পাই, নরেন্দ্রনাথকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা, তুই কি চাস বল?" তখন তিনি বলেছিলেন, তিনি শুকদেবের মতো সর্বক্ষণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদনে মগ্ন হয়ে থাকতে চান। তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করে বলেন: "ছিঃ, ছিঃ, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলুম কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!" আরেকদিন বলেছিলেন: "চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে যে-কর্মপ্রেরণা প্রদান করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই ঐহিক স্বার্থযুক্ত কর্ম নয়—ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতির সঙ্গে যুক্ত কর্ম। আদর্শের সঙ্গে কর্ম। এই যে আত্মানুভূতির সঙ্গে বা ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম, তা-ই 'সেবা'। এই সেবাই হলো গীতোক্ত কর্মযোগ। তাই পরবর্তী কালে স্বামীজী বলতে পেরেছেন, 'ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ'। 'দান' শব্দের দ্বারাও তিনি সেবাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। দান অর্থ আহার্যদান, বস্ত্রদান, ঔষধাদি দান, বিদ্যাদান, শিক্ষাদান, ধর্মদান ও সর্বোপরি অধ্যাত্মজ্ঞানদান—যা আমরা, ভারতবাসীরা করে এসেছি এবং করতে পারি। তার মধ্যে শেষোক্ত দান যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা উল্লেখ করে তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন: "ধন্য ব্যাস, ধন্য মনু"—যাঁরা নির্ভীক চিত্তে প্রচার করে গেছেন, কলিযুগে দান বা সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

নরেন্দ্রনাথের বাল্য বয়সের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, দেবশিশু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঐ ঋষিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন। বাড়িতে দরিদ্র ভিখারি এলেই নরেন্দ্রনাথ তাঁদের ভাল জামাকাপড় দিয়ে দিতেন। ঐ ভিখারিরা দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আসত। বাড়ির অভিভাবকগণ তা টের পেয়ে ঐ সময়ের জন্য দোতলার একটি ঘরে তাঁকে তালাবন্ধ করে রাখতেন। কিন্তু যাঁর সহজাত প্রবৃত্তি সেবা, বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা—সেই নরেন্দ্রনাথ ভাল জামাকাপড় ভিখারিদের না দিয়ে কি থাকতে পারেন!

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা তো স্বামী বিবেকানন্দকে অদ্বৈতবেদান্তী বলেই জানি। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে কেবলমাত্র শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, আর সবই মিথ্যা। সুতরাং সেবা, দান, সহানুভূতি প্রভৃতির মধ্যে একটা দ্বৈত ভাব থাকাতে তার সঙ্গে ঐ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হবে কি করে? স্বামীজীর মনেও যে এই সত্য বা তত্ত্ব উদিত হয়নি, তা নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর মহাবাণী—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পরম আদর্শ উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছিলেন জীবের প্রতি সহানুভূতি, সেবা বা দানের মাধ্যমেই সেই অদ্বৈত শুদ্ধ পরমতত্ত্বকে নিজের জীবনের উপলব্ধি করা যায়। একেই তিনি 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।

তাই দেখা যায়, যাদের কাজের জন্য সেই দেবশিশু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিকে ধরায় এনেছিলেন, তারা তো কেউ সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত ছিল না। তারা তো তাদের স্বার্থপরতা, জৈব প্রেরণা প্রভৃতির দ্বারা এই সমাজকে প্রায় নরকতুল্য করে তুলেছিল—যাকে স্বামীজী বলেছিলেন—"সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়..."। সেই জগতের মানুষদের যতটা সম্ভব উর্ধ্বে তোলার জন্য এবং কোন কোন অনুরাগী ভক্তের গভীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁরা এসেছিলেন। সুতরাং আমরা যে রয়েছি শক্তির জগতে তথা মায়ার জগতে, যাদের অভ্যুদয় বা উন্নতি সর্বদাই প্রার্থিত—তাদের জন্যই সেবা, দান ও সহানুভূতির প্রয়োজন। স্বামীজী তাঁর চরম সিদ্ধান্ত 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' কবিতার শেষ অংশে বলে গেছেন—"মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক... থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার আর থাক প্রেম নিরবধি।"

এই কবিতায় স্বামীজী চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেও সেবাদর্শ ও দানের মহিমা রক্ষা করেছেন। বলেছেন—'সত্যে

গতি যার'। যেহেতু আমরা সাধারণ জীবগণ অবনতি-উন্নতির তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি, সেহেতু আমাদেরও সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থা একান্ত প্রয়োজন —'সেবা ও প্রেম'। মৈত্রায়ণী উপনিষদে একটি শ্লোক আছে ঃ "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"। (৬।২২) এর অর্থ—যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শাস্ত্রগম্য ব্রহ্মে বা ব্রহ্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হয়েছেন, তিনিই পরব্রহ্মকে জানতে বা লাভ করতে পারেন। এই যে পরব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান, যাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে নিষ্ণাত বা পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ই বলেছেন ঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন...।" (৪।৪।২২) অর্থাৎ এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা জানতে ইচ্ছা করেন। এই যে বিবিদিষা বা জানার ইচ্ছা তা কৌতূহল মাত্র নয়, কিন্তু তাঁকে জানার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, যাকে কেন উপনিষদ্ই বলেছেন ঃ "ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।" (২।৫) অর্থাৎ যাঁকে এই জীবনেই জানতে না পারলে সবই বিনষ্ট অর্থাৎ বৃথা হয়। এইরূপ বিবিদিষাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। সুতরাং এইরকম বিবিদিষা লাভের জন্য বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপবাস প্রভৃতি সকলপ্রকার কর্ম বা সাধনই আমাদের অনুষ্ঠান করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, শব্দব্রহ্মকে আয়ত্ত করতে হলে দান, তপস্যা প্রভৃতিকে বাদ দেওয়া যাবে না। 'Universal Religion' বা 'বিশ্বজনীন ধর্ম' বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ "আমি তো Religion-এর মধ্যে Universal অর্থাৎ সর্বজনগ্রাহ্য কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। সাধারণত জগতের প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহে তিনটি অংশ আছে। সেই ধর্মের পৌরাণিক ভাগ হলো প্রথম অংশ। দ্বিতীয়টি তার অনুষ্ঠান বা সাধন অংশ। আর তৃতীয়টি হলো সেই সাধনার দ্বারা লভ্য ফল বা অনুভূতি। প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়, এই তিনটি অংশ এত বিভিন্ন প্রকারের যে, তার মধ্যে Universal বা সর্বধর্ম-গ্রাহ্য কোন অংশই খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

"এরই মধ্যে আমার মনে একটি সংস্কৃত শব্দ জেগে উঠল, যেটি হলো 'যোগ'। এই যোগ শব্দটি এত গভীরার্থক ও ব্যাপক যে, তার মধ্যেই বিশ্বজনীন ধর্মের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর মনে সেসময়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথাই উদিত হয়েছিল। গীতাতেই 'যোগ' শব্দটির অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থ গৃহীত হয়েছে। এমনকি বিষাদ বা দুঃখকেও একটি যোগের অন্তর্গত করা হয়েছে; কর্ম, ভক্তি, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি অভ্যাসযোগ এবং জ্ঞানের তো কথাই নেই! এই ভগবদ্গীতাতেই রয়েছে—"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" (১৮।৪৬) অর্থাৎ প্রারব্ধ অনুসারে সমাজে যে যে-অবস্থায় আছে, তার জন্য বিহিত কর্মসকল ভগবানের অর্চনারূপে অনুষ্ঠান করে মানুষ সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। আবার গীতাতেই রয়েছে—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।" (১২।৪) অর্থাৎ যেসকল জ্ঞানী সকল প্রাণীর হিতে রত, তাঁরা আমাকেই (ঈশ্বরকেই) প্রাপ্ত হন। এইসব উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, উপনিষদের 'দান', ভগবদ্গীতার 'স্বকর্মে'র দ্বারা ভগবানের অর্চনা এবং সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে অনুরাগ—এইসব বাক্যে সেবাধর্মের দার্শনিক ভিত্তি পাওয়া যায়। আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও একটি শ্লোকে আছে, সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আমাকে (ঈশ্বরকে) সেবা না করে যারা শুধুমাত্র অর্চার অর্থাৎ বিগ্রহের সেবা করে, তারা ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। এখানেও প্রাণিগণের সেবাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেবাধর্মের প্রধান প্রবক্তা বিবেকানন্দ আরেকটি কথা যোগ করেছেন—" 'সেবা' বললেও আমার প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হচ্ছে না, 'শিবজ্ঞানে জীবের পূজা' বললে তবেই আমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয়।" ভাগবতে আছে—"তস্মাদ্ অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ) ধনমানাদিনা।" অর্থাৎ স্বামীজীর কথায় এই ভাবেরই প্রকাশ।

আবার আচার্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "শান্তো মহান্তো... তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতু-নাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ।" (৩৭) অর্থাৎ এরূপ অনেক সাধু-মহাত্মা আছেন, যাঁরা নিজেরা সংসার-সমুদ্র পার হয়ে অন্যদেরও পার করেছেন। বলা বাহুল্য, অপরজনকে পার করতে হলে তাদের নানাবিধ সেবারই প্রয়োজন হয়। তাই ঐ গ্রন্থেই শঙ্কর আবার বলেছেন ঃ "বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ।" অর্থাৎ তাঁরা বসন্তের মতো লোকের হিতেই আচরণ করে থাকেন। এই গ্রন্থ থেকেও স্বামীজী সেবার আদর্শ ও প্রেরণা লাভ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জ্ঞানলাভেচ্ছুদের জন্য গীতায় বলা হয়েছে—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" (৪।৩৪) এই কথা বলে শ্রীভগবান জ্ঞানযোগীর সেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ভারতের ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও দেখতে পাই, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রমুখ সব শাস্ত্রকারই পঞ্চ-মহাযজ্ঞকে সকল গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—(১) দেবযজ্ঞ, (২) ঋষিযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) নৃযজ্ঞ এবং (৫) ভূতযজ্ঞ। এইসকল মহাযজ্ঞই সেবাত্মক। সুতরাং এর থেকেও সেবাদর্শের প্রেরণা লাভ হয়ে থাকে।

মানুষের মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, সকল অধ্যাত্মসাধনার পথেই সেবার অবদান অপরিমিত। মানুষের মনে স্থূলভাবেই হোক আর সূক্ষ্মভাবেই হোক, একটা আত্মম্ভরিতার ভাব থাকে—আমি কম কিসে?

শ্রীরামকৃষ্ণ একথাটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন ধনী বা কোন বিদ্বান বা সঙ্গতিসম্পন্নকে যদি বলা যায়—'অমুক স্থানে একটি ভাল সাধু এসেছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি, আপনি কি সেখানে যাবেন?' জবাবে তিনি বলবেন—'না, আমার একটু কাজ আছে।' কিন্তু মনের ভাব হলো—আমার এত টাকা, এত বিদ্যা, এত মান, আমি কম কিসে যে তাকে দেখতে যাব? একেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—উঁচু জমিতে বা টিপিতে জল জমে না, গড়িয়ে চলে যায়। আত্মম্ভরিতা থাকলে জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র সেবার দ্বারাই মানুষ এই আত্মম্ভরিতাকে বিনষ্ট করে অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে পারে। তাই সেবাদর্শের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এত আগ্রহ এবং শ্রীমা সারদাদেবীরও ঐ আদর্শের প্রতি আন্তরিক সমর্থন।

মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে আরো বলা যেতে পারে যে, 'সেবা' এইরকমই একটি পদার্থ—যার আদর্শ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলে মানুষের সকল দোষ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধী পদার্থগুলি আপনিই ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়। 'সেবাদর্শ' কথাটির গভীরে সেব্য ও সেবকের ভাব অবশ্যই নিহিত থাকে। এটা দ্বৈতভাব হলেও সাধককে অধোগামী করে না। কারণ, সেব্য—এই ভাবটির মধ্যেই নিজের 'অহং'-এর চেয়ে সেব্যের উৎকৃষ্টতাবোধ থাকবেই। সেই উৎকর্ষ তিনি আত্মস্বরূপ অথবা তাঁর ভিতরে অন্তর্যামী ঈশ্বর বিদ্যমান—এই বোধ থেকেই হওয়া সম্ভব। তাই 'সেবাদর্শ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আদর্শ তাকেই বলা যায়, যা পরম তত্ত্ব বা পরম সত্যকে দেখিয়ে দিয়ে তাকে পাইয়ে দেয়। সেইজন্যই ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ "ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।" (১৩।২৯) অর্থাৎ সাধক সকলের মধ্যে সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে পেয়ে আত্মার দ্বারা আত্মাকে হিংসা বা আঘাত করেন না। তারই ফলে তিনি পরম গতি—তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তি লাভ করেন।

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, তত্ত্বদ্রষ্টা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র নির্দেশ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষির ভগবৎকার্য সাধনের জন্য ধরায় আগমন, ছেলেবেলা থেকেই জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী দান ও সেবার সংস্কারলাভ—এগুলির পুনঃ পুনঃ সমর্থন উপনিষদ্ ও গীতাতে পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সেবাদর্শের মধ্যে আপাতত একটু দ্বৈতভাব থাকলেও সেই দ্বৈতভাবের দোষহীনতা এবং পরম সত্যে গতি—এগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি। ❑

দীক্ষার বিবরণ

বঙ্গবালা মাইতি

আমি গরিব বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলায় চণ্ডীপুর মঠের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম। দুবেলাই বিদ্যালয়ে যেতে হতো। রোজ ভোরে মঠে গিয়ে ঠাকুরের মালা গাঁথা, বাগানে জল দেওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম করতাম। তাছাড়া সন্ধ্যারতিতে যোগদান কোনদিন বাদ যেত না। মঠে মহারাজদের ধ্যান-জপ করতে দেখে খুব আনন্দ হতো। আমার বড়মামা ও ছোটমামা (স্বামী বিশ্বদেবানন্দ), রজনী মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত ছিলেন। তাঁদের কাছে আমি দীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করতাম। আমার ছোটবেলা থেকেই পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তা হয়নি। আমার দাদা আমাকে না জানিয়ে বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে চলে আসেন। ঐসময় থেকে দীক্ষার জন্য আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ হয় ও দিনরাত কান্নাকাটি করি। শেষে আমার বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "আমি তোকে বেলুড়ে নিয়ে গিয়ে দীক্ষার ব্যবস্থা করে দেব।"

১৯৩৮ সালে আমি যখন অন্য এক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি, তখন বাবা পুজোর ছুটিতে ষষ্ঠীর দিন আমাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। আমি পরদিন বেলুড় যাওয়ার জন্য খুব অস্থির হয়ে পড়ায় তিনি বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে রাতে রওনা হলেন। বহু রাস্তা হাঁটার ফলে আমার দুপায়ে ঘষা লেগে চামড়া উঠে যায় ও হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। যাতায়াতের জন্য মাথাপিছু মাত্র বারো আনা পয়সা খরচ করে কোনরকমে সন্ধ্যার সময় বেলুড় মঠে পৌঁছাই। তখন দেবী দুর্গার আরতি চলছে। ঐসময় পুরনো মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় মায়ের পুজো হয়েছিল। আরতির শেষে বাবাকে দেখতে না পেয়ে খুব কান্নাকাটি করছি, এমন সময় দেখলাম—একজন মহারাজ আমার নাম ধরে নতুন মন্দিরের দিকে ডাকছেন। মহারাজ অচেনা বলে আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না, তবু তিনি আমাকে বারেবারে ডাকার ফলে একটু যাই, কিন্তু মহারাজ চলা আরম্ভ করলে আবার পিছিয়ে আসি। এইভাবে কয়েকবার যাওয়া-আসার ফলে বাবাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি বাবাকে বললাম ঃ "ঐ মহারাজ কেন আমাকে ডেকেছিলেন জিজ্ঞাসা করি চল।"

দেখলাম, মহারাজ তখন স্বামীজীর বারান্দার দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি ঐ সিঁড়িতে উঠলাম, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আর কাউকে দেখতে পেলাম না। চারিদিক খুঁজে নেমে এলাম। তারপর মঠের বিজয় মহারাজ (স্বামী বিদ্যানন্দ) আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাকে তিনি মঠের কাছেই সন্তোষবাবুর বাড়িতে রেখে এলেন। কিন্তু আমি ঐ বাড়িতে একটুও ঘুমোতে পারিনি। কারণ, আমার দীক্ষা হবে কিনা তখনো জানতে পারিনি। ভোরে উঠে মঠে এসে মায়ের ঘাটে মুখ-হাত-পা ধুয়ে সব মন্দিরে প্রণাম করলাম। অস্থির মন নিয়ে শুধু পাগলের মতো এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছি আর কাঁদছি। আগের দিন বিজয় মহারাজের কাছে শুধু জেনেছিলাম, স্বামীজীর পাশের ঘরে দীক্ষা হয়। আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে ৮টা-৮½টার সময় ঘুরতে ঘুরতে দোতলায় স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়ি। দেখলাম, ঐ ঘরে একজন মহারাজ একা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে দেখেই আমি চমকে গেলাম। কারণ, তিনিই গতকাল আরতির পর আমাকে নতুন মন্দিরের দিকে ডেকেছিলেন। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি একটা চেয়ার নিয়ে আমায় তাঁর কাছে বসতে বললেন। কিন্তু আমি চেয়ার তুলতে না পারায় মহারাজ নিজে চেয়ার নিয়ে এসে কাছে বসালেন এবং নানারকম প্রশ্ন ও কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। আমার তখনো বাসি কাপড় ছাড়া ও স্নান হয়নি।

ঐদিন ছিল দুর্গাষ্টমী। মহারাজ ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর আমার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন ও তাঁর সেবক মহারাজকে মায়ের মন্দির থেকে একটা ভাল কাপড় আনতে বললেন। তিনি কাপড় আনলে আমি কাপড় ছাড়লাম। আমি গুছিয়ে কাপড় পরতে না পারায় তিনি আমাকে ভালভাবে কাপড় পরিয়ে দিলেন। আমার প্রতি তাঁর অশেষ কৃপার কথা আমি কোনদিন ভুলব না। কিছুক্ষণ পরে কলকাতার একটি মেয়ে দীক্ষা নেবে বলে একটি চেয়ার নিয়ে আমার কাছে বসল। তখন আমি ভাবছি, মহারাজ ঐ মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করতে বললে আমি কি বলব? পরমুহূর্তেই মহারাজ আমাদের পরিচয় করতে বললেন। তারপর মহারাজ তাঁর সেবককে দিয়ে আমার জন্য ফল, মিষ্টি ও ফুল আনতে বললেন। টেবিলে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি সাজানো ছিল। মহারাজ তাঁদের শ্রীচরণে ফুল দিতে বললেন। তিনি আরো বললেন ঃ "আমি উপলক্ষ্য মাত্র। ঠাকুরই সব। তাঁকে তোমরা প্রাণভরে সবকিছু জানাবে।" তারপর ঠাকুর ও মায়ের মন্ত্র ও প্রার্থনা লেখা একটা কাগজ আমাদের দিলেন। আমরা সেই লেখা পড়ে নিলাম। কিভাবে হাতে ও মালায় জপ করতে হয় তাও

শিখিয়ে দিলেন। গুরুদেব নিজে আমাকে একটা মালা দিয়ে হাতে ধরে সবকিছু শিখিয়ে দিলেন। এরপর তিনি আমাদের ফুল ও প্রণামী দিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বললেন। কিন্তু আমার প্রণামীর পয়সা ছিল না। তিনি উঠে আমার হাতে ৫ টাকা দিতে আমি প্রণাম করলাম। দীক্ষার পর সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময় একজন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসিনী আমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। পরে জানলাম, উনি গৌরী-মা।

নবমীর দিন আমার বাড়ি ফেরার পালা। গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁকে শুধু ভাল করে দেখছি ও কাঁদছি। তাঁর মুখে কোথায় তিল আছে, চুলগুলো কিভাবে পাকছে তাও নিরীক্ষণ করছি। আমার অবস্থা দেখে মহারাজ বললেন ঃ "তুমি আবার এখানে আসবে তো?" তখন আমি উত্তর দিলাম ঃ "হয়তো আর কোনদিন আসব না, কারণ আমার বাবার পয়সা নেই। তাছাড়া কেই বা আমাকে আনবে?" তিনি আবার বললেন ঃ "তুমি বাড়ি গিয়ে চিঠি দেবে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম ঃ "আমি চিঠি লিখতে শিখিনি।" এই বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনিও যতদূর দেখা যায় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার দীক্ষা নেওয়ার কিছুদিন পরেই শুনলাম মহারাজ দেহ রেখেছেন। ঐসময় আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাতদিন শুধুই তাঁর কথা চিন্তা করে কাঁদতাম। নিজের ওপর বেশ একটা ধিক্কার এসে গিয়েছিল। অকৃতি না হলে শেষের দিনে কেউ গুরুদেবকে ঐসব কথা বলে আসে না। তাঁর অসীম দয়ার কথা আমার সর্বদা মনে পড়ে। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে, বিপদে-আপদে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলেই তিনি আমার কথায় সাড়া দিয়েছেন।

একবার জপের সময় আমার মালা ঘোরানোর ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় তিনি স্বপ্নে আমাকে ঠিক করে দিয়েছেন। পরে আমি সনৎ মহারাজ (স্বামী প্রবোধানন্দ)-কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। আরেকবার তাঁর দেওয়া জপের মালা হারিয়ে যাওয়ায় মন খুব খারাপ হয়। তখন পরিতোষ মহারাজ (স্বামী সুতীর্থানন্দ) কাশী থেকে একটা মালা কিনে পাঠিয়ে দেন। তবু ঐ মালার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বছর দুই পরে নতুন ঘর হবে বলে পুরনো ঘরের মাটি নিজে কোদাল দিয়ে খুঁড়তে গিয়ে ঐ মালাটি একটি গর্তের মধ্যে খুঁজে পাই। তবে ১৫-২০টা দানা ইঁদুর কোথায় ফেলে দিয়েছে। এখন ৫৪টি দানায় মালা গেঁথে জপ করি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্রের কাগজটা নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ি। হঠাৎ মারা গেলে ঐ কাগজ অন্য কারোর হাতে পড়লে ক্ষতি হতে পারে। সেজন্য অনেক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা তা গঙ্গায় দিতে বলেন, কিন্তু আমি তা পারিনি। একবার পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এখানে দীক্ষা দিতে এলে তাঁকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ। ভাবলাম, তাঁকে কাগজখানা দিলে মন্দ হয় না। আবার কাগজটি হাতছাড়া হয়, তাতেও মনে সায় নেই। তবু তাঁরই হাতে কাগজটি দিলাম।

বিগত ২০০১ সালে কাঁকুড়গাছিতে পূজনীয় মহারাজের কাছে যাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ "আপনি কি আমার ঐ কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন?" তিনি বললেন ঃ "না, সেটি সযত্নে গুছিয়ে রেখেছি।" তবু যেন মনের মধ্যে খটকা লেগে রইল। হঠাৎ গত শিবচতুর্দশীর দিন ভোর ৪টের সময় গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বললেন ঃ "তোমার মন্ত্রের কাগজটা উপযুক্ত জায়গায় গেছে। মন খারাপ করো না।" এই বলে আরেকটা মন্ত্রের কাগজ তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি তা পড়েও দেখলাম। কিন্তু ঘুম ভাঙতে আর কোথাও দেখতে পেলাম না। এইভাবে প্রায়ই মাঝে মাঝে গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখতে পাই। এবারে তিনি আমাকে এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার থেকে টেনে নিলেই বাঁচি। শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ আমার গুরুদেব। ❑

● *স্বামী দুর্গাত্মানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত*

সমাধান ঃ শব্দচেতনা

পাশাপাশি ঃ (১) বিবেকানন্দ, (৪) সাজা, (৫) রমা, (৬) নয়, (৭) নাগ, (৮) নন্দ, (৯) মাধবানন্দ, (১৩) এল ও ভি ই, (১৪) আড্ডা, (১৫) শ্রীম, (১৮) ডাকা, (২০) পূজা, (২১) জিন, (২২) মনস্তাত্ত্বিক।

ওপর-নিচ ঃ (১) বিজ্ঞান, (২) নয়ন, (৩) প্রেমানন্দ, (৪) সান্ত্বনা, (৯) মানে, (১০) বাস্তু, (১১) তাও, (১২) তাই, (১৪) আশাপূর্ণা, (১৬) ময়ন, (১৭) চয়ন, (১৯) কার্তিক।

শব্দচেতনা (১৯)-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

শুভেন্দু চৌধুরী, অলক পাল চৌধুরী, মহাদেব নন্দী

আদি শঙ্করাচার্য

শিশু ও কিশোর বিভাগ

মহর্ষি ব্যাস ও মহর্ষি জৈমিনিকে দেখে আচার্য শঙ্কর তাঁদের প্রণাম করলেন। কিন্তু মণ্ডন মিশ্র শঙ্করকে দেখে ক্রুদ্ধ হলেন।

শঙ্করাচার্যের উত্তরের মধ্যে ছিল নির্ভেজাল রসিকতা।

আরো রেগে গেলেন মণ্ডন মিশ্র।
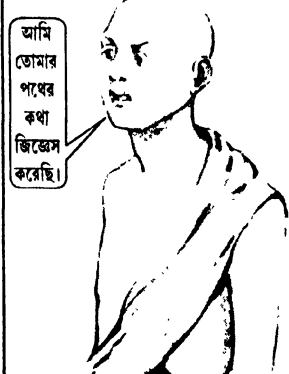
কেন, পথ কি আপনাকে কিছু বলেছে?

তোমার মাথা আর মুণ্ডু।

ঠিক তাই।

মণ্ডন মিশ্র ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে তিনি অসংলগ্নভাবে রূঢ় কথা বলতে লাগলেন। তাঁকে অত্যন্ত অহঙ্কারী ও কুরুচিবান বলেই মনে হলো। আচার্য শঙ্কর কিন্তু শান্তভাবে কথা বলছিলেন।

মণ্ডন মিশ্রের ব্যবহারে মহর্ষি জৈমিনি এবং মহর্ষি ব্যাসদেবও অসন্তুষ্ট হলেন। ব্যাস বললেন—

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

শঙ্করাচার্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে মণ্ডন তাঁকে পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন এবং তাঁকে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন।

প্রার্থনা

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
আমি চাই রাঙা দুই চরণ ছুঁতে সব প্রলোভন মিথ্যা মানি।
কাল পারাবার অসীম অপার, সবই যে মা, তোর রূপেরই আধার—
তোর ঐ অরূপের স্বরূপ চিনে জিনবো এবার জগৎখানি।
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
জীর্ণক্লিষ্ট কামনা অসার কেমনে হই মা, সে-সকল পার?
ঝরুক না তোর করুণা অপার যা ভরে দেয় হৃদয় জানি।
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
আসে ও যায় কজনে পায়, মার প্রকৃত রূপ দেখিতে?
রামকৃষ্ণ বলে—"মার শ্যামলে ডুবেই মায়েরে নে না চিনি।"
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
আজকে ও ভাই, আয়রে সবাই—আছিস যারা পাপী ও তাপী—
মায়ের চরণ করেই বরণ মৃত্যুরে বাঁধ শেকল আনি।
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
অমৃতপুত্ররূপে গো ছাড় মার প্রসাদে অন্ধকূপে—
মা যে মোদের সূর্যকলস জ্যোতির্ময়ী আলোকদানী!
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
মাতৃপূজার লাগি যদি যায় কভুও নিজের প্রাণ—
জানব মোরা পেলেম মুক্তি লভি মায়ের পরশমণি।
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
বলি—"মা, এই অধম সন্তানেরে নে গো তুলে অঙ্ক 'পরে—
দিসনে ঠেলে দূরে ফেলে, দেখব মা, তুই কেমন ধনী!"
আমায় ডুবিয়ে দে তোর শ্যামলরূপে ব্রহ্মময়ী ভবতারিণী!
আমি চাই রাঙা দুই চরণ ছুঁতে সব প্রলোভন মিথ্যা মানি।

প্রতিনিধি

সৈয়দ আনিসুল আলম

করুণাময়ের প্রতিনিধি তুমি
চিন্তা করেছ কি তোমার মান?
মেঘ থেকে উঁচু তব রাজপথ
জগতে পেয়েছ সেরা সম্মান।
বিশ্ব-ইতিহাসে মহত্ত্বের পথে
রচিয়াছ তব উজ্জ্বল মিনার।
বহু ঝটিকায় হয়নি অবসান
সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার।
সত্য প্রদীপের আলো জ্বেলে যাব
এই জীবনের প্রতিটি ক্ষণ
রেখে যাব মম প্রতি সাধনার
সোনালি আখরে অক্ষয় ধন।
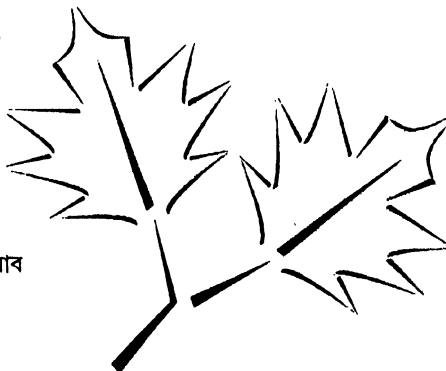
বাউল ফিরিয়া যায়

দিবাকর চক্রবর্তী

কবে সেই বৈরাগী বাউল
দেহদুখে জরজর প্রাণ,
নৈরাশ্যের অর্থহীন গান গেয়ে
ফিরে গেছে জরার নির্বন্ধ অতিক্রমী;
আরো দূর—কোন ঠাঁই
ঈপ্সিত শীতল আশ্রয়ে তার।

তার সেই সঙ্গীতের রাগ—
স্পর্শি গেছে যত বনফুলে,
তারি সাথে বিধূনিয়া তাই
প্রকৃতির হতে অব্যক্তের
যত মর্মকথা মহাগীতে—
ধ্বনিতেছে ধুলার ধরণীতে।

বাউল একাকী অনন্যমনা
প্রাবৃষ বসন্ত হিমে তাপে,
মুক্তির অব্যর্থ ছন্দ বাজে পায়;
নর্মবন্ধহীন তার আত্মার ভুবনে
যে-সঙ্গীত নিত্য উৎসারিছে,
সেই গীতে অঞ্জলি পুরিয়া
পরমেতে চলে উৎসর্গিতে!

যেথায় অনন্ত মৃত্যু জীবনসঙ্গীতময়,
কালজয়ী গহিন আঁধারে সেথা
আলোকের গৈরিক মুকুল
সঘন উৎসারে উন্মুখ;
আজন্ম বিবাগী জীবাত্মা সে
মুক্তিতৃষা-ব্যাকুল সে পথে—
অমৃতের সৌগন্ধে মিলায়।

আনন্দময়ী মা সারদা

বিদ্যুৎরেখা হাইত

স্বজন সুহৃদে কি হবে তাহার
আনন্দময়ী মা তুমি যার
তুমি যার চির আশ্রয় মাগো
যে করেছে তব চরণ সার।
অপরাজেয় মহাভাগ সে যে
যে হয়েছে তব স্নেহের ধন
বিশ্বভুবন বন্দে তাহারে
নাহি থাকে তার আকিঞ্চন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

সুনীলকুমার রুদ্র

তোমার মহাকর্ষে,
ঘোরাও মোর মতি—
যেন চলি বাকি জীবন।
তোমার কৃপাসুধায়
ভরাও এ মরুজীবন,
তব প্রেমবারিবর্ষণ।
জানি, মোর অযোগ্য আধার,
ভিক্ষা মাগি তোমার আশিস,
শুদ্ধ-পবিত্র কর এজীবন
তোমার নামগানে
যেন অবিচল থাকি,
শ্রদ্ধা-ভক্তির শতদলে।
কৃষ্ণ-রামের মাহাত্ম্য বিরাজ,
তব একাধারে—
কলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে।

ফিরে দেখা চাই

অশোক মুখোপাধ্যায়

অশান্ত পরিবেশে ক্লান্ত হয়েছে পান্থজন
তবু চলা, বিশ্রামের নেই অবসর।
আমৃত্যু বিষয়ভাবনা কেবল বাড়ায় যাতনা
চেতনার হয় না উদয়।
দুঃখে নীল হওয়া—শুধু নিজেকেই ভালবেসে।
অথচ একজন আছেন
যেজনের খোঁজ পেলে জুড়াবে হৃদয়,
শান্ত হবে অস্থির মন,
ভালবাসা উদার হবে সবারই মাঝে।
তাঁর খোঁজ পেতে গেলে
ফিরে দেখা চাই।

উজ্জয়িনী

শান্তিকুমার ঘোষ

আমার তিনকুড়ি বছর লেগে গেল
আজ এখানে পৌঁছাতে।
কবিতার রাজধানী, অন্তর্বাষ্প যাকে
ঘিরে ছিল একদিন... ভাবের কৈলাস।

এই শিপ্রা-নীরে আজও কি মুখ দেখেন
উমা-মহেশ্বর।

ভেঙে গেছে রাজসভা, নৈঃশব্দ্যের কেন্দ্র আজ,
কান পেতে শুনি তবু বাজে দিব্য গীতি।
মেঘ যায় ছায়া ফেলে শ্যামল-মেদুর
উপত্যকাময়।

তুমি সোপান বেয়ে পায়ে পায়ে
এস নেমে গর্ভগৃহে
রত্নদীপ হাতে,
হবে অন্ধকারে উদ্ভাসিত
দেবতা ভাস্বর।

রক্তের ভিতরে কণ্ঠস্বর

দিলীপ মিত্র

দেওয়াল ভাঙতে ভাঙতে
শুনতে পাই তাঁর কণ্ঠস্বর
খুঁজে পাই না তাঁকে,
কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারি,
আমার রক্তে তিনি আছেন মিশে,
ভাবের 'আমি'কে বলি দে,
নইলে সেই 'আমি'
অহঙ্কারের রাক্ষস হয়ে গিলে খেয়ে
তোকেও রাক্ষস সাজাবে,
স্বভাবের 'আমি'কে বলি দিয়ে
না হয় একটু অভাবেই রইলি
মাথা নত কর,
প্রিয়কে, শ্রেয়কে পাবি,
ধ্যানস্থ হয়ে যা নিজের কাছে!
চোখের সামনের দিবানিশির 'অহং',
মায়ায় ঘুরিস বধ্য পাঁঠার মতো,
মুখ থুবড়ে দেখিস নিজের রক্ত!
হাহাকার করিস, সব হারালাম বলে
চোখ বুজে বল, 'আমি'কে বিসর্জন দিলাম।
দেখবি, দুঃখ, হতাশা, 'আমি'র অহং-এর
অন্ধকারের গর্ভ থেকে ফুল হয়ে ফুটছে।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ ও কলকাতা

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতস্বাদিনী কথার নৈবেদ্য কিংবা ভক্ত-প্রাণের, তৃষিত জনের সঞ্জীবনীসুধা নয়—এই গ্রন্থ সমকালীন সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানেরও এক অমূল্য আকর। সমকালীন কলকাতার চালচিত্র কিভাবে ধরা পড়েছে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-এর দর্পণে, বর্তমান প্রবন্ধে সেই রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীম-র সাক্ষাৎকারের কয়েকটা বছরের দিনলিপি। মূলত দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতার প্রেক্ষাপটেই এই কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টি। সাহিত্যকে যদি ‘Social Institution’ বলে ধরা হয়, তাহলে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত’ অবশ্যই সেই ‘Social Institution’। আর তাই এই গ্রন্থটির মূল্য এত অপরিসীম।

এই মহান গ্রন্থের যিনি মূল চরিত্র সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল ‘শ্রীম’ অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথের। দক্ষিণেশ্বর এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনাস্থল হলেও এই গ্রন্থের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সমকালীন কলকাতা। কেননা ভক্তদের আমন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন।

কলকাতার যে-চিত্রটি ‘কথামৃত’-এ বিশেষভাবে ধরা পড়েছে তা হলো তৎকালীন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০-১৮৭৯ কালপর্বকে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজের গণ্যমান্য অনেকেই সেইসময় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস সরকার, ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মণি মল্লিক, উমানাথ গুপ্ত, হীরানন্দ, সৌরীন্দ্র ঠাকুর, নন্দলাল সেন, বেণীমাধব পাল এবং সর্বোপরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর ‘বাটীতে’ এবং উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে দেখতে গিয়েছিলেন। ‘কথামৃত’-এ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এইসব মনীষীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীম লিখেছেন ঃ “ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করেন।” শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় যোগাযোগের ফলে সমাজের অনেকের মধ্যেই একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে এক নতুন কেশবচন্দ্র জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁর ‘অনেক বদলে’ যাওয়ার খবর পাই এই ‘কথামৃত’-এ।

কেশবচন্দ্রের মতো আরো একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীম লিখেছেন ঃ “শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—দেখ, বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে।” অন্যত্র তিনি বলছেন ঃ “বিজয় এখন বেশ হয়েছে।... একেবারে সাষ্টাঙ্গ।”

নরেন্দ্রনাথেরও ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসেন, তখন

তাঁর মতবাদ গ্রহণে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে দুটি বাধা ছিল—অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস। অনুমান করা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ থেকেই এই সংস্কার তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবিশ্বাসের মূল ধীরে ধীরে শিথিল করে দেন। বলা যেতে পারে, নরেন্দ্রনাথকে জয়ের মধ্যেই হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ব্রাহ্মমুহূর্ত সূচিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের সব আচার-অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেননি। তাঁদের উপাসনা-পদ্ধতিতে ঈশ্বরের স্তুতি তাঁর মোটেই মনঃপূত হতো না। শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন ঃ "হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালীবাড়িতে) গিছিল। আমি বললুম তোমরা কিরকম নেকচার দাও, আমি শুনব। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হলো, আর কেশব বলতে লাগল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ—এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে।"

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি তাঁর পছন্দ হয়নি। শ্রীম-র ভাষায়—"তিনি জানতেন [উপাসনায়] মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন।"

রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে যে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন, ১৮২৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেটি ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরেন। কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও অন্যতম সহযোগী হয়ে ওঠেন। এসময় পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম কতিপয় শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেশবচন্দ্র তাঁর অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভার দ্বারা এই ব্রাহ্মধর্মকে সর্বসাধারণের মধ্যে এবং সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। কালক্রমে অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ, আচার্যপদে অব্রাহ্মণ নিয়োগ এবং খ্রিস্টধর্মানুরাগ নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রধান ব্রাহ্মনেতাদের তীব্র মতভেদ হয়। ফলে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে গিয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। এরপর ১৮৮৭ সালে কোচবিহারের রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এ ভাঙন ধরে। তাঁর অনুগামীরা অনেকেই (শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ) দলত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে ১৮৮০ সালে 'নববিধান' নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নন্দলাল বসুর বাড়িতে শুভাগমন করেন, তাঁর বাড়ির দেওয়ালে কেশব সেনের 'নববিধান'-এর ছবি দেখেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মূল্যবান সংবাদ রয়েছে 'কথামৃত'-এ ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবচন্দ্রের প্রতি)—'তুমি দল দল করছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।' কেশব বললে—'মহাশয়, তিনবৎসর এ দল থেকে আবার ও দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল।' " বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' তৈরি করে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সেসময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেখানে উপস্থিত। তাঁকে দেখে কেশব একটু অপ্রস্তুত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলছেন ঃ "তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ।"

ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত কোথায় অনুষ্ঠিত হতো, তারও বিস্তারিত তথ্য রয়েছে এই গ্রন্থে। সিমুলিয়ার ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮২ সালের জানুয়ারির

মহোৎসব। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ঠাকুর-পরিবারের অনেক ভক্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'কমলকুটীর'-এ কেশব সেনকে দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনকে তিনি প্রথম দর্শন করেন আদি ব্রাহ্মসমাজে, ১৮৬৪ সালে। শ্রীম-র কথায়—শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"আদি সমাজে সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পূজাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে আসতে পারে।"

১৮৮৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনের বাড়িতে 'নববৃন্দাবন' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র পওহারী বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
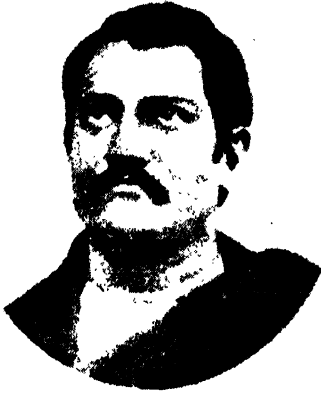
ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতির একটি চমৎকার বিবরণ রয়েছে 'কথামৃত'-এ—"ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদির ওপর আচার্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্যঋষির শ্রীমুখ-নিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম করিতে লাগিলেন।... পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রাহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল—ক্রমে উদ্বোধন, প্রার্থনা, উপাসনা। বেদিতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদি হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ... এইবার আচার্য প্রবন্ধপাঠ করিতেছেন।"

সমাজজীবনের সঙ্গে থিয়েটার, যাত্রাগান ইত্যাদির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। সেইসময় কলকাতার থিয়েটার, যাত্রাগান ইত্যাদির খবরও পাই 'কথামৃত'-এ। স্টার থিয়েটার সেই সময় বিডন স্ট্রিটে ছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা' দর্শনের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। দর্শকদের বসার আসনের বিশেষ শ্রেণি হিসাবে 'বক্স' ছিল। শ্রীম লিখছেন: "ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। অনেকগুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক একজন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ।"

'চৈতন্যলীলা' ছাড়া সেইসময় রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল—'নিমাই সন্ন্যাস', 'প্রহ্লাদ', 'বৃষকেতু' ও 'নববৃন্দাবন'। শ্রীরামকৃষ্ণ 'বৃষকেতু' অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন। এছাড়া 'বুদ্ধলীলা'র অভিনয়েরও খবর পাওয়া যায়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গিরিশ ঘোষের আমন্ত্রণে 'বুদ্ধলীলা'র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। স্টার থিয়েটার ছাড়া আরেকটি রঙ্গশালার উল্লেখ 'কথামৃত'-এ রয়েছে। সেটি হলো 'কোহিনূর থিয়েটার'। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ছাড়া 'নীলকণ্ঠের যাত্রা' খুবই বিখ্যাত ছিল। যদু মল্লিকের বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠের গান শুনে মুগ্ধ হন। যাত্রা এবং থিয়েটারের পাশাপাশি শম্ভু এবং রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান, নকুড় বাবাজীর গান, পান্না কীর্তনী ও কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণের গান সেসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপত্তি হ্রাস এবং হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে থাকে। সেইসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচার লক্ষিত হয়। নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, রাধিকা গোস্বামী, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের উল্লেখ 'কথামৃত'-এ পাই। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল এবং ভাগবৎ পাঠের প্রবণতাও লক্ষণীয়। এছাড়া বেদ-বেদান্ত, গীতা, মায়াবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদির ব্যাখ্যা এবং প্রচারও মানুষকে আকৃষ্ট করে। এসময় অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে যে 'থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তারও প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থিয়োজফিস্টদের অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসেন—একথাও আমরা 'কথামৃত'-সূত্রে জানতে পারি। সেইসময় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহের উল্লেখ রয়েছে 'কথামৃত'-এ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"যত লোক দেখি, ধর্মকর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সব পরস্পর ঝগড়া।"

সমাজে সুরাপান তখন খুবই প্রচলিত ছিল। কলকাতার একাধিক মানুষ যাঁরা 'কথামৃত'-এ উঠে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই পানাসক্ত ছিলেন। শ্রীম জানিয়েছেন—"সুরেন্দ্র কারণ পান করেন। আগে বাড়াবাড়ি ছিল, ঠাকুর সুরেন্দ্রের

অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন।" এর সঙ্গে 'বার্ডস আই', 'ইয়ার্কি', 'বাবুয়ানা', 'স্কুল পালানো', 'কুস্থানে যাওয়া' ইত্যাদিরও খবর রয়েছে।

এবারে সমাজজীবনের কিছু ঘরোয়া কথায় আসা যাক। তখনো ঘরে বৈদ্যুতিক আলোর সূচনা হয়নি। গ্যাসের আলোর চল ছিল, সেও ব্যবহৃত হতো সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর বৈঠকখানায় গ্যাসের আলো রয়েছে দেখলেন। তাছাড়া অনেকের বাড়িতেই আলোর জন্য গ্যাসের নল খাটানো ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় সাধারণত বসার জন্য কৌচ, কেদারা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। কেশব সেনের বৈঠকখানায় রাখা আসবাবগুলির মধ্যে এগুলির উল্লেখ রয়েছে। সামাজিক ভদ্রতায় তামাক এবং পানের রেওয়াজ ছিল সেসময়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হতো পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা, তানপুরা ইত্যাদি। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে নহবত বসত, সানাইয়ের প্রভাতী রাগে রোশনচৌকি শোনা যেত।

কলকাতার শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত যেসব তথ্যাদি আমরা 'কথামৃত'-এ পাই, তাদের মূল্যও কম নয়। এই গ্রন্থে ব্রাউটন ইনস্টিটিউশন এবং বৌবাজার স্কুলের কথা আছে। বৌবাজার স্কুলে বিদ্যাসাগর দিনকতক হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করেছিলেন। সেসময় স্কুলের পাঠ্যসূচীতে 'Merchant of Venice', 'Comus', 'Buckie's Self-culture' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব বই যে খুব উঁচু ক্লাসে পড়ানো হতো, তা সহজেই অনুমেয়। শ্রীম লিখেছেন ঃ "মাস্টারমশায় এইসব বই পড়িতেছেন। পড়া তৈয়ার করিতেছেন। স্কুলে পড়াইতে হইবে।" এই বইগুলির নামের মধ্য দিয়ে সমকালীন শিক্ষার মান কেমন ছিল সেবিষয়ে আমরা ধারণা করতে পারি। এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া জেনারেল অ্যাসেম্বলি, ভিক্টোরিয়া কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, মিউজিয়ামের কথাও রয়েছে এখানে। রয়েছে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের কথাও। কর্নেল অলকট সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে ৩২,৫০০ টাকা দান করেছেন—এই তথ্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব যে সত্যিকারেরই উৎসব ছিল তার মূল্যবান বিবরণও রয়েছে 'কথামৃত'-এর পাতায়। 'লোকে লোকারণ্য'—এই কথাটি বিদ্যাচর্চার প্রতি মানুষের মনে যে সত্যিকারের শ্রদ্ধার ভাব ছিল, তারই ইঙ্গিত বহন করে।

সেই সময়কার আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো—হ্যামিল্টন, বার্কলে, হার্বার্ট স্পেন্সার, টিণ্ডেল, হাক্সলি প্রমুখ বিদেশী দার্শনিকদের মতবাদ এবং চিন্তাধারা মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা মানুষের চিন্তার জগতে যুক্তিবাদ এবং বিচার-প্রবণতা লক্ষ্য করি। সহজ ভক্তিবাদ, অবতারবাদ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা হচ্ছে। 'কথামৃত' থেকে উদ্ধৃত করা যাক—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—ঈশ্বর অবতার হতে পারেন—একথা যে ওঁর [ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার] সায়েন্স-এ (ইংরেজি বিজ্ঞানশাস্ত্র) নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?"

এবারে অন্য এক আসরে প্রবেশ করা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন খেলার মাঠে অর্থাৎ গড়ের মাঠে। উদ্দেশ্য বেলুন ওড়ানো দেখবেন। সেসময় গড়ের মাঠে কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে বেলুন ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল। বহু লোক এই অনুষ্ঠান দেখতে আসত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে এই খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ও চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সংবাদও আমরা 'কথামৃত'-এ পাই।

১৮৮২ সালের ১৫ নভেম্বর শ্রীম লিখছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণির টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপর বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, 'বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায়'।" 'উচ্চস্থান' বলতে গ্যালারির কথাই বলা হচ্ছে। সাধারণত সার্কাসে সেসময় কি ধরনের খেলা দেখানো হতো, তারও খবর পাই আমরা—"রঙ্গস্থলে নানা রূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখান হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার রিং (চক্র)। রিংয়ের কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিংয়ের নিচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রিংয়ের মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্‌বন্‌ করিয়া ঐ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও আবার ঐরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া।"

খেলার আসর থেকে আসা যাক রসনার জগতে।

'বড়বাজারের রং করা সন্দেশ', 'ফাগুর দোকানের কচুরি' নিঃসন্দেহে আমাদের রসনার উদ্রেক করে।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজী—এই দুই চিকিৎসারই সেসময় বেশ চল ছিল। ঠাকুরের গলার অসুখের জন্য এই তিন মতেই চিকিৎসা করানো হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি

কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর হোমিওপ্যাথির প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। শ্রীম লিখেছেন ঃ "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একটু ভাল আছেন।"

কলকাতায় সেসময় যেসব প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন, যেমন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল, ডাঃ দুর্গাচরণ, ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাঃ ভগবান রুদ্র—এঁদের সবারই উল্লেখ রয়েছে 'কথামৃত'-এ।

সমকালীন কলকাতার বিভিন্ন কর্মসংস্থা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু সংবাদ উল্লেখ করা যাক। এদের মধ্যে রয়েছে কম্পট্রোলার জেনারেলের অফিস, বরানগর ওয়ার্কিং ম্যান্স ইনস্টিটিউট, ম্যাকেঞ্জি নয়ানের এক্সচেঞ্জ নামক নিলামঘর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিস ইত্যাদি। এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও টাউন হল-এর উল্লেখ রয়েছে। এখানে বক্তৃতা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হতো।

'কথামৃত'-এ কেবল সমকালীন কলকাতার চিত্রই যে ধরা পড়েছে, তা নয়। তৎকালীন সমাজজীবনের খুঁটিনাটি নানা তথ্য এ-গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাই। 'কথামৃত'-এ বিদ্যাসাগরের যে-পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, সমকালীন পটভূমিকায় তার গুরুত্ব ততখানি বিবেচিত না হলেও এর একটা সামাজিক মূল্য আছে। শ্রীম লিখেছেন ঃ "টেবিলের উপর যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হইবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার [কারমাটার] চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরিব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছেন না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন—আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহবা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।"

সেসময় মধ্যবিত্ত মানুষদের সংসারব্যয় নির্বাহ করতে কিরকম খরচা হতো, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কিরকম ছিল—এসব মূল্যবান তথ্যও আমরা এখানে পাই। পাই বিভিন্ন পেশার কথা। শ্রীম লিখেছেন ঃ "অধর ডেপুটি, তিনশত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালেটির ভাইস চেয়ারম্যানের কর্মের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন—মাহিনা হাজার টাকা। কর্মের জন্য অধর কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।" 'কথামৃত'-এ আরেকজন ডেপুটির উল্লেখ রয়েছে। কেশব সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 'নববৃন্দাবন' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"দেখলাম একজন ডেপুটি ৮০০ টাকা মাহিনা পায়।" দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম ব্যক্তির বেতনের এই তারতম্যকে আমরা সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারি। অধর সেন চাকুরিতে নবীন। দ্বিতীয় ব্যক্তি (নামোল্লেখ হয়নি) চাকুরিতে প্রবীণ।

সেকালে রাজেন্দ্র মিত্র বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়েছিলেন। বেতন পেতেন ৮০০ টাকা। সেসময় এম. এ. পাশ করা একজন ব্যক্তি কি চাকরি করতেন, তার উল্লেখ নেই। তবে তিনি তিন-চারশো টাকা মাইনে পান, তার উল্লেখ রয়েছে। এই ব্যক্তির নাম মনমোহন চৌধুরী। তিন-চারশো টাকা মাইনের কর্মচারীরা সমাজে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলেই গণ্য হতেন। সেসময় একজন ইংরেজের হাওয়ানদারের বার্ষিক ছ-হাজার টাকা বেতন ছিল। হাওয়ানদারের পদটি যে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল, সমকালীন বিচারে বেতনের অঙ্কই তার প্রমাণ।

'কথামৃত' সমকালীন সারস্বত সমাজের মূল্যবান দলিল। ইতিপূর্বে এইরকম গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়েনি। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এবারে সমাজের সর্বস্তরের সুধীজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র

ঘোষ, জোসেফ কুক, পদ্মলোচন (বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত), বলরাম বসু, অধরলাল সেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (নেপালের রাজার উকিল ও রাজপ্রতিনিধি), যদুলাল মল্লিক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামচন্দ্র দত্ত, দয়ানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, কর্ণেল অলকট, রানী ভবানী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নটী বিনোদিনী, অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবচরণ (পণ্ডিত), নারায়ণ শাস্ত্রী, জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে, সুরেশ মিত্র, জয়গোপাল মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র, মনমোহন চৌধুরী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, রাধিকা গোস্বামী এবং আরো অনেকে।

অমৃতের সাগর 'কথামৃত'। রত্নের আকরও 'কথামৃত'। সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজজীবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহশালাও এই গ্রন্থটি। সেকালের কলকাতার ওপর গবেষণা করলে এই গ্রন্থটির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। ভবিষ্যতে হয়তো কোন আগ্রহী 'কথামৃত'-পাঠক এবিষয়ে দৃষ্টি দেবেন—এই আশা করা যায়। ❑

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

শব্দচেতনা ২১

শিব সম্বন্ধীয় স্তোত্র ও গান অবলম্বনে

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ স্তবকুসুমাঞ্জলি, সঙ্গীত সংগ্রহ)

■	১	■	২			৩		■	৪
৫		■		■	■		■	৬	
	■	৭	■	৮	৯		■		■
■	■	১০		■		■	■	■	১১
১২	১৩	■	■	■	১৪		■	১৫	
১৬		■	১৭	১৮	■	■	■	১৯	
	■	■	■		■	২০	২১	■	■
■	২২	■	২৩			■		■	২৪
২৫		■		■	■	২৬	■	২৭	
	■	২৮					■		■

পাশাপাশি ঃ (২) উত্তর ভারতের শিবক্ষেত্র (৫) শিব-মস্তকে শোভা পায় (৬) মৃত্যুরূপী শিব (৮) —— দেবার্চিত-শেখরায় (শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্) (১০) শিবানুচর (১২) এই বাদ্য শিবের প্রিয় (১৪) এটি গায়ে মাখতে ভালবাসেন শিব (১৫) বাণেশ্বরান্ধকরিপো ——লোকনাথ (শিবনামাবল্যষ্টকম্) (১৬) —— শিব শঙ্কর হর ত্রিপুরারি (শিবগীতি) (১৭) পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধম্ —— (শিবমহিম্নঃস্তোত্র) (১৯) তদপি —— গুণানাম্ ঈশ... (শিবমহিম্নঃস্তোত্র) (২০) শিবের গাত্রবর্ণ (২৩) ——ধ্বজ মত্তমাতঙ্গহরং (শিবাষ্টকস্তোত্রম্) (২৫) যে নার্চিতং ——মপি প্রণমন্তি চান্যে (শিবপ্রদোষস্তোত্রাষ্টক) (২৭) —— মালা গলে বিরাজে (শিবগীতি) (২৮) ——রঞ্জিতসম্মুকুটং (শিবাষ্টকস্তোত্রম্)।

ওপর-নিচ ঃ (১) এই শিবক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্র আছে (২) যদ্যদ্ বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে —— বক্তুম্ (শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্) (৩) ——হারায় ত্রিলোচনায় (শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্) (৪) শিবের প্রিয় ফল (৫) প্রমত্তং ——সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং (বাণেশ্বর শিবের ধ্যানমন্ত্র) (৬) এঁর চরণতলে বুক পেতেছিলেন শিব (৭) —— অপমান সমান তো তার (শিবগীতি) (৯) শিবকণ্ঠের বর্ণ (১১) শিবের নামে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ (১২) শিবের উৎসব (১৩) ক্রুদ্ধ হলে শিব এটি করেন (১৫) অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো ——ধিয়ঃ (শিবমহিম্নস্তোত্র) (১৮) শিবধনু (২১) শিব ঘুচাও আমার মনের —— (শিবগীতি) (২২) যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ —— নিমজ্যামৃতময়ে (শিবমহিম্নঃস্তোত্র) (২৩) শিবের একটি নাম (২৪) শশধর তিলক —— (শিবগীতি) (২৫) হে ব্যোমকেশ —— কণ্ঠ গণাধিনাথ (শিবনামাবল্যষ্টক) (২৬) পর——করণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং (শিবস্তোত্রম্) (২৭) এর চর্মেই শিবের আসন নির্মিত।

শিশির রায়

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

নিন্দুকেরা যাই বলুন, পরিসংখ্যান কিন্তু সত্যনির্ভর

বিশ্বনাথ দাস

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে স্নাতক স্তরের জনৈক ছাত্র যখন রাশিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করার কথা ভেবেছিল, তখন তার শুভানুধ্যায়ীরা শুনে প্রায় আঁতকে উঠে বলেছিল : এত বিষয় থাকতে শেষকালে কিনা রাশিবিজ্ঞান, ডিজরেলি যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন 'নিকৃষ্টতম মিথ্যা' বলে! বেচারা বরং আরেকবার ভেবে দেখুক ভাল করে।

কৌতূহলবশত ডিজরেলির সঠিক উক্তিটি সে খুঁজে বের করেছিল : "There are three kinds of lie—lie, damned lie and statistics!" (মিথ্যা তিন ধরনের—মিথ্যা, নির্জলা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান!) কিন্তু শেষপর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীদের এই পরামর্শ ছাত্রটির শোনা হয়ে ওঠেনি। এখন তার মনে হয়, ভাগ্যিস হয়নি! হলে বিজ্ঞানের এই অসীম সম্ভাবনাময় শাখাটির গভীরে প্রবেশ করার, এর অনুপম সৌন্দর্য আস্বাদন করার সুযোগ হয়তো কোনদিন পাওয়া যেত না। এবং জানাও যেত না—বিজ্ঞানের নানান শাখায় গবেষণা, রাজ্যশাসন, শিল্পোৎপাদনে গুণমান, সংরক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন, জনমত অথবা বাজার-চাহিদা সমীক্ষা ইত্যাদি নানান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাশিবিজ্ঞানের এত কদর সত্ত্বেও কেন এর এত নিন্দন।

পরিসংখ্যান আসলে একখানা ধারালো অস্ত্রের মতো—সুফল পেতে হলে এর সঠিক ব্যবহার জানা চাই। একজন অভিজ্ঞ এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ একখানা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মানুষের কল্যাণে অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারে। আবার সেই অস্ত্রই যখন একটি ছোট ছেলে অথবা অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন কারো হাতে পড়ে, তখন ঘটতে পারে নানান অঘটন—দু-চারটি দামি চারাগাছ বিনষ্ট হতে পারে অথবা অকারণ খুনজখম হয়ে যেতে পারে। পরিসংখ্যানও সেইরকম। ঠিকমতো ব্যবহার জানলে সত্যপ্রতিষ্ঠায় এর জুড়ি মেলা ভার। অথচ এর অপপ্রয়োগে নানান বিপত্তি।

ইংরেজি 'Statistics' কথাটির বাঙলা প্রতিশব্দ দুটি। যেকোন ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যরাশিকে বলা হয় 'পরিসংখ্যান'। যেমন আমরা বলি—জনসংখ্যা, খাদ্যোৎপাদন, বহির্বাণিজ্য, বাজারদর ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। আর এইসব তথ্য সংগ্রহ, উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যানের নানা বিধি ও পদ্ধতি নিয়ে কারবার বিজ্ঞানের যে-শাখাটির, তার নাম 'রাশিবিজ্ঞান'।

আসলে পরিসংখ্যান তথা রাশিবিজ্ঞানের কপালে এত বড় একটা বদনাম জুটে যাওয়ার প্রধান কারণ—অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যরাশি সংগ্রহের সময় সংগ্রাহকের পর্যাপ্ত নিষ্ঠা, সততা, সতর্কতা, বাস্তববুদ্ধি এবং দক্ষতা থাকে না। ফলস্বরূপ যে-পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্রের বদলে একটি ভ্রান্ত বা বিকৃত চিত্র দেখি। এধরনের ভুলে ভরা তথ্যরাশি থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তও বাস্তবের ধারে কাছে যায় না। (আগেকার দিনের আবহাওয়া বা খাদ্যোৎপাদন সংক্রান্ত পূর্বাভাস স্মর্তব্য) ফল, সেই বদনাম!

অবশ্য সংগৃহীত তথ্যরাশি যথাসম্ভব নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হলেও যে নিস্তার আছে তা নয়। জনমানসে পরিসংখ্যান এবং নির্জলা মিথ্যা সমার্থক হয়ে ওঠার আরেকটা বড় কারণ—অনেক সময় আমরা অপ্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করি অথবা পরিসংখ্যান ব্যবহার করি ভুল পরিপ্রেক্ষিতে। এর ফলে নানারকম বিপত্তি দেখা দেয়। এইসব ভুল কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয় (misuse or abuse of statistics), কখনো আবার ঘটে যায় অনিচ্ছাকৃতভাবে, সচেতনতা অথবা অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত

কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনের ফলাফল বেরতে একজন ছাত্রনেতা পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে হতাশা এবং বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন : এরকম পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনের কোন মানে হয়? জেনারেল সেক্রেটারি-পদে যে মহিলা-প্রার্থীটি জিতেছে, মেয়েদের ৯২ শতাংশই ভোট দিয়েছে তাকে! এটা একটু সুষ্ঠু নির্বাচন হলো?

আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রটির বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে মনে হলেও একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, নির্বাচনে পক্ষপাতের অভিযোগ আনার আগে পাশাপাশি দেখা দরকার, ছেলেদের কত অংশ ঐ মহিলা-প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। যদি দেখা যায়, ঐ প্রার্থীকে ছেলেদের দেওয়া ভোটের শতকরা হারও ৯২-র কাছাকাছি, তাহলে বুঝতে হবে ঐ মহিলা-প্রার্থী সত্যিই যোগ্য, অর্থাৎ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অবান্তর। আর ঐ প্রার্থীকে দেওয়া ছেলেদের

ভোটের হার যদি তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়—যেমন ২০ শতাংশ বা আরো কম, তাহলে অবশ্য এ অভিযোগ উঠতে পারে। অথবা বলা যেতে পারে ভোট ন্যায়সঙ্গত হয়নি। অসম্পূর্ণ তথ্যরাশি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া বা করার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

অসম তুলনা

একটি শহরে সারা বছরে মোটরগাড়ির ছোট-বড় মোট ৮২০টি দুর্ঘটনার মধ্যে দেখা গেল, পুরুষ গাড়িচালকরা ঘটিয়েছে ৭৭৯টি (৯৫%), আর মহিলা গাড়িচালকরা মাত্র ৪১টি (৫%)। এথেকে সিদ্ধান্তে আসা হলো, মোটরগাড়ির চালক হিসাবে ঐ শহরের পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অনেক, অনেক বেশি দক্ষ!

সত্যিই কি তাই? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, দুর্ঘটনার সংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা গাড়িচালকদের শতকরা অংশ নয়, এখানে তুলনীয় হবে সমপরিমাণ (যথা—প্রতি হাজার কিলোমিটার) গাড়ি চালানোয় এই দু-শ্রেণির চালকদের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার গড় সংখ্যা, কেননা মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা সাধারণত অনেক বেশি পরিমাণে গাড়ি চালায়। ঐ শহরে সেবছর যদি পুরুষ ও মহিলা চালকরা যথাক্রমে ২,৫৮৫ ও ৪৫ হাজার কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছিল ধরা যায়, তাহলে প্রতি হাজার কিলোমিটারে দুর্ঘটনার গড় সংখ্যা দাঁড়াবে পুরুষদের ০.৩০১৪টি এবং মহিলাদের ০.৯১১১টি। আপেক্ষিক দক্ষতার বিচার করার জন্য এই দুটির মধ্যে তুলনা করতে হবে এখানে—মোট সংখ্যার বিচারে ৯৫% ও ৫%-এর মধ্যে নয়। কত জন পুরুষ ও কত জন মহিলা গাড়িচালক আছে সেটিও ধর্তব্য।

শতকরা হারের ভুল ব্যবহার

একটা স্কুল থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২৮ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, আর অন্য আরেকটি স্কুল থেকে ১৭ জন। সুতরাং দ্বিতীয় স্কুলটি থেকে প্রথমটি অনেক ভাল—চট করে এরকম সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়, এটা আমরা সাধারণত খেয়াল রাখি না। কেননা দুটি স্কুলের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য থাকতে পারে বলে এখানে তুলনীয় হবে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণদের শতকরা হার। কিন্তু আর সবকিছু উহ্য রেখে যদি শুধুমাত্র শতকরা হারের উল্লেখ করা হয় তাহলেও যে একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠতে পারে, এটা আমরা মনে রাখি না। যেমন ধরা যাক, বলা হলো—অমুক স্কুলের শতকরা ৫০ জন শিক্ষিকাকে ছাত্রছাত্রীরা খুব অপছন্দ করে। আপাতদৃষ্টিতে তথ্যটি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যদি মাত্র দুজন শিক্ষিকা হন? কোন একজন শিক্ষিকাকে ছাত্রছাত্রীরা পছন্দ নাও করতে পারে, এটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এবং ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের ৫০ শতাংশ জনপ্রিয় নন, তথ্যের দিক থেকে এতেও কোন ভুল নেই। তবে এখানে পাশাপাশি শিক্ষিকাদের মোট সংখ্যার উল্লেখ না থাকলে শুধুমাত্র শতকরা হার বিভ্রান্তি ঘটাতে বাধ্য।

পরিবর্তনশীল গোষ্ঠী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

একটি কলেজের প্রাক্তনী সংসদের সদস্যদের গড় বয়স ১৯৯১ সালে ছিল ৪২.২ বছর, আর ২০০২ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৯.৮ বছরে। রাশিবিজ্ঞানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পরম উৎসাহী একজন এই তথ্য দেখিয়ে বললেন : তাহলে রাশিবিজ্ঞানে আস্থা রাখতে হলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এই এগারো বছরে সদস্যদের বয়স গড়ে ২.৪ বছর করে কমেছে! যত সব গাঁজাখুরি ব্যাপার!

পরিসংখ্যান-দুটিতে চোখ রাখলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে হবে, এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কারো বয়স তো আর সত্যি সত্যি কমে যেতে পারে না! কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, আলোচ্য দুটি বছরে প্রাক্তনী সংসদের গঠন এক নয়। ১৯৯১-এ জীবিত ছিলেন এমন বেশ কিছু বয়স্ক সদস্য ২০০২-এ হয়তো মারা গেছেন এবং ১৯৯১-এর পর সংসদে যোগ দিয়েছেন অনেক অল্পবয়সী সদস্য। ফলে সদস্যদের গড় বয়স ১৯৯১-এর তুলনায় ২০০২-এ কমে যেতেই পারে, এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

সংজ্ঞা বিভ্রাট

সংজ্ঞার হেরফেরে দুপ্রস্থ তথ্যরাশির মধ্যে তুলনা করা হলে ভুল চিত্র পাওয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯৯১-এর আদমশুমারিতে কলকাতা ও মুম্বাই শহরের জনসংখ্যা দেখানো হলো যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ এবং ৯৯.২৬ লক্ষ। দেখে মনে হবে, কলকাতার তুলনায় মুম্বাইয়ের জনসংখ্যা সত্যিই বুঝি অনেক বেশি। কিন্তু আসল তথ্য হলো, প্রথমটি শুধুমাত্র কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৃহত্তর মুম্বাইয়ের। স্পষ্টতই শহরের সংজ্ঞা দুটি ক্ষেত্রে এক নয় এবং সেটার উল্লেখ না থাকলে বিভ্রান্তি ঘটতে বাধ্য।

গড় মানই সব নয়

এক গ্রীষ্মের দুপুরে তিনটি ছোট-বড় ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এসেছেন নদীর ঘাটে, যেতে হবে ওপারে। নৌকা নেই। ঘাটের ধারে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে, বছরের ঐসময় ঘাট বরাবর ওপারে যাওয়ার পথে নদীর গড় গভীরতা ৩ ফুট ২ ইঞ্চি। একটু-আধটু রাশিবিজ্ঞান জানা ছিল পরিবারের কর্তার, তাঁর হিসাবে পরিবারের

পাঁচ সদস্যের গড় উচ্চতা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি—সুতরাং সবাই মিলে হেঁটে নিরাপদে ওপারে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়। অতএব নেমে পড়া গেল জলে। ফল কী হলো, সহজেই অনুমেয়!

আসলে কোন চলরাশি একপ্রস্থ মানের গড় ঐ মানগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারলেও সেটাই সব নয়—মানগুলির পরস্পরের মধ্যে কী পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে, সবচেয়ে ছোট মানটি কত, সবচেয়ে বড়টিই বা কত—এসবও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে 'রাশিবিজ্ঞান-মনস্ক' পরিবারের কর্তাটির খেয়াল রাখা উচিত ছিল, নদীপথের গড় গভীরতা এবং দলের সদস্যদের গড় উচ্চতা নয়, ঐ ঘাট বরাবর নদীর সর্বাধিক গভীরতা এবং দলের পাঁচ সদস্যের সবচেয়ে ছোটটির উচ্চতা—এক্ষেত্রে এদুটিই কেবল প্রাসঙ্গিক তথ্য। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, যদি প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি বড় হতো, একমাত্র তাহলেই ঐ দলের সকলের পক্ষে নিরাপদে নদী পেরনো সম্ভব হতো।

পক্ষপাতদুষ্ট নমুনার ব্যবহার

রাশিবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, কোন বড় পূর্ণক (population) থেকে ছোট একটি উপযুক্ত নমুনা (sample) নিয়ে সেই নমুনালব্ধ তথ্য কাজে লাগিয়ে পূর্ণকটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করা। এতে সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচে। যেমন কলকাতা শহরে ৭৫০টি পরিবারের একটি নমুনা সমীক্ষা করে দেখা গেল, ঐ নমুনায় পরিবারপিছু গড় সদস্যসংখ্যা ৪.২ এবং গড়ে ৪৭ শতাংশ পরিবারে টিভি আছে। নমুনাটি সঠিকভাবে নেওয়া হলে এথেকে বলা যাবে, সারা কলকাতা শহরে পরিবারপিছু গড় সদস্যসংখ্যা ৪.২-এর কাছাকাছি এবং শহরে টিভি ব্যবহার করা পরিবারের শতকরা হার মোটামুটিভাবে ৪৭। তবে এই পদ্ধতিটি কার্যকর হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হলো, নমুনাটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ণকের প্রতিনিধিস্থানীয় (representative) হতে হবে। এই শর্ত সবসময় সঠিকভাবে মানা হয় না, কখনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে, কখনো আবার অসতর্কতাবশত। ফলে দেখা দেয় নানারকম বিপত্তি। দু-একটা উদাহরণ দেখা যাক।

লোকসভায় তুমুল বিতর্ক চলছে দেশে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ঘোষণা করতে চাওয়া একটি বিলের ওপর। বিরোধী পক্ষের এক সদস্য তাঁর বক্তৃতায় চমকপ্রদ পরিসংখ্যান তুলে ধরে সভায় আলোড়ন ফেলে দিলেন। তিনি দাবি করলেন, দেশের সবকটি প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে ১,০০০ জনের একটি নমুনা সমীক্ষা করে দেখেছেন, এই ১,০০০ জনের মধ্যে ৯১২ জনই মদ্যপান বেআইনী ঘোষণা করার বিপক্ষে! ১,০০০ আয়তনের নমুনাটি নেহাত ছোট নয়, এতে আবার সবকটি রাজ্যের প্রতিনিধিও রয়েছে—যার মধ্যে ৯১.২ শতাংশই বিলটির বিপক্ষে! সদস্যরা নড়েচড়ে বসলেন—এতখানি প্রবল জনমত যখন বিপক্ষে, বিলটি পাশ হওয়ার তো কোন যুক্তিই নেই। সভার হাওয়া যখন এইভাবে প্রায় পুরোপুরি ঘুরে গেছে, সরকার পক্ষের এক সদস্য সেইসময় চেপে ধরলেন—নমুনাটি কীভাবে নেওয়া হয়েছে, যারা মতামত দিয়েছে তাদের মদ্যপান-সংক্রান্ত অভ্যাস কীরকম—এসব খুলে বলতে হবে। প্রথমোক্ত সদস্যটিকে এরপর কবুল করতে হলো, তিনি যাদের মতামত নিয়েছেন তাদের সকলেই তাঁর মতো কম-বেশি মদ্যপানে আসক্ত!

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নমুনা নিয়ে কার্যসিদ্ধি করার অপচেষ্টার উদাহরণ এটি। অনেক সময় অবশ্য অসাবধানতাবশত আমরা ভুল নমুনা নিয়ে ফেলি। যেমন, কলকাতার চারটি বড় সরকারি হাসপাতালের শিশুবিভাগের আউটডোরে আসা ২,৫০০ শিশুকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসা হলো যে, শহরের ৪১ শতাংশ শিশুই অপুষ্টির শিকার। তথ্যটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, বাস্তব অবস্থা এতখানি খারাপ হওয়ার কথা নয়। কারণ, পরীক্ষিত নমুনাটি মোটেই সারা শহরের সবশ্রেণির শিশুদের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। শহরের সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে সাধারণত দরিদ্র পরিবারের লোকেরাই আসে শিশুদের নিয়ে, তাও আবার এই শিশুরা কোন কারণে অসুস্থ হলে তবেই। সুতরাং গৃহীত নমুনাটি বড়জোর শহরের দরিদ্রশ্রেণির অসুস্থ শিশুদের একটি নমুনা হতে পারে, শহরের সব শিশুর নয়। এবং একথাও সকলেরই জানা, দরিদ্র এবং অসুস্থ শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার প্রকোপ অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

কৃত্রিম সহগতি

কোন শহরের টেলিফোন গ্রাহকদের সংখ্যা এবং সেখানে ডাকাতি-রাহাজানির সংখ্যা সংক্রান্ত পরপর কয়েক বছরের তথ্যের ওপর চোখ রাখলে (এবং অঙ্ক কষেও) দেখা যাবে, সংশ্লিষ্ট চল-দুটির মধ্যে জোরালো ধনাত্মক সহগতি (positive correlation) রয়েছে (একটি বাড়লে অন্যটিও সাধারণভাবে বাড়ে—এই অর্থে)। এথেকে একজনের তির্যক মন্তব্য ঃ পরিসংখ্যান বিশ্বাস করলে, টেলিফোনের গ্রাহকসংখ্যা কমিয়ে ফেলতে পারলেই এখানে ডাকাতি রাহাজানি কমে যাবে! কী চমৎকার দাওয়াই!

আসলে দুটো চলের মধ্যে সহগতি রয়েছে দেখা গেলে তাদের মধ্যে যেমন কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে,

তেমনি চল-দুটির ওপর এক বা একাধিক চলের প্রভাবের দরুনও তাদের মধ্যে আপাত সহগতি পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই সহগতিকে বলা হবে 'কৃত্রিম সহগতি'। আমাদের আলোচ্য উদাহরণেও চল-দুটির মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম সহগতি। অন্য চল, যা এদুটিকে প্রভাবিত করছে তা হলো 'সময়' (সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুটোই বাড়ছে —এই অর্থে)। সুতরাং এখানে আপাত সহগতি থেকে কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজাটাই বোকামি। সম্ভাব্য অন্যান্য চলের (বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগ করে এদের চিনতে হবে) প্রভাবমুক্ত হওয়ার পরও যদি দুটি চলের মধ্যে সহগতি রয়েছে দেখা যায়, তবেই তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার কথা ভাবা যাবে।

পরীক্ষণের ভ্রান্ত পরিকল্পনা

ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ানোর একটি প্রকল্প চালু হয়। একসময় প্রস্তাব ওঠে, প্রকল্পটি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে কতখানি সহায়ক হচ্ছে খতিয়ে দেখা হোক। চিকিৎসক, পুষ্টিবিদ, রাশিবিজ্ঞানী, সরকারি আমলা প্রভৃতিদের নিয়ে গড়া হয় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। কমিটি ঠিক করে, সারা দেশ থেকে ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি নমুনা নেওয়া হবে। নতুন শিক্ষাবর্ষে এইসব বিদ্যালয়ে যে ছাত্রছাত্রীরা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হবে, তাদের অর্ধেককে এই দুগ্ধ-বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে, বাকি অর্ধেককে রাখা হবে এই প্রকল্পের বাইরে। প্রকল্পটি একবছর চলার পর এই দুদল ছাত্রছাত্রীর ওজনের গড় বৃদ্ধি তুলনা করে বিচার করা হবে প্রকল্পটি শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে আদৌ সহায়ক কিনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী নমুনায় আসা ১২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রীর দুবার করে ওজন নেওয়া হলো—একবার বছরের শুরুতে, আরেকবার প্রকল্পটি একবছর চলার পর। প্রত্যেকের জন্য এই একবছরের ওজনবৃদ্ধির পরিমাণ হিসাব করা হলো। মজার কথা, দেখা গেল এই একবছরে যারা দুধ পেয়েছে এবং যারা পায়নি তাদের ওজন গড়ে বেড়েছে যথাক্রমে ১.৭ কেজি ও ২.৬ কেজি! কোথাও ভুল হয়ে থাকতে পারে ভেবে আবার নতুন করে সব অঙ্ক কষা হলো—কিন্তু ফলাফল বদলাল না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দেওয়া হলো, দ্বিতীয় গড়টি প্রথম গড়ের তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে তো বটেই, রাশিবিজ্ঞানসম্মতভাবেও যথেষ্ট বেশি! তাহলে কি এই দুধ খাওয়ানোর প্রকল্পটি শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক? কমিটির সদস্যরা ভালরকম বিব্রত। সন্দেহের আঙুল উঠল রাশিবিজ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যতার দিকে।

এই অবিশ্বাস্য ফলাফলের কারণ খুঁজতে গিয়ে কমিটির রাশিবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ সদস্যটির একসময় খেয়াল হলো—আরে, প্রকল্পটির জন্য ক্লাসের অর্ধেক ছাত্রছাত্রী কিভাবে বাছা হবে, সেসম্বন্ধে তো কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই প্রকল্পটির জন্য যাদের বাছা হয়েছে, তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারগুলি থেকে আগত। রহস্য ধরা পড়ল। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাছাইপদ্ধতি সঠিক হলেও যে-প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য এই সমীক্ষার আয়োজন, তার পক্ষে এটি মারাত্মক রকমের ভুল। একবছরে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ওজন কতখানি বাড়বে তা দৈনিক ঐ এক গ্লাস দুধের ওপর যতখানি নির্ভর করে, তার থেকে অনেক বেশি নির্ভর করে সে বাড়িতে কী ধরনের পুষ্টিকর খাবার বা স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা ও পরিবেশ পায়—তার ওপর, অর্থাৎ তার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর। সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নটির সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষকদের উচিত ছিল বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তর থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের দুটি দলে (যারা দুধ পাবে এবং যারা পাবে না) মিলিয়ে মিশিয়ে রাখা। একমাত্র তাহলেই ওজনবৃদ্ধির গড় পার্থক্যকে এই এক গ্লাস দুধ খাওয়া-না-খাওয়ার ফলাফল হিসাবে চিহ্নিত করা যেত। যাঁরা এই পরীক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটির পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি খেয়াল করেননি। পরীক্ষণ-পরিকল্পনায় গলদ থাকলে ফলাফল কতখানি ভুল সঙ্কেত দিতে পারে—ঘটনাটি তারই উদাহরণ।

অপব্যবহারের এইসব নমুনা খুঁটিয়ে দেখে কি মনে হয়, পরিসংখ্যান আর নির্জলা মিথ্যা সমার্থক? আসলে পরিসংখ্যান কখনো মিথ্যা বলে না, বরং মিথ্যাভাষীরাই পরিসংখ্যানের সাহায্যে মানুষকে বোকা বানায় (Figures seldom lie, only liars figure)! ল্যাম্পপোস্ট একজন মদ্যপের খুব কাজে লাগে—তবে আলো পাওয়ার জন্য নয়, ওতে ঠেসান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনে! মতলববাজদের কাছে পরিসংখ্যানের উপযোগিতাও অনেকটা এইরকম। অবশ্য অনেকসময় অসতর্ক কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবেও যে আমরা পরিসংখ্যানের অপব্যবহার করে ফেলি, সেরকম কয়েকটা উদাহরণও আমরা আলোচনা করেছি।

আজকের দিনে বিজ্ঞানসাধক, দক্ষ প্রশাসক, সচেতন শিল্পপতি, সফল রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী কিংবা জাগ্রতচক্ষু সাধারণ নাগরিক—কারোরই পরিসংখ্যানের সাহায্যে অযথা বিভ্রান্ত হওয়া চলে না। তাই পরিসংখ্যানের এইসব অপব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে সকলকেই। ❑

স্থাপত্য ও ইতিহাসের মিলনভূমি মহীশূর

চিররঞ্জন মজুমদার

দাক্ষিণাত্যের অতীতের মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে আশ-পাশের কানাড়াভাষী কিছু অঞ্চল জুড়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভাষার ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে আজকের কর্ণাটক রাজ্য। বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর—'মহীশূর'। রাজধানী ব্যাঙ্গালোর থেকে এর দূরত্ব ১৩৯ কিমি.। এই শহরের সঙ্গে নিয়মিত রেল ও বাসের সংযোগ আছে।

বৈচিত্র্যে ভরা রাজ্য কর্ণাটকের চির সবুজে ছাওয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, বিস্তৃত বনাঞ্চল, কৃষ্ণা, কাবেরী, ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধুর কলতান, নয়নাভিরাম জলপ্রপাত (যোগ ফল্‌স্), সুদৃশ্য উদ্যাননিচয়, ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ধ্বংসাবশেষ, মন্দির-স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যশিল্প পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কর্ণাটকের চন্দন গাছ ভারতের এক বিশেষ সম্পদ। এখানে নারকেল, আখ ও কলাগাছের চাষও হয় প্রচুর। নীলগিরি অঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ কফির চাষ হয়। এছাড়া নানাপ্রকার মশলার চাষও হয় এই কর্ণাটকে। চন্দন কাঠের আভরণ ও নানারূপ শিল্প, পাথর ও হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভাস্কর্য, হস্তশিল্প ও মাইশোর সিল্ক শাড়ির আকর্ষণও অনস্বীকার্য। মহীশূরের দশেরা উৎসবের প্রশস্তি আজ সারা বিশ্বময়। অক্টোবর মাসে দশদিন ধরে চলে এই উৎসব। জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য মিছিল, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা ও প্রদর্শনীতে সারা শহর উৎসবের সাজে সেজে ওঠে। বাজিও পোড়ে শহর জুড়ে। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটকের সমাগম ঘটে এই দশেরা উৎসবে।

কর্ণাটকের মূল অংশ মহীশূরে বিভিন্ন বংশের রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁদের মধ্যে কদম্ব, চালুক্য, গঙ্গা, রাষ্ট্রকূট, হোয়েসল ও বিজয়নগরের রাজারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৪শ শতকের শেষভাগে গুজরাটের দ্বারকা থেকে বিজয় ও কৃষ্ণ—দুই যাদব ভাই এসে বাসা গড়েন মহীশূরে। বিজয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মহীশূর-রাজ তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দিলেন। রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্বও পেলেন বিজয়। এই ওয়াদিয়ার রাজবংশের রাজত্ব চলে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর মহীশূরের রাজা হন ঐ রাজবংশের বীর সেনাপতি হায়দার আলি। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় শ্রীরঙ্গপত্তমে। হায়দার আলি ও তাঁর বীর পুত্র টিপু সুলতানের বিক্রমের কথা আজ সকলেরই জানা। টিপুর পরাভবের পর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশের দখলে যায় এই মহীশূর। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন মহারাজা জয় চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার করদ-রাজ্য মহীশূরকে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। রাজাদের বৈভব আজও মহীশূরের অন্যতম আকর্ষণ। তাই মহীশূরকে কেউ কেউ বলেন 'প্রাসাদপুরী'।

মহীশূরকে কেন্দ্র করেই ১১-১৪ শতকের হোয়েসল-রাজদের গড়া বেলুর, হালেবিদ ও সোমনাথপুরমের মন্দির-স্থাপত্য, গঙ্গারাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া বিশ্বের উচ্চতম মনোলিথিক প্রস্তরমূর্তি শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর, মহীশূরের রাজপ্রাসাদ, জগমোহন আর্ট গ্যালারি, চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির, অদূরে কাবেরীতে ঘেরা দ্বীপ শ্রীরঙ্গপত্তম—হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন রাজধানী এবং মহীশূরের গৌরবগাথার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

অক্টোবর থেকে মার্চ মাস বেড়াবার উপযুক্ত সময়। রেলপথে ১১৫ কিমি. দূরে হাসানে এসে ৩৪ কিমি. দূরে বেলুরে যেতে বাসে দেড় ঘণ্টার মতো সময় নেয়। বেলুর থেকে হালেবিদ ১৬ কিমি. বাসে যেতে আধঘণ্টার মতো সময় লাগে। হালেবিদ থেকে ৩৯ কিমি. বাসে হাসানে এসে দুপুরের পর বাস ধরে ৫২ কিমি. দূরে শ্রবণবেলগোলায় দুঘণ্টায় যাওয়া যায় এবং সেখান থেকে মহীশূর ৯৩ কিমি. বাসে ফিরে আসাও যায়। সময়ের স্বল্পতা থাকলে রাজ্য সরকারের কণ্ডাকটেড ট্যুরে একদিনের প্রোগ্রামে বেলুর, হালেবিদ ও শ্রবণবেলগোলা দেখে নেওয়া যায়। গাইডও সঙ্গে থাকে।

বেলুর, হালেবিদ ও সোমনাথপুরমের মন্দির-স্থাপত্য—সেযুগে হোয়েসল-রাজদের বিশেষ কীর্তি। সেগুলি অপূর্ব ভাস্কর্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অনবদ্য কারুশিল্পের নিদর্শন বহন করছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের প্রতাপশালী চোল রাজ্য ধ্বংস হয়ে মহীশূর মালভূমিতে নতুন রাজ্য স্থাপিত হলো 'হোয়েসল'। হোয়েসল-রাজদের রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে গোটা দক্ষিণ ভারত পদানত করেন। সেই সময়ে এই রাজধানীও লুণ্ঠিত হয়েছিল। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে ধ্বংস হয় হিন্দুরাজ্য হালেবিদ।

হোয়েসল বংশের প্রথম রাজা বিষ্ণুবর্ধন জৈনধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাঁর এই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে খুব সম্ভব ৫০ কিমি. দূরত্বে মেলুকোটেই এর ইতিহাস লুকিয়ে আছে। পবিত্রতা, প্রেম ও নিরভিমান-তার মধ্য দিয়ে আবাল্য বিষ্ণুভক্ত আচার্য রামানুজ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবের সেবায় তিনি শ্রীরঙ্গমে তাঁর বৈষ্ণব মত প্রচার করছিলেন। সেখানে আচার্য মহাপূর্ণর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে

তিনি বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাধারণ মানুষের উপযোগী করে ধর্ম প্রচার করেন। সমগ্র ভারতের দিকে দিকে এই রামানুজ-পন্থীদের আদর্শ ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীরঙ্গমে বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, কিন্তু চোলবংশীয় ত্রিচিনাপল্লীর রাজা এসব সহ্য করতে পারেননি। রামানুজ তখন মেলুকোটের যাদবপুরীতে চলে আসেন। মেলুকোটের যাদবপুরীর রাজা বল্লাল জৈনধর্মাবলম্বী হলেও উদারচেতা ও সাধুভক্ত ছিলেন। রামানুজকে আশ্রয় দিতে তিনি আপত্তি করেননি। কথিত আছে, রাজকন্যা অসুস্থ হওয়ায় ঝাড়-ফুঁক, চিকিৎসা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ করেও সুস্থ করা যায়নি। এইসময়ে রামানুজ এলেন রাজা বল্লালের দেশে। তিনি মন্ত্রের জোরে রাজকন্যাকে সুস্থ করে তোলেন। রামানুজের ধর্ম গ্রহণ করে রাজা বল্লাল হলেন বৈষ্ণব। তাঁর নতুন নাম হলো 'বিষ্ণুবর্ধন'। যাদবপুরীতে জৈনমন্দিরের জায়গায় নারায়ণস্বামীর নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো। এরপর চোলরাজার মৃত্যুর খবর পেয়ে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে ১২০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

বেলুরের (প্রাচীন নাম 'বেলপুরা') চেন্ন কেশব বিষ্ণুমন্দির হোয়েসল-রাজ বিষ্ণুবর্ধনের কীর্তি। 'চেন্ন' মানে সুন্দর। হোয়েসল-রাজদের একজন বিখ্যাত স্থপতি তথা ভাস্কর জঘনাচারির পরিকল্পনায় এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে মন্দিরত্রয়—বেলুর, হালেবিদ ও সোমনাথপুরমে। বেলুর মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমান কর্ণাটকের হাসান জেলায় বেলুরের অবস্থান। মহীশূর শহর থেকে বেলুরের দূরত্ব ১৫৫ কিমি.। তামিলনাড়ুর মন্দিরগুলির মতো এর আকাশচুম্বী গোপুরম নেই, নেই সুবিস্তৃত চত্বরও। তবে এর ভাস্কর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শকদের অভিভূত করে। আমরা গোপুরমের নিচ দিয়ে মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল, মাঝখানে মন্দির। এই মন্দিরের চূড়া নেই, গম্বুজ নেই, তবে পাথরে যেন প্রাণের প্রকাশ। মন্দিরগাত্রের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত। হাতি, ঘোড়সওয়ার সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে। তার ওপরের সারিতে নানারকম ফুল, লতাপাতা, দেবতার মূর্তি। ওপরের দিকে কারুকার্যময় থামের ওপর নৃত্যপরা দেবীমূর্তি। পায়ের কাছে যুক্তকরে ভক্তবৃন্দ। দেবীর এক পদ মাটিতে, অন্য পদ শূন্যে। সারা অঙ্গে নানা অলঙ্কার। অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি! এরকম ৩৮টি মূর্তি আছে। এর মধ্যে সরস্বতীর মূর্তিও আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের বহুভুজ চেন্ন কেশবের দুমিটার উঁচু মূর্তি নিয়মিত পূজা পান। দশাবতাররূপী বিষ্ণুমূর্তি, নানা দেবদেবী, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়াও আরো মূর্তি চোখে পড়ে। মন্দিরের পূর্ব, উত্তর আর দক্ষিণ—তিনদিকে প্রবেশদ্বার। বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরটাকে যেন প্রাণবন্ত মনে হয়। কী অপূর্ব সৌন্দর্যচেতনা! কী গভীর ধর্মানুরাগ! স্থাপত্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বেলুরের মন্দির ছেড়ে বাজার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি হালেবিদের দিকে ছুটছে। পথশোভা মনোরম। হালেবিদ নিতান্ত অনাদৃত গ্রাম। ইতিহাসের দ্বারসমুদ্র তথা হোয়েসল রাজবংশের কীর্তির ঐশ্বর্য নিয়ে আজও বেঁচে আছে হালেবিদ। মন্দিরে বিরাট কোন প্রবেশদ্বার নেই, কিন্তু পরিকল্পনার বিশালতা লক্ষ্য করতে কষ্ট হলো না। এখানে একাধিক গর্ভগৃহ, একাধিক নন্দী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ। মন্দিরের দুটি গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত রয়েছেন শিব—হোয়েসলেশ্বর ও সান্তালেশ্বর। ১১২১ খ্রিস্টাব্দে নাকি মন্দির-নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। হোয়েসল-রাজ নরসিংহের সময় প্রায় ৮০ বছর ধরে শয়ে শয়ে শিল্পী অক্লান্তভাবে পাথর কেটে কেটে এই কাজ সম্পন্ন করেন। হালেবিদের মন্দিরের কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম, আরো সুন্দর। মন্দিরগাত্র, সিলিং—সর্বত্র হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। স্বর্গের দেবসভা বসেছে এর দেওয়ালে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও উৎকীর্ণ হয়েছে মন্দিরগাত্রে। কার্ণিসের নিচের অংশের কারুকার্য আরো সুন্দর। তদানীন্তন সমাজব্যবস্থা, যুদ্ধজয়ের উল্লাস, নৃত্য ও গীতের ছন্দোময় ভাস্কর্য সত্যিই চমকপ্রদ। সেই হাতি, ঘোড়সওয়ার, সিংহ, পৌরাণিক পশুপাখি, ফুল-লতা-পাতার সারি ছাড়াও আছে পুরাণের নানা কাহিনী, চিত্র ও দেবদেবী। এই মন্দিরে চারটি দ্বার—উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে, পূর্বে দুটি। কিরীটশোভিত গণেশ, মকরের ওপর সস্ত্রীক বরুণদেব, ময়ূরবাহন কার্তিক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য, ইন্দ্র, নটরাজ, পার্বতী, সরস্বতী, লক্ষ্মী—সব হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিই আছে। এগুলির নানা অলঙ্করণ ও শিল্পকার্য অনবদ্য। তাছাড়া কয়েকটি ভৈরব ও সর্পবেষ্টিত নারীমূর্তিও এখানে স্থান পেয়েছে। দিগম্বর জৈনমূর্তিটিও দেখার মতো। কত বিচিত্র কল্পনা, বলিষ্ঠ সংযত সুন্দর আর স্বপ্নময় প্রকাশ এই মন্দির-শিল্পের কাজে। মন্দিরের বাইরে মন্দির-ভাস্কর্যের নানা নিদর্শন নিয়ে মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে। হালেবিদের স্থাপত্যের বিশালতার অনেকটাই ধূলিসাৎ হয়ে যায় ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতানের আক্রমণে। হোয়েসলেশ্বর মন্দিরের আধ কিমি. দূরে কেদারেশ্বরের শিবমন্দির এবং পরশুনাথের জৈনমন্দিরের কারুকার্যও দেখার মতো।

হালেবিদ থেকে হাসান হয়ে আমাদের গাড়ি দেড় ঘণ্টায় ভারতের অন্যতম জৈনতীর্থ শ্রবণবেলগোলায় চলে এল। ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি পাশাপাশি দুটি পাহাড়। ৩,৩৪৭ ফুট উঁচু ইন্দ্রগিরির একটি চূড়া খোদাই করে তৈরি হয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বরের বিশাল (১৭.৫ মিটার উঁচু) নিরাবরণ মূর্তি। প্রায় ৬০০ ধাপে সিঁড়ি উঠেছে ৪৭০ ফুট

উঁচুতে মূর্তির পাদদেশে। জুতো ছেড়ে আধঘণ্টায়ও ওঠা যেতে পারে। উৎসবকালে দূরদূরান্ত থেকে জৈন ভক্তরা আসেন। আসেন পর্যটকরাও। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নাকি এসেছিলেন এই শ্রবণবেলগোলায় এবং এখান থেকেই তিনি জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রাত ৮টায় আমরা মহীশূর ফিরে এলাম।

মহীশূরের চামুণ্ডী পাহাড়ে দেবী চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দির

পরদিন প্যাকেজ ট্যুরে আমরা প্রথমে মহীশূর শহরের পাশেই চামুণ্ডী পাহাড়ে চলে এলাম নয়নাভিরাম পাহাড়ী পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে। পথের ওপর দণ্ডায়মান মহিষাসুরের মূর্তি দেখে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। অল্প দূরে মন্দিরের বিরাট গোপুরম (৪০ মিটার উঁচু) দিয়ে ঢুকেই চামুণ্ডেশ্বরী মায়ের মন্দির। দেবীর মর্মরমূর্তি। তিনি অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী; বাংলার মতো লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সেখানে অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভারতে এরকম মূর্তি আর নেই, যা আছে তা হয় শিব, না হয় বিষ্ণু। কার্তিক-গণেশও দেখেছি, দেখেছি মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী। কিন্তু মহিষমর্দিনী মূর্তি আর দেখিনি। কথিত আছে, একদা মহীশূর রাজ্যের রাজা ছিলেন মহিষাসুর। দেবী দুর্গা এখানেই নাকি মহিষাসুর বধ করেন। এই চামুণ্ডেশ্বরী মহীশূর-রাজদের ইষ্টদেবী। রাজাদের জন্য বিশ্রামগৃহ রাজেন্দ্রবিলাস প্রাসাদও আছে চামুণ্ডী পাহাড়ে। কাছেই টেপ্পাকুলম সরোবরে নাকি বিশেষ বিশেষ রাতে দেবীর নৌকাবিহার হয়। পাহাড় থেকে নামার পথে

চামুণ্ডী পাহাড়ে মহিষাসুরের মূর্তি

পাথর কেটে তৈরি করা বিরাট নন্দী (বৃষ) দেখলাম। ১৬ ফুট উঁচু, পাহাড়ের গায়ে এত বড় মূর্তি আমরা কোথাও দেখিনি। শুধু পাথরের ওপর কারুকার্য করা মালা নয়, ভক্তদের দেওয়া ফুলের মালাও নন্দীর গলায় শোভা পাচ্ছে। ফেরার পথে মহা সম্মানিত অতিথিদের জন্য নির্মিত বিরাট এক প্রাসাদ 'ললিতামহল' দূর থেকেই দেখলাম। মহীশূরে প্রাসাদের নির্মাণশৈলী পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বিরাট প্রাসাদপুরী, চত্বর জুড়ে বাগিচা ছাড়া কয়েকটি মন্দিরও আছে—ভুবনেশ্বরী, গায়ত্রী এবং গোপালকৃষ্ণস্বামীর। প্রাসাদের কল্যাণমণ্ডপে দশেরা উৎসবের ছবি, দ্বিতলে দরবার হল-এ হিন্দু পুরাণের নানা দেবদেবীর মূর্তিগুলি দেখার মতো। হাতির দাঁত ও মূল্যবান পাথরের চাকচিক্যময় অলঙ্করণ, রূপার দরজা, মেহগনি কাঠের কারুকার্যময় সিলিং, হোয়েসলী শৈলীর কার্ভিং, গিলটি করা থামগুলি দরবার হল-এর আকর্ষণ বাড়িয়েছে। প্রাসাদের আর্ট গ্যালারির তৈলচিত্রগুলিও সুন্দর।

এক ঘণ্টায় রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য দেখা সাঙ্গ করে আমরা জগমোহন আর্ট গ্যালারিতে চলে এলাম। কত শিল্পীর কত চিত্র, রাজপরিবারের ছবি, রাজাদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, আরো নানা সম্ভার, সেই আমলের ঘড়ি, প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের নমুনা, চন্দনকাঠ ও হাতির দাঁতের নানাপ্রকার আভরণ ও মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য নিয়ে সে এক অপূর্ব সংগ্রহশালা! দ্বিতলে 'সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে মহিলা' ছবিটি সংগ্রহের মর্যাদা আরো বাড়িয়েছে।

চামুণ্ডী পাহাড়ে নন্দীর মূর্তি

দুপুরের খাওয়া সেরেই আমরা মহীশূর থেকে ৩৮ কিমি. দূরে হোয়েসল-রাজদের অপর এক কীর্তি সোমনাথপুরমের চেন্ন কেশব মন্দির দেখতে এলাম। মন্দিরের ভাস্কর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এটিও ভাস্কর জঘনাচারির আরেক কীর্তি। দ্বারসমুদ্রের রাজা নরসিংহ তৃতীয়-র সেনাপতি সোমা ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিজের নামে গ্রাম গড়ে বিষ্ণুমন্দিরটি তৈরি করেন। তারাকার এক উঁচু জমিতে পাশাপাশি তৈরি তিনটি মন্দির—মাঝে চেন্ন কেশব, ডাইনে জনার্দন ও বামে বেণুগোপাল। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হাতে ৬ ফুট উঁচু বিষ্ণুমূর্তি, আবার বংশী-হাতে গাছে ঠেস দেওয়া বেণুগোপাল কৃষ্ণমূর্তিও আছে। মন্দিরের সিলিং ও থামগুলি সবই অনবদ্য কারুকার্যে ভরা। গরুড়ের কাঁধে লক্ষ্মী-নারায়ণ, ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্র ও শচী, নৃত্যের ভঙ্গিমায় গণপতি ছাড়াও নানা জীবজন্তু, শিকারী, নর্তকী এবং রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী মূর্ত হয়েছে দেওয়ালে। বিষ্ণুর দশাবতার-মূর্তিও রূপ পেয়েছে। সেযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন-রূপে সোমনাথপুরমের এই মন্দির আজও তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে।

এরপর আমরা ২৬ কিমি. দূরে শ্রীরঙ্গপত্তমে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত রাজধানীতে চলে এলাম। অসমসাহসী বীর সেনাপতি হায়দার আলি তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় মহীশূরের হিন্দু-রাজাকে পরাজিত করে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে এখানেই রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি যুদ্ধে ইংরেজদেরও বিধ্বস্ত করেছিলেন। ১৭৮২-তে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের হাতে ইংরেজদের অনেক নাকাল হতে হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের রণকৌশলে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিলের সম্মুখসমরে টিপুর দেহত্যাগ হয়। শ্রীরঙ্গপত্তমের ঐতিহাসিক দুর্গ ব্রিটিশের দখলে চলে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সন্তান হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের বীরবিক্রমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল দরিয়া-দৌলতবাগের সামনে। সুন্দর একটি ছায়াচ্ছন্ন বাগানবাড়ি। পিছন দিয়ে কাবেরী বইছে কলকল করে, সামনে ফুলের বাগান। প্রখর গ্রীষ্মে টিপু সুলতান এখানেই বাস করতেন। এরপর আমরা টিপুর সমাধিক্ষেত্র গম্বুজে চলে এলাম। শ্বেতপাথরের সৌধ। ওপরে সুন্দর গম্বুজ। সুন্দর বাগানের ভিতর এই স্মৃতিসমাধি। এখানে টিপুকে তাঁর পিতামাতার পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। আমাদের গাড়ি দুর্গের সামনে টিপুর দেহত্যাগের স্থান ঘুরে রঙ্গনাথের বিখ্যাত মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। সম্ভবত ১২০০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার হয়ে নতুন মন্দির নির্মাণ হয়েছিল দক্ষিণী শৈলীতে। পাঁচতলা গোপুরম পেরিয়ে প্রবেশ করতে হয়। রঙ্গনাথ স্বামীর বিরাট অনন্তশয়ান মূর্তি অনেকটা শ্রীরঙ্গমের মতোই দেখতে। মন্দিরের ভাস্কর্যে নানা অবতাররূপী বিষ্ণু মূর্ত হয়েছেন। টিপুও নাকি হিন্দু-দেবতা শ্রীরঙ্গনাথের ভক্ত

সোমনাথপুরমের চেন্ন কেশবের মন্দির

ছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমে এসে আমরা দেশের জন্য টিপুর আত্মদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করলাম। সবশেষে রাতের আলোয় বৃন্দাবন গার্ডেনের বিভিন্ন বর্ণের ফোয়ারা দেখে, নানা আলোয় আলোকিত কৃষ্ণরাজ সাগরের মধুময় পরিবেশে আরো কিছুটা সময় থেকে সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। সঙ্গীতের তালে তালে ফোয়ারাগুলিও নাচতে শুরু করে। রঙের বদল ঘটে ক্ষণে ক্ষণে। রাত ৯টায় আমরা মহীশূরের নিউ গায়ত্রী ভবনের লজে ফিরে এলাম।

হাসান থেকে আরসিকেরে হয়ে বিরুর অথবা সিমোগা রেলস্টেশনে নেমে বাসে করে ১০৫ কিমি. দূরে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ দর্শন করে আসা যায়। আচার্যের তৈরি সারদা সরস্বতীর মন্দির ও চেন্ন কেশব মন্দির এবং তাদের অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী দর্শন না করলে তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থাকবে। শৃঙ্গেরী থেকে পশ্চিমে বেশি দূরে নয়—আরবসাগরের তীরে বৈষ্ণবতীর্থ উদিপিতে মাধবাচার্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরটিও দেখে নেওয়া যেতে পারে, আবার সিমোগা থেকে উত্তরদিকে ৭৭ কিমি. গিয়ে হরিহরেশ্বরের হরিহরক্ষেত্রের আকর্ষণও কম নয়। ❑

বাঙলা সাহিত্যে এক নবদিগন্তের দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ

সুজাতা সিংহ

পেলব-কোমল বাঙলা সাহিত্যে আমরা সহসা এক দৃপ্ত, শাণিত কণ্ঠের বিদ্যুৎস্পর্শ লাভ করেছিলাম। প্রাক্-স্বাধীনতার দিনগুলিতে ভারতের জাতীয় জীবন মুহুর্মুহু উজ্জীবিত হয়েছিল সেই কম্বুকণ্ঠে এবং সেই রুদ্রবীণার ঝঙ্কার বাঙলার কাব্যসাহিত্যকেও ছুঁয়েছিল প্রাণময় বলিষ্ঠতায়। সমগ্র মানবজাতির শোণিতপ্রবাহের মধ্যে এক পৌরুষদৃপ্ত ঝঙ্কার সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যই স্বামীজীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তীব্র কর্মস্রোতে বাহিত ঝঞ্ঝাসদৃশ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যুগোদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টি করতে নয়; যদিও তিনি ছিলেন আত্মার আলোকবাহী পুরুষ। জগৎময় সেই আলোক-সঞ্চারই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনা ও বক্তৃতাবলী ভারতেতর ভাষায়। কিন্তু নয়ন মেলে যে-ভাষায় তিনি প্রথম কথা বলেছিলেন, সেই বাঙলা ভাষার আসনও আলোকিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠস্বর ও লেখনীতে। যদিও সকল জড়তা ভেঙে আমরা অবহিত হতে চাইনি।

মুষ্টিমেয় তাঁর বাঙলা রচনা, কিন্তু আবেদনে বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের রসগ্রহণ করে কেউ লিখেছেন—বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের তিনি উজ্জ্বলতম স্থানাধিকারী। কারো মনে হয়েছে —বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কথা আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীক জীবনসংগ্রামের অনন্ত প্রেরণা। বিবেকানন্দের জগৎ-আলোড়নকারী শক্তিকে তাঁর রচনার মধ্যে অনুভব করে কেউ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই সত্য—বাঙলা গদ্যে বীররসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেকানন্দ। বর্তমান আলোচনায় মূলত আমরা এইখানেই মনঃসংযোগ করব।

চিঠিপত্র, কিছু কবিতা ও সঙ্গীত, সাধু গদ্য, চলিত গদ্য, ভ্রমণসাহিত্য ও অনুবাদ—এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা সাহিত্য। প্রথম জীবনের সাহিত্যকর্ম হার্বার্ট স্পেনসারের 'Education' গ্রন্থের অনুবাদ, 'শিক্ষা', 'Imitation of Christ'-এর আংশিক অনুবাদ 'ঈশানুকরণ' এবং 'সঙ্গীত-কল্পতরু' গ্রন্থের ভূমিকার কথাও মনে রাখতে হয়। তবু তা বিন্দুতে সিন্ধু। এইসকল রচনাতে যেমন আছে তীব্র মননশীলতা, অপার প্রেম, গভীর সহানুভূতি, তেমনি হাস্যরস ও বীররসে স্নাত। বাঙলা সাহিত্যে বীররসের অনটন বিবেকানন্দকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই কখনো দেখি তিনি রুদ্র, সময়ে সময়ে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষার চাবুক। কখনো আবার দেখা গেছে সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

যে যুগপটভূমিতে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—সম্মুখে দেখেছিলেন তমসাবৃত ভারতবর্ষকে, পরাধীন দাসসুলভ পতিত জাতিকে—"যার চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন।"[১]

এই আত্মবিস্মৃতি থেকে তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নিজেদের পরিচয় আমরা জানতাম না, জানিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। ধ্বনিত হয়েছে তাঁর মেঘমন্দ্র স্বর—"জগতের ইতিহাস হলো মুষ্টিমেয় আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস, সেই বিশ্বাসই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলে। যে-মুহূর্তে কোন ব্যক্তি বা জাতি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়, অমনি তার বিনাশ ঘটে। আগে নিজেকে বিশ্বাস কর, তারপরে ভগবানে বিশ্বাস।" দেহে ও মনে বলিষ্ঠ জাতি, সবল ভাষা, মনের ঔদার্য, নির্ভীক মনুষ্যত্ব ছিল তাঁর কাম্য।

দেশ, জাতি, মানুষ, এমনকি ভাষা ও সাহিত্যের মুক্তির পথ নির্ধারিত করে দেওয়ার মধ্যে প্রথমেই আমরা উপনিষদে স্নাত এক বিবেকানন্দকে পাই। কারণ—"উপনিষদ্ বলিতেছে, 'হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর।' " উপনিষদের সংগ্রামের বাণীতে তিনি যেমন প্রাণিত, তেমনি এর ভাষা, সাহিত্যগুণ ও কবিত্বে মুগ্ধ ও প্রীত। উপনিষদের তাঁর সেই প্রিয় শ্লোকগুলির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, যেগুলির মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ কবিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভাষার যাদুকর। উপনিষদের সাহিত্যগুণ ও ওজস্বী ভাষার কথা তিনি তাঁর ভাষণে বহুবার উল্লেখ করেছেন—"উপনিষদের ভাষা, ভাব—সবকিছুরই ভিতর কোন জটিলতা নাই, উহার প্রত্যেকটি কথাই তরবারি-ফলকের মতো, হাতুড়ির ঘায়ের মতো সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই সঙ্গীতের প্রত্যেকটি সুরের একটা শক্তি আছে, প্রত্যেকটি তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪০-২৪১

দেয়।... যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য; যে-জাতি তখনও তাহার জাতীয় তেজবীর্য এতটুকু হারায় নাই।" লিখেছেন—"উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই।... উপনিষদ্‌সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে-শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে।... দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতা—ইহাই উপনিষদের মূল মন্ত্র।"[২]

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের অনেক কবি-সাহিত্যিক উপনিষদ্ থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন, কারণ যেকোন সৎ সাহিত্যই ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু বিবেকানন্দ যেভাবে উপনিষদ্ থেকে তেজ ও ওজস্বিতাকে দোহন করে এনেছেন তা অনন্যসাধারণ। আমরা জানি, বনের বেদান্তকে ঘরে আনাই ছিল তাঁর সারাজীবনের সাধনা। উপনিষদের শ্রদ্ধাবান নচিকেতা ছিল তাঁর প্রিয় চরিত্র। সেই দৃঢ় ও নির্ভীক বালক নচিকেতা, যিনি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিৎ যমের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছেন জীবন-মৃত্যুর রহস্য, প্রশ্ন করেছেন —মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়?

সমকালীন বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে স্বামীজী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি ছাড়াও ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণ, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থখানি এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর চিন্তাপূর্ণ ও তথ্যমূলক গবেষণায় তার অজস্র উল্লেখ রয়েছে। কবি মধুসূদনের কাব্যের উদাত্ত ভঙ্গি, দার্ঢ্য, বীরোচিত আবেদন তাঁর মনে সাড়া জাগাত। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গির স্মৃতি উত্থাপন করে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, যুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প রাবণের বীরোচিত determination-কে স্বামীজী শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার মর্যাদা দিয়েছেন। বীরবাহুর জননী মন্দোদরী ক্রন্দনরতা, প্রিয়পুত্র বীর মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত, রাবণ কিন্তু যুদ্ধে অবিচল। বীরের এই ভঙ্গি ছিল তাঁর প্রিয়। মিল্টনের কবিতা আবৃত্তি করতেও তিনি ভালবাসতেন। পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গির জন্যই এই কাব্যগুলি তাঁর মনকে স্পর্শ করত। জীবনের প্রতি এই বীরোচিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে বীরভাবের দীনতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। লিখেছেন: "ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চারশো বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা লেখা হয়েছে—সেসব এক কান্নার সুর।" বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘ সময়টি বৈষ্ণব ভাবুকতার প্রভাবজাত যুগ। নিরুদ্যম ভগ্নোৎসাহ জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য ভাষার মধ্যে ওজঃশক্তির সঞ্চার প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল তাঁর। প্রাণতারুণ্যে উজ্জ্বল বিবেকানন্দ জেনেছিলেন—"ক্ষীণা স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ।"

ভাষার সজীবতার একটি লক্ষণ হলো প্রাণের স্ফূর্তি। তাই চলতি ভাষাকে তিনি আধুনিক বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম মনে করেছিলেন—"স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে-ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।"[৩]

'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর ভাষায় সবিশেষ লক্ষণীয় তাঁর তেজস্বিতা ও গভীর রসিকতাবোধ। তাঁর সৃষ্ট চলতি ভাষার এক চূড়ান্ত রূপ এইরকম—"আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো হচ্ছে মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।"[৪]

জাতীয় জড়ত্বের মূলচ্ছেদ করতে অপরিহার্য তাঁর ভাষার চাবুক—"যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারো নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[৫]

পূর্বেই দেখেছি, বাঙলা সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'বিবেকানন্দ ও বাঙলা গদ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোন বাঙালি সাহিত্যিক বলেননি।... 'সবুজপত্র'-এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র'-এর মারফতে চলিত ভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিত ভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোধা বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চলিত

---

২ ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা, 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৩০
৩ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫
৪ ঐ, পৃঃ ১৫৫
৫ ঐ, পৃঃ ৩৩
৬ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ২য় সং, পৃঃ ৫৪০-৫৪১

ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।"[৬] স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা চলিত ভাষার ঐশ্বর্যে চমৎকৃত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ, রোমাঁ রোলাঁ—প্রত্যেকে স্বামীজীর ভাষার ওজঃশক্তি, প্রাণময়তা ও বিদ্যুৎস্পর্শের কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে সেদিকে সেযুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। প্রশ্ন হলো, এযুগেও তা কতটা হয়েছে?

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আলাপচারিতার মধ্যে বহু সময়ে তাঁর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাই। ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচিত্রণে, নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে তার বিভিন্ন পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে। ইংরেজি, বাঙলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। বরানগর মঠে অবস্থানকালে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া যায় —একদিকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য, অপরদিকে বাল্মিকী, ভবভূতি, শেক্সপীয়র, বায়রণের রচনা পাঠ ও আলোচনায় সময়ে সময়ে নতুন সন্ন্যাসীদের নির্জনবাস মুখরিত হয়ে উঠত। এগুলির অনেকটাই স্বামীজীর কণ্ঠস্থ ছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা এবং তামাশাচ্ছলে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিতেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গানগুলি তাঁকে গাইতে শোনা গেছে বহুবার। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রসগ্রহণেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। দেশ ও বিদেশের ইতিহাস, দর্শন এবং শাস্ত্রপাঠের কথা তো স্বতন্ত্র। নিবেদিতাও স্বামীজীর এরূপ কাব্যরসে প্রাণিত দু-একটি মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

মধুসূদনের কাব্যে তিনি কতদূর মুগ্ধ ছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত বরানগর মঠের একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ "বাঙলা সাহিত্য তিনি কতদূর পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহার উপর তাঁহার কতদূর দখল ছিল, সেইদিন তিনি সকলকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। নোকা (লক্ষ্মণ) ধোপার যাত্রা (শ্রীমন্তর মশান) হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ অধিকারীর ছন্দ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় তিনি সেইদিন বলিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যবিষয়ক এইরূপ বক্তৃতা ও উপলব্ধি খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়।"[৭]

স্বামীজীর অতুলনীয় ভ্রমণসাহিত্যে মুগ্ধ একালের সাহিত্যিক শঙ্কর, কেবল মুগ্ধ নন প্রভাবিতও। স্বামীজীকে তিনি শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্যিক বলে অভিহিত করেছেন। 'যেখানে যেমন' গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন ঃ " 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লিখিত হওয়ার পর সমগ্র এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হলো, কত প্রচণ্ড প্রতিভাধর এই বিংশ শতাব্দীতে বাঙলা ভ্রমণসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ আজও অদ্বিতীয়। কি স্টাইলে, কি সরসতায়, কি অন্তর্দৃষ্টিতে, কি গভীর মানবপ্রেমে, কি আত্মবিশ্বাসে—'পরিব্রাজকে'র লেখক আজও বাঙলা সাহিত্যের সেরা হয়ে রইলেন।"

রসকৌতুকে স্বামীজীর বাঙলা রচনা আকীর্ণ, কিন্তু তা সর্বদাই পরিচ্ছন্ন, সরস ও স্নিগ্ধ। ধাতে যিনি বীর তিনি প্রাণ খুলে হাসেন। উদাত্ত তাঁর হাসি। স্বামী তুরীয়ানন্দ-সহ জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রার অতি সরস বর্ণনা পাই 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে—"তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস করে পাতালমুখো হয়ে বলিরাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেব, তাতে কত রঙ ঢঙ মশলা বার্ণিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবোল-তাবোল বকছি! ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।"[৮]

স্বামীজীর এইসকল রচনায় যে-সুর বেজে ওঠে, সেটি হলো আনন্দদায়ী সুর।

এবারে তাঁর চিঠিপত্রে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। স্বামীজীর অধিকাংশ পত্রই ইংরেজিতে রচিত, গুটিকয় মাত্র বাঙলায় লিখিত। কিন্তু মানবমুক্তির পথনির্দেশ করে দিতে এসেছেন যে মহাপুরুষ, তাঁর প্রতিদিনের হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত সেই পত্রমালা। তাঁর গুরুভ্রাতাকে লিখিত এমনই একটি পত্রাংশ, আগ্নেয়গিরির মতোই যার উদ্গীরণ—"বলো 'অস্তি অস্তি', 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল! সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে, ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর, বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম... ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনাহীনা ভাব—ও হলো ব্যারাম। ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার!... যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই।... বল্, আমি সব করতে পারি।"[৯] [ক্রমশ]

---

৭ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১০৩

৮ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬০

৯ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯, ১২

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—**সম্পাদক**

প্রহেলিকা!

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক-পৌষ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত দেবাঞ্জন সেনগুপ্তের 'নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঃ রাগে অনুরাগে' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। প্রথমাংশ শেষ হলো। পরবর্তী অংশে নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু লেখা হবে।

আমি সামান্য দু-একটি কথা লিখতে চাই। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কের রহস্য দীর্ঘকাল ধরেই আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করেছে। শ্রীসেনগুপ্ত তাঁর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এই দুই বিখ্যাত মানুষের মধ্যে যে একটা স্বেচ্ছা আরোপিত দূরত্ব ছিল তার ওপর আলোকপাত করেছেন। স্বামীজীর দেহাবসানের বহু বছর পর মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে মেয়েদের 'inspire' করার ক্ষমতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন।" অথচ নিবেদিতার ভারতে আগমন বিবেকানন্দের 'বিবেকানন্দ' হওয়ার পর এবং তাঁর আরব্ধ ব্রতে অংশগ্রহণ করার জন্যই। বিবেকানন্দই ছিলেন নিবেদিতার 'friend, philosopher and guide'। নিবেদিতা নিজের পরিচয় দিতেন এই বলে—'Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda'। ১৯১১ সালে নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার প্রতি ছত্রে নিবেদিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে। তিনি লিখেছেন—

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।"

"এই যে এত বড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি, ইহাকে আমরা যে-অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব।"

"ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃঃ ৫৩২)

এত সব প্রশস্তির পরও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করতে পারলেন না, বলতে পারলেন না কোন্ সেই শক্তি, যার প্রভাবে নিবেদিতার এই আত্মবিসর্জন এবং কি সেই প্রেরণা, যার জন্য তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসলেন।

১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহাবসান হয়। তার প্রায় ৬ বছর পর 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের একটি ছোট অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।... তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" (ঐ, পৃঃ ৪২০)

বিবেকানন্দের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই প্রয়াস অকৃপণ না হলেও রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ ভক্তদের অনেকটাই সান্ত্বনা দেবে। স্বামীজীর জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি যেমন উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন, স্বামীজীর মৃত্যুর পর তাঁর সেই নির্লিপ্ত ভাব কিছুটা হলেও হয়তো অপসৃত হয়েছিল। কলকাতার সাউথ সুবারবন স্কুলে ১২ জুলাই ১৯০২-এ আয়োজিত স্বামীজীর শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। বেলুড় মঠে ১৯০৫ সালে আয়োজিত বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবে নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। (দ্রঃ রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্ক—পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়)

এবার স্বামীজীর চিন্তা-ধারণা নিয়ে দু-একটি কথা আলোচনা করা যাক। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩-২৪ বছর বয়সে 'সঙ্গীত-কল্পতরু' নামে একটি সঙ্গীত সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ বসাকের সহায়তায়। স্বামীজীই ছিলেন মূল সঙ্কলক। ১৭৬ জন সঙ্গীত-রচয়িতার ৬৪৭টি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ১২টি গান তিনি এই গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত করেছিলেন। তাঁর ১২টি গানের মধ্যে যেমন 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন' আছে, তেমনি 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে' ('ভানুসিংহের পদাবলী') গানটিও আছে। এই সঙ্গীত-সঙ্কলনে ধর্ম, সমাজ, প্রেম, পুরাণ প্রভৃতি সব ধরনের গানই স্থান পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, এইসময় নরেন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের আলোয় নিষ্ণাত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যে পরিণত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরেই ১৮৮৬ সালে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর সন্ন্যাসী হন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা না থাকলে তাঁর ১২টি বিভিন্ন ধরনের গান তিনি সঙ্কলিত করতেন না। প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক শোভন সোম যথার্থই লিখেছেন ঃ "নানা দিক থেকে নরেন্দ্রনাথের রচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই সঙ্কলনে আমরা লক্ষ্য করি।" ('দেশ', ৪ মে ২০০১ এবং 'উদ্বোধন', শারদীয়া ১৪০৯, পৃঃ ৭২৯)

এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তী কালে (তখন স্বামী বিবেকানন্দ) নিবেদিতাকে ঠাকুর-পরিবার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেন ঃ "Remember that family had poured a flood of erotic venom over Bengal." দেবাঞ্জনবাবু 'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় একথা উল্লেখ করেছেন। এ এক প্রহেলিকা!

পরিশেষে এই তথ্যপূর্ণ রচনার জন্য দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক মহারাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

ম্যাসনিক জগতে স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার লেখা নিবন্ধ 'স্বামীজী যখন লস এঞ্জেলেসে মিসেস ব্লজেটের অতিথি হয়েছিলেন...' পাঠ করে শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী গত আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় যে-পত্রটি লিখেছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। কারণ, এতে স্বামীজীর জীবনের একটি প্রায়-অজ্ঞাত তথ্য আংশিক উন্মোচিত হয়েছে। মিসেস ব্লজেটের স্মৃতিকথা ('Reminiscences of Swami Vivekananda, 3rd ed., p. 361) থেকে উদ্ধৃত করে আমি লিখেছিলাম, শিকাগোর ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামীজী-প্রদত্ত আরেকটি বক্তৃতা মিসেস ব্লজেট শুনেছিলেন এবং সেই বক্তৃতাসভায় একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে তাঁর যেসকল বাক্যবিনিময় হয় তার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পত্রলেখক সরোজেন্দ্রবাবু জি. সি. কুল্মুরের ২২ জানুয়ারি ১৮৯৪ তারিখের একটি পত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, স্বামীজী তখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় ম্যাসনিক ব্রাদারদের তাঁর বক্তব্য শোনাতে পারেননি। পত্রলেখক আরো জানিয়েছেন, 'ব্রাদার' ভিন্ন অন্য কেউ ম্যাসনিক টেম্পলে প্রবেশ করতে পারেন না, এমনকি তাঁদের নিকট আত্মীয়গণও নয়। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস, মিসেস ব্লজেট কর্তৃক উল্লিখিত সভাটি নিশ্চয়ই অন্যত্র সঙ্ঘটিত হয়েছিল। শ্রীসর্বাধিকারী জানিয়েছেন, তিনি ম্যাসনিক জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন এবং এঁদের বিভিন্ন লজে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব দাবি করে, বিশেষ করে এই কারণে যে, স্বামীজীর জীবনীগুলিতে শিকাগোর ম্যাসনিক টেম্পলে তাঁর বক্তৃতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্বামীজীর বাঙলা জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ অবশ্য তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''মহাসভার পর স্বামীজী কতদিন শিকাগোয় ছিলেন এবং কোথায় কোথায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সঠিক জানা যায় না, তবে তিনি সেখানে অন্তত দুই মাস ছিলেন বলে অনুমান হয়।'' (২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৫৯) একথা সত্য যে, মিসেস ব্লজেট শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর থেকে তাঁর খুবই ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই কারণে অনুমান করা যায়, শিকাগোয় প্রদত্ত তাঁর তদানীন্তন কালের বেশ কিছু বক্তৃতাসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তথাপি বেশ কয়েক বছর পর (১৯০২-এর ২ সেপ্টেম্বর) মিস ম্যাকলাউডকে স্মৃতিচারণমূলক পত্রটি লেখার সময় বক্তৃতার স্থান সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি তাঁকে প্রতারণা করতেও পারে, কারণ তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭৩।

শ্রীসর্বাধিকারীর পত্রে একথাও আছে যে, স্বামীজী একজন ম্যাসনিক ব্রাদার-রূপে দীক্ষিত হয়েছিলেন 'অ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ, ২৩৬ ইসি'-তে এবং জি. সি. কুল্মুর ১৮৯৪ সালে তাঁকে 'ম্যাসনিক গুপ্তমন্ত্র ও সঙ্কেত' সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনি একজন তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত ম্যাসন।

স্বামীজীর জীবনচরিতগুলিতে ম্যাসনিক জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রমথনাথ বসু রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''নরেন্দ্র সংসার চালাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'ফ্রি-মেসন' হইলে যদি কোন সুবিধা হয়—এই ভাবিয়া দিনকতক উহাদের দলে মিশিলেন।'' (১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১১৭) এই কথাগুলি থেকে স্বভাবতই মনে হয়, পিতার দেহত্যাগের পরে তিনি ঐ দলে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের জীবনপঞ্জীতে পাই, ১৮৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি 'অ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ' লজে ফ্রি-ম্যাসনরূপে যোগদান করেন। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর ঠিক ৬ দিন পূর্বে (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ নরেন্দ্রনাথের পিতা পরলোকগমন করেন) তিনি ঐ সংস্থায় যোগ দিয়েছিলেন। আমরা জানি, পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ একদিকে সংসারের প্রচণ্ড দারিদ্র্যজ্বালায় ও আত্মীয়স্বজনদের রূঢ় আচরণ ও প্রতারণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এবং অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদচ্ছায়ায় বসে তাঁর অন্তরের প্রবল আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, তাঁর অসীম ভালবাসায় প্রাণ জুড়িয়েছেন। তাই মনে হয়, তখন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানের পরবর্তী কয়েকটা বছর তিনি আর ম্যাসনিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ পাননি। পরবর্তী কালে আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতাসফরকালে তাঁর আবার ম্যাসনিক ব্রাদারদের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ হয়েছিল কিনা জানা নেই। শ্রীসর্বাধিকারী এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারলে তা স্বামীজীর জীবনীর নতুন উপাদান হয়ে থাকবে।

শ্রীসর্বাধিকারী তাঁর পত্রে একথাও জানিয়েছেন যে, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় স্বামীজীর ম্যাসনিক জগতে দীক্ষিত হওয়ার শতবার্ষিকী পালিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর জীবনচরিত অনুযায়ী, আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন ফ্রি-ম্যাসনরূপে যোগদান করেছিলেন। অতএব সেই দিক থেকে বিচার করলে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ শতবার্ষিকী পালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তা না হয়ে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কেন হয়েছিল বুঝতে পারলাম না।

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩ ১৭৮

তারিখটি ঠিক নয়

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' বিভাগের 'উৎসব-অনুষ্ঠান' স্তম্ভে নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত বাতানুকূল সভাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও মন্দিরে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপনের যে-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তারিখের গণ্ডগোল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরম পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ঐ বাতানুকূল সভাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ৩

নভেম্বর ২০০২ (৯ নভেম্বর নয়) এবং মন্দিরে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন তার পরদিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর ২০০২ (শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিল্লি আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সমাপন সমারোহের সাতদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শাস্ত্রীয় গায়ক রশিদ খাঁ খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশন করেন। এছাড়া স্বামী গিরিজেশানন্দজী, স্বামী তদ্গতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজীর ভজন ও স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর প্রবচন বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

ভাস্কর রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

নারীজাগরণ আজ কোন্ পথে?

কালচক্রের বিবর্তনে বিংশ শতাব্দী শেষ, একবিংশ শতাব্দীরও কিছুটা অতিবাহিত। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফসলে মানবজাতি নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলছে। পুরনো জিনিস সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে নতুনকে। প্রাচীনকে বর্জন করে নবীনকে বরণ করে নেওয়াই মানবজাতির চিরাচরিত প্রথা। প্রগতির ধারা নিরবচ্ছিন্ন। সেই প্রগতির জয়পতাকাও বিদ্যমান চারিদিকে।

কিন্তু তবু এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও 'প্রগতিশীল' নারীদের বছরের একটি আলাদা দিন 'নারীদিবস' বা 'Women's Day' হিসাবে পালন করতে হয় নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণের তাগিদে! একবিংশ শতাব্দীর নারীসমাজ প্রাচীনকালের তুলনায় কতটা উন্নত হতে পেরেছে? কতটা নিরাপদে আছে সে? কতটা মুক্ত আজকের নারীরা? নারী চিরকালই বন্ধন জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

শিক্ষার আলোকে একবিংশ শতাব্দীর নারীসমাজ কিছুটা আলোকিত হতে পেরেছে ঠিকই; কিন্তু সেই আলোর ব্যাপ্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত? সমাজের কয়েকটি মাত্র স্তরেই সেই আলো আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা আজও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি, পারছে না। শুধু শিক্ষার কল্যাণময় স্পর্শ থেকেই যে নারী বঞ্চিত তা নয়, নারী বঞ্চিত বহু ক্ষেত্রেই।

আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিচার করতে গেলে দেখতে পাই, নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা পুরুষের তুলনায় কম। এই একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েও 'কন্যা-পুত্রের' বিভেদ মুছল না—ঘুচল না কুসংস্কার। কন্যাভ্রূণ-হত্যা আজও অব্যাহত। এমনকি শিক্ষিত পরিবার, শিক্ষিত মাতা-পিতাও অনেকসময় কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে থাকেন। জন্ম থেকে বিবাহ—এই বিবাহেও কন্যা অনেকসময় দয়ার পাত্রী, কন্যার পিতার কাছে আমরা 'কন্যাপণ' দাবি করতে পারি নিঃসঙ্কোচে। কন্যাপণ দিতে অক্ষম হলে 'দেনাপাওনা'র নিরুপমার মতো আজও অসংখ্য নবপরিণীতা কন্যা একই পরিণতির সম্মুখীন হন। 'দেনাপাওনা' থেকে একুশ শতক—সময়ের চাকা ঘুরেছে ঠিকই, প্রকৃতির ঋতু বদল হয়েছে তার নিয়ম মেনেই, কিন্তু অবস্থার তারতম্য কি খুব বিশেষ ঘটেছে? সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বধূনির্যাতন, নারীর শালীনতা হানির খবর! সভ্যতার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছালে বন্ধ হবে এইসব ঘৃণ্য অপরাধ? স্বামী বিবেকানন্দের নারীমুক্তির কর্মসূচী কি চিরকাল অধরাই থেকে যাবে?

সমগ্র নারীসমাজের ওপরেই যে এক নিঃসীম অন্ধকারের ছায়া তা নয়—কালকে অতিক্রম করে অল্পসংখ্যক নারী হয়তো এগিয়ে যেতে পারছেন ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষত নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত স্তরের প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা পিছিয়ে পড়ছেন ক্রমশই। শিক্ষা, প্রগতি বহু ক্ষেত্রেই থেকে যাচ্ছে শহরভিত্তিক হয়ে। একুশ শতকের সভ্যতা আর প্রগতির চোখ-ঝলসানো আলোর সামনে সাজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল মেয়েদের পিছনে যে অন্ধকার, সেখানে এখনো কোটি কোটি মেয়ের জীবনের যবনিকাপাত ঘটে যাচ্ছে। আজও নারী অবহেলিত, লাঞ্ছিত, উপহসিত। এইসকল পরিস্থিতির জন্য দায়ী কি আর্থসামাজিক পরিকাঠামো, না নারী নিজেও—যাঁরা বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের পুরুষের 'ইচ্ছার পুতুল' মনে করেন?

নারীর অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার—যে-শিক্ষা তাকে মানসিকভাবে সবল করে তুলবে, দেবে আত্মবিশ্বাস। স্বামীজীর কথা অনুসারে নারীজাতি শক্তির আধার—একথা বিস্মরণ হলে চলবে না।

আরেকটি দিক উল্লেখের প্রয়োজন আছে। আজকের নারীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা—প্রগতিশীল, আধুনিকা হয়ে উঠতে গেলে প্রয়োজন পাশ্চাত্যের অনুকরণের। আমাদের দেশজ সংস্কৃতিকে বর্জন করে, ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভুলে অনেকেই মুখর হন পাশ্চাত্যের অনুকরণে। পাশ্চাত্য সমাজ তাদের মন্দ জিনিস যা বর্জন করছে, ভারতীয় মহিলাদের অনেকেই তা গ্রহণ করছেন দুহাতে—প্রগতির অজুহাতে। কিন্তু তাতে প্রগতির নামে শুধু নিজেদের সঙ্গে প্রবঞ্চনাই করা হচ্ছে।

আজ ভারতবর্ষের একান্ত প্রয়োজন প্রকৃত আদর্শবাদী, স্থিতপ্রজ্ঞা নারীদের—যাঁরা ভবিষ্যতের ভারতের কাণ্ডারী হতে পারবেন। সীতা, দময়ন্তী, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে আজকের নারীদের। স্বামীজী যে বিপুল সম্ভাবনা নারীদের মধ্যে দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করে তোলা নারীসমাজের কর্তব্য। শুধু কন্যা, জায়া, জননী নয়—নারীকে নিজের জন্য খুঁজে নিতে হবে পৃথিবীর একখণ্ড শক্ত ভূমি। তাই এক সার্থক নারীজাগরণ আজ আমাদের সকলের কাছেই একান্ত কাঙ্ক্ষিত। একুশ শতকের মেয়েরা কি পারবে না বিজয়িনীর হাসি হাসতে? পারবে না স্বামীজীর স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে?

অর্চিতা বিশ্বাস
সাম্মানিক স্নাতক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বাগবাজারে 'লক্ষ্মীনিবাস'

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে। (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবার তৃতীয় পর্যায়ে 'লক্ষ্মীনিবাস'।
—সম্পাদক

কবি ও ভগবৎপ্রেমী লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাড়িতে শ্রীমা সারদাদেবীর শুভাগমন সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক ও বিবেকানন্দ-পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। কিরণচন্দ্রের পুত্র সদ্যপ্রয়াত ব্রহ্মগোপাল দত্ত স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ "লক্ষ্মী দত্ত লেনের (পূর্বতন রামকান্ত বোস ফার্স্ট লেন) 'লক্ষ্মীনিবাস' শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ এবং বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর পদধূলিতে পবিত্র। শ্রীশ্রীমা তাঁর ভক্ত সেবকের আহ্বানে এই বাড়িতে তিনবার শুভাগমন করেছিলেন—১৯০৪ সালে যতীন্দ্রলাল মিত্রের পদাবলীকীর্তন শোনার জন্য, ১৯০৯ সালে আন্দুলের কালীকীর্তন শুনতে এবং শেষবার ১৯১২ সালের ২৬ মার্চ অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষ্যে। ঐদিন তিনি অন্নপূর্ণারূপিণী হয়ে ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ছবি স্বয়ং পূজা করে স্বহস্তে তাঁকে অন্নভোগ নিবেদন করেছিলেন—'ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে দেখি তিনি গ্রহণ করেছেন।' কায়স্থ দত্ত পরিবারকে ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদনের অধিকার দিয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'অন্নপূর্ণাপূজার সঙ্গে ঠাকুরের ঐ পূজা করে যেও, বন্ধ করো না।' সেই পূজা দত্তবাড়িতে এখনো অব্যাহত রয়েছে।"[১]

বাগবাজারে 'লক্ষ্মীনিবাস' • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

এই প্রসঙ্গে আরো তথ্য পাওয়া যায়—"স্বগৃহে মাথুর-কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়া বাগবাজারের কিরণ দত্ত শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। পদাবলীগায়ক যতীন্দ্র মিত্র (গ্রন্থপ্রণয়নকালে ইনি পাটনা হাইকোর্টের উকিল) পেশাদার কীর্তনীয়া ছিলেন না, অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই গান খুব জমিয়া যায়। সেই রাত্রেই অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া যতীনবাবু শ্রীমতীর বিরহের অবস্থার গান শেষ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় গোলাপ-মা চিকের ভিতর হইতে বলিলেন, 'একখানা মিলনের গান গেয়ে শেষ করো।' কোনরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন করাইয়া দিয়া কীর্তন সমাপ্ত হইল, শ্রোতারাও একে একে আসর ত্যাগ করিয়া গেলেন। গানের সূচনাতেই মা কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, গান শেষ হইলেও সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। কিছুতেই ভাব ভঙ্গ হয় না দেখিয়া গোলাপ-মা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া কোনরূপে জলযোগের মতো যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন এবং গাড়িতে উঠাইয়া বাড়িতে লইয়া আসিলেন।"[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দত্ত পরিবারের কাশীতে 'লক্ষ্মীনিবাসে'ও শ্রীশ্রীমা প্রায় আড়াই মাস বাস করেছিলেন। এই সম্পর্কে আরো উল্লিখিত আছে—"১৩১৯ সালের ৺দুর্গাপূজার কিছুদিন পর শ্রীমা কাশীধামে উপস্থিত হন (২০ কার্তিক, ৫ নভেম্বর ১৯১২)। বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রমে পদার্পণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি পার্শ্ববর্তী বাগবাজারের দত্তবংশের নবনির্মিত বাটী 'লক্ষ্মীনিবাসে' চলিয়া যান। এই বাড়িতে তিনি প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। তাঁহার শুভাগমন হইবে বলিয়া গৃহস্বামীরা অল্পদিন পূর্বে গৃহপ্রবেশকার্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইবারে শ্রীমায়ের সহিত গোলাপ-মা, জয়রামবাটীর ভানুপিসি, কোয়ালপাড়ার কেদারবাবুর মা, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী ও শ্যালিকা, মাস্টার মহাশয়, বিভূতিবাবু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছিলেন। বাড়ির প্রশস্ত

বারাণ্ডা দেখিয়া মা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।' শ্রীমা ঐ বাড়ির উপরে থাকিতেন; স্ত্রীভক্তেরাও সেখানে থাকিতেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতি পুরুষ-ভক্তেরা নিচে বাস করিতেন।"[৩]

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, কিরণচন্দ্র দত্ত (১৮৭৬-১৯৬০) বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন এবং পরবর্তী কালে স্বপ্নে স্বামীজীর কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন। পরে মন্ত্র সম্পর্কে তাঁর কিছু সংশয় হলে শ্রীশ্রীমা ঐ মন্ত্র শোধন করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে দীক্ষাদান করেন। কিরণচন্দ্র আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কিছুকালের জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির 'রিসিভার' নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৭-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতার 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিছুকাল তিনি 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর নামাঙ্কিত এবং তাঁদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিরণচন্দ্র জড়িত ছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই ঘরে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে পূজা করেছিলেন • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

পথনির্দেশ : 'লক্ষ্মীনিবাস'-এর ঠিকানা : ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩। বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরের সামনে দিয়ে রামকান্ত বসু স্ট্রিট বরাবর কিছুদূর গেলে বাঁদিকে পড়বে লক্ষ্মী দত্ত লেন। এই গলিতে ঢুকে ডানদিকের প্রথম বাড়িটিই শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য 'লক্ষ্মীনিবাস'। রাজবল্লভপাড়া স্ট্রিট দিয়েও এখানে আসা যায়। এই পথ দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ডানদিকে পড়ে লক্ষ্মী দত্ত লেন। এই গলিটি যেখানে রামকান্ত বোস স্ট্রিটের সঙ্গে মিশেছে, তার আগে বাঁদিকের বাড়িটি 'লক্ষ্মীনিবাস'। ❑

তথ্যসূত্র

১ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম সং, ১৯৯৮, পৃঃ ১০৮
২ শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ৮ম সং, পৃঃ ৫৯-৬০
৩ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, নভেম্বর ১৯৮১, পৃঃ ২৯১

চয়ন

আনন্দ ও অনুদুঃখ

আনন্দ কে ভোগ করে? —মন
আনন্দ কখন ভোগ হয়? —অন্তর্মুখ অবস্থায়।
আনন্দ কোথা থেকে আসে? —স্বরূপ থেকে।

ঈশ্বর-সৃষ্টি ত্যাগ হয় না। ঈশ্বর-সৃষ্ট আকাশাদি কোথায় ত্যাগ করবে? জীব-সৃষ্ট দ্বৈতই ত্যাগ করা যায়—অহংতা মমতা ত্যাগ।

জীব-সৃষ্ট রাগ, দ্বেষ যাবতীয় ব্যবহারের কারণ। একই ব্যক্তিকে দর্শন করে বিভিন্ন ব্যক্তির চিত্তে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। ব্যবহারও সেরকম ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অনুদুঃখই দূর হয়। জ্ঞানে দুঃখ দূর হয় না। কর্মজ দুঃখ জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই হবে। কিন্তু জ্ঞানীর অনুদুঃখ হয় না। অনুদুঃখ হয় অহংতা, মমতা থেকে। বিষাদ, বিলাপ, 'হায় হায়' করা—এসবই অনুদুঃখ। জ্ঞানীর এগুলি হয় না।

কর্মজ ব্যাধি তো হবেই। তার দুঃখ তো হবেই। সেগুলি হয় প্রারব্ধ কর্মবশত। সে তো আর ভোগ ছাড়া ক্ষয় হবে না! ❑

হৃদ্‌রোগের আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি 'অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি'

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনারি আর্টারি ডিজিস (সি. এ. ডি.)—চলতি কথায় যাকে আমরা 'হৃদ্‌রোগ' বলে থাকি তা আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এই বৃদ্ধির হার এতই বেশি যে, ২০১৫ সাল নাগাদ এই রোগ ভারতবর্ষে মহামারীর আকার ধারণ করবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। শুধু তাই নয়, ৩৫-৪০ বছর বয়সের লোকেদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা দেবে।

হৃদ্‌রোগ ঠেকাতে আমাদের দেশে এখন আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হলো 'অ্যাঞ্জিও-প্লাস্টি'। এই পদ্ধতিতে হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় রোগীর ধকল সইতে হয় খুবই কম। তাই এটি ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাইপাস অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে।

করোনারি আর্টারি ডিজিজের অন্যতম কারণ

আমাদের শরীরে রক্তচলাচলের প্রধান পথ হলো ধমনী। কোন কারণে যদি সেই পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে রক্তচলাচল করতে পারে না। তখনি দেখা দেয় হৃদ্‌রোগের নানা উপসর্গ। রক্তচলাচলের পথে অর্থাৎ ধমনীর মধ্যে বাধার সৃষ্টি হতে পারে নানা কারণে। যেমন —রক্তবাহিত বর্জ্যপদার্থ জমে, চর্বিজাতীয় পদার্থ (কোলেস্টেরল বা লিপিড প্রোফাইল) জমে ইত্যাদি। এইসব চর্বিজাতীয় পদার্থ ধমনীর দেওয়ালে ধীরে ধীরে জমে তা মোটা করে দেয়। ফলে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তচলাচলের পথ ক্রমশ সরু হয়ে যায়। এইভাবে ধমনীর বিভিন্ন জায়গায় ব্লকেজ বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এই প্রতিবন্ধকতাই করোনারি আর্টারি ডিজিজের অন্যতম কারণ। ধমনীতে চর্বি জমে রক্ত-চলাচলের পথ সরু হয়ে যাওয়াকে ডাক্তারি পরিভাষায় 'অ্যাথেরোসক্লেরোসিস্' বলে।

রোগ সারাতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

'অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি' শল্যচিকিৎসায় যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে কোন হৃদ্‌রোগীর দেহে কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু কুঁচকির কাছে একটি শিরা ফুটো করে একটি রবার-জাতীয় সরু নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই নলটির সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের প্রধান তিনটি ধমনীর মধ্যে একটি রঞ্জক পদার্থ ইঞ্জেকশন করা হয়। এরপর টিভির পর্দায় শরীরের ভিতরের ছবি ফুটে উঠলে সহজেই ব্লকেজগুলি চিহ্নিত করা যায়। এরপর চিকিৎসকের কাজ হলো একটি বিশেষ ধরনের 'ক্যাথিটার' (যার মুখটি বেলুনের মতো ফোলানো যায়) সেই স্থানে নিয়ে গিয়ে ব্লকেজগুলি দূর করা।

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি কিভাবে করা হয়

প্রথমে একটি সরু তারের সঙ্গে বিশেষভাবে তৈরি ক্যাথিটারটি যেখানে ধমনীতে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে রক্ত-

চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে ধমনীর অবস্থা

চলাচলের রাস্তা সরু হয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বাইরে থেকে ক্যাথিটারের মুখটি অর্থাৎ বেলুনটি ফুলিয়ে দেওয়া হয়। ফোলানো বেলুনের চাপে চর্বিজাতীয়
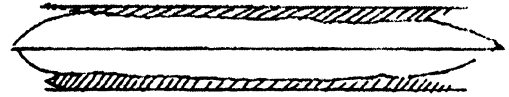
ধমনীর ভিতরে ফোলানো বেলুন

পদার্থগুলি (ব্লকেজ) ধমনীর গায়ে চেপে বসে যায়। ফলে রক্ত-চলাচলের পথটি আবার প্রশস্ত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে রক্তচলাচল করতে পারে ও রোগী সুস্থ বোধ করে। এই পদ্ধতিতে হৃদ্‌রোগের চিকিৎসাকে বলে 'অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি' অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পর রোগী স্বাভাবিক
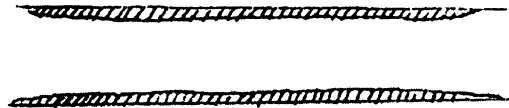
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরে ধমনীর ভিতরের অবস্থা

জীবনযাপন করতে পারে, অথচ বাইপাস অপারেশনের ধকল সইতে হয় না। তবে এই চিকিৎসাপদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই পদ্ধতিতে যেসব রোগীর চিকিৎসা করা হয় তাদের মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ রোগীর ছয়মাসের মধ্যে পুনরায় ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি যাতে সফল হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে চিকিৎসকরা এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে তাঁরা একটি তারের জালিকা বা স্টেন্ট ব্যবহার করে ধমনীর পুনরায় সরু হয়ে যাওয়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। স্টেন্টটি ধমনীর মধ্যে বসানোর জন্য একটি বেলুন ক্যাথিটারের সঙ্গে ধমনীর সরু জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বেলুনটি ফোলানোর

সঙ্গে সঙ্গে স্টেন্টটি খুলে গিয়ে ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে চেপে বসে যায়। ফলে ধমনীর ভিতর পুনরায় ব্লকেজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে। তবে স্টেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও

ধমনীতে তারের জালিকা বা স্টেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে

অসুবিধা দেখা দিতে পারে। স্টেন্ট অর্থাৎ তারের জালিকা ধমনীর দেওয়ালে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। এই ক্ষতের দরুন ধমনীর দেওয়ালে কোষের বিভাজন শুরু হয়ে তা দ্রুতহারে বেড়ে ধমনীকে পুনরায় ব্লক্‌ড করে দিতে পারে। এইভাবে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা রোগীদের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশের ধমনী পুনরায় ব্লক্‌ড হতে পারে। কোষবিভাজনকে আটকানোর জন্য অনেক সময় রেডিয়েশন দিয়ে স্কার টিস্যুগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

'র‍্যাপামাইসিন' আবিষ্কার হওয়ার পর কোষ-বিভাজনকে প্রায় পুরোপুরি প্রতিহত করা গেছে। এই ওষুধটির প্রলেপ দিয়ে ধমনীর ভিতর কোন স্টেন্ট বসালে তা কোষবিভাজন করে না বললেই চলে। ফলে ধমনীর ভিতরে রক্তচলাচলের পথ পুনরায় সরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বর্তমানে কলকাতাতেও এই চিকিৎসাব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তবে এর খরচ (প্রায় দেড় লক্ষ টাকা) পড়ে বলে এখনো এটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই বলা চলে। ❑

শবাসন কী ও কেন?

স্বপনকুমার দাশ
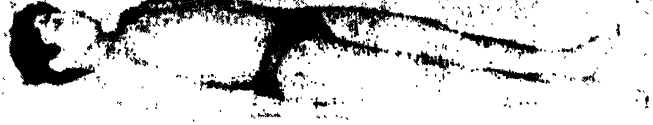
সুদূর বৈদিক যুগের নবপ্রভাতে যাঁদের মানসলোক চৈতন্যের বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁরা এই ভারতবর্ষের মহান মুনি-ঋষিবৃন্দ। তাঁদের চিন্তা থেকে ধ্যান ও অনুশীলনের স্তরক্রম পেরিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি তত্ত্ব, যা আজও সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। এই তত্ত্ব হলো 'যোগতত্ত্ব' বা 'যোগবিদ্যা'।

সেই যোগবিদ্যার আলোকে আমাদের জীবন কেমন আমূল পালটে যায়—সেই কথাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকোলাহলে আমরা বিভ্রান্ত হই, কখনো দুশ্চিন্তায় ভুগি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় বিপর্যস্ত হই। অবশেষে আমাদের মনের ওপর নেমে আসে অবসাদ। ক্লান্তি আর অবসাদ আমাদের তিলে তিলে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়।

এই অন্ধকার আমরা চাই না। আমরা চাই সুস্থ ও আলোকিত জীবন। এর জন্য যা প্রয়োজন তা বৈদিক মুনি-ঋষিগণ বহুকাল আগেই বলে গেছেন। প্রথম প্রয়োজন 'শবাসন'। শবাসনে এই উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, টেনশন থেকে অহেতুক উত্তেজনার প্রশমন হয়। আমরা নতুন করে যেন বেঁচে উঠি, কর্মতৎপর হই। রক্তচাপবৃদ্ধি হ্রাস পায়।

শবাসন অর্থাৎ মৃতের মতো নিস্পন্দভাবে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। এই শবাসন অভ্যাস করার সময় মনে ব্যবহারিক জীবনের কোন দেনা-পাওনা থাকবে না, কী পেয়েছি বা কী পাইনি তার হিসাবনিকেশ চলবে না। শবাসন অভ্যাসের ফলে আমাদের নিউরো মাসকুলার ইউনিটের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ে, আর তাতে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হয়, চিন্তাচ্ছন্ন স্নায়ুগুলি বিশ্রাম পায়, শরীরের ভিতরকার স্নায়ুগুলি কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বেশি বিশ্রাম পায় আমাদের ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকে অথবা কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ২০-২৫ মিনিট শবাসন করলে ফিরে আসে নতুন কর্মশক্তি, উদ্যম ও মানসিক শান্তি। ফিরে আসে নতুন দিন শুরু করার প্রেরণা।

বাড়িতে এমন একটা নির্জন জায়গা আমাদের বেছে নিতে হবে, বাইরের জগতের সঙ্গে যার কোন যোগা-যোগ থাকবে না, সেখানে সম্পূর্ণ একা থাকা যাবে। টেলিফোন এলে কেউ ডাকবে না, টিভির আওয়াজও পৌঁছাবে না। এই কর্ম-কোলাহলমুক্ত স্থানে প্রতিদিন শবাসন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ। ❑

কথামুখে শ্রীমদ্ভাগবত

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক :
এইচ. রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি, ন্যাশানাল প্লেস
বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১ ৩০৬
মূল্য : ৭৫ টাকা
পৃঃ ১৬+২২৮
প্রকাশকাল : ১৯৯৭

'শেষ নাই যে শেষ কথা কে বলবে।' মহর্ষি বেদব্যাস-কৃত, বাক্যমনাতীত আনন্দরসঘন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরিতগাথা শ্রীমদ্ভাগবত নিঃসৃত হয়েছে ব্যাসপুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের শ্রীমুখ থেকে। পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তিরসে আপ্লুত গৃহত্যাগী আত্মারাম ব্রহ্মর্ষি তিনি। তিনি পরম-রসবারিধি। অহৈতুকী ভক্তিরসের পথযাত্রী—অভিযাত্রী। ভক্তিরস গণ্ডূষে পান করতে করতে যে অ-ক্ষর বচনামৃতের ক্ষরণ ঘটাচ্ছেন, তাতে স্নাত হচ্ছেন মৃত্যুর পরোয়ানা-হাতে রসপথিক এক জিজ্ঞাসু রাজা—কুরুবংশজ পরীক্ষিৎ। এসবই সেই আনন্দরসঘন পরমপুরুষের রসলীলার টানা আর পোড়েন।

যে-কথার 'শেষ নাই', সেই রসসিন্ধু-রসকথাকে রসবিন্দু-মধ্যে দর্শালেন যিনি, তিনি ভাগবত-রসস্নাত এযুগের এক প্রাজ্ঞ কথক-আচার্য গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখনীপ্রসূত **'শ্রীমদ্ভাগবতের কথা'** এক অমূল্য রতন। একে নির্দ্বিধায় শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের কথামুখ বলা যায়। এই কথামুখের প্রারম্ভেই উপস্থাপিত হয়েছে 'শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসঙ্গ' এবং তাতে স্পন্দিত হয়েছে গভীর-গহন চৈতন্যরাজ্যের অন্তঃপুরচারিণী উন্মীলনী, উদ্ভাসী-ভাষা।

বেদ-উপনিষদের উন্মুক্ত অলিন্দ পেরিয়ে এক মহাযুগ-সন্ধিক্ষণে গীতায় শ্রীভগবানের কণ্ঠে নিনাদিত হয়েছিল আত্মস্বরূপ-ঘোষণা 'মামেকং শরণং ব্রজ'। (১৮।৬৬) সেই শরণপথই অগ্রগামী হয়ে যে-ভক্তিপথের সঙ্গে মিলিত হলো—সেই পথই শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত ভক্তিরসপথ। মধুরভাবের শ্রীরাজ্য যেন। তাই আচার্যের ভাগবতী কথামুখে প্রকাশ পেয়েছে যেন সেই বেদ-বেদান্ত-গীতাবাণীর কালচক্রে আবর্তনের আস্বাদ আর মধুররসে আপনাকে দ্রবীভূত করে পরমনিদান শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তীব্র ব্যাকুলতা। গ্রন্থসমাপ্তিতে সংযোজিত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়-কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্ব' দেহ-বীণার ঘাটে ঘাটে ঝঙ্কৃত সেই স্বানুভববেদ্য ব্যাকুলতার অনুরণন যেন। যেন অনন্ত ব্রহ্মাস্বাদনের রুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে খুলে দিয়ে কাঙাল চিত্তকে আনন্দের রসে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। নিজানন্দে মগ্ন ভক্তের চিদ্‌বিভূতির দ্বার পেরিয়ে দেহ-মনের সুদূর পারে আপনাকে হারিয়ে ফেলার প্রয়াসে যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্পন্ন হয়, তাই-ই ক্ষরিত ভাগবত-রসামৃতপান। এই পুনঃ পুনঃ পানই সংসারবন্ধন ছিন্ন হওয়ার কারণ।

গ্রন্থনার মধ্যভাগ স্তবাকীর্ণ। আকুল পাগল-পারা ভক্ত-হৃদয়ের না-বলা-বাণী স্তবকে স্তবকে নিজ তনু বিস্তার করেছে। পুষ্পিত হয়ে বরণ করেছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। গ্রথিতা বাণী যেন মূর্ত হয়ে একেকটি আকুতির রূপ পরিগ্রহ করেছে—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। (কঠ উপনিষদ্, ২।২।৯) কখনো সে ভক্তিপ্রাণা কুন্তীরূপে গদগদ স্বরে স্তুতি করেছে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শেষে অঘটনঘটনপটু প্রয়াণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণের। কখনো সে উত্তরায়ণের পুণ্যলগ্নের জন্য অপেক্ষমাণ জ্ঞানসূর্য ভীষ্মের কুসুমিত হৃদয় থেকে পুষ্পিতাগ্রা ছন্দে উৎসারিত হয়েছে আত্মসমর্পণের আর্তিতে—আত্মবিলয়ের স্তুতি হয়ে। আবার কখনো সে ভগবৎপ্রেমে আহ্লাদিত অথচ ত্রস্ত, বিপন্ন বালক প্রহ্লাদের রূপ পরিগ্রহ করে ভজনা করেছে অকল্পনীয় ভয়ঙ্কররূপে দণ্ডায়মান পিতৃহন্তা শ্রীকৃষ্ণের রুধিরপ্লাবিত চরণযুগল। গোপীস্তবে সেই না-বলা-বাণীই গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত প্রেমিক ভগবানের সঙ্গে নিলীন হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠেছে আকুল। তাই গোপীদের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রীভগবান পূজিত হচ্ছেন রম্যা হ্লাদিনী-স্তুতিতে। সর্বশেষে গ্রথিত হয়েছে বেদস্তুতি। যে-বেদরাশি সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমপুরুষের নিঃশ্বাসবৎ, সেই বেদরাশিকেই অতিক্রম করে শ্রীভগবান চির-অস্তিতায় অটল রয়েছেন—'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'। (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১) এ যেন সৃষ্টি দিয়েই সৃষ্টির পারে যাওয়ার উদগ্র কামনা—এ যেন অনন্তের পথে উশতী বাণীর অভিসার।

ভাগবতী কথাসার এই অমূল্য গ্রন্থটি দুর্ভাগ্যবশত মুদ্রণপ্রমাদ-দোষদুষ্ট। গ্রন্থের নামকরণ 'শ্রীমদ্ভাগবতের কথা', না 'ভাগবতের কথা'—এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যাচ্ছে না। 'শ্রীমদ্ভাগবত স্তবসুধা'র অন্তর্গত স্তবগুলির মধ্যে কুন্তী এবং ভীষ্মের স্তব বেশ কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী 'শ্রীমদ্ভাগবত স্তবসুধা' —এই সাধারণ নামে চিহ্নিত হয়েছে। গ্রন্থকার গ্রন্থভূমিকায় মুদ্রণকারের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেও সফলকাম হননি। অধিকন্তু, এই মূল্যবান গ্রন্থের তুলনায় কাগজের গুণগতমান উচ্চাঙ্গের নয়। ❑

সঙ্গীতশিক্ষার নতুন পদ্ধতি

স্বামী সর্বগানন্দ
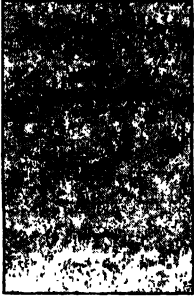
নবধারায় প্রাথমিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা (১ম ভাগ)
কিরণকুমার মিত্র
প্রকাশক :
প্রজ্ঞা-পারমিতা দেবী
'কীর্তন কুটীর'
বাঘাযতীন, কলকাতা-৯২
মূল্য : ৫০ টাকা
পৃঃ ১৬+৮৮
প্রকাশকাল : ১৯৯৯

সাধারণত হালকা গান শেখার দিকেই আজকাল ছেলেমেয়েদের নজর বেশি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রীতি জাগানোর ব্যাপারে অবশ্য অভিভাবকদেরও দায়িত্ব যথেষ্ট অধিক। তার প্রথম শর্ত হলো তাঁদের নিজেদেরও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসিক হতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর বেশ কয়েক দশক ধরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে আকাল চলছিল, তা এখন সমাপ্তির পথে চলেছে বলেই মনে হয়। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, এখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি ছেলেমেয়েদের ঝোঁক বেড়েছে। যদিও দীর্ঘক্ষণ তানপুরা বা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে বসে গলা সাধার ধৈর্য অনেক সময়েই তাদের থাকে না, তবু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি রুচি হয়েছে—এটাই আশার কথা। সিদ্ধ গায়ক বা বাদকদের জীবনের ঘটনা এখন এক-একটি প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের মধ্যে ১০-১২ ঘণ্টার রেওয়াজ এখন নিছক কল্পনা। আর ইলেকট্রনিক্স-এর দৌলতে সবকিছু ন্যানো সেকেণ্ডে করতে হবে—অর্থাৎ এক্ষুণি চাই! সাধনার সময় নেই। পিঠে যেন একটা দমকলের ঘণ্টা বাঁধা! গানের শিক্ষকদের তাই বড়ই দুরবস্থা। ছাত্রছাত্রীরা ছ-মাসেই আমির খাঁ কিংবা বেগম আখতার হয়ে উঠতে চায়। বহু অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ কিরণবাবু সবদিক বজায় রেখে একটি স্বকীয় সঙ্গীতশিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ছোট ছেলেমেয়েদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অনেক গবেষণা চলছে। সহায়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, হচ্ছে। 'নবধারায় প্রাথমিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা' গ্রন্থটিও একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ।

দেখতে ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র নয়। বয়সের তারতম্য অনুসারে শিক্ষাপদ্ধতিগত তারতম্য থাকেই। কিন্তু খুব অল্পবয়সের শিক্ষার্থীর জন্যও যেমন, তেমনি কিশোর-কিশোরীদের জন্যও এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী হয়েছে। প্রথমে ভৈরব রাগের ওপর তান ও পাল্টা অভ্যাস করার কথা বলেছেন লেখক। বস্তুত, স্বরসাধনা ছাড়া কোন গানই সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় কেবল ভৈরব নয়, শুদ্ধ স্বরের ওপরেও তান ও পালটা অভ্যাসের প্রয়োজন প্রথম থেকেই করানো দরকার। কিরণবাবুর ইচ্ছা ছিল প্রথমত, শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা 'ভাল-লাগা' সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়ত, অল্পসময়ের মধ্যে তাদের মনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করা। উভয় ক্ষেত্রে তিনি খানিকটা সফল হয়েছেন। গ্রন্থটি পড়ে মনে হলো, এটি শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকেরই বেশি কাজে লাগবে। অবশ্য শিশুদের এইভাবে অভ্যাস করানোর জন্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিজস্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। কারণ প্রথম শিক্ষাক্রম, দ্বিতীয় শিক্ষাক্রম ইত্যাদি পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীকে ক্রমশ সরল থেকে জটিলে নিয়ে গিয়েছেন। একেবারে শুরুতে হারমোনিয়াম বাজানো শিক্ষা, অঙ্গুলিচালনা এবং লয় (বিলম্বিত, ঠায়, দ্বিগুণ) শিক্ষার কথা বলেছেন লেখক। সব ছাত্রছাত্রীর তানপুরা থাকে না, তাই হারমোনিয়ামের চল বেশি। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে হারমোনিয়াম প্রকৃতপক্ষে অচল। কল্যাণকৃৎ লেখক একথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি এবং বিশেষ করে ধ্রুপদ গাইতে গেলে সূক্ষ্ম শ্রুতি-চেতনা দরকার। এই শ্রুতি-ভিত্তিক শিক্ষায় লেখক শিক্ষক হিসাবে জোর দেবেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থে উল্লিখিত তান বা পাল্টাগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন হারমোনিয়াম নিয়ে গাইলেই সুবিধা হবে। এব্যাপারে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হারমোনিয়াম নয়, তানপুরাও নয়, শিক্ষার্থীর লক্ষ্য সুর। আর মানুষ তো সুরের মাধ্যমেই সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে উপনীত হয়।

ভারত সরকার হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে লেখককে সিনিয়র ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, এই গ্রন্থের প্রকাশনার ব্যাপারেও সাহায্য করেছেন। সুতরাং সরকার অভিনন্দনযোগ্য কাজই করেছেন। তারাপদ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, ওস্তাদ লতাফত হুসেন খাঁ প্রমুখ লেখকের প্রয়াত গুরুকুলের আশীর্বাদ ও প্রেরণা তাঁর এই প্রাপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করেছে—সেকথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ❑

ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৌষ ১৪০৯				
১০০৬	১	১ম এবং ৩য়	'শ্রীমতী রাইট'	'শ্রীমতী নাইট'
ফাল্গুন ১৪০৯				
৮৮	১	শিরোনামে এবং ১ম ও ২৭তম	'মে ভক্ত'	'মে ভক্তঃ'

পৃঃ	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ফাল্গুন ১৪০৯				
৮৮	১	৪র্থ	'কড়জোড়ে'	'করজোড়ে'
৯৫	২	২১তম	'The Gosple'	'The Gospel'
১২৭	২	সহায়ক গ্রন্থের ২০তম	'Karl Mark Penguine'	'Karl Marx Penguin'

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

গঙ্গাসাগর মেলা

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই **মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)** গঙ্গাসাগর মেলায় বিভিন্নভাবে তীর্থযাত্রীদের সেবা করে আসছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও আশ্রম বিনামূল্যে তীর্থযাত্রীদের থাকা, খাওয়া প্রভৃতির জন্য অস্থায়ী শিবির পরিচালনা করেছিল। শিবিরে প্রায় ৫০০ যাত্রীর সমাগম হয়। প্রত্যহ 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, হিন্দি প্রবচন প্রভৃতির মাধ্যমে শিবিরে আধ্যাত্মিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মনসাদ্বীপ আশ্রম এবার ৩,৪৫২ জন রোগীকে চিকিৎসাত্রাণও দিয়েছে এবং দুঃস্থ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১৬০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

গঙ্গাসাগর হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। মহর্ষি কপিল মুনি এখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কথিত আছে, সগর রাজার প্রপৌত্র অর্থাৎ নাতির ছেলে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ৬০ হাজার পুত্রকে গঙ্গার পবিত্র জলধারার দ্বারা জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার পর থেকেই এই পবিত্র জলে স্নান করে পুণ্য অর্জনের জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড় হচ্ছে প্রতি বছর পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তির সময়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের প্রায় সকল রাজ্য থেকে তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয়। অবশ্য এবছর বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা থেকে আগত মানুষের ভিড় ছিল বেশি। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ছিল কম।
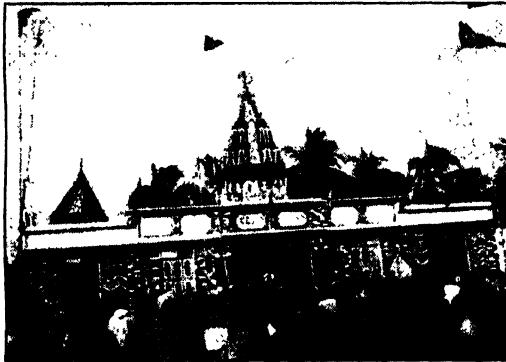
কপিল মুনির মন্দির • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে কপিল মুনির একটি মন্দির আছে। প্রাচীন মন্দির জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় এই নতুন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কপিল মুনি, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্তি আছে। পূর্বে কুসংস্কারবশত কোন কোন সন্তানহীনা নারী সন্তানবতী হওয়ার আশায় মানসিক করে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়ে আসত। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পূর্বে তীর্থযাত্রীরা হেঁটে বা নৌকা করে এই তীর্থে স্নানাদি করতে আসত। এব্যবস্থা যেমন ছিল কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। বর্তমানে যাতায়াতের বহু সুবিধা হয়েছে। এখন কলকাতা থেকে বাসে বা ট্রেনে কাকদ্বীপ, নামখানা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নৌকা বা স্টিমার-যোগে গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়। এছাড়া কলকাতা থেকে নামখানা বা কাকদ্বীপগামী বাসে 'নতুন রাস্তা' স্টপেজে নেমে সেখান থেকে রিক্সা কিংবা বাসে ৮নং লটে আসা যায়। সেখান থেকে লঞ্চে নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়ায় আসতে হয়। কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার বাস আছে।

গঙ্গাসাগরের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যবহ। এটি সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি গ্রাম। তবে তীর্থমাহাত্ম্যে ৫৯৪ বর্গ কি.মি.-বিশিষ্ট এই দ্বীপটি 'গঙ্গাসাগর' নামে পরিচিত। এর উত্তর-পশ্চিমে হুগলি নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অনেকের মতে, এই দ্বীপে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ভগ্নপ্রায় ইঁটের বাড়ি ও প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি পূর্বে বিশেষ সমৃদ্ধশালী দ্বীপ ছিল। কিন্তু ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ বন্যায় এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। পরে ইংরেজ আমলে উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলতে থাকে। ফলে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি লাইট হাউস নির্মিত হয়। তারপর ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দ্বীপে মানুষ বাস করতে শুরু করে। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড ঝড়ে বহু মানুষ মারা যায়। এইসব অবস্থার মধ্য দিয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোকের বসতিও হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় সাধু-সমাগম • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

মেলার একাংশ • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

বর্তমানে মেলায় তীর্থযাত্রীদের আসা সুগম করার জন্য বহু রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং যানবাহনেরও অপ্রাচুর্য নেই। তাই এবছর মেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়েছিল। ভিড় বেশি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত যাত্রীদের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রী ভিন্ন সাধুগণেরও সমাগম হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের সুব্যবস্থার জন্য এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ করেছে। সাগরদ্বীপের রামকৃষ্ণ মিশন মনসাদ্বীপ আশ্রমের ইতিবৃত্ত 'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৯ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিন ধরে এদিন হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠ (হুগলি) : গত ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানে প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকশিক্ষা পরিষদ ও ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এছাড়া এই উপলক্ষ্যে একটি সেমিনার ও কৃষিমেলা আয়োজিত হয়।

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান) : গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং আশ্রম পরিদর্শন করেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয় (বেলুড় মঠ) : বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান (নিউ দিল্লি) পরিচালিত ২০০২ সালের পূর্ব মধ্যমা (মাধ্যমিক) ও উত্তর মধ্যমা (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

ত্রাণ

খরাত্রাণ

চেন্নাই মঠ (তামিলনাড়ু) তাঞ্জোর ও তিরুভারার জেলার ৪,১৩২টি খরাক্লিষ্ট পরিবারকে পরিবার প্রতি ১৮ কে.জি. চাল বিতরণ করেছে।

দুঃস্থত্রাণ

আলসুর আশ্রম (কর্ণাটক) ব্যাঙ্গালোরের চারপাশের দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৩৫০টি শাড়ি ও ৩৫০টি ধুতি বিতরণ করেছে।

অগ্নিত্রাণ

বিশাখাপত্তনম আশ্রম (অন্ধ্রপ্রদেশ) আশ্রমের কাছাকাছি গোল্লালাপালেম গ্রামের ১২৭টি পরিবারের মধ্যে বাসনপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গঙ্গাপালেম গ্রামের ২৮০টি পরিবারের মধ্যে ব্যবহৃত পোশাক বিতরণ করেছে।

শৈত্যত্রাণ

বেলুড় মঠ সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে প্রায় ৩,৫০০ কম্বল বিতরণ করেছে। এছাড়া আলং আশ্রমের মাধ্যমে ৫০০ কম্বল, চণ্ডীগড় আশ্রমের মাধ্যমে ৬৮টি কম্বল, লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে ২১০টি কম্বল ও ১৬০টি গরম পোশাক, রাঁচি স্যানাটোরিয়ামের মাধ্যমে ৩৬৫টি কম্বল এবং বৃন্দাবন আশ্রমের মাধ্যমে ৩০০ কম্বল ও শাল বিতরিত হয়েছে।

পুনর্বাসন

গুজরাট ভূমিকম্প পুনর্বাসন

গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত এলাকায় বাসগৃহ ও বিদ্যালয় নির্মাণকল্পে **বেলুড় মঠ** যেসমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তা **গুজরাটের শাখাকেন্দ্র** ও **শিবিরের** মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। একবছর আগে **ধানেতি** ও **মোরবি শিবিরের** মাধ্যমে যথাক্রমে ২৫২টি ও ৩৮টি বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। নির্মাণের পর বাড়িগুলি গত জানুয়ারির মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে গৃহীত ৮০টি বাড়ির মধ্যে ৩০টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৫০টির কাজ চলছে। **ধানেতি, মোরবি** ও **সুরেন্দ্রনগর শিবিরের** মাধ্যমে যথাক্রমে ৩টি, ১০টি ও ৭টি বিদ্যালয় নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হয়েছে। **লিমডি** ও **পোরবন্দর আশ্রমের** গৃহীত ২৪ ও ৩৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি ও ৩৫টি বিদ্যালয় হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ১টির নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২টির কাজ এখনো চলছে। এই পুনর্বাসন প্রকল্পে প্রায় ১৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী গুণময়ানন্দ (ভক্ত মহারাজ) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৫ জানুয়ারি ২০০৩ সকাল ৭টায় দেহত্যাগ করেন।

দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। যদিও কয়েক বছর ধরে তিনি ডায়াবিটিসে ভুগছিলেন, তথাপি আশ্রমিক কাজ যথানিয়মে উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করছিলেন। তাঁর এই শরীরত্যাগ অপ্রত্যাশিত ছিল।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৯ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি কানপুর, কামারপুকুর ও কাশীপুর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯১-১৯৯২ সালে তিনি উত্তরকাশীতে কয়েক মাস যাবৎ ত্রাণকার্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ-সরল, অমায়িক ও প্রফুল্ল প্রকৃতির। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ **শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ**, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ **শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ** এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ **শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি পালন করা হয়। এই তিথিগুলিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী জপপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী সর্বগানন্দজী এবং স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চন্দন সেন। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভাষণ দেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, গীতিনাট্য ও আলোচনাসভা মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপিকা রায়, দোলন ঘোষাল ও তপতী রায়। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন পার্বতীনাথ হাজরা। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের তাৎপর্য' বিষয়ে আলোচনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। পালাকীর্তন পরিবেশন করেন শ্রীকুমার অধিকারী ও সম্প্রদায়। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী ও স্বামী কল্যাণানন্দ পুরী। দুপুরে প্রায় ১৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) : গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ ও ১৫ জন দুঃস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ শোভাযাত্রা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বিনামূল্যে ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিবস পালন করা হয়।

দশঘরা রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণ সেবা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। আলোচনা করেন বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, তরুণ গোস্বামী ও অমিয় অধিকারী।

বহিচাড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ আশ্রম, তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী ও স্বামী কালাতীতানন্দজী। এদিন প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন 'দুই ভাই' সম্প্রদায়। পরদিন ৩০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বাউলগান ও নাটক।

যাদবপুর নিবেদিতা নারী সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) : গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার বাণী পাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বাসুদেবানন্দজী, স্বামী সৎপ্রভা-নন্দজী, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, তরুণ গোস্বামী এবং প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণাজী। যুব-প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করেন অয়ন দাস, মণিদীপা মজুমদার প্রমুখ। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন পূর্ণিমা ঘোষ, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২৭৬ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

সাঁকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবরূপপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা মদ্ভাবপ্রাণাজী।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, বেদ,

'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, চণ্ডীচরণ মণ্ডল প্রমুখ। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন কৃষ্ণা দাস, বিনীতা চন্দ্র, ডঃ অপূর্বকুমার ঘোষ প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। দুপুরে প্রায় ১,৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র (বাঁকুড়া) : গত ৩০ ডিসেম্বর ২০০২ পাঠচক্রের প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'চণ্ডী' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ১৫ জন দুঃস্থ মানুষকে কম্বল প্রদান করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী লোকেশানন্দজী। সন্ধ্যায় বাউল গান পরিবেশন করেন সুকুমার বাউরী ও সম্প্রদায়।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (ওড়িশা) : গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথমদিন 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, ভক্তিগীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে তাপস বসু, দেবযানী পাঠক ও নিবেদিতা পাঠক এবং ভক্তিগীতিতে লিপি সিন্‌হা, ছবি দাস ও বীথি দত্ত অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা করেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দজী। পরের দুদিন তিনি 'গীতা' ও 'ভাগবত' পাঠ এবং আলোচনা করেন। ১ জানুয়ারি বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। এদিন প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ 'কল্পতরু দিবস' ও সঙ্ঘের রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, শোভাযাত্রা, পদাবলীকীর্তন, ভজন, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী কৈবল্যানন্দজী। স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ক এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী পুরাতনানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সগুণানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী ও স্বামী বীরানন্দজী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সঙ্ঘের সম্পাদক অলোককুমার ঘোষ ও সভাপতি জয়দেব সাধুখাঁ। এদিন প্রায় ২২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু দিবস' উপলক্ষ্যে পাঠ, ভজন ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় দমদমে (কলকাতা-৭৫)। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' পাঠ করেন যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়। ভজন পরিবেশন করেন নির্মল রায়, মনোতোষ গোস্বামী, সুনন্দা চ্যাটার্জি প্রমুখ। আলোচনা করেন সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজী, শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, দেবনাথ চক্রবর্তী ও ডঃ গৌতম মুখার্জি। এদিন 'সমন্বয়' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র, হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে 'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দেবব্রতানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ গায়েন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র গায়েন ও ডঃ অরুণকুমার দাশ। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পাকুড় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কীর্তন, পাঠ ও আলোচনাসভার মাধ্যমে 'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। পূজা ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে পাঠ করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী, কৃষ্ণা দাস, কেয়া পাণ্ডে প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন বদরিকাপ্রসাদ তেওয়ারি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাম চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

মির্জাপুর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (হুগলি) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে 'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ব্রহ্মচারী কল্যাণ। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী আত্মবিকাশানন্দজী, ডাঃ কালোসোনা পাধা ও ডঃ সোমনাথ মিত্র। এই উপলক্ষ্যে ৮০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ এবং প্রায় ১২,০০০ নরনারায়ণকে সেবা করা হয়।

বনগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ 'কল্পতরু উৎসব' উপলক্ষ্যে 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, স্থানীয় হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ এবং ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। পাঠে অংশগ্রহণ করেন মাখনলাল চক্রবর্তী ও তাপসকুমার ঘোষ। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী চিৎরূপানন্দজী।

নাগভবন (বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৬) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, ভজন, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ৯৫তম 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির)-এর অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দজী। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে রাজু দাস ও স্বামী বিমোহানন্দজী প্রমুখ। পালাকীর্তন পরিবেশন করেন স্বদেশরঞ্জন দাস ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে সেবা করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী পুরাণানন্দজীর

সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। গত ৩ জানুয়ারি আয়োজিত হয় একটি সাধুভাণ্ডারা।

শিলচর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (অসম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০৩ মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, কীর্তন, জপযজ্ঞ ও ধর্মসভার মাধ্যমে 'কল্পতরু দিবস' পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী নরেশানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রসূনকান্তি দেব ও গৌরবিনোদ দেব। সকালে কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী দেবদেবানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুভাষচন্দ্র সাহা, অধ্যাপিকা অর্চনা চক্রবর্তী, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি) : গত ৪ জানুয়ারি ২০০৩ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। পূজা করেন স্বামী শিবপদানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী শিবপদানন্দজী ও স্বামী প্রাণেশানন্দজী। গত ১২ জানুয়ারি প্রভাতফেরি, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়।

রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বর্ধমান) : গত ৪-৫ জানুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বাত্মানন্দ মঠের স্বামী শিবাত্মানন্দজী এবং আলোচনা করেন স্বামী শৈলজানন্দজী। কীর্তন পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। পরদিন 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ করেন যথাক্রমে শ্যামাকুমার ভট্টাচার্য ও তপনকুমার দেবশর্মা। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী, স্বামী যতীশানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। সভান্তে শ্রুতিনাটক ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের সদস্যবৃন্দ ও স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে (উত্তর চব্বিশ পরগনা)। আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, সঙ্ঘের সম্পাদক ভুবনরায় সরস্বতী, পৌরপ্রধান বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ দে ও গোবিন্দলাল দেব। সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ৭৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। প্রত্যেককে দুপুরের আহার এবং 'ভারতে নিবেদিতা' ও স্বামীজীর ছবি প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ঝাড়গ্রাম-নিবাসিনী সরোজকুসুম ঘোষ গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি পরিচিতজনের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয়া ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হুগলি-নিবাসিনী ননীবালা দত্তগুপ্ত গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী বিনয়কুমার গুপ্ত গত ১৯ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক এবং পত্রিকা বিভাগে স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। এছাড়া তিনি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ও লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সোদপুর-নিবাসী অনিলবরণ দাস গত ২০ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি সোদপুর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)-নিবাসী শুভাশিস পালিত গত ২০ ডিসেম্বর ২০০২ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি 'বিবেকানন্দ হিউম্যান সেণ্টার'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু নবীন ও প্রবীণ সন্ন্যাসীর তিনি বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার ও পরহিতচিকীর্ষা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত মাঘ ও ফাল্গুন মাসে 'উদ্বোধন'-এর যে প্রচ্ছদ দেওয়া হয়েছিল, তার সন্ততি এমাসের প্রচ্ছদেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। জয়রামবাটীতে বাল্যজীবন কাটিয়ে যৌবনে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। দক্ষিণেশ্বরে যে-নহবতখানায় শ্রীশ্রীমা বাস করতেন তার চিত্র দেখা যাচ্ছে, পশ্চাৎপটে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ছবি। এই নহবতখানায় শ্রীশ্রীমা ১৮৭২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন।

আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থ ও ক্যাসেট

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসবে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত)
স্বামী ভূতেশানন্দ ৪০.০০

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ
মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত ৮০.০০

করুণারূপিণী জননী সারদাদেবী
স্বামী ধর্মদানন্দ ৭.০০

স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা
সঙ্কলক : স্বামী চেতনানন্দ ৩৫.০০

বৈদিক দৃষ্টিকোণে বিশ্বের সার্বজনীন ঐক্য
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৫.০০

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

পাতঞ্জল যোগসূত্র (সূত্র, সূত্রানুবাদ ও ব্যাখ্যা)
ব্যাখ্যাতা : স্বামী প্রেমেশানন্দ ১৫.০০

ভগবান বুদ্ধ এবং আমাদের ঐতিহ্য
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ১০.০০

নৈঃশব্দ্যের সঙ্গীত
স্বামী পরমানন্দ ১০.০০

আরাত্রিক স্তব (অর্থ ও ব্যাখ্যা)
স্বামী সর্বগানন্দ ১০.০০

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (৯ম স্কন্ধ) (মূল শ্লোক, অন্বয়, মূলানুবাদ, শ্রীধর-টীকা ও টীকানুবাদ-সহ)
অনুবাদিকা : অধ্যাপিকা গীতা মাইতি ১৫০.০০

জীবনগঠনের পথে (২য় খণ্ড)
স্বামী জগদাত্মানন্দ ৫০.০০

শ্রীরামের অনুধ্যান
স্বামী [illegible] ৭০.০০

ক্যাসেট

শিব শক্তি মালা
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ৩০্

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে
স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫্

ও দুটি চরণ সার
স্বামী সর্বগানন্দ ৩৫্

ভজন মঞ্জরী
রাজকুমার ভারতী ৩০্

শোন শোন অমৃতস্য পুত্রাঃ
যন্ত্রসঙ্গীতে প্রচলিত ভক্তিমূলক গান ৩০্

ভজন সুধা
বাণী জয়রাম ৩০্

ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হলে সরাসরি "ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩" — এই ঠিকানায় লিখুন।

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

No work is secular. All work is adoration and worship.
SWAMI VIVEKANANDA

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ **রামকৃষ্ণ মিশন**, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ **সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com**

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
  ফোন : (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা
  নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪
  ফোন : (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

আসাম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড
  উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স
  বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক**, **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড
  ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্‌হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল
  নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর,
  ধানবাদ-৮২৬০০১

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **এম. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
  ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি
  ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স
  ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এঁ/৭, রচনা সোসাইটি
  বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড
  ভালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : ০২৬৩২/২৪২৩৭৩
  ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com

দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website : www udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl net
udbodhan@vsnl.com

Vol. 105
No. 3
MARCH
2003

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
MM&PO/WB/RNP-15/2003

হয়েছে কি? আপনার নবীকরণ কিংবা গ্রাহকভুক্তি না হয়ে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

১০৫ তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

ইয়ে অন্দর কী বাত হ্যায়!
LUX®
cozi™

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥
১০৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা [illegible] ১৪১০ এপ্রিল ২০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) ❑ ১৪১০ বঙ্গাব্দ / ২০০৩-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

তিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২২ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৬ মে	২০০৩
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	১৬ মে	,,
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	২৮ আষাঢ়	রবিবার	১৩ জুলাই	,,
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১০ শ্রাবণ	রবিবার	২৭ জুলাই	,,
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২৬ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	১২ আগস্ট	,,
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২ ভাদ্র	মঙ্গলবার	১৯ আগস্ট	,,
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৯ ভাদ্র	মঙ্গলবার	২৬ আগস্ট	,,
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৩ আশ্বিন	শনিবার	২০ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	৯ আশ্বিন	শুক্রবার	২৬ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১৯ কার্ত্তিক	বুধবার	৫ নভেম্বর	,,
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২১ কার্ত্তিক	শুক্রবার	৭ নভেম্বর	,,
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১৬ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	২ ডিসেম্বর	,,
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	৩০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	১৬ ডিসেম্বর	,,
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	৩ পৌষ	শুক্রবার	১৯ ডিসেম্বর	,,
যিশুখ্রিস্ট		৮ পৌষ	বুধবার	২৪ ডিসেম্বর	,,
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১২ পৌষ	রবিবার	২৮ ডিসেম্বর	,,
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২১ পৌষ	মঙ্গলবার	৬ জানুয়ারি	২০০৪
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৯ পৌষ	বুধবার	১৪ জানুয়ারি	,,
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ মাঘ	শুক্রবার	২৩ জানুয়ারি	,,
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১০ মাঘ	রবিবার	২৫ জানুয়ারি	,,
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২২ মাঘ	শুক্রবার	৬ ফেব্রুয়ারি	,,
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৯ ফাল্গুন	রবিবার	২২ ফেব্রুয়ারি	,,
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১৬ ফাল্গুন	রবিবার	২৯ ফেব্রুয়ারি	,,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২২ ফাল্গুন	শনিবার	৬ মার্চ	,,
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৬ ফাল্গুন	বুধবার	১০ মার্চ	,,
রামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৬ চৈত্র	মঙ্গলবার	৩০ মার্চ	,,

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	১৫ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	৩০ মে	২০০৩
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৩০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১৪ জুন	,,
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	১৬ আষাঢ়	মঙ্গলবার	১ জুলাই	,,
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	৮ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	২৫ সেপ্টেম্বর	,,
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	১৫ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	২ অক্টোবর	,,
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	৭ কার্ত্তিক	শুক্রবার	২৪ অক্টোবর	,,
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্ত্তিক শুক্লা নবমী	১৬ কার্ত্তিক	রবিবার	২ নভেম্বর	,,
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্ত্তিক পূর্ণিমা	২২ কার্ত্তিক	শনিবার	৮ নভেম্বর	,,
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১১ মাঘ	সোমবার	২৬ জানুয়ারি	২০০৪
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৫ ফাল্গুন	বুধবার	১৮ ফেব্রুয়ারি	,,

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	১৩, ২৮ (এপ্রিল ২৭, মে ১২)	কার্ত্তিক—	৫, ১৮ (অক্টোবর ২২, নভেম্বর ৪)
জ্যৈষ্ঠ—	১১, ২৭ (মে ২৬, জুন ১১)	অগ্রহায়ণ—	৪, ১৮ (নভেম্বর ২০, ডিসেম্বর ৪)
আষাঢ়—	১০, ২৫ (জুন ২৫, জুলাই ১০)	পৌষ—	৪, ১৮ (ডিসেম্বর ২০, জানুয়ারি ৩)
শ্রাবণ—	৮, ২২ (জুলাই ২৫, আগস্ট ৮)	মাঘ—	৩, ১৮ (জানুয়ারি ১৮, ফেব্রুয়ারি ২)
ভাদ্র—	৬, ২০ (আগস্ট ২৩, সেপ্টেম্বর ৬)	ফাল্গুন—	৩, ১৮ (ফেব্রুয়ারি ১৬, মার্চ ২)
আশ্বিন—	৫, ১৯ (সেপ্টেম্বর ২২, অক্টোবর ৬)	চৈত্র—	৩, ১৮ (মার্চ ১৭, এপ্রিল ১)

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

তোমরা সম্মিলিত হও। সকলে একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর। কারণ, সভ্যবৃন্দের একবাক্যতা সংহতি দৃঢ় করে। তোমাদের মনসমূহ সমানভাবে পরস্পরের জানা দরকার অর্থাৎ তোমাদের মন পরস্পর এক মত হোক। তাহলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। আগে (পুরাকালে) দেবগণ এক হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন, সমভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তোমরাও সমভাবে ধনাদি সম্পদ বণ্টন করে নাও।

তোমাদের স্তুতি অভিন্ন রূপ হবে, প্রাপ্তি সমানরূপ হবে, অন্তঃকরণ একরূপ হবে, বিচারপূর্বক আহৃত জ্ঞান সমান সমান হবে—এই প্রার্থনা করি। আমি সকলের কল্যাণের জন্য তোমাদের যথাযোগ্য মন্ত্রে সংস্কারবিধান করি। সকল দেবতার জন্যই সমান আহুতি প্রদান করি।

তোমাদের সঙ্কল্প এক হোক। তোমাদের হৃদয়গুলি সমান হোক। তোমাদের মনগুলি এক সুরে বাঁধা হোক। যাতে তোমাদের পরস্পরের ঐক্য সাধিত হয়, তাই হোক।

(ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২-৪)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

রামকৃষ্ণ মঠ একটি ট্রাস্ট এবং রামকৃষ্ণ মিশন একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি। অর্থাৎ সরকারিভাবে দুইটি পৃথক সংগঠন। কিন্তু উভয়ে একত্রে যেন একটি যমজ সংগঠন—একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিয়া ভাবা যায় না। সকল প্রকার ধর্মীয় কর্মসূচী রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্গত। আর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মতালিকায় রহিয়াছে যাবতীয় সেবাকর্ম। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচার এই উভয়েরই কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। জন্মলগ্ন হইতেই এই সঙ্ঘের চলিবার পথ যে অতীব বন্ধুর ছিল তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসে বিধৃত আছে। কিন্তু বর্তমানে শতাব্দী-প্রাচীন এই সঙ্ঘের ভাবে ভাবিত হইয়া সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে এবং ভারতের বাহিরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বামীজীর বাণী এতদিনে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছিল, স্বামীজী তাঁহার সমসাময়িক বাস্তব সংস্কৃতি অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। আর সেই কারণেই তাঁহাকে সমসাময়িক সমাজ ও ঘনিষ্ঠ সজ্জনবর্গ পুরোপুরি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া স্বামীজীকে চলিতে হইয়াছে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। সেই অমসৃণ, কণ্টকাকীর্ণ চলার পথে অপমানিত, আহত বিবেকানন্দের অন্তরে বিপুল অধ্যাত্মশক্তি যেন আরো উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাধ্যমে ক্রমশ সেই বিপুল শক্তির অভিঘাত আজ সমাজে আসিয়া পড়িতেছে। এই মহাশক্তির বিকাশ ও প্রভাবের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে স্বামীজীর দূরদৃষ্টির যাথার্থ্য অনুমিত হয়। অর্থাৎ সহস্র বৎসরব্যাপী এই শক্তির অভিঘাতে কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ পশুভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমশ দেবত্বে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি সংগ্রহ করিবে—ইহা কল্পনা হইতে ক্রমে বাস্তবে রূপান্তরিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনকে স্বামীজী একটি 'মডেল' বা আদর্শ হিসাবে জগৎকে উপহার দিয়াছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই সঙ্ঘ বা মডেল সহসা গগন ভেদ করিয়া ভিন্ন কোন গ্রহ হইতে আসিয়া পড়ে নাই। ইহার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে বা হইতেছে এই সমাজ হইতেই, যেখানে ধর্মের গ্লানি বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীভগবানকে নরশরীরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। আর একথাও সত্য, এই বাস্তব সমাজ হইতেই যদি আদর্শের সমুদ্ভব না হয়, আমমানুষের পক্ষে অন্য গ্রহ হইতে আগত আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করাও তখন অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সুতরাং যেভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র আকার হইতে শুরু করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে, অন্যান্য সংগঠনও ক্রমশ কেন্দ্রীভূত একটি ক্ষুদ্রাবয়ব হইতে ধীরে ধীরে বৃহদাকার ধারণ করিবে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ সংগঠন গড়িয়া উঠিবে, যেখানে সেবা ও ত্যাগের সহিত মহাশক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত যুবগোষ্ঠী পরহিতচিকীর্ষায় সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইসব সংগঠনের সুষ্ঠু কর্মধারা এবং জনকল্যাণমুখী প্রসার অব্যাহত রাখিবার জন্য কিছু ইন্ধনের প্রয়োজন হইবে, যাহা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্প্রসারণের প্রেরণার মূল উৎস হইতেই আহরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সংগঠনের সহিত যুক্ত সকলকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চলিবার শক্তি কোথায় নিহিত আছে তাহা জানিয়া লইতে হইবে। অথবা আরো সহজে বলা যায়, ভাবপ্রচার পরিষদের সহিত যুক্ত সকলেরই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ ও ইতিহাস সম্যক্ জানিয়া রাখা প্রয়োজন। মনে যদি কোন সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা নিরসন করিয়া লইতে হইবে।

খুঁটি দরকার

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য) খুব ভাল সংগঠক। একটি পত্রে শশী মহারাজকে তিনি লিখিলেন ঃ

> "তোমাতে organising power আছে—একথা ঠাকুর আমায় বললেন। কিন্তু এখনো ফোটে নাই।... তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) ছাড়িতে চাও না, ইহাই তাহার নিদর্শন। তবে intensive (তীব্র [কর্মকুশলতা]) এবং extensive (ব্যাপক [উদার]) দুই-ই হওয়া চাই।" (স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭৭, পৃঃ ৪১১)

দুইভাবে ইহার অর্থ করা যায়। শশী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণকেই জীবনের আদর্শ ও পরম সাধ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বপ্নেও তিনি ঐ আদর্শকে ত্যাগ করিবার কথা ভাবিতে পারিতেন না। ইহাকে তাঁহার খুঁটি বা 'centre of gravity' না ছাড়িয়া থাকা বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত,

যখন বরানগর মঠ স্থাপিত হইল, তখন ঐ ভগ্নদশাগ্রস্ত পোড়ো বাড়ির একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করিয়া শশী মহারাজ নিত্যপূজাদি করিতেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ ভারততীর্থ দর্শনে নির্গত হইতেন; কিন্তু শশী মহারাজ কোথাও যাইতেন না। তিনি খুঁটির ন্যায় সংগঠন (অথবা সংগঠনের বীজ) রক্ষা করিয়া থাকিতেন। ইহাকেই স্বামীজী 'organising power' (সংগঠনশক্তি) বলিয়া অভিহিত করিলেন। যাঁহারা এদিক-ওদিকে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদেরও অন্তরে একটি বোধ সর্বদা থাকিত—"বরানগরের মঠে গেলেই প্রাণ জুড়োবে, আর কেউ না থাক শশীভাই তো আছে ঠাকুরকে নিয়ে।" সকল সংগঠনের সদস্যদেরই এইরূপ একটি বড় মানসিক আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে।

আদর্শ ও বাস্তব

সংগঠনের প্রথম কথাই হইল আনুগত্য। গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)-কে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন ঃ

> "Organisation-এর প্রথম আবশ্যক এই যে obedience (আজ্ঞাবহতা)। যখন ইচ্ছা হলো একটু কিছু করলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম, তাতে কাজ হয় না। Plodding industry এবং perseverance (ধীরস্থির-ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই।" (ঐ, পৃঃ ৩৭২)

এই আনুগত্য প্রসঙ্গে অনেকের আপত্তি দেখা যায়। 'আমি কেন ওকে মানবো?'—এইরূপ মনোভাব সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র যেখানেই থাকে থাকুক, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এই ভাবটি বেমানান। মনে রাখিতে হইবে, বৃহত্তর অর্থেই 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামটি ব্যবহৃত হইতেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিভূ বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং সমষ্টিগতভাবে মঠের অছিগণের মধ্য দিয়াই সঙ্ঘমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা কার্যকরী হইতেছে—এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় রামকৃষ্ণ মঠান্তর্গত প্রত্যেক অঙ্গের হৃদয়েই বিদ্যমান। পরবর্তী কালে আবির্ভূত অন্যান্য পরবর্তী ক্ষুদ্রাকার সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও শুরুতে কেহ না কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণাতেই সংগঠনের সূচনা করিয়াছিলেন—একথা সত্য। সুতরাং যিনি বা যাঁহারা সূচনায় প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি বাকিদের আনুগত্য প্রদর্শনও একান্ত জরুরি। স্বামীজী স্বয়ং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে অছি-পরিষদ নির্বাচনের পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে-অছিবর্গ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভূরূপে সঙ্ঘ পরিচালনা করিবেন। ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্গত সকল সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐসকল ক্ষেত্রেও যে-পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হইলেন, তাঁহাদের নির্দেশ সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশরূপেই গৃহীত ও সমাদৃত হইবে—ইহাই স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। অতএব এক্ষেত্রে পরিচালকবর্গের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনেরই নামান্তর মাত্র। এবং স্বামীজী এই আনুগত্যের কৃপণতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কারণ, আনুগত্যের অভাব ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাবে সঙ্ঘের সংহতি বা ঐক্য বিনষ্ট হয়। তীব্র তিরস্কার করিয়া তিনি একদা বলিয়াছিলেন ঃ "যেকেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ [বিনাশ] করিতে চেষ্টা করিবেন... তিনি ইহপরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিলেন ঃ "প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।... নিজে পবিত্র থাকিয়া, অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] আজ্ঞা পালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।... তাঁহার সেবক বা সেবকের সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ নহে। মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ দেখিবার অগ্রে 'আমি মন্দ দেখি কেন?' প্রথম ভাবা উচিত।"

*

কাজের মধ্যে কখনো কখনো আমরা সাহস হারাইয়া ফেলি। এই ভয় সংগঠনের বহির্গত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য যেমন সম্ভব, তেমনি সংগঠনের অন্তর্গত ব্যক্তি বা জড়বস্তুর জন্যও সম্ভব। যাহার মনে দুর্বলতা নাই, স্বার্থপরতা নাই, তাহার কিসের ভয়? স্বামীজী আশ্বাসবাণী এবং একই সঙ্গে সাবধানবাণী শুনাইলেন ঃ

> "এইটি জেনে রেখো, যখনি তুমি সাহস হারাও তখনি তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়।" (আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ১৮৮৫ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে লিখিত, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩০৮)

অন্যত্র লিখিলেন—

> "যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর ওপর অনুরাগ থাকবে, আর সত্যের ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটি গেলেই বিপদ।... আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে।... আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না।" (ঐ, পৃঃ ৩৬৬)

রামকৃষ্ণ মিশনের একশত বৎসরের ইতিহাসে ইহা বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাহারা সাহসী তাহারা স্বামীজীর আশীর্বাদী প্রেরণা অন্তরে সর্বদা অনুভব করিয়া থাকে।

[ক্রমশ] (দুই)

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

তত্ত্ব-প্রকাশিকা, ১৮৮৬-১৮৮৭ (রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত)

আদি শক্তি হইতে সাকার রূপের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব, নৃসিংহ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ-বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, তৎসমুদয় সেই আদি শক্তির গর্ভসম্ভূত। এইজন্য সকল দেবতাকে এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন এক চিনির রস হইতে নানাবিধ মট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা এক মৃত্তিকাকে জালা, কলসি, ভাঁড়, খুরি, প্রদীপ, হাঁড়ি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যায়। ইহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে কাহারও সহিত কাহার সাদৃশ্য নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু উপাদান-কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

✳

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে হয়। যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কত প্রকার পদার্থ আছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

✳

কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত সাকার মূর্ত্তি নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক আতা দেখিয়া শোলার আতা সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা জড়মূর্ত্তির উপাসনা করে তাহারা বাস্তবিক জড়োপাসক নহে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জড় নহে। যদ্যপি প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার তাহাই লাভ হইবে; কিন্তু ঈশ্বরভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বরলাভই হইয়া থাকে।

✳

যে-ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্মগরিমা প্রকাশ না পায়, সর্ব্বদাই দয়া দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়, রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে, আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে, স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ত্বগুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

রজঃ গুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে। কোন কোন রিপুর পূর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি, কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে।

তমঃ গুণে রজঃ-র সমুদয় লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় এবং তদ্ব্যতীত রিপুগণেরও পূর্ণ কার্য্য হইয়া থাকে।

✳

যে-ব্যক্তির যে-গুণ প্রধান, তাহার তদ্রূপই কার্য্য হইয়া থাকে। এই গুণভেদের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যের সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত সাধনকার্য্যে এক প্রণালী মতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা যায় না।

✳

কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন।

✳

ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে নামে বিশ্বাস এবং সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। এই সাধনপথ অবলম্বন ব্যতীত কাহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ করা সম্ভব নহে।

✳

শিয়ালদহে গ্যাসের মসলার ঘর। কোন জায়গায় পরি, কোথাও মানুষ, কোথাও লণ্ঠন, কোথাও ঝাড়; কত রকমে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে কেউ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। যেকেউ স্থূল আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে সে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই অদ্বিতীয় ঘর বলিয়া জানিবে।

✳

জ্ঞান এবং ভক্তি এই পথ লইয়া সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা বলে যে, জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বরলাভ হয় না এবং ভক্তিমতে তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞান পুরুষ। সে বহির্বাটীর খপর বলিতে পারে এবং ভক্তি স্ত্রীলোক, সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত জ্ঞানপথে যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয় তাহা সম্পূর্ণ স্থূল ও বাহিরের কথা। ভক্তদিগের মতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

✳

ভক্তেরা যখন যেরূপ দর্শন করেন তাহা তাঁহাদের চরম নহে। কারণ সে-অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন এবং অনাহারে থাকিলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা ভগবানের নিয়ম। যাঁহারা ভগবানের রূপ লইয়া অবিচ্ছেদে কাল হরণ করিতে চাহেন, তাঁহার একুশদিনের অধিক দেহ থাকিতে পারে না। দেহান্ত হইয়া যাইলে তাঁহার যে কি অবস্থা হয় তাহা কাহার বলিয়া দিবার শক্তি নাই। দেহবিচারে জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধি হওয়া এবং ভক্তের এই অবস্থা একই প্রকার।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী শিবানন্দের দুখানি পত্র

অন্নদাকান্ত বড়ুয়াকে লিখিত

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P.O.
Dt. Howrah
10/1/31
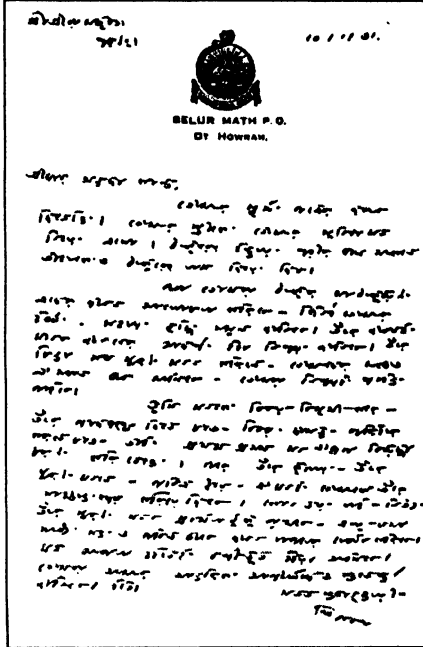
শ্রীমান অন্নদাকান্ত,

তোমার পূর্ব্ব পত্রের জবাব দিতেছি। তোমার স্ত্রীকে তোমার সুবিধামত নিয়ে এসো। ঠাকুরের ইচ্ছায় শরীর ভাল থাকলে তাহাকেও ঠাকুরের নাম দিয়ে দিব।

বাবা তোমরা ঠাকুর মাঠাকুরুণ এদের জীবন আলোচনা করিবে—তিনিই তোমার ইষ্ট—সহায় বুদ্ধি সম্বল জানিবে। তাঁর জীবনই মানব জীবনের আদর্শ—ইহা নিশ্চয় জানিবে। তাঁর চিন্তা স্মরণ-মনন করিলে—তোমাদের মধ্যেও ঐসকল ভাব আসিবে—তোমরা নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

তুমি মনকে বিষয়বিমুখী করে তাঁর পাদপদ্মে দিতে চাও—বিষয়-দাসত্ব পরিহার করতে চাও—তাই প্রথম প্রথম মন ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পরে তাঁর কৃপায়—তাঁর স্মরণ-মননে পবিত্র হয়ে ঐ মনই তোমাকে তাঁর সাক্ষাৎকার করিয়ে দিবে। কোন ভয় নাই—নিত্য তাঁর স্মরণ-মনন প্রার্থনাটুকু রাখবে এবং যথাসাধ্য সৎ ও পবিত্র ভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিবে। মন আপনা হইতেই বশীভূত হইয়া আসিবে। তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
5/4/31

শ্রীমান অন্নদাকুমার,

তোমার প্রেরিত টাকা দুইটা ও ওখানের উৎসবের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। কেতকী মহারাজও [স্বামী প্রভানন্দ] পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলেন। সম্বিদানন্দ ভাল আছেন জানিয়া প্রীত হইয়াছি। তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও এবং তুমি জানিবে। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি করে দিন। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

* শিলং-নিবাসী, স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

> রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

শ্লোকার্থ ঃ *প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের এই 'সংঘাত'-এর (জীবের) কর্মে আসক্ত হন, কাজেই 'ফলের জন্য আমরা কর্ম করি'—এইরূপ অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিৎ ব্যক্তিগণ সেইসব অজ্ঞ, অনাত্মবিৎ, মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে বিচালিত (বিভ্রান্ত) করিবেন না।*

ব্যাখ্যা ঃ আত্মা এবং মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাঁহারা সেই পার্থক্য বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক মানসিকতাসম্পন্ন হইতে পারেন। যে সাত্ত্বিক, সে উত্তম জিনিস সম্ভোগ করিতে চাহে। যে রজোগুণের বশীভূত, সে বহু কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাহার একটি assertive motive (কিছু করিবার স্পৃহা) থাকে। সবশেষে কখনো বা তমোগুণের বশীভূত হইয়া মানুষ কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে। কিন্তু এইভাবে চলিলে প্রকৃতির হাত হইতে মুক্ত হইবার কোন আশা নাই। দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, অর্থাৎ দেহ-মনকে যে 'আমি' মনে করে, শাস্ত্র উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া সর্বাগ্রে তাহার স্বীয় দেহ-মনকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। জ্ঞানের বিষয় সে কিছুই বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের কথা শুনিলে তাহার বুদ্ধি গুলাইয়া যায়। কাজেই এক করিতে আরেক করিয়া সে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। সেই কারণে বেদান্তবাদী সাধুবেশী এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন ঃ "তোর বেদান্তে মুতে দি।" [অর্থাৎ তাহার 'বেদান্ত' আবর্জনার ন্যায় ত্যাজ্য।]

প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণ বিদ্যমান। জীবাত্মা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু যে নিজেকে গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝে না, সে তো গুণের প্রেরণাতেই সব কাজ করিবে। তাহার সম্মুখে আত্মার মহিমা কীর্তন করিলে সে জ্ঞানীর ভান করিবে, জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে না। মুখে বলিবে—আমি কোন গুণের বশ নই। কিন্তু গুণাতীত অবস্থার বোধ না হইলে, অন্তত কথাটি বুঝিবার মতো বুদ্ধির বিকাশ না ঘটিলে জ্ঞানের কথা শুনিলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিপরীত ফল হয়। গৃহস্থ হইয়াও সে সন্ন্যাসী সাজিয়া পরিবারের কর্তব্য অবহেলা করে। 'অনাসক্ত গৃহস্থ'-এর ভান করিয়া পারিবারিক কর্তব্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। তাহাতে আত্মার উন্নতি ব্যাহত হয়।

[মন্তব্য ঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা আছে—"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা"। সকল প্রাণীর মনে এই দেহাত্মবোধ ভ্রান্তিরূপে বিদ্যমান। তিনগুণের পরিণাম এই দেহ ও ইন্দ্রিয়। এই দেহেন্দ্রিয়তে 'আমি' ও 'আমার' বোধই ভ্রান্তি। ফলে দেহেন্দ্রিয়ের কর্মকে 'আমার কর্ম' বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩০তম শ্লোকেও একই কথা শ্রীভগবান বলিলেন—কায়-মন-বাক্য দ্বারা কৃত যাহা কিছু কর্ম, সবই প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত। মানুষের পরম লক্ষ্য আত্মা সর্বদাই অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সে আত্মার বিদ্যমানতার ফল ভোগ করিতে পারে না। যিনি সর্বোপাধিবর্জিত বলিয়া আত্মাকে অনুভব করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী।—সম্পাদক]

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০।।

শ্লোকার্থ ঃ *পরমেশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি—এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে [শ্রীভগবানে] সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া ফলাভিসন্ধিরহিত, মমত্বহীন ও শোকশূন্য হইয়া তুমি যুদ্ধ কর।*

ব্যাখ্যা ঃ 'অধ্যাত্মচেতসা'—তৃতীয়া বিভক্তি অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা। কি সেই চেতনা? 'আমি' ব্রহ্মের একটি ক্ষুদ্র অংশ। মায়ানিদ্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবন-দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। স্ব-স্বরূপের জ্ঞানলাভই আমার একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং এই স্বপ্ন-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে হইবে। তাই যাহা কিছু কর, ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে কর। এই জগতের কোন বস্তুকে আমার ভাবিও না। এই জগতের সব ভোগ্যবস্তুই পরিণামে দুঃখদায়ক—এই বলিয়া সব ত্যাগ কর।

'আমি' চৈতন্যাংশ। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি হইতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক। এইগুলিকেই 'আমি' ভাবিয়া আমরা দুঃখ পাই। যখনি বুঝিবে, আমি ইহাদের অতীত এবং ব্রহ্মাংশ, তখনি এই জগৎ হইতে আমার আর কিছুই চাহিবার থাকিবে না। কাজেই মমত্ববোধও থাকিবে না।

[**মন্তব্য ঃ** তিনপ্রকার অবস্থার কথা শাস্ত্রমুখে জানা যায়। দ্বৈতভূমিতে আমি আলাদা, ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম) আলাদা। বিশিষ্টাদ্বৈতভূমিতে আমি ব্রহ্মাংশ বা ঈশ্বরাংশ। অদ্বৈতভূমিতে 'আমিই ব্রহ্ম'। যদিও দর্শন হিসাবে অদ্বৈত দর্শনই শেষকথা, তথাপি সাধারণ মানুষের অদ্বৈত অনুভূতি হয় না। সেই কারণে ভূয়োদর্শী সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজী নিজেকে ব্রহ্মাংশ বা চৈতন্যাংশ বলিয়া ভাবিতে উপদেশ করিয়াছেন।—**সম্পাদক**]

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ।।৩১।।

শ্লোকার্থ ঃ *যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাবান এবং অসূয়াশূন্য (গুণে দোষাবিষ্কার) হইয়া আমার এই মত (উপদেশ) সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও ধর্মাধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন।*

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানের এই উপদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী (শ্রদ্ধাবান) থাকিলে এবং মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অভাব (অনসূয়া) হইলে কর্ম করিতে করিতেই জ্ঞান ও শেষে মুক্তি হইবে—এই কথা শ্রীভগবান নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থ কেবল বাড়ি-ঘর, বাপ-মাকে পরিত্যাগ নহে অথবা কর্মত্যাগও নহে। মন হইতে বাসনাত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য। [মনে রাখিতে হইবে, পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাকার নবাগত ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিবার উদ্দেশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।—**সম্পাদক**] শ্রীশ্রীঠাকুর সাংখ্যতত্ত্বের এবং শ্রীশ্রীমা যোগতত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। ঠাকুর ছিলেন এই সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আর মা সংসারে থাকিয়াও পূর্ণ সন্ন্যাসী। আবার ঠাকুরই একাধারে গৃহস্থের পূর্ণ আদর্শ! আর আমাদের সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের ধারণা কেমন জান? সন্ন্যাসাশ্রম মানে 'ব্যাচেলার্স' আশ্রম, আর গৃহস্থ ঘর মানে গোয়ালঘর! আমাদের দৌড় এই পর্যন্ত। গৃহস্থ বাড়িতে পিতা-মাতা কেহই ধ্যান-জপাদি করে না, কেবল আহার-নিদ্রা-আনন্দ। সন্তান কেমন করিয়া অনাসক্তি কাহাকে বলে, তাহা শিখিবে?

'অসূয়া' অর্থ অবিশ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হইতে পারে, শ্রীভগবান আমাদিগকে 'কর্ম' করিতে উপদেশ দিয়া ঠিক পথে চালাইতেছেন তো? মায়ের দেশের একজন সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া মঠের মন্দিরের পিছনের এক চালায় থাকিতেন। সন্ন্যাসোচিত জীবনযাপন করিতে পারিতেন না। কেবল মায়ের কথা শুনিলেই ক্রন্দন করিয়া বলিতেন ঃ "মা কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন?" সর্বদা জপ করিতেন। শাস্ত্রপাঠাদি কিছু করিতেন না। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় নিজের কতটুকু উন্নতি হইতেছে বুঝিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার মনে এইরূপ অসূয়া ক্রিয়া করিত। শ্রীভগবান বারংবার বলিতেছেন—এইপ্রকার সন্দেহ যেন বিন্দুমাত্র না থাকে।

[ক্রমশ] ।।সাত।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা

পাশাপাশি ঃ (২) মানিকরাম, (৫) শিব, (৬) চেক, (৮) পাতাল, (১০) জরে, (১২) মান, (১৪) টিকে, (১৫) চার, (১৬) স্টার, (১৭) সাজো, (১৯) রাজা, (২০) কুলো, (২৩) নরক, (২৫) ঘোগ, (২৭) কাল, (২৮) ভজনানন্দ।

ওপর-নিচ ঃ (১) ভাব, (২) মাটি, (৩) রাখাল, (৪) কাক, (৫) শিবু, (৬) চেলা, (৭) কাজ, (৯) তাকুটি, (১১) বিরজা, (১২) মাস্টার, (১৩) নর, (১৫) চারা, (১৮) জোয়ার, (২১) লোক, (২২) দাগ, (২৩) নমাজ, (২৪) চাল, (২৫) ঘোল, (২৬) সন্দ, (২৭) কাশী।

শব্দচেতনা ২০-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

নন্দদুলাল ঘোষ, দিলীপকুমার মৌলিক, সুনীতি পাল, কে. কর্মকার, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভারতীয় চিকিৎসাবৃত্তি

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

'মানুষ মুখ্য, আর সবই গৌণ'—এই সত্যটি অনুভব করতে সক্ষম হলে এই বোধ প্রবল হয়ে উঠবে যে, আমি কোন জড়পদার্থের দাস নই। সেই উপনিষদের যুগ থেকে শুরু করে একালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্বজনের সম্মুখে উচ্চারিত স্বামীজীর বাণীর মধ্যে এই সত্যটিই বারংবার উদ্ঘোষিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, মানুষের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ভাবটি হলো, মানুষ হচ্ছে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—অমৃতের সন্তান। মানুষ কখনো জড়পদার্থের দাস নয়, পরন্তু জড়পদার্থই মানুষের দাস। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর এই উদাত্ত আহ্বান যে চমকপ্রদ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার কারণ মানুষের মর্যাদা ও কর্তৃত্ববোধ যে সকল জাগতিক বস্তুর উর্ধ্বে—এই সত্যটি তিনি সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একাগ্রভাবে নিজের অন্তরে দৃষ্টিস্থাপন করলে অনুভব করা যায়, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হলো অসীম, অনন্ত। গত শতাব্দীর অন্তিম ভাগে এক আমেরিকান চিকিৎসাবিজ্ঞানী একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নামটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ—'Man the unknown'। আপনারা মানুষের শারীরবিজ্ঞান, দৈহিক গঠনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানলাভ করেছেন, কিন্তু এই 'অজ্ঞানা মানুষ'-এর গভীরের রহস্য আজও আপনাদের নিকট অনাবৃত থেকে গেছে। ঐ বিজ্ঞানী গত শতাব্দীতে এই বিষয়টি নিয়ে গভীর গবেষণা করেছিলেন।

বেদান্ত অনুশীলনের সাহায্যে এই ধারণা লাভ করা যায় যে, মানুষের এই ক্ষুদ্র, জৈব শরীরের অন্তরালে আছে এক অক্ষয়, অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য এই বাণীই বহন করে এনেছিলেন। তিনি চাইতেন, মানুষ যেন ব্রহ্মাণ্ডের এই জাগতিক সুখের মধ্যে নিমজ্জিত না হয়ে যায়। সে যেন তার মর্যাদা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই অক্ষয় আত্মাস্বরূপ। এটিই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। আর ঠিক এই বোধ থেকেই উৎসারিত হচ্ছে আজকের এই উন্নতমান প্রযুক্তির যুগে জীবনধারণ এবং সকল কাজ করার শক্তি। স্মরণ রাখতে হবে, যেকোন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ, তা সে যতই ক্ষুদ্র কাজ হোক। হাজার হাজার বছর পূর্বে গীতায় আমরা এই বাণীরই অনুরণন দেখতে পাই। এযুগে স্বামীজী 'ব্যবহারিক বেদান্ত'-এর প্রবর্তন করে সেই বাণীই পুনরায় ঘোষণা করলেন। আপনি একজন চিকিৎসক, সেবিকা, শাসক, গৃহবধূ অথবা শ্রমিক হতে পারেন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আপনি যদি আপনার সত্তার গভীরে আপনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তাহলে দেখবেন—আপনি এমন এক শক্তির অধিকারী হবেন, যা আপনাকে এক অনাবিল আনন্দ, সুখ ও পরিতৃপ্তির আস্বাদ এনে দেবে। সে এক অপূর্ব মহিমময় অবস্থা!

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ, অপরদিকে আমেরিকা ধনসমৃদ্ধ। আমি একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ্‌কে জানি, তাঁর নাম মিঃ জন কেনেথ গলব্রেথ। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে দীর্ঘদিন এদেশে ছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন—'The Affluent Society'। প্রাচুর্যপূর্ণ আমেরিকান সমাজের অশুভ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ঐ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমরা ভারতীয়রা এখানে অতি দরিদ্র মানুষের মাঝে বসবাস করছি, আর তিনি বাস করেন ধনসমৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে। তিনি আমাদের দেশের 'প্ল্যানিং কমিশন'-এর সঙ্গে দেখা করে বলেন: সমগ্র বিশ্বে আমি দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু ভারতীয় দারিদ্র্য এককথায় অনবদ্য। আমি এই দরিদ্র ভারতবাসীর চোখে এক উজ্জ্বল জ্যোতি লক্ষ্য করেছি, যা পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখিনি। ভারতীয়রা আর্থিক মাপকাঠিতে দরিদ্র সত্য, কিন্তু অন্তরে তাঁরা এক অনুপম অসীম সম্পদের অধিকারী। কলকাতা সম্বন্ধে দোমেনিক ল্যাপিয়র রচিত 'City of Joy' গ্রন্থটি আমি পড়েছি। সেখানে বলা হয়েছে, ভারতীয়দের জীবনে এমন এক আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যা আমেরিকা বা ইয়োরোপের অতি উচ্চস্তরের মানুষের জীবনে অনুপস্থিত। একথার তাৎপর্য কি? তিনি বলতে চেয়েছেন, যুগ যুগ ধরে পরম্পরাগতভাবে ভারতীয়দের অন্তরের অন্তস্তলে এক প্রবল শক্তির উৎস বর্তমান। কোনরকম দারিদ্র্যই ভারতবর্ষের এই অমূল্য সম্পদ—এই 'অন্তরাত্মা'কে—স্পর্শ বা কলুষিত করতে পারে না।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর্থিক সচ্ছলতা ভারতবর্ষের আত্মাকে ধ্বংস করছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায়

আকস্মিকভাবে সামান্য অর্থের অধিকারী হয়েই ভারতীয় আত্মাকে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছে। বর্তমানের প্রকৃত চিত্রটি হলো—আর্থিক সচ্ছলতা লাভের পাশাপাশি আত্মজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। এই বিষয়টি সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তিনি বারবার বলেছেন, এই পথ মানবজীবনের লক্ষ্য অথবা উন্নতির উপায় হতে পারে না। আমাদের এমন এক শক্তির অধিকারী হতে হবে, যার সাহায্যে সকলপ্রকার লৌকিক বস্তুর ওপর প্রভুত্ব করা যেতে পারে। মানুষের আত্মা মহান; কোনকিছুই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। মানুষের মূল্য কখনো দশ ডলার অথবা ঐজাতীয় অর্থের এককে পরিমাপ করা যায় না। এই সত্যটি আজ অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু আমরা আজ কি দেখছি? আমরা দেখছি, আজ আত্মা অপেক্ষা অর্থকেই অধিকতর মূল্য দেওয়া হচ্ছে। আর সেই কারণেই সমাজে আজ এত অন্যায়, দুর্নীতি, অপরাধ প্রভৃতির দৌরাত্ম্য প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের এই তথাকথিত 'অর্থকরী সভ্যতা'কে 'আত্মিক সভ্যতা'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। তিনি চেয়েছেন, আমরা যেন সর্বদা আত্মজ্ঞান লাভের সাধনায় সমাহিত হতে পারি। আর সেকারণেই ভারতীয় চিন্তাধারা, যোগ, বেদান্ত প্রভৃতির প্রতি আজ এক সার্বজনীন আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব আজ ভারতীয় যোগ, বেদান্ত ইত্যাদির ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে এক ব্যাপক বিপ্লবের সম্মুখীন। পাশ্চাত্যবাসীরা এখন অনুভব করতে পারছেন, আজ এই শক্তিই তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের যেটি অমূল্য সম্পদ সেটি যেন কোনমতেই আমরা হারিয়ে না ফেলি এবং পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য যেটিকে অর্থহীন, মূল্যহীন বলে বর্জন করছে, সেটিকে যেন আমরা গ্রহণ না করি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই ভ্রমেরই শিকার হয়ে পড়ছি। যে ভোগসর্বস্ব সমাজ আজ পাশ্চাত্যের সকল সর্বনাশের কারণ, সেই সমাজব্যবস্থাটিকেই আমরা অন্ধ অনুকরণ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। ভারতীয়দের পক্ষে এ এক চরম মূর্খতার পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-বিবেকানন্দ আমাদের সঠিক পথের অনুসন্ধান প্রদানের জন্যই বললেন, জীবন শুধু ভোগের জন্য নয়, জীবন বহু স্বর্গীয় আনন্দের আকরস্বরূপ। আনন্দ শুধু দেহে নয়, মনেও অনুভব করা যায়। কোন একটি উত্তম গ্রন্থ পাঠ করে, মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করে, গভীর অনুধ্যানের মধ্যে অথবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাফল্যে মানুষ যে-আনন্দ লাভ করে, সেটিই হলো মানসিক আনন্দ, মানসিক প্রশান্তি। এই আনন্দের ব্যাপ্তি দৈহিক আনন্দের থেকে অনেক বেশি গভীর। আর এই আনন্দের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে 'আত্মজ্ঞান' লাভের আনন্দ—পরমানন্দ। সে-আনন্দ অনেক বেশি গভীর ও মহিমময়।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "এই সংসার হচ্ছে মজার কুটি।" সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই অসীম, অব্যয়, অক্ষয় আত্মা আমাদের মাঝেই বিরাজমান। এই অতি মূল্যবান সত্যটি বিস্মৃত হলে জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর আমরা যদি পাশ্চাত্যের অনুসৃত জড়বাদ, বিলাসিতা—এককথায় 'ভোগবাদ'কে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে নিবৃত্ত না হতে পারি, আমাদের এই অনুকরণপ্রিয়তা যদি অব্যাহত থাকে, তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। শুধু আমাদের দেশই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সতর্কবাণীকে যথাযথ মূল্য দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ভোগ'কে অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, ঐ ভোগের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত। মাত্রাতিরিক্ত 'ভোগ' থেকেই সৃষ্টি হয় 'রোগ'—মানসিক এবং শারীরিক উভয়ই। মানসিক রোগ আবার শারীরিক রোগ অপেক্ষা বিপজ্জনক।

একবার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ—একজন ভক্ত, সজ্জন এবং অতি মেধাবী মানুষ—মানসিক ব্যাধির শিকার হন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, তিনি একটি শিশুর মতো হয়ে গেছেন। কর্মক্ষেত্র থেকে কার্যত পালিয়ে এসে তিনি তাঁর ঘরে একটি বিছানার ওপর চুপচাপ বসে আছেন। বুঝলাম, তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস পুরোমাত্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তাঁকে তাঁর কলেজে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললাম ঃ "আপনি এই কলেজের অধ্যক্ষ, আপনাকে নিজের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।" আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে ফিরে এলাম। শুনলাম, পরমুহূর্তেই তিনি আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই বিছানাটিতে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। এর কারণ কি? কারণ, তাঁর মধ্যে যে প্রবল শক্তি বর্তমান, সেটি এখন পুরোপুরি সুপ্ত এবং এসম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি অন্ধকারে। তারই ফলে এই মানসিক বিপর্যয়। এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তাঁর প্রায় ছয়মাস সময় লেগেছিল। পরবর্তী কালে তিনি আরো দুটি কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের চতুর্দিকে আজ এজাতীয় অসংখ্য অমঙ্গলের ইঙ্গিত। অশুভ বৃত্তিগুলি আজ সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। কিন্তু এই বিশাল দেশের প্রতিটি শিশুর মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির কণামাত্র বিকাশ ঘটলেই আমরা নিজেদের এই অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আশীর্বাদই করে গেছেন।

জড়বিজ্ঞানের মতো এটিও একটি বিজ্ঞান; যাকে বলা হয় 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান'। উভয় বিজ্ঞানই সার্বজনীন, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ স্বীকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকেই আমরা সেই শক্তি লাভ করব। এই অস্থির অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ঐ শক্তির অতি অল্প অংশই যথেষ্ট। শক্তির পরিমাণ এখানে মুখ্য নয়, মুখ্য হলো শক্তির গুণগত মান। এযাবৎ আমরা শক্তির পরিমাপের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। এখন থেকে আমাদের শক্তির গুণগত মানের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। এই বিংশ শতাব্দীতে সকলেই একমত যে, মানুষের মাপকাঠি হলো তার চারিত্রিক গুণ, তার শারীরিক শক্তি নয়। আমরা নিশ্চয়ই একজন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অথবা একজন স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারব না, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে যদি আমরা সামান্য অধ্যাত্মভাবের প্রতিফলন ঘটাতে পারি, তবে তা আমাদের প্রভূত আত্মিক শক্তির অধিকারী করে তুলবে। এই শক্তি আমাদের যাবতীয় মানসিক চাপ, ভীতি এবং অপূর্ণতা থেকে রক্ষা করবে।

চিকিৎসকগণ রোগীদের জন্য ঠিক এই কাজটুকুই করতে পারেন। শুধু বাহ্য লক্ষণগুলির চিকিৎসা করলেই হবে না, রোগীর হৃদয় স্পর্শ করতে হবে এবং রোগীকে তার অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ এই কথা স্বীকার করছে, বর্তমান যুগের ব্যাধির উৎস মানুষের শরীর নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উৎস হলো মানসিক বিকার। আর এই মানসিক বিকার নামক রোগটির মূল ব্যক্তিসত্তার অনেক গভীরে নিহিত। এই সত্য সম্বন্ধে লব্ধ ধারণা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এক নিগূঢ় বিজ্ঞানচেতনা বিশেষ, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ। এবিষয়ে মাস্টার মহাশয়ের বর্ণনাটি অতি মনোরম। 'শ্রীমদ্ভাগবত' থেকে তিনি একটি অতি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"

অর্থাৎ তোমার এই কথ্যরূপ অমৃত কিরকম? না, 'তপ্তজীবনম্'—সংসারতাপে তপ্ত যে-মানুষ মৃতপ্রায়, দগ্ধ —তার কাছে জলস্বরূপ। তারপর বলা হয়েছে— 'কবিভিরীড়িতম্' অর্থাৎ কবি বা জ্ঞানী যাঁরা, শাস্ত্রধর্ম যাঁরা জানেন, তাঁরা এই 'কথামৃত'-এর প্রশংসা করেন, কারণ তা মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়—মানুষ যে মরণশীল নয়, এই জ্ঞান প্রদান করে। তারপর বলা হচ্ছে— 'কল্মষাপহম্' অর্থাৎ আমাদের সকল কল্মষ, পাপ, কলুষ, কালিমা এই 'কথামৃত' দূর করে দেয়। তারপর বলা হয়েছে—'শ্রবণমঙ্গলং' অর্থাৎ কেবলমাত্র 'কথামৃত' শ্রবণ করলেই জীবের কল্যাণ হয়।

যাঁরা এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের শ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধন করছেন। আর কোন কর্মই এই সাধনার সমতুল বলে বিবেচিত হতে পারে না। এই সত্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমি চিকিৎসক এবং তাঁদের সহকারীদের প্রতি সর্বদা এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করি, কারণ তাঁরা এমন এক মহান বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত, যেখানে মানুষের শারীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান— উভয়েরই সম্মিলন ঘটেছে। জীবন্ত মানুষকে কেন্দ্র করেই আপনাদের কর্মযজ্ঞ। কিন্তু সমস্যাটি হলো, আপনারা যদি আপনাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত মানবসত্তার সঠিক 'সেবা' করতে ব্যর্থ হন, তাহলে অন্যান্য মানুষের প্রকৃত সেবা তথা মঙ্গল আপনারা করবেন কিভাবে? এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন চিকিৎসক এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে একটি প্রবল অধ্যাত্মভাবের স্ফুরণ এবং একমাত্র তখনি সাধারণ মানুষ প্রকৃত আরোগ্যলাভের আনন্দ অনুভব করতে পারবে। আর এই কাজটি সম্ভব বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই, কোনরকম যাদুর সাহায্যে নয়। এযুগে মানুষের প্রকৃত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকগণকে তাঁদের কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে শারীরবিজ্ঞান, তারপর চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং সবশেষে মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সার্থক সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে এবং এগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

ঈশ্বরের 'মানুষ'-রূপ সৃষ্টিটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে সবকিছুই বেশ জটিল, মোটেই সরল নয়। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হলেই ঐ মহান বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হবে। প্রথমে নিজের ওপর এবং তারপর অপরের ওপর এই বিজ্ঞানলব্ধ শিক্ষার প্রয়োগ করতে হবে। তখন সমগ্র মানবসমাজে এক মহান পরিবর্তন আসবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দেশের চিকিৎসক ও তাঁদের সহকারীরা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি মানবসম্পদের এই মহান বিজ্ঞানের স্পর্শে চিকিৎসার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবেন।

বর্তমান সমাজের চিত্রটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক, বিষাদপূর্ণ। এমনকি আমেরিকাতেও চিকিৎসকদের খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তার কারণ হলো, প্রত্যেকেই আজ অর্থের জন্য লালায়িত। পাশ্চাত্য দেশে এই চিত্রটি অধিকতর প্রকট এবং বিষয়টি সমালোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে এই সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের মানবিক বোধগুলির অবনতি হতে দেব

কেন? আমরা চাই সুস্থ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষ। আর সুস্থ মানুষ তাঁকেই বলা যায়—যাঁর হৃদয় প্রেম ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ। তিনি সেই প্রেম অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে তাকে আনন্দময় হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন। এটিই একমাত্র উপায়, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের তথা সকল মানুষের সেবা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের এই আশীর্বাদই করে গেছেন।

স্বামীজী আমাদের জন্য লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে গেছেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মোক্ষলাভ তথা জগতের কল্যাণ। এই যৌথ লক্ষ্যের যথাযথ সন্নিবেশ সাধিত হলে দর্শন তথা বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমাদের জীবনধারণ ও কর্মের জন্য স্বামীজী এই পথ নির্ধারণ করে গেছেন।

প্রার্থনা করি, প্রবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনারা আপনাদের জীবন ও চরিত্রগঠনে সাফল্যলাভ করুন এবং হাজার হাজার মানুষকে সুখী ও আনন্দময় করে তোলার ব্রতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠুন। সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।* [সমাপ্ত] ❑

* কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে গত ২৩ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের 'Sri Ramakrishna and Indian Medical Profession' শীর্ষক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

শব্দচেতনা ২২

সহায়ক গ্রন্থ ঃ
শ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীশ্রীমায়ের কথা ইত্যাদি।

পাশাপাশি ঃ (১) মায়ের 'ভারী' (৪) ললিতবাবুকে মা বলেছিলেন ঃ "খোলটাই তো বদলায়, —— তো একই থাকে (৫) মা বলছেন ঃ "নূতন ভক্তদের ঠাকুর—— করতে দিতে হয়, কারণ তাদের নবানুরাগ।" (৬) মা ছিলেন একাধারে —— ও মানবী (৭) স্বামী অরূপানন্দকে মা বলেন ঃ "কৃপায় —— দিই। নতুবা আমার কি লাভ?" (৮) ঠাকুর মাকে বলেছিলেন ঃ "একটি পয়সার জন্যে যদি কারো কাছে —— পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।" (৯) যে-তিথিতে মায়ের আবির্ভাব (১৩) বৃন্দাবনে এই সাধুকে মা দর্শন করেছিলেন (১৪) এক যুবককে অভয় দিয়ে মা বলেছিলি ঃ "আমি বলছি, ——তে মনের পাপ পাপ নয়।" (১৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী, —— দিতে এসেছে।" (১৮) আশুতোষ মিত্র রচিত মায়ের জীবনীগ্রন্থ (২০) এই তীর্থে মা বহুদিন ছিলেন (২১) স্বামীজীর কথা উল্লেখ করে মা একদিন বলেছিলেন ঃ "——র জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না।" (২২) ঠাকুরের রোগারোগ্যের জন্য মা এখানে হত্যা দিয়েছিলেন।

ওপর-নিচ ঃ (১) স্বামী অভেদানন্দ মাতৃস্তোত্রে লিখেছিলেন ঃ "—— জ্ঞানদায়িকে" (২) মায়ের সম্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ (৩) মা ঠাকুরকে বলেছিলেন ঃ "তুমি মা কালীর —— খেয়েছ।" (৪) স্বামী তন্ময়ানন্দকে মা বলেছিলেন ঃ "—— হলো দ্বিতীয় সংসার।" (৯) মা বলতেন ঃ "তপস্যা করছ বলেই যে ভগবানের —— হবে, এমন নয়।" (১০) মা বলেছেন ঃ "যে ——, সে রয়।" (১১) মায়ের কথা ঃ "—— গাছের সময়ে বেড়া দিতে হয়।" (১২) মা বলতেন, এমন কাজে মন সর্বদা যায় (১৪) মানুষের অসংযম দেখে মা বলেছিলেন ঃ "গড় করি মা ——কে।" (১৬) মায়ের এক ভাইঝি (১৭) স্বামী অরূপানন্দকে মা বলেছিলেন ঃ "ঠিক ঠিক পূর্ণজ্ঞান না হলে —— যায় না।" (১৯) এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের বাড়িতে মা বাস করেছেন।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম
আষাঢ় ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শিশির রায়

বাগবাজারে শরৎ সরকারের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

> শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে। (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবার চতুর্থ পর্যায়ে শরৎ সরকারের বাড়ি।
> —সম্পাদক

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শরৎ সরকারের বাড়িতে শ্রীমা সারদাদেবী প্রায় একমাস অবস্থান করেছিলেন। সময়টা ছিল বৈশাখ মাস—১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যভাগ থেকে মে মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত। স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেনঃ "১৩০৩ সালের গোড়াতে মা কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীযুক্ত বলরামবাবু মহাশয়ের পুত্র রামকৃষ্ণবাবুর বিবাহোপলক্ষ্যে বসুগৃহ লোকপূর্ণ থাকায় ঐ বাটীর পশ্চিমস্থ সরু গলির উপর শ্রীযুক্ত শরৎ সরকারের বাটীতে (৫৯/২, রামকান্ত বোস স্ট্রিট) একমাস অবস্থান করেন। সেখানে একদিন মঠের সকলের উদ্দেশে লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্র শ্রীমাকে শোনানো হয়। পত্রে নরনারায়ণের সেবার্থে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হইয়াছে। পত্র শুনিয়া মা বলিলেন, 'নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিয়ে এসব লিখাচ্ছেন।' "[১]

এই বাড়িতেই কুমুদবন্ধু সেন স্বামী যোগানন্দের সহযোগিতায় প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণে—"স্বামী যোগানন্দের কাছ থেকেই আমি জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক তরুণ ভক্ত শরৎ সরকারের বাড়িতে অবস্থান করছেন। বলরাম-মন্দিরের পশ্চিমে একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বাড়িটি।

"পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে কিছু ফুল—প্রধানত লালপদ্ম ও মিষ্টান্ন নিয়ে আমি সেখানে হাজির হলাম। বাড়ির দরজায় শরৎ সরকার দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে দোতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, মাতাঠাকুরানী পূজা করছেন, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে দিয়ে ভিতরে শ্রীশ্রীমার কাছে খবর পাঠালেন, আমি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছি। পনের মিনিটের মধ্যেই গোলাপ-মা এসে শ্রীশ্রীমার দর্শনের জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। যে-ঘরে আমি অপেক্ষা করছিলাম, তার সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি ঘরের [বর্তমানে ঠাকুরঘর] চৌকাঠের ওপর গোলাপ-মা দাঁড়িয়েছিলেন।

বাগবাজারে শরৎ সরকারের বাড়ি • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

"দুরুদুরু বক্ষে, ভাবাপ্লুত হৃদয়ে আমি আস্তে আস্তে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর মিষ্টান্নাদি গোলাপ-মায়ের হাতে দিয়ে (যাঁকে আমি তখনো পর্যন্ত জানি না, পরে শরৎ সরকারের কাছে জেনে নিয়েছিলাম) দেখি, শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্রবস্ত্রে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কিন্তু শ্রীচরণ মুক্ত, কোন আবরণ নেই। ভক্তিভরে সবকটি ফুল তাঁর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম। চারিদিকে পূর্ণ নীরবতা। আমি ওঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রীশ্রীমা নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। স্নেহ ও আশীর্বাদের সেই দিব্যস্পর্শ আমাকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁর সান্নিধ্যে যে-শিহরণ বোধ করেছিলাম, তখন বালক আমি, সেই পবিত্রকারী প্রভাবের

গভীরতা পরিমাপ করতে পারিনি, তথাপি সেই গম্ভীর ভাবময় পরিবেশ যে একটা বিরাট মহিমার বোধ আমার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে, তা অনুভব করেছিলাম। কোন কথাবার্তা হয়নি, তিনি কোন প্রশ্নও করেননি। কয়েক মিনিট পরে মা চলে গেলেন। গোলাপ-মা কিছু ফল এবং মিষ্টান্ন প্রসাদ আমাকে দিলেন। বিপুল আনন্দে ভরপুর হয়ে আমি নিচে নেমে এলাম—দরজার কাছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বললেন, 'আরে, তুই তো বড় চালাক দেখছি। আমি ছিলাম না, সেই ফাঁকে তুই চুপি চুপি এসে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করে নিয়েছিস!'
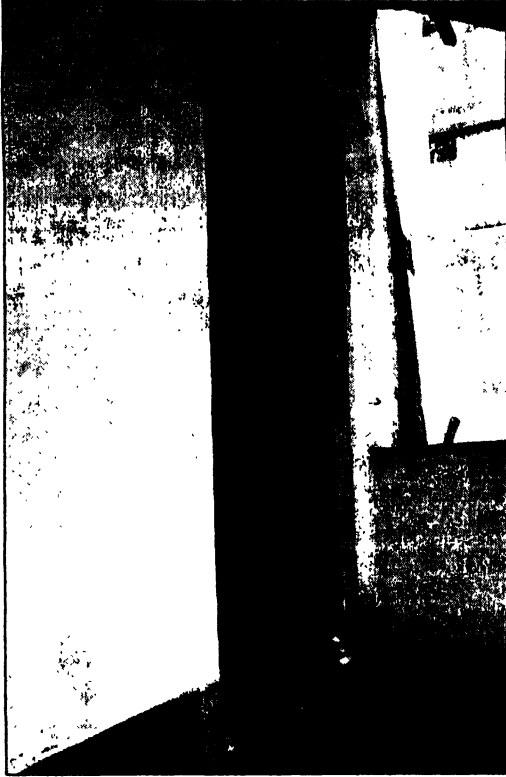
শরৎবাবুর বাড়ির ঠাকুরঘরের প্রবেশদ্বার • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

"এখানে বলে নেওয়া যায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সমস্ত ভক্ত মায়ের দর্শনের জন্য আসতেন, তাঁদের দেখাশোনা করবার জন্য ঐ বাড়িতে থাকতেন। স্বামী যোগানন্দও মায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। আমার পরম ভাগ্য, আমি স্বামী যোগানন্দের কৃপাতেই মাকে প্রথম দেখার সুযোগ পাই।

"তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি মায়ের কাছে গেছি। গঙ্গায় স্নান করে ফুল হাতে শরৎ সরকারের বাড়িতে যেতাম মাকে দর্শনের জন্য।... অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি, আমি এমন একজনের সান্নিধ্যে উপনীত, যিনি আমার পিতামাতার থেকেও অনেক বড়।"[২]

শ্রীশ্রীমায়ের এই বাড়িতে অবস্থান সম্পর্কে কুমুদবন্ধু সেন আরো জানিয়েছেন—"শরৎ সরকারের বাড়িতে মায়ের এই অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বলেছিলেন, 'শরৎ, লোকে তিনদিন দুর্গাপূজা করে, আর তুমি একমাস ধরে দুর্গাপূজা করছ! লোকে মাটির মূর্তির পূজা করে, আর তুমি করলে জ্যান্ত দুর্গার পূজা'।"[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য শরৎ সরকার এর পরের বছরই ১লা মে ১৮৯৭ তারিখে বলরাম-মন্দিরে গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন কলকাতায় তিনশো বছরেরও অধিক প্রাচীন বসু-পরিবারের দৌহিত্র, অর্থাৎ এটি ছিল তাঁর মামার বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো প্রবোধচন্দ্র বসু এই বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ও তাঁর পত্নী লীলাবতী বসু শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। যেসকল অব্রাহ্মণকে স্বামীজী উপবীত দান করেছিলেন, প্রবোধচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুত্র শিবপ্রসাদ বসু (স্বামী শিবানন্দের দীক্ষিত) শৈশবে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বছর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ এই বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছেন।[৪]

এই প্রাচীন বাড়িটি শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি সযত্নে বক্ষে ধারণ করে আজও সগৌরবে বিদ্যমান।❑

পথনির্দেশ : শরৎ সরকারের বাড়ির ঠিকানা : ৫৯/২, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩। গিরিশ অ্যাভিনিউ থেকে নিবেদিতা লেনে প্রবেশ করে বামদিকে 'বোরোলীন হাউস'-এর পাশে যে সরু গলি, তার প্রথম বাড়িটিই শরৎ সরকারের বাড়ি। বলরাম-মন্দির থেকে এই পথেই শ্রীশ্রীমা এবাড়িতে আসেন। রামকান্ত বোস স্ট্রিট দিয়েও এই বাড়িতে আসা যায়।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীমা সারদা দেবী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩শ সং, পৃঃ ১৪০-১৪১
২ শতরূপে সারদা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৭৫০-৭৫১
৩ ঐ, পৃঃ ৭৫২
৪ দ্রঃ 'উদ্বোধন', ৯৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০২, পৃঃ ১৭৯-১৮১

বাঙলা সাহিত্যে এক নবদিগন্তের দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ

সুজাতা সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

যদি কেউ মনে করে থাকেন, বিবেকানন্দের সৃষ্ট বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের এক অগ্নিস্রাবী প্রকাশমাত্র, তাহলে ভুল হবে। স্বামী বিবেকানন্দ যে কত প্রগতিশীল ও আধুনিক, তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করা প্রয়োজন। ভাষা চরিত্রের প্রকাশক। ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ চরিত্রের পৌরুষ সদা বর্তমান। এমনকি হিন্দি ভাষার মধ্যেও যথেষ্ট বলিষ্ঠতা রয়েছে। মাথায় গামছা, হাতে লাঠি, হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মেজাজেও রয়েছে শক্তিমত্তার প্রকাশ। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হলে বাঙালিও হিন্দিভাষা ব্যবহার করে ফেলে—লিখেছেন সাহিত্যিক প্রভাতকুমার। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রই তাঁর ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে—একথা ঠিক, কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলে না।

স্বামীজীর পন্থা অনুসরণ করে সবল ভাষা সৃষ্টির দ্বারা আমরা বাংলার জাতীয় চরিত্রকে আরো বলিষ্ঠরূপে পাওয়ার আশা করতে পারি না কি? নমনীয়তা ও কমনীয়তা-সঞ্চারী বাঙলা ভাষায় যথোচিত এই সবলতার অভাব দুর্লক্ষ্য নয়। এমন ভাষা আমরা ব্যবহার করব, যার উচ্চারণে আমাদের চিন্তার জড়তা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও শ্লথ গতি সরে যায়। চিন্তাপূর্ণ, চাঁচাছোলা অথচ উদ্দীপনাময়ী ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বাঙলা ভাষায় অভিপ্রেত। বাংলার জাতীয় জীবনে আরো বেশি উদ্যম, আরো অধিক প্রাণশক্তি ও বলিষ্ঠতার প্রত্যাশী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কখনো কখনো এই বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে—"দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল দেশে তৈরি হয় না? তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষী বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল!... ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।... খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে।"[১০]

ভারতের যুবশক্তিকে তিনি ডাক দিয়েছেন সিংহনাদে—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন"। সেই ঘুম ভেঙে কি আমরা সম্পূর্ণ জেগে উঠেছি? যুবশক্তির প্রতি কর্মরহস্য উন্মোচিত করে দিয়ে তিনি বলেছেন: "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার"। আমাদের জানা ছিল না মাতৃভূমির জন্য আমরা 'বলিপ্রদত্ত'।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা শুধু বজ্রগর্ভ নয়, গভীর ভাববাহীও বটে। উপনিষদের আদর্শ থেকে দুটি ধারা এসেছে তাঁর সাহিত্যে। একটি হলো 'অভীঃ', অপরটি হলো অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশের ভাষা, তাকে কি 'মিস্টিক' বলতে পারি না? এসম্পর্কে স্বামীজী জানিয়েছেন: "জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার আর চেষ্টা রইল না।... আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হলো যে, সেই শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করে দেয়।" এই ভাষাই প্রকাশলাভ করেছে স্বামীজীর সঙ্গীতে—"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।" কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন, কবিতাটি হলো 'emotions recollected in tranquility'।

তুলনা না করেও স্বামীজীর উক্তি এখানে উল্লেখ করা যাক—"যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনি মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে।... জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা-ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্বকবিতা পাঠ করিয়া উপভোগ করিতে পারিব।"[১১]

উপনিষদ্ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন: "প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চস্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এইসকল উপনিষদ্বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।... তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত।"[১২]

এই কবিত্বের সংজ্ঞাও পাই ঈশ উপনিষদে—"কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"—যিনি কবি, তিনি ক্রান্তদর্শী।

স্বামীজীর প্রিয় ও একাধিক বক্তৃতায় উদ্ধৃত উপনিষদের একটি শ্লোক লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি বহুবার উচ্চারণ করেছেন—

---

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২১৯   ১১ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২   ১২ ঐ, পৃঃ ১০৪

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।"[১৩]

কবিত্ব প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের উল্লেখ করে স্বামীজী লিখেছেন ঃ "ঋগ্বেদ-সংহিতার 'নাসদীয় সূক্তে'র বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়াবস্থা-বর্ণনার সেই শ্লোক আছে—'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' ইত্যাদি—যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এটি পড়িলে এই উপলব্ধি হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত রহিয়াছে।"[১৪]

কবিত্বের মধ্য দিয়ে জগতের অলৌকিক সত্য প্রকাশের এমনই একটি মুহূর্ত দেখি ক্ষীরভবানী দর্শনের পর রচিত স্বামীজীর 'Kali the Mother' নামক সাক্ষাৎ উপলব্ধিজাত অনন্য কবিতাটিতে—

"নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগে!...
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণনিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় গো মা আয় মোর পাশে।"
(অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

উপনিষদের অতীন্দ্রিয় ভাব সাক্ষাৎ রূপ-পরিগ্রহ করেছে কবিতাটির মধ্যে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ "উপনিষদের কাব্যত্বের ভিত্তি কোথায়? শব্দশরীর নির্মাণে? ঔপনিষদিক শব্দ ও ছন্দের অসামান্য শক্তি ও সৌন্দর্য স্বামীজী স্বীকার করেছেন, কিন্তু ঐ শব্দ যাকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট, সেই মহারহস্যের গুণ্ঠন ঈষৎ বিচলিত করার সাফল্যেই তার কাব্যত্ব নিহিত।"[১৫]

বৈষ্ণব পদাবলী বা বৈষ্ণব ভাব তমোগুণী মানুষের কাছে বিষস্বরূপ—স্বামীজীর এই মনোভাব বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মন না হলে রাধাতত্ত্ব বোঝা যায় না। জনৈক গুরুভাইয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একটি বিশেষ ভাবের মুহূর্তে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "Radha was not of flesh and blood. She was a froth in the Ocean of Love."—রাধা রক্ত-মাংসে গড়া মানবী নন, তিনি প্রেমের মহাসাগরের একটি বুদ্বুদ।[১৬]

একদিকে যিনি রুদ্র, অপরদিকে তিনিই শিব। এই তো স্বামীজীর স্বরূপ। কালাতীত থেকে কালের মধ্যে অবতরণ করে আমরা দেখতে পাই—শিবের মতোই তিনি হলাহল পান করেছেন। বহুমুখী ঘটনাবিদ্ধ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে রয়েছে তার অজস্র নিদর্শন। সেই জীবনলব্ধ অনুপম সত্য ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর হৃদয়নিংড়ানো পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

"সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর
দুঃখে যার ভালবাসা
সুখে দুঃখে অমৃতে গরল
তবু নাহি ছাড়ে আশা।"

লিখেছেন—"তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধরে—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—এ তো আর কারো নয়
এ শুধু তোমার।"

সকলে ভয়ঙ্করকে ভালবাসতে পারে না। কিন্তু শাক্ত কবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত সেই ভয়ঙ্করীকে ভালবাসার সাহস দেখিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তাই লিখেছেন—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী
তোমারি মায়ার ছায়া
করালিনী কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ
সুখস্বপ্ন দেহে দয়া।।"

বিবেকানন্দের পত্রগুলি পড়লে দেখা যায়, শিবের মতোই তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোকে পাদচারণা করেছেন পর্বতপ্রমাণ বাধা, বিপদ, শত্রুতা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে। এই মহাবীরকে দর্শন করে মহামায়া পিছু হটেছেন। এই পথে তিনি উত্তরণ করেছেন মায়াকে।

বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্তী। অদ্বৈতবেদান্ত 'ফিলজফি' হতে পারে, কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন তার এক 'practical demonstration'। নিজের জীবনের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে তিনি লিখেছেন ঃ "যতদিন দুই আছে, ভয় তোমাকে ছাড়বে না। সাহসী হও, সবকিছুর সম্মুখীন হও। ভাল আসুক, মন্দ আসুক —দুটিকেই বরণ করে নাও। দুই-ই আমার খেলা।" সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়নিঃসৃত প্রেমধারায় সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে তিনি বলেছেন ঃ

"মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।...
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।"

সত্যের স্বরূপ অপরূপ উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

কী বলিষ্ঠ উচ্চারণ! এই বলিষ্ঠতারই অপর নাম—স্বামী বিবেকানন্দ। [সমাপ্ত] ❑

---

১৩ কঠ উপনিষদ, ২।২।১৫ ১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬
১৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, পৃঃ ১৬০
১৬ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭

বৈশাখ ১৩০৯
এপ্রিল ১৯০৩

মান্দ্রাজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে লিখিয়াছেন,

গত পরশ্ব এখানে পরমানন্দের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার দরিদ্রকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রায় ৬০০ জন ভক্ত ও বন্ধুবর্গ অতি আনন্দের সহিত সমস্ত দিন ধরিয়া পরিবেশন, সংকীর্ত্তন, সাদর সম্ভাষণ, প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি আমোদজনক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বেলা ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্মুখে সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ময়লাপুর (মান্দ্রাজের এক পাড়া) হইতে একদল ও ত্রিপ্লিকেন হইতে আর একদল সংকীর্ত্তন আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুরাগ ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য অনেক গায়ক আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মধুর গীত গাহিয়া স্ব স্ব গুণপণার পরিচয় দিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন ও দরিদ্র ভোজন হইতে লাগিল। এই প্রকার উৎসবে প্রায় বেলা তিনটা হইয়া গেল।

তৎপরে বেঙ্কটাচলম্ নামক একজন কথক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে সুন্দর কথা কহিতে লাগিলেন। জনতার পরিসীমা ছিল না। তাঁহার কথা ৬½টার সময় শেষ হইল। দরিদ্র ভোজনও সেই সময়ে শেষ হইল। পরে বেঙ্কটরঙ্গ রাও নামক একজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুন্দররূপে সন্ন্যাসীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিগ্রহবান সনাতন ধর্ম্ম। পরে রাত্রি আট ঘটিকার সময় আরাত্রিক ও প্রসাদবিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হইল। জনতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ধনী নাম্নী বীণবাদিকা বীণহস্তে উপস্থিত হইলেন এবং বীণ বাজাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে যে কয়জন সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রায় ১ ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাড়া রাগ (যাহা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ শুনিতে ভাল-বাসিতেন) বাজাইয়া তিনি সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

স্বামীজির কথা।

১। জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদ পাঠও অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্চে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি অবস্থা লাভ কল্লে [করলে] তবে সেই পরম পুরুষকে জানা যায়।

২। জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। তিনি অবশ্য সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জেনে সব সম্প্রদায়ের অতীত হয়েছেন। তিনি কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চেষ্টা করেন না, বরং সকলকে উন্নতির পথে সহায়তাই করেন। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়, সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

৩। জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ কত্তে [করতে] হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্চে, সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

৪। মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণে দেহ-মনের বিকাশ হবার সুবিধা হয় আর ভিতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

৫। বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার ইহাও বলেন যে, যুক্তি বিচারের চেয়েও বড় জিনিষ আছে। কিন্তু যুক্তি বিচার করেই তার বাহিরে যেতে হবে।

সংবাদ

স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় সানফ্রাণসিস্কো বেদান্ত সমিতিতে গীতা পড়াইতেছেন। তাঁহার সহজ ও মধুর ব্যাখ্যায় ছাত্রগণ প্রভূত উপকার পাইতেছেন। পুনর্জ্জন্মবাদ, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তিনি ঐ সকল তত্ত্বসম্বন্ধে ভারতীয় বেদান্তের মত অতি সুন্দররূপে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তদ্ব্যতীত, যাহাতে তাঁহারা প্রকৃতরূপে বেদান্তের তত্ত্বসকল জীবনে পরিণত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জপধ্যানও শিখাইতেছেন।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব উন্নয়নের আলোকে ভারতের নবম-দশম পরিকল্পনা

আলোককুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭) আদৌ কোন পরিকল্পনা নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে কোন কোন মহল। বেসরকারিকরণ হলো এর মূল লক্ষ্য। তার অনুসঙ্গ শিথিলীকরণ বা উদারীকরণ। অর্থনীতিকে শৃঙ্খলিত করতে পারলে সুবিধাও হয় অনেকের। শিল্পে লাইসেন্স ব্যবস্থায় বিড়লাদের সুবিধার কথা তো সর্বজনবিদিত।

উদারতা আর উদারীকরণ এককথা নয়। বেসরকারি-করণ আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিনি, বিশ্ব ব্যাঙ্ক আর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের চাপে পড়ে করতে হয়েছে। ফল যে খুব খারাপ হয়েছে তা বলা যায় না। অন্তত উন্নয়নের গতি দ্রুততর হয়েছে। আমরা রাজকৃষ্ণ-বর্ণিত 'হিন্দু উন্নয়ন হার' (শতকরা ৩.৫ শতাংশ) থেকে উদ্ধার পেয়ে ৫ থেকে ৭ শতাংশ উন্নয়নের মুখ দেখেছি। সরকারের আশা, আমাদের উন্নয়ন হার দশম পরিকল্পনায় ৮ শতাংশ হবে।

'আশা' তো বটে, কিন্তু পুরণ করবে কে? উন্নয়ন যে যে উপাদানে সম্ভব হয়, তাতে আপাতত ৮ শতাংশের জ্বালানি নেই। তদুপরি ৮ শতাংশ হারে উন্নয়ন ঘটলে কি লাভ হবে? তাতে কি দেশের দারিদ্র্য দুর হবে? দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রকৃত অবস্থান কোথায়? মনে রাখতে হবে, অর্থনীতির একটি 'প্রকৃত' কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যিক দিক আছে, আরেকটি 'আর্থিক' দিক আছে। আমাদের অনেক সমস্যাই প্রকৃত নয়, কেবল আর্থিকভাবে দেশের প্রকৃত সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যর্থতা। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের দেশকে এখন খাদ্যে স্বয়ম্ভর বলা হয়, অথচ ক্রয়ক্ষমতার অভাবে দেশের অন্তত ৩২০ মিলিয়ন বা ৩২ কোটি মানুষ প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অর্থনীতি হলো সম্পদকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া বা তার সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা। তা না হলে বিহারই হতো দেশের দরিদ্রতম-র পরিবর্তে সমৃদ্ধতম রাজ্য। আর এখানেই মানবসম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে মানবসম্পদের বহির্মুখী দ্বার উন্মোচনের বাধ্যবাধকতাই আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের অভাব সৃষ্টি করে। চিনের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হলো, আমরা ছেলেমেয়েদের তৈরি করি বিদেশে চাকরি করার জন্য, কিন্তু চিনের ছেলেমেয়েরা সরকারের পয়সায় বিদেশে পড়াশোনা করে এসে দেশে কাজ করতে বাধ্য থাকে।

প্রথমে দেখা যাক—উন্নয়ন প্রকরণ। নবম পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) ৬.৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে মাত্র ৫.৪ শতাংশ হারে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। বিগত দুবছরের মধ্যে ২০০০-২০০১ সালে মাত্র ৪ শতাংশ হারে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। আর গতবছরে অর্থাৎ ২০০১-২০০২ সালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ফলে ঐ ৫.৪ শতাংশ উন্নয়ন হারের গড়ে ফেরা সম্ভব হয়। এই পটভূমিকায় দশম পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার ৮ শতাংশ করতে গেলে একদিকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, অপরদিকে মুলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে আয় হয় বেশি। আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পরিকাঠামো রচনায় ব্যয় হয়ে যায় অধিকাংশ মূলধন। কলকারখানা তৈরি করতে আমাদের প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। আমেরিকার মতো দেশে বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুতই থাকে, তার ওপর কিছু বিনিয়োগ করলেই ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। ওদের প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদন করতে তিন একক মূলধন গঠন করলেই চলে। আমাদের সেখানে নবম পরিকল্পনা কালের 'উন্নয়নমূলক (Δ) মূলধন-উৎপাদনের হার' ৪.৫ ছিল। দশম পরিকল্পনায় সেই 'আই. সি. ও. আর' বা 'ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেসিও' বা অনুপাতকে ৪-এ আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

বস্তুত, আরোহণ যখন দুরূহ, তখনি একজন ভাল পর্বতারোহী তার অতিরিক্ত লুক্কায়িত শক্তি এবং প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করে। তদুপরি আমাদের উন্নতি করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। উচ্চ হারে উন্নয়ন সম্ভব কিনা সেটা কথা নয়, কথা হলো—এখনো আমরা সেটা সম্ভব না করে চালিয়ে যেতে পারব কিনা।

পরিকল্পনার ইতিহাস

প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৬) কৃষির ওপর জোর ছিল। আমরা সকলেই জানি, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি ছাড়া আমাদের দেশের অন্তত ৭০ শতাংশ মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তদুপরি জনসংখ্যা বাড়ছিল, দেশ-বিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষ আসছিল কাতারে কাতারে, আর শিল্পোন্নয়নের পটভূমি হিসাবেও কৃষির প্রয়োজন ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় বিশেষ কিছু উন্নয়ন আশা করা হয়নি। যতটুকু আশা ছিল তার অতিরিক্ত সাফল্যই এসেছিল। ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-১৯৬১) সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'নেহরু-মহলানবিশ প্রকৌশল' দিয়ে প্রথমত বৃহৎ শিল্প এবং দ্বিতীয়ত সরকারি ক্ষেত্রের ওপর গুরুত্ব সহায়ে 'মিশ্র অর্থনীতি'র আওতায় 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ধার্য হলো। নিন্দুকেরা একে 'সোনার পাথরবাটি' বলে বর্ণনা করলেন।

দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেলায় তিনটি বিশাল বিশাল ইস্পাতশিল্প গড়ে উঠলেও উন্নয়নের হার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাল না। অনেকে তাই এই কর্মকাণ্ডের সমালোচনা

করল। কিন্তু এই সময় থেকেই ভারতের অর্থনীতিতে (১) মুদ্রাস্ফীতি বা জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সমস্যা বড় হয়ে উঠল এবং (২) বিদেশী সহায়তার ওপর নির্ভর করার ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের সূচনা ঘটল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-১৯৬৬) পুনরায় কৃষিতে ফেরার প্রয়াস মাঠে মারা গেল, কারণ যুদ্ধ লেগে গেল, আর অবহেলিত কৃষি বোধহয় নিদারুণ আত্মাভিমানে খরায় (১৯৬৫) ভেঙে পড়ল। তৃতীয় পরিকল্পনা বিধ্বস্ত হওয়ায় ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে পরিকল্পনার ইতিহাসে ছুটি বা 'প্ল্যান হলিডে' বলে চিহ্নিত হয়ে রইল। আর ঠিক এই সময়েই সমালোচকদের চোখের সামনে 'সবুজ বিপ্লব' সফল হয়ে গেল। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দেশের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হলো, আর চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৯-১৯৭৪) কালে মার্কিন গম আমদানির (পি এল ৪৮০) বাঁধন থেকে আমরা রেহাই পেয়ে গেলাম।

অন্যদিকে ঠিক এইসময় আরেকটি আভ্যন্তরীণ আবিষ্কারে (দাণ্ডেকার এবং রথ, ১৯৭১) আমাদের টনক নড়ল। দেখা গেল, পরিকল্পনাকালে ১৯৬০-এর দশকে (১) শতকরা হিসাবে দারিদ্র্য যৎসামান্য হ্রাস পেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে না, বরং বেড়ে যাচ্ছে এবং (২) গ্রামীণ দারিদ্র্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর অর্থ হলো, পরিকল্পনার সুফল জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাচ্ছে না। পঞ্চম পরিকল্পনায় (১৯৭৪-১৯৭৮) কিছু চটজলদি বা 'অ্যাড হক' ব্যবস্থা নেওয়া হলো। তার মধ্যে জরুরি অবস্থা (১৯৭৫) ঘোষণাও ছিল। অবশেষে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) সুসংহত গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থা (আই. আর. ডি. পি.) ও জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (এন. আর. ই. পি.) গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৮০-র দশকের শেষে সপ্তম পরিকল্পনায় এগুলিকে আরো সুসংহত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তার পরই অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৯২-১৯৯৭) বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত।

মানব উন্নয়ন

পৃথক করে এই শিবের গীতের প্রয়োজন হতো না যদি পরিকল্পনাকালেই মানব উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হতো। বস্তুত, ভারতের পরিকল্পনার চল্লিশ বছরে প্রধানত বস্তুগত মূলধন গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০-র দশকের সূচনায় মানবসম্পদ মন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে মানব মূলধনের ওপর জোর দেওয়া হলেও মানব মূলধনের সংজ্ঞা সঠিক নির্ণীত হয়নি। বেসরকারিকরণের যুগেই বরং মানব উন্নয়ন, মানুষের অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারার পরিবর্তন সহজ হয়নি। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যত বস্তু মূলধন গঠনের অনুকল্পে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত কর্মসূচীর প্রবর্তন প্রয়াসে পর্যবসিত হয়।

শিক্ষা এবং সাক্ষরতার কর্মসূচীতে দশম পরিকল্পনার (২০০২-২০০৭) খসড়া প্রস্তাবে 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' প্রবর্তনে বলা হয়েছে, এপর্যন্ত ৬ থেকে ১৪ বছরের ২০ কোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র ১২ কোটির স্কুলে জায়গা হতে পেরেছে। এদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ স্কুলে যায়ই না। এই অবস্থার পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন। তদুপরি শিক্ষাকে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত করা দরকার। এছাড়াও প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেক ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং বাসগৃহের ১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। কেবল স্কুল খুলে এবং শিক্ষক নিয়োগ করে অবস্থার উন্নতি ঘটানো যাবে না। দেশের বহু গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষকের অনুপস্থিতি একটি বড় সমস্যা। তাই এখন 'কর্মমুখী শিক্ষা'র কথা বিশেষ করে ভাবার সময় এসেছে।

এসব আমরা সকলেই জানি। পরিসংখ্যান দিয়ে পাতা না ভরিয়ে বরং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার প্রবর্তন করা যাক। সেই প্রস্তাবনার আগে নবম-দশম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে—

- দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২১ শতাংশ করা হবে। ২০০৭ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ দারিদ্র্য কমবে এবং ২০১২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ১৫ শতাংশ হ্রাস পাবে।
- পরিকল্পনাকালীন বর্ধিত শ্রমের যোগানকে লাভজনক কর্মসংস্থানে যুক্ত করা হবে। এর অর্থ—বেকারি আর বাড়বে না।
- ২০০৭ সালের মধ্যে দেশের সব শিশু ৫ বছরের বিদ্যালয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে।
- সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ শতাংশ হবে।
- সাক্ষরতা ও মজুরির হারে নারী-পুরুষ পার্থক্য ৫০ শতাংশ হ্রাস পাবে।
- ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৬.২ শতাংশ হারে কমবে।
- শিশুমৃত্যুর হার ২০০৭ সালে হাজারে ৪৫ থেকে ২০১২ সালে হাজারে ২৮ দাঁড়াবে।
- সেই সময় প্রসূতিমৃত্যুর হার যথাক্রমে হাজারে ২ থেকে হাজারে ১ হয়ে যাবে।
- এছাড়াও গাছগাছালি বাড়বে। পানীয় জলের সংস্থান হবে। নদীগুলি হবে দূষণমুক্ত।

বেসরকারিকরণের যুগে পরিকল্পনার লক্ষ্য কেবল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে সঙ্কুচিত থাকেনি। পৃথক পৃথক এলাকার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। বিলগ্নীকরণ সরিয়ে রেখেই ১৬ লক্ষ কোটি টাকার দশম যোজনা চালু হয়েছে। আমরাও বিলগ্নীকরণ, করসংস্কার ও রাজকোষ ঘাটতির প্রসঙ্গগুলিকে আপাতত 'প্রকৃত' নয় বলে

সরিয়ে রাখি। এগুলির উল্লেখ করা হলো অর্থনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে। সেই সংস্কার বিষয়ক সিদ্ধান্ত বহুলাংশেই রাজনৈতিক এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক।

প্রকৃত অর্থনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে, আপন অর্থনৈতিক উন্নয়নে, গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণের প্রকৃত প্রস্তাব হলো দারিদ্র্য দূরীকরণের বেসরকারিকরণ। এককথায়, দেশের প্রমাণিত বেসরকারি সংস্থা বা এন. জি. ও.-গুলিকে আরো বেশি করে দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের কার্যধারার মধ্যে সংহতি সাধন করতে হবে। প্রধান কাজ হলো গ্রামের মানুষের কাছে প্রকল্পের প্রস্তাব চাওয়া, তাদের ওপর কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। এই প্রকল্প সন্ধান প্রক্রিয়ায় দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের দিয়ে নিজের নিজের গ্রামে অনুসন্ধান করানো যেতে পারে। তাদের দিয়ে অনুসন্ধান করানোর সুবিধা হলো—(১) তারা তুলনামূলকভাবে কম দুর্নীতিগ্রস্ত, (২) তাদের সংগৃহীত তথ্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য, কারণ তাদের নিজ গ্রাম সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকবেই—সদ্য তারা সেখান থেকে এসেছে; তাদের কাছে ভুল তথ্য সরবরাহ করে পার পাওয়া সহজ নয় এবং (৩) তাদের উৎসাহ বেশি, নিজের গ্রামের জন্য কিছু করতে পারছে বলে তারা উৎসাহিত ও গর্বিত হবে।

এক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্য জলপানির আয়োজন রাখলে তার পরিমাণ ভাড়াটিয়া মনোভাবাপন্ন সরকারি কর্মচারীর বেতন এবং তেলের খরচের তুলনায় বেশি হবে না। সর্বোপরি প্রশাসনের প্রয়োজনে এই ছাত্রদের ক্যাম্পাসের বদলে মাঠ থেকে সংগ্রহ করলে কোষাগার থেকে তাদের গ্রামীণ প্রশিক্ষণের খরচ বাঁচবে।

ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত উদ্যোগগুলি জেলান্তরে প্রশাসক, নেতৃস্থানীয় ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত এবং শিক্ষকগণ মিলে পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে নির্বাচন করে ফেলতে পারেন। পঞ্চায়েতকে যেমন প্রকল্প ও উদ্যোগ সংগ্রহ থেকে রেহাই দেওয়া হবে, তেমনি প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হবে। রূপায়ণের সাফল্য পঞ্চায়েতে অর্থবরাদ্দ নির্ধারণ করবে। সবশেষে ছাত্রদের কাজটা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাসের অন্তর্গত করে ফেললে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা বীক্ষণাগারের আনন্দ পাবে। একবার কোনক্রমে কিছু প্রকল্প জোগাড় করে দিয়েই ছাত্রদের কাজটা শেষ হয়ে যাবে না। প্রত্যেক ছুটিতে তাদের দেখতে যেতে হবে কোন্ উদ্যোগের কাজ কতটা এগোল এবং কোন্‌টি কেন পিছিয়ে পড়ল। প্রাথমিক এই উদ্যোগের সাফল্যই অন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করবে।

এইভাবে মানুষের স্বীকৃতি এবং অংশগ্রহণে পরিকল্পনা প্রকৃত বিকেন্দ্রায়িত হবে। এধরনের পরিকল্পনায় রাজকোষ ঘাটতি শেষপর্যন্ত অবান্তর হয়ে পড়বে, কারণ প্রথমেই অর্থ-সংস্থানের অনুকল্পে যত বেশি সম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাকিগুলিকে পরবর্তী সময়ের জন্য ধরে রাখা হবে, কোনকিছুই বাদ দেওয়া হবে না। রদবদল করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই করা হবে।

আমাদের পরিকল্পনার মূল সমস্যা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি নয়, মানুষের অংশগ্রহণে অনীহা। একজন বিদগ্ধ মানুষ বলছিলেন : স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে অসুবিধা হলো, তিনি কোন 'মডেল' দিয়ে যাননি—না শিক্ষাব্যবস্থার, না পরিকল্পনার, না অর্থনীতির। আসলে আমরা 'মডেল' বা 'লাঠি' ছাড়া চলতে শিখিনি। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হোক, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক, তারপর তার নিজের উদ্যোগকে আহ্বান করে সঞ্জীবিত করাই হবে প্রকৃত বিকেন্দ্রায়িত নির্দেশমূলক পরিকল্পনা। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের জন্যও কোন 'মডেল' না রেখে গেলেও, রেখে গিয়েছিলেন এক মহান আদর্শ। দিয়ে গিয়েছিলেন মানুষ। বলেছিলেন, নিজেরা যা ভাল বোঝ তা করো।

নবম পরিকল্পনা পর্যন্ত (২০০০ সালে) বিশ্বের মানব উন্নয়ন-সূচকে ভারতের স্থান ছিল ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১২৪তম তথা মধ্যম স্তরের ৮৪টি দেশের মধ্যে শেষের দিকে ৭১তম। ০ থেকে ১-এর মধ্যে ভারতের অবস্থান তখন ০.৫৭৭। মানবসম্পদে উন্নত দেশ হতে হলে অন্তত ০.৮০০ অবস্থান ছুঁতে হবে। নরওয়ে, সুইডেন এবং কানাডার স্থান যথাক্রমে ০.৯৪২, ০.৯৪১ এবং ০.৯৪০। অথচ কারিগরি উন্নতিতে আমাদের দেশ বিশ্বের প্রথম সারির দশটি দেশের মধ্যে। এখানেও স্বামীজীর বার্তা আপামর ভুনাওয়ালা, চাষা আর ঝুপড়ির মধ্যে তথা ভারতের অন্তরে পৌঁছায়নি। তার জন্য অজ্ঞ অশিক্ষিত মুচি-মেথররা দায়ী নয়। দায়ী আমাদের পরিকল্পনার 'এলিট' সম্প্রদায়। দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক ক্ষেত্রের বিকাশে সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন অমর্ত্য সেন। তাই বলে বাজার অর্থনীতির অভিঘাতে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। পরিকল্পনা কমিশনকে উদ্যোগ সৃষ্টির আহ্বান কার্যকরী করার তাগিদেই সমাজের সর্বস্তরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে। আমলাতন্ত্রের ধমনীতে এখন আর 'মডেল' দরকার নেই, চাই 'মানুষ'। ❑

রচনাসূত্র

(১) দশম পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭) খসড়া প্রস্তাব (ও পরিবর্তন পদক্ষেপ)—পরিকল্পনা কমিশন, নিউ দিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১

(২) নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকার, ১৯৯৭

(৩) ঐ, নবম পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা

(৪) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নবম ও দশম পরিকল্পনার পর্যালোচনা, বিশেষত বি. এম. ভাটিয়ার (দ্রঃ দ্য স্টেটসম্যান, ৯ নভেম্বর ২০০২)

(৫) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন : ২০০২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, ২০০২

(৬) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসম্পদ বিষয়ক গবেষণাপত্র —আলোককুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৬

আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত আচার্য বিনোবা ভাবে

তাপসশঙ্কর দত্ত

বিনোবা ভাবে ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও অবহেলিত মানুষের সেবা করে গেছেন। তাঁর মধ্যে আমরা জ্ঞান ও কর্মের সুষম সমন্বয় দেখতে পাই। একা চলার পথের পথিক বিনোবা ভাবে ১৯৫১ সাল থেকে পদব্রজে সারা ভারতের গ্রামগুলি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সুদীর্ঘ বারোবছর ধরে। পুণ্যভূমি ভারত গ্রামপ্রধান দেশ—ভারতের শতকরা সত্তরজন মানুষই গ্রামে বাস করে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ভূমিহীন কৃষক। বিনোবা ভাবে ভূস্বামীদের কাছ থেকে ভূমিহীনদের জন্য ভূমি জোগাড় করেছিলেন। ভূস্বামীদের তিনি বলেছিলেনঃ "তোমার সাতটি ছেলে আছে—তারা তো তোমার জমির অংশীদার—তোমার অষ্টম ছেলে মনে করে আমাকেও একভাগ জমি দান কর।" এই কথায় তিনি অভূতপূর্ব সাড়া পান। ভূস্বামীদের প্রদত্ত জমি ভূমিহীন কৃষিজীবীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিলেন।

প্রচারবিমুখ বিনোবা ভাবে নাম-যশ এড়িয়ে চলতেন প্রতি পদক্ষেপে। তাই তাঁর বাল্যজীবনের কথা বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছিল। সমকালীন বন্ধুবান্ধবরা লেখনীর মাধ্যমে তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন।

আচার্য বিনোবা ভাবের জন্ম ১৮৯৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অধুনা মহারাষ্ট্রের কলার জেলার গাগোড় গ্রামে। পুরো নাম—বিনায়ক নরহরি ভাবে। 'ভাবে' তাঁর পারিবারিক নাম। চার ভাই ও বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। জীবনের প্রথম দশবছর তাঁর জীবন ছিল বৈচিত্র্যহীন। বাবা নরহরি শম্ভুরাও পেশাতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, থাকতেন বরোদাতে। বিনোবা ও তাঁর মা রুক্মিণী দেবী থাকতেন দাদু শম্ভুরাওয়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে। মা ও দাদু উভয়েরই ছিল ভগবানের প্রতি অগাধ ভক্তি। ধর্মপ্রাণ শম্ভুরাওয়ের মধ্যে গোঁড়ামি বলে কিছু ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি 'ভগবান শিবের মন্দির' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁকে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের ওয়ালি শহরে কাটাতে হতো বছরের কয়েক মাস। ভগবান শিবের সন্তান তো সকলেই। তাই সকলেরই তাঁর কাছে আসার অধিকার আছে মনে করে তিনি উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন প্রবল প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করেও। তাছাড়া উৎসবাদিতে ধর্মীয় সঙ্গীত গাইবার জন্য মুসলমান গায়কদের সময় সময় নিয়োগ করতেন তিনি—যা তখনকার দিনের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। শম্ভুরাও ছিলেন উদার অন্তঃকরণের মানুষ। তাঁর গ্রামের বাড়ির আমগাছে গ্রীষ্মকালে প্রচুর আম হতো। প্রথম তোলা সমস্ত আম তিনি বিতরণ করতেন প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা তিনি শৈশবকালেই পেয়েছিলেন তাঁর উদারচেতা দাদু শম্ভুরাওয়ের কাছ থেকে।

দশবছর বয়সে মা রুক্মিণী দেবী তাঁকে নিয়ে আসেন বরোদাতে তাঁর পিতার কাছে। তাঁর আক্ষরিক জ্ঞান বরোদাতেই হয়েছিল। সেখানে পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় পাঁচবছর ধরে। ১৯১০ সালে তাঁকে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। তখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল ১৯০৫ সালে। লোকমান্য তিলক এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সুদীর্ঘ ছয়বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতাদের

মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। 'কেশরী' নামে একটি মারাঠী সাপ্তাহিকও তিনি চালাতেন। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় অবিচারের কথা তিনি তাঁর পত্রিকাতে ব্যক্ত করতেন। বিনোবা এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এইসময়ই তিনি সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের সঙ্কল্প নেন তাঁর জীবনের সাধনা হিসাবে।

মায়ের প্রভাব বিনোবা ভাবের ভবিষ্যৎ জীবন গড়তে সহায়তা করেছিল। অতি শৈশব থেকেই ধর্মীয় গান ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে রুক্মিণী দেবী তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি কোন সময় সন্তানের ভাব নষ্ট করতেন না। তাই বিনোবা আজীবন ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনের সঙ্কল্পের কথা মাকে বললে তিনি বাধা না দিয়ে উৎসাহিত হয়ে বলেন: "বিনো, যে দেয় সে ভগবান, আর যে দিতে কুণ্ঠা করে সে শয়তান। আমি নারী না হয়ে যদি পুরুষ হয়ে জন্মাতাম, ব্রহ্মচর্য পালনে কঠোরতা কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম!" প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে রুক্মিণী দেবী নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসতেন। একবার এক অসুস্থ প্রতিবেশীর বাড়িতে রান্না করে দেওয়ার জন্য রুক্মিণী দেবী নিজের ঘরের রান্না সেরে প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ করলে বিনোবা বলে ওঠেন: "মা তুমি ভীষণ স্বার্থপর—নিজের বাড়ির খাবার তৈরি করে তারপর প্রতিবেশীর বাড়িতে রান্নার জন্য যাচ্ছ।" প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি বলেন: "ওরে বোকা, প্রতিবেশী যাতে গরম খাবার খেতে পারে সেজন্য আমি পরে যাচ্ছি। তাকে আমায় খাইয়ে আসতে হবে।" সময় সময় বাড়িতে মায়ের রান্নায় বেশি বা কম লবণ পড়ে যেত। পাছে তিনি কষ্ট পান সেজন্য বিনোবা উচ্চবাচ্য না করে তা খেয়ে নিতেন। অন্য ভাইরা খাওয়ার সময় অভিযোগ করলে রুক্মিণী দেবী বলতেন: "বিনো তো এব্যাপারে কিছু না বলে খেয়ে গেল।" প্রচারবিমুখ হলেও বিনোবা ভাবে সময় সময় তাঁর জীবনে মায়ের প্রভাবের কথা ঘনিষ্ঠ মহলে ব্যক্ত করতেন।

ছেলেবেলা থেকেই মাথায় বড় বড় চুল রাখতেন তিনি। হাত ও পায়ের নখগুলি নিয়মিত না কাটার জন্য বড় হয়ে যেত। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি এইভাবেই মেলামেশা করতেন। বাইরের চাকচিক্যের দিকে তাঁর একেবারেই নজর ছিল না। লম্বা চুল ও বড় নখ দেখে কেউ বিদ্রূপ করলে তিনি বলতেন: "তুমি বুঝি নাপিত, তাই আমাকে ছেড়ে চুল-নখের দিকে দৃষ্টি?"

এণ্ট্রান্স পাশ করে বিনোবা ভাবে কলেজে ভর্তি হলেন ১৯১৩ সালে। কলেজে ঢুকেই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেন। মুখস্থ বিদ্যা ছাড়া কলেজ-জীবনে শিক্ষণীয় কিছু নেই এবং এ-শিক্ষা দেশ ও জাতির কোন প্রয়োজনে আসবে না; তাই কলেজে চারবছর বৃথা জীবন কাটিয়ে সময়ের অপচয় করা ঠিক নয়—এসব কথা ভেবে তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব সার্টিফিকেট একদিন আগুনে পুড়িয়ে দেন মায়ের প্রবল নিষেধ সত্ত্বেও। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়িবছর।

বিনোবা ভাবে ছিলেন নির্ভীক, স্বাধীনচেতা। নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ীই তিনি কাজ করতেন—কারোর মতামতের অপেক্ষা না রেখে। একবার বরদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার সময় গরমে অস্থির হয়ে গায়ের জামা খুলে ফেলেন তিনি। জনৈক করণিক তাঁকে এই অবস্থায় দেখে বলেন: "প্রকাশ্য জায়গায় কিভাবে চলতে হয় তা জানা ও সেভাবে আচরণ করার জন্য একটু মস্তিষ্কের প্রয়োজন।" তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়ে তিনি বলেন: "ভগবৎপ্রদত্ত মস্তিষ্ক আছে বলেই আমি এভাবে আছি।" করণিক ইংরেজ গ্রন্থাগারিকের কাছে তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলাতে তিনি বিনোবা ভাবেকে ডেকে পাঠান। ঘরে আসামাত্র তিনি বলে ওঠেন: "ভাল আচরণ কাকে বলে তা কি তুমি জান না?" বিনোবা ভাবে বিদ্রূপাত্মকভাবে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালে গ্রন্থাগারিক বলেন: "লাইব্রেরিতে তোমার এমন বিসদৃশ আচরণের কারণ কি?" তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন: "যার সঙ্গে কথা বলব, তাঁকে প্রথমে বসতে বলে কথা বলার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।" সাহেব থতমত খেয়ে তাঁকে বসতে বলেন। ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন: "আমাদের দেশের রীতিনীতি ভিন্ন—আমরা গরমের দিনে অত্যধিক জামাকাপড় বর্জন করি, কারণ তা স্বাস্থ্যহানিকর।" উত্তর শুনে কথা না বাড়িয়ে ইংরেজ গ্রন্থাগারিক তাঁকে চলে যেতে বলেন।

কলেজের পাঠ ইতি করে অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার জন্য বিনোবা ভাবে কাশীতে বসবাস করতে থাকেন। প্রতিদিনই তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন, সময় সময় মনের ভাব কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। এই সময়কার ছোটখাট ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার সহায়ক হয়েছিল। একদিন গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরার সময় তালা কিনতে একটি দোকানে যান। দাম তিন আনার বেশি হবে না মনে করে দাম জানতে চাইলে দোকানদার জানায়, দাম দশ আনা। উচ্চবাচ্য না করে দাম দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন: "তালার দাম তিন আনা জেনেও তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার চাহিদামতো দশ আনা দিলাম।" রোজই একই পথে যাতায়াত করতেন

তিনি। একদিন দোকানদার তাঁকে বলে ঃ "তালার দাম তিন আনাই, আমি তোমাকে অতিরিক্ত সাত আনা ফেরত দিতে চাই।" একথা শুনে তিনি অভিভূত হয়ে যান। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দুটো মৌলিক সত্য শিক্ষার জন্য তিনি ভগবানকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকেন। শিক্ষাদুটি হচ্ছে—(১) সবসময় সত্য কথা বলবে, যাতে অন্যেরা তোমার কথা সত্য বলে ধরে নিতে পারে। (২) অন্যের কথাও সত্য বলে বিশ্বাস করে সেভাবে আচরণ করবে, যাতে অসত্যবাদীও যথাসময়ে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

কাশীতেই গান্ধীজীর সঙ্গে বিনোবা ভাবের দেখা হয়েছিল। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যে তিনি গান্ধীজীর অনুগত শিষ্য হয়ে যান। কাশীতেই তিনি বেদ, গীতা, উপনিষদ্, পুরাণ আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃত চর্চা শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে নেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে তিনি 'যথার্থ মা' বলে সম্বোধন করতেন। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে যেকোন সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন গীতার মর্মার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে। রোগ, শোক, তাপে গীতা তাঁর কাছে এনে দিত সান্ত্বনার বাণী। ১৯৩২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত কারাবাসকালে তিনি সতীর্থ কয়েদিদের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়টি সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর কাছে গীতার ব্যাখ্যা শোনানোর আবেদন আসে নারী কয়েদিদের কাছ থেকেও। কারাগারে নারী-পুরুষ কয়েদিদের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হলেও কারাগার-কর্তৃপক্ষ নিয়মের ব্যতিক্রম করে বিনোবা ভাবেকে নারী কয়েদিদের কাছে গীতা ব্যাখ্যা করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছিল। কারাগারজীবনের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও গীতা পড়ে তিনি শান্তি পেতেন। তাঁর ভাষায়—"মায়ের বুকের দুধ খেয়ে আমার শরীর যতটা পুষ্ট, আমার মন ও হৃদয় গীতার মর্মবাণী উপলব্ধি করে তার চেয়েও বেশি পুষ্ট। গীতার সঙ্গে আমার বন্ধন সবরকম যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে।" আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলতেন ঃ "গীতা আমার প্রাণবায়ু।"

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাকে লবণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে থাকেন। মুক্ত রাখা নিরাপদ নয় মনে করে সরকার তাঁকে কারাগারে বন্দী করেন। কারাগারেই তিনি মারাঠী ভাষায় লেখেন 'গীতাঈ'। মারাঠী ভাষায় মাকে বলে 'আঈ'। ছেলেবেলায় মা তাঁকে সহজ-সরল ভাষায় গীতার অনুবাদ করতে বলেছিলেন। মায়ের কথা মনে রেখে বিনোবা ভাবে কারাগারজীবনের অবসর সময়ে সহজ-সরলভাবে গীতার ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। গীতাই তাঁকে ত্যাগের পথে এগিয়ে দিয়েছে, তাই গীতার নাম রেখেছিলেন 'গীতাঈ' বা 'গীতা-মা'। একসময় পাহাড়ের গায়ে গীতার শ্লোকগুলি মারাঠী ভাষায় লিখেছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর গীতাভাষ্যের অনুবাদ করা হয়েছিল।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ ভালভাবে বোঝার জন্য তিনি আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। কোরাণ পাঠরত বিনোবা ভাবে বিষয়বস্তু ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একসময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন। তাঁর কোরাণপাঠে মুগ্ধ গান্ধীজী সেবাগ্রাম আশ্রমে আগত মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বলেন তাঁর কোরাণপাঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মতো কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে। সম্মত আজাদ বিনোবা ভাবের মুখে কোরাণ পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। খুব কঠিন শব্দও ঠিক ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে দেখে আজাদ তাঁকে 'হাফিজ' (কোরাণ হৃদয়ঙ্গমকারী) আখ্যা দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরাণের নির্বাচিত অংশগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি 'Essence of the Koran' নামে একটি গ্রন্থ ১৯৬২ সালের আগস্টে প্রকাশ করেন। বিধর্মীদের দ্বারা লিখিত কোরাণ অপবিত্র বলে পাকিস্তানী প্রেস চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। পাকিস্তান সরকারও তাঁর অনূদিত পবিত্র কোরাণ গ্রন্থকে কোন গুরুত্ব দিতে অস্বীকৃত হন। এসব তুচ্ছ সমালোচনা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তিনি পদব্রজে তাঁর ষোলদিনের পূর্ববাংলো সফরের সময় প্রার্থনাসভায় এই গ্রন্থটির মর্মবাণী মুসলমান শ্রোতাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সমবেত ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রোতারা আটশো কপি কোরাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিনে নেন।

১৯২১ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার তাঁকে কারাগারে যেতে হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য। এপ্রসঙ্গে তাঁর কারাগারজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সেকথা কারাগার-কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা একদিন বিনোবা ভাবেকে বলেন ঃ "কারাগারের নিয়ম মেনে আপনাকে সাধ্যমতো সুযোগসুবিধা দেব। মনোমতো খাবার এবং পড়ার জন্য সীমিত সংখ্যক গ্রন্থও দেওয়া হবে আপনাকে। অদূর ভবিষ্যতে আপনার কক্ষে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। আপনার অসুবিধা বা কষ্ট লাঘবের জন্য এর বেশি আর কি করতে পারি?" উত্তরে তিনি বলেন ঃ

"কারাগারজীবনে আমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ থেকে বঞ্চিত—এর চেয়ে আর কষ্টকর জীবন কি হতে পারে?"

১৯৪০ সালে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়ে তাতে অংশগ্রহণের জন্য বিনোবা ভাবেকে প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে চিহ্নিত করেন। গান্ধীজীর নির্দেশ মেনে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি সুদীর্ঘ পাঁচবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিতেন। ইংরেজ বন্ধু অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে বিনোবা ভাবের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তিনি বলেন: "আশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হচ্ছে বিনোবা। তার আগমনে আশ্রম ধন্য হয়েছে।" গান্ধীজী এই কথা বলেছিলেন ১৯১৮ সালে। ছাব্বিশ বছরের বিনোবা ভাবেকে গান্ধীজী 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন ১৯২১ সালে। ঐবছরই তিনি তাঁকে ওয়ার্ধাতে নতুন আশ্রম খোলার জন্য প্রেরণ করেন। একবার অসুস্থ বিনোবা ভাবে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন ছুটি নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার সময় গান্ধীজীকে আশ্রমে ফেরার তারিখও জানাতে ভোলেননি। তাঁকে নির্ধারিত তারিখে ফিরে আসতে দেখে গান্ধীজী বলেন: "অদ্ভুত তোমার সত্যনিষ্ঠা!" উত্তরে বিনোবা ভাবে বলেন: "বলুন এটা গণিত-নিষ্ঠা। অঙ্কে তো চিরদিনই মাথাটা খেলে, তাই তারিখ ভুল হয়নি।"

গান্ধীজীকে গুরু বলে মানলেও অপরিসীম ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বিনোবা ভাবে তাঁর সবকিছু মেনে নিতে পারতেন না। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজী তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির বক্তব্য ছিল—"বিনোবার মতো একজন মহান আত্মার সংস্পর্শে আমি কখনো আসিনি।..." চিঠি পড়েই তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে দেন। কমলনয়ন নামে তাঁর এক ছাত্র ছেঁড়া কাগজগুলি সাজিয়ে গান্ধীজীর কথাগুলি পাঠ করে তাঁকে বলে: "গান্ধীজী আপনাকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু চিঠিটা তো আশ্রমের সম্পত্তি, তাই এটা নষ্ট করার অধিকার আপনার নেই। গান্ধীজীর সব চিঠি সযত্নে আশ্রমে রক্ষিত হয়। চিঠিটা আপনার জন্য না হোক, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সযত্নে রাখা উচিত। আপনি একটা মস্ত ভুল করেছেন।" উত্তরে বিনোবা ভাবে বলেন: "আমাকে 'মহান আত্মা' বলে গান্ধীজী মহা ভুল করেছেন। তিনি অনেক মহান ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু না বলে তাঁদের ছোট করেছেন, তাই ভুল সংশোধনের জন্য তাঁর চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছি।" উত্তরে কমলনয়ন বলে: "গান্ধীজী হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেন না। অনেক বিচার-বিবেচনা করেই তিনি এ-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" বিনোবা ভাবে তখন বলেন: "যদি ধরেই নিই যে, ভুল করে তিনি এ-চিঠি লেখেননি, তাহলেও চিঠিটি রেখে আমার অহং ভাব জাগানো ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। আধ্যাত্মিক জগতে চলার পথে 'আমি' 'আমার'ই হচ্ছে প্রতিবন্ধক। তাই চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছি আমার আধ্যাত্মিক জগতে চলার পরিবেশ তৈরি করতে।"

গান্ধীজীর দেহাবসানের পর তিনি তাঁর ভাবধারা বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। তাঁর 'ভূদান' হচ্ছে গান্ধীজীর ভাবধারারই প্রতিফলন। তিনি প্রশংসা-নিন্দাতে বিচলিত হতেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রদর্শিত পথ—ফলের দিকে না তাকিয়ে ভগবানকে সমর্পণ করে তিনি কর্ম করে গেছেন আজীবন।

ষোলটি ভাষায় পারদর্শী বিনোবা ভাবে ছিলেন প্রকৃত অর্থে 'ভাষাতত্ত্ববিদ্'। ল্যাটিন, ফরাসি, ইংরেজি, চিনা, জার্মান ও জাপানি ভাষা ছাড়াও তামিল, তেলেগু, বাঙলা, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত ইত্যাদি অনেক ভারতীয় ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

'তরোরিব সহিষ্ণুনা'—তরুর মতো সহনশীল হও। শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃক্ষ জীবজগতের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে অনাদি কাল থেকে। তাই বৃক্ষের সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তাঁর জন্মদিন ১১ সেপ্টেম্বর 'বৃক্ষরোপণ দিবস' হিসাবে পালন করেছেন জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও।

তিনি আজ আর ইহজগতে নেই। ১৯৮২ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি মরজগৎ ত্যাগ করেন। আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ বিনোবা ভাবে জাগতিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতার আলোকে। প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও আদর্শকে তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের পীঠস্থান ভারতের ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর দুর্লভ মানবজন্ম তাই সার্থক। ❑

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃঃ	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ফাল্গুন ১৪০৯	১২১	২য়	১৪	শ্রীশ্রীমায়ের	শ্রীম-র
চৈত্র ১৪০৯	১৮১	২য়	১৫	১৮৮৭	১৮৮৪

পেতাম যদি

ভক্তি দেবী

রাত্রিশেষে ভোর আকাশে
নীলাভ সেই কিশোর ছেলে
এসে দাঁড়ায়।
বাঁশি বাজায়—ভোরের ঠাটে।
মন বলে যে নীলের ছোঁয়া তাতেই লাগে আকাশটাতে।
সাদা মেঘের দল ভেসে যায়,
বাঁশির সুরে অঙ্গ ভাসায়—
আকাশ জুড়ে ফুটতে থাকে অচিন ছেলের নীল সুষমা
কখন যে তার পায়ে পায়ে জগৎ করে পরিক্রমা।
আমার মনে ইচ্ছা থাকে,
দুচোখ ভরে দেখব তাকে—
হয় না সে তো।
ডাক পড়ে যায় নানান কাজে,
কেবল শুনি মনের মাঝে অধরা তার সুরটি বাজে।
অনুভবেই যায় যে দেখা—চোখ দিয়ে তো সব দেখিনে
রিনিন্ ঝিনিন্ পায়েল শুনি সেই কিশোরের দুই চরণে।

দিনের শেষে একলা আমি ক্লান্ত পায়ে ফিরছি ঘরে
আপনা হতেই চোখ চলে যায়—ঐ গোধূলির আকাশ 'পরে।
নীলের দেখা নেই সেখানে—অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি
কুণ্ডলিত ধূসর রঙের কার সে জটা কাঁপছে এ কি?
তরঙ্গিত গঙ্গা যেন আকাশ থেকে আসছে নেমে,
চারপাশেতে ঢেউ জাগিয়ে খুলছে সে জট থমকে—থেমে।
বাজছে যেটা, নয় তা বাঁশি—ড্রিমিড্রিমি ডম্বরু সে,
রাজার রাজা নটরাজের অভয় হাসির সুপ্রকাশে।

কৃষ্ণা রাতে নিষ্প্রভ চাঁদ, দু-একটা বা তারার আলো
ঘন কালোয় তাতেও দেখি ঐ তারারাই কি জমকালো।
ঘুম এসে যায় ঠাণ্ডা হাওয়ায়
হঠাৎ দেখি মাথার কাছে
রাতের কালোর চেয়েও কালো একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ঘুম ছুটে যায় গভীর রাতে সহস্রবার শুধুই ভাবি—
কোথায় গেলে কুড়িয়ে পাব 'বিশ্বরূপে'র আসল চাবি।
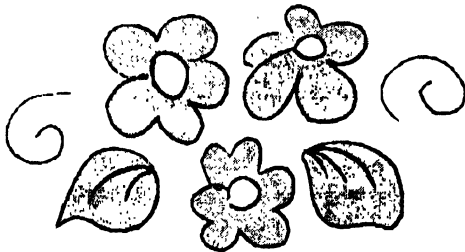
মুখ তুলে চাও

অরুণ মৈত্র

সেই কবে যে হাঁটার শুরু
নাই তো মনে—
হাঁটতে হাঁটতে সকাল, বিকেল,
দুপুর কাবার;
এখন পায়ে নাচন লেগে
ঘুরতে থাকি
ভুলেই গেছি কোথাও যাওয়ার
দিনটা বাকি।
মাধুকরী সার করেছি এ পথ চলায়
যখন যেমন, তখন তেমন শরীর ভাসায়
তোমার কথাই ভাবতে থাকি
আপন মনে;
মুখ তুলে চাও পরম প্রিয়...
অন্তরে যে লুকিয়ে আছ
সঙ্গোপনে।

পুরুষোত্তম

প্রদীপ বসু

নমি প্রাণেশ
জন্মান্তরের প্রভু,
হৃৎকমলের অমিতবীর্য মণি
হারায় না যেন কভু।
নহ তো তুমি কালী—কাল
লহ মোর পঞ্চভূতের দেহ
নিবিড় প্রাণের বন্ধন
পারে কি টুটিতে কেহ!
যুগাচার্য,
তুমি প্রেমসাগরের রাজা
অধম জনেও দাও না কোন সাজা
শুনাও কেবল হৃদয়জয়ী বাণী—
ত্যজ লোকভয় ও রাজভয়
ত্যজ অলসতা দুর্বলতা
কর জয় মৃত্যুভয়।
বিভু,
কভু যেন না করি সংশয়
হর মোর সকল মিথ্যা ভয়।
প্রেমাধীশ তুমি, শুভঙ্কর
কৃপা করি কর এ আশীর্বাদ—
তব অমৃতবাণী সুধা-করুণা
আনিবে বিশ্বে অক্ষয় সাম্যবাদ।

প্রার্থনা

দিলীপকুমার ঘোষ

আলো গেছে চলে, কোন্ সে সকালে
ছায়া হয়ে আছে ছবি,
যা ছিল সকলি, কোথা গেল চলি
কপালে ঠিকানা খুঁজি।

তাই রাখি ধরে, বুকের মাঝারে
মাটি মা'র কোলে বসি,
নিয়তির লেখা, দেখে দেখে একা
গোপনে নয়নে ভাসি।

সুখ শখ গেছে, ফুল পাখি গেছে
কাঙাল হয়েছে মন,
তবু কালো আশা, বাঁধে ভবে বাসা
ঘটে না উদ্বোধন।

তোমা লাগি হিয়া, আছে যে জাগিয়া
তোমারই স্মরণে মননে,
সাজি ভরে তাই, ফুল তুলে যাই
ও দুটি চরণ বরণে।

কোথা তব দয়া, সুশীতল ছায়া
গুমরিয়া মরে মরমে,
ভাঙা ঘরে হায়, হাওয়া হেসে যায়
কীট ছেয়ে যায় কুসুমে।

ভেসে চলে ভেলা চলে যায় বেলা
লহর শুনায়ে যায়,
মন-মুখ যার, এক হয় তার
কপাল ফিরিয়া যায়।

এ কেমন কথা, দয়াল দেবতা
দুই এক নয় বলে,
পড়ে রব দুখে, মরু নিয়ে বুকে
তুমি যাবে অবহেলে।

তাও যদি মানি, চির শুভ তুমি
ওগো ও করুণাময়,
আগামী আগুনে, পুড়ায়ে যতনে
করিও আলোকময়।
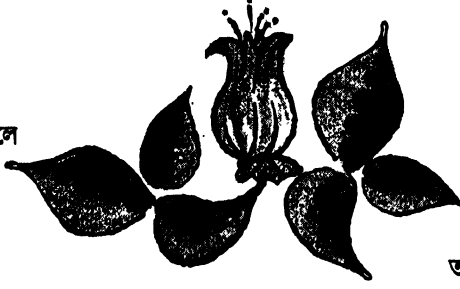
পাওয়া

সুনীলকুমার পাল

নাচন-কোদন অনেক হলো
কতজনাই এল গেল,
মনটাকে তুই শান্ত করে একটুখানি বোস।

মন্দ ভাল প্রচুর চাওয়া
সাঙ্গ হলো অনেক পাওয়া,
আসল পাওয়া রইল বাকি হয় নাকি আপশোস?

হীরে-জহরত টাকাকড়ি
মানছি রে তোর নেই কো জুড়ি
আনন্দ, সুখ রইল কদিন সত্যি করে বল?

জীবনখানার অর্থ খুঁজে,
যদি পেতিস হৃদয় মাঝে
তাঁকে, তখন আনন্দস্রোত বইত অবিরল।

সময় কিছু যায়নি বয়ে,
বসে যা তুই তৈরি হয়ে,
মনটাকে তোর আঁটুবাঁটু করেই তাঁকে ডাক।

সোজা নয় এ শক্ত মানি,
হৃদয়ে পাত আসনখানি,
ভোগবিলাসী! বিষয়-আশয় সবই চুলোয় যাক।

আরো পথ এক আছে শুধুই,
ঠাকুরকে দে বকলমা তুই,
তারপরেতে আপন কর্ম করিস যেমন কর।

আঁকড়ে মায়ের দেহখানা,
হয়ে যা তুই বাঁদরছানা,
নয়তো বেড়াল মায়ের ওপর কর পুরো নির্ভর।

চির নতুন

সঞ্জীব ব্যানার্জি

হে বিরাট।
ক্ষুদ্র মানব মনের ক্যানভাসে
তুমি অধরা আলোকের ছবি।
কালের সমুদ্রকে মনের পরিধি দিয়ে
তাই অসংখ্য বৃত্তে ভাগ করে দিয়েছি।
সময়ের স্রোত ধরে জীবনের খেয়া
ভেসে চলে ঘাট হতে ঘাটে।
বছর আসে, বছর যায়, আবারও আসে।
এমনি করেই একদিন বছরের সমষ্টিতে
একটা জীবনের সমর্পণ হয়
অন্য এক জীবনের গর্ভে।
জন্মের 'রিলে রেস' চলতেই থাকে।
অবশেষে সেই মহাদিন—
অজস্র পুণ্য জীবনের মালা গলে
মহাজীবন আসে।
সে তো সেই তুমি!
তাহলে নতুন কে?
সময় না সংখ্যার গোনা?
জীবন না মহাজীবন?
সব গুলিয়ে যায়।
মাথা ঘোরার সেই অন্ধকার দিনে
চোখ বুজে দেখি
অতি পরিচিত পুরাতন সেই তুমি
দীপ জ্বাল স্মিত মুখে
চির নতুনের সাজে।

বৈষ্ণব পুঁথি রচিত ও অনূদিত হয়। নির্মিত হয় অসংখ্য রেখদেউল, চালামন্দির, রত্নমন্দির প্রভৃতি।

শুধু বিষ্ণু, শিব বা রাধাকৃষ্ণ নয়, রামায়ণ সংস্কৃতির নিদর্শনও বাঁকুড়ায় কম নয়। বাঁকুড়ায় মহাভারতের প্রভাব তেমন পড়েনি, কিন্তু রামায়ণের প্রভাবে এখানকার জনজীবন, লোকসাহিত্য ও লোক-উৎসব পরিপুষ্টতা লাভ করেছে। মন্দিরের টেরাকোটায়, রামায়ণ কথকতায়, রাবণকাটা উৎসবে, ভাদু ও তুষু গানে, রাসযাত্রায়, সর্বোপরি রামায়ণ অনুবাদে এই ধর্মবিশ্বাস এখনো জীবন্ত হয়ে আছে।

মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মসংস্কৃতির প্রভাবও এই জেলায় অল্পবিস্তর রয়েছে। নবাব আমলে বা মোগল আমলে মল্লরাজারা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করে গেছেন এবং পীর-দরগা বাঁকুড়াতেও কম নেই। অসংখ্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আজও স্বতন্ত্রভাবে স্বধর্মচর্চায় দিনযাপন করে চলেছেন। বিষ্ণুপুরের সত্যপীরতলার পীরবাবার পবিত্র অঙ্গন হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-নির্বিশেষে এক মহামিলন ক্ষেত্র। এছাড়া ইয়োরোপীয় মিশনারিদের আগমনবার্তা বাঁকুড়ায় পৌঁছেছিল গত শতাব্দীতে। বাঁকুড়া শহর এবং সারেঙ্গা অঞ্চলে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর বিশেষ সমাবেশ ঘটেছে। এই ধর্মাবলম্বী মানুষরা আজও তাঁদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে পালন করে চলেছেন। সেই হিসাবে বলতে গেলে বাংলার সংস্কৃতিসম্পন্ন অথচ দরিদ্র জেলা বাঁকুড়াকে সর্বধর্মের ঐতিহ্যবাহী এক অনন্য জেলা বলা চলে। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

১ বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা—রবীন্দ্রনাথ সামন্ত
২ বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ মল্লভূমের ইতিহাস—ফকিরনারায়ণ কর্মকার

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

আদর্শ মিত্র

দুই মিত্র। একজন দরিদ্র, অপরজন ধনবান। দরিদ্র ব্যক্তিটি কন্যার বিবাহের জন্য অর্থাকাঙ্ক্ষী হয়ে ধনী বন্ধুটির বাড়ি গেল। বন্ধু তখন বাড়ি ছিল না। তার স্ত্রী দরিদ্র ব্যক্তিটিকে আপ্যায়ন করে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করল এবং তাকে পাঁচশো টাকা দিল। ধনী ব্যক্তিটি বাড়ি ফিরলে তার স্ত্রী টাকা দেওয়ার কথা জানাল। শুনে ঐ ধনী ব্যক্তি কাঁদতে আরম্ভ করল। স্ত্রী বলল ঃ "তোমার মিত্রকে তার বিপদের সময় পাঁচশো টাকা দিয়েছি বলে তুমি কাঁদছ? আমার পিতা ধনী। আমি ঐ টাকা এনে তোমাকে দেব।" ধনী ব্যক্তিটি বলল ঃ "তুমি জান না। আমি সেজন্য কাঁদছি না। সে আমার মিত্র! কোথায় বিপদের সময় আমি নিজে গিয়ে তাকে সাহায্য করব, তা হলো না, বরং তাকেই টাকার জন্য এসে ভিক্ষা করতে হলো! সেইজন্য কাঁদছি।" ❑

প্রারব্ধ ভোগ

"ভোগে বিনা মিটে নাহি, করম্‌গতি বলবান।"

যোগী গোরক্ষনাথের পায়ে ঘা হয়েছে। দারুণ কষ্ট। নিজের ও অপরের বহু ঔষধেও সারল না। তখন তিনি তা প্রারব্ধের ওপর ছেড়ে দিলেন, আর কষ্টের দিকে খেয়াল করলেন না। রোজ জঙ্গলের একই রাস্তা দিয়ে তিনি যাতায়াত করেন। একদিন একজন পিছন থেকে ডাকল ঃ "মহারাজ! মহারাজ!" চারদিকে চেয়ে গোরক্ষনাথ দেখলেন—কোন জনমানুষ নেই। একটি লতা বলছে ঃ "মহারাজ! আমাকে উঠিয়ে পিষে ঘায়ে লাগাও, সেরে যাবে।" গোরক্ষনাথ বললেন ঃ "রোজই তো আমি এই রাস্তা দিয়ে যাই, তুমিও এখানেই আছ। তা, এতদিন বলনি কেন? কতদিন ধরেই তো আমার এই ঘা হয়েছে।" লতা বলল ঃ "মহারাজ! এতদিন তোমার সময় পূর্ণ হয়নি। ভোগ পুরো হয়নি। আর তিনদিন ভোগের বাকি আছে।" গোরক্ষনাথ বললেন ঃ "এতদিনই তো গেল, আর তিনদিনও না হয় ভোগই করব, তোমায় আর পিষে লাগাব না। ভোগেই কর্মক্ষয় হোক।" ❑

স্বামীজি! আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়ায়। ১৯১৯ সাল। গরমকাল। মা ভক্তদের সঙ্গে হঠাৎ স্বামীজীর প্রসঙ্গ করছেন। সতেরো বছর আগে স্বামীজী চলে গেছেন। উনচল্লিশ বছরে চলে যাওয়াটা কি উচিত কাজ হয়েছিল? বেলুড় মঠে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হলো সেদিন। স্পোর্টস। তারিখ ২৮ মার্চ ১৯০২। ভগিনী নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করছেন। স্বামীজীর শয়নকক্ষের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছেন শ্রীমতী ম্যাকলাউড। স্বামীজী হয়তো বিশ্রাম করছিলেন। স্বামীজী কি বার্তা পেলেন, আমাদের জানার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ বললেন ঃ

"আমি কখ্‌খনো চল্লিশ পেরুব না।"

শ্রীমতী ম্যাকলাউড জানতেন, তখন স্বামীজীর উনচল্লিশ চলছে। ম্যাকলাউড বললেন ঃ "কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধের জীবনের বড় কাজ তো তাঁর চল্লিশ থেকে আশি বছর বয়সের মধ্যে হয়েছিল, তার আগে হয়নি।"

—"আমার যা দেওয়ার ছিল তা দিয়ে ফেলেছি, এখন আমাকে যেতেই হবে।"

—"যাবেন কেন?"

স্বামীজীর অদ্ভুত উত্তর ঃ "বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না; তাদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাকে যেতেই হবে।"

আহ্বান তিনি শুনতে পেয়েছিলেন অনেক আগেই। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, বিদায় আসন্ন। ঐ বাঁশি আর বাজবে না বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে। লীলা গুটিয়ে আনছেন। সর্বগ্রাসী উদাসীনতা। 'তুমি কি চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছ?'

শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে অলৌকিক হাসি।

"ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ।"

—উদ্ধব! তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। ব্রহ্মা, শঙ্কর ও লোকপালগণের ইচ্ছা যে নরলীলা শেষ করে বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাই।

স্বামীজীর হাতে দুখণ্ড পাথর। ঝিলামের তীরে একটি আপেল বাগিচা। ধারে ধারে নাসপাতি আর কুলগাছ। চমৎকার ঘাস। স্বামীজী বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শান্ত ঝিলাম। মৌন পাহাড়ের সারি। এ এক অলৌকিক দৃশ্য! স্বামীজী যেন ধ্যানস্থ শিব। গতি কমে আসছে। নদী যেন মোহনায়। স্বামীজীকে ঘিরে বসে আছেন তিন বিদেশিনী—ধীরামাতা, জয়ামাতা আর নিবেদিতা।

স্বামীজী প্রস্তরখণ্ড দুটি নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ নিবেদিতাকে বলছেন ঃ "যখনি মৃত্যু আমার কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা—এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করতে থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই।"

স্বামীজী দুহাতে ধরা পাথরদুটি ঠুকলেন। সেই শব্দ প্রদোষের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল। পাখির ঠোঁটের শব্দের মতো। স্বামীজী কথা শেষ করলেন ঃ "কারণ, আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।"

কয়েকদিন আগে স্বামীজী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আজ কিঞ্চিৎ সুস্থ। যে-বাগিচায় বসে আছেন, সেখানে হাউসবোট আসতে পারবে না, তাই স্বামীজী এসেছেন ডোঙায় চেপে। হাউসবোট দাঁড়িয়ে আছে ঝিলামের গভীর জলে। ঐ শিকারাতেই স্বামীজী অসুস্থ বোধ করায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শরীর ক্রমশই যেন অপটু হয়ে আসছে।

১৮৯৭ সালের ১১ আগস্ট স্বামীজী জনৈক সাধুকে বলেছিলেন ঃ "আমি আর মাত্র পাঁচ কি ছয় বছর আছি।" সময় এগোচ্ছে, ১৯০১ সাল। ঢাকার জনসভায় বক্তৃতার পর স্বামীজী ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি বড় জোর একবছর আছি। এখন শুধু মাকে গোটাকতক তীর্থদর্শন করিয়ে আনতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিন। ৩১ ডিসেম্বর। বিংশ শতাব্দীতে পা রাখবেন স্বামীজী। বিংশ শতাব্দীর সূচনা করবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদীপটি স্থাপন করবেন উদ্ঘাটিত

দুয়ারপথে। তিনি বলতেন—আলো, আলো নিয়ে যাও ঘরে ঘরে। এই আলো, বিশেষ আলো বিচ্ছুরিত হবে 'আত্মারামের কৌটো' থেকে। "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব, তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি!' সেইজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি।"

নতুন শতাব্দী শুরু হলো। রামকৃষ্ণ শতাব্দী। তার পরিমাপ একশো বছরে হবে না, দেড়হাজার বছর তো বটেই। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সহস্রাব্দ। "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র করে রাখেন।" স্বামীজী বললেন।

"ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নতুন স্রোত এসেছে। সব নতুন ছাঁচে গড়তে হবে। আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙে দিয়ে এখন কেমন এক নতুন ছাঁদ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদ করছে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি?... দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিতে হয়... সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে।" নতুন প্রাণের স্পন্দন।

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ করলেন। পাহাড়ে, বরফে, শীতে, ঝুপড়িতে। নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অমরনাথ। "অমরনাথ দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নামছেন না। অমরনাথ যাওয়ার সময় এমন সব উঁচু উঁচু জায়গায় উঠেছিলাম, যেখানে কোন যাত্রীরা যায় না। সেই নির্জন পথে হাঁটবার জন্য আমার কেমন একটা ঝোঁক চেপেছিল। সেসময় শরীর-বোধ ছিল না।"

২৯ জুলাই ১৮৯৮। পহেলগাঁও। আজ একাদশী। গতকাল তাঁবুতেই রাত কাটিয়েছেন স্বামীজী। শরীর চলছে মনের জোরে, আত্মার অক্ষয় শক্তিতে। একাদশী পালনের জন্যই ২৯ তারিখেও পহেলগাঁওয়ে অবস্থান। পাহাড়ী লিডার কখনো উচ্চ পাহাড়ে বৃষ্টির কারণে ফুলেফেঁপে উঠে উপলশয্যার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলতানে। পরমুহূর্তেই জলশূন্য উপল-বিস্তার। [ক্রমশ] (এক)

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) 'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখার বিষয়—ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না।
(২) লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়।
(৩) কবিতা ও পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
(৪) শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে লেখা পাঠাতে হয়।
(৫) লেখার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত ছবি (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়।
(৬) উচ্চমানের লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হয় না। কেবলমাত্র 'মাধুকরী' বিভাগেই ঐধরনের লেখা প্রকাশিতব্য।
(৭) গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতার বই সমালোচনার জন্য পাঠাবেন না।
(৮) জেরক্স বা কার্বণ কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখতে হয়। শব্দসংখ্যা ২,৫০০-এর কম। লেখক বা লেখিকার নাম, ঠিকানা, ফোন নং দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
(৯) একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
(১০) লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে ঐ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লেখক-লেখিকার। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদির পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
(১১) রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ মা দেখেন

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে থেকে একদল যুবক তখন ভগবানলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করছিল। রাতের বেলা চারিদিক যখন চুপচাপ, তখন ভগবানের নাম করার সুবিধা। সেইজন্য ঠাকুর চাইতেন ছেলেরা যেন এই সময়েই জপধ্যান করে। কিন্তু রাতে বেশি খেলে তো তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে। তখন আর বেশিক্ষণ রাত জেগে ভগবানের নাম করতে পারবে না। তাই রাতে কে কটা রুটি খাবে তা ঠাকুরই ঠিক করে দিতেন। কিন্তু ছেলেদের খাওয়াতেন শ্রীমা। তিনি যে মা। তাই মুখ দেখলেই টের পেতেন, কার পেট ভরেনি। তখন নিয়মের তোয়াক্কা না করেই তিনি তাকে পেটভরে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু ঠাকুরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তিনি একদিন ঠিক ধরে ফেললেন। তাঁর মনে হলো, এমনটি হলে তো ছেলেদের সাধনভজন ঠিকঠাক হবে না। ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতি হবে। তাই মাকে তিনি সেকথা বলতে গেলেন। কিন্তু বলা মাত্রই মা ঘোমটার আড়াল থেকে শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন : "ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" এমন কথা শুনে ঠাকুর আর কিছু বললেন না। ছেলেরা নিয়ম না মানলেও ঠাকুর মনে মনে খুশি হলেন। বুঝলেন ছেলেদের পিছনে 'মা' আছেন। ভবিষ্যতে তো তাঁকেই সব দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে।

পরবর্তী কালে সত্যিই দেখা গেছে, ঠাকুর না থাকলেও শ্রীমা-ই 'সবার মা' হয়ে সব ছেলেকে রক্ষা করেছেন আর ছেলেরাও সারাজীবন প্রাণ দিয়ে মায়ের নির্দেশ পালন করেছে।

পাঁজির মতন *
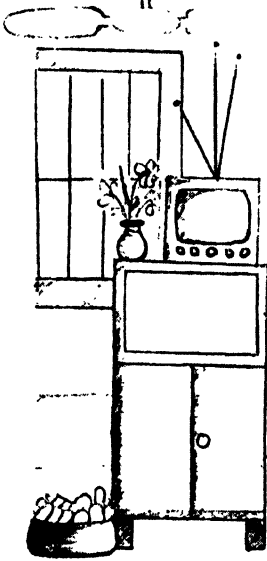
পাঁজির পাতায় লেখা থাকে,
জল হবে বিশ আড়া‡;
কিন্তু যদি পাঁজি টিপিস,
পাঁজিকে দিস নাড়া,
একটি ফোঁটা জল মেলে না,
লেখাই থাকে শুধু,
পাঁজির পাতা রুখু-শুখু
মরুর মত ধু-ধু।
প্রায় পণ্ডিত ওই রকমই,
বাকিতে খুব বড়,
খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, দেহের সুখ আর
টাকার কথায় দড়।

* রচনা : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

‡ জলের পরিমাপের একক

ছবি : অর্পিতা কয়াল
নবম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ মিশন সারদামন্দির, সরিষা

বি.দ্র. : ওপরের ছড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পকে ভিত্তি করে রচিত। এরকম আরো অনেক ছড়া আছে— 'শুকদেবের গুরুদক্ষিণা দান', 'পাটোয়ারীর বর প্রার্থনা', 'দাঁত গেছে তাই বলি বন্ধ' ইত্যাদি। আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা আগামী দুমাসের মধ্যে উপরি উক্ত তিনটি গল্প-ভিত্তিক সাদা-কালো ছবি পাঠাতে পার। মনোনীত হলে তা ছাপা হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা—
'সবুজ পাতা', প্রযত্নে—সম্পাদক, 'উদ্বোধন', ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩

আদি শঙ্করাচার্য ২০

শিশু ও কিশোর বিভাগ

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

প্রশ্ন ঃ (১) বর্তমান ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে যেটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি হলো রাজনীতি। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহলে স্বামীজীর ভাবানুরাগী যুবসমাজও কি রাজনীতিকে পরিহার করে চলবে? আর তা না হলে তারা রাজনীতিতে কতটা জড়িত হবে? বর্তমান সমাজে রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তির কোন মূল্য আছে কি?

(২) আমাদের দেশের সঠিক ইতিহাস বোধহয় এখনো রচিত হয়নি। দেশের সাধারণ মানুষের ইতিহাসচেতনাও কম। আমরা জানি, স্বামীজী এই বিষয়ে একাধিকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নির্মোহ দৃষ্টিতে আধুনিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত না হলে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেও ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের দুর্বলতা সম্বন্ধে নানা সংশয় ও বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছে। এসম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা আছে কি?

—সোহম পাইন, দুর্গাপুর

উত্তর ঃ (১) হ্যাঁ, স্বামীজীর ভাবানুরাগী যুবসমাজও সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করে চলবে।

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করা এক, আর রাজনীতিকে সমর্থন করা আরেক। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে। সবদিক চিন্তা করেই প্রত্যেককে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করবে কিনা।

বর্তমান সমাজে রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তির নিশ্চয় মূল্য আছে। আমরা দেখেছি—যাঁরা যথার্থ নিষ্কাম সেবার কাজে নিয়োজিত, তাঁরা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন।

(২) ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের—তা সরকারি বা বেসরকারি যে-পর্যায়েরই হোক। রামকৃষ্ণ মিশনের একার কোন দায়িত্ব নয়। তবে তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাঙলা ভাষায় দুই খণ্ডে 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইংরেজি ভাষায় এগারো খণ্ডে ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ ইতিহাস সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'The History and Culture of the Indian People'। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন ঐতিহাসিক। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সম্পাদনায় সহায়তা করেন। এপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যেসকল বিদেশী বা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের ঐতিহাসিকরা ভারতের যে-ইতিহাস রচনা করেছেন—তা অত্যন্ত একপেশে।

তোমাদের আরো জানা উচিত, আমাদের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। যুগে যুগে যেসকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন—তাঁদের জীবনীকে অবলম্বন করে যেসব পুস্তক রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যেও বিধৃত রয়েছে ভারতের ইতিহাস।

প্রশ্ন ঃ (১) স্বামীজীর উপদিষ্ট পথে যেসব যুবক-যুবতী চরিত্রগঠন, মানবসেবা ও দেশগঠনের লক্ষ্যে ব্রতী হতে চায়, তাদের জীবনে দীক্ষাগ্রহণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আছে কি?

(২) আমাদের জীবনে কর্মফল, পূর্বজন্মের সংস্কার, পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও পুরুষকারের কোন সম্বন্ধ আছে কী? এবিষয়ে 'উদ্বোধন'-এর 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে খুব সংক্ষেপে কিছু উত্তর প্রদত্ত হয়েছে। আরো বিশদভাবে জানতে চাই।

—পরীক্ষিৎ ঠাকুর, কলকাতা-৬৮

উত্তর ঃ (১) নিশ্চয়ই আছে। মন্ত্রদীক্ষা নিলে নিজেদের জীবন আরো সুনিয়ন্ত্রিত হবে, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ হবে। ফলে তার চরিত্র মহিমময় হবে। সে সেবাকার্য আরো ভালভাবে করতে পারবে।

(২) অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। বিশদভাবে জানতে হলে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পড়বে। এটি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ৯ম খণ্ডে আছে। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেও এটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : *(১) ক্রমবর্ধমান দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ধর্মীয় উস্কানি ও 'exclusive rights'-এর বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্ন—ভারতবর্ষের মতো বহুজাতিক, বহুধর্ম-সমন্বিত রাষ্ট্রে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন কোন্ পথে সম্ভব? কিছু বিভ্রান্ত মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিবেকানন্দ-অনুরাগীর যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?*

(২) এককভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন সামাজিক অবিচারের প্রতিকার করতে গেলে বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। এরকম ক্ষেত্রে স্বামীজীর ভাবাদর্শে যারা কাজ করছে, তাদের কর্তব্য কী? অর্থাৎ তারা কিভাবে এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করবে?

—কৃষ্ণায়ণ শাসমল, বাজকুল, মেদিনীপুর

উত্তর : (১) একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ"-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই আধুনিক বিশ্বে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন সম্ভব। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবি বহু বছর আগেই একথা বলেছেন। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষেরাও আর্ণল্ড টয়েনবির কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের উচিত শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী নিজ জীবনে গ্রহণ করে তা সর্বত্র প্রচার করা।

(২) সর্বকালে সর্বদেশে চরিত্রবান, আদর্শবান ব্যক্তির কাছে সকলেই মাথা নত করে। নিঃস্বার্থ সেবায় কেউ বিরোধিতা করতে পারে না। স্বামীজীর ভাবাদর্শে যারা কাজ করবে, তাদের প্রত্যেককে চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থপর হতে হবে। তাহলেই তাদের কোন রাজনৈতিক সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্ন : *স্বামীজী যুবকদের যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেরকম হতে গেলে কিভাবে শুরু করা উচিত অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্তরে না সাংগঠনিক স্তরে?*

—সৈকত ব্যানার্জি, রাঁচি

উত্তর : স্বামীজীর কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—'Be and make'। নিজেকে আগে তৈরি হতে হবে। স্বামীজীর আদর্শগুলি নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে হবে। তবেই 'Be' হবে। তারপরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হবে। 'Making' তার পরে।

প্রশ্ন : *স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছেন—"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে একমাত্র আশা বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের সমন্বয়।" হিন্দুধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর অনেক কথা আমরা জানি, ইসলামধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত কি?*

—মহসীনা নিলুফার আফ্রোজ, বসিরহাট

উত্তর : 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ১০টি খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ইসলামধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা যায়। প্রত্যেক খণ্ডের শেষে 'নির্দেশিকা'তে এর 'reference' পাবে। 'বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে 'মহম্মদ'-এর ওপর স্বামীজীর বক্তৃতা আছে। এছাড়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত 'Thus Spake Mohammad' নামক ছোট্ট পুস্তিকাতেও স্বামীজীর ইসলাম বিষয়ক কথাগুলি একত্রে দেওয়া আছে। তোমার উদ্ধৃত কথাটিতে ইসলামের একত্ববোধ (unity) ও ভ্রাতৃপ্রতিম ভালবাসার (brotherhood) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন স্বামীজী।

প্রশ্ন : *স্বামীজীর নির্দেশিত পথে চলব বলে ব্রহ্মচর্য পালনের চেষ্টা করি। কিন্তু শারীরিক প্রবণতাগুলিকে সংযত করলেও মন থেকে কামনা-বাসনা যায় না। শুধু কায় ও বাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে উন্নতিলাভ নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। মনের নিম্নগামী ইচ্ছাকে নির্মূল করা যায় কিভাবে?*

—দীপাঞ্জন বসু, কলকাতা-৮৪

উত্তর : সৎ চিন্তা, নিয়ন্ত্রিত জীবন, সৎ জীবনচর্যা ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সৎসঙ্গ করলে মনকে ঊর্ধ্বগামী করা যায়। সেইসঙ্গে নিঃস্বার্থ সেবা করতে হবে—নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। এজন্য মন্ত্রদীক্ষারও প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : *বর্তমান পরিস্থিতিতে যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে—একথা স্বামীজীও বলেছিলেন। পরনির্ভর হওয়ার কারণে অনেক যুবক-যুবতী ঠাকুর-মা-স্বামীজী সম্পর্কেও যথেষ্ট তথ্য জানতে পারে না। আমার প্রশ্ন—যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে কোথায় কি 'কোর্স' আছে? অথবা অন্য কোন সুযোগ আছে কি?*

—শুভাশিস সিন্‌হা, শ্যামনগর

উত্তর : ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করেছিল প্রায় একশো বছর পূর্বে। স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজী মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কেন্দ্রে স্বনির্ভর প্রকল্প রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি—বেলুড় মঠের সারদাপীঠে 'শিল্পায়তন' ও 'শিল্পমন্দির', 'সমাজসেবা শিক্ষণ মন্দির', কামারপুকুর-জয়রামবাটীতে 'পল্লীমঙ্গল', রহড়া, নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল, সরিষা ও বেলঘরিয়ায় 'শিল্পপীঠ' এবং মনসাদ্বীপ ও তমলুক কেন্দ্রে স্বনির্ভর প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে এসব ব্যবস্থা রয়েছে।

'পানিহাটী সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে'

গৌরী মিত্র

"পানিহাটী সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে,
বড় বড় সমাজ আর পতাকা মন্দিরে।"

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ পানিহাটীর কথা শ্রীচৈতন্যকাব্য-রচয়িতা জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাসের রচনায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য পানিহাটী বৈষ্ণবদের কাছে এক পরম তীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ পণ্ডিত রাঘবচন্দ্রের ভিটা এই পানিহাটী গ্রামে। রাঘব আর তাঁর ভগিনী দময়ন্তী দেবী ছিলেন শ্রীরাধামদনমোহনের একান্ত সেবক। জনশ্রুতি, গৃহদেবতা মদনমোহন নিজ হাতে রাঘবের কাছ থেকে নৈবেদ্য চেয়ে খেতেন।

'পানিহাটী' নামটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে নানা মত আছে। অনেকে বলেন, রাঘবের বসবাসকালের বহু আগে এই জনপদ 'পণ্যহাটী' নামে পরিচিত ছিল। 'পণ্যহাটী' থেকে 'পানিহাটী' শব্দটির বিবর্তন। পণ্য বিক্রিবাটার জন্য দূর-দূরান্তের জনপদ থেকে ব্যাপারীরা জলপথে নৌকাযোগে আসত এই পণ্যহাটী অর্থাৎ পানিহাটীতে। চাল, ডাল, গুড়, মধু, সুপারি, নারকেল—বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য শুধু নয়, বস্ত্র-ব্যবসায়ার্থেও এখানে আসত ব্যবসায়ীরা। কেউ আবার দাবি করেন, 'পানিহাটী' কথাটি এসেছে 'পুণ্যহাটী' বা 'পুণ্যহাট' থেকে। ভাগীরথীর তীরবর্তী বঙ্গদেশের এইসব অঞ্চল ছিল বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সাধনক্ষেত্র। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ইসলাম, বৌদ্ধ—সকল ধর্মের মানুষ এই পানিহাটীতে সাধন-ভজন করে এই স্থানকে পুণ্যময় করেছিল বলেই একসময়ে এর নাম 'পুণ্যহাট' ছিল।

বৈষ্ণব ধর্মের কট্টরপন্থীদের মতে, শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলিধন্য পানিহাটী হলো প্রেমের সুধাপানির হাট। শ্রীচৈতন্য পানিহাটীতে এসেছিলেন দুবার। নীলাচল থেকে উত্তর ভারত বিজয়ের উদ্দেশে যাত্রা করে তিনি নবদ্বীপ-সহ শান্তিপুর, রামকেলি প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেইসময় এসেছিলেন পানিহাটীতে। সমগ্র গৌড়রাজ্য তখন শ্রীচৈতন্যের নামসঙ্কীর্তনে আলোড়িত। নীলাচলে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয়বার আসেন পানিহাটীতে। সেটি ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। এসময় তিনি প্রিয় পার্ষদ মহাপণ্ডিত রাঘবের ভবনে রাত্রিবাস করেন। শ্রীচৈতন্য নিজমুখে রাঘবের প্রেমভক্তির কথা বলতে গিয়ে রাঘব-ভবনে তাঁর সদা বিরাজমানতার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ নিত্যানন্দ-নর্তন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শচীমাতার রন্ধনে যেমন তিনি আছেন, তেমন রাঘব-ভবনেও তিনি আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে রাঘব তাঁর প্রভুর জন্য তিনটি ঝালিতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য—আম্রকাসুন্দি, আদা ঝাল কাসুন্দি, লেবু আদা, আমসী, আমতা, আম্রখণ্ড, আম্রকলি, তৈলাম্র, পুরনো সুক্তপাতা, নানারকমের লাড্ডু, নারিকেল খণ্ড, ক্ষীরসার, অমৃতকর্পূর, চিঁড়া, মুড়ি, গঙ্গাজল—আরো কত কিছু। রাঘবের ঝালি দেখে সকলে পরম বিস্মিত হয়েছিল। নবদ্বীপে শচীমাতার কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনিও পরম প্রীত হন।

পানিহাটি গঙ্গাতীরের বিখ্যাত বটবৃক্ষ

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন ঘটেছিল পানিহাটীতে রাঘবের ভিটাতে। সপার্ষদ নিত্যানন্দ এই পানিহাটীর পথে পথে নামসঙ্কীর্তন করেছিলেন। রাঘবভবনে নিত্যানন্দের অভিষেক উৎসব হয়েছিল। ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্প, তুলসী—উৎসবের সকল উপচার সাজানো, তবু নিত্যানন্দের অভিলাষ পূর্ণ নয়। তিনি রাঘবকে জানালেন কদম্বপুষ্পের মালা পরতে তিনি অভিলাষী। কদম্বপুষ্প? রাঘবের অঙ্গনে ছিল যূথি, জাতী, অপরাজিতা, শেফালি, মালতী পুষ্পবৃক্ষ। কিন্তু ছিল না কদম্ববৃক্ষ। আসনে উপবিষ্ট নিত্যানন্দ রাঘবকে বললেন: "যাও, দেখ তোমার বাগানে কদমগাছ আছে কিনা।" রাঘবের বাগানে সেদিন এক জম্বির বৃক্ষে অপূর্ব বর্ণ আর সুগন্ধে পূর্ণ অসংখ্য কদম্বপুষ্প ফুটেছিল।

নিত্যানন্দের পানিহাটীতে অবস্থানের খবরটি পৌঁছেছিল তৎকালীন বর্ধিষ্ণু জনপদ সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাসের কাছে। জমিদার বংশের পুত্র রঘুনাথের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পাগলপ্রায় প্রেমভক্তি ভাবিত করেছিল তাঁর পিতামাতাকে। তাঁর বৈরাগ্য দেখে কড়া প্রহরা বসিয়েছিলেন পিতা। রঘুনাথ সব প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে নৌকাযোগে এসেছিলেন পানিহাটীতে। গঙ্গাতীরে সপার্ষদ নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের মহানামে তখন মাতোয়ারা। রঘুনাথ দূরে দাঁড়িয়ে সেই প্রেমনামের আস্বাদন করছিলেন। নিত্যানন্দ তা বুঝতে পেরে রঘুনাথকে কাছে ডাকেন এবং চুরি করে হরিনাম শোনার জন্য তাঁকে দণ্ড দেন। বলেন:

"নিকটে না আইস চোরা থাক দূরে দূরে
আজ লাগ পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।
দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাও মোর গণে।"

রঘুনাথ মহানন্দে দণ্ড পালন করেছিলেন। দধি, চিঁড়া, দুগ্ধ, আম্র, কদলী, চিনি, সন্দেশ সহযোগে সেদিন পানিহাটীর গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে সমবেত সকলকে তিনি আহার করিয়েছিলেন। দাস রঘুনাথ-কৃত এই উৎসব 'দণ্ড উৎসব' বা 'চিঁড়া উৎসব' নাম পেয়েছিল। তাঁর পরে রাঘব এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। দাস রঘুনাথ বৃন্দাবনবাসী হলে তিনি তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ রাধারমণকে নিত্যসেবার জন্য রাঘববাটীতে রেখে গিয়েছিলেন। আজও তিনি রাধামদন-মোহনের সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন।

রাঘব পণ্ডিতের দালানের প্রবেশদ্বার

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে 'চিঁড়া উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। পানিহাটীর গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরাঙ্গঘাট-সংলগ্ন বিশাল বটবৃক্ষতলা নামগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উৎসবে অনেকবার সপার্ষদ এসেছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী একবার এখানে আসার জন্য আগ্রহী হয়ে নিজেই তাঁর আগমন স্থগিত রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলেছিলেন : "ভালই হয়েছে, নইলে দুজনকে দেখে উৎসবের সমবেত ভক্তলোকেরা বলত, হংসহংসী এসেছে।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এ আছে—"শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজে আসিয়া সঙ্কীর্তন-মধ্যে প্রেমমূর্তি দেখাইতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পানিহাটীতে চিঁড়া মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন, তখন এই মহোৎসব পানিহাটীর সেন পরিবারের মণি সেনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতো।

বৈষ্ণব সংস্কৃতির পীঠস্থান পানিহাটীতে এসেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও। তাঁর শৈশব জীবনের বেশ কয়েকটা দিন কেটেছিল 'পেনেটির বাগানবাড়ি'তে। শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘাটের অনতিদূরে রাঘবের ভিটার কাছেই এর অবস্থান। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ পানিহাটীর কথা লিখে রেখেছেন। বালক রবীন্দ্রনাথের সেই শৈশবস্মৃতি জীবনের শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল।

পানিহাটীতে এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও। পানিহাটীর ঘোষবংশীয় এক যুবকের সঙ্গে কলকাতার মিত্র বংশের দ্বাদশবর্ষীয়া এক বিধবা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি এই গ্রামে এসেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রগতি প্রবাহে, রাজনীতি ও সমাজের পালাবদলে পানিহাটীর জনজীবনের রূপ পালটেছে বারবার। পরিবর্তন, বিবর্তন ঘটলেও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'দণ্ড বা চিঁড়া মহোৎসব'-এর আয়োজনে আজও ভাটা পড়েনি। প্রতিবছর নির্দিষ্ট তিথিতে তা উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। শুধু বৈষ্ণব নয়, সব ধর্মের মানুষই এই উৎসবে যোগ দেন। বৈষ্ণব ধর্মপথ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলবিধানের একটি সুমহান পথ। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে ছিল না গোষ্ঠীর বিচার, জাতপাতের সঙ্কীর্ণতা। হরিনামগান, নগর-সঙ্কীর্তন —সব কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল মানবমৈত্রীবন্ধন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের সেবা। ❑

ওজোনস্তর ধ্বংস হয় যেভাবে

মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান মরাম লক্ষ্য করেন, বায়ুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎক্ষরণ (Electric discharge) ঘটালে একপ্রকার বিশ্রী গন্ধ অনুভূত হয়। কিন্তু তিনি এব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সেঁনেবা একে নতুন গ্যাস বলে মনে করেন এবং এর নামকরণ করেন 'ওজোন' (Ozone)। এই গ্যাসটি আসলে অক্সিজেনেরই একটি রূপভেদ। সাধারণ অক্সিজেন গ্যাসে অক্সিজেনের অণুতে (O_2) অক্সিজেনের দুটি পরমাণু থাকে। ওজোনের অণুতে থাকে তিনটি পরমাণু (O_3), যা বিজ্ঞানী সরে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করতে সফল হন।

বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটি হলো 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার'। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিমি. উঁচুতে শুরু হয়ে ৫০ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরেই ওজোন বিদ্যমান। ওপরের স্তরে ওজোন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চক্রাকারে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সূর্য থেকে আলট্রা-ভায়ালেট রশ্মি এসে যখন বায়ুমণ্ডলের ওজোনকে আঘাত করে তখন তা অক্সিজেন অণু (O_2) ও পরমাণু (O)-তে বিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য এর পরমুহূর্তেই পরমাণুগুলি জোড়া লাগে এবং একইসঙ্গে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ওজোন গ্যাস আগের মতোই থেকে যায়, মাঝখান থেকে আলট্রা-ভায়োলেটের প্রভাবে উৎপন্ন হয় নির্দোষ উত্তাপ। এই কাজটি সম্পন্ন হয় বলেই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ব্যাহত হয় না। কারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে, এই আলট্রা-ভায়ালেট রশ্মি বিভিন্ন ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়ক। তাই ওজোনস্তরকে পৃথিবীর ছাতাস্বরূপ মনে করা হয়। ছাতা যেমন আমাদের রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে, তেমনি ওজোনস্তর আমাদের রক্ষা করে আলট্রা-ভায়োলেটের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে। এক তথ্যমতে, ওজোন-বেষ্টনীর প্রতি এক শতাংশ বিনষ্টির জন্য পৃথিবীতে চর্মের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ২ থেকে ৫ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (দ্রঃ 'বিজ্ঞান সাময়িকী', এপ্রিল-মে ২০০১, পৃঃ ৯)

সত্তর দশকের শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা ওজোনস্তরের ক্ষয়প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন, তবে এই সংবাদ বৈজ্ঞানিক মহলে কিংবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ততটা গুরুত্ব পায়নি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আন্টার্কটিকা মহাদেশের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিরাট 'ওজোন হোল' বা গর্ত সৃষ্ট হওয়ায় বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। পুনরায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে যখন এর পরিমাপ করা হয়, তখন তার ক্ষেত্রফল ছিল প্রায় আমেরিকার সমান এবং উচ্চতা প্রায় মাউন্ট এভারেস্টের মতো। এই তথ্য বিশ্ববাসীর পক্ষে ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত। এর পর থেকেই ওজোনস্তর রক্ষার জন্য মানুষের সবিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যাগুলির মধ্যে ওজোনস্তরের ক্ষয়প্রাপ্তি অন্যতম।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পল জে. ক্রুজেন প্রমাণ করেন যে, নাইট্রাস অক্সাইড ওজোনস্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস যখন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছায়, তখন আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে। এই রূপান্তরিত নাইট্রিক অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয়। এরা ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনকে ভেঙে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে। বিপদের কথা হলো, বিক্রিয়ার শেষে পুনরায় NO_2 ও NO উৎপন্ন হয়, যা অন্য আরেকটি ওজোন অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। ফলে ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধনও অবিরামভাবে চলে। ক্রুজেনের এই আবিষ্কার বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আমেরিকার এস. এস. টি. (Supersonic Transport) প্রোগ্রামে। ওজোনস্তরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হবে—এই ভয়ে বাধ্য হয়ে আমেরিকার এস. এস. টি. প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়। কারণ, সুপারসনিক জেট সাধারণত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং প্রচুর নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত করে থাকে।

ক্রুজেনের এই আলোড়নকারী আবিষ্কারের চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শেরওড রোল্যাণ্ড এবং ম্যারিও মোলিনা দেখতে পান, ওজোনস্তর ক্ষয়ের জন্য নাইট্রোজেন অক্সাইডের চেয়ে বহুগুণে বেশি দায়ী ক্লোরোফ্লুয়োরো কার্বন (CFC), যা সাধারণত 'ফ্রেয়ন' নামে পরিচিত। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অ্যামোনিয়া ও সালফার ডাই অক্সাইড রেফ্রিজারেন্ট-এর বিকল্প হিসাবে এদের প্রস্তুত করা হয়। রোল্যাণ্ড ও মোলিনা দেখেন, CFC-ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো অপরিবর্তনীয়ভাবে ট্রোপোস্ফিয়ারে অবস্থান করতে পারে। যখনি এই CFC স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছায়, তখনি তা শুরু করে এক মরণ খেলা। এরা আলট্রা-ভায়োলেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে।

এই মুক্ত ক্লোরিন ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন মনোক্সাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। ঐ ক্লোরিন মনোক্সাইড আবার মুক্ত অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস ও মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়া অবিরামভাবে চলতে থাকে।

এক তথ্য মতে, CFC থেকে নির্গত প্রতিটি ক্লোরিন পরমাণু ওজোনের এক লক্ষ অণু ভেঙে দিতে পারে। ('বিজ্ঞান সাময়িকী', এপ্রিল-মে ২০০১, পৃঃ ৫৪) পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন, ওজোনস্তর অবক্ষয়ের পিছনে যে CFC-র এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে সেব্যাপারে বিশ্ববাসী একমত। আর তাই ক্রুজেন, রোল্যাণ্ড ও মোলিনার আলোড়িত আবিষ্কারের জন্য তাঁদের ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে রসায়নের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পরিবেশ বিষয়ক কাজের জন্য এটাই ছিল প্রথম নোবেল পুরস্কার।

রোল্যাণ্ড এবং মোলিনার আবিষ্কারের পর থেকেই CFC-র বিকল্প তৈরির প্রয়াস চলছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের পরই আমেরিকাতে 'স্প্রে ক্যান' নিষিদ্ধ হয়। তবে রেফ্রিজারেটরে CFC-র ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে, কারণ এর উপযুক্ত কোন বিকল্প এখনো পাওয়া যায়নি। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায় ওজোনস্তর সংরক্ষণ সংক্রান্ত 'ভিয়েনা কনভেনশন' গৃহীত হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মণ্ট্রিল প্রোটোকলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে CFC, হ্যালন ও কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মিথাইল ক্লোরোফর্ম এবং ২০৪০ খ্রিস্টাব্দে হাইড্রোক্লোরোফ্লোরো কার্বন (HCFC) ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সুবিধা ভোগ করবে। এসবই ওজোনস্তর রক্ষার জোর প্রচেষ্টা, সন্দেহ নেই। সারা বিশ্ববাসীর জন্য এটি অবশ্যই একটি শুভ সংবাদ।

ওজোনস্তর রক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে UNEP ১৬ সেপ্টেম্বরকে 'ওজোন দিবস' হিসাবে পালন করার আহ্বান জানান, যা ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পালিত হয়ে আসছে। ক্রুজেন, রোল্যাণ্ড এবং মোলিনা তাঁদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ওজোনস্তর দিনে দিনে কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে। বিশ্ববাসীর আজ এগিয়ে আসতে হবে ওজোনস্তর রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে। অবশ্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ওজোন-ধ্বংসকারী দ্রব্যের বিকল্প প্রস্তুত করার জন্য চেষ্টারত। বৈজ্ঞানিকদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে—এটা আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাম্য। ❑

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১ ওজোনস্তরের ক্ষয় ঃ ধরিত্রীর জন্য অশনি সঙ্কেত—এ. এইচ. এম. জহিরুল ইসলাম রুবেল, 'বিজ্ঞান সাময়িকী', ৪০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০০১

২ Ozone Explorers—B. C. Sharma, 'Science Reporter', December 1995

২ Environmental Chemist Share the 1995 Chemistry Nobel Prize : An honour for Unearthing the Secrets of our Ozone Roof—S. Parthiban, 'Resonance', April 1996

৪ 'The Hindu', 16.08.2002

৫ Journey Through the impossible—Chris Nicase

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

গলায় অসুখের কারণে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় চলে এলেন। জীবনের শেষ আট মাস তিনি কলকাতার উত্তরপ্রান্তে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কাটিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ গৃহের একতলায় একটি ঘরে থাকতেন। এখন সেখানে তাঁর পটে নিত্য পূজা হয়। ছবিতে কাশীপুর উদ্যানবাটী দেখা যাচ্ছে। ইনসেটে শ্রীশ্রীমা যে-ঘরে থাকতেন সেই ঘরের প্রবেশদ্বার ও দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। পবিত্র ও বৈরাগ্যবান যুব-শিষ্যগোষ্ঠীর নিরন্তর তপস্যা, ত্যাগ, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-জপ ও সেবার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী ইচ্ছায় এই উদ্যানবাটীতেই ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূত্রপাত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই প্রচ্ছদ পরিকল্পনা।

আলোকচিত্র ঃ ডি. ডি. সাহা

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

ডায়াবিটিস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে কুমুদবন্ধু স্বামীর লেখা 'ডায়াবিটিস প্রসঙ্গে দু-চার কথা' পড়ে আমি স্থানীয় বাজারে 'কুটিলাগম'-এর সন্ধানে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পারলাম, ওটা 'কুটিলাগম' নয়—হবে 'কপিলাগম'। দাম জানলাম ২০০ টাকা কেজি.। আমি ২০ টাকা দিয়ে একশো গ্রাম 'কপিলাগম' কিনেছি। দেখলাম, ধুনারই মতো ডেলা ডেলা আঠালো জিনিস। আমার জিজ্ঞাসা হলো—'কপিলাগম' ও 'কুটিলাগম' কি একই জিনিসের স্থানভেদে দুই নাম? এর একটা সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে পারলে আমি নির্দেশমতো ঐ ওষুধ খাওয়া শুরু করতে পারি।

বর্তমানে আমার বয়স ৬৭ বছর। প্রায় গত কুড়ি বছর যাবৎ ডায়াবিটিসের শিকার। বহুরকম অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করেছি। বর্তমানে প্রত্যহ দুটি (প্রাতরাশ ও রাতের আহারের পর) Euclide-M এবং দুপুরের খাওয়ার পর একটি করে Pioglit-30 খাচ্ছি। তাতেও P. P. Blood Sugar 200-250-এর মধ্যে থাকছে। সম্প্রতি দিন পনেরো হলো 'ইন্দ্রযব' গুঁড়া করে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে দু-চামচ জল সহযোগে খাচ্ছি। আরো ১৫ দিন পর রক্তপরীক্ষা করলে জানা যাবে কোন উপকার হলো কিনা। মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি মতে Syzygium (Q) ১০/১২ ফোঁটা করে ভোরবেলা খাই।

গত অক্টোবর ২০০০-এ ভেলোরে চেক-আপ করাতে গিয়েছিলাম। ভেলোরের ডাক্তারবাবু 'Dialutes Mellitus' ইনসুলিন নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইনসুলিন ব্যবহার করিনি।

রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
আসানসোল-৭১৩ ৩০২

ঐতিহাসিক সত্যান্বেষণ

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—"বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ধ্বনিত হইয়াছিল এই মহামন্ত্র।" ইতিহাসের দিক থেকে তথ্যটি বোধহয় ঠিক নয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এপ্রসঙ্গে কিছু তথ্য উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্যদের আগমনকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১৪০০ অব্দ এবং ভারত তথা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যগ্রন্থ ঋগ্বেদের সম্ভাব্য রচনাকাল, ঐতিহাসিক বাসামের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ। অপরদিকে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দ। সুতরাং বুদ্ধদেবের জন্ম এবং আর্যদের আগমন বা ঋগ্বেদ রচনার সম্ভাব্য কালের মধ্যেই ব্যবধান প্রায় ৫০০-১০০০ বছর। এক্ষেত্রে বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক সহস্র বছর পূর্বে 'গীতা' রচিত হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, 'গীতা' মহাভারতের অংশ বলেই আমরা জানি। মহাভারত রচিত হয়েছিল, ঐতিহাসিক মতে, পরবর্তী বৈদিক যুগে। এই যুগ এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালের ব্যবধানও ৫০০ বছরের বেশি নয়। তৃতীয়ত, মহাভারত অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতার বাণী ধ্বনিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের মহারণে। ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের সময়কাল নির্ণয় করেছেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ—যা বুদ্ধদেবের জন্মের ৪০০ বছরের সামান্য আগের ঘটনা।

সুতরাং এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে মনে হয়, গৌতম বুদ্ধের জন্মসময় এবং 'গীতা'র রচনাকালের ব্যবধান বোধহয় কয়েক শত বছর হওয়াই সম্ভব, 'কয়েক সহস্র বছর' নয়। উপরি উক্ত তথ্যগুলি আমরা সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—১ম খণ্ড' (স্নাতক স্তরের), প্রভাতাংশু মাইতির 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোন প্রামাণ্য গ্রন্থেই এই তথ্যগুলি পাওয়া যেতে পারে।

সম্পাদক মহারাজ যদি এবিষয়ে কোন মতামত জানান তাহলে বিশেষ উপকৃত হব।

রুমকি বসু ও কল্যাণী ভট্টাচার্য
সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৭১১ ১০৪

সম্পাদকের বক্তব্য

উপরি উক্ত পত্র প্রাপ্তিতে খুশি হলাম। নিঃসন্দেহে এই ধরনের চিঠি একদিকে যেমন কোন বিতর্কিত বিষয়কে আলোকিত করতে সাহায্য করে, তেমনি বিভিন্ন মতের সমন্বয়ও ঘটায়। আমার পক্ষেও এই ধরনের চিঠি উপকারী, কারণ পড়াশোনা করার সুযোগ বাড়ে। আসলে ইতিহাসগ্রন্থে কিছু ছাপা আছে বলেই তা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে হবে তা নয়, আবার যে-তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকেও উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। তাই আর্যদের ভারতে আগমন, মহাভারতের যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়।

বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে যেভাবে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন মিশিয়ে জল হয়, সেইভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না রাম-রাবণের যুদ্ধ অমুক সালে হয়েছিল কিংবা অমুক তারিখে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন, বুদ্ধপূর্ণিমা একটি তিথি, কিন্তু কোন্ তারিখে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা বলা সম্ভব নয়। বিশেষত আমরা খ্রিস্টাব্দ নামক 'স্কেল'-এর বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারি না। তাছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস নিজস্ব ঢঙে যাকিছু রচিত হয়েছে তা 'পুরাণ' নামে আখ্যাত। পাশ্চাত্য ঢঙের ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষ রচনা করতে শেখেনি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত পাশ্চাত্যবাসীর প্রদত্ত ইতিহাসই

আমাদের গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। পাশ্চাত্যবাসীর লেখা ইতিহাস যে শতকরা ১০০ ভাগ সত্য—একথা মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাঁরা হয়তো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে গেছে, যে-কারণে বাধ্য হয়ে তাঁরা কোন বিশেষ ঘটনার বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করেছেন। এইভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে তা জানার উপায় এখন নেই।

এন. এস. রাজারাম এবং ডেভিড ফ্রাক্সি-র লেখা 'Vedic Aryans and the Origin of Civilisation' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহাভারতের যুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। স্বামীজী সাধারণ ধারণা থেকে বলেছেন, বৈদিক সভ্যতা ৯,০০০ বছরের কম প্রাচীন নয়। সাম্প্রতিক ভারতীয় গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মত হলো—শেষ তুষারযুগে বরফ গলার পর যে নদীমাতৃক ভারত প্রকাশিত হয়েছিল, তখনি ঋগ্বেদীয় সভ্যতার সূচনা। সে প্রায় ১০,০০০ বছরেরও বেশি। বৈদিক যুগের পর এল বেদাঙ্গ যুগ। তারপর সূত্র যুগ। গৃহ্যসূত্র, বৌধায়নসূত্র, সুল্বসূত্র ইত্যাদি থেকে গণিতের সৃষ্টি হলো। এই সূত্র যুগের গণিতানুসারে হরপ্পা-মহেঞ্জোদরো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই তত্ত্ব নিয়ে বর্তমানে রাশিয়ান পত্রপত্রিকায় আলোচনা হচ্ছে। তাঁরা এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেননি, বরং সাদরে রুশভাষায় অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপিয়েছেন। একটা ধারণা ক্রমশ বলবতী হচ্ছে—মহাভারতের পরবর্তী কালে হরপ্পার সভ্যতা। গীতা মহাভারতের অঙ্গ। সুতরাং গীতাও হরপ্পা সভ্যতার পূর্ববর্তী। আবার অন্য মতও আছে। কেউ বলেন, আর্যরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে এসেছেন। উল্টোটা নয় কেন? অর্থাৎ ভারত থেকেই আর্যদের মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন হবে না কেন? সেক্ষেত্রে ঋগ্বেদের উদ্ভবকাল পিছিয়ে যায় ১০,০০০ বছর।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির বেশির ভাগই ইংরেজ বা বিদেশীদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি মূর্তি বা ফসিলের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তাতে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না। কিন্তু সমস্যা পরে দেখা দেয়। অর্থাৎ যে-প্রত্নটির সময়কাল নির্ধারিত হলো, তার আগে পরে কি ছিল, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, ধর্মগত সবরকম ঈক্ষণ (observation)-ই যে নিরপেক্ষ (unbiased) হয়েছে, তা বলা যায় না। সুতরাং যে 'data' (তথ্য) আমরা এখন পাচ্ছি, আজ থেকে ২৫ বছর পরে অন্য 'data' পেলে সেই তথ্য নাকচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু রাজনৈতিক বা কায়েমী স্বার্থপরায়ণ কিছু অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী তা করতে দেয় না। ফলে যথার্থ ইতিহাস এখনো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

যেহেতু গীতাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছি (শান্তিপর্বেও শ্রীকৃষ্ণ গীতার উল্লেখ করেছেন), সেই কারণে গীতার সময়কাল নিরূপণের দিকে জোর না দিয়ে মহাভারতের সময় নিরূপণের কথা ভাবতে পারি, যদিও মহাভারত দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছে বলেই মনে হয়। ডঃ লরিনসারের মতে, গীতা বুদ্ধদেবের পরবর্তী কালে রচিত। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকার 'Vaisnavism and Saivism' গ্রন্থে বলেছেন, গীতার উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভের পরে কিছুতেই নয়। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বা তাঁর পরবর্তী যুগে গীতার উৎপত্তি। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে, গীতা গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে রচিত এবং ভাগবতধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ। বালগঙ্গাধর তিলক, সেনার্ট, বুহ্লার প্রমুখ ভাগবতধর্মের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন। গীতাতে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ নেই বলে ডঃ দাশগুপ্ত গীতাকে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলে নির্দেশ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্র্যাট ম্যাকডোনেলের মতে, মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে রচিত। তাছাড়া বৌদ্ধ যুগে মহাভারত প্রসিদ্ধ ছিল। প্র্যাট ম্যাকডোনেল বলেন, মহাভারতের আদিম রূপটি অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে প্রকাশিত। ডঃ দফতরীর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১১৬২ এবং অধ্যাপক সেনগুপ্তের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল ২৫৬৬ খ্রিস্টপূর্ব।

গীতা ও পাতঞ্জল যোগসূত্রের তুলনা করলে দেখা যায়, গীতা পাতঞ্জল যোগসূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যকার, অতএব পাণিনির পরবর্তী কালের মানুষ। পাণিনির সময়কাল নিরূপিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৫০০ বছর। ঐতিহাসিক মিঃ বৈদ্য প্রমাণ করেছেন, শতপথ ব্রাহ্মণ অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ বছর পূর্বে রচিত। এবং শতপথ ব্রাহ্মণ শ্রুতির সময়ের শেষভাগে রচিত। আবার গীতাও উপনিষদের সমসাময়িক। সুতরাং অধ্যাপক ভি. বি. আঠাওয়ালে এবং মিঃ বৈদ্য প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, গীতা অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দে রচিত।

ডঃ রাজারামের মতে—(১) ঋগ্বেদের যুদ্ধের অবসান খ্রিস্টপূর্ব ৩,৭০০ অব্দে, যখন দশরথ ও রামের আবির্ভাব। (২) খ্রিস্টপূর্ব ৩,১০০ অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ সময়েই বৈদিক যুগের অবসান। মধ্য সরস্বতী সভ্যতার কাল ৩,৭০০-৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব। (৩) হরপ্পা সংস্কৃতির কাল ৩,০০০-১,৮৮০ খ্রিস্টপূর্ব। এটি সূত্র ও ব্রাহ্মণ যুগ। অশ্বলায়ন ও বৌধায়ন সূত্রের প্রভাবকাল। এসময়ে সরস্বতীর অবনতি। (৪) এরপর অরাজকতার যুগ শুরু হয় ১,৮০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এই সময়েই উচ্চকোটি ভারতীয়গণ মধ্য এশিয়ায় অভিবাসন (migrate) করেন।

এটি অন্য মত। সকলেই যে এই মতে সায় দেবেন তা নয়। আবার যাঁরা বলছেন গীতা বুদ্ধ-পরবর্তী সৃষ্টি, সেটিও একটি মত। সেখানেও সকলে একমত নন। সুতরাং 'ভগবান বুদ্ধের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে' কথাটি আমি প্রত্যাহার করি না, আবার একথাও বলি না, এই বাক্যটিই চরম সত্য।

স্বামী সর্বগানন্দ

পুরাণ অবশ্যই ইতিহাস

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে 'প্রসঙ্গ তর্কাতীত এক মহান চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ' শীর্ষক পত্রে প্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান লিখেছেন: "সকল ঐতিহাসিক ঘটনা

পৌরাণিক ঘটনা হতে পারে, কিন্তু সকল পৌরাণিক ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না। ফলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৌরাণিক ঘটনার বিচার সঠিক নয় বলে মনে হয়।" বলাই বাহুল্য, প্রহ্লাদবাবুর এধরনের মন্তব্য প্রচলিত ভারত-ইতিহাস চর্চারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। যেহেতু স্বামীজীর স্বপ্ন 'উদ্বোধন' সত্যপ্রকাশের ক্ষেত্র এবং মনুষ্য জীবন ও সমাজের নানাবিধ সত্যতা প্রকাশ করাই এর লক্ষ্য, সেইহেতু এপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা লিখতে প্রয়াসী হলাম।

শুরুতেই উল্লেখ্য যে, ইংরেজি 'হিস্টরি' এবং সংস্কৃত 'ইতিহাস' ঠিক এক ধাতুতে গড়া নয়। সূচনা থেকেই ইতিহাস, দর্শন তথা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যাতে নিজস্ব জীবনগতি নির্ণয় করে নিতে পারে তেমন শিক্ষা প্রদান করা। এজন্যই মহাভারতে বলা হয়েছে—যাতে ধর্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সহ পূর্ব বৃত্তান্ত আছে, তাই ইতিহাস। প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস-চেতনা ছিল লোকশিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায় দ্বারা জারিত—যা আধুনিক 'হিস্টরি'-চেতনাতে প্রায় অনুপস্থিত। লোকশিক্ষা প্রতিপাদন করার অভিপ্রায়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনী পল্লবিত হওয়া বা করা কোন অভিনব ব্যাপার নয়। বিগত ১৯-২০ শতকের কোন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেও এমন পল্লবিত কাহিনী মেলে, যা আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করতে দ্বিধান্বিত হতে হয়। আজ থেকে কয়েকশো বছর পরের প্রজন্ম হয়তো তাঁদেরও কাউকে কাউকে ইতিহাস-পুরুষ ভাবতে কুণ্ঠিত হবে। কারণ, এর মূলে আছে মহাকালের এক অমোঘ নিয়ম। যার ফলে, সত্য যত দূরে চলে যায় তাকে ততই উপকথা বলে ভ্রম হয়। অতীত ইতিহাসের অত্যদ্ভুত ঘটনাও একদিন এই কারণেই উপাখ্যানরূপে প্রতিপন্ন হয়ে যায়। এই কথাগুলি মাথায় রেখে নির্মোহ ও সামূহিক বিশ্লেষণ করলে সকল পৌরাণিক ঘটনাই ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হবে।

দ্বিতীয়ত, 'পৌরাণিক' শব্দটি সংস্কৃত 'পুরাণ' শব্দের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক এক অর্থও পুরাণ-সম্বন্ধীয়। অভিধানে 'পুরাণ'-এর অর্থ—বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি অবলম্বনে ব্যাসদেবের সঙ্কলিত শাস্ত্রগ্রন্থ। 'পুরাণ' শব্দটি আবার 'পুরা' শব্দের সমীপবর্তী এবং পৌরাণিক, পুরাণ ও পুরা—তিনটি শব্দই 'প্রাচীন' অর্থবোধক। 'ইতিহাস' শব্দের অর্থ অতীত বৃত্তান্ত, প্রাচীন কাহিনী, পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। 'পুরাবৃত্ত' আবার 'পুরাতত্ত্ব'-এর অনুরূপ। পুরাতত্ত্বের অর্থ প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত, প্রাচীন ইতিহাস। 'ইতিহাস' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'ইতিহ' (পরম্পরাগত উপদেশ, ঐতিহ্য) +√অস্+অ (ধি)। ইংরেজিতে 'A methodical record of public events' হিসাবে বর্ণিত 'হিস্টরি' শব্দের অর্থও অতীতের ঘটনাসমূহ, সত্যকাহিনী ইত্যাদি-সহ বৈচিত্র্যময় অতীতচরিত। বৈচিত্র্যময় চরিতচিত্রণে অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তি যে আজকের দিনেও বিরল নয়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং পুরাণ ও ইতিহাস সমার্থক এবং তাৎপর্যের দিক থেকে পুরাণ 'হিস্টরি'রও নিকটবর্তী। তৃতীয়ত, 'অমরকোষ' এবং বরাহপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের মত ও অভিপ্রায়ের ভিন্নতা হেতু পুরাণের অনেকগুলি লক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে (১) সর্গ বা সৃষ্টি (প্রথম সৃষ্টির বিবরণ), (২) প্রতিসর্গ বা বিসর্গ বা বিসৃষ্টি (প্রলয়ের পরে আবার নতুন সূচনার কথা অর্থাৎ পরবর্তী সৃষ্টি), (৩) মন্বন্তর বা মনুর অন্তর তথা মনুবার্তা (মনুর অধিকারকাল, তদর্থে মনুশাসিত একেকটি যুগের বর্ণনা—এককথায় বিভিন্ন মনুর বিবরণ, আধুনিক ইতিহাসের পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'কাল'), (৪) বংশ (দেবতা, দানব, মুনি ও নৃপতিদের বংশবর্ণনা অর্থাৎ বিভিন্ন রাজবংশ ও ঋষিবংশের ইতিহাস), (৫) বংশানুচরিত (রাজ-বংশের ধারাবাহিক বিবরণ বা আখ্যান)—এগুলি তো প্রকারান্তরে 'হিস্টরিয়গ্রাফি' বা বিজ্ঞানগন্ধী ইতিহাস লিখনেরও উপজীব্য। এছাড়া (৬) হেতু (সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ), (৭) স্থিতি (সৃষ্টির আয়ুষ্কাল), (৮) সংস্থা বা প্রলয় (সৃষ্টির ধ্বংস বা অবসান), (৯) রক্ষা বা শাসন (প্রতিপালন বা রক্ষা), (১০) কর্মবাসনা (কর্মের ইচ্ছা), (১১) বৃত্তি (জীবিকার উপায়) এবং (১২) দেবকীর্তি (অন্য দেবতার মহিমা বর্ণনা অর্থাৎ মনীষী-চরিত)—এসব কি 'হিস্টরি' বা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় নয়? আধুনিক দৃষ্টিতে কেবল (১৩) অপাশ্রয় (মানুষের শেষ আশ্রয়) বা মোক্ষ নিরূপণ (জন্ম থেকে মুক্তির পথনির্দেশ) এবং (১৪) কীর্তন (হরিকথা)—এদুটি অধ্যাত্মধর্মী লক্ষণকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু থেকে বিযুক্ত করা যেতে পারে, যদিও এগুলি মনুষ্য সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাই 'পুরাণ'কে বৈদিক গ্রন্থসমূহে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। খোদ ঋক্সংহিতায় 'পুরাণ' শব্দটি পনেরো বার পাওয়া যায়। অথর্ববেদে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েই সর্বপ্রথম 'পুরাণ' প্রকাশ করেন। পুরাণের উল্লেখ আছে 'গোপথ ব্রাহ্মণ'-এও। মহাভারতে মেলে আঠারোটি পুরাণের নাম। প্রথম যুগের বৌদ্ধ গ্রন্থে পুরাণকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়েছে। এছাড়া 'ইতিহাস-পুরাণ'—এই যুগ্ম শব্দ মেলে অথর্বসংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, সাংখ্যায়ন, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতিতে। কথাটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ চার বেদের পরেই ইতিহাস-পুরাণকে স্থান দিয়েছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে স্বাধ্যায়ের তালিকায় ইতিহাস-পুরাণ গুরুত্ব পেয়েছে। সুতরাং পুরাণকে অর্বাচীন এবং পুরাণ ইতিহাস তো নয়ই, এমনকি ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও পুরাণের স্থান গৌণ—এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। আর তা নয় বলেই বেদাদি গ্রন্থে কেবল বৈবস্বত মনুর পরবর্তী কালেরই সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণে তারও অনেক আগের স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে সংবাদ মেলে। উইলসন পুরাণের বৃহদংশকেই যথার্থ বলেছেন এবং স্মিথ মনে করেছেন, পুরাণের বংশ-তালিকায় ভারতের ঐতিহাসিক পরম্পরা সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত। পার্গিটার তো পুরাণ ঘেঁটেই রাজবংশ তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছেন। এর পরেও কি 'সকল পৌরাণিক ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না' এবং 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৌরাণিক ঘটনার বিচার করা সঠিক নয়' মনে করা যথার্থ?

বিমানবিহারী রায়
অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩ ২২২

দেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনে রামকৃষ্ণ মিশনের বৈপ্লবিক ভূমিকা

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে একটি চিঠিতে অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে লিখছেন ঃ "বাঙ্গালী। লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মতো—আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে থালা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না—এই আদর। ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার গেড়ি-গুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্রমিশ্রিত ভিজে মাটির মেঝে, বিহার পেত্নী-শাঁকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর।" স্বামীজীর এই কথাটি থেকেই আমরা বুঝতে পারি—সেসময়ে দেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা কোন্ পর্যায়ে ছিল। স্বামীজী দুঃখ করে বলেছিলেন—এরকম পরিবেশে বড় হলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীমা সারদাদেবীও যতদিন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে ছিলেন—ততদিন সেখানে প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদির কোন স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য তিনি দুঃখ করে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও এই অবস্থার খুব বড় একটা উন্নতি হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগই অপরিচ্ছন্নতাজনিত এবং জলবাহিত। শুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে পারলে এবং কিছু স্বাস্থ্যসম্মত বিধি সম্বন্ধে সচেতন করতে পারলে দেশের সাধারণ মানুষকে অনেকরকম রোগ থেকেই মুক্তি দেওয়া সম্ভব। সত্তর ও আশির দশকে কিছু কিছু চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা কোন সুসংহত সামগ্রিক প্রচেষ্টা নয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের শাখা সংগঠন লোকশিক্ষা পরিষদ বিগত ১৯৫৫-১৯৫৬ সাল থেকে গ্রামোন্নয়ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সেসম্বন্ধে পথও খোঁজা হচ্ছিল। আশির দশকের প্রথমদিকে ভারত সরকার পরীক্ষামূলক-ভাবে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নতুন ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি করেছিলেন। অথচ এর মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ শৌচাগার ব্যবহৃত হতো—বাকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ভারত সরকার একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিলেন, যার সদস্য হওয়ার সুযোগ হয়েছিল বর্তমান লেখকের। এই কাজটি করতে গিয়ে যে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হয়েছিল, তাই পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর পরিকল্পনা রচনায় পথ দেখিয়েছে।

প্রথমে একটি বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল যে, সেই বাড়ির পরিবার তাদের শৌচাগারটিকে ঠাকুরঘর বানিয়েছে! যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "তোমরা এটাকে ঠাকুরঘর করলে কেন?" উত্তরে তারা বলল ঃ "আমরা যে-ঘরে থাকি তার খরচ দেড়হাজার টাকাও নয়, আর শৌচাগার ও তার ঘর করতে সরকারের দুহাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমরা ভাবলাম, আমাদের এখানে তো অনেক ঝোপ-ঝাড় আছে, সেখানেই তো যেতে পারি। আমরা ঠাকুরদেবতাকে ভাল জায়গায় রাখতে চাই, সেজন্য এখানেই ঠাকুরঘর বানিয়েছি।"

দ্বিতীয় বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, শৌচাগারকে তারা খাদ্যশস্যের ভাঁড়ারঘর বানিয়েছে। তাদের যুক্তি হলো ঃ "আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গলে যাই, কাঠ-ফল বিক্রি করে তবে ফিরি। ভাঙা ঘরে যেটুকু সহায়-সম্বল আছে তা সুরক্ষিত থাকে না, সেজন্য সেসব জিনিস আমরা এখানে রেখে তালা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরোই।"

এই অভিজ্ঞতা থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো যেকোন সামাজিক পরিবর্তনই আমরা আনার চেষ্টা করি না কেন, তার সঙ্গে যদি মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম হয়। যাকে বলা হয়—'লাইভলিহুড সিস্টেম'। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যে-গতিতে আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী ফললাভ একশো বছরেও হবে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

গ্রাম সংগঠনের কর্মী হিসাবে বিকল্প উপায় বের করার জন্য সেসময় অনেকের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে স্থানীয় ইউনিসেফ-কর্তৃপক্ষ অন্যতম। সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে-সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

(১) কর্মসূচী রূপায়ণ করার প্রথম পদক্ষেপ হবে ব্যাপক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী। স্বামীজী দেশের সমস্যা সমাধানকল্পে যে-বিষয়টির ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো—'শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা'। আবার সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন : এ-শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা হলে চলবে না, চাই হাতেনাতে শিক্ষা—যার মাধ্যমে একজন ছুতোর মিস্ত্রি ভাল মিস্ত্রি হতে পারে, একজন চাষি ভাল চাষি হতে পারে। এবং এরও তিনটি পর্যায় আছে—গণচেতনা, গণশিক্ষা ও গণসংগঠন। স্বামীজীর এই চিন্তা-ভাবনাকেই বর্তমান স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং এক্ষেত্রে যে-কথাকয়টি ব্যবহার করা হয় তা হলো—'Information, Education, Communication' বা 'I.E.C.'।

(২) দ্বিতীয়ত, স্বামীজী যে আরেকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন, তা হলো স্থানীয় মানুষের ওপর দায়িত্ব দিয়ে তাদের মাধ্যমেই কাজ করা। স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি লিখছেন : "Afterwards it will be they who will collect small sums, short institution at their villages, and gradually from among these very men, teachers will spring. 'One must raise oneself by one's own exertions.'... We help them to help themselves."

রামকৃষ্ণ মিশন এই নীতি অনুসরণ করেই স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণ করার জন্য মেদিনীপুর জেলাকে বেছে নিয়েছিল—যে-জেলা ভারতবর্ষের বৃহত্তম জেলা হিসাবে গণ্য এবং যেখানে দেশের একভাগ লোক বাস করে। এই জেলার প্রায় ১,২০০ গ্রাম-সংগঠন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিকে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বাস্থ্যবিধান কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি রামকৃষ্ণ মিশন ও তার গ্রাম-সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে এই আন্দোলনে ব্রতী হয়েছে।

(৩) তৃতীয়ত, এই কর্মসূচী সম্বন্ধে জেলার প্রায় ১৭ লক্ষ পরিবারের মানুষকে অবহিত করতে গেলে ব্যাপক প্রচার ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দরকার। সেই উদ্দেশ্যে মিশন থেকে ব্যাপক শিক্ষা-কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। যেমন—পথনাটিকা, জনসমাবেশ, দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচারমূলক বাণী লেখা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্রদের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো, দেশের গণমাধ্যমগুলি অর্থাৎ রেডিও, টিভি ও সিনেমার ব্যবহার, হাটে-বাজারে প্রদর্শনী, চেতনাশিবির প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী, যার বিস্তৃত বিবরণ ৩নং সারণিতে দেওয়া আছে।

সারণি ১

মেদিনীপুর জেলার এলাকাভিত্তিক পারিবারিক শৌচাগারের চিত্র
(মোট ব্লক সংখ্যা—৫৪)

মহকুমা	মোট পরিবার	জুন ২০০২ পর্যন্ত মোট শৌচাগার	শৌচাগারের শতকরা হিসাব
হলদিয়া	[illegible]	[illegible]	[illegible]
তমলুক	২,৯২,৮৯৫	১,৬৯,৮৪০	৫৮.০০
কাঁথি	[illegible]	১,৫০,৮৫৫	[illegible]
এগরা	১,৫২,৮৪৫	[illegible]	[illegible]
মেদিনীপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খড়্গপুর	৩,৪৯,৫২৭	১,৪৬,৪৮৭	[illegible]
ঝাড়গ্রাম	২,২৬,৬৭৬	২১,৪৭৭	[illegible]
ঘাটাল	১,৫৮,৬৭৩	৬৪,৬৬২	৪০.৭৫
মোট	১৬,৭৩,৮৫৩	৮,২০,৮৫০	৫০.৭৫

(৪) সমস্ত প্রচারমূলক প্রথা ছাড়াও অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো—ব্যক্তিগত যোগাযোগ। ব্যাপক প্রচারের পরেও যেহেতু একটি পরিবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব নয়, সেজন্য প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রতি ১৫০টি পরিবার-পিছু একজন 'মোটিভেটর' নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদেরও আবার মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ না করে শৌচাগার-পিছু সম্মানী দিয়ে নিয়োগ করা হলো। এদের মধ্যে মহিলাদের সুযোগ বেশি দেওয়া হলো, কারণ ঘরের কাছে শৌচাগার না থাকলে তাদেরই কষ্ট পেতে হয় বেশি। এর জন্য ব্যাপক সংখ্যক মোটিভেটর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

(৫) প্রয়োজনীয় জিনিসটি হাতের কাছে না পেলে দূর অঞ্চল থেকে বিনা পয়সাতেই হোক বা পয়সা দিয়েই হোক গ্রামের সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয় না। সেজন্য প্রতিটি ব্লকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণকেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে মেদিনীপুরের ৫৪টি ব্লকের মধ্যে ৪৫টি ব্লকেই উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য ব্যাপক

স্বামীজীর চিন্তাভাবনা ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে তার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব কতখানি সম্ভব সেটি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। স্বামীজী বলতেনঃ আমি টুকরো টুকরো সংস্কারে বিশ্বাস করি না, আমি আমূল সংস্কারে বিশ্বাস করি।

মেদিনীপুরের এই পরিবর্তন শুধু এই জেলাতেই সীমাবদ্ধ নেই—নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। মেদিনীপুরের মধ্যে আবার পূর্ব মেদিনীপুরে কাজ খুব ভাল হয়েছে। সেখানে ৭,৬৪,১৫৩টি পরিবারের মধ্যে ৫,৩৮,০৫৪টি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ শতকরা ৭০.৪১ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃতভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের ৯,৯০,৭০০টি পরিবারের মধ্যে ২,৮২,৭৯৬টি পরিবার অর্থাৎ শতকরা ৩১.০৯ শতাংশ পরিবার শৌচাগার গ্রহণ করেছে। এর ফলে সম্পূর্ণ জেলার হার নেমে এসেছে ৫০.৭৫ শতাংশে।

সমস্ত দেশের প্রেক্ষাপটে এই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া একটি বৈপ্লবিক ঘটনা বলেই শুধু এদেশ নয়—বিদেশের বহু সংগঠন প্রতিনিয়ত এই কাজের গুণগত দিকটি বোঝার জন্য আসছেন। মুসৌরির আই. এ. এস.-এর যারা ছাত্র, তারা প্রতিবছরই প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে এখানে আসে। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য-বিধান প্রকল্পের জন্য যে-অর্থ দেয়, তার মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি এবং বিভিন্ন রাজ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী গ্রহণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা পর্যদের যে নীতি-নির্দেশক কমিটি আছে, মিশন-কর্মী সে-দুটিরই সদস্য। এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, স্বামীজী গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সর্বাত্মক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের গ্রামাঞ্চলে রোগভোগের প্রধান কারণ যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা। সেজন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণের বৃহৎ কর্মসূচী রূপায়ণের কথাও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এটাই সব নয়। পানীয় জলের উৎস অর্থাৎ পুকুর ও টিউবওয়েলগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি করা দরকার। অধিকাংশ টিউবওয়েলের গভীরতা খুবই অল্প—৫০-১৫০ ফুট পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, টিউবওয়েলগুলির চাতাল নেই, ভাঙাচোরা এবং পাশেই মলমূত্র ত্যাগ ও কাপড় কাচার ফলে নোংরা জল টিউবওয়েলের পাইপের পাশ দিয়ে মাটির নিচে চলে গিয়ে সেই জলও দূষিত করে দিচ্ছে। সুতরাং টিউবওয়েলের জল খেলে দূষিত জলই খাওয়া হচ্ছে। সেজন্য টিউবওয়েলগুলি যে সবসময় গভীর করতে হবে তা-ই নয়, দেখতে হবে টিউবওয়েলের যেন বাঁধানো চাতাল এবং চারপাশটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাছাড়া টিউবওয়েল থেকে যে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে আসছে তা যদি নালার মাধ্যমে ১৫-২০ ফুট দূরে শোষক গর্তে এনে ছোট করে সবজিচাষ করা যায়, তাহলে একদিকে যেমন নোংরা জলের সদ্ব্যবহার হবে, তেমনি এই জল থেকে মানুষের কোন ক্ষতিসাধনও হবে না। লক্ষ্য রাখা দরকার, একটি জলের উৎস থেকে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ২০-৩০ ফুটের মধ্যে করা উচিত নয়। জীবাণুগুলি ১৫-২০ ফুটের বেশি যেতে পারে না।

আমাদের দেশে যেখানে মাটির নিচে জল সহজেই পাওয়া যায়, সেসব অঞ্চলে ভারত সরকার ৫০টি পরিবার-পিছু একটি করে টিউবওয়েল তৈরি করতে বলেন, যা গড়ে ২৫০ জন মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু টিউবওয়েল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু প্রায় সবসময়েই তার মধ্যে ৫০ ভাগ টিউবওয়েল খারাপ থাকে। তার কারণ টিউবওয়েল-পিছু বছরে খরচ হয় ৬০০ টাকা, অথচ রাজ্যের যা টাকা আছে, তার দ্বারা অর্ধেকের বেশি টিউবওয়েল সারানো যায় না। এসব কারণে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য জলব্যবহারকারী ৫০টি পরিবার থেকে ৫-৭ জন মহিলা ও পুরুষকে নির্বাচন করে তাদের মধ্যে যারা টিউবওয়েলের কাছাকাছি থাকে—এমন দুজন মহিলাকে টিউবওয়েল সারানোর প্রযুক্তি শেখানো হয়। মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হয়—গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্ব তাদেরই, টিউবওয়েলগুলি খারাপ হলে তাদের দূর থেকে জল আনতে হয়। সেজন্য তারা উৎসাহের সঙ্গে এই কাজে এগিয়ে আসে এবং পরিবার-পিছু মাসে ১ টাকা করে সংগ্রহ করা হবে ঠিক হয়। টিউবওয়েল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মহিলারা নেওয়ায় আর্থিক খরচ পড়ল গড়ে ৫০ টাকা, যেখানে সরকারি খরচ ৬০০ টাকা—যা ঠিকাদারদের দিয়ে করানো হয়। এই প্রথায় মিশন ১,০০০টি টিউবওয়েল তৈরি করেছে এবং ১,০০০-এর বেশি মহিলা প্রযুক্তিবিদ্ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা—যা কিনা দেশে তো বটেই, এমনকি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, আই. এম. এফ. প্রভৃতি

সারণি—৩

স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ও প্রচার কর্মসূচী (জুন ২০০২ পর্যন্ত)

বিষয়	মোট কর্মসূচী
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] আলোচনা	[illegible]
মায়েদের সভা	[illegible]
জেলা পর্যায়ে আলোচনাসভা	[illegible]
গুচ্ছ সমিতিভিত্তিক আলোচনা	২২১
স্থানীয় পত্রিকায় প্রচার	১৫
পথসভা	৪২৭
মাইকের সাহায্যে প্রচার	৫১৫
মোট	২৪,৭৪,৫৭২

স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির স্থাপন ও ব্যবহার (জুন ২০০২ পর্যন্ত)

ব্যবস্থার নাম	মোট নির্মাণ/ব্যবহার
পারিবারিক সুলভ শৌচাগার	[illegible]
শোষক গর্ত	১,৫৫৭
সার/আবর্জনা গর্ত	৭,৭৭২
স্নানের চাতাল	১,৩০৬
হাত ধোয়ার চাতাল	৭৬২
উন্নত চুলা	[illegible]
তারা হ্যান্ডপাম্প	[illegible]
শৌচাগারের [illegible]	[illegible]
ও. আর. এস. প্যাকেট বিক্রয়	[illegible]

কাজের এলাকা/মাধ্যম/পরিকাঠামো

ব্লকের সংখ্যা	৫৪
গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	[illegible]
গুচ্ছ সমিতির সংখ্যা	[illegible]
স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের সংখ্যা	[illegible]
গ্রামের সংখ্যা	[illegible]

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি/দৃষ্টান্ত

[illegible]

আন্তর্জাতিক সংস্থারও স্বীকৃতিলাভ করেছে। শুধু রক্ষণাবেক্ষণ নয়, নতুন টিউবওয়েল বসানোর জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তারও এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র গ্রামবাসী দিতে প্রস্তুত আছে—যদি সমগ্র বিষয়টি তাদেরই পরিচালনায় রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল—যেসমস্ত অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব রয়েছে সেখানে ১০০টি টিউবওয়েল বসানো হবে। হিসাব করে দেখা গেল, এর জন্য ৭৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। মিশন-কর্তৃপক্ষ ইউ. এন. ডি. পি.-তে আবেদন করায় তারা বলেছিল, গ্রামবাসীরা যদি এর কিছু অংশ দিতে রাজি থাকে, তাহলে তারা পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। এক্ষেত্রেও গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় ২০ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিল। এটিও একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। কেননা এখান থেকেই মিশন-পরীক্ষিত নীতি জাতীয় পর্যায়েও গৃহীত হয়েছে। এখন থেকে সমস্ত সরকারি পানীয় জল (টিউবওয়েল বা নলবাহিত জলপ্রকল্প) সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের ন্যূনতম শতকরা ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা দিতে হবে গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। দলীয় সংঘাতের মাধ্যমে নয়, আমাদের লক্ষ্য হবে গ্রামবাসীদের সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা।

স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমি পরিকল্পনা করি না। পরিকল্পনা নিজেই গড়ে ওঠে ও এগিয়ে চলে। আমি শুধু বলি জাগ, এগিয়ে চল।" মেদিনীপুরে স্বাস্থ্যবিধান আন্দোলনে স্বামীজীর এই কথাটি যথার্থভাবে কার্যকরী হয়েছে। কেননা এই কাজ আরম্ভ করার সময় কর্মীরা কেউই জানত না কোন সরকারি অনুদান ছাড়াই কী করে একাজ সম্ভব হবে। শুধুমাত্র স্বামীজীর কথার ওপর নির্ভর করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার ফলেই এই কাজটি সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে লোকশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সঙ্গের সারণিতে এই 'লোকশিক্ষা'র একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রায় ৭,১৬,৯৬,৭৬২ টাকার 'ম্যানডেট অফ ওয়ার্ক' সৃষ্টি হয়েছিল সরকারি অনুদান ছাড়াই এবং যেসমস্ত সংগঠন এই কাজে এগিয়ে এসেছিল, তারা এখন শুধু স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত হয়নি বরং আরো বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ কল্যাণকর্মে ব্রতী হয়েছে। সঙ্গের সারণি থেকে এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ❑

বৈজ্ঞানিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অমলেন্দু চক্রবর্তী
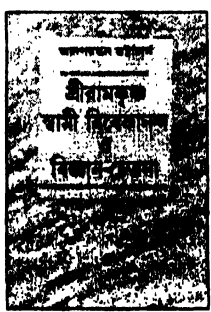
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান-চেতনা
অরূপরতন ভট্টাচার্য
প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭৩
মূল্য : ৩৫ টাকা
পৃঃ ১১২
প্রকাশকাল : ১৯৯৯

বিজ্ঞান-চেতনায় চৈতন্যের উন্মেষ ঘটেছিল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাণীর মাধ্যমে : "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" এ যেন সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির অমৃতময় বাণী, যা আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদের দুটি পঙ্‌ক্তির (৩।১) মধ্যে পাই—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।"

—যাঁর থেকে সবকিছুরই সৃষ্টি, যাঁর মধ্যে সবকিছুরই অস্তিত্ব, প্রলয়ে যাঁর মধ্যে সবকিছু বিলীন হয়, তুমি তাঁকে জানতে ইচ্ছুক হও—তিনিই ব্রহ্ম।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে এই মূলতত্ত্ব একটি বাস্তব সত্তা, অন্তরালে লুকনো একটি পটভূমি। একথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েল অকপটে স্বীকার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের পূজারীরা কি অবশেষে শক্তি ও বস্তুর অভিন্ন সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন? অচিৎ-প্রকৃতি (বৃহত্তম অর্থে cosmophysical) কি শেষপর্যন্ত চিৎ-প্রকৃতিতে (বৃহত্তম অর্থে cosmophysical) বিলীন হয়ে গেল? এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যুক্তিবাদী এবং প্রমাণভিত্তিক।

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দ কখনো বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেননি, কিন্তু সর্ববিষয়ে গভীর কৌতূহল, মনের সচেতনতা এবং একান্ত সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক মেজাজের ভিত্তি। যুক্তি ছাড়া তিনি কোনকিছুই মেনে নিতেন না। তাঁর যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছা দিনে দিনে এমন বর্ধিত হয়েছিল যে, স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতে দ্বিধা করেননি। একবার স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "প্রমাণ না পেয়ে কিছুই বিশ্বাস করো না। আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি।" কতখানি দৃঢ়চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধানী হলে একথা বলা যায় তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। প্রমাণ চাই, তা না হলে কোন কিছু বিশ্বাস করব না—এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মৌলিক চরিত্র। এই মৌলধর্ম ছিল স্বামীজীর সহজাত। তাঁর এই সহজাত বৈশিষ্ট্যটি এযুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ছত্রছায়ায় ক্রমশ বিকশিত হয়েছিল। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন এক আধুনিক মনের মানুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞান-চেতনার, তাঁর আধুনিক যুক্তি-মনস্কতার কতগুলি চিত্র পাওয়া যায়। যেমন : "কাশীধাম—পড়, শোন, দর্শন কর।" (১।২১৬) "দুধ—শোন, দেখ, খাও।" (৪।৩৩) "কাষ্ঠ—কাষ্ঠে আছে আগুন। এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।" (৩।৫৬) শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরবাটীতে অবস্থান করছিলেন, সেইসময় চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে বিজ্ঞান এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি নানাপ্রকার মন্তব্য করেছিলেন, যা আমাদের পরম বিস্ময় উদ্রেক করে।

অধ্যাপক অরূপরতন ভট্টাচার্য **'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞান-চেতনা'** গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণ হাব্‌লের বহু পূর্বে 'cosmology' নিয়ে এমন কথা বলেছেন, যা সেযুগের বিজ্ঞানীদের চিন্তার বাইরে ছিল। বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল এবং অনুরাগ না থাকলে এমন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে বিজ্ঞানের অনেক জটিল কথা সহজভাবে প্রকাশ করেছেন আপনকালের উর্ধ্বে উঠে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে সাধুবাদ জানাতে হয় এজন্য যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যার অনেক জটিল অথচ প্রয়োজনীয় এবং গূঢ়তত্ত্ব সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন সাধারণ পাঠকের জন্য। দ্বিতীয় কাজটি আরো কঠিন এজন্য যে, তিনি রামকৃষ্ণালোকে এবং বিবেকানন্দ-বোধের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার এক অসাধারণ মেলবন্ধন রচনা করেছেন। লেখকের উপস্থাপনার মধ্যে বারবার এক কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানচেতনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এবং এই বিজ্ঞান-চেতনা মানব-চেতনাতেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বিংশ শতকের উষালগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বচেতনাকে অবলম্বন করে স্বামী বিবেকানন্দ দেখালেন যে, মানুষের পক্ষে পার্থিব চিন্তা ও পরমার্থ চিন্তা—উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতকের সূচনাতেই আমরা দেখতে

পাই, আজকের বিজ্ঞান যেন অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে নিজস্ব বিশিষ্ট স্বরূপ হারিয়ে ফেলে 'পূর্ণত্ব' লাভ করতে চলেছে। আর এই পরম বিস্ময়কর সত্যের প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন যুগাচার্য বিবেকানন্দ। তাঁরই মহান চেতনায় এই সত্য প্রথম ধরা পড়েছিল যে, বিজ্ঞানের পথ ধরে নিদিধ্যাসনার ফলশ্রুতিতে মানুষ একদিন জড়বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে ভূমার গভীরে চলে যেতে সমর্থ হবে। এইখানেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির যথার্থ ঋষিত্ব। লেখকের এই মহতী প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। গ্রন্থটির কলেবর সীমিত হলেও এক অসীম সত্যের বার্তাবহ হিসাবে সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট অবশ্যই আদরণীয় হয়ে উঠবে।❑

আকাশ-তত্ত্ব

দেবব্রত দাস

আকাশব্রহ্ম
অযাচক
প্রকাশিকা : মায়া রায়
যোগেন্দু প্রকাশন
৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
ব্লক-জি, নং-১৮
কলকাতা-৭০০ ০৫৪
মূল্য : ৪০ টাকা
পৃঃ ১২+১৮২
প্রকাশকাল : ১৯৯৮

আমরা দেখি মহাকাশ নিথর, নিস্তব্ধ। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই মহাকাশই গতিশীল, ক্রিয়াশীল, প্রাণময়, শক্তিময়, চৈতন্যময়, আলোকময়, আনন্দময়, পূর্ণময়, অমৃতময়। বেদবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই মহাকাশই হলেন 'আকাশব্রহ্ম'। অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা না করে এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বা আকাশব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করাই উচিত। অন্তত, বেদবিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

এই কথাটি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন লেখক অযাচক তাঁর গ্রন্থ 'আকাশব্রহ্ম'-তে। মহাযোগী শ্রীঅনির্বাণের আকাশভাবনার প্রেক্ষাপটে বেদবিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সূত্রের সন্ধান পাওয়ার প্রচেষ্টা অযাচক-কৃত এই গ্রন্থটি। লেখক মহাকাশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থটির ৭০-৭১ পৃষ্ঠায়।

মহাকাশ অসীম ও অনন্ত। মহাকাশকে চতুর্মাত্রিক (Four dimention) বাঁধনে বাঁধা যায় না। এই চতুর্মাত্রা হলো—নিমিত্ত বা কার্যকারণ (cause), কাল (time), দেশ (space) এবং সুখাশক্তি বা বাসনা বা অহং (ego)।

প্রথমত, মহাকাশ অকারণ, কার্যকারণের অতীত। তার অস্তিত্বের কোন কারণ বা হেতু অর্থাৎ উৎস নেই। তাই মহাকাশের জন্ম নেই, মহাকাশ অজ। যা জন্মরহিত, তা স্বভাবতই অমর, অমৃত। মহাকাশ একটি অদ্বয় অবস্থা। দ্বিতীয়ত, মহাকাশ কালাতীত। মহাকাশ শাশ্বত, সনাতন। তৃতীয়ত, মহাকাশ অসীম, অনন্ত, বন্ধনমুক্ত। তাই মহাকাশেই পাওয়া যায় অনাবিল মুক্তির স্বাদ। চতুর্থত, মহাকাশ যেহেতু 'অহং' দ্বারা বদ্ধ নয়, তাই মহাকাশের স্বরূপ হলো নিত্য আনন্দের। এই 'আনন্দ' হলো, ভারতীয় দর্শনমতে, সুখদুঃখের অতীত চিত্তের অব্যক্ত রসময় এক দিব্য অবস্থা। সবকিছু ত্যাগ করে মহাকাশের শূন্যতাকে নিজের ভিতরে-বাইরে যে নিয়ে আসতে পারে, সেই দিব্য আনন্দের অধিকারী।

লেখক আকাশতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র আদ্যাশক্তি মহামায়ার তিনটি চরিত্রের ক্রমবিকাশের প্রসঙ্গ এনেছেন। অতিশীতলা মহাশূন্যময়ী নিরাকারা অরূপা মহাকালীই ক্রমশ অনন্তরূপা ঐশ্বর্যময়ী মহালক্ষ্মী হন—মহাকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি-রূপে আবির্ভূতা হন, অগণিত নক্ষত্রলোকরূপে রাত্রির অন্ধকার আকাশে ঘটে তাঁর বহিঃপ্রকাশ। সেই মহালক্ষ্মীই ক্রমে হন মহাসরস্বতী। তখন তিনি দিবাভাগের নীলাকাশে সূর্যোজ্জ্বলা জ্ঞানদায়িনী আনন্দময়ী চৈতন্যশক্তি।

লেখকের ব্যক্তিগত মত হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের 'কোয়ান্টাম থিওরি' হলো মূলত অস্তিত্বের তত্ত্ব বা 'Theory of Existence'। মহাকাশ হলো বিরাট, বিশাল, অসীম, অনন্ত 'কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম'। এই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম-রূপে মহাকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। এই থেকেই আমরা ভারতীয় ভাবনায় আসতে পারি, যেখানে বলা হয়েছে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)

এইভাবেই ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, বেদবিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে অযাচক রচনা করেছেন 'আকাশব্রহ্ম'। মননশীল পাঠককে চিন্তার রসদস্বরূপ এই গ্রন্থটি দিতে পারার জন্য প্রকাশক হিসাবে যোগেন্দু প্রকাশন কৃতিত্ব ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।❑

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন (মোরাবাদি) আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী (১৯২৭-২০০২)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের বহুমুখী কর্মপ্রবাহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। 'দিব্যায়ন'-এর তত্ত্বাবধানে এই আশ্রম এখন দেশের সেবামূলক সংগঠনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। এই আশ্রম ১৯২৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিগত ২০০২ সালে ঝাড়খণ্ডের মোরাবাদি অঞ্চলে অবস্থিত রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৫ বর্ষপূর্তি (প্ল্যাটিনাম জুবিলি) উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, সহাধ্যক্ষ-দ্বয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন, প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হা, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল এম. রামাজয়েস এবং ভারত সরকারের কৃষি ও গ্রামীণ উদ্যোগমন্ত্রী কড়িয়া মুণ্ডা।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন (মোরাবাদি) আশ্রম

আশ্রমের সূচনা হয় অলৌকিকভাবে। আশুতোষ রায় নামে এক ব্যক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁকে 'ঝুনো সরষে' বলে ডাকতেন, তিনি শিলঙে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ঘরে এবং অন্যান্য ভক্তদের বাড়িতে নিয়মিত 'কথামৃত' পাঠ চলত। কিন্তু তিনি কর্মোপলক্ষ্যে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে সেই পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা রাঁচিতে বদলি হলেও 'কথামৃত' পাঠ শুরু করা সম্ভব হয়নি। একদিন রাতে ঘুমন্ত আশুতোষবাবু শুনতে পেলেন, কে যেন ডাকছে—'ঝুনো সরষে! ও ঝুনো সরষে!' তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি আশ্চর্য হলেন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে এই নামে ডাকতেন না বা কেউ এই নাম জানতও না। দরজা খুলে দেখেন—হাতে চিমটে আর গেরুয়া কাপড় পরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আশুতোষবাবুকে বললেন : "আমার বিষয়ে তোমরা শিলঙে কিছু আলাপ-আলোচনা করতে। ঢাকায় না হয় তার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখানে (রাঁচিতে) সেসব বন্ধ করলে কেন? এরকম করো না।" এইভাবে আশুতোষ রায়ের চেষ্টায় রাঁচিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বীজরোপণ স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই করেন।

এই ভাবান্দোলনের সূচনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণকে প্রভূত আকৃষ্ট করেছিল। ১৯১৩ সালে স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ, ১৯১৪ সালে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, ১৯১৬ সালে গৌরীমা, ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৩১ সালে স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ এবং ১৯২৪ সালে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এখানে এসেছিলেন।

১৯২৭ সালে আশ্রম-স্থাপনের জন্য বেলুড় মঠ থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ রাঁচি গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি ছোট বাড়ি সমেত একখণ্ড জমি আশ্রমকে দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সাকার হয়েছে এই 'রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম'-রূপে। কালক্রমে 'দিব্যায়ন'-রূপে আজ প্রায় ৩৫ বছরে এটি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র-রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এই সংস্থার নিঃস্বার্থ সেবাকার্য দেখে জনজাতীয় কার্য মন্ত্রালয় একে 'স্থাপিত স্বয়ংসেবী সংস্থা' (Established Voluntary Association)-র সম্মানে ভূষিত করেছে।

আশ্রমের স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য জ্যোতীন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র মৃণালকান্তি ঘোষ বলেন : "১৯২৭-এ রাঁচি আশ্রমের পত্তন হয়েছিল একটি হোমিওপ্যাথি ডিস্পেনসারি দিয়ে। তখন সেখানে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ একটি ছোট খাপড়ার ঘরে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে থাকতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজা-পাঠ করতেন। যদিও তিনি অধিকাংশ সময় জপ-ধ্যানেই অতিবাহিত করতেন তবু তাঁর সহজ-সরল জীবন, ত্যাগ, তপস্যা ও সহৃদয়তায় প্রভাবিত হয়ে বিশেষত দরিদ্রস্তরের মানুষজন তাঁর কাছে আসত। ধীরে ধীরে ডোরাণ্ডার বীণাপাণি ক্লাব ও মাতৃভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলীর বাড়িতেও গীতা ও উপনিষদ্ পাঠের শুভারম্ভ হয়। সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হতো। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর ব্যক্তিত্ব সেসময় রাঁচি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা গ্রহণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আশ্রমে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ছাড়াও অন্য অনেক উৎসব পালন করা হতো, যাতে আমরা সবাই সক্রিয় অংশগ্রহণ করতাম। ডোরাণ্ডা ও হিনুতে আয়োজিত সব উৎসবেই স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী যেতেন এবং ভাষণ দিতেন।

সেসময় হাতির পিঠে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি সাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হতো। ভজনকীর্তনেরও আয়োজন করা হতো। আশ্রমের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ভক্তগণ সক্রিয় অংশ নিতেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর প্রচেষ্টায় রাঁচির ডুমরিতে রামকৃষ্ণ মিশন টিবি স্যানাটোরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজ শুরু হয়। একনাগাড়ে ২৫ বছর রাঁচিতে বসবাস করে তিনি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকাশস্তম্ভরূপে কাজ করতে থাকেন।"

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ১৯৪৮ সালে আরোগ্য আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৫১ সালে ৩২টি শয্যা-সমন্বিত এই আশ্রম যক্ষ্মারোগীদের সেবায় উৎসর্গিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত মানবসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই স্যানাটোরিয়ামের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক তথা লোকহিতের বহুবিধ কাজও করা হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ হওয়ার পরেও রাঁচিতে কয়েক বছর থেকেছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে উচ্চতর দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে বেলুড় মঠে যেতে হয়। তারপর স্বামী সুন্দরানন্দজী, স্বামী মুক্তানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দজী, স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী, স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী এবং স্বামী আত্মবিদানন্দজীর নেতৃত্বে আশ্রমের বিকাশকার্য জোরকদমে চলতে থাকে। নতুন ভবনের নির্মাণ, পুস্তকালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়েরও প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া ত্রাণকার্যের মধ্যে আছে বিহারের দুর্ভিক্ষ, রাঁচির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সেবা ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত শরণার্থীদের সেবা। ১৯৬৯ সালে বিশেষ করে এই এলাকার আদিবাসী যুবকদের চাষবাস, বাগান, পশুপালন, মুরগি পালন, মৌমাছি পালন, গোপালন, হাঁসপালন, মৎস্যপালন, মাশরুম, রেশম ও তসর চাষ, ওয়েল্ডিং, লোহার পাম্প মেরামত, অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে 'দিব্যায়ন' নামে অবৈতনিক আবাসিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের স্থাপনা হলো, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা নিগম' দ্বারা স্বীকৃত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে। ৭,২৯১ জন প্রশিক্ষার্থী এখানে শিক্ষাগ্রহণ করে। ৩,৯৫১ জন ছাত্র নিয়ে ৭০ বর্গকিমি. জুড়ে ৭১টি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এছাড়া জল ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এর ফলে বিহার ও আশপাশের রাজ্যের যুবকগণ উৎসাহিত হচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি স্বামী শশাঙ্কানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে বিশেষত গ্রামীণ আদিবাসী যুবতীদের স্বনির্ভর করার জন্য এক নতুন প্রকল্প—'সশক্তি স্বয়ং সহায়তা সমূহ' শুরু হয়েছে। 'দিব্যায়ন'-এ স্ব-রোজগার ছাড়াও যুবকদের সাধারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদিতেও নিপুণ করে তোলা হয়, যাতে তারা দেশের যোগ্য নাগরিক হতে পারে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর ভাষায়—"আজ এখানে যাকিছু হয়েছে ও হচ্ছে সেসব স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর দীর্ঘ ২৭ বছর তপস্যার ফল।" ভবিষ্যতে এই আশ্রম থেকে মানুষের কল্যাণের আরো অনেক সম্ভাবনা আছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

শিকরা-কুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক, যোগাসন, যাদুবিদ্যা প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন আয়োজিত যুবসম্মেলনে প্রায় ১০,০০০ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী, গোলাম হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী। উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়দিন বেদ, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান, গীতিনাট্য, কীর্তন এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী শ্যামলানন্দজী। 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ করেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী। দুপুরে ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী ও অধ্যাপক শ্যামল সরদার এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী। তৃতীয়দিন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' থেকে পাঠ করেন স্বামী বিমুক্তাত্মানন্দজী। সভায় ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী বীতরাগানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এদিন প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' যাত্রাপালা অভিনীত হয়।

ত্রিচুর রামকৃষ্ণ মঠ (কেরালা) ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি সংক্ষিপ্ত আশীর্বাণী দান করেন।

বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম (উত্তর প্রদেশ) ঃ গত ৩-৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রম প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করে আশীর্বাণী দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী কেদারানন্দজী, স্বামী মুক্তিনাথানন্দজী প্রমুখ। এই

উপলক্ষ্যে সহাধ্যক্ষ মহারাজ 'শতবর্ষের দ্যুতি ফুল' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব এবং 'রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী—একশত বর্ষ (১৯০২-২০০২)' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর প্রদেশ) ঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি এবং স্বামীজীর ব্রোঞ্জমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন (ত্রিপুরা) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয় মিশনের ধলেশ্বর কেন্দ্রে। এদিন প্রায় ৬,০০০-এর অধিক ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। গত ৯ মার্চ এই আশ্রম বিবেকনগর কেন্দ্রে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। 'রামকৃষ্ণ মেলা' ছিল উৎসবের এক আকর্ষণীয় অঙ্গ। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় ১১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

ছাত্রকৃতিত্ব

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোম (কলকাতা-৫৬) ঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তফসিল জাতিভুক্ত একটি ছাত্র ৫ম স্থান অধিকার করে। ছাত্রটি ভারত সরকারের কাছ থেকে 'ডঃ আম্বেদকর স্কলারশিপ' (পুরস্কার-মূল্য ১০,০০০ টাকা) এবং একটি সার্টিফিকেট লাভ করেছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পুরস্কারটি প্রদান করেন ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদবানী। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২১ মার্চ ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০৩ বেদপাঠ, প্রভাতফেরি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী। গানের সুরে 'পুঁথি' পরিবেশন করেন দীপক ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ১,৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী, মৃত্যুঞ্জয় জানা ও দীপক ভট্টাচার্য। সভান্তে ৮৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে স্কুল-ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়।

বিবেকানন্দ পাঠমন্দির, ঠাকুরপুকুর (কলকাতা-৬৩) ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা ত্রিদিবপ্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও অধ্যাপক হোসেনুর রহমান।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামীজীর জন্মদিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী ও ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী ও বর্ধমান আশ্রমের স্বামী শান্তানন্দজী।

দক্ষিণ কলিকাতা বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র (কলকাতা-২৭) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ কেন্দ্রের উদ্যোগে চেতলা পার্কে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়। মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী অসক্তানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী ও স্থানীয় পৌরপিতা ফিরহাদ্ হাকিম।

ডিমাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নাগাল্যাণ্ড) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়। শোভাযাত্রায় প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে ৩ কিমি. পথ পরিক্রমা করে। ১৬ জন নাগা ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন পোশাকে অংশগ্রহণে শোভাযাত্রাটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় জেলিয়াং ছাত্রছাত্রীদের লোকনৃত্য। এদিনের আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন ডিমাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এ. পেটন। আলোচনা করেন নাগাল্যাণ্ড সরকারের শিক্ষাদপ্তরের মুখ্যসচিব টি. এন. মানেন, নাগাল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জি. ডি. শর্মা, বদরুল হক, সোসাইটির সভাপতি প্রজেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোসাইটির সহ-সভাপতি সুধাংশুরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সম্পাদক জহর ভট্টাচার্য। সভাশেষে বেলুড় মঠ প্রদত্ত ২৫০টি বই নাগা ছাত্রছাত্রী ও উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বেতালবসান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ সেবাশ্রমের নবনির্মিত

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ক্যুইজ, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী ও অধ্যাপক শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বৈকালিক সভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। পরদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী ও শচীনন্দন সামন্ত। এদিন প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র (গুয়াহাটি) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে একটি বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনী এবং আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী, ডঃ রাজর্ষি ভট্টাচার্য ও ডঃ পরাগ দাশগুপ্ত। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কিছু শীতবস্ত্র বিতরণ এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও ওষুধপত্রাদি দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কোচবিহার) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, সঙ্গীত, অঙ্কন, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি সেবাশ্রম আয়োজিত যুবসম্মেলনে আলোচনা করেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দজী।

আগরপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (কলকাতা-১০৯) ঃ গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী ও অধ্যাপক শুভঙ্কর ঘোষ।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, অখণ্ড হরিনাম-সঙ্কীর্তন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। বালিতোড়া বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীরা লোকনৃত্য পরিবেশন করে। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী, সুশীলচন্দ্র বেরা, বিজয়কৃষ্ণ ভৌমিক প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির। এদিন দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র ও ধুতি-শাড়ি বিতরণ করা হয়।

মণ্ডলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পূজা, পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী বিষয়ক 'বিবেক পরিচিতি' প্রতিযোগিতা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও পাঠ করেন বর্ধমানের মধ্যমগ্রাম আশ্রমের স্বামী দুর্গানন্দজী। প্রতিযোগিতায় ১০৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল এবং রক্তদান শিবিরে ৩৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম বিদ্যানিকেতন (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিবস পালন করা হয়। স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন নরেন্দ্রনাথ পাল, সেবাশ্রমের সভাপতি জগত্তারণ আচার্য এবং বিদ্যানিকেতনের শিশুরা। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে একটি করে স্বামীজীর পুস্তিকা ও ফটো প্রদান করা হয়।

বিলাসিপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (ধুবড়ি, অসম) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ আলোচনা ও দুঃস্থদের মধ্যে ৭০টি কম্বল বিতরণের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়েছিল। আলোচনা করেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী।

খানপুর বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ খানপুর-জৌগ্রাম মোড়ে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি ও বাউল গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার বাউড়ী। ধর্মসভায় আশীর্বাণী দান করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

ঘোঁজা যুগলকিশোর পল্লী উন্নয়ন সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কলকাতা পুলিশের (এ. ডি. জি.) কে. কে. দাস এবং স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী, সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, শৈলেন মল্লিক প্রমুখ।

আবাডাঙা গোপেশ্বর হাইস্কুল (বীরভূম) ঃ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারি ২০০৩ গীতি-আলেখ্য, আবৃত্তি ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। 'যুবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপলকুমার দাস। ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও আবৃত্তি, আলোচনা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন মহাদেব দত্ত, কার্তিক দাস বাউল এবং স্থানীয় বি. ডি. ও. মৃণালকান্তি নস্কর। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জগদম্বানন্দজী। দ্বিতীয়দিন কেন্দ্রের উদ্যোগে নির্মিত শিবানন্দ-তোরণের উদ্বোধন এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী

গোবিন্দানন্দজী, সন্তোষকুমার ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ একটি যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুবসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী ও সুখেন্দুশেখর জানা। সম্মেলনে প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পরদিন অনুষ্ঠিত ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী কালাতীতানন্দজী। গত ২৬ জানুয়ারি সেবাশ্রম আয়োজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসবে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কাবলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, বেদ, 'চণ্ডী', 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ১,৫৪৫ জন ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৫৯ জন রক্তদান করেন এবং দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে ৮৮টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

চাকদহ বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (নদীয়া) ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ সঙ্গীত, অঙ্কন ও আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিরঞ্জনকুমার সাহা প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও ডঃ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে চাকদহ অগ্রগামী ক্লাব ময়দানে ভগিনী নিবেদিতার পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হুগলি) ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'চণ্ডী' পাঠ, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'চণ্ডী' পাঠ করেন ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস। দুপুরে প্রায় ২,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সৎপ্রভানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী ও সমীরকুমার নিয়োগী।

নিমতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ (কলকাতা-৪৯) ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শিবনাথ মুখার্জি ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী একব্রতানন্দজী।

বহির্ভারত

শ্রীমঙ্গল বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ (মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ) ঃ গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। রক্তদান শিবিরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ৫৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ধর্মসভায় পরিষদের সম্পাদক রণজিৎ রায় রণের স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দেন হরিপদ সরকার ও প্রমথেশ দেবচৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি দ্বীপেন্দ্র ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলং-নিবাসী কালীপ্রসন্ন চৌধুরী গত ২১ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শিলং ও চেরাপুঞ্জি আশ্রমে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনাও করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাগবাজার-নিবাসী প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত গত ২৪ নভেম্বর ২০০২ জপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য চন্দ্রমোহন দত্তের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মালবাজার (শিলিগুড়ি)-নিবাসী বিভূতিভূষণ দে গত ২৪ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি মাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। সেবাপরায়ণতা, সরলতা ও মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ভাতার (বর্ধমান)-নিবাসী অজিতকুমার হাজরা গত ২৯ নভেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ভাতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং বেলুড় মঠ ও রেঙ্গুন আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হালিশহর-নিবাসী সূর্যগোবিন্দ গুপ্ত গত ১ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিভক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের প্রপৌত্র। সহজ-সরল ও মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নিউ দিল্লি-নিবাসী নিখিলরঞ্জন রায় গত ৩ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি নিউ ব্যারাকপুর বি. টি. কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং বেলুড় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য ছিলেন। ❑

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান।
* সাধুসঙ্গ।
* নির্জনবাস।
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা।
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেট

UD-018	শিবশক্তিমালা	স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ	৩০.০০
UD-006	দিব্য গীতি *(হিন্দি ভজন)*	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-014	স্তবমালা-১	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-015	স্তবমালা-২	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-016	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-019	চিদানন্দ সিন্ধুনীরে	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-021	ও দুটি চবণ সাব	স্বামী সর্বগানন্দ	৩৫.০০
UD-020	অন্তবে জাগিছো মা	স্বামী অনিমেষানন্দ	৩০.০০
UD-017	ত্রিশবণ	স্বামী অনিমেষানন্দ	৩৫.০০
UD-001	শ্রীবামকৃষ্ণেব ভজনামৃত	মহেশবঞ্জন সোম	২৮.০০
UD-002	শ্রীবামকৃষ্ণেব প্রিয় গান	মহেশবঞ্জন সোম	২৮.০০
UD-003	বিশ্বজননী শ্রীমা সাবদাদেবী	শঙ্কব সোম ও অন্যবা	২৮.০০
UD-004	চিকাগো বক্তৃতা *(ইংবেজি ও বাঙলা)*	এন বিশ্বনাথন ও দেববাজ বায	৩০.০০
UD-005	সঙ্গীতাঞ্জলি	বিভিন্ন শিল্পীব গাওয়া	২৮.০০
UD-007	ভজনসুধা	বাণী জযবাম	৩০.০০
UD-008	ভজনমঞ্জরী	বাজকুমাব ভাবতী	৩০.০০
UD-009	কল্পতরু শ্রীবামকৃষ্ণ	মহেশবঞ্জন সোম ও অন্যবা	২৮.০০
UD-010	সঙ্গীত আবাধনা	মহেশবঞ্জন সোম	২৮.০০
UD-011	কীর্তনানন্দে শ্রীবামকৃষ্ণ	মহেশবঞ্জন সোম	২৮.০০
UD-012	আগমনী ও মায়েব গান	মহেশবঞ্জন সোম	২৮.০০
UD-013	অমৃতস্য পুত্রাঃ	যন্ত্রসঙ্গীতে প্রচলিত গান	৩০.০০

অডিও সি. ডি.

দিব্যগীতি *(হিন্দি ভজন)*	স্বামী সর্বগানন্দ	১৫০.০০
শ্রীবামকৃষ্ণেব প্রিয় গান	মহেশবঞ্জন সোম	৯০.০০
চিকাগো বক্তৃতা	এন বিশ্বনাথন ও দেববাজ বায	৯০.০০
শ্রীবামকৃষ্ণ ভজনামৃত	মহেশবঞ্জন সোম	৯০.০০
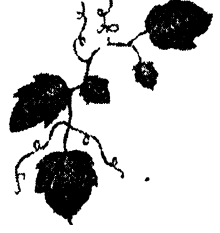
মিউজিক ভিডিও সি. ডি.

বিবেকানন্দ তর্পণ
স্বামী সর্বগানন্দ
ও
প্রদীপ ঘোষ
১০০.০০

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮

ঈশ্ববেব অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দবিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমাব ঈশ্বব নয়? অগ্রে তাহাদেব উপাসনা কব না কেন? গঙ্গাতীবে বাস কবিযা কূপ খনন কবিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর পত্র-সঙ্কলন

(৩য় খণ্ড)

যাঁহাদের নিকট মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র, উপদেশ বা অন্য লেখা আছে, তাঁহারা উহার জেরক্স কপি ডাকযোগে বা হাতে হাতে দিলে উহা গ্রন্থে প্রকাশের জন্য সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া যোগ্য বিবেচিত হইলে ছাপা হইতে পারে।

পাঠাইবার ঠিকানা :

(১) ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর
৯৫/৪৩ বোসপুকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪২

(২) সম্পাদক, 'উদ্বোধন'
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

Unselfishness is more paying, only people have not patience to practise it.

Swami Vivekananda.

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর-৭১২৪২৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন : ২৬৭৩-৯২০৮
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ
গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫
- স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
কুন্তুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন : ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- সুশান্ত মাইতি, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
(কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯
ফোন : ২৬৩০-০৭০৯
- ডঃ চিন্ময়ী নন্দী
(স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার
প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন : ২৬৬৩-৮৫২৬
- গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ কুটীর
১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
ফোন : ২৬৬৩-৭০৪৬
- শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ, প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
ফোন : ২৬৮৪-৬২৮৪
- সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র
গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬
ফোন : ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র, প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
জনাই-৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-২৪৪১১৪
- গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- স্বপন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
১৩বি, সান্যাল লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
ফোন : ২৬৬২-৬৬৭৮
- কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র
তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ
৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ
১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন,
বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, বগুলা-৭৪১৫০২
- তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র, এফ/১২, পোঃ তাহেরপুর

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫
পিন : ৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর, ফোন : ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪

মুর্শিদাবাদ

- শান্তশ্রী, বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩
- দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬

বাঁকুড়া

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর-৭২২২০৩
- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- ডঃ সুনির্মল বেরা
প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
সারেঙ্গা-৭২২১৫০

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ গ্রন্থ অবলম্বনে

মহামুনি পতঞ্জল-কৃত
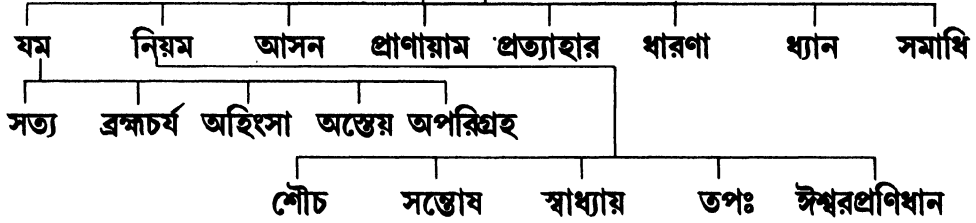
যোগসাধনের উদ্দেশ্য কী? —কৈবল্যলাভ
যোগের উপায় কী? —চিত্তবৃত্তি-নিরোধ

শব্দার্থ

অস্তেয় = অচৌর্য বা চুরি না করা
শৌচ = শুচিতা [দৈহিক ও মানসিক]
স্বাধ্যায় = জপ ও সদ্গ্রন্থ পাঠ করা
ঈশ্বরপ্রণিধান = ঈশ্বরের চিন্তা ও অনুধ্যান
প্রাণায়াম = শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ [গুরুর কাছে থেকে শিক্ষণীয়]

অপরিগ্রহ = অন্যের দান গ্রহণ না করা
সন্তোষ = মনের প্রফুল্লতা
তপঃ = তপস্যা [কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য]
আসন = যোগাসন যা শরীরের আরামদায়ক
প্রত্যাহার = পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পঞ্চ বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়)

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।...যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 105
No. 4
APRIL
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316

হয়েছে কি?

না হয়ে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০৲ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫৲ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫৲ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০৲ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০৲ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০৲ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০৲ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০৲ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০৲ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩
❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ ৫ম সংখ্যা

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

LIBRARY

শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর (ভগবানের) কৃপা হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥
১০৫তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ মে ২০০৩

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নত্থি রাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোসসমো গহো,
নত্থি মোহসমং জালং নত্থি তণ্‌হাসমা নদী।

—আসক্তির সমান অগ্নি নেই, বিদ্বেষের সমান ক্ষত নেই, মোহজালের সমান বন্ধন নেই। আর তৃষ্ণা-নদীর (আসক্তি) সমান (বিশাল) নদী নেই।

✿

দুপ্‌পব্বজ্জং দুরভিরমং দুরাবাসা ঘরা দুখা,
দুক্‌খো' সমান সংবাসো দুক্‌খানুপতিতদ্ধগূ,
তস্মা ন চ'দ্ধগূ সিয়া ন চ দুক্‌খানুপতিতো সিয়া।

—সংসারত্যাগে সর্বদা দুঃখ অর্থাৎ কষ্টকর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে থাকতে হয়, আর সংসারে থাকলেও তাই। এই দুঃখময় সংসারে তাই সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সঙ্গ না পেলে দুঃখের শেষ নেই। আবার বারবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণও অতি দুঃখময়। সুতরাং হে জন্মমরণশীল পথিক! এই দুঃখকে জয় করে আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ কর।

✿

তসিণায় পুরক্‌খতা পজা পরিসপ্পন্তি সসো'ব বাধিতো
তস্মা তসিনং বিনোদয়ে ভিক্‌খু আকঙ্‌খী বিরাগমত্তনো।

—আসক্তিতাড়িত মানুষ শশকের মতো সদা ভীতগ্রস্ত হয়। মুক্তিকামী সাধক সেজন্য আসক্তিকে দূর করে দেন।

(ধম্মপদ, ১৮।১৭, ২১।১৩, ২৪।১০)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

সাংগঠনিক চরিত্র এবং পরম লক্ষ্যের উৎকর্ষই যেকোন সংগঠনের কার্যকরী শক্তির বিকাশ ও সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাহার দীর্ঘজীবিত্বের নির্ধারক—সেব্যাপারে সন্দেহ নাই। একথা স্বামীজী ভালভাবেই জানিতেন। শক্তির বিকেন্দ্রীকরণেই যে সব সমস্যার সমাধান লুক্কায়িত রহিয়াছে—ইহা সবসময়ে সত্য নহে। যাঁহারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বা সঙ্গীতানুষ্ঠানে sound system-এর দায়িত্বে থাকেন তাঁহারা জানেন যে, heavy load amplifier-এর সহিত যদি দুর্বল ohms-যুক্ত speaker জুড়িয়া দেওয়া হয়, শব্দ ফাটিয়া যায়, তখন সঙ্গীত সুখদায়ক না হইয়া প্রবল দুঃখপ্রদ হইয়া উঠে। অর্থাৎ শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ তখনি যথার্থ ফলপ্রসূ হয় যখন সব উপকরণের যথাযোগ্যতা বজায় থাকে। যেকোন সংগঠনের পক্ষে সেই অবস্থায় পৌঁছাইতে সময় লাগে। স্বামীজী ইহা বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়াই একটি পত্রে কলকাতার জনৈক ব্যক্তিকে ২ মে ১৮৯৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

> "সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর। গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনোই শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না। আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।... ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়াইয়া দাও। সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ।"

ঈর্ষা এবং অহংভাবই সংগঠন বিনাশের মুখ্য কারণ। ইহার সহিত নাম-যশাকাঙ্ক্ষাকেও স্বামীজী সংগঠনের বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৮৯৫ সালে স্বীয় গুরুভ্রাতা শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পত্রে লিখিলেন ঃ

> "ঈর্ষা সর্পিণী যদি না আসে তো কোন ভয় নাই। মাভৈঃ।... নাম-যশ-কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মতো ত্যাগ করিবে।"

ঐ পত্রেই স্বামীজীর বহু-উদ্ধৃত সেই অসাধারণ উক্তিটি রহিয়াছে—

> "চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুসন্ধান, মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর।"

আমাদের দৈনন্দিন সাংগঠনিক কর্মপ্রবাহে নিজেরাই আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারি যে, আমাদের সেবাকার্য কতটা আন্তরিক হইতেছে, কতটা চালাকির ইন্ধনে হইতেছে এবং কতটা অহঙ্কার, ঈর্ষা ও নাম-যশাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় সঙ্ঘটিত হইতেছে। স্বামীজী সংগঠনকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন এবং চাহিয়াছেন উহাতে যেন কোন কৃত্রিমতা না থাকে। পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লক্ষ্য করিয়া মঠের গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশে তিনি লিখিতেছেন—

> "কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে। যেখানটা ভাল বোধ না হয়, ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পরকে criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙাবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি। ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের মূলসূত্র।... সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। ... দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই। এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।"

আনন্দের কথা যে, বিগত পাঁচ দশকে ভারতবর্ষে যে-পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, স্বামীজীর উপরি উক্ত মতের ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। অর্থাৎ ভারতবাসী ক্রমশ দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে শিখিতেছে। ভারতবর্ষের পারমাণবিক কর্মসূচী, জাতীয় পরিকল্পনায় দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষকে লইয়া বৃহত্তর উন্নয়নমূলক 'মডেল' যথা 'সবুজ বিপ্লব' ইত্যাদি রূপায়ণে একত্রে কাজ করিবার অভ্যাস অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই—ইহাও অতি সত্য। উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচী—সরকারি স্তরে বা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্তরে, যে-স্তরে হউক না কেন—যদি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতি-সম্পৃক্ত হইয়া উঠে তাহা হইলে ফল যে আশানুরূপ হইবে না, সেকথা বলা বাহুল্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনগুলিও হীন রাজনীতির শিকার হইয়া পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে। সংগঠনের বাহিরে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-বিজেপি-তৃণমূল, আর অন্তরে সভাপতি-সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ-পৃষ্ঠপোষক—এই লইয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা সেবামূলক কর্মসূচী ক্ষীণতনু স্রোতস্বিনীর ন্যায় ক্রমশ শুকাইয়া যাইতে থাকে। সংহতি বিনাশের আরেকটি মূল কারণ 'অহঙ্কার'। কখন কি রূপ লইয়া এই অহঙ্কার আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। পদমর্যাদার অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, বড়লোকের সমর্থনের অহঙ্কার (অমুক মন্ত্রীর সহিত

কিংবা বড় মহারাজের সহিত আমার খাতির আছে ইত্যাদি), এমনকি কোন বোধগম্য কারণ ছাড়াই অকারণ অহঙ্কার আসিয়া সংগঠনের ক্ষতিসাধন করে। স্বামীজী তীব্র শ্লেষের সহিত বলিতেন ঃ "ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।" অর্থাৎ ছুঁচোরও অহঙ্কার আছে—'আমি চোদ্দ সিকে দিয়ে চাকর রেখেছি'। আর চামচিকা অহঙ্কার করিতেছে—'আমায় পায় কে, টাকায় সকলকে কিনে নেব।' আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী ১৯ নভেম্বর ১৮৯৪-এর পত্রে লিখিলেন ঃ

"একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক—এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি তুমি এত নির্বোধ হইতেই পার না। তথাপি তোমাকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সম্প্রদায় ভাঙিয়া যায়। কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবা-লোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া যেন মরিতে না হয় যে, আমি নামের জন্য, এমনকি পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। এক বিন্দু দুর্নীতি, বদ মতলবের এক বিন্দু দাগ পর্যন্ত যেন না থাকে।"

আলাসিঙ্গা পেরুমল ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্র, বিবেকী, বৈরাগ্যবান এবং নিঃস্বার্থপর এক যুবক। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মাদ্রাজে গিয়াছিলেন তখনি তাঁহার সহিত পরিচয় এবং তাঁহার চরণে তৎক্ষণাৎ আত্মোৎসর্গ। তথাপি স্বামীজী তাঁহাকে পর্যন্ত এইভাবে সাবধান করিয়া দিয়া বোধহয় আগামী প্রজন্মকেই সাবধান করিয়া দিলেন।

কখনো কখনো স্বামীজীর ভাষায় যেন আগুন ঝরিয়া পড়িত। তীব্র তিরস্কার, এবং একইসঙ্গে মহান আশার বাণী ও অনন্ত প্রেমাধার লইয়া তাঁহার অসাধারণ উপলব্ধি যেমন একদিকে এক মহনীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার মহাপ্রেরণাস্বরূপ হইয়া উঠিত, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি করিত বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের নব নব অনবদ্য সম্পদ। পূর্বেই বলিয়াছি, এখনকার সাংগঠনিক সমস্যাগুলি স্বামীজী দূরদৃষ্টি সহায়ে তখনি দেখিয়াছিলেন। তাই সেইভাবেই তাঁহার অতি বিশ্বস্ত মানুষজনকেও বারংবার সাবধান করিয়াছিলেন। আমরা তাই স্বামীজীর নিজস্ব লেখা হইতেই উদ্ধৃতি দিতেছি। ঐ ভাষা, ঐ ভাবের বিকল্প নাই। সেকারণে সময়ে সময়ে উদ্ধৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়ত হইতেছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা হইতে লিখিয়াছিলেন—

"সাধারণ মানুষের ঈর্ষা, হিংসা, গুঁতোগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোন ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দা হঠছে, সূর্যোদয় হচ্ছে।... দাদা এসব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমরা ছাড়া। হাল ছেড়ো না।... দাদা leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো। Jealousy (ঈর্ষা), selfishness (স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader। প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader।... Love conquires in the long run, দিক হলে চলবে না—wait, wait। (প্রেমই আখেরে জয়লাভ করে। বিভ্রান্ত হয়ো না, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর।)... যদি প্রভুর ইচ্ছা [যাহা আমরা সর্বদা বলিয়া থাকি!] তবে তোমরা দলাদলি, jealousy পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে) কার্য কর। Shameful (লজ্জার কথা)! আমরা Universal religion (সর্বজনীন ধর্ম) করছি দলাদলি করে।... যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নিচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তাহলেই সকল ন্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙুল নাড়াবার শক্তি নাই, কিন্তু 'কাউকে উঠতে দেব না' বললে কি চলে? ঐ jealousy, ঐ absence of conjoined action (সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তির অভাব)—গোলামের জাতের nature (স্বভাব)। কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা দরকার। ঐ terrible jealousy characteristic (ভয়ানক ঈর্ষাই চারিত্রিক বিশেষত্ব) আমাদের, বিশেষ বাঙালির। কারণ, we are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus. (কারণ আমরাই সকল হিন্দুর মধ্যে চরম অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতি।) পাঁচটা দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের সমাম্না [সমগোত্রীয়] এই গুণে এদের (আমেরিকায়) স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রিরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলো পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐরকম। গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই—স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউকেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে।"

মনে হয় সমসাময়িক এবং ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষিতে তথা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এরূপ অসাধারণ অভিব্যক্তি স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

[ক্রমশ] (তিন)

সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

তত্ত্ব-প্রকাশিকা, ১৮৮৬-১৮৮৭ (রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত)

এক ব্যক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার মামা, কাহার মেশো, কাহার পিসে, কাহার ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক অদ্বিতীয় কিন্তু তাহার ভাবে অসীম প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে।

*

যেমন জল এক পদার্থ। দেশভেদে কালভেদে এবং পাত্রভেদে নামান্তর হয়। যেমন বাঙ্গালায় বারি, নীর বলে, সংস্কৃতে অপ্ বলে, হিন্দিতে পাণি বলে, ইংরেজীতে ওয়াটার ও একোয়া বলে। কাহার কথা না জানিলে কেহ বুঝিতে পারে না, কিন্তু জানিলে কিম্বা না জানিলে ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত নাম (হরি, ব্রহ্ম, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, আল্লা, গড, জিহোবা, জোভ, লর্ড ইত্যাদি)। এবং অনন্ত ভাব (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি)। যাহার যে নামে, যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়।

*

যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তিনি তাহার সদ্গুরু সংযোজন করিয়া দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই।

*

বকলমা অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

*

নাম অবলম্বন করিলে বিচার করিতে হয় না। নামের গুণে সকল সন্দেহ, কুতর্ক দুর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি হয় এবং নামে ঈশ্বরলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু নামে বিশ্বাস করিতে হইবে।

*

যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া থাকিলে করতালি দ্বারা তাহাদের উড়াইয়া দেওয়া যায়, তেমনি নামসঙ্কীর্তন কালে করতালি দিয়া নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে পাপ-পক্ষীরা পলাইয়া যায়।

*

যাহারা একবার ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদন করিয়াছে তাহাদের যাহাতে আর সে ভাবের উদ্দীপন না হইতে পারে এমন সাবধানে বাস করা কর্তব্য। কারণ চক্ষে দেখিলে এবং কর্ণে শুনিলে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনে একবার কোনপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গেলে তাহা তাহার চিরজীবনে ভুল হয় না।

*

মনই সকল কার্য্যের কর্ত্তা। জ্ঞানী বল, অজ্ঞানী বল সকলই মনের অবস্থা। মনুষ্যেরা মনেই বদ্ধ এবং মনেই মুক্ত; মনেই অসাধু এবং মনেই সাধু; মনেই পাপী এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে পারিলে পূর্ণ সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের আর অপেক্ষা রাখে না।

*

ঈশ্বর কি ভাবে দেখা দেন?

বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছ দেখা যায় না। ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ দুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায়, পরে বড়শিবিদ্ধ হয়। তদ্রূপ ভগবান্ ঘনসচ্চিদানন্দ গূঢ়ভাবে থাকেন, যোগ ধ্যান প্রেমভক্তির চার দিতে দিতে কখন কখন দৈবাৎ তিনি আসিয়া দেখা দেন। তৎপর ধরা দিয়া থাকেন।

*

বিষয়লালসা কিরূপে দূর হয়?

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাটবাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন তাঁহাদের আর বিষয়লালসা থাকে না।

*

কি প্রকার লোক অন্য লোকের নেতা হইতে পারে?

যে গরুর মস্তকে গোরোচনা থাকে সে দলের অন্য অন্য গরুর অগ্রে অগ্রে গমন করে। সেইরূপ যে-ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে তিনিই অপর সকলের নেতা হন।

*

ব্রহ্ম নির্ব্বিকার হইলে তাঁহার লীলা কিরূপে সম্ভব?

বৃক্ষের ছায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বৃক্ষের মূলদেশ যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। সেইরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না, অথচ তাঁহার লীলা পরিবর্ত্তনশীল।

*

সঙ্গীত কিভাবে করিতে হয়?

হস্তীর দুইপ্রকার দন্ত—একপ্রকার দেখাইবার জন্য, অন্যপ্রকার আহারাদি করিবার জন্য। সেইরূপ, সঙ্গীতাদিও দুইপ্রকার—একপ্রকার সঙ্গীত লোককে শুনাইবার জন্য, অন্যপ্রকার [উপ]ভোগ করিবার জন্য।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র*

মিসেস জি. ডব্লিউ. হেলকে লিখিত

[১]

হোটেল বেলভিউ
বেকন স্ট্রিট, বস্টন
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

মা,

আপনার অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রখানি এইমাত্র এসেছে। আমি গত কয়েকদিন ধরে সর্দি ও জ্বরে ভুগছিলাম। এখন বেশ ভাল আছি। সমস্ত কাগজ যে নির্বিঘ্নে আপনার কাছে পৌঁছেছে তাতে আমি আনন্দিত। খবরের কাগজের সব ক্লিপিংস মিসেস ব্যাগলির কাছে আছে; আপনাকে শুধু তার নকল পাঠানো হয়েছে। এটা আপনার আমার নিজেদের ব্যাপার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'টি অধ্যাপক রাইটের কাছে আছে এবং তিনি তা আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন। ফোনোগ্রাফের এখনো কোন সংবাদ নেই। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যাক, তারপর আমরা অনুসন্ধান করব। যদি খেতড়ির স্ট্যাম্প দেওয়া কোন পত্র দেখেন, বুঝবেন নিশ্চয়ই সংবাদ আসছে। ফাদার পোপের[১] চিরন্তন বাক্স যখন দিবারাত্র সেবনার্থে খোলা থাকত, তখন যতটা ধূমপান করতাম এখন তার এক-তৃতীয়াংশও করি না। হরিদাস ভাইকে কেবলমাত্র 'শ্রী' বলে সম্বোধন করতে হবে। খামের ওপর 'দেওয়ান বাহাদুর' লেখাই সমীচীন, কারণ সেটি একটি উপাধি। সম্ভবত মহীশূরের মহারাজার পত্রটি ইতিমধ্যে আপনার কাছে পৌঁছেছে। বস্টনে এবং তার আশপাশে আমি এখনো কয়েকদিন থাকব। ব্যাঙ্কের বইটি ব্যাঙ্কেই আছে। আমরা সেটি নিয়ে আসিনি, তবে চেকবইটি আমার কাছে আছে। ধর্ম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করতে চলেছি; তাতে কোন মিশনারিরই স্থান নেই। শরৎকালে আমি নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি, তবে আমি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে শিক্ষাদান করাই অধিকতর পছন্দ করি এবং বস্টনে তা যথেষ্টই হবে।

আমি চেয়েছিলাম কম্বলগুলি ভারত থেকে পাঠানো হোক এবং সেগুলি আসবে পাঞ্জাব থেকে, যেখানে সবচেয়ে ভাল কম্বল প্রস্তুত হয়।

---

* ইংরেজিতে পত্রদুটি যথাক্রমে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর ডিসেম্বর ১৯৮০ এবং জুলাই ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১ ফাদার পোপ—জর্জ ডব্লু. হেল। আমেরিকায় এঁর বাড়িতেই স্বামীজী প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁকে 'ফাদার পোপ' এবং মিসেস হেলকে 'মাদার চার্চ' বলে সম্বোধন করতেন।
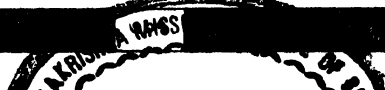
মেরি[২]র কাছ থেকে আমি একটি সুন্দর চিঠি পেয়েছি।

নরসিংহ[৩] নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে টাকা বা পাথেয় পেয়ে গেছে এবং তার লোকেরা তার স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য টমাস কুকের পাথেয় তাকে পাঠাবার ব্যাপারে যত্নবান হয়েছে। মনে হচ্ছে সে এখন চলে গেছে।

আমি মনে করি না যে, স্বদেশবাসীদের গুণগ্রাহিতার কারণে প্রভু তাঁর সেবককে অহঙ্কারে স্ফীত হতে দেবেন। আমি আনন্দিত যে, তারা আমার গুণগ্রাহী; আমার নিজের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নিন্দা কখনো মানুষকে উন্নত করতে পারে না, প্রশংসাই পারে। এবং জাতির পক্ষেও একথা সত্য। ভেবে দেখুন কী পরিমাণ গালিগালাজ সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে আমার অনুরক্ত হতভাগ্য দেশের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এবং কিসের জন্য? তারা কখনো খ্রিস্টানদের অথবা তাদের ধর্মকে অথবা তাদের প্রচারকদের আঘাত করেনি। তারা চিরদিন সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অতএব আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মা, একটি বিদেশী জাতি তাদের উদ্দেশে যেসকল উত্তম কথা বলে, ভারতে তার প্রত্যেকটির উৎকর্ষসাধনের বিরাট ক্ষমতা রয়েছে। এখানে আমার সামান্য কার্যের প্রতি আমেরিকাবাসীদের সপ্রশংস মনোভাব বাস্তবিক তাদের প্রভূত উপকারসাধন করেছে। দিনরাত্রি তাদের গালিগালাজ করার পরিবর্তে ভারতের পদদলিত, নিন্দিত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষের জন্য অন্তত একটি সুবাক্য, একটি সুচিন্তা প্রেরণ করুন। আপনাদের জাতির কাছে এই আমার ভিক্ষা। যদি পারেন তাদের সাহায্য করুন; যদি না পারেন, অন্তত তাদের গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

সমুদ্রতীরে স্নানের স্থানগুলিতে আমি অশোভন কোন কিছু দেখিনি, তবে শুধু কয়েকজনের মধ্যে অসার দম্ভ দেখেছি —তাদেরই মধ্যে যারা স্বল্পবাস পরে জলে নেমেছিল। ব্যস্ ঐ পর্যন্তই।

আমি এখনো 'ইন্টার ওশন'[৪]-এর কোন কপি পাইনি।

ফাদার পোপ, খুকিদের ও আপনাকে ভালবাসা জানাই।

আপনার আজ্ঞানুবর্তী পুত্র
বিবেকানন্দ

[২]

হোটেল বেলভিউ
বেকন স্ট্রিট, বস্টন
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

মা,

সবকটা বাণ্ডিল নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছে। একটিতে ছিল ভারতের সংবাদপত্র। আরেকটিতে, বহুদিন আগে মিঃ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত আমার গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।[৫] পরের বাণ্ডিলটিতে আছে দুটি অ-বাঁধা পুস্তিকা। একটি আমার গুরুদেবের জীবনালেখ্য; অপরটিতে আছে গ্রন্থাদি থেকে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতাংশ, যাতে দেখানো হয়েছে মিঃ [কেশব] চন্দ্র সেন এবং [প্রতাপচন্দ্র] মজুমদার তাদের 'নববিধান' বলে যা প্রচার করেছেন তা কিভাবে আমার গুরুদেবের জীবন থেকে চুরি করা হয়েছিল। সুতরাং শেষেরটি আপনার বিতরণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আশা করি আমার গুরুদেবের জীবনীটি আপনি বহু সজ্জন ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করবেন।

আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এর থেকে কয়েকটি নিউ ইয়র্কের হাডসন-তীরবর্তী ফিস্কিলে মিসেস গার্ণসিকে[৬] এবং ১৯ ওয়েস্ট থার্টি এইটথ্ স্ট্রিট, নিউ ইয়র্কে মিসেস আর্থার স্মিথ ও মিসেস ফিলিপস—উভয়কে পাঠিয়ে দেবেন। আর পাঠাবেন ম্যাসাচুসেটসের অ্যানিস্কোয়ামে মিসেস ব্যাগলিকে এবং হার্ভার্ডের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক জে. রাইটকে।

সংবাদপত্রগুলি নিয়ে আপনার যা অভিরুচি হয় করতে পারেন এবং আশা করি আমার সম্পর্কে খবরের কাগজে যেকোন সংবাদ পেলে তার ক্লিপিংসগুলি ভারতে পাঠিয়ে দেবেন।

আপনার ইত্যাদি
বিবেকানন্দ

---

২ জর্জ ডব্লু. হেলের কন্যা মেরি হেল।
৩ মহীশূর সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধিকর্তা আর. এ. নরসিংহচারিয়া।
৪ 'Inter-Ocean' আমেরিকার শিকাগো থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র।
৫ স্বামীজী এখানে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ' পুস্তিকাটির কথা বলছেন।
৬ স্বামীজীর নিউ ইয়র্ক-বাসিনী শিষ্যা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২।।

শ্লোকার্থ ঃ *কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ আমার এই বাক্যের নিন্দা করে এবং [অবজ্ঞা করিয়া] উহা পালন করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় ও পরমার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিও।*

ব্যাখ্যা ঃ যে আমার (শ্রীভগবানের) কথায় অবিশ্বাস করে সে নিজ স্বরূপ কখনো জানিতে পারে না। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি স্বয়ং দেহমনাদি হইতে পৃথক এবং বিদ্যামায়া-বৃত হইয়া পরব্রহ্মের একটি কণাস্বরূপ—একথা সে বুঝিতে পারে না। ফলে তাহার মুক্তিলাভের আশা সুদূরপরাহত।

[**মন্তব্য ঃ** অসূয়া = বিদ্বেষ, অভ্যসূয়া = অতীব বিদ্বেষ। অভ্যসূয়ন্তঃ = যাহাদের মধ্যে (ঈশ্বরের প্রতি) এই অতিবিদ্বেষ বিদ্যমান। সর্বজ্ঞানবিমূঢ় = যাহার কর্মজ্ঞান নাই, সগুণজ্ঞান নাই, নির্গুণজ্ঞান নাই। অর্থাৎ যে সর্বপ্রকার জ্ঞানের অযোগ্য।—সম্পাদক]

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন। অজ্ঞের কি কথা? প্রাণিবর্গ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। (অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপদিষ্ট স্বধর্মাচরণ করিতে পারে না) সুতরাং আমার (ভগবানের) বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কী ফল হইবে?*

ব্যাখ্যা ঃ যাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে তাহারা কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেই সব হইল না। দীর্ঘকাল অবিরাম পরম শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সাধনা না করিলে (উপায়ত) বহু জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসবশত ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের দিকে যথেচ্ছভাবে ধাবিত হয়। কিছুতেই উহাদের রোধ করা যায় না। সুতরাং কেবল বাহ্যগত ইন্দ্রিয়-নিরোধের দ্বারা আত্মজ্ঞানের পথে চলিতে পারা যায় না। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি অপরের নিকট সম্মানলাভের জন্য নানাপ্রকার কঠোরতা করিয়া দেহ ক্ষয় করে। ইহাতে লাভ কিছুমাত্র হয় না, বরং nerve (স্নায়ু) অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। অত্যন্ত দৃঢ়, বলিষ্ঠ স্নায়ু না থাকিলে আত্মজ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। অতীতে রাজন্যবর্গের এইরূপ স্নায়ু ছিল ('রাজর্ষয়োঃ বিদুঃ')। তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন, আমি 'নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ স্বভাব'। ফলে কোনকিছুই তাঁহাদের উত্তেজিত করিতে পারিত না। আর তখনি উত্তম রাজ্যশাসন সম্ভব হইত। আমাদের স্নায়ু দুর্বল। অল্পেতেই ইহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। হৃষীকেশে সাধু দেখা যায়—গ্রীষ্মকালে সারাদিন সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকে। দারুণ শীতে হিমজলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকে। উত্তপ্ত বালুতে সারাদিন শুইয়া থাকে। দুই-চারি বৎসরের মধ্যেই শিষ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু এতে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়? জ্ঞান না হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সম্ভব নহে।

আমাদিগের ন্যায় যাহাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা জ্ঞানলাভই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করে, তাহারা যদি নিষ্ঠার সহিত সেই সাধনা ধরিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে বিবেকবুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া কালে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে। অবশ্য এইভাবে এই পথে চলিলেও সর্বদা জ্ঞানবিচার আবশ্যক। তাহা না হইলে সহসা কোন বিষয়ে ভ্রম হইয়া পতন হইতে পারে। যদি সাধক এই অবস্থায়ও নিজের দুরবস্থা বুঝিতে পারেন, তাহা

হইলে পূর্বকৃত সাধনার সংস্কারবশে যেখান হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এই জীবনেই মুক্তিলাভ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবেন।

Chemistry Laboratory (রসায়নাগার)-এ নানাপ্রকার chemical (রাসায়নিক দ্রব্য) মিশাইয়া বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার সময়ে কোনরূপ ত্রুটি হইলে তাহা নিষ্ফল হয়, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। তেমনি এই সাধনপথে খুব সাবধান না হইলে পতন ও বিষম দুর্দশা যেকোন সময়ে উপস্থিত হইতে পারে। তাই স্বামীজী অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে 'exact science' বলিতেন। স্বামী সারদানন্দজীর নিকট একটি বালক আসিত। শিশুকাল হইতে সে অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছে। পরে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন (স্বামী প্রেমেশানন্দজীর জীবদ্দশায়) তিনি সাধনপথে ভুল করায় সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মহাদুর্ভোগে প্রপীড়িত। এইরূপ বহু ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিতদের মধ্যেও দেখা যায়।

প্রত্যেক মানুষের দেহ ও মনে তাহার স্বীয় পরিবার, জন্মস্থান ইত্যাদির সংস্কার থাকে। যখন তাহার আত্মোপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তখন সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি হইতে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (দ্রষ্টব্য ঃ "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু... পরতস্তু সঃ"—গীতা, ৩।৪২) কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধিতে যে অভ্যাস জ্ঞান হইবার পূর্বে ছিল, তাহা দেখিতে পূর্ববৎই মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর মানবিক দৃষ্টিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান কামারপুকুরের গ্রাম্য ভাষায় তিনি কথা বলিতেন। অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর ভাষা, আচার-ব্যবহার সবই নতুন আকার ধারণ করিবে—এরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানলাভের পূর্বে ও পরেও দারুণ ঝাল খাইতেন। মথুরাদাস বাবাজী প্রচণ্ড শীতে থরথর কম্পিত হইতেছেন, কিন্তু বলিতেছেন ঃ "অন্দর হিল্‌তা নেহী"। অর্থাৎ বাহিরের কম্পন বাহিরেই আছে, অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ, তিনি তো স্পষ্ট দেখিতেছেন তিনি স্বয়ং এই দেহরূপ গাড়ি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেহ নিজের ক্রিয়া যথারূপ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, কেরানি জেল হইতে বাহির হইয়া কি ধেইধেই করিয়া নাচিবে? তাহা নহে, সে আবার কেরানির চাকরি খুঁজিবে। অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া জনক রাজার সভাসদ্‌বৃন্দ হাস্য করিতেছে দেখিয়া মুনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমি এত চামার একসঙ্গে দেখিনি।" অর্থাৎ ইহারা সকলে চামড়ার খরিদ্দার। তাই মুনির বিকৃত শারীরিক গঠনটাই দেখে, মুনির আত্মস্বরূপতাকে দেখে না।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।

শ্লোকার্থ ঃ *মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। সকল ইন্দ্রিয়েরই বিষয় বা ইন্দ্রিয়ার্থ আছে। অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় হইলে সকল ইন্দ্রিয়েরই আসক্তি বা বিদ্বেষ (বিরক্তি) জন্মায়। অতএব কিছুতেই উহাদের বশীভূত হইবে না। কারণ এই দুইটি জীবের শ্রেয়োলাভের প্রতিকূল।*

ব্যাখ্যা ঃ শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ অনুসারে চলিবে। নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলিবে না। যে-সাধক জ্ঞানলাভেচ্ছু, সে যদি দৈনন্দিন জীবনে 'ইহা পছন্দসই, ইহা অপছন্দ'—এই ভাবিয়া বৃথা কালক্ষেপ করে, তাহা হইলে সে কখন ঈশ্বর-পাদপদ্মে মন অর্পণ করিবে? অর্থাৎ খুঁতখুঁতে মন লইয়া কখনোই ঈশ্বরচিন্তা করা যায় না। Practical জীবনে আমরা অনেক সময় নিজের স্বভাবকে সংহত করিয়া থাকি, যথা ঔষধ তিক্ত হইলেও গ্রহণ করি, অথবা নিত্যকৃত্য না করিয়া ক্ষুধার্ত হইলেও আহার করি না, কিংবা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া পশুবলি দিই না—ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখিতে হইবে কোন্‌টি আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ, সেখানে সেইভাবেই চলিতে হইবে। রাগ-দ্বেষ, পছন্দ-অপছন্দের স্থান সেখানে নাই।

[**মন্তব্য ঃ** মন কিংবা ইন্দ্রিয়সকল যেমন চাহিতেছে তেমন চলিতে থাকিলে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবি পরিণতি—একথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন। সেই বিখ্যাত দুইটি শ্লোক স্মরণ করিলে মন্দ হইবে না—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২।।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।

অর্থাৎ অনুকূল বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে তৎসমুদয়ে মানুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা বা তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ হইতে কর্তব্যাকর্তব্যরূপে বিবেক বিনষ্ট হয়। বিবেক নাশ হইলে শাস্ত্র এবং আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশজনিত সংস্কারের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। স্মৃতিবিভ্রম ঘটিলে পুরুষের সদসদ্ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং সদসদ্ বিচার স্তব্ধ হইলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া পশুপদবিতে অবনমিত হয়।—**সম্পাদক**]

[ক্রমশ] ।।আট।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অনন্য 'কথামৃত'-রচনার প্রাক্কালে

রথীন দে

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশিত হওয়ার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশাবলী যতবারই সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হোক না কেন, সেগুলিকে বড় জোর বাণী বা উক্তির সঙ্কলনমাত্রই বলা চলে। এই বাণী-সঙ্কলনগুলি যে পরবর্তী কালে 'কথামৃত' রচনায় কোনরকম সাহায্য করেছে তা নয়। কারণ, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বহু আলোচিত ও প্রশংসিত শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। উপক্রমণিকা ও পরিশিষ্টের কিছু অংশ ব্যতীত মূল 'কথামৃত'-এ এমন শব্দ একটিও নেই যে-শব্দটির জন্য শ্রীম অন্য কারো বর্ণনা বা অভিজ্ঞতার কাছে এতটুকু ঋণী। ঠিক এই কারণেই 'কথামৃত'-এর আগে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সঙ্কলনগুলিকে কোনমতেই 'কথামৃত'-এর আদি রূপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

'কথামৃত'-এর উপস্থাপন-ভঙ্গিমা ও বস্তুনিষ্ঠ বিন্যাস-শৈলী এককথায় অনন্য, বোধকরি নজিরবিহীনও। বর্ণের পর বর্ণ, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে শ্রীম এখানে ঠাকুরকে যেন সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে নিয়ে এসেছেন কোটি কোটি মানুষের প্রাণের কাছে। সেখানে যেমন নেই পরমপুরুষের মুখনিঃসৃত অমৃতময় কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করে টীকাটিপ্পনী আরোপ করার প্রচেষ্টা, তেমনি নেই তথাকথিত ভদ্র-সমাজের কাছে শ্রুতিকটু লাগবে ভেবে শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখোচ্চারিত কোন শব্দকে ভদ্রস্থ করার অভিপ্রায়। এমনকি যা সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, সেগুলিরও সামান্যতম সম্পাদনার চেষ্টা করা হয়নি। লক্ষণীয় যে, সাধারণত যেভাবে মহাপুরুষদের জীবন চিত্রিত করা হয়ে থাকে, শ্রীম কিন্তু সে-পথে হাঁটেননি। প্রচলিত পথটি হলো—যেসব খুঁটিনাটি বর্ণনা কোন মহাপুরুষের জীবনকে একেবারে সাধারণের স্তরে নামিয়ে আনতে পারে, সযত্নে সেগুলি এড়িয়ে গদগদ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে অলৌকিক মহিমায় উজ্জ্বল দিব্য জীবনটুকু শুধু তুলে ধরা। অথচ 'কথামৃত'-এ সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। 'কথামৃত'-এর প্রথম দিকে তো শ্রীম রীতিমতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক যুক্তিবাদীর ভূমিকায় সমাসীন। সেখানে নেই এতটুকু ভক্তির আতিশয্য। শ্রীম তাঁর এই প্রথম দিককার মনোভাবও 'কথামৃত'-এ গোপন রাখেননি। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তো এখানেই। শুধু তাই নয়, অনুলেখক হিসাবেও তাঁর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। মূল ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি এতটুকু ঘষামাজা করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংলাপ। তাঁর এই নির্ভেজাল অকৃত্রিমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীও। জয়রামবাটী থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেনঃ "তোমার নিকট যেসমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই ঐসমস্ত কথা বলিতেছেন।"[১] আরেক স্থানে 'কথামৃত' প্রসঙ্গে শ্রীমা বলছেনঃ "আহা! যেন সামনেই সব কথা হচ্ছে। গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে।"[২]

'কথামৃত'-এর সার্থকতা এখানেই। তাই তা শুধু মূল্যবান বাণী বা উপদেশ-সঙ্কলন নয়। প্রকৃতপক্ষে 'কথামৃত' হলো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের পবিত্র এক মাধ্যম। 'কথামৃত'-এর ভাষা এমনই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন যে, 'কথামৃত' পাঠকালে গ্রন্থ পাঠ করছি —একথা যেন আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই, সেখানে জাগ্রত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভের পুণ্য অনুভূতি।

ভুললে চলবে না, বহু আলোচিত এই 'কথামৃত' কিন্তু 'শ্রীম-লিখিত' নয়, 'শ্রীম-কথিত'। কেননা 'লিখিত' শব্দটি ব্যবহার করলে রচয়িতার স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবিরূপেই শ্রীম-র ওপর বর্তাবে। কিন্তু যুগাবতারের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণীগুলি শ্রীম আবার নতুন করে কিভাবে রচনা করবেন! বোধকরি এজন্যই 'কথামৃত'-এ শ্রীম রয়েছেন পরমপুরুষের পুণ্যলীলার কথক বা ভাষ্যকারের ভূমিকায়। তবে প্রচলিত অর্থে তাঁকে ভাষ্যকারও বোধহয় বলা চলে না। যে-অর্থে শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য প্রমুখকে গীতার ভাষ্যকার বলা হয়ে থাকে, সে-অর্থে শ্রীম-কে যুগাবতারের যুগলীলার ভাষ্যকার বলা যায় না। 'কথামৃত'-এ শ্রীম-র ভূমিকা শুধু ধারাভাষ্যদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, প্রায় প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী হিসাবেও তিনি এখানে উপস্থিত। কখনো আবার অজ্ঞজনের সুবিধার্থে তিনি নিজেই উপস্থিত হয়েছেন প্রশ্নকর্তার ভূমিকায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গীতায় অর্জুনের যে-ভূমিকা ছিল, একমাত্র তার সঙ্গেই যেন তুলনীয় হতে পারে শ্রীম-র ভূমিকা।

তবে এই তুলনাতেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। গীতায় প্রধান দুটি চরিত্রের মধ্যে অর্জুনের চরিত্রটি ছিল অন্যতম, অথচ 'কথামৃত'-এ কথামৃতকারকে অন্যান্য অসংখ্য ভক্তমধ্যে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। স্বভাবলাজুক আর আত্মপ্রকাশবিমুখ শ্রীম এখানে যেন স্বেচ্ছায় রয়েছেন প্রচ্ছন্ন ভূমিকায়। তাঁর পদবি ছিল গুপ্ত,

যথার্থ অর্থেই তা যেন সার্থক। কারণ, 'মণি', 'মাস্টার', 'মোহিনীমোহন', 'মণিমোহন', 'মহেন্দ্র', 'একজন ভক্ত' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে তিনি চেয়েছিলেন ভাষ্যকার হিসাবে নিজ অস্তিত্বটুকু সম্পূর্ণ মুছে ফেলে পাঠকরূপ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রচনা করতে। নিজে অলক্ষ্যে থেকে ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সরাসরি মেলবন্ধনের এই প্রয়াসে তিনি পেয়েছিলেনও আশাতীত সাফল্য।

অবশ্য আরেকটু অন্য ভাবেও তাঁর এই বিভিন্ন নামগ্রহণকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু স্বচক্ষে দেখা ঘটনা ও স্বকর্ণে শোনা কোন বাক্য ব্যতীত তিনি মূল 'কথামৃত'-এ আর কিছুই নথিবদ্ধ করেননি, তাই এর প্রত্যেকটি দৃশ্যেই তাঁর অস্তিত্ব ধ্রুবতারার মতোই সত্য। কিন্তু মুহুর্মুহু 'শ্রীম' নামের উল্লেখ সেক্ষেত্রে আবার পৌনঃপুনিকতার সৃষ্টি করতে পারে, ফলত পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা বা একঘেয়ে লাগা খুব বিচিত্র নয়। এজন্যই বিভিন্ন দৃশ্যে শ্রীম রয়েছেন বিভিন্ন নামের আড়ালে। বহুবিধ নামগ্রহণের পিছনে এমন কোন অপ্রত্যক্ষ কারণও থাকতে পারে।

'কথামৃত'-এ শ্রীম-র ভূমিকা কি? তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। ভাষ্যকার। জিজ্ঞাসু ভক্ত। জীবনীকার। অনুলেখক। কোন পরিচয় দ্বারাই যেন কথামৃতকারের ভূমিকাটিকে পুরোপুরি ধরা যায় না। অনেকে শ্রীম-কে তুলনা করেন জেমস বসওয়েলের সঙ্গে—যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের জীবনী রচনা করে। যতদূর জানা যায়, উভয়ের মধ্যে এই তুলনার ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন অলডাস হাক্সলি।[৩] অনেকে আবার হাক্সলির চেয়েও একধাপ এগিয়ে বলে থাকেন, শ্রীম হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'বসওয়েল'। কিন্তু মনে হয় না এই তুলনা বিশেষ সঙ্গত। শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুণ্য মহাজীবনের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল বসওয়েলের তুলনায় যাওয়া অনুচিত।

অধিকাংশ প্রচলিত বাঙলা অভিধানে 'কথা' শব্দের অর্থ 'উক্তি'। তবে ব্যাপক অর্থে 'কাহিনী', 'আখ্যান', 'উপাখ্যান' ইত্যাদি অর্থকেও সেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'শ্রীম' প্রচলিত অর্থে 'কথামৃত' শব্দ দ্বারা শুধু অমৃতময় বাণী বা উপদেশকেই বোঝাতে চেয়েছেন, তা মনে হয় না। যেহেতু 'তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম্...' সংস্কৃত শ্লোকটি ভাগবত থেকে চয়ন করা হয়েছে এবং এই শ্লোকটি দিয়েই শুরু হয়েছে 'কথামৃত'-এর পুণ্যকথা, তাই বাঙলার চেয়ে সংস্কৃত প্রতিশব্দকেই এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। কেননা 'কথামৃত' শব্দটি রয়েছে ভাগবত থেকে নেওয়া এই সংস্কৃত শ্লোকটির মধ্যেই। আবার সংস্কৃতে 'কথা' শব্দটি সাধারণত কাহিনী বা উপাখ্যান অর্থেই বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণে 'কথামৃত'-এর সূচনায় ঐ সংস্কৃত শ্লোকটির উল্লেখ অন্তত এই বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে যে, 'কথামৃত' শব্দ দ্বারা শ্রীম শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বা বাণী সঞ্চয়ন বোঝাতে চাননি।

'কথামৃত'-এর আগে প্রকাশিত বেশির ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীসঞ্চয়নে কিন্তু এই অস্পষ্টতা নেই, সেখানে গ্রন্থের নাম থেকেই স্পষ্ট হয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু (যেমন—'পরমহংসের উক্তি', 'পরমহংস', 'রামকৃষ্ণের উক্তি' ইত্যাদি)। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির রচনাকাল নিয়ে রয়েছে কিছু বিতর্ক। তাই আমরা শুধু সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কালক্রম অনুযায়ীই গ্রন্থগুলির উল্লেখ করব। তবে কোন গ্রন্থের আলোচনায় যাওয়ার আগে সমসাময়িক পত্রপত্রিকার কথাও একটু বলে নেওয়া উচিত, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সংবাদ এবং তাঁর পরিচিতি ও উক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকাগুলিই ছিল পথিকৃৎ। যতদূর জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্রান্ত প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয় কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ২৮ মার্চ ১৮৭৫। ঐবছর ১৫ মার্চ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে উপস্থিত হন। ঐদিনই তাঁর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন। তারই ফলশ্রুতি 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি।[৪] তবে ঐদিন কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দেখলেও ঠাকুর কিন্তু বহু পূর্বেই তাঁকে দেখেছিলেন ব্রহ্ম উপাসনা মন্দিরে। তাঁর ভাষায়, কেশবের তখন 'ফাতনা ডোবা' অবস্থা।

যাই হোক, শুধু 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত সংবাদ প্রায় নিয়মিতই প্রকাশিত হতো 'ধর্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার', 'ধর্মপ্রচারক', 'পরিচারিকা', 'নিউ ডিস্পেনসেশন' প্রভৃতিতে। তবে শুধুই সংবাদ নয়, বহু ক্ষেত্রেই সংবাদের সঙ্গে যে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু উক্তিও উদ্ধৃত হতো, তারও একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অনেক আগেই ১৮৭৬ সালে 'দি সানডে মিরর' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ'। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই কিছু উক্তির সঙ্কলন। পরে তা প্রকাশিত হয় পুস্তকাকারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি বা বাণীর সর্বপ্রথম সঙ্কলক কে ছিলেন? এপ্রশ্নেও বিস্তর মতপার্থক্য আর পরস্পর-বিরোধিতা ঐক্যমতে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গিরিশচন্দ্র সেনের 'আদি কথামৃত' গ্রন্থটি এখনো সহজলভ্য। এই গ্রন্থটিতে দাবি করা হয়েছে, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ১৮৪টি শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তিসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটিই 'কথামৃত'-এর আদি রূপ এবং সেক্ষেত্রে

গিরিশচন্দ্র সেনই হলেন আদি কথামৃতকার। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এর কোথাও আদি কথামৃতকার-রূপে গিরিশচন্দ্র সেনের উল্লেখ নেই বলে অনেকে শ্রীম-কে অভিযুক্তও করেন। মজার ব্যাপার হলো, গিরিশচন্দ্র সেন নিজেকে কখনো 'প্রথম কথামৃতকার' হিসাবে দাবি করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু ইতিহাস-অনুসন্ধানী ব্যক্তি এই দাবি করেন। তবে যতদূর জানা যায়, তাঁদের এই দাবি যথার্থ নয়। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু বাণী-সম্বলিত ১০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ পায় ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে—কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে। এই পুস্তিকাটিই প্রথম প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির সঙ্কলনগ্রন্থের স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। যদিও এই পুস্তিকাটিতে কেশবচন্দ্রের নামোল্লেখ নেই, তথাপি বেঙ্গল লাইব্রেরি প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকায় 'পরমহংসের উক্তি' নামক পুস্তিকার প্রণেতা হিসাবে তাঁর নামই রয়েছে। হতে পারে, কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর ব্রাহ্ম অনুরাগী গিরিশচন্দ্র সেনই শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির সঙ্কলন ও প্রকাশে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু পুস্তিকাটিতে যেহেতু সঙ্কলক হিসাবে কারো নাম নেই কিংবা অন্যত্রও পাওয়া যায়নি, তাই গিরিশচন্দ্র সেনকে প্রথম সঙ্কলক হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, কোন গ্রন্থই শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এর আদি রূপ হতে পারে না। কেননা শ্রীম স্বচক্ষে দেখা কোন ঘটনা ভিন্ন 'কথামৃত'-এ আর কিছুই নথিবদ্ধ করেননি, যে-কারণে ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বা 'আত্মপ্রকাশপূর্বক অভয়দান'-এর মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও 'কথামৃত'-এ অনুপস্থিত। কারণ একটাই—শ্রীম ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। আর 'কথামৃত'-এর মতো প্রামাণ্য গ্রন্থের ব্যাপারে অন্য কোন সূত্রের ওপর এতটুকু নির্ভর করতেও তিনি রাজি ছিলেন না। এজন্যই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, 'কথামৃত'-এর কোন আকরগ্রন্থ নেই, নেই কোন সহায়ক গ্রন্থও।

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রচারে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের নিরলস প্রয়াস সবিশেষ স্মরণযোগ্য। প্রভুর ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে নগরসঙ্কীর্তন, সাপ্তাহিক প্রচার, বিভিন্ন ভক্তগৃহে নিয়ম করে আলোচনার ব্যবস্থা, বক্তৃতা, পরমপুরুষের বাণীসম্বলিত বিবিধ পুস্তিকা প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ, একাধিক সাময়িকপত্র ও মাসিক পত্র প্রকাশ ইত্যাদি বহুমুখী উদ্যোগে তাঁরা দিবারাত্র নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তাঁরা যখন যুগাবতারের উক্তিগুলি সংগ্রহ করে সেগুলিকে মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেসময় জনৈক ভক্তমুখে সে-সংবাদ শুনে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই রামচন্দ্রকে বলেছিলেন ঃ "কেহ কেহ আমায় বলিয়াছে যে, তুমি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতেছ। এরূপ কার্য এখন করিও না। আমার বিষয় আপাতত গোপন রাখিবে। যদি তুমি এখনই ঢাক বাজাইয়া দাও তাহা হইলে এই শরীর থাকিবে না।"[৫]

এরপর ঠাকুরের শুভাশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা শুধু তাঁর বাণী ও উপদেশগুলি মুদ্রণে যত্নবান হন। 'তত্ত্বসার'-এর পর প্রকাশ পায় রামচন্দ্রেরই 'তত্ত্ব প্রকাশিকা'। বহু খণ্ডে বিভক্ত এই 'তত্ত্ব প্রকাশিকা'র প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পেয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের কিছুটা আগেই (২০ জুন ১৮৮৬)।[৬] 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক মাসিক পত্রিকাটিরও সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত। এই পত্রিকাটিতেও শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্রান্ত সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ঠাকুরের ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত বক্তৃতামালাও মুদ্রিত হয়েছিল পুস্তিকাকারে। মোটামুটি এরকম ১৮টি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়ার গেছে।[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর ৮ জুলাই ১৮৯০ রথযাত্রার দিন প্রকাশ পেল রামচন্দ্র-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' নামক ২১০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি। তাঁর উদ্যোগেই বোধকরি এই প্রথম বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশের প্রয়াস নেওয়া হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের শৈশব ও কৈশোর কাল সম্পর্কে রামচন্দ্রকে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। মনোমোহন মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের কাছ থেকেও সংগৃহীত হয়েছিল এই গ্রন্থের কিছু তথ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিলাভের পর যেসকল পত্র-পত্রিকা তাঁর অমৃতময় উপদেশ ও সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সুলভ সমাচার', 'ধর্মতত্ত্ব', 'পরিচারিকা', 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'সখা', 'তত্ত্বকৌমুদী', 'বেদব্যাস', 'The Theistic Quarterly Review', 'The Indian Mirror' প্রভৃতি।

সময়ক্রম অনুসারে এর পরেই উল্লেখ করতে হয় সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত 'পরমহংসদেবের উক্তি' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের কথা। প্রকৃতপক্ষে এটি শ্রীম-রই একটি প্রয়াস। 'সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন' তাঁর ছদ্মনাম। এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ। যতদূর জানা যায়, এই গ্রন্থে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০।[৮] গ্রন্থটির প্রচ্ছদে মুদ্রিত 'তৃতীয় ভাগ' শব্দটি অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। কেননা বহু অনুসন্ধানেও এমন কোন তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি যার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে, ঐ গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আদৌ কখনো প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া থেকে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও

তার কথামৃত' গ্রন্থে সুনীলবিহারী ঘোষ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সচ্চিদানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ঐ গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কখনো প্রকাশ পায়নি।[৯]

আসা যাক অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' প্রসঙ্গে। সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার সাবলীল কাব্যময় প্রকাশ এটি। গ্রন্থটির শব্দচয়ন এবং বিন্যাসশৈলীতে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ স্পষ্টতই লক্ষিত হয়। অক্ষয়কুমার সেনের এই গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, পরমপুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সুপ্রাচীন পয়ার ছন্দে। বোধকরি একারণেই গ্রন্থটি অনবদ্য। বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। পরে ২৫ নভেম্বর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সব খণ্ড একত্র করে প্রকাশিত হয় ৫৭৯ পৃষ্ঠাসম্বলিত একটি অখণ্ড সংস্করণ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নরলীলার শেষদিকে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় তাঁর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন হয় এবং সম্ভবত ১৮৮৬-র ১ জানুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মন্ত্রদান করেন। তাঁর রচিত অপর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'পদ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা'। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়।

অক্ষয়কুমার সেনের পরই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিগণ যাঁর কাছে ঋণী, তিনি হলেন সত্যচরণ মিত্র। ৯ অক্টোবর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরমপুরুষের জীবনী ও বাণী সম্বলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

'The Imperial & Asiatic Quarterly Review & Oriental & Colonial Record' পত্রিকায় ১৮৯৬-তে প্রকাশিত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সি. এইচ. টনির শ্রদ্ধার্ঘ্য। মাত্র একমাসের মধ্যেই 'The Indian Mirror' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হলো ঐ প্রবন্ধ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবন্ধটিই আবার আত্মপ্রকাশ করল 'A Modern Hindu Saint' নামক ৯ পৃষ্ঠার এক পুস্তকরূপে।[১০]

টনির পর ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমুলার 'The Ninteenth Century' পত্রিকায় লিখলেন 'A Real Mahatman'। লেখাটি সমৃদ্ধ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ৩১টি মূল্যবান উপদেশে। প্রবন্ধটিতে ম্যাক্সমুলার কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন, আর তাতেই ঘটে যত বিপত্তি। কেশব-অনুরাগীদের অসন্তোষ আর ক্ষোভের ফলে সৃষ্টি হলো এক অতিশয় তিক্ততার বাতাবরণ। খুব সহজে কিন্তু এই উত্তেজনা স্তিমিত হলো না। প্রকাশ পেল 'নববিধান সমাজ'-এর উপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত রচিত 'Max Muller on Ramakrishna & Keshab' নামক পুস্তিকা। ফল হলো সুদূরপ্রসারী। এর কিছু পরেই প্রকাশিত হলো ম্যাক্সমুলারের পরবর্তী লেখা—'Ramakrishna : His Life & Sayings' (1898)। সম্ভবত বিদেশীর কলমে লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-সম্বলিত প্রথম তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এটি। তবে পূর্বে প্রকাশিত 'এ রিয়েল মহাত্মন' গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু শ্রদ্ধাবনত নয়, পরন্তু এখানে গ্রন্থকারের ভূমিকা কিছুটা যেন সমালোচকের। বিভিন্ন উগ্র প্রতিবাদপত্র আর বিকৃত প্রবন্ধ সম্ভবত প্রভাবিত করেছিল ম্যাক্সমুলারকে—এটুকু অনুমানে কষ্ট হয় না। ব্রাহ্মসমাজের কারো কারো সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব পরিবর্তনে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।[১১]

কালক্রম অনুসারে এর পরই যে-গ্রন্থটির কথা বলতে হয়, সেটি হলো শ্রীম কর্তৃক ইংরেজিতে লিখিত 'গস্‌পেল'। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঔৎসুক্য আর কৌতূহল সৃষ্টি করে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তবে সকলেরই এক কথা —সর্বসাধারণের কাছে ঠাকুরকে পৌঁছে দিতে গেলে বাঙলা ভাষার কোন বিকল্প নেই। কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠ থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'তেও একই কথা বললেন রামচন্দ্র দত্ত। খণ্ডাকারে প্রকাশ না করে যুগপুরুষের কথা প্রকাশ করতে হবে এক অখণ্ড সংস্করণের আকারে এবং তাঁর দ্বিতীয় অনুরোধটি হলো ভাবটিকে যথাযথভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশে মাধ্যম হিসাবে বাঙলাকেই গ্রহণ করতে হবে।

তবে আয়তনের দিক থেকে দেখলে শ্রীম-প্রকাশিত এই 'গস্‌পেল'কে কিন্তু কোনমতেই গ্রন্থ বলা যায় না, বড়জোর প্যামফ্লেট বা পুস্তিকা-রূপে গণ্য করা যায়। এটি প্রথমে মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধ-রূপে। উল্লেখ্য, এই 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকাই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা সর্বপ্রথম বাংলার বাইরে প্রচারের উদ্যোগ নেয়। স্বামীজীর উৎসাহে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হতো এই পাক্ষিক পত্রিকাটি। প্রসঙ্গত, মাদ্রাজ থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত'ও বিভিন্ন সময়ে 'গস্‌পেল'-এর অংশবিশেষ প্রকাশ করে, তবে তা কখনোই শ্রীম কর্তৃক 'গস্‌পেল' প্রকাশের আগে নয়, বরং বেশ কিছুটা পরে। পুস্তিকাকারে শ্রীম-র 'গস্‌পেল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং 'গস্‌পেল'-এর অংশবিশেষ 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮-এর মার্চে। তবে শুধুই 'ব্রহ্মবাদিন্' বা 'প্রবুদ্ধ ভারত' নয়, 'লাইট অফ দ্য ইস্ট', 'ডন' ইত্যাদি পত্রিকাতেও কিছুকালের মধ্যেই 'গস্‌পেল'-এর বিভিন্ন অংশ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এর

অনেক পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রহ্মবাদিন্' প্রকাশনগোষ্ঠী এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নাম একই, তবে এটি পুস্তিকা নয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮৪। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ১৯০২ এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 'কথামৃত' গ্রন্থাকারে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গস্পেল'কে 'কথামৃত'র আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ ভাবলে ভুল হবে। প্রকাশভঙ্গি ও ভাববিস্তারে ভাষার প্রয়োগ-পার্থক্যের কারণে দুটি গ্রন্থই স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাওয়ার আগে 'উদ্বোধন', 'তত্ত্বমঞ্জরী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কিছুকাল যাবত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে তা কখনোই সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তাই পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ (ফাল্গুন ১৩০৮) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে বাঙলায় প্রকাশিত হলো 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শ্রীমা সারদাদেবীকে। প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৯৪। এরপর ২০ অক্টোবর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে (কার্তিক ১৩১১) প্রকাশিত হলো গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড, এতে মোট পৃষ্ঠা ছিল ৩০৮। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩১৫)। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৯০। এর প্রায় দুবছর পর ১০ অক্টোবর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন ১৩১৭) প্রকাশিত হলো ৩৫২ পৃষ্ঠাসমন্বিত চতুর্থ খণ্ড। সর্বশেষ পঞ্চম খণ্ডটির প্রকাশকাল ছিল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ (ভাদ্র ১৩৩৯)। কথিত আছে, শ্রীম-র কাছে যেসকল তথ্য ও উপকরণ ছিল তার দ্বারা 'কথামৃত'-এর আরো বেশ কয়েকটা খণ্ড বের করা যেত। কিন্তু তাঁর প্রভুর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। 'কথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডের চতুর্দশ ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই তিনি শুনেছিলেন প্রভুর আহ্বান। সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন প্রত্যূষে তিনি মিলিত হয়েছিলেন তাঁর আরাধ্যের সঙ্গে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। শতবর্ষ পরেও 'কথামৃত'-এর জন্য ব্যাকুলতা ক্রমবর্ধমান। 'কথামৃত'-প্রীতি বাস্তবিক এক নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতবর্ষের প্রায় সব কয়টি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'কথামৃত'। কথিত আছে, বহু বিদেশী শুধু 'কথামৃত' পাঠের জন্যই বাঙলা ভাষা শিখতে শুরু করে। বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজি ছাড়াও পর্তুগিজ, জার্মান, ডেনিশ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, স্প্যানিশ, জাপানিজ ও চেকোস্লোভাক ভাষায় 'কথামৃত' অনূদিত হয়েছে। বিক্রিও হয়েছে হাজার হাজার কপি।

বস্তুত, 'কথামৃত'-এর এই সর্বকালীন ও সর্বজনীন আবেদনের পিছনে রয়েছে এর কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীম তাঁরই নির্বাচিত পুরুষ। 'কথামৃত'-এ আমরা লক্ষ্য করি, কখনো কখনো আলোচনার মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শ্রীম-কে জিজ্ঞেস করছেন তিনি বুঝেছেন কিনা। এমনকি তিনি ঠিক বুঝেছেন কিনা তা জানার জন্য ঠাকুর তাঁকে দিয়ে বলিয়েও নিয়েছেন। আসলে তিনি তখন থেকেই তাঁর এই বাণীবাহককে গড়ে তুলছিলেন। তাই স্বামী শিবানন্দ ঠাকুরের অজ্ঞাতে তাঁর বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করতে থাকলে অন্তর্যামী ভগবান তাঁকে বলেন, একাজ তাঁর নয়। এর জন্য অন্য একজন পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছেন। পরবর্তী কালে সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই স্বহস্তে গড়া নির্বাচিত পুরুষটি হলেন শ্রীম—যিনি নিজের অহংকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে চিরকালের মানবজাতির কাছে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত করেছেন এযুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে। ধন্য শ্রীম! ধন্য 'কথামৃত'। ❑

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, 'শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ' অংশ
২ তব কথামৃতম্—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৭
৩ The Gospel of Sri Ramakrishna—Swami Nikhilananda, 'Foreword' portion, Aldous Huxley
৪ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ৩ (ভূমিকা) এবং ৩ (তিরোভাবের পূর্বে)
৫ ভক্ত মনোমোহন, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৫১
৬ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১২০; ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৫২
৭ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৫২, ১৫৩; সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১২২-১২৪
৮ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১২২
৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কথামৃত, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া, পৃঃ ২১৯
১০ শ্রীম-র জীবনদর্শন, পৃঃ ৩৪৬; সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১৩৯
১১ শ্রীম-র জীবনদর্শন, পৃঃ ৩৪৭
১২ শ্রীম-র জীবনদর্শন, পৃঃ ৩৪৫; তব কথামৃতম্, পৃঃ ১৭

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—**সম্পাদক**

বৈকুণ্ঠধাম

নির্মলকুমার রায়

> শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে। (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবার পঞ্চম পর্যায়ে 'বৈকুণ্ঠধাম'।
>
> —সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের (১৮৫৭-১৯৩৭) উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাড়িতে (২০, বোসপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩) শ্রীমা সারদাদেবীর শুভাগমন ঘটেছিল।

'বৈকুণ্ঠধাম' • *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল সম্পর্কে স্বামী বিমলাত্মানন্দ লিখেছেন : "বৈকুণ্ঠ সান্যাল মহাশয়ের বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার বেলপুকুর গ্রামে। কিন্তু তিনি কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে বাস করতেন। বাগবাজারে তাঁর বাসস্থান ছিল ২০ নম্বর বোসপাড়া লেন। বর্তমানে বৈকুণ্ঠের বাড়িটি ভেঙে ঐ জায়গাতে আবার বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। বাড়িটির গায়ে একটি শ্বেতপাথরে লেখা আছে 'বৈকুণ্ঠধাম'।

"বৈকুণ্ঠনাথের পরিচয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন সুন্দরভাবে দিয়েছেন—

'জুটিল যুবক এক সাণ্ডেল বামুন।
ভিতরেতে ভরা অনুরাগের আগুন।।
ক্ষিপ্তপ্রায় দ্রুত যেন বারুদের বাজি।
প্রভুরে করুণা মাগে, প্রভু নন রাজি।।
অন্তরে অকুতোভয় দস্যুর আচার।
মানসভাণ্ডার লুটে ভাঙিয়া দুয়ার।।
প্রকৃতি দেখিয়া বড় আনন্দ প্রভুর।
অচিরে করিলা কৃপা দয়াল ঠাকুর।।'

"নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ উৎকণ্ঠিত মনের সাক্ষী ছিলেন বৈকুণ্ঠ। সেদিনের 'নরেন্দ্রময়' শ্রীরামকৃষ্ণের মনের পরিচয় লীলাপ্রসঙ্গকার বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার যেদিন 'নরেন্দ্র কালী মেনেছে'—সেই ঘটনার পরের দিন বৈকুণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছিলেন কিরূপে 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে' এবং '(আমার) মা ত্বং হি তারা' গানটি সারারাত গেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় বৈকুণ্ঠ তাঁর সেবা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে বিশেষ সখ্য ছিল। উত্তরকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক 'স্বামী কৃপানন্দ' নামধারণ করেন। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডে ও বরাহনগরে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু পরে, তিনি গার্হস্থ্যজীবন অবলম্বন করেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে তাঁকে প্রায় দেখা যেত, যতদিন সারদানন্দজী উদ্বোধনে ছিলেন। এই সূত্রে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'সান্যাল মহাশয়' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৭ চৈত্র শনিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।"[১]

এছাড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা-রূপেও তাঁর এক বিশেষ পরিচিতি আছে। প্রথম জীবনে তিনি সরকারি স্টেশনারি অফিসে চাকরি করতেন এবং অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ঠাকুরও যোগদৃষ্টি সহায়ে

তাঁর মানসিক সংস্কার অনুযায়ী তাঁকে মন্ত্রদান করেন। এই পরম ভাগ্যবান ভক্তের বাড়িতেই শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন ঘটেছিল এবং তিনি ঠাকুরের ভোগ রান্না করেছিলেন।

এই সিংহাসনে পূজা হয়। পিছনে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের ছবি।
• আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

এই সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়—"২০ নম্বর বোসপাড়া লেনের বৈকুণ্ঠনাথের বাড়িতে ৮০ বছর যাবৎ দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। মা সারদামণি এই বাড়িতে স্বয়ং রান্না করে রামকৃষ্ণদেবকে ভোগ খাইয়েছিলেন। প্রথম দুবছর মায়ের নামে সঙ্কল্প করে দুর্গাপূজা হয়েছিল। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ এই বাড়িতে প্রথম পূজারী ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল বিজয়চন্দ্র রায়। তাঁর বাল্য ও কৈশোর এই বাগবাজারেই কেটেছিল। এখনো এই বাড়িতে প্রায় ৭০ বছরের উপর অন্নপূর্ণা এবং কালীপূজা হয়ে আসছে।"[২]

এই বাড়িতে এসে অনুসন্ধানে জানা যায়, স্বামী নির্মলানন্দ তথা তুলসী মহারাজের বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। বাকি অংশ ৬, চোরবাগান লেন-নিবাসী বসুদের কাছ থেকে কেনা। বৈকুণ্ঠনাথের অন্যতম কৃতি সন্তান ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সুধীরনাথ সান্যাল শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহ লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন : "বড় ডাক্তার হোসনে, ভাল ডাক্তার হ।" শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ পালন করে তিনি আমৃত্যু বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে গেছেন। ❑

<u>পথনির্দেশ</u> : 'বৈকুণ্ঠধাম'-এর ঠিকানা : ২০, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। 'গিরিশ ভবন'-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের যে-গলিটি বোসপাড়ায় গিয়ে পড়েছে, সে-দুটির সংযোগস্থলে বাঁদিকের বাড়িটি বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের। এর সদর দরজা বোসপাড়া লেনে।

তথ্যসূত্র

১ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম সং, ১৯৯৮, পৃঃ ৭০৩
২ ঐ, পৃঃ ১৪০

অনুষ্ঠান-সূচী : আষাঢ় ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য : **গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)**
আষাঢ় পূর্ণিমা
২৮ আষাঢ়, রবিবার
(১৩ জুলাই ২০০৩)

পূজাতিথি-কৃত্য : **রথযাত্রা**
আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া
১৬ আষাঢ়, মঙ্গলবার
(১ জুলাই ২০০৩)

একাদশী-তিথি : ১০, ২৫ আষাঢ়
বুধবার, বৃহস্পতিবার
(২৫ জুন, ১০ জুলাই ২০০৩)

সমাধান : শব্দচেতনা ২১

পাশাপাশি : (২) কেদারনাথ, (৫) শশী, (৬) কাল, (৮) মুনীন্দ্র, (১০) নন্দী, (১২) গাল, (১৪) ভস্ম, (১৫) হর, (১৬) জয়, (১৭) অপি, (১৯) তব, (২০) শুভ্র, (২৩) মকর, (২৫) শিব, (২৭) ব্যাল, (২৮) শশলাঞ্ছিত।

ওপর-নিচ : (১) কাশী, (২) কেন, (৩) নাগেন্দ্র, (৪) বেল, (৫) শক্তি, (৬) কালী, (৭) মান, (৯) নীলাভ, (১১) ভৈরব, (১২) গাজন, (১৩) লয়, (১৫) হত, (১৮) পিনাক, (২১) ভ্রম, (২২) ইব, (২৩) মহেশ, (২৪) ভাল, (২৫) শিতি, (২৬) হিত, (২৭) ব্যাঘ্র।

শব্দচেতনা ২১-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম :

অনিমা সর্বাধিকারী, সুদীপ্তকুমার বোস, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

স্বামীজি! আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

কাশ্মীর। আচ্ছাবলের মোগলবাগ। মাথার ওপর আকাশ। এ-আকাশ সামুদ্রিক নয়, পাহাড়ি। পাহাড় চূড়ায় বরফ সাজায়। কখনো নীল। কখনো চিনির রসের মতো চটচটে, পিচ্ছিল। এই রোদ তো এই বৃষ্টি। উদ্যানে বসে আছেন স্বামীজী। বসে আছেন ওলি বুল, কলকাতার আমেরিকান কনসাল জেনারেলের স্ত্রী, মিসেস প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা আর জোসেফিন ম্যাকলাউড। মিসেস প্যাটারসন স্বামীজীর আমেরিকা ভ্রমণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমেরিকার দক্ষিণপ্রান্তে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজী বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে ওলি বুলকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস বুল,

আপনি অনুগ্রহ করে আমায় মিঃ ফ্রেডারিক ডগলাসের নামে যে-পরিচয়পত্রটি দিয়েছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাল্টিমোরে এক হোটেলওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্যবহার পেয়েছি, সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। যেমন সর্বত্র হয়েছে, এখানেও তেমনি —আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। এখানে মিসেস টটনের বাড়িতে বাস করছি। ইনি আমার শিকাগোর জনৈক বন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী।"

এই প্যাটারসন-পত্নীই সর্বপ্রথম স্বামীজীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গীরা অনুভব করছেন, স্বামীজী ক্রমশই যেন বদলে যাচ্ছেন। অন্তর্মুখী, সমর্পিত, শান্ত। বেরীনাগ আর আচ্ছাবলের সমস্ত উদ্যান ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ভূস্বর্গে মানুষ আর প্রকৃতি উভয়ে স্বর্গ-রচনা করেছে। মুগ্ধ স্বামীজী যেমন উপভোগ করছেন, তাঁর বিদেশিনী শিষ্যারাও করছেন।

স্বামীজী পাঠান খাঁর জেনানার সামনে একটি স্থির জলাশয় দেখে স্নান করার ইচ্ছা দমন করতে পারলেন না। নিভৃতে স্নান করে ফিরে এলেন আচ্ছাবলের মোগলবাগে। মধ্যাহ্ন সমাগত। উন্মুক্ত আকাশের নিচে মধ্যাহ্নের আহার। সাদা চাদর বিছানো হয়েছে। বিদেশিনীদের আন্তরিক সুব্যবস্থা।

নির্জনে ধ্যান, হিমালয়ের কোলে। স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের এই বাসনা পূর্ণ করতে রাজি হয়েছিলেন। সাধনা। পপলার গাছের তলায় মৌনাবলম্বন করে ধ্যান অভ্যাস। একটি সপ্তাহ চলবে এই অনুশীলন। কয়েকটি তাঁবু আনানো হলো। আচ্ছাবলের বনের প্রান্তে সারি সারি তাঁবু। এ এক শিক্ষাশিবির। স্বামীজী গুরু। অস্থায়ী এক ভৃত্য যাবতীয় কাজ করেন। স্বামীজী তাঁর শিষ্যাদের সামনে উন্মোচিত করছেন ভারতের রত্নভাণ্ডার। কখনো ভারতের অতীত ইতিহাস। মহাপুরুষদের জীবন। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা। মৌন কালকে বাঙ্ময় করে তুলছেন। হে অতীত কথা কও। খোল তব স্তব্ধ নীল যবনিকা।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজে লিখেছিলেন—"নরেন শিক্ষে দিবে।" নরেন হবে চিরকালের শ্রেষ্ঠ গুরু। তৈরি করবে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। আগ্রহী বিদেশিনীরা অভিভূত। ধীরামাতার (ওলি বুল) নৌকায় বসে স্বামীজী একদিন বললেন ঃ

"পাশ্চাত্যবাসী তোমরা বড় সহজে বিষণ্ণ বোধ কর। তোমরা দুঃখের উপাসনা কর। তোমাদের সারা দেশে এই আমি দেখেছি। প্রতীচ্যে তোমাদের সামাজিক জীবন বাইরে থেকে হাস্যমুখরিত, কিন্তু ভিতরে গভীর মর্মব্যথা। শীঘ্রই তা কান্নায় পরিণত হয়। আমোদপ্রমোদ যাকিছু, সব ওপরে—আসলে তা গভীর দুঃখে পূর্ণ। কিন্তু এদেশে বাইরের দিকটা দুঃখপূর্ণ ও নিরানন্দ, কিন্তু ভিতরে নিশ্চিন্ত ভাব ও আনন্দ।"

নৌকা, নদী, কাশ্মীরের নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ। শীতলতা। স্বয়ং মহাদেব যেন জগৎ আর জীবনের কথা বলছেন। যেন বলছেন ঃ "তোমরা জান, আমাদের একটা মত হলো, ঈশ্বর ক্রীড়াচ্ছলে নিজেকে জগৎ-রূপে বিকাশ করেছেন। অবতারগণ লীলাহেতু এখানে আগমন করেন এবং বাস করেন। খেলা—সব খেলা। খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন? সে কেবল লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু খেলা করে যাও। বল—এসব লীলা, লীলা। তুমি কিছু করেছ কি?"

নিবেদিতার কী অপূর্ব বর্ণনা ঃ "অতঃপর আর একটি কথাও না বলিয়া তিনি নক্ষত্রালোকে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং নিজের নৌকায় চলিয়া গেলেন। আমরাও নদীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের নিকট রাত্রির মতো বিদায় লইলাম।"

সেই নির্জন বাস, সেই তাঁবুর জীবন, সেই গুরু-শিষ্য-সঙ্গ-সাধন স্মৃতির ঝরাপাতা আচ্ছাবলের বনপ্রান্তে পড়ে আছে। আমরা এক দূর বর্তমানের যাত্রী। স্বামীজীকে খুঁজে বেড়াই নদীর স্রোতে। অরণ্যের বাতাসে। পাহাড়চূড়ার বরফে। একের পর এক নৌকা ভেসে যায়। কোনটিতে হঠাৎ

দর্শন পেয়ে যাব সেই মৌনী বিশ্বেশ্বরের—ঠাকুর যাঁকে বলতেন, জগতের গম্ভীর। সময় এক বর্ণখচিত জাজিম। বর্তমানকে অনবরত রিক্ত করে সব গুটিয়ে নিয়ে চলে যায় অতীতে।

নির্জনবাসের সপ্তাহে এক সন্ধ্যা। নদীর তীর। চির আর চিনার আর পপলারের বিশাল বিশাল, ঋজু ঋজু বৃক্ষশ্রেণি। নিচে সমাবেশ। ছোট্ট, একান্ত। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ। স্বামীজীর অসীম, অলৌকিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত। নেতৃত্বের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু হলো আলোচনা। চলে এল প্লেটোয়। অবশেষে স্বামীজী অপূর্ব এক তত্ত্ব শোনালেন শিষ্যাদের ঃ "আমরা যাকিছু দেখছি, সবই সেই মহান ভাবের ক্ষীণ বিকাশমাত্র; সেই ভাবসত্তাই কেবল সত্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ। কোন এক জায়গায় একটা আদর্শ 'ত্বং' পদার্থ রয়েছে, আর এই জগতে কেবল তাকেই প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা অনেক বিষয়ে আদর্শের কাছে যেতে পারছে না। তথাপি এগিয়ে চল। কোন-না-কোনদিন আদর্শকে ধরতে পারবে।"

আহার চলছে। সামোভারে কাশ্মীরি চা। অতি সুস্বাদু কাশ্মীরি মোরব্বা। স্বামীজীর মন কোন্ লোকে আছে কে জানে! 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'। শরীর ভূমিতে, মন ভূমায়। স্বামীজী হঠাৎ বললেন, আবার একবার চেষ্টা করব অমরনাথে যাওয়ার। সঙ্গী হবে আমার কন্যা। মানসকন্যা নিবেদিতা।

পনেরো দিন আগের এক ভোরে শিষ্যারা স্বামীজীর খবর নিতে গিয়ে দেখলেন, স্বামীজীর নৌকাটি নেই। অন্যান্য নৌকার মাঝিরা বললেন, স্বামীজী কোথাও চলে গেছেন। রাতে প্রকৃত খবর পাওয়া গেল। স্বামীজী শোনমার্গের পথে অমরনাথ গেছেন। একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায়। ফিরে আসবেন ভিন্ন একটি পথে।

পাঁচদিন পরে বিকাল পাঁচটার সময় নিবেদিতা এবং অন্যান্য বিদেশিনীরা নদীর অনুকূলে তরতরে স্রোতে ভ্রমণের জন্য সবে নৌকা খুলেছেন, এমন সময় নৌকার মাল্লারা বলল—মেমসায়েব, আমাদের চেনা একটা নৌকা আসছে। এখনো অনেক দূরে। মনে হয়, স্বামীজীর নৌকা। ফিরে আসছে।

ঠিক তাই। একঘণ্টা পরে স্বামীজীর নৌকা ভিড়ল। নিবেদিতা লিখছেন তাঁর দিনলিপিতে ঃ "একঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীষ্ম ঋতুতে (১৮৯৮) অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল এবং কয়েকটি তুষারবর্ত্ম ধসিয়া যাওয়ায় শোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটি দুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।"

জুলাই ২৫। আচ্ছাবল। প্রকৃতিপ্রেমী, বিজ্ঞানী, সম্রাট জাহাঙ্গীর বহু উদ্যান রচনা করেছিলেন। কোন্‌টি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিশ্রামস্থল ছিল। সেটি এখানে, না ভেরিনাগে? নিবেদিতার প্রশ্ন। পাঠান খাঁর জেনানার বিপরীতে চমৎকার সরোবরের শান্ত, শীতল জলে চমৎকার স্নান। অপূর্ব 'লাঞ্চ'। চমকপ্রদ ঘোষণা—অমরনাথ আর আমাকে ফেরাতে পারবেন না। দেবাদিদেব মহেশ্বরের আহ্বান আমি শুনেছি। কন্যা নিবেদিতা প্রস্তুত হও। পথ অতি দুর্গম।

স্বামীজী গান গাইছেন ঃ "ভূতলে আনিয়া মাগো করলি আমায় লোহাপেটা/ (আমি) তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা।" [ক্রমশ] (দুই)

'রামচরিতমানস'-এ রামরাজ্য কেমন?

স্বামী অবধূতানন্দ

আদিকবি বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করছেনঃ "আপনি সর্বজ্ঞ, সকল দেশের সকল মানুষের কথাই আপনি জানেন। আপনি আমাকে এমন কোন দেবতা বা মানুষের কথা বলতে পারেন, যাঁকে কেন্দ্র করে আমি আমার অন্তরের ব্যথা ও অলৌকিক ভাবকে প্রকাশ করতে পারি? এমন কোন মহান ব্যক্তির কথা কি আপনার জানা আছে, যিনি চরিত্রবান এবং যাঁর মধ্যে একসঙ্গে সমস্ত গুণরাশি বিদ্যমান? এই সময় পৃথিবীতে এমন কোন গুণবান ব্যক্তি কি আছেন, যিনি বলবান, ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ এবং নিজ প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনে সুদৃঢ়?"

নারদ বাল্মীকিকে বললেনঃ "তুমি যেসব গুণের কথা বলছ তা তো কোন দেবতার মধ্যে দেখি না, তবে এই নরলোকেই একজন সর্বগুণসম্পন্ন 'নর-চন্দ্রমা' আছেন, তিনি হলেন অযোধ্যার রাম। তাঁকে কেন্দ্র করে তোমার ভাবের জোয়ার উদ্ঘাটিত করতে পার। রামের নৈতিক চরিত্র, হৃদয়বত্তা, ক্ষমাশীলতা, প্রেম ও কোমলতার পরিচয় পেয়ে সকল অযোধ্যাবাসী দশরথের রাজত্ব-কালেই রামকে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হতে অনুরোধ করেছিলেন।"

'রামচরিতমানস'-এ কবি তুলসীদাস লিখছেনঃ

"সব কেঁ উর অভিলাষু অস কহহিঁ মনাই মহেসু।
আপ অছত জুবরাজ পদ রামহি দেউ নরেসু।" (২।১।১)

—সকলের মনে এই একমাত্র বাসনা যাতে রাম রাজা হন। সেজন্য শিবের নিকট সকলে প্রার্থনা করে বলছেন, দশরথ জীবিত থাকতেই যেন রামকে রাজা করা হয়।

মহারাজ দশরথ অযোধ্যায় রামরাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাসনাময়ী কৈকেয়ী ও লোভরূপী মন্থরা বাধা সৃষ্টি করায় তাঁর পক্ষে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। মানুষের জীবনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভরূপী বৃত্তিসমূহ বিদ্যমান, ততক্ষণ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা হৃদয়ে অধ্যাত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অযোধ্যাতে দুর্বলতা, কামনা, বাসনা, লোভাদি বৃত্তিসমূহ এবং লঙ্কারাজ্যে অধর্ম, দুরাচার, পাপাদি দুর্গুণসমূহ যতক্ষণ বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। বাইরের এবং অন্তরের দুর্গুণরূপ রাক্ষসদের বিনাশে হৃদয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। বাইরের দুর্গুণরূপ রাক্ষস নাশ করার ভার রাম ও লক্ষ্মণ নিয়েছিলেন এবং অযোধ্যার ভিতরের দুর্গুণসমূহ নাশের ভার নিয়েছিলেন ভরত ও শত্রুঘ্ন। অবশেষে ভরত দ্বারা অযোধ্যায় এবং বিভীষণ দ্বারা লঙ্কায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

রামরাজ্য ধর্মরাজ্য। অন্তরের পরিবর্তনে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। রামরাজ্য আইন, আদালত, পুলিশ দ্বারা সুব্যবস্থার রাজ্য নয়, হৃদয়ের স্বভাবের পরিবর্তনে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাদ, চুরি, ডাকাতি করার প্রবৃত্তিই যদি কারোর না হয় তাহলে পুলিশ, আইন, আদালত ও রক্ষকের কোন প্রয়োজন হয় না। 'রাম-চরিতমানস'-এ রামরাজ্যের বর্ণনায় আছে—

"রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোকা।
হরষিত ভয়ে গয়ে সব সোকা।।
বয়রু ন কর কাহু সন কোই।
রাম প্রতাপ বিষমতা খোই।।"

(৭।১৯।৪)

—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তিনলোক হর্ষিত হয়েছিল। সমস্ত দুঃখ-শোক দূর হয়েছিল। কারো প্রতি কারো শত্রুতা ছিল না। শ্রীরামের প্রভাবে সকলের ভেদভাব দূর হয়েছিল।

শ্রীরাম তাঁর প্রজাদের পুত্রের ন্যায় পালন করতেন। প্রজারাও তাঁকে পিতার তুল্য মনে করত। শ্রীরাম নিজমুখে লক্ষ্মণকে বলছেনঃ

"জাসু রাজ প্রিয় প্রজা দুখারী।
সো নৃপু অবসি নরক অধিকারী।।"

(২।৭০।৩)

—যে-রাজ্যে প্রজারা দুঃখকষ্ট পায়, সে-রাজ্যের রাজার নরকবাস হয়।

নারদের কথানুযায়ী—যদি কোন মুর্খ মানুষ কোন অধর্ম বা নিন্দিত কর্ম করে, তাহলে রাজ্যের ক্ষতি ও পাপের

জন্য সে-রাজ্যের রাজাই দায়ী হন। কথায় আছে—রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। শ্রীরাম বেদ ও ধর্মানুসারে রাজ্য চালাতেন। প্রজাদেরও সৎপথে চলার প্রেরণা দিতেন।

একদা অযোধ্যার রাজসভায় গুরু বশিষ্ঠ-সহ শ্রীরাম বিরাজমান আছেন। ব্রাহ্মণ এবং নগরবাসীরাও উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় মানুষের জন্ম-মরণ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে শ্রীরাম বলছেন ঃ

"সুনহু সকল পুরজন মম বাণী।
কহহুঁ ন কছু মমতা উর আনী।।
নহিঁ অনীতি নহিঁ কছু প্রভুতাই।
সুনহু করহু জো তুম্হহি সোহাই।।" (৭।৪২।২)

—*হে নাগরিকগণ! আমার কথা শুনুন। আমি হৃদয়ে মমতা রেখে বা অনীতিমূলক কিছু কথা বলছি না এবং এতে আমার প্রভুতা বা অহং ভাবও নেই। সুতরাং সকলে সঙ্কোচ, ভয় ত্যাগ করে মন দিয়ে আমার কথা শোনার পর যদি ভাল লাগে তা পালন করুন।*

"সোই সেবক প্রিয়তম মম সোই।
মম অনুসাসন মানৈ জোই।।
জৌঁ অনীতি কছু ভাবৌঁ ভাই।
তৌ মোহি বরজহু ভয় বিসরাই।।" (৭।৪২।৩)

—*যে আমার আজ্ঞা পালন করে, সে-ই আমার প্রিয়তম এবং সেবক। হে ভাই! আমি যদি কোন অনীতিমূলক বাক্য বলে থাকি তবে ভয় না করে তার প্রতিবাদ কর।*

এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাদের বলছেন ঃ

"বড়েঁ ভাগ মানুষ তনু পাবা।
সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা।।
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা।
পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁবারা।।" (৭।৪২।৪)

—*বহু ভাগ্যে এই মানবশরীর লাভ হয়েছে। মানবশরীর লাভ করা দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। এই শরীর সাধন-ভজন ও মোক্ষলাভের দ্বারস্বরূপ। এমন দুর্লভ মানবশরীর পেয়েও যে মুক্তিলাভের চেষ্টা না করে সে দুঃখের ভাগী হয়।*

"জো ন তরৈ ভব সাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই।।" (৭।৪৪)

—*যে-মানুষ এমন সাধনযোগ্য মানবশরীর লাভ করেও ভবসাগর পারের চেষ্টা না করে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করে। সে তখন আত্মহত্যাকারীর গতিপ্রাপ্ত হয়।*

লোকরঞ্জন বা প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্তই শ্রীরামের জীবনধারণ। লোকশিক্ষা ও প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি রাজ্য এবং নিজপত্নী সীতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যখন বনবাসে, তখনো সুমন্ত্রকে উপদেশ দিয়ে বলছেন ঃ

"কহব সন্দেসু ভরত কে আয়েঁ।
নীতি ন তজিঅ রাজপদু পায়েঁ।।
পালেহু প্রজহি করম মন বাণী।
সেয়েহু মাতু সকল সম জানী।। (২।১৫১।২)

—*ভরত অযোধ্যায় এলে তাকে আমার কথা ও উপদেশ শোনাবেন এবং বলবেন, সে যেন রাজপদ লাভ করে নীতি ও ও কর্তব্য না ত্যাগ করে। কায়মনোবাক্যে প্রজাদের পালন ও মাতাদের যেন সেবা করে।*

রাজনীতির আধার বা আশ্রয় একমাত্র ধর্মই হওয়া উচিত। ধর্মহীন রাজনীতি মানুষকে দানবে পরিণত করে। ধর্মরাজ্যই শ্রীরামের রাজ্য এবং অধর্মরাজ্য রাবণের রাজ্য। রাজা স্বয়ং যখন ধার্মিক, পরোপকারী ও উদার চরিত্রের হন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রজাদের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দুর্গুণসমূহ নাশ হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সূচিত হয় এবং সব সমস্যার সমাধান হয়। ধর্মরাজ্য স্থাপন হলে মানুষের লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও সঙ্ঘর্ষের অবসান হয়। ধর্মহীন রাজনীতি অশান্তি ও অকল্যাণ ডেকে আনে।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে দণ্ড বা লাঠি কেবল সন্ন্যাসীর হাতে, কেননা অপরাধ বা চুরি-ডাকাতি করার কোন লোকই নেই। রাজ্যে কোন শত্রু নেই, তাই জয়ের কোন প্রশ্নই নেই। শুধু নিজের মনকে জয় করা চাই। সবকিছু অনুকূলে থাকায় ভেদনীতির প্রয়োজন নেই। কেবল সুর, তাল ও লয়ে ভেদ আছে। অর্থাৎ রামরাজ্যে আছে সাম ও দান, কিন্তু দণ্ড ও ভেদনীতির প্রয়োজন নেই—

"দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নর্তক নৃত্য সমাজ।
জীতহু মনহি সুনিঅ অস রামচন্দ্র কেঁ রাজ।।" (৭।২২)

রামরাজ্যে প্রজাগণ কিরকম ধর্মপরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল, 'রামচরিতমানস'-এ তার সুন্দর বর্ণনা আছে—

"চারিউ চরন ধর্ম জগ মাঁহী।
পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ।।
রাম ভগতি রত নর অরু নারী।
সকল পরম গতি কে অধিকারী।।" (৭।২০।২)

—*চারপাদ (সত্য, শৌচ, দয়া, দান) ধর্ম ছিল। স্বপ্নেও কেউ পাপ কাজ করত না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই রামভক্তিপরায়ণ ও মোক্ষাধিকারী ছিল।*

"বরণাশ্রম নিজ নিজ ধরমনিরত বেদ পথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখহি নহি ভয় সোক ন রোগ।।" (৭।২০)

—*সকলে নিজ নিজ স্বধর্মপালনে তৎপর ছিল। শাস্ত্রানুযায়ী জীবনযাপন করত। সর্বদা সুখ বিরাজ করত। ভয়, দুঃখ এবং রোগ ছিল না।*

"অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা।
সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা।।
নহিঁ দরিদ্র কোই দুখী ন দীনা।
নহি কোই অবুধ ন লচ্ছনহীনা।। (৭।২০।৩)

—অকালমৃত্যু, পীড়াদি কারো হতো না, সমস্ত মানুষ নিরোগ ও সুন্দর ছিল। দীন, দুঃখী, দরিদ্র, মূর্খ মানুষ ছিল না। সকল মানুষ সুলক্ষণযুক্ত ও জ্ঞানী ছিল।

"দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা।
রাম রাজ নহিঁ কাহুহিঁ ব্যাপা।।
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতি।
চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতি।।" (৭।২০।১)

—ত্রিতাপে কেউ তাপিত হতো না। মানুষের মধ্যে প্রীতি ছিল এবং সকলে শ্রুতি-নীতি অনুযায়ী স্বধর্ম পালন করত।

"সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী।
নর অরু নারী চতুর সব গুণী।।
সব গুণগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী।
সব কৃতগ্য নহিঁ কপট সয়ানী।।" (৭।২০।৪)

—সকল মানুষ নিরহঙ্কার, ধর্মরত ও পুণ্যবান ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ছিলেন। সকলে কৃতজ্ঞ, অকপট এবং বিবেকবান ছিলেন।

'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ আছে, যে-রাজ্যে রামচন্দ্রকে রাজা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, সে-রাজ্য জঙ্গলে পরিণত হয়। যেখানে রাম বাস করেন, জঙ্গল হলেও তা রাষ্ট্র বা রাজ্যে পরিণত হয়—

"ন হি তদ্‌ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।
তদ্ বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি।।" (২।৩৭।২৯)

'রামচরিতমানস'-এও আছে—

"অবধ তঁহা জহঁ রাম নিবাসূ।
তহঁই দিবসু জহঁ ভানু প্রকাসূ।।" (২।৭৩।২)

—রাম যেখানে, অযোধ্যাও সেখানে। যেমন সূর্যের প্রকাশ যেখানে দিবস সেখানে।

রাম-রাবণ যুদ্ধের কারণ শুধু সীতাহরণ বা শূর্পণখার নাক কাটা নয়, এসব কারণ নিমিত্তমাত্র। আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মরাজ্য স্থাপন, সাধু ও ভক্তের মহিমা প্রচার। যদি আমরা ধর্মকে রক্ষা করি, তাহলে ধর্মও আমাদের রক্ষা করবেন। যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়—এই কথা ভারতের প্রাণের কথা ও চিরন্তন আদর্শ। রামরাজ্য বিশ্বভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন ও উদারতার প্রতীক। রামরাজ্য সুখশান্তি ও আদর্শ রাজতন্ত্রের প্রতীক।

ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য রাজনীতি থেকে ধর্মকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতির আধার একমাত্র ধর্মই হওয়া উচিত, কেননা ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিতে দশের ও দেশের কল্যাণ হয়।

'রামচরিতমানস'-এ ধর্মরথের বর্ণনায় রামচন্দ্র বিভীষণকে বলছেন ঃ

"সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা।
জেহিঁ জয় হোই সো স্যন্দন আনা।।" (৬।৭৯।২)

—হে সখা! যেভাবে বিজয়লাভ হয়, সেরূপ রথের বর্ণনা শোন—

"সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা।
সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা।।" (৬।৭৯।৩)

—শৌর্য এবং ধৈর্য হলো এই রথের চাকা। সত্য, সদাচার, চরিত্র ইত্যাদি হলো রথের ধ্বজা এবং পতাকা।

"বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে।
ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে।।" (৬।৭৯।৩)

—বল, বিবেক, দম (ইন্দ্রিয়সংযম) ও পরোপকার হলো রথের ঘোড়া। ক্ষমা, দয়া এবং সমতারূপ দড়িতে ঘোড়াগুলি রথের সঙ্গে যুক্ত আছে।

এইভাবে ঈশ্বরভজনকে রথীর সঙ্গে, বৈরাগ্যকে ঢালের সঙ্গে, সন্তোষকে তরবারির সঙ্গে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রচণ্ড শক্তি ও ধনুর সঙ্গে, শম-যম-নিয়মকে বাণের সঙ্গে এবং গুরুপূজাকে কবচের সঙ্গে তুলনা করে শ্রীরাম বলছেন ঃ

"সখা ধর্মময় অস রথ জাঁকে।
জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তাকেঁ।।" (৬।৭৯।৬)

—হে সখা! এইরকম ধর্মময় রথ যাঁর কাছে থাকে, তাঁর কখনো পরাজয় হয় না।

তাৎপর্য হলো, রাবণকে হারানো একমাত্র জয় নয় কিন্তু সংসাররূপী অজেয় শত্রুকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিকে) যে জয় করতে পারে, সে-ই প্রকৃত বীর।

"মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর।
জাকেঁ অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতি ধীর।।" (৬।৮০)

—হে বুদ্ধিমান সখা, যাঁর কাছে এইরকম দৃঢ় রথ বর্তমান থাকে সেই বীর এবং সেই সংসাররূপী (জন্ম-মৃত্যু) দুর্জয় শত্রুকে জয় করতে পারে।

তুলসীদাস তাঁর 'বিনয় পত্রিকা'য় বলেছেন—"শরীররূপী ব্রহ্মাণ্ডে মনের বৃত্তিসমূহ যেন লঙ্কা দুর্গ। মনরূপী ময়দানব এটি রচনা করেছেন। পঞ্চকোশ হলো মহল এবং তিনগুণ যেন সেনাপতি। দেহাভিমান হলো সমুদ্র, মোহ, অহঙ্কার এবং কাম যেন রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ। ইন্দ্রিয়গণ এবং অন্যান্য দুর্গুণসমূহ যেন রাক্ষস-রাক্ষসী। জীবরূপী বিভীষণ রাক্ষসের রাজ্যে ভয়ে বাস করেন। জ্ঞানরূপ দশরথ ও ভক্তিরূপিণী কৌশল্যার প্রার্থনায় শ্রীরাম অবতার রূপ পরিগ্রহ করেন। ব্যবহারিক জ্ঞান-রূপ সুগ্রীব সমুদ্রে সেতুনির্মাণে সহায়তা করেন। বৈরাগ্যরূপী হনুমান লঙ্কা দুর্গকে জ্বালিয়ে ছারখার করেন। রাম-রাবণ যুদ্ধে রাক্ষসদের নাশ হলে জীবরূপ বিভীষণ

লঙ্কা দুর্গের রাজা হন। তাৎপর্য হলো যে, শ্রীরাম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলে অন্তরের দুর্গুণসমূহ নাশ হয়। অসুরনাশে দেবতাদের সাম্রাজ্য বা রামরাজ্য গড়ে ওঠে।

রাজ্য ও শাসনক্ষমতা উৎকৃষ্টতম অধিকারীর হাতে থাকা উচিত, অন্যথায় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। গুরু বশিষ্ঠদেব ভরতকে রাজ্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলে ভরত বলছেন ঃ

"কহউঁ সাচুঁ সব সুনি পতিআহু।
চাহিঅ ধরমসীল নরনাহু।।
মোহি রাজু হঠি দেইহহু জবহীঁ।
রসা রসাতল জাইহি তবহীঁ।। (২।১৭৮।১)

—আমি সত্য বলছি আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন, ধর্মশীল ব্যক্তিকেই রাজা করা উচিত। আপনি (গুরুদেব) আমাকে যদি রাজ্যভার গ্রহণে বাধ্য করেন তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।

ভরতের মহান ত্যাগ, নিস্পৃহতা, সংযম ও সাধনায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে দৃঢ়ব্রত হলে তাঁর আদেশে ভরত বাধ্য হয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজত্ব চালাতে থাকেন। রাজ্য, সম্পত্তি সবকিছু রামের, আমি তাঁর দাস, ভৃত্যমাত্র—এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করে ভরত জটা-বল্কল পরিধান ও ফলমূল মাত্র আহার করে চোদ্দবছর যাবৎ রামরাজ্য রক্ষা করতে থাকেন। লোভ এবং কামনা-বাসনার নাশেই ঠিক ঠিক রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভরত ত্যাগ ও সংযমের প্রতীক।

ভরতের পরম আত্মত্যাগ ও রামের প্রতি একান্ত প্রেম থাকায় অযোধ্যায় আদর্শ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। ভারতের সংস্কৃতি সত্যানুরাগী, ধর্মবোধের দ্বারা গঠিত। স্বামীজী বলেছেন, আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূল-ভিত্তি একমাত্র ধর্ম। সত্যানুরাগী রামচন্দ্র যা বিশ্বাস করতেন সত্য বলে, বিনা দ্বিধায় তার জন্য জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। সত্যের উপাসক তিনি। তিনি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। সর্বত্রই তিনি আদর্শ স্থাপন করেছেন। প্রজার সুখে এবং হিতে রাজার সুখ ও হিত। রাজার প্রিয় জিনিস বা কর্ম হিত নয়, প্রজাদের প্রিয়ই হিত। সত্যের জন্য ত্যাগ, জীবনব্যাপী তপস্যা, প্রজার কল্যাণে রাজধর্ম পালন—এই হলো ভারতবর্ষের আদর্শ। বর্তমানে এই আদর্শ লুপ্ত হতে চলেছে। আমরা অনেকেই শপথ নিয়ে থাকি, কিন্তু শপথের মর্যাদা দিই না। শ্রীরামের সমান নীতিবান ও চরিত্রবান রাজা পৃথিবীতে দুর্লভ। 'রামচরিতমানস'-এ বশিষ্ঠদেব ভরতকে বলছেন ঃ

"নীতি প্রীতি পরমারথ স্বারথু।
কোউ ন রাম সম জান জথারথু।।" (২।২৫৩।৩)

—নীতি, প্রেম, পরমার্থ, স্বার্থ (সমষ্টির কল্যাণ) শ্রীরামের মতো যথার্থভাবে আর কেউ জানেন না।

শুক্রাচার্য তাঁর 'নীতিসার'-এ বলছেন ঃ

"আত্মানং প্রথমং রাজা বিনয়েনোপপাদয়েৎ।"
(১।৯২)

—প্রথমে রাজার পরম ধর্মাত্মা, নীতিবান এবং বিনয়ী হওয়া আবশ্যক।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখই অন্নাদি গ্রহণ করে এবং সমস্ত অঙ্গকে সমানভাবে পোষণ করে বলে মুখকে প্রধান বলা হয়। রাজ্যে রাজা কর ও উপহারাদি গ্রহণপূর্বক সমস্ত প্রজার পালনপোষণের ভার নেন এবং সকলকে সমানভাবে দেখেন। 'রামচরিতমানস'-এ তুলসীদাস রামচন্দ্রকে রাজনীতি-সারসর্বস্ব আখ্যা দিয়ে মুখের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

"সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিবু হোই।"
(২।৩০৬)

—সেবক যেন হাত, পা, চক্ষু এবং প্রভু যেন মুখ।

অন্তর্জগতের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির জন্য ধর্ম প্রয়োজন, আবার বাহ্যজগতের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির জন্য রাজ্যের প্রয়োজন হয়। মানুষের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি তথা কল্যাণের জন্য দুয়েরই প্রয়োজন। ধর্মরক্ষার জন্যই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, আবার রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে। ধর্মহীন রাজ্য রাবণের রাজ্য—অন্যায়, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলের রাজ্য। ধর্মযুক্ত রাজ্য রামের রাজ্য—ন্যায়, নীতি ও শান্তির রাজ্য। ভারতীয় রাজনীতির আদর্শ হলো, তা 'সর্বজনহিতায়' এবং 'সর্বজনসুখায়'। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—

"ন বৈ রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্।।" (৫৯।১৪)

—যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়েই ধার্মিক হয়, সেখানে কেউ কাউকে শোষণ করে না। একে অপরের রক্ষক, পালক ও হিতকারী হয়।

ধর্মরক্ষার জন্য রাজধর্ম এবং রাজনীতি রক্ষার জন্য ধর্ম প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে—

"ধর্মেণ রাজ্যং লভতে মনুষ্যঃ
স্বর্গং চ ধর্মেণ নরঃ প্রয়াতি।
আয়ুশ্চ কীর্ত্তিং চ তপশ্চ ধর্মং
ধর্মেণ মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ।।"

—মানুষ ধর্মের দ্বারাই রাজ্যলাভ করে। ধর্ম থেকেই স্বর্গ, আয়ু, কীর্তি, তপ এবং মোক্ষ লাভ হয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণে দেখা যায়, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য ও রাজনীতি দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দৈত্যরাজ বলির রাজ্য ও রাজনীতি পরিচালনা

করতেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। ভগবান রামচন্দ্র নিজ গুরু বশিষ্ঠের নির্দেশে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিচালনার সহায়ক ছিলেন কৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও বিদুর। ছত্রপতি শিবাজীর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন সমর্থ রামদাস। প্রাচীন ভারতে বহু উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞ এবং দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদেও জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ উপযুক্ত রাজনীতিবিদ্ ও বৈদান্তিক মহাপুরুষের উল্লেখ আছে। ধর্ম ও ধর্মরাজ্য রক্ষার জন্যই ভগবানকে যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়। 'রামচরিতমানস'-এ আছে—

"জব জব হোই ধরম কৈ হানী।
বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী।।...
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা।
হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন পীরা।।" (১।১২০।৩-৪)

স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ রাজ্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়যুগের সভ্যতা, বৈশ্যযুগের প্রসারণক্ষমতা এবং শূদ্রযুগের সেবা ও সমানতার ভাবের সমন্বয়ে যে-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তা হয় আদর্শ রাষ্ট্র।"

ভরতের দিব্য প্রেম ও আত্মত্যাগ, লক্ষ্মণের শৌর্য-বীর্য, মহাবীর হনুমানের দিব্য সেবা এবং রামচন্দ্রের অনুপম করুণা ও উদারতায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ❑

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—সম্পাদক

শব্দচেতনা ২৩
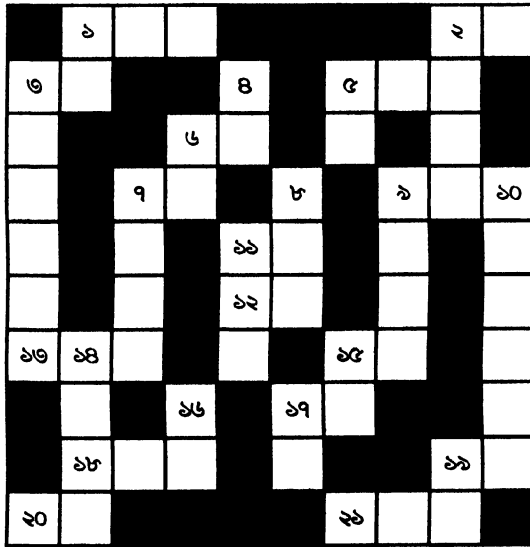
পাশাপাশি ঃ (১) নুনের পুতুল যা মাপতে গিয়েছিল (২) "যিনি —— তিনিই কৃষ্ণ" (৩) লীলার সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (৫) "—— গুরু সিদ্ধ যোগী" (নজরুল) (৬) এই 'আমি'-কেই দরকার (৭) "মানুষ কাম কাঞ্চনের ——" (৯) ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যা (১১) "—— তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ" (নজরুল) (১২) এই তীর্থেই ক্ষুদিরাম স্বপ্নে গদাধর দর্শন করেন (১৩) "আলু পটল সিদ্ধ হলে —— হয়" (১৫) রামচন্দ্র দত্ত এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "—— তো ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত।" (কথামৃত) (১৭) এই শক্তিই আছেন সকল নারীর মধ্যে (১৮) "অনেক মদ খেলে খুড়া-জ্যাঠা বোধ থাকে না, তাদেরই বলে ফেলে, তোর ——।" (১৯) "সুরা —— করিনে আমি" (কথামৃত) (২০) "——এ এসেছে কার কামিনী।" (কথামৃত) (২১) একেও ভবতারিণী-জ্ঞানে ঠাকুর মায়ের নৈবেদ্য থেকে খাইয়েছিলেন।

ওপর-নিচ ঃ (১) এমন কথাই কলির তপস্যা (২) দক্ষিণেশ্বরে এই মূর্তিকে ঠাকুর বাৎসল্যভাবে সেবা করতেন (৩) জ্ঞানীকে এর সাহায্যেই বিচার করতে হয় (৪) "—— মাটি" (৫) "অনন্ত মত, অনন্ত ——" (৬) "——মুক্ত শিব" (৭) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গৃহী ভক্ত (৮) "আজীবনং বহুকৃতং —— স্বদেহে" (শ্রীরামকৃষ্ণসুপ্রভাতম্) (৯) "—— মালটি আছে" (১০) পাপ-পতিতকে উদ্ধার করেন বলেই ঠাকুরের এই নাম (১১) "প্রাণার্পণ —— তারণ" (শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন) (১৪) এই গুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজে জড়ায় (১৫) —— দুইপ্রকার, পরা ও অপরা (১৬) কারো মধ্যে ক্ষীরের, কারো মধ্যে কলাইয়ের —— (১৭) "—— ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" (১৯) কৃপাবাতাস বইছেই, শুধু —— তুলে দিতে হবে।

শিশির রায়

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

আতাতুর্কের দেশে

স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ, যাঁকে স্বামীজী 'গ্যাঞ্জেস' (গঙ্গাধর→গঙ্গা→গ্যাঞ্জেস) বলে ডাকতেন, একদিন একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর কাছে স্বামীজী ছিলেন আরাধ্য দেবতার মতো। মহারাজ সেই স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

"দেখলুম, স্বামীজী প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকিরের দেহ—কোমরে লোহার শিকল, পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চারজন শিষ্য। জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'এরকম বেশ কেন?'

স্বামীজী বললেন ঃ 'এরকম শরীর নইলে কাজ করব কি করে? তোদের বাঙলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে, জানলি? আমি বসে নেই। আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদারতার ভাব ছড়াচ্ছি। তাই এদের ফকির সেজে এদের সঙ্গে মিশি।'

—'ওরা কারা?'

এক এক করে চারজনকে দেখাতে দেখাতে বললেন ঃ 'ইরান, তুরান, খোরাসান, আফগান।'

—'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?'

—'এইরকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।'

—'এখন তুমি কি করতে চাও?'

—'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয় তাই করতে চাই। বেদ মহাভারত পড়ে দ্যাখ, এরা তোদেরই জাতভাই। কিন্তু আরেকটা শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করছে, যাতে সেটা না ঘটে ওঠে।' "

> সাম্প্রতিক আমেরিকা-ইরাক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য মহল যে-পরিণতির কথাই ভাবুন না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ত্যাগী-গৃহী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের ধারণা—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গ পশ্চিমী ইসলাম জগৎকেও প্লাবিত করবে। সেই ইঙ্গিতই এই দিব্য স্বপ্নে পাওয়া যায়।

তুরস্ক [TURKEY]

আমন্ত্রণ

তুরস্কের যে-অংশ 'মধ্য আনাতোলিয়া' নামে পরিচিত, তার পূর্বে অবস্থিত 'সিবাস' নামে একটি শহর। এই শহরেই রয়েছে 'চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়'। সেখানকার অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ ফেরিট কোকোগ্লু ৬ মে ২০০২ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে আমন্ত্রণ জানান তাঁদের এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য। সম্মেলনটি হবে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২। বিষয়—'শান্তির জন্য মতবিনিময় ঃ সার্বজনীন ঐক্যের লক্ষ্যে ধর্মের অবদান' ('Dialogue for Peace: The Contribution of Religions to Living Together')। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় প্রতিনিধিকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, সম্মেলনে পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
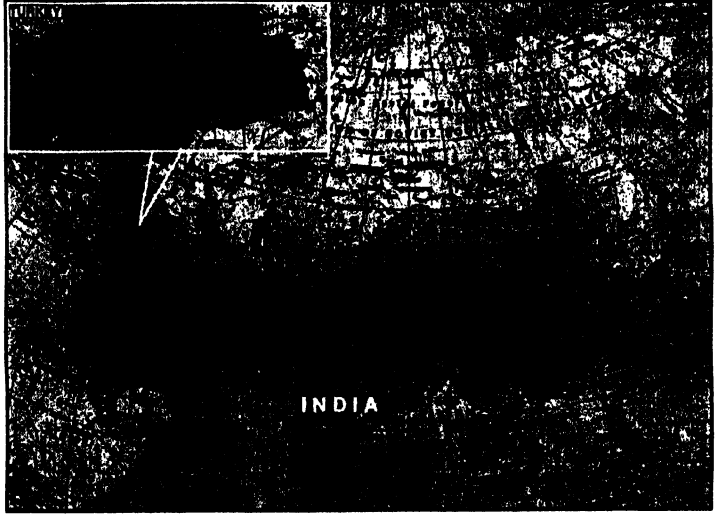
প্রস্তুতি

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক মহারাজ চিঠিটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহারাজ বা অন্য কোন উচ্চ পদাধিকারী সন্ন্যাসীরই যাওয়া উচিত।

সেই সময় সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ছিলেন ব্রাজিলে। মঠ থেকে সহকারী সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ব্রাজিলে ইন্টারনেট, টেলিফোন প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পাদক মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। একটু দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি রাজি হলেন যেতে। পরে জানালেন, যেহেতু সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় যেতে হবে,

তাই সঙ্গে একজন সহকারী থাকলে সুবিধা হয়—অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমতি-সাপেক্ষে।

ল্যাটিন আমেরিকা সফর সেরে স্বামী স্মরণানন্দজী ১৯ জুন ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। চুমহরিয়তের অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় বিশদ বিবরণ ও যাত্রাপথ সম্বন্ধীয় সংবাদ-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চিঠি এসেছিল ১৭ জুন। সহকারী সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতিও এসে গেল। উষ্ণ আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি আরো লিখেছেন, দুজনেরই যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদি তাঁরা করবেন; আগে থেকে জানিয়ে দিলে লোক ও গাড়ি পাঠিয়ে বিমান-বন্দর থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

সহকারী হিসাবে আমার যাওয়া ঠিক হলো। ব্যবস্থা হলো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পাসপোর্টের। নতুন দিল্লিতে অবস্থিত তুরস্কের দূতাবাস থেকে ভিসার ব্যবস্থাও হলো।

ঠিক হলো, ৯ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দিল্লি পৌঁছানো হবে। কয়েক ঘণ্টা রামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লি কেন্দ্রে কাটিয়ে রাত ১২.৫০-এ KLM Royal Dutch Airlines-এর বিমানে আমস্টারডাম হয়ে ১০ সেপ্টেম্বর এই কোম্পানির বিমানে পৌঁছাতে হবে ইস্তাম্বুল। সেখান থেকে Turkish Airlines-এর বিমানে যেতে হবে কেয়সরি। শেষ ১৯৪ কিলোমিটার গাড়িতে। তবেই গন্তব্যস্থল 'সিবাস' শহরে পৌঁছানো যাবে।

প্রাচীন বিদ্যাচর্চার স্থান—গোক মেদ্রেসে

ভারতের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডসের সময়ের পার্থক্য ৪½ ঘণ্টা। আর নেদারল্যাণ্ডসের সঙ্গে তুরস্কের সময়ের পার্থক্য ১ ঘণ্টা। কাজেই সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় বিমানে বা বিমানবন্দরে কিংবা রাস্তায় থাকতে হবে। ইস্তাম্বুল যাওয়ার সুবিধাজনক অন্য যাত্রাপথ না পাওয়ায় অতটা পশ্চিমে আমস্টারডাম গিয়ে আবার পূর্বে ইস্তাম্বুল পৌঁছানোর এই রুটই ঠিক হলো।

তুরস্ক

তুরস্কের অবস্থান এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থলে। এই দেশকে বেষ্টন করে আছে গ্রিস, বুলগেরিয়া, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া। তুরস্ক ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় বসপোরাস প্রণালীতে এশিয়া ও ইউরোপকে সংযুক্ত করেছে। মোটামুটিভাবে দেশটির বিস্তার উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০ মাইল। বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে তুষারাবৃত পর্বতমালা, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত স্বর্ণাভ বালুকাবৃত উপকূল-রেখা, ঘন সবুজে ঢাকা উপত্যকা ও বিশাল অনুর্বর ক্ষেত্র। সমস্ত ভূখণ্ডটি প্রধানত পার্বত্য অঞ্চলে পূর্ণ। সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট আরারতের উচ্চতা ৫,১৬৫ মিটার (১৭,২১৭ ফুট)। বিশ্বাস করা হয় যে, বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এ বর্ণিত মহাপ্রলয়ের পর নোয়ার পোত এখানেই এসে ঠেকেছিল। এদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ৬৭.৬ মিলিয়ন। রাজধানী আঙ্কারা। মুদ্রা হলো তুর্কি লিরা। সংবিধান অনুযায়ী এটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশের ৯৯ শতাংশ লোক মুসলমান। বাকি ১ শতাংশের মধ্যে রয়েছে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা। প্রধান তিন ভাষা হলো তুর্কি, কুর্দিশ ও আরবি। তবে তুর্কির ব্যবহারই বেশি।

তুরস্ক অর্থাৎ আনাতোলিয়া এশিয়ার এক প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। প্রথমে 'বাইজেনটিয়াম' ও পরে 'কনস্ট্যান্টিনোপল' নামে পরিচিত থাকার পর বর্তমানে 'ইস্তাম্বুল' নামে পরিচিত হয়েছে এদেশের বৃহত্তম শহরটি।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা এই বৃহত্তম শহরটি দখল করে তুর্ক সাম্রাজ্য স্থাপনা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এই সাম্রাজ্য বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, জর্ডন, ইজরায়েল, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও এজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯২৩-এ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র দেশ হিসাবে পরিবর্তিত হয়।

ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম দেশ হলো তুরস্ক। প্রশাসনিক দিক থেকে এই দেশ ৮১টি রাজ্যে বিভক্ত। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, শুষ্ক ও গরম গ্রীষ্মকাল এবং মৃদু বৃষ্টিপাত-সহ শীতকাল। কোথাও কোথাও শীতের প্রকোপ তীব্র থাকে।
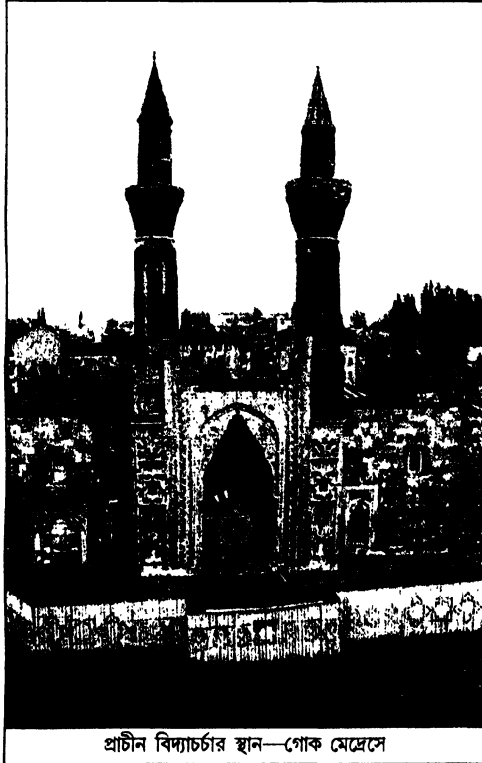
এদেশে শিক্ষিত লোকের হার গড়ে ৮২.৩ শতাংশ। তার মধ্যে পুরুষ ৯১.৭ শতাংশ ও মহিলা ৭২.৪ শতাংশ। আমেরিকান ডলারের সঙ্গে তুর্কি লিরার বিনিময় হার এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে। মনোরমা ইয়ার বুক ২০০২-এর তথ্য অনুযায়ী ১ আমেরিকান ডলার = ৬,৬৯,০৩৫ তুর্কি লিরা।

তুর্কি পুরুষ-স্ত্রী উভয়েরই অবয়ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সুদর্শন। প্রায় সকলেই শ্বেতাঙ্গ হলেও দুধে-আলতা রং বললে ঠিক হবে। যদিও এদেশের ৯৯ শতাংশ লোক মুসলমান, কিন্তু এদের সাজ-পোশাক, মেলামেশা, আচার-ব্যবহার সবই পুরোপুরি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। বোরখা-আবৃত স্ত্রীলোক খুব কমই দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যেও মুসলমান ধর্মের রীতি অনুযায়ী দাড়ি-গোঁফ রাখা বা পোশাকের ব্যবহার প্রায় নেই।

তুরস্ক সম্বন্ধে বলা কখনোই সম্পূর্ণ হবে না যদি মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে না বলা হয়। তিনিই হলেন বর্তমান তুরস্কের রূপকার। এদেশের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, তাঁর ছবি বা তৈলচিত্র দেখা যাবেই। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সালোনিকায় (গ্রিসের এক তুর্কি-অধ্যুষিত শহর) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল 'মুস্তাফা'। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর ডাকনাম দেওয়া হয় 'কামাল', অর্থাৎ 'পূর্ণতা' (perfection)। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি গ্যালিপোল্লির যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পরিচালন দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯২০-তে তিনি 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি'-র অধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হন। তিনি তুরস্কে বিভিন্ন বিষয়ে নানা পরিবর্তন সাধন করেন। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে—১৯৩৪-এ স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের নিয়ম চালু। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সে এই অধিকার প্রথা শুরু হয় ১৯৪৪-এ। আতাতুর্ক তুরস্কে ফেজ টুপির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন এবং প্রথাগত পোশাকের বদলে পাশ্চাত্য পোশাকের ব্যবহার চালু করেন। শুরু করেন ল্যাটিন বর্ণমালার ব্যবহার। তিনি আইন সংক্রান্ত নতুন নিয়মাবলীর প্রবর্তন করেন এবং তুরস্ককে এক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তুরস্কে তিনি হলেন সবচেয়ে শ্রদ্ধার ব্যক্তি। তুরস্কের মানুষদের নামের সঙ্গে একটি পদবি নেওয়ার প্রথা রয়েছে। মুস্তাফা কামাল তাঁর পদবি নেন 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ 'তুর্কীদের জনক'। প্রতি বছর ১০ নভেম্বর সকাল ৯.০৫-এ তাঁর প্রয়াণ-মুহূর্তে দেশজুড়ে নীরবতা পালন করা হয়।

যাত্রা শুরু

৯ সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সকাল ৭টার IC 263 বিমানে রওনা দিয়ে স্বামী স্মরণানন্দজী ও আমি দিল্লি পৌঁছালাম সকাল ৯টায়। মিশনের দিল্লি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী ও তাঁর সহকারী স্বামী গণদেবানন্দজী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। আশ্রমে কাটাতে হবে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

আমস্টারডামের উড়ান রাত ১২.৫০-এ। রাত ৯টায় আহারাদি সেরে ৯.৩৫ নাগাদ বিমানবন্দরের উদ্দেশে আমরা রওনা দিলাম। সঙ্গে স্বামী গোকুলানন্দজী ও স্বামী গণদেবানন্দজী। গোকুলানন্দজীর পরিচিত ভক্ত এয়ারপোর্ট ম্যানেজার সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। দিল্লি-আমস্টারডাম উড়ান KL 872-এর যাত্রীদের জন্য চেক ইন-এর ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। লাউঞ্জে যাত্রীদের বিশাল লাইন। বিমানকর্মীর সহায়তায় এই পর্বের কাজকর্ম শীঘ্র হয়ে গেল। বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার জন্য KLM Royal Dutch Airlines-এর কাউন্টারে গেলাম। যেহেতু এই একই কোম্পানির বিমানে আমস্টারডাম থেকে ইস্তাম্বুল যেতে হবে, তাই সব লাগেজ সরাসরি ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বুক করে দিলাম। পাসপোর্ট, ভিসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি দেখে কাউন্টার থেকে আমাদের বোর্ডিং কার্ড দিল। আমস্টারডাম থেকে শুধু উড়ানে চড়লেই হলো। মালপত্র নিয়ে ভাবার কিছু নেই।
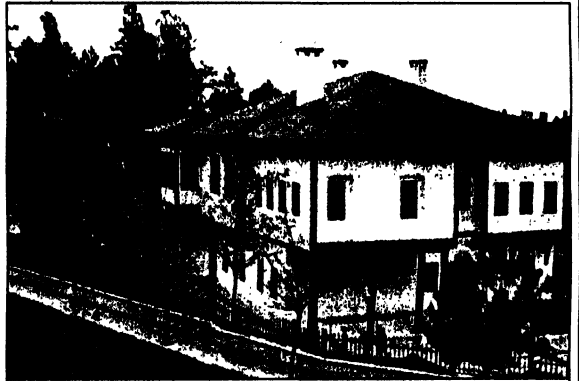
প্রাচীনকালের ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি—আবদি আগা কোনাগি

রাত ১২টায় গোকুলানন্দজী ও গণদেবানন্দজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানের উদ্দেশে এগিয়ে গেলাম। অভিভাসন-ছাড়পত্র ও অন্যান্য কাজকর্ম সেরে বিমানের মধ্যে সংরক্ষিত আসনে বসলাম।

বিমান ছাড়ার কথা রাত ১২.৫০-এ। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই ইংরেজি মতে তারিখ পাল্টে ১০ সেপ্টেম্বর হয়ে গেছে। বিমান উড়তে প্রায় ১ ঘণ্টা দেরি হলো। ঘোষণা করা হলো—যেহেতু তখনি যাত্রা করলে আমস্টারডামে ভোর থাকতেই পৌঁছে যাব, তাই একটু দেরিতে রওনা দেওয়া হচ্ছে। দিল্লি থেকে আমস্টারডাম পৌঁছাতে সময় লাগবে ৭ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। প্রায় পৌনে দুটোয় বিমান উড়ল।

নেদারল্যাণ্ডসের সময় সকাল ৬.২০-তে 'স্কিপহোল' বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। বিমান থেকে দেখা গেল খুব সাজানো সুন্দর শহর। আমাদের বিমানবন্দরের লাউঞ্জেই

পরবর্তী বিমান ধরার জন্য বসে থাকতে হবে। কারণ, বাইরে যাওয়ার ভিসা নেই। বিশাল বিমানবন্দর। বহু বিমান বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষমাণ।

অন্ধকারের ঘোমটা সরিয়ে সবেমাত্র সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করছেন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। বিমানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বাইরের তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বিমান আসছে F-8 গেট-এ। বিমানেই একটি নির্দেশিকা পেলাম, যাতে আঁকা আছে কিভাবে অন্য গেটে পৌঁছানো যাবে। সুন্দর ব্যবস্থা। নির্দেশাদি ও সাহায্যের ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। লাউঞ্জের বিভিন্ন জায়গা দোকানপাটে ভর্তি। যাত্রীদের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাদির মধ্যে ধ্যানকক্ষও রয়েছে!

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ইস্তাম্বুল। চার ঘণ্টারও বেশি সময় লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে হবে। ঘোষণা হয়ে গেছে, KL 1613 বিমানে ইস্তাম্বুল যাওয়ার যাত্রীদের D-48 নং গেট দিয়ে যেতে হবে। এখন ঐ গেট খোলা নেই। বিমান ছাড়ার ৩৫-৪০ মিনিট আগে খোলা হবে। তাই বসার জন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করা হলো।

বিভিন্ন স্থানের পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্যাবলীর সমঝোতা করতে করতে শরীর অবসন্ন! একটু ঝিমুনিও আসছে। এখনো অনেক পথ বাকি! খাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি সবকিছুর সময় ওলটপালট হয়ে গেছে। বাঁচোয়া যে, এখানে আর মালপত্র নিতে বা 'বুক' করতে হবে না বা নতুন করে 'চেক ইন' ইত্যাদির দরকার নেই!

শিফটে মিনারেলি মেদ্রেসে

সবকিছুর পাট চুকিয়ে বিমানে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। বিমান ছাড়তে দেরি হলো ৫৫ মিনিট। কারণ হিসাবে জানানো হলো যে, দুজন যাত্রী তাঁদের মালপত্র 'চেক ইন' করে বিমানে তুলে দিলেও নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা বিমানে ওঠেননি। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেরকম নাশকতামূলক কাজকর্ম ও সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডব চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থায় যাত্রা করা খুবই বিপজ্জনক। শেষে অবশ্য দুই যাত্রী বিমানে উঠলেন। বিমানও ছাড়ল, তবে তাঁদের আসন গ্রহণে দেরির কারণ জানা গেল না।

আমস্টারডাম থেকে ইস্তাম্বুল উড়ানে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। ইস্তাম্বুল পৌঁছালাম স্থানীয় সময় বিকাল ৩.২৫ মিনিট। বিশাল বিমানবন্দর। সুদৃশ্য বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দিকে। বিমানবন্দরের একাংশে তৈরির কাজ চলছে। বিমানবন্দরের সব বাড়িরই কাঠামো লোহার। কারণ, ইস্তাম্বুল ভীষণভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ। সব কাজকর্ম সেরে ইন্টার-ন্যাশনাল টার্মিনাল থেকে ট্রলিতে মালপত্র নিয়ে ডোমেস্টিক টার্মিনালের দিকে রওনা দিলাম। এখানে দেখলাম, ট্রলি নিতে গেলে ১ আমেরিকান ডলার দিতে হয়।

কাস্টমস-এর পরীক্ষার সময় অফিসার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ও সেখানে যাওয়ার কারণ। যখনি তিনি শুনলেন আমরা সিবাস শহরে চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছি, তিনি খুব সন্তুষ্টচিত্তে এই বলে আমাদের ছেড়ে দিলেন যে, তিনিও ঐ শহরের বাসিন্দা।

ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরের ডোমেস্টিক টার্মিনালটিও অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখান থেকে 'Turkish Airlines'-এর বিমান আমাদের নিয়ে যাবে 'কায়সেরি'। চেক ইন করে লাউঞ্জে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সর্বত্রই পোশাকের জন্য আমাদের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ আমাদের জিজ্ঞাসাই করে বসলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি বা গন্তব্যস্থল কোথায়? ১ ডলার দিয়ে দেড় লিটার পানীয় জল কেনা হলো।

হাতে কিছু সময় আছে। সম্পাদক মহারাজ বললেন বিমানবন্দরে চায়ের কোন স্টল আছে কিনা দেখতে। একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল সুন্দর সব স্টল, কিন্তু লোকজন ভাল ইংরেজি জানে না। চা পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে এক দোকানী প্যাকেট দেখিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিলেন—চাইলে তিনি লিপটন চা তৈরি করে দিতে পারেন। আমরা দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। চা-পানের পর দোকানে ৪ ডলারের নোট দিলাম। ফেরত পেলাম ২২.৫ লক্ষ তুর্কি লিরা। বুঝলাম, এদেশে মুদ্রাস্ফীতির ভীষণরকম প্রভাব চলেছে।

ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে অবতরণের সময় আকাশ থেকে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বিশাল শহরকে খুব সুন্দর দেখা যায়। দূর থেকে চোখে পড়ে, ভূমধ্যসাগরের নোঙর করা রয়েছে বহু জাহাজ; আবার অনেক জাহাজ চলেও যাচ্ছে। জাহাজের যাতায়াতের ফলে ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় ইস্তাম্বুল শহরের বাতাস ভীষণ দূষিত হচ্ছে বলে এখানকার লোকজন খুবই চিন্তিত।

বিকাল ৫.১৫-এ 'Turkish Airways'-এর বিমান আকাশে উড়ল। গন্তব্যস্থল কেয়সরি। এই যাত্রায় বরাবরই বিমানে জানালার ধারের আসন পেয়েছি। এবারও তাই। জানালা দিয়ে দেখা গেল, প্রায় সব জায়গাই উঁচু-নিচু বা পাহাড়ি। চাষবাস, সবুজ খেত বা বন-জঙ্গল কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। শুধুই নেড়া পাহাড় ও শুকনো খেত। সন্ধ্যা হয় হয়। ঘড়িতে সময় ৬.২০। বিমান পৌঁছাল কায়সেরি। বিমান নামার সময় চোখে পড়ল এদেশের বিরাট সামরিক বিমানঘাঁটি। সারিবদ্ধ সেনাছাউনি-সহ বিপুল সংখ্যক সামরিক বিমান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি সেখানে রয়েছে। জায়গাটি পাহাড়ঘেরা। চারপাশের দৃশ্য অতি সুন্দর। এখন চিন্তা—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছেন কিনা!

বিমানবন্দরের অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে হেঁটেই এলাম। অপেক্ষা করছি মালপত্র নেওয়ার জন্য। ভাবছি, এখনো ১৯৪ কিমি. গাড়িতে যেতে হবে! যদি কেউ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে না আসেন, তাহলে আবার বাস বা ট্যাক্সি ধরে যেতে হবে।

১২৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হাসপাতাল বুরুচায় মেদ্রেসে

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি চিঠিতে সম্পাদক মহারাজকে জানানো হয়েছিল যে, অন্যসময় যেকোন পোশাক ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীরা যে-পোশাক পরেন, সেমিনারের সময় তা-ই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এর উত্তরে মহারাজ লিখেছিলেন, আমরা সবসময় দেশে যে-পোশাক ব্যবহার করি, সেই পোশাকেই থাকব।

হঠাৎ লাউঞ্জের বাইরে চোখে পড়ল, একজনের হাতে ধরা রয়েছে একটি প্ল্যাকার্ড, যার ওপর সুন্দর ইংরেজি অক্ষরে বড় বড় করে লেখা—SWAMI SMARANANANDA! মহারাজই প্রথম দেখলেন। চিন্তামুক্ত হওয়া গেল। আমরা দুজনেই হাত নাড়িয়ে আগমনবার্তা জানিয়ে দিলাম। হয়তো আমাদের পোশাকই তা আগে জানিয়ে দিয়েছিল।

সব কাজ সেরে লাউঞ্জ থেকে যখন বাইরে এলাম তখন অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুজন আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। একজন ডঃ হুসেন কক ও অপরজন গাড়ির চালক মেহমেট। তাঁরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ঠিক বিমানবন্দরের বাইরে গাড়ি রাখা ছিল। মালপত্র গাড়িতে তোলা হলো। গাড়িতে ওঠার আগেই সোজা সামনে একটি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলো। খুব দূরে নয়। সূর্য অস্তমিত হলেও ঐ আলোতেও দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় বরফের আস্তরণ। তখন বাইরের তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আমাদের নিয়ে গাড়ি ছুটতে শুরু করল। ডঃ হুসেন জানালেন যে, তিনি চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি ডিপার্টমেন্টের (ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগ—তুর্কিতে Ilahiyat Fakultesi) অধ্যাপক। ইংল্যাণ্ডে কয়েক বছর ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলামিক ল' নিয়ে ডক্টরেট করেছেন। কথার মাঝে জানতে চেয়েছিলাম, 'ইসলামিক ল'-এর ব্যবহার এখানকার সমাজজীবনে কিরকম? উত্তরে তিনি জানান, এটি মূলত একটি পাঠ্যবিষয়ে পরিণত হয়েছে।

গাড়ি ছুটছে দ্রুত গতিতে। রাস্তা খুব সুন্দর। শহর ছেড়ে গাড়ি উঠল ফ্রি-ওয়েতে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে জনবসতি। আর দেখা যায় শুষ্ক ধু-ধু মাঠ ও পাহাড়ি জায়গা। কিছু পরে শুরু হলো ঝিরঝির বৃষ্টি। রাস্তায় এক জায়গায় ঠাণ্ডা পানীয় কেনা হলো। শুনলাম, ১৯৪ কিমি. যেতে সময় লাগবে মাত্র দেড় ঘণ্টা! প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। পরে দেখলাম, কথাটি অতিরঞ্জিত নয়। গাড়িতে ডঃ হুসেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল। টানা প্রায় ২৪ ঘণ্টা রাস্তায়! বিশ্রাম নেই। শরীর তা জানিয়েও দিচ্ছে। ডঃ হুসেনকে আমাদের আহারের সম্বন্ধে জানানো হলো। তিনি সেলফোনে হোটেলে জানিয়ে দিলেন। যে-কয়দিন আমরা এদেশে ছিলাম, ডঃ হুসেনই আমাদের দোভাষীর কাজ করেছেন। যখনি আমরা বাইরে বেরিয়েছি, তিনিই ছিলেন আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বৃষ্টির জন্য আমাদের পৌঁছাতে একটু দেরি হলো। রাত ৯টা নাগাদ হোটেলে পৌঁছালাম। শহরের নাম 'সিবাস'। এখনো বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তুর্কিতে 'Hotel' হয়েছে 'Otel'। আমাদের হোটেলের নাম 'Otel Sultan'। বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সম্মেলনের জন্য আগত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো আমাদের। প্রাথমিক নিয়মকানুন সেরে আমাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হলো। ডঃ হুসেন জানিয়ে দিলেন, রাত ৯.২৫ নাগাদ রাতের খাবার পাওয়া যাবে; তার

মধ্যে আমরা যেন তৈরি হয়ে নিই। ডঃ হুসেন ও মেহমেট আমাদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করলেন। তারপর আর বেশি দেরি না করে ঘরে চলে এলাম।

সিবাস এবং চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়

সিবাস শহরটি তুরস্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে 'কিজিলিরম্যাক' বা 'কিজি' নদী। শহরের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪,১৮৩ ফুট। রোমান শাসনকালে এই শহরের পরিচিতি ছিল 'সিবাস্তিয়া' নামে। বাইজান্টাইন সম্রাটের রাজত্বকালে সিবাস্তিয়া ধনসম্পদে পূর্ণ ছিল। খ্রিস্টীয় ১১শ শতকে তুর্কিরা এখানে আসে। 'তুর্কমেন দানিশমেণ্ড' রাজবংশ সিবাস্তিয়া জয় করে ১০৮০-১০৯০ খ্রিস্টাব্দে। তারাই এই শহরের নামকরণ করে 'সিবাস' এবং শহরটিকে রাজধানীতে পরিণত করে। এরপর ১১৭২-এ 'রাম' (Rum)-এর সেলজাক সুলতানের দখলে আসে এই শহর। এই সুলতানদের হাতেই সিবাস সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছায় এবং সেই সময় আনাতোলিয়ার শহরগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহররূপে পরিগণিত হয়। বলা হয় যে, ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে মধ্য-এশিয়া থেকে যখন তৈমুর লং এসে সিবাসে লুঠতরাজ করে, তখন এই শহরে দেড় লক্ষেরও বেশি লোকের বাস ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যে সিবাস ছিল একটি আঞ্চলিক রাজধানী। এই স্থানেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক দ্বিতীয় জাতীয় মহাসভা ডাকেন। সেই মহাসভাই পরিণামে ইউরোপ থেকে আসা বিভিন্ন দখল-দারীদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে অটোমান সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও প্রজাতন্ত্রী তুরস্কের প্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমানে সিবাস শহরের গর্বের বিষয় এই চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে ১১,০০০ একর জমির ওপর অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০০-২০০১-এর বিবরণ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ১৭,০০০; শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,১৭৪ ও ১,১৯১। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হলো 'Faculty of Theology'। এই বিভাগই সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছে। তাতেই আমরা আমন্ত্রিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে রয়েছে উঁচু-নিচু পাহাড়। ভিতরের পরিবেশ সুশৃঙ্খল। যদিও সবুজের বড় অভাব, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর খুব সাজানো-গোছানো। সমস্ত চত্বর জুড়ে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। যখন এগুলি বড় হবে তখন প্রকৃতি আরো সবুজে ভরে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই আছে খুব বড় একটি মসজিদ। নিয়মিত প্রার্থনা হয় সেখানে। শুক্রবারে থাকে বিশেষ প্রার্থনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শনি ও রবিবার বন্ধ থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০২

আমরা সেমিনারের একদিন আগেই পৌঁছে গেছি। রাতে ভাল বিশ্রাম হলো। আগের রাতেই ডঃ হুসেন বলে
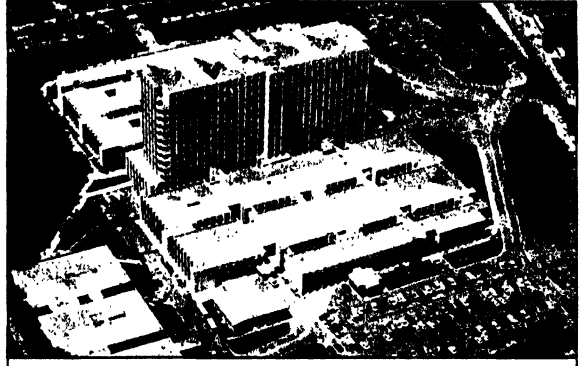
চুমহরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়

গিয়েছিলেন, ১১ তারিখ সকাল ৯.১৫-এ আমাদের নিয়ে যেতে আসবেন। স্নান, প্রাতরাশ সেরে আমরা প্রস্তুত। ঠিক ৯.১৫টায় দরজায় টোকা। ডঃ হুসেন এসে গেছেন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তাঁর গাড়িতেই রওনা দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। এখানে গাড়ি ৯০-১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় চলে, তাই হোটেল থেকে মিনিট সাতেকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেলাম।

তিনি প্রথমেই আমাদের হাজির করলেন থিওলজি বিভাগের ডীন-এর অফিসে। ডীন আবার ইংরেজি জানেন না। ডঃ হুসেনই দোভাষীর কাজ করলেন। আসলে এদেশে মূলত তুর্কিতেই পড়াশোনা হয়। তাই ইংরেজি বলার লোক হয়তো কম। পরপর অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সঙ্গে পরিচয় হলো। সবাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ডঃ হুসেনের অফিসে বসে মহারাজ শিক্ষকদের কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

যেহেতু এদেশের মানুষজন প্রায় সমস্ত বিষয়েই পাশ্চাত্য ভাবকে গ্রহণ করেছেন, তাই প্রথম পরিচয়ে করমর্দন রীতি প্রচলিত। কিন্তু প্রতিটি অফিসেই রয়েছে হাত ধোয়ার জন্য একপ্রকার তরল পদার্থ। তাতে খুব সম্ভবত রেক্টিফায়েড স্পিরিট রয়েছে, যার প্রভাবে হাত জীবাণুমুক্ত হয়। আমাদের যেমন আচমনের জন্য হাতে সামান্য জল নেওয়া হয়, তাঁরা করমর্দনের পর ঐ তরল পদার্থ শিশি থেকে একটু হাতে নিয়ে দু-হাতে মাখিয়ে নেন। আর দ্বিতীয় রীতিটি হলো—যখনি কোন অফিসে কারো সঙ্গে দেখা হবে, তিনি তুর্কি চা বা কফি পানের জন্য অবশ্যই অনুরোধ জানাবেন। অনুরোধ না রাখলে তাঁরা দুঃখ পান। তাই সর্বত্রই গ্রহণ। যে-কয়দিন এদেশে ছিলাম, দিনে কয়েকবার আমাদের চা-পান করতে হতো। চায়ের পাত্রটির চেহারা একটি বড় টিউলিপ ফুলের মতো।

প্রধানত কাচের। তার ওপর থাকে একটি ঢাকনা। সঙ্গে ছোট একটি চামচ ও কিছু চিনির কিউব। তৃতীয় একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। এদেশের মানুষ ভারতবর্ষকে 'হিন্দুস্থান' বলেই জানেন ও কথোপকথনের সময় তা-ই বলে থাকেন। আমাদের যখনি কারো সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে, তা ইংরেজিতেই হোক বা তুর্কিতেই হোক, সবসময় বলা হয়েছে—"এঁরা 'হিন্দুস্থান' থেকে এসেছেন।"

থিওলজি বিভাগের বাড়িটি চারতলা। কিন্তু কোন লিফ্‌ট নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করলে শরীর ভাল থাকবে, তাই এমন ব্যবস্থা!

এরপর ১০.৪৫ নাগাদ ডঃ হুসেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ ফেরিট কোকোগ্লুর অফিসে নিয়ে গেলেন। থিওলজি বিভাগ থেকে বেশ কিছুটা দূরে আরেক বিশাল বাড়িতে এই অফিস। এখানেও লিফ্‌ট চোখে পড়ল না। সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে ওঠা। খবর দেওয়া মাত্রই ডঃ কোকোগ্লু নিজে বাইরে এসে আপ্যায়ন করে আমাদের তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। একটু কথাবার্তার পরই মনে হলো, তিনি আমাদের খুব আপন করে নিয়েছেন। খুব সজ্জন ব্যক্তি। কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ এটি। 'রেক্টর'ও বলা যায়। ভাল ইংরেজি জানেন। তাই কথাবার্তায় সুবিধা হলো। যে-কয়দিন আমরা এখানে ছিলাম, তিনি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। সম্পাদক মহারাজ তাঁকে কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দিলেন। যথারীতি সাক্ষাতের সময় ডঃ কোকোগ্লু চা-পানের অনুরোধ জানালেন। মহারাজ সবিনয়ে বললেন যে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার চা-পান হয়েছে। কিন্তু কিছু তো গ্রহণ করতেই হবে। ঠিক হলো ফলের রস।

কথোপকথনের ফাঁকে প্রশ্ন রেখেছিলাম, আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁরা জানলেন কিভাবে? উত্তরে তিনি জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা বছরের নানা অনুষ্ঠানে বা আলোচনাসভায় বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে প্রধানত মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই যোগ দিয়ে থাকেন। এবারে ঠিক করা হয়েছিল, অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও যেন যোগ দিতে পারেন—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই অফিসে নির্দেশ পাঠানো হয় ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমন্ত্রণ পাঠাতে। কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আমন্ত্রণলিপি পেলেও যোগাযোগ করেনি। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শোনার পর আমাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হলো রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের মাধ্যমে আমন্ত্রণ আসার তাৎপর্য সম্বন্ধে।

ডঃ কোকোগ্লু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় আমাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য বলে দিলেন। অফিসের বাইরে এসে তিনি আমাদের বিদায় জানালেন। একটু পরেই পৌঁছালাম ক্যাফেটেরিয়ায়। দুপুরের আহার সেরে হোটেলে ফিরলাম ১.৩০ নাগাদ। ডঃ হুসেন জানালেন, ২.৩০ নাগাদ তিনি আমাদের নিতে আসবেন। দেখাবেন শহরের কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। এর ফাঁকে সামান্য বিশ্রাম।

২.৩০-এ ডঃ হুসেনের সঙ্গে আমরা রওনা হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে চললেন সিবাস শহরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে। আমরা যেসব স্থান দেখলাম, সেসম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে জানাই—

(১) Gok Medrese ঃ 'Gok'-এর অর্থ 'নীল'। এটি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। তখন এটি ছিল বিদ্যাচর্চার স্থান। এখানে এখন রয়েছে একটি সংগ্রহশালা।

(২) Buruciye Medrese ঃ এটিও নির্মিত হয় ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে। আগে এটি একটি হাসপাতাল ছিল। এর মধ্যে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কায়-কাউস-১-এর কবর আছে।

(৩) Cifte Minareli Medrese ঃ তৈরি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে। এর দুটি মিনার রয়েছে। মিনারের দেওয়ালগুলি সূক্ষ্ম খোদাই করা কারুকার্যে পূর্ণ।

(৪) Abdi Aga Konagi ঃ নির্মিত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীনকালের ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির নমুনাস্বরূপ এটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে সেইসময় বাড়িতে বসার, শোওয়ার, খাওয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা কিরকম ছিল তা সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে দর্শকদের জন্য।

(৫) সিবাস শহরের যে-স্থানে আতাতুর্ক তাঁর অনুগামীদের প্রস্তুত করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতে, পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সেই জায়গাটিকে বর্তমানে একটি মনোরম প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করা হয়েছে। এখানে উঠলে প্রায় পুরো শহরটির চিত্র চোখে পড়ে।

এইসব স্থান ঘুরে আমরা ডঃ হুসেনের সঙ্গে পৌঁছালাম শহরের এক অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তায়, যেখানে একটি নতুন দোকানঘরের উদ্বোধন হচ্ছিল। এই অনুষ্ঠানে দেশের, শহরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে ডঃ হুসেন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে এক শোভাযাত্রায় একটি দল এদেশের প্রাচীনকালের যোদ্ধাদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল।

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম হোটেলে। প্রায় রাত ৮টা নাগাদ গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে। ঘণ্টা দেড়েক ধরে এদেশের এক বিখ্যাত পিয়ানোবাদক তুলুইহান উগুরলুর পিয়ানোবাদন শুনলাম। রাত্রে হোটেলে ফিরে আহারাদি সেরে যখন ঘরে এলাম তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই বেশ ঠাণ্ডা। [ক্রমশ]

অয়ি অরণ্য, এই সমাজ

সুনীলকুমার দত্ত রায়

সৃষ্টির আদি থেকে ওরা আছে আমাদেরই মতো
আমাদের কাছে, আমাদের পাশে, একান্ত আপন হয়ে,
জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়-লয়—একই সূত্রে গাঁথা,
ভাব ভাষা বিভেদের আড়ালে জীবন যায় বয়ে।
জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ আমাদেরই মতো
ওদেরও আছে, তবু ওরা হয় না অধীর,
স্থির থেকে যায়, দিয়ে যায় সব তুলে আমাদের,
ভোগ করে বর্জ্য ফেলি, অধিকারে সদম্ভে অস্থির।
ভাব ভাষা বিনিময়ে মানুষের জীবন, মানুষের পরিচয়—
শুধু হিংসা-দ্বেষ বিষে জড়োজড়ো বিষাক্ত সমাজ,
কাছাকাছি পাশাপাশি ওরা, সব দেখে সব বোঝে,
তবু থাকে অচঞ্চল, রয় শুধু প্রকাশে সলাজ।
অরণ্য সমাজ—একই মায়ের বুকে ভোক্তা ভোজ্য
রূপে রূপে যুগে যুগে পৃথক দুই জীবনের বিচিত্র প্রকাশে
শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেখি উঠে আসে ভোগীরই হাতে,
ভোজ্যের বিনাশের মাঝে কি ভোক্তার আবরণ নাশে?

মন বাউল

সঞ্জয় ভুঁইয়া

যদি পেতে চাও, আগে হারাও
যদি ভাব বিশ্রাম নেবে দুদণ্ড
আগে হাল বেয়ে নাও!

দেখ দুচোখ মেলে
সামনে দিয়ে তিরিতিরি বয়ে যায় নদী,
ওর আছে সাগরে বিশ্রাম
তার আগে পথচলা অবশ্যম্ভাবী।

ওহে পথিক, শোন তোমায় বলি
যদি চকিতে মনে কখনো
উঁকি মেরে যায় স্বর্গের অনন্ত সম্ভাবনা
জেনো প্রথমেই বনবাস নয়;

আগে বাঁচতে শেখা
এই কাঁচামাটির নিদারুণ সত্যে!

কোথায় তুমি?

সীমা মিশ্র

তুমি যেন সবকিছুর ধরাছোঁয়ার বাইরে,
বুদ্ধি দিয়ে তোমাকে বোঝার চেষ্টা করি,
কিন্তু বুদ্ধিতে তুমি ধরা দাও না।
বোধের নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সমুদ্রে
কখনো তোমাকে উপলব্ধি করি।

নীলাকাশ—নীল নীল গভীর নীল
মন যেখানে হারিয়ে যায় কোন এক অজানার দিকে
তখন হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো
অনুভব করি তোমার উপস্থিতি।

একটুখানি অনুভূতি, একটুখানি স্পর্শ দিয়ে
কোথায় লুকাও তুমি?
এদিকে ছোট্ট আমি, জ্ঞানহীন আমি,
তোমাকে একটু ছোঁয়ার জন্য
বন থেকে বনান্তরে, মাঠ-ঘাট-লোকালয় পেরিয়ে
মন্দির-মসজিদ-গির্জার দুয়ারে
তোমাকে খুঁজে চলেছি
কোথায় তুমি? কোথায় রয়েছ তুমি?

এবাড়ির সাথে

সুব্রত ব্রহ্মচারী

দরজাতে কড়া নাড়ি
ভিতর দুয়ারে শব্দহীন হাওয়া
'কেউ আছেন? ভিতরে কেউ আছেন?'
ভারি কাঠের দরজা—নীরব কথা কওয়া!

পথের ওপর ঘাসের আন্দোলন
ঝাঁঝাঁ রোদের দুপুরে চারিপাশে
ভিতরে দুয়ার... শ্যাওলা-সবুজ মায়া...
এমনি নীরব থাকতে ভালবাসে!!

"কেউ আছেন? ভিতরে কেউ আছেন?"
প্রতিধ্বনি ওঠেনি কি বহুদিন?
দরজাতে কড়া নাড়ি
এবাড়ির সাথে সম্পর্ক আজ ক্ষীণ!

হে প্রভু

গায়ত্রী সেন

দহনের দিনে এসেছিলে বুঝি
অভয়ের বাণী শোনাতে,
মগ্ন ছিলাম মালাচন্দনে
অর্ঘ্য আমার সাজাতে।
কখন যে এসে ফিরে গেছ প্রভু
হয়তো ডেকেছ বুঝিনি তো তবু,
কোন উপচার নাহি প্রয়োজন
একথা বোঝে না মন।
কাহারে শুধাব
কোথা গেলে পাব
চিন্ময় দরশন।

মা-নির্ভর

প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী

শিশুরা কোঁদল করে হামেশা বলে—
'মাকে বলে দেব',
এ কি শুধু কথার কথা?
বড়রা শিখুক শিশুদের থেকে
ও ক'টি কথা—
যাতে আছে পরম নির্ভরতা।

সীমারেখা

[illegible]াল মিশ্র

হলঘরের সব[illegible]য় দাও
[illegible]প্রয়োজন নেই।
[illegible] তুমি আর আমি।
তু[illegible]স্থির [illegible]চোখে চেয়ে থাক—
কেটে যাক আমার সব আবিলতা,
ধীরে ধীরে তলিয়ে যাই কোন্ গভীরে।
হঠাৎই যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠি,
জেগে উঠি
এক অচিন্ত্য জ্যোতিঃপুঞ্জে।
সব সীমারেখা মুছে যায়—
একৈবাহম্, ত্বমেবাহম্ একাকার হয়ে
ভেসে যায়
কোন্ নিরুদ্দেশের আবর্তে।

'কৌপীন[illegible]'

(শঙ্করা[illegible]কৃত স্তোত্রের অনুবাদ)

প্রণব [illegible]ল

বেদান্তবাক্যেতে যে সদা রত রয়,
ভিক্ষান্ন গ্রহণে অতি পরিতৃপ্ত হয়,
শোকহীন চিত্তে সেই বিচরণকারী—
সেই হয় ভাগ্যবান পূত কৌপীনধারী॥১॥

আশ্রয়ের স্থান যার গাছের নিচেতে,
ভোজনের কর্ম যিনি সারেন করেতে,
লক্ষ্মীকে কাঁথার ন্যায় অবজ্ঞা যে ক[illegible]
সেই হয় ভাগ্যবান কৌপীন যে ধরে[illegible]

সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সুসংযত করে
আনন্দস্বরূপে নিজের সতত বিহরে—
অহোরাত্র ব্রহ্মানন্দে যারা রত রয়,
(সেই) কৌপীনধারণকারী ভাগ্যবান হয়॥৩॥

আত্মবুদ্ধিহীন[illegible]যেজন নিজ কলেবরে,
অন্তরে[illegible]স্বরূপ সাক্ষাৎকার করে—
অন্ত মধ্য[illegible]শূন্য যিনি,
কৌপীনধারী[illegible] তিনি॥৪॥

পবিত্র[illegible] ক'রে উচ্চারণ
'আমি ব্রহ্ম'—এই ভাবে সদা নিমগন,
মাধুকরী ক'রে যে বা বিচরণ করে,
সেই মহাভাগ্যবান কৌপীন যে ধরে॥৫॥

কলমীর দল

রুণা রায়চৌধুরী

[illegible]ামে কে আনিল মহাকলমীর দল,
[illegible]প্রেমের উন্মাদনায় নামে সেথায় ঢল।
[illegible] যার মহিমায় মুগ্ধ সকল জন,
[illegible]শায়ে সেথায় হইল বৃন্দাবন।
সাধ[illegible]নি পরমসিদ্ধ ভক্ত তাঁহার চাই,
চারদিক হতে মিলিল অনেক 'কলমীর দল' তাই।
সাধ্বী রানী রাসমণি যে ভক্তির প্রতীক,
মথুরামোহন প্রভুর প্রতি বিশ্বাসে নির্ভীক।
ঠাকুরের অতি প্রিয় সন্তান রাখাল-বাবুরাম,
কেশব, লাটু, নরেন, সুরেন আর বলরাম।
তারক, যোগেন, শশী, সুবোধ, হরি, নিরঞ্জন,
বুড়ো গোপাল, শরৎ, কালী, হরিপ্রসন্ন।
গঙ্গাধর ও গিরি[illegible]ন ভক্তিভাবে মত্ত,
প্রাণের টানে আ[illegible]বে[illegible] শুদ্ধসত্ত্ব।
ভক্তিমতী মায়ের[illegible] দ্বারে,
ঠাকুর, মায়ের [illegible]ভাসায় সবারে।
গৌরী-মা, [illegible] এলেন গোলাপ-মা,
গোপালের মার গোপা[illegible] ঠাকুরের সহস্র বায়না।
আরো অনেক ভক্তজনের সমাগমে পূর্ণ,
বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ভক্তে সমাকীর্ণ।
ধন্য মোদের ঠাকুর আর ধন্য মোদের মা,
কলমীর দল টেনে এনে ভরিয়ে দিলেন গাঁ।

মাতৃসান্নিধ্যে কুসুমকুমারী দেবী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমার জীবনীপাঠকগণ কুসুমকুমারীর নামের সঙ্গে পরিচিত আছেন। সুরবালার কন্যা রাধু বা রাধারানীর সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। শ্রীশ্রীমার স্নেহের সেজভাই অভয়চরণের যখন অকালমৃত্যু ঘটে তখন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সুরবালা পিত্রালয়ে অবস্থান করছিলেন। সুরবালা শৈশবে মাতৃহারা হয়ে দিদিমা ও মাসিমার কাছেই প্রতিপালিতা হয়েছেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর দিদিমা পরলোকগমন করলে সুরবালা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কিছুদিন পর তাঁর মাসিমাও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুরবালার অসহায় অবস্থা দেখে শ্রীশ্রীমা তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন। পর্যায়ক্রমিক আঘাত সহ্য করতে না পেরেই সুরবালার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। এমতাবস্থায় ১৯০০ সালের ২৬ জানুয়ারি সুরবালা এক কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। কন্যার নাম রাখা হলো 'রাধু' বা 'রাধারানী'। এই সময়কার কথা স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "পাগলীর পক্ষে শিশুর লালনপালন অসম্ভব জানিয়া শ্রীমায়ের তখন চিন্তার অবধি নাই। দৈবক্রমে পরের মাসে স্বামী অচলানন্দের সহিত কুসুমকুমারী দেবী নামে জনৈক স্ত্রীভক্ত আসিলেন। শ্রীমা এই মহিলার হস্তে রাধুর প্রতিপালনভার অর্পণ করিলেন। কুসুমকুমারী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত জয়রামবাটীতে থাকিয়া এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।"[১]

এরপর "১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর ১৯০০) সুরবালা, নীলমাধব ও ভানুপিসিকে সঙ্গে নিয়া শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসেন এবং বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়িতে কয়েক মাস বাস করেন। নিবেদিতা বিদ্যালয় তখন ১৭ নম্বর বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৬ নম্বর বাড়ির পাশে একটি সরু গলির মতো স্থান ছিল; একদিন সেই গলি দিয়া আসিয়া রান্নাঘরের জানলা ভাঙিয়া তাহাতে চোর প্রবেশ করে। শেষরাত্রে প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিয়াই সুরবালা রান্নাঘরে লোক দেখিয়া আতঙ্কে চিৎকার করিয়া ওঠেন এবং পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহারা হন। ইহার ফলে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি বাড়িয়া যাওয়ায় মা তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করেন। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি কুসুমকুমারীর হস্তে কন্যার ভার দিয়াছিলেন। যোগীন-মা প্রভৃতি অনেকে বলিলেন, জয়রামবাটীতে এইরূপ একটি স্ত্রীলোক রাখিয়া দিলেই চলিবে, তাঁহারা একটি স্ত্রীলোক রাখার ব্যবস্থাও করিবেন, সুতরাং পাগলীকে কন্যাসহ জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হউক আর মা কলিকাতায় থাকুন। সন্ধ্যার সময় জপ করিতে বসিয়া মানসচক্ষে মা দেখিলেন, জয়রামবাটীতে মেয়েটি অযত্নে কষ্ট পাইতেছে, তাহার গর্ভধারিণীর খেয়ালে যেকোন মুহূর্তে তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা রহিয়াছে; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যোগীন-মাকে বলিলেন, 'ও যোগেন, আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবেনি, ঐ পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি স্থির থাকতে পারবনি।'... শ্রীশ্রীমা সুরবালাকে লইয়া জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন। (১৯০১ সালে)।"[২]

এরপর ১৯০৪ সালের জানুয়ারি থেকে একবছর শ্রীশ্রীমা ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের 'নীলমণি শান্তিধাম'-এ অবস্থান করেন। এইকালেই তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "তখন পুরী পর্যন্ত বেঙ্গল-নাগপুর রেললাইন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। শ্রীমায়ের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণির এক রিজার্ভ গাড়িতে স্থান পাইলেন নীলমাধব, পাগলীমামি, গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি, রাধু, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, চুনীলালবাবুর স্ত্রী ও কুসুমকুমারী।"[৩] মা পুরীতে প্রায় দু-মাস ছিলেন। পুরী থেকে ফিরে তিনি জয়রামবাটী যান।

১৯০৫ সালের জুন মাসে শ্রীশ্রীমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (প্রসন্নমামার) স্ত্রী কলেরা রোগে মারা যান। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তুতি চলে। সেসময় স্বামী গিরিজানন্দ মাতৃদর্শনে জয়রামবাটীতে এসেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথায় কুসুমকুমারী দেবীর প্রসঙ্গ পাইঃ "প্রায় ১২/১৪ দিন মার ওখানে (জয়রামবাটীতে) থাকার পর যোগোদ্যানে যাইব স্থির করিয়াছি, মা বলিলেন, 'পাগলী (রাধুর মা) খেপেছে, গঙ্গাস্নানে যাবে। তুমি বাপু, একে কলকাতায় কুসুমের বাড়ি দিয়ে যেও।' আমি বালক হইলেও পাগলীমামিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলাম। মার আদেশ।... সেইদিন তেলোভেলোর প্রান্তর-মধ্যে একটি চটি পাইয়া উহাতে আশ্রয় লইলাম। পরদিন তারকেশ্বরে আসিয়া ট্রেনে চাপিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্বে মামীকে শ্যামবাজারে কুসুমঠাকুরানীর বাড়িতে দিয়া যোগোদ্যানে গেলাম।"[৪]

পরবর্তী কালে অন্তত ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত কুসুমকুমারী দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাধন্য গোপালের মার (অঘোরমণি দেবী) প্রয়াণকাল পর্যন্ত তাঁর সেবায় নিরত দেখা যায়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা উল্লেখ করেছেনঃ "গোপালের মা অসুস্থতা ও বার্ধক্যহেতু অশক্ত হইয়া পড়িলে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ৫৭নং রামকান্ত

বসু স্ট্রিটে বলরাম বসুর বাড়ি লইয়া আসেন। তখন পর্যন্ত শ্রীমার কলকাতাবাসের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই; সাময়িকভাবে তাঁহার জন্য বাড়ি ভাড়া করা হইত। সুতরাং নিবেদিতা যখন প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার বাড়িতে একখানি পৃথক ঘরে গোপালের মা বাস করিতে পারেন এবং তিনি দেখাশুনার ভার লইবেন, তখন স্বভাবতই স্বামী সারদানন্দ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। ডিসেম্বর মাসের (১৯০৩) গোড়ার দিকে গোপালের মা নিবেদিতার নিকট আগমন করেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট হইল। একজন ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহার পরিচর্যা করিতেন—নাম কুসুম।"[৫]

রাধুর পরিচর্যার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা কৃপা করে কুসুমকুমারী দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবীর পিসতুতো দিদি ভাবিনী দেবী বহুদিন থেকেই বলরামবাবুর বাড়িতে অবস্থান করতেন এবং ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদদের নিকট পরিচিত ছিলেন। ফলে কুসুমকুমারী দেবীরও শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজতর হয়। এই সুবাদেই তিনি গোপালের মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ পান। তাঁর ভক্তিভাব ও দৈবীভাবে আপ্লুতা কুসুমকুমারী দেবী তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। গোপালের মা প্রথমে কিছুতেই রাজি হননি। স্বামীজীর মধ্যস্থতায় তা সম্ভব হয়েছিল—"স্বামীজীর অনুরোধে গোপালের মা একবার দুইজন মহিলাকে (ভাবিনী দেবী ও কুসুমকুমারী দেবী) মন্ত্র দিয়াছিলেন। মহিলাদ্বয় দীক্ষা চাহিলেও গোপালের মা সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি যে-সে? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে পারবে না তো কে পারবে? বলি কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও—তাতেই ওদের কাজ হবে। তোমার আর কি হবে?' দীক্ষার পর স্পৃহাশূন্যা গোপালের মা গুরুদক্ষিণা কিছুই লইবেন না দেখিয়া বলরামবাবু বলিলেন, 'কিছু না নাও, অন্তত ষোল আনা করে নাও।' শিষ্যাদের পাছে ক্ষোভ হয়, তাই একটি একটি করিয়া টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি উপদেশ দিলেন, 'ওগো, মনপ্রাণ যে দেবার কথা! টাকা তো তুচ্ছ!... নাম নেওয়া হেলনা-ফেলনা জিনিস নয়। অন্তত দশ হাজার জপের পর আসন ত্যাগ করবে।' "[৬]

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদে গোপালের মা এতই ব্যথিতা হয়েছিলেন যে, অন্যমনস্ক অবস্থায় পড়ে গিয়ে তাঁর হাত ভেঙে যায়। তখন তাঁর সেবার জন্য স্বামী সারদানন্দ সেবিকা হিসাবে কুসুমকুমারী দেবীকে নিযুক্ত করেন। এপ্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "কামারহাটীর বাগানে ভূতের উৎপাত ছিল। দত্তগৃহিণীর আমলে যে-পাহারার ব্যবস্থা ছিল, উহা রহিত হওয়ায় স্বামী সারদানন্দ নিজব্যয়ে তথায় একটি মালী নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহ বাগানে থাকিত না। স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদে পড়িয়া গিয়া যখন গোপালের মার হাত ভাঙিয়া যায়, তখন একজন সেবিকার তথায় থাকার ব্যবস্থা হয়। গোপালের মা যেন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচেন, এমনিভাবে বলিতেন, 'কখন যাবি? এ্যাঁ, থাকবি নাকি? মতলব কি? একথা বলছি বলে কিছু মনে করিসনি।' ইহার পূর্বে (১৯০১) তাঁহার আমাশয় হইলে কন্যাস্থানীয়া একজন সেবিকা সেখানে ছিলেন, আরেক ব্রহ্মচারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া আসিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ ও নিবেদিতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। স্বামীজীও একবার গিয়াছিলেন। সেবিকাকে দেখিয়াই অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, 'কেন এখানে এলি? কষ্ট পাবি। আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একটা ঘর ঠিক কর। সব ঘরে চাবি। পূজারী বামুনকে বল—একটা খুলে দেবে। দ্যাখ, যখন শব্দ-টব্দ পাবি, তখন খুব জপ করবি—গোড়া থেকেই বাপু বলে রাখছি। এখানে নানান রকম আছে।' রাত্রে সেবিকার অগ্নিপরীক্ষা চলিল—ছাদে দুড়দুড় শব্দ, জানালায় আওয়াজ, আরেকটা ছমছম ভাব। অথচ জানিয়া শুনিয়া ইহারই মধ্যে গোপালের মার দীর্ঘজীবন যাপিত হইল।"[৭]

গোপালের মার হাতভাঙা কালে স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে নিয়ে কামারহাটীর বাগানবাড়িতে যান। তাঁর নিজস্ব বিবরণেও আমরা কুসুমকুমারী দেবীর প্রসঙ্গ পাই: "একদিন বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) সঙ্গে লইয়া গোপালের মাকে দেখিতে যান। বেলা দেড়টা হইবে, গোপালের মা ও সেই স্ত্রীলোকটি (কুসুমকুমারী দেবী) আহার করিতে বসিয়াছেন। এবং কিছু আহারও করিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে লইয়া সেই ঘরটিতে একেবারে ঢুকিয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটি আহার করিতেছিল, কিন্তু অপরিচিত দুটি পুরুষ দেখে আহারের থালাখানি থেকে হাত তুলে নিলেন এবং মুখে ঘোমটা দিলেন। গোপালের মা সেই দেখে বলিয়া উঠিলেন, 'ওগো, ওদের দেখে লজ্জা করছ কেন? ওরা যে আমার গোপালের।' এমন মধুর ও পবিত্রতাপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি করিলেন যে, স্ত্রীলোকটি আর কোন লজ্জা করিলেন না, মুখের ঘোমটা খুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ ও বর্তমান লেখকের মনেও আর কোন দ্বিধাভাব রহিল না।... গোপালের মার এমন একটি আশ্চর্য প্রভাব যে, বাবুরাম মহারাজ, বর্তমান লেখক ও সেই স্ত্রীলোকটি

একসঙ্গে পান সাজিতে বসিলেন এবং খাইতে লাগিলেন, কিন্তু সঙ্কোচ বা দ্বিধাভাবের লেশমাত্র কাহারও মনে আসিল না।"[৮]

১৯০৬ সালে গোপালের মার শরীর খুব খারাপ হলে তিনি ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার কাছে অবস্থান করেন। তাঁর শুশ্রূষার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতা স্বয়ং এবং তাঁর সেবায় নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন কুসুমকুমারী দেবী। শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন ঃ "গোপালের মার পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে-ছবি দেখা যায়, তাহা নিবেদিতার ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তোলা, গোপালের মার শেষ অসুখের সময়ে, সময় আনুমানিক জুন ১৯০৬। গোপালের মার মাথার দিকে পাখা হাতে মহিলাই কুসুম। ছবিটি তাঁর কাছ থেকেই সংগৃহীত। ছবির বিষয়ে কুসুমদেবী বলেন—'চোখ বুজেই শুয়ে থাকতেন। ছবি তোলার সময় নিবেদিতা বারবার চোখ চাইতে বললেন। তিন-চারবার 'মা, চোখ খুলুন' বলা হলো। কিছুতেই চোখ চাইলেন না।"[৯] ১৯০৬ সালের ৮ জুলাই গোপালের মা প্রয়াতা হন।

গোপালের মার সতত সেবা করলেও শ্রীশ্রীমার স্মরণ-মনন অব্যাহত ছিল কুসুমকুমারী দেবীর। গোপালের মার প্রয়াণ ঘটলে তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। কেবল ভগিনী নিবেদিতাই নয়, ভগিনী দেবমাতার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ এবং সম্প্রীতির মেলবন্ধন অব্যাহত ছিল। দেবমাতাকে লেখা শ্রীশ্রীমার এক পত্রে তার নিদর্শন মেলে—

আমার পরম আদরের কন্যা প্রিয় দেবমাতা,

তোমার ১৬ আগস্টের পত্র পাইয়াছি। যখন তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তখনি তোমার পত্রটি আসিল। সুতরাং বুঝিতে পার সেটি পাইয়া আমি কতখানি আনন্দিত হইয়াছি।...

সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুসুমদেবী, গণেন, নিবেদিতা ও সুধীরা ভাল আছে। তাহারা প্রায়ই তোমার কথা বলে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। আদরের কন্যা আমার।

ইতি

তোমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী[১০]

এপর্যন্ত বিবরণে আমরা কর্মযোগিনী কুসুমকুমারীকে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কিভাবে তিনি শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে এলেন, এবার সে-প্রসঙ্গে আসা যাক।

কাশী বসবাসকালে কুসুমকুমারী দেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ঠাকুর ও মায়ের কথা প্রথম জানতে পারেন। তখনি তাঁর মাতৃদর্শনের ব্যাকুলতা জাগে। সৌভাগ্যক্রমে স্বামী

রোগশয্যায় শায়িতা গোপালের মা, পার্শ্বে উপবিষ্টা ভগিনী নিবেদিতা ও পাখাহাতে কুসুমকুমারী দেবী

অচলানন্দ তখন কাশী থেকে মাতৃদর্শনে জয়রামবাটীতে যাত্রা করছিলেন। কুসুমকুমারী দেবী তাঁর মহিলা সহযাত্রীদের সঙ্গত্যাগ করে স্বামী অচলানন্দের সঙ্গে জয়রামবাটী গমন করেন। প্রথম মাতৃদর্শনেই তিনি মুগ্ধ ও বিমোহিত হন। তখনি তিনি কয়েক মাসের জন্য জয়রামবাটী অবস্থান করেন। পরবর্তী কালে তিনি বাগবাজারে মায়ের বাড়িতেও বহুদিন অবস্থান করেছেন। অনেকদিন তিনি মায়ের রান্নাবান্নার কাজেও ব্যাপৃত ছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকে কুসুমকুমারী দেবী তাঁর এক বিশেষ প্রত্যয়ের সংবাদ জানিয়েছেন ঃ "রান্নার জিনিস—তেল, ঘি, আটা ইত্যাদি হয়তো ভাঁড়ারে নেই, সেকথা মাকে জানাতেই মা বললেন, 'ভাল করে দেখগে না, আছে।' ফিরে গিয়ে ঠিক সেদিনকার উপযোগী জিনিস পেলাম। চাল এ-বেলা দশ সের, ও-বেলা দশ সের রান্না হতো। কোনদিন মাপতে গিয়ে হয়তো দেখলাম, সেদিনকার পুরো চাল নেই। পরদিন চাল তৈরি হবে। মা বললেন, 'আরেকবার মেপে দেখ দেকি।' আবার মেপে দেখা গেল, চাল পুরোই আছে। মা বললেন, 'তুমি আগে মাপতে ভুল করেছিলে।' "[১১]

শ্রীশ্রীমা অসুস্থ হয়ে উদ্বোধনে উপস্থিত হলে অন্যান্যদের সঙ্গে কুসুমকুমারী দেবীও মাতৃসেবায় নিয়োজিত হন। মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীমা ব্রহ্মচারী গণেন মারফৎ 'ঠাকুর ও মা'র একটি ফটো বাঁধিয়ে এনে তা উৎসর্গ করে কুসুমকুমারী দেবীর হাতে

দেন। তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে যান। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, মায়ের পূজা করে দেওয়া ঠাকুর-মার একটি ফটো পেলে তা তাঁর জীবনের পরম সম্বল হয়ে থাকবে; তাঁদের নিয়েই পরম নিশ্চিন্তে কেটে যাবে তাঁর বাকি জীবন! কিন্তু মায়ের শরীর ক্রমশ খারাপ হওয়ায় তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি; অন্তর্যামিনী মা সবই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নিজেই ফটো কিনে তা পূজা করে কুসুমকুমারী দেবীর হাতে দেন।
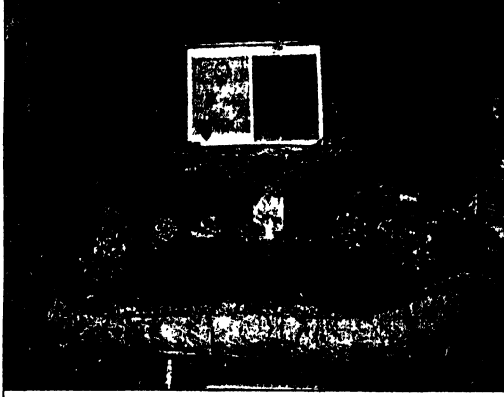
শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে অভিষিক্ত এবং কুসুমকুমারী দেবীর পূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পট। আলোকচিত্র ঃ কৌশিক নাগ

এই অমূল্য নিধিকে বুকে ধরে রেখে কুসুমকুমারী দেবী তাঁর ১২নং বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়িতে (বাগবাজার, কলকাতা-৩) বাকি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি অসুস্থ হলে তাঁর আত্মীয়া সেটির পূজার্চনা করতেন। এরপর তাঁর পুত্রবধূ পূজার্চনার দায়িত্ব নেন। এমন সময় ৭নং বৃন্দাবন পাল লেনের হারাধন মুখোপাধ্যায়ের দুই কন্যা বেলা ও হেনা মুখোপাধ্যায়ের (দুজনেই অবিবাহিতা) হাতে পূজার দায়িত্ব অর্পিত হয়। চিত্রপটটির নিচে ডানদিকে লেখা আছে—'28, Hartfield Rd, Wimbledon, S.W.' আর বাঁদিকে লেখা আছে—'C. Sheaff'। এই পরিবারে মায়ের অভিষিক্ত চিত্রপটটি আজও পূজিত হয়ে চলেছে।[১২]

শোনা যায়, কুসুমকুমারী দেবী যখন পানিহাটীতে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ 'চিঁড়া মহোৎসব' উপলক্ষ্যে সেখানে এলে তাঁকে দর্শন করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয় তাঁর। তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। পরবর্তী পর্বে তিনি দীর্ঘদিন মায়ের সেবা করেছেন, স্বামীজীর পাদস্পর্শ করেছেন, রাধারানীকে প্রতিপালন করেছেন, গোপালের মার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, নিবেদিতা-দেবমাতার সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন, শরৎ মহারাজের স্নেহলাভ করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের তিনি এক সার্থক সৈনিক—একাধারে মাতা-কন্যা-সেবিকা! ❑

তথ্যসূত্র

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০১, পৃঃ ১৪৯
২ শ্রীশ্রী সারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৬, পৃঃ ৬৮
৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৫৭
৪ মাতৃদর্শন—সঙ্কলন ঃ স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৪, পৃঃ ৪৭
৫ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৪০
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৪৫
৭ ঐ, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৬
৮ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৮৬, পৃঃ ১৬৪-১৬৫
৯ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৬, পৃঃ ২১৩
১০ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৫, পৃঃ ২৫৭
১১ ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৭, পৃঃ ৭২২
১২ বেলা মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে ৮৫ বছর বয়স্কা) এবং শঙ্করী মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রাপ্ত।

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর স্মারক হিসাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকার এবারের প্রচ্ছদ বেলুড় মঠের দক্ষিণে অবস্থিত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ি তথা পুরনো মঠ। বেলুড় মঠের জমি ক্রয়ের পূর্বে মঠ এই বাড়িতে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণই শুধু এই বাড়িতে স্থূলশরীরে বাস করেননি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পারিষদই এই বাড়িতে বাস করেছেন। শ্রীশ্রীমা এই বাড়ির দ্বিতলে উত্তরদিকের ঘরটিতে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি লাভের পর তিনি প্রাণের বিরহজ্বালা প্রশমিত করতে তাঁর শয়নকক্ষের পশ্চিমে খোলা ছাদে 'পঞ্চতপা' করেছিলেন। এই বাড়িতেই স্বামীজী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দান করেন এবং 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' আরাত্রিক স্তবটি রচনা করেন। বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় সম্পৃক্ত এই বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে একটি মহাতীর্থস্বরূপ। *আলোকচিত্র ঃ ডি. ডি. সাহা*

শিশুর মতোই

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "তুই ব্রজের রাখাল।" তাঁর পিতার দেওয়া নামও ছিল—'রাখাল'। রাখাল বালকের মতোই শিশুমনের মানুষ ছিলেন তিনি। ঈশ্বর তো শিশুর মতোই। তাই যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তারাও শিশুর মতো হয়ে যায়।

একদিন হলো কি, কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে। ঐ বাড়িরই ছেলেমেয়ে তারা। সেই সময়ে রাখাল মহারাজ তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। হঠাৎ তিনি নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা ভাবল, তিনি বুঝি এখন ঘুমোবেন। যাতে তিনি ঘুমোতে না পারেন তাই তারা খুব হৈচৈ করতে লাগল। এদিকে ঘরের মধ্যে তিনি একটা কালো কম্বল জড়িয়ে মুখে একটা ভীষণাকৃতি মুখোশ পরে হঠাৎ দরজা খুলে 'হুম্' শব্দ করে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন। বারান্দায় বাচ্চারা সব ভয়ে চিৎকার করে উঠে যে যেদিকে পারল পালাল, আর আড়াল থেকে দেখতে লাগল। বড়রা সব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রমাদ গুণল। 'এটা আবার কি এল?'—ভাবতে লাগল। একটু পরেই কম্বল আর মুখোশ খুলে মহারাজ নিজের মুখটি বের করলেন। তখন কী হাসির ধুম চারিদিকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের চারিদিকে একটা অদ্ভুত পবিত্র ভাব সর্বদা বজায় থাকত। বড়রাও সেখানে গিয়ে সংসার ভুলে শিশুর মতো হয়ে পড়তেন।

চামড়ার জামা*

ঠাকুরের কাছে নারান** আসেন,
ঠাকুর তো খুবই তুষ্ট।
তবে নারানের বাড়ির লোকেরা
নারানের 'পরে রুষ্ট।
ঠাকুরের কাছে ওঁর আসা-যাওয়া,
তাঁরা চান, হোক বন্ধ,
প্রহার, তাও তো জোটে মাঝে-মাঝে,
এমনই কপাল মন্দ।

তা শুনে ঠাকুর নারানকে ক'ন,
তুই এক কাজ করবি,
মারলেও তোকে লাগবে না মোটে,
চামড়ার জামা পরবি।

* রচনা ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়
** শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্ত নারায়ণ

ছবি ঃ অর্পিতা কয়াল
নবম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ মিশন সারদামন্দির, সরিষা

বি.দ্র. ঃ ওপরের ছড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পকে ভিত্তি করে রচিত। এরকম আরো অনেক ছড়া আছে—'শুকদেবের গুরুদক্ষিণা দান', 'পাটোয়ারীর বর প্রার্থনা', 'দাঁত গেছে তাই বলি বন্ধ' ইত্যাদি। আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা আগামী দুমাসের মধ্যে উপরি উক্ত তিনটি গল্প-ভিত্তিক সাদা-কালো ছবি পাঠাতে পার। মনোনীত হলে তা ছাপা হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা—
'সবুজ পাতা', প্রযত্নে—সম্পাদক, 'উদ্বোধন', ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩

আদি শঙ্করাচার্য

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

বিস্ফোরক

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

আজ আমরা যে হিংসা ও সন্ত্রাসের দিনে বাস করছি, তাতে পৃথিবী জুড়ে একটি শব্দই প্রতিদিন উচ্চারিত হচ্ছে, উচ্চারিত হচ্ছে ঘৃণা-বিষাদ-শোক-আতঙ্ককে সঙ্গী করে। শব্দটি—বিস্ফোরক।

বেশ কয়েক বছর আগে একটি সংবাদ পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। সেটি হলো আফগানিস্তানে সহস্রাব্দী আগে নির্মিত দুটি বিশাল বুদ্ধমূর্তি, যাদের প্রচলিত নাম ছিল 'বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি', ধ্বংস হয়ে গেছে সেদেশের শাসক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে। এই ধ্বংসলীলা ঘটেছে মূঢ়তায়, আক্রোশে, ধর্মান্ধতায়। এর নিন্দার কোন উপযুক্ত ভাষা নেই। হাজার বছরেরও আগে পাহাড় কেটে ঐ মূর্তিগুলি খোদাই করতে হাজারেরও বেশি মানুষের শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছিল। ঐ ঐতিহাসিক শিল্পকর্মকে আজ আর লক্ষ কোটি ডলারেও কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতিকামী সভ্য মানুষেরা প্রতিবাদ করেও ঐ ধ্বংসকে রোধ করতে পারেনি। বুদ্ধমূর্তি-দুটি ধ্বংস করতে ব্যবহার হয়েছিল সবরকম শক্তিশালী ও আধুনিক বিস্ফোরক।

বিস্ফোরকের আরেক সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ইতিহাস এখনো আমাদের অনেকের স্মরণে। তা হলো রাজীব গান্ধীর মৃত্যু—তীব্র বিস্ফোরক 'মানববোমা'র ব্যবহারে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর দেশে দেশে অনুরূপ বিস্ফোরকের ব্যবহারের পিছনে শুধুই আক্রোশ, অন্ধতা আর হিংসা। এর নেপথ্যে রয়েছে নানা অপরাধী, নানা দুষ্কৃতকারী, নানা জঙ্গীবাহিনী। কোন দেশই মুক্তি পাচ্ছে না এই বিস্ফোরণ-জনিত সন্ত্রাস ও হত্যা থেকে। নানা রাষ্ট্রনায়ক, গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তো বটেই—বিভিন্ন দেশের বিদেশী দূতাবাস ও গুরুত্বপূর্ণ সৌধগুলির সুরক্ষাও আজ এক গভীর সমস্যা।

বিস্ফোরক ব্যবহারের ইতিহাস অনেক কালের। বস্তুত, হিংসাভিত্তিক যুদ্ধের যে-ইতিহাস, তার অভিশাপ মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই। প্রাচীন সব যুদ্ধের ইতিহাস—সে-যুদ্ধ ছোটই হোক, বা বড়ই হোক—তার ফলাফল নির্ণীত হতো ধাতব অস্ত্রসম্ভারের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষে এবং ততোধিক ব্যক্তিগত শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের ওপর। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি জুড়ে তারই বর্ণনা।

যেদিন গোলাবারুদ আবিষ্কার হলো, সেদিনটি হয়তো সভ্যতার এক চরম দুর্দিন। যেদিন থেকে যুদ্ধে গোলাবারুদ আর কামান-বন্দুক ব্যবহার হতে লাগল, সেদিন থেকেই তা হয়ে উঠল শৌর্যবীর্যের লড়াই ছেড়ে দূর থেকে কাপুরুষের যুদ্ধ। শুধু যোদ্ধা, সৈনিক আর রাজপুরুষেরা সেইসব গোলা-বারুদ ও বিস্ফোরকের একমাত্র লক্ষ্য হলেন না—লক্ষ্য হলো সাধারণ অসামরিক লোকজন, লক্ষ্য হলো—আবালবৃদ্ধবনিতা।

গত শতাব্দীতে সব যুদ্ধে, মহাযুদ্ধে কেবলই উন্নত থেকে উন্নততর বিস্ফোরক উদ্ভাবিত হয়েছে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। শেষপর্যন্ত চরম বিস্ফোরক পরমাণু বোমা, তাকে ছাপিয়ে আরো তীব্র হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরক-রূপে উদ্ভাবিত হয়েছে। আর পরমাণু বোমা বা সাধারণ বোমাকে বহুদূর থেকে লক্ষ্যে নিক্ষেপের জন্য অনিবার্য প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল। গত শতাব্দী থেকেই আমরা দেখেছি—মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিস্ফোরকের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য দেশে মহাদেশে উন্মাদ প্রতিযোগিতা।

বিস্ফোরককে মানুষ প্রথম হয়তো দেখেছিল আদিম যুগে ভলক্যানো বা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে। তীব্র শব্দ, তার সঙ্গে ছিটকে ওঠা বিধ্বংসী বস্তুস্তূপের ক্রিয়াকলাপ স্তম্ভিত ও অসহায় করে দিয়েছিল মানুষকে। মানুষের দীর্ঘকাল ক্ষমতা ছিল না এমন বিস্ফোরণকে হাতে-কলমে ঘটানোর। তা সম্ভব হলো মাত্র এক শতাব্দী আগে, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে—হিরোসিমা, নাগাসাকিতে। তার আগে বিস্ফোরণের মডেল ছিল—ডিনামাইট, যুদ্ধ বোমা ও অন্যান্য বোমার বিস্ফোরণ।

মানুষ প্রথম বিস্ফোরণ আয়ত্ত করেছিল অবশ্যই বারুদ আবিষ্কার করে। ততদিনে বিজ্ঞানচর্চায় মানুষ বুঝেছে, ছোট আধারে কঠিন বা তরলকে তাৎক্ষণিক কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াতে যদি নানা গ্যাসে পরিণত করা যায়, তাহলে উৎপন্ন গ্যাসের বিপুল আয়তন কঠিনের ছোট আধারকে ফাটিয়ে বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পথ করে নেয়। আর তারই ফলে কিছু শব্দশক্তি ছাড়া বাকি শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপ নিয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। এই বারুদের

বিস্ফোরণকে পুঁজি করে তৈরি হলো গুলি-গোলা। ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত হলো বন্দুক-কামান। বন্দুক-কামানে বিস্ফোরক গোলাবারুদের ব্যবহার বদলে দিল যুদ্ধের চেহারা। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের পত্তনের মূলে গোলাবারুদ, কামান-বন্দুক। মজা এই, পরমাণু বোমার যুগের প্রেক্ষিতে আজও বন্দুকের ব্যবহার আর তার খরচ কমাতে পারেনি কোন রাষ্ট্রই। তার আয়োজন প্রয়োজন আজও সব দেশেই বিপুল।

আবিষ্কারের পর প্রথম ছয় শতাব্দী ধরে গোলবারুদই ছিল একমাত্র বিস্ফোরক। ১৮৬৬ সালে দুটি বিস্ফোরক জন্ম নিল ল্যাবরেটরিতে—ডিনামাইট (গ্লিসারল ট্রাইনাইট্রেট) এবং গানকটন (সেলুলোজ নাইট্রেট)। ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড বি. নোবেল। পরবর্তী কালে এমন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আবিষ্কর্তারূপে অনুতপ্ত নোবেল প্রবর্তন করেন বিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কার'। এই নোবেল পুরস্কারের অন্যতম বিষয় হলো 'বিশ্বশান্তি'। তার ইতিহাস সকলেরই জানা।

ডিনামাইট বা নাইট্রোগ্লিসারিন তার তরল উপাদানের আয়তনের ১০,০০০ গুণ গ্যাস উৎপন্ন করে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণে তাপ সৃষ্টি হয় প্রায় ৩০০০° সেন্টিগ্রেড।

সাধারণ বারুদে থাকে সোরা (পটাশিয়াম নাইট্রেট), গন্ধক (সালফার) এবং কাঠকয়লা (কার্বন)। এটি কর্ডাইট —নাইট্রোগ্লিসারিন ও গানকটনের মিশ্র বিস্ফোরণ। প্রথম মহাযুদ্ধে এর বহু ব্যবহার হয়েছিল। এটি রাইফেলে ও ভারী মেশিনগানে ব্যবহৃত হতো।

ট্রাইনাইট্রোটলুইন—টলুইনের সঙ্গে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় এই তীব্র বিস্ফোরকটি পাওয়া যায়। এটির ব্যবহার সর্বাধিক। সব যুদ্ধেই প্রামাণ্য বোমার উপাদান এটিই।

$4C_7H_5(NO_3)_2$ বা টি এন টি-র কার্যকারিতা আরো বহুগুণ বাড়ে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মিশিয়ে ব্যবহার করলে।

এগুলি ছাড়াও আরো বহু বিস্ফোরক পরে আবিষ্কৃত হয়ে বিস্ফোরকের তালিকা বাড়িয়েছে।

বিস্ফোরক আবিষ্কারের পাশাপাশি আবিষ্কার হয়েছে ডিটোনেটরের। এরা বিস্ফোরকের সঙ্গে থেকে আগে জ্বলে উঠে বিস্ফোরণকে দ্রুত ঘটতে সাহায্য করে। এরা হলো—মার্কারি ফালমিনেট $[Hg(ONC)_2]$, সিলভার ফালমিনেট (AgONC) এবং লেড অ্যাজাইড।

বিস্ফোরকের তালিকায় নানা নাইট্রোজেন যৌগ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে আছে ডাই-ফিনাইল অ্যামিন, ইথিলিন ডাইনাইট্রেট, ডাইনাইট্রো ন্যাপথালিন, ট্রাইনাইট্রোবেঞ্জিন (T.N.B.), পিকরিক অ্যাসিড, টেট্রা-নাইট্রোমিথেন, হেক্সানাইট্রোইথেন ইত্যাদি। আজকের অতি আধুনিক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকগুলি এই শ্রেণিরই।

একটি বিখ্যাত বিস্ফোরক ব্লাস্টিং জিলাটিন। বেশি মাত্রায় নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে অল্পমাত্রায় নাইট্রো-সেলুলোজের মিশ্রণে জেলির মতো এই বিস্ফোরকটি পাওয়া যায়। পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি করতে এটি খুবই উপযোগী। অবশ্য একাজে ডিনামাইটও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক ডিনামাইট আজ আর কিসেলঘরে (Kiselghur) শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিন নয়। আধুনিক ডিনামাইটে থাকে নাইট্রোগ্লিসারিন, কাঠের গুঁড়ো, কিছুটা করে ময়দা বা স্টার্চ, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও চকের গুঁড়ো।

ডিনামাইটের সমতুল্য ম্যানিটল হেক্সানাইট্রেটও একটি শক্তিশালী বিস্ফোরক।

কয়লাখনি ও অন্যান্য খনিতেও ডিনামাইট এবং বিকল্প ডিনামাইটের ব্যবহার প্রায় আবশ্যিক; তার প্রয়োজনেও নতুন নতুন বিস্ফোরকের পরীক্ষা করা হয়।

যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও ইচ্ছাকৃত ধ্বংস ছাড়া মানবকল্যাণে বিস্ফোরকের ব্যবহার কম নয়। পাহাড় ফাটানো, টানেল তৈরি, খাল কাটা, সমুদ্রগর্ভে বিশেষ বাধাকে অপসারণ, খনির কাজ, রাস্তা তৈরির কাজ ও আরো বহুবিধ কাজে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়। খনিতে, বিশেষ করে কয়লাখনিতে আজকাল অনেক উন্নত বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়। এগুলির নাম 'মোড়ক বিস্ফোরক' (Shealted explosive)। এগুলির ব্যবহার নিরাপদ।

আধুনিক কালে জঙ্গীবাদের সঙ্গে যুক্ত যে-বিস্ফোরকটি পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, তার নাম—আর ডি এক্স (RDX)। এর অনুষঙ্গী বিস্ফোরক পি ই টি এন (PETN)। আর ডি এক্স-এর পুরো কথাটি হলো 'রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপ্লোসিভ'। নামটি দিয়েছে মার্কিন সমর বিভাগ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে হেনিং আর ডি এক্স আবিষ্কার করেন। এটি তৈরি হয় হেক্সামিনের $[(CH_2)_6N_4$, ফর্মালডিহাইড ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় তৈরি] সঙ্গে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায়।

RDX এবং PETN-এর তুলনামূলক গঠন—

টরনেক্স—আরো তীব্র বিস্ফোরক। তৈরি হয় আর ডি এক্স, টি এন টি এবং অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ মিশিয়ে। এটি সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার করা হয়। এর বিস্ফোরণে তাপ উৎপন্ন হয় ৫১০০° সেন্টিগ্রেড।

টরনেক্সের মতো আরেক মিশ্র বিস্ফোরক হলো 'সি-ফোর' (C-4)। এতে RDX-ও থাকে। উপাদান—RDX (৯১%), ডাইসেলাফেট (৫.৩%), পলি আইসো বিউটিলীন (২.১%) এবং মোটর অয়েল (১.৬%)।

আর ডি এক্স বা সেমটেক্সের সঙ্গে মোম ও জিলাটিন প্লাস্টিসিন মেশালে কাদা বা ময়দার তালের মতো পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলির নাড়াচাড়া তেমন বিপজ্জনক নয়। এগুলি বেল্টে ভরে, গালে বা শরীরে মেখে লক্ষ্যবস্তু বা মানুষের কাছে গেলে সন্দেহের কোন কারণই ঘটে না। তারপর রিমোট কন্ট্রোলে ডিটোনেটর-যুক্ত এই পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটালে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যায়। জঙ্গীদের সুইসাইড স্কোয়াডে এটির বহুল ব্যবহার।

এইসব ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে মূল বিস্ফোরণকেন্দ্র থেকে নানা পদার্থ ছিটকে উঠে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যায় চারপাশে। তীব্র গতির এই পদার্থের ভরবেগে হাতুড়ির মতো আঘাতে ভেঙে পড়ে কংক্রিটের ঘরবাড়িও। ছিটকে যাওয়া এইসব পদার্থের ভরবেগ কী বিপুল, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে নিম্নোক্ত বিস্ফোরণগুলি থেকে নিক্ষিপ্ত পদার্থগুলির গতিবেগ পর্যালোচনা করে।

বিস্ফোরক	নিক্ষিপ্ত পদার্থের গতিবেগ (মিটার/সেকেণ্ড)
[illegible]	[illegible]

এইসব বিস্ফোরণের কয়েকটি উদাহরণ—

বেইরুট, ২৩ অক্টোবর ১৯৮৩। হোটেল হিলটন। বিস্ফোরণে গোটা হোটেল ভেঙে পড়ে মারা যায় কয়েকশো মার্কিন সেনা-সহ।

ভারত, ২১ মে ১৯৯১, শ্রীপেরামবুদুর। বিস্ফোরণে নিহত হন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

নিউ ইয়র্ক, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। কুইন্স টাওয়ারের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারের বেসমেন্টে বিস্ফোরণ। বিপুল ধ্বংস ও বহু হতাহত হয়।

মুম্বাই, ১২ মার্চ ১৯৯৩। স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ১৩টি জায়গায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। হতাহত ৫০০-র বেশি।

কলকাতা, ১৬ মার্চ ১৯৯৩। মধ্যরাতে বৌবাজারে বিস্ফোরণ, মৃত শতাধিক।

নয়া দিল্লি, ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬, সদরবাজার। বিস্ফোরণে প্রচুর ধ্বংস ও হতাহত।

পূর্ণ তালিকা আরো দীর্ঘ। এখনো প্রতিদিন এমন ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ ঘটছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এই শতাব্দীর শুধু নয়, ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম বিস্ফোরণে ধ্বংস হয় আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারের দুটি গগনচুম্বী বাড়ি। কিন্তু এ বিস্ফোরণের মূলে কোন বিস্ফোরক ছিল না। তার ধ্বংসের মূলে ছিল আছড়ে পড়া বিমানের বিপুল পরিমাণ পেট্রোলের জ্বলে ওঠা।

আজকাল পৃথিবীর, বিশেষ করে ভারতবর্ষের সব শহর ও গ্রামে কোন বিক্ষোভ হলেই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, দলে-ব্যক্তিতে, দলে-দলে, দলে-পুলিশে সংঘর্ষে ইতস্তত প্রায় মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক ঘটনার নেপথ্যেই রাজনৈতিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ বিশেষ ভূমিকা নেয়। এগুলি ঘটায় দুষ্কৃতকারীরাই, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক দলগুলির মদত অবশ্যই থাকে। বোমা উৎপাদন এখন প্রায় কুটিরশিল্পের পর্যায়ে। এইসব বোমার বেশির ভাগ মশলা কিন্তু প্রচলিত তুবড়ির মশলার মতো—পটাশিয়াম ক্লোরেট, গন্ধক, অ্যান্টিমণি সালফাইড, কাঁচের গুঁড়ো এবং জানা-অজানা আরো নানা মশলা। বোমার সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে মেশানো থাকে কিছু স্প্লিণ্টার —কাচের টুকরো, পেরেক ইত্যাদি। বোমা ফাটলে এই স্প্লিণ্টারগুলি তীব্র গতিতে ছুটে আক্রান্ত ব্যক্তির অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু ঘটায়।

বিচিত্র এই—যে-আগুনে ভাত রাঁধি, সেই আগুনেই ঘর পোড়ে। রসায়নে নাইট্রোজেন একটি রহস্যময় মৌল। তার ভূমিকাতেই উদ্ভব অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন এবং প্রাণের মূল বীজ ডি এন এ এবং আর এন এ। আবার বারুদ থেকে জাত আর ডি এক্স, টি এন টি—তার মূলেও নাইট্রোজেন। প্রসঙ্গত, তিল তিল মৃত্যুর কারণ যে-ড্রাগ হেরোয়িন, কোকেন—তার কেন্দ্রে রয়েছে অ্যালকালয়েড এবং তার মধ্যমণিও নাইট্রোজেন।

একে স্মরণ করেই কি মানুষের আদি প্রার্থনা—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" (শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্, ৪।২১) □

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

সামঞ্জস্য বিধান করাই উদ্দেশ্য

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'মহাভারতের চরিত্রচিত্রণ' বিষয়ক আলোচনাগুলি যথার্থই যুক্তিসঙ্গত। একথা ঠিক, 'পাতকী' দ্রৌপদী স্বামীজীর বক্তব্যে স্থান না পেলেও তাঁর কথায়—"সদাভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী।" ('বাণী ও রচনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮) আর তাঁর পঞ্চস্বামী গ্রহণে "মাতৃ-আজ্ঞাই মুখ্য কারণ।" (ঐ, পৃঃ ২৩৪) তাছাড়া শঙ্করীবাবুর নিজেরই উপলব্ধি—"দ্রৌপদী সম্বন্ধে ঠিকভাবে লিখতে হলে অক্ষয় কালির কলম, সেইসঙ্গে অপরিমেয় প্রতিভার প্রয়োজন।... তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী, গুণবতী ও সর্বসুলক্ষণযুক্তা।" ('উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪০৯, পৃঃ ৭১৮) আর যুধিষ্ঠির? শঙ্করীবাবু তাঁর বিরূপ সমালোচনা করলেও তাঁকে "রীতিমতো ধর্মজ্ঞ" বলে স্বীকার করেছেন। (ঐ, পৃঃ ৭১৩) স্বামীজীর মতে—"রাজার ভাব অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে অধিক ছিল।" ('বাণী ও রচনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮) অবশ্য শঙ্করীবাবু শেষে বলেছেন ঃ "অসঙ্গতির কারণেই তাঁরা [অর্থাৎ মহাভারতের চরিত্রগুলি] জীবন্ত মানুষ...।" এই আলোচনা রূঢ় বাস্তব হলেও স্রষ্টা ব্যাসদেবকে এর সঙ্গে জড়ানো ঠিক হয়নি বলে মনে হয়। কারণ আমাদের ভুললে চলবে না, রামায়ণ, মহাভারত 'একলা কবির কথা' নয়, বরং মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র। বস্তুত, ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না, ও তো একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১০৯) এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য আরো গর্বের—"রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজগতের সযত্নে রক্ষিত জাতীয় সম্পত্তি এবং তাঁহাদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে বর্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে-আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখনো বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।" ('বাণী ও রচনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮)

আমার মনে হয়, রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রগুলির ত্রুটি-দুর্বলতা না খুঁজে স্বামীজীর কথামতো এগুলির নতুন ইতিবাচক দিকের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যা মানবসমাজ তথা মানবকল্যাণের যথার্থ অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। উদাহরণ-স্বরূপ মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্য সৃষ্টির কথা বলা যায়। "সত্য ও দিব্যাত্মার ধারক হচ্ছেন সত্যবান—মৃত্যু ও অজ্ঞতার পঙ্কে নিমজ্জিত। সবিতা দুহিতা সাবিত্রী সর্বোচ্চ সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি জগতে জন্ম নিয়েছিলেন সকলকে রক্ষা করতে। আর অশ্বপতি (গতি বা প্রগতির প্রতীক বা প্রভু) হলেন সাবিত্রীর লৌকিক পিতা, যিনি তপস্যার অধিরাজ। মরজগৎ থেকে অমর্ত্যলোকে উন্নতিলাভের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ঘনীভূত শক্তিপুঞ্জ। দ্যুমৎ সেন, সত্যবানের পিতা হলেন নির্মল আতিথ্যের অধিপতি, দৈবীমানসের অধিকারী। কিন্তু অন্ধ, অধ্যাত্মদৃষ্টির জগৎ থেকে নির্বাসিত এবং গৌরবশালী আপন রাজ্যভ্রষ্ট।" (সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ—নীরদবরণ চক্রবর্তী, পৃঃ ২০৪) মানবাত্মার প্রতীক সত্যবানকে দেবী সাবিত্রী তাঁর কল্পনাতীত কঠোর যোগশক্তির বলে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এতে অন্ধকারের, অজ্ঞানের তথা মৃত্যুর পরাজয় ঘটে। জগতে আলো, সত্য ও আনন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দও মহাভারতের অন্তর্গত গীতার নতুনত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ "পূর্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পরবিবাদ ছিল; ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে-সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।... এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫২) এই সমন্বয়ের ভাব আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করে পরস্পরকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে। এপ্রসঙ্গে সর্বধর্মসমন্বয়ে স্বামীজীর নির্দেশিত 'ওঙ্কারোপাসনা'র কথাও স্মরণযোগ্য। (ঐ, পৃঃ ২০১) কাজেই কোন বিতর্ক নয়, বরং মহাভারতের মধ্য থেকে সন্ধান করতে হবে নতুন জগৎ, নতুন মানবজাতি সৃষ্টির ইঙ্গিত—যার বার্তাবহ 'উদ্বোধন'—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর বাণীশরীর—যা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'-তে উৎসর্গীকৃত শ্রদ্ধেয় ত্যাগব্রতিগণের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনায় সদা গতিশীল।

প্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান
বাহারপোতা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ১৫১

দুটি তথ্যের সংশোধন প্রয়োজন

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৯ সংখ্যার দুটি লেখা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নিবেদনের জন্য এই পত্র।

(১) বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও কলকাতা' প্রবন্ধটি তথ্যবহুল এবং সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই। তবে কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ চলছিল, সেই সম্বন্ধে ১৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—"কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সেসময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেখানে উপস্থিত। তাঁকে

দেখে কেশব একটু অপ্রস্তুত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলছেন ঃ 'তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ।' "

অপরদিকে 'কথামৃত'-এ দেখতে পাই, ঘটনাটির প্রেক্ষাপট —'শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার'। (১।২।৭) অর্থাৎ স্থানটি দক্ষিণেশ্বর নয়। সেখানে লেখা আছে ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ। (হাস্য) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো, দুজনে ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না। (উচ্চহাস্য)"

লেখক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপরি উক্ত উদ্ধৃতির সমর্থনে 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করেননি। সুতরাং এবিষয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে গেল।

(২) 'পরিক্রমা' বিভাগে চিরঞ্জন মজুমদারের 'স্থাপত্য ও ইতিহাসের মিলনভূমি মহীশূর' রচনার ১৯০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—"এই ওয়াদিয়ার রাজবংশের রাজত্ব চলে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর মহীশূরের রাজা হন ঐ রাজবংশের বীর সেনাপতি হায়দার আলি।" আসলে হায়দার আলি প্রথমে ওয়াদিয়ার রাজাদের অধীনে একজন সৈনিক ছিলেন। পরে কর্মদক্ষতায় সেনাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। ওয়াদিয়ার রাজা তাঁকে মহীশূর রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদেও নিযুক্ত করেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে তিনি মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন দখল করেন। (দ্রঃ স্বদেশকথা—ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী) প্রবন্ধটির অন্যত্র (পৃঃ ১৯৩) লেখক অবশ্য এই কথা অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "ঐ রাজবংশের (অর্থাৎ ওয়াদিয়ার রাজবংশের) হায়দার আলি" বলে উল্লেখ করা বোধহয় ঠিক হয়নি।

ঐ পৃষ্ঠাতেই লেখা হয়েছে—"টিপুর পরাভবের পর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশের দখলে যায় এই মহীশূর। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন মহারাজা জয় চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার করদ-রাজ্য মহীশূরকে ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত নেন।" এখানেও ইতিহাসের একটু ফাঁক থেকে যায়। টিপুর পরাজয়ের পর মহীশূর রাজ্য যদি ব্রিটিশের দখলেই যায় তবে ওয়াদিয়ার রাজপরিবার কোথা থেকে এল! আসলে টিপুর পরাজয়ের পর ব্রিটিশরাই মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব ওয়াদিয়ার রাজবংশের হাতে তুলে দেয়—একটি করদ-রাজ্য হিসাবে।

সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা
সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

শিক্ষায় ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

১৫ ডিসেম্বর ২০০২-এর 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ভারতের রাষ্ট্রপতির এক বক্তব্য সম্পর্কে এই কথাগুলি প্রকাশিত হয়েছে —"Dr. A. P. J. Abdul Kalam today urged all states to join in the endeavour to transform India into a 'Knowledge Society' by the year 2012." এখানে রাষ্ট্রপতি ভারতকে এক 'জ্ঞানসমৃদ্ধ' সমাজে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আশাবাদী মনোভাবের অন্তরালে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর বোধ এবং দৃঢ় বিশ্বাস সুস্পষ্ট। বর্তমান সময়ে ভারত এবং বহির্বিশ্বের ছাত্রসমাজের মানসিকতার তুলনা করলে এই বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায় তা বোঝা যাবে।

প্রথমে বহির্বিশ্বের ছাত্রসমাজের অবস্থা-সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেওয়া যাক। কয়েক মাস আগেই সংবাদপত্রে দেখা গেছে, জার্মানির এক স্কুলে এক ছাত্রের গুলিতে ১৭ জনের মৃত্যু হলো। নিহতদের অধিকাংশই শিক্ষক। এই ভয়াবহ ঘটনা উপলক্ষ্যে জার্মানির নেতৃবর্গ স্মরণ করেছেন বেশ কিছুকাল আগের স্কটল্যাণ্ডের এক অনুরূপ ঘটনা।

আরো কয়েকটি দেশের ছাত্রদের অবস্থা দেখা যাক। এই তথ্যগুলি 'Britannica Book of the year 2000' থেকে পাওয়া গেছে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকার লিটল্‌টনে কলম্বাইন হাইস্কুলের দুই ছাত্র গুলি করে ১৩ জনকে হত্যা এবং ৩০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে আহত করে। তারপর তারাও আত্মহত্যা করে। এর একমাস পর ঐ স্কুলেরই ১৫ বছর বয়সের এক ছাত্র এক হাইস্কুলের ৬ জন ছাত্রকে গুলি করে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপ কয়েকটি ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়। ওদেশে অভিভাবকদের অনেকেই সরকারি স্কুলের ওপর আস্থা হারিয়ে এমন স্কুলের দিকে ঝুঁকছেন, যেখানে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

জাপানে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুলছাত্রদের ৩৫,২৪৬টি হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ নথিভুক্ত হয়েছে; এর মধ্যে ১৮,৪০০টি ঘটেছে ছাত্রদের মধ্যে, ৪,৫০০টি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এবং ১০,৪০০টি ঘটনায় স্কুলের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। এইসব ঘটনার কারণ হিসাবে পারিবারিক জীবনের শিথিলতা এবং ছাত্র-শিক্ষক দূরত্ব চিহ্নিত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস এলাকায় ৩,৯১৮ জন স্কুল ছাত্রকে নিয়ে এক সমীক্ষায় শতকরা ৩৭ ভাগ ছাত্রের অস্বাভাবিক আচরণ দেখা গেছে। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা।

গ্রিসের সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাতে ছাত্রদের বেশি করে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এর প্রতিবাদে ৩,১৪০টি সরকারি স্কুলের সবকটিতেই ছাত্ররা অনশন-সহ অবস্থান ধর্মঘট করে এবং ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্কুলের আসবাব নষ্ট করে।

ফ্রান্সের এক সমীক্ষায় দেখা গেল, যেসব ছাত্র হাইস্কুলে ভর্তি হতে আসে তাদের শতকরা ২০ জন বই পড়তেই (reading) পারে না এবং শতকরা ৩৮ জন পাটিগণিতের সাধারণ অঙ্কও কষতে পারে না, কিন্তু ক্যালকুলেটর ব্যবহার জানে। সরকার এই অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করলে সারাদেশে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়।

এইসব দেশই বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার ধারক ও বাহক। এখানে ব্যক্তি বস্তুস্তূপের বেষ্টনে পরস্পর থেকে

বিচ্ছিন্ন। এই সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হলো ঃ

"Its members, male or female, increasingly come to think of their wages as their own... This attitude is encouraged by the increasing availability of attractive consumer goods.... For older members, the family becomes merely the domicile... their minds are formed more by influences operating outside it." (Encyclopedia Britannica, Vol. 24, 1998, p. 285) এইভাবে দেখানো হয়েছে, কিভাবে পরিবারের বাঁধন শিথিল হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। অথচ পরিবারের গুরুত্বের স্বীকৃতিও আছে ঃ "Indeed, no social institution has as great an influence throughout development as does the family." (Ibid., Vol. 14, p. 840)

আজ তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে পরিবারের অস্তিত্ব দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। সেখানে অধিকাংশ শিশু পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্নেহবাৎসল্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবিক ও সামাজিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সমাজজীবন বিপর্যস্ত। কাজেই কেবল পাশবিক বর্বরতা সম্বল করেই অধিকাংশ শিশুকে বেড়ে উঠতে হচ্ছে। এই অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি ছাত্র-ছাত্রীর আচরণে পরিস্ফুট। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, ভবিষ্যতে ঐসব সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং তারা সবদিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়বে।

এর পাশাপাশি ভারতীয় ছাত্রসমাজের কথা ভাবলে বোঝা যাবে, আপাতদৃষ্টিতে উদ্বেগজনক হলেও এদের আচরণ অনেক বেশি পরিশীলিত। এখানকার পরিবার-ভিত্তিক সমাজে শিশুরা বিভিন্ন মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। উগ্র ভোগবাদী সমাজে ছাত্রদের মন রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত; এদেশের বৃহত্তর ছাত্রসমাজের মন স্থৈর্যশীল, প্রশান্ত এবং উর্ধ্বায়ন-উন্মুখ। এরই ভিত্তিতে উন্নত মানের গুণাবলীসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এমন ইঙ্গিত যথেষ্টই পাওয়া যায়। ২৮ নভেম্বর ২০০২-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দ্বিতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে—"আমেরিকায় উচ্চশিক্ষাভিলাষী বিদেশী ছাত্রসমাজে ভারতীয়রা এখন সংখ্যায় একনম্বর।... সর্বাধিক সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সহজ সরল অর্থ, উচ্চশিক্ষার্থে আবেদনকারী বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত মানে ভারতীয়রাই সর্বোত্তম।"

ভারতের এখন প্রয়োজন এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা—(১) কিছু নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তি উন্নত সভ্যতার নামে যে বর্বরতার আমদানি করছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করা; (২) ভারতীয় সভ্যতার কুসংস্কারমুক্ত প্রকৃত মানবিক ধারা চিহ্নিত করা এবং (৩) তারই ভিত্তিতে উন্নততম আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এর ফলে আগামী দিনে ভারত স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে এবং উদ্‌ভ্রান্ত অবশিষ্ট বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাভাব কিংবা অন্য কোন অজুহাতে এই বিষয়টির অবহেলা একান্তই অনুচিত।

সুবলচন্দ্র মণ্ডল
চাকদহ, নদীয়া-৭৪১ ২২২

কোষ্ঠবদ্ধতা ও তার প্রতিকার

কোষ্ঠবদ্ধতা দেহের প্রায় সকল রোগের উৎপত্তির কারণ। একটা বয়সের পর বহু মানুষ এই রোগে কষ্ট পেয়ে থাকেন। জিবের ওপর ময়লা জমা, মুখে দুর্গন্ধ হওয়া, হঠাৎ মাথাধরা, পেটব্যথা, বমি-বমি ভাব, অনিদ্রা, শারীরিক দুর্বলতা, খিটখিটে মেজাজ, অনিয়মিত দুর্গন্ধযুক্ত (কখনো কখনো কালচে রঙের) মলত্যাগ প্রভৃতি হলো কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ। শ্রমবিমুখতা, অতিরিক্ত আমিষ ভোজন, অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়া, মানসিক উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কোষ্ঠবদ্ধতার প্রধান কারণ। আমাদের দেশে জলবায়ুজনিত কারণে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে এই রোগের কষ্ট বেশিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তবে কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যেমন—

(১) ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর চা-চামচের ৩ চামচ ভর্তি উৎকৃষ্ট মানের ছোলার ছাতুর সঙ্গে ১ চামচ চিনি/মধু মেশাতে হবে। এবার গ্লাসটি জলে ভর্তি করে সরবত তৈরি হলে পান করুন। এরপর আরো ১-২ গ্লাস শুধু জল পান করুন।

(২) এরপর প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন। অবশ্যই ব্রাহ্মমুহূর্তে। ১½+১½ কিমি./ ২+২ কিমি. পথ হাঁটুন। যাঁর যেমন গতিতে হাঁটতে ভাল লাগবে, তাঁর তেমন গতিতেই হাঁটা দরকার। ভ্রমণকালে কথাবার্তা না বলাই ভাল।

(৩) বাড়িতে ফিরে এসে পোশাক বদলে একটু ব্যায়াম করুন। প্রথমে (ক) বিপরীতকরণী মুদ্রা, তারপর (খ) শবাসন এবং শেষে (গ) ময়ূরাসন। এই ময়ূরাসন করার সময় শ্বাস কিছুটা নিয়ে, শ্বাসবদ্ধ অবস্থায় নিজের শরীরকে দুহাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তুলবেন। এই আসনটি ৩-৪ বার করবেন। প্রত্যেকবার ৪/৫ সেকেণ্ড আসনটিতে থাকবেন। এই আসনটি অভ্যাস করতে সময় লাগবে। কোন ভাল ব্যায়ামের বই কিনে অভ্যাস করাই ভাল। এই ব্যায়ামগুলি করতে ১০ মিনিটের মতো সময় লাগবে। সন্ধ্যায় এই ব্যায়ামগুলি আবার করবেন।

(৪) ব্যায়াম-শেষে ২-৩ গ্লাস জল পান করবেন। সুস্বাস্থ্যের জন্য অধিক পরিমাণে জল পান অবশ্য কর্তব্য।

ছাতুর সরবত, প্রাতঃভ্রমণ, ব্যায়াম ও জল পান—এই চারদফা কর্মসূচীর মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীকরণে ছাতুর সরবত ও ময়ূরাসনের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সবশেষে আরেকটা কথা বলি, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিপাকযন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই চর্বিজাতীয় এবং ঝালমশলাযুক্ত খাদ্যগ্রহণ যতদূর সম্ভব কম করা দরকার।

বিকাশরঞ্জন চৌধুরী
চাঁদমারিডাঙা, বাঁকুড়া-৭২২ ১০১

শ্রীরামকৃষ্ণ : অন্য চোখে

তরুণকুমার দে

কেন লেখা?

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বিপ্লবের কাহিনী নিয়ে পালা রচনার পরিকল্পনা প্রায় সেরে ফেলেছিলেন, সেই সময়ে ঐ কাজ কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রেখে তিনি লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনভিত্তিক এক পালা। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, যাত্রাজগতে ঐসময়ে প্রবহমান দুটি প্রবল স্রোতের বিরোধিতা করা। ঐ স্রোত-দুটির প্রথমটি ছিল—কর্মপ্রয়াস ও পুরুষকারকে অবহেলা করে অন্ধবিশ্বাসে দেবতার আরাধনা করা। এই সমাজে কর্মবিমুখ মানুষ যাকিছু না পাওয়ার বেদনা অনুভব করে, মনে করে ঈশ্বরের কাছে তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজাতীয় পালাতে দর্শকের মন ঐদিকেই আকৃষ্ট করা হতো। ফলত, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী 'ফোঁস' করার সামান্য প্রবণতাটুকুও অবলুপ্ত হচ্ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল নব্যধারা, যাতে ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার কথা বলা হতো। এজাতীয় পালার অধিকাংশের মধ্যে সহিংস মুক্তিসংগ্রামের কথা বলা হতো। কিন্তু সংগ্রামের পূর্বে সাংগঠনিক প্রস্তুতি, সংগ্রামের সুচিন্তিত ইতিবাচক রূপ ইত্যাদি বিশেষ প্রাধান্য পেত না। চিন্তাশীল বামপন্থীদের ভাষায় ঐ পথকে হঠকারিতারূপেই চিহ্নিত করা হতো বা হয়েছে। কারণ, আদর্শ মহৎ হলেও সুনির্দিষ্ট চিন্তাকে বাদ দিয়ে শুধু আবেগকে সম্বল করে সমাজ-পরিবর্তনের পথে নামলে ব্যক্তি বা দেশ কারো ক্ষেত্রেই পরিণতি শুভ হয় না। এই দুটি স্রোতকেই মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা ছিল আলোচ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী বিষয়ক পালাতে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই একদল উগ্র বামপন্থীর মধ্যে পুরনো সমস্ত রীতি এবং মতবাদকে অস্বীকার ও নস্যাৎ করার প্রবণতা প্রবল হচ্ছিল। ঐসব বামপন্থীরা ভুলে গিয়েছিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী বহু মানুষ এযুগেও আছেন—যাঁরা নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন। আর এটা তো জ্বলন্ত সত্য যে, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি থেকেও ঈশ্বরবিশ্বাসকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

আলোচ্য পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরগতপ্রাণ হলেও তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলী আজও অনেক প্রগতিশীল মানুষের অনুকরণীয়। এই কারণেই ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবাদমুখর অশান্ত পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীভিত্তিক পালা উপহার দিয়েছিলেন।

শুরু

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্ব। স্বভাবতই তাঁকে নিয়ে প্রচুর গল্প, স্মৃতিকথা, জীবনীগ্রন্থ, কবিতা, গান, নাটক ও যাত্রাপালা লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। রঙ্গমঞ্চে খুব সম্ভব গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'নসীরাম' নাটকেই, যদিও রূপকাকারে, প্রথম দেখা গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে। যাত্রার আসরে জীবনীপালার প্রচলন হয়েছে আধুনিক কালে। ১৯৪৬-এ 'মায়ের ডাক' এবং ১৯৪৮-এ 'ধরার দেবতা'র সাফল্যের পরে হাল আমলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'মাইকেল মধুসূদন' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালার জনপ্রিয়তা লাভের ফলশ্রুতিতে যাত্রাজগতে জীবনীপালার প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছিল। অতঃপর যাত্রার আসরে বহু জীবনীপালা অভিনীত হয়েছে। ঐসব জীবনীপালার অনেকগুলিতেই প্রধান বা পার্শ্বচরিত্র হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা গেছে। বর্তমান আলোচনা একদা নট্ট কোম্পানি অভিনীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনীপালা নিয়ে। যাত্রায় সাধারণত শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের ভাববাদ, প্রবল ভক্তিভাব এবং অলৌকিক ঘটনাবলী প্রাধান্য পেত বা পেয়েছে। এই পালাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী বা ঘটনাবলী একেবারে বাদ না দিয়েও মানবতাবাদী ও 'সেকুলার' শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলে ধরা হয়েছিল। এর ফলে তাঁর চরিত্রটি পেয়েছিল ভিন্ন মাত্রা। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র লেখনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছিল, সেসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

সারল্য

পালায় শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে সারল্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল। সেটি মোটেও আরোপিত ছিল না। বাস্তবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত সরল এবং সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ। গোটা পালা জুড়েই তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। 'নটী বিনোদিনী' পালার কল্যাণে রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণকে অপমান করা, খাবার আসন থেকে তুলে দেওয়া এবং 'Get out' বলার ঘটনা কারো জানতে বাকি নেই। আলোচ্য পালায় ঐ ঘটনার পরের দৃশ্যটি বিধৃত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ঐসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সারল্যের চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পালাটির সংশ্লিষ্ট অংশটি এরকম—

"নির্মল॥ কাল রাতে অতখানি অপমান সয়ে চলে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণ॥ তখন না চলে এলে হয়তো ধরে দু-ঘা দিয়েই দিত।

নির্মল॥ আপনাকে খেতে বসিয়ে হাত ধরে তুলে দিয়েছিল—

রামকৃষ্ণ॥ ভালই করেছিল। অত রাতে অমন ফুলকো লুচি বেশি খেলে পেট ছেড়ে দিত।

নির্মল॥ আবার 'Get out' বলেছিল।

রামকৃষ্ণ॥ তাতেই তো জানতে পারলুম, 'Get out' মানে বেরিয়ে যাও। এখন আমাকে কেউ বিরক্ত করলেই বলে দেব—'Get out'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই মানের গোড়ায় ছাই দেওয়ার কথা বলতেন। আসলে অহঙ্কার ও আত্মাভিমান বর্জন করতে না পারলে ঈশ্বরলাভ হয় না—এটা তিনি জানতেন। আর সাধারণ মানুষের চরিত্রে দোষত্রুটি থাকতেই পারে। তাদের কাছে পৌঁছাতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই গায়ে ধুলোবালি লাগবে। সেই ভয়ে পিছিয়ে এলে আসল কাজটাই হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের সারল্যের উল্টোপিঠেই ছিল মানসিক দৃঢ়তা। ফলে খুব সহজেই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন ঐজাতীয় আঘাত, যা সাধারণ মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথাগুলি স্মরণযোগ্য—"তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিল, সেটি হইতেছে তাঁহার অপূর্ব সরলতা।"

নির্লোভ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবিতাবস্থাতেই যে প্রচার ও প্রতিপত্তি পেয়েছিলেন, তাতে ইচ্ছে করলেই তিনি শেষ জীবন চরম বিলাসে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে-পথে তিনি হাঁটেননি। সাদামাটা জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন আমৃত্যু। পালাতে সেজাতীয় ঘটনা কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে। মথুরবাবু তাঁকে একটি দামি শাল উপহার দিয়েছিলেন। সরলচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সেই শাল গায়ে দিয়েছিলেন, তারপরে ফেলে দিয়েছিলেন। এ-ঘটনাটি পালাতে হৃদয়ের জবানীতে বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মা চন্দ্রমণি দেবীও ঐরকমই নির্লোভ ছিলেন। মথুরবাবু কিছু সম্পত্তি দান করতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তা প্রত্যাখ্যান করায় মথুরবাবু তাঁর মাকে প্রস্তাব দেন—

"মথুর॥ আমার নিজেরই না দিয়ে শান্তি হচ্ছে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যা তোমার ইচ্ছে চেয়ে নাও।

চন্দ্রমণি॥ তাহলে এক কাজ কর ভাই। আমার দাঁতে দেবার গুল ফুরিয়ে গেছে, চার পয়সার গুল আনিয়ে দাও।"

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগপুরুষদের জীবনে এই গুণই লক্ষ্য করা গেছে। বুদ্ধদেব রাজসুখ ত্যাগ করে মানুষের মুক্তির সন্ধানে পথে নেমে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন বহির্বাংলার আঙিনায়। শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানুষের কল্যাণে। যাঁরা মহামানব—এটাই তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁরা বিশ্বমানবতার জন্য ভাবেন, নিজের বা নিজের আত্মীয়দের প্রতি পক্ষপাত তাঁদের থাকে না। সভ্যতার অগ্রগতিতে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

চিন্তায় বাস্তবতা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ছাত্রছাত্রীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাববাদী বলে থাকেন। ভাববাদী হলেও তাঁর চিন্তায় যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। বস্তুত, বাস্তব-চিন্তার অধিকারী না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনোই উনবিংশ শতাব্দীর সবধরনের elite বা আলোকিত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন না। প্রায়-নাস্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন। আবার মন্দিরের কৃষ্ণবিগ্রহের পা ভেঙে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা রায় দিয়েছিলেন—নতুন বিগ্রহ বসাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বিগ্রহ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। পালাকারের ভাষায়—

"গদাধর॥ তোমার এক জামায়ের যদি পড়ে গিয়ে একখানা পা ভেঙে যায়, তুমি কি তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আরেকটা জামাই ধরে আনবে? না, চিকিচ্ছে করে পা জুড়ে দেবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচলিত জীবনীগুলির প্রায় সবকটিতেই জানা যায়, দক্ষিণেশ্বরের একটি জবাফুল গাছে একই সঙ্গে সাদা আর লাল জবা ফুটেছিল। ঐ ঘটনা দেখিয়ে পালাগানের আসরে ভক্তির স্রোত বইয়ে দেওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার দে সে-পথ মাড়াননি। তাঁর রচিত সংলাপটি ছিল এরকম—

"গদাধর॥ এও তো একটা নিয়ম।... কোথায় ভেলকি দেখলি র‍্যা? এটাও তো প্রকৃতির নিয়ম। গাছ-গাছড়া নিয়ে যারা কারবার করে তাদের শুধো, সব বলে দেবে।"

ঐসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা এই মতকে সমর্থনই জানাবে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অলৌকিকতার চেয়ে বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, তা তাঁর কথিত একটি গল্প থেকে বোঝা যায়। তিনি বলতেন, এক সাধু বহুবছর তপস্যা করে হেঁটে নদী পার হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই তপস্যালব্ধ দক্ষতার মূল্যায়ন করেছিলেন এক পয়সা দিয়ে। কারণ, এক পয়সা মাঝিকে দিলেই সে নদী পার করিয়ে দেয়। [ক্রমশ] (এক)

মনের দরজা খুলে

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য

What Swami Vivekananda Means to Me
Editors :
Steven Shank
David Leventer
Publish by :
The Vedanta Society of Portland, Oregon
1157 S.E. 55th Avenue
Portland, Oregon 97215
Price : $5 ● Pages : 2+64
Date of Publication : 1993

বাস্তবিকই স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা মানে লণ্ঠনের ভীরু আলোয় সূর্যের মুখ দেখা। কেননা আকাশছোঁয়া যাঁর বৈদগ্ধ্য, বৈরাগ্য যাঁর সুসংবদ্ধ, গভীর যাঁর মানবচেতনা—সেই হৃদয়বান সন্ন্যাসীকে অক্ষরবন্দী করা যে সহজ কাজ নয় তা সংশয়াতীত। তবু **'What Swami Vivekananda Means To Me'** গ্রন্থে ২৫ জন মানুষ গদ্যে ও পদ্যে অল্পকথায় তুলে ধরেছেন স্বামীজীকে। মনের দরজা খুলে তাঁরা নিপুণ হাতে লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা স্পষ্ট। এঁরা নানা পেশার মানুষ। কেউ শিক্ষক—দর্শন বা ধর্মের, কেউ আইনবিদ্, কেউ মনোবিজ্ঞানী, শিল্পী, ডাক্তার, সেবিকা, বণিক, এমনকি সন্ন্যাসিনীর মা। স্বামীজীর মধ্যে তাঁদের ভাবনা খুঁজে পেয়েছে অনন্ত রত্নের সন্ধান। সুখ-দুঃখের দোটানায় পড়ে যখন তাঁরা বিভ্রান্ত, তখন তাঁরা এই 'র‍্যাডিক্যাল' সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। চেয়েছেন পথের দিশা। বিশ্বের নানা প্রান্তের এই ভক্তদের চোখে কোন্ বিবেকানন্দ ধরা পড়েছেন? প্রথমজন বন্ধু—সুজন সন্ন্যাসী। দ্বিতীয়জন ব্রহ্মবিদ্—রীতিমতো বেদান্তবাদী। তৃতীয়জন সহৃদয় মানুষ—বাস্তববাদী, মানুষের সুখ-দুঃখে উদ্বিগ্ন, অস্থিরতা-দীর্ণ এক সত্তা, মানবকল্যাণে নিবেদিত। ধর্মের নামে যুক্তির সমস্ত দরজা-জানালা তিনি বন্ধ করেননি। স্বদেশকেও তিনি ঈশ্বরের পাশে রেখে পূজা করেছেন। এই দিকটি বিদেশী ভক্তদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

সেন্ট পলের মতো পরিব্রাজক এই সুহৃদ সন্ন্যাসী প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে পশ্চিমে হাজির হন। মুক্তহস্তে তাঁদের দিলেন অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য। বললেন—দুঃখী তারা, যারা দুর্বল। তাদের সিংহসাহসের সাধনাই ধর্ম। এ-কাজ ক্লান্তিহীন, আসক্তিশূন্য। মনের শক্তিই মন্ত্রশক্তি। বিবেকানন্দ-কথিত ধর্মের এই অচেনা দিকটিই ছুঁয়ে যায় পাশ্চাত্যবাসীদের অন্তর। কলম্বাস আমেরিকার ভৌগোলিক দেহ আবিষ্কার করেছিলেন, আর স্বামীজী করলেন তাঁদের আত্মাকে।

তাই দেখি স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট আমেরিকার ২৯ জন মহান অতিথির মধ্যে স্বামীজীকে একজন শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক হিসাবে সম্মান দিয়েছে। ১৯৭৬ সালে তাঁরা দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটির কাছে এই কারণে স্বামীজীর ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী চেয়ে পাঠান। যেকোন ভারতবাসীই গর্ব অনুভব করবেন এই গৌরবময় সংবাদের জন্য। এই আনন্দ-সংবাদ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। আগ্রহী পাঠকেরা এই গ্রন্থ থেকে জানতে পারবেন আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কর্মযজ্ঞ।

ওয়েড ডেজি এবং স্টুয়ার্ট বুশের চিন্তাসমৃদ্ধ লেখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর 'Turn and face the brutes'—এই নির্দেশ বিদেশীদের চিন্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, আমরা স্বরূপত অখণ্ড। অখণ্ডের ঘরের লোক। কিন্তু আমাদের মন কুয়োর ব্যাঙের মতো। তাই ছাই চাপা পড়েছে স্ফুলিঙ্গ। তাঁর মতে, আমরা সবাই পারি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে। স্বামীজীর ভাষা তাই লেখার কালির মতো ঠাণ্ডা নয়, দেহের রক্তের মতোই উষ্ণ।

এই গ্রন্থটি আলো করে আছে মনস্বী সন্ন্যাসীর দর্শন ও জীবন। এটি বাঙলায় অনূদিত হলে বোধকরি অনেকে উপকৃত হবেন। মাত্র ৬৬ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট গ্রন্থ আমাদের এক নতুন, তাজা হওয়ার স্পর্শ দেয়। সন্ধান দেয় সার্থক জীবনের। ❑

ইতিহাস-গবেষণায় নতুন সংযোজন

রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
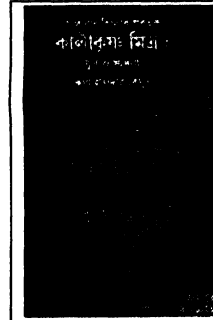
বঙ্গে নারীশিক্ষার প্রবর্তক
কালীকৃষ্ণ মিত্র ঃ যুগ ও সাধনা
ঝর্না হালদার (বসু)
প্রকাশক ঃ বিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
মূল্য ঃ ২৫ টাকা
পৃঃ ১৮+৬৪
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৭

উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ঘটে, তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ধারণ করেছিল কলকাতা, কিন্তু রাজধানীর সীমানা ছাড়িয়ে তা সন্নিহিত জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির নতুন কর্মোন্মাদনা ও গঠনমূলক চিন্তার পরিণামে গড়ে উঠেছিল নানা প্রতিষ্ঠান। সেই সার্বিক নির্মাণকাজের অন্যতম স্মারক উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার

বারাসত বালিকা বিদ্যালয়। এটি স্থাপিত হয় ১৮৪৭ সালে। একাজে উদ্যোগী হন মুখ্যত সেযুগের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাধানাথ শিকদার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র।

'বঙ্গে নারীশিক্ষার প্রবর্তক কালীকৃষ্ণ মিত্র ঃ যুগ ও সাধনা' গ্রন্থটিতে ঝর্না হালদার (বসু) কালীকৃষ্ণ মিত্রের জীবন ও কর্মধারার পরিচয় দিয়েছেন। মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে নবজাগৃতির প্রেক্ষাপট, নারীশিক্ষার উদ্যোগ, কালীকৃষ্ণ মিত্রের পারিবারিক পরিচয় ও নানা উদ্যোগের আলোচনা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে কিছু তথ্য, বিশেষত 'পরিশিষ্ট' অংশে যা সংযুক্ত হয়েছে, তা গ্রন্থটির শীর্ষনামের প্রেক্ষিতে অবশ্য প্রাসঙ্গিক নয়। কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কেও ভিন্নমতের অবকাশ আছে। যেমন বলা হয়েছে—১৮৪৭ সালের আগে "সমাজের অভ্যন্তরে নারীশিক্ষার জন্য তেমন কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি।" (পৃঃ ১০) প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়ের সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন ও বেন্টিঙ্কের সতীদাহ নিরোধ আইন (১৮২৯) পাশ হওয়ার পর হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্ররা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে উৎসাহী হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীশিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ (১৮৪০), প্যারীচাঁদ মিত্রের এই বিষয়ক আলোচনা, রামগোপাল ঘোষের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন (১৮৪২) এবং ঐ প্রতিযোগিতায় মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ ইত্যাদি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, এদেশীয়দের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমকালীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শান্তিপুরের নারীরা শিক্ষার সুযোগ চেয়ে চিঠি লেখেন এবং ১৮৩৫ সালের ১৫ মার্চের 'সমাচার দর্পণ'-এ চুঁচুড়ার নারীরা সেই বক্তব্য জোরালোভাবে সমর্থন করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'তেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে একটি তথ্য উল্লেখ্য, ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি চেয়ে এডুকেশন কাউন্সিলের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু কাউন্সিল চারবছর এবিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। পরে জানায় যে, বেথুন নিজেই পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তার ফলাফল দেখে তবে ঐ আবেদন মঞ্জুর করবেন। এই প্রসঙ্গটি জানিয়েছেন ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল 'বেথুন স্কুল ও কলেজ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ'-এ। (পৃঃ ২) সেদিন জয়কৃষ্ণের আবেদন গৃহীত হলে ১৮৪৫ সালেই বাংলায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হতো। সুতরাং ১৮৪৭-এর আগে বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের প্রমাণ দুর্লভ নয়।

একইভাবে আরেকটি মন্তব্যে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়কে 'বঙ্গের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়' ('কথামুখ') বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে হানা মার্শম্যান স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়, যাকে হুগলি জেলার ইতিহাসপ্রণেতা বলেছেন—'বঙ্গদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়' অথবা ১৮২৪ সালে শ্রীরামপুর এলাকার ১৩টি বালিকা বিদ্যালয়, ১৮১৮ সালে মে সাহেবের উদ্যোগে পরিচালিত চুঁচুড়ার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অবশ্য এতে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের গৌরবহানি হয় না, কারণ এই বিদ্যালয়গুলি মিশনারি-উদ্যোগে স্থাপিত বা পরিচালিত। সুতরাং বারাসত বালিকা বিদ্যালয়কে দেশীয়দের উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বলাই সঙ্গত। স্বয়ং বেথুন তাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা পান বারাসত বালিকা বিদ্যালয় থেকে।

দুঃখের বিষয়, বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কালীকৃষ্ণ মিত্রের নাম অনেকের কাছে অজ্ঞাত। 'ভারতকোষ', 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ নেই। কিন্তু রাধানাথ শিকদারের নাম আছে। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের জীবনীকোষেও একই কথা। তাই বঙ্গে নারীশিক্ষার প্রবর্তক হিসাবে বিদ্যাসাগর-বেথুনের দাবি খণ্ডন করে কালীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করার যে-প্রচেষ্টা এগ্রন্থটিতে রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এক নতুন গবেষণার ইঙ্গিত দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থে তুলনায় অপ্রয়োজনীয় তথ্য পরিহার করে উল্লিখিত বিষয়টির ওপরে আরেকটু গুরুত্ব দিলে পাঠকের প্রত্যাশাপূরণ হতে পারত। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের সংযোজন ও বিশ্লেষণে নিপুণ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ে। উনিশ শতকের ইতিহাসের এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাদানের এই আন্তরিক উদ্যোগকে, আশা করি, পাঠকমাত্রেই সাধুবাদ জানাবেন। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—সঙ্কলক ঃ মণীন্দ্রকুমার সরকার।** প্রকাশিকা ঃ ভারতী সরকার, প্রযত্নে দিলীপ সরকার, ২ দেশবন্ধু নগর, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। পৃঃ ১০+১২৮। মূল্য ঃ ২৫ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০০।
- **শ্রীহট্ট অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-প্রসারের ধারা—ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।** প্রকাশক ঃ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ৯৫/৪৩ বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৪২। পৃঃ ২+২০। মূল্য ঃ ৫ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৬।
- **চারিত্রিক উৎকর্ষ—কমল নন্দী।** প্রকাশিকা ঃ আরতি নন্দী। ১০ গ্যালিফ স্ট্রিট, ফ্ল্যাট-৫৮, কলকাতা-৩। পৃঃ ১০+৩০। মূল্য ঃ ৬ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০২।
- **ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, ক্ষয়শীল ভারত—হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য।** প্রকাশক ঃ এইচ. আর. ভট্টাচার্য, ৩০ই দ্বারিক জঙ্গল রোড, পোঃ+গ্রাম—ভদ্রকালী, হুগলি-৭১২২৩২। পৃঃ ৬+৪০। মূল্য ঃ ৮ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০১।
- **ধর্ম ঃ ভারতীয়তা ঃ সংহতি—শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়।** প্রকাশক ঃ ব্রজগোপাল মাইতি, মনন প্রকাশন, ৩০ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। পৃঃ ৮+৩২। মূল্য ঃ ৮ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪।

রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল
ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশের তৎকালীন গভর্ণর কে. এ. এ. রাজা ইটানগরের এক পার্বত্য উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র ভবনের ভিত্তিস্থাপন করে সূচনা করেন ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর এই হাসপাতালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। সেদিন তিনি তাঁর ভাষণে বলেনঃ "এমন একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলের উন্নয়নের একটি মাইলস্টোন।" তখন এখানে ছিল বহিরাগত রোগীদের জন্য একটি বিভাগ এবং একটি ছোট ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি। প্রতিষ্ঠানটি আজ ২৫ বছরের ব্যবধানে একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকারের দীর্ঘসময়ের ভিত্তিতে লিজ নেওয়া প্রায় বাইশ একর জমির ওপর বিস্তৃত এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত, যার সদস্যদের মধ্যে আছেন অরুণাচল প্রদেশ সরকারের তিনজন প্রতিনিধি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত সাতজন ব্যক্তি।

হাসপাতালটির পঞ্চাশ শতাংশ ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করে। বিশেষ কোন প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য ভারত সরকারের কাছ থেকেও পাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের দুটি প্রধান প্রকল্প—যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং নতুন কর্মিভবন নির্মাণ তথা হাসপাতাল ও পুরনো কর্মিভবনের মেরামত বাবদ অর্থসাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসাবিভাগ (O.P.D.)ঃ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে এই বিভাগটি স্থানান্তরিত হয় বর্তমান ডায়াগনস্টিক ব্লকের একাংশে, যেটি হাসপাতালের সর্বপ্রথম নির্মিত ভবন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চে পাকাপাকিভাবে এটি স্থানান্তরিত হয় অনুসন্ধান ও নথিভুক্তি দপ্তর-সমন্বিত ও.পি.ডি. ক্যাজুয়ালটি ব্লকে।

এই বিভাগে আছে—জেনারেল মেডিসিন, শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি, শিশুরোগ, অস্থিরোগ ও কৃত্রিম অঙ্গসংস্থাপন কেন্দ্র, কান-নাক-গলা, চক্ষুরোগ, দন্তচিকিৎসা, চব্বিশ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স-সহ ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি। এছাড়া বিশেষ বিভাগও রয়েছে—এণ্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, আলট্রা সোনোগ্রাফি, ইসিজি, প্যাথোলজিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং রেডিওলজি। এই সমস্ত ক্লিনিকে যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা আছেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০ রোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আসে। তার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ পাহাড়ি আদিবাসী।

অন্তর্বিভাগ বা ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডঃ ১৬টি শয্যাবিশিষ্ট এই বিভাগটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তরিত হয় একটি নবনির্মিত ভবনে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডে মোট শয্যাসংখ্যা বেড়ে হয় ১৫০। রোগীদের হঠাৎ রক্তের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি ব্লাডব্যাঙ্ক চালু করা হয়েছে।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে একটি এক্স-রে মেশিন নিয়ে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট শুরু হয়েছিল। পরে বৃহদাকার এক্স-রে মেশিন বসানো হয়। বর্তমানে এখানে চারটি এক্স-রে মেশিন আছে। ফলে চিকিৎসার সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৮৮-র ফেব্রুয়ারিতে একটি কম্পিউটার-চালিত আলট্রা-সাউণ্ড স্ক্যানার বসানো হয়েছে। রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টের অধীনে একটি ইসিজি ইউনিট শুরু হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া অন্তর্বিভাগে রয়েছে আপার জি. আই. এণ্ডোস্কোপি ও কোলোনোস্কোপি, ফিজিক্যাল ও
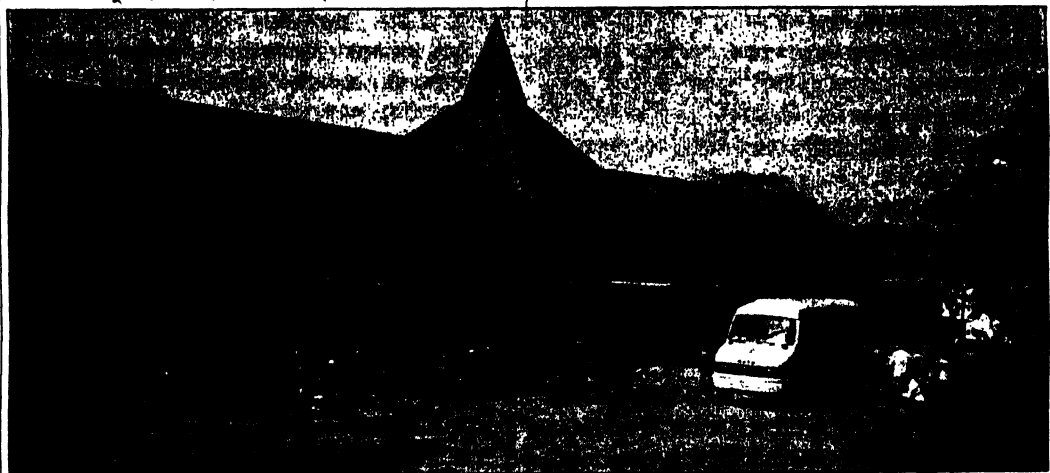
ইটানগরে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের প্রবেশপথ

অকুপেশনাল থেরাপি এবং আর্টিফিশিয়াল লিম্বস ফিটিং সেন্টার। প্রতিবন্ধী রোগীদের অঙ্গসঞ্চালনে সাহায্য করতে একটি কৃত্রিম অঙ্গসংস্থাপন কেন্দ্র চালু হয়েছিল ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয়। তাতে হাসপাতালের রোগীরা ছাড়াও বহিরাগত রোগীদেরও প্রয়োজন মেটানো হয়।

এই হাসপাতালের তিনটি অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে দুটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সম্প্রতি হাসপাতালের আধুনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে ল্যাপরোস্কোপ। এটি কোলেসিস্টেক্টমি, গলব্লাডার স্টোন বের করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। রোগীর বধিরতা যাচাই করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অডিওমেট্রি যন্ত্র।

অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে ভারত সরকার থেকে অত্যাধুনিক পাঁচটি যন্ত্র ২০০১ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে Yag Laser এবং A-Scan যন্ত্রদুটি সমগ্র অরুণাচল প্রদেশে আর কোথাও নেই। সারা শরীরে সিটি স্ক্যান করার যন্ত্রের জন্য NEC (North-Eastern Council)-এর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

এই হাসপাতালের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর মেডিকেল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট। রোগীদের তাৎক্ষণিক রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের নিখুঁত রেকর্ড রাখা হয়। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের রোগীদের প্রত্যেককে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য রোগীদের রেকর্ডের যথাযথ সূচী কম্পিউটারে রাখা হয়।

প্রশাসনিক কাজের খাতিরে হাসপাতালের মেডিকেল লাইব্রেরিটি সপ্তাহের সমস্ত কাজের দিন সন্ধ্যার সময় কর্মীদের জন্য খোলা থাকে। নানা মেডিকেল জার্ণালও এই লাইব্রেরিতে রাখা হয়।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে অরুণাচল প্রদেশের উপজাতি মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নার্সিং স্কুল খোলা হয়। সেখানে সাধারণ নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যায় তিনবছরের সার্টিফিকেট কোর্স আছে। স্কুলটি 'অসম কাউন্সিল ফর নার্সেস, মিডওয়াইভস অ্যাণ্ড হেলথ ভিজিটার্স'-এর শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত এবং 'ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল'-এ নথিভুক্ত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ১৯৮৬-র ১২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে স্কুলটির প্রথম সদস্যভুক্তি ও আলোক-উৎসব পালন করা হয়।

এছাড়া হাসপাতালের রোগী ও কর্মীদের জন্য ডেয়ারি, পোলট্রি ও সবজি বাগান, সম্মেলন ও আলোচনাসভার জন্য ৪০০ আসন-সমন্বিত 'বিবেকানন্দ হল' এবং সঙ্কটাপন্ন রোগীদের অন্য কোন হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য হাসপাতাল-চত্বরে একটি হেলিপ্যাডও নির্মাণ করা হয়েছে।

সীমিত সংখ্যক রোগীর সেবার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে হাসপাতালটি বহুমুখী উন্নতি করেছে। সেইসঙ্গে আরো বিস্তৃত স্থানে একটি ও.পি.ডি. (O.P.D.)-র প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। 'ডিপার্টমেন্ট অফ প্ল্যানিং অফ নর্থ ইস্টার্ণ রিজিয়ন'-এর কাছে একটি নতুন ও.পি.ডি. ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মানুষ সভ্যতার আলো এখনো ভাল করে দেখেনি। সেখানে অসুস্থ হলে প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে প্রতিবেশীর চোখের সামনেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মিশনের এই হাসপাতালটি বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশের বৃহত্তম হাসপাতাল। প্রয়োজন হলে দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে দশ-বারোটি পাহাড় পেরিয়ে হেলিকপ্টারে রোগীকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। রোগী সুস্থ হয়ে উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়। স্বামীজীর সেবাদর্শের একটি চমৎকার বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় এই অনুপম হাসপাতালকে কেন্দ্র করে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ২৬,০০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। গত ৯ মার্চ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। এদিন দুপুরে প্রায় ৩৫,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। আরো তথ্যের জন্য 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ' দ্রষ্টব্য।

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ মঙ্গলারতি, বেদ, স্তোত্র ও 'পুঁথি' পাঠ, বিশেষ পূজা ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করা হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। গত ৯ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসব উপলক্ষ্যে 'কথামৃত' পাঠ করেন (হিন্দি ও বাঙলা) স্বামী একস্থানন্দজী ও ব্রহ্মচারী ভূদেবচৈতন্য। আলোচনা করেন স্বামী শ্রীবাসানন্দজী, স্বামী হরিদেবানন্দজী ও স্বামী অমৃতরূপানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার।

জম্মু রামকৃষ্ণ মিশন (জম্মু ও কাশ্মীর) ঃ গত ২১ মার্চ ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এছাড়া এদিন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ আশ্রমের একটি নতুন কার্যালয় ও পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ২১-২৩ মার্চ ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, পদাবলী কীর্তন, বাউল গান, নরনারায়ণ সেবা ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। উৎসবের প্রথমদিনের ধর্মসভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী শশাঙ্কানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। ভজন ও বাউল গান পরিবেশন

করেন যথাক্রমে সরোজ ফরিকার এবং রবি বাগদি ও সম্প্রদায়। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বালকশিল্পী সম্রাট সরকার। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী ও স্বামী শশাঙ্কানন্দজী। আলোচনান্তে ভক্তিগীতি ও পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন যথাক্রমে জয়দেব ঘোষাল ও সম্প্রদায় এবং হরিসাধন অধিকারী ও সম্প্রদায়। তৃতীয়দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী শশাঙ্কানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। এদিন প্রায় ১৮,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তিগীতি এবং বাউল গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে রঞ্জন পাত্র ও দিলীপ মুখার্জি এবং পরীক্ষিৎ বালা ও সম্প্রদায়। পদাবলী কীর্তন ও লোকগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে কমল চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায়।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বিহার) ঃ গত ২৯ মার্চ ২০০৩ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আশ্রমের শিশুমন্দিরে একটি কৃত্রিম চিড়িয়াখানা উদ্বোধন করেন। এছাড়া এদিন আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে তিনি আলোচনা করেন। এছাড়া আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী সুমনসানন্দজী।

সেবাব্রত

খরাত্রাণ

আলসুর আশ্রম (কর্ণাটক) ব্যাঙ্গালোর জেলার খরা-কবলিত কয়েকটি গ্রামের ৩০৭টি গবাদি পশুর জন্য পশুখাদ্য বিতরণ করেছে। এই জেলার সাতনুর গ্রামে ১০০০ গবাদি পশুর পানীয় জলের জন্য একটি কূপ খনন করা হয়েছে।

মহীশূর আশ্রম (কর্ণাটক) বি. আর. হিলস্ অঞ্চলের ১২০টি ভূমিহীন সালগা আদিবাসী পরিবারের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি বড় পুকুরের খননকার্য শুরু করেছে।

অগ্নিত্রাণ

পুরী মঠ (ওড়িশা) পুরী জেলার তান্দিকেরা গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত ১৪টি পরিবারের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, মশারি ও ওষুধ বিতরণ করেছে।

দুঃস্থত্রাণ

আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) স্থানীয় দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১,৪৪০টি ধুতি ও শাড়ি এবং ৫০০ শিশুদের জামা-প্যাণ্ট বিতরণ করেছে। এছাড়া শীতনিবারণার্থে দরিদ্র মানুষের মধ্যে ১৬০টি কম্বল বিতরিত হয়েছে।

শীতকালীন ত্রাণ

এলাহাবাদ আশ্রম (উত্তর প্রদেশ) দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৩২১টি পশমী পোশাক বিতরণ করেছে।

আলং আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ) দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৫০০ কম্বল বিতরণ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী আপ্তকামানন্দজী মহারাজ (গণপতি মহারাজ) গত ৩ মার্চ ২০০৩ সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। দেহত্যাগের আগে তিনি কয়েক বছর ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতিতে ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ সালে তিনি ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, টাকি, সারদাপীঠ, বাগবাজার, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, পুরী মিশন, মনসাদ্বীপ, পুরুলিয়া ও চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে কয়েক মাস ত্রাণকার্যে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি কাঁথি কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। গত ৫ বছর তিনি প্রথমে কাঁথি কেন্দ্রে এবং পরে বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ প্রয়াত মহারাজ ছিলেন তপস্বী ও কঠোরকর্মী। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্বাচিত সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে থাকবেন ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের প্রবীণ সদস্য শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (এযাবৎ একবিংশতিতম) নির্বাচিত হয়েছেন। সঙ্ঘের অন্য দুজন সহাধ্যক্ষ হলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ১৯৪৬ সালে স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাদ্রাজ কেন্দ্রে (মায়লাপুর) যোগদান করেন। তিনি সঙ্ঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা এবং ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। মাদ্রাজ মঠ ভিন্ন বেলুড় মঠ, কাশী, কানপুর ও রাঁচি কেন্দ্রে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে তিনি দীর্ঘদিন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ, প্রশাসন-দক্ষ পূজনীয় স্বামী গীতানন্দজী মহারাজের সুলিখিত দুটি গ্রন্থ 'ভাগবৎ কথা' এবং 'শ্রীরামের অনুধ্যান' উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

তেলুয়া রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (তেলোভেলোর চটি, হুগলি) ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় এক যুব ও শিক্ষক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল

—'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে চরিত্রগঠন ও প্রতিষ্ঠালাভ'। আলোচনা করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী ও অসিত পাত্র। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনীর ওপর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিবিরে ৩০টি বিদ্যালয় থেকে ২০০ বিদ্যার্থী এবং ৫০ জন শিক্ষক যোগদান করেন।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৩৯)ঃ গত ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নিত্যরঞ্জন মণ্ডল ও শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়। ধর্মসভার বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী সুখানন্দজী, ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। সভায় স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে শৈলেন্দ্র নন্দী ও অশোককুমার মাইতি। প্রথমদিন দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'বোধন' নাট্যসংস্থা কর্তৃক নাটক অনুষ্ঠিত হয়।

রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মানন্দ মঠ (বর্ধমান)ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, সঙ্গীত, সমবেত ধ্যান ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন এই মঠের স্বামী শিবাত্মানন্দজী। আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী, স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দজী, স্বামী শিবাত্মানন্দজী ও বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শান্তানন্দজী।

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র (হুগলি)ঃ ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ শোভাযাত্রা, পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ডঃ সোমনাথ মিত্র।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি (চন্দননগর, হুগলি)ঃ গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আলোচনা ও ৩২জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন যথাক্রমে শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সত্যব্রত পাল।

বঙ্গাইগাঁও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম)ঃ গত ২২-২৪ জানুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অঙ্কন, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী সুমন। আলোচনা করেন বিলাসীপাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৮০০ যুবক-যুবতী ও ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া)ঃ গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত', 'চণ্ডী', 'কঠোপনিষদ্' পাঠ ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী ও পার্থপ্রতিম কুণ্ডু।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান)ঃ গত ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (হুগলি)ঃ গত ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিতকুমার চন্দ্র ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও ডঃ সোমনাথ মিত্র।

বারাকপুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৩ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ২৫০ জনের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাভাবপ্রাণাজী ও অমিয় চক্রবর্তী।

কুমরুল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হুগলি)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৩ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, বৈদিক স্তোত্র, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অসিত কোলে, ভক্তিপ্রসাদ দেব অধিকারী প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ও স্বামী সগুণানন্দজী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বেদপাঠ ও সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। আলোচনা করেন ডঃ ওসমান গণি, ডঃ বাসুদেব বর্মন ও গোপেন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। এতে ৮৫০ জন যুবপ্রতিনিধি ও ৫০ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সকলকে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অলোককুমার ঘোষ। গত ২৮ জানুয়ারি আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ২৯ জন রক্তদান করেন।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (কলকাতা-৩২)ঃ গত ৩১ জানুয়ারি ২০০৩ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কে. পি. মেমোরিয়াল হল-এ একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুব্রত পাল। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ জোয়ারদার ও অধ্যাপক অশেষ রায়চৌধুরী।

রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (বর্ধমান)ঃ গত ১-২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ একটি যুবসম্মেলন ও বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও স্বামী শৈলজানন্দজী। প্রায় ২০০ যুবপ্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়দিন

'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, পালাকীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও ডঃ রামদুলাল বসু। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাঁকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনাসভার মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা চক্রবর্তী প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী ও ভক্তকে দুপুরে প্রসাদ এবং যুবপ্রতিনিধিদের একটি করে 'সবার স্বামীজী' বই ও স্বামীজীর ছবি দেওয়া হয়। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ও স্বপনকুমার পুরকাইত।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভক্তিগীতি ও হরিনাম-সঙ্কীর্তন পরিবেশন করেন যথাক্রমে শচীকান্ত বেরা এবং হরেকৃষ্ণ মাইতি ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী ও স্বামী কালাতীতানন্দজী।

হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া)ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে হাঁটাল বিশালাক্ষী হাইস্কুলে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সচ্চিদানন্দ মান্না, তিনকড়ি মাখাল প্রমুখ। পাঠে অংশগ্রহণ করেন মৌমিতা সামন্ত ও সীমান মাজি। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ দেবেশকুমার আচার্য, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও দিলীপকুমার মহাপাত্র। সম্মেলনে প্রায় ৮৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মনোরঞ্জন মান্না ও কিংশুক মাখাল।

আগ্রা সারদামণি পল্লীমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথমদিন দুপুরে প্রায় ২,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও স্বামী ব্রহ্মবিদানন্দজী।

সেবাব্রত

বিশ্ববিবেকতীর্থ (কলকাতা-৩২)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০৩ আয়োজিত এক চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে ১৫০ জনের চোখ পরীক্ষা করে ২৫ জনের চোখের ছানি বিনাব্যয়ে অপারেশন করা হয়।

শিবপুর সারদা সেবাসঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ৭ মার্চ ২০০৩ ৩২ জন প্রতিবন্ধীকে শিবজ্ঞানে মালাচন্দন পরিয়ে কৃত্রিম পা, ট্রাইসাইকেল, হুইল চেয়ার প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, আসানসোল-নিবাসিনী মীনা মুখার্জি জপরত অবস্থায় গত ১ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। কান্দরা রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী পাঠচক্রের তিনি আমৃত্যু সভানেত্রী ছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহার, সেবা-পরায়ণতা ও উদারতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার নাগভবন-নিবাসিনী উমারানী দত্ত গত ৪ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, গুজরাটের বরোদা-নিবাসিনী শান্তি দিঘে গত ১০ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বরোদা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে তিনি 'ভাগবত', 'গীতা', 'উপনিষদ্'-এর ক্লাশ নিতেন। সেবাপরায়ণতা, সরলতা ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শোণিতপুরের চারালি-নিবাসী বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব গত ১১ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সল্টলেক-নিবাসী নির্মলকুমার সাহা গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অসমের শিলচর-নিবাসী শিশিরকুমার দেব ৬৬ বছর বয়সে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্র এবং কর্মজীবনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর (ই. এম. ই বিভাগের) ক্যাপ্টেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর-নিবাসিনী অনিমা সেন গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার নাকতলা-নিবাসী সুধীরকুমার সরকার গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পুরী-নিবাসী ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে হোমমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পুরী মিশন আশ্রমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ছিলেন আশ্রমের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের অবৈতনিক শিক্ষক।❑

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

Come out into the universe of Light. Everything in the universe is yours, stretch out your arms and embrace it with love.

Swami Vivekananda

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত
- শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৫১০
- রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
- বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা
- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর
- অলক পালচৌধুরী, প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড
  সন্তুটাপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন ঃ ৭৪৩১৭০
- ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা
- ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
- মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন ঃ ৭৪৩ ২৪৮
- বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, প্রযত্নে সুধীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া, পিন ঃ ৭৪৩১৪৫
- স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ঃ ৭৪৩ ৪৩৫
- হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন ঃ ৭৪৩ ১৬৫
- কথাশিল্প, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫
- বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫
- সুজিত ঘোষ, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ২৫৯২-১২৩০
- শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ১৮৭
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ১২৭
- নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৪
- ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া, পিন ঃ ৭৪৩ ১২৩
- ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন ঃ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন ঃ ২৫৫০১৮
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৭৫
- হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ঃ ২৫৫৩৯২
- অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ২২২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড়
- হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৯৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৬১০
- রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২
- বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন ঃ ২৪৩৩-৮৩৬৯
- জীবনকৃষ্ণ দাস, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-২৬০৪৫০
- দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৭২
- শতদল সাধুখাঁ
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৪৯
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫৭
- রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 105
No. 5
MAY
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০্ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩
❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

তম বর্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ মিশন

পশ্চিমবঙ্গে শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় ত্রাণকার্য

রামকৃষ্ণ মিশন সাম্প্রতিক সংঘটিত শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন সহস্রাধিক পরিবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হুগলি, বাঁকুড়া, কুচবিহার প্রভৃতি জেলাগুলিতে পুনর্বাসন কার্য শুরু করেছে।

'নিজের বাড়ি নিজে বানাও' প্রকল্পে প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণের সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া রাজস্থান ও কর্ণাটকে খরাত্রাণ কার্য শুরু করা হয়েছে এবং গবাদি পশুদের জন্য খাদ্য ও জল বিতরণ করা হচ্ছে।

এইসকল ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যের জন্য সম্ভাব্য খরচ ৬৩ লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে।

এই ত্রাণকার্যের জন্য প্রদত্ত নগদ টাকা বা 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর নামে প্রদত্ত চেক/ড্রাফট্ ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত।

সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন, প্রধান কার্যালয়
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া
পিন-৭১১ ২০২
Fax : (033) 2654-4346 ✧ E-mail : rkmhq@vsnl.com

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

১লা মে, ২০০৩

সৌজন্যে ঃ জনৈক ভক্ত

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥
১০৫তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৪১০ জুন ২০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১০)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১০/সেপ্টেম্বর ২০০৩ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।**
- **শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই।
- **ইচ্ছা করলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকেও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাতে হবে। ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২৫ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর আগে অবশ্যই কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- গ্রাহকরা অতিরিক্ত কপি কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে প্রতি কপি ৪০ **টাকায়** পাবেন। যাঁরা হাতে হাতে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন, তাঁরা **অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো** দেখিয়ে এই অতিরিক্ত কপিটিও **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে** সংগ্রহ করতে পারবেন। আর যাঁরা ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি নেবেন, তাঁরা অতিরিক্ত কপি নিলে **রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ২৫ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে।**
- **গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে যাঁরা **সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে** সংগ্রহ করতে চাইলে **তাঁরা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই সংবাদ প্রেরণ করবেন, যাতে আমাদের কাছে ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে।**
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হয় না।**
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন [**২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে**], তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'**-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ** এবং **শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সোমবার কার্যালয় খুলবে।**

প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্।।

—হে মা ! তুমি (এই) সংসার সৃষ্টি করছ, পালন করছ এবং প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্তই সংহার করছ। সুতরাং, অহো ! তুমি ব্রহ্মা, তুমি ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র এবং তুমিই এই সমস্ত হয়েছ। (তাই) তোমাকে আমি কী স্তব করব !

অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্বাণনিবহান্
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দরসিকাম্ ।।

—বহু লোক তোমাকে ছেড়ে অপর দেবগণকে তোমার চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী মনে করে সেবা করে থাকে। হে মা ! সেইসব মূঢ়েরা তোমার পরম তত্ত্ব কিছুই জানে না। (তাই) আমি সাগ্রহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব কর্তৃক সমুপাসিতা, আদ্যা ও শাশ্বত ব্রহ্মানন্দ-রস উপভোগে নিমগ্না তোমার শরণাগত।

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়াঃ ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ।।

—হে কালি ! তুমি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ। তুমি কল্যাণ-বিধায়িত্রী গিরিশরমণী। তুমি অদ্বিতীয়া হয়েও সর্বরূপে বিরাজিতা। হে মা ! (এরূপ প্রকৃতিসম্পন্না তুমি) তোমার স্তুতি কিরূপে হতে পারে ? তুমি শুধু নিজ কৃপায় নিরাশ্রয় আমার প্রতি প্রসন্না হও—এই জন্মের পর আমার যেন আর পুনর্জন্ম না হয়।

(দক্ষিণাকালিকাস্তোত্র, ১২-১৪)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

সংগঠন বা দলবদ্ধ প্রয়াস অর্থাৎ Team Work একালের যুগলক্ষণ—তাহা স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন। মানুষের অধ্যাত্মজীবনেও এই দলবদ্ধ প্রচেষ্টা এযুগের বিশেষত্ব, সেকথা এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমরা যথেষ্টই উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু বিশ্বায়নের নামে ধর্মকে পণ্য করা বা consumerism-এর স্তরে এই অধ্যাত্ম প্রচেষ্টাকে টানিয়া নামাইতে স্বামীজী কখনোই বলেন নাই। বরং বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে Institutionalised Religion বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মপ্রচারের যেসব দোষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে-ব্যাপারে প্রতি পদে গুরুভাই এবং শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। একদা আমেরিকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট স্যার আব্রাহাম লিঙ্কন নিজ পুত্রের গৃহশিক্ষককে একটি অসাধারণ পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তিনি গৃহশিক্ষককে অনুরোধ করিয়াছিলেন ঃ "আপনি আমার পুত্রকে শিক্ষা দিবেন—কি করিয়া নিজেকে সর্বোত্তম ক্রেতার নিকট উৎসর্গ করিতে হয়, কিন্তু কখনোই সে যেন নিজের বুকের উপর একটি মূল্যলেখা কাগজ না লাগায় [যে আমার দাম এত ডলার]।" মঠের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মবিধি রচনা করিয়া স্বামীজী স্পষ্টভাষায় বলিলেন ঃ "অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তো একান্ত তাহাকেই বলা হইবে।"

কেবল ধর্মীয় সংগঠন নহে, যেকোন সংগঠনের ক্ষেত্রেই ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা, পরস্পরের নামে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নালিশ করা এবং সংগঠনের সুনাম ও জনগণের আস্থাকে মূলধন করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা সেই সংগঠনের বিনাশের কারণ হয়। যে-পৃথিবীর মাটিতে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, উহাকেই যদি বারংবার ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করি, ভবিষ্যতে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। স্বামীজী চাহিতেন, যখনি কিছু মনোমত হইল না, তখনি তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযথ ভদ্রোচিত ভাষায় জানানো দরকার। অপরপক্ষে প্রত্যেকের মধ্যে এমন উদারতা থাকিবে যে, সংগঠনের অন্যান্য সভ্যবৃন্দের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার কুণ্ঠা থাকিবে না, কিংবা কেহ তাঁহার দোষ উল্লেখ করিলে তাহা ধৈর্য সহকারে শুনিতে তিনি দ্বিধা করিবেন না। 'আমি যাহা করিয়াছি তাহাই ঠিক, যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, অপরে যাহা করিয়াছে কিংবা বুঝিয়াছে তাহা ঠিক নহে।'—এইরূপ ধৃষ্টতা সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সকলের পক্ষে অসম্মানজনক। ভুল করা মানবিক গুণ। এমন কখনো হইতে পারে না যে, মানুষ কখনো ভুল করিবে না। কিন্তু পারস্পরিক অহঙ্কারবিবর্জিত প্রেমের সম্পর্ক থাকিলে সেই ভুল, ব্যক্তিগত বা দলগত যে-স্তরেই হউক, সহজে সংশোধন বা নির্মূল করা সম্ভব হয়। ইহা একধরনের 'art of living' বা বাঁচার শিল্প। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অপূর্ব সহিষ্ণুতা, সর্বগ্রাহিতা, অপরকে প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানের সামর্থ্য, সকল আশ্রিতের আহার ও থাকার যথাযথ ব্যবস্থাদি করা এবং ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, অশান্তির নিলয় এই জগৎ-সংসারে যথার্থ art of living কাহাকে বলে।

যে-সংগঠনে কেবল পরস্পরের প্রতি দোষারোপ কিংবা আন্তর রাজনীতি অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপূর্তি রহিয়াছে, সেখানে প্রেমের পরিবর্তে বিদ্বেষ, হিংসা, প্রিয়জনের রক্তচক্ষু বিরাজ করে। এইধরনের সংগঠনের দীর্ঘজীবিত্ব অসম্ভব। কেবল পুঁথিগতভাবে নয়, সাম্প্রতিক ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অস্থির সামাজিক চালচিত্র হইতে এই শিক্ষা আমরা এখন চাক্ষুষ লাভ করিতেছি।

সংগঠনের সকল কর্মীরই সমান অভিজ্ঞতা থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না। বড় কর্মী আমরা তাঁহাকেই বলি যাঁহার অভিজ্ঞতা বেশি, যিনি উদ্যমী, প্রেমিক এবং সিদ্ধান্তে ভুল কম হয়। তাঁহার বয়সের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যেকোন সদস্যেরই, বড় বা ছোট, সাংগঠনিক গুরুত্ব নির্ধারিত হয় মূলত তাহার চারিত্রিক শুদ্ধতার দ্বারাই। পূর্বের প্রসঙ্গ টানিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ

> "At any cost, any price, any sacrifice (ইহার জন্য যতই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হউক না কেন) ঐটি [ঈর্ষা] আমাদের মধ্যে না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই, do not care (কুছ পরোয়া নাই), কিন্তু ঐ কয়টা [ঐ গুটিকয়েক—দশজন কিংবা দুজন] perfect character [সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দোষ চরিত্র] হওয়া চাই।

আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া। বুঝতে পারছ কি? হাত ব্যথা হয়ে এল... আর লিখতে পারি না। 'মাঙ্গনা ভালা ন বাপ্‌সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক্'। রঘুবীর টেক রাখেন দাদা, সেবিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো।" (১৮৯৪ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র)

বিদ্যাচর্চা ঃ "বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশাপ্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।" সঙ্ঘের বুনিয়াদী শিক্ষার নিয়মনীতি নির্ধারণকালে স্বামীজী এই কথা বলিয়া প্রত্যহ মঠে শাস্ত্রচর্চার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের বারবার বলিতেন ঃ "স্বামীজীর বই পড়ো।" কারণ, স্বামীজীকে 'ঘনীভূত ভারতবর্ষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঋষি অরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ঃ "যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে পড়ো।" ভারতবর্ষের পাঁচসহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য-সহ এজাতির যাবতীয় পতন ও অভ্যুদয়ের সারাংশ বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। তাই ভারতবর্ষকে জানিতে গেলে 'বিবেকানন্দ' পড়িতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে প্রভাববিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার 'উদার' ভাবের জন্য। এবং ঐ উদার ভাব তিনি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চা মানুষকে উদার করে। তখন মানুষ জীবন এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মের একটি অর্থ খুঁজিয়া পায়। কিন্তু বিদ্যাচর্চার অভাবে জীবন অথবা দৈনন্দিন কর্ম সবই অর্থহীন হইয়া পড়ে। মানুষ তখন সঙ্কীর্ণ, সম্প্রদায়বদ্ধ, গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছাদিত দৃষ্টিভঙ্গির বশীভূত হইয়া ক্রমশ মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। যাহারা একদা মনুষ্যকল্যাণ সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, তাহারাই ধীরে ধীরে উন্মার্গগামী হইয়া অতি হীন স্বার্থপরের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে। তখন 'বৃহত্তর স্বার্থ' তাহার কাছে অর্থহীন হইয়া একমাত্র নিজের 'দল' বা 'সম্প্রদায়'ই সত্য বলিয়া ধারণা হয়। সে তখন সমাজের সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়া নিজের দলকে সমৃদ্ধ করে। এইভাবে তাহারা কখনোই সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া নিজেরাও অতৃপ্ত হৃদয়ে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং অপরাপর দশজনের সর্বনাশসাধন করিয়া থাকে। এই গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা শ্রীরামকৃষ্ণ মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার প্রথম বাণী—প্রেম। "প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুখ যায়।" অতএব যেসব ভক্ত বা কর্মীর নয়ন প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিত, তাঁহারা যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন করি, যে-'বিদ্যাচর্চা'র কথা স্বামীজী উল্লেখ করিলেন, তাহার আধুনিক রূপ কেমন হইতে পারে? সংক্ষেপে বলিলে—'বিবেকানন্দ চর্চা'ই পূর্বোক্ত 'বিদ্যাচর্চা'র আধুনিক রূপ। তাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ, নবীন-প্রবীণ সকলপ্রকার সংগঠনেরই একটি মৌলিক কর্তব্য 'বিবেকানন্দ চর্চা', একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করিয়া সম্যক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর নামাঙ্কিত সকল সংগঠনেরই প্রধান কর্তব্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিগত দুই-তিন দশকের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারকার্য পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চতুর্দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের নামে অসংখ্য সেবাশ্রম, স্মরণতীর্থ, পাঠচক্র, সঙ্ঘ বা সমিতির জন্ম হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্বত্রই 'বিবেকানন্দ চর্চা'র বিস্তর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সংগঠনের কোন কোন সদস্য হয়তো ব্যক্তিগতভাবে 'বাণী ও রচনা' পড়িয়াছেন ও উপকৃত হইয়াছেন, কিন্তু দলবদ্ধভাবে এই প্রয়াসের অভাব আছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য সংগঠনের পরিচালকবৃন্দের সত্বর প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন। অভিভাবকগণ সকলেই দেখিতেছেন—কিছু অশুভ শক্তি বা জনগোষ্ঠী যুবসম্প্রদায়ের শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা-ধ্বংসী প্রলোভক বহু উপকরণ সমাজে বিতরণ করিতেছে। সম্প্রতি বহুসংখ্যক যুবক-যুবতী পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিপথগামী হইয়াছে, হইতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদারতা, ত্যাগ, সেবা ও সর্বোপরি পবিত্রতার ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 'স্বামীজী-চর্চা' একান্তভাবেই আবশ্যক, সেকথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন নাই।

উদ্দেশ্যের একতানতা ঃ সংগঠনের পরিচালকবৃন্দের উদ্দেশে স্বামীজী বলিলেন ঃ "পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের একতানতাই (continuance of policy) মহৎ কার্য-সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র কারণ।" সংগঠনকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করি—একটি উহার প্রকৃতিগত বা 'constitutional part' বা অংশ (যেমন computer-এর ক্ষেত্রে বলা হয় হার্ডওয়্যার) এবং অপরটি উহার বহির্ভাগ বা উপরিভাগ (computer-এর ক্ষেত্রে যাহা সফট্ওয়্যার), তাহা হইলে দেখা যাইবে, উভয় ক্ষেত্রেই এই 'continuance of policy' বা উদ্দেশ্যের একতানতা অত্যন্ত জরুরি। আমরা ভাবিতেই পারি—প্রেম, পবিত্রতা,

উদারতা, ত্যাগ, সেবাকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব-স্বরূপের জ্ঞানলাভই সংগঠনের হার্ডওয়্যার অংশ বা অন্তর্ভাগ। অপরপক্ষে সংগঠন কি কি ধরনের উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে তাহা বাস্তবায়িত করিবে, তাহাই সংগঠনের উপরিভাগ বা সফট্ওয়্যার অংশ। সংগঠনের অন্তর্ভাগের পূর্বোক্ত লক্ষ্যপথের একতানতা বজায় রাখিবার প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী কাহারো কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না, একথা নিশ্চিত। কিন্তু সফট্ওয়্যার অর্থাৎ বহির্ভাগ অংশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের সুযোগ থাকিতে পারে। মতভেদও থাকিতে পারে। কিন্তু এই উপরিস্থিত কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যের একতানতা সঙ্ঘের ঐক্য এবং শক্তিবৃদ্ধির কারণ হয়। ইহার অভাবে শক্তিক্ষয় হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, কোন সংগঠনের কার্যকরী সমিতিতে সিদ্ধান্ত হইল, সঙ্ঘের নিজস্ব জমিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হইবে। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হইল। অর্থসংগ্রহ, আইনী কাগজপত্র তৈরি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি শুরু হইল। কাজ ধীরে ধীরে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে কোন কারণে পুরাতন কার্যকরী সমিতি বরখাস্ত হইয়া সম্পূর্ণ নতুন একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল। নূতন সমিতি আসিয়াই সিদ্ধান্ত লইল, ঐ স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় হইবে না, পরন্তু একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত হইবে। ইহাতে উদ্দেশ্যের একতানতা নষ্ট হইয়া সংগঠনের শক্তিক্ষয় হইল এবং জনকল্যাণমুখী একটি প্রকল্পও বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেইসঙ্গে ঐ সংগঠনের উপর জনসাধারণের আস্থা বিপন্ন হইল। অন্যদিকে বাহিরের কর্মসূচীর ঘন ঘন পরিবর্তনের অভিঘাতে সংগঠনের অন্তর্ভাগের যে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে স্ব-স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা, তাহাও ভুলিয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে : "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"

যোগসমন্বয় : স্বামীজী নিয়মবিধির ঐ পরিচ্ছেদে আরো বলিলেন : "জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের (সঙ্ঘের) উদ্দেশ্য।" আজীবন তিনি এই চার যোগের সমন্বয়কেই এই যুগের একমাত্র সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ['কথাপ্রসঙ্গে', 'উদ্বোধন', ফাল্গুন, চৈত্র ১৪০৮ এবং বৈশাখ ১৪০৯ দ্রষ্টব্য] সুতরাং সংগঠনের প্রত্যেক অঙ্গ বা সদস্যের এই 'যোগসমন্বয়' ব্যাপারটি সম্যক অনুধাবন করা বিধেয়। সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দের চরিত্রগঠনের উপর স্বামীজী সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—"ঐ কয়টা perfect character হওয়া চাই..." ইত্যাদি। এবং এই চরিত্রের সহিত সংগঠনের কি সম্পর্ক তাহা ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী স্বশিষ্য ই. টি. স্টার্ডিকে পত্রে লিখিলেন :

> "কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য অথবা বাক্‌চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ মূল্য নাই। পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।" [৯ আগস্ট ১৮৯৫-এর পত্র দ্রষ্টব্য]

ভোটের ব্যালটে সংখ্যাধিক্য দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা সদস্যবৃন্দের প্রত্যাশা, সমর্থন কিংবা নির্বাচক ও নির্বাচিতের সুচরিত্র ও কল্যাণবুদ্ধির যথাযথ প্রতিফলন যে সবসময়ে হয় না, তাহা এদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর বলিয়াই স্বামীজী গণতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন। একই কারণে তিনি সমাজতন্ত্রকেও সমর্থন করিতেন, কারণ অন্নহীন থাকার অপেক্ষা আধখানি রুটি শ্রেয়। আসল কথা, সেবাকার্যের পাশাপাশি সদস্যবৃন্দের চরিত্রগঠন ও অধ্যাত্ম-বিকাশের প্রতি সংগঠনের পরিচালকবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। সেইসঙ্গে সংগঠনের অভ্যন্তরে একটি প্রীতিপূর্ণ আবহ সৃষ্টি হইলে সব কার্য মঙ্গলমত চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ একটি নির্মল ভালবাসার বন্ধনে অপরকে বাঁধিবার প্রয়াস সকলের মধ্যে থাকা চাই।

কর্ম রহিবে প্রেমের আবরণে আবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূর্তিমান জীবন্ত প্রেম। তবু 'কর্মকঠোর'। অহর্নিশ সমাধিমগ্ন থাকিয়াও তিনি নিরলস কর্ম করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শরীর। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগী কেহই অকর্মণ্য হইতে পারে না। তাহার মধ্যে জনকল্যাণমুখী কর্মপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইবে। সংগঠনের প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে পূর্ণ কর্মোদ্যম যাহাতে বজায় থাকে সেব্যাপারে সকলকে সচেতন করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব পরিচালকবৃন্দের। ইহার সহিত বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটিবে এবং ধ্যানাভ্যাসের মাধ্যমে সকলে স্বয়ং উপলব্ধি করিবে তাহার কর্ম যথার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতিসাধক হইতেছে কিনা। কারণ, এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতিসাধক কর্মই চিত্তশুদ্ধির কারণ বলিয়া স্বামীজী নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, স্বামীজীর মতাদর্শ অনুযায়ী সকল কর্মীর মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সুষম বিকাশসাধনই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। [ক্রমশ] (চার)

আজ হতে শতবর্ষ আগে

উদ্বোধন

আষাঢ় ১৩১০
জুন ১৯০৩

বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

আশ্রম প্রতিষ্ঠা—গত বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ কিছু দিনের জন্য বারাণসীধামে অবস্থান করেন। সেই সময় কাশীনিবাসী জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি কাশীধামে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন। স্বামীজির অনুমতি অনুসারে স্বামী শিবানন্দ ১৩০৯ সালের ১লা আষাঢ় তারিখ হইতে কাশীর লাক্ষা নামক মহল্লায় খাজাঞ্চীর বাগান নামক একটী বাগানবাটী ভাড়া লইয়া কার্য্য করিতেছেন।

আশ্রমের উদ্দেশ্য—দেশীয় যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ভগবান রামকৃষ্ণদেব-প্রদর্শিত পথাবলম্বনে যাহাতে সকলে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া আপনার মুক্তিসাধন ও অপরকে সর্ব্ববিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারেন, ইহাই এই আশ্রমের বিশেষ লক্ষ্য।

কার্য্যপ্রণালী—ব্রহ্মচারিগণকে রাখিয়া সাধন ভজন ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া যাইবে। শুদ্ধ [শুধু] সংস্কৃত নয়, যাহাতে আশ্রমবাসিগণ ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ভারতে ও ভারতবহির্ভূত প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাইতে পারেন, এ আশ্রম হইতে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশাবলী আশ্রমবাসিগণের বিশেষ আলোচনার বিষয় থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কাশীবাসী অনাথ রোগী আতুরাদির সেবাকার্য্য আশ্রমবাসীদের শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ হইবে। এই ব্রহ্মচারিগণ শিক্ষিত হইলে চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতও অবলম্বন করিতে পারেন অথবা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংযতভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। গৃহিগণও তাঁহাদের অবকাশমত এখানে কিছুদিন বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া আবার গৃহে গমন করিতে পারেন। আশ্রমে বাসকালীন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারিগণের প্রতিপাল্য সমুদয় নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের ভিতর ধর্ম্মভাব বিস্তারের জন্য সময়ে সময়ে আশ্রমে পাঠ, বক্তৃতাদি হইবে।

গত এক বৎসরের কার্য্য—আশ্রম স্থাপনের সংবাদ স্থানীয় সংবাদপত্র 'ভারতজীবনে' প্রকাশ করা হয়। প্রথমে প্রায় তিনমাস আশ্রমে সাধারণের জন্য সপ্তাহে তিনদিন ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয় এবং দুইজন ব্রহ্মচারীকে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে পাঁচজন ব্রহ্মচারী আশ্রমভুক্ত হন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সাহায্যে সকল ব্রহ্মচারীকে ব্যাকরণ পড়ান হয় এবং ভগবদ্গীতা, বিবেকচূড়ামণি, ভারতান্তর্গত সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায় (শঙ্করভাষ্য সহিত) পড়ান হয়। ধ্যান জপ পূজাদিও নিয়মিতরূপে হয়। ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাইয়া অনাথগণের সেবা করিয়াছেন। উপরোক্ত ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে একজন কলেজে পড়িতেন, তিনি এক্ষণে পুনরায় কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতে গিয়াছেন। আর একজন সরকারী কর্ম্ম হইতে ছয়মাসের ছুটি লইয়া সাধন ভজন ও পাঠাদি করিতেন। তিনিও এক্ষণে অবকাশান্তে কর্ম্মস্থলে গিয়াছেন। উপস্থিত আশ্রমে দুইজন সন্ন্যাসী ও তিনজন ব্রহ্মচারী আছেন।

সাহায্য প্রার্থনা—এইরূপে আশ্রম স্থায়ী হইলে তদ্দ্বারা দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহও নাই। এই জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই আশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে প্রাণপণে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি। আশ্রমের বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী এবং কি উপায়ে এই আশ্রমের স্থায়িত্বপক্ষে সহায়তা করা যাইতে পারে, জানিবার জন্য আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, খাজাঞ্চীর বাগান, লাক্ষা, বেনারস সিটি ঠিকানায় পত্র লিখুন।

[সম্প্রতি বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের শতবর্ষপূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল।—**সম্পাদক**]

* * *

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি—বাগবাজার বসুপাড়ার ছাত্রবৃন্দ প্রায় ছয়মাস হইল, একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির সভাপতি স্বামী সারদানন্দ ও কার্য্যাধ্যক্ষ ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, এম. বি। ৫০ নং বসুপাড়া লেনে (বাগবাজার) এই সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া যাহাতে ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির দ্বারা এই বাগবাজার অঞ্চলের লোকের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা বলা যায় না। গত প্লেগের সময় জনৈক সহৃদয় লোকের সাহায্যে প্রায় ৩৫০ খানি খোলার ঘর এবং ১৬ জন ভদ্রলোকের বাটী ৮ জন মেথর ও একজন ভিস্তি রাখিয়া রীতিমত পরিষ্কার করা হয়। প্রায় মাসাবধি ঐ কার্য্য হইয়াছিল। সমিতির সভ্যগণ যেরূপ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া নিজেরা মেথর ভিস্তিদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে দিন দিন স্বার্থত্যাগরূপ মহাব্রতের সাধনায় উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইঁহাদের আর একটী প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রতি রবিবার সমিতির যুবকবৃন্দ দলে দলে বহির্গত হইয়া ঝুলি লইয়া বাটী বাটী ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহ করেন ও প্রতিমাসে পাড়ার অসহায়, নিঃস্ব, ভদ্র পরিবারগণকে নিজেরা উহা পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। ইঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত কলিকাতার প্রতি পল্লীতে অনুকরণ করা হউক, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী শিবানন্দের চারটি পত্র*

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
7/5/28

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া যদি জপাদি করিতে বস তাহা হইলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া বসিবার অপেক্ষা[ও] শুদ্ধতর হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে আচমনটা রেখো। গঙ্গাজল না পেলে জল শোধন করিয়া লইয়া তাহাতে আচমন করিতে পার। আচমন কর আর নাই কর তাঁকে স্মরণ করেই ধ্যান জপে বসিবে।
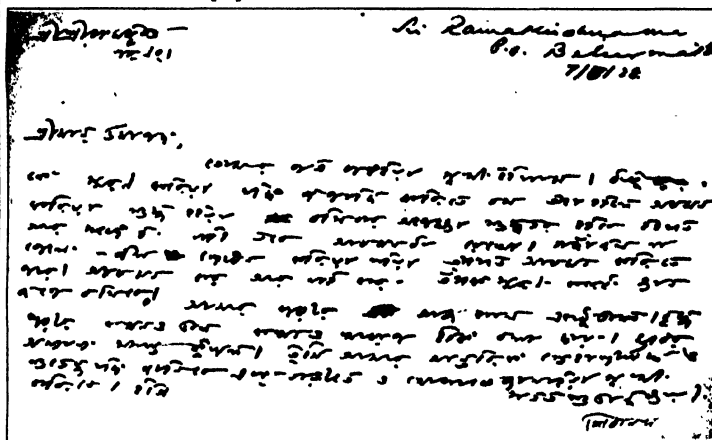
আমার শরীর আজকাল একটু ভাল। বৃদ্ধ শরীর কখনও ভাল কখনও খারাপ ঠিক বলা দায়। মঠের অন্যান্য সমস্ত কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বাড়িতে ও খোকাকে** জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
28/8/28

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করে পড়ে থাক, তাতেই সব হইবে—ঠাকুর কৃপা করে [যেন] তোমার অন্য সব বাসনা কামনা দূর করে দেন এবং তৎস্থলে তোমাদের হৃদয় ভক্তি বিশ্বাসে পূর্ণ করে দেন।

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। দুঃখের সঙ্গে জানাই, গত ১৯।৪।২০০৩ যোগবিলাসবাবু পরলোকগমন করেছেন।—সম্পাদক

** যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়

বাবা, তোমরা গরিব আছ তাতে কি হয়েছে—অর্থ [দ্বারা] কি কখনও শান্তি হয়? শান্তি মনের জিনিস। দেখছ তো বড়লোকের কি দুর্দ্দশা। ঠাকুরের কাছে খুব ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করবে—তিনি কৃপা করে যদি তা দেন, তার চেয়ে সুখকর, শান্তিপ্রদ, আনন্দপ্রদ অন্য কিছু নাই জানবে। শাক ভাত দুমুঠো খেয়ে তাঁতে যদি মন থাকে—সে যা অবস্থা তার তুলনায় মোহরের গাদায় শুয়ে ভগবৎ-বিমুখ মন নিয়ে জীবিত থাকা অতি হেয়। তাঁর যে প্রিয় সে যে আমাদেরও অতি প্রিয়। তোমাদের এত স্নেহ করি ভালবাসি—তোমরা তাঁর ভক্ত বলেই। অন্য কিছুর জন্য নয়। অধিক আর [কি] লিখিব। তুমি ত সব বুঝ। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। আশীর্বাদ করি তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করুক। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
26/9/28

শ্রীমান উমাপদ,

তোমাদের কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। জপ করিতে ভাল লাগিতেছে যখন, তখন তাহাই করিবে—ধ্যান জপ উভয়ই সমতুল্য। কোনটা ছোট, কোনটা বড় নয়—যখন যেটা ভাল লাগে। জপের সময় ইষ্ট মূর্ত্তির চিন্তা করিবে—তাহা হইলেই ধ্যানের কাজ হইয়া যাইবে। তাঁকে ধরে থাক—তাঁর কৃপায় মঙ্গল হইবেই।

তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিতে কোন ক্ষতি নাই। তান্ত্রীকি সন্ধ্যা করিবার প্রয়োজন নাই—তবে যদি ইচ্ছা হয় করিতে পার। যতরকমভাবে তাঁকে স্মরণ করা যায় ততই ভাল। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে—মধ্যে একটু সর্দ্দি হইয়াছিল। আজকাল একটু ভাল আছি। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে—ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[৪]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
18/3/30

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্বের মতই চলিতেছে—কখনও বা একটু ভাল, কখনও খারাপ। শরীর কি আর চিরকাল থাকবে গা—এ ত জড়বস্তু, নষ্ট হবেই। আমার জন্য চিন্তিত হইও না। ঠাকুরকে খুব ডাক, প্রার্থনা কর—তিনিই তোমাদের শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং বাড়িতে সকলকে ও ছেলেকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।

শ্লোকার্থ ঃ *স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্টতর। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্মসাধনে নিধনও মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু পরধর্ম অনুষ্ঠান বিপজ্জনক।*

ব্যাখ্যা ঃ সেকালে সমাজ একটি organised trade guild (সুসংবদ্ধ বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন) ছিল। অর্থাৎ সমগ্র সমাজ বিভিন্ন বৃত্তিসেবক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিল। শাস্ত্রানুসারে যদি কোন বৃত্তিধারী সমাজসেবার মনোভাব লইয়া কর্ম করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিবে এবং নিষ্কামভাবে সেবা করিলে তাহার মুক্তি হইবে। সেই ব্যক্তি যেকোন পদাসীন বা বৃত্তিধারী হউক না কেন, এই স্বর্গ বা মুক্তির অধিকার সকলেরই সমান। কিন্তু কাহারো যদি স্ব-বৃত্তিতে অনাহারে থাকিয়া প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তথাপি তাহার স্ব-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করা কর্তব্য নহে; কারণ সেক্ষেত্রে তাহার নিজের সুবিধা হইলেও সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে, একজনের জন্য দশজনের ক্ষতি সাধিত হইবে।

[**মন্তব্য ঃ** ১। এই শ্লোকটির অন্য একটি ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, যাহার যাহা ধর্ম—খ্রিস্টান, মুসলমান, হিন্দু আবার হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তী ইত্যাদি—তাহা ত্যাগ করা সমীচীন নহে। কারণ, যে-ধর্ম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা নাই, সহসা সেই ধর্ম গ্রহণ করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে তাঁহারা 'স্বধর্ম' বলিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকেন।

২। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৫তম শ্লোকেও শ্রীভগবান একই কথা বলিয়াছেন ঃ "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" অর্থাৎ নিজস্ব বৃত্তিতে থাকিয়াই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। পুরাণে ধর্মব্যাধের কাহিনী রহিয়াছে—তাহা আমরা সকলেই জানি।—**সম্পাদক**]

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

শ্লোকার্থ ঃ *অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—হে কৃষ্ণ, (বার্ষ্ণেয় = বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ) মানুষ কাহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? [অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যেন সম্পূর্ণ বিবশ হইয়া মানুষ যাহা কর্তব্য নহে তাহাই করিয়া ফেলে।]*

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন, ইহাই রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে।*

ব্যাখ্যা ঃ এই কাম-ই ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। আর কামনার উদ্ভব রজোগুণ হইতে। কামনা আর কিছুই নহে, কেবল দিনরাত চাই-চাই। মান চাই, অর্থ চাই, সুখ চাই। 'আমি চাহি না'—একথা বলিবার লোক নাই। এবং 'চাওয়া' কখনো নিবৃত্ত হইতে দেখি না। ইহা 'মহাশনঃ'—দুষ্পূরণীয় 'মহাপাপ্মা', মুক্তিলাভের পথে মহাপ্রতিবন্ধক-স্বরূপ বাসনা।

মন হইতে এই বাসনা ত্যাগ করিতে চাহিলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—আমি স্বরূপত কি? বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, আমি দেহ নহি, আমি মন নহি, আমি বুদ্ধি নহি। সন্ন্যাসীদের তো এই-ই বিচার। শাস্ত্র

সকলকে সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ করেন নাই। বৌদ্ধ আমলে চাষাভুষা সকলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। অহিংসা-ধর্ম প্রচারিত হইল। রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। মুসলমান দেশ আক্রমণ করিল। প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রমশ সারা দেশে মুসলিম শাসন কায়েম হইল। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসের জের আজও পর্যন্ত চলিতেছে।

সন্ন্যাসী হইবে খুব কম। যাঁহারা মোক্ষপরায়ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিচারবান, বৈরাগ্যপ্রবণ অন্তর—তাঁহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী। বাকি সকলে স্বধর্মপরায়ণ হইয়া অভ্যুদয়ার্থী হইবে। সমাজের কল্যাণ সাধিত হইলে তাহারাও আখেরে লাভবান হইবে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *যেরূপ ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকেন, যেরূপ ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে সেরূপ কামনা দ্বারা এই বিবেক-বুদ্ধি আবৃত থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ খেলার ছলে পরব্রহ্ম বিদ্যামায়ার সাহায্যে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করেন। তাহার ফলে যেন ব্রহ্মের প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি জীবাত্মায় পরিণত হয়। তখন সেই জীবাত্মা নিজেকে যদিও সচ্চিদানন্দস্বরূপ বোধ করে, তথাপি অনন্ত ব্রহ্মের তুলনায় তাহা এক কণামাত্র। তাহার পর সেই জীব অবিদ্যামায়ার কারণে আবৃত বা আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। যখন আমরা নিদ্রিত হই তখন 'আছি কিনা আছি' কিছুই বোধ হয় না। কখনো কখনো একটু চৈতন্যের বিকাশ ঘটিলে আমরা সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকি। মায়াবৃত জীবের জীবনরহস্য এই শ্লোক কয়টিতে বলা হইয়াছে। মায়ানিদ্রায় ঘুমন্ত জীব দেখে যে, সে মন-বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর মন-বুদ্ধি হইতে একটি স্থূলদেহ তৈরি হয়। ঐ স্থূলদেহের সহিত বাহ্যজগৎ নামক আরো এক বস্তুর সংযোগ ঘটে এবং সেই বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে জীবের সুখ-দুঃখ বোধ হয়।

যাহারা এই সুখ-দুঃখরূপ বোধ লইয়া থাকিতে চাহে, তাহারা নানা ধরনের অভ্যুদয়াত্মক কর্মে ব্যস্ত থাকে। আর যাহাদের এই সুখ-দুঃখের আবর্তন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এই বাহ্যজগৎ হইতে ইন্দ্রিয়কে গুটাইয়া লইতে (প্রত্যাহার করিতে) হয়। আবার সেই সংযত ইন্দ্রিয়সকলকে মনে এবং মনকে বুদ্ধিতে বিলীন করিতে হয়। এইরূপে দীর্ঘকাল মায়ার খেলা বন্ধ থাকিলে অন্তরের গভীরে স্ব-স্বরূপের জ্ঞান বিকশিত হয়। এই জীবনের ইহাই mechanism (কর্মরহস্য)। এই বিষয়ে মানুষকে মৌখিক উপায়ে বুঝানো যায় না বলিয়া জ্ঞানিগণ মানুষকে আত্মসংযমের বহুপ্রকার পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই অধ্যাত্মজীবনের একমাত্র জানিবার বিষয়।

সাধারণত বৈরাগ্যবান সাধুদের মধ্যে গৃহস্থগণ বিশেষ কিছুই লক্ষণীয় দেখেন না। কেবল দেখে—ইঁহারা বেশ আছেন! তাহার ফলে গৃহস্থগণ নিজেদেরই ফাঁকি দিয়া থাকেন। ভাবেন—আমাদের সহিত ইঁহাদের চালচলনে তো কোন তফাৎ নাই! [ক্রমশ] ।।নয়।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ শ্রাবণ ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ**
আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী
১০ শ্রাবণ, রবিবার
(২৭ জুলাই ২০০৩)
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ
শ্রাবণ পূর্ণিমা
২৬ শ্রাবণ, মঙ্গলবার
(১২ আগস্ট ২০০৩)

একাদশী-তিথি ঃ ৮, ২২ শ্রাবণ
শুক্রবার, শুক্রবার
(২৫ জুলাই, ৮ আগস্ট ২০০৩)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২২

পাশাপাশি ঃ (১) সারদানন্দ, (৪) আত্মা, (৫) সেবা, (৬) দেবী, (৭) মন্ত্র, (৮) হাত, (৯) কৃষ্ণাসপ্তমী, (১৩) ভাস্করানন্দ, (১৪) কলি, (১৫) জ্ঞান, (১৮) শ্রীমা, (২০) কাশী, (২১) জ্ঞানী, (২২) তারকেশ্বর।

ওপর-নিচ ঃ (১) সারদে, (২) নরেন, (৩) ভাবামৃত, (৪) আশ্রম, (৯) কৃপা, (১০) সয়, (১১) চারা, (১২) মন্দ, (১৪) কলকাতা, (১৬) নলিনী, (১৭) বিচার, (১৯) মাস্টার।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

মনোজ মুখোপাধ্যায়, অলক পাল চৌধুরী, রমণীমোহন বর্মন, দিলীপকুমার মৌলিক, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, গীতা ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, নন্দদুলাল ঘোষ, সুনীতি পাল, অসীমা চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ

স্বামী ভূতেশানন্দ

কর্ণাটকের কুর্‌গ জেলার পোনামপেট-এ আমি প্রথম আসি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। সেসময় এখানে আমাদের আশ্রমের বার্ষিক উৎসব চলছিল। তখন আশ্রমের প্রধান ছিলেন স্বামী সম্ভবানন্দ। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, উৎসবটি যেন সমগ্র কুর্‌গ-এর অন্যতম জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। ঐ উপলক্ষ্যে এখানকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ এখানে সমবেত হয়েছিল এবং আশ্রয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তারা পুরো দুটি দিন এখানে অতিবাহিত করেছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যেও এখানে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলি অতি শান্ত-ভাবে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তাদের শুনতে দেখেছিলাম। এখানকার মানুষের শৃঙ্খলাবোধ দেখে আমি বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে যাই। কুর্‌গ-এর মানুষের শৃঙ্খলাপরায়ণতার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম; কিন্তু সেবার আমি তা প্রথম প্রত্যক্ষ করি। শত অসুবিধার মধ্যেও সকলে ধীরস্থির, সভায় কোন কোলাহল নেই, সকল অসুবিধাই তারা নিঃশব্দে সহ্য করছে। শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনে কিরকম সুফল প্রদান করতে পারে, তা এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আমার চোখ খুলে গেল।

সেই আমার এখানে প্রথম আসা। তারপর অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে। তখন আমি ছিলাম নিতান্ত যুবক। এখন আমাকে সকলে বৃদ্ধ বলে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এই কয়েক বছরে আশ্রমটির শুধু বাহ্য সমৃদ্ধিই ঘটেনি; পরন্তু অসংখ্য ভক্তের যাতায়াত দেখে এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি আজ অনুভব করছি যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আশ্রমটি এই অঞ্চলের মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

একথা সত্য, আমি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ [১৯৯০]; কিন্তু তার জন্য আমার কোনই কৃতিত্ব নেই। স্বয়ং প্রভুর ইচ্ছা হয়েছে বলেই তিনি আমাকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন—আমার ইচ্ছা হয়েছে বলে নয়। তিনি তো শিশুর মতো; কোনরূপ নিয়মের অধীন তিনি নন। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁকে মজা করে 'বৃদ্ধ' বলত, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কোনরকম নিয়মের বশীভূত ছিলেন না। সেই কারণেই বোধ করি, এই অযোগ্য লোকটিকে তিনি এই কঠিন দায়িত্বভার দিলেন। মনে রাখতে হবে, আমরা সেই পরম প্রভুর দাস ব্যতীত কিছুই নই। যাঁর নামানুসারে এই সঙ্ঘ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের ভাগ্যবিধাতা, তাঁকেই আমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এগুলিই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। কোনকিছু শিক্ষা দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে আমরা—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা—মানুষের কাছে যাই না; আমরা যাই শিক্ষার্থিরূপে, যাই সেই শ্রীরামকৃষ্ণের দাসরূপে—যাঁর ভাবধারা আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে হবে, যাতে এই ভারতবর্ষের মাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যটি সার্থকভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা শুধু এই দেশের জন্যই নয়, সারা জগতের কল্যাণের জন্য। সেই ভাবধারার মহান বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করে সেই

বাণীই প্রচার করলেন। তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ আদর্শকে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগুলি সমগ্র মানবজাতির পূর্ণ বিকাশলাভের ক্ষেত্রে এবং বর্তমান ও চিরন্তন জটিল সমস্যার সমাধানের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণই হলেন সেই আদর্শ পুরুষ—যিনি শুধু আমাদের দেশবাসীকেই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীকে শান্তি ও সুখের সন্ধান দিতে পারেন। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র জীবনব্রত, যাঁকে যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর এই কাজের সার্থক যন্ত্ররূপে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্য থেকে স্বামী বিবেকানন্দকেই তাঁর ভাবপ্রচারের আদর্শ বাহকরূপে চিহ্নিত করেছিলেন, যাতে তাঁর ভাবালোক সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করলে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবর্তন স্বামী বিবেকানন্দ করেননি। তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করেছিলেন মাত্র। সর্বত্র তাঁর বাণী প্রচারের জন্য যে-যুবগোষ্ঠীকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর মনের মতো করে গড়ে তোলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের নেতারূপে নির্দিষ্ট হন। আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে একনিষ্ঠভাবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীই সমগ্র বিশ্বের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করলেন, যদিও তিনি বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরি হতে পারে। (দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৫৮) স্বামীজীর এই বিনম্র ভাব তথা অকপট স্বীকারোক্তির গভীরতা অনুধাবন করা আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

অতীতের বহু পাশ্চাত্যদেশীয় প্রাজ্ঞ, ধার্মিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, এযুগের সকল সমস্যার মূর্তিমান সমাধান হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত গভীর ভাবসমৃদ্ধ বাণীগুলির যে-সঙ্কলন করা হয়েছে, তার অন্তর্নিহিত প্রগাঢ় জ্ঞানের গভীরতা মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলছে। সেইজন্যই মানুষ আজ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-অভিলাষী হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মানুষের সেই প্রত্যাশাপূরণের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনারা জানেন, আমরা সেই পরম প্রভুর দাস মাত্র। আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, আমাদেরই যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে তিনি তাঁর ভাবসমূহ পরিব্যাপ্ত করে চলেছেন। এইভাবেই তাঁর ভাব সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। এখন আমাদের ওপর নির্ভর করছে কীভাবে আমরা এই যন্ত্রটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি, তাঁর বাণীগুলি নিজেদের জীবনে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারি এবং তাঁর ভাব অন্যত্র প্রচার করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি—যার মাধ্যমে স্বামীজীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমূহ দেশে-বিদেশে প্রচার করেছেন। সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগুলি এরকম—সব মানুষই একই ভগবানকে ডাকছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে। জগতে অনেক ধর্ম আছে। সব ধর্মই কিন্তু সেই একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়। তবে তার জন্য প্রয়োজন ব্যাকুলতা, বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর এগুলিই হলো সারকথা।

সাধনার শুরুতে 'বহু' এবং পরস্পরের মধ্যে 'বিভেদ'-জ্ঞান থাকলেও অন্তিমে সব পথই সেই একই ঈশ্বরচেতনার সন্ধান দেয়। লক্ষ্যের দিকে আমরা যতই অগ্রসর হতে থাকি, আধ্যাত্মিক জীবন ততই সমৃদ্ধ হতে থাকে; আমাদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য এবং আত্মায় আত্মায় নিবিড় সম্পর্ক ততই উপলব্ধ হতে থাকে। আমরা সকলে একই তীর্থের যাত্রী, কিন্তু আমাদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। যত আমরা লক্ষ্যের নিকটবর্তী হতে থাকি, তত আমাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মিক সংযোগ ঘটতে থাকে।

আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই উদ্ভূত হয় যত মতানৈক্য, সঙ্ঘাত, যুদ্ধ প্রভৃতি। ধর্মের মূল সুর, এমনকি নিজ ধর্মের সারকথা অনুধাবন না করার ফলেই আজ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। সমগ্র জগতের তীব্র দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এই প্রসঙ্গে দু-একটি ঘটনার কথা বলি। ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গা দর্শন করছিলেন। ঘাটে তখন দুখানি নৌকা লেগেছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় নিয়ে পরস্পর কলহ করছিল। কলহ ক্রমে বেড়ে গেলে সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির পিঠে প্রচণ্ড জোরে চড় মারল। ঠাকুর তাতে আর্তনাদ করে উঠলেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, সাধকভাব, পৃঃ ১৭৮) শুধু তাই নয়, তাঁর পিঠ লাল হয়ে ফুলে উঠল। আসলে ঐ মাঝিটির সঙ্গে তিনি গভীর একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই যে এমন হয়েছিল তা নয়। কালীবাড়ির উদ্যানে ঘাসের ওপর দিয়ে এক ব্যক্তি জুতা পায়ে হেঁটে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ পিঠে গভীর যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। (দ্রঃ ঐ) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা বোধের এটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এমন একজন মানুষ কি সকলকে না ভালবেসে থাকতে পারেন? আমরা সর্বদাই

নিজেদের ভালবাসি, কিন্তু যখন আমরা নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে সক্ষম হই, তখনি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আমার এই আত্মাই সর্বভূতে বিরাজমান। তখন আর প্রেম ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—সমগ্র মানবসমাজ তথা সর্বভূতের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জাগ্রত হয়। ঈশ্বর হলেন প্রেমস্বরূপ। তিনিই এই নিখিল সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি চান চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সর্বভূতে গভীর প্রেম। এটিই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি।

এই কথাগুলি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এবং তাহলেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, আমার নিজের মুক্তির অর্থ সর্বজীবের মুক্তি, কারণ এই 'আমি'ই তো সর্বজীবে আত্মারূপে বর্তমান। উপনিষদ্, গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে এই সত্যটি বারবার ঘোষণা করা হলেও এপর্যন্ত সেটি শুধু তত্ত্বের আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে আমরা সেটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সুমহান তত্ত্বটি প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির স্বকীয় প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দেরই ছিল। এটি সেই ভাব, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। এই ভাবের দুটি লক্ষ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণসাধন। এই দুই ভাবকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এদুটি পরস্পর সন্নিবিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলতেন: আমি মুক্তি চাই না, সেই নিত্য সত্য সম্বন্ধে জগদ্বাসীর হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার করতে এবং তাদের মুক্তির সন্ধান দিতে আমি বারবার জন্ম নিতে রাজি। আর এই অমূল্য ভাবসম্পদের সার্থক উত্তরসূরি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি আমাদের জন্য এই লক্ষ্যটিই নির্দিষ্ট করে দিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, তুই কি চাস বল? নরেন্দ্রনাথ জানালেন—আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কতকটা উত্তেজিতকণ্ঠে তিরস্কার করে বলেছিলেন—ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিসনি। (দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৫১)

এই কথাটি স্বামী বিবেকানন্দ কোনদিন বিস্মৃত হননি। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি বলেছিলেন—ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন বদ্ধ থাকবে, ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না। (দ্রঃ ঐ, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩৪৮) এই সুমহান উদার মনোভাবই হলো এই সঙ্ঘের প্রধান সম্পদ।

তিনিই আমাদের আদর্শ। তিনি হলেন সেই বৃক্ষমূল, আমরা যার শাখাপ্রশাখাস্বরূপ। এই মূল থেকে রস আহরণ করেই আমরা জীবনীশক্তি লাভ করি। এইভাবেই আজ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ বিকাশলাভ করছে। সেই আদর্শটিকেই আমরা আমাদের জীবন এবং সীমিত উপলব্ধির সাহায্যে প্রচার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি কোন সম্প্রদায় প্রবর্তনও করেননি। সাম্প্রদায়িকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র অধ্যাত্মস্পৃহায়, যা চিরন্তন এবং সর্বজনীন। আসুন, আমরা সকলে নিজেদের জীবন সেই আদর্শে গড়ে তুলি, নিজেরা সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করি এবং অপরকে সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনধারণ করতে সাহায্য করি। এই পথে ভাবের প্রসার না ঘটলে, আধ্যাত্মিকতা-সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের 'অহং' বুদ্ধি তথা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা বিসর্জন দিতে না পারলে কোন আশা নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার আবরণ থেকে নিজেদের উন্মুক্ত করতে হবে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে হবে এবং 'জীবসেবার অর্থ ঈশ্বরেরই সেবা'—এই বুদ্ধিতে সমগ্র জগতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

এই মহান উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে নিয়ে এলেন স্বামীজীকে এবং প্রবর্তন করে গেলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই ধারা। আমাদের সীমিত সামর্থ্যের সাহায্যে আমরা তাঁর নির্দেশিত কাজই করে যাচ্ছি। কিন্তু এই আদর্শটিকে শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, দিকে দিকে এই আদর্শকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে—যাতে প্রত্যেকে সেই আদর্শ সম্বন্ধে ধারণালাভ করতে সক্ষম হয় এবং এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে।* ❑

* ১৫ জুন ১৯৯০ কর্ণাটকের কুর্গ জেলার পোনামপেটে 'কোদাবা সমাজ হল'-এ 'সর্বজনীক স্বাগত সমিতি' কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনাসভায় প্রদত্ত এই আশীর্বাণীর অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ভাষণটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—সম্পাদক

আতাতুর্কের দেশে

স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

সকালে স্নানাদি ও প্রাতরাশ সেরে আমরা প্রস্তুত। ৯টার পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমে গেলাম ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের ডীন-এর অফিসে। ওখানেই একে একে অন্য বক্তারাও এলেন। খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের প্রতিনিধিরা তাঁদের সাধারণ পোশাক অর্থাৎ প্যান্ট-শার্ট ইত্যাদি পরিবর্তন করে ধর্মীয় পোশাক পরলেন। তারপর সকলকে অডিটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হলো। ১০.১৫ নাগাদ সকলে হলে পৌঁছালেন। ততক্ষণে শ্রোতৃমণ্ডলীর আসন সব ভর্তি হয়ে গেছে।

বক্তৃতা-মঞ্চের পিছনের দেওয়ালে আলোকোদ্ভাসিত পর্দায় ভেসে উঠল বক্তাদের নাম ও পরিচয়। পর্দার মাঝখানে আলোর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিশ্ব-মানচিত্রের চারপাশে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীকগুলি। তার নিচে লেখা তুরস্কের রূপকার আতাতুর্কের বাণী: "Peace at home, peace in the world"—অত্যন্ত বর্ণময় পরিবেশ!

সম্মেলনের শুরুতে ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের ডীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, তুরস্ক মন্ত্রীসভার ধর্ম-সম্বন্ধীয় বিভাগের অধ্যক্ষ এবং সিবাস শহরের গভর্ণর একে একে বক্তব্য রাখলেন। সকলেই তুর্কিতে বললেন। প্রত্যেকের ভাষণের শেষে সেগুলির সারাংশ ইংরেজিতে বলা হলো। সকালের অধিবেশনে একমাত্র ভ্যাটিক্যানের প্রতিনিধি ফরাসি ভাষায় বললেন। তাঁর ভাষণ তুর্কিতে তর্জমা করে বলা হলো। এরপর দুপুরে আহারের বিরতি। আহারের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাফেটেরিয়াতে। বক্তারা সকলে একত্রে সেখানে আহার সেরে অডিটোরিয়ামে ফিরে এলেন।

দুপুর ১.৪০ থেকে বেশ কিছুক্ষণ চলল পিয়ানোবাদন। আগের রাতে যিনি বাজিয়েছিলেন—সেই তুলুইহান উগুরলু-ই বাজালেন। বাদ্যের বিষয় ছিল—'Temples of the Holy East' (পবিত্র প্রাচ্যের দেবালয়সমূহ)।

বৈকালিক অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তা হলেন স্বামী স্মরণানন্দজী। মহারাজের লিখিত ইংরেজি ভাষণের ছাপানো তুর্কি-ভাষান্তর আগেই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।* মহারাজের ভাষণ শেষ হলে তার সম্পূর্ণ তুর্কি অনুবাদ পাঠ করা হলো। পরে তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ কোকোগ্লু বেশ কয়েকবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিকালের অধিবেশন শেষ হলো ৫টা নাগাদ। বক্তাদের একত্রে ছবি তোলা ও প্রত্যেককে স্মৃতিচিহ্ন উপহার দেওয়া হলো।

অনুষ্ঠান-শেষে অডিটোরিয়াম থেকে বেরনোর সময় দেখা হলো ডঃ মিনিরা গারায়েভার সঙ্গে। এই বয়স্কা ভদ্রমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা বিভাগের চেয়ারপার্সন। তিনি আজারবাইজানের মানুষ। দিল্লি থেকে আমাদের ভিসা করার সময় ভাষাবিভ্রাটের ফলে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি দিল্লির তুরস্ক দূতাবাসে তা জানানোয় দ্রুত ভিসার ব্যবস্থা হয়।

চুমহুরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ

হলের বাইরে এসে বুঝলাম, সূর্যদেব অস্তাচলে। ঠাণ্ডা পড়ছে। হোটেলে ফিরলাম ৫টা ৩০ নাগাদ। ডঃ হুসেন জানালেন, সন্ধ্যা ৭টা ৩০-এ রাতের আহার। বক্তারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। হোটেলের ওপরতলায় আহার সেরে আমরা ঘরে চলে এলাম।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কারণ, ঘুরতে ঘুরতে খুব ক্লান্ত হয়ে

---

* মূল ভাষণের বঙ্গানুবাদ এই সংখ্যার ৩৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।—সম্পাদক

পড়েছিলাম। তাই বিকল্প হিসাবে মহারাজ প্রস্তাব দিলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে যদি কোন আলোচনার ব্যবস্থা হয় তাহলে তিনি যোগ দিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সানন্দে রাজি হলেন।

সকাল ১০টা নাগাদ হোটেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালাম। এখানে দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন ডঃ কোকোগ্লু। আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরেই তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হলো। ঠিক আতাতুর্কের মূর্তির সামনে তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। এদিন ছিল শুক্রবার। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে প্রার্থনার জন্য আগত বহু লোকজন-সহ অনেক গাড়ি চোখে পড়ল।

দুপুরে কিছুক্ষণ ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা হলো। মহারাজের বক্তব্য ডঃ হুসেনের মাধ্যমে তুর্কিতে ভাষান্তরিত হয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছাচ্ছিল। আর ঠিক ঐভাবেই ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে। আমাদের এই বিভাগের গ্রন্থাগার দেখানো হলো। সেখানে শুধু ইসলামধর্ম সম্বন্ধীয় বই আছে। তাঁরা জানালেন, এই বিভাগে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সম্বন্ধে পঠনপাঠন হয় না। তাই অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের মনে হলো, বিশেষ গভীরে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ এখানে খুব একটা নেই। সেইজন্য যতদূর সম্ভব সাধারণভাবে ও সহজবোধ্য করে মহারাজ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন ও তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন। অধ্যাপকদের প্রশ্নগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—(১) হিন্দুধর্ম ও তার মূলতত্ত্বগুলির বিষয়ে, (২) হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে, (৩) গঙ্গানদীর পবিত্রতা সম্বন্ধে, (৪) গরু এক পবিত্র প্রাণী বিষয়ে, (৫) সাধুজীবন বা সন্ন্যাসজীবন ও সন্ন্যাসীদের পোশাক সম্বন্ধে, (৬) ইসলাম ও নবী সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা বিষয়ে, (৭) ঈশ্বর ও সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা বিষয়ে, (৮) শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা প্রফেট হিসাবে দেখি কিনা এবং তাঁর পরেও নতুন কোন প্রফেট আসতে পারেন কিনা সেবিষয়ে, (৯) যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ পড়াশুনা করেননি কিন্তু তিনি কিভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতা বা প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন সেই সম্বন্ধে, (১০) ইসলামের কোন্ কোন্ ধারণা আমাদের পছন্দ হয় না—ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার সময় মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ইসলাম-সাধনা ও তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দকে অবগত করান। দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ আলোচনাপর্ব শেষ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম। একটু পরেই বুঝলাম, ডঃ হুসেন আমাদের হোটেলে না নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছালাম পাহাড়ঘেরা একটি জায়গায়। সেখানে রয়েছে একটি বিশাল স্কুল। নাম—'সুলতান মুরাত স্কুল'। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সুন্দর লন। পাশে সরষের খেতে হলুদ ফুলের মেলা। তবে পাহাড়গুলিতে সবুজের বড়ই অভাব।

রাত্রে হোটেলে আহারাদির পর ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক ডঃ তালিপ ওজদেস আমাদের দুজনের আসা-যাওয়ার খরচ আমেরিকান ডলারে দিয়ে দিলেন। পরদিন রওনা। ডঃ হুসেন আসবেন সকাল ৬টার পরই।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

সকাল ৬টার মধ্যেই আমাদের সব প্রস্তুতি শেষ। ডঃ হুসেন এলেন ৬টা ৩০ নাগাদ। বিমান ধরার জন্য ১৯৪ কিমি. পথ যেতে হবে। তাই একটু চিন্তা। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি প্রস্তুত। অত সকালে রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ডঃ হুসেন আমাদের নিয়ে এলেন এক রেস্তোঁরায়—প্রাতরাশ সেরে নেওয়ার জন্য। আমাদের জন্য নিরামিষ স্যুপ, পাঁউরুটি ও চা। তাঁরা খেলেন আমিষ স্যুপ, পাঁউরুটি ও চা। অবশ্য এই কয়দিন আমাদের প্রধানত পাঁউরুটি, স্যুপ ও স্যালাডের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। তুর্কি মিষ্টি, টক দই, দুধ, ফলও পাওয়া যেত।

৬টা ৪৫ নাগাদ গাড়ি বিমানবন্দরের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করল। সুন্দর ফ্রি-ওয়ে। তাই ঠিক দেড় ঘণ্টাতেই ১৯৪ কিমি. অতিক্রম করে কেয়সরি বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট লাউঞ্জ। লম্বা লাইন। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হলো। যখন আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে তখন গাড়ির চালক মেহমেত এসে জানালেন, গাড়ির ফোনে যোগাযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ কোকোগ্লু জানতে চেয়েছেন আমাদের সব ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়েছে কিনা এবং তিনি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদেশে অর্থাৎ তুরস্কে যাঁদের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, সকলেই খুবই সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। তবে এই বিষয়ে ডঃ কোকোগ্লু যেন সকলকেই ছাপিয়ে গেছেন।

উপহার দেওয়ার জন্য কিছু গ্রন্থ আমাদের সঙ্গে ছিল। মহারাজ সেগুলি ডঃ হুসেনকে দিলেন। তিনিও তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বিমানের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফেরার পথে শুধু এই কেয়সরি বিমানবন্দরেই মালপত্র সনাক্ত করতে হলো। 'Turkish Airlines'-এর এই বিমানে আমরা ঠিক সময়েই ইস্তাম্বুল পৌঁছালাম। আমস্টারডাম যাওয়ার বিমান বিকাল ৩টায়। তাই অপেক্ষা। ইস্তাম্বুলেই আমরা আমস্টারডাম ও লণ্ডনের জন্য চেক-ইন করে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে নিলাম।

উপসংহার

ইসলাম ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ। তুরস্কে তা কঠোরভাবে পালন করা হয়। খাদ্য হিসাবে হালাল করা মাংস ব্যবহৃত হয়। তুরস্কের মানুষ দৈনিক আহার্য হিসাবে মাংসের বিভিন্ন

পদ রান্না করে থাকেন। এখানে নিরামিষ খাদ্যের বিশেষ চল নেই মনে হলো। তবে সিগারেটের ব্যবহার খুব।

মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশ্বরতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদককে কথা দিয়েছিলেন, কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ বিশেষত হিন্দুধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠাবেন। ভারতে এসে সেইমতো গ্রন্থ পাঠানো হয়েছে। তবে মূল সমস্যা হচ্ছে ভাষার। গ্রন্থগুলি সবই ইংরেজিতে। যাই হোক, তবুও কিছু অন্য ধর্মের গ্রন্থ লাইব্রেরিতে থাকলে পরবর্তী কোন সময়ে ইংরেজি ও তুর্কি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছাত্র ও শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন ধর্মের পাঠ ও চিন্তা করতে পারবেন।

আমাদের এই তুরস্কযাত্রার ১০২ বছর আগে স্বয়ং স্বামীজী সেদেশে গিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তিনি পৌঁছেছিলেন কনস্ট্যান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল)। কয়েকদিন ছিলেন তিনি সেদেশে। ঘুরে দেখেন বেশ কিছু প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান। যদিও কনস্ট্যান্টিনোপলে স্বামীজী কোন বক্তৃতা দেননি, কিন্তু ২ নভেম্বর স্কুটারির 'আমেরিকান কলেজ ফর গার্লস'-এ 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তুরস্কের মানুষদের কাছে স্বামীজীও সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন।

আমাদের এই ভ্রমণের মাধ্যমে তুরস্কের কিছু মানুষ যেমন সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির বিষয়ে, বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তেমনি আমরাও তুরস্কের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারলাম। এইভাবেই হয়ে থাকে আদানপ্রদান। ভবিষ্যৎই বলতে পারবে, স্বামী অখণ্ডানন্দজীর দেখা যে স্বপ্নের রেশ ধরে এই লেখা শুরু, তার বাস্তব রূপায়ণের জন্যই এই আমন্ত্রণ ও সম্মেলনে যোগদান বিধাতানির্দিষ্ট এক পদক্ষেপ কিনা। [সমাপ্ত] ❑

শব্দচেতনা ২৪

পাশাপাশি : (১) শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকে যিশুখ্রিস্টের দলে দেখেছিলেন (৪) ——পঞ্চমী তিথিতে শ্রীম জন্মগ্রহণ করেন (৫) শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ দুর্গাচরণের পদবি (৬) গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে এসেছিলেন ——কালী (৭) স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন এঁর অংশজাত (৮) মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার এটি উপহার দিয়েছিলেন (৯) স্বামী সুবোধানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ—উভয়ের মায়েরই এই নাম ছিল (১৩) অঘোরমণি দেবী এই নামে প্রসিদ্ধা (১৪) স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এটি শিখতে চেয়েছিলেন (১৫) নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে। —— কিন্তু আমার হাতে রইল।" (১৮) বলরামবাবুর পদবি (২০) ভক্তভৈরব ছাড়াও আর যে-কারণে গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত (২১) যতজন 'ঈশ্বরকোটি' ছিলেন (২২) স্বামী সারদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম।

ওপর-নিচ : (১) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম (২) এই নামে দুই যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতেন (৩) স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্মস্থান (৪) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জন্মস্থান (৯) ——গোপাল ঘোষের বাড়িতে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র রচনা করেন (১০) নরেন্দ্রনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "জানি আমি, প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, —— রূপী নারায়ণ।" (১১) শিশু নরেন্দ্রনাথ (১২) স্বামী যোগানন্দকে ইনি মন্ত্রদান করেছিলেন (১৪) 'ঈশ্বরকোটি'দের অন্যতম (১৬) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগত এক ব্রাহ্ম (১৭) এঁর বাড়ির দুর্গাপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণ যেতেন (১৯) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম 'রসদ্দার'।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অরিন্দম দাস

যোগীন-মার বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে। (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবার ষষ্ঠ পর্যায়ে 'যোগীন-মার বাড়ি'।

—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা ও শ্রীমা সারদাদেবীর অন্যতমা সঙ্গিনী ও সেবিকা যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী তথা যোগীন-মার উত্তর কলকাতার বাগবাজারের পিত্রালয়ে (৫৯বি, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩) জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা কয়েকবার শুভাগমন করেছিলেন—অবশ্য ঠাকুরের দেহরক্ষার পর।

এপথেই শ্রীশ্রীমা যোগীন-মায়ের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন

• আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

যোগীন-মার একমাত্র কন্যা গণুর নামানুসারে ঠাকুরের কাছে তিনি ছিলেন 'গণুর মা'। 'কথামৃত'-এও তাঁকে 'গণুর মা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে তিনি ছিলেন 'মেয়ে যোগেন', আর ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 'যোগীন-মা'। বিবাহিত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর জন্য তিনি সুখী হতে না পারায় একমাত্র কন্যা গণুকে নিয়ে তিনি তাঁর পিতা ডাঃ প্রসন্নকুমার মিত্রের (তৎকালীন ৫৯/১ বাগবাজার স্ট্রিট) বাড়িতে সারাজীবনের মতো চলে এসেছিলেন। বর্তমানে তাঁর এই পিত্রালয়টি ভক্তদের কাছে 'যোগীন-মার বাড়ি' নামে পরিচিত। এই বাড়িতেই ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তাঁর জন্ম এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

ভক্ত বলরাম বসু ছিলেন তাঁর মামাশ্বশুর। তাঁর বাড়িতেই (বলরাম-মন্দির) যোগীন-মা প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে থাকেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে যোগীন-মার বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়—"গণুর মার বাড়িতে বৈঠকখানায় ঠাকুর বসিয়া আছেন।... পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানালার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন-সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।"[১]

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহাশ্রিতা যোগীন-মা সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন : "একসময়ে (শ্রীশ্রীমা) বলিয়াছিলেন, 'মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী' এবং পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখপূর্বক জানাইয়াছিলেন, 'যোগেন আমার জয়া—আমার সখী, সহচরী, সাথী।' "[২]

গম্ভীরানন্দজী আরো জানিয়েছেন : "১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী যোগীন-মায়ের তথায় গমনের আয়োজন করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'যোগেন-মার জন্য ডাণ্ডী হইবে; কিন্তু বাকি সকলকে পায়ে হাঁটিতে হইবে।' স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, যোগীন-মা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুরের ভাবরাশি স্ত্রীজাতির মধ্যে অনুস্যূত হইবে। তিনি তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রী-মঠের অধিনেত্রীপদে ইঁহাদিগকে অধিষ্ঠিতা করিবার আশা পোষণ করিতেন।"[৩]

সারাজীবন শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী যোগীন-মা শেষজীবনেও উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ি'তে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করেছেন, যদিও তিনি মায়ের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিলেন কিনা জানা যায় না। এই সম্পর্কে স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন ঃ "যোগীন-মার দৈনন্দিন জীবন বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি স্নানাহ্নিকান্তে নিত্য 'মায়ের বাটী'তে আসিয়া ঠাকুরের দুই বেলার ভোগের জন্য তরকারি কুটিতেন এবং অন্যান্য কার্যসমাপনান্তে অদূরবর্তী স্বগৃহে গমনপূর্বক রন্ধন করিয়া উহা গৃহদেবতার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদন করিতেন। পরে স্বীয় জননী ও অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া ও স্বয়ং আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণান্তর পুনর্বার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধ্যমতো তাঁহার সেবাদি করিতেন। অবশেষে মায়ের বাটীতে রাত্রের ভোগ সমাপ্ত হইলে তিনি স্বগৃহে ফিরিতেন। বস্তুত, শ্রীশ্রীমায়ের এইরূপ সেবা যোগীন-মার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।"[৪]

যোগীন-মার বাগবাজারের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়—"যোগীন-মা গৃহে বাস করিলেও তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট কৌলসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপূজার গুহ্যতত্ত্ব শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে তদনুরূপ সাধনও করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার গৃহে প্রতিবৎসর ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় আগমন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন।"[৫]

এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করে সরলাবালা দেবী জানিয়েছেন ঃ "উদ্বোধন, কলিকাতা। আজ জগদ্ধাত্রী-পূজা। সকাল হইতেই ভক্তসমাগম। যোগেন-মার বাড়িতে পূজা; তিনি সকালে আসিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মাকে যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন।... দুপুরবেলা মা ও আমরা সকলে যোগেন-মার বাড়ি যাইয়া ঠাকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। মা সারাদিন উপবাসী রহিয়াছেন, কারণ তাঁহার বাড়িতে পূজা। বেলা চারটার পর যখন সব পূজা শেষ হইল, তখন মা প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিলেন।"[৬]

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা—উভয়ের পূতস্মৃতি ধারণ করে বাড়িটি আজও বিদ্যমান। বর্তমানে মিত্র পরিবারের লোকজন এবং কিছু ভাড়াটিয়া এখানে বাস করেন। ❑

পথনির্দেশ ঃ যোগীন-মার বাড়ির ঠিকানা ঃ ৫৯বি, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩। শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার স্ট্রিট ধরে এগোলে 'মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুল'-এর কিছু আগে ডানদিকে পড়বে এই বাড়িটি। এবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সম্বলিত একটি প্রস্তরফলক প্রবেশপথের বামদিকে উৎকীর্ণ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৯।২
২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৫১
৩ ঐ, পৃঃ ৪৬১-৪৬২
৪ ঐ, পৃঃ ৪৬৩
৫ ঐ, পৃঃ ৪৬৪
৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৩১৫

জীবনদাতা

পদ্মরাগ সরকার

বয়সকালে বেনারসী
দিন ফুরোলে বারাণসী।
সূর্য-ডোবা সাঁঝ বিকেল
হঠাৎ কখন খতম খেল।
খেলার শুরু কখন কোথা
হিসেব রাখেন জীবনদাতা।
সব ছেড়ে তাই তাঁকেই ধরি
ভাঙুক হাল, পালের দড়ি।
ডুবুক তরি, ভয়কে দুয়ো
আসল তিনি, বাকি ভুয়ো।
নকল ফেলে আসল খোঁজা
ভাবলে কঠিন, নেহাৎ সোজা।
একটি হাত কাজের ঘাটে
অপরটি ঠিক তাঁর চৌকাঠে।
কাটুক কাল যেমন তেমন
লাগাম হাতে তিনিই স্বয়ং।
তাঁহার প্রকাশ সকল সুরে
সেই আনন্দ হৃদয় জুড়ে।
সত্য-আলোক মলিন প্রাণে
ধীরে গহিন আঁধার ভাঙে।
আলোয় ভাসা হৃদয়পথে
আসেন দয়াল সোনার রথে।
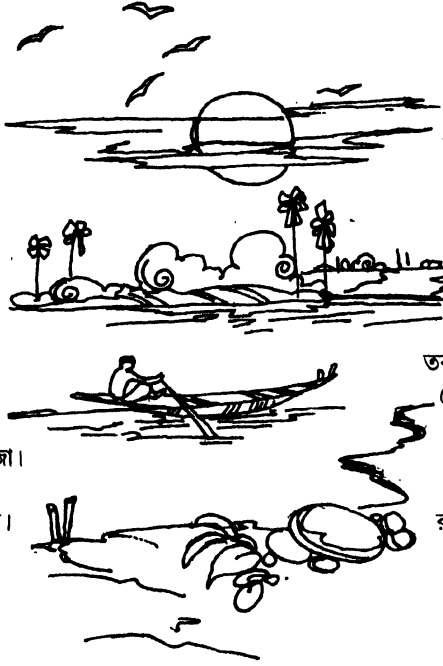
সোঽহম্

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের আজ মানুষকে প্রয়োজন
পাশাপাশি থাকি, তবু চেনা নয় মুখ
ভালবাসা নেই, প্রাণহীন আয়োজন
স্বার্থপরতা, হননেই উৎসুক।
মানুষের কাঁধে মানুষ রাখে না হাত
চোরা স্রোত বয়, গরলেতে জর্জর
প্রত্যাশা নেই, শুধুই প্রত্যাঘাত
উষ্ণতাহীন, প্রতিবেশী সেও পর।
তবু ভোর হয়, আলো আসে অফুরান
যেন সে শোনায় নতুন দিনের গান।
সোঽহম্ মন্ত্র প্রাণে আনে নিরাময়
ঘোচায় কলুষ, চিরসত্যের জয়।
সব প্রাণে তিনি, হৃদয় যে দেবালয়
রাম ও রহিম কেউ কারো পর নয়।
প্রাণে প্রাণে বাজে বিশ্বধাতার বীণ
মানবাত্মার বন্ধন অমলিন।
সোঽহম্ মন্ত্রে ফুটে ওঠে কত ফুল
মানুষে মানুষে ঘুচে যাক যত ভুল।
দ্বেষ-বিদ্বেষ, শেষ হোক গ্লানি-ভয়
রক্তলোলুপ নিষাদের হোক লয়।

তুমি যে আমার চির আপনার

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি যে আমার চির আপনার
সেকথা থাকে না মনে,
তাই হৃদয় আমার মগ্ন থাকুক
তোমার চরণধ্যানে।
প্রেমের ঠাকুর প্রেমপারাবার
সেও ভুলি ক্ষণে ক্ষণে
রসনা আমার ব্যাপৃত থাক
তোমারই নামগানে।
দুই হাতে প্রভু যাহা কিছু করি
হোক সে তোমার পূজা
তব নাম সদা হৃদয়ে জপিব
সকল রজনী দিবা।
সৃষ্টি মাঝারে নয়ন হেরিছে
তোমার রূপের মাধুরী।
নয়ন মুদিলে কানে বাজে তব
প্রেমানন্দ লহরী।

বিরহ সাজানো ফুলে

অমরেন্দ্র গণাই

বিরহ সাজানো ফুলে চিরকাল মিলনের খেলা;
বনের গভীর মুখে রূপ ঝরে সারা সন্ধ্যাবেলা।
কখনো জ্যোৎস্নায় তার ঘুম নামে পাতার গভীরে—
আঁধার তরঙ্গ থেকে তুলে আনে বেদনার হীরে।
কেন এত কান্না দিলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ক্ষয়;
তাই বুঝি বনাঞ্চল পেতে রাখে পাতার প্রণয়।
খেলাগুলো বুকে নিয়ে হেঁটে চলি সান্ধ্য নদীতীরে—
তাই তো জ্যোৎস্নায় তার ঘুম ভাঙে পাতার গভীরে।

শরণাগতি

সুবল কর

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাঙ্ক্ষিত যে-যাত্রা
সে-যাত্রা শরণাগতি।

মুক্ত বাতাসের মতো সে সংশয়নিরসন,
স্বচ্ছ ঋজু বিশ্বাসের সে সহজ সঞ্চারণ,
চিত্তের সে শুদ্ধ আলো দৃষ্টির উন্মেষ,
সৎকর্মের সে সুমতি।

দিক্‌ভ্রান্ত মুমূর্ষুর একান্ত নির্ভর সে-ই,
স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ সে পরম প্রশান্তেই,
কাল-পাত্র ভেদশূন্য ঐক্যের ঐশ্বর্য
বরাভয় সে সদ্‌গতি।

সহাবস্থান

অশোককুমার ঠাকুর

বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ জীবন
কালের যাত্রাপথে
অহেতুক জীবন অন্বেষণ
বেঁচে থাকা কোনমতে।

ক্ষয়িষ্ণু যুগযন্ত্রণায়
বাঁচে শুধু যন্ত্রমানব
অথবা আত্মহীন মন্ত্রণায়
দুঃশাসন কিংবা দানব।

স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সরলের
দুঃসহ যাপন ছবি
সবুজের বুকে বাস গরলের
সশঙ্ক ঈশ্বরনবী।
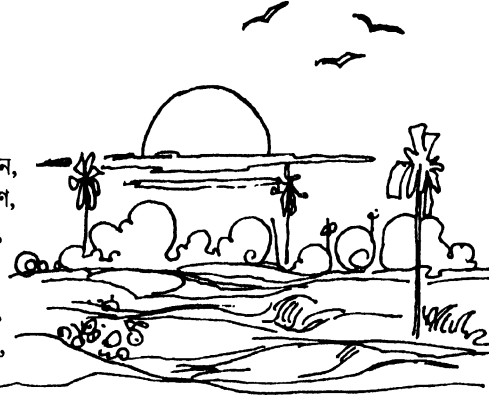
এক আশ্চর্য সকাল

ঈপ্সিতা ভৌমিক

প্রচ্ছন্ন আলো-আঁধারের সর্পিল চক্রে
ক্ষতবিক্ষত আহত আবর্তে
ভেসে যাচ্ছিল
মানুষের পিচ্ছিল মুখগুলি।

নিঃসঙ্গ রক্তাক্ত মন পথ খুঁজে ফেরে
অন্ধ তমিস্রার বন্ধ চোরাগলিতে।
এখানে, ওখানে—কোথাও শান্তি নেই।
আছে শুধু অসংখ্য চাওয়া-পাওয়ার রঙিন বুদ্‌বুদ।

কিন্তু জীবন তো আলোর পথযাত্রী।

তাই স্বপ্নের ভেলায়
এক ঝলক টাটকা তাজা বাতাস এসে
মুখোশে আঁটা বিবর্ণ মুখগুলো সরিয়ে দিয়েছিল।

সারি সারি নীলপদ্ম...
ভেসে চলেছিল স্বপ্নগন্ধমাখা
এক অনির্বাণ জ্যোতিশিখা।
দুচোখে তার প্রেমের বন্যা
আর নিশ্চিত আশ্বাস।

উত্তরণের ভোর শুরু হলো বুঝি।

করুণাময়ী মা

সন্ধ্যারানী মুখোপাধ্যায়

মায়ের করুণাধারা বহিছে সদাই ওরে
অবোধ সন্তানের লাগি,
কে কোথায় আছিস ছুটে আয় সবে
মার পদতলে ভিখ মাগি।
শান্তি দাও মা শান্তিদায়িনী
শান্তি নাই যে হেথা,
অশান্তির আগুন জ্বলিছে সদাই
তুমি আছ মাগো কোথা।
যেখানেই থাক ছুটে এস তুমি
দাও মা শান্তিবারি,
দুঃখ-দহনে জ্বলে পুড়ে মাগো,
ঝরে না অশ্রুবারি।
এত দুঃখ মাগো কেমনে সহিবে,
তোমারই প্রিয় সন্তান,
সহনশক্তি লোপ পেয়ে গেছে,
কোনভাবে আছে তাদের প্রাণ।

শান্তির জন্য মতবিনিময় ঃ
সার্বজনীন ঐক্যের লক্ষ্যে ধর্মের অবদান
স্বামী স্মরণানন্দ

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

আজ এখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'Dialogue for Peace: The Contribution of Religions to Living Together' বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদান করতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত।

আমি ভারতবর্ষের এমন একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি, যা মাত্র একশো বছর আগে স্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি এক সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই অংশস্বরূপ —যার মতবাদগুলির সাধন ও প্রচার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬)। আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমি তাঁর সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। কারণ, তিনি ছিলেন বর্তমান যুগে শান্তিস্থাপন ও সমন্বয়-সাধনের অগ্রদূত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্গদেশের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) এক প্রত্যন্ত গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই তিনি ভগবৎ-সাধনায় মগ্ন হন। দীর্ঘ বারো বছরব্যাপী তিনি ধর্মের সকল পথ অবলম্বন করে কঠোর সাধনা করেন। প্রত্যেক ধর্মপথেই তিনি সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন এবং ঘোষণা করেন যে, সকল পথই মানুষকে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। কোন পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর ছিল না। অজানাকে জানাই ছিল তাঁর সাধনা। তাঁর আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তগুলি তিনি নিম্নলিখিতরূপে বর্তমান যুগের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেছেন ঃ

(১) ঈশ্বর সত্য এবং তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। (২) ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। (৩) তার উপায় হলো—ভোগবাসনা ত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগবোধ। (৪) সকল ধর্ম সেই এক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন পথস্বরূপ। (৫) মানবসেবা ঈশ্বরের সেবা। (৬) সত্যকথা এই যুগের তপস্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ত্যাগী যুবক গুরুভ্রাতাদের সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠা করলেন এক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ, যার নামকরণ হলো রামকৃষ্ণ মঠ। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভাষণ দেন। সেখানে তিনি তাঁর গুরুদেবের বাণীগুলি আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। সমগ্র আমেরিকা তাঁকে ঐ ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তারূপে স্বীকার করে নেয়।

ঐ ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ঘোষণা করেন ঃ "যদি এই ধর্মমহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করে থাকে তো তা এই—সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্ম-পদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন। এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁকে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, তাঁর মতো ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লেখা হবে—'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ কেউই কোন নতুন ধর্ম অথবা দর্শন প্রবর্তন করেননি। তাঁরা ছিলেন ধর্মজগতের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যাঁরা সর্বদাই অধ্যাত্মভাবের তুরীয় অবস্থায় বিচরণ করতেন। ভারতবর্ষের যখন চরম সঙ্কটকাল, ঠিক সেইক্ষণেই তাঁরা ভারতবর্ষের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরি-রূপে আবির্ভূত হন। তাঁরা ঐ শাশ্বত ঐতিহ্যের ধারাটিকে সংস্কৃত, জীবন্ত এবং সমৃদ্ধ করে তোলেন, কিন্তু নিজেদের কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা অন্যান্য ধর্ম এবং সংস্কৃতিসমূহের গভীরে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র মানবজাতির নিকট এক সার্বজনীন অধ্যাত্মদর্শনের বার্তা পৌঁছে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দেশিত দার্শনিক তত্ত্বগুলি ঐ সার্বজনীন অধ্যাত্মদর্শনের প্রতিফলন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ 'রামকৃষ্ণ মঠ'-এর সমাজসেবামূলক শাখারূপে প্রতিষ্ঠা করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। তিনি তাঁর গুরুভাইদের সম্মুখে তুলে ধরেন দ্বিমুখী আদর্শ—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

আজ একশো বছর অতিক্রান্ত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামক এই সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গৃহী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের সাহায্যে অভীষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করে চলেছে এবং ভারতবর্ষে আজ এক বিশেষ গৌরবময় স্থান লাভ করেছে। সমন্বয়, শান্তি ও মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে আজ এই সঙ্ঘ সমগ্র বিশ্বে তার অবদানের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ১১০টি এবং আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জাপান-সহ বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের ৩৭টি শাখাকেন্দ্র আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক-রূপে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ ঘোষণা করে গেছেন, ঈশ্বর নাম, রূপ এবং সকল জাগতিক বন্ধনের অতীত। তিনি অসীম, তিনি ভূমাস্বরূপ, তিনি সকল সত্তার অন্তর্নিহিত নির্যাস, দেহ-মনের জটিল তত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ, তিনি নিত্য, তিনি অবিনশ্বর। একমাত্র তাঁর জন্য ব্যাকুল হলে এবং তাঁকে লাভ করলেই মানুষ তার বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে এবং তখন সে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়।

এটিই হলো ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণের পরম উপলব্ধির সারাংশ। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা একথাও ঘোষণা করেন, ঐ মহিমময় সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। আর যেকোন অধ্যাত্ম সাধককেই ঐ চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেকোন একটি পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা দেওয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য অথবা অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা দর্শন— এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর এবং মুক্ত হও। এটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ তার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।"

আজ সমগ্র বিশ্বের প্রধান সমস্যা হলো, আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দান করে নিজেদের মধ্যেই বিবাদ সৃষ্টি করছি। আমরা সারবস্তু পরিত্যাগ করে অসার বস্তু নিয়ে মেতে উঠছি। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যের ভাবগুলিকে ছেড়ে সেগুলির মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য-গুলিকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। তারই ফলস্বরূপ বহু শতাব্দী ধরে অব্যাহত আছে বিবাদ, যুদ্ধ এবং হাজার হাজার মানুষের নিধন।

আমাদের এই বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে, সব ধর্মই ঈশ্বরলাভের উপযুক্ত পথ। এটি যেন একটি পাহাড়ের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—এই চারদিক থেকে আরোহণ করার মতো। মনে করুন, চারজন ব্যক্তি চারদিক থেকে একটি পাহাড়ে আরোহণ করতে শুরু করল। যাত্রার প্রাথমিক পর্বে তাদের মধ্যে বিশাল দূরত্ব থাকবে। কিন্তু যত তারা উঁচুতে উঠবে, ততই তাদের মধ্যে দূরত্ব কমবে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তারা এবিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত থাকে না। পর্বতশীর্ষে আরোহণ করার পর তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।

প্রকৃত ধর্ম হলো সেই 'সর্বোত্তম'কে লাভ করার সাধনা। এটি হলো পাশব প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে নিজের অন্তর্নিহিত দৈবভাবটি উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা। রাজনীতি বিদ্বেষ ও ভীতির উদ্রেক করে। তার সঙ্গে ধর্মকে জড়ানো উচিত নয়।

প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সমগ্র মানবজাতিকে ঈশ্বরের ছত্রছায়ায় সমবেত হতে হবে। রাজনীতির অবদান ঘৃণা এবং ভীতিকে পরিহার করে ধর্ম থেকে লাভ করতে হবে প্রেম, নির্ভীকতা এবং শান্তি। সেই কারণেই আন্তর্ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

আরেকটি বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিতে চাই। বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলি তাদের আধিকারিক পুরুষগণ কর্তৃক উপলব্ধ কয়েকটি চিরন্তন সত্যের কথা ঘোষণা করে। একই সঙ্গে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য সাধারণ প্রবর্তকগণ কয়েকটি নিয়মের প্রচলন করেন। এই নীতিগুলিকে অনুসরণ করেই অধিকাংশ নরনারী সেই উচ্চতম শিখরে পৌঁছাতে পারে বলে তাঁরা আশা করেন। এই লৌকিক বা ব্যবহারিক মূল্যবোধগুলিকে যখন শাশ্বত সত্যরূপে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা হয়, তখনি হয় অধিকাংশ বিবাদের সূত্রপাত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাগুলিও পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ তাতে এগুলি যুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণ তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা যে নিত্য সত্যের সন্ধানলাভ করেছিলেন, আজ প্রয়োজন সেগুলির ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা।

আধুনিকোত্তর দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী চরম সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সেই চরম সত্য সম্বন্ধে মানুষের ব্যাকুলতার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি এবং সেই কারণে সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিরূপ মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এমন চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের ঐ বহুত্ববোধের মধ্যে যে-বস্তুটির একান্ত অভাব, সেটি হলো কোনরকম পরীক্ষালব্ধ সত্যতার উপস্থিতি। ঐ বহুত্ববাদকে পরীক্ষিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার মহান কাজটি করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি আক্ষরিকভাবেই বিভিন্ন ধর্মনির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কঠোর সাধনা করেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে ঘোষণা করেন—"যত মত তত পথ"। অর্থাৎ সকল পথই সেই এক চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তার দ্বারা বহুত্ববাদ একটি প্রামাণ্য ধর্মমতরূপে স্বীকৃত এবং দার্শনিক তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রধান বাণীগুলি হলো—(১) প্রত্যেক ধর্মই সেই চরম সত্যকে লাভ করার একটি পথ। (২) ঈশ্বর এক, তাঁর নাম ভিন্ন ভিন্ন। (৩) সব

পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। (৪) পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, কারণ সেগুলি সবই সেই চরম সত্যে পৌঁছে দেয়।

আমার বিশ্বাস, অন্তত এই চারটি তত্ত্ব সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মসমন্বয় স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : যে-সমাজে এই চরম সত্যগুলি ব্যবহারিক মাত্রা লাভ করেছে, নিঃসন্দেহে সেই সমাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা বহুজাতিক সমাজে বাস করি। সেইজন্য আমাদের বহুত্ববাদকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই 'Pluralism' (বহুত্ববাদ) শব্দটির শুরু একটি বড় হরফের 'P' দিয়ে, যার অর্থ হলো 'Positive' (ইতিবাচক) মনোভাব। আমাদের লক্ষ্য 'Syncretism' (কৃত্রিম ঐক্যস্থাপন) নয়। বহুজাতিক সমাজে অপরের অনুসৃত পথে কোনরকম বাধা সৃষ্টি না করে প্রত্যেকে যেন তার নিজ নিজ পথ অবলম্বন করতে পারে।

আন্তর্ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমেই এই মানসিকতা অর্জনের পথনির্দেশ লাভ করা যাবে। তার ফলে শুধু সমাজের উচ্চশ্রেণি ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই নয়, পরন্তু দরিদ্র, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষও শান্তি ও উন্নতিলাভের জন্য নিজ নিজ পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই আন্তধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য আমি চুমহুরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ এই বিশ্বায়নের যুগে এইজাতীয় সম্মেলন বিশ্বধর্ম স্থাপনের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও অধিকতর উদার মানসিকতা গঠনে সহায়তা করবে এবং এইভাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে।

আসুন, আজ আমরা এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের শান্তি, উন্নয়ন এবং সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

সকলকে ধন্যবাদ জানাই।* ❑

* গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২ তুরস্কের সিবাস শহরের চুমহুরিয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'Dialogue for Peace : The Contribution of Religions to Living Together' বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজীর ইংরেজি ভাষণের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন **রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**।

এই ভাষণটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—**সম্পাদক**

উদ্দেশ্যহীন কর্ম

এক ব্যক্তি হরিদ্বারে রেলগাড়িতে উঠেছে। লাকসরে টিকিটচেকার টিকিট চেয়েছে। সেই লোকটির গায়ে অনেকগুলি জামা। কোন্ পকেটে সে টিকিট রেখেছে তা খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে গাড়ি মোরাদাবাদ এসে গেল। সে-গলদঘর্ম। অন্য যাত্রীরা বলল : "নাই বা পেলে টিকিট। তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?" তখন সেই ব্যক্তি বলল : "না, সেজন্য নয়। টিকিটটা না পেলে আমি জানব কি করে যে, আমি কোথায় যাচ্ছি?" লোকেরা বুঝল যে, এই ব্যক্তি একটি আহাম্মক। ট্রেনে চড়ে সে যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তা তার জানা নেই।

সংসারেও একই ব্যাপার। লোকে কত কাজ করছে, কত ভৌতিক-বিজ্ঞান, কত ব্যবসা-বাণিজ্য! দিনরাত ব্যস্ত নানা মতলবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কি, কোথায় যাচ্ছে, আসলে কি চায়—তার খোঁজ নেই। এও মহামূর্খতা নয় কি? কর্ম করতে হবে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কি লক্ষ্যে করছ তা আগে ঠিক না করে শুধু কর্মই করে গেলে তার পরিণাম কি? তার শেষ কোথায়? ভৌতিক বিজ্ঞানের পিছনে ছুটে তাই আজ মানুষ দিশাহারা।

মনের জয়

মন জয়ের উপায় তিনটি—রোধ, শোধ ও বোধ।

(১) **রোধ** অর্থাৎ মনকে যোগাভ্যাস দ্বারা নিরোধ করা। এতে পূর্ণ মনোজয় হয় না। অভ্যাস ছেড়ে দিলেই মন আবার যে কে সেই।

(২) **শোধ** অর্থাৎ মনকে শুদ্ধ করা—শুভ নিষ্কাম কর্ম, উপাসনাদি দ্বারা মনের মলিনতা দূর করা। তা করলেও বিষয়ের আকর্ষণে মন আবার মলিন হয়ে যায়। এটি একটি 'never ending process'। অনন্ত সংস্কার মনের। কতগুলি জয় করবে?

(৩) **বোধ** অর্থাৎ জ্ঞান। আত্মবিচারে জ্ঞান হয়। ঐ রোধ ও শোধ সহকারে আত্মবিচার কর। তখন জ্ঞান হলে আর মনই থাকবে না। তখনি ঠিক ঠিক মনের জয় হবে। জ্ঞানই লক্ষ্য।

বেদান্তে সৃষ্টি বদলায় না। দৃষ্টি বদলাতে হবে। রোধ ও শোধ কঠিন। জ্ঞানবিচারই কর্তব্য। সৃষ্টি মিথ্যা। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বেদান্ততত্ত্ব একদিকে কঠিন, অন্যদিকে সহজ। ❑

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক-পৌষ ১৪০৯ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) সংখ্যায় এই আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। এবার শেষাংশ।

■ মানসিক নৈকট্যে গভীর বাধা

আমেরিকার মার্সেলিস থেকে যাত্রা শুরু করে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ নিবেদিতা মাদ্রাজে এসে পৌঁছালেন। ৫ ফেব্রুয়ারি পৌঁছালেন কলকাতায়।

ভারতবর্ষে এই তাঁর দ্বিতীয়বার পদার্পণ। প্রথমবার তিনি এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগিণী হিসাবে, দরিদ্র মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে। তখনো তিনি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। কিন্তু এবার নিবেদিতা অনেকটাই অন্য মানুষ। অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বেশি স্বাবলম্বী।

গত এক বছর ইউরোপ, আমেরিকা তিনি চষে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কাজে, লেখায় ও বক্তৃতায়। ভারতের সার্বিক উন্নয়নে নিবেদিত-প্রাণ বিদুষী হিসাবে এদেশ ও বিদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি এখন এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে ফিরে আসার অল্প আগে ম্যাকলাউডের মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে 'Asia is One' আন্দোলনের পুরোধা জাপানী শিল্পী কাউন্ট কাকুজো ওকাকুরার। কলকাতায় আসার পর আনুমানিক মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় নিবেদিতা-ওকাকুরা সাক্ষাৎ ও মুখোমুখি আলোচনা হয়।[১] খুব সম্ভবত তারপরই নিবেদিতা মনস্থির করে ফেলেন, ভারতবর্ষের পরাধীনতা মোচনের আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন।

সে-কাজে আত্মনিয়োগ করার ফাঁকেই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন দেশীয় শিল্প আন্দোলনেও। গুরুদেব বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অনিবার্য দায়বদ্ধতা অটুট রেখেও এবং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের ব্যাপারে স্বামীজীর স্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও নিবেদিতা এই কর্মকাণ্ডে প্রাণপাত করতে থাকেন।

৪ জুলাই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ হয় এবং তার কিছুদিন পরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার 'কাগজে-কলমে' সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। ফলে নিবেদিতা তাঁর নির্ধারিত কর্মযজ্ঞে আরো স্বাধীনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠতার পক্ষে খুবই প্রশস্ত সময়। স্বামীজীর সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বের সংঘাত তখন আর বাধা নয়। তাছাড়া শুধু শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়েই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আগ্রহ তখন সর্বজনবিদিত সত্য।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু আগেই সম্ভবত ২৪ বা ২৫ মার্চ ১৯০২ নিবেদিতা তাঁর ডাকা এক পার্টিতে ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেন।[২] ১২ জুলাই ১৯০২ 'এক্সেলসর ইউনিয়ন' ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বণ স্কুলে স্বামীজীর স্মৃতিতে এক শোকসভার আয়োজন করে; নিবেদিতা ছিলেন সেই সভার মূল বক্তা, রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। কিন্তু এসব ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই থাক, নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে এসব যোগাযোগ কোন ইতিবাচক অনুঘটকের কাজ করেনি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের উজ্জ্বল প্রতিনিধি নিবেদিতার প্রতি ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের এক আদর্শগত বাধা তো থাকবেই। তাছাড়াও এই দূরত্বের পিছনে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি মোটামুটি গোটা তিনেক ঃ প্রথমত, যাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে আগ্রহ এবং সেই সূত্রে প্রাণাধিক প্রিয় রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ, সেই কাউন্ট ওকাকুরার সম্পর্কেই নভেম্বর মাসে নিবেদিতার মোহভঙ্গ ঘটে। এবং 'ভারতপ্রেমিকের ছদ্মবেশে' তাঁর 'গোপন অভিসন্ধি' বিষয়ে নিবেদিতা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এই ঘটনা নিবেদিতার মনকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। আলাপকে বন্ধুত্বে রূপান্তরে তিনি সংযত হন। দ্বিতীয়ত, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রোগভোগ এবং ২৯ নভেম্বর ১৯০২ তারিখে মৃত্যু শোকস্তব্ধ রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য নিজস্ব কাব্য-বিদ্যালয়-বন্ধু-পরিজনের গণ্ডিতেই আটকে রাখে। তৃতীয়ত, নিবেদিতা এই সময় বক্তৃতা ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে দৌড়ে বেড়ান। তবে এসব বাধাগুলি রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতা ঘনিষ্ঠতার পথে প্রকৃত অন্তরায় নয়। আপাতত মূল বাধার কারণ উভয়ের রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য।

মাত্র দশবছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে নিবেদিতা তাঁর মাতামহ হ্যামিল্টনের অভিভাবকত্বে মানুষ হন। এই হ্যামিল্টন ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা। সম্ভবত তাঁর প্রভাবেই নিবেদিতা বরাবর চরমপন্থী আন্দোলনের পক্ষপাতী। ওকাকুরার সংস্রব ত্যাগের পরেও তাঁর এই প্রবণতা এতটুকু কমেনি। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে অরবিন্দ ঘোষ ভারতের গুপ্ত

সমিতিগুলির সমন্বয়সাধনে পাঁচ সদস্যের যে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়েন, নিবেদিতা ছিলেন তার অন্যতমা।

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন এপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—"তাঁর [নিবেদিতার] দেশসেবার মধ্যে যে প্রচণ্ড দাহ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন না।... একদিকে তিনি নিবেদিতার প্রতি যেমন যথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তেমনি আবার ভগিনীর চারিত্রিক ঋজুতা ও বিপ্লবী মনোভাবের চণ্ডতাকে (যেগুলিকে তিনি বোধহয় বিবেকানন্দের প্রভাব বলে মনে করতেন) পরিহার করে চলতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, উপন্যাসে, আলোচনায় প্রধর্ষী দেশপ্রেমকে কখনো স্বীকৃতি দিতে পারেননি। নিবেদিতা এসব ব্যাপারে আইরিশ-বিপ্লবের আদর্শে অগ্নিকণা ছড়াতে চাইতেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলবার জন্য তিনি আগ্রাসী স্বদেশপ্রেমকে অধিকতর মূল্য দিতেন। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনরকম মিল ঘটা সম্ভব ছিল না।"[৩]

প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও এই একই মত প্রকাশ করেছেন—"একথা সত্য বলেই মনে হয় যে, স্বদেশী আন্দোলন যখন বিপ্লব আন্দোলনে পর্যবসিত হলো এবং নিবেদিতা তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। আবার তাঁদের মতান্তরের কথাও কবি জানিয়েছেন। রেমঁ-লিখিত নিবেদিতা-জীবনীতে পাই, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেছেন, 'তোমার বিশ্বাস আছে, শক্তি আছে, তুমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলতে পার, কিন্তু তোমার চারিদিকে যে-যুবকদল এসে জুটেছে, তাদের বিশ্বাসও নেই, শক্তিও নেই, তারা হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা কাজ চায় মাত্র। তুমি না থাকলে তারা কিছুই করতে পারবে না।' এই সংলাপের উৎস কি জানি না, কিন্তু এই ধরনের সংলাপ অসম্ভব ছিল না। অরবিন্দমোহন বসুর সঙ্গে কথাবার্তার নোটে পেয়েছি—'নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংঘর্ষ হতো; নিবেদিতার উগ্র জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে তুলত; ও বস্তুটা তাঁকে ধাক্কা দিত, যার থেকে তিনি নিজে সরে এসেছিলেন।' একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, আন্দোলনের পাক-খাওয়া দিনগুলিতে দুজনে ভিন্ন ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।"[৪]

পরবর্তী কালে দেখা গেছে, শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শেই নয়, উভয়ের স্বভাব ও বিশ্বাসেরও মূলগত পার্থক্য ছিল খুব স্পষ্ট। অর্থাৎ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দই নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ সৌহার্দ্যে প্রধান বাধা—এমন একটা বিশ্বাস অদ্যাবধি প্রচলিত থাকলেও এবং নিবেদিতা নিজেও একসময় এই ধারণার বশবর্তী হলেও সে-পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণত সত্য নয়। অবশ্য উভয়ের মানসিক নৈকট্যের পথে এমন 'গভীর বাধা' থাকলেও উভয়ের পারস্পরিক 'গভীর ভক্তি' ও শ্রদ্ধাবোধের কথাও স্বীকার করতে হবে।

তাই নিবেদিতা যখন স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবককে পদব্রজে হিমালয়-ভ্রমণে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন, রবীন্দ্রনাথ সোৎসাহে রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেন—সেটা ১৯০৪ সালের মে মাসে গ্রীষ্মাবকাশের সময়।[৫]

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেনঃ "একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হলো। নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ—আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালয়ের পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষত তীর্থগুলি দেখে আসে। নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না; যখন যা মনে আসত তখন তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন স্বামীজীকে ধরলেন হিমালয়-ভ্রমণের দল জোগাড় করতে। বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম দলটিকে নিয়ে সদানন্দ স্বামী কেদার-বদরী রওনা হবেন, তখনি তাঁর ইচ্ছা হলো আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান।"[৬] বাস্তবিক, রথীন্দ্রনাথের এই হিমালয়-ভ্রমণের সম্পূর্ণ স্মৃতিচারণটি পড়লে মনে হয়, শেষপর্যন্ত দীনেন্দ্রনাথকে তিনি সঙ্গী হিসাবে পাননি।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা উভয়ে কলকাতায় থাকলে প্রায়ই নানা উপলক্ষ্যে তাঁদের সাক্ষাৎ হতো এবং অবশ্যই মতবিনিময় হতো। প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'হিসাবের খাতা' ইত্যাদি থেকে যে-তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে জানা যাচ্ছে, উভয়ে উভয়ের বাসস্থানেও এসেছেন বেশ কয়েকবার।

এই সময় ১৯০৪ সালেই ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি আধিপত্যের বিস্তার ও উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন 'ইউনিভার্সিটি বিল' পাশ করালেন। এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলনে নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠ প্রায় একই উষ্মায় উচ্চারিত হয়।

এই বিল প্রণয়নের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে কার্জন ১৯০২-এর জানুয়ারি মাসে যে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশন' গঠন করেন, তার সুপারিশগুলি সম্পর্কেই নিবেদিতা আগাম গর্জে ওঠেনঃ "সম্প্রতি আমরা একটি ইউনিভার্সিটি কমিশন পাইয়াছি—সমস্তরকম শিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞান-শিক্ষাকে ধ্বংস করিতে যাহা অতি উত্তম ব্যবস্থা লইয়াছে। ভারতবর্ষের 'ভারতবর্ষ' থাকিবার অধিকার, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করিবার অধিকার, জ্ঞানার্জনের অধিকার—এইসব [হরণ] সংক্রান্ত অন্যায়

আমাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। এইসকল জরুরি ক্ষোভগুলি সামনে না থাকিলে আমি হয়তো ভারতবর্ষের খাদ্যের অধিকার অথবা ন্যায়বিচারের অধিকার অথবা অন্য কোন বিষয় লইয়া উত্তপ্ত থাকিতে পারিতাম।"[৭]

৪ জুলাই ১৯০৪ তিনি ম্যাকলাউডকে লিখেছেন ঃ "How the pressure upon the people, to deprive them of Education, is multiplying."[৮]

দেশের এই সঙ্কটের সময় রবীন্দ্রনাথ পথ দেখাতে কলম ধরলেন। আষাঢ় ১৩১১ 'য়ুনিভার্সিটি বিল' শীর্ষক রচনায় তিনি কার্জনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন ঃ "বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী? আমাদের কানে একথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।...

"সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে—কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেশন করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।"[৯]

এমন জননী-সুলভ শিক্ষাদাত্রী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছে ভগিনী নিবেদিতার মতো শিক্ষাবিদের কথাই—যাঁকে তিনি পরবর্তী কালে 'লোকমাতা' হিসাবে বরণ করে নেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পাশাপাশি জোড়াসাঁকোর বাড়িটিতে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এক শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এবং এই শিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি নিবেদিতাকে আহ্বান করেন। ৫ জুলাই ১৯০৪ নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে চিঠিতে জানান ঃ "Mr. R. N. Tagore has offered me his beautiful house for a Normal School."[১০]

নিবেদিতা এব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন ঃ "Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়িতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়।"[১১] সম্ভবত এইসব বাস্তব অসুবিধার কারণেই এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। নিবেদিতা-জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাও জানিয়েছেন ঃ "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাসভবনের একাংশে নিবেদিতাকে একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অনুরোধ করেন। নিবেদিতারও বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে অন্যত্র শিক্ষকতা সম্ভব ছিল না; সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষা সম্ভব হয় নাই।"[১২]

তবে 'নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা'র পরিকল্পনা যে নিবেদিতারও সম্পূর্ণ আদর্শ অনুসারী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে ১৮ জুলাই ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এক পত্রে। দেশীয় অর্থে প্রতিষ্ঠিত এক পলিটেকনিকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ঃ "ভারতবর্ষে অবশেষে 'Education by the people for the people'-এর জন্ম হইল। স্বামীজী দেখিতে পাইলে এমন দিনে কত না আনন্দ করিতেন! লর্ড কার্জনের মাধ্যমেই জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে, শিক্ষার প্রসারে সরকার মোটেও বন্ধুভাবাপন্ন নন—তাহারা দেখিল এব্যাপারে তাহাদের স্বাবলম্বী হওয়া তাই একান্তই আবশ্যিক।"[১৩]

বস্তুত, সমগ্র জাতির জীবনে শিক্ষা জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন দুজনেই—নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ। তফাত ছিল শুধু প্রয়োগগত দিকে। নিবেদিতা ভারতীয় হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে এক পরীক্ষামূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। সেই পথ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। "নিবেদিতা কন্যা, মাতা, বধূদের জীবনের সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে, প্রাচীন ও নবীন ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে যে-শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন, তার প্রয়োগবিধি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না; কিন্তু নিবেদিতা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে ভারতীয় নারীর স্বাভাবিক শিক্ষাসংস্কারকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাদের মনের প্রবণতা অনুসারে শিক্ষাবিধিকে কেটেছেঁটে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুরূহ সাধু প্রচেষ্টাকে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।"[১৪]

এমনকি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি আগে থেকেই নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতেন—এমন সম্ভাবনাও অসম্ভব নয়।[১৫]

■ কেন বুদ্ধগয়া ভ্রমণ

ভগবান বুদ্ধের প্রতি মার্গারেটের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ বহুদিনের। প্রথম জীবনে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেন। তাতে তাঁর যুক্তিবাদী মন অনেকটা আরাম খুঁজে পায়। এরপর স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় মানবপ্রেম এবং তার মধ্যে সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকাশ তাঁকে অভিভূত করে। তাই বুদ্ধগয়া নিবেদিতাকে টানবেই।

১৯০৪ সালের শুরুতে এক বক্তৃতা-সফরে লখনৌ

যাওয়ার পথে তিনি প্রথম বুদ্ধগয়া দর্শন করেন। স্বামী সদানন্দ এবং ব্রহ্মচারী অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সেখানকার মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক মোহন্তের অতিথি হিসাবে তাঁরা এক ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেন। বক্তৃতা-সফরের তাড়ায় খুবই অল্পসময়ের এই অবস্থান। স্বভাবসুলভ আবেগে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন ঃ "এর মধ্যে বুদ্ধগয়া ঘুরিয়া আসিলাম, ছিলাম মোহন্তের অতিথি হিসাবে। মন্দির এবং [বোধি] বৃক্ষ দর্শন করিলাম। তুমি তো [স্বামীজী ও ওকাকুরার সহিত তোমার বুদ্ধগয়া ভ্রমণের পর] আমাকে এবিষয়ে কিছু বল নাই? সত্যই কি তুমি উপলব্ধি কর নাই যে this [is] politically the most important spot in India?"*[১৬]

এই 'politically' শব্দটি আমাদের নিশ্চিতভাবে অবাক করবে। "চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত রজনী। নিবেদিতা নিঃশব্দে গিয়া বোধিদ্রুমতলে উপবেশ করিলেন।"[১৭]—এমন এক অপার্থিব অভিজ্ঞতার বর্ণনাই এই ভ্রমণের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নিবেদিতা যে অন্য ধাতুতে গড়া।

বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ এবং স্বামীজীর শিক্ষা ও শেষ ভ্রমণের প্রাসঙ্গিকতাকে ছাড়িয়েও নিবেদিতার সদা-সক্রিয় মস্তিষ্ক আরো একটি বিষয়কে ধারণ করে আছে। সে-বিষয়টি, ধর্মীয় আদর্শের ছোঁয়া থাকলেও, মূলত রাজনৈতিক।

বুদ্ধগয়ার মন্দির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহুকাল ধরে শৈব মোহন্তই পালন করে আসছিলেন। অনাগরিক ধর্মপাল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে বৌদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সে নিয়ে মামলা-আন্দোলন ইত্যাদি চলতে থাকে। এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার বাহ্যত নিরপেক্ষ থাকলেও লর্ড কার্জনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বৌদ্ধদের প্রতিই। বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত তাঁর 'Strictly Private and Confidential' নোটটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় এবং তার এক কপি নিবেদিতার হস্তগত হওয়ায়[১৮] সম্ভবত নিবেদিতা আরোই জ্বলে ওঠেন।

এই ভ্রমণকালেই মোহন্ত তাঁকে জানান, ব্রিটিশ সরকার কেমনভাবে তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ শ্রীমতী ওলি বুলকে তিনি লখনৌ থেকে লেখেন ঃ "সরকার মোহন্তকে একটি 'Title' গ্রহণে রাজি করাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, 'সরকার আর আমাকে কী দিবেন? মোহন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন উপাধি নিশ্চয় হইতে পারে না।' আসল সত্য তিনি আমাদের বলিলেন, যাহারা সরকারের নিকট হইতে জমি বা অন্য কিছু গ্রহণ করে, তাহাদের এক declaration-এ দস্তখত করিতে হয় যে, তাহাদের নিজস্ব কোন অধিকার রহিল না। This he will not do. ইহা সেই চার্চ বনাম রাষ্ট্রের পুরনো কোন্দল, *এই স্থলে চার্চ হইল সাধারণ জনগণ আর রাষ্ট্র হইল* বিদেশী [শাসক]। We MUST pray for the clergy and the Faith."[১৯]

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় শিক্ষিত নিবেদিতা বুদ্ধের পথকে যে হিন্দুত্বেরই এক সংস্কারকৃত পথ হিসাবে মনে করবেন তা স্বাভাবিক। তাই তাঁর মত—"Buddhism was not a religion separate from or antagonistic to Hinduism." এবং "As Buddha is the glory of Hinduism, even so is Bodh-Gaya the glory of India." তাছাড়া তাঁর মনে হয়, বৌদ্ধদের এই দাবিকে প্রশ্রয় দিলে জাপানের মতো 'Buddhist Nations' হয়তো 'an independent footing in India' লাভ করতে পারে।[২০]

সুতরাং 'Wretched fanatic Dharmapala'-র আন্দোলনকে প্রতিহত করতে নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়েন। এব্যাপারে ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে লখনৌ-কলকাতা-কাশী ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বক্তৃতায় তিনি বারংবার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এর মাঝে মার্চ মাসে কাশী যাওয়ার পথে শ্রীমতী সেভিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আবার বুদ্ধগয়ায় যান। এইবার মোহন্তের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়।[২১] নিবেদিতার মনে হয়, মোহন্তের বক্তব্য দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের গোচরে আনা বিশেষ দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বন্ধু, 'The Statesman' পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফকে বুদ্ধগয়া বিতর্ক সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ লেখার অনুরোধ জানান এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাদান লিখিতভাবে প্রেরণ করেন।[২২]

এই একই উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ভারতবাসীকে তিনি বুদ্ধগয়ায় নিয়ে গিয়ে মোহন্তের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলাতে চান। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ লেখেন ঃ "৮ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে একটি দলকে বুদ্ধগয়ায় লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় আছি। যদি মোহন্তের সহিত কয়েকজন জননেতার ব্যক্তিগত পরিচয় করাইয়া দিতে পারি তো [ঈশ্বরের কাছে] কৃতজ্ঞবোধ করিব।"[২৩]

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে বুদ্ধগয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন—একথা রবীন্দ্রনাথ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গিরিডিতে থাকাকালীন জানতে পারেন এবং তখনি এই দলে সামিল হতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। শ্রীশচন্দ্রের মাধ্যমে বুদ্ধগয়ায় থাকার জন্য তাঁবু ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায়

---

* প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে (১৯৯৮, পৃঃ ২৫৯) শেষোক্ত বাক্যাংশটির অনুবাদ করেছেন—"ভারতবর্ষে এই স্থানটির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক?" অনুধাবনযোগ্য, 'politically' শব্দটি তিনি এড়িয়ে গেছেন।

এসে বহুবার তাঁর বাগবাজার ও পার্শিবাগান যাতায়াতের যে-সংবাদ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় বুদ্ধগয়ায় যাওয়া বিষয়ে পরামর্শাদি করার জন্য তিনি ঘন ঘন নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে এই সময়ের এক চিঠিতে তিনি মজা করে লেখেন ঃ "নিবেদিতা যেই শুনলেন—আমরা তাঁবুর জোগাড় করে দিব্য আরামে থাকবার চেষ্টায় আছি, অমনি বলে উঠলেন 'Oh, how nice!' অর্থাৎ ওঁদের জন্যও তাঁবুর জোগাড় করে দেওয়া আবশ্যক।"[২৪]

শেষপর্যন্ত ৮ অক্টোবর ১৯০৪ মহালয়ার বিকেলে নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ সদলবলে বুদ্ধগয়া রওনা হলেন। এই দলে ঠিক কে কে ছিলেন সেপ্রসঙ্গে একটু সংশয় আছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নানা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে এক সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন—"নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী দলে ছিলেন কুড়িজন। কে কে ছিলেন, নানা তালিকা অনুযায়ী আমরা দিয়ে দিচ্ছি ঃ স্যার যদুনাথের তালিকায়—ভগিনী নিবেদিতা, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ)। আত্মপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম—মথুরানাথ সিংহ। মুক্তিপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম—শ্রীমতী অবলা বসু, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ। লিজেল রেমঁর তালিকায়—ত্রিপুরার রাজকুমার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রকুমার দে। রেমঁ রবীন্দ্রনাথ-পত্নীর কথা লিখেছেন, মনে হয় অসাবধানে 'মিস্টার'-এর স্থলে 'মিসেস' পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করার কালে। রথীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকুমারের (দ্বিতীয় রাজকুমার) নাম জানিয়েছেন, ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা), এবং বাড়তি নাম দিয়েছেন—তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও ত্রিপুরার কর্ণেল মহিম ঠাকুর। স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের রেমঁ-কৃত নোটে দেখেছি, তিনি মিঃ ও মিসেস র‍্যাটক্লিফ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রনাথ দে-র নাম দিয়েছিলেন। এইসঙ্গে অরবিন্দমোহন বসু জিন হারবার্টকে জানিয়েছিলেন, তিনিও দলে ছিলেন। নামগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা মোট আঠারো জনের নাম পাচ্ছি।"[২৫]

এর মধ্যে পরলোকগতা 'মিসেস রবীন্দ্রনাথ'-এর নাম তো বাদ রাখতেই হবে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের নামও বাদ যাবে। কারণ, তিনি কলকাতা থেকে যাননি, আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে পাটনায় এই দলটির সঙ্গে যোগ দেন। রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি এই দলের সকলের নাম না করলেও এমন তিনজনের উল্লেখ করেছেন যাঁদের কথা পূর্বোক্ত কোন তালিকায় নেই—তাঁর নিজস্ব শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসু এবং আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা।[২৬] তাহলে সব মিলিয়ে কুড়ি জনই কলকাতা থেকে বুদ্ধগয়া রওনা হলেন। [ক্রমশ]

তথ্যসূচী

১ *রবিজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল, ৫ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স,* ১৩৯৭, পৃঃ ৫৪
২ ঐ
৩ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা প্রসঙ্গ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উনিশ-বিশ', মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৭৪, পৃঃ ২১৮
৪ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', ৭ পৌষ ১৩৭৪, পৃঃ ৭৬৬
৫ রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃঃ ৯৪
৬ পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জিজ্ঞাসা', ১৩৭৩, পৃঃ ৫৩
৭ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. II, Nababharat Publishers, 1982, p. 540
৮ Ibid., p. 654
৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৯০, পৃঃ ৮৭
১০ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 654
১১ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭
১২ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৯৮, পৃঃ ২৫৬
১৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 820
১৪ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা প্রসঙ্গ, পৃঃ ২০৪
১৫ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩১৬
১৬ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 626
১৭ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৫৯
১৮ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 605
১৯ Ibid., p. 624
২০ Ibid., p. 604
২১ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৬০
২২ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 605
২৩ Ibid., p. 68
২৪ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫
২৫ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, 'দেশ', ৭ পৌষ ১৩৭৪, পৃঃ ৭৭৩
২৬ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—**সম্পাদক, 'উদ্বোধন'**

বাঙলা গদ্যের প্রত্নরূপ

সুজাতা বণিক

"ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।" লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বাঙ্গলা ভাষা' নামক প্রবন্ধে। তাঁর মনে হয়েছিল, আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত গদাইলস্করি চালের অনুকরণ করতে গিয়ে তার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করে ফেলছে। তাঁর মতে সহজ-সরল কথ্য ভাষাই সাহিত্যের বাহন হওয়া উচিত, তিনি চেয়েছিলেন ঃ "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"[১] স্বামীজী চেয়েছিলেন, যে-ভাষায় সবাই ঘরে কথা বলে, মনের ভাব আদান-প্রদান করে সেই ভাষায় সাহিত্য রচিত হোক। বাঙলা ভাষা সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধটি বিবেকানন্দ পত্রাকারে লিখেছিলেন আমেরিকা থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে। এটি লেখা হয়েছিল বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাষাও যেন এইরকম সহজ সরল অথচ দৃঢ় মজবুত হয় তা তিনি শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন। তাঁর নিজের রচনাতেও সাবলীল ভঙ্গি এনে তিনি এক নতুন ছাঁচের বাঙলা ভাষা রচনা করেছিলেন ঃ "বাঙলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙলা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেশি জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি।"[২]

এরপর সমস্ত বিংশ শতক ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষা ক্রমশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বাহন হয়েছে সরল চলিত গদ্য। ক্রমে কবিতা ও গদ্যের ব্যবধান ঘুচে গেছে। কবিতায় এসেছে গদ্যছন্দ, অন্ত্যমিল নেই। মোটকথা, কোন নির্দিষ্ট বন্ধন নেই। মনের ভাব অনুযায়ী রচনা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটির সূচনা করেছিলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যের একটি কবিতা—

"ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,
পরের ঘরে মানুষ,
যেমন ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।"[৩]

আমাদের কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষার মধ্যে আজ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই সহজ স্বাভাবিকত্বে পৌঁছাতে বাঙলা ভাষাকে অনেক চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই এই বাঙলা ভাষার প্রত্নরূপ—তার ঐতিহাসিক পরিচয়ের পূর্ণ মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলা গদ্যের চর্চা করতেন এবং বাঙলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁরা মনে করতেন—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই শ্রীরামপুর মিশনারি সম্প্রদায় এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও সাহেবদের প্রচেষ্টাতেই সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্য সাহিত্যগ্রন্থ রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে গদ্যের উৎপত্তি ও বিবর্তনের অয়নরেখা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রীরামপুর মিশনেরও আরো দুশো বছর আগে বাঙলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিল। তার কিছু দৃষ্টান্তও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সংস্কৃত 'গদ্' ধাতু থেকে 'গদ্য' শব্দের উৎপত্তি। 'গদ্' ধাতুর অর্থ—কথা বলা। সুতরাং আমরা কথাবার্তায় যে-ভাষা ব্যবহার করি, তা-ই গদ্য। কিন্তু সর্ব দেশে ও সর্ব সাহিত্যে প্রথমে পদবন্ধযুগ ছন্দের আবির্ভাব হয়, পরে আসে গদ্য। 'তন্ত্রীপদলয়সমন্বিত' পদ্যের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যোগ, পদ্য মানুষের শৈশবের সংস্কার। মানবসভ্যতার শৈশবে তাই সুরে তালে লয়ে গীত, ছড়া, পদ্যই ছিল তার আনন্দ, ব্যথা, বেদনা প্রকাশের বাহন। আর বিশেষত বাঙলা পয়ার ছিল এমনই একটি ঘাতসহ বিচিত্র ছন্দ, যাতে যেকোন গদ্যাত্মক ব্যাপার সহজেই বর্ণনা করা যেত। সেইজন্য মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন গদ্যের সাহিত্যগত প্রয়োজন উপলব্ধি হয়নি। আর তাই চর্যা থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাতশো বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যে যাকিছু লেখা হয়েছে সবই পয়ার ত্রিপদী ছন্দে। যেমন—

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ ২ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪

৩ সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৫, কলকাতা, পৃঃ ৬৬২

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুন পুণ্যবান।।"

এর অন্ত্যানুপ্রাস-দুটির জন্য একে 'গদ্য' বলা যাবে না। পয়ারের ঝোঁকটা দীর্ঘায়ত হয়ে পড়ে অন্ত্যানুপ্রাসের কাছে। গোটা পঙ্‌ক্তির মধ্যে রয়েছে একটানা একটা তান বা টান। এতেই কবিতার ধর্ম ধরা পড়ে। কিন্তু এই টানটুকু যদি বর্জন করা যায় আর ছত্রের শেষের টানটি হ্রস্ব করা যায়, তাহলে হয়তো পয়ার পঙ্‌ক্তি গদ্যের দিকেই আকৃষ্ট হবে। বিশেষত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত) পয়ার ত্রিপদীতে কবিতার সুর থাকলেও বাক্যবিন্যাস পদ্ধতিতে অনেক স্থলেই গদ্যের আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

"রাধা ল! মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে দধির পসার লঞাঁ।
অনেক যতন কৈলোঁ না দিলে আশ গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।।"[৪]

এরপর মানুষ যখন পদ্যের যুগ পার হয়ে চিন্তা ও সমস্যার আধুনিক খাতে অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তার আত্মপ্রকাশের ভাষাও হয়েছে গদ্য—যে-ভাষায় সে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে, চিন্তা করে, মনের ভাব প্রকাশ করে, আলোচনা করে। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসি সাহিত্যে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মান সাহিত্যে সর্বপ্রথম গদ্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বাঙলা গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় ষোড়শ শতকে চিঠিপত্রকে অবলম্বন করে। সাহিত্যে নয়, বাঙলা গদ্যের ব্যবহারযোগ্য রূপ সর্বপ্রথম এই চিঠিপত্রেই বিকশিত হয়। কারণ, চিঠিপত্র বাস্তব প্রয়োজনের জন্য লেখা। তাই তা আবেগবহুল পদ্য দ্বারা সম্ভব নয়। তবে এপ্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন যে, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বলেছেন, বাঙলা গদ্যের সূচনাকাল দশম শতক। কেননা এই সময় রচিত 'শূন্যপুরাণ'-এ অন্তত তিনটি গদ্যবন্ধের নিদর্শন আছে। তবে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে, পুরাণটি দশম শতক নয়, তার অনেক পরে রচিত।

যাই হোক, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' পত্রিকায় ষোড়শ শতকের কিছু পুরনো চিঠিপত্র, দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া শিবরতন মিত্রের 'Types of Early Bengali Prose', দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ইত্যাদিতে চিঠিপত্র, দলিলের নমুনা পাওয়া যায়। যেমন—'বঙ্গসাহিত্য'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত একটি পত্র। এটি কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ কর্তৃক অহোম-রাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবের নিকট লিখিত হয়েছিল। এর রচনাকাল ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ। চিঠিটি এরকম—"লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। এখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতয়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতি বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"[৫] ইত্যাদি। তবে পত্রটির ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হলেও দুর্বোধ্য নয়। স্থানে স্থানে অলঙ্কার প্রয়োগও আছে। যেমন—"উভয়ানুকূল প্রীতি বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" এই পত্রটি উল্লেখযোগ্য, কারণ এর ভাষা সাধু বাঙলা গদ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে একটি ফারসি (সর্দার) শব্দ ছাড়া আর অন্য কোন বিদেশী নেই। শুধু শব্দ-প্রয়োগই নয়, বাক্যগঠনেও পরবর্তী কালের গদ্যের অনুরূপ।

তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ক্রয়বিক্রয় চুক্তিপত্র, আত্মবিক্রয় পত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং এগুলির মধ্যেই বাঙলা গদ্যের প্রথম যথাযথ লিখিত রূপ পাওয়া গেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ কয়েক ছত্র গদ্যরচনা আছে—"অতঃপর তারা দেবতাসকল শিবের করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন, অবধান করহ।"[৬] এটি সর্বজনবোধ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের বা তারও পূর্বের এই নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এই শতাব্দীতেই সর্বজনবোধ্য ও ভাবপ্রকাশে সক্ষম বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক রীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

১৬৩১ সালে গৌহাটির ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে লেখা অসম-রাজের একটি রাজনৈতিক পত্র—"স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু—সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্রসহ আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তমপত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীত ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণে না হইবেক।"[৭]

এখানে ইসলামি শব্দের ব্যবহার খুবই সঙ্কুচিত। ভাষার অন্বয় ও শব্দবিন্যাসও কোথাও উৎকট ও অস্বাভাবিক নয় এবং এর একটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে, আধুনিক সাধু গদ্যরীতি মিশনারি সাহেব বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুনশিদের দান নয় বা সাধুভাষা কোন কৃত্রিম ভাষা নয়। সাধুরীতিই প্রাচীন গদ্যের কায়া গঠন করেছিল। এমনকি পয়ার ত্রিপদী ছন্দও মূলত সাধুরীতিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। এটি যথার্থই ক্লাসিক রীতি, যা ষোড়শ শতক

---

৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (রাধাবিরহ খণ্ড)—বড়ু চণ্ডীদাস, সম্পাদনা—ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১১১
৫ 'বাংলা গদ্যের আদিপর্ব', বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৩৩
৬ ঐ, পৃঃ ৩৪ ৭ ঐ, পৃঃ ৩৫

থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বরং সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিত রীতিটিই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের চেষ্টাপ্রসূত ব্যাপার।

বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলা গদ্যের একটা মোটামুটি অন্বয়বন্ধন স্থিরীকৃত হয়েছিল। ডঃ আনিসুজ্জমান এপ্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ একটি নমুনা উল্লেখ করেছেন—"জমিদার ও নাএব হরিহর সর্ম্মা আখেজ করিয়া য়ামাগ তাহার রায়তি হইতে ফিরবার করিবের জৈন্যে জবরদস্তি পাকড়িয়া নিয়া বেহাদ্দ মারিপীট কত্রদ করিয়া নগদ (১২৫) এক সত্ত পঁচিশ টাকা লইয়াছেন জমীদারের লোকে জোর করিয়া তাত হইতে উঠাইয়া নিতে তাতের কাপড় কাড়িয়াছে জাত জমাত বন্দ করিয়া ১২৫ টাকার গুনাগিরির একরার লেখাইয়া লইয়াছে।"[৮] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বিশেষত জমিজমা ও আদালত সংক্রান্ত যত চিঠি ও দলিল পাওয়া গেছে, সেখানে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তখন নবাব দরবারে সর্বকার্যে ফারসি এবং ফারসির মারফতে বয়ে আসা আরবি শব্দের ব্যবহার শিষ্ট সমাজে প্রচলিত ছিল। ফলে সাধারণ চিঠিপত্রেও কারণে-অকারণে প্রচুর ফারসি ও আরবি শব্দ ব্যবহৃত হতো। সেইসঙ্গে ইসলামীয় শব্দেরও অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধশতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, বাক্যবিন্যাসে ও পদবন্ধনে ইসলামি রীতি কোনসময় প্রবেশ করেনি। সেকালে দলিল আরম্ভ করার আগে 'লিখনং কার্য্যঞ্চ গে' দিয়ে শুরু হতো এবং সময় যত এগিয়েছে ততই ভাষার অনভ্যস্ততা ও জড়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ইসলামি শব্দের ব্যবহারও ক্রমেই সংযত হয়েছে।

চিঠি হচ্ছে ভাবপ্রকাশের বাহন। চিঠির দুপ্রান্তে দুটি ব্যক্তির উপস্থিতি সর্বদা উপলব্ধি করা যায়। ফলে ব্যক্তিগত চিঠিতে কিছুটা সংলাপধর্মিতা আত্মপ্রকাশ করে বলে ভাষার মধ্যে ঈষৎ প্রত্যক্ষতা থাকে এবং এর ফলে চিঠিপত্রেই সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্যের জড়ত্ব ও অনভ্যস্ততা দূরীভূত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চিঠির অধিকাংশই সরল ও স্বাভাবিক।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তারও পরে বৈষ্ণব সহজিয়া সমাজে বাঙলা গদ্যের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ তত্ত্বকথা ও সাধনভজনসমৃদ্ধ অনেকগুলি ক্ষুদ্র সহজিয়া পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। যেমন—চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি, আশ্রয়নির্ণয়, রূপ-গোস্বামীর কারিকা, আলম্বনবিভাব, সিদ্ধতত্ত্ব, তত্ত্বকথা ইত্যাদি। তবে এগুলি অধিকাংশই প্রশ্নোত্তরমূলক, শাস্ত্রালাপের ঢঙে রচিত। বক্তব্য প্রায়শই একঘেয়ে, ভাষা স্বাদগন্ধহীন গদ্যপঙ্ক্তি মাত্র। যেমন—"তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হৈতে। তত্ত্ববস্তু কি। পঞ্চ আত্মা।" (নরোত্তমের দেহকড়চা, সা-প-প, ১৩০৪, ১ম) "স্বয়ং ভগবান থাকেন কোথা। অখণ্ড পদ্মের উপর। শ্রীবৃন্দাবন স্থান সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ। অখণ্ড পদ্মের উপর পৃথিবী।"[৯] (শিক্ষাপটল)

এরপর উনিশ শতকের একেবারে প্রথমে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। কেননা এখানে উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ যতই খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করুন না কেন, বাঙলা গদ্যের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহারে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এখানের মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রকাশিত বাঙলা গদ্যপুস্তিকা যেমন—কেরি সাহেবের 'কথোপকথন', রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ' (অনুবাদ), 'বত্রিশ সিংহাসন' ইত্যাদি আধুনিক গদ্যের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। □

৮ অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু বাংলা চিঠিপত্র—ডঃ আনিসুজ্জমান, 'ভাষাসাহিত্য', ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৫

৯ 'বাংলা গদ্যের আদিপর্ব', পৃঃ ৬৫

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম আবির্ভাব-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যা থেকে পত্রিকার প্রচ্ছদপটে শ্রীশ্রীমায়ের পাদস্পর্শে ধন্য বিশেষ বিশেষ স্থানের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এবারের চিত্রে মূলত পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দেখা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীমা পুরীতে দুবার এসেছিলেন ও শ্রীজগন্নাথের দর্শনলাভ করেছিলেন এবং ওড়িশার কোঠারে বলরাম বসুর পৈতৃক বাসভবনে ২ মাসেরও বেশি ছিলেন। প্রচ্ছদে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিচে বামদিকে কোঠারে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানধন্য সেই ঐতিহাসিক ভবনের প্রাচীন চিত্রটি দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্মৃতি সমিতি, কোঠার' কোঠারের সেই প্রাচীন ভবনটি মেরামত করেছেন। নবরূপ পরিগ্রহের পরে কোঠারের মাতৃতীর্থের চিত্রটিও প্রচ্ছদের নিচে ডানদিকে দেখা যাচ্ছে। কলকাতার বাগবাজারেও বসু-গৃহে (বর্তমানে বলরাম-মন্দির) শ্রীজগন্নাথের সেবা হতো। সেখানেও শ্রীশ্রীমা ছিলেন। প্রসঙ্গত, এই বলরাম-মন্দিরেই ১৮৮৪ সালে উল্টোরথের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ রথ টেনেছিলেন। তাই মধ্যে বলরাম-মন্দিরের আলোকচিত্রটিও দেখা যাচ্ছে। *(কোঠারের আলোকচিত্র সমরেশ নিয়োগীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)*

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

বালীর কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

জনৈক ভক্ত একবার আমায় প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "বালীর পিনকোড ৭১১২০১, অথচ বেলুড় মঠের মতো আন্তর্জাতিক স্থানের পিনকোড ৭১১২০২ কেন?" আমি তখন বলেছিলাম ঃ "দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর সশরীরে বালীতে এসেছিলেন কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে। তার বহুকাল পরে স্বামীজীর কাঁধে চেপে আত্মারাম এসেছিলেন বেলুড় মঠে, হয়তো এইজন্যই বালীর এই সম্মানলাভ।" আমার কথা শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন ঃ "বেশ বললেন তো, এভাবে তো ভাবিনি কোনদিন।" তখন আমি বলেছিলাম ঃ "না, এটা ভাবতে আমার ভাল লাগে তাই বললাম। আসলে উত্তর দিকে বালী খাল থেকে হাওড়া জেলা শুরু বলে বালী প্রথমে, তার পরেই বেলুড়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর যেসময় বালীতে কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে এসেছিলেন, সেসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মানসপুত্র রাখাল (পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ)। সেদিনের ঘটনার বিবরণ পরবর্তী কালে তাঁর সেবক স্বামী নির্বাণানন্দজী যেমন শুনেছিলেন তা হলো—"কল্যাণেশ্বরকে দর্শন করে ঠাকুরের এমন গভীর সমাধি হয়েছিল যে, তিনি কখনো ঠাকুরের এইরকম সমাধি আর দেখেননি, সমস্ত মন্দির আলোয় আলো হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুর আর কল্যাণেশ্বর শিব যেন এক হয়ে গিয়েছিলেন।"

নির্বাণানন্দজী মহারাজ বলেছেন ঃ "কল্যাণেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, খুব জাগ্রত। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রায়ই যেতেন মন্দিরে। এখনো মঠ থেকে প্রতি সোমবার কল্যাণেশ্বর মন্দিরে পূজা দেওয়া হয়।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে সকলের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, ভাবিকালের মানুষের অবগতির জন্য কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন এবং তাঁর সমাধিস্থানের স্মারক হিসাবে একটি ফলক এখানে থাকলে ভাল হতো।

পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বালী, হাওড়া-৭১১ ২০১

শ্রীশ্রীমায়ের নহবতখানায় বসবাসের সময়কাল প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রচ্ছদ-পরিচিতি'তে বলা হয়েছে ঃ "এই নহবতখানায় শ্রীশ্রীমা ১৮৭২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন।" এই বক্তব্যের শেষাংশে 'অক্টোবর পর্যন্ত' কথাটি সঠিক বলে মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় শ্যামপুকুরবাটীতে স্থায়িভাবে বাসের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের তারিখটি তাঁর জীবনীকারেরা কেউই উল্লেখ করেননি। স্বামী প্রভানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' গ্রন্থের (১ম ভাগ, ১ম সং, ১৩৯২) একজায়গায় (পৃঃ ৯৪) লিখেছেন ঃ "খুবই সম্ভবত এই দিন (অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের নভেম্বরের ১০ তারিখ) থেকেই তিনি [শ্রীমা] শ্যামপুকুর বাড়িতে স্থায়িভাবে থাকতে আরম্ভ করেছিলেন।" এর একটু পরেই (পৃঃ ৯৬-৯৭) ১৩।১১।৮৫ তারিখের ঘটনাবলীর শেষে লিখছেন ঃ "শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কথা ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—'তাঁর [শ্রীমার] খুব বুদ্ধি ও সহ্যশক্তি। হাজরাকে সরাবার কথায় বলে, আহা থাক।' লাটু বলেন—'তিনি [শ্রীমা] কাঁদতে লাগলেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন—'এজন্যই তো এরা [ভক্তেরা] রাগ করেছে—তুমি [হাজরা] দক্ষিণেশ্বরে গিছলে বলে।' "

এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত, শ্রীশ্রীমা ১৩।১১।৮৫ তারিখেও দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। এরপর তিনি কবে শ্যামপুকুরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন তার উল্লেখ প্রভানন্দজীও করেননি বা তার হদিস পাননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো এক মাস এগিয়ে ১৮৮৫ সালের নভেম্বর অন্তত মধ্যভাগ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা উক্ত নহবতে বাস করেছিলেন বলাই বোধ হয় সমীচীন।

কালীজীবন দেবশর্মা
মিলনী, ডামকুনি, হুগলী-৭১১২২৪

সাংবাদিক বিদ্যাসাগর

শতাধিক বর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের গৌরবে উজ্জ্বল 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন একটি বিখ্যাত পত্রিকার (অধুনালুপ্ত) উল্লেখ বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। এই পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম।

জনসাধারণের চেতনা জাগানোর অন্যতম মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। বিদ্যাসাগর অনেক দিন ধরে ভাবছিলেন একটি সংবাদপত্র বের করার কথা। এদিকে তাঁর ছাত্র সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি ও সংস্কৃত পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে বৃত্তি লাভ করেও বধিরতার জন্য কাজকর্মে কোন সুবিধা করতে পারছিলেন না। তাই তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, আমি একটা পত্রিকা বের করার কথা ভেবেছি। তুমি পারবে সেই পত্রিকার ভার নিতে? সারদাপ্রসাদ রাজি হলেন। প্রকাশিত হলো 'সোমপ্রকাশ'। চাঁপাতলার ১নং সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন থেকে ১২৬৫ সালের ১ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর

১৮৫৮) সোমবার 'সোমপ্রকাশ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটল। কিছুদিন পর সারদাপ্রসাদ খবর পেলেন, বর্ধমান রাজার বাড়ি থেকে মহাভারত অনুবাদ করার পরিকল্পনা চলছে। সেজন্য অনুবাদকের প্রয়োজন। সারদাপ্রসাদ সেকথা জানালেন বিদ্যাসাগরকে। তিনি একটু সুপারিশ করলেই চাকরিটা হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে সারদাপ্রসাদের চাকরিটা হয়েও গেল। কিন্তু ক্ষতি হলো 'সোমপ্রকাশ'-এর। পত্রিকা সময়মতো বের করা সমস্যা হয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরের মনে পড়ল তাঁরই সহপাঠী প্রতিভায় সমুজ্জ্বল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথা। তিনি দ্বারকানাথকেই পত্রিকাটির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী করলেন। তিনিও নিয়মিত লিখতে লাগলেন 'সোমপ্রকাশ'-এ। 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র জগতে নিয়ে এল এক যুগান্তর। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পর 'সোমপ্রকাশ'ই ছিল বিদ্যাসাগরের সংবাদপত্র জগতে রচনার দ্বিতীয় ক্ষেত্র। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি কম দক্ষ ছিলেন না। প্রতি সোমবার 'সোমপ্রকাশ' দেখার জন্য পাঠকগণ উৎসুক হয়ে থাকত। তাছাড়া বিদ্যাসাগর যে-পত্রিকাতেই লিখতেন, সেই পত্রিকাই হয়ে উঠত সর্বসাধারণের আগ্রহের বস্তু। হিন্দি ভাষাতেও লিখতে পারতেন তিনি। কাশীর হিন্দি পত্রিকা 'কবি বচনসুধা'র তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। পরবর্তী কালে ভাটপাড়ার পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্নের বড় ছেলে পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী যখন 'বিদ্যাদয়' নামে একটি সংস্কৃত পত্রিকা বের করলেন, তখন বিদ্যাসাগর তাতেও সংস্কৃতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। 'বিদ্যাদয়'ই ছিল বাংলাদেশে প্রথম সংস্কৃত পত্রিকা।

১৮৬২ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এবং প্রেস দুই-ই চাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত হয়। চাংড়িপোতায় ছিল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের জন্মস্থান। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘ দশবছর এই কাগজখানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে তা সত্যি বিস্ময়কর। 'সোমপ্রকাশ' কখনো অন্যায়ের সমর্থন করেনি। লাহোরের সংবাদদাতার প্রেরিত একটি তথ্য ছাপার জন্য সরকার দ্বারকানাথের কাছ থেকে মুচলেকা ও একহাজার টাকা জামিন দাবি করলে দ্বারকানাথ রাজি না হওয়ায় কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রকাশ মল্লিক
কালিন্দী এস্টেট, কলকাতা-৭০০ ০৮৯

প্রসঙ্গ শালগ্রাম তত্ত্ব

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে প্রকাশিত শালগ্রাম তত্ত্ব বিষয়ে পশুপতি মিশ্রের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই চিঠি। একটি দৈনিক সংবাদপত্রে এই বিষয়ে আমি কিছু তথ্য পেয়েছিলাম। 'উদ্বোধন'-পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সেগুলি নিবেদন করছি।

প্রাচীন কালে ঋষিরা শালগ্রাম শিলার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে—

"অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাশ্বতঃ।।
বজ্রকীটশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
মচ্ছিলা কুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্।।"

এর পাশাপাশি ঐতিহাসিকগণ যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এইরকম—মহাদেশীয় চলমানতা বা কণ্টিনেণ্টাল ড্রিফটের ফলে প্রায় তিন কোটি বছর আগে 'ইণ্ডিয়ান প্লেট' 'এশিয়ান প্লেট'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে টেথিস সাগর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় হিমালয় পর্বত। এই প্রাকৃতিক আলোড়নে সামুদ্রিক প্রাণিকুল মাটি, বালি ইত্যাদি চাপা পড়ে জীবাশ্ম বা 'ফসিল'-এ পরিণত হয়। শালগ্রাম শিলা এইরকমই এক ফসিল। ভূতত্ত্ববিদ্ টনি হেগেন 'Mount Everest' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "These 'Saligrams' are concretions which have formed around fossilised ammonites in globular form. Often the core of these ammonites contained Pyrites (The Gold). No Saligrams are to be found on the Nepal side of the Everest Group as the appropriate rocks are not present."

শালগ্রাম গোলাকার শামুকের মতো, যাকে বলে 'Molluse'। সংস্কৃতে 'বজ্রকীট'। শক্ত আবরণে নানা রেখার জটিল নকশা ও ছিদ্র থাকে। কালীগণ্ডকী নদীর তীরবর্তী উপলে 'শালগ্রাম শিলা' পাওয়া যায়। লক্ষণ অনুযায়ী শালগ্রাম শিলাকে ১৮ ভাগে ভাগ করা হয়। এর বিভিন্ন নামও আছে। নেপালের গণ্ডকী নদীগর্ভে 'শালগ্রাম' নামে এক তীর্থের কথা বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে। হিন্দুরা ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে এই শিলা পূজা করে।

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর 'ইতিহাস ও দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব' মূল্যবান প্রতিবেদনটি পড়ে অনেককিছু জানতে পারলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উনি লিখেছেন, শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করলে নিত্যপূজা করতেই হবে। অন্যান্য পূজার ক্ষেত্রে নিত্যপূজা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু আমার জ্ঞানমতো যেকোন বিগ্রহ, এমনকি ছবি রেখেও যদি পূজা করা হয় তাহলেও নিত্যপূজা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা হয়েও থাকে। তা সে বাড়ির ঠাকুরঘরেই হোক বা মন্দিরেই হোক। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করার সময়েও আমরা তাঁকে সর্বদেবদেবীস্বরূপ চিন্তা করেই পূজা করি। বিশ্বচরাচরে চেতনা হিসাবেই পরমাত্মা বিরাজ করেন। তাই সব জীবন্ত প্রাণীই ভগবান বিষ্ণুর অংশ এবং পূজ্য। অন্নজল বন্ধ হলে হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। আত্মা সেই হৃদয়কে ত্যাগ করলে সে আর আত্মার বাসভূমি থাকে না। নররূপী নারায়ণের পূজা

মানেও তো শ্রীবিষ্ণুর পূজা, ঈশ্বরের পূজা। এইভাবেই শাস্ত্রকারেরা কল্পনার আলোকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, ধরাধামে প্রচলিত হয়েছে সেইসব দেবদেবীর পূজা। তাহলে কি করে মেনে নেব, একমাত্র শালগ্রাম শিলা ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর নিত্যপূজা বাধ্যতামূলক নয়? অমরনাথ রহস্যেরও কি উন্মোচন হয়েছে? আসলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'—এই আপ্তবাক্যটি মেনে নিতে হবে, যতদিন পর্যন্ত না এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়।

সবশেষে জানাই, শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে লিখেছেন—"শালগ্রাম শিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে তা সেখানেই দেখব—এই হোক আমার সাধনা।"

শচীদুলাল চক্রবর্তী

গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০ ০২৪

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

বেশ কিছুকাল 'উদ্বোধন' পড়ছি। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পড়ছি বললে সত্যের অপলাপ হবে। 'উদ্বোধন' পড়ি বিপদে পড়ে। জীবনভোর কখনো নিজেকে নিয়ে, কখনো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এককেন্দ্রিকতার বেড়াজালে যখন দমবন্ধ হয়ে যাই, হিংসা-লালসার পূতিগন্ধময় সংসার যখন সবদিক থেকে ঠেলে ফেলে দেয় অপদার্থ বলে—তখন 'উদ্বোধন'-এ আশ্রয় খুঁজি। জানি যে-মহাজালে আবদ্ধ হয়েছি, এর মধ্যে চুপ করে পড়ে থেকে লাভ নেই। লাভ নেই নিছক পুচ্ছতাড়নায়। যাদের ক্ষমতা আছে তারা জালে পড়েনি বা জাল থেকে লাফিয়ে পালিয়েছে—এই জানাটুকুই অত্যন্ত পীড়া দেয়। বাস থেকে আমাকেও নেমে যেতে হবে জানলেও সিট খালি হলে জমিয়ে বসি। ভাল-মন্দ, নিত্য-অনিত্য—এসব ভাসা ভাসা জানলেও অনিত্যের সঙ্গ ছাড়তে পারি না। পরতে পরতে জড়িয়ে পড়ি এর অমোঘ টানে। দাগী আসামীরা যেমন ছাড়া পেয়েও আবার অন্য মামলায় জড়িয়ে পড়ে! ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কৃপালাভের পথে 'উদ্বোধন' এক পরম সম্পদ। আমার ও আমার সমব্যথীদের কাছেও 'উদ্বোধন' উদ্বোধিত হোক জীবনের নিত্য-অনিত্যের সঙ্ঘাত ঘোচাতে—সত্যের দিকে—সত্য পথে।

অশোক পাঠক

মল্লারপুর, বীরভূম-৭৩১ ২১৬

বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর

সম্প্রতি একটি বিশেষ ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ১১-২৭ সেপ্টেম্বর যে-বক্তৃতাগুলি দান করেছিলেন, শিকাগো আর্ট গ্যালারির আর্কাইভ থেকে কেউ বা কারা তার অডিও রেকর্ডিং ভারতে পাঠিয়েছেন। তার কপি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনেও এসেছে। শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠে এবং মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। স্বামীজীর স্বকণ্ঠের বক্তৃতা শুনে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত। নিজের কানকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, স্বামীজীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনছি! তার প্রথমদিকে এক মহিলার ঘোষণাপর্ব থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত (অবশ্য সবকটি বক্তৃতার রেকর্ডিং পাওয়া যায়নি) শুনেই বোঝা যায়, আগেকার দিনের সেই ফোনোগ্রাফের রেকর্ডিং কেমন ছিল। আধুনিক রেকর্ডিং এত উন্নত হয়েছে যে, আমরা এটা ভাবতেই পারি না। আজ থেকে ১১০ বছর আগেকার সেই রেকর্ডিংও তুলনায় বেশ ভালই মনে হয়। স্বামীজীর উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা মাদকতা আছে আর সর্বোপরি ঐ শিকাগো-বক্তৃতা এমন একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে চলে গেছে —যার ১০০ বছর উদ্‌যাপিত হয় মহাসমারোহে। সেই বক্তৃতা শুনে আমরা যে অভিভূত হয়ে পড়ব, তা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো-বক্তৃতার আগে কোন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন না। সুতরাং তাঁর বক্তৃতা আলাদা করে রেকর্ডিং করার কোন যুক্তি নেই। অর্থাৎ সম্ভাব্য ঘটনা এটাই হতে পারে, প্রথমদিনে ঐ মঞ্চে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকেরই বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়েছিল। তাহলে বাকিদের রেকর্ডগুলি নিশ্চয়ই আর্ট গ্যালারির আর্কাইভে পাওয়া যাবে। সম্পাদক মহারাজ যদি এব্যাপারে আলোকপাত করেন তাহলে আনন্দিত হব।*

শিশির রায়

রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-১০৩

* সম্পাদকের বক্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

তথ্যটি সঠিক নয়

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যার 'ইতিহাস' বিভাগে 'পানিহাটী সমগ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে' রচনাটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় (পৃঃ ২৬৫) একটি বাড়ির আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটির নিচে লেখা আছে—'রাঘব পণ্ডিতের দালানের প্রবেশদ্বার'। কিন্তু তথ্যটি সঠিক নয়। এটি মণি সেনের ঠাকুরবাড়ির প্রবেশদ্বার। রাঘব পণ্ডিতের বাসভবন বর্তমানে 'পাঠবাড়ি' নামে পরিচিত। এর ঠিকানা—পাঠবাড়ি লেন, পানিহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭০০১১৪।

প্রভাস চট্টোপাধ্যায়

পানিহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা

মঠের 'খোকা'

ডাকনাম খোকা। আসল নাম অন্য। আসলে স্বভাবটি খোকার মতোই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্বগ্রহণ করে তাঁর একটা পোশাকি নাম হলো—স্বামী সুবোধানন্দ। সেবার খবর এল, শ্রীশ্রীমা মঠে আসছেন। দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ ঘুরে তিনি কলকাতায় ফিরেছেন। বেলুড় মঠের বড় তোরণের দুপাশে বসল মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আরো কত কিছু। মাকে স্বাগত জানানো হবে। মায়ের গাড়ি যেই দেখা গেল, দুম্ দুম্ দুম্। অর্থাৎ কয়েকটা বোমা ছোঁড়া হলো। এখন যেমন দুর্গাপূজা, কালীপূজায় হয়। মা মঠের গেটে ঢুকেই গাড়ি ছেড়ে হেঁটে ঠাকুরঘরে চললেন। মঠের বড় মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সকলকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ "মা যখন মঠের ভিতরে আসবেন, রাস্তায় কেউ যেন মাকে প্রণাম না করে।" খুব কড়া নিয়ম। মা ধীরে ধীরে অনেকের সঙ্গে চলেছেন। দুপাশে কত ভক্ত সব হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মায়ের সচল প্রতিমা দেখছে। হঠাৎ একটা বেঁটেখাটো মানুষ ঝড়ের বেগে লাইন ভেঙে মায়ের সামনে এসে পড়ল। মাকে প্রণাম করে তাঁর চরণবন্দনা করল। তারপর ঝড়ের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ হাঁক দিলেন—"ধর ধর, কে ওটা!" কে আর? খোকা! সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজটি গুছিয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে। ভক্তরা সব হেসেই অস্থির।

গিরগিটির রং*
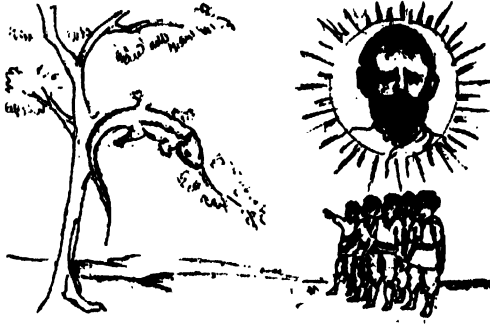
গিরগিটি দেখে একজন বলে, কী টকটকে লাল,
অন্যে বলল, লাল নয়, গাঢ় সবুজ দেখেছি কাল।
লাল-সবুজের কোনটাই নয়, আমি তো দেখেছি নীল,
তৃতীয় জনের সঙ্গে ওদের মতে হলো গরমিল।
চতুর্থ জন বলল, পাঁশুটে, পঞ্চমজন বলে,
গিরগিটিটা তো বহু বর্ণের, ভুল বললে কি চলে?
এর পরে এল আর একজন, এল সে সবার পিছে,
সব শুনে বলে, তোমাদের কারো বলাটাই নয় মিছে,
যে গাছেতে ঐ গিরগিটি থাকে, আমি থাকি তারই নিচে।
কখনো ও লাল, কখনো বা নীল, বহু রং দেহে আনে,
কখনো বা দেখি, সারা দেহটায় রং নেই কোনখানে,
ঠাকুর বলেন, ঈশ্বর কি, তা যে দেখেছে সে-ই জানে।

ছবি ঃ তমোঘ্ন সরকার
নবম শ্রেণী, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, সরিষা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

* রচনা ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

বি.দ্র. ঃ ওপরের ছড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পকে ভিত্তি করে রচিত। এরকম আরো অনেক ছড়া আছে—'শুকদেবের গুরুদক্ষিণা দান', 'নেমন্তন্ন বাড়িতে শুরুতে শব্দ, শেষে নিঃশব্দ', 'দাঁত গেছে তাই বলি বন্ধ', 'সূর্যঘড়ি' ইত্যাদি। আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা আগামী দুমাসের মধ্যে উপরি উক্ত চারটি গল্প-ভিত্তিক সাদা-কালো ছবি পাঠাতে পার। মনোনীত হলে তা ছাপা হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা—
'সবুজ পাতা', প্রযত্নে—সম্পাদক, 'উদ্বোধন', ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩

আদি শঙ্করাচার্য ২২

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

প্রশ্ন : *আমরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে বিশ্বাস করি। আমরা চারপাশে ভোগসর্বস্বতা, বৈষয়িকভাবে জর্জরিত সমাজের চিত্র দেখতে পাই। আমরা দুজনেই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। আমাদের বাড়ির লোকের যা মনোভাব, তাতে মনে হয় এখানে থেকে নিজ আদর্শে সঠিক উত্তরণ সম্ভব নয়। আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাইলে আমাদের অবর্তমানে আমাদের বাবা-মায়ের কি হবে? এক একসময় প্রচণ্ড হতাশ লাগে। অনুগ্রহ করে আমাদের উপদেশ দিলে নিজেদের ধন্য মনে করব।*

—ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় ও শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, বালি, হাওড়া

উত্তর : যারা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগ দিতে চায় তাদের যোগ্যতা ও করণীয় সম্বন্ধে 'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৯ (পৃঃ ২৬৬) সংখ্যায় সংক্ষেপে কিছু উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাতে একটু ভুল থেকে গেছে। সেটা হলো—সচ্চরিত্র, অবিবাহিত যেসব যুবক মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে (শতকরা ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে) পাশ করে নিজের আত্মিক মুক্তি ও জগতের সেবা—এই জীবনোদ্দেশ্য অবলম্বন করে সঙ্ঘে যোগ দিতে চায়, তাদের যোগ দেওয়ার বয়স বর্তমানের পরিবর্তিত নিয়মানুসারে সর্বাধিক ২২ বছর হতে হবে। অন্য বয়সসীমা ঠিকই ছাপা হয়েছে। তোমার বা তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিতে হলে তোমাদের সম্বন্ধে আরো তথ্য না পেলে এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতের দ্বারা তোমাদের প্রত্যেকের মনের গঠন, তোমাদের মানসিক প্রবণতা, তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধারা, তোমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে কতটা গভীর বা অগভীর পরিচয় হয়েছে, তোমাদের পিতামাতার আর্থিক স্বচ্ছলতা কতখানি ইত্যাদি না জেনে উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যারা যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদের সৎ, সংযত, পবিত্রভাবে জীবনযাপন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য নিয়মিত শ্রদ্ধাভরে পাঠ এবং শত অসুবিধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের অন্তত একটা আশ্রমের প্রধান বা তৎস্থলাভিষিক্ত সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে অন্তত কয়েক মাস ধরে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। ইতোমধ্যে যোগাযোগকারী যুবক নিজের বৈরাগ্যের গভীরতা বা অগভীরতা কতখানি তা কিছুটা আত্মবিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে। আশ্রমের প্রধান বা তৎস্থলাভিষিক্ত সন্ন্যাসীও যুবকটির যোগ্যতার একটি মূল্যায়ন করতে পারেন। আনুষ্ঠানিক যোগদানের বিষয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তোমাদের ক্ষেত্রে মনে হয়, তোমাদের বাড়ির নিকটবর্তী কোন আশ্রম বা বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী যোগদান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত পূজনীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে পার। তাতে অসুবিধা হলে ডাকে চিঠি লিখে নিজের সমস্যা ও মনোভাব জানাবে। এই ঠিকানায় চিঠি লিখবে—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পিন-৭১১ ২০২।

সাধুজীবন যাপনের পথে বাধা অনেক ঠিকই। জগতের যেকোন ভাল ও বড় কাজেই বাধা অনেক, তবে এ-বাধা দূর করার জন্য নিজের আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি খুব প্রার্থনাপরায়ণ হতে হয়। যারা এরূপ হয় তাদের বৈরাগ্য ঈশ্বরকৃপায় বেড়ে যায়, বিঘ্নও ধীরে ধীরে কেটে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, ঈশ্বরে (ও ঈশ্বরীয় বিষয়ে) অনুরাগ বা আকর্ষণ এবং ভোগ্যবস্তুর প্রতি, বিশেষত কাম-কাঞ্চনের প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা—'বৈরাগ্য' অর্থে দুটোই বুঝায়। এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত ও সর্বদা প্রার্থনাশীল যুবকদের বিঘ্ন দূর হওয়ার এবং সঙ্ঘে যোগদানের বহু দৃষ্টান্তই দেখা যায়।

প্রশ্ন : *সংসার বা নিজ পরিবারের সকল কাজ করার পর কিভাবে ধর্মাচরণ করব?*

—চিন্তামণি বিশ্বাস, বোহারী, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তর : নিজের বা সংসারের (নিজ পরিবারের) সকল কাজ করার পর ধর্মাচরণ করতে হবে—কথাটা ঠিক নয়। নিজেদের সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সকল কাজের মধ্যেই ধর্মাচরণ করতে হয়। সংযম, সততা, পবিত্রতা, ঈশ্বরে

বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, সেবাপরায়ণতা, একাগ্রতা প্রভৃতি ধর্মীয় ও মানবীয় গুণগুলি-সহ নিজ নিজ কর্তব্য করা ধর্মাচরণের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। অবশ্য পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা ছাড়াও আলাদাভাবে নিয়মিতভাবে সদ্গ্রন্থ পাঠ, যথাসম্ভব জপধ্যান, প্রার্থনা, মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ, একটু নির্জনবাস—এগুলির ওপর শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ খুবই জোর দিয়েছেন। এগুলিও ধর্মাচরণের জন্য একান্ত আবশ্যক। এগুলি করার জন্য সংসারের অনেক কাজকর্মের, ঝড়ঝাপটার মধ্যেও অন্তত একটুখানি সময় করে নিতে হয়। চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে এটা করা সম্ভব। এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের আহার, স্নান, নিদ্রা, খবরের কাগজ পড়া, গল্পগুজব করা প্রভৃতির জন্য যেমন সময় করে নিই, সেইভাবে মনের পুষ্টির জন্য মানসিক খাদ্য হিসাবে জপধ্যান, প্রার্থনা, সদ্গ্রন্থ পাঠের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হয়। আন্তরিক চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে অন্তত একটু সময় করতে পারবেন—আমাদের খুব বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ *আমরা শিক্ষার্থীরা কেন স্বামীজীকে স্মরণ করব?* ***—স্বরূপানন্দ বিশ্বাস, গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা***

উত্তর ঃ স্বামীজীকে স্মরণ করব, এককথায়, নিজের ও দশের উন্নতির জন্য। স্বামীজীকে স্মরণ করা মানে কি? স্মরণ করা মানে ভাসাভাসাভাবে শুধু তাঁর নাম, জন্মতারিখ প্রভৃতি জানা নয়। স্মরণ করা মানে তাঁর ওজস্বী, তেজস্বী, পবিত্রতা-সমুজ্জ্বল মূর্তি, তাঁর ভাব, ভাষা, সর্বোপরি সাহস, সত্যনিষ্ঠা, খাপখোলা তলোয়ারের মতো বিচারবুদ্ধি, মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ-নিংড়ানো ভালবাসা, তাদের সেবার জন্য তিলে তিলে নিজের জীবনপাত করা—এইসব চারিত্রিক মহত্ত্ব-নির্দেশক ঘটনাবলী স্মরণ করা। এরকম করলে কি উপকার হয়, কি লাভ হয় তা প্রশ্নকর্তা নিজেই কিছুদিন অভ্যাস করলে বুঝতে পারবেন। দেশ-বিদেশে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে এইভাবেই স্মরণ করে, চিন্তা করে কত উপকৃত হচ্ছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

মানুষের দেহের পুষ্টি যেমন পুষ্টিকর আহার, ব্যায়াম প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে, মানুষের মনের পুষ্টিও সেইরূপ মানসিক পুষ্টিকর আহার (noble thoughts), মানসিক ব্যায়াম প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। মনস্তত্ত্বের (psychology) একটি বহু পরীক্ষিত সত্য এই যে, 'যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়'। আমরা যদি দিনরাত অসৎ, লোভী, দাম্ভিক, স্বার্থান্বেষী মানুষের চিন্তা করি, তবে আমাদের মানসিক গঠনও ঐধরনের হতে বাধ্য। আর যদি স্বামীজীর মতো ব্যক্তিত্বের চিন্তা করি, স্মরণ করি তবে আমাদের মনও আমাদের চিন্তার গভীরতার তারতম্য অনুসারে, স্বামীজীর মনের কিছুটা অনুরূপ হবে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর একশো বছর কেটে গেল। এই শতাধিক বছরের মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী স্বামীজীর জীবনী পড়ে ও তাঁকে স্মরণ করে ব্যক্তিগত জীবনে উপকৃত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং তাতে দেশ, সমাজ ও পৃথিবীর কত উপকার হচ্ছে তার হদিশ করা যাবে না। যেকেউ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে স্বামীজীর সত্তা, স্বামীজীর গুণাবলীর একটু না একটু সে পাবেই—মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়মানুসারেই। দীন-দুঃখী, আর্ত-পীড়িত মানুষের প্রতি স্বামীজীর প্রেম, তাঁর স্বদেশপ্রীতি, তাঁর সাহস, তাঁর সত্যনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, বিশ্বগ্রাসী উদার ভাব, বিচারপরায়ণতা চিন্তাকারীর কিছু না কিছু বাড়বেই; স্বামীজীকে স্মরণ-মনন করার পর পাঠকের জীবন শুভপথে এগোবেই। এই সত্য যেকেউ নিজের জীবনে যেকোন অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নেতাজী, গান্ধীজী, রোমাঁ রোলাঁ এবং আমাদের দেশের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সহিংস ও অহিংসপন্থী দেশসেবকদের অসংখ্য বিবৃতি নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এইসব জ্বলন্ত প্রমাণ চোখের সামনে দেখে স্বামীজীকে স্মরণ করার উপকারিতা কি—এবিষয়ে সন্দেহের কি কোন অবকাশ আছে? স্বামীজীকে গভীর ও ব্যাপকভাবে চিন্তা করলে আমাদের বর্তমান জীবন অপেক্ষা মহত্তর জীবন লাভ করবই, কারণ মহৎ চিন্তা থেকেই মহৎ জীবন গঠিত হয়।

ভ্রম-সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সংখ্যার ৩৫২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ'-এর ৯ এবং ১১ পঙ্ক্তিতে যথাক্রমে 'সঙ্ঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ'-এর পরিবর্তে 'সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ' এবং 'ষষ্ঠ অধ্যক্ষ'-এর পরিবর্তে 'সপ্তম অধ্যক্ষ' হবে।

বিচিত্র গ্রহ শুক্র

শৈবালকুমার গুহ

শুক্র গ্রহ (Venus) সম্পর্কে সাধারণের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। জ্যোতিষবিদ্যায় শুক্র গ্রহকে সৌন্দর্য, প্রেম ও আবেগের স্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে এই আলোচনায় শুক্র গ্রহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানের আলোচনাই করা হবে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন মহাকাশযান 'পাইওনিয়ার' শুক্রের খুব কাছে গিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ-রূপে তার চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং তিনবছর ধরে রেডারের সাহায্যে শুক্রপৃষ্ঠের ৭৫° উত্তর এবং ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অনেক ছবি পাঠায়। এইভাবে শুক্রপৃষ্ঠের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাতে দেখা যায়, শুক্র গ্রহে অনেক ছোট ঢেউখেলানো পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং সমতলভূমি রয়েছে। এছাড়াও দেখা গেছে উপত্যকা এবং লাভাপ্রবাহের চিহ্ন। এইভাবেই সর্বপ্রথম শুক্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ শিখর 'মাউন্ট ম্যাক্সওয়েল'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এরপর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দুটি মহাকাশযান ভেনাস-১৩ এবং ভেনাস-১৪ শুক্রপৃষ্ঠে নামে। সেগুলি থেকেই সর্বপ্রথম শুক্রপৃষ্ঠের রঙিন ছবি পাওয়া যায়। এর ফলে জানা গেছে, শুক্র গ্রহেও বিশাল পর্বত আছে—যার উচ্চতা এভারেস্টের চেয়েও বেশি। চারদিকে ইতস্তত পাথর ছড়ানো বিস্তীর্ণ সমভূমি, উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো ভূমিপৃষ্ঠ। মাটির রঙ খয়েরি, অনেকটা আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত জমাটবাঁধা লাভার মতো। সেখানে জলের চিহ্নও নেই। অত গরমে জল থাকা সম্ভবও নয়। আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। শুক্রে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার এক শতাংশ মাত্র।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সোভিয়েত মহাকাশ সংস্থা শুক্রের চারপাশের কক্ষপথে আরো দুটি মহাকাশযান স্থাপন করে—ভেনাস-১৫ এবং ভেনাস-১৬। ১৯৮৩-র অক্টোবর থেকে ১৯৮৪-র জুলাই পর্যন্ত এরা রেডারের সাহায্যে শুক্রপৃষ্ঠের অনেক ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠায়। আগের তুলনায় এই ছবিগুলিতে শুক্রপৃষ্ঠের ভূপ্রকৃতি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাইওনিয়ার, ভেনাস-১৫ এবং ভেনাস-১৬ থেকে পাঠানো ছবিগুলি পরীক্ষা করে বোঝা যায়—দুটি মহাদেশ বেশ বড়, এগুলি দেখতে অনেকটা উঁচু মালভূমির মতো। এদের নাম রাখা হয়েছে—'ইশতার টেরা' (Ishtar Terra) এবং 'অ্যাফ্রোডিটা টেরা' (Aphrodita Terra)। ইশতার টেরার ব্যাস প্রায় ২,৯০০ কিলোমিটার। এর আয়তন অস্ট্রেলিয়ার মতো। এই অঞ্চলেই রয়েছে উচ্চতম পর্বত মাউন্ট ম্যাক্সওয়েল। এর উচ্চতা প্রায় ১১,০০০ মিটার অর্থাৎ মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও ২,০০০ মিটার উঁচু।

ইশতার টেরার পশ্চিমদিকে একটি মালভূমি দেখা যায়। এর নাম 'লক্ষ্মী প্লেনাম' (Lakshmi Plenum)। এই মালভূমির প্রান্তীয় অঞ্চল প্রাচীরের মতো ঘিরে রয়েছে উচ্চ পর্বতমালা। যেমন—পূর্বে 'মাউন্ট ম্যাক্সওয়েল', উত্তরে 'মাউন্ট ফ্রেইজা' এবং পশ্চিমে 'মাউন্ট আর্কলা'। আর দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতমালার মধ্যে বিরাট দুটি গিরিশৃঙ্গ—'উচ্চ রূপেস' এবং 'ভেসভা রূপেস'। এই শৃঙ্গদুটি ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে দক্ষিণে সমতলভূমি বরাবর। মালভূমির মধ্যে দুটি নিচু অঞ্চল লক্ষ্য করা যায়—একটির নাম 'কোলো', আরেকটির নাম 'সাকাজাওই'।

শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র

ইশতার টেরার পূর্বদিকে রয়েছে মালভূমি। এর মাঝে মাঝে কয়েকটি উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত ইতস্তত ছড়ানো। অ্যাফ্রোডাইট টেরা শুক্রের নিরক্ষরেখা বরাবর অবস্থিত এবং দক্ষিণে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন ৩ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ প্রায় আফ্রিকা মহাদেশের সমান। এই এলাকা অনেক বেশি বন্ধুর। এখানে একটি গোলাকার নিম্নাঞ্চল দেখা যায়, যার ব্যাস

প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার। এখানেই আছে 'ডায়ানা' নামক গভীর খাদ। তাছাড়া এখানে রয়েছে একাধিক গভীর উপত্যকা। এগুলি লম্বায় ১,০০০ কিলোমিটারের মতো, চওড়ায় কয়েকশো কিলোমিটার এবং গভীরতা প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার।

ইশতার টেরার দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বিটা রিজিও' নামে একটি মালভূমি রয়েছে। এখানে দুটি আগ্নেয়গিরি আছে। এদের প্রত্যেকটির উচ্চতা ৫,০০০ মিটার। একটির নাম 'থেরাইয়া মন্‌স' অন্যটির নাম 'রিয়া মন্‌স'।

সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রেরিত বিভিন্ন মহাকাশযানের সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে শুক্র সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, এই গ্রহটির আয়তন এবং ভর পৃথিবীর মতো হলেও এর আবহমণ্ডল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পৃথিবীর তুলনায় শুক্রের বায়ুমণ্ডল অনেক বেশি ঘন। আর তার প্রায় সবটাই কার্বন ডাই অক্সাইড। এজন্য শুক্রের পৃষ্ঠদেশের ওপর বায়ুচাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের প্রায় ৯০ গুণ বেশি। এত বেশি চাপ পৃথিবীর মহাসাগরের ৯০০ মিটার গভীরেই শুধু প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া ওপরদিকে রয়েছে পুরু মেঘের আবরণ, যার প্রধান উপাদান সালফিউরিক অ্যাসিড।

সূর্য থেকে যে-পরিমাণ তেজঃশক্তি প্রতি মুহূর্তে শুক্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, তার একটা বিরাট অংশই অবলোহিত রশ্মি (তাপশক্তিবাহক)-রূপে শুক্রপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। আর ঐ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে শেষপর্যন্ত তার বায়ুমণ্ডলেই আটকা পড়ে যাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'। এজন্য গ্রহটির ভূসংলগ্ন বাতাসের উষ্ণতা দাঁড়িয়েছে ৪৭০° সেলসিয়াসের মতো। ঐ উষ্ণতায় সীসাও গলে যায়।

সুদূর অতীতে হয়তো শুক্র গ্রহে জল ছিল, কিন্তু এখন নেই বললেই চলে। এখানকার বায়ুমণ্ডলের সামান্য পরিমাণে যে জলীয় বাষ্প আছে, তাও ঐ প্রচণ্ড গরমে ঘনীভূত হয়ে জলে পরিণত হতে পারছে না, বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের সালফার ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিন্দু বিন্দু সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করছে।

শুক্রপৃষ্ঠে মেঘের আচ্ছাদন প্রায় ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত। সবচেয়ে ওপরের স্তরটি প্রায় ৬০ কিলোমিটার থেকে ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। অতি সূক্ষ্ম সালফিউরিক অ্যাসিড-বিন্দু দিয়ে গঠিত এই স্তর। এর উষ্ণতা ১৭° থেকে ২০° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। ❑

সমকালীন পত্রিকায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন'

১০৫ বছর আগে ১৩০৫ সালের 'হিন্দু পত্রিকা'র চৈত্র সংখ্যায় তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকা সংক্রান্ত 'সংক্ষিপ্ত আলোচনা'য় 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' প্রসঙ্গে যে-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে অবিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের পূর্বে শ্রীম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ করতেন। এই 'হিন্দু পত্রিকা'তেও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

'প্রবুদ্ধ ভারত' ঃ ইংরাজিতে সম্পাদিত, স্বামী বিবেকানন্দের কর্তৃতাধীনে পরিচালিত। আমরা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পাঠে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্যও মহান্। এই পত্রিকাখানি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, এইক্ষণ হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত আলমোরা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। একবিধ পত্রিকার দ্বারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * *

'উদ্বোধন' ঃ এ পত্রিকাখানিও স্বামী বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহারও উদ্দেশ্য মহান্, ভাষাও প্রাঞ্জল। এরূপ পত্রিকা যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবনে পরিতুষ্ট হইব। আজ কালের অনেক পত্রিকাতেই সাম্প্রদায়িক ভাবের আতিশয্য দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত, কিন্তু সুখের বিষয় যে, উক্ত দুই পত্রিকায় উহার লেশও নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীতা এবং তাঁহার সহচরগণ দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এই পত্রিকাও তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। ❑

বাংলার অ্যাথলেটিক্স ঃ সঙ্কট ও সম্ভাবনা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রানাঘাটের মণ্ডলপুকুরিয়া থেকে অলিম্পিকের তীর্থ-পীঠের মণিকাঞ্চনশোভিত বিজয়মঞ্চ! কল্পনাকে দূরতম চিন্তালোকে বিধৃত করেও কোন সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাওয়া সম্ভবও নয়। স্বপ্ন দেখারও তো একটা সীমা আছে! অলিম্পিক পদক জিততে গেলে শুধু সাধনা, আন্তরিকতা ও প্রতিভা থাকলেই চলে না, সর্বোপরি দরকার সর্বাঙ্গীণ সুযোগসুবিধা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অথচ গোটা রাজ্যে এরকম সুযোগসুবিধা হাতে গোনা গুটিকয়েক সাই কেন্দ্রে, তাও স্বয়ংসম্পূর্ণ আঙ্গিকে নয়।

এরকম একটা অবস্থা থেকে উঠে এসে সোমা বিশ্বাস যখন এশিয়ার মধ্যে নিজের অ্যাথলেটিক সত্তাকে আবদ্ধ না রেখে আরো বৃহৎ কোন স্বপ্নের পিছনে ধাবমান হন, তখন একটু অন্যরকম ভাবতে ইচ্ছে করে। এত নেই-এর মধ্যেও যে আশার সলতে পাকিয়ে প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালানো সম্ভব, তা তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। ইতালিতে বিশ্বপর্যায়ের অ্যাথলেটিক্সে অসাধারণ পারফরমেন্স করে সোমা ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকেই গৌরবান্বিত করেছেন। আশায় বুক বাঁধছে এদেশের ক্রীড়ামহল—পরবর্তী অলিম্পিকের লক্ষ্যে।

অথচ কী নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা, পদে পদে অসহযোগিতা ও বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের শিকার হতে হয় এরাজ্যের কত অ্যাথলিটকে, তার খোঁজ কজন রাখেন? কলকাতার সাই কেন্দ্রের অ্যাথলেটিক কোচ কাম ট্রেনার কুন্তল রায় এপ্রসঙ্গে জানালেন ঃ "এরাজ্যে হাজারো ছেলেমেয়ে অ্যাথলেটিক্সের চর্চা করছে। মেঠো জমিতে অনুশীলন করেই তারা বেড়ে উঠছে। এদের দশ শতাংশ অনুশীলনের সুযোগ পায় গুটিকয়েক সাই কেন্দ্র, তাও সব সেন্টারে ক্রীড়াবিজ্ঞানের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। ট্র্যাকও মানোত্তীর্ণ নয়। একমাত্র কলকাতা ও শিলিগুড়িতে পরিকাঠামো মোটামুটি সন্তোষ-জনক। আর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বেশি কিছু আশা করাও উচিত নয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে খেলা ও শরীরচর্চা জাতীয় জীবনগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এবিষয়ে তাদের সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী এবং উন্নয়নমূলক চিন্তাভাবনাপ্রসূত। আমাদের দেশে স্বাধীনতার এতবছর পরেও এরকম কোন নীতিই প্রণয়ন করা হয়নি। যার দরুন সিস্টেমটাই নড়বড়ে। আসলে এদেশে বিনোদনমূলক ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই। বিনোদন ক্রীড়ার অর্থ স্বাস্থ্য-সচেতনতা, নৈতিক উত্তরণ, ক্রীড়ামনস্কতা বাড়ানো, বয়স্ক মানুষদের শারীরিক সুস্থতা ধরে রাখা ইত্যাদি। আর প্রতিযোগিতামূলক খেলা বলতে বোঝায় উঁচু মাত্রার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লড়াই, জাতীয়তাবোধের সঞ্চার, লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সবকিছুর বিনিময়ে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া—এই ব্যাপারগুলিই প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার প্রথম শর্ত। আর ঠিক এখানেই ফারাকটা হয়ে যাচ্ছে। সকলেই এদেশে খেলাধুলাকে বিনোদনমাধ্যম হিসাবে দেখে। তার জন্যই কোচ, কর্মকর্তা, খেলোয়াড়—কারোর মধ্যেই সেরকম দায়বদ্ধতা নেই। সকলেই যদি নিজের নিজের কাজের সাফল্য-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ থাকে, তাহলে কাজটা নিখুঁত ও জমাট হয়। তার জন্য অবশ্যই সরকারি নীতি-নির্ধারক কমিটি থাকা দরকার।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাবেক পূর্ব জার্মানির লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রীড়াবিজ্ঞানে পি. এইচ-ডি-র পর কয়েক বছর ইউরোপে অ্যাথলেটিক্সের বিস্ময়কর অগ্রগতির সম্যক পরিচয় পেয়ে কুন্তল রায় দেশে ফিরে আসেন এক মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর লক্ষ্য—যাবতীয় অব্যবস্থার মধ্যেও এদেশের ছেলেমেয়েদের ঘষেমেজে একটা উচ্চতায় তুলে আনা।

বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অ্যাথলেটিক্সের জনপ্রিয়তা কমে আসছে। একে সুযোগসুবিধার অভাব, ভাল পারফরমেন্সের কোন স্বীকৃতি নেই, তার ওপর চরম দারিদ্র্য থেকে জন্ম নেওয়া হতাশা! ফলে অনেক কুঁড়িই বিকশিত হওয়ার আগে অকালে ঝরে যাচ্ছে। নীতিভ্রষ্টতা, দলাদলির জটিল আবর্তে পড়ে অ্যাথলেটিক্সের আজ নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। আধুনিক প্রশিক্ষণ, উন্নত সাজসরঞ্জাম তো দূর অস্ত, ন্যূনতম সুযোগসুবিধাও দিতে পারছে না ক্রীড়াপর্ষদ। ফলে হতাশা ও জীবনযন্ত্রণায় বহু ছেলেমেয়ে অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এত অব্যবস্থার মধ্যেও 'চরৈবেতি' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে চলেন সোমা, সরস্বতীরা। এশিয়াডে পদক জিতেই যারা থেমে থাকতে চান না। আর তাঁদের সঙ্গে থাকেন কুন্তল রায়ের মতো অ্যাথলেটিক্সে নিবেদিতপ্রাণ কিছু মানুষ। সোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে আসা সুস্মিতা সিংহরায়, সুতপা দাস, কল্পনা দাস, মনীষা দে, রাখী দেবনাথরা তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও কক্ষপথকে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন এমনই একজন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে।

যদিও জাতীয় গেমসে ইদানীং বাংলা নিজের অস্তিত্বকে মোটামুটি খাদের কিনারায় নিয়ে এসেও টিকিয়ে রাখতে পারছে মূলত টেবিল টেনিসের দৌলতে, কিন্তু তাই বলে অ্যাথলেটিক্সের অবদানকে অস্বীকার করলে চলবে না। আগের মতো রাশি রাশি পদক না এলেও এখনো বাংলার অ্যাথলিটদের ট্র্যাকে দেখলে সমীহ ও সম্ভ্রম-মাখানো চোখে তাকায় উন্নত রাজ্যের অ্যাথলিটরা। তাই যতই এরাজ্যে অ্যাথলেটিক্সের জনপ্রিয়তা ও চর্চা কমে আসুক, যতই 'এটা নেই, ওটা নেই' বলে বিস্তর হইচই হোক, এই বাংলা থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসে জ্যোতির্ময়ী থেকে সোমা-সরস্বতীর মতো উজ্জ্বল ক্রীড়াবিদ্‌রা। আর তাঁদের পদচিহ্ন ধরে উঠে আসবে পরবর্তী প্রজন্মও। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ অন্য চোখে

তরুণকুমার দে

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ একসময়ে শাস্ত্রীয় বিধিমতে চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। তান্ত্রিক বললেই আমাদের মনের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নরবলি প্রদানকারী পিশাচ-সদৃশ এক ভীমকায় মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে। তন্ত্রের উৎপত্তিকালে তান্ত্রিকদের এই রূপ ছিল না। তন্ত্র সর্বধর্মসমন্বয় এবং পদদলিত মানুষের মুক্তি তথা উত্থানে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। তন্ত্রসাধনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কাপালিকসুলভ ভয়াবহতা কখনোই ফুটে ওঠেনি। বরং প্রশান্ত, সৌম্য, সদাশয় ও ক্ষমাশীল রূপেই তাঁকে দেখা গেছে। কেন তিনি তন্ত্রসাধনার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তার একটা ব্যাখ্যা (সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী অনুসারে সত্য নাও হতে পারে) ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পালায় রাখা হয়েছিল—

"রামকৃষ্ণ।। তন্ত্র বড় ভাল জিনিস গো। ধর্মের নামে মেয়েদের ওপর অত্যাচার, হাঁড়ি-ডোম-দুলেদের দুপায়ে মাড়ানো আর যেসব জ্ঞানী মানুষ উল্টো কথা বলবে, তাদের হ্যানস্তা করার পাল্টা ধাক্কা তো ঐ তন্ত্রই দেয়।"

বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি মানুষকে ভালবাসাতে এবং দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের ঘৃণ্য পতিতা এবং নিন্দিত মদ্যপ অভিনেতাদের পাশে। পালাকারের ব্যাখ্যা ঐ দিকটিই নির্দেশ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যিনি অদ্বৈত সাধনা শিখিয়েছিলেন, সেই সাধু তোতাপুরীর একসময়ে কঠিন রক্ত আমাশা হয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গায় নামলেও তাঁর হাঁটুর ওপরে জল ওঠেনি। ফলে আত্মহত্যা করাও সম্ভব হয়নি। কিন্তু পালার মধ্যে তোতাপুরীর অসুখ এবং আত্মহত্যায় ব্যর্থতার কারণ অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল ঃ

"রামকৃষ্ণ।। পাঞ্জাবের আবহাওয়া রুক্ষ। তোমার শরীরের গঠন সেইসঙ্গে মিলিয়ে হয়েছে। এখানকার বাতাস-মাটি-জল সবই অন্যরকম। তোমার তা সহ্য হবে কেমন করে? তাই পেটের অসুখ করেছে।... গঙ্গায় কেনে ডুবতে পারনি জান?... তুমি যে সাঁতার জান গো। রোগের জ্বালায় ডুবতে গেছ ঠিকই। আবার তোমার অজান্তেই তোমার হাত-পা নড়েচড়ে তোমাকে ভাসিয়ে তুলেছে।"

প্রাকৃতিক কতকগুলি ব্যাপার আছে, যা মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে মানুষের মনে অসহায়তা জন্ম নেয়। যেসমস্ত ঘটনাকে মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারে না বা মেনে নিতে পারে না, তাদের বশে আনার জন্য সে সর্বশক্তিমান কারো সাহায্য চায়। সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হতে পারেন অথবা হতে পারেন কোন ধর্মগুরু। ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার বাইরে হলেও ধর্মগুরু সহজলভ্য। কোন কোন ধর্মগুরু আবার তাবিজ-কবচ-যাগযজ্ঞ করে শরণাগত মানুষের মনের বিভ্রান্তি আরো বাড়িয়ে দেন। আবার মুষ্টিমেয় ধর্মযাজক আছেন, প্রত্যেক যুগেই ছিলেন, যাঁরা মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে শিখিয়েছেন, জরাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে বলেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী বলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে বাঁচার রাস্তাও দেখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির মহামানব ছিলেন। পালাকার তাঁর মুখ দিয়ে তোতাপুরীর আত্মহত্যায় ব্যর্থতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তোতাপুরীর অসুস্থতার কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঐ সংলাপে।

পালার আরেক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একটি সংলাপ বসানো হয়েছে। হুবহু ঐকথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বলেননি, কিন্তু তাঁর বাণীগুলি ব্যাখ্যা করলে ঐ সুরটিই ধরা পড়ে ঃ

"রামকৃষ্ণ।। এ পৃথিবীতে কত কি জানবার আছে, তার কতটুকু আমরা জানতে পেরেছি! সেই নিয়ে অহঙ্কার! কেউ আমরা কিচ্ছু জানি নে..."

বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রে এই জানার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই তন্ত্রসাধনার পরে অদ্বৈতসাধনার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, পরে ইসলামধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মকেও জেনেছিলেন, ব্রাহ্মদেরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

কঠোর বাস্তববাদী শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, যাত্রাজগতে অভিনেতার পক্ষে মদ্যপান অস্বাভাবিক নয়। এও তিনি বুঝতেন, মদ্যপান যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাকে মদ ছাড়াতে চাইলে হয় ব্যর্থ হতে হবে, নয়তো নেশাসক্ত মানুষটি অসুস্থ হয়ে পড়বে। যে-শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনার সময়ে তান্ত্রিক কারণ (অর্থাৎ মদ্য) স্পর্শ করেননি, 'মাতাল' গিরিশচন্দ্রকে তিনিই সাদরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়েছিলেন (পালার সংলাপে) ঃ "মদ খাবি তো খা, মদ যেন তোকে না খায়।"

সেইসঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনসময়েই লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বা পাহাড়ের গুহায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং তিনি বারবারই বলতেন ঃ "যত্র জীব, তত্র শিব।" প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও তাঁর 'বহুজনহিতায়' কাজ করার নির্দেশ ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অনুকরণীয় বহু বিষয় রয়েছে, রয়েছে পার্থিব মানবসমাজের ব্যবহারের উপযোগী অমোঘ সত্য। ঐসব সত্যগুলিকে নব্য মতবাদ কখনো কোণঠাসা করতে পারেনি। তবে কালভেদে প্রকাশভঙ্গি পাল্টাতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও বহু ধর্মশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ সহজ সরল ভাষায় যুগোপযোগী করে পরিবেশন করতেন।

পালায় আছে, মদ্যপান করে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলছেন ঃ "এ বোতলে যে মদ ছিল, সিরাপ হলো কি করে?" ম্যাজিক-বিরোধী শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিচ্ছেন পাল্টা প্রশ্ন করে ঃ "আজ বুঝি অনেক দাম দিয়েছিলি?" পরবর্তী কালে দেখা গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্মবিমুখ অলস মানুষকে ক্ষাত্রবীর্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলাকে শ্রেয় বলেছেন এবং তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীদের যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দিতেন, বিবেকানন্দও তেমনি নিবেদিতার মধ্যে যুক্তিনির্ভর ধর্মবোধকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের রোগমুক্তির আশায় শ্রীমা সারদাদেবী তারকেশ্বরের মন্দিরে 'হত্যা' দিয়েছিলেন। পালার শেষদিকে সেই প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু পরিবেশনা ছিল অন্যরকম। অন্তত অন্য ইঙ্গিতবহ।

"সারদা।। আমায় তারকেশ্বরে যাবার অনুমতি দেবে না তুমি?

রামকৃষ্ণ।। তোমার কি মনে হয় ঐখানে হত্যে দিলেই আমার অসুখ সারবে? তা যদি হতো, তাহলে মহেন্দ্র সরকার তৈরি হতোনি।"

এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ বলেননি, কিন্তু অসুখকে তিনি সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। রোগযন্ত্রণাও তিনি সহ্য করেছিলেন হাসিমুখে। প্রশান্তির সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যুকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। পালার উল্লিখিত সংলাপটিতে বাস্তববাদী শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের জন্য অলৌকিক কিছুর বদলে শিক্ষিত চিকিৎসককেই গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ধর্মসাধনা প্রকৃতপক্ষে মানুষকেন্দ্রিক ছিল। সেইদিক থেকে পালাকারের বক্তব্য অনেকটাই বাস্তবনির্ভর।

সহজ ব্যাখ্যা

বুদ্ধদেব পালি ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রচারের মাধ্যম হিসাবে। চৈতন্যদেব বেছে নিয়েছিলেন বাঙলা ভাষাকে। একটাই কারণ—সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করা। কিন্তু এটাও সত্য যে, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ কথা তো বটেই, অত্যন্ত দুরূহ তত্ত্বেরও সাদামাটা ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আগে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির পা ভাঙা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ ছিল ঃ "দেবতাকে পুতুল বলে মনে কচ্ছ কেনে? সেও তো একদিন মাটির মানুষই ছিল। গুণ আছে বলে তাকে দেবতা বলা হয়েছে।"

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষে পরবর্তী কালে দেবত্ব আরোপিত হয়। বাস্তবে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কথা না বললেও এটা সত্যি, প্রায়-নাস্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করেই। পালাকার বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপে ঐজাতীয় কথা লিখেছেন। সম্ভবত যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে পালাকার তাঁকে একজন মহামানবরূপেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় সংগঠক। এও তিনি জানতেন, নরেন্দ্রনাথের নতুন তত্ত্ব গ্রহণের ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি; আবার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—অনেক কিছুই নরেন্দ্রনাথ সহজে গ্রহণ ও বর্জন করতে সক্ষম। সেই কারণেই নরেন্দ্রনাথ হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। বিষয়টি পালাকার এইভাবে লিখেছেন ঃ

"রামকৃষ্ণ।। অখাদ্য বলে জগতে কিছু নেই জানবি। দেশভেদে জলবায়ু ভেদ; মানুষের শরীরেও সেইরকম নানা খাদ্যাখাদ্য সয়, আবার সয় না। বাঘ কি ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে? গরুকে যদি মাংস খাওয়াতে যাস, সে কি খাবে? না, খেলেও তার শক্তি বাঘ-সিঙ্গীর মতো হবে?"

প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের শক্তি পরিমাপ করতে ভুল করেননি। তাঁর প্রয়াণের পরে স্বামীজী গোটা পৃথিবী জুড়ে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করে গিয়েছিলেন, আজও তা মহিমোজ্জ্বল। সেদিন যদি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের আচার-আচরণকে কঠোরভাবে

নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাহলে আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে পেতাম কিনা সন্দেহ।

মানবধর্মের সন্ধানে

'পুজো' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। একটা প্রতিমা থাকবে, তার সামনে থাকবে নৈবেদ্যের স্তূপ, জ্বলবে সুগন্ধি ধূপ, ধুনোর গন্ধে ভরপুর থাকবে চারপাশ। ইলেকট্রিক বাল্ব থাকলেও প্রদীপ জ্বলবে। উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণ চন্দনচর্চিত ফুল-বেলপাতা প্রতিমাকে নিবেদন করবেন এবং তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি মন্ত্র সমবেত মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সম্পূর্ণরূপে এই পরিবেশটি দেবতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক ভক্তি আন্দোলন এই ব্যাপারটিকে ভাঙতে শুরু করে। আধুনিক যুগে এই কাজ যাঁরা করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম। তবে তিনি কখনো আন্দোলনের পথে যাননি, কেননা তা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি এক আদর্শ জীবনযাপন করেছিলেন। তাতেই নিহিত ছিল সব সমস্যার সমাধান। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তিনি করতেন অন্তরের পূজা। ফলত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলরা যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। পালাতে 'ভাণ্ডারী' নামে একটি চরিত্র এদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভাণ্ডারী ঈর্ষা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাড়াতে চায়। ঐসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কিরকম ছিল পালার একটি সংলাপে তা বর্ণনা করা হয়েছে :

"ভাণ্ডারী॥ গদাধর ঠাকুর মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারে না, নিজের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে মায়ের পায়ে দেয়, নিজে খেয়ে মাকে খাওয়ায়। গলায় তাঁর পৈতে নেই। যেখান থেকে যত সন্ন্যিসী আসে, সবার কাছেই সে সাধনপদ্ধতি শেখে। এদের মধ্যে অনেকেই ঠাকুর মানে না। এদের কেউ যদি তাকে ভজাতে পারে, তাহলে কোনদিন দেখব গদাধর ঠাকুর মাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে।"

পালাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মসাধনার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁরই মুখ দিয়ে : "কলিযুগে বেদ-ফেদের কোন দাম নেই গো। কাউকে ধর্মের উঠোন থেকে গলাধাক্কা আর দেওয়া যাবেনি।... ব্রহ্মজ্ঞান পেলে যদি সবাইকার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখতে পাই, সে তো খুবই ভাল।"

প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে আজকের দিনের জাগতিক সমস্যার সমাধান খুঁজলে ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, ঐসব শাস্ত্র রচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রযুক্ত ছিল। তারপর মানবসভ্যতা এগিয়েছে, সমস্যার ধরন বদলেছে। ঐসমস্ত শাস্ত্র আজ আর সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয় এটা উপলব্ধি করেছিলেন। নইলে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কখনোই বলতে পারতেন না, প্রাচীন কুসংস্কার একটা বিরাট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; এটা ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করে হিন্দুর জীবনীশক্তিকে নিজের চাপে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে সার্বজনীন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ধর্ম মানুষের জন্য মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে—এমন ধারণাই দিয়েছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা ঐ ধারণার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, পালাকার এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

মূলত কালীসাধক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র ও অদ্বৈত সাধনার পরে ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মেও দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নের কাজও করেছিল। "যত মত তত পথ"-এর উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এর বিশ্লেষণ দেননি পালাকার। তিনি আসরে অনুপস্থিত, এমন সময়ে তাঁর মা আর হলধারীর কথোপকথনে পালাকার প্রকাশ করেছেন সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা :

"হলধারী॥ একবার মুসলমান হয়ে গেলে আর তুমি তাকে ঘরে নিতে পারবে?

চন্দ্রমণি॥ খিস্টেনকেও এর পরে ঘরে নিতে হবে। মোছলমানকে নিয়ে অভ্যেস করে রাখি।

হলধারী॥ তোমার উঠোনে দাঁড়িয়ে সে নমাজ পড়বে, আর আল্লা আল্লা করবে?

চন্দ্রমণি॥ একই তো মালিক রে বাপু—যে আল্লা, সেই হরি।"

ধর্মের সহজ ও মানবিক ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। নরেন যখন অবিশ্বাসী, তখনো তাঁকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেননি। যুবক নরেন্দ্রনাথকে শিবনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরের সাধকের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর মতে, বিবিধ সাধনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ও মনের ওপরে অত্যাচার করেছেন। ফলে মাঝে মাঝে তাঁর মূর্ছাজাতীয় রোগ প্রকট হয়। পালার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ—"আমি এসব বিশ্বাস করি না" বললে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন : "করতে হবে না তোকে বিশ্বাস। মানুষকে তো মানিস? সেই মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দে।" স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অবশ্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই বাণী—"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" [ক্রমশ] (দুই)

‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতা কবিরত্ন ঘনরাম চক্রবর্তী

শঙ্কর ঘোষ

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে দেবমাহাত্ম্যমূলক যেসব আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল, সেগুলিই ‘মঙ্গলকাব্য’ নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের তিনটি প্রধান ধারা—‘মনসামঙ্গল’, ‘চণ্ডী-মঙ্গল’ এবং ‘ধর্মমঙ্গল’। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর মতো ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর মূলত অনার্যদের পূজিত দেবতা।

পূর্বে ভাগীরথী থেকে পশ্চিমে সিংভূম জেলার অন্তর্গত ছোটনাগপুর এবং উত্তরে ময়ূরাক্ষী থেকে দক্ষিণে দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বলা হয় ‘রাঢ়’। বহু প্রাচীনকাল থেকে এইসব অঞ্চলে আদিম জাতি বাস করত। এই আর্যেতর জাতিরই দেবতা ছিল ধর্মঠাকুর। বিশেষ করে বাউরী এবং ডোম জাতি ধর্মঠাকুরের সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ভক্ত। ধর্মঠাকুরের পূজা দুপ্রকারের—বাৎসরিক ও মানসিক। বাৎসরিক পূজা বৈশাখী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। মানসিক পূজার ক্ষেত্রে অভীষ্ট পূর্ণ হলেই পূজা। এই পূজা বছরের শুক্লপক্ষের যেকোন রবিবার অনুষ্ঠিত হতে পারে। আনুষ্ঠানিক স্নান ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার অঙ্গ। বন্ধ্যা রমণী সন্তান কামনায়, মৃতবৎসা সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনায়, কুষ্ঠরোগী রোগমুক্তির কামনায়, অনাবৃষ্টি বা মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আগ্রহে এই আর্যেতর জাতি ধর্মঠাকুরের পূজা করত। পশুবলি ছিল এই পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। তিনি ভয়ঙ্কর দেবতা—অবিশ্বাসীকে কুষ্ঠরোগ দিয়ে শাসন করেন। তিনি আবার চক্ষুরোগের পরিত্রাতা। এই দেবতার কোন মূর্তি নেই। এক টুকরো প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা হয়। এই ধর্মশিলা কোথাও ডিম্বাকৃতি, কোথাও ত্রিকোণ, কোথাও বা চতুষ্কোণ। ডোমেরাই এই দেবতার প্রধান পূজারী।

রামাই পণ্ডিতের দ্বারা ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি রচিত হওয়ার পর তাঁর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাহিনীগুলি লোকের মুখে মুখে ফেরে। ডোমদের দেবতা বলে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে উচ্চবর্ণের কেউ এইসব কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে চাইত না। ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনতম কবির নাম ময়ূরভট্ট। অন্যান্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন মানিকরাম গঙ্গোপাধ্যায়, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস, রাজারাম দাস, রামদাস আদক প্রমুখ। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত লৌকিক দেবতাকে যিনি বেদ-পুরাণের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পেরেছেন, তিনি ধর্মমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর সম্পর্কে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেনঃ “ঘনরামই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান ও প্রায় প্রথম কবি, যিনি পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য ও বর্ণহিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে নিজ প্রতিভার সমন্বয়ে নিতান্ত গ্রাম্য লোককথাকে তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য কাব্যরূপ দান করেছিলেন।”[১]

কাব্যের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র ভণিতায় কবি খণ্ডে খণ্ডে আত্মপরিচয় দান করেছেন। সেগুলি সঙ্কলিত করলে এমন একটি কবি-পরিচিতি পাওয়া যায়—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে ছিল কবির নিবাস। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়। মা সীতাদেবী ছিলেন রাজবংশসম্ভূতা। ঘনরাম ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের অত্যন্ত ভক্ত। তাই তিনি তাঁর চার পুত্রের নাম রেখেছিলেন—রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কাব্য-মধ্যে কবি তাঁর চার পুত্রের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। ধর্মমাহাত্ম্য রচনা করতে বসেও কবি ভণিতায় শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি তাঁর কাব্যরচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

অন্যান্য মঙ্গল-কবিরা যেখানে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সেখানে ঘনরামের কাব্য-রচনায় দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নেই। এখানে গুরুর আদেশই দেবতার স্বপ্নাদেশের কাজ করেছে। এই গুরু তাঁর টোলের অধ্যাপক। গ্রন্থোৎপত্তির মূলে কবি কৃতজ্ঞতা-ভরে এই গুরুর ঋণ স্বীকার করেছেন। এই গুরুই তাঁকে ‘কবিরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি লিখেছেনঃ

“নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন,
কৃপাময় করুণা আধান।”

ঘনরাম তাঁর কাব্যে বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্রেরও কল্যাণ কামনা করেছেনঃ

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।"

কীর্তিচন্দ্র কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কিন্তু রাজার আদেশে এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—এমন কোন উল্লেখ কবির লেখায় নেই। এমনকি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবিও তিনি ছিলেন না। এপ্রসঙ্গে গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন ঃ "অনেকেই ঘনরামকে কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ও তাঁহারই আদেশে তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো ঘনরামের এই সৌভাগ্য হয় নাই।"[২]

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্তী কবি। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের বীরত্বের কাহিনী তাঁর কাব্যে গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-কাব্য তিনি লিখলেন তা বীররসে পরিপূর্ণ। করুণ রসের আধিক্য এ-কাব্যে নেই। স্বভাব-কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগই তাঁর কাব্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। পাণ্ডিত্যের প্রভাব ঘনরামের সহজ কবিত্বকে কোন স্থানে প্রতিহত করতে পারেনি। এবিষয়ে পরবর্তী যুগের কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। ঘনরামের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়কও বটে। তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা। সংস্কৃতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কাব্যমধ্যেও তার প্রচুর সাক্ষ্য আছে। হরিহরের স্তব অংশ থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

"শিরসি সহস্রদলে ধ্যান করি যোগবলে
জ্যোতির্ময় জগত-আধান।
বাহ্য বুদ্ধি পরিহরি মানসিক পূজা করি
স্তুতি করি হয়ে নতমান।।"

অলঙ্কার প্রয়োগে কবি এখানে নিরঙ্কুশ। এসম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "অলঙ্কারের প্রয়োগে, প্রধানত অনুপ্রাসাদির প্রাচুর্যে, কাব্যখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।"[৩] একটি দৃষ্টান্ত—

"ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি।"

যেন অনুপ্রাসের শোভাযাত্রা চলেছে। এছাড়া তিনি অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক সুন্দর ও সহজ বাঙলায় অনুবাদ করে কাব্যের স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করেছেন। যেমন—

"মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে।।"

❋

"সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন।।"

চরিত্রসৃষ্টিতে ঘনরাম যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। লাউসেনের বীর্যবত্তা, রঞ্জাবতীর ব্যাকুল মাতৃত্ব, মহামদের ষড়যন্ত্র ও কপটতা, কালু ডোম-কলিঙ্গা-কানাড়ার বীরত্ব—সবকিছুর মধ্যে মহাকাব্যের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। কেউ কেউ ঘনরামের কাব্যে করুণ রসের অভাব বোধ করেছেন। প্রাচীন বাঙলা কাব্যে করুণ রস বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ লাচারী ছন্দে দীর্ঘ বিলাপোক্তি, তা ঘনরামের কাব্যে একেবারে নেই। সাধারণত যে-চরিত্রেরা বিলাপ করে থাকে, সেই নারীচরিত্রগুলি এই কাব্যে পুরুষের চেয়েও বীর। এখানে গতানুগতিক করুণ রস সৃষ্টির অবকাশই নেই।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে ঘনরামের কাব্য পরিপূর্ণ। গৌড়পতির পুরাণপাঠ শ্রবণের সূত্র ধরে কত পৌরাণিক কাহিনী যে ঘনরাম আমাদের শুনিয়েছেন, তার শেষ নেই। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কিত মানবিক আবেগের স্বাভাবিক বর্ণনার বহু দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন কালু ডোমের জন্য লখা ডোমনী বলছে—

"পুত্রশোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ।
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজে রাজ দশরথ।
সকলি মজিল নাথ রাজধর্মপথ।"

ঘনরাম সেই কবি, যিনি পৌরাণিক নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায় উপেক্ষিত লোককাব্যকে পুরাণকথার মর্যাদা দান করেছেন। রচনায় গ্রাম্য ইতরতা নেই, কিন্তু তির্যক বাণীভঙ্গিমা চিত্তাকর্ষক। এই কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "সর্বোপরি এতে এক যুগের রাঢ়ের সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হয়েছে—সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এ-গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান।"[৪] ❑

গ্রন্থসূত্র

(১) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সং, পৃঃ ৪১১
(২) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৫ম সং, পৃঃ ৭১৯
(৩) বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১ম সং, ১৯৫৯, পৃঃ ৫২
(৪) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭ম সং, পৃঃ ২২৪

মানসিক চাপ জয় করার পথে এক মূল্যবান পথনির্দেশ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

How to Overcome Mental Tension *Swami Gokulananda*	**How to Overcome Mental Tension** *by* **Swami Gokulananda** ***Publisher :*** **The Secretary** **The Ramakrishna Mission Institute of Culture** **Kolkata-700 029** ***Price :* Rs. 30** ***Pages :* 34+238** **1997**

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণে বিষয়ের দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ **'How to Overcome Mental Tension'**-এর মুখবন্ধে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বলেছেন : "স্বামী গোকুলানন্দ একজন সন্ন্যাসী। মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ নন।" তবুও মানুষ কেন মানসিক চাপে ভোগে, কেন অস্থিরতার শিকার হয়, মানসিক অসুস্থতায় পঙ্গু হয়ে পড়ে, জীবনযাপনে কষ্ট পায়, জীবনকে বিরাট একটা বোঝা মনে করে এবং পরিশেষে কীভাবেই বা সেই নিদারুণ বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থতার মধ্যে থাকতে পারে তা লেখক ১৮টি সুশোভন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। গভীরভাবে বিশ্লেষণও করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন একাধিক। এককথায় বলা যায়, স্বামী গোকুলানন্দ মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চেয়েছেন এবং অনুভব করেছেন, কী উপায়ে মনের চাপা উত্তেজনাকে প্রশমিত করা সম্ভব। এমনকি জয় করাও।

কোন সন্দেহ নেই, **'How to Overcome Mental Tension'** গ্রন্থটি অস্থিরতাময়, বিপর্যস্ত পাঠককে আজকের এই দিশাহীনতার দিনে প্রভূত উপকৃত করবে, মানসিক বল যোগাতে সাহায্য করবে। এখানে আলোচিত পদ্ধতিগুলির নিয়মিত অনুশীলনে পাঠকমন সমৃদ্ধ হবে। মনের মধ্যে জমে থাকা নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে পারবে অনায়াসে।

স্বামী গোকুলানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লি শাখার অধ্যক্ষ। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তাঁকে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। পরিচিত-অপরিচিত বহু মানুষ, বহু ভক্তের পারিবারিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, মানসিক তথা জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সন্ন্যাসী লেখককে তার সমাধানের সন্ধানও দিতে হয় অবিরত। এরই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ রচনা।

এই গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে রয়েছে নিরলস পরিশ্রমের ছাপ, নিরন্তর সাধনার ফসল। শুধুই কি পরিশ্রম? ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুধ্যানের মিলনে সংস্কৃতমনস্কতার প্রমাণও পাওয়া যায় নিখুঁত বাক্যগঠনে। লেখকের সুচিন্তিত অভিমত এবং পরামর্শ ছাড়াও এই গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করেছে এর অনুপম ভাষা, বড় বড় হরফে পরিচ্ছন্ন ছাপা আর স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' ও 'ইচ্ছাশক্তি' অনুশীলনের সাধনা এবং অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-মগ্নতা। গ্রন্থটির গভীরে মনোনিবেশ করলে মূল যে-সুরটি মানব-মনকে সমৃদ্ধ করবে তা হলো, ধর্ম একটা বিজ্ঞান—পরীক্ষিত বিজ্ঞান। মানব-মনের সমস্যা যেমন আলাদা আলাদা, সমাধানের পদ্ধতিও তেমনি আলাদা আলাদা। আবার সমাধানের এমন কতকগুলি পদ্ধতি লেখক দেখিয়েছেন যে, মনে হবে, যে-সমস্যায় আমি জর্জরিত, আক্রান্ত, তা থেকে মুক্তি তো আমি নিজের চেষ্টাতেই পেতে পারি।

'How to Overcome Mental Tension' গ্রন্থটির প্রকৃত তাৎপর্য হলো মানসিক শান্তির অন্বেষণ। এই অন্বেষণে তৃপ্তির স্বাদ অবর্ণনীয়। যেহেতু গ্রন্থটি একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রণীত, তাই এই অন্বেষণ ব্যর্থ হবে না। ❑

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মূল্যবান দলিল

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

An Episode of India's Struggle for Freedom
***by* Ganesh Ghosh**
Publisher :
Sardar Akhtiar Singh
President, Gurdwara Saheedganj, Komagata Maru
514 M. G. Rd., Budge-Budge
24 Parganas (S)
***Price :* Rs. 50 (India), $ 5 (Outside India) ◆ *Pages :* 128**
1998

'কোমাগাতা মারু' একটি জাপানি জাহাজের নাম। বাবা গুরদিত সিং নামে জনৈক শিখ কণ্ট্রাক্টর ১৯১৪ সালে জাহাজটি ভাড়া করেন এবং ৩৭৬ জন যাত্রী নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা করে হংকং ও সাংহাই হয়ে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছান ২৩ মে ১৯১৪। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ৩৪০ জন শিখ, ১২ জন হিন্দু এবং ২৪ জন মুসলমান। গুরদিত সিং-এর উদ্দেশ্য ছিল এই ভারতীয়দের কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে বসবাস করানো—যেখানে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ভারতীয় বসবাস করছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে আইনত ভারতীয়দের অধিকার ছিল

যেকোন ব্রিটিশ উপনিবেশে বসবাস করার। গুরদিত সিং আইনের এই অবস্থানটি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছালে জাহাজটিকে ঘিরে রাখা হয় এবং যাত্রীদের নামতে দেওয়া হয় না। কানাডা সরকারের ভয় ছিল, এরা বিপ্লবী গদর পার্টির লোক এবং এরা কানাডায় ঢুকলে রাজনৈতিক গণ্ডগোল হতে পারে। তাছাড়া, কানাডায় ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়লে সেখানকার অর্থনৈতিক বিপদ বাড়বে। ফলে পুরো দুই মাস ধরে আইনের লড়াই চলে এবং কানাডা সরকার ২২ জন যাত্রীকে গ্রহণ করতে রাজি হয়। অবশেষে ৩৫৪ জন যাত্রীকে নিয়ে জাহাজটি আবার ফিরে আসে কলকাতার কাছে বজবজ বন্দরে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৪। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের হাতে জরুরি ক্ষমতা ছিল। দুঃখকষ্ট ও হতাশা নিয়ে সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করে যারা বজবজে নামল, ভারতীয় প্রশাসন তাদের সোজা পাঞ্জাবে চলে যেতে আদেশ দেয়। কিন্তু যাত্রীরা দাবি করে, ভারতের যেকোন স্থানে বসবাস করার আইনগত অধিকার তাদের আছে, সুতরাং পাঞ্জাবে যেতে তারা বাধ্য নয়। তখন বজবজে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সামনাসামনি সঙ্ঘর্ষ বাঁধে, যার ফলে সরকারি মতে ২১ জন (শিখদের মতে ৬৭ জন) শিখ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। বাকিদের বন্দী করে পাঞ্জাবগামী ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কলকাতা এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় এর জোরালো প্রতিবাদ করেন এবং কানাডা সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কানাডা-যাত্রা বাতিল করেন। বাবা গুরদিত সিং গা-ঢাকা দেন এবং সাতবছর পর আত্মসমর্পণ করেন। বাংলায় রাসবিহারী বসু এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় ও ভাই পরমানন্দ বজবজের ঘটনাটি নিয়ে আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি বসায় এবং অবশেষে ৭ জন শিখের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয় ও বাকিদের আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেসময় 'কোমাগাতা মারু'র ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ভারতীয় জনমতে তীব্র হয়ে ওঠে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই দিক থেকে ঘটনাটিকে পরবর্তী কালের কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়।

বজবজের অধিবাসী এবং বজবজ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ যথেষ্ট গবেষণা করে **'An Episode of India's Struggle for Freedom'** গ্রন্থে এই ঘটনাটির বিবরণ লিখেছেন। তিনি তাঁর কাজে তদানীন্তন বিভিন্ন সরকারি দলিল, কানাডা সরকারের দলিল ও ইমিগ্রেশন আইন, বঙ্গ সরকারের কাগজপত্র, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা এবং সিডিশন কমিটির রিপোর্ট (১৮১৮) ইত্যাদি ব্যবহার করে একটি ইতিহাসসম্মত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। শ্রীঘোষের কাজের মধ্যে যেমন তথ্যনিষ্ঠতা আছে, তেমনি আছে স্বাদেশিকতা। গ্রন্থকারের ঐতিহাসিকসুলভ তথ্যানুসন্ধান প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে দেওয়া আছে জাহাজের যাত্রী, বজবজে নিহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা, কয়েকজন বন্দীর বক্তব্য, বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি, ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট এবং তৎসম্পর্কে সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য। সবমিলিয়ে গ্রন্থটি যে একটি মূল্যবান দলিলের মর্যাদালাভের যোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে পীড়া দেয়, যা না থাকলে ভাল হতো। ❑

শিশু-শিক্ষায় ধর্মনীতি

রমা চক্রবর্তী
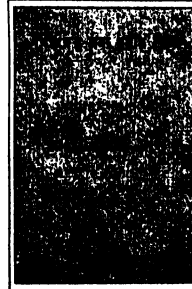
শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
'হরিধাম', ১৯৫ পূর্ব সিঁথি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০
মূল্য : ১২ টাকা
পৃঃ ১৮+১১২
১৯৯০

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ (১৯৭৯) উপলক্ষ্যে লিখিত **'শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা'** গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের (১৩৯৭ বঙ্গাব্দের) গুরুপূর্ণিমায়। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সেই শিশুদের খাঁটি মানুষে পরিণত করতে এবং জাতীয় ঐতিহ্য উপলব্ধি করাতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেখক সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। কি পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ হবে তাও তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য সহজ সরল ভাষায় দৃষ্টান্ত-সহ গল্পের মাধ্যমে শিশুদের মনের গভীরে প্রবেশ করা যায়। তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে যদি তাদের সেইসব প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেওয়া যায়, তাহলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগবে ও সুস্থ মানসিকতা গড়ে উঠবে। ফলে ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হতে পারবে।

ছাত্রদের কিছু কিছু ধর্মীয় প্রশ্ন লেখক এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লেখক শিশুদের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর তাদের উপযোগী করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, পরিবারের সকলের প্রতি কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মবিশ্বাস, সততা, ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রভৃতি গুণাবলীর যাতে বিকাশ হয় তারই উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ছাত্রদের প্রতি কতকগুলি উপদেশের উল্লেখ করে একটি সুন্দর পথনির্দেশ দান করেছেন।

লেখকের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। কারণ, এই গ্রন্থটি শিশু, মাতাপিতা, শিক্ষক—সকলের পক্ষেই ভবিষ্যৎ জীবনের সঠিক পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করবে। ❑

অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী

অ-দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে নগাধিরাজের কোলে মায়াবতীতে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রম। প্রকৃতির মায়াবী রহস্যঘেরা এই আশ্রমের অনন্যতা আরো এক কারণে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় যে-কয়টি আশ্রমের সূত্রপাত দেখে গিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম এটি। (বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের মূলকেন্দ্র ছাড়া অন্যগুলি হলো—মাদ্রাজ, মুর্শিদাবাদের মহুলা ও আমেরিকার নিউ ইয়র্ক কেন্দ্র এবং কলকাতার নিবেদিতা বিদ্যালয়—যেটি তখন বেলুড় মঠের অধীনে ছিল।)

একথা অনেকেরই জানা যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে ঈশ্বরসাধনার যে নানা মত ও পথ প্রচলিত, তারা মোটামুটি তিন ভাবের—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। ঈশ্বর বা জগৎকারণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এই তিন মতে আছে কিছু মিল, আবার অনেকটা আপাত-অমিল। সেই অমিলকে নিয়ে ভারতবর্ষে ধর্মে-ধর্মে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে হয়েছে বিস্তর মতান্তর, মনান্তর ও হানাহানি। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য জীবনালোকে অনুভব করেছিলেন যে, এই মতগুলি পরস্পর-বিযুক্ত তো নয়ই, এরা একটি সিঁড়ির কয়েকটি ধাপের মতো; একটিকে ছাড়িয়ে অপরটিতে উঠতে হয়। বিবেকানন্দের এই সমন্বয়সাধন ও পারম্পর্যসন্ধান একদিকে যেমন ভারতের ধর্ম-দর্শনকে সমৃদ্ধতর করল, অন্যদিকে তেমনি ভবিষ্যতের জন্য রাখল ধর্মীয় সঙ্ঘাত-মুক্তির অমোঘ সম্ভাবনা, প্রেরণা ও প্রতিশ্রুতি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যনামে প্রতিষ্ঠিত মঠে যে মূর্তি, প্রতিকৃতি বা পটে তাঁর পূজা হবে—এ তো স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, মঠ ও মিশনে এই ধরনের দ্বৈত-উপাসনা প্রচলিত থাকুক; সেইসঙ্গে থাকুক এমন একটি কেন্দ্র—যেখানে হবে কেবল বিশুদ্ধ অদ্বৈতচর্চা। সেখানে থাকবে না কোন বিগ্রহ, হবে না প্রথাগত কোন মূর্তিপূজা বা উপাসনা। নিরাকার নির্গুণ সত্তার ধ্যানে মথিত থাকবে সে-আশ্রম। দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে উত্তরণই যে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তারই প্রতীক হিসাবে হয়তো তিনি ভাবতে চেয়েছিলেন আশ্রমটিকে। আবার, সাধনার উচ্চ স্তরে যে-সাধকের মন সাকার ছাড়িয়ে চলে যেতে চায়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'রূপ-টুপ' যাঁর আর ভাল লাগে না—তাঁর সাধনার উপযুক্ত একটি নিভৃত কেন্দ্র স্থাপনও হয়তো স্বামীজীর মনের মধ্যে থেকে থাকতে পারে। তাছাড়া ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর এই ইচ্ছাও ছিল যে, নির্জন হিমালয়ের এই আশ্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যরা সতীর্থের মতো এসে মিলবেন ও পারস্পরিক চিন্তা বিনিময়ের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পাবেন।

অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী

পরিবেশের কথায় এসে যায় মায়াবতীর অবস্থানের প্রসঙ্গ। স্বামীজীর ইচ্ছাকে রূপ দিতে তাঁর ব্রিটিশ ভক্ত-দম্পতি ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার হিমালয়ের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আশ্রমের উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করলেন। তাঁদের সাহায্য করলেন স্বামীজীর সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দ। অবশেষে পাওয়া গেল মায়াবতীর জমি। উত্তরাঞ্চলের (তখনকার উত্তরপ্রদেশের) চম্পাবত জেলায় অবস্থিত এই মায়াবতী রয়েছে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে। বন্য পরিবেশ শীতল, শ্যামল। দেবদারু, পাইন, ওক ও অন্যান্য গাছের ঘন জঙ্গলে ঘেরা। অতি নির্জন। উত্তরে দেখা যায় প্রায় ৩৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গ—নন্দাদেবী, ত্রিশূল, আপি প্রভৃতি। কাছাকাছি কোন লোকালয় নেই। নিকটতম গ্রামটি প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে। নিকটতম সাব-ডিভিশনাল শহর লোহাঘাট প্রায় ৯ কিলোমিটার নিচে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন স্থাপিত হলো অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী। কয়েকটি বাড়ি-সহ বিশাল জমি। কয়েকজন সন্ন্যাসী সেখানে নিযুক্ত হলেন। সেভিয়ার দম্পতিও আলাদা গৃহে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। (কেন্দ্রটি পরবর্তী কালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধীনে আসে।) আশ্রম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রবুদ্ধ ভারত' বা 'Awakened India' পত্রিকার অফিসও এখানে উঠে আসে। এই পত্রিকাটি স্বামীজীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৮৯৬ সালের জুলাইতে মাদ্রাজ থেকে রাজম আয়ারের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামীজী এটির খুব প্রশংসা করতেন। ১৮৯৮ সালের মে মাসে রাজম আয়ারের অকালে দেহত্যাগ হলে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকা অফিস উঠে আসে আলমোড়ার 'থম্পসন হাউস'-এ এবং অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের সম্পাদনায় সেখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। মায়াবতীতে

উঠে আসার পর সেখান থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট ১৮৯৮) ছাপা হয় স্বামীজীর একটি উদ্দীপ্ত কবিতা—'To the Awakened India' (বঙ্গানুবাদে—'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি')।

স্বামীজী মায়াবতী গিয়েছিলেন আরো পরে। সে-প্রসঙ্গে আসার আগে স্মরণ করা যেতে পারে, অদ্বৈত আশ্রমের পরিচয়-পুস্তিকায় (prospectus) ছাপানোর জন্য মার্চ ১৮৯৯-তে পাঠানো তাঁর লেখাটি। বঙ্গানুবাদে সেটি এইরকম ঃ

"যাঁর মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, যিনি স্বয়ং এই ব্রহ্মাণ্ড; যাঁর মধ্যে আত্মা অবস্থিত, যিনি আত্মাতে অবস্থিত, যিনি সকল মানুষের আত্মস্বরূপ; তাঁকে এবং ফলত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে—আমাদের থেকে অভিন্নরূপে জানাটাই শুধু সকল ভয় নির্বাপণ করে, দুঃখের অবসান ঘটায় এবং অনন্ত মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। ব্যক্তি বা সমষ্টির ক্ষেত্রে যেখানেই ঘটেছে প্রেমের প্রসারণ বা কল্যাণের অগ্রগতি, সেখানেই তা হয়েছে 'সকল সত্তার একত্ব' নামক চিরন্তন সত্যের ধারণা, বোধ ও বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়েই। 'অধীনতাই দুঃখ। স্বাধীনতাই আনন্দ।' অদ্বৈতই একমাত্র প্রণালী যা মানুষকে দেয় তার নিজের ওপর সর্বাঙ্গীণ অধিকার; অপসারণ করে সব দাসত্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট কুসংস্কার। এইভাবেই অদ্বৈত আমাদের বীরত্ব প্রদান করে যন্ত্রণাভোগ করতে, কর্ম করতে এবং শেষপর্যন্ত তা আমাদের চূড়ান্ত মুক্তিলাভে সমর্থ করে।

"এতদিন পর্যন্ত এই মহান সত্যকে দ্বৈতবাদী দুর্বলতার বাতাবরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে প্রচার করা সম্ভব হয়নি। আমরা নিশ্চিত, শুধু এই কারণেই এটিকে বৃহত্তর মানব-কল্যাণে অধিকতর ক্রিয়াশীল ও উপযোগী করে তোলা যায়নি।

"ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি এবং মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য এই 'একমাত্র সত্য'কে ক্রিয়াশীল হওয়ার আরো স্বাধীনতা ও পূর্ণাঙ্গতর সুযোগ প্রদান করতে আমরা এই অদ্বৈত আশ্রমের সূত্রপাত করছি হিমালয়ের ক্রোড়ে—যেখানে এই সত্য প্রথম উদ্ঘোষিত হয়েছিল।

"আমরা আশা করছি, এখানে অদ্বৈতকে মুক্ত রাখা যাবে সকল প্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকারী স্পর্শদোষ থেকে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে ও অনুশীলন করা হবে শুধু একত্ববাদ, যা পবিত্র ও সবল। অন্য সব মতবাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিশীল হলেও এই আশ্রমকে উৎসর্গ করা হলো অদ্বৈত এবং শুধু অদ্বৈতের উদ্দেশেই।"

প্রসঙ্গত, স্বামী বিবেকানন্দের বরিষ্ঠ জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের (তৃতীয় খণ্ড) 'আদর্শের বাস্তব রূপ' অধ্যায়ে জানিয়েছেন, স্বামীজী ক্ষেত্রবিশেষে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতি এমন একমুখী আনুগত্য দেখালেও পাশাপাশি তাঁর জীবনেই অন্যত্র আবার অবিমিশ্র ভক্তির অসামান্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক, স্বামীজীর জীবন ছিল জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অদ্ভুত সার্থক এক সমাহার।

স্বামীজী মায়াবতী গিয়েছিলেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে। পূর্ব ইউরোপ, মিশর প্রভৃতি ঘুরে স্বামীজী দেশে ফিরে (১৯০০) জানলেন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি এক চিঠিতে লিখলেন, সেভিয়ার শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ঠিক করলেন, মায়াবতী যাবেন—শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে। ডিসেম্বরের ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে তিনি সদলবলে মায়াবতী আশ্রমে পৌঁছালেন ৩ জানুয়ারি ১৯০১। স্বামীজী সেখানে প্রায় পনেরো দিন ছিলেন। আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঐ কয়টি দিন স্বামীজীর দিব্য সান্নিধ্যে অশেষ আনন্দে কাটালেন। আশ্রম থেকে মাইল দেড়েক দূরে ধরমঘর পাহাড়চূড়াটি ছিল স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় সাধনস্থল। আজও যেসব ভক্ত মায়াবতী যান, তাঁরা প্রায় সকলেই ঐ পবিত্র স্থানটি দর্শন করে আসেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল মায়াবতী আশ্রমে শুধু অদ্বৈত ভাবের সাধনা হবে—আচারগত কোন দ্বৈত-উপাসনা এখানে চলবে না। কিন্তু তিনি এসে দেখলেন, আশ্রমবাসী কেউ কেউ একটি ঘরে ধূপ-দীপ-ফুল দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি পূজা করছেন। এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে আশ্রম-পরিচালকদের তিনি তীব্র তিরস্কার করলেন। ফলে অচিরেই 'ঠাকুরঘর' উঠে গেল। তবু একজনের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল—স্বামীজীর এই মত কি চূড়ান্ত? সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীকে চিঠি দিলেন। উত্তরে জয়রামবাটী থেকে এল শ্রীশ্রীমায়ের সেই ঐতিহাসিক পত্র ঃ "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।" শ্রীশ্রীমায়ের এই পত্র—এই দৃঢ় প্রত্যয়ী উচ্চারণ—সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে এক মহামূল্যবান নথি। এটির সঙ্গে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পর অদ্বৈত আশ্রমে আর কখনো ঠাকুরঘর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বামীজী বেলুড় মঠে ফিরে বলেছিলেন ঃ "আমি ভেবেছিলুম অন্তত একটি কেন্দ্রেও তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে! কিন্তু হায়, হায়! গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসে আছেন।"

অদ্বৈত আশ্রমের আরেকটি বিশেষ পরিচয় হলো—এটি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি অগ্রণী প্রকাশনাকেন্দ্র, যেখান থেকে মূলত ইংরেজিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা এবং বেদান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আসছে প্রথম থেকেই। প্রথম প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বই ছাপা ও প্রকাশের কাজটি সম্পূর্ণভাবে মায়াবতী থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো। পরে কর্মপরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হলো কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে; যেটি পরবর্তী কালে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, ওয়েলিংটন লেন প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে মার্চ ১৯৬১-তে উঠে আসে এণ্টালি অঞ্চলে তার বর্তমান অবস্থানে।

মায়াবতীতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থের সম্পাদনা ছাড়া সন্ন্যাসীদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো একটি

দাতব্য হাসপাতাল পরিচালনা করা। ১৯০৩ সালে সামান্যভাবে শুরু হওয়া এই চিকিৎসালয়টি আজ মোটামুটি সুসজ্জিত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত একটি গ্রামীণ হাসপাতাল—যাতে রয়েছে একটি ইণ্ডোর ও একটি আউটডোর বিভাগ। উত্তর ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বহু মানুষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই হাসপাতালে আসেন। হাসপাতালের কল্যাণস্পর্শ প্রসারিত হয়ে রয়েছে প্রায় ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে আন্দাজ ১৪০০টি গ্রাম জুড়ে। এখানে চিকিৎসা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এছাড়া মায়াবতীতে আছে একটি অতিথিনিবাস ও গোশালা।

কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমের শাখাকেন্দ্র থেকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশনা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির কাজ পরিচালিত হয়। রয়েছে একটি বড় গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। গ্রন্থাগারটি থেকে ধর্মীয় বিষয়ের বই ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকও পাওয়া যায়। দোতলার হলঘরে নিয়মিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সম্প্রতি এই কেন্দ্রের কাজের জন্য সন্নিহিত অঞ্চলে প্রায় ৬৫ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়েছে। ঐ জমিতে প্রকাশনা বিভাগের কাজের বৃহদংশ স্থানান্তরিত হওয়ার পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া একটি প্রেক্ষাগৃহ, ধ্যানঘর, সংগ্রহশালা, পাঠ্যপুস্তকের পাঠকক্ষ (কলেজ ছাত্রদের জন্য) ও সাধুনিবাস তৈরির পরিকল্পনাও আছে।

নতুন আশ্রম স্থাপন

রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড় মঠ) সম্প্রতি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান বিহারের ছাপড়া জেলায় 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম' নামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পূর্বে এর নাম ছিল 'রামকৃষ্ণ অদ্ভুতানন্দ আশ্রম, ছাপড়া'। আশ্রমটির ঠিকানা—'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ছাপড়া, বিহার-৮৪১৩০১। ফোন: (০৬১৫২) ২২-০৭৩৯।

উৎসব-অনুষ্ঠান

কাঁথি আশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ৪-৫ এপ্রিল ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী।

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির) কলকাতা-৩ : গত ১ মে ২০০৩ বিশেষ পূজা, সরোদবাদন, ভক্তিগীতি ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে সারাদিন ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী। আলোচনা করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী ও ডঃ বাসুদেব বর্মন। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী পূতানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। অনুষ্ঠানে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ, হাওড়া) : গত ১ মে ২০০৩ বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে একটি শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, ব্রহ্মচারী জনার্দনচৈতন্য, অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস, ডঃ ধীমান গাঙ্গুলি প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী রমানন্দজী ও অধ্যাপক দীপক ঘোষ। সম্মেলনে বাঁকুড়া জেলার ১৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগদান করেন। প্রতি বছর বিদ্যামন্দির ও তার প্রাক্তন ছাত্রসংসদ যে বিবেকানন্দ সম্মেলনের আয়োজন করে, এই সম্মেলনটি তারই অঙ্গস্বরূপ অনুষ্ঠিত হলো। এই ধরনের জেলা-ভিত্তিক উদ্যোগ এই প্রথম। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৬ মে ২০০৩ **শ্রীশঙ্করাচার্যের** জন্মতিথিতে 'আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

গত ১৬ মে ২০০৩ **শ্রীবুদ্ধদেবের** জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

ফলহারিণী কালীপূজা : গত ৩০ মে ২০০৩ বিশেষ পূজা, হোম ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে ফলহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কল্যাণব্রত সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ৬-১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সঙ্ঘের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শিশুসমাবেশ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী যতীশানন্দজী, প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী, মুরারিমোহন শাস্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল সেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ এবং গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিনহা ও সুজিত গুপ্ত।

চাতরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (বীরভূম) : গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বামদেব সাহা। এই উপলক্ষ্যে ১৭ জন দুঃস্থ মানুষকে ধুতি ও শাড়ি প্রদান করা হয়।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, বৈদিক স্তোত্র ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন কার্তিক সেন

এবং 'মায়ের কথা' পাঠ করেন প্রতিমা নন্দী। সকালে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বপন মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী।

দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী, স্বামী যতীশানন্দজী, প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী, ডঃ রামচন্দ্র মান্না প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর-পর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কানাইলাল দাস। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্তকে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মুর্শিদাবাদ)ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বৈদিক স্তোত্র ও 'কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও অসীমনারায়ণ খান। উল্লেখ্য, গত ২৬ জানুয়ারি প্রায় ৬০০ যুবপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (নদীয়া)ঃ গত ১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, 'বেদ', 'ভাগবত', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, লীলাকীর্তন, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী চিদ্‌রূপানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা দেবরূপপ্রাণাজী। উৎসবের শেষদিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নাটাগড় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (সোদপুর, কলকাতা-১১৩)ঃ গত ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণ ও বাউল গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে নিখিল চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার বাউরী। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী জগদম্বানন্দজী, স্বামী স্বগতানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী, অধ্যাপক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রথমদিন প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলি)ঃ গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী বরানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী কালাতীতানন্দজী, স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী ও কমলকুমার মান্না। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিন দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পুঁইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলি)ঃ গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, 'মায়ের কথা' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ভক্তিগীতি, যাত্রাপালা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী সগুণানন্দজী। দুদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শেখরানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা দেবরূপপ্রাণাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শুচিশ্রী রায়, অচিন্ত্য কোলে প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ১০০ দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ পাঠচক্র (কলকাতা-৮১)ঃ গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, বাউল গান ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন অশোক মুখার্জি। বাউল গান পরিবেশন করেন কবীর ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণাজী ও মিহিরকুমার ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীশচন্দ্র দাস ও প্রফুল্লচন্দ্র অঙ্কুর। প্রথমদিন দুপুরে ১২৫ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, যাত্রা, নাটক, বস্ত্রবিতরণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা ছিল দুদিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌতম মুখার্জি। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আলোকময় বসু। উৎসবের শেষদিনে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (হুগলি)ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'বেদ', 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। কানাইলাল ব্যানার্জির স্বাগত-ভাষণের পর ভাষণ দেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি এক স্বাস্থ্যশিবিরে ২৫০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

চুঁচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, স্মরণিকা প্রকাশ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (নদীয়া) ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সঙ্গীত, আলোচনাসভা, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, মৌমিতা বসাক প্রমুখ। আলোচনা করেন অসিতকুমার দত্ত, তপনকুমার বোস প্রমুখ।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউল গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুকুমার বাউরি, শুভ্রকান্তি গায়েন প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও যোগেশ পাঠক এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৬,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, 'চণ্ডী' ও 'গীতা' পাঠ, বস্ত্র বিতরণ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী। সন্ধ্যায় 'নটী বিনোদিনী' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ স্তোত্র, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, জপধ্যান, শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা, স্বামীজীর 'পত্রাবলী' পাঠ ও প্রশ্নোত্তরপর্বের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালিত হয়। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী। শিবিরে ১২২ জন মহিলা যোগদান করেছিলেন।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৯) ঃ গত ২০-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিন সঙ্ঘের মন্দিরের বেদিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী পূতানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী ঋতানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী এবং স্বামী বোধসারানন্দজী ও স্বামী তদ্জপানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। উৎসবের শেষদিনে পূজাদি-সহ প্রায় ১,২০০ নরনারায়ণের সেবা করা হয়।

চাকদহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (নদীয়া) ঃ গত ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন, শ্রুতিনাটক, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'ভাগবত' এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে মিহির ভট্টাচার্য এবং বঙ্কিমনগর আশ্রমের স্বামী সুরেশানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও স্বামী ব্রজেশানন্দজী। উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং সন্ধ্যায় 'রানী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পুরুনিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (বাঁকুড়া) ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নন্দলাল ভাণ্ডারী। ধর্মসভায় স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডাঃ চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী ও গুরুদাস মুখোপাধ্যায়।

হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বস্ত্র-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা তন্ময়প্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, গৌরীপদ গাঙ্গুলি ও ডঃ নমিতা দত্ত। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন জগন্নাথ নস্কর।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, উত্তর চব্বিশ পরগনার রাজারহাট-নিবাসিনী অর্চিতারানী বিশ্বাস গত ৩ জানুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহভাজন এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী কৃষ্ণমোহন মজুমদার গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। গদাধর আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং সরল ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কামারপুকুর-নিবাসী গৌরহরি বিশ্বাস গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজের স্নেহধন্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মুম্বাই-নিবাসী মনোরঞ্জন গুহ গত ২১ জানুয়ারি ২০০৩ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মুম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী মনোজিৎ সেন গত ২১ জানুয়ারি ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্থানীয় বিশুদ্ধানন্দ সমিতির সভাপতি ছিলেন। ❑

আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

No work is secular. All work is adoration and worship.
SWAMI VIVEKANANDA

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। **স্বামী বিবেকানন্দ**

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

Come out into the universe of Light. Everything in the universe is yours, stretch out your arms and embrace it with love.

Swami Vivekananda

TREE DIAGRAM

সমাধিপাদ

পাতঞ্জল যোগসূত্র

যোগের উপায় কী? —চিত্তবৃত্তি-নিরোধ

চিত্তের অবস্থা কী?

প্রমাণ	বিপর্যয়	বিকল্প	নিদ্রা	স্মৃতি
ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট	ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট	ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট	ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট	ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট
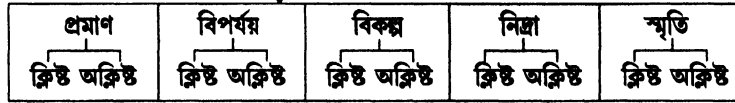
বৃত্তি-নিরোধের উপায় কি?

অভ্যাস

বৈরাগ্য

পরবৈরাগ্য

বশীকার

একেন্দ্রিয়

ব্যতিরেক

যতমান [নিকৃষ্ট বৈরাগ্য]

কৈবল্য

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (নিরোধ ভূমিক)

নির্বীজ সমাধি (একাগ্রভূমিক)

সালম্বন সমাধি

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি

বিতর্ক বিচার আনন্দ অস্মিতা

উপায়প্রত্যয় (যোগীদের)

ভবপ্রত্যয়

দেবদেবীর অবস্থা

প্রকৃতিলীন অবস্থা

শ্রদ্ধা+বীর্য+স্মৃতি +সমাধি+প্রজ্ঞা

মৃদু — মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র

মধ্য — মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র

অধিমাত্র — মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র

অধিমাত্র

তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ

(অধিমাত্রের অধিমাত্র বলে তীব্র সংবেগশীল সাধকের শীঘ্র অনুভূতিলাভ হয়)

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)**
  বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, প্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক**, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেণ্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  পিন ঃ ৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ**, সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ, পিন-৭১৩৪০৩, ফোন ঃ ২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ, পিন ঃ ৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন ঃ ৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার**
  অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল**
  হাওড়া রেলস্টেশন

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

Now
I can save my money while I plan its best uses

INTRODUCING

Peerless
QUICK RETURN
BOND

One Time

Fixed Deposit Scheme

for 1.5 years. For saving small or big amounts.

Save minimum Rs 2,000 or more in multiples of Rs 1,000 • **FREE Accidental Death Benefit***
• Pre-mature withdrawal after one year
• Doorstep service by friendly Peerless Agents. No queues. No delays • Effective yield 6%
• Free Peerless Savings Card for every depositor

arranged through

New India Assurance Co Ltd.

The Peerless General Finance & Investment Company Limited
'Peerless Bhavan', 3, Esplanade East, Kolkata 700 069

Contact your nearest Peerless Agent or call **Kolkata** (033) 2242 1564/1001 • **Guwahati** (0361) 252 3878 • **New Delhi** (011) 2334 6421/2374 4869 • **Mumbai** (022) 2284 6095/2282 5807 • **Ahmedabad** (079) 658 1247/4954 • **Chennai** (044) 2853 0335/5326 • **Hyderabad** (040) 2761 7176/7

www.peerless.co.in

* conditions apply

Statutory advertisement published in BARTAMAN and BUSINESS STANDARD on 26 05 2003

UDBODHAN
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 105
No. 6
JUNE
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316 06
9 770971 431004

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

১০৫তম বর্ষের জন্য আবার 'উদ্বোধন'-এর অর্ঘ্য জনসাধারণের উদ্দেশে নিবেদিত হলো। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য এবছরের জন্যও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০্ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এইভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন। 'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে। M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ। ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

শ্রাবণ ১৪১০ ৭ম সংখ্যা

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● ই-মেল ঃ rmsppp@vsnl.com

(বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩)

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেট

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
SP-3	শ্রীরামনাম-সংকীর্তন (স্বামী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-6	শিবমহিমা
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
SP-17	বীরবাণী
SP-18	গীতিবন্দনা
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)
SP-23	ওঠো জাগো
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা
SP-29	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত)
SP-30	সারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)
SP-35	আগমনী
SP-36	ভজন সুধা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সম্বলিত সঙ্গীতের সিডি
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

অডিও সি. ডি. / মূল্য ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণঃ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)
Cd/SP-27	বেদমন্ত্র
Cd/SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
Cd/SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের** নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফ্‌ট **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্‌ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ২৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

সূচীপত্র

১০৫তম বর্ষ | ৭ম সংখ্যা | শ্রাবণ ১৪১০ | জুলাই ২০০৩

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১০)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১০/সেপ্টেম্বর ২০০৩ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।**
- **শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে **(By Post)** পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই।
- **ইচ্ছা করলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকেও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২৫ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর আগে অবশ্যই কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- গ্রাহকরা অতিরিক্ত কপি কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে প্রতি কপি ৪০ টাকায় পাবেন। যাঁরা হাতে হাতে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন, তাঁরা **অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো** দেখিয়ে এই অতিরিক্ত কপিটিও **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে** সংগ্রহ করতে পারবেন। আর যাঁরা ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি নেবেন, তাঁরা অতিরিক্ত কপি নিলে **রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ২৫ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে।**
- গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যাঁরা **সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে **তাঁরা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে** ২০ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই সংবাদ **প্রেরণ করবেন, এবং ঐ কেন্দ্র আমাদের কাছে ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সংবাদটি পৌঁছে দেবে।**
  - ✤ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হয় না।**
  - ✤ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা **থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, **গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - ✤ **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন **[২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে]**, তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - ✤ **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সোমবার কার্যালয় খুলবে।**

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

—কখনো কেউ ক্ষণকালও কর্ম না করে থাকতে পারে না। কারণ, প্রকৃতিজাত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অধীন হয়ে সকলেই কর্ম করতে বাধ্য হয়।

☆

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

—ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। সেজন্য তুমি ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হয়ে সকল কর্মের অনুষ্ঠান কর।

☆

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।

—যাঁর থেকে প্রাণীদের উৎপত্তি এবং যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, মানুষ তাঁকে বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।

☆

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

—সকল ধর্মাধর্ম অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করে একমাত্র (গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যু-বর্জিত পরমেশ্বর) আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ থেকে মুক্ত করব। অতএব, শোক করো না।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৫, ৩।৯, ১৮।৪৬, ১৮।৬৬)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

ক্লীবতা বা নির্জীবিতা স্বামীজী পছন্দ করিতেন না। পৌরুষ এবং পুরুষকার স্বামীজীর প্রিয় চারিত্রিক গুণ। স্বামীজী মনে করিতেন—যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনি সংগঠনের ক্ষেত্রেও এই পৌরুষ অত্যন্ত জরুরি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোকটি—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে" (হে অর্জুন! ক্লীবতা ত্যাগ কর, ইহা তোমার সাজে না)—স্বামীজী বারংবার সকলকে শুনাইতেন। বলিতেন, ক্লীবতা পরিহার করিয়া শক্তিমান ব্যক্তি বীর্যপ্রদর্শন করেন। অর্থাৎ শক্তিমান ব্যক্তির ক্লীবের ন্যায় আচরণ মানায় না। যাহারা স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত পতাকা বহন করিবে, তাহাদেরও ক্লীবতা প্রদর্শন নিন্দনীয়। 'বিবেকানন্দ' নামোচ্চারণের সাথে সাথেই অন্তরের শক্তির বোধন ঘটিবে এবং 'নাই', 'নাই' রব অন্যত্র যেখানেই থাকুক, রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'আছে', 'আছে' রবই ধ্বনিত হইতে থাকিবে। কি নাই? অর্থ নাই? না থাকুক, বাহুতে শক্তি আছে; অর্থ-উপার্জন করিবার সামর্থ্য সংগঠনের রহিয়াছে। কেবল দানের উপর ভিত্তি করিয়া সংগঠন চলিতে পারে না। গৃহ নাই? না থাকুক, শ্রীরামকৃষ্ণচরণে পরমাশ্রয় আছে। ক্রমশ পাকা গৃহ নির্মিত হইবে! পরিকাঠামো নাই? না থাকুক, মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে, পরস্পরের মধ্যে অগাধ প্রেম আছে, কর্মস্পৃহা আছে, পরিকাঠামো তাহারা নির্মাণ করিয়া লইবে অচিরেই। সবই আছে। আজ যাহা 'নাই', কাল তাহা 'আছে' হইবে। দরকার ধৈর্য, আদর্শানুরাগ, প্রবল সেবাকাঙ্ক্ষা। ১৮৯৪ সালে নিউ ইয়র্ক হইতে নিজস্ব অননুকরণীয় বাচনশৈলীতে স্বামীজী লিখিতেছেন ঃ

> "নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল। ঐ যে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনা' ভাব—ও হলো ব্যারাম। ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। 'ন লিঙ্গং ধর্মকারণং, সমতা সর্বভূতেষু, এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্।' (বাহিরে একটি তিলক বা মালা-জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিলেই ধার্মিক হয় তাহা নহে। সকল মানুষে সমান জ্ঞানই মুক্তপুরুষের লক্ষণ)। অস্তি, অস্তি, অস্তি (আছে, আছে, আছে)। সোঽহং, সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং, শিবোঽহং। (আমিই সেই, আমিই সেই চিদানন্দরূপ শিব) 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।' (পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেমন বন্ধন ভাঙিয়া নির্গত হয়, তেমনি যে বীর, সে জগৎ-জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তাবস্থা লাভ করে)। ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' (দুর্বল কখনো আত্মলাভ করিতে পারে না)।... আমায় জানিস তো? তুই (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যে গোঁড়ামিতে নাই তাতে আমি বড়ই খুশি। Avalanche-এর মতো (পর্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপ) দুনিয়ার ওপর পড়।—দুনিয়া ফেটে যাক চড়্চড়্ করে। হর হর মহাদেব। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে) [গীতা, ৬।৫]।"

ঐ শ্লোকেরই পরবর্তী অংশ—'নাত্মানমবসাদয়েৎ'। অর্থাৎ নিজেকে কদাপি অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে না। কিংবা তোমাকে অবসন্ন করিয়া দিবার সুযোগ অপর কাহাকেও দিবে না। এই কথা ব্যক্তি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে সমভাবে সত্য। সংগঠনের বিপুল প্রাণশক্তি সর্বদা সকল সদস্যের মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল থাকিবে। বাহিরের কোন শক্তিকে এই প্রাণশক্তি খর্ব করিবার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। এবং এই প্রাণশক্তি প্রবল থাকিলে তখনি কেবল 'নিজেকে নিজে উদ্ধার করিবার' সামর্থ্য জন্মিবে। যে-রোগ হইয়াছে তাহার ঔষধও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ঐ ঔষধ সংগ্রহ করিবার উদ্যোগটুকু সর্বদা বজায় থাকিলেই রোগ সারিবার সম্ভাবনা থাকে।

যেকোন সংগঠন একটি সজীব বস্তুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। সেই কারণে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বলা যাইতে পারে—Impersonal personality বা নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব। সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যেকোন সংগঠনের যে নিজস্ব 'রূপ' বা 'image' থাকে, তাহাই তাহার নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব। সেই নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে একটি জ্যোতির্ময় চালচিত্র যদি কল্পনা করি—যে-চালচিত্র বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করে, আকৃষ্ট করে—তাহা নিশ্চয়ই ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সভ্যবৃন্দের ত্যাগ, উদারতা, পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, উদ্যম এবং সেবাকাঙ্ক্ষার উপরেই নির্ভর করে। এবং এই সবকয়টি 'গুণ'ই যথার্থ শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগের ফলশ্রুতি। আর তাহাকে উৎকৃষ্টতর রূপ প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজন হয় যথার্থ সমাজকল্যাণমুখী কর্মসূচী বা development model। অবশ্য একথা সত্য যে, বৎসরে একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় প্রভাতফেরিতে

দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়া, প্রতিবেশিগণকে খিচুড়ি-আলুরদম-বোঁদে খাওয়াইয়া কোন 'image' গড়া সম্ভব নহে। সংগঠনের নিজস্ব গতি আনয়নের লক্ষ্যে উহা একটি পদক্ষেপমাত্র।

অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ঃ মঠের গুরুভ্রাতৃগণকে আমেরিকা হইতে নানা নির্দেশ দিয়া স্বামীজী চিঠি লিখিতেন। 'অ্যাকাউন্টস' ব্যাপারটি আজ আমাদের নিকট যতটা স্বাভাবিক, ঐসময়ে উহা সেরূপ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে যেরূপ সলতেটি পর্যন্ত কিভাবে পাকাইতে হইবে শিখাইয়াছিলেন, স্বামীজীও অনেকটা সেইরূপে কিভাবে সংগঠন চালাইতে হইবে তাহা মঠের বৈরাগ্যবান গুরুভ্রাতাগণকে শিখাইয়াছিলেন। হিসাবপত্র রক্ষা করা, চিঠিপত্রের 'ফাইল' রক্ষা করা, অতিথি, অভ্যাগত, পৃষ্ঠপোষক দাতাগণকে আন্তরিক আপ্যায়ন করা, সকলের সহিত পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা, যাহাতে 'communication gap' বা 'ছিন্ন-যোগ' না হয় ইত্যাদি সবই চিঠি লিখিয়া সুদুর আমেরিকা হইতে তিনি শিখাইতেছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার তীব্র সতর্কবার্তা ছিল—"শাকের কড়ি মাছে দিবে না।" অর্থাৎ সংগঠনের অর্থনৈতিক হিসাব রাখিবার সময়ে যতই কষ্ট হউক না কেন, কখনোই একটি খাতের আয় অন্য খাতে ব্যয় করা চলিবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের ১০৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহাই হইয়াছে যে, এই অর্থনৈতিক সততা এবং স্বচ্ছতাই মিশনের উপর সাধারণ মানুষের আস্থার মূল কারণ। যদি কেহ মিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিতে চাহেন, দেখিবেন এখানে কোনরূপ লুকোচুরি বা স্বেচ্ছাচারিতা নাই। শুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রামকৃষ্ণ মিশন। এবং মিশনের সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরই এইটুকু বোধ আছে যে, সংগঠনের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই অর্থনৈতিক সততা ও স্বচ্ছতা। যেকোনভাবে ইহার সহিত সামান্যতম আপস করার অর্থই হইল সংগঠনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া। এবং, অবশ্যই স্বামীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা। আমাদিগকে প্রথমে বুঝিতে হইবে, আমরা স্বামীজীর প্রীতি উৎপাদন করিতে আগ্রহী কিনা। যদি তাহাই আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে স্বামীজীর আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধবোধটুকুও আমাদের অন্তরে নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকিবে।

বিরুদ্ধতা, উদাসীনতা এবং স্বীকৃতি ঃ ইতোমধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কি করিয়া ১০৬ বৎসর এরূপ সাবলীলভাবে অতিক্রম করিল তাহা লইয়া আলোচনা ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু হইয়াছে। স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি এবং ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসঙ্গ এখানে তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু অ-রাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে ইহা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা অবশ্যই। অবশ্য এখনই আমাদের আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন নাই। বিপরীত দিক হইতে চিন্তা করিলে ইহাই সঙ্ঘের পক্ষে সুকঠিন পরীক্ষার সময়। ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দিবার সময় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ যেকোন সংগঠনের জীবনে তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছিলেন। প্রথমটি Opposition অর্থাৎ বিরুদ্ধতা। জনমানসে রক্ষণশীলতার কারণে দেখা যায় যে, কোন সদ্যোজাত সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমাজ তাহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে চাহে এবং সেই বিরুদ্ধাচরণ রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘটিত হইলে তাহার ফল সুদুরপ্রসারী হইয়া থাকে। বর্তমানে যাঁহারা কোন নবীন সংগঠনের সহিত যুক্ত, মনে হয় তাঁহারা সকলেই এইপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন বা করিতেছেন। এই বিরুদ্ধাচরণের কারণে সংগঠনের মূল যে আরো দৃঢ়ীভূত হয়, তাহাও সত্যি কথা।

দ্বিতীয় অবস্থাটি হইল Indifference বা উদাসীনতা। যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহারা যখন ব্যর্থ হইল তখন নবীন সংগঠনটির ব্যাপারে তাহারা উদাসীন হইয়া পড়ে। অবশ্য জনগণের এই উদাসীনতার সময়ে নিঃশব্দে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ নির্মাণের সুযোগ সংগঠনের এক বিশেষ প্রাপ্তি।

ইহার পর ক্রমশ ঐ নবীন সংগঠন যৌবনে পদার্পণ করিয়া ত্যাগ ও সেবা সহায়ে যখন সমাজে দীর্ঘস্থায়ী (sustainable) কল্যাণমূলক কর্মসূচীর প্রবর্তন করে এবং জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া উঠে, তখন তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ তাহাকে স্বীকৃতি দান করে এবং নিজের মধ্যে গ্রহণ (accept) করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বামী সারদানন্দজী বলিলেন, এই Acceptance সংগঠনের পক্ষে একটি সুকঠিন পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, এখন হইতে তাহাকে সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে, মানুষের আস্থার সুযোগে পাছে তাহার ত্যাগ ও সেবার ভাবে বিঘ্ন ঘটিয়া যায়, পাছে তাহার মধ্যে ক্ষমতা, অর্থ ইত্যাদির প্রতি আসক্তিজনিত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া কেহ তাহাকে আদর্শচ্যুত করিয়া দেয়। ই. টি. স্টার্ডিকে স্বামীজী চিঠিতে লিখিয়াছিলেন ঃ

> "আর আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, অন্য সবগুলিকে গ্রাস করিয়া ভবিষ্যতে একটি মতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সেটি কোন্টি?... অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তই যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই জয়লাভ করিবে যাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে।"

সুতরাং সমাজ কর্তৃক Acceptance-ই সঙ্ঘের পক্ষে 'অ্যাসিড টেস্ট'। অ-রাজনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক যেকোন সংগঠনের ক্ষেত্রেই এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বলপূর্বক ঐ স্বীকৃতি আদায়ের প্রবণতা রহিয়াছে। ইহা ঐ সংগঠনের দুর্বলতার পরিচায়ক। "অমুককে তো সেই আমাদের কাছেই আসতে হলো।" এই 'আমাদের কাছে' আসাটা শ্রদ্ধায় সঙ্ঘটিত হইয়াছে, না ঘৃণা ও অবজ্ঞামিশ্রিত ভয়ের দ্বারা সঙ্ঘটিত হইয়াছে—তাহাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। আর এই বলপূর্বক স্বীকৃতি আদায়ের (যাহা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অহরহ লক্ষ্য করা যায়) মারাত্মক ফলশ্রুতি হইল—সংগঠনের চরিত্রে অসত্য-হিংসা-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি অসামাজিক দোষসকল বিকাশের ব্যাপক সুযোগলাভ। এবং এই সবকিছুর উৎস একপ্রকার ভিত্তিহীন অহঙ্কার। সংগঠনের তো অহঙ্কার হয় না, যিনি বলেন 'আমাদের কাছে', এই অহঙ্কার তাঁহারই। ঐশী প্রেরণায় সৃষ্ট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রে এইরূপ জোর করিয়া স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা, নিজের ঢাক নিজে পিটানো—কল্পনাতীত ব্যাপার।

প্রচার ঃ নিজের ঢাক নিজে পিটানো এবং যথার্থ ভাবপ্রচার সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। 'ভাবপ্রচার' শব্দটির সহিত অহঙ্কারমিশ্রিত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। ভাবপ্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী দিকে দিকে প্রচার করা। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা কৃতিত্বকে তুলিয়া ধরা ভাবপ্রচারের লক্ষ্য নহে। সুতরাং প্রচারকার্য সংগঠনের একটি মৌলিক দায়িত্ব। স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে। অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনো বিরত হইবে না।" শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীই ভাবপ্রচারের মূল প্রতিপাদ্য বলিয়া সর্বদা বিবেচিত হইবে। যেকোন কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্যে এই কথা বিস্মৃত হইলে ভবিষ্যতে যে জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সংগঠনের ব্যবহারিক সমস্যা ঃ সংগঠনের পরিচালক ও সদস্যগণের সম্মুখে স্বামীজী যে আদর্শগত লক্ষ্য তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং যে যে বিষয়ে সাবধান করিয়াছিলেন তাহা মনে রাখিয়া বাস্তব কিছু সমস্যার কথা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

যেকোন সংগঠনের মূল উপাদান মানুষ। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, মানুষমাত্রেই দুর্বলতা আসিতে পারে। ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, ক্ষমতালিপ্সা ইত্যাদি দুর্বলতা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সকল সদস্যেরই মনে উদয় হইতে পারে। সেই সেই ক্ষেত্রে 'সমষ্টিগত শুভেচ্ছা'র আশ্রয় লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অর্থাৎ সমমনস্ক কাহারো নিকট নিজের মনের কথা বলিয়া মন হাল্কা করা একটি উপায়। যাঁহার নিকট সব কথা বলা হইল, তিনি যদি বক্তার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি নিশ্চয়ই হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবেন না। ঐরূপ করিলে সংগঠনের ঐক্যের প্রশ্নে তাহা ক্ষতিসাধক হইবে অবশ্যই। বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি যথার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বা বিবেকানন্দ-অনুরাগী হইলে তিনি সহানুভূতির সহিত শাস্ত্রাদি হইতে (এখানে 'শাস্ত্র' কেবল বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-পুরাণ নহে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা ইত্যাদি গ্রন্থও বুঝাইতেছি) উদাহরণ দিয়া বুঝাইবেন যে, অতীতেও অনেক বড় মাপের মানুষের এইরূপ দুর্বলতা মনে উঁকি দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা এই-এই প্রকারে সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া স্বমার্গে গমন করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রসঙ্গ না টানিয়া যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগঠনের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে দৃঢ় করিবার জন্য আদর্শের সহিত সামান্য আপস করিবার প্রয়োজন হইলে কি করা উচিত? স্বামীজীর শিক্ষা ও চিন্তা অনুসারে আমরা আদর্শের প্রশ্নে কোনরূপ আপস করিতে পারি না। যেমন সামান্য হইলেও সত্যের অপলাপ করিয়া সংগঠনকে পুষ্ট করিতে স্বামীজী কখনো বলেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় যেভাবে অর্থাগম হইতেছে উহাই মানিয়া লইয়া সামান্য পরিকাঠামোর সাহায্যেই সেবাকার্য যথাসাধ্য চালাইয়া যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য, এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু মন্দ ব্যক্তি কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে অ্যাকাউন্টসে কারচুপি করিবার জন্য সংগঠনের সদস্যকে, বিশেষ করিয়া ক্যাশিয়ার বা হিসাবরক্ষককে উত্ত্যক্ত করিতে থাকে। পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে বাৎসরিক উৎসবের বিবরণ-সম্বলিত একখানি পত্র পাইয়া ১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীমা মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লিখিয়াছিলেন ঃ "ছেলেরা সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। তাহাদিগকে আমার আশীর্বাদ দিবে ও তোমরা সকলে লক্ষ্য রাখিবে তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] অকলঙ্ক নামে কোন দুষ্ট লোক ঢুকিয়া কলঙ্ক না রটায়।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ "এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয় তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক যথাসময়ে এসে যাবে।" এবং ঘটনাও তাহাই। [ক্রমশ] (পাঁচ)

সমসাময়িক সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দ

'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য, সেই বছরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। এর ৩০ বছর পর শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক আবির্ভাব। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের সংবাদ ভারতের যেসকল প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তখন বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অগ্রগণ্য। সেখানে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং সংবাদ ও মন্তব্যের কিয়দংশ অনূদিত আকারে এখানে উপস্থাপন করা হলো। *অনুবাদক : জয়দীপ ঘোষ*

ইণ্ডিয়ান মিরর, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৩

সম্পাদকীয়

বর্তমান যুগে ধর্মীয় পুনরুত্থান এবং হিন্দুজাতি

শিকাগো ধর্মমহাসভা এবং অ্যানি বেসান্তের ভারতে আগমন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। যিনি শিকাগোকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করতে পেরেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ—একজন হিন্দু। হিন্দুত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জাগিয়ে তুলেছিল ব্যাপক আগ্রহ, এমনকি কখনো রোমাঞ্চও। বেশির ভাগ শ্রোতা তাঁরই মুখ থেকে সেদিন প্রথমবার হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শুনেছিল। অন্যান্য হিন্দু বক্তাও ঐ ধর্মমত সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেসব বক্তৃতা, বোধহয়, স্বামী বিবেকানন্দের মতো আগ্রহ জাগাতে পারেনি। তিনটি পৃথক দিন ধার্য করা ছিল থিওজফিস্টদের জন্যও। তাঁরাও আমেরিকাবাসী এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের হিন্দুধর্মের সু-উচ্চ দর্শন সম্পর্কে অবগত করান। আমরা বিশ্বাস করি, শিকাগো ধর্মমহাসভায় সূচনা হলো এমন একটি আন্দোলনের—যা পৃথিবীকে ক্রমশ একই ধর্মের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলতে পারবে। অন্তত, সেদিন যাঁরা মন দিয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনেছেন, তাঁরা এরকমই মনে করেন। এটা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা সত্যিই চমৎকার এবং তা সুন্দরভাবে সম্পন্নও হয়েছে। ❑

ইণ্ডিয়ান মিরর, ২০ ডিসেম্বর ১৮৯৩

সংবাদ ও মন্তব্য

শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম ভাষণটি দেওয়ার আগে যাঁর নাম জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব-পরিচয় সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তিনি তুলনামূলকভাবে অল্পবয়স্ক, বড়জোর তিরিশ বছর হবে। জীবনের প্রায় শুরু থেকেই—কৈশোরেও প্রবেশ করেননি যখন—আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তিনি ব্রাহ্মসমাজ আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মসভায় যেতেন এবং বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অধ্যাত্মভাবাপন্ন নাটকে অভিনেতার দলভুক্ত ছিলেন—যে-নাটক, আমাদের বিশ্বাস, বাবু কেশবেরই পরামর্শ ও পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল। এই সময়েই তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম) তাঁর প্রতি দুর্নিবার টান অনুভব করতে থাকেন। ক্রমে তিনি তাঁর অনুরক্ত শিষ্যদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। পরমহংস—যিনি নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন—একবার বলেছিলেন : "যদি কেশব একটি শক্তির অধিকারী হয়, তবে নরেন্দ্র আঠারোটি শক্তির অধিকারী।" অন্য একদিন তিনি বলেন, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে উচ্চমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান ও অধ্যাত্মপ্রেমের শক্তি পরিপূর্ণ রয়েছে। পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো—তিনি তাঁর বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে একদিন জগতের ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দেবেন। এইসব কথাকে আমরা নিজের শিষ্য সম্পর্কে এক প্রেমময় হিন্দুগুরুর অতিকথন বলে ধরে নিতে পারতাম, কিন্তু ইতোমধ্যেই আমরা বহু প্রমাণ পেয়েছি যে, এই বাঙালিটি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। যাঁরা তাঁকে চেনেন, সবাই এব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত যে, তিনি অতি উচ্চ চারিত্রশক্তিতে বলীয়ান, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও বৈরাগ্যের তেজে পরিপূর্ণ, যে-তেজ প্রাচীন ঋষিগণকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছিল এবং তাঁরা মানুষের উন্নতি ও মুক্তির জন্য সচেষ্ট হতে পেরেছিলেন।

আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাবের কথা মনে রেখে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁর মতো আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাকে আজ ভারতবর্ষের নয়, জড়বাদী পশ্চিমেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমরা শুনেছি, মাদ্রাজের দুজন ধনী জমিদার বিবেকানন্দের শিকাগো-যাত্রার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। আমরা সেই দুই পরোপকারী ভদ্রলোককে অনুরোধ করতে পারি, যাতে তাঁরা স্বামীর (স্বামী বিবেকানন্দের) আমেরিকা-প্রবাসকে আরো একটু দীর্ঘায়িত করে তোলার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে তিনি হয়তো—আমরা যাকে বলতে পারি উচ্চতর হিন্দুত্ব—তার সম্বন্ধে আরো বেশি জানানোর সুযোগ পাবেন এবং খ্রিস্টান-জগৎ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নিজেদের দুর্মর অজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। আর এইভাবে পশ্চিমের মানুষের কাছে হিন্দুধর্ম সত্যের আলোয় আলোকিত হয়ে যথার্থ শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে সক্ষম হবে। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত*

[১]

মঠ বেলুড়, হাওড়া জেলা
বাংলা, ভারতবর্ষ
১১ মে ১৮৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমি সত্যি অবাক হয়ে ভাবছি তোমার কী যে হলো! এক যুগ হয়ে গেল তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি, আর স্টার্ডির ডেট্রয়েটে পদার্পণের পর আমি তা বিশেষভাবে আশা করেছিলাম। মানুষটিকে তোমার কেমন লাগল? বেবি ও ডেভন্‌ডর্ফদের খবর কি? মিসেস ফাঙ্কে কেমন আছেন? এই গ্রীষ্মে তুমি কি করবে ঠিক করেছ? বিশ্রাম নাও, প্রিয় ক্রিস্টিনা, আমি নিশ্চিত যে তোমার তা একান্ত প্রয়োজন।

বস্টনের মিসেস বুল ও নিউ ইয়র্কের মিস ম্যাকলাউড এখন ভারতে আছেন। পুরনো অপরিচ্ছন্ন বাড়িটি[১] থেকে গঙ্গাতীরে একটি বাড়িতে[২] আমরা মঠ স্থানান্তরিত করেছি। এই স্থানটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। নদীর একই দিকে, যেখানে এখন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড বাস করছেন, তার কাছেই আমরা একখণ্ড জমি পেয়েছি। বিরল ভোগোপকরণের ও ক্লেশকর ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে এঁরা যে [এত] সুন্দর মানিয়ে নিয়েছেন—এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। সত্যি, এই ইয়াঙ্কিদের অসাধ্য কিছুই নেই! বস্টন ও নিউ ইয়র্কের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পর এই নগণ্য ক্ষুদ্র কুটিরে কেমন সুন্দর পরিতৃপ্তিতে ও সুখে আছেন!! আমরা একসঙ্গে কাশ্মীরে কিছুটা বেড়িয়ে আসতে চাই, তারপর তাঁদের নিয়ে আমেরিকায় চলে যাব এবং সেখানে বন্ধুরা যে আমাদের আন্তরিক স্বাগত জানাবে—এসম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তোমার কি মনে হয়? এটা তোমার কাছে সুসংবাদ তো? অবশ্য, আমি আগের মতো একই মাত্রায় পরিশ্রম করতে পারব না—প্রিয় ক্রিস্টিনা, আমি দুঃখিত যে তা আর কখনোই করে উঠতে পারব না। আমি সামান্য কাজ করব এবং যথেষ্ট বিশ্রাম নেব। আর ভিড়ের মুখোমুখি হওয়া এবং হৈচৈ করা নয়, এবার যা করতে চাই তা হলো সম্পূর্ণ নিরিবিলিতে ব্যক্তিগত কাজকর্ম।

এবার আমি নিঃশব্দে আসব এবং কেবল আমার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে ও হৈচৈ না করে নিঃশব্দে চলে যাব।

শীঘ্র চিঠি লিখো, কারণ আমি খুবই উদ্বিগ্ন।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ "দুই শ্রেণির মানুষ আছে—এক শ্রেণির হৃদয় জলের মতো, অন্যদের পাথরের মতো। একটিতে সহজেই যেমন ছাপ পড়ে তেমন সহজেই তা মিলিয়ে যায়। অন্যটিতে কদাচিৎ ছাপ পড়ে, তবে একবার যদি পড়ে তবে তা চিরকাল থেকে যায়। শুধু তাই নয়, সেটা মুছে দিতে তারা যতই চেষ্টা করে, ততই তা হৃদয়ের অন্তস্তলে খোদিত হয়ে যায়।"
—রামকৃষ্ণ পরমহংস

---

* ভগিনী ক্রিস্টিনকে ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রদুটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল।

১ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ২ বেলুড় মঠের পুরনো বাড়ি

[২]

মঠ বেলুড়, হাওড়া জেলা
২৫ অক্টোবর ১৮৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

কেমন আছ? তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি খুব উদ্বিগ্ন। বহুদিন হলো, তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি।

আমার স্বাস্থ্য আবার খুবই ভেঙে পড়েছিল। সেজন্য তাড়াহুড়ো করে কাশ্মীর ছেড়ে আমাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। চিকিৎসকেরা বলেন, এই শীতে আমার পক্ষে আর ঘুরে বেড়ানো সমীচীন হবে না। বুঝলে, এটা বড়ই নৈরাশ্য-জনক ব্যাপার। যাহোক, এই গ্রীষ্মে আমি যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছি। মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড এবছরের কাশ্মীরভ্রমণ বড়ই উপভোগ করেছেন এবং এখন তাঁরা দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর ইত্যাদি স্থানের পুরনো মিনার ও হর্ম্যগুলি এক পলক দেখে নিচ্ছেন।

যদি তোমার সময় থাকে তবে একটি সুন্দর ও সুদীর্ঘ পত্র লিখ এবং খেটে খেটে মরে যেও না। কর্তব্য নিঃসন্দেহে কর্তব্য, কিন্তু শুধু মাতা প্রমুখদের প্রতিই আমাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়, অন্যদের প্রতিও আছে। কখনো কখনো এক কর্তব্য দৈহিক নিগ্রহ দাবি করে, আবার অপরটি আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে প্রণোদিত করে। আমরা অবশ্য অধিকতর বলবান প্রেরণাকেই অনুসরণ করে থাকি এবং জানি না তোমার ক্ষেত্রে কোন্‌টি অধিক জোরালো বলে সাব্যস্ত হবে। যাই হোক, তোমার শরীরের বিশেষ যত্ন নেবে, এখন তো তোমার বোনেরা তোমাকে সহায়তা করছে।

পরিবারকে কিভাবে সামলাচ্ছ? খরচ ইত্যাদি? যাকিছু লিখতে ইচ্ছে করবে আমাকে লিখবে। আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারী কোরো; করবে তো? কোরো কিন্তু!

আমার স্বাস্থ্যের প্রতিদিনই উন্নতি হচ্ছে এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্রে আমার রওনা হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি মাস তো পড়েই আছে। একদম ভেবো না, 'মা' জানেন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলকর কোন্‌টি। তিনি পথ দেখাবেন। এখন আমি ভক্তি নিয়ে আছি। আমার যতই বয়স হচ্ছে, ততই জ্ঞানের স্থান দখল করছে ভক্তি। নতুন 'প্রবুদ্ধ ভারত' ('Awakened India') তুমি পাচ্ছ কি? কেমন লাগছে এটা?

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

এমা কালভেকে লিখিত

মঠ বেলুড়, হাওড়া জেলা
বাংলা, ভারতবর্ষ
১৫ মে ১৯০২

প্রিয় মাদামোয়েজেল,

আপনার ওপর যে বেদনাদায়ক শোকতাপ নেমে এসেছে তা অবগত হয়ে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি।

এইসকল আঘাত আমাদের সকলের ওপর আসবেই—এটাই প্রকৃতির বিধান; তথাপি এসকল সহ্য করা কত না কঠিন!

সংসর্গজাত শক্তি এই কুহকিনী ধরিত্রীর বুকে এক বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে এবং সংস্রব যত দীর্ঘদিনের হবে, প্রচ্ছায়া তত বেশি সত্য বলে প্রতিভাত হবে—কিন্তু একদিন সময় আসে যখন এই কুহক আবার শূন্যে বিলীন হয়ে যায় এবং হায়, তা সহ্য করা কতই না কষ্টকর!

তথাপি যথার্থ সত্য হলো এই যে, সেই আত্মা চিরকাল আমাদের সঙ্গে রয়েছে, সর্বত্র তা বিরাজমান। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এই অপসৃয়মাণ প্রচ্ছায়াময় জগতে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

মাদামোয়েজেল, আশা করি মিশরে আমাদের শেষ সাক্ষাতের পর আপনার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

প্রভু আপনার প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদসকল সর্বদা বর্ষণ করুন—সতত এই প্রার্থনা জানাই।

বিবেকানন্দ

* মাদাম কালভেকে ইংরেজিতে লেখা স্বামীজীর এই পত্রখানি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৪ সালের ৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমা কালভের পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে স্বামীজী এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে অর্জুন (কৌন্তেয়), মানুষের অন্তরের এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। এবং অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় (কখনোই তৃপ্ত হইবার নয়)। এই তৃষ্ণারূপ কামের দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি আবৃত থাকে।*

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের স্বভাব হইল, কষ্টে প্রাণান্ত হইতেছে, কিন্তু সুখ পাইলেই ঐ কষ্টকে সে ভুলিয়া যায়। সেই কারণে শ্রীভগবান স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—'নিত্যবৈরিণা'। অর্থাৎ অনন্তকাল ধরিয়া এই কাম জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহা দুষ্পূরণীয় অগ্নির ন্যায়। 'দুষ্পূরণোনলেন' —বাসনা কিছুতেই মন হইতে যাইতে চাহে না। যতই দেওয়া যায় ততই চাহি, চাহি। মন হইতে বাসনা দূর করিতে হইলে চাওয়ার ইচ্ছা জোর করিয়া রোধ করিতে হইবে। এইভাবে অভ্যাস হইলে ঐদিকে মনের এক স্বাভাবিক গতির সৃষ্টি হয়। উহার ভিতরের পুরুষকার জাগ্রত হয়। পূর্বসংস্কার তখন তাহাকে পর্যুদস্ত করিতে পারে না। তখন মন সহজে কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয় না।

[**মন্তব্য ঃ** কাম ও ক্রোধ বস্তুত একই মুদ্রার এ-পিঠ এবং ও-পিঠ। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্ভব হয়। এবং এই কাম (বাসনা) অনলের ন্যায়। "ন অলং অস্য ইতি অনলঃ"—যাহার শেষ বা সমাপ্তি (অলং) নাই, তাহাই অনল। তৃপ্তি কখনো হয় না। সর্বদা চাহি চাহি, আরো চাহি। ঐ জন্যই রাজা যযাতি বলিয়াছেন ঃ "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শ্যামতি/ হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।" অর্থাৎ অগ্নিকে ঘৃত দিয়া কেহ অগ্নি নির্বাপণের চেষ্টা করিলে যেরূপ উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ঐরূপ সতত পরিপূর্তির দ্বারা কামকে প্রশমিত করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা।—**সম্পাদক**]

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

শ্লোকার্থ ঃ *মানুষের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—এইগুলি কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয় এবং ইহাদের সাহায্যে বিবেকবুদ্ধিকে আবৃত করিয়া কাম (বহুদূর বিস্তৃত মনোবাসনাসমূহ) দেহাভিমানী জীবকে বিভ্রান্ত করে।*

ব্যাখ্যা ঃ স্থূলদেহ (অন্নময় কোশ ও প্রাণময় কোশ) এবং সূক্ষ্মদেহ (মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশ) দেহীকে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত করিয়া আছে। এবং এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই কামের কর্মভূমি।

[**মন্তব্য ঃ** বেদান্তের বর্ণনানুযায়ী প্রত্যেক জীবের তিনটি দেহ বা শরীর আছে। যথা স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণশরীর। অন্য পরিভাষায় ইহাদের 'পঞ্চকোশ'-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন মতে, স্থূলশরীরকে অন্নময় কোশ বলা হয়। অন্নময় কোশের অন্তরে প্রাণময় কোশ বিদ্যমান, যাহা অন্নময় কোশকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখে। উহার অভ্যন্তরে মনোময় কোশ বিদ্যমান, যাহা প্রাণময় কোশকে পরিচালিত করে। এই মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত লইতে অপারক। উহার অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত-পারদর্শী বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোশ ক্রিয়াশীল থাকে। এই বুদ্ধি সত্ত্বগুণশালিনী এবং নিশ্চয়াত্মক, অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী। বুদ্ধির পশ্চাতে আছে 'অহং' বা আনন্দময় কোশ—যাহাকে শাস্ত্রে 'কারণশরীর' বলা হইয়াছে। ইহাতে লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই এবং ইহা কামের ক্রীড়াক্ষেত্রও নহে। এই পঞ্চকোশের অতীত বলিয়া 'আত্মা' নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।—**সম্পাদক**]

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।।৪১।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, প্রথমে তুমি ইন্দ্রিয়-দিগকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক এই পাপরূপ কামকে পরিহার কর।*

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমে কাম, ক্রোধ, লোভের বিষয় হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক কর্তব্য ইন্দ্রিয়-সংযম। তাহার পর সাধুসঙ্গের মাধ্যমে বিবেক ও বিচারের দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া এই কাম-ক্রোধাদি যে যথার্থই নিজ জীবনে পরিহার্য, সে-কথায় দৃঢ় ধারণা করা প্রয়োজন। পতঞ্জল মুনির মতেও এই ক্রমই সাধকের যথার্থ কল্যাণজনক—তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান। এখানে 'তপঃ' বা 'তপস্' অর্থাৎ 'তপস্যা' অর্থে সেই একই কথা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয় থেকে দূরে থাকা। তাহার পর সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরধারণা।

শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা অর্থাৎ কাম 'জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্'। এখানে 'জ্ঞান'-এর অর্থ পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র পড়িয়া কিংবা গুরুমুখে শুনিয়া যে-ধারণা। এবং 'বিজ্ঞান' অর্থ অনুভূত জ্ঞান বা অনুভূতি। বিজ্ঞান অবস্থায় যোগী দেখেন যে, তিনি এই দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে প্রাকৃতিক নিয়মে কোন সময়ে কোন বিশেষ কারণে কাম-ক্রোধ-লোভের আকার তাঁহাতে দেখা যায়। যেমন তোতাপুরীর চিমটা হাতে লইয়া তাড়া লাগানো ইত্যাদি। আসল কথা, সেই সময়ে তাঁহারা মনকে শরীরে প্রয়োগ করিয়া লাগাইয়া রাখেন, নামাইয়া রাখেন। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, মনকে লইয়া এইরূপ খেলা করিলেও তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে, এই দেহ-মন-বুদ্ধি-অহং হইতে তাঁহারা পৃথক এবং যখনি ইচ্ছা তখনি তাঁহারা ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অবতারপুরুষগণের জীবনেও এইসব দেখা যায়। তাঁহারা মায়াধীশ বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। যদিও স্বামীজী বলিয়াছেন, অবতারপুরুষগণ দ্বিতীয় শ্রেণির। প্রথম শ্রেণির তাঁহারাই যাঁহারা সর্বদা সমাধিস্থ থাকেন, যাঁহাদের নাম পর্যন্ত মানুষ জানিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২।।

শ্লোকার্থ ঃ *স্থূলদেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহ হইতে শুরু করিয়া বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। [এই আত্মাকে আশ্রয় করিলেই কামনাশ হইতে পারে।]*

ব্যাখ্যা ঃ ইন্দ্রিয় ব্যতীত দেহ তো একটি জড়পদার্থ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তো অনুভব করা যায়, এই দেহটি চেতন। আবার মনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাবতীয় কাজকর্ম করাইয়া থাকে। অবশ্য এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথাই বলা হইয়াছে। এবং বুদ্ধি আড়ালে থাকিয়া নিঃশব্দে মনকে নাচাইতেছে—'এটা ভাল নয়, ওটা ভাল', 'এটা করব না, ওটা করব'—এইরূপে। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বলিয়া সর্বদা কিছু জিনিস গ্রহণ করিতেছে, কিছু জিনিস বর্জন করিতেছে।

কিন্তু 'আমি' এসব কিছুর সাক্ষী। অথচ এই 'আমি'ই বুদ্ধির সহিত একাত্ম হইয়া সুখ-দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। আমরা দীর্ঘ জীবন, জন্ম-জন্মান্তরে এইভাবে চলিয়াছি। তাই সর্বদা কাম-ক্রোধ-লোভের সহিত একাত্ম হইয়া রহিয়াছি। ইহা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে সমগ্র ঘটনার স্রোতকে ঘুরাইয়া নিজের দিকে লইয়া আসিতে হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধি তখন মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর হুকুম বন্ধ করিবে। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অচঞ্চল স্থির হইলে অন্তরে একটি 'আমি' 'আমি' ধারা বহিতে থাকিবে। এই ধারাই 'অস্মিতা'। এবং এই অস্মিতার সাহায্যে ধ্যানে বসিলে দেহ, মন, বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক বোধ করা সহজ হইবে। আর তখনি কাম-ক্রোধের কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ কেমন করিয়া তাহারা মন-বুদ্ধিকে বশীভূত করিতেছে—সেব্যাপারে সম্যক জ্ঞানলাভের মাধ্যমে কাম-ক্রোধাদি জয় করা সহজসাধ্য হইবে।

অনেক সময়ে 'আমি দেহ নহি, মন নহি' ইত্যাদি ভাবিয়া কেহ কেহ শরীরকে অযথা কষ্ট দিয়া থাকে। এই ভাবে শারীরিক অত্যাচার বা কৃচ্ছ্রসাধন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা বা স্বামীজী কেহই পছন্দ করিতেন না। ইহা যথার্থ পদ্ধতি নহে। শাস্ত্রমুখে এবং গুরুমুখে শুনিয়া যথার্থ নিয়ম মানিয়া সাধনভজন করাই 'সাধনা'।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে মহাবাহু অর্জুন, শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে মনকে সমাহিত করিয়া এবং দ্রষ্টা পরমাত্মাকে জানিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে বিনাশ কর।*

[**মন্তব্য ঃ** টীকাকার আনন্দগিরি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারাই সম্পূর্ণ কামজয় সম্ভব, অন্যথা নহে। 'আমি স্বরূপত আত্মা এবং এই আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়াদি (যাহা কামের আশ্রয়) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক'—এই বোধ যত দৃঢ় হইবে, কাম-ক্রোধের প্রভাব ততই ক্ষীণ হইয়া যাইবে।] [ক্রমশ] ।।দশ।।

।। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শ্রাবণ ১৩১০
জুলাই ১৯০৩

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন

স্বামীজি যখন প্রথমবার আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত হন, তখন মান্দ্রাজের 'হিন্দু' নামক পত্রিকার একজন প্রতিনিধি চিংলিপট ষ্টেশনে স্বামীজির সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত ট্রেনে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত আসেন। গাড়ীতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল।

স্বামীজি, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন?

বড় শক্ত কথা। আমি এর আংশিক উত্তর দোবো। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরছিলুম;—দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হোল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছলুম।

আপনি জাপানে কি দেখলেন? জাপানের মত ভারত কি উন্নতি কত্তে পারবে?

কিছুই কত্তে পারবে না, যদ্দিন না ভারতের ত্রিশ ক্রোর [crore] লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানের মত এমন স্বদেশহিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না আর তাদের একটু বিশেষত্ব এই যে, অন্য অন্য জাতের একদিকে যেমন শিল্পের বাহার, অপরদিকে তেমনি তারা আবার বেজায় অপরিষ্কার। জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য্য, তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার। আমার ইচ্ছে, আমাদের যুবকেরা জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল বোলে মনে করে আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ বোলে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ঢের তফাত। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকবাদে দূষিত; জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম আস্তিক।

চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়াল, আপনার ধারণা?

আমার ধারণা, চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অক্রীশ্চান ধর্ম্ম সকলকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অক্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রাধান্য—আর ক্রীশ্চান ধর্ম্মই হীন প্রতিপন্ন হোলো। সুতরাং ক্রীশ্চানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্চে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে 'ধর্ম্মমহাসভা' না হয়, তার বিশেষ চেষ্টা কচ্চেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে। উহাতে বেদান্তের তরঙ্গ বিস্তার হবার সুবিধা হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্চে।...

ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড় অজ্ঞ। কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ, এখানে দরিদ্রতা একটা রাজদণ্ডযোগ্য অপরাধ বোলে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দ্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোষাকের দরুন জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার যোগাড়ই করেছিল। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ ইউরোপীয় জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।

জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল, আপনি বলেন?

লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে-প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন, তাই কত্তে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভিতর বিস্তার কত্তে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান করে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে।

কিন্তু স্বামীজি, আপনি কি মনে করেন, একায সহজে হতে পারে?

অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কত্তে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কায কত্তে প্রস্তুত, তা হলে কালই এটী হতে পারে। কেবল এই কাযে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, সেই পরিমাণে ইহা সিদ্ধ হবে।

স্বামীজি, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?

ক্রিয়াকাণ্ড হচ্চে ধর্ম্মের কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে উহা এখন সম্পূর্ণ আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাযের ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ড উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন প্রবর্ত্তন কত্তে হবে।

তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন, দেখছি।

না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড কত্তে হবে। সকল বিষয়েরই অনন্ত উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইহাই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পশ্চাতে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দু জাতির ইতিহাসে বরাবর কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনের চেষ্টা হয়েছে।...

আপনার এখানকার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ?

আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য দুটী শিক্ষালয় কত্তে চাই—একটী মান্দ্রাজে, আর একটী কলকাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হোন, অসাধুই হোন, জ্ঞানীই হোন, অজ্ঞানীই হোন, ব্রাহ্মণই হোন আর চণ্ডালই হোন।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন ছিল শ্রাবণ সংক্রান্তি

মণীন্দ্রকুমার সরকার

(১)

সেদিন ছিল শ্রাবণ সংক্রান্তি। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ। আকাশ তার স্বাভাবিক নীল রঙ ও ঝলমলে আলোর শোভা হারিয়ে 'রোদনভরা' সজল কৃষ্ণমেঘে ঢাকা। ঘন ঘন মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায় আর বিশ্বপ্রকৃতির 'অন্তরবেদনা' অবিরাম বাদলধারায় ঝরে পড়ে। এইদিন রাত একটায় 'বহু সাধকের বহু সাধনার' ধন নরদেহধারী নারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলশরীর ত্যাগ করে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রকট হয়েছিলেন। ভক্তহৃদয়ে সে এক ভয়ঙ্করী কালরাত্রি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঘাতক জরা ব্যাধের নিক্ষিপ্ত বিষবাণের মতো যে-কালব্যাধি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীরের ঘাতকরূপে চিহ্নিত—সেই গলরোগের সূত্রপাত বৎসরাধিক কাল আগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন মাসে। সেবছর শেষবারের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবীণ ও নবীন ভক্তসঙ্গে পানিহাটির 'চিড়ার মহোৎসব'-এ যোগ দিতে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবক ভক্তদের ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "সেখানে ঐদিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল' কখনো ঐরূপ দেখিস নাই, চল দেখিয়া আসিবি।"[১]

প্রবীণ ভক্তদের মধ্যে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তও ছিলেন। ঠাকুরের গলার ব্যথা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। রামবাবু এবং আরো কেউ কেউ ঠাকুরকে তাঁর অসুখের কথা ভেবে মেলায় না যাওয়ার কথা বললেও ঠাকুর তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ঃ "তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐবিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।"[২]

দুঃখের কথা, শেষপর্যন্ত 'সামলাইয়া চলা' ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেলার সময় মাঝে মাঝে প্রবল ধারায় বৃষ্টি হয়েছিল। পথঘাট ছিল কর্দমাক্ত। এর মধ্যেই ঠাকুর একটানা কয়েক ঘণ্টা ভাবাবেগে নৃত্য ও কীর্তনে মেতে উঠেছিলেন। আবার মাঝে মাঝে ভাবসমাধিতেও ডুবে থেকেছেন। এই অনিয়মের পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। ব্যাধির বাড়বাড়ন্ত শুরু তখন থেকেই। ডাক্তার এসে সব দেখেশুনে বললেন, খারাপ আবহাওয়ায় মেলায় গিয়ে শরীরের ওপর বেশিমাত্রায় অত্যাচার করাতেই রোগ জটিলাকার ধারণ করেছে। এখন থেকে যথেষ্ট সাবধান না হলে ব্যাধি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

ভক্তগণ চিন্তিত হলেন, কিন্তু ঠাকুরের মনে চিন্তার চিহ্ন নেই। তিনি বরং বালকের মতো সব দায় চাপিয়ে দিলেন রামচন্দ্র দত্তের ওপর। বললেন ঃ "উহারা যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি পানিহাটিতে যাইতে পারিতাম?" পরেও একদিন এক ভক্ত পানিহাটির প্রসঙ্গ তুলতেই ঠাকুর ছোটছেলের মতো অভিমানভরে বলতে লাগলেন ঃ "হ্যাঁ, দ্যাখ দেখি, এই উপরে জল, নিচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এল! সে পাশকরা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করত তাহলে কি আমি সেখানে যাই?" চিকিৎসকের কথামতো বাক্‌সংযমেও ছিল তাঁর আপত্তি। ঐ ভক্তকেই বললেন ঃ "তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই দ্যাখ দেখি—তুই কতদূর থেকে এলি, আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?"[৩]

(২)

দক্ষিণেশ্বরে সুচিকিৎসার সুযোগ নেই, তাই ভক্তগণ ঠাকুরকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ঠাকুর উঠলেন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর বাড়িতে। দিনটি ছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। কবিরাজি মতে চিকিৎসার কথা হলো। গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ঠাকুরকে পরীক্ষা করে রোগটি 'রোহিণী' বা 'ক্যান্সার' বলে সাব্যস্ত করেন। বলেন ঃ "শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।"[৪]

কবিরাজগণ ভরসা দিতে না পারায় এবং অ্যালোপ্যাথি ঠাকুরের ধাতে সয় না বলে তাঁকে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে রাখা হলো। ডাক্তারের আন্তরিক চেষ্টায় মাঝেমধ্যে সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও শেষপর্যন্ত ব্যাধির দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভব হলো না। কাজেই ডাক্তার এবং ভক্তগণ বিশেষ চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু সদানন্দ ঠাকুরের হালচাল একেবারেই বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং লোকের মুখে মুখে বেশ প্রচারিত হয়ে গেছে। তিনি কলকাতায় এসে বাস করছেন শুনে উচ্চাবচ সকল স্তরের মানুষ ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করার আশায় দলে দলে তাঁর কাছে এসে ভিড় করতে আরম্ভ করল। আর ভক্তবৎসল কৃপাঘন ঠাকুরও নিজের কঠিন ব্যাধি এবং আহার-বিশ্রামের কথাও বিস্মৃত হয়ে শুকদেবের মতো অবিরাম ঈশ্বরীয় কথা শোনাতে লাগলেন। ডাক্তারের সাবধানবাণী ও আতঙ্কিত ভক্তদের আকুল আবেদন—কোনকিছুতেই ঠাকুর কর্ণপাত করলেন না।

ঠাকুরের আচরণে বিস্মিত হয়ে সেবকদের কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করতে লাগলেন—তবে কি ঠাকুর অসুখের নাম করে কলকাতায় এসেছেন একান্তভাবে ভোগবাদী, বিদেশী ভাবাপন্ন, বিষয়পঙ্কে নিমজ্জিত মানুষগুলিকে ধর্মোপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করতে। অধিকাংশ সেবকই কিন্তু এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের অভিমত হলো—চিরসত্যাশ্রয়ী ঠাকুর কোন কারণেই কিছুমাত্র মিথ্যা বা ছলনার আশ্রয় নিতে পারেন না। তিনি যা করছেন তার এক কারণ হলো তাঁর 'প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম' এবং অপর কারণ হলো 'সংসার-তাপদগ্ধ মানুষের প্রতি অপরিসীম অনুকম্পা'।

বস্তুত, ঠাকুরের একালের আচরণ ছিল বিস্ময়কর। "ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ অবস্থান করেছেন প্রশান্ত প্রফুল্লতার মধ্যে এবং স্বরচিত একটি আনন্দময় পরিবেশের বাতাবরণে। তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে স্বতঃ উৎসারিত আশ্চর্য সব উপলব্ধি-সুবাসিত যাদুরহস্য দিয়ে কখনো শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করেছেন, কখনো বা ভাবসমাধির অতলে ডুব দিয়েছেন... আবার কখনো বা তিনি গল্প, হাসি, রঙ্গরস, অভিনয় দিয়ে সমাগতদের মনপ্রাণ ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার কখনো বা রোগযন্ত্রণায় বিদ্ধ অসহায় বালকের মতো কাতরতা প্রকাশ করেছেন। অথচ তাঁর সকল আচরণ-বিচরণের লক্ষ্য কম্পাসের কাঁটার মতো একান্তভাবে ভগবন্মুখী।"[৫]

নিজের মরণব্যাধি নিয়েও ঠাকুরের কখনো দুঃখপ্রকাশ, কখনো রসিকতা, আবার কখনো কাতরভাব। এই অসুখের সময় ঠাকুরের পথ্য তৈরি করতেন শ্রীমা। গলায় ক্ষতের জন্য কঠিন খাদ্য গলাধঃকরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল সুজির পায়েস। এপ্রসঙ্গে তিনি একদিন দুঃখ করে বলেন: "ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে। এ-অসুখে পরিবার (শ্রীমা) পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁদলাম এই বলে—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে!"[৬]

ঠাকুরের ঐসময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম 'ঈশ্বরকোটি' সন্তান বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "কথা বলবার যো ছিল না; পেটে ক্ষুধা, খাবার যো ছিল না; উঠে বসে সুখ ছিল না। অষ্টপ্রহর গাত্রদাহ। কিন্তু অহৈতুক কৃপাসিন্ধু কৃপাবিতরণে কখনো ক্ষান্ত ছিলেন না। এরকম দেড় বৎসর। জীবের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হওয়া আর কাকে বলে?"[৭]

ঠাকুরের এই অবর্ণনীয় করুণ অবস্থা দেখে সেবক ও ভক্তগণ যখন অন্তর্বেদনায় মুহ্যমান, তখন আবার ঠাকুরকে দেখা গেছে নিজের দেহকে নিয়েও রসিকতা করতে। একদিন বললেন: "রোগে ভুগে দেহটা কেমন হয়েছে, সূক্ষ্মশরীরে বেরিয়ে এসে দেখি গলার ভিতর ঝাঁজরার মতো হয়েছে; তা হতে পুঁজ, রক্ত পড়ছে, আর খোলটা (দেহটা) যেন কেমন একরকম হয়েছে। ওরে, দেখে এত হাসি এল যে কি বলব! মানুষ এই নশ্বর দেহের ভালবাসায় ভগবানকে ভুলে বাঁচবার কামনা করে।"[৮]

ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ দেবশরীরে কালব্যাধির প্রবেশ তাঁর স্বেচ্ছাবৃত। এই ব্যাধির কারণ তাঁর জানা ছিল, ভক্তদেরও জানিয়েছেন। আবার প্রতিকারও ছিল তাঁর করতলগত; কিন্তু সে-কাজেও ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অনীহা। শ্যামপুকুরে থাকাকালে তাঁর এক অদ্ভুত দর্শন হয়। এবারও তিনি দেখেন—"তাঁহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলায় সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—নানারূপ দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে।"

ব্যাধি যতই পীড়াদায়ক হোক, তা ঠাকুরকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, "জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহপূর্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন।"[৯] ঠাকুর কতবার বলেছেন: "দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।"

একবার ডাক্তার সরকার ঠাকুরের শরীরের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তিনি বলেন: "যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন করতে হয়। কিন্তু দেখছি যে, এটা আলাদা। কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে, দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—ঢপর ঢপর করছে। যেমন খাপ আর তরবার—খাপ আলাদা, তরবার আলাদা। তাই দেহের অসুখের জন্য তাঁকে বেশি বলতে পারি না।"[১০]

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন ঠাকুরকে বলেন: "মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?" শুনে ঠাকুর বলেছিলেন: "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

ঠাকুরের উত্তর শুনে পণ্ডিত নীরব হলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেবকগণ জিদ ধরলেন। বললেন:

"আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।" ঠাকুর বললেনঃ "আমার কি ইচ্ছা রে যে, আমি রোগে ভুগি; আমি মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা না সারা মা-র হাত।" সেবকগণ পুনরায় জিদ করায় ঠাকুর বলতে বাধ্য হলেনঃ "তোরা তো বলছিস, কিন্তু ওকথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় নারে! আচ্ছা দেখি, পারি তো বলব।"

ঘণ্টাকয়েক পরে নরেন্দ্রনাথ এসে জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বললেনঃ "মাকে বললুম, 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।"[১১]

অতঃপর গুরুগতপ্রাণ সেবকদের নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন এবং আসন্ন সেই ভয়ঙ্কর দিনের জন্য দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিই বা করার ছিল!

একথা ঠিক, বালকস্বভাব ঠাকুর বারকয়েক ডাক্তারকে অসুখ সারিয়ে দিতে বলেছিলেন। শ্যামপুকুরে থাকাকালে একদিন বললেনঃ "এই অসুখটা ভাল করে দাও; তাঁর নাম-গুণ করতে পারি না।" ডাক্তার উত্তরে বললেনঃ "ধ্যান করলেই হলো।" ঠাকুর বললেনঃ "সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচরকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে, কখনো ঝালে, অম্বলে, কখনো বা ভাজায়! আমি কখনো পূজা, কখনো জপ, কখনো ধ্যান, কখনো বা তাঁর নামগুণগান করি, কখনো বা তাঁর নাম করে নাচি।"[১২]

(৩)

দক্ষিণেশ্বর থেকে লীলার আসর গুটিয়ে ঠাকুর চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতার বলরাম ভবনে তিনি ছিলেন সাতদিন এবং শ্যামপুকুরে এক ভাড়াবাড়িতে ছিলেন সত্তরদিন। চিকিৎসা ও সেবার সুব্যবস্থার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না; তাসত্ত্বেও ঠাকুরের নিরাময়ের আশা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন; সেবক-ভক্তের দলও তাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ঠাকুরের বিয়োগাশঙ্কায় অসহায় শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। ঠাকুরের চোখেও জল। তিনি মৃদু স্বরে বললেনঃ "কাঁদিস কেন, শরীর কি চিরকাল থাকবে?"[১৩]

কলকাতার জনবহুল, দমবন্ধ করা পরিবেশে ঠাকুরের স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্ভব নয় মনে করে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শে ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর শেষ লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। এ-স্থানের পরিবেশ অনেক প্রশান্ত, জনবিরল ও উন্মুক্ত। এখানে ঠাকুর আসেন ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯২ (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫)।

কাশীপুর বাগানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। বলেছেনঃ "কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।"[১৪]

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে পা রেখেই ঠাকুর নিজে মেতে উঠলেন খেলাঘর ভাঙার খেলায়। আর নরেন্দ্র (স্বামীজী), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ) প্রমুখ ত্যাগী ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করলেন জপ, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতি বিবিধ ঈশ্বরীয় সাধনায়। তাঁরা কখনো ছুটে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের সাধনভূমিতে, কখনো বা বুদ্ধগয়ায়। একদিন নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ভগবৎ অনুরাগ তীব্র আকার ধারণ করল। ভাবের ঘোরে 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করতে করতে তিনি বসতবাটীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে থাকলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান তখন লুপ্তপ্রায়। রাত্রি গভীরতর হলে তাঁর কণ্ঠস্বরও যেন উচ্চতর হয়ে উঠল। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর ঠাকুরকে বিচলিত করে তুলল। তাঁর আদেশে কয়েকজন নরেন্দ্রনাথকে জোর করে ধরে তাঁর কাছে আনলে তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেনঃ "হ্যাঁরে, তুই ওরকম কচ্ছিস কেন? ওতে কি হবে? দ্যাখ, তুই এখন যেমন কচ্ছিস, এমনি বারোটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি বাবা!"[১৫]

ঠাকুরের কথাবার্তায় সবসময়েই বিদায়ের ব্যঞ্জনা। কখনো বলেনঃ "লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি। এক-একবার মনে হয়, কাকে আর বলব।" আবার একসময় বলেনঃ "দেখলাম, সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে। আর আর কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না। আচ্ছা, ঐ নিরাকারে ঝোঁক—ওটা কেবল লয় হবার জন্য, না?" ভক্তগণ শুনে অবাক হয়ে যান।

১৪ মার্চ ১৮৮৬। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেবকগণ ঠাকুরের কাছে আছেন। তাঁর কষ্ট দেখলে পাষাণ বিগলিত হয়। তিনি মাস্টারমশায়কে অতিকষ্টে আস্তে আস্তে বলছেনঃ "তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি। সব্বাই যদি বল যে—'এত কষ্ট, তবে দেহ যাক', তাহলে দেহ যায়।" পরদিন আবার মাস্টারমশায়ের দিকে চেয়ে বলছেনঃ "কি দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন; মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন। যেমন একবার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু—সব মোমের, সব এক জিনিসে তয়েরি।" "দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ হয়েছে।"

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হয়ে ঠাকুরের কথা শুনছেন। তিনি বলে যাচ্ছেনঃ "শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকেদের চৈতন্য হতো। তা রাখবে না।—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যান-জপ নাই।" ভক্তদের গুহ্যকথা শোনাচ্ছেন ঠাকুরঃ "এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?" ভক্তেরা চুপ করে আছেন। ঠাকুর বলে চলেছেনঃ "কাকেই বা বলব, কেই বা বুঝবে। তিনি মানুষ

হয়ে—অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।”

সুযোগ পেয়ে রাখাল বললেন ঃ “তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।” ঠাকুর শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর পূর্বকথার জের টেনে বললেন ঃ “বাউলের দল হঠাৎ এল, নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল। এল—গেল, কেউ চিনলে না।”[১৬]

আপন সন্ন্যাসী শিষ্যদের দিয়ে একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ত্যাগী যুবকদের দক্ষিণেশ্বরে এসে মিলিত হওয়ার সময় থেকে। দক্ষিণেশ্বরেই এই সঙ্ঘের বীজ উপ্ত হয় এবং শ্যামপুকুরে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হয়। কাশীপুরে এই শিশু সঙ্ঘ-তরুটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে বিশাল মহীরুহে পরিণত করার সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন তিনি অল্পকাল মধ্যেই। এই সঙ্ঘের সাংগঠনিক সকল দায়িত্ব অর্পিত হলো নরেন্দ্রনাথের ওপর। তিনি ছিলেন দেহে ও মনে অপর সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ। তাঁর ইচ্ছা ছিল ব্রহ্মবিদ্ শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয়দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকবেন, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাবেন। একথা শুনে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের আর ‘শুকদেব’ হওয়া হলো না, যদিও ঠাকুর তাঁর নির্বিকল্প সমাধিলাভের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সর্বময় কর্তারূপে চিহ্নিত হলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তার সর্বময়ী চালিকাশক্তি হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ‘শক্তি’ শ্রীশ্রীমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরের কাজটি ছিল ‘ভার সমর্পণ’। দেশে ও বিদেশে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের লিখিত ‘চাপরাস’ তিনি তুলে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের হাতে। দয়াঘন শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নিবিষ্ট মনে লেখেন ঃ “জয় রাধে পৃমমেহি (প্রেমময়ী), নরেন শিক্ষে দিবে জখন (যখন) ঘুরে বহিরে (বাহিরে) হাক (হাঁক) দিবে [।] জয় রাধে”। সঙ্গে এঁকে দিলেন একটি মানুষের মুখাবয়ব এবং ময়ুরের চিত্র।

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে ঠাকুর তাঁর হাতে কাগজটা তুলে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করে বললেন ঃ “আমি ওসব পারব না।” শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ “তোর ঘাড় করবে।”[১৭] সেদিন নরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করলেও পরে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায় ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন এবং

প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করে।

দেহরক্ষার দুদিন আগে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একান্তে বললেনঃ "দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ওপর পর্বত-প্রমাণ বোঝা যেমন চাপিয়েছেন, তেমনি সেই বোঝা বহনের শক্তিও তাঁর মধ্যে সঞ্চার করে গেছেন। এপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বলেছেনঃ "ঠাকুরের দেহ যাবার তিন-চারদিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাকলেন। আর সামনে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shock-এর মতো এসে আমার শরীরে ঢুকছে। ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্যচেতনা হলো, দেখি ঠাকুর কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর সস্নেহে বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।' "[১৯]

আপন ইষ্টপথের সহায়িকা শ্রীমা সারদাদেবীর ওপরেও শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুদায় অর্পণ করেছিলেন। প্রথম দায় প্রসঙ্গে শ্রীমা নিজে বলেছেনঃ "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[২০] দ্বিতীয় দায় জীবোদ্ধার। একদিন ঠাকুর নীরবে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে তিনি বললেনঃ "কি বলবে, বলই না।" ঠাকুর অনেকটা অনুযোগের সুরেই বললেনঃ "হ্যাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের দেহ দেখিয়ে) এ-ই সব করবে?" শ্রীমা বললেনঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?" ঠাকুর উত্তর দিলেনঃ "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে। দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"[২১]

শ্রীমা দেখেছিলেন দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর অতন্দ্রভাবে—শুধু কলকাতার নয়, আরো বৃহৎ প্রেক্ষাপটে 'অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে' এমন অসংখ্য মানুষকে।

করণীয় কাজ যা ছিল, তা সবই সমাপ্ত। এবার নির্ভাবনায় হঠাৎ আসা বাউলের 'হঠাৎ চলে যাওয়া'। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার আসর যে শীঘ্রই ভেঙে যাবে তা কমবেশি সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছিল। তাই এক নিবিড় আশঙ্কার কালো ছায়া ঘনীভূত হয়েছে উদ্যানবাটীর সর্বত্র। "কান পাতলেই শোনা যায় বিদায়ের করুণ রাগিণী।" লীলার শেষ দিনে সকালে ঠাকুর সেবক যোগীনকে (স্বামী যোগানন্দ) ডেকে বলেন পাঁজি থেকে পড়ে শোনাতে। তিনি ঠাকুরের কথামতো শ্রাবণ মাসের শেষাংশ পাঠ করতে থাকেন। ঠাকুর শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনটি বিস্তারিতভাবে পড়তে বলেন এবং এদিনের বিবরণী শুনেই যোগীনকে থামতে বলেন। ইচ্ছামৃত্যু ঠাকুরের আচরণে যোগীন হতবাক হয়ে যান। ঐদিন ঠাকুরকে বলতে শোনা যায়ঃ "দেখছি পারার হ্রদ, তার মধ্যে আমি একটি ছোট সীসের পুতুল।"[২২]

এর আগে একদিন সেবক শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঠাকুর বলেছিলেন, তাঁর দেহ-কলসটি সাগরের জলে ভেসে চলেছে, তার দুই-তৃতীয়াংশ জলে ভরে রয়েছে, বাকিটাও শীঘ্র ভরে যাবে; তখন সমস্ত কলসিটাই সাগরের জলে টুপ করে ডুবে যাবে।[২৩]

(৪)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র মানবলীলায় যিনি পূর্বাপর অন্তরালবর্তিনী হয়েই থেকেছিলেন, সেই শ্রীমা সারদাদেবীকে কয়েক বছর আগেই দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুর বলেছিলেনঃ "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।"

উক্ত ঘটনাগুলি একে একে সবই ঘটে গেছে এবং শ্রীমায়ের মনে আকাশেও আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে 'হত্যা' দিতে। ফল কিছু হয়নি। স্বপ্নে দেখলেন, মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করে জানলেন, ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছে বলে তাঁর গলাতেও ঘা, তাই ঘাড় কাত।[২৪] এর পরে আশার শেষ আলোটিও নিভে গেল।

রবিবার, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩ (১৫ আগস্ট ১৮৮৬)। রাত্রে সামান্য পথ্যগ্রহণের পর ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ। তখনো ঠাকুর তাঁকে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। বারবার বললেনঃ "এসব ছেলেদের তুই দেখিস।" ঠাকুরকে প্রসন্ন দেখে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ঘুমোবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনবার 'কালী' নাম উচ্চারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন হলেন।

গভীর রাত্রে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্থূলশরীর পরিত্যাগ করে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। পুঁথিকার অপূর্ব ভাষায় লিখেছেনঃ

> "সরাটে বিগ্রহ দেহে আছিল আলয়।
> এখন হইল সৃষ্টি রামকৃষ্ণময়।।"[২৫]

শ্রীশ্রীমা কিছুদিন পর সহসা তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। শুনলেন, ঠাকুর বলছেনঃ "এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এ ঘর, আর ও ঘর।"[২৬] ❑

তথ্যসূচী

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় খণ্ড, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ২১শ সং, পৃঃ ১৩৫
২ ঐ
৩ ঐ, পৃঃ ১৪৩
৪ ঐ, পৃঃ ১৪৯
৫ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ [৩]
৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, পৃঃ ১১১৫
৭ অন্ত্যলীলা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩০৬
৮ ঐ
৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৭৮
১০ কথামৃত, পৃঃ ১০৪৮
১১ অন্ত্যলীলা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৫১-১৫২
১২ ঐ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৫
১৩ ঐ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২
১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), ৮ম সং, পৃঃ ২৩৯
১৫ অন্ত্যলীলা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩-৮৫
১৬ কথামৃত, পৃঃ ১১১৩-১১১৪ ও ১১২৩-১১২৫
১৭ অন্ত্যলীলা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৩-১৬৪
১৮ ঐ, পৃঃ ৩১৪
১৯ ঐ, পৃঃ ৩১৩-৩১৪
২০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২৯৫
২১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৯৫-৯৬
২২ অন্ত্যলীলা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৭
২৩ ঐ, পৃঃ ৩১৮
২৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২১৭
২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, ১১শ সং, পৃঃ ৬৩১
২৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৮ম সং, পৃঃ ১৩৫

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

শ্রীশ্রীমা স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থান হুগলি জেলার আঁটপুরে দুবার পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম যান ১৮৮৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, শ্রীম প্রমুখের সঙ্গে। সেবার তিনি আনুমানিক সাতদিন ছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি আঁটপুরে আসেন ১৮৯৪ সালে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রেমানন্দ-জননী মাতঙ্গিনী দেবীর আমন্ত্রণে। পরবর্তী কালে প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই আঁটপুরেই আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬। সেদিন রাত্রে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সকলে মিলে শুকনো ডালপালা যোগাড় করে ধুনী প্রজ্বলন করেছিলেন। যিশুর ত্যাগ-বৈরাগ্য-পরার্থপরতার কথা বলতে গিয়ে ক্রমে তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের প্রসঙ্গ উঠেছিল। নরেন্দ্রনাথের আটজন গুরুভাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্তরের জ্বলন্ত বৈরাগ্যাগ্নি এবং বাইরের ধুনীর প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে সেদিন তাঁরা সঙ্কল্প করেছিলেন, ভগবান যিশুর ত্যাগী শিষ্যদের মতো তাঁরাও সংসার ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী দিকে দিকে প্রচার করবেন। সেই ধুনীস্থলের স্মৃতিমণ্ডপ প্রচ্ছদের ডানদিকে মধ্যস্থলে দেখা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীমা যে-ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের মেরামতির কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। কলির মহাতীর্থ সেই ঘর ও বাড়িটির একাংশ প্রচ্ছদের ডানদিকে ওপরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাঁদিকে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের টেরাকোটার কাজ। এই মন্দিরে স্বামী প্রেমানন্দের মাতুলালয়ের আদি গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের নিত্যপূজা এখনো হয়ে থাকে।

নীলমণি শান্তিধাম

নির্মলকুমার রায়

> শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার সপ্তম পর্যায়ে 'নীলমণি শান্তিধাম'।
>
> —সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের কিছুদিন বাসের জন্য উত্তর কলকাতার বাগবাজার স্ট্রিটে একটি বাড়ি [বর্তমানে 'নীলমণি শান্তিধাম', ২/১ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩] ভাড়া করা হয়েছিল এবং সেখানে শ্রীশ্রীমা প্রায় একবছর অবস্থান করেছিলেন। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের থাকাকালীন পদ্মবিনোদের আগমন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানধন্য 'নীলমণি শান্তিধাম'

• আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা বিনোদবিহারী সোম ছিলেন মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্কুলের ছাত্র। প্রথম জীবনে তিনি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং ঈশ্বরচিন্তা করে তাঁর মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হতো। ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পরে তিনি বিবাহ করলেও সংসার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারে যোগদান করে সু-অভিনয়ের জন্য তিনি 'পদ্মবিনোদ' আখ্যা পান; কিন্তু সঙ্গদোষে তিনি প্রচণ্ড মদ্যপায়ী হয়ে ওঠায় অচিরেই তাঁর পতন হয়। শেষজীবনে তিনি কঠিন উদরীরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানে শেষমুহূর্তে তিনি পুনরায় ঠাকুরকে স্মরণ করে 'কথামৃত' শুনতে চান। অন্তিমকালে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে এবং 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে করতে ভক্ত পদ্মবিনোদ তথা বিনোদবিহারী সোম দেহত্যাগ করেন।

বিনোদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার নিদর্শন 'কথামৃত'-এ পাওয়া যায়—"বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাস্টারকে বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাস্টারের স্কুলে পড়িতেন। বিনোদের ঈশ্বরচিন্তা করে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসেন।"[১]

* * *

বাগবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত 'নীলমণি শান্তিধাম'-এ শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থান এবং সেখানে পদ্মবিনোদের আগমন সম্পর্কে জানা যায়—"স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থানুযায়ী ১৯০৪ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় এক বছর শ্রীমা ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে ('নীলমণি শান্তিধাম') অবস্থান করেন। এই সময়ে শ্রীমা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অনেককে নিয়ে এখানে ছিলেন। এখান থেকে তিনি পুরী যান নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ। তিনি এই বাড়িতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন ১৯০৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ।"[২]

বাগবাজার স্ট্রিটের এই বাড়িতে শ্রীমা থাকাকালীন বিনোদবিহারী সোম (পদ্মবিনোদ) আসতেন। স্বামী সারদানন্দকে তিনি 'দোস্ত' বলতেন। পদ্মবিনোদ একদিন গভীর রাত্রে উপস্থিত। বারকয়েক 'দোস্ত' 'দোস্ত' বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে গান ধরলেন—

"উঠ গো করুণাময়ি, খোল গো কুটিরদ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
তারস্বরে ডাকিতেছি, তারা তোমায় কতবার।
দয়াময়ী হয়ে আজি, এ কী কর ব্যবহার॥

সন্তানে রেখে বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে।
'মা' 'মা' বলে ডেকে মোর হলো অস্থিচর্মসার॥"

গান শেষ হতে পদ্মবিনোদ দেখলেন, মা জানলা খুলে সেখানে দাঁড়িয়েছেন। মাকে দেখে পদ্মবিনোদ বলে উঠলেন—"উঠেছ, মা? ছেলের ডাক শুনেছ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" বলে আনন্দে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তারপর গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন—

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

আখর দিচ্ছেন—"আমি দেখি, দোস্ত না দেখে।"

পরদিন মা সব শুনে বললেনঃ "দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে।"

পরদিন ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পদ্মবিনোদের নামে অভিযোগ করলে তিনি বলেছিলেনঃ "ওর ডাকে যে থাকতে পারি নে।" এর অল্পদিন পরেই পদ্মবিনোদের দেহান্ত হয়। সে-সংবাদ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পৌঁছালে তিনি বলেছিলেনঃ "তা হবে না? ঠাকুরের ছেলে যে। কাদা মেখেছিল, এখন যাঁর ছেলে তাঁরই কোলে গেছে।"[৩]

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবিজড়িত এই দোতলা বাড়িটি বেশ পুরনো। এখানে এসে অনুসন্ধানে জানা যায়, এই বাড়িটি পরবর্তী কালে কুমারটুলী-নিবাসী নীলমণি লাহা (বর্তমানে প্রয়াত) কিনেছিলেন। তাঁর নাম ও তাঁর স্ত্রী শান্তিদেবীর নাম একত্র যুক্ত করে এই বাড়ির নামকরণ হয় 'নীলমণি শান্তিধাম'—যা একটি পাথরের ফলকে বাড়ির প্রবেশদ্বারের ওপরের দেওয়ালে লেখা আছে। বর্তমানে কিছু ভাড়াটিয়া-সহ নীলমণিবাবুর পরিবারের ব্যক্তিরা এই বাড়িতে বাস করেন। ❑

পথনির্দেশঃ 'নীলমণি শান্তিধাম'-এর ঠিকানাঃ ২/১ বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩। বাগবাজারে 'গিরিশ মঞ্চ'-এর পশ্চিমদিকে 'হরনাথ হাইস্কুল', তার ঠিক বিপরীত ফুটপাথেই 'নীলমণি শান্তিধাম'।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৩।১৪
২ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ৬৪৩
৩ দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ১৬২-১৬৩

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমা সারদাদেবীর ১৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যা আগামী জানুয়ারি ২০০৪-এ প্রকাশিত হবে। প্রায় ২২৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে থাকবে মননশীল সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ্, ঐতিহাসিক এবং প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিশ্লেষণমূলক রচনাবলী। আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে বিশেষ আদরণীয় হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ৫০ টাকা। যাঁরা ইচ্ছুক, উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করলে ৩০ নভেম্বর ২০০৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা পাঠাবেন, স্মারক পত্রিকাটি তাঁদের জন্য মাত্র ৩৫ টাকায় দেওয়া হবে। যাঁরা ডাকযোগে নিতে চান, তাঁরা ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ২৫ টাকা, অর্থাৎ ৬০ (৩৫+২৫) টাকা পাঠাবেন। সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ ছাপানো হবে। সুতরাং গ্রন্থটির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পুরো টাকা পাঠিয়ে সত্বর আপনার নাম নথিভুক্ত করুন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবায়ন

স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী দুটি প্রধান পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে—এক, ভারতের সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর মতামত এবং দুই, দেশগড়ার কাজে তাঁর শিক্ষা ও পথনির্দেশ। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে, এই শতাব্দীকে তাই বাংলার রেনেশাঁসের কাল বলে আখ্যায়িত করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ভারতের সামগ্রিক মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু তার আশানুরূপ স্থান করে নিতে পারেনি। প্রশ্ন ওঠে—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কি তাঁদের চিন্তাধারা প্রয়োগে ঘাটতি দেখা গেছে? বর্তমান প্রবন্ধে স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাগুলির মূল সুরটির অনুসন্ধান এবং সেইসঙ্গে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। উত্তাল তরঙ্গের মতো ভারতের জনসাধারণ জেগে উঠল তাঁকে স্বাগত জানাতে। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে তাঁর ধর্মপ্রচার, বজ্রনির্ঘোষে ভারতের মর্মবাণী প্রচার তখন চারিদিকে অভিনন্দিত হচ্ছে। সেই বছর ১ মে কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু ভক্ত মিলিত হলেন তাঁর আহ্বানে। সেখানে স্বামীজী প্রস্তাব রাখলেন—"মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেইসকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।"[১]

পূর্ণতার প্রকাশ

স্বামীজীর লোকহিতের ধারণা তাই ধর্মের প্রচলিত গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবকল্যাণের বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত, স্বামীজীর 'শিক্ষা' সম্পর্কিত ধারণাবলীর সঙ্গে তাঁর 'ধর্ম' বিষয়ক চিন্তারাজির অনেকদিকেই মিল রয়েছে। তাঁর মতে, ধর্ম হলো মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, আর শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের অজ্ঞানের পর্দাকে সরিয়ে দেয়, তখনি তার ভিতরের সুপ্ত জ্ঞানরাজি শতধারে বিকশিত হয়। তাহলে শিক্ষকের কাজ কি? শিক্ষক ছাত্রকে হাত ধরে জ্ঞানের পথে নিয়ে চলেন তাকে পথের বাধা-বিপত্তি থেকে বাঁচিয়ে। একটি বীজ পরিণত হয় মহীরুহে—পারিপার্শ্বিক উপকরণের সাহায্যে। কিন্তু মহীরুহের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে থাকে সেই বীজে, বাহ্য কারণগুলি সেখানে সহায়ক মাত্র। একইভাবে, চারিদিকের নানা পুস্তকে ও গ্রন্থাগারে ছড়ানো রয়েছে জ্ঞানের নানা উপকরণ। আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠলেই ছাত্ররা এগুলি তাদের জীবনে ব্যবহার করতে পারে—চারিদিকের প্রকৃতি ও তথ্যভাণ্ডার থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে তাই স্বামীজী বারেবারেই ছাত্রদের মন তৈরি করার দিকে নজর দিতে বলেছেন। মনই সেই যন্ত্র, যার সাহায্যে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার ছাত্রের অন্তরে প্রবেশ করে; তাই এই যন্ত্রটিকে উপযুক্তভাবে তৈরি করা একান্তই আবশ্যক। ছাত্রের জীবনে আত্মসংযম এই কারণে অত্যন্ত জরুরি। প্রকৃত সংযম শরীর-মনের শক্তিকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না, মনে আনে একাগ্রতা। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।" এই আত্মসংযম বৃদ্ধির জন্য চাই পবিত্র জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, বারোবছরের অটুট ব্রহ্মচর্য মানুষের একটি বিশেষ নাড়ি খুলে দেয়। এই 'মেধা নাড়ি' খুলে গেলে মন শীঘ্র একাগ্র হয়, সব জ্ঞান অনায়াসে করায়ত্ত হয়ে যায়। সূর্যের আলোক যেমন আতস কাঁচের সাহায্যে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করলে তাতে তীব্র উত্তাপ সৃষ্টি হয়, মনকে সেইভাবে একমুখী করতে পারলে তাতে প্রচণ্ড শক্তি জন্মায়।

মনঃসংযম

তবে একদিনে এই সংযম আসে না। এর জন্য দরকার নিরন্তর অভ্যাস ও সদসদ্ বিচার। মনের বহির্মুখী বৃত্তি বারেবারেই তাকে কক্ষচ্যুত করে বাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় তাকে আবার উদ্দিষ্ট বিষয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। অনাবশ্যক, ক্ষতিকর বিষয়ের চিন্তা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। একটি বিশেষ ক্ষণে মনে নানাবিধ চিন্তার ঢেউ ওঠে—কোনগুলি আমাদের জ্ঞাতসারে, কোনগুলি আমাদের অগোচরে। মনঃসংযমের অভ্যাস যত বাড়বে, ততই মন একটি বৃত্তি, একটি চিন্তাকেই অবলম্বন করবে; বাকি সকল বিষয়ের চিন্তা থেকে মন ক্রমশ দূরে সরে আসবে।

জগতে যেকোন সাফল্যের মূলেই আছে মনঃসংযোগ। আবার সচেতনভাবে একাগ্রতা ও মনঃসংযোগের অভ্যাস জ্ঞানার্জনের পদ্ধতিকে সহজ করে তোলে। স্বামীজীর জীবনে একাগ্রতার অদ্ভুত শক্তি দেখা যায়। তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একদিন বেলুড় মঠে এসে দেখেন, নতুন 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' কেনা হয়েছে। বইগুলির কলেবর দেখে তিনি বললেন যে, এত বই একজীবনে পড়া অসম্ভব। স্বামীজী তখন তাঁকে জানান, তিনি নিজে ইতোমধ্যেই বইটির দশ খণ্ড পড়ে শেষ করে একাদশ খণ্ডখানি পড়তে আরম্ভ করেছেন। শিষ্য এই কথা পরখ করে দেখতে লাগলেন—বইগুলি থেকে বেছে বেছে কঠিন বিষয়ে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বামীজী ঐ বিষয়গুলির মর্মার্থ তো বললেনই—এছাড়া স্থানে স্থানে পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করে বলতে লাগলেন। পরীক্ষা করা শেষ হলে স্বামীজী মন্তব্য করেন ঃ "দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।"[২]

সার্বিক সমন্বয়

স্বামীজীর মতে, আদর্শ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়—আদর্শ শিক্ষা হলো হৃদয়, মস্তিষ্ক ও শরীরের সার্বিক সমন্বয়সাধন। একটি বিষয়, একটি সত্য অধিগত হলে কায়মনোবাক্যে তা প্রতিফলিত হওয়া দরকার। স্বামীজী তাই আহ্বান করেছেন কয়েকটি ধ্রুব নীতিকে জীবনে ফলপ্রসূ করার জন্য। একজন একটি গ্রন্থাগারের সমস্ত বই মুখস্থ করে ফেললেও সে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত না হতে পারে। তার তুলনায় পাঁচটি ধ্রুব সত্যকে বেছে নিয়ে সেগুলিকে নিজ জীবনে প্রয়োগ করার জন্য যিনি সর্বান্তঃকরণে প্রয়াসী, তিনি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণ আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, তিনি কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে বাস করেও অল্প কয়েকটি ইংরেজি শব্দ অধিগত করেছিলেন। অথচ তিনি জীবনে যেটি স্থিরভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, তার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর হৃদয়, মস্তিষ্ক ও শরীর—সবকিছু দিয়েই তিনি এই সত্যের লক্ষ্যে ধাবিত হতেন। দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধেও তাঁর 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা' প্রত্যাখ্যান, ভবতারিণী দেবীর মর্মর মূর্তির আরাধনা করতে করতে চিন্ময়ী দেবীর সন্ধানে তাঁর তীব্র সাধনা, মুদ্রার স্পর্শে তাঁর অঙ্গবিকৃতি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই বিশেষ ধারাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত জীবনমুখী—মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামে তা সহায়ক হয়ে উঠবে। দেশে যখন বেকারত্ব প্রবল, তখন মানুষ ছোট-বড় যেকোন ধরনের চাকরি গ্রহণ করে। তার ফলে বহু ক্ষেত্রেই তার দীর্ঘ ছাত্রজীবনে অধীত বিষয়গুলির সঙ্গে চাকরিজীবনের সম্পর্ক থাকে না—বিদ্যাগ্রহণ ডিগ্রিগ্রহণের নামান্তর হয়ে পড়ে। স্বামীজী তেজস্বী ভাষায় শিক্ষার এই নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে আমাদের সাবধান করেছেন—"কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো! যে-বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে-শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সে-ই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এইসব স্কুল-কলেজে পড়ে তোরা কেমন একপ্রকারের একটা dyspeptic জাত তৈরি হচ্ছিস। কেবল machine-এর মতো খাটছিস, আর 'জায়স্ব' 'ম্রিয়স্ব'—এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস।"[৩]

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী চাকরি না করে ব্যবসায়ের পথে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে তাঁকে বলেছেন, ভারতের সামগ্রী নিয়ে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডে বিক্রি করতে। ইংরেজদের প্রবল কর্মতৎপরতার প্রশংসা করে তাদের কাছ থেকে এইগুলি শিখতে বলেছেন। বলেছেন—চাকরি করা অপেক্ষা ব্যবসা মানুষকে সম্মানিত করে, স্বাধীন করে।

উদারীকরণ

বস্তুত, স্বামীজী শিক্ষাকে বরাবরই সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। শিক্ষাই হচ্ছে দেশের যাবতীয় সমস্যার মহৌষধ। অনুগামীদের আহ্বান করে তিনি বলেছেন ঃ "তাই তো বলি, তোরা এই mass-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে

বলগে—'তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ। আমরা তোমাদের ভালবাসি। ঘৃণা করি না।' তোদের এই sympathy পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।"[৪]

পাখি যেমন এক পক্ষের সাহায্যে উড়তে পারে না, সমাজও সেইভাবে নারীজাতির শিক্ষাদান ও উন্নতি ব্যতীত অগ্রসর হতে পারে না। স্বামীজীও তাই বহুবার স্ত্রীশিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—"History repeats itself."[৫] বৈদিক যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীদের মতো প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী নারীরা যখন পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে তর্ক-বিচার করেছেন, বর্তমান যুগে তখন তারা কোনভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে না। 'মনুসংহিতা' থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন ঃ "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।/ যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"—যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দ করেন; কিন্তু যেখানে তাঁরা পূজিতা হন না, সেখানে সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়ে যায়। শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে স্বামীজী একটি স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠা করার কথা ভেবেছেন। মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে তাদের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দুই বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হবে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা মেয়েরা ইচ্ছা করলে সংসারে ফিরে যেতে পারবে, বিদুষী নারীরা ক্রমে বীর পুত্রসন্তানের জননী হবেন। উনবিংশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলছেন ঃ "যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস, ধর্মহীন হলে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে।"[৬] স্ত্রীশিক্ষার কাজেও প্রধানত নারীরাই উদ্যোগী হবে, পুরুষরা নয়; তারাই স্ত্রীশিক্ষা কোন্ খাতে বইলে সঠিক হবে তা নির্ধারণ করবে।

ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিনের উদ্যোগে স্বামীজীর পরিকল্পিত স্ত্রীশিক্ষার পত্তন কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে হয়েছিল। সেই 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'ই পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের প্রধান উৎসস্থল হয়ে ওঠে। স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে স্বামীজীর গভীর চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তাঁর তপস্বিনী মাতা গঙ্গাবাঈ প্রতিষ্ঠিত 'মহাকালী পাঠশালা' পরিদর্শনের সময়। স্বামীজী এই বিদ্যালয়ের সবকটি কক্ষ ঘুরে ছাত্রীদের পাঠপদ্ধতি দেখেন, তাদের মুখে 'রঘুবংশ'-এর সংস্কৃত ব্যাখ্যা শোনেন, ভিজিটার্স বুক-এ স্কুল সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্যও করেন।

প্রতিযোগিতা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গ—প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ। কম বয়স থেকে পাঠ্যগ্রন্থের ভার ছাত্রছাত্রীদের পীড়িত করে, অথচ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক পরীক্ষাব্যবস্থায় এইগুলিকে সমাজ মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতাকে বহুক্ষেত্রেই স্বাগত জানানো হয়—এর সাহায্যে মানুষের প্রতিভা বিকশিত হবে এই বিবেচনায়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর ডারউইন-তত্ত্বের আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই তত্ত্বে নিম্নতর প্রাণী থেকে উচ্চতর প্রাণীর বিবর্তনে জীবনসংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে—যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর কথা। এই তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "Animal kingdom বা নিম্নপ্রাণিজগতে আমরা সত্য সত্যই struggle for existence, survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই।... [কিন্তু] animal kingdom-এর ন্যায় rational human kingdom-এ পরের ধ্বংসসাধন করে progress হতে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution একমাত্র sacrifice দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়।... animal kingdom-এ স্থূলদেহের সংরক্ষণে যে struggle পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle বিপরীত দেখা যায়।"[৭]

কৃষ্টি

বহুগুণসম্পন্ন স্বামীজী স্বয়ং ছিলেন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। পরবর্তী কালে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যেরও পরিচয় পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারতের সংস্কৃতির পর্যালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, ভারতের জাতীয় আদর্শ হলো ধর্ম। বহু শতাব্দী ধরে, নানা লাঞ্ছনা সয়েও ভারতীয় সভ্যতা টিকে আছে ধর্মের অমলিন জ্যোতিকে বক্ষে ধারণ করে। কিন্তু ধর্মের এই চিরন্তন সত্যগুলি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের

মাঝে সংরক্ষিত না রেখে তা ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষা, কলা, কৃষ্টি প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্য দেশগুলি বাহ্যপ্রকৃতিকে অবলম্বন করে বহুধা উন্নতি করেছে—শিল্প, কলাতেও তাই তারা 'nature'-কে অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করেছে। অপরদিকে প্রাচ্যে, ভারতবর্ষে অন্তঃপ্রকৃতিতে হয়েছে নব নব আবিষ্কার—ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হয়েছে উদ্ঘাটিত। শিল্প, কলাতেও তাই 'ideality' বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে মা কালীর মূর্তিতে আবার ঘটেছে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। স্বামীজী তাঁর এই ভাব প্রকাশ করেছেন 'Kali the Mother' কবিতায়। আবার এই ভারতেই ধর্মসমন্বয়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে। স্বামীজী সেটি বিধৃত করেছেন তাঁর আঁকা রামকৃষ্ণ মিশনের শীলমোহরে।

রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে দেশ গড়ার শিক্ষার নানা উপকরণ। কিন্তু তাঁর হাতে গড়া রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি প্রথম থেকেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। দেশগড়ার কাজে তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা কেমন হবে? নাকি তাঁর এই শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাবে সন্ন্যাসীরা ব্যতীত সমাজের গৃহস্থ অনুগামীরা—এই নিয়ে ছিল সংশয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ক্রমে স্বামীজীর অমোঘ যুগান্তকারী বাণীর তাৎপর্য আরো ভালভাবে উন্মোচিত হতে থাকে। দেশগড়ার সেই নব উদ্যোগে সরকারি আহ্বানে সাড়া দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন একটি একটি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে—প্রচলিত পাঠক্রম ও বুনিয়াদি শিক্ষা দুই-ই অনুসরণ করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে হলে পশ্চিমবঙ্গের অধুনা বর্তমান মিশনের প্রায় পনেরোটি বিদ্যালয়, সাতটি মহাবিদ্যালয় প্রভৃতির দিকে তাকাতে হবে। এগুলির মধ্যে কয়েকটিতে আবাসিক পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়েছে। কারণ, স্বামীজী এরূপ গুরুকুল প্রথায় শিক্ষা বিতরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা সেখানে অন্যান্য গৃহস্থ শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে ছাত্রদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দুই বিষয়েই সেখানে শিক্ষাদান করা হয়। প্রচলিত বিষয়ের পাঠের সঙ্গে ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচিত হয় ভারতের সনাতন কৃষ্টি ও ধর্মের সঙ্গে। প্রার্থনাকক্ষের শান্ত পরিবেশে নিজেদের মনকে একাগ্র করে তারা। সেই কারণে পড়াশোনা, খেলাধুলা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আসে সামগ্রিক উৎকর্ষ। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা নিজেদের সমস্ত বৌদ্ধিক ও মানসিক প্রয়াস আহুতি দেন ছাত্র-নারায়ণের সেবাযজ্ঞে; শিক্ষাদান তখন হয়ে ওঠে পূজা—নিছক কর্ম থেকে অনেক ঊর্ধ্বে যার অবস্থান।

উপসংহার

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সেই জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সন্ধিক্ষণেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। স্বামীজী কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বিসর্জন দিতে বলেননি; তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনমানসে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত এই মেলবন্ধনকে অনেকেই স্বপ্নবিলাস বলে মনে করেছিলেন। এই নতুন সহস্রাব্দে কিন্তু পুনরায় ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের চর্চা বেড়েছে। মানুষ চাইছে তাদের শিকড়ের সন্ধান করতে, নিজেদের পূর্বসূরিদের শ্রদ্ধা জানাতে। স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাগুলি তাই দেশগড়ার এক উৎকৃষ্ট উপাদান, যা এই বর্তমান যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১০০ বছরেরও আগে স্বামীজী কল্পনা করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরিদের—"আমি চাই A band of young Bengal, এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞা-অনুবর্তী যুবকগণের ওপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea-সকল যারা work out করে আমাদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে।"[৮] তাঁর শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেরিয়ে আসুক 'A band of young Bengal'—এ আমাদের সকলের প্রার্থনা। ❑

তথ্যসূচী

(১) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৭
(২) ঐ, পৃঃ ২১৩
(৩) ঐ, পৃঃ ১১৭
(৪) ঐ, পৃঃ ১১৮
(৫) ঐ, পৃঃ ১০৭
(৬) ঐ, পৃঃ ২০৯
(৭) ঐ, পৃঃ ১৩১
(৮) ঐ, পৃঃ ২২০

এই নিবন্ধটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক-পৌষ ১৪০৯ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) সংখ্যায় এই আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। গত আষাঢ় ১৪১০ সংখ্যায় শুরু হয়েছে এই আলোচনার শেষাংশ।

■ বুদ্ধগয়ায় মতান্তর

বুদ্ধগয়ায় শৈব মোহন্তের পক্ষে বুদ্ধিজীবী মহলকে নিয়ে আসার এবং সেই সূত্রে জনমত গঠনের যে-পরিকল্পনা নিবেদিতা নিয়েছিলেন তা খেয়ালে রাখলে স্বীকার করতেই হবে, দলের সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি মোটেও বাস্তববোধের পরিচয় দিতে পারেননি। হয়তো এই নির্বাচন শেষপর্যন্ত ঠিক তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিলও না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগত সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে অন্তরায় হয়েছিল।

এর পিছনে কারণ রয়েছে বেশ কয়েকটি। প্রথমত, 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পালের মতে—"অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ধর্মপাল একাধিকবার মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনুমান করা যায়, বুদ্ধগয়ায় মন্দির নিয়ে বৌদ্ধ-হিন্দু বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল বৌদ্ধদের প্রতি।"[২৭] দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজ এবং বিশেষত ঠাকুর পরিবারে বৌদ্ধধর্মের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসন বহু আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সিংহল ভ্রমণে যান কেশবচন্দ্র সেন ও পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই বাংলাদেশে নতুন করে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের চর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্র-মানস গঠনে বৌদ্ধ প্রভাবের যে-প্রতিফলন, তার মূলে রয়েছে তাঁর পারিবারিক পরিবেশের এক বিরাট প্রভাব।[২৮] তৃতীয়ত, ওকাকুরা বুদ্ধগয়ায় একটি জাপানি কেন্দ্র গড়তে চাইলে পালামৌ জেলার তদানীন্তন ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২?) লিখেছিলেন ঃ "ইতিমধ্যে মোহন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে বলে গবর্মেন্টের অনুমতি ব্যতীত সে জমি দিতে পারে না। তুমি তাকে একটু বিশেষ রকম তাগিদ দিতে পার না?"[২৯] অর্থাৎ মোহন্তের প্রতি বিরাগ বেশ কিছুকাল আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে শিকড় গেড়ে আছে। অবশ্য এই চিঠি লেখার সময় নিবেদিতাও ছিলেন ওকাকুরার সমর্থক। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁর সেই মোহ ভঙ্গ হয়।

যাই হোক, নিবেদিতার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজস্ব দল এই ভ্রমণে সামিল হওয়ায় নিবেদিতার উদ্দেশ্য তো সাধিত হলোই না, বরং তাঁদের পারস্পরিক অসূয়ার এক অনভিপ্রেত মঞ্চ তৈরি হলো বুদ্ধগয়ায়।

এই দলে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবেদিতার অনভিজ্ঞতা তো অবশ্যই দায়ী, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, জগদীশচন্দ্র তাঁকে আগাম সতর্ক করে দিলে তা নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রতিই তাঁর যথার্থ বন্ধুকৃত্য হতো। অথচ পরিতাপের বিষয়, সে-চেষ্টা তো দূরের কথা, রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ সঠিক হলে জগদীশচন্দ্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন—"১৯০৪ সাল হবে। জগদীশচন্দ্র, শ্রীমতী অবলা বসু ও ভগিনী নিবেদিতা-সহ বুদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন; পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমশ দলটি বেশ বড় হয়ে গেল।"[৩০]

এমনিতে ব্যক্তি মোহন্তের বিরুদ্ধে অবশ্য কোন বিরূপতা কারো ছিল না। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁকে 'সৎস্বভাব, সুপণ্ডিত' হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর আপ্যায়নও যথাযথ। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ—"মোহন্ত তাঁর অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল, তাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয়নি, উত্তম দুধ, ঘি, ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সবসময়েই প্রস্তুত। যখনি ফাঁক পেতুম, উঠোনে বৃহৎ ইঁদারা ছিল, তার ভিতর নেমে গিয়ে বসে থাকতুম। এরকম ইঁদারা ইতিপূর্বে দেখিনি। ইঁদারার বাইরের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ির মতো গ্যালারি নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। তার মাঝে মাঝে জানলা আছে। গরমের দিনে সেখানে বসে বড় আরাম।"[৩১]

রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' থেকে আরেকটি প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণ উদ্ধৃত করা যাক ঃ "মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানি তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন; আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি! কী গভীর তাঁদের ভক্তি! ইষ্টপূজার কী অনাড়ম্বর প্রণালী! অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে মোহন্তের পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলুম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এঁদের মধ্যে কার পূজা খুশি

হয়ে গ্রহণ করলেন? মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারো আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল।...

"বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিনদিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল! বড় দুঃখ যে তার আজ কোন অনুলিপি নেই। সেই অল্প বয়সে বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য বা বয়স্কদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। না থাকলেও এই তীর্থস্থানে দুর্লভ সৎসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।"[৩২]

জাপানি ভক্ত ও মোহন্তের ধর্মাচরণের পার্থক্য সম্বন্ধে নবীন রথীন্দ্রনাথ যে-মন্তব্য করেছেন, তার পিছনে তাঁর অনাড়ম্বর ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের আশৈশব অভিজ্ঞতা হয়তো একটা কারণ। আবার পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের তিনি প্রতিধ্বনি করছেন—এমনটা ভাবাও অযৌক্তিক নয় এবং সে-সম্ভাবনার কথা খেয়ালে রাখলে বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতা গল্প-আলোচনা-পরামর্শ এবং সর্বোপরি তর্ক-বিতর্ক লিপিবদ্ধ না থাকার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়।

এই ভ্রমণ সম্পর্কে অপর যে দুজনের বর্ণনা আমরা পেয়েছি, সেই যদুনাথ সরকারের স্মৃতিচারণ[৩৩] এবং ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি[৩৪]—তার কোনটিতেই এমন সরাসরি তর্ক-বিতর্কের কোন উল্লেখ নেই। হয়তো স্বাভাবিক সৌজন্যের খাতিরেই।

তাঁদের দুজনের বর্ণনা মিলিয়ে সেই দিন চারেক তাঁরা কিভাবে কাটিয়েছিলেন তার একটা আভাস পাওয়া যায়। সকালে সূর্যের আলো ফোটার আগে তাঁরা বোধিবৃক্ষতলে নীরব ধ্যানে উপবিষ্ট হতেন। তারপর সকাল ছটায় চা-পান শেষ করে চওড়া বারান্দায় সবাই জমায়েত হতেন। এই সময় রোজই পড়া হতো ওয়ারেনের 'Buddism in Translations', তাছাড়া মাঝে মাঝে এডুইন আর্ণল্ডের 'Light of Asia' বা নিবেদিতার 'Web of Indian Life'। রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতা ও গান শোনাতেন। সকাল-বিকালে মন্দির-প্রাঙ্গণ বা কাছাকাছি কোন গ্রামে ঘোরা হতো। একদিন বিকালে তাঁরা গিয়েছিলেন 'উরবেল' (বুদ্ধদেবের আমলে 'উরুবিল্ব') গ্রামে। সুজাতা ছিলেন এই গ্রামেরই প্রধানের মেয়ে। সারাদিনই নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো।

কোন সন্দেহ নেই, এই আলোচনার সূত্রেই নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে তর্ক বাধত এবং মতভেদ স্পষ্ট হয়ে যেত। সম্ভবত এই মতভেদের কারণেই বুদ্ধগয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ, সামাজিকতা ও আন্তরিকতা নিবেদিতাকে স্পর্শ করলেও তিনি নির্দ্বিধায় ম্যাকলাউডকে পূর্বোক্ত চিঠিতে লিখে দেন: "But for all this, Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me."

কিন্তু সেবিষয়ে যাওয়ার আগে অন্য আরেকটি বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। তা হলো মোহন্তের প্রসঙ্গ। তাঁর আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করা হলেও এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা —সেকথা কিন্তু কোন বিবরণী পড়েই বোঝার উপায় নেই। নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির আলোচনায় মোহন্ত যোগ দিতেন কিনা অথবা কী ভূমিকা নিতেন, সেকথা কেউই উল্লেখ করেননি।

বরং যদুনাথ সরকার মনে রেখেছেন অতিথিশালার স্বল্পমেয়াদী এক আবাসিককে। দরিদ্র জাপানি জেলে ফুজি। তাঁর বহু বছরের শ্রমলব্ধ অর্থ জমিয়ে জমিয়ে তিনি এই পুণ্যভূমিতে আসার সংস্থান জোগাড় করেছেন। প্রতি সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের নিচে প্রার্থনায় বসে তিনি যখন আবৃত্তি করতেন—'নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গৌতম চন্দ্রিকায়...' তখন এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হতো। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, পরে 'নটীর পূজা' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় মনে পড়েছিল সেই পরিবেশের কথা—শ্রীমতীর প্রার্থনা হিসাবে তিনি তাই এই স্তোত্রটিই ব্যবহার করেছিলেন।

বুদ্ধগয়ায় তাঁদের কেমন আলোচনা হতো সেপ্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন: "ভারতীয় শাস্ত্র, শিল্প এবং লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হতাম। সেসকলের উচ্চপ্রশংসা করতেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য কবিরও নিজস্ব সুন্দর প্রকাশভঙ্গি ছিল। কিন্তু তিনি বলতেন, বস্তুর একেবারে মর্মে গিয়ে প্রবেশের ক্ষমতা আছে নিবেদিতার। আর সেগুলিকে অপূর্বভাবে তুলে ধরতেও তিনি পারতেন।"[৩৫]

তাঁদের আলোচিত অন্য কয়েকটি বিষয়ের কথা নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে জানিয়েছেন: "We talked History, Nationality, Swamiji, Sri Ramakrishna and the rest."[৩৬] কোন সন্দেহ নেই, এই বিষয়গুলির প্রায় প্রতিটির প্রসঙ্গে নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দর্শনে বিশ্বাসী, ভিন্ন মেরুর অধিবাসী। স্যার যদুনাথ সরকার এক সান্ধ্যরাত্রির বর্ণনায় নিবেদিতার যে-বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন সেসম্পর্কেও এই একই আশঙ্কা। তিনি নিবেদিতাকে স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত

করেছেন ঃ "বৌদ্ধধর্ম আদিতে কোন নূতন ধর্ম ছিল না। বুদ্ধ একজন বিরাট হিন্দু আচার্য ছিলেন, যদিও সমসাময়িক সাধুদের তুলনায় পবিত্রতর, শ্রেষ্ঠতর। তাঁর অনুগামীরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাঁরা নিজেদের নূতন ধর্মের মানুষ মনে করতেন না, তাঁরা হিন্দু কিন্তু আশপাশের মানুষ অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ, অধিক বিশ্বাসী হিন্দু। সারা বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম জীবন্ত ছিল, যদিও বৌদ্ধ-লেখকেরা নীরব থেকেছেন সেবিষয়ে।... হিন্দুদের পীড়নে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে—একথা আমার কাছে মিথ্যা ইতিহাস মনে হয়। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যেধরনের শত্রুতা, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সে-শত্রুতা ছিল না। অধ্যাপক সিসিল বেণ্ডাল নেপালি পুঁথি থেকে দেখিয়েছেন, উত্তর ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধরা সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করত এবং বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—অধ্যাপকের এই কথা শুনে আমার কী যে আনন্দ হয়েছিল কি বলব।"[৩৭]

কিন্তু নিবেদিতার এই যুক্তিজাল বিস্তারের আনন্দ যে রবীন্দ্রনাথকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারবে না, তা নিবেদিতাও অনতিকাল মধ্যেই নিশ্চয় বুঝে যান এবং তাতেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধগয়া ভ্রমণের তাঁর সব উদ্দেশ্যই মূলত ব্যর্থ হয়েছে।

বুদ্ধগয়া ছেড়ে আসার আগের রাত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় স্যার যদুনাথ সরকারের স্মৃতিকথা থেকে—"বুদ্ধগয়া ত্যাগের সময় এলে সারারাত্রি নিজের ঘরে নিবেদিতা ভেঙে পড়ে কেঁদেছিলেন, 'ব্যর্থ হয়েছি আমরা; দেশের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি; এখনো জীবনসঞ্চার হয়নি তাতে। কিছু করতে পারিনি—না—কিছু না—। ভারতের আত্মা, যা একদিন তাকে পৃথিবীর দীপ করেছিল—এশিয়ার হৃদয় ভারত—সে-আত্মা জাগেনি। কবে এদেশ তার অতীত মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হবে, মানুষের চিন্তায়, সভ্যতায় নিজ অতীতের বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধে সজ্ঞান হবে।—কবে—কবে—আসবে সেই জীবন—সেই প্রাণ—!'"[৩৮]

তাঁদের এই ভ্রমণের সময়েই ১৩ অক্টোবর ১৯০৪ নিবেদিতা গয়ায় 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, স্যার যদুনাথ সরকার এবং সিস্টার ক্রিস্টিন।[৩৯]

বুদ্ধগয়া থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা প্রত্যক্ষ করলেন ভারতপ্রাণা নিবেদিতার 'প্রজ্বলিত মূর্তি'। রথীন্দ্রনাথ ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ "ফেরবার সময় সকলে মিলে গয়া স্টেশনে যাওয়া হলো। সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়, তাই বিভিন্ন ট্রেন ধরতে হবে। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র বম্বে মেলে কলকাতায় যাবেন—সেই ট্রেনই প্রথম এল। দৌড়াদৌড়ি করে কোন কামরাতেই জায়গা পেলেন না। প্রথম শ্রেণির একটা কামরায় দেখা গেল দুটি লোক, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতীয়কে তারা ঢুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-একজন স্টেশনমাস্টারের কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে দেখি ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্বজাতিদুটিকে বেশ তিক্ত-মধুর ধমক দিচ্ছেন। ধমক খেয়ে সাহেবরা অবশেষে গাড়ির দরজা খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু শেষমুহূর্তে কোনরকমে উঠে পড়লেন।

"ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রজ্বলিত মূর্তি। কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছেন না; সেই মুহূর্তেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবে যেন স্বস্তি পান। তাঁর সেই রাগ পড়তে-না-পড়তে আর একটা ট্রেন এসে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে পশ্চিমের দিকে। দুটি মাত্র প্রথম শ্রেণির কামরা—একটিতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্যটিতে একটিমাত্র ভারতীয় পুরুষ। যে-কামরায় ইংরেজ মহিলা ছিলেন, আমরা নিবেদিতার মালপত্র সেই কামরায় তুলে দিতে গেলে তিনি বললেন, 'I am not going in there.' অগত্যা অন্য কামরায় নিয়ে গেলুম। আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই ভদ্রলোকটি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতার জন্য তাঁর নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় নিবেদিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন, 'Now, you see the difference between the barbarous Englishmen and the civilized Indians.'"[৪০]*

বুদ্ধগয়া থেকে রাজগীরে এসে মিস ম্যাকলাউডকে ১৫ অক্টোবর ১৯০৪ তারিখে তিনি যখন চিঠি লিখছেন, তাঁর ব্যর্থতা-জনিত হতাশা তখন অনেকটাই থিতিয়ে গিয়েছে। তিনি লিখছেনঃ "আমি ভরসা করি, তখন সেখানে [বুদ্ধগয়ায়] যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করিবে স্বামীজীর সেই কথাটি যা তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'Only when they go away, will they know how much they have received.'"[৪১]

একথা যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্যি, রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'ই তার প্রমাণ। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে তাঁর পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-রচনার পরবর্তী ইতিহাসও তার সাক্ষী। কিন্তু তখনি রবীন্দ্রনাথ বোধহয় অনুভব করতে পারেননি, তাঁর অবচেতনার মণিকোঠায় তিনি কী সম্পদ এই

* নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব বালক রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে এমনই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, নিবেদিতার বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সঙ্গিনী এবং সেই ট্রেনের সহযাত্রিণী ক্রিস্টিনের কথা তাঁর মনেই পড়ে না। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য সূত্র থেকে ক্রিস্টিনের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

বুদ্ধগয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। ফেরত পথে গিরিডি গিয়ে সেখান থেকে মোহিতচন্দ্রকে তিনি যে-চিঠি লিখেছেন, সে-ভাষায় বড় একটা উচ্ছ্বাস নেই—"বুধগয়াতে থাকবার সময় যদিও অনেক অনিয়ম সহ্য করতে হয়েছিল তবু সেখানকার বৌদ্ধমন্দির দেখে একথা মনে হয়েছে যে, না দেখলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকত।"[৪২]

মঠের মোহন্তের সু-আতিথেয়তার কথা রথীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাহলে কবি-কণ্ঠে এমন অনিয়মের অনুযোগ কেন? সে কি নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের সদ্যোপলব্ধ তিক্ততার জের?

■ রবীন্দ্র-আতিথ্যে নিবেদিতা

বুদ্ধগয়া থেকে ফেরার মাস দুয়েক পরেই নিবেদিতার কাছে শিলাইদহ যাত্রার আমন্ত্রণ এসে পৌঁছাল। বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ মতানৈক্যের সাম্প্রতিক স্মৃতি সত্ত্বেও এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পদ্মার বুকে বোটযাত্রায় কবির সঙ্গী হওয়ার আগ্রহ নিবেদিতার অনেকদিনের। সেই ১৮৯৯-তেই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং নিবেদিতাও সোৎসাহে তা গ্রহণ করেছিলেন। যাত্রার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলার পরেও হঠাৎ স্বামীজীর সঙ্গে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা হওয়ায় সে-ভ্রমণের পরিকল্পনা তখনকার মতো বাতিল হয়ে যায়।

তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। স্বামীজীর দেহান্ত এবং মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু যথাক্রমে নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে অনেকটাই নিঃসঙ্গ ও রক্তাক্ত করেছে। উভয়েই তাঁদের নিজস্ব বিবিধ কর্মযজ্ঞে যথাসাধ্য ব্যস্ত। দুজনের মানসভূমি আলাদা হলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি বা দেশীয় রাজনীতির নানা সূত্রে তাঁদের বারবার যোগাযোগ হয়েছে। সশ্রদ্ধ আকর্ষণ জন্মেছে। তীব্র মতভেদ প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে এই কয়েক বছরে তাঁদের দুজনের মধ্যে 'গভীর বাধা'র সঙ্গে 'গভীর ভক্তি'র সহাবস্থানে এক আশ্চর্য জটিল সম্পর্ক রূপলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের মনে বুঝি তাই দ্বিধা ছিল। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় তাঁদের তর্ক-বিতর্কের পর হয়তো তাঁর মনে আশঙ্কা হয়েছিল—নিবেদিতা তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন। বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমেই নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ৫ জানুয়ারি ১৯০৫ শ্রীমতী ওলি বুলকে এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিবেদিতা জানিয়েছিলেন, তাঁরা দুজন ছিলেন জগদীশচন্দ্রের অতিথি, পক্ষান্তরে জগদীশচন্দ্ররা ছিলেন কবির অতিথি।[৪৩]

খুব আপশোসের কথা, শিলাইদহে, নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের এই নিভৃত আলাপন পরবর্তী গবেষকদের কাছে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

'নিবেদিতা লোকমাতা' শীর্ষক বিস্তৃত গবেষণায় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। শুধু শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনায় তিনি নন্দলাল বসুর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে—"একবার পদ্মায় বোটে করে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু ও সিস্টার [নিবেদিতা] বেড়াতে গিয়েছিলেন।"[৪৪]

১৯৬৭-তে প্রকাশিত 'নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য' প্রবন্ধে শ্রীবসু লিখেছিলেনঃ "এপর্যন্ত যা পেয়েছি—নিবেদিতার ১৫ অক্টোবর ১৯০৪-এর চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখ।"[৪৫] কিন্তু ১৯৮২-তে প্রকাশিত তাঁর 'Letters of Sister Nivedita'-য় শ্রীমতী বুলকে লিখিত পূর্বোক্ত চিঠিটি সঙ্কলিত আছে।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেনঃ "রবীন্দ্রনাথ তখন অধিকাংশ সময় শিলাইদহে অবস্থান করিতেন। নিবেদিতা কয়েকবার সেখানে গিয়াছিলেন। ১৯০৪-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন ডক্টর বসুর সহিত প্রথম শিলাইদহে গমন করেন, তখন পদ্মার তীরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার কী আনন্দ!"[৪৬] কিন্তু 'কয়েকবার' শব্দটি নিয়ে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা ডিসেম্বর ১৯০৪-এর পর নিবেদিতা আর কবে কবে শিলাইদহে গিয়েছিলেন, সেসম্পর্কে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাও নীরব এবং নিবেদিতার পত্র, রবীন্দ্রনাথের জীবনী ইত্যাদি সম্ভাব্য কোন সূত্রেই আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

লীলা সরকার লিখিত এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে—"আমি যখন শিলাইদহে থাকতাম, তখন নিবেদিতা কখনো কখনো এসেছেন।"[৪৭] অর্থাৎ নিবেদিতার 'কয়েকবার' শিলাইদহ যাওয়ার উল্লেখ থাকলেও এখানেও সন-তারিখের কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। তাছাড়া এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বলে কিছু পরেই যখন লেখা হয়—"[শিলাইদহে] দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারেন না। আমার জমিদারির যতগুলি গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রাম তিনি গিয়েছেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন।"—তখন এই প্রবন্ধের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ জাগবেই। নিবেদিতার মতো কর্মব্যস্ত মানুষ শিলাইদহে গিয়ে 'মাসের পর মাস' গ্রামে গরিব চাষিদের মধ্যে কাটাচ্ছেন—একথা বিশ্বাস করা মুশকিল।

'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল নিবেদিতা-লিখিত ৫ জানুয়ারি ১৯০৫ চিঠিটির অনুসরণে জানিয়েছেন, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পদ্মার ওপর বাস করছিলেন; নিবেদিতা ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৪ সম্ভবত ক্রিস্টিনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ২ জানুয়ারি ১৯০৫ রবীন্দ্রনাথ-সহ সকলে কলকাতায় ফিরে

আসেন।[৪৮] কিন্তু এই ঘটনার আগে বা পরে নিবেদিতা আর কখনো শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন—এমন কোন সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

অর্থাৎ নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত জীবনী-কারদের মধ্যে এই শিলাইদহ ভ্রমণ সম্পর্কে স্পষ্ট মতভেদ রয়েছে। এবং বলা উচিত, তাঁদের নিজস্ব মতের পক্ষে খুব বেশি জোরালো তথ্যপ্রমাণ কারোরই নেই। অথচ আশ্চর্য, এঁরা কেউই শচীন্দ্রনাথ অধিকারী সংগৃহীত এই সংক্রান্ত দীর্ঘ বিবরণটির উল্লেখ অবধি করেননি।

শচীন্দ্রনাথ 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে শিলাইদহ এস্টেটের কর্মচারী দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর একটি স্মৃতিচারণ অত্যন্ত জীবন্তভাবে উপস্থিত করেছেন।[৪৯] এই দক্ষিণারঞ্জনই ছিলেন নিবেদিতার শিলাইদহ বেড়ানোর স্থানীয় 'গাইড'। সুতরাং এই বিবরণটির গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে। অল্পজ্ঞাত রচনাটি গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে কিছু বলার নেই, কিন্তু উপেক্ষা করলে তা অবশ্যই অন্যায়।

সন্দেহ নেই, শচীন্দ্রনাথের এই রচনায় ঐতিহাসিক কিছু গুরুতর তথ্যপ্রমাদ রয়ে গেছেই—যা এই ধরনের স্মৃতি-নির্ভর রচনায় মোটেও অস্বাভাবিক নয়। যেমন, প্রথমেই বলা যাক, সন-তারিখ সংক্রান্ত ত্রুটির কথা। তিনি বলেছেন, ১৩০৯ বা ১৩১০ সালের শীতকালে নিবেদিতা শিলাইদহে যান। ভ্রমণের যে-কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন, তা অবশ্যই শীতকালের এবং বৎসরান্তের। কিন্তু সালের গোলমাল কিছু হচ্ছেই।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯/২৯ নভেম্বর ১৯০২ রবীন্দ্র-জায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তারপরই রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে নিবেদিতার শিলাইদহ ভ্রমণ নিশ্চয়ই শোভন নয়। তাছাড়া তিনি তখন নাগপুর, বরোদা, ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ ইত্যাদি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর বক্তৃতা-সফরে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। পরবর্তী শীতেও নিবেদিতা ব্যস্ত তাঁর লেখালিখি এবং ভ্রমণ কর্মসূচীতে। এই সময় ডিসেম্বর ১৯০৩—জানুয়ারি ১৯০৪ রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার শিলাইদহে গিয়ে থাকলেও নিবেদিতার পক্ষে তাই শিলাইদহে তাঁর আতিথ্যগ্রহণ করা সম্ভব নয়। নিবেদিতার চিঠিপত্র এবং 'রবিজীবনী'র কালানুক্রমিক বর্ণনা থেকে বোঝাই যায়, 'কয়েকবার' নয়, নিবেদিতা একবারই মাত্র শিলাইদহে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তা ঐ ১৯০৪-এর বৎসরান্তেই। সুতরাং শচীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত বিবরণটি নিশ্চয় ঐ ভ্রমণের।

তাছাড়া শচীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, নিবেদিতা 'প্রায় ১৫/২০ দিন শিলাইদহে ছিলেন'। উপরি উক্ত তথ্যসূত্রই প্রমাণ করছে, এখানেও তিনি ভুল করেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের যে-স্মৃতিচারণ তিনি সংগ্রহ করেছেন, সেখানেও ঘটনাবলীর মেয়াদ দিন তিনেকের বেশি বলে মনে হয় না।

কালনির্ণয়ে এই স্পষ্ট ভ্রম সত্ত্বেও এই বিবরণীকে কোন মতেই অস্বীকার করা যাবে না। তার প্রথম কারণ, এই ভ্রমণের এমন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আর একটিও লভ্য নয়। তাছাড়া বন্ধুবর তারকনাথ তরফদারের যুক্তিটিও স্মর্তব্য—"শচীনবাবুর বর্ণনামতো শিলাইদহে নিবেদিতার যে-আচরণ তা এত বেশি 'নিবেদিতাসুলভ'—অর্থাৎ কিনা নানা গবেষণায় নিবেদিতার যে-চরিত্র আজ আমরা পাই, যার অনেকটাই শচীনবাবুর লেখা প্রকাশের সময় [১৩৬৮] অজানা—যে সেই 'নিবেদিতা'কে কিংবদন্তী বলে মেনে নিতে মন চায় না।"[৫০]

এছাড়া দুটি বেশ পুরনো লেখাও শচীন্দ্রনাথের বিবরণীকে স্বীকৃতি দেবে। একটি 'উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৩৫৯-এ প্রকাশিত লীলা সরকারের উল্লিখিত প্রবন্ধটি। অপরটি তারও আগে 'মাসিক বসুমতী'-র আষাঢ় ১৩৫৬-এ প্রকাশিত অন্য একটি প্রবন্ধ। দুটি লেখাতেই রবীন্দ্রনাথের 'জবানী'তে নিবেদিতার শিলাইদহ-ভ্রমণের কিছু 'স্মৃতিচারণ' আছে। এই ধরনের রচনা সম্পর্কে যদি পণ্ডিতেরা বিচার করেন সাল-তারিখের নিরিখে, তাহলে শুকনো তথ্যে কেমন গোলযোগ ধরা পড়ে, তা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু এই দুই রচনায় যেসব ঘটনার কথা আছে তা অস্বীকার করতে পারা যায় না। ঘটনাগুলি যে শুধু 'নিবেদিতাসুলভ' তা-ই নয়, তাঁদের দেওয়া খণ্ডচিত্রগুলির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর প্রদত্ত বর্ণনা আশ্চর্যরকম মিলে যায়।

যেমন 'উদ্বোধন'-এর প্রবন্ধে দেখি—"পদ্মার চড়ার মধ্য হতে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হচ্ছে। চাষিরা ভোরের সময় লাঙল কাঁধে মাঠে আসছে। গেরুয়া বসন-পরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সহিত আরেকটি মেয়ে ছিল তার সহচরী [সিস্টার ক্রিস্টিন?]। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা! নিবেদিতা দৌড়ে চাষিদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই তোমরা এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা বলল, আমরা মেমসাহেবকে দেখছি। তিনি বললেন, মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল তোমাদের বাড়ি যাই, তোমাদেরই দেখব আমি। চাষিরা শশব্যস্তে তাঁকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।... [নিবেদিতা] তাদের সঙ্গে চিঁড়ে কুটেছেন, ধান ভেনেছেন—তাদের নাড়ু, মোয়া খেয়েছেন—তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি যে, তিনি তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান কুটছেন।"[৫১]

আবার 'মাসিক বসুমতী'তে রয়েছে—"শিলাইদহের গৃহস্থবাড়ির রান্নাঘর, শয়নঘর, ঢেঁকির[ঘর], গরুবাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কী আনন্দ! পল্লী নরনারীর স্বহস্তকৃত কাঁথা,

ছেলেদের দোলাই, কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ করা, বাঁশের কাজ করা, পাখা, লাঠি—তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের 'অষ্টসখা'র নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।"[৫২]

শচীন্দ্রনাথ সংগৃহীত স্মৃতিচারণে আরো নানা ঘটনার সঙ্গে এইসব খণ্ডচিত্রও রয়েছে যথাযথ ক্রমে এবং আরো অনেক বিস্তারিতভাবে। রয়েছে পোশাক, পরিবেশ, সংলাপের অনেক খুঁটিনাটি। তাই এই বর্ণনা এত জীবন্ত। সেকারণে নিবেদিতার শিলাইদহ ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখতে গেলে এই রচনাটির ওপর নির্ভর করতেই হবে।

■ দক্ষিণারঞ্জনের স্মৃতি

১৫ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৪ নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে যে-চিঠিটি লিখেছেন, তা পড়ে ঘুণাক্ষরেও বোঝার উপায় নেই যে, তার দুদিন পরই নিবেদিতা শিলাইদহ যাবেন।[৫৩] তাঁর এতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে, অথচ তিনি স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে নিরুত্তাপ। হঠাৎ করে দুদিনের মধ্যে তাঁর শিলাইদহ-ভ্রমণ স্থির হলো এবং ৩০ ডিসেম্বর তিনি রওনা দিলেন—এমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সেক্ষেত্রে, এই ভ্রমণের কথা তিনি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুজনদের কাছে আপাতত গোপন রাখতে চাইছেন—এমনটি হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। অথবা বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন তাঁর যে সংস্কারে বিশ্বাসের কথা, তা এখানেও সত্যি হতে পারে—"I did not dare to mention it till all was over—as I am very superstitious about the accomplishment of things made too sure of."[৫৪]

রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই থাকেন শিলাইদহে। শীতে পদ্মার চরে বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে রান্না-স্নান ইত্যাদি অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। কবি সাধারণত থাকেন 'পদ্মা' নামের তাঁর প্রিয় বোটে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা এসে তাঁর অতিথি হন। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র তখন প্রায়ই তাঁর সপ্তাহান্তিক অতিথি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেনঃ "আমার ছেলেবেলাকার শিলাইদহের স্মৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মধুর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।"[৫৫]

১৯০৪-এর শেষ প্রান্তে ক্রিস্টিনকে সঙ্গী করে নিবেদিতা পৌঁছালেন শিলাইদহে। পদ্মার ওপর 'নাগর' নামের এক ছোট বোটে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হলো। তারকনাথ ধারণা করেছেন, নাগর নদীর নামে বোটের এই নামকরণ।[৫৬]

পরদিন ভোরবেলা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাছাকাছি গ্রামের মাঠে বেড়াতে গিয়ে চাষিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। ভাঙা বাঙলায় দুই মেমসাহেব রবিশস্য চাষের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন দেখে চাষিরা অবাক! তাদের জমিদারবাবু রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় চলছিল এই আলাপ।

কথা বলতে বলতে আর হাঁটতে হাঁটতে বেলা বাড়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলপথ ধরে এগিয়ে তাঁরা কাঁদাবাড়ির বিশাল বটগাছ দেখতে পেলেন। নিবেদিতা অভিভূত গলায় স্বগতোক্তি করলেনঃ "How Divine—How Majestic!"

তার পরদিন [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৪?] ভোরবেলা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছারির আমলা দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীকে ডেকে নিবেদিতাদের গ্রাম ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব দিলেন। বলে দিলেনঃ "গ্রামে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পল্লীর গৃহস্থ চাষি, তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলেদের বাড়ি গিয়ে তারা কিভাবে থাকে, কি করে তারা খায়, পরে, কী তাদের পেশা"—এইসব ভালভাবে দেখিয়ে দিতে।

নিবেদিতারা প্রথমে গেলেন শিলাইদহের বুনো আর বিন্দিদের পাড়ায়। সেখান থেকে গ্রামের সীমানায় নবীন প্রামাণিকের বাড়ি। তাদের বাড়িতে মেয়েদের ধান ভানা, চিঁড়ে কোটা ইত্যাদি গৃহস্থালীর নানা খুঁটিনাটি তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন। ডাব আর বাড়ির বানানো চিঁড়ের মোয়া খেলেন। অপরপক্ষে বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও মুগ্ধতা সঞ্চারিত হলো। আশপাশের বাড়ির মেয়েরাও তাঁর কাছে এল, এমনকি প্রণামও করল।

ফেরার পথে মেয়েদের সুখ্যাতি করতে করতে নিবেদিতা বললেনঃ "এরা ঋষির মেয়ে, আমরাই এদের সুখী করতে পারিনি।" দক্ষিণারঞ্জনের মনে হয় জানা ছিল না বিবেকানন্দের বাণী—"ভারতবাসীমাত্রই ঋষির সন্তান।"

শচীন্দ্রনাথের লেখা থেকে মনে হয়, ১৯০৪-এর এই শেষ দিনটিতে তাঁরা এরপর গিয়েছিলেন মুসলিম পাড়ায়। মুসলিম তাঁতিদের বাড়িতেও নিবেদিতা-ক্রিস্টিন একইরকম সাবলীল, তাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে একইরকম সশ্রদ্ধ কৌতূহলী।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা তাঁরা দেখলেন 'ষষ্ঠী ঘোষের বটগাছ'। প্রাচীন প্রথা অনুসারে, কোন সুদূর অতীতে গ্রামের মানুষ বট আর পাকুড়ের দুটি ছোট চারার বিয়ে দিয়েছিলেন মহাসমারোহে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এমন আত্মিক বন্ধন দেখে আপ্লুত নিবেদিতা বললেনঃ "Sublime-Divine."

আরেক সকালে, সম্ভবত ১৯০৫-এর প্রথম প্রভাতে সিস্টাররা গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করলেন। পুরনো মন্দিরের স্থাপত্য দেখলেন, হিন্দু রীতি-নীতি মেনে খালি পায়ে বিগ্রহ প্রণাম করলেন, দুহাত পেতে চরণামৃত পান করলেন।

এমনভাবে, শিলাইদহের যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধায়-বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছেন। নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-আভিজাত্যের গরিমা সরিয়ে রেখে নিবেদিতারা সাধারণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসীরাও তাই অচেনার দূরত্ব অতিক্রম করে তাঁদের আপন করে নিয়েছিল।

নিবেদিতাদের 'নাগর' বোট যে-স্নানঘাটে বাঁধা থাকত, তার পাশেই ছিল বুনো পাড়া বা রাজবংশীদের পাড়া।

তাদের সঙ্গেই বোধহয় এই 'সাধু-মা' দুজনের আলাপ জমেছিল সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বাউল ফকির, বুনো পাড়ার 'অষ্ট সখী' নাচিয়ে ছেলেরা—সবার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক অদ্ভুত হৃদ্যতা।

আর গ্রামবাসীদের এমন নৈকট্যে যেতে পারার পিছনে স্থানীয় জমিদার রবীন্দ্রনাথের এক পরোক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর ব্যবস্থাতেই গ্রামবাসীদের অন্দরমহলে যাওয়া সিস্টারদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁদের আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথ সিস্টারদের বোটে পাঠিয়ে দিতেন পল্লীগ্রামের নানা মরসুমী সুখাদ্য—খেজুরের রস, আখের টাটকা গুড়, গরুর সদ্য-দোয়া দুধ।

তাছাড়া একসঙ্গে বসে সিস্টারদের তিনি গান শোনাতেন। একদিন গেয়েছিলেন ঃ "প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।" যতক্ষণ গানটি চলল, নিবেদিতা চোখ বুজে দুহাত জোড় করে কোলের ওপর রেখে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসেছিলেন।

এই শিলাইদহ-ভ্রমণে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ শুধুমাত্র এই ব্যবস্থাপনা আর আতিথেয়তার মধ্যেই অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। যদিও কাছারির আমলা দক্ষিণারঞ্জনের পক্ষে কোন বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবু তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি—"রবীন্দ্রনাথের বজরায় [সিস্টাররা] আসতেন প্রায়ই আর আলোচনা ও তর্কও খুব চলত।"

আবার সেই তর্কের কথা! বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সময়েও যে-তর্কের কথা আমরা জেনেছি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি, ঠিক কী ছিল তার বিষয়। এক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে প্রায় নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়, শিলাইদহে ঠিক কী কারণে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ মতানৈক্য তীব্রতর হয়। [ক্রমশ]

তথ্যসূচী

২৭ রবিজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭
২৮ রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৌদ্ধ অনুপ্রেরণা—অনীতা মুখোপাধ্যায়, 'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৩, পৃঃ ৩৯
২৯ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬
৩০ পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জিজ্ঞাসা', ১৩৭৩, পৃঃ ২৫৫
৩১ ঐ
৩২ ঐ
৩৩ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', ৭ পৌষ ১৩৭৪, পৃঃ ৭৭৩
৩৪ Letters of Sister Nivedita—Ed. Sankari Prasad Basu, Vol. II, p. 685
৩৫ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৭৬৬
৩৬ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 685
৩৭ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৭৬৭
৩৮ ঐ
৩৯ রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্ক—পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৯৫, পৃঃ ১০০
৪০ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ২৫৬
৪১ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 686
৪২ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮
৪৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 711
৪৪ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩
৪৫ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৭৬৫
৪৬ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩১৭
৪৭ ভগিনী নিবেদিতা—লীলা সরকার, 'উদ্বোধন', কার্তিক ১৩৫৯, পৃঃ ৫৭৬
৪৮ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫
৪৯ পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মিত্র-ঘোষ, ১৩৬৮, পৃঃ ৭
৫০ শিলাইদহে ভগিনী নিবেদিতা—তারকনাথ তরফদার, 'উদ্দীপন' ২০০২, গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর
৫১ 'উদ্বোধন', কার্তিক ১৩৫৯, পৃঃ ৫৭৬
৫২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'জিজ্ঞাসা', কলকাতা-৯, ১৯৬০, পৃঃ ৪৯
৫৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, pp. 703-704
৫৪ Ibid., p. 685
৫৫ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ২৫৫
৫৬ 'উদ্দীপন' ২০০২

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ ভাদ্র ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীকৃষ্ণ**
শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী
২ ভাদ্র, মঙ্গলবার
(১৯ আগস্ট ২০০৩)
স্বামী অদ্বৈতানন্দ
শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী
৯ ভাদ্র, মঙ্গলবার
(২৬ আগস্ট ২০০৩)

একাদশী-তিথি ঃ ৬, ২০ ভাদ্র
শনিবার, শনিবার
(২৩ আগস্ট, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা

পাশাপাশি ঃ (১) সমুদ্র, (২) রাম, (৩) নিত্য, (৫) পরম, (৬) পাকা, (৭) বশ, (৯) গোলাপ, (১১) জয়, (১২) গয়া, (১৩) নরম, (১৫) বিলে, (১৭) আদ্যা, (১৮) গুষ্টির, (১৯) পান, (২০) রণ, (২১) বেড়াল।

ওপর-নিচ ঃ (১) সত্য, (২) রামলালা, (৩) নিত্যানিত্যজ্ঞান, (৪) টাকা, (৫) পথ, (৬) পাশ, (৭) বলরাম, (৮) দয়য়া, (৯) গোলেমালে, (১০) পতিতপাবন, (১১) জগত, (১৪) রজোগুণ, (১৫) বিদ্যা, (১৬) পুর, (১৭) আমি, (১৯) পাল।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

স্বামী অম্বিকেশানন্দ, মীনাক্ষী ব্যানার্জি, সুনীতি পাল, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন বর্মন

শ্রীশ্রীএকাদশী দেবী-স্তোত্রম্

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

সুরাসুরবিনাশানাং আদিভূতে হরিপ্রিয়ে।
জ্ঞানভক্তিং দেহি মে দেবি স্বরাক্ষরে নমোঽস্তুতে।।১।।

একাদশ্যৈ নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শ্রীশপ্রিয়ে।
পরাবিদ্যাং দেহি মে নিত্যং সর্ববিদ্যে নমোঽস্তুতে।।২।।

শঙ্কাভীতিনাশিনীঞ্চ নিত্যবুদ্ধিদায়িনীম্।
দিব্যশক্তি-প্রেমভক্তি-শোকতাপহারিণীম্।।৩।।

পূজ্যসর্বদেবলোকঃ পূর্ণসত্যসুস্থিরম্।
তাং নমামি বৈষ্ণবীং হি ভক্তমাতৃরূপিণীম্।।৪।।

বঙ্গানুবাদ

(হে দেবি!) তুমি ভগবান শ্রীহরির পরিতোষবর্ধনকারিণী, সুর নামক অসুরের দণ্ডদানের প্রধান কর্ত্রী, সনাতনী। তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ জানার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং (নারদীয়) ভক্তি (-র সূত্র) প্রদান কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি।।১।।

হে একাদশি দেবি! তুমি ভগবান বিষ্ণুর লীলা-সহচরী ও সর্ববিদ্যাপ্রদায়িনী। তুমি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান প্রদান কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি।।২।।

যে-দেবী (ভক্তদের মনের যাবতীয়) শঙ্কা, ভীতি (সযত্নে) পরিহার করেন এবং (সেখানে ঈশ্বরকে জানার জন্য) দিব্যশক্তি, প্রেমভক্তি এবং সুবুদ্ধি প্রদান করেন; যে-দেবী সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন এবং শোকতাপ (ত্রিতাপ) হরণ করেন; যিনি সত্যের স্বরূপিণী, অচঞ্চলা এবং সুর-নর কর্তৃক পূজিতা—সেই ভক্তগণের জননীরূপিণী নারায়ণী (বৈষ্ণবী)-কেই প্রণাম করি।।৩-৪।।

চির আশ্রয় প্রভু মোর

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

নিপুণ চতুর হাতে বিতত বিতংস চারিধারে
মায়া-হরিণীর ছল হাতছানি দিয়ে বারেবারে
করে দেয় পথহারা, বৃন্তচ্যুত; ভ্রষ্ট হয় ধ্যান,
তম্বুরার ছিন্ন তন্ত্রে ব্যর্থ হয় সুরের সন্ধান।

তুমিই ফিরাও প্রভু, ভ্রান্তি থেকে হাত ধরে টেনে,
বসাও সযত্নে ফের পূজাকক্ষে ধ্যানের আসনে।
দাও ফিরে পুনর্বার হারানো সে নিভৃত আশ্রয়,
তোমারি করুণা-ভরা সে আমার শান্তির নিলয়।

চিরাশ্রয় প্রভু মোর, লেলিহান বাসনা-অনল
নির্বাপিত করে তব কৃপাস্নিগ্ধ পূত শান্তিজল;
উত্তাল হৃদয়-সিন্ধু শান্ত হয় স্তব্ধ মোহানায়।
যন্ত্রণা-বিদীর্ণ বুকে জননীর মতো মমতায়
সুকোমল স্পর্শে তব চেতনায় উঠে যে ঝঙ্কারি
ব্যথাহরা সঞ্জীবনী সপ্তস্বরা আনন্দলহরী।
স্তিমিত অন্তর-দীপে পুনর্দীপ্ত কোমল আভায়
তোমার প্রসন্ন মুখ উদ্ভাসিত প্রেম-করুণায়।

সত্যিকারের মা

চন্দ্রা দাশগুপ্ত

বলতে পার মা গো তুমি কেমনতর মা?
স্নেহ ঢেলেও দাও না দেখা বুঝতে পারি না।
মা কি কেবল দূরে থাকে? সামনে আসে না?
কেমন করে বুঝব তুমি সত্যিকারের মা?
নিজের মুখে এই বাণীটির অনেক ব্যবহার,
'সবার আমি আপন মা' যে এই কথাটি সার।
তোমার আকুল স্নেহের স্বরূপ যারাই দেখেছে,
হৃৎপদ্মের পাপড়ি তাদের আপনি ফুটেছে।
তোমার কত ত্যাগী ছেলে এই ধরারই মাঝে,
ঘুরছে তারা তোমায় ধরে সেবাব্রতের কাজে।
শক্তি তুমি, ভক্তি তুমি, সাহস তুমি মা,
অনিত্য এই ধরার তুমি নিত্য মহিমা।
ঠাকুর মোদের দয়াল ঠাকুর, তুমি তাঁরই ছায়া,
মায়া-মোহের অন্ধকারে বদ্ধ মোদের কায়া।
মা, ঠাকুরের আশীর্বাণী, ধ্যান-ধারণা আর—
জীবনের এই চলার পথে স্মরি বারংবার।
ধরাধামের তুচ্ছ সুখের পারেও আছে যা,
একটিবার দাও গো দেখা সত্যিকারের মা।

মা

নিভা দে

বিশ্বচরাচরে বেজে চলেছে এক চিরন্তন ধ্বনি—'মা' 'মা'
কেউ শুনতে পায়, কেউ কেউ পায় না।
বিশ্বপিতা—তিনি তো এক পরমপুরুষ
অতি দূর নির্জনে ধ্যানে তাঁর বসবাস,
আমাদের কাছে যে মমতার ভাণ্ডার—
তিনি জননী, তিনি বসুন্ধরা।

ঘুম থেকে জেগে তাই অজান্তে ডেকে উঠি—'মা' 'মা'।
"ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূনাং ভয়কারিণি।"
দিনান্তে কর্মশেষে তারই আশ্বাস চাই—ঘুমঘোরে
বিপদে সঙ্কটে মা ছাড়া আছেন কে এমন রক্ষাকর্ত্রী?
তাই প্রতি মঙ্গলে ঘরে ঘরে পূজা বিপত্তারিণী।

শিব যদি আশুতোষ—অল্পেতে সদাই তুষ্ট, অন্তরে প্রীতি
তিনিও তো আছেন পেতে হাত—সদা সেই বরাভয়দাত্রীর প্রতি।
ঋতুতে ঋতুতে তাই আকাশে বাতাসে
মাতৃনামবন্দনায় মুখর এ-বিশ্ব।

লোকাতীতে যে-মুখ লুকিয়ে থাকে
তার জন্য দিকে দিকে এত আয়োজন!
গৃহে মণ্ডপে মন্দিরে তাঁরই পূজার বোধন।
প্রতি গৃহে আছেন তাঁরই অনুকল্প—আমাদের মা
আমরা কি এমন অধম সন্তান হব যে,
ভুলে যাব তা?

স্বামীজি, তুমি!

সৌমিত্র সেন

প্রহরের পর প্রহর চলে যাচ্ছে
দেশ-বিদেশের ঢেউ ছুটে আসছে দুরন্ত গতিতে,
যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, অজস্র অন্ধকার
গ্রাস করতে আসছে জীবন, চাইছে বলি...
তুমি বিন্দু বিন্দু করে নিংড়ে দিয়েছ এই মাটিতে
তোমার রক্ত...
আমি তোমার ঘাম, রক্ত, উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যে
জন্মেছি, পেয়েছি প্রাণ।
পৃথিবীর দুঃখগুলোকে তোমার প্রাণপুটে নিয়ে
চলে গেছ অনন্ত সমুদ্র অতলে
ঝিনুক যেমন চলে যায়... আর
মুক্ত হয়ে মৃত্যুতে মুছে যায়।
তোমার মুক্ত আজ পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার
শিয়রে থেকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে অশেষ আকাঙ্ক্ষায়
অবিরাম... অবিরল...
তোমার হাতে-গড়া পৃথিবীর ধুলায় আমার
শরীর দাঁড়িয়ে—রোমাঞ্চ জাগছে শিরায়, রক্তে, চৈতন্যে।
এই ঘাসে তুমি হেঁটেছ,
তুমি চোখ মেলে তাকিয়েছ ঐ আকাশের পানে,
প্রশ্বাসে নিয়েছ তুমি এই বায়ু
এই পথেই পড়েছে তোমার ছায়া—
আমি আর আমার সঙ্গে এই সমস্ত পৃথিবী, মানুষ
আজ ধন্য হচ্ছে প্রতিদিন... রাত... ঋতু... যুগ।
এই পৃথিবীর কিছু উজ্জ্বল ইতিহাসের গায়ে এখনো
গন্ধ লেগে তোমার রক্তের!
আমাদের জন্য এত কাঁদতে কে বলেছিল?
ঝরাতে কে বলেছিল এত প্রেম?
সব দুঃখ নিয়ে চলে যেতে চাইলেও হায়
এত বড় দুঃখ যে রয়ে গেল বুঝলে না বীর!
তবু আজ অমৃত হব, অশ্রুকে ধুয়ে দেব আনন্দে
তবু আজ তোমার আশিস আছে জেগে—এই ভেবে
তোমাকে বন্দনা করি, হে মহামানব!

বিবেকানন্দ

দ্বীপেন্দ্র ভট্টাচার্য

জাগাতে যৌবন, জাগিতে জীবনে যদি আসে সাধ মনে
দুঃখ-ব্যথায়, আত্মশ্লাঘায় যদি কাঁদে মন অনুক্ষণে
শরণ লও, হে শরণাগত, দুঃখাহত পরমানন্দে
শৌর্যে, বীর্যে, স্থৈর্যে প্রবাদসম বীরেশ্বর বিবেকানন্দে।

দানে, ধ্যানে, জপে, তপে নহে শুধু অমৃতের আস্বাদন
কর্মে হও বীর, হও মহাশক্তিধর, মহাবীর্যবান।
মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলে কর অস্পৃশ্যতা বর্জন,
জীবনে সকল সত্তায় কর এ-সত্যের উদ্ঘাটন।

হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের নীচতা দগ্ধে মনস্তাপে,
ভীরু-কাপুরুষ মরে পুনঃ পুনঃ দ্বিধাদ্বন্দ্বের উত্তাপে,
ওঠ, জাগ, অনন্তবাসী প্রস্ফুটিত কর হৃদয়খানি,
জীবন-মোহানায় নিত্য যে সাথী বিবেকানন্দের বাণী।

সবকিছু আলোছায়া, ক্ষণস্থায়ী জীবনের কীর্তি সত্য,
বিবেকানন্দের অমর সব বাণী দেখাবে পথ নিত্য।

হে মহাঋষি, হে মহাসূর্য

যদুপতি মল্লিক

হে মহাঋষি, হে মহাসূর্য!
তোমার অমিত তেজ আমায় একটু দাও
তোমার কণামাত্র তেজে আমি
অসীম শক্তির অধিকারী হব।

একাকী আমার মন্দিরে
মগ্ন তোমার ধ্যানে
আমার এই মগ্নতা ভেঙো না ভেঙো না।
ধ্যানে আমায় আবিষ্ট রাখ আমৃত্যু।

জীবনদেবতা!
তোমার দক্ষিণ হস্ত রাখ আমার মস্তকে
অনন্ত কাল বয়ে যাক
জ্ঞানে চৈতন্যে বৈরাগ্যে প্রেমে
এস পূর্ণ ব্রহ্ম।

আমি ঠিক যাব তোমার নির্দেশিত পথে
কোমলে কঠোরে
তোমার বরাভয়ের হস্ত যেন
যেমনকার তেমনই সজীব থাকে
তোমার গৈরিক ধর্মে আমায় জড়িয়ে নাও
করি সার্থক জনম আমার।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

প্রসঙ্গ 'ঐতিহাসিক সত্যান্বেষণ'

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত রুমকি বসু ও কল্যাণী ভট্টাচার্যের পত্র এবং সম্পাদকের বক্তব্য বিষয়ে এই পত্র। পত্রলেখিকা 'গীতা' এবং 'মহাভারত'-এর কালনির্ণয় প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বাসামের উল্লেখ করেছেন এবং 'বোধহয়', 'মনে হয়', 'সম্ভাব্য', 'আনুমানিক' কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। অতি প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এই কথাগুলি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ কোনটিই নিঃসংশয়ে সঠিক নয়, সবই মাটির নিচে ডুব দিয়ে তুলে আনা।

অপরদিকে সম্পাদক মহাশয় তিলক, রাজারাম-সহ বহু ঐতিহাসিকের উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর গুটিকয়েক মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য—(১) পাশ্চাত্য প্রদত্ত ইতিহাস শতকরা ১০০ ভাগ সত্য বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, (২) খ্রিস্টাব্দ নামক 'স্কেল' ব্যবহারে সমস্যা, (৩) ভারতের ইতিহাস নিজস্ব ঢঙে রচিত হয়েছে, (৪) গীতার সময় নির্ধারণের চেয়ে মহাভারতের সময় নির্ধারণই শ্রেয় এবং (৫) গীতা মহাভারতের অঙ্গ। অবশ্য এই কথাগুলি ভিন্ন অন্য কয়েকটি কথা প্রচলিত আছে। যেমন—(১) গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এবং (২) শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের পর কলিযুগের উৎপত্তি। অর্থাৎ মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই ক্রান্তিকাল এবং যুগান্তর ঘটিয়েছে। এটি দ্বাপর এবং কলি যুগের সংক্রান্তি। অতএব কলিযুগের উৎপত্তির আগেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং গীতা উচ্চারিত হয়েছে। সেটা মহাভারতের সময় বলে স্বীকৃত।

এবারে 'ভারতের নিজস্ব ঢঙে' ইতিহাসের সময় নির্ধারণে প্রাচীন ভারতের গণিততত্ত্ববিদ্ ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের 'কালনামাধ্যায়' অংশে কলিযুগের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্লোকাংশে দেখা যায়—"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।" এর অর্থ দাঁড়ায়—নন্দ = ৯, অদ্রি = ৭, ইন্দু = ১, গুণাঃ = ৩। এখানে প্রযোজ্য 'অঙ্কস্য বামাগতি' অর্থাৎ এককের ঘরে ৯ দিয়ে আরম্ভ করলে ক্রমে দাঁড়ায় ৩১৭৯। অর্থাৎ কলির ৩১৭৯ বছর পরে শকাব্দ আরম্ভ (শকনৃপস্যান্তে)। অঙ্কের হিসাবেই দেখা যায় এখন কল্যব্দ = ৩১৭৯ + শকাব্দ ১৯২৫ = ৫১০৪ খ্রিস্টপূর্ব। বর্তমান থেকে কল্যব্দ যদি ৫১০৪ বছর আগে হয়, তবে মহাভারতের সময় তারও কিছু আগে হবেই। অতএব গীতার রচনাকাল গৌতম বুদ্ধেরও কয়েক হাজার বছর আগেই হবে। বর্তমান কালের গণনায় কল্যব্দের তারিখটি ধরা হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি।

অপরদিকে সামগ্রিক (এক লক্ষ শ্লোক-সহ) মহাভারতের অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিখ্যাত ভাষণে মহাভারতের সময় নির্ধারণ করেছেন কয়েকটি তথ্যের ভিত্তিতে (মহাভারতম্, বিশ্ববাণী সং, প্রথম খণ্ড)। তথ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি', (২) কালিদাসের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩ অব্দ) 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থের ২২ অধ্যায়ের ১১ শ্লোক এবং (৩) রবিকীর্তির শিলালেখ (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ)। ভাস্করের শ্লোক সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এবারে আমরা কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণের ২২ অধ্যায়ের ১১তম শ্লোকে দেখি—"বর্ষৈঃ সিন্দুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতি কালৌ।" অর্থাৎ সিন্ধু (গজ) = ৮, দর্শন = ৬, অম্বর = ১, গুণ = ৩। 'অঙ্কস্য বামাগতি' হিসাবে ৩১৬৮ অব্দ পাওয়া যায়। কালিদাসকে ভাস্করাচার্যের কিছু আগেই ধরা হয়। কালিদাসেরই ঐ গ্রন্থের অন্য শ্লোকে প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায়, যুধিষ্ঠিরাব্দ = ৩০৪৪ + বিক্রম সংবৎ ১৩৫ + শালিবাহনাব্দ/ শকাব্দ ১৮৫২ = ৫০৩১ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে) খ্রিস্টপূর্ব। এবারে তৃতীয় প্রমাণ—চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে কবি রবিকীর্তি লিখিত শিলাফলক (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর দুটি শ্লোক—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতদাহবাদিতঃ।
শপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতে স্বব্দেষু পঞ্চসু।।
পশ্চাশৎসু কলৌকালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকাব্দামপি ভূভুজাম্।।"

সিদ্ধান্তবাগীশ দেখিয়েছেন, ৩৭৩৫ – ৫৫৬ = ৩১৭৯ কল্যব্দ (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে)। সেটি ছিল ৩১৭৯ + ১৮৫২ = ৫০৩১ খ্রিস্টপূর্ব।

আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যা বললেন, সেটাই অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া। আমাদের দেশের গবেষকরাও সেটাই গলাধঃকরণ করেন। দেশীয় ধারায় মৌলিক গবেষণার ধারে-কাছেও তাঁরা যান না। কথায় কথায় বাসাম, রোমিলা থাপারের নাম উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু রাজারাম, তিলক, ভাণ্ডারকারের নাম উচ্চারিত হয় না।

বিষয় অন্য হলেও আমিও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণায় রত আছি। অতএব প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি—(১) ইহুদিদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বর্তমান পৃথিবীর জন্ম ৭ অক্টোবর ৩৭৬১ সাধারণ অব্দ পূর্ব (খ্রিস্টপূর্ব), যা মহাভারতের প্রায় নিকটবর্তী। প্রসঙ্গত, ইহুদিরা A.D অথবা B.C স্বীকার করে না। তাদের বর্ষ—C.E = Common Era এবং B.C.E = Before Common Era। তাছাড়া খ্রিস্টাব্দ শুরু হয় ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে (with retrospective effect) এবং যিশুখ্রিস্টের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নিয়েও বহু বিবাদ আছে। (২) পৃথিবীতে প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের 'রেকর্ড' দেখা যায় চীনদেশে—যা বর্তমান হিসাবে দাঁড়ায় ২১ অক্টোবর ২১৩৭ খ্রিস্টপূর্ব। (৩) কিছুদিন আগে ভারতে দৃশ্য পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের গ্রাসবিন্দু রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত সরলরেখায় ৮ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। (৪) ১৬ জুলাই ২০০০ ভারতে দৃশ্য পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণটির ঠিক আগের এবং ঠিক পরের অমাবস্যায় ভারতে অদৃশ্য সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে যা বিরল ঘটনা, কদাচিৎ দেখা যায়।

ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইছি না। কারণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে মহামতি ব্যাসদেব যুদ্ধ নিবারণের জন্য যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, আকাশে পর পর গ্রহণ দেখা যাচ্ছে, যা অতীব দুর্লক্ষণ। এখন যদি আমরা বাস্তবতার খাতিরে ধরি, জয়দ্রথবধের সময় শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখা আসলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ—যার মোক্ষ হয়েছিল সন্ধ্যার ঠিক আগে, তবে বর্তমান কম্পিউটারের যুগে সেই বিরল ঘটনার সময় এবং মহাভারতের কাল নির্ণয় হতে পারে। স্থানটি অবশ্যই কুরুক্ষেত্র হতে হবে। অনুরূপভাবে বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে সূর্যকে হনুমানের 'বগলদাবা' করাটা যদি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয় —যা রামেশ্বরম/শ্রীলঙ্কার ওপরে সূর্যোদয়ের সময়ে ছিল, তাহলে রামায়ণের কালও পাওয়া যেতে পারে।

আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয় কম্পিউটার-বিজ্ঞানী ডঃ ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এসম্বন্ধে বলেন, ভারতের অতি প্রাচীন সভ্যতা বিশ্বে স্বীকৃত, কিন্তু কোন proper documentation নেই। সেখানেও সেই একই সমস্যা—'খ্রিস্টাব্দ স্কেল'। তখন তো খ্রিস্ট জন্মাননি, অতএব স্কেলটা হবে কি করে? ভারতের documentation আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, রাশিচক্র বিচার করে হয়েছিল, যা অতি নির্ভুল বলেই মনে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা পরিত্যাগ করেছি। ডঃ রায়চৌধুরীকেও অনুরোধ করেছি, যদি সম্ভব হয় সূর্যগ্রহণের হিসাব খুঁজতে। না হলে রামায়ণ-মহাভারতের সবই আনুমানিক হয়েই থাকবে।

কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য
গোপালপুর, আসানসোল-৭১৩৩০৪

স্বামীজীর কণ্ঠস্বর নয়

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত শিশির রায়ের পত্র 'বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর' প্রসঙ্গে জানাই, ঘটনাটি আশ্চর্যজনক। কিছুদিন পূর্বে একটি অডিও সিডি আমার হাতে আসে। যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছেই জানলাম, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালার নির্বাচিত কয়েকটি বক্তৃতার একটি পুরনো রেকর্ডিং আছে এই সিডিতে। শুনলাম, ঐ রেকর্ডিঙে স্বামীজীর নিজের কণ্ঠস্বর আছে। তাই শোনার খুবই আগ্রহ হলো। মন দিয়ে রেকর্ডিংটি শুনে মনে খটকা লাগল—কি একটা চেনা চেনা লাগছে। ইংরেজি উচ্চারণ, স্বরের ওঠানামা—সবই চেনা চেনা। মনে মনে খুশি হলাম এই ভেবে, বোধহয় পূর্বজন্মে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতিই এখন মনে পড়ছে! পরে বুঝলাম, পূর্বজন্ম নয়—এই জন্মেই সেই বক্তৃতা শুনেছি। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে 'শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী' স্মরণে একটি ক্যাসেট বেরিয়েছিল। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আমিই ছিলাম। প্রফেসর এন. বিশ্বনাথন মূল ইংরেজি বক্তৃতাগুলির কয়েকটি পাঠ করেছিলেন। ক্যাসেটটি এখনো উদ্বোধন কার্যালয়ে পাওয়া যায়। ক্যাসেটের সেই বক্তৃতাটিকেই গতি বাড়িয়ে, নয়েস (noise) যোগ করে খুব প্রাচীন একটা রেকর্ডিঙের রূপ দান করে বর্তমান সিডিখানি নির্মিত হয়েছে বলে মনে হলো। আমার ধারণা অভ্রান্ত কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঐ সিডি এবং এন. বিশ্বনাথনের মূল ক্যাসেটটি পাশাপাশি চালিয়ে চালিয়ে দেখলাম, যেখানে তিনি একটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছেন (২৭ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায়), সিডিতেও স্বামীজী সেই প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছেন! যেখানে এন. বিশ্বনাথন গলা বিকৃত করে কুয়োর ব্যাঙের বার্তালাপ নাটকীয়ভাবে বলেছেন, সেখানে স্বামীজীও ঐভাবেই গলা বিকৃত করে ঐ বার্তালাপ নাটকীয়ভাবে বিবৃত করেছেন! যেখানে এন. বিশ্বনাথন 'OFTEN' শব্দটিকে 'অফেন' না বলে 'অফ্টেন' বলেছেন, সেখানে স্বামীজীও বলেছেন 'অফ্টেন'। তখন বুঝলাম, এই সিডিতে যে-কণ্ঠস্বর আছে তা বস্তুত স্বামীজীর নয়, এন. বিশ্বনাথনেরই বিকৃত কণ্ঠস্বর। তাই ঘটনাটিকে আশ্চর্যজনক না বলে অত্যন্ত দুঃখজনক বলাই সমীচীন। বক্তৃতার পূর্বে নারীকণ্ঠের একটি ঘোষণা আছে। তা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে নারী ঘোষক ছিলেন না। অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের বোকা বানানোর জন্য এত পরিশ্রম করে, অর্থব্যয় করে এই সিডি নির্মাণ করেছেন—তাঁরা বোধহয় জানেন না, শিবরূপী বিবেকানন্দ সত্যস্বরূপ ছিলেন। সব অসত্যের আবরণ তাঁর অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবেই।

স্বামী সর্বগানন্দ

বদনগঞ্জে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা

কামারপুকুর থেকে আট মাইল এবং জয়রামবাটী থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত হুগলি জেলার বদনগঞ্জ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। ১৮৭৬ সালে (১২৬২) শ্রীশ্রীমা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি এখানে এসেছিলেন 'পিলে' দাগানোর জন্য। এটি একপ্রকার গ্রাম্য চিকিৎসা এবং রোগীর পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। স্নানের পর রোগীকে শুইয়ে তিন-চারজন লোক তার হাত-পা চেপে ধরত, যাতে সে উঠে না পালায়। তারপর একজন একটা জ্বলন্ত ঝুলকাঠ দিয়ে পেটের ওপর কিছুটা জায়গায় ঘষত। এতে চামড়া পুড়ে গেলে রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করত। জননী শ্যামাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমা এখানে হাটতলায় এসেছিলেন। তাঁরা যখন যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরে উপস্থিত হন, তখন সেখানে অন্য এক ব্যক্তির ঐরূপ চিকিৎসা চলছিল। শ্রীশ্রীমা সব দেখলেন এবং সব আর্তনাদও শুনলেন। যথাসময়ে তিনি স্নান সেরে এলে কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে তাঁকে ধরতে গেল। কিন্তু মা বললেন ঃ "না, কাউকে ধরতে হবে না। আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে থাকব।" বাস্তবিকই তিনি সেই অমানুষিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করেছিলেন এবং পরে তাঁর রোগও সেরে গিয়েছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দজী জানিয়েছেন ঃ "শোনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরও প্লীহা দাগাইবার জন্য কয়াপাটের হাটতলায় গিয়াছিলেন।" (শ্রীমা সারদা দেবী, ১৪শ সং, পৃঃ ৪৭)

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে তাঁর শিষ্য প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ। জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী (রামময় মহারাজ) এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন।

হুগলি জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্গত বদনগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ব্যবস্থাপনায় গত ৩১ মার্চ ১৯৯৬ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের পিলে দাগার স্থানে এক মর্মরফলক স্থাপন করেন। উক্ত স্থানে সেবাশ্রম একটি 'মা সারদা সেবা সদন'ও নির্মাণ করেছে। কামারপুকুর চটি থেকে প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বদনগঞ্জ বাস আছে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই এই ঐতিহাসিক স্থানটি অবস্থিত।

গুরুপদ গুইন
সভাপতি, বদনগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলি, পিন-৭১২১২২

প্রসঙ্গ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও কলকাতা'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৯ সংখ্যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও কলকাতা' শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে দেখা গেল, ঐ প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু তথ্যগত ভুল থেকে গেছে। এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত এবং লজ্জিত। 'উদ্বোধন'-এর মতো ঐতিহ্যবাহী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোন তথ্যগত ভুল থাকা অভিপ্রেত নয়। পাঠকের অবগতির জন্য আমি ভুলগুলি, সেইসঙ্গে সঠিক তথ্যও নিবেদন করছি।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮১	১ম	২৬	১৮২৯	১৮৩৩
১৮৩	১ম	২১	বিদ্যাসাগর	নরেন্দ্রনাথ
১৮৪	২য়	১৯	মনমোহন চৌধুরী	মনোমোহন মিত্র
১৮৫	১ম	৬	রানি ভবানী	ইনি ঠাকুরের সমকালীন নন, ১৭১৪ সালে তাঁর জন্ম।
১৮৫	২য়	১	মনমোহন চৌধুরী	মনোমোহন মিত্র

প্রসঙ্গত, জনৈক 'উদ্বোধন'-পাঠক জানিয়েছেন, ১৮২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১১তম পঙ্ক্তিতে আমি যে লিখেছি—"কেশবচন্দ্র পওহারী বাবার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন।"—তা সঠিক নয়। এবিষয়ে জানাই, 'কথামৃত'-এর (অখণ্ড সং) ১৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে—"কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।" তাছাড়া 'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা 'দুটি তথ্যের সংশোধন প্রয়োজন' শীর্ষক পত্রে আমার উক্ত নিবন্ধে উল্লিখিত একটি তথ্যের বিষয়ে লিখেছেন। সেবিষয়ে সবিনয়ে জানাই, উনি যা লিখেছেন, তাই সঠিক। ঘটনাটির প্রেক্ষাপট 'শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার'। স্থান দক্ষিণেশ্বর নয়। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (অখণ্ড সং) গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আমার প্রবন্ধে যে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে (পৃঃ ১৮১, ২য় স্তম্ভ, পঙ্ক্তি ১০), তা সংশোধন করে দিয়ে শ্রীদাশশর্মা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।'

বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পিন-৭৩৪৪৩০

সুস্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মজীবন

বাণী মার্জিত

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলতেন ঃ "প্রথম প্রথম সাধনভজন করতে গেলে আহার ও স্বাস্থ্য অনুকূল হওয়া চাই।" বলতেন ঃ "জীবনকে নিয়মিত করার চেষ্টা কর, ঘড়ির মতো চলবে। তাতে শরীর-মন খুব ভাল থাকবে।" তিনি এই উপলব্ধির কথা বলেছেন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই।

আজকাল প্রায় সকলেই স্বাস্থ্য-সচেতন। কি করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় তার নানা উপায়ের সন্ধানে কেউ প্রাতঃভ্রমণ, কেউ খাদ্যসংযম (dieting), কেউ আবার চিকিৎসকের পরামর্শে নানাধরনের ব্যায়াম ইত্যাদির দ্বারা সুস্থ থাকার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ঠিক ঠিক ধ্যানজপ করে ঈশ্বরলাভ ও সিদ্ধিলাভ হয়—এটা আমরা জানি। কিন্তু ধ্যানজপের সাহায্যে সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর মনের অধিকারী কিভাবে হওয়া যায় সেটাই বর্তমানে আলোচ্য বিষয়।

আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন করি। আমাদের ফুসফুস-দুটির গঠন অনেকটা বেলুনের মতো এবং এর মুখটা সরু। ফলে দ্রুত শ্বাস নিলে ও প্রশ্বাস ছাড়লে ফুসফুসের মুখটা সঙ্কুচিত হয়ে সম্পূর্ণ বাতাস বাইরে বেরতে পারে না। সেজন্য সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বেড়ে যায়। প্রাণায়ামের সাহায্যে বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমানো হয়।

আমরা খাদ্যগ্রহণ করলে তা বিপাকক্রিয়ার সাহায্যে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের দেহে কিছুটা শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। বিপাকের প্রয়োজনে কিছুটা অক্সিজেন ব্যয় হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কম আহার করলে বিপাকক্রিয়ার হার কম হয়, যার ফলে অক্সিজেনের ব্যয় কম হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের হারও কমে যায়। আমরা সাধারণত যখন ধ্যানে বসি বা যখন মন স্থির করার চেষ্টা করি, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসের হার যথেষ্ট কম থাকে। সাধারণত আমরা প্রতি মিনিটে ১৬-১৮ বার শ্বাস নিই, কিন্তু ধ্যানের সময় এই হার কমে প্রায় ৭-৮ বার হয়।

খাদ্যের পরিমাণ বেশি হলে দেহে বিপাকক্রিয়ার হারও বেড়ে যায়। এই সময় দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে দেহের জলীয় অংশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ে, তাতে দেহ থেকে হাইড্রোজেন বেশি পরিমাণে নির্গত হয়। এর ফলে রক্তে অম্ল-আধিক্য (acidosis) হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যদি উত্তম ধ্যান করার বাসনা নিয়ে আমরা অল্প পরিমাণে আহার করে ধ্যানে বসি, তাহলে বিপাকক্রিয়ার হার কম হবে এবং অম্ল-আধিক্যও হবে না। এই কারণেই বোধ করি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের সাধনকালে রাত্রে কম আহার করতে বলতেন। তাঁর 'মানসপুত্র' স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও পরবর্তী কালে বলতেন ঃ "রাত্রে কম খেলে ধ্যানজপের সুবিধা হয়।" কোন পূজায় উপবাস অথবা সামান্য ফলমূল খেয়ে আসনে বসলে শ্বাসপ্রশ্বাস সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা প্রাণায়াম করতে সুবিধা হয় এবং অম্ল-আধিক্য হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধ্যানের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে রক্তের বিপাকক্রিয়াজনিত অম্ল-আধিক্য (metabolic acidosis) রোধ করা যায়। এতে অক্সিজেনও কম প্রয়োজন হয়। একই কারণে সাধু-সন্ন্যাসীরা উঁচু পাহাড়ে (যেখানে অক্সিজেন কম) অথবা গুহার মধ্যে ধ্যানজপ করতে পারতেন।

কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট বা প্রোটিনযুক্ত—যে-খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন, সেগুলি কোষমধ্যস্থ অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত (oxidised) হওয়ায় কিছু পরিমাণ শক্তি ও তাপ উদ্ভূত হয়। এজন্য আমরা দেখেছি, বেশি পরিমাণে খাওয়ার পর বেশ গরম লাগে। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ফলে গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন কোষ এবং মাংসপেশীতে গ্লাইকোজেন হিসাবে জমা হয়। এই গ্লুকোজ পরিশেষে পাইরুভিক অ্যাসিড ও ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং অল্প পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে। বেশি পরিশ্রম করলে ঐচ্ছিক মাংসপেশীর গ্লাইকোজেন বেশি পরিমাণে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, ফলে রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ বেড়ে যায়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে (aerobic) ল্যাকটিক অ্যাসিড আবার গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়ে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করতে পারে। পরিশ্রমের সময় অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, তাই হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশী আবার ঐ ল্যাকটিক অ্যাসিডকেই পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে কিছু শক্তি উৎপন্ন করে।

আমরা যখন ধ্যানে বসি, তখন শরীরের মাংসপেশী শিথিল (বিশ্রামে) থাকে, তার ফলে মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালন এবং অক্সিজেনের সরবরাহ বেশি হয়। তাতে ধ্যানের সময় রক্তে ল্যাকটেটের মাত্রা কম থাকে। কারণটা আগেই বলা হয়েছে—কিভাবে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ল্যাকটেট খরচ হয়ে শক্তি ও গ্লুকোজ তৈরি হয়। এই শক্তি ও গ্লুকোজ মানসিক শক্তি (mental activity) ও দৈহিক

শক্তি (physical activity) বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু অক্সিজেন কম হলে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হতে হতে একসময় তার মাত্রা বেড়ে যায় (lactic acidosis) এবং এর ফলে মানুষ 'আচ্ছন্ন অবস্থা'য় (coma) চলে যেতে পারে।

কোন ব্যক্তি ধীর-স্থির শান্ত অবস্থায় শুয়ে থাকলে তাঁর ল্যাকটেটের মাত্রা যত কমে, ধ্যানের সময় তার চতুর্গুণ দ্রুত কমবে। কারণ, সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশ নর-এপিনেফ্রিন নামক স্নায়বিক প্রেরক-পদার্থ (neuro-transmitter) নির্গত করে, যা রক্তে মিশে ল্যাকটেটের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই নর-এপিনেফ্রিন আবার ধমনীকে সঙ্কুচিত করে, ফলে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। ধ্যানের সাহায্যে আমরা যদি এই স্নায়ুতন্ত্রকে আয়ত্তে আনতে পারি, তাহলে নর-এপিনেফ্রিনের পরিমাণ কম হওয়ায় ল্যাকটেটের পরিমাণও কম হবে এবং ধমনী সঙ্কুচিত হবে না। ফলে রক্তের চাপও কমে যাবে।

অপর পক্ষে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের অ্যাসিটিল কোলিন নামক নিউরোট্রান্সমিটার ধমনীকে স্ফীত রেখে রক্তের চাপ কম রাখতে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে রক্তচাপ মাপানো ও ওষুধ খাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে যদি ঠিকমতো ধ্যান করা যায়। রক্তচাপ কম থাকলে ধমনী দিয়ে সহজেই বেশি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্তের মাধ্যমে সব কোষ প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন পায়, তাতে ল্যাকটেটের পরিমাণও কমে যায় এবং বেশি শক্তি ও গ্লুকোজ সঞ্চিত হয়।

হৃদ্‌যন্ত্রকে কাজ করতে হলে তাকে একবার সঙ্কোচন ও একবার প্রসারণ করতে হয়। একেই আমরা 'হৃৎস্পন্দন' বলি। সাধারণভাবে আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র প্রতি মিনিটে ৭২-৭৫ বার স্পন্দিত হয়। রক্তের চাপ ও ল্যাকটেটের পরিমাণ কম থাকলে হৃদ্‌যন্ত্রকেও কম পরিশ্রম করতে হয়, ফলে হৃৎস্পন্দনের হারও কম থাকে। এছাড়া হৃদ্‌যন্ত্র নিজে পরিশ্রম না করেও ল্যাকটেট থেকে শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। যাঁরা দ্রুত হৃৎস্পন্দনজনিত (tachycardia) অসুখে ভোগেন, তাঁরাও ধ্যানের সাহায্যে ঐ রোগ থেকে মুক্তি পাবেন।

সাধক যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তখন তাঁর বক্ষদেশ রক্তিম বর্ণ ও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। কারণ, স্ফীত ধমনী দিয়ে তখন বেশি পরিমাণ রক্তচলাচল করে। স্ফীত ধমনীর গাত্রে প্রচ্ছন্ন শক্তি (potential energy) নিহিত থাকে। স্ফীত ধমনী দিয়ে রক্তচলাচল করলে রক্ত ও ধমনীর মধ্যে ঘর্ষণের ফলে ঐ প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। তাই ঐ জায়গাটি উত্তপ্ত হয়। এই কারণে পাহাড়ের ওপর শীতপ্রবণ স্থানেও অনেক সাধুকে খালি গায়ে ধ্যানজপ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাঁদের দেহ ঐ কারণেই উষ্ণ থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, বেশ কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর বেশ গরম লাগে, ঘাম দেয়।

যাঁরা উৎকণ্ঠাজনিত স্নায়ুরোগে (anxiety neurosis) অথবা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ বেশি থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত (stimulated) অবস্থায় থাকে বলে নর-এপিনেফ্রিন নির্গত হয়ে ধমনী সঙ্কুচিত হয়। ধ্যানের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে এসব রোগীও উপকার পেতে পারেন। ধ্যানের গভীর অবস্থায় রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ ও রক্তচাপ দুই-ই কম থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অসময়ে খাওয়া, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির ফলে অনেককে গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগতে দেখা যায়। অর্থাৎ অনিয়মের ফলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড জমে ঘা হয়। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের ভেগাস স্নায়ুতন্তু পাকস্থলীর রস-নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ভেগাস নার্ভ পাকস্থলীতে অ্যাসিড এবং গ্যাসট্রিন নামে একটি হরমোন নিঃসরণ করতে সাহায্য করে। এই গ্যাসট্রিন হরমোনটি আবার নিজেও কিছু অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। তাই প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে আয়ত্ত করে এই অ্যাসিড নিঃসরণকে সংযত করতে পারলে গ্যাসট্রিক আলসার হওয়ার ভয় থাকে না। এর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ও পরিমিত আহার দরকার। খালি পেটে অ্যাসিড বেশি জমে পাকস্থলীর গাত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে। ফলে পেটে যন্ত্রণা হয়, মন দিয়ে ধ্যানজপ করা যায় না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আরেকটি অত্যন্ত জরুরি সমস্যা কোষ্ঠকাঠিন্য, যেজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেও অনেক সময় মনোমত ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ধ্যান বা প্রাণায়ামের সাহায্যে এর উপশম সম্ভব। খাদ্যবস্তু হজম হওয়ার পর দেহের বর্জনীয় পদার্থ বা মল বৃহদন্ত্রের রেক্টাম অংশে এলে সেই অনুভূতি স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) যায়। তখন কতকগুলি প্রক্রিয়া আমাদের শরীরে শুরু হয়, যা মলত্যাগে সাহায্য করে। যেমন গভীর শ্বাস নেওয়ার পর শ্বাসনালীর ওপরের অংশকে (glottis) বন্ধ রেখে পেটের মাংসপেশীতে চাপ দিতে হয়। তাতে মলদ্বারে চাপ সৃষ্টি করে মলত্যাগে সাহায্য করে।

প্রাণায়ামের সময় লম্বা নিঃশ্বাস (পূরক) নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ শ্বাসনালী বন্ধ রেখে (কুম্ভক) আস্তে আস্তে শ্বাস ফেলি (রেচক)। এর ফলে আমাদের বক্ষ ও পেটের সন্ধিস্থলে যে-পর্দা (diaphragm) আছে, তা নিচের দিকে নেমে পেটের ভিতর চাপ বৃদ্ধি করে। সেই চাপ মলত্যাগে সাহায্য করে। সেজন্য সকালে ধ্যানের সময় নিয়মিত

প্রাণায়াম অভ্যাস করলে এবং প্যারা-সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে আয়ত্ত করলে (এটি উত্তেজিত হলে মলত্যাগে সাহায্য হয়) কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। তখন আলাদা করে ব্যায়াম বা ইসবগুল জাতীয় জিনিস খাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

বাইরে থেকে বিভিন্ন অনুভূতি স্নায়ুতন্তু দ্বারা মস্তিষ্কে পৌঁছায়। যতক্ষণ কোন লোক জেগে থাকে এবং মস্তিষ্ক সজাগ থাকে, ততক্ষণ সে তার পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ মানসিক বা জাগতিক—যেকোন একটির দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে। বাইরের অনুভূতি মস্তিষ্কে এলে মস্তিষ্কের ওপরের অংশ (cerebral cortex) তা নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রকে সাধনার দ্বারা বা মনঃসংযোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মনঃসংযোগের দ্বারা এমন একটা ক্ষমতা আসে, যার সাহায্যে ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ও সংযম বৃদ্ধি পায়। ছাত্রছাত্রীরাও যদি মনঃসংযোগ অভ্যাস করে, তারা পড়াশোনা অনেক ভাল করতে পারবে এবং তার জন্য কোন 'ব্রেন টনিক'-এর প্রয়োজন হবে না। ❑

শব্দচেতনা ২৫

স্বামী বিবেকানন্দের রচিত স্তোত্র, তাঁর প্রিয় স্তোত্রাদি, উপনিষদ্ ইত্যাদি অবলম্বনে তৈরি শব্দছক।

■	১		■	২		■	৩	■
৪		■	৫		■	৬		■
■	৭		■	৮		■	৯	
১০		■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫	
১৬		■	১৭		■	১৮		■
	■	১৯		■	২০		■	২১
■	২২		■	২৩		■	২৪	
২৫		■	২৬		■	২৭		■
■	২৮		■	২৯		■		■

পাশাপাশি : (১) '—— কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে' *(বীরবাণী)* (২) '—— সুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ' *(শিবমহিম্নস্তোত্রম্)* (৪) 'বারাণসীপুরপতিং —— বিশ্বনাথম্' *(বিশ্বনাথাষ্টকম্)* (৫) '—— বন্দন বন্দি তোমায়' *(বীরবাণী)* (৬) 'অন্তবন্ত ইমে —— নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ' *(গীতা)* (৭) 'ভজ শিব ওঁকার —— শিব ওঁকার' *(সঙ্গীতসংগ্রহ)* (৮) 'তদেব মে দর্শয় —— রূপং/ প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস' *(গীতা)* (৯) '—— সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা' *(গীতা)* (১০) '—— বা কৃতং কিমকৃতং ক কপাললেখঃ' *(বীরবাণী)* (১১) '—— ত্বেন পৃথক্ ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম্' *(গীতা)* (১২) '—— রূপং মিদং সর্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্' *(বিবেকচূড়ামণি)* (১৩) '—— জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' *(কঠ উপনিষদ্)* (১৪) যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা —— লোকে' *(কঠ উপনিষদ্)* (১৫) 'আশ্চর্যো —— কুশলোঽস্য লব্ধা' *(কঠ উপনিষদ্)* (১৬) 'গীতং শান্তং মধুরমপি —— সিংহনাদং জগর্জ' *(বীরবাণী)* (১৭) '—— রিপৌ ত্বয়িবিষমং তব পদ্মনেত্রম্' *(বীরবাণী)* (১৮) '—— লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' *(গীতা)* (১৯) 'ন —— সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং' *(কঠ উপনিষদ্)* (২০) '—— শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়' *(হরগৌর্যষ্টকম্)* (২২) 'যে —— মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' *(গীতা)* (২৩) 'লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ ——' *(শিবনামাবল্যষ্টকম্)* (২৪) 'পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ —— ন বচঃ' *(শিবমহিম্নস্তোত্রম্)* (২৫) '—— এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা' *(গীতা)* (২৬) '—— কুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগর পারং' *(গঙ্গাস্তোত্রম্)* (২৭) 'অনাথো দরিদ্রো —— রোগ যুক্তো' *(ভবান্যষ্টকম্)* (২৮) 'ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিদ্ দুর্গতিং —— গচ্ছতি' *(গীতা)* (২৯) '——বর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে' *(গীতা)*।

ওপর-নিচ : (১) 'প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো ——' *(বীরবাণী)* (২) 'জগজ্জনন্যৈ —— নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়' *(হরগৌর্যষ্টকম্)* (৩) '—— পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ' *(কৌপীনপঞ্চকম্)* (১৬) '—— সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প-বর্জিতাঃ' *(গীতা)* (১৭) 'কিং বা পুত্রকলত্র —— পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্' *(শিবাপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রম্)* (১৮) '—— যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' *(গীতা)* (১৯) '—— তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি' *(গীতা)* (২০) 'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে —— সংশয়াঃ' *(মুণ্ডক উপনিষদ্)* (২১) '—— ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' *(কঠ উপনিষদ্)* (২২) 'বশ্যাত্মনা তু —— শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ' *(গীতা)* (২৩) 'চাম্পেয়গৌরার্ধ —— কায়ৈ, কর্পূরগৌরার্ধ শরীরকায়' *(হরগৌর্যষ্টকম্)* (২৪) 'কালী —— চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা' *(মুণ্ডক উপনিষদ্)*।

শুক্লা পাঠক

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

যাঁরা সবসময় আনন্দে থাকতেন

রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) খুব মজা করতে পারতেন। তাঁর নির্মল আনন্দের ভাগী হতেন সকলে। অবশ্য মাঝে মাঝে কেউ কেউ বেজায় চটে যেতেন, কিন্তু পরক্ষণেই মহারাজের শিশুর মতো সরল হাসি দেখে আর রাগ করতেন না। একবার গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দজী) খুব চটেছিলেন। সেবারে হলো কি, ওড়িশার কোঠারে দুজনেই একসঙ্গে আছেন। গঙ্গাধর মহারাজের সারগাছি ফেরার খুব তাড়া। সারগাছি মুর্শিদাবাদ জেলায়। অর্থাৎ ওড়িশা থেকে ট্রেনে হাওড়া স্টেশন। তারপর হাওড়া থেকে শিয়ালদা। সেখান থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে সারগাছি। অনেক পথ। তাই তাড়া খুব। রাজা মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অনেক অনুরোধ করলেন—যেও না, যেও না। কে কার কথা শোনে! তখন রাজা মহারাজ পালকির বেহারাদের ডেকে চুপি চুপি বলে দিলেন—পালকিতে উঠেই (গঙ্গাধর) মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে। আর যেই তিনি ঘুমোবেন, অমনি তোমরা স্টেশনে না গিয়ে এই আশ্রমে ফিরে আসবে। বেহারারা বলল—তাহলে পয়সা পাব না। মহারাজ বললেন—আমি ডবল দেব। তারা কিছুক্ষণ পালকি বয়ে যথাসময়ে আশ্রমে ফিরে এল। এদিকে স্টেশন এসেছে ভেবে গঙ্গাধর মহারাজ হাসিমুখে পালকি থেকে যেই নেমেছেন, দেখলেন সামনে মহারাজ। ভাবলেন, বিদায় জানাতে মহারাজ বুঝি স্টেশনে নিজেই এসেছেন। কিন্তু স্টেশন কোথায়! এ যে সেই কোঠারের বাড়ি! মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কি, ফিরে এলে যে? সব বুঝে গঙ্গাধর মহারাজ চটে লাল। কিন্তু মহারাজের কৌতুক-মাখানো সরল হাসি দেখে রাগ আর রইল না।

পাটোয়ার ভক্ত

ভগবতী তুষ্টা হলেন
তাঁর ভক্তের 'পর,
হাসিমুখে বলেন—বলো,
কী চাও তুমি বর?

ভক্ত বড়ই চতুর, বলে
জোড় করে দুই হাত—
নাতির সঙ্গে খাই যেন মা,
সোনার থালায় ভাত!

ব্যাস, সহজেই পড়ল মারা
দুই পাখি এক ঢিলে,
নাতির মুখ আর ঐশ্বর্য—
দুটোই গেল মিলে।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

ছবি: অনুস্মিতা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি, ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

বি.দ্র.: ওপরের ছড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পকে ভিত্তি করে রচিত। এরকম আরো অনেক ছড়া আছে—'শুকদেবের গুরুদক্ষিণা দান', 'নেমন্তন্ন বাড়িতে শুরুতে শব্দ, শেষে নিঃশব্দ', 'দাঁত গেছে তাই পাঁঠাবলি বন্ধ', 'সূর্যঘড়ি', 'বাবলা গাছ দেখে', 'মর্কট বৈরাগ্য', 'ভোলেনি সংস্কার' ইত্যাদি। আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা আগামী দুমাসের মধ্যে উপরি উক্ত সাতটি গল্প-ভিত্তিক সাদা-কালো ছবি পাঠাতে পার। মনোনীত হলে তা ছাপা হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা—
'সবুজ পাতা', প্রযত্নে—সম্পাদক, 'উদ্বোধন', ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩

আদি শঙ্করাচার্য ২৩

শিশু ও কিশোর বিভাগ

চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ অন্য চোখে

তরুণকুমার দে

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্মনিরপেক্ষতার পথে

এটা সকলেই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা কালী থেকে শুরু হয়ে ব্রহ্ম, অদ্বৈত পরিক্রমা করে ইসলাম, খ্রিস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পরিমণ্ডলে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সকল ধর্মমত সাধককে একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তাই সব ধর্মের মানবকল্যাণের দিকগুলি তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পালার মধ্যে এক জায়গায় নরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি ব্যাখ্যা করেন ঃ "খিস্টেনরা যিশুকে চায়, মেরি মাকে চায়, তাদের ঈশ্বর ঐরকম। আবার মুসলমানেরা কোন মূর্তি পছন্দ করে না, তাই তাদের আল্লা নিরাকার। কেউ আগুনকেই ঈশ্বর বলে পুজো করে, আগুনই তাদের দেবতা।... তোদের ঐ বিদ্যেসাগরকে দেখেছিস তো?... ওরও দেবতা আছে।... ঐ যে অভাগী বিধবাগুলোর মধ্যে।" বস্তুত, কেউ ঈশ্বরবিশ্বাসী না হলেও মানবকল্যাণকর কাজ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভালবেসেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন। পালাকার এই সুরটিকে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উপদেশকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পালার একেবারে শেষে ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ॥ সব ধর্মের নিয্যেসটুকু টেনে নিয়ে তুই এই মাটির মাকে সাজা।"

এই পথ বেয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'সেকুলারিজম' আসতে পারে। কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-যুগ অস্পৃশ্যতায় কলঙ্কিত। পরবর্তী যুগেও ভারতবর্ষ অস্পৃশ্যতা-মুক্ত হতে পারেনি। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে গুণ্টুরের এক গ্রামের হরিজনদের হাতে তাঁকে তৃষ্ণার জল পান করতে দেননি সহযোগী বন্ধুরা। এই ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পালার মধ্যে দেখা গিয়েছিল, এক নিম্নবর্ণের (দুলে) মেয়ে দক্ষিণেশ্বর এবং কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিজনদের কাছে ঘন ঘন আসত। তার সঙ্গে নিজের মাকে দেশে পাঠাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সঙ্কোচ ছিল না। দুলের মেয়ে চিন্ময়ী আর আরাধ্যা দেবী কালী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রমণি দেবী সেজন্যই নির্ভীকভাবে বলতে পেরেছিলেন ঃ "আমি বেহ্মজ্ঞানীর মা, খিস্টেনের মা, মোছলমানের মা, আমার কাছে ছোটলোক কেউ নেই, সবাই সমান।" বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ ছিল না, শ্রীচৈতন্য বর্ণ ও ধর্মভেদের বেড়া ভেঙে ফেলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ স্রোতকেই আরো বেগবতী করেছেন।

মানবতাবাদী

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ণ মানবতাবাদী। সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। পালার ছত্রে ছত্রে সেই চিহ্ন রেখেছেন পালাকার। নটী বিনোদিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করেছিলেন। ঐ কাহিনী নিয়ে পালাকারের একটি বিখ্যাত পালা রয়েছে। ঐ পালাতে একটি দৃশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এক গণিকা বাঈজীকে দেখা যায়। সে শ্রীরামকৃষ্ণকে পথভ্রষ্ট করবে বলেই এসেছিল। কিন্তু যেভাবে লক্ষহীরা বাঈজী সাধু হরিদাসের কাছে এসে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে ঐ বাঈজী হার মেনেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মঞ্চে নাট্যাভিনয় দেখার যাই উদ্দেশ্য থাক, তাঁর আগমনে যে মঞ্চশিল্পীরা সম্মানলাভ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাস বলে, একদিন নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়ে তিনি অপমানিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য তিনি শিল্পীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। যিনি তাঁকে অপমান করেছিলেন, অনুতাপদগ্ধ সেই গিরিশচন্দ্রের পাশে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পার্ষদগণ প্রতিবাদ করলে তিনি বলেছিলেন (পালার সংলাপ) ঃ "যাদের কেউ ঘরে উঠতে দেয় না, যাদের সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তারাই জগতের রথ টেনে আসছে। ওদের কাছে যাবনি তো যাব কোথায়? ওদের কাছে গেলে, ওদের পাশে দাঁড়ালে, ওদের একজন হতে পারলে আমার সাধনা সফল হবে।"

ঠিক এই সংলাপ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে বের হয়নি সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত মানবতাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর মুখে ঐ সংলাপ আদৌ বেমানান ছিল না। পালাকার এজন্যই সাহসী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপাংশে "মানুষ ঠাকুরকে যে মানে না, সে আকাশের ঠাকুরের চেয়ে বহুদূরে রয়ে যায়"—এই কথাগুলি যুক্ত করেছিলেন।

সিংহহৃদয়

যত বিনয়ী থাকুন না কেন, যতই মান-অপমান তুচ্ছ করুন না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সিংহহৃদয়। যে-যুগে মানুষ ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই যুগে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "যত মত তত পথ"। হিন্দু হয়েও তাঁর ইসলামধর্ম সাধন

করা, সকল ধর্মের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করা ছিল যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক। পালার মধ্যে এই সিংহহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজে পাই। পালার শেষদিকে প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন : "মুসলমানকে দেখ, গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে; অথচ এক ডাকে সবাই হাজির।" এই সিংহহৃদয় ছিল বলেই তিনি সমাজের অবহেলিত গণিকাকে আশীর্বাদ করতে পেরেছিলেন, উপেক্ষিত মঞ্চশিল্পীদের মাঝে বারবার ছুটে যেতে পেরেছিলেন। গোটা পালা জুড়ে একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা করে অদ্বৈতচেতনার চরমে ওঠা, কিছু পরেই আবার ইসলামধর্মে প্রবেশ করার ঘটনা বিধৃত রয়েছে। সেইসঙ্গে ছুঁৎমার্গ পরিহার, ব্রাহ্মণের চিহ্ন পৈতে ফেলে দেওয়া এবং সব ধর্মের আসরে উপস্থিত হওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা পালায় দেখানো হয়েছিল। বৈষ্ণবকুলের অহঙ্কার চূর্ণ করার ঘটনাটিও পালায় ছিল। পালার শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বাস্তবের শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই বিনয়ী অথচ নির্ভীক; সরল অথচ দৃঢ়চিত্ত; হিন্দু হলেও সব ধর্মের ইতিবাচক ও মানব-কল্যাণকর দিকগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেছিলেন : "রামকৃষ্ণ মানুষগুলোকে গরু-ভেড়ার মতন বিনয়ী অর্থাৎ আহাম্মুক হইতে উপদেশ দেন না। তিনি বলেন সকলকে পুরুষ হইতে। ভয়-বিজয়ী, দুর্বলতা-বিজয়ী, সাহসশীল, পুরুষকারশীল নরনারী গড়িয়া তুলিবার জন্যই এইসকল কথোপকথন।"

শ্রীমা সারদাদেবী

পালাতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা সারদাদেবীর আসার ব্যাখ্যাটি নাটকীয় করা হয়েছিল। 'ভাণ্ডারী' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তি সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ জানিয়ে মিথ্যা খবর পাঠিয়েছিল। সারদাদেবী সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছিলেন। ভাণ্ডারী ভেবেছিল, সারদাদেবী এলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য ও শিক্ষায় সারদাদেবীর মধ্যে সার্বজনীন মাতৃত্বের জাগরণ হয়েছিল। পালার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপ ছিল : "গোটা পৃথিবী জোড়া আমার কোটি কোটি সন্তান। আর সন্তানে প্রয়োজন নেই মা। তাছাড়া... ছেলেপিলে থাকলেই পক্ষপাত আসে। দেশের ছেলে আর নিজের ছেলেতে তফাৎ হয়ে যায়।"

বলা বাহুল্য, কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেননি, এটি পালাকারের সংযোজন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন : "মানুষ দেখতে সুন্দর, কেউ কালো, কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভেতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।" —এ-পালার সংলাপ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

ইতিহাস বলে, বুদ্ধত্বলাভের পথে সিদ্ধার্থ-গৌতম যুবতী স্ত্রী যশোধরাকে পিছনে ফেলে চলে গিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য হওয়ার শুরুতেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করেছিলেন। যিশু নারীসঙ্গ বর্জনের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র বলেছে—নারী নরকের দ্বার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতিকে যেরকম শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন, তা বাস্তবিকই বিরল।

এ-পালা রচনার আগে-পরে পালাকার যতগুলি পালা লিখেছেন, সব পালাতেই নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। বিনোদিনী ও সোনাই-এর মতো অসংখ্য নারী ত্যাগ, দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদের অলঙ্কারে ভূষিত হয়েছিল তাঁর হাতে। এ-পালার সবকয়টি নারীচরিত্রই বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল সারদাদেবীর চরিত্রটি। কারণ, গ্রামের বাড়িতে থেকেও তিনি স্বামীর ইসলাম ধর্মগ্রহণ করাকে সমর্থন করতে পেরেছিলেন (পালার সংলাপে) : "তুমি ভৈরবী মার কাছে তন্ত্রের সাধনা করেছ, তোতাপুরীর সঙ্গে ব্রহ্মদর্শন করেছ, হনুমানভাবে রামচন্দ্রকে পেয়েছ, রাধার ভজনায় কৃষ্ণকে পেয়েছ। আমি ভাবছিলাম, ইসলাম আর খ্রিস্টান—এ দুটি ধর্মই বা আর বাকি থাকবে কেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে, পালার সংলাপানুযায়ী, "বাঙালীর মা, বিহারীর মা, ভারতবাসীর মা, ইংরেজের মা, শিখের মা, মুসলমানের মা, খ্রিস্টানের মা"-তে পরিণত করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রায় শেষদিকে তাঁর আগমন ঘটেছিল। এ-পালায় দেখা যায়, গিরিশ স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক ও দুঃখে শান্তির আশায় বিভিন্ন ধর্মস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বহু জায়গায় নীরস তত্ত্বকথা শুনে শুনে তিনি বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়ছেন। এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন—পালাটিতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছিল। গিরিশের মনের মধ্যে একদিকে ছিল নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা, অন্যদিকে তাঁর মনে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছিল। পালাকার এই বৈপরীত্য দিয়েই গড়ে তুলেছিলেন গিরিশ-চরিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্রের মুখে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসীর সংলাপ—

"নরেন॥ [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলে, ঈশ্বরকে দেখেছি, তার সঙ্গে আমি কথা কই, ঝগড়া করি। এ কখনো হয়।

গিরিশ॥ না, হয় না। Empty vessel sounds much.

নরেন॥ আবার নাকি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী!

গিরিশ॥ Absurd! কত বিশ্বামিত্র দেখলুম, ভরদ্বাজ দেখলুম, বাকি আছে দক্ষিণেশ্বরের রামকেষ্টবাবাজী। ঝুট!"

সাক্ষাতের পরে সেই গিরিশই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন (পালার সংলাপে) : "কে তুমি? তোমার মুখের কথায় বিষ হয় অমৃত, তোমার চোখের চাউনিতে সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে যায়, তোমার কথায় মনটাকে পাগল করে তোলে।"

এর পরেও গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছিলেন। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচুর গালমন্দ করলেও তাঁকেই তিনি প্রণাম করে যান। পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বকলমা দিয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন।

তিনি থিয়েটার ছেড়ে দেবেন বলতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন (পালার সংলাপে)ঃ "অমন কাজ করোনি বাপু! তোমাকে উপলক্ষ্য করে হাজার হাজার লোকের উদ্দীপন হচ্ছে, এ কি চাট্টিখানি কথা?" কঠোর বাস্তববাদী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, থিয়েটার মতপ্রকাশ ও প্রচারের একটা বৃহৎ মাধ্যম। এও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গিরিশচন্দ্রের অভিনয় করা ও নাট্যরচনার প্রতিভা উচ্চস্তরের। সেজন্যই শিষ্যকে সব ছেড়ে ইষ্টনাম জপ করতে উপদেশ না দিয়ে মঞ্চকেই লোকশিক্ষার মাধ্যমরূপে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে অন্তত বাংলার রঙ্গালয়ের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পেরেছিল। অর্থাৎ পরোক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গালয়ের উন্নতির স্রোতকে বেগবতী করেছিলেন।

প্রধান শিষ্য

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রায় শেষদিকে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। গিরিশের মতোই নরেন্দ্রনাথও সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের পাহাড় নিয়েই তাঁর গুরুর কাছে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মনে অন্ধবিশ্বাসের স্থান ছিল না। সেজন্য তিনি গুরুকে মেনে নেওয়ার আগে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। ঐসব পরীক্ষার কাহিনী সবারই জানা। এ-পালাতেও তার দু-একটি বর্ণিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে আলোচ্য পালাতে গুরুর শিষ্যকে বাজিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গটিও এসেছিল—বিশেষত যে-দৃশ্যে পিতৃহীন নরেন্দ্রনাথ সংসার প্রতি-পালনের জন্য কালীমন্দিরে প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। হৃদয়ের প্রশ্নের উত্তরে সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সংলাপ ছিল—"(টাকা) চাইতে যদি পারে, তাহলে আর ওকে আমি চাইবনি।" "কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবেনি?"

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই নরেন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। পালাকার শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে "গোটা বিশ্বের হাহাকার বন্ধ কর, ঘরের কান্না এমনি কমে যাবে।" সংলাপ দিয়ে ঐ নির্দেশকেই ধ্বনিত করেছিলেন।

সবাই জানেন, নরেন্দ্রনাথ ভবতারিণীর কাছে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পালাকার ঐ প্রার্থনাকে রূপান্তরিত করেছেন এইভাবেঃ "মা, আমাকে বিবেক দাও, যেন লক্ষ কোটি আর্ত মানুষের ব্যথা বুঝতে পারি; মা, আমাকে বৈরাগ্য দাও, যেন পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞানে অপরের জন্য বিলিয়ে দিতে পারি; জ্ঞান দাও, যেন সঠিক পথে চলে মানুষের সেবা করতে পারি; ভক্তি দাও, যেন সবাইকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে পারি, জীবের মাঝে শিবরূপী তোমার দর্শন যেন নিত্য লাভ করে ধন্য হই।"

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ও বাণীর ভিত্তিতে তাঁর মুখে ঐ সংলাপ বেমানান নয়। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে যতই ভাববাদী বলা হোক না কেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

অবতার

রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্রিশ কোটি হিন্দুর দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার ফলশ্রুতি—যাঁকে লোকে পূর্ণ অবতার-রূপেই দেখে থাকে। যোগেশ্বরী ভৈরবীর মতে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'গৌরাঙ্গের অবতার নিতাইয়ের খোলে'। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৮২)

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ব্যক্তিত্ব ও সহজ অথচ গভীর উপদেশ এবং তৎকালীন প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পালার শ্রীরামকৃষ্ণের মতে দেবতা তাঁকেই বলা হয়, যাঁর মধ্যে অসংখ্য মানবিক গুণের সমন্বয় ঘটে। একটু পরেই-আবার তাঁকে "কত ভক্ত পুজো করবে", "দলে দলে মানুষ এসে পায়ে অঞ্জলি দেবে"—এসব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "আমাকে শুধু ভালবাসবার অফুরন্ত শক্তি দে মা।" পালার শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তবের মহামানবের মতোই সাধারণ মানুষের মঙ্গল চেয়েছিলেন, নিপীড়িত মানুষের মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

একসময়ে বৈষ্ণব সমাজের নেতারা শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এক বৈষ্ণব সভায় তিনি গৌরাঙ্গের আসনে বসেছিলেন বলেই বৈষ্ণব সমাজের নেতা ভগবানদাস তাঁকে কালনায় গিয়ে জবাবদিহি করে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কালনায় তিনি উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ভগবানদাসও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পালাতে ছিল ভগবানদাস শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ "আমি নিশ্চিত বুঝেছি, তুমি যোগী-বাঞ্ছিত নবদূর্বাদলশ্যাম। তুমিই সত্যযুগে প্রহ্লাদকে বাঁচাতে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলে। তুমিই ত্রেতায় ধনুর্বাণ হাতে রাক্ষস দমন করেছিলে। দ্বাপরে তুমিই গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলেছিলেনঃ "ও সেজোবাবু, ও হৃদু, দ্যাখ দেখি, আমায় কেমন হ্যানস্তা কচ্ছে।"

পালার মধ্যে এও আছে, অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "করতে হবে না তোকে বিশ্বেস। মানুষকে তো মানিস? সেই মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দে।" অর্থাৎ দেবতার চেয়ে মানুষকেই তিনি গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন। পালাতে যে-কয়টি অলৌকিক ঘটনা

প্রদর্শিত হয়েছিল, পালাকার সবগুলিরই প্রায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহজ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপে যুক্ত করেছিলেন। বস্তুত, তিনি উপদেশ দেওয়ার জন্য যেসমস্ত গল্প বলতেন, সেগুলির প্রায় প্রতিটিই ছিল বাস্তবানুগ। এদিকটি বিচার করেই পালাকার পালার চরিত্রটিকে প্রায় যুক্তিবাদী করেছিলেন। এক্ষেত্রে সম্ভবত বাস্তব শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে পালার চরিত্রটি সামান্য সরে এসেছিল। কিন্তু তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্যাদাহানি ঘটেনি। পালার নানা চরিত্র—মথুর, হৃদয়, রাসমণি, এমনকি একদা অবিশ্বাসী গিরিশ ও নরেন্দ্রনাথও তাঁকে মহামানব বলেই চিনেছিলেন। প্রথম তিনজন তো তাঁকে দেবতাসদৃশ ভাবতেন। পালাকারের বিখ্যাত 'নটী বিনোদিনী' পালায় অমৃতলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণকে "দেবতা বলে বিশ্বাস করেননি, কিন্তু খাঁটি সোনা বলে বিশ্বাস" করেছিলেন। সম্ভবত পালাকার নিজেও তাই বিশ্বাস করতেন। পালাটি অন্তত সেই প্রমাণই রেখেছিল।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেননি। তিনি মুখ্যত হিন্দুর প্রচলিত ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের তত্ত্বের গভীরেও ডুব দিয়েছিলেন। সব ধর্মের সার নিয়েই পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-বর্জনযোগ্য, শুভ-অশুভ সম্পর্কে একটি প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বরের উপাসক হলেও তাঁর কাছে মানুষই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। পালাকার আলোচ্য পালায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিকটিই যথাসম্ভব তুলে ধরেন। পরমহংস বা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পালাতে উপস্থাপিত হননি। এ-পালাতে তিনি এসেছেন সরল, নির্লোভ, অসাম্প্রদায়িক, অস্পৃশ্যতাবিরোধী, নির্ভীক এক মহামানবরূপে—যাঁর জীবন, চরিত্র ও প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই আজও মানুষকে অনেক শিক্ষণীয় পথের সন্ধান দিতে পারে।* [সমাপ্ত] ❑

* নিবন্ধের কিছু কিছু সংলাপ নাট্যকারের মনঃকল্পিত হলেও নাট্যরূপের খাতিরে আমরা সেগুলি উল্লেখ করেছি। এই রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।—সম্পাদক

স্বামীজি! আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সংখ্যার পর]

মহাশিবের আহ্বান!

তুমি শিব। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ। মা জানতেন। তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, আমার নরেন, আমার বিলে ভীষণ রাগী ছিল। রেগে যখন সব লণ্ডভণ্ড করছে, তখন টেনে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতুম। শিব যে ঠাণ্ডা জলে সন্তুষ্ট!

শ্রীম লিখছেন ঃ "বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশি দিন যান নাই (১৬ আগস্ট ১৮৮৬, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩, রাত ১টা ২ মিনিট)। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। একদিন রাখালের পিতা বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য রাখালকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল বলিলেন, 'কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন! আমি এখানে বেশ আছি। এখন্ আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।' "

মাস্টারমশাই বেলা নটার সময় মঠে ঢুকে দানাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি লিখছেন ঃ "তাঁহাকে [শ্রীম] দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।'

"তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্, বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূলরাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।।'

"আজ সোমবার, শিবরাত্রি, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭।"

শিব শিবের চিত্র আঁকছেন গানে। অনল ত্রিশূল। গরজে গঙ্গা। গঙ্গার গর্জন তাঁর কণ্ঠে। শুনে স্তম্ভিত শিকাগো ধর্মমহাসভার কয়েক হাজার মানুষ। তাঁর শরীরটাই তো অনল-ত্রিশূল! নিবেদিতা তাঁকে বলতেন— 'King'।

শিব চলেছেন শিবদর্শনে—অমরনাথে। সঙ্গী কন্যা নিবেদিতা। শত শত যাত্রী চলেছেন অমরনাথ দর্শনে। ১৮৯৮ সাল। আজও সেই একই দৃশ্য। বিরামহীন। বিরামবিহীন মহা ওঁকার ধ্বনি। স্বামীজী আজও চলেছেন সহস্রপদে। নিবেদিতার উচ্ছ্বসিত উক্তি ঃ "Oh! India is indeed the Holy Land."

এ-দৃশ্য স্বামীজীর পরিচিত। নিবেদিতা অবাক হয়ে দেখছেন। পাহাড়ের মাঝখানে নানা আকারের কয়েকশো তাঁবু। সঙ্গে দোকান-বাজার, ক্রেতা-বিক্রেতা। নিমেষে এক শহর। যেন বাজিকরের বাজি। ঘোড়া, দোলা, ডাণ্ডি। গৃহী, সন্ন্যাসী। পাহাড়ী রাত। প্রবল ঠাণ্ডা। গৈরিক ছাতার তলায় তলায় ভস্মাবৃত সন্ন্যাসীর দল। সামনে ধুনি জ্বলছে। বাতাসে আগুনের ফুলকি। কেউ ধ্যানে নিশ্চল। কোথাও শাস্ত্র আলোচনা। কোথাও মশাল জ্বলছে। রাম-শিঙা বাজছে। শাঁখ। সমবেত কণ্ঠে শিবস্তোত্র। 'হর, হর, বম্, বম্' ধ্বনি।

কবে একদল মেষপালক সু-উচ্চ পাহাড়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিল অলৌকিক এক তুষারলিঙ্গ। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অতুলনীয় বর্ণনা—"তিনি (স্বামীজী) শ্বেত তুষারলিঙ্গটির মনোহর কবিত্বের দিকটাও দেখাইতে ভুলিতেন না, আর তিনি কল্পনা করিতেন যে, এক সুদূর অতীতকালে একদল মেষপালক কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের অনুসন্ধানে বহু দূর ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবক্রমে এখানে আসিয়া পড়ে ও গুহামধ্যে প্রবেশপূর্বক তুষারলিঙ্গের অস্তিত্ব জানিতে পারে। সরলমনা তাহাদের তখনি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইনি স্বয়ং মহাদেব।" কর্পূর-ধবলাঙ্গ। রজতগিরিনিভং।

২৯ জুলাই ১৮৯৮। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে সব লিখে রাখছেন। বিদেশিনীরা স্বামীজীকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছেন না। তিনি নিজের ভাবে, নিজের মতো আছেন। তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর ভীষণ আগ্রহ। একাহারী। সাধুসঙ্গ ছাড়া অন্য সঙ্গ পরিহার করেছেন। কখনো কখনো তাঁবুতে আসছেন। তখন তাঁর হাতে মালা। শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য স্বামীজী নিজেকে তৈরি করছেন। সারাদিন উপবাস। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে সামান্য আহার। বাক্‌সংযম, নির্জনে অবস্থান, মালাজপ, ধ্যান। স্বামীজী ধ্যানসিদ্ধ। বিদেশিনীরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপের কতটুকুই বা জানেন। জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। নরেন্দ্র কাকেও 'কেয়ার' করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল। কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নেই। যেন কোন বন্ধন নেই।"

নিবেদিতা স্বামীজীর সেই রূপ দেখছেন। নিবেদিতা লিখছেন ঃ "I am learning a great deal." এই স্বামীজীকে নিবেদিতা দেখেননি।

১৮৮৬ সালের নরেন্দ্রনাথ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর। অসুস্থ। নরেন্দ্রনাথ নানাভাবে বিপর্যস্ত। সহিষ্ণুতার পরীক্ষা চলছে। বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রনাথ মাস্টার-মশাইকে বললেন ঃ "অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে।

মাস্টারমশাই, আপনি দুঃখকষ্ট পান নাই তাই,—মানি দুঃখকষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute Dependence on God. দুজনের আলোচনা ঈশ্বরপথের গোপন কথা, সাধকের ব্যক্তিগত ভাবের একান্ত কথা—

"নরেন্দ্র।। আমার জন্য [ঠাকুর] মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না, বাবার কাল হয়েছে, বাড়িতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

"মাস্টার।। তা জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম।

"নরেন্দ্র।। টাকা হলো না। তিনি বললেন, 'মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত-ডাল হতে পারে।'

"এত আমাকে ভালবাসা; কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন। অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখনো কখনো গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর (ঠাকুরের) কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠল না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত উঠে আর উঠল না। বললেন, 'তোর এখনো হয় নাই।' "

এমন অকপট আলোচনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি পরবর্তী কালে পৃথিবীতে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হবেন। আর্থকোয়েকের মতো 'বিবেকানন্দ-কোয়েক'। 'এপিসেন্টার' শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেন্দ্রনাথের সেই রাতের 'কনফেসান'—"এক-একবার খুব অবিশ্বাস আসে, যেন ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নাই।"

"মাস্টার।। ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক-একবার হতো।"

দুজনে চুপ করে বসে আছেন। ভাঙা, ভুতুড়ে বাড়ি। লণ্ঠনের মৃদু আলো। বাইরে রাতের অন্ধকার। অনন্তের রহস্য। সেই প্রশ্ন—আমি কোথাও পাব তারে।

এই অস্থিরতার শুরু উদ্যানবাটীর শেষের দিন থেকে। ঠাকুর প্রস্তুত। চলে যাবেন। এগোচ্ছেন তিনি। অন্তরঙ্গদের জানাচ্ছেন—"মনে হচ্ছে, জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূর চলে যাচ্ছি।" নরেন্দ্রনাথের হয়তো মনে হলো, প্রভুর আরোগ্য যখন অসম্ভব, তখন মৃত্যুসিদ্ধ সেই অবতারের কাছে গিয়ে মৃত্যু শিখে আসি। যাঁর ধর্মের মূলকথাই হলো—'লার্ণ ডেথ'। নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই গুরুভ্রাতা তারক ও কালীকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন কয়েকদিনের জন্য। [ক্রমশ]

(৪৯৩ পৃষ্ঠার পর)

পল্লবগ্রাহী সাংবাদিকতার ভাইরাস মনে হয় তাঁদের সময়ে এত বেশি ছোঁয়াচে ছিল না। সেকারণেই সচেতন গবেষণার এক সৎ ও উদ্দেশ্যমুখী যত্ন তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। ছোট ছোট পরিচ্ছেদে আলোচনাকে বিভক্ত করার ফলে একঘেয়েমির আক্রমণ নেই কোথাও। তথ্য পরিবেশনায় লেখক কালানুক্রম মেনে চলার চেষ্টা করেননি সচেতনভাবেই। ফলত, একটি গল্পরীতির আভাস আছে, যা সুখপাঠ্য; যদিও কখনোই সাহিত্যিকের তথ্য-উপেক্ষার মাধ্যমে কল্পলোকবিলাসের চেষ্টা নেই। ব্রিটিশ মহাফেজখানার কাগজপত্র সংক্রান্ত আলোচনাটি যেমন মূল্যবান, তেমন আকর্ষণীয়। নেতাজীর চিকিৎসা এবং 'মৃত্যু' বিষয়ে দুজন ডাক্তারের দুরকম রিপোর্ট দেখলে সত্যই চমকে উঠতে হয়। গভীর উদ্বেগে ভাবতে হয়, তাহলে এতদিন কোন্ ইতিহাস পড়েছি? জাতীয় কংগ্রেসের আধিপত্যলাভের কাহিনীও ভারতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, যদিও গৌরবের নয়। নেতাজীর কালানুক্রমিক এক বিশদ জীবনপঞ্জী নিঃসন্দেহে চমৎকার, অনেক মূল্যবান তথ্যের প্রাপ্তিস্থল। সাদা-কালো আলোকচিত্রগুলি পুরনো বলেই বোধহয় কিছুটা অস্পষ্ট, তবে এক শিহরণজাগানো ইতিহাসের অ্যালবাম। 'সিওনান' (Syonan) থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে পাঠানো আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে লেখা নেতাজীর চিঠিটি গ্রন্থের এক অমূল্য অলঙ্কার। 'নেতাজীর দুঃসাহসিক নজিরহীন যাওয়া আসা', 'আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয় অভিযান', 'নেতাজীর শেষ বিমান যাত্রাপথ' নামের তিনটি মানচিত্র পরবর্তী কালের অনেক গবেষণার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে।

তবুও, কয়েকটি বিষয়ে একটু যেন ফাঁক থেকে গেছে অথবা প্রয়োজন আছে বাড়তি সতর্কতার। গবেষণাগ্রন্থে হঠাৎ করে আবির্ভূত স্বরচিত একটি কবিতা ব্যক্তিগত আবেগকে প্রমাণ করছে; কিন্তু মননশীল আলোচনার পক্ষে তা বাহুল্যই বটে। গান্ধীজী, জওহরলাল সংক্রান্ত আলোচনায় লেখকের অসহিষ্ণু মনটা বারবার প্রকাশ হয়ে পড়েছে। গবেষকের কাজ তথ্য উদ্ঘাটন, পরিবেশন ও যুক্তির শৃঙ্খল নির্মাণে সীমিত। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্রয় সেখানে বর্জনীয়। গবেষককে তাই নিরাসক্তি অভ্যাস করতে হয়। নেতাজীর মতো রহস্যময় ও স্পর্শকাতর বিষয়ের আলোচকরা বোধহয় এবিষয়ে আরো বেশি সতর্ক ও যত্নবান হবেন—এটাই কাম্য। ছাপাখানার অলৌকিক অপদেবতার উপস্থিতি গ্রন্থে যথেষ্ট। ভূমিকায় এবিষয়ে খোলাখুলি স্বীকারোক্তি অবশ্য আছে।

তাসত্ত্বেও গ্রন্থটি এক সৎ ও সাহসী প্রয়াস, এক যুগন্ধর মহামানবের যুগসৃষ্টির অতন্দ্র সাধনার পথে অজস্র প্রতিকূলতার এক তথ্যনিষ্ঠ দলিল। 'উৎসর্গ' পত্রে লেখক সুভাষচন্দ্রের এক অমর আহ্বান উদ্ধৃত করেছেন। তার সামান্য একটু অংশ আমরাও স্মরণ করি : "তোমাদের সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের গড়া রাস্তা। সেই পথ দিয়ে যাব আমরা।" আজ নেতাজী স্বয়ং ঐ প্রাতঃস্মরণীয় পথপ্রদর্শকদের দলে। তাঁর গড়া রাস্তা পড়ে আছে আমাদের সামনে, আমাদের জন্য। যাওয়ার কাজটা করতে হবে আমাদের। এই রাস্তা গড়ার তপস্যায় কত বিঘ্ন, কত পিছুটান, কত দুর্গমতা যে অতিক্রম করতে হয়েছে মুক্তিপথের এই অগ্রদূতকে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী ঐ যাওয়ার পথে হবে আমাদের পাথেয়, আমাদের প্রেরণা। সে-কাহিনী ছড়িয়ে আছে কানাইলাল বসুর গ্রন্থে, আর ঐ প্রেরণাই তো নেতাজীকে নতুন করে দেখা। ❑

এক মহীয়সী নারীর জীবনী ও বাণী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা
সম্পাদনা ঃ
প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা
প্রকাশিকা ঃ
প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬
মূল্য ঃ ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৪৫৬
প্রকাশকাল ঃ ২০০১

জন রাসকিন তাঁর 'সেসামি অ্যাণ্ড লিলিজ' গ্রন্থে যাবতীয় গ্রন্থকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—যে-গ্রন্থ মুহূর্তের, আর যে-গ্রন্থ চিরকালের। প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা সম্পাদিত 'প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা' নিঃসন্দেহে শেষোক্ত শ্রেণির অন্তর্গত। সংসারের তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে যাতে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত না হই, সেজন্য এই মহান গ্রন্থটি যুগপৎ দিগ্‌দর্শন ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ করবে।

মহীয়সী নারী প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী ছিলেন শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা। এই ধরনের মঠের স্বপ্নই স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন ঃ "তাঁকে [শ্রীশ্রীমাকে] অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।... এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই।" এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা-মাতাজীর অধ্যক্ষতায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠের উদ্বোধনের মাধ্যমে। যে-ব্রতচারিণীদের অক্লান্ত সাধনায় এই মঠ পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী (৯ ডিসেম্বর ১৯১৫—৩০ আগস্ট ১৯৯৯) অগ্রগণ্য। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি যেমন উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তেমনি তিনি হয়ে উঠেছিলেন করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং এক দক্ষ পরিচালিকা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অংশে সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে পূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীর জীবনী। তাঁর জন্ম হয় উত্তর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রেণুকা বসু। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পঞ্চবটীর প্রতি তাঁর ছিল আশৈশব আকর্ষণ। শুঁড়া কন্যা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে তিনি সঙ্গিনী পেয়েছিলেন বালিকা আশাকে, যিনি পরবর্তী কালে হন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা—শ্রীসারদা মঠের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা। যখন রেণু ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী, তখন তিনি তাঁর দাদামশায়ের বন্ধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর অকৃতদার মামা ভক্তিমান ডাঃ সত্যেশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসীর ছিল গভীর যোগাযোগ। তাঁর সঙ্গে রেণু অনেকবার জলপথে বেলুড় মঠে যান এবং সেই সূত্রে স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী অভেদানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের দর্শনলাভ করেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ রেণু ও তাঁর মাকে বেলুড় মঠে দীক্ষাদান করেন। এই সময় মহারাজ রেণুকে বলেছিলেন ঃ "আজ থেকে তোমার কেউ নেই, শুধু ঠাকুর ও মা।" তাঁর এই উক্তিতে রেণু প্রথমে হতচকিত হলেও পরে এর গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর পারিবারিক সমস্যার কারণে কিছুদিনের জন্য তাঁর পড়ায় ছেদ পড়ে। এরপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পাশ করার পর তাঁর অভিভাবকরা তাঁর বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে তিনি সারাজীবন অবিবাহিতা থাকার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা তাঁদের জানিয়ে দেন। এই সময়ে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র 'কর্মযোগ' অংশটি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

নিবেদিতা স্কুলে যোগদানের আহ্বান পেয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন রেণুকা দেবী সেখানে যোগ দেন। ১ জুলাই তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কর্মভার গ্রহণ করেন এবং খুব নিষ্ঠা নিয়ে সে-কর্তব্য পালন করতে থাকেন। ঐ স্কুলের সূত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রাজ্ঞ সাধুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তাঁদের স্নেহাশিস লাভের সৌভাগ্য হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার অতিরিক্ত পদ গ্রহণ করতে হয়। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ও মাদার-এর তিনি দর্শন পেয়েছিলেন ঐ বছরের ৫ নভেম্বর।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ যে সাতজন মহিলাকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন রেণুকা দেবী। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ যখন শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি এখানে যোগ দেন। এর আগে মাস ছয়েক তিনি সি. আই. টি. রোডের বাড়িতে সরলাদেবীর (প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর) তত্ত্বাবধানে সাধনা ও উপাসনাজ্ঞানে কর্ম করতেন। সেটা ছিল তাঁর প্রস্তুতি-পর্ব।

ব্রহ্মচারিণী রেণুকা শ্রীসারদা মঠের সেবায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণা। মঠজীবনের আর্থিক ও কায়িক কৃচ্ছ্রতা তাঁকে কখনোই বিচলিত করতে পারেনি। তিনি খুব সুন্দরভাবে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজাতেন। আবার প্রয়োজন হলে সকলের অগোচরে নর্দমাও তিনি নিপুণভাবে পরিষ্কার করে দিতেন। তাঁর শান্ত ও নম্র ব্যবহার এবং সেবা ও স্নেহপরায়ণতা সকলকে মুগ্ধ করত।

১৯৬০ সালে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী শ্রীসারদা মঠের সহাধ্যক্ষা-পদে বৃত হন। যখন রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উদ্যোগে দমদমে ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়, তখন অন্য দুজন ব্রহ্মচারিণীর সহযোগিতায় তিনি তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। হোমিওপ্যাথিতে পারদর্শিতা থাকার জন্য তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলেন ও সেখানে নিজে রোগীদের চিকিৎসা করার ভার নেন। শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের বহু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর লোকান্তর ঘটে। ১০ এপ্রিল প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী অধ্যক্ষাপদে আসীনা হন। এই দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিতা হওয়ার পরে কিন্তু তাঁর স্বভাব বা আচরণে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। নতুন ভূমিকাতেও তিনি ছিলেন 'আগের মতোই সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত,

সমর্পিতপ্রাণ'। মঠের সকল বিভাগের ওপর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন ও সকল কর্মীর সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ছাব্বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে তিনি মঠ পরিচালনা করেছেন। অধ্যক্ষা-রূপে তাঁর কার্যপঞ্জী থেকে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্রুত সম্প্রসারণের বিবরণ পাওয়া যায়ঃ ১৯৭৫ সালে পুনেতে শ্রীসারদা মঠের শাখার উদ্বোধন, ১৯৮০ সালে দিল্লি কেন্দ্র থেকে মঠের ষাণ্মাসিক মুখপত্র 'Samvit'-এর প্রবর্তন, ১৯৮১-তে ব্যাঙ্গালোর মঠের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন, ১৯৮৭ থেকে ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'নিবোধত' পত্রিকার প্রবর্তন, ১৯৮৫-তে ভুবনেশ্বরে, ১৯৯১-তে ইন্দোরে এবং ১৯৯৩-তে বারাণসীতে শাখা স্থাপন/সম্প্রসারণ, ১৯৯৪-তে স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন এবং ১৯৯৮-তে নিবেদিতা স্কুলের শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯৯৯-এর ৩০ আগস্ট পূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি শরীরী রূপে না থাকলেও তাঁর মহান জীবন ও মহামূল্য বাণী সবসময় ভক্তজনকে প্রেরণা যোগাবে। তাঁর উপদেশ হবে চলার পথের পাথেয়। নতুন ব্রহ্মচারিণীদের তিনি বলতেনঃ "আধ্যাত্মিক পথে যারা চলে, তাদের মনের ওঠাপড়া তো আছেই... পথচলা কষ্টকর হলেও পথের শেষে বড় আনন্দ। ... নিজের কাজ হলো রুটিন ওয়ার্ক। ভাল লাগুক, চাই না লাগুক, করে যেতে হবে। মনকে ছেড়ে দিলে হবে না। তাকে দিয়ে যতখানি পার খাটিয়ে নাও। সে বেঁকে বসবে, করতে চাইবে না, আলসেমি করবে, নানা বায়না ধরবে। কিন্তু তুমি ওসবে একেবারে কান দেবে না, ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না।"

নবাগতাদের জন্য তিনি লিখেছেনঃ "সঙ্ঘের আদর্শ মানেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ। এটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর।... কাউকে বিচার করতে যেও না। যা হচ্ছে বা হয় সব চুপ করে দেখে যাও—কারো কোন কিছু পছন্দ না হলে তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না, অবজ্ঞা করবে না। ভুলে যাবে না কিছুতেই—তোমারই ইষ্ট তাকেও এখানে এনেছেন।"

মাতাজীর দুটি প্রবন্ধ ('শান্তি ও আনন্দলাভের পথ' এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় পূর্বপ্রকাশিত 'পঞ্চবটী মূলে') আলোচ্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'উক্তিসংগ্রহ' অধ্যায়ে অনেক মণিমুক্তো ইতস্তত ছড়ানো আছে। মাতাজীর বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্র ও অনেকগুলি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এই চিঠিগুলিতে সহজ, সরল ও আন্তরিকভাবে তিনি অনেক জ্ঞানের কথা লিখেছেন, অনেককে সান্ত্বনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য গানের অনবদ্য পঙ্‌ক্তিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার এই চিঠিগুলিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। আবার অন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মাতাজীকে বিভিন্ন সময়ে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির নির্বাচিত অংশও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থের দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে মর্মস্পর্শী 'স্মৃতিচারণ' অংশে রয়েছে মাতাজীর সংস্পর্শে আসা তাঁর শিষ্যশিষ্যা ও অন্যান্যদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। এইখানে 'শাসনে-নির্দেশনায়-আশীর্বাদে ফুটে ওঠে এক সুগম্ভীর গুরুশক্তির পরিচয়'। ভেসে উঠেছে সুধাবর্ষিণী মায়ের এক অপরূপ আলেখ্য।

মোক্ষপ্রাণামাতাজী ভারতীপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণের পর যে-উক্তি করেছিলেন, সে-উক্তির প্রতিধ্বনি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও করতে সাধ হয়ঃ "আমরা স্থূলজগতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনযাপন দেখার সৌভাগ্যলাভ করিনি, কিন্তু তাঁর এই কন্যাটির জীবন আমাদের সম্মুখে... জাজ্বল্যমান ছিল।"

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর মনোরম 'মুখবন্ধ' গ্রন্থটিকে ঋদ্ধ করেছে। সুপরিকল্পিত, সুসম্পাদিত এবং সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটির আকাশী তাইকোর প্রচ্ছদটি নয়নাভিরাম। 'প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা' প্রত্যেক অধ্যাত্মপথের যাত্রীর এক অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।❑

*

নেতাজী চরিত্র ঃ পুরনো হয়েও নতুন

ব্রহ্মচারী জনার্দনচৈতন্য
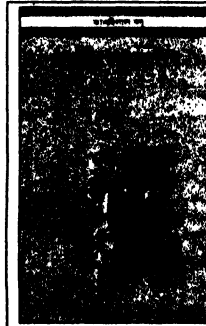
নেতাজীঃ নতুন করে দেখা
কানাইলাল বসু
প্রকাশকঃ
অশোককুমার বারিক
ভারতী বুক স্টল
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
মূল্যঃ ১৬০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ১৪+৪২৬
প্রকাশকালঃ ২০০২

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক অবিস্মরণীয় নাম। যে-কালে তাঁর জন্ম, সে-কালে তাঁরই মতো একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারত-ইতিহাসের বিধাতাপুরুষ সে-প্রয়োজন মিটিয়েও দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশে তাঁর আবির্ভাব। আবাল্য এই সৈনিক সন্ন্যাসীর অগ্নি-আখরে লেখা বাণী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগের উদাত্ত আহ্বান সুভাষকেও 'ঘরছাড়া বিবাগী' করেছিল তাঁর গ্লানিভরা দেশের কলঙ্ক মোচনের জন্য। যে-দেশের জন্য ঘরের সুখ সুভাষ বিসর্জন দিয়েছিলেন অকাতরে, বেছে নিয়েছিলেন দুর্গম, দুঃসহ এক চলার পথ—সে-দেশ কিন্তু তাঁকে সবসময় তাঁর যোগ্য ও প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। তাঁকে নিয়ে সংশয় দানা বেঁধেছে নিরন্তর, রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে অবিরত। স্বাধীন দেশের রাজমুকুটের লোভ তাঁর ছিল না। অথচ সেই মুকুট-লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যেরা তাঁকে প্রতিযোগী ভেবে নিয়েছে। স্বার্থের সেই ইঁদুর-দৌড়ে ইতিহাসের বিকৃতিও ঘটেছে বহুবার। তবু, ইতিহাস যে রহস্য ঢেকে রাখে না। মজুত রাখা তথ্যের সন্ধানে ইতিহাসের সত্য তাই বেরিয়ে আসেই। সুভাষচন্দ্রকে নিয়েও এই সন্ধান দীর্ঘদিনের। বিস্ময়কর, তাতে কখনো মিথ্যারই কদর বেড়েছে, কখনো বা সত্যের আলো ঠিকরে পড়েছে। ভাল লাগছে এই ভেবে যে, কানাইলাল বসুর 'নেতাজীঃ নতুন করে দেখা' গ্রন্থটি এই সন্ধানে কেবল সাম্প্রতিক এক সংযোজনই নয়, সত্যপ্রকাশের এক সার্থক তথ্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টাও।

(পরবর্তী অংশ ৪৯১ পৃষ্ঠায়)

বিলেতে বেদান্ত ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার

স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বেদান্তের দৃপ্ত প্রবেশ—একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো থেকে শুরু করে প্রায় দুবছর ধরে 'আমেরিকা-বিজয়' সম্পূর্ণ করার পর স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে পৌঁছালেন আরেক সেপ্টেম্বরে—১৮৯৫-তে। এবং পৌঁছেই কাজে নামলেন তিনি। সেখানে তাঁর কাজে আমেরিকার থেকেও বেশি সাফল্য আসতে আরম্ভ করল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে (United Kingdom) স্বামীজীর প্রভাবের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান হলেন তাঁর ব্রিটিশ শিষ্য-শিষ্যারা—যাঁদের অন্যতম ভগিনী নিবেদিতা, সেভিয়ার দম্পতি ও মিঃ গুডউইন। স্বামীজীর কাজে তাঁদের 'আত্মবলিদান' সম্বন্ধে স্বামীজীর জীবনীপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত প্রচারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করে স্বামীজী ভারত থেকে তাঁর গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে লণ্ডনে আসতে চিঠি লিখলেন। সারদানন্দজী লণ্ডনে পৌঁছালেন ১৮৯৬ সালের এপ্রিলে। ওদিকে আমেরিকার কাজও বাড়ছিল। (স্বামীজী ১৮৯৬ সালেই নিউ ইয়র্কে স্থাপন করলেন বেদান্ত সোসাইটি।) ফলে সারদানন্দজীকেও আমেরিকায় যেতে হলো। এইসব কারণে সর্বসম্মতিক্রমে লণ্ডনে প্রচারকাজের দায়িত্ব নিয়ে এলেন স্বামীজীর আরেক গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ—১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে। লণ্ডনে তাঁর প্রথম বক্তৃতা উষ্ণ সমাদর লাভ করল। নিশ্চিন্ত বিবেকানন্দ সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইনকে নিয়ে ভারতে ফিরলেন ১৮৯৭ সালের গোড়ায়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

আশ্রমগৃহ

অভেদানন্দজীকেও আমেরিকায় প্রচারকাজের জন্য লণ্ডন ছেড়েই যেতে হলো। মাঝে মাঝে তিনি আমেরিকা থেকে সেখানে আসতেন। কিন্তু সেখানে থেকে প্রচারকাজ আরো ভালভাবে চালানোর জন্য তিনি স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু ই. টি. স্টার্ডির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। এইভাবেই চলছিল। এর পরের বছরগুলিতে লণ্ডনে প্রচারের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব সন্ন্যাসীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী পরমানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ এবং বিশেষত স্বামী অব্যক্তানন্দ।

প্রবেশপথ

লণ্ডনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে-কেন্দ্রটি এখন প্রতিষ্ঠিত, তার সূত্রপাত করেন স্বামী ঘনানন্দ। তিনি অক্টোবর ১৯৪৮-এ ইংল্যাণ্ড আসেন এবং ঐ মাস থেকেই কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। নাম হয় 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার'। ১৯৬৯-এ দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত ঘনানন্দজী এই কেন্দ্রের প্রভূত সেবা করেন। একাধিক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর সময়ে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রটির ঠিকানা হয় লণ্ডনের 'হল্যাণ্ড পার্ক'। ১৯৫২ থেকে ঘনানন্দজী প্রকাশ করতে শুরু করেন দ্বিমাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত ফর ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট'। পরবর্তী কালে ১৯৭৭ সালে স্বামী ভব্যানন্দের সময়ে বেদান্ত কেন্দ্রটি উঠে আসে তার বর্তমান অবস্থানে—লণ্ডন থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে টেম্‌স উপত্যকায় বাকিংহামশায়ারের 'বোর্ণ এণ্ড'-এ। প্রায় ১০ একর জমিতে গড়ে ওঠা বোর্ণ এণ্ড-এর এই কেন্দ্রটি নির্জন পরিবেশে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত।

আশ্রমস্থ বনবীথি

আশ্রমস্থ পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র

এই কেন্দ্রের মুখ্য কাজ হলো শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোকে বেদান্তের প্রচার ও প্রসার। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা নিয়মিত পাঠ-আলোচনা প্রভৃতি করে থাকেন। এই আশ্রম এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের অংশগ্রহণ ও সহায়তায় বছরের বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত হয় সাধন-শিবির। প্রত্যহ আরতি ও জপধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। ডিসেম্বরে পালিত হয় 'ক্রিসমাস ইভ'। এই কেন্দ্রটি থেকে সারাবছর প্রচুর সংখ্যায় গ্রন্থ ও ক্যাসেট বিক্রয় হয়। তাছাড়া কেন্দ্রটি ইংল্যাণ্ডে ও তার বাইরে বিভিন্ন ত্রাণকার্যে সাধ্যমতো সহযোগিতাও করে থাকে।

সংশোধনাগারে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মালদহ ও কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে **মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** উদ্যোগে মালদা জেলা সংশোধনাগার (জেলখানা)-এ সম্প্রতি একটি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে একজন সন্ন্যাসী এবং ৪-৫ জন স্বেচ্ছাসেবক (বয়স্ক ভক্ত, প্রাক্তন শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি/বেসরকারি কর্মী) গিয়ে শিক্ষাদান করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা (১০টা—১১.৩০) এই শিক্ষাকেন্দ্র চলে। প্রথম ৫ মিনিট ধ্যান, প্রার্থনা ও স্বামীজীর জীবনের একটি কাহিনী পাঠ করা হয়। তারপর ক্লাস শুরু হয়। ইতিমধ্যে বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ), ধারাপাত, নামতা এবং সামান্য ইংরেজি শেখানো হয়েছে। ৬০-৬৫ জন আবাসিক (বন্দী) এই ক্লাসগুলি করছে। গত ২৪ মে আই. জি. কারাবিভাগ, জেলাশাসক, বহু বিশিষ্ট নাগরিক এবং ৪ জন সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শিল্প শিক্ষালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ শিখছে ১৪ জন, কাঠের কাজ ১০ জন। সপ্তাহে ৬ দিন এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে (সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত) অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা। এতে বন্দীদের মধ্যে পড়াশোনা ও হাতের কাজ শেখার খুব আগ্রহ দেখা গিয়েছে। মিশনের উদ্যোগে ৩০০ বন্দীর জন্য ১ মার্চ ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়েছে। ৯ এপ্রিল ও ৯ জুন পশুপালন ও মাছচাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক ও মৎস্যবিজ্ঞানের গবেষক দ্বারা আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী দিব্যানন্দজীর পরিচালনায় দুদিনের আলোচনাচক্রে প্রশ্নোত্তর-পর্বটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। এইসব কাজের উদ্দেশ্য হলো—বন্দীরা মুক্তির পর যেন স্বনির্ভর হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। পরবর্তী কালে কৃষিবিজ্ঞান, মাশরুম, মৌমাছি পালন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের কাজ হবে। উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সদস্য আশ্রম তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি আগে থেকেই এই সেবামূলক কাজ করছে। এই সেবার ফলে বন্দীদের যেমন মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ ও আনন্দও বৃদ্ধি হচ্ছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২৩-২৬ এপ্রিল ২০০৩ আশ্রম ও বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। বিভিন্ন দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী প্রভানন্দজী ও স্বামী উমানন্দজী। ভাষণ দান করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী শেখরানন্দজী, অধ্যাপক রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক, অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ভড়, অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। উৎসবে স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী শান্তিদানন্দজী ও রণজিৎ জানা।

রামকৃষ্ণ মিশন চেন্নাই স্টুডেন্টস হোম (তামিলনাড়ু)ঃ গত ৪ মে ২০০৩ প্রস্তাবিত একটি নতুন চিকিৎসা বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং আশ্রমের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কলেজের ল্যাবরেটরির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ (হুগলি)ঃ গত ১১ মে ২০০৩ প্রস্তাবিত নতুন চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসবঃ গত ৪ জুন ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধন-বাটীতে পদার্পণ উৎসব আয়োজিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন, গীতিনাট্য, ধর্মসভা ছিল উৎসবের অন্যতম বিষয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মুকুট চক্রবর্তী ও বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। অভিনন্দন শিল্পগোষ্ঠীর 'সারদেশ্বরী মা' গীতিনাট্য এবং সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের 'কংসবধ' যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। উৎসবে আগত প্রায় সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নদীয়া) ঃ গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও ডঃ নমিতা দত্ত। দ্বিতীয় দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী, রঞ্জিতচন্দ্র সাহা প্রমুখ। এদিন দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিন সানাইবাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী বিমুক্তানন্দজী। এদিন দুঃস্থদের মধ্যে ১০০ বস্ত্র বিতরণ এবং প্রায় ২,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়দিনে 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বাউল গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা চৈতন্যপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয়দিন দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গাঁতী বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, পদাবলী কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী পুরাতনানন্দজী, স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক সত্যব্রত চৌধুরী প্রমুখ। সন্ধ্যায় তরজা গান পরিবেশন করেন শিবপদ মণ্ডল।

হিন্দমোটর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (হুগলি) ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কার্তিকচন্দ্র সেন, দেবী মুখার্জি প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ ভাব-সমন্বয় কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলুড় বিদ্যামন্দিরের 'বিবেকানন্দ সভাগৃহ'-এ। সম্মেলনে সারা পশ্চিমবঙ্গের ৪৭টি যুবসংগঠন থেকে ১,১০০ যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন স্বামী রমানন্দজী। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, তরুণ গোস্বামী, পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ।

ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনামন্দির (হাওড়া) ঃ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ করেন কাশীনাথ দে চৌধুরী ও ডঃ ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, নেপাল ঘোষাল প্রমুখ। ধর্মসভায় আলোচনা করেন সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী। এদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসঙ্ঘ (নদীয়া) ঃ গত ১-৫ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ভক্তিগীতি, কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৈরিকা মুখার্জি, নিখিল কুণ্ডু প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী, স্বামী সুরেশানন্দজী, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রমুখ। উৎসবের শেষদিনে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সোদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বাগতা রায়, তরুণ ব্যানার্জি প্রমুখ। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, কীর্তন, পাঠ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মচারী শিশির। কীর্তন পরিবেশন করেন বিষ্ণুপদ মাইতি ও সম্প্রদায়।

মুলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র) (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, লীলাকীর্তন, বাউল গান, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন রণজিৎচন্দ্র সাহা এবং 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন ভবানীচরণ দে। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

তেজু শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (লোহিত, অরুণাচল প্রদেশ) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন পি. আর. গোস্বামী ও গৌতম বোস। সভায় আলোচনা করেন ডাঃ বিশ্বনাথ শর্মা এবং এ. কে. কাঞ্চন। এদিন প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পার্বতীনাথ হাজরা। আলোচনা করেন বিশ্বেশ্বর রায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরুণিমা রায় ও মিঠু মণ্ডল।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ২০০ জনের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী সারদাচৈতন্য।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র (অসম) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। এরপর ২১-২৪ মার্চ আয়োজিত গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভায় বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী, স্বামী গুঢ়াকেশানন্দজী, অধ্যাপক দিবাকর ডেকা, অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা (ওড়িশা) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'গীতা', 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

পাখানজোড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ছত্তিশগড়) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ধর্মসভায় আলোচনা ও পূজা করেন স্বামী বিভানন্দজী।

ডোমজুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ৫ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ ও সেবাশ্রমের নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ১৬ মার্চ ২০০৩ প্রস্তাবিত মন্দিরের শিলান্যাস করে আলোচনা করেন স্বামী বাসুদেবানন্দজী ও সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী। এদিন প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ৫-৬ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমরেন্দ্র মুখার্জি, মৌসুমী মান্না প্রমুখ। ধর্মসভায় সরোজ কয়ড়ীর স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন গোপীবল্লভ গোস্বামী, অলোক ঘোষ, পঙ্কজ কুণ্ডু প্রমুখ। এদিন প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ৫ ও ৬ মার্চ ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন উমেশ রায়চৌধুরী, গার্গী মুখার্জি, অশোককুমার পাত্র প্রমুখ। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) ঃ গত ৫-৭ মার্চ ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, তরজা গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। তরজা গান পরিবেশন করেন শ্রীনিবাস সরকার ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী কাশীনাথানন্দজী ও গৌরগোপাল সাহা। উৎসবে প্রায় ২,৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বিহার) ঃ গত ৫-৯ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'গীতা', 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, কীর্তন, রামনাম-সঙ্কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী।

ভাতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ৫-৯ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, বাউল গান, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবে প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (অসম) ঃ গত ৫-১০ মার্চ ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সঙ্গীত, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শঙ্করপ্রসাদ সোম ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুরুষোত্তমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (পূর্ব মেদিনীপুর) ঃ গত ৮ মার্চ ২০০৩ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে ভূমিপূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও স্বামী শ্রুত্যানন্দজী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিলকেন্দু সৎপতি।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) ঃ গত ৯ মার্চ ২০০৩ প্রভাতফেরি, বেদ, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। পূজা করেন বিমলেন্দু ভট্টাচার্য। 'কথামৃত' ও 'পুঁথি' পাঠ করেন অধ্যাপক নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভবানীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, বিনীতা চন্দ্র প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বহড়াগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবাসমিতি (পূর্ব সিংভূম, বিহার) ঃ গত ৯ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'উদ্বোধন' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'চণ্ডী' এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র পণ্ডা ও লক্ষ্মীকান্ত রজক। ধর্মসভায় প্রদীপকুমার পণ্ডার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন মৃত্যুঞ্জয় সাহু, ডাঃ শান্তনু পণ্ডা প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজীবকুমার দাশ। উৎসবে প্রায় ৭৮১ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দক্ষিণেশ্বর স্বামী যোগানন্দ উৎসব সমিতি (কলকাতা-৫৭) ঃ গত ২১ মার্চ ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে নগরকীর্তন এবং সমীর মুখার্জি, অলোক মুখার্জি প্রমুখ কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী।

বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ২১ মার্চ ২০০৩ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদ, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বাউল গান, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ এবং বিশেষ পূজা করেন স্বামী লোকেশানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী রমানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী। এদিন প্রায় ৩৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং ৪০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কুচাকলা স্বামী বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২২ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বাউল গান, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, রণ-পা নৃত্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ২,৫৩২ জন বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী ও দীপককুমার ভট্টাচার্য।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (হুগলি) ঃ গত ২২ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পাপড়ি দাশশর্মা। আলোচনা-সভায় অধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত-ভাষণান্তে 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি (হুগলি) ঃ গত ২২ ও ২৩ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন ত্রিদণ্ডি স্বামী পরাঙ্কুশজী ও জয়শ্রী রায়। দ্বিতীয়দিনের সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও অধ্যাপক নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'নদীয়ার গোরা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ধানবাদ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (বিহার) ঃ গত ২২ ও ২৩ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী ভাবাত্মানন্দজী। পরদিনের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং ভক্ত ও যুববৃন্দের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী।

রানিয়া কুলটুকারী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ২৩ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, কালীকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী রাজীবানন্দজী ও স্বামী চেতসানন্দজী।

কটক বিবেকানন্দ আশ্রম (ওড়িশা) ঃ গত ২৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'গীতা' ও 'লীলামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, স্বামী সত্যময়ানন্দজী, স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী, স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দজী প্রমুখ। উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী উপেন্দ্রলাল ধর গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ জপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্থানীয় উদয়পুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। সরলতা ও অমায়িকতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী নৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৩ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। তিনি ছেলেবেলা থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত সন্ন্যাসী স্বামী সৌম্যানন্দজী ও স্বামী চণ্ডিকানন্দজীর সঙ্গলাভ করেছিলেন। তিনি যৌবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। তাছাড়া শিলচর আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, জয়রামবাটী-নিবাসী রণজিৎ সাহা গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে তিনি প্রচুর অর্থদান করেছেন। দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়া-নিবাসী ডাঃ চৈতন্যময় মণ্ডল গত ২৭ জানুয়ারি ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। সততা ও পরোপকারিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান-নিবাসিনী সুনীতি চৌধুরী গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। উদার ও অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বাঁকুড়া-নিবাসিনী সুলোচনা মুখোপাধ্যায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, দমদম-নিবাসিনী বীণারানি দত্ত গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**, কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ২৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)** হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ২৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ**, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন ফোন ঃ ২৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র** ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির** ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) ফোন ঃ ২৪৪৬-০৬৮৮/২৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স** ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক**, সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র**, চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক**, ৯ আর. এন. টেগোর রোড নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৬৭-১১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র** বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স**, ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল** ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-১০৫ ফোন ঃ ২৩২৩-০০৯৭
- **মলয় ভৌমিক**, ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ** ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির** ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য** ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী**, স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জি ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫ ফোন ঃ ২৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **দাসানুদাস সাহা**, ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট কলকাতা-৫, ফোন ঃ ২৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**, ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড কলকাতা-৫০, ফোন ঃ ২৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা**, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন ঃ ২২১৮-১২৮৫
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮ ফোন ঃ ২৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির** ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ** প্রযত্নে শঙ্কর আইচ, ৯/এইচ, দমদম রোড, রাজাবাগান কলকাতা-৩০, ফোন ঃ ২৫৫৭-০৫৭৬, ৯৮০৩১৩২৩৯২
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, ২নং এয়ারপোর্ট গেট পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ২৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ ফোন ঃ ২৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক) ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১ ফোন ঃ ২৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ ফোন ঃ ২৪৫৮-৯৪২৭, ২৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ২৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ** ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস**, ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ২৫১২-৫৭৪৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর** প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা কলকাতা-৪৯, ফোন ঃ ২৫৪১-০১২২
- **রূপম চক্রবর্তী** প্রযত্নে সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬, ফোন ঃ ২৮৭৪-১৪৭৩/১৪৭৪, ২৫৪১-১৫৬৪
- **বিবেকানন্দ পাঠমন্দির**, প্রযত্নে কানাইলাল বসু ৪৩ স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, পোড়া অশ্বত্থতলা, ঠাকুরপুকুর কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ২৪৬৭-৩৫৩৫/১৪৯৪

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

Now
I can save my money while I plan its best uses

INTRODUCING
Peerless
QUICK RETURN
— BOND —

One Time
Fixed Deposit Scheme
for 1.5 years. For saving small or big amounts.

Save minimum Rs 2,000 or more in multiples of Rs 1,000 • **FREE Accidental Death Benefit***
• Pre-mature withdrawal after one year
• Doorstep service by friendly Peerless Agents. No queues. No delays • Effective yield 6%
• Free Peerless Savings Card for every depositor

**arranged through*

New India Assurance Co. Ltd.

The Peerless General Finance & Investment Company Limited
'Peerless Bhavan', 3, Esplanade East, Kolkata 700 069

Contact your nearest Peerless Agent or call **Kolkata** (033) 2242 1564/1001 • **Guwahati** (0361) 252 3878 • **New Delhi** (011) 2334 6421/2374 4869 • **Mumbai** (022) 2284 6096/2282 5807 • **Ahmedabad** (079) 658 1247/4954 • **Chennai** (044) 2853 0335/5326 • **Hyderabad** (040) 2761 7176/7

www.peerless.co.in

** conditions apply*

Statutory advertisement published in BARTAMAN and BUSINESS STANDARD on 26 05 2003

UDBODHAN
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone : 2554-2248, 2554-2403

Vol. 105
No. 7
JULY
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO-WB/RNP 154/PWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R N 8793/57
Postal Regn. No. MM&PO WB/RNP-15 2003

ISSN 0971-4316

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) 'উদ্বোধন' ১০৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✿ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✿ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✿ 'উদ্বোধন'-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০৩-এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ হবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন— এই প্রার্থনা।

✿ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
উদ্বোধন
১০৫

"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মতো, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে।
আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে,
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succour you want is within yourselves. Therefore make your own future.

Swami Vivekananda

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥

১০৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪১০ আগস্ট ২০০৩

যুগ্মসম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪১০)

একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪১০/সেপ্টেম্বর ২০০৩ (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৫০ টাকা। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না।**
- **শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। হাতে হাতে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে** তাঁদের পত্রিকা যথারীতি সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে জানিয়ে থাকলে আর জানানোর প্রয়োজন নেই।
- **ইচ্ছা করলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকেও নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা পাঠাবেন। ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২৫ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর আগে অবশ্যই কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে** কার্যালয় থেকে হাতে হাতে (By Hand) পত্রিকা দেওয়া হবে। এর পরে এই সংখ্যাটি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।
- গ্রাহকরা অতিরিক্ত কপি কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে প্রতি কপি ৪০ টাকায় পাবেন। যাঁরা হাতে হাতে শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন, তাঁরা **অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো** দেখিয়ে এই অতিরিক্ত কপিটিও **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে** সংগ্রহ করতে পারবেন। আর যাঁরা ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি নেবেন, তাঁরা অতিরিক্ত কপি নিলে **রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ২৫ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে।**
- **গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে যাঁরা **সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে **তাঁরা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে** ২০ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই সংবাদ **প্রেরণ করবেন, এবং ঐ কেন্দ্র আমাদের কাছে ২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সংবাদটি পৌঁছে দেবে।**
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যা সংক্রান্ত যেকোন সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হয় না।**
  - প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হয়। তবু অনেক গ্রাহক **নির্ধারিত তারিখের পরে** জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের **সহৃদয় সহযোগিতা** আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের **শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা, যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন [২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে], তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার** সময় **তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন** হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে **২৫ আগস্ট ২০০৩-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে (দুই কপি) জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে **আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
- **কার্যালয় খোলা থাকে (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ এবং শনিবার বেলা ১.৩০ মিঃ পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ।**
- **২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সোমবার কার্যালয় খুলবে।**

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তথাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।।

—অন্যান্য প্রাণীর দেহ অপেক্ষা মানবদেহ দুর্লভ; কারণ এই দেহে ভগবানলাভ হয়। আর সেই দেহ ক্ষণস্থায়ী। সেজন্য এই মনুষ্যজন্মে যদি বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয় ভক্তগণের দর্শনলাভ হয়, তা অপেক্ষা অধিক কিছু দুর্লভ মনে করি না।

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।।

—(বিদেহরাজকে ঋষি-কবি বললেন) হে রাজন্! ভাগবদ্ধর্ম (সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তন) আশ্রয় করে মানুষ কখনো বিপদগ্রস্ত হয় না। কিংবা এ-সংসারে চোখ বুজে দৌড়ালেও তার পতনের ভয় থাকে না।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।

—ভগবৎচিন্তনে যাঁর চিত্ত এমনই অভ্যস্ত হয়েছে যে, অবশ হয়ে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের নাম একবার স্মরণ করামাত্র সর্বপাপনাশকারী হরি প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ-চরণ হয়ে তাঁর হৃদয়মন্দির ত্যাগ করেন না। এমন ব্যক্তিই ভাগবতপ্রধান (ভক্তশ্রেষ্ঠ) বলে কথিত হন।

শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।।

—ভগবানের নাম যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ (স্মরণ-মনন), সঙ্কীর্তন, ধ্যান (চিন্তন) ও পূজন (পূজা) করা যায়, তাহলে তিনি মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে অযুত জন্মের সঞ্চিত পাপ বিনাশ করে থাকেন।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২।২৯, ১১।২।৩৫, ১১।২।৫৫, ১২।৩।৪৬)

প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ

চাই কুসংস্কারমুক্ত মন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলিতেন—'চাই কুসংস্কারমুক্ত মন', তখন তাঁহার সুদূর-প্রসারিত দৃষ্টিতে দুইপ্রকার কুসংস্কার ভাসিয়া উঠিত। একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। মানব-মনে এই কুসংস্কারের ব্যাপ্তি কতদূর, তাহা বলা অসম্ভব। কারণ, মন দিয়াই উহার বিচার করিতে হয়। স্থূল কুসংস্কার অপেক্ষা সূক্ষ্ম কুসংস্কার অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী। চরম লক্ষ্যপথে ঐসব সূক্ষ্ম কুসংস্কার সাধকের বিষম অনিষ্ট করিয়া থাকে। একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারাই সূক্ষ্ম কুসংস্কার এবং যাবতীয় মনোবাসনা এককালে দগ্ধ হইতে পারে। অতএব 'ভাবপ্রচার ও সংগঠন' প্রসঙ্গে আপাতত আমাদের দৃষ্টি স্থূল কুসংস্কারের উপরই নিবদ্ধ থাকিবে।

এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, গুনিন, ওঝা, ভূত, ডাইনি, গ্রহশান্তি, পণপ্রথা, জাতপাত, এমনকি অকালে পতি-বিয়োগ নিবারণের জন্য সারমেয়-কুলের সহিত কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পিতার দ্বিধাবোধ না হওয়া। কেবল গ্রামবাংলা নহে, আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের এই চিত্র। অবশ্য যেখানে শিক্ষার আলো সম্যক পৌঁছে নাই, সেখানেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়া থাকে। স্বামীজী এগারো দশক পূর্বে নির্দেশ করিয়াছিলেন, শিক্ষাই ভারতবর্ষের যাবতীয় ব্যাধির মহৌষধ এবং শিক্ষার অভাবই যাবতীয় সামাজিক ব্যাধির মূল কারণ।

কিন্তু শিক্ষিত সমাজও কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জমান, চিন্তা করিলে সেকথাও বেশ বুঝা যায়। অবশ্য উহা এতাদৃশ স্থূল নহে। আবার অত্যন্ত সূক্ষ্মও বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মীয় গোঁড়ামি অথবা সমাজে পারিবারিক মর্যাদাবোধের কৃত্রিম অহঙ্কার কিংবা 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আমিই একমাত্র বুঝিয়াছি' ধরনের কুসংস্কার আমাদের মনকে নিরন্তর দুর্বল করিয়া দেয়। অর্থহীন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘৃণা করিতেন। কারণ, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। আবার কাহারো পারিবারিক বা সামাজিক মর্যাদা যাহাই থাকুক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত সংগঠনের মধ্যে সকলেই সমান। এবং একথাও সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁহার নিকট ধরা দেন, সে-ই তাঁহাকে বুঝে, অন্যে নহে। লোকশিক্ষা দিবার জন্য 'চাপরাশ' চাই। অর্থাৎ যাহার-তাহার 'চাপরাশ' লাভ হয় না, একথাও বুঝা দরকার। স্থূল কুসংস্কারের প্রসঙ্গই চলিতেছে। কেহ যদি ঐশ্বর্যের অহঙ্কার লইয়া প্রভুর কাছে আসে, প্রভু তাহার ঐশ্বর্য দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। সুরেন্দ্রের 'গোড়েমালা' ঠাকুর ভাবাবস্থায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র তীব্র বেদনাহত হইয়া চোখের জলে ভাসিয়া আকুল হইয়া যখন 'ধনমদ' ত্যাগ করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ঐ মালা কুড়াইয়া গলায় পরিলেন। এইরূপে 'বিদ্যামদ' অর্থাৎ বিদ্যার অহঙ্কার, 'শক্তিমদ' বা শক্তির অহঙ্কার এবং সর্বোপরি 'ধর্মমদ' বা ধর্মের অহঙ্কার হইতে সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ হইতে সাধারণ সদস্য পর্যন্ত সকলেরই দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, সেকথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন নাই। যথার্থ কুসংস্কারমুক্ত মনে এইপ্রকার আবর্জনা আসিতে পারে না। সমদৃষ্টির অভাবে সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদিগের সহিত সাধারণ সদস্যদের বিরোধ উপস্থিত হইয়া ঐক্য বিনষ্ট হয়। চারিত্রিক বল, সততা, প্রেম এবং অন্তরে ইষ্টের প্রতি দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে অপরের নিকট হইতে জোর করিয়া শ্রদ্ধা-ভালবাসা আদায়ের প্রশ্ন উঠে না। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বলিতেন, ক্ষমতায় না থাকিয়াও যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণ সেবা করিতে পারে, সে-ই যথার্থ সেবক। সুতরাং কর্তাব্যক্তিদের চরিত্রবল, পাণ্ডিত্যের গভীরতা, ত্যাগ ও সেবাকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন করিবে—ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার, জোর করিয়া ঐসকল আকর্ষণ করিবার কোন উপযুক্ততা নাই।

বিপরীত পক্ষেও একটি কথা বিশেষভাবে আলোচ্য। সংগঠনের সকল সদস্য বা 'অঙ্গ'-ই যদি প্রাণে প্রাণে বুঝেন যে, এই কাজ শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা, 'সম্পাদকের ব্যক্তিগত কাজ' নহে, তাহা হইলে অনেক সমস্যা মিটে। 'এ তো সেক্রেটারির কাজ'—এই মনোভাব সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট করে। যদি আপত্তিকর কিছু মনে হয়, পেটের মধ্যে জমাইয়া না রাখিয়া মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে তাহা সম্পাদক কিংবা অন্যান্য পদাধিকারীদের জানানো প্রয়োজন। এবং ইহাও মনে রাখা দরকার, 'ঘরের কোঁদল ঘরেই যেন থাকে'। বলা বাহুল্য, সর্বসম্মতিক্রমে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রতি আনুগত্যই সঙ্ঘজীবনের দীর্ঘজীবিত্বের সূচক।

আরেকটি কুসংস্কার সম্প্রতি স্থানে স্থানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংগঠন একটি সজীব প্রাণীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংগঠন সৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমরা সকলে যেমন একদিকে আনন্দিত হইতেছি, অপরদিকে তেমনি আশঙ্কিত হইতেছি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব বিরাজ করিতেছে দেখিয়া। বলা নিষ্প্রয়োজন, উভয় সংগঠনই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত! যদি সেবাকর্মের মাধ্যমে 'চিত্তশুদ্ধি' আমাদের কাম্য হয়, এইরূপ হীনম্মন্যতা হিতে বিপরীতটাই সাধন করিবে, সেকথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিযোগিতা যদি স্বাস্থ্যকর হয়, সকলেই তাহাকে স্বাগত জানাইয়া থাকে। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সংগঠনের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই ক্ষতিসাধক হইয়া উঠে। ধর্মের নামে ভণ্ডামি করিয়া 'ক্লাব'-জাতীয় সংগঠন নির্মাণ করিতে স্বামীজী নিশ্চয়ই আমাদের বলেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পরস্পরের জন্য পরস্পরের প্রার্থনা ও সহযোগিতা হউক আমাদের অগ্রগতির মহামন্ত্র!

ব্যবহারিক প্রজ্ঞা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ'-এর কাহিনী আমরা জানি। অচেতন শিষ্যের জ্ঞান ফিরিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সরিয়া দাঁড়াইলে না কেন? শিষ্য বলিল, হাতি-নারায়ণ; আপনি বলিয়াছেন সর্বভূতে নারায়ণ। গুরু বলিলেন, মাহুত বলিয়াছিল 'সরিয়া দাঁড়াও'। মাহুত-নারায়ণের কথা কেন শুনিলে না? এই কথার গূঢ় অর্থ হইল, শুদ্ধ মনই ঐ মাহুত-নারায়ণ। যাহার মন যত শুদ্ধ, সে মাহুত-নারায়ণের কথা তত বেশি শুনিতে পায়। কারণ, সেই শুদ্ধ মনে 'সত্য' প্রতিফলিত হন। সংগঠনের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রয়াসে প্রত্যেক সদস্যের মনের অশুদ্ধি দূর করাই সেবাকর্মের লক্ষ্য। সেবা করিতে গেলে প্রত্যেকটি কাজ নিপুণভাবে এবং নির্ভুলভাবে করা প্রয়োজন। অনবধানতার সহিত কিংবা অবজ্ঞাভরে সেবা করিলে 'সেবাপরাধ' হইবে এবং আমরা লক্ষ্যচ্যুত হইব। শুদ্ধমনেই ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অধিক প্রকাশ ঘটে। 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞা' কথাটির অর্থ আরেকটু বিস্তার করা যাইতে পারে।

স্বামীজী 'Practical Wisdom' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বপ্নপুরীতে বাস না করিয়া বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ব্যবহারিক প্রজ্ঞা। কেহ কেহ মনে করেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে গেলে তাহার প্রধান শর্ত হইল, বাহিরে মূর্খবৎ আচরণ করিতে হইবে, কর্ম করিতে গিয়া পদে পদে ভুল করিতে হইবে এবং কথায় কথায় কাঁদিয়া আকুল হইতে হইবে। অনেকে 'বৈরাগ্য' শব্দেরও এইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কাহারো জীবনে কতটা 'commitment' আছে, অর্থাৎ সেই জীবন কতটা উৎসর্গীকৃত, এই কলিযুগে তাহাই সাধারণভাবে ভক্তির লক্ষণ। এবং ভক্ত নিজ আচরণে 'practical' বা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হইলে সেবাও ঠিক ঠিক হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। মহাভাবে সুপ্রতিষ্ঠ ঠাকুরের সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞ ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ একাধারে আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের যেরূপ হইত, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও ভক্তগণ বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা এবং অন্তর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পঞ্চবটীতে যখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাবে ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অশ্রু মাটিতে পড়িয়া রীতিমত কর্দমাক্ত হইয়াছিল দেখিয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সেই অনাথশরণ, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু 'প্রেমার্পণ-সমদরশন' মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও কখনো ভক্তিগদগদ হইয়া বাস্তববুদ্ধি হারাইতেন না। যুবক যোগেনকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন ঃ "ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি?" সামান্য একটু ভাব-ভক্তি হইয়া যদি কাহারো ছাতা বা গামছা আনিতে ভুল হইত, ঠাকুর বলিতেন ঃ "আমার পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, তবু অতদূর নয়।" অর্থাৎ কর্ম নিখুঁত না হইলে অথবা মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিলে দয়ার ঠাকুরও বিরক্ত হইতেন। শ্রীশ্রীমা প্রত্যন্ত গ্রামের অশিক্ষিতা, সরলা মহিলা হইয়াও কখনো বাস্তববুদ্ধি হারাইতেন না। একদিন জয়রামবাটীতে জ্ঞান মহারাজ গোয়ালাকে বলিতেছেন ঃ "খাঁটি দুধ চাই। টাকায় আট সের দাও, তাও ভাল। কিন্তু দুধ খাঁটি হওয়া চাই।" শ্রীশ্রীমা পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন। অমনি বলিলেন ঃ "সে কি জ্ঞান! ঐভাবে দর বাড়াতে হয়? এখানে পয়সায় পোয়া দুধ (অর্থাৎ টাকায় ষোল সের)। গোয়ালা তো জল মেশাবেই। বরং পয়সা পাবে বলে আরো বেশি জল মেশাবে।"

আবার বিপরীত পক্ষে নিজেকে কেহ কেহ অত্যধিক 'practical' বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন এবং অপরের হৃদয়ের ভাব, ভালবাসা, দয়া-ভক্তি কিংবা ধ্যানপ্রবণতাকে তুচ্ছ করিতে গিয়া ক্রমে নিজেই ঐসকল সুকোমল হৃদয়বৃত্তি-বিরহিত হইয়া 'দরকাঁচা' মারিয়া যান। ইহাও শ্রীরামকৃষ্ণের অনভিপ্রেত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভাবপ্রচারের সহিত যুক্ত সকলকেই নিরন্তর বিচারপ্রবণ হইয়া দেখিতে হইবে যে, স্বীয় কার্য অহঙ্কারপ্রসূত, নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যথার্থ ভক্তিপ্রসূত। সর্ববিষয়ে সু-সমন্বয় করাই আমাদের লক্ষ্য।

ব্যবহারিক প্রজ্ঞার দুটি প্রধান ভিত্তি হইল—যুক্তিসিদ্ধতা এবং অভিজ্ঞতা। দৈনন্দিন কর্মের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যেসব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিতেছি, তাহা স্মরণ রাখাই ব্যবহারিক প্রজ্ঞার মূল চাবিকাঠি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা

গিয়াছে, শতকরা সত্তর ভাগ অভিজ্ঞতার কথাই আমরা স্মরণে রাখিতে পারি না। আমাদের আরো দু-একটি দোষ দূর করা প্রয়োজন। উহা কূপমণ্ডুকতা ও একদেশদর্শিতা। "আমরা যাহা করিতেছি উহাই সঠিক, অপর কোন আশ্রম ইহা অপেক্ষা ভাল পদ্ধতি অবলম্বন কিংবা সুসম্পাদন করিতে পারে না"—ইহাকেই কূপমণ্ডুকতা বলিতেছি। প্রয়োজন হইলে অন্যত্র গিয়া 'first hand experience' অর্জন করিতে হইবে। কোন আশ্রমের বাৎসরিক উৎসবকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উৎসব সু-সংগঠিত করিবার জন্য উৎসব কমিটি গঠিত হইল। ভক্তদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া উৎসব সম্পন্ন হইল। সু-সম্পন্ন হইল কিনা কেহ বলিতে পারে না। কারণ, উৎসব চলাকালীন নানান অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। নিজেদের মধ্যে আত্মম্ভরিতার লড়াই, পরস্পরের সহিত অসহযোগিতা, স্থানীয় মানুষের বিরুদ্ধাচরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিসাবের ভুল অর্থাৎ পাঁচহাজারের ব্যবস্থা করিয়া দশহাজারের বেশি ভক্তের সেবা কিংবা দুইহাজারের ব্যবস্থা করিয়া তিনশো ভক্তের সমাগম, গরম খিচুড়ির দীর্ঘক্ষণ হাণ্ডায় থাকিয়া অখাদ্যে রূপান্তর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের যথাযথ আপ্যায়নে ত্রুটি এবং সর্বোপরি 'communication gap' বা 'ছিন্ন যোগ'-এর কারণে উৎসব যতটা সু-সম্পন্ন হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল, ততটা হয় নাই! এই উৎসবের সহিত জড়িত সকলেই অবশ্য বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সাধারণত দেখা যায়, পরবর্তী উৎসবের সময়ে পূর্বের অভিজ্ঞতার শতকরা ত্রিশ ভাগও কাহারো স্মরণে নাই। সুতরাং একই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলিতেই থাকে। এক্ষেত্রে উৎসবের অব্যবহিত পরেই একটি 'পিছু ফিরে দেখা-সভা' বা 'review meeting' করিয়া সকলের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করিয়া রাখিলে পরবর্তী উৎসবের পূর্বে উহা অত্যন্ত সহায়ক হইবে, সেকথা বলা বাহুল্য। আমাদের আপন আপন পারিবারিক জীবনেও এই পদ্ধতিতে চলিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

আদর্শগত সমস্যা ঃ স্বামীজী বহুবার তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও বলপূর্বক 'রামকৃষ্ণ-ভাব' গলাধঃকরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর বলিতেন ঃ "কারো ভাব নষ্ট করতে নাই।" সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যই যেসব অন্যান্য বহু মানুষের সংস্পর্শে আসেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলিয়া মান্য করিবেন—এমন আশা করা যায় না। হইতে পারে, তাঁহাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামীজী অপর দশজন সাধক বা মহাপুরুষের ন্যায় মহাপুরুষমাত্র। সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের বিষয়ে জোর করিয়া তাহাদের বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। বরং শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাদর্শ এবং আলোচ্য সংগঠনের ত্যাগ-প্রতিষ্ঠ কর্তাব্যক্তি তথা সাধারণ সদস্যগণের সান্নিধ্যে আসিয়া ঐসকল ব্যক্তি যতই ঘনিষ্ঠ হইবেন, ততই তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইবে। ইহা ঘটনা। যদি কেহ স্বামীজীকেই ভালবাসেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীমাকে গ্রহণ না করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আবার কেহ যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে বা শ্রীশ্রীমাকে ভক্তি করেন, স্বামীজীর প্রতি ভক্তি নাই, তাহাতেও আমাদের ইষ্টাপত্তি নাই। কারণ, ঠাকুর-মা-স্বামীজী তিনে এক, একে তিন।

যদি কোন ব্যক্তি বিদেশি কোন মহাপুরুষের নামোচ্চারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তাহাতেও আমাদের কোন দুঃখ নাই। কারণ, ভাল করিয়া খুঁজিলে আমরা দেখিতে পাইব, স্বামীজী বা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা শ্রীশ্রীমায়ের উক্তির মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐ মহাপুরুষের উক্তির সদৃশ বাণী নিহিত রহিয়াছে। আগন্তুক ব্যক্তিকে কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে ঃ "ভাই, আপনি যেমন ঐ বিদেশি মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধালু, ভারতের মহাপুরুষগণকে যদি ঐরূপে শ্রদ্ধা করেন তো আপনার মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না।"

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশিক্ষণ ঃ 'Let nature be thy teacher'—প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা প্রদান করুন। পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির প্রবাহ চলিতেছে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া। এই প্রবাহ কেন স্তব্ধ হইতেছে না? ইহার কারণ কি? গানের ছলে কবি বলিতেছেন ঃ "মরণ কি ভয় দেখাও মোরে/ মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানরূপী শিব আছেন আমার এ অন্তরে/... শিশু ছিলাম, যুবা হয়েছি, বৃদ্ধ হব দুদিন পরে/ তেমনি আবার শিশু হব, দেহের নাশে দেহান্তরে।।" ঐ মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানরূপী শিব-ই পরিবর্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয় সত্তা। এবং শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সবই পর পর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনশীল অবস্থামাত্র। প্রকৃতিতে 'Old order changeth yielding place to the new'—নূতন পৃথিবীর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় প্রবীণ নবীনকে স্থান ছাড়িয়া দেয়, নিজেরই বাঁচিবার তাগিদে। যেকোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনও এইরূপ একটি প্রবাহস্বরূপ। সেখানে একটি প্রাণশক্তি বিদ্যমান থাকে। ঐ প্রাণরস এক প্রজন্ম হইতে পরবর্তী প্রজন্মে অনুসঞ্চারিত হয়। তাই সংগঠনকে সজীব রাখিতে গেলে নূতন প্রজন্মের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইরূপ একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই পরম্পরা আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতেও 'নূতন প্রজন্মের প্রশিক্ষণ' ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর। তবে একথাও অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, কেবল ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমান প্রজন্মেরও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। দিকে দিকে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম', 'বিবেকানন্দ পাঠচক্র', 'সারদা মাতৃসঙ্ঘ' ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে যেকোন অ-রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠন এই 'প্রশিক্ষণ'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। কিভাবে সেবা করিব, 'কর্মযোগ' কাহাকে বলে, কিভাবে পূজা করিতে হয়, কিভাবে ধ্যান করিতে হয়, কিভাবে শরীর-মন গঠন করিতে হয় ইত্যাদি সকল প্রশ্নের উত্তর এই প্রশিক্ষণের মধ্যেই নিহিত আছে এবং এই প্রশিক্ষণ সারাবৎসরব্যাপী চলিতে থাকিবে। আজকাল বিভিন্ন স্থানে 'ভক্তসম্মেলন' হইতেছে। ইহাও ঐ 'প্রশিক্ষণ'-এর অন্তর্গত। অতএব যুবশিবির, অনুধ্যান-শিবির, যোগ ও স্বাস্থ্য-শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা সংগঠনের মৌলিক দায়িত্ব বলিয়াই মনে করা হয়।

এই 'প্রশিক্ষণ' যথাযথ হইলে সংগঠনের বয়স্ক ও যুবাদের মধ্যে একটি প্রীতির সেতু গড়িয়া উঠে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক সদস্যদিগের সহিত যুবাদের সদ্ভাব-সম্প্রীতি নাই দেখিতে পাওয়া যায়। যুবগোষ্ঠীর অভিযোগ—'ওঁরা সব নিজেরাই করবেন, আমাদের কোন দায়িত্ব দেবেন না।' এবং বয়স্কগণের মনোভাব—'ওরা দায়িত্ব নিতেই শেখেনি। তাছাড়া ওদের বেশি দায়িত্ব দিলে আমাদের সরিয়ে দেবে। সংগঠনের দায়িত্বে আছি বলে যাহোক লোকে একটু মান্যি করে।' কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, একহাতে কখনো তালি বাজে না। প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এইখানে। সকল সদস্যের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেই 'team work' বা দলবদ্ধ প্রয়াস সাফল্যলাভ করে। প্রত্যেকেই পরস্পরের সুখ-সুবিধা দেখিলে সঙ্ঘজীবন মধুময় হইয়া উঠে। পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকিলে সংগঠনের স্থিতি, গতি, বৃদ্ধি সবই ব্যাহত হয়। এবং পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিদ্বেষ, ঘৃণা, হীনম্মন্যতার কারণে সংগঠনের মধ্যেই একটি শ্রেণিসংগ্রাম চলিতে থাকে। ক্রমশ সংগঠন ধ্বংস হইয়া যায়। শত্রুপক্ষের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘে শ্রেণিসংগ্রাম-তত্ত্ব প্রযোজ্য নহে। জয়রামবাটীতে একটি বালক অপর একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ "সব একসঙ্গে খাচ্ছে, ওরা কি জাত?" অপর বালক উত্তর করিলঃ "ওরা ভক্ত।" মা বলিতেন, ভক্তের জাত নাই। ঠাকুরও বলিয়াছেনঃ "এক উপায়ে জাতপাত নাশ হতে পারে, তা হলো ভক্তি।" সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত সংগঠনে শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

ভক্তের কর্তব্য ও আচরণঃ সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। যথাঃ সন্ন্যাসী, গৃহী, অবিবাহিত (গৃহে থাকিয়াও সংসারত্যাগী)। ভবঘুরে কিংবা বাউণ্ডুলে-জাতীয় ব্যক্তিদের এই তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। মনে রাখা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী যেকোন ব্যক্তি এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। বিগত ১৪০৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে '*ভক্তের ব্যবহার ও কর্তব্য*' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছিল। তাহার সারাংশ পুনরায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের পৃথক চরিত্রগুণ থাকে, যথা (ক) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য এবং (খ) মিশনের প্রতি আনুগত্য।

(২) সংগ্রামশীলতায় এই আনুগত্যের প্রকাশ। অর্থাৎ (ক) ভক্ত মানে 'গোবেচারা' হওয়া নহে এবং (খ) দুঃখের কথা, লক্ষ লক্ষ দীক্ষিত ভক্ত মিশনের কর্মধারা সম্পর্কে মোটেই সচেতন বা আগ্রহী নহেন। তাঁহাদের আগ্রহী ও সচেতন হইতে হইবে। (গ) অসংখ্য ভক্ত মিশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, অসত্য নিন্দার বিরুদ্ধে নীরব। তাঁহাদের সরব ও প্রতিবাদী হইতে হইবে। (ঘ) ইহা সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসব্রতীর অপ্রতুলতা বেদনাদায়ক। পরিবার-পিছু অন্তত একজন সন্তানকেও ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। (ঙ) ভক্তকে 'Assertive' বা রোখালো হইতে হইবে। দুষ্ট ব্যক্তি চোখ রাঙাইলে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, আমরাও চোখ রাঙাইতে পারি। (চ) সংবাদপত্রের মিথ্যা সমালোচনার উত্তরে তথ্যনির্ভর হইয়া সংবাদপত্রেই লিখিতে হইবে। (ছ) প্রতিবাদকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং সৎ ও ইতিবাচক সমালোচনাকে স্বাগত জানাইতে হইবে।

(৩) নিজ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তজ্জন্য সত্য, ত্যাগ, সেবা, সহানুভূতি, পবিত্রতা, ভালবাসা ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শকে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) আদর্শকে সাধ্যমতো প্রচার করিতে হইবে।

(৫) বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মবৈষম্য ও অন্যান্য সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) পণপ্রথা ও উহার সগোত্র যাবতীয় কুসংস্কার ও ক্ষতিকারক সামাজিক রীতির বিরোধিতা করিতে হইবে।

(৭) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গুরুবাদের বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একমাত্র গুরু। অন্তরে স্বীয় দীক্ষাগুরুর প্রতি

ভক্তিপরায়ণ রহিয়া বাহ্যভাবে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ-গুরুরই প্রচার ও পূজা চালাইতে হইবে।

ভাবপ্রচার পরিষদের দশ দফা নির্দেশাবলী ঃ সংগঠন পরিচালনা করিতে যাইলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতেই হয়। কিছু সমস্যা তাৎক্ষণিক, কিছু দীর্ঘস্থায়ী। জমি-জমা-সম্পত্তি কিংবা বাহ্য প্রতিরোধমূলক বা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি যেন বৃত্তের উপরিস্থিত সমস্যা। কিন্তু আদর্শ-হীনতা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি বৃত্তের কেন্দ্রস্থ সমস্যা। কেন্দ্র মজবুত থাকিলে সবই ক্রমে ক্রমে পথে আসিবে। তবু বাহ্য নিয়মশৃঙ্খলাও বিশেষ জরুরি। এই কারণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল কেন্দ্র হইতে প্রচারিত দশ দফা নিয়মাবলীর পুনরুল্লেখ করিতেছি। এই নিয়মাবলী যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদিগের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে, সেব্যাপারে সন্দেহ নাই। নিয়মগুলি নিম্নরূপ—

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে 'Religious Trust'-রূপে এবং/ অথবা 'Societies Registration Act' অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া চাই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করিবে। সেইসঙ্গে মঠ ও মিশনের ধারা অনুযায়ী পরিচালিত করিবে তাহাদের সেবাকাজ।

(২) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মঠ ও মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

(৩) এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনরকম সংস্রব রাখিবে না এবং এমন কোন গোষ্ঠী বা সংস্থা যা মঠ ও মিশন দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহাদের সহিতও সম্পর্ক রাখিবে না।

(৪) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে বা কোন কারণে সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—এমন কোন সন্ন্যাসীকে বা ব্রহ্মচারীকে এইসব প্রতিষ্ঠানে থাকিতে দেওয়া যাইবে না বা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা যাইবে না।

(৫) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান টাকা-পয়সার সঠিক হিসাব রাখিবে এবং প্রতি বছরে চার্টার্ড হিসাবপরীক্ষক দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাইবে।

(৬) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অন্যান্য কাজকর্ম ছাড়াও স্থানীয় দরিদ্রদের মধ্যে অবশ্যই কিছু পরিমাণ প্রতিকার বা প্রতিষেধকমূলক সমাজসেবা করিবে।

(৭) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গ্রামের হরিজন অথবা গিরি-জনদের মধ্যে যথাসাধ্য উন্নয়নমূলক সেবাকাজ করিবে।

(৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় যুবসমাজের দিকে মনোযোগ দিবে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পাঠচক্র এবং প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, ভাষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাৎসরিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবে। ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক পাঠচক্রের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারত সরকার স্বামীজীর জন্মদিন ১২ জানুয়ারি 'জাতীয় যুবদিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি আশ্রম এই দিনটি অবশ্যই পালন করিবে।

(৯) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন মানুষকে সাহায্যের জন্য ত্রাণকার্যের কর্মসূচী গ্রহণ করিবে। এই কাজ স্বাধীনভাবে বা মঠ ও মিশনের পরিচালনাধীনে করা যাইতে পারে।

(১০) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধর্মশাস্ত্রের ক্লাস ছাড়াও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

এইসকল প্রতিষ্ঠান পরিষদের পরিচালনায় সম্মিলিতভাবে বাৎসরিক উৎসব করিবে। সমর্থ ও ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যায়ক্রমে বাৎসরিক উৎসবের দায়িত্ব লইতে পারে। পূজা, আরতি, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মীয় সভা ছাড়াও একটি দিন পুরো রাখা থাকিবে ছাত্রছাত্রী ও যুবকযুবতীদের জন্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আবৃত্তি, ভাষণ, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হইবে এবং সেসকলের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা পরিষদের উৎসবের অঙ্গ হইবে। যে-গ্রাম বা শহরে পরিষদের উৎসব হইবে, সেখানে উৎসবের একদিন প্রাতে ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা সেই গ্রাম বা শহরের প্রধান পথসমূহ পরিক্রমা করিবে এবং শোভাযাত্রার শেষে একটি স্বল্পকালীন জনসভা আয়োজিত হইবে।

উপসংহার ঃ মহাকালের দুর্নিবার প্রবাহের টানে জীবজগৎ সবই ভাসিয়া চলিতেছে মুক্তির লক্ষ্যে। তবু বারংবার বলিতে ইচ্ছা হয় ঃ "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।" সহসা সেই অনন্ত মহাকাল-প্রবাহের মধ্যে দ্বীপবৎ এক আশার আলো দেখা যাইতেছে। জুড়াইবার একটি স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। যেখানে দাঁড়াইলে নব সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করা যাইবে; দেখা যাইবে কেমন করিয়া রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া চিরকালের পূতিগন্ধযুক্ত এই দুঃসহ সংসারজ্বালায় কে যেন দিব্যগন্ধের প্রলেপ দিতেছে। "কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারী"—কোন এক অদ্ভুত শক্তি সমূহ পাপরাশিকে পুণ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিতেছে। জগৎসংসারে সদ্য আরব্ধ এক মহাপুণ্যযজ্ঞে সকল ভক্তবৃন্দ, সন্ন্যাসী অথবা গৃহী চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে অংশগ্রহণ করিবার জন্য। আমরাও সকলে ছুটিয়া আসিয়াছি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন' নামক সেই মহাযজ্ঞে সেবাদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিবার জন্য। ❑

সমসাময়িক সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দ

'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য, সেই বছরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। এর ৩০ বছর পর শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক আবির্ভাব। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের সংবাদ ভারতের যেসকল প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তখন বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অগ্রগণ্য। সেখানে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং সংবাদ ও মন্তব্যের কিয়দংশ অনূদিত আকারে এখানে উপস্থাপন করা হলো। *অনুবাদক : জয়দীপ ঘোষ*

ইণ্ডিয়ান মিরর, ৩০ নভেম্বর ১৮৯৩

সম্পাদক সমীপেষু

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

কোন কোন মানুষ এটা জানতে উৎসুক হয়ে উঠেছে যে, কিভাবে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু কালাপানি পেরতে পারেন, 'ম্লেচ্ছ' পদ্ধতিতে খাওয়াদাওয়া করেন এবং ধর্মমহাসভায় নিজেকে উপস্থাপিত করেন! বিবেকানন্দ স্বামী—যিনি তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং চমকপ্রদ ভাষণের দ্বারা ধর্মমহাসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন—মাদ্রাজের হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপেই পরিচিত। আমাদের পাঠকগণ এটা জেনে চমৎকৃত হবেন যে, তিনি মাদ্রাজের সন্ন্যাসী নন, বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাঙালি গ্র্যাজুয়েট। তাঁর আসল নাম বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁকে 'ব্রাহ্মণ' হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল। তিনি আমাদের প্রয়াত বন্ধু সিমলার তারকনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র [?]; যিনি আসলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য [?] ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মদলভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সুমধুর স্বরে একটি বিশেষ ব্রাহ্মসমাজের গায়নদলকে [?] নেতৃত্ব দিতেন। যখন আমাদের নেতা জীবিত ছিলেন, তখনি কোন একসময়ে তিনি নব বৃন্দাবন থিয়েটারে অভিনয়ও করতেন।

বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি আইন পড়ছিলেন, কিন্তু ক্রমশ তিনি উপনীত হন দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামকৃষ্ণ পরমহংসের পদতলে, যাঁর দেহান্তের পর তিনি ভিক্ষুকের জীবনযাপনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন এবং আত্মত্যাগের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পদব্রজে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং মাদ্রাজের হিন্দুগণের সাহায্যে শিকাগোর উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, কর্মঠ এবং আত্মত্যাগী; কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে, তিনি প্রাচীন গোঁড়া হিন্দুত্বের শরিক নন, বরং তিনি নব-হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। ❑

ইণ্ডিয়ান মিরর, ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৩

মহাশয়,

আমেরিকার অগ্রণী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি 'দি নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক' এবং 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' থেকে উদ্ধৃত পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের মহান শিষ্য বিবেকানন্দ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত রচনাংশ-দুটি, আমার স্থির বিশ্বাস, আপনাদের অগণিত পাঠকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এগুলি পাঠ করার পর তাঁর গুরু পরমহংসদেব তাঁর সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যা আপনাদের সাম্প্রতিক সংখ্যাটিতে [২০ ডিসেম্বর] প্রকাশিত হয়েছে—বিবেকানন্দ পৃথিবীর ভিত-সুদ্ধ কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্যই অবতীর্ণ*—তার অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে কারোর মনেই সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

'নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক' বলেছেঃ ''অনেক সংক্ষিপ্ত ভাষণই ছিল অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, কিন্তু কেউই সেই হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো এই ধর্মমহাসভার মূল ভাব ও তার সীমাবদ্ধতাকে এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। আমি উক্ত ভাষণটি পুরোপুরিই লিপিবদ্ধ করেছি, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে আমি কিছু ইঙ্গিত দিতে পারি মাত্র। কারণ, তিনি এক দিব্য অধিকারসম্পন্ন বক্তা এবং চিত্রবৎ গৈরিক প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রগাঢ় ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী এবং ছন্দোময় উচ্চারণ ঐ দিব্য শব্দগুলির থেকে কোন অংশে কম আকর্ষণীয় নয়।''

[এখানে তাঁর পুরো ভাষণটি তুলে দেওয়া হয়েছে।]

আবার, সেই একই পত্রিকা বলেছেঃ ''তাঁর সংস্কৃতিবোধ, তাঁর বাক্‌পটুতা, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের এক নতুন ধারণা প্রদান করে। তাঁর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী এবং তাঁর সুগভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে—যা সকলকে নিমেষে আচ্ছন্ন করে দেয়—ক্লাব এবং চার্চগুলিতে ক্রমাগত আলোচনা হচ্ছিল, যতদিন না তাঁর আদর্শ আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। তিনি পূর্বলিখিত কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই শিল্পীসুলভ ভঙ্গিমায় ভাষণ দেন, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করতে পারেন।...''

'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' বলেছেঃ ''বিবেকানন্দই নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর কথা শোনার পর আমরা বুঝেছি, ঐ সুশিক্ষিত দেশে মিশনারি প্রেরণ করা কী মূর্খতার কাজ!'' ❑

* 'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার ৪৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
—সম্পাদক

স্বামী শিবানন্দের চারটি পত্র

[১]*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌

BELUR MATH P.O.
Dt. Howrah
22/9/31

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মা তুমি ঠাকুরকে নিয়ে যেভাবে আছ, তাতে তোমার মঙ্গল হইবেই। পূজা পাঠ জানার কোন দরকার নাই। তাঁর চরণে ভক্তি, বিশ্বাস নিবেদন করলেই সব হইল। তিনি ত মা মন দেখেন—মন্ত্র তন্ত্রের ছটায় বাহিরের লোক ভুলে বটে, কিন্তু তাঁকে কি ভোলান যায়। মন চঞ্চল তার জন্য চিন্তিত হইও না—তাঁর প্রতি ভালবাসা, ভক্তি, বিশ্বাস থাকলেই হইল। তাঁরই দেওয়া সংসার, আত্মীয়স্বজন—তাদেরও ত দেখতে হবে। ওসবও যে মা তাঁরই।

এখানে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ—তা নাই হলো। ঠাকুর ত রয়েছেন, মা তোমাদের কাছে। এখানেও তিনি—তোমাদের কাছেও তিনি। তবে আর চিন্তা কি? তোমরা ঘরে বসেই সব পাবে।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি ও বাড়ির সকলে আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জেনো। প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌

BELUR MATH P.O.
Dt. Howrah
13/10/31

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ওখানে পূজা নাই বলে কষ্ট করো না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মাত্রই পূজার প্রতীক্ষায় থাকে, কোথাও দুর্গাপূজা হলে তাদের কত আনন্দ হয়। সেই আনন্দের ধ্বনি তোমরা শুনতে পাবে না, তাতে কষ্ট হবারই

* মনোরমা সরকারের পুত্রবধূ, গড়িয়া-নিবাসিনী বাসন্তী সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কথা। এ আনন্দের মূলে কত ভালবাসা, আশাভরসা যেন জড়িত রয়েছে। ভক্তি বিশ্বাস তিনি ত তোমাদের দিয়াছেন, মূর্ত্তি নাই বাহিরে দেখলে, হৃদয়ে তাঁর দর্শন পাবে। তোমরা যে কজন বাঙ্গালী আছ, সে কজনে মিলেমিশে দেখাশুনা করে তাঁর কথা বলবে, মাকে স্মরণ করবে, তাহলেই মার খুব আনন্দ হবে।

তোমার মা পত্র পেলেই জবাব দিব, যদি কিছু দেরী হয়, মনে কিছু করো না। তোমাদের কথা খুব মনে আছে, খুব প্রার্থনা করি—তোমাদের তিনি মঙ্গল করুন।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। মঠের অন্যান্য সব কুশল। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে এবং বাড়ির সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH
6/11/31

মা মনোরমা,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। ঠাকুর তোমাদের কুশলে রাখুন এবং তোমাদের প্রেম ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি করুন। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং ক্ষিতীশকে জানাইয়া সুখী করিবে।

বন্যার জন্য যে ৫্টী টাকা পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়াছি। মঠে মার পূজাকল্প হয়ে গেল। তিন দিনে ৭।৮ হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিল—আর অদ্ভুত ভক্ত সমাগম হইত। এইসব কারণের জন্য ৩০০্ টাকা পূজা বাবৎ কর্জ্জ হইয়াছে। যদি অসুবিধা না হয় ক্ষিতীশকে বলে ১০্টা টাকা পাঠিও—পূজার ঋণ বাবৎ।

আমার শরীর পূজার পর হইতেই খুব খারাপ হইয়াছে। রক্তের চাপ ২৫০ হইয়াছিল। সেটা একটু কম পড়ার পর হইতেই গত কল্য হইতে খুব হাঁপের টান হইতেছে। গত রাত্রে প্রায় বসিয়াই কাটাইতে হইয়াছে। সবই তাঁর ইচ্ছা। তোমরা সব কুশলে থাক প্রার্থনা করি। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[৪]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELUR MATH P.O.
DT. HOWRAH
28/3/32

মা মনোরমা,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম। দেখ না, এবারও তোমার পত্রের জবাব দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। মাঝে শরীরটা খুবই খারাপ হইত—নিত্য একটু করে জ্বর হইত, এই ভাবে দিন ২৪ কেটেছে। আজ ৫।৬ দিন একটু ভাল আছি।

তাঁর ইচ্ছা হইলে—তোমাদের ঠাকুরের উৎসব দেখা হইবে। এবৎসর ত হয়ে গেল। লক্ষাধিক ভক্ত আসেন—১৯।২০ হাজার ভক্ত জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রসাদ পান। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা।

তোমরা সব কুশলে থাক। তিনি তোমাদের প্রেম ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি করুন। তিনি তোমাদের শান্তি দিন। মঠের অন্যান্য সব কুশল। তুমি ও বাড়ির সকলে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

ভূমিকা ঃ কর্মরহস্য

জীবের জীবনচক্রটি যেন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। যতদিন তাহার অন্তরে জগৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল থাকে, ততদিন এই কলের গতি বন্ধ করিবার উপায় নাই। কোন কৃত্রিম উপায়ে ঐ যন্ত্রকে অচল করিয়া রাখিলে অচল করিবার শক্তি ক্ষয় হইলেই, কলটি পুনরায় পূর্ববৎ চলিতে থাকে। এবং কল যতই চলে, তাহার গতিশক্তি ততই বাড়িয়া চলে। এই কল বন্ধ করিলেও বিপদ, চালাইলেও বিপদ। সেইজন্যই তো এই 'যাওয়া-আসা'র জীবন হইতে মুক্তিলাভ করা এত দুঃসাধ্য।

আমরা যখন কোন কর্ম করি, তাহার পশ্চাতে পূর্বকর্মের সংস্কার বা 'প্রাক্তন'-এর বেগ শক্তি জোগায়। প্রয়োজনের অনুরূপ শক্তি ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু সংস্কাররূপে তাহাই আবার ঘুরিয়া আসিয়া শক্তিভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া থাকে (রসায়ন বিজ্ঞানের exothermic reaction-এর মতো)। এই জগতে প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, তাই আমরা শারীরিক বা মানসিক যেকোন কর্মই করি না কেন—সেই কর্ম করিবার শক্তি ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু উহা আশ্চর্য নিয়মে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলরূপে সঞ্চিত হয়।

যখন আমরা কোন কাজ বা চিন্তা করি তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে যে-স্পন্দন উপস্থিত হয়, কাজ শেষ হইয়া গেলে চিত্তকোষাগারে তখন তাহা গিয়া আবার সংস্কাররূপে অবস্থান করে। প্রথম যেদিন ধূমপান করিবার চেষ্টা করি, সেদিন গলার কাশি উঠে তাহাতে কষ্ট হয়। মন বলিল—ধূমপান করা কষ্টকর, আর খাব না। কিন্তু 'বুদ্ধি' অত্যন্ত অভিজ্ঞ বিচক্ষণের মতো বলিল—যদি কষ্টকরই হইত, তবে জগতের কোটি কোটি লোকই কি ধূমপান করিত? নূতন জিনিস অভ্যাস করিতে একটু কষ্ট হইয়া থাকে, এরপরে সুখ হইবে। বুদ্ধির প্রেরণায় কয়েকদিন কষ্ট করিয়া খাওয়ার পর দেখিলাম, সত্যসত্যই ধূমপানের বেশ একটা সুখ আছে। তাহার পর যতই খাই, ততই খাওয়ার প্রয়োজন বাড়ে। খুব উত্তম ভোজ খাওয়ার পর একটু সুখটান না দিলে রাজভোগ খাওয়ার আনন্দই যেন মাটি হইয়া যায়। তাহার পর একদিন খুব সর্দিকাশি হইল। ধূমপানে এমন কাশি হয় যে, কাশিতে কাশিতে শ্বাসবন্ধ হইবার উপক্রম হয়; কিন্তু তথাপি উহা না করিয়া পারি না। জীবনের সকল কর্মেরই ইহাই রহস্য।

কত লক্ষ লক্ষবার আমরা জন্মিয়াছি এবং অনন্ত কর্মসংস্কার চিত্তকোষাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। যখন ঘটনাচক্রে যে-পরিবেশে পড়ি, তখন সেই পরিবেশের অনুকূল পূর্বসঞ্চিত সংস্কারসমূহ জাগ্রত হইয়া জীবনের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। একটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কোন কর্মের ফলে শ্রমিকের ঘরে জন্ম হইল। বয়স বাড়িতে না বাড়িতে সে গ্রামের মোড়ল হইয়া উঠিল। সে মরিয়া আবার এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। তখন তাহার লেখাপড়ার দিকে অসাধারণ ঝোঁক দেখিয়া সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। একটি কুচরিত্র লোক মাতাল হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিত; কিন্তু সে কোন দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিলেই পরমভক্তিভরে প্রণাম করিত। লোকে তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত। পদ্মবিনোদের কাহিনী ঠিক এইরূপ।

মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত রহস্য যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা লক্ষ্য করিলে অনেকসময় স্তম্ভিত হইতে হয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, আমাদের সূক্ষ্মদেহে অনন্ত জীবনের সংস্কারসমূহ সঞ্চিত আছে। আমরা ঘটনাচক্রে যখন যেখানে উপস্থিত হই অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করি, সেই আবহাওয়ার অনুকূল যেসব সংস্কার আমাদের ভিতর থাকে, তাহা সেইসময় জাগিয়া উঠে। আমরা জীবন দিয়া কতকগুলি কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। যেটুকু ভোগ হয়, তাহাকে বলে 'প্রারব্ধ কর্ম'। অর্থাৎ আমাদের পূর্বসঞ্চিত কর্মসমূহের যেটুকু আমরা এই জীবনে ভোগ করিব, যাহা প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়াছে এবং জীবনের বহুপ্রকার বৈচিত্র্যের যে বিকাশ দেখা যায়—তাহা ঐ প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ের পথে চলিবার গতি। ঐ প্রারব্ধ কর্ম ভোগ হইয়া গেলে এই জীবন অর্থাৎ স্থূলশরীর খসিয়া পড়ে। তাই এই কর্মকে বলা হয় 'ক্ষীয়মাণ কর্ম'। কর্মের ঐ এক আশ্চর্য রহস্য—যাহা ক্ষয় হয়, তাহাই আবার প্রবলতর হইয়া সঞ্চিত হয়। এইজন্যই তো বলা হয় যে, কর্মসন্ন্যাস না হইলে মুক্তি হয় না। স্থূলবুদ্ধি লোকেরা কর্ম না করাকে কর্মসন্ন্যাস মনে করিয়া থাকে; তাহারা জানে না যে, অনন্ত জীবনের কর্মসংস্কারের একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার চিত্তের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আছে। তাই জ্ঞানীরা বলেন, কর্মের দিকে মনোযোগ না দিয়া কর্মের উর্ধ্বস্থিত নৈষ্কর্ম্যাবস্থায় মন সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিলে, মানুষ যদি সত্য সত্য আগ্রহান্বিত থাকে তবে ঐ কর্মের ভাণ্ডারটি ফেলিয়া দিয়া উপরের তলায় নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির ঘরে উঠিয়া যাইতে পারে। এই কর্মের রহস্য বুঝাইবার জন্য মোক্ষশাস্ত্র প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। 'Plan of the Creation' এমন যে, মানুষের পক্ষে এই কর্মরহস্য চিরকাল দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি অধ্যাত্মসাধনার একমাত্র লক্ষ্য—ঐ কর্মচক্র হইতে অব্যাহতি। তাহাকেই বলে 'মুক্তি'।

ঐ কর্মচক্র হইতে মুক্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে দারুণ ভয় হয়। দেখা যায়, যাহারা বাড়ি হইতে কখনো বাহির হয় না, তাহারা শ্বশুরবাড়ি যাইতেও ভয় পায়। আবার যাহারা বাল্যকাল হইতে বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবার সুযোগ পায়, তাহারা আনন্দলাভের আশায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো পছন্দ করে। সেইজন্য বিধাতার সৃষ্টিতে মর্ত্যজীবনের উর্ধ্বে বহু স্তরের কথা জানা যায়। মানুষ কর্মফলে যদি গন্ধর্ব, অপ্সরা হইবার সুযোগ পায় এবং তখন যদি তাহারা জানিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে দেবতা হইবার লালসা তাহাদের মনে জাগিয়া উঠে। দেবজীবনের আনন্দের আস্বাদ পাইলে, যদি তাহারা শুনে ইহার উর্ধ্বে আরেকটি আনন্দজীবন আছে, তবে ঐ জীবনলাভের জন্য তাহারা চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু একটি পশুমানবকে কিন্নর, অপ্সরা বা দেবজীবনের আনন্দের কথা বলিলে তাহারা কখনো দেবত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

একদা দেবর্ষি নারদ চতুর্দশভুবনে ভ্রমণ করিতে করিতে মর্ত্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি জীবের দারুণ দুর্দশা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হন। তিনি ভাবিলেন, ভগবান ইচ্ছা করিলে সর্বজীবকে সুখী করিতে পারেন; তবে তিনি কেন তাহাদিগকে এত কষ্ট দিতেছেন? নারদ ব্যথিতচিত্তে ও অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। দুঃখভারাক্রান্ত নারদকে দেখিয়া নারায়ণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার দুঃখের কথা ভগবানকে নিবেদন করিলেন। নারায়ণ বলিলেন ঃ "বৎস নারদ, তুমি পরম ভক্ত, আমি তো তোমার একান্ত অধীন। তোমার যদি জীবকে আনন্দ দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সকলকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে এস।" এই কথা শুনিয়া নারদ আহ্লাদে আটখানা হইয়া মর্ত্যলোকে উপস্থিত হইলেন। নারদ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদীতীরে বহুলোকের বিষ্ঠার মধ্যে পড়িয়া কৃমিকুল ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দৃশ্য তাঁহাকে খুব ব্যথিত করিলেও তিনি কীটদের নিকটে গিয়া বলিলেন ঃ "বৎসগণ, তোমাদের দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না; চল তোমরা আমার সঙ্গে; আমি তোমাদিগকে পরমানন্দময় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইব।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া অধিকাংশ কীট বিষ্ঠার মধ্যে আত্মগোপন করিল; কয়েকটি মাত্র সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিল ঃ "প্রভু আমরা ওখানে কোথায় থাকব, কী খাব?" নারদ বলিলেন ঃ "সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই, আনন্দের মধ্যে থাকিবে এবং অমৃত পান করিবে।" কীটেরা বলিল ঃ "আমরা তো ঐসব জিনিস জানি না, আমাদের এ-ই খাদ্য ওখানে দিতে পারবেন কিনা বলুন।" নারদ বহু চেষ্টা করিয়াও কীটের নিকট স্বাদুতম বিষ্ঠা অপেক্ষাও যে স্বাদুতর জিনিস আছে, তাহা বুঝাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনে পড়িল ভগবানের সেই কথা—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" (গীতা, ১৮।৬১) অর্থাৎ হে অর্জুন। ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যন্ত্রারূঢ় পুতুলের ন্যায় মায়ার দ্বারা সকল জীবকে চালনা করিতেছেন।

[ক্রমশ] ।।এগারো।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

৩

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

সচ্চিদানন্দ ধর

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

সনাতন হিন্দুধর্মে দশ অবতারের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক পুরুষ গৌতম বুদ্ধকেও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ভগবানের অবতার বলেই গ্রহণ করেছে। অথচ শ্রীবুদ্ধ বেদ বা ভগবান বাহ্যত স্বীকার করেননি। বাসুদেব, দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুরা ঈশ্বরাবতার অপেক্ষাও অধিক সম্মান দেন। অন্যান্য অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের 'কলা' বা 'অংশমাত্র', কিন্তু বহু দিব্য মহিমায় মণ্ডিত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" মনুষ্যদেহ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য তাঁকে 'অবতার' বললে তাঁর মহিমা খর্ব করা হয়। তাঁর স্বকীয় অনন্যসাধারণ মহিমায় তিনি স্বয়ং ভগবান-ই।

শ্রীকৃষ্ণের তিন লীলা

মানবদেহধারী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের তিনটি লীলা—বৃন্দাবনলীলা, কুরুক্ষেত্রলীলা ও প্রভাসলীলা। এই তিন লীলাতেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অতিমানবীয় গুণরাশির বিকাশ ঘটেছে। অবতারেরা আসেন লোকশিক্ষার জন্য—ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। তাঁদের দিব্য-মানবীয় জীবনচর্যা এবং বাণীই হয় সাধারণ মানুষের অনুসরণ ও আচরণের প্রেরণা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই তিন লীলাকে নিজ নিজ অভিরুচি এবং দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন নানা মুনি-ঋষি, মনীষী, ভাষ্যকার, আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানিগণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেকক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মননে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনাগুলি প্রধানত পাওয়া যায় মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' এবং আমেরিকার প্যাসাডোনায় 'সেক্সপীয়ার ক্লাব'-এ প্রদত্ত 'মহাভারত' শীর্ষক বক্তৃতা-দুটিতে। বর্তমান আলোচনায় এই দুটি বক্তৃতাকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

কামকাঞ্চনাসক্তিরহিত, সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—ঈশ্বরাবতারের ত্যাগ-করুণা-প্রেমময় জীবন কী হতে পারে। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকেও কামগন্ধহীন প্রেমময়, অনাসক্ত কর্মময় এবং উদার, সহিষ্ণু ও আধ্যাত্মিকতা-ময়রূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন।

(ক) একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী ■ স্বামীজী বলেছেন ঃ "শ্রীকৃষ্ণ একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিস্ময়কর রজোশক্তির বিকাশ দেখা গিয়েছিল, অথচ তাঁর ছিল অদ্ভুত ত্যাগ। গীতা পাঠ না করলে কৃষ্ণচরিত্র কখনোই বোঝা যেতে পারে না; কারণ তিনি তাঁর নিজের উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। সব অবতারই—তাঁরা যা প্রচার করতে এসেছিলেন, তার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহ হিসাবে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত। তিনি অনেককে রাজা করলেন, কিন্তু নিজে সিংহাসনে বসলেন না। যিনি সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁর কথায় রাজারা নিজের নিজের সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন—তিনি নিজে রাজা হতে চাননি।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনিই প্রচ্ছন্ন নায়ক। পাণ্ডবদের বিজয়ের পর তিনি যুদ্ধবিজয়ের কোন কৃতিত্ব নিলেন না। অনাসক্তভাবে ধর্মসংস্থাপন করে তিনি প্রভাসেই প্রস্থান করলেন। সেই সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে অনাসক্তভাবেই থাকলেন।

(খ) গোপীপ্রেম—অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্ত ■ দুর্বোধ্য গোপীপ্রেমকে কিভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে তা স্বামীজী সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন ঃ "তাঁর [শ্রীকৃষ্ণের] জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে, যা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেউ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হচ্ছে, ততক্ষণ তা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়।... কে গোপীদের সেই প্রেমজনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝতে পারে—যে-প্রেম প্রেমের আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চায় না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোক কোন বস্তু কামনা করে না।... তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান—তা-ও তারা জানতে চাইত না।

তারা কেবল বুঝত—তিনি প্রেমময়, এই তাদের কাছে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলেই বুঝত। বহু সেনাবাহিনীর নেতা রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাদের কাছে বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন। 'আমি ধনজন চাই না, বিদ্যাবুদ্ধি চাই না, এমনকি আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। আমাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হোক, কিন্তু হে ভগবান, তোমার প্রতি যেন আমার ভালবাসা থাকে—নিষ্কাম ভালবাসা, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা।' ধর্মের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়—অহৈতুকী ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম।...

"গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন।... এই প্রেম এতই শুদ্ধ যে, সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হলে এ বোঝা যায় না। যাদের মনে সারাক্ষণ কাম-কাঞ্চন, যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠছে, তারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝতে চায়, এর সমালোচনা করতে চায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া।... গীতায় ধীরে ধীরে সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই শুধু রয়েছে। এছাড়া আর কিছুই নেই। গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ সব একাকার হয়ে গেছে; ঈশ্বর নেই, স্বর্গ নেই, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নেই। সব গেছে—আছে শুধু সেই প্রেমোন্মত্ততা। এই অবস্থায় সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ, একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখে না। সব মুখ তার কাছে কৃষ্ণের মুখ। তার নিজের মুখও তাই। তার সর্বসত্তা তখন 'কৃষ্ণ'বর্ণে রঞ্জিত। শ্রীকৃষ্ণের এমনই মহিমা!" উল্লেখ্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এই প্রেমবিগ্রহ।

(গ) **গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ—বেদের উদার ভাষ্যকার** ■ কুরুক্ষেত্রলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতা-উপদেশ দান করেছেন, তার মধ্যে বেদ-বেদান্ত ও সকল আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় তত্ত্ব নিহিত আছে। স্বামীজী গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দরভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন ঃ "গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনো হয়নি, হবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বোঝা বড় কঠিন, কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা—সেই ভগবান্ নিজে এসে গীতার প্রচারক হিসাবে শ্রুতির অর্থ বুঝালেন। আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন, সমগ্র জগতে তার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নয়।... একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার হয়তো কোন উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন; উপনিষদে অনেক দ্বৈতভাবের কথা আছে, তিনি কোনরকমে সেগুলোকে ভেঙেচুরে তা থেকে নিজের মনোমত অর্থ বের করলেন। আবার কোন দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকার যখন ব্যাখ্যা করবেন, তিনি অদ্বৈতভাবের অংশগুলোকে ভেঙেচুরে দ্বৈত অর্থ করবেন। কিন্তু গীতাতে কোথাও শ্রুতির তাৎপর্য এভাবে বিকৃত করার চেষ্টা হয়নি।"

(ঘ) **গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের আদর্শ, তাই অবতারশ্রেষ্ঠ** ■ স্বামীজী বলেছেন ঃ "কৃষ্ণভক্তরা বলেন, কৃষ্ণই অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভেবে দেখ; তাঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, সুতরাং গৃহীদের সুখ-দুঃখে তাঁদের সহানুভূতি ছিল না; কি করেই বা থাকবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করে দেখ, তিনি পুত্ররূপে, পিতারূপে, নৃপতিরূপে—সব অবস্থাতেই আদর্শ চরিত্র দেখিয়েছেন।" গৃহি-সন্ন্যাসী যেকোন আশ্রমের ও যেকোন বর্ণের মানুষই উচ্চতম আধ্যাত্মিকভাবে উপনীত হতে পারে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উদার ঘোষণা।"

(ঙ) **নিষ্কাম কর্মযোগ ও অনাসক্তির বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ** ■ স্বামীজী বলেছেন ঃ "তিনি যে অপূর্ব উপদেশ প্রচার করে গেছেন, সারাজীবন নিজে তা আচরণ করে জীবনে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যিনি প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে থেকেও মধুর শান্তি লাভ করেন, আবার গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যেও যিনি মহা কর্মশীল, তিনিই জীবনের যথার্থ রহস্য বুঝেছেন।' এই আদর্শ কিভাবে কাজে পরিণত হতে পারে, কৃষ্ণ তা দেখিয়ে গেছেন। এর উপায় অনাসক্তি। 'সব কাজ কর, কিন্তু কোনকিছুর সঙ্গে নিজেকে বেশি জড়িয়ে ফেলো না। তুমি, সর্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম আমাদের দুঃখের কারণ নয়, আসক্তিই দুঃখের কারণ।' দৃষ্টান্ত হিসেবে অর্থের কথা ধরুন। ধনী হওয়া খুব ভাল কথা। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হয়ো না। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, মান-যশ সবার সম্বন্ধেই একই কথা। এদের ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই, কেবল এটুকু লক্ষ্য রাখবেন যে, এদের প্রতি যেন আসক্ত হয়ে না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং ভগবান, আর কেউ নয়। আত্মীয়স্বজনের জন্য কাজ করুন, তাদের ভালবাসুন... কিন্তু কখনো তাদের প্রতি আসক্ত হবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবনই এই উপদেশের যথার্থ দৃষ্টান্ত।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হলেও মানবীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাঁর জীবন অনুধ্যান করতে পারলেই আমরা ধন্য হব। □

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার অষ্টম পর্যায়ে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর কলকাতার বাড়িতে (৪০ রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০০৪) যেমন ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে শ্রীমা সারদাদেবীরও এই বাড়িতে শুভাগমন হয়।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রীম তাঁর 'কথামৃত'-এ ৫ এপ্রিল ১৮৮৪ তারিখের বিবরণে লিখেছেন ঃ "প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুজ্জেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ি। ম্যাকেঞ্জি লায়ালের এক্সচেঞ্জ নামক নীলামঘরের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তচর্চায় তাঁহার বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন।"[১]

শ্রীম ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখের বিবরণে আরো লিখেছেন ঃ "[প্রাণকৃষ্ণ] প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার [অর্থাৎ পত্নীর] মত লইয়া দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্রসন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একটু স্থূলকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটা বামুন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন।"[২]

বলা আবশ্যক, যিনি স্বহস্তে সেদিন ঠাকুরের জন্য এই ভোগ প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরম ভাগ্যবতী পত্নী বগলামণি দেবী। গৌরী-মার আশ্রমে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় ছিল। ঠাকুরকে যেমন তিনি রেঁধে খাইয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমাকেও তেমন আহার করাবার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে এবং এই উপলক্ষ্যেই প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ঘটে। বগলামণি দেবীর একান্ত আগ্রহেই শ্রীশ্রীমা তাঁদের বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য-সহ পরমান্ন গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করেন; অবশ্য সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বা প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কেউই ইহলোকে ছিলেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের এই বাড়িতে শুভাগমন সম্পর্কে দুর্গাপুরী দেবী জানিয়েছেন ঃ "শ্যামবাজার-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একবার ঠাকুরকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী বগলামণি দেবীর প্রস্তুত পরমান্ন ঠাকুর স্বয়ং উপযাচক হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। বগলাদেবীর ইহা ছিল পরম গর্ব। গৌরী-মার আশ্রমে

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি

• *আলোকচিত্র ঃ ডি. ডি. সাহা*

আসিয়া তিনি সেইকালের কথা আমাদিগকে শুনাইয়া আনন্দ পাইতেন, আমরাও শুনিয়া ধন্য হইতাম।

"মাতাঠাকুরানীকেও স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে তাঁহার বাসনা হইল। রামলালদাদাকে একদিন তিনি মনের অভিলাষ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মা সহজেই তাঁহার নিমন্ত্রণে স্বীকৃত হইলেন। রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি, শিবরামদাদা এবং দুই-তিনজন সাধুসেবকও মায়ের সঙ্গে তথায় গমন করেন।

"গৃহকর্ত্রী মাতার পদ ধৌত করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং একখানি নূতন বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে মাকে ভূষিত করিলেন। ঠাকুর যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

"বগলাদেবী ছিলেন অতিশয় আচারসম্পন্না বিধবা, তিনি গঙ্গাজলে রন্ধন করিলেন। নানাবিধ ভোজ্য, পিষ্টক এবং পরমান্ন প্রস্তুত হইল। তাঁহার ভক্তি ও আন্তরিকতায় সকলেই প্রসন্ন হইলেন।

"লক্ষ্মীদিদি বলিয়াছিলেন, 'অনেক জায়গায় গেছি, অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েছি। খুড়িমার সঙ্গে এ-ব্রাহ্মণীর বাড়িতে যেমন আদরযত্ন আর পেসাদ পেলুম, তা অনেককাল মনে থাকবে।' "[৩]

অনুসন্ধানে জানা যায়, বর্তমানে এই বাড়ির মালিকানা বদল হয়েছে। ❑

পথনির্দেশ ঃ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিকানা ঃ ৪০ রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০০৪। বিধান সরণিতে অবস্থিত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেছে শ্যামপুকুর স্ট্রিট। এই রাস্তা দিয়ে কিছুটা গিয়ে চৌমাথা থেকে ডানদিকে রামধন মিত্র লেন ধরে এগোলে এই বাড়িটি পড়ে।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৩।১　　২ ঐ, ৪।১।১　　৩ সারদা-রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৭০

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

■ (ক) শ্রীমা সারদাদেবীর ১৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যা আগামী জানুয়ারি ২০০৪-এ প্রকাশিত হবে। প্রায় ২২৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে থাকবে মননশীল সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ্, ঐতিহাসিক এবং প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিশ্লেষণমূলক রচনাবলী। আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে বিশেষ আদরণীয় হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ৫০ টাকা। যাঁরা ইচ্ছুক, উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করলে ৩০ নভেম্বর ২০০৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা পাঠাবেন, স্মারক পত্রিকাটি তাঁদের জন্য মাত্র ৩৫ টাকায় দেওয়া হবে। যাঁরা ডাকযোগে নিতে চান, তাঁরা ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত ২৫ টাকা, অর্থাৎ ৬০ (৩৫+২৫) টাকা পাঠাবেন। সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ ছাপানো হবে। সুতরাং গ্রন্থটির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পুরো টাকা পাঠিয়ে সত্বর আপনার নাম নথিভুক্ত করুন।

■ (খ) বিগত দুবছরে কাগজের মূল্য অত্যন্ত বেড়েছে। ভারত সরকার ব্যাঙ্কের সুদের হার অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন খাতে খরচের বহর ক্রমে বেড়েই চলেছে। তবু 'উদ্বোধন'-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য পাঠক-পাঠিকাদের কথা ভেবে আমরা বৃদ্ধি করতে পারিনি। আগামী মাঘ ১৪১০ (জানুয়ারি ২০০৪) থেকে অনন্যোপায় হয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (বিশেষ পূজা সংখ্যা নিয়ে মোট ১২টি সংখ্যা) ৫ টাকা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। অর্থাৎ মাত্র ৮০ টাকায় 'উদ্বোধন'-এর ১২টি সংখ্যা পাওয়া যাবে। এবং সডাক গ্রাহকমূল্য ১০০ টাকা হবে।

মন

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

স্থূল শরীরের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর। ঐ সূক্ষ্ম শরীরের নাম মন। শরীর যেমন স্থূল ভূত দ্বারা গঠিত, সূক্ষ্ম শরীর মন তদ্রূপ সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা গঠিত। ভূত মাত্রই শক্তির আধার। স্থূল শরীরে শক্তি স্থূলভাবে কাজ করে। মনে শক্তির কাজ সূক্ষ্মভাবে। মনাশ্রয়ী শক্তির সূক্ষ্মভাবাপন্ন কার্য্যের বিকাশ চিন্তা। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরস্পর ভিন্ন নয়।...

পঞ্চেন্দ্রিয় বহির্জগতের বিষয় গ্রহণ করে মনের হাতে দেয়। মন তৎসমুদায় জীবাত্মার সমক্ষে আনয়ন করে তাঁর ভোগ ও জ্ঞানের জন্য। জীব বিষয়ের ভোক্তা; মন ইন্দ্রিয়গৃহীত ভোক্তব্য বিষয় জীবাত্মার নিকটে বহন করে মাত্র। মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয় জীবাত্মার নিকট বহন করে না নিয়ে গেলে জীবাত্মার বিষয়ভোগ অসম্ভব। অনেক সময়, মনোযোগ সহকারে পাঠে নিমগ্ন থাকলে ঘরে ঘড়ি বেজে গেলে শুনা যায় না। ঘড়ির শব্দজন্য বায়ুর কম্পন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও মন পাঠে নিযুক্ত থাকায় শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়নি বলে ঐ শব্দ জীবাত্মার শ্রবণগ্রাহ্য হয় না। জীবাত্মা কর্ত্তা। "এটা কর", "এটা করো না"—ইত্যাদিরূপ আজ্ঞা জীবাত্মা হতে আসে প্রথমে মনে। মন সে-আজ্ঞা ইন্দ্রিয়গণের নিকট বহন করে। তারপর ইন্দ্রিয়গণ তদনুসারে কার্য্য করে।

মন স্বতঃচেতন নয়। মনের চৈতন্য সর্ব্বচৈতন্যাধার ভগবানের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। মনের কার্য্য সাধারণতঃ দুই প্রকার। জ্ঞান-সহিত ও জ্ঞান-রহিত। জ্ঞান-সহিত কার্য্যে কর্ত্তার অহংজ্ঞান বিদ্যমান।...

মনের তিন অবস্থা—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তমঃ—জড়তা, কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা; রজঃ—কার্য্যতৎপরতা, কার্য্যে মহা উদ্যম ও উৎসাহ; সত্ত্ব—সংযম, কিনা কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই কর্ত্তার স্বায়ত্ত।... রজঃ দ্বারা তমঃ অভিভূত করে পরে সত্ত্ব দ্বারা রজঃ জয় করতে হয়।

কার্য্য চিন্তার পরিণাম। মন সৎ ও উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ কর; তা হলে আপনিই সৎ ও উচ্চ কাজ এসে যাবে। নিজেকে দুর্ব্বল, পাপী ভাবলে দুর্ব্বল ও পাপী হতে হয়। সবল ও পবিত্র ভাবলে তাই হয়ে যায়। চিন্তার এমনই শক্তি!...

চিন্তা স্থূলাকার হবার আগে সূক্ষ্মাকারে থাকে। সূক্ষ্মাবস্থা স্থূলের বীজ। স্থূলভাব প্রাপ্ত হলে তবে চিন্তা আমাদের সম্যক্ জ্ঞানগ্রাহ্য হয়। সূক্ষ্মাবস্থায় চিন্তা আমরা ঠিক ঠিক ধরতে বা জানতে পারি না। স্থূলাবস্থায় চিন্তা সবল হয়ে উঠে; তখন তাকে রোধ করা কঠিন।...

যে-ভাব আশ্রয় করে কিছু দিন বা কিছু ক্ষণ মন কাজ করে, মনের স্বভাব আরও কিছু ক্ষণ সেই ভাবে থাকতে চেষ্টা করা। বিশেষ ইচ্ছা ও শক্তি প্রকাশের দ্বারা মনের ঐরূপ চেষ্টা নিবারণ করতে হয়। এই জন্য, যিনি অনেক দিন ধরে কুপ্রবৃত্তির সেবা করেন—তাঁহার মনের চেষ্টা হয়, আপনিই কুপথে যেতে। তিনি ভাল হবার চেষ্টা করলেও মন তাঁকে ভাল হতে দেয় না; মনের ঝোঁক হয় কুকাজে।...

প্রত্যেক মনে যে-চিন্তার উদয় হয়, নিবৃত্তির পর উহা মনের উপর একটি দাগ রেখে যায়। মনের উপর ঐরূপ অনেক দাগ আছে, এ জন্মের ও পূর্ব্ব জন্মাবলীর। সেসকল দাগ আপাততঃ প্রত্যক্ষ না হলেও উহারা মনের জ্ঞান-রহিত স্তরে লুক্কায়িত আছে। সুবিধা হলেই উহা যে-চিন্তার দাগ, সে-চিন্তারূপে প্রকাশিত হয়। রাগের দাগ রাগরূপে, দ্বেষের দাগ দ্বেষরূপে, প্রীতির দাগ প্রীতিরূপে ইত্যাদি।... যদি সৎ চিন্তার দাগ অধিক হয়, তাহলে সে-ব্যক্তির চরিত্র ঐসকল দাগের প্রভাবে সৎ হয়। অসৎ চিন্তার দাগ অধিক হলে চরিত্র অসৎ হয়।...

মন যেন চসমা। যে জিনিষ আমরা দেখি, সব দেখি মনের মধ্য দিয়ে, আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় মন; মনের মধ্য দিয়ে সমস্ত জ্ঞান।... আজ আমরা মানুষের মন নিয়ে জগৎটা এই এই রকম দেখছি। কাল যদি এই মনটা আর এক রকম হয়ে যায়, এই জগৎটা আর এক রকম দেখবে। অন্য রকম মন যাদের, সেসকল জীব এই জগৎটাকেই আর এক রকম দেখছে। ভগবান্‌কে দেখতে হলেও এই মন দিয়ে। সুতরাং ভগবদ্দর্শনও ভগবানের যথার্থ স্বরূপে মনের রং মাখান।

যোগী বলেন, মন দেখা যায়। কিন্তু যাঁরা স্থূল শরীর দেখছেন, তাঁরা মন দেখছেন না ও দেখতে পারেনও না। স্থূল শরীরের অনুভূতির নাশের পর মনের অনুভূতি সম্ভব। না হলে নয়।

জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ এক, দ্বৈতবর্জ্জিত। কিন্তু তিনি মনের বহু চিন্তার সহিত নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করে নিজেকে বহু মনে করেন ও দেখেনও বহু। এই দেখার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা নাশের নাম মোক্ষ।... জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে হলে চিন্তার সংখ্যার হ্রাস করতে হবে। চিন্তার সংখ্যার হ্রাসের সঙ্গেই জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ-বৃদ্ধি হবে। রাজযোগের ধারণা চিন্তাসংখ্যা হ্রাসের উপায়। একটী মাত্র চিন্তায় মনকে একাগ্রতা সহকারে নিবিষ্ট রাখলে সেই চিন্তার দ্বারা অন্য চিন্তা সমুদায় তাড়িত ও অভিভূত হবে, তার পর এই শেষ চিন্তাটিকেও নাশ করতে হবে। তন্নাশের পর জীবাত্মার আত্মীয়তা স্থাপনের উপায় নেই; নিজেকে বহু ভাববার উপায় নেই। ফল—অবিদ্যানাশ ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। স্বস্বরূপে স্থিতি—এর নাম সমাধি, যোগের চরম লক্ষ্য।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব-দর্শনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা*

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনধারাকে আয়ত্ত ও আত্মীকরণ করে সর্বার্থেই হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের মানুষ। ১৫ আগস্ট ১৮৭২ কলকাতায় তাঁর জন্ম এবং প্রথম ছয়বছর তিনি বাংলাতেই কাটান। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলার সংস্কৃতি ও সংস্কার তাঁর মানসিক গঠনতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল, যদিও তাঁর বাবা তাঁকে পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পাঁচবছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করা হলো দার্জিলিঙের লরেটো স্কুলে, যাতে তিনি সাহেব-সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশা ও পড়াশোনা করে তাদের আদবকায়দা রপ্ত করতে পারেন। সাত বছর বয়সে তাঁকে রাখা হলো ম্যাঞ্চেস্টারে এক ব্রিটিশ পরিবারে। ইংল্যাণ্ডে তাঁর এই শিক্ষাজীবনে তিনি ইউরোপের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক পরিচিতিলাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। কেম্ব্রিজে ট্রাইপ্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং গ্রিক ও ল্যাটিন পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যান। ১৪ বছর তিনি ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম আত্মীকৃত করে ১৮৯৩ সালে ২১ বছর বয়সে ভারতে ফিরে আসেন।

ঐবছর ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনকাল। স্বামী বিবেকানন্দ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ প্রাচ্যের ধর্মসংস্কৃতি বহন করে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যখন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সম্মুখীন হলেন, তখন তারা উপলব্ধি করল—"After hearing Him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation." এদিকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতের মুম্বাইতে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর ভিতরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনার যেন জাগরণ হলো। মুম্বাই থেকে তিনি চলে এলেন বরোদায় মহারাজা সায়াজীর দপ্তরে চাকরি করতে। এর কিছুকাল পরেই তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার অধ্যাপক-রূপে নিযুক্ত হলেন বরোদা সরকারি কলেজে। এই কালে তিনি সংস্কৃত ও কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিখলেন। দেশীয় ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করলেন। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্, গীতা, কালিদাস, ভবভূতি পড়ে আয়ত্ত করলেন। এইভাবে নানা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রীঅরবিন্দ।

পরবর্তী কালে তাঁর এই বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে 'The Life Divine' এবং 'The Human Cycle' গ্রন্থ-দুটিতে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সাধন-প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলার পথ দেখানো হয়েছে তাঁর 'The Synthesis of Yoga' গ্রন্থে। সাহিত্য যেন তাঁর বিশ্বসাহিত্য। বিশ্ববাসীর সৌন্দর্যচেতনা, আবেগ ও সমস্যাগুলিকে নিয়ে রচিত তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'Savitri' (সাবিত্রী)-তে তাঁর দর্শনচেতনা অপূর্ব নাটকীয় ভঙ্গিমায় প্রকাশলাভ করেছে। তিনি ছিলেন জন্মকবি। কোন একসময় তাঁর মনে হয়েছে—"কবিতা এবং শিল্পকলাই একদিন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে।" দার্শনিক হরিদাস চৌধুরী 'The Philosophy of Integration' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বকে দিয়েছেন সর্বাত্মক এক দর্শন (a very comprehensive philosophical system) ও সর্বসমন্বয়মূলক এক পূর্ণ (integral) সমাজতত্ত্ব, যা মানুষকে দেখিয়েছে উৎকৃষ্ট এক জীবনধারা। মানুষের ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন যত প্রশ্ন থাকতে পারে—তার প্রায় সবেরই উত্তর পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে। রাশিয়ান লেখক ভি. ব্রডভ 'Indian Philosophy in Modern Times' গ্রন্থে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐরূপ মূল্যায়নের সমালোচনা করে লিখেছেন, যে-দর্শন ও সমাজতত্ত্ব সর্বকাল ও সর্বমানবের জন্য, তা আসলে সুনির্দিষ্ট কোন স্থানে ও কালে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এ তো কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। বুদ্ধির দৃষ্টিতে যা 'সামান্য' বা 'universal', তার সত্তা প্রত্যেক বিশেষ (particular)-এর মধ্যে নিহিত। যদি বলি 'মানুষ' (মনুষ্যত্ব), তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোঝানো হবে নাকি? নির্দিষ্ট যেকোন মানুষই তো বুদ্ধিশীল প্রাণী।

বস্তুত, শ্রীঅরবিন্দ হলেন সর্বকালের মানুষ—প্লেটো যেধরনের মানুষকে বলতেন 'নিত্যকালের দর্শক' (spectator of eternity)। তাই তিনি কোন প্রদেশে ও দেশে, নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে বা কোন জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক আবর্ত তাঁকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক বিপ্লবীর প্রকাশ্য ভূমিকা তাঁর মাত্র পাঁচবছরের জন্য—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়

* শ্রীঅরবিন্দের ১৩১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই বিশেষ প্রবন্ধটি নিবেদিত।

থেকে তাঁর পণ্ডিচেরীতে চলে আসার (এপ্রিল ১৯১০) পূর্বকাল পর্যন্ত। যদিও সেই বিপ্লব সারা ভারতকে স্বাধীনতা-লাভের প্রেরণায় মাতিয়ে তোলে এবং ব্রিটিশ সরকারের ভিত্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে একান্তই জরুরি তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর ভবিষ্যদৃষ্টিতে জেনেছিলেন যে, ভারতবর্ষ কালক্রমে বিশ্বায়নে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু ভারত যতদিন স্বাধীন হয়ে উঠতে না পারছে, ততদিন তার পক্ষে বিশ্বায়নে কোন ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন ভারত স্বাধীন হলো, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন ঃ "ভারতের এই উত্থান শুধু তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, গোটা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য।" আশ্চর্যের বিষয়, ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন, আবার সেটি স্বাধীন ভারতেরও জন্মদিন। এই যে দুটি জন্মদিনের সমাপতন, একে তিনি এক ঐশী অভিপ্রায়ের নিদর্শন বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, "এদিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হলো, আরম্ভ হলো নতুন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যই নয়, এশিয়ার জন্য, সমগ্র জগতের জন্য এদিনের অর্থ রয়েছে। সে-অর্থ হলো নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব—অফুরন্ত যার ভবিষ্যসম্ভাবনা, মানব-জাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান।" (হে চিরদিনের, পৃঃ ২৮)

প্রতীচ্যে 'ভাববাদ' যাকে বলা হয়, তার অর্থ চৈতন্যবাদ—যা কিনা অধ্যাত্মবাদের মুখবন্ধ। প্রচলিত ধারণায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক হেগেলই ভাববাদকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এনে সম্পূর্ণ করে তোলেন। যদিও ভাববাদের কিছু শাখা-উপশাখা সাম্প্রতিক দর্শনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ধারণাটি যে নির্ভুল নয়, তার প্রমাণ—শ্রীঅরবিন্দ হেগেলকেও ছাপিয়ে গিয়ে চৈতন্যবাদের আধুনিকতম রূপকে দর্শনজগতের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। তাঁর 'The Life Divine' এবং 'Savitri' কাব্যগ্রন্থ কোন কোন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সমাদৃত, যদিও গ্রন্থগুলি চেতনার যে-স্তরের ওপর আলোকপাত করেছে তা সাধারণ মানুষী স্তরের অনেক উর্ধ্বে। তাই সেই মহান ভাবনাসমূহকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার উদ্দেশে বুদ্ধিজীবী মহলের কোন কোন অংশে সরলীকরণ এবং বর্তমান ভাষাগত প্রকাশভঙ্গি ও বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয়ে চলেছে। দর্শনের আকাশে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের যে-দ্বন্দ্ব, তার সমাপ্তি দেখেছেন শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব এক মিলনের মধ্যে। 'দিব্যজীবন'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে তিনি লিখেছেন ঃ "চিন্ময় যিনি, তাঁরই বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে। শাশ্বত যিনি, এমনি করে তিনিই পরেছেন দুদিনের সাজ; শুধু তাই নয়, যে-জড়কে নিয়ে তাঁর এই সাজের খেলা, অফুরান এই ঘরবাঁধার খেলা—সেও কখনো অসার্থক ও অগৌরবের নয়। নিঃসন্দেহে যদি একথা জানি, তবে অসঙ্কোচে বলা চলে—এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রেতি।"

বিবর্তনবাদ আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও দর্শনে একটি স্বীকৃত বিষয়। এর মূলসূত্রকে শ্রীঅরবিন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন বেদের মধ্যে। আর আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে টাইলার্ড ও আলেকজাণ্ডারের বিবর্তনতত্ত্ব। এই তিনজনই ছিলেন সমসাময়িক, যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা বিবর্তনবাদের আলোতে মানুষকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'র সুস্পষ্ট ধারণা নেই, যেজন্য সেখানে বিবর্তনের পর্যাপ্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা মেলেনি। টাইলার্ড ও আলেকজাণ্ডার উভয়েই কল্পনা করেছিলেন, পার্থিব বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় কালক্রমে দেবকুলের আবির্ভাব ঘটবে, মানুষেরই হবে দেবত্বে রূপান্তর। কিন্তু নিরেট জড় থেকে কিভাবে প্রাণের উন্মেষ ঘটল, প্রাণবন্ত জড় থেকে কিভাবে মন আত্মপ্রকাশ করল, কি করেই বা মনুষ্যকুলের সীমিত চেতনা থেকে অনন্ত চেতনাসম্পন্ন প্রাণীর (দেবকুলের) আবির্ভাব সম্ভব হবে—এইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আলেকজাণ্ডারের দর্শনে নেই। আর টাইলার্ডের ব্যাখ্যাতেও উত্তরটি সুস্পষ্ট নয়। তিনি ঈশ্বরকে সর্বোত্তম সত্তা হিসাবেই দেখেছেন। ঈশ্বর যদি সর্বেসর্বা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অনাদি ও অনন্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কোন্ প্রয়োজনে জড়ের সৃষ্টি হলো? জড়ই কি ছদ্মবেশী ঈশ্বর? ঈশ্বরের চৈতন্য কি জড়েতে সংগুপ্ত রয়েছে? কোন্ ক্রমে তা রয়েছে? এসকল বিষয়ে টাইলার্ড খুব সুস্পষ্ট আলোচনা করেননি। আলেকজাণ্ডারের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশ-কাল হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের মূল দ্রব্য, যার ভিতরে প্রাণ ও চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রথমে ছিল না—ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনভাবেই নয়। 'দেশ-কাল' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয় বিশ্বের মূলগত গতি বা পরিবর্তনশীলতাকে। কিন্তু ঐ গতি ও পরিবর্তন তার লক্ষ্যের প্রতি নির্দিষ্ট হলো কি করে? প্রকৃতির পরিবর্তন শুধু এক অবস্থা থেকে ভিন্ন অবস্থাতে রূপান্তরই নয়—সেটি হচ্ছে লক্ষ্যযুক্ত, উর্ধ্বমুখ বা উন্নয়নসূচক। বিংশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক হেনরি বের্গর্স-র বিচারে, প্রাণের লক্ষ্য হলো উচ্চতর কর্মদক্ষতার উদ্ভব ঘটানো। প্রাণকেই তিনি বিশ্বের মূল দ্রব্যরূপে জেনেছিলেন। পৃথিবীর গতি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণ করে ক্রমশ সমৃদ্ধতর সৃষ্টির সাধন করে চলেছে (এত মন্থর গতিতে যে, আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে তা অবশ্য ধরা পড়ে না)—এমন কথা আজকের বিজ্ঞানজগতে একটা স্বীকার্য সত্য। জড়ের পটভূমিতে যে-প্রাণের উন্মেষ ঘটল, সেটি জড় অপেক্ষা

সমৃদ্ধতর; প্রাণবন্ত জড় থেকে যে-মনের আবির্ভাব হলো, সেটি প্রাণের তুলনায় উন্নততর। পক্ষান্তরে, দেশ-কাল তার আদিম অবস্থাতে ছিল নিশ্চেতন, যার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না। যতকাল পৃথিবীতে মনের আবির্ভাব ঘটেনি, ততকাল উদ্দেশ্যমুখিনতা ছিল এক অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার। এদিকে টাইলার্ড মনে করতেন, আদিম জড়ের ভিতরে চৈতন্য নিবিষ্ট ছিল—যার প্রথম অভিব্যক্তি প্রাণরূপে, দ্বিতীয় অভিব্যক্তি মনরূপে, তৃতীয় অভিব্যক্তি উন্নততর মন (অর্থাৎ মানুষী মন)-রূপে এবং চতুর্থ অভিব্যক্তি হবে মূর্তদিব্য-চৈতন্যরূপে। জড়ে নিহিত ঐ চৈতন্যের উৎসটি কি? তা কি পরম দেবতার অংশবিশেষ, ওমেগা থেকে উদ্ভূত? কোন্ ক্রমেই বা জড়ের মধ্যে তার নিহিতি সম্ভব হলো? জড় তো স্বরূপত অচেতন।

প্রশ্নগুলির সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। বেদে ঘোষিত হয়েছে, ভগবান (সচ্চিদানন্দ) আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সসীম জগতের রচনা করেছিলেন। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" তাতে তাঁর আনন্দ নিয়েছে এক নতুন রূপ, ঐ আনন্দের পরিমাণ ও বৃদ্ধি লাভ ঘটেছে। ঐ আত্মোৎসর্গ কি? আত্মসঙ্কোচন, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" অর্থাৎ ভগবানের স্বধাম থেকে নেমে আসা। স্বধামে তিনি অসীম ও পূর্ণ এবং অবতরণে তিনি হয়েছেন সসীম ও অপূর্ণ। এই আত্মসঙ্কোচনের সামর্থ্য হলো অবিদ্যা শক্তি। বিদ্যা শক্তির সাহায্যে তিনি আত্মপ্রকাশের অর্থাৎ সৃষ্টির সম্প্রসারণ করে চলেছেন। এই হলো দ্যুলোক (স্বর্গরাজ্য), যা অনন্ত হয়েও সম্প্রসারণশীল। বিস্ময়কর এক ব্যাপার। আবার একেই বলা হয়েছে 'পরাপ্রকৃতি'। ঐ একই সময়ে তিনি তাঁর অবিদ্যাশক্তির সাহায্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে চলেছেন, যার ফলে অসীম ও পূর্ণ যিনি—তিনিই হয়েছেন সসীম ও অপূর্ণ। এই অবিদ্যাগত জগৎকে বলা হয় 'অপরাপ্রকৃতি'। শ্রীঅরবিন্দ যাকে 'অতিমানস' আখ্যা দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে পরাপ্রকৃতির প্রাথমিক রূপ—যাকে অবলম্বন করে তাঁর অন্তহীন আত্ম-সম্প্রসারণ। আর ঐদিকে তাঁরই আত্মসঙ্কোচনের পরিণতিতে অতিমানস নিচে নেমে এসে হয়েছে মানস, মানসের পরিণতি হয় প্রাণে এবং প্রাণের পরিণতি জড়ে। জড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও সংগুপ্ত রইলেও ভগবানের নিত্যস্বরূপই হলো চৈতন্য, এবং অবিদ্যার প্রভাবে তা বিস্মৃতমাত্র। তাই তো নিশ্চেতনার (অচিতির) মধ্যেও রয়েছে আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ আত্মসচেতন হওয়ার প্রেরণা বিবর্তনের বীজাকারে। স্বেচ্ছায় আত্মগোপনের ব্যবস্থা যেখানে, তার মূলে থাকে পূর্ণ আত্মচেতনা। ঐ সংগুপ্ত সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাই হলো সেই উদ্দীপনা, যা তাঁকে নতুন নতুন রূপে ক্রমোচ্চ ধারায় উন্মেষিত করেছে প্রাণাকারে ও মানসরূপে। এই তো বিবর্তন—সচ্চিদানন্দের জড়েতে নেমে আসার পর ঊর্ধ্বমুখ যাত্রা। আলেকজাণ্ডার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, দেশ-কালের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক প্রেরণা—দেবত্বের প্রতি ঝোঁক বা আকর্ষণ। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেবত্ব (অতিমানস) সম্ভাব্য ও সংগুপ্ত-রূপে জড়ের মূলে উপস্থিত ছিল, যার ফলে ঐ ঊর্ধ্বমুখ বিবর্তন সম্ভব হয়েছে—প্রস্তরকুল অতিক্রান্ত হয়েছে উদ্ভিদকুলের আবির্ভাবে, উদ্ভিদকুল অতিক্রান্ত হয় ইতর প্রাণিকুলের আবির্ভাবে, ইতর প্রাণিকুল অতিক্রান্ত হয় মনুষ্যকুলের আবির্ভাবে, আবার মানবগোষ্ঠীর অতিক্রমণে হবে অতিমানস গোষ্ঠীর আবির্ভাব। অতিমানসেই চৈতন্যের যথার্থ ও পূর্ণরূপকে পাওয়া যাবে, যার আবির্ভাব এই পার্থিব বিবর্তনধারাকে সার্থক করবে। এইভাবে পাশ্চাত্যের যেসব বিবর্তনতত্ত্বে দেবকুলের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের উল্লেখ আছে, সেগুলির আত্মসঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা এনে দিতে পারে শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তনতত্ত্বটি।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ দার্শনিক এ. এন. হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭)-এর চিন্তাধারার বিশেষ বিশেষ অংশে অরবিন্দ-দর্শনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তিনি যেসমস্ত বিষয়কে দেশ-কালোত্তীর্ণ শাশ্বত বিষয় বলে বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলি প্লেটোর সার্বিক শাশ্বত ধারণাগুলির মতো প্রায় স্তরবিন্যাসভুক্ত। অবশ্য হোয়াইটহেডের বর্ণিত শাশ্বত বিষয়গুলির প্রত্যেকটির মধ্যে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যা কোন-না-কোন দেশ-কালগত (পার্থিব) ঘটনার মধ্যে অন্তর্গমনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অবশ্য সমস্ত দেশ-কালগত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শাশ্বত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কম-বেশি বিভিন্ন মাত্রা। শূন্য মাত্রাতেও প্রাসঙ্গিকতা সম্ভব। ঘটনা ব্যতিরেকে শাশ্বত বিষয়গুলি হচ্ছে অমূর্ত, আবার শাশ্বত বিষয় থেকে স্বতন্ত্র নিছক ঘটনাবলী হলো ঐরকম অমূর্ত ও অবাস্তব। কোন ঘটনাতে একটি শাশ্বত বিষয়ের অনুগমন হলে তবেই ঘটনাটি মূর্ত হয়ে ওঠে। তখন তাকে বলা হবে বাস্তব বস্তু। দেশ-কালোত্তীর্ণ শাশ্বতের ক্ষেত্রটিকে বলা যায় আদর্শের জগৎ, যাকে লক্ষ্য করে পার্থিব বিবর্তন এগিয়ে চলেছে পরম সত্য ও সুন্দরের দিকে। প্রাকৃতিক বিবর্তন যে অন্তহীন এবং তা মানুষের পর্যায়ে এসে থেমে যায় না—এমন চিন্তাও হোয়াইটহেড করেছিলেন। মানুষের হবে আমূল রূপান্তর। বর্তমান মানুষের চেতনার স্তর, তিনি লিখেছেন, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের তুলনায় নিঃসন্দেহে অসামান্য। তেমনি ভাবিকালের মানুষের চেতনার স্তর আজকের মানুষের বিচারে হবে অসাধারণ ও অকল্পনীয়। অবশ্য তিনি সুস্পষ্টরূপে পৃথিবীতে দেবতার আবির্ভাবের কথা বলেননি, সেটির এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস বিবর্তনতত্ত্বের আলোতে তাঁর দর্শনের ত্রুটিগুলি অতিক্রান্ত হতে পারে এবং দর্শনটি পেতে পারে এক সম্পূর্ণ রূপ।

'যোগসমন্বয়' প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 'All Life is Yoga' গ্রন্থে বলেছেন, যোগ প্রাকৃত জীবন থেকে স্বতন্ত্র, দূরে ও ঊর্ধ্বে নীরবতায় তন্ময়তাপূর্ণ (তুরীয়) কোন ব্যাপারই নয়। প্রাকৃত জীবনটাই যোগের একমাত্র ক্ষেত্র। তাই মানুষের যোগপ্রণালী হলো তার জীবনযাত্রাপ্রণালী। মানুষের বিভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার পথ তিনি তাঁর 'যোগসমন্বয়' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন। যোগের লক্ষ্য অবশ্য ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে জীবনের পূর্ণতালাভ। ঈশ্বর হলেন সত্য-শিব-সুন্দর। কে না চায় নিজের জীবন ও সমাজ-পরিবেশকে সত্য-শিব-সুন্দরময় করে তুলতে? বিজ্ঞান ও দর্শনের লক্ষ্য সত্য— আপেক্ষিক ও পূর্ণ। নীতিবিদ্যার লক্ষ্য শিব (মঙ্গল)। আর কান্তিবিদ্যার লক্ষ্য সৌন্দর্য। ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী যেকোন ধরনের মানুষ বিশ্বে কাজ করে চলে ঐ লক্ষ্যসিদ্ধির পথে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী "যত মত তত পথ"-এর ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন, সমস্ত পথের মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে এবং সেগুলির সমন্বয়ও সম্ভব। কিন্তু গোড়ায় বিভিন্ন মতের অরণ্যে দিশেহারা না হয়ে নিজের রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী একটি পথকে আঁকড়ে ধরে চলাই সমীচীন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং—যিনি সমস্ত সাধনার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন—একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত সাধনকালে সেই পথকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তবে অন্য পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত প্রধান প্রধান পথগুলিকে আয়ত্ত করেছিলেন। এই অবস্থাতেই কেবল সমস্ত পথের মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলার সামর্থ্য জন্মেছিল তাঁর।

রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—সবরকম ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ব-ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঐ স্বপ্নে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি হলো বিশ্বরাষ্ট্রের ভাবনার বিকিরণকেন্দ্র, গোটা মানবকুলের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্রবিশেষ। বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলীতে ঐরূপ বিশ্বরাষ্ট্রের বিবর্তনের একটা আভাস রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের বিচারে গণতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সার্থক হতেই পারে না, যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্রের একীকরণ সম্ভব না হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক আদর্শ সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন, যার ভিত্তিতে থাকবে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা, যদিও তার অর্থনৈতিক কাঠামোটা হবে মার্ক্সীয় বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতির সঙ্গে বেশ খানিকটা সাদৃশ্যযুক্ত। (অনস্বীকার্য যে, স্বামীজীর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার মধ্যে একধরনের মৌলিকতা ছিল, কেননা তিনি সম্ভবত মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যদি বিশ্বরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও আত্মীকৃত হয়, তবেই সেটি পৃথিবীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ রয়ে গেলে সেটি সফল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না—পূর্ব ইউরোপে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্রকে যেমন সর্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি তিনি স্বামীজীর মতোই চেয়েছিলেন সেটির সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গতিপূর্ণ এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা—যেখানে গোষ্ঠীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করেই ব্যক্তির স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখা হবে এবং ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। স্বামীজী বুঝেছিলেন, নিছক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিখুঁত হতে পারে না—যদিও সেটি সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের তুলনায় শ্রেয়। উপরন্তু সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে না, যদি না তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রগতি যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে সমাজের প্রগতি বিপর্যস্ত হবেই। অনুরূপভাবে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "যেসকল চিন্তাবিদ্... ব্যষ্টিকে ছোট করে দেখেন এবং তাকে জনতার অংশহিসাবে ভাবতে চান, কিংবা প্রধানত একটা কোষ, একটা অণুরূপে গণ্য করেন—তাঁরা প্রাকৃতিক ক্রিয়ার কেবল অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষ প্রকৃতির জড়রূপগুলির মতো নয় বা পশুর মতো নয় এবং প্রকৃতির উদ্দেশ্য হলো—মানুষের মধ্যে বিবর্তনটি যেন ক্রমশ অধিকতর সচেতনভাবে হয়, তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে এত বেশি বিকশিত এবং তা একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।... সকল বিশাল পরিবর্তনের প্রথম স্পষ্ট ও কার্যকরী শক্তি এবং তাদের সরাসরি সংগঠনের শক্তি ব্যক্তিমনে কিংবা স্বল্প কয়েকটি ব্যক্তির মনে রূপ নেয় এবং জনসাধারণ তাদের অনুসরণ করে।" (হে চিরদিনের, পৃঃ ১৫৪)

ভাবিকালের বিশ্বসমাজের নমুনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে ভাষায় ব্যক্ত করে লেখা হয়েছিল—পৃথিবীর বুকে এমন এক জায়গা থাকুক, যাকে কোন বিশেষ জাতি নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারবে না। এমন এক দেশ যেখানে সব শুভ ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ বিশ্বনাগরিক-রূপে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে একটিমাত্র শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে—যাঁকে আমরা পরমেশ্বর বলি। তা হবে প্রকৃত শান্তি, ঐক্য ও সঙ্গতির রাজ্য—যেখানে মানুষের সবরকম সংগ্রামী প্রবৃত্তিগুলি ব্যবহৃত হবে দুঃখক্লেশের মূলোচ্ছেদের জন্য। মানুষের দুর্বলতা, অজ্ঞতা, সর্বপ্রকার অক্ষমতা ও সীমারেখাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে এমন এক পরিবেশ রচিত হোক, যেখানে মানুষের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা তার জৈবকামনার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য পাবে। স্বপ্নটির বাস্তব রূপায়ণের জন্য অরোভিল নগরের শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পণ্ডিচেরী থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। 'অরোভিল'-এর অর্থ 'প্রভাতনগর'। অর্থাৎ সেই প্রভাতরশ্মি হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞার দিব্যচ্ছটা—যা সমস্ত বিশ্বকে তার আঁধার পাথার পার করে উত্তীর্ণ করবে জ্যোতির্লোকে। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বিভূতিভূষণ*

অজিতেন্দ্র সিংহ

বাল্য ও কৈশোরে গ্রামবাংলার পল্লিপ্রকৃতির শ্যামল-শোভা দেখে তখন থেকেই বিভূতিভূষণের নিসর্গ-প্রীতি জন্মায়। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা করতে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, বিভূতিভূষণকেও প্রায়ই সঙ্গে নিতেন। ফলে বিভূতিভূষণের মনে অধ্যাত্মচেতনা সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রকাশ পায়। সেইসঙ্গে ভ্রমণের নেশাও গড়ে ওঠে। এমনকি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ ঘটাতে পিতাই তাঁকে সাহায্য করেন। মানুষের প্রতি মমত্ববোধও জাগে এই শৈশবেই। শৈশবে নির্জন ইছামতীর তীরে শিমুল-তলায় লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়িকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল—সেই জায়গার দিকে তাকিয়ে মনটা তাঁর উদাস হয়ে যেত। পরজগতের অনন্ত রহস্য তখন থেকেই তাঁকে যেন হাতছানি দিত।

শিশুকাল থেকেই বাংলার পল্লিশ্রীর মধ্যে এমনভাবে তিনি মানুষ হয়েছিলেন যে, প্রকৃতিকে তাঁর 'বিশল্যকরণী' মনে হতো। শিশুজীবনই হোক, তরুণজীবনই হোক কিংবা পরিণত বয়সের শিক্ষকজীবনই হোক—সারাটা জীবন তিনি প্রকৃতি নিয়ে মেতেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, প্রকৃতিও মানুষের মতো এক অকথিত সুরের ধারা। তারও একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে। বস্তুত, প্রকৃতির মধ্যে তিনি ঈশ্বরের মহিমা দেখতেন। প্রকৃতিকে বলতেন—দেবতার কবিতা।

প্রকৃতিকে ভালবাসলেও মানুষকে তিনি এড়িয়ে যাননি। সরল দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখে তিনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হতো, অসীম যেন একটি বৃন্ত এবং মানুষ ও প্রকৃতি সেই বৃন্তেরই দুটি ফুল। অখণ্ড অনন্তকে উপলব্ধি করতে হলে দুটিরই প্রয়োজন। দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন ঃ "এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির গানের সঙ্গে, মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যোগ আছে বলে এত ভাল লাগে।"

প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যত বেড়েছে, ততই যেন তিনি পরিণত হয়েছেন, শান্ত হয়েছেন, আরো আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর থেকেই পরলোক সম্পর্কে কৌতূহলী হন। আধ্যাত্মিক জীবনেরও বিকাশ আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। যা ছিল তাঁর ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি, তাই তাঁর শেষজীবনে ভগবৎপ্রেমে পরিণত হয়। তাঁর জীবনের শেষ দু-তিনটি বছরের দিনলিপি একান্ত আধ্যাত্মিকতায় ভরা। যেখানেই তাঁর চোখ পড়েছে, সেখানেই তিনি বিশ্বদেবতাকে দেখেছেন। মৃত্যুপারের জগৎটা যেমন আমাদের কাছে রহস্যময়, ঈশ্বরের অস্তিত্বও তেমনি সাধারণ মানুষের অজানা, অদেখা। বিভূতিভূষণ প্রথমে ঈশ্বর মানতেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে করতেন যে, তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ দিতে পারে না—তাঁকে চেনা যায় না। দেখা যায়, তিনি কয়েকটা বছর ভগবানকে নিয়ে খুব ভাবনা-চিন্তা করেছেন। ১৯৩৩-১৯৩৪—এই দুটো বছর তিনি বেশ কিছু আধ্যাত্মিক ও পরলোকতত্ত্বের বই পড়েছেন। এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "Spiritualism-এর বইগুলো পড়ে নতুন আলো পাচ্ছি জীবনে।" 'God যে আছেন'—এই বিশ্বাস তাঁর জন্মেছে শেষে। পরম অস্তিত্বের আশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। যখন জ্বর হয়েছে, ডেকেছেন ভগবানকে। প্রার্থনা জানিয়েছেন ঃ "ভগবান, আমার অসুখ সারিয়ে দাও।"

তাঁর সাহিত্যপাঠে আমরা তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস, পরলোক-বিশ্বাস এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসের কথা জানতে পারি। ঈশ্বর যে আছেন—এই বিশ্বাসে পৌঁছানোর ব্যাপারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং রোমাঁ রোলাঁর লেখা 'The Life of Ramakrishna' বই দুখানি তাঁকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর ১ এপ্রিল ১৯৪৩-এর দিনলিপি থেকে। সেখানে তিনি লিখেছেন ঃ "আজ কদিন ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও 'কথামৃত' পড়ছি। পড়ে বুঝলুম, হাতের কাছে এমন বই সব ছিল, এ ফেলে কিনা অন্ধকারে হাতড়ে মরেচি এখানে ওখানে।" এরপরেও আবার একদিনের দিনলিপিতে তিনি

* জন্মতারিখ ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

লিখে রেখেছেন ঃ "ভগবানের কথা অনেকদিন থেকেই ভাবি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলেই তাঁর কথা আমার ভাল করে মনে পড়ে। আমার মনের ভগবান সম্বন্ধে এই পরিণতি গত বৎসর জানুয়ারি থেকে বেশি হয়েছে—তারপর হয়েছে এপ্রিল-মে মাসে 'রামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামীজীদের জীবনী পড়ে।" বেশ বোঝা যায়, ভগবান যে আছেন—এ-বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'স্বামীজীদের' বই পড়ে।

তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে, দেখেছেন মানুষের মধ্যে। বিশ্বাস করেছেন ঈশ্বরের সাকার নিরাকার দুই রূপকেই। বুঝেছেন, "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।" সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা তিনিই। বিশ্বসংসার তাঁরই রচনা। বলেছেন ঃ "ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য, তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" উচ্চতর অনুভূতির জন্য সাধনা ও মনের একাগ্রতা চাই—একথা বোঝানোর জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও তাঁর 'পুকুরের ধারে বসে মাছ ধরা ও পথিক'-এর গল্পকথাটি থেকে

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ আশ্বিন ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**স্বামী অভেদানন্দ** ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ৩ আশ্বিন, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩) **স্বামী অখণ্ডানন্দ** ভাদ্র অমাবস্যা ৯ আশ্বিন, শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩)
পূজাতিথি-কৃত্য	ঃ	**মহালয়া** ভাদ্র অমাবস্যা ৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩) **শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা** আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর ২০০৩)
একাদশী-তিথি	ঃ	৫, ১৯ আশ্বিন সোমবার, সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর, ৬ অক্টোবর ২০০৩)

'ফাতনাতে ঠোকরাচ্ছে' কথাটি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'তৃণাঙ্কুর' দিনপঞ্জী গ্রন্থটিতে। এ-গ্রন্থটির রচনাকাল জুন ১৯২৯ থেকে জানুয়ারি ১৯৩৯-এর মধ্যে। প্রকাশকাল মার্চ ১৯৪৩। ১ এপ্রিল ১৯৪৩-এর দিনপঞ্জীতে তিনি লিখেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত') বইখানি দিন ৭/৮ আগে তাঁর হাতে এসেছে। মনে হয় এখানে সন-তারিখের কোথাও একটু ভুল থেকে গিয়েছে। কেননা আগেই তাঁর এ-গল্পটি জানা ছিল।

দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি বিশেষ টান তাঁর বরাবরই ছিল। সেই টানেই তিনি যখন সবে I.A. পাশ করে B.A.-তে ভর্তি হয়েছেন, তখনি গিয়েছেন বেলুড় মঠে। সেটা ১৯১৬ সালের কথা। আবার সেখানে এসেছেন ১৯৩৪ সালে। কাজেই সেই সময়েই গল্পটি শোনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। ১৯৪৫ সালে পূজার ছুটিতে হরিদ্বারে এসে তিনি কনখলে রামকৃষ্ণ মঠ দর্শন করেছেন। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়তেন প্রায় সারাদিন ধরে। ১৮ অক্টোবর ১৯৪৩-এর দিনলিপিতে লিখেছেন, সারাদিন ধরে তিনি শুধু 'উদ্বোধন' পড়েছেন। লিখেছেন ঃ "বিশ্বময় বিশ্বপুরুষের আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা বাস করচি।" ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ তারিখের দিনলিপিতে রয়েছে—"ভগবানের পবিত্র নাম যেন সর্বত্র। লোকের ভক্তি নেই, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে রেখেচে জীবনে। টাকা চাই, যশ চাই, মান চাই, সম্পত্তি চাই, পুত্র চাই, আরাম চাই, ভাল খাদ্য, শয্যা, পরিচ্ছদ চাই—কিন্তু ভগবান? না। অনেকে ভগবান সম্বন্ধে সচেতনই নয় মোটে। ওদের চৈতন্যের মধ্যে জাগতিক সবকিছু আছে, বিষয়, টাকাকড়ি, স্ত্রীলোক—নেই কেবল ভগবান।" শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথার প্রতিধ্বনি তাঁর দিনলিপিতে পাওয়া যায়।

৬ অক্টোবর ১৯৪৩-এ তিনি লিখেছেন ঃ "চাররকমের জীব আছে, সবারই এক অবস্থা নয়। বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব। সকলকে সাধন করতে হয় না—নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ। জ্ঞানী কে? যে কারো অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মতো হয়ে যায়। হয়তো বাড়িতে খুব ঐশ্বর্য। আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে। আঁট নেই কিছুতেই। বিজ্ঞান = বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে, সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, সে বিজ্ঞানী। ঈশ্বরদর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মায়—এর নাম বিজ্ঞান। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর ভক্তবৎসল। নির্জনে কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে

লাগাতে হয়। হাবজা গোবজা বিদ্যার কি দরকার? তাঁকে কি বুঝা যায় গা? আমিও কখনো তাঁকে ভাবি যেন, কখনো মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেচে। কখন তিনি হুঁশ করেন, কখনো অজ্ঞান করেন। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক। দেহেরই এসব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়তো ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন প্রসববেদনার পর সন্তানলাভ। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হবেই।—রামকৃষ্ণ।"

৫ অক্টোবর ১৯৪৩-এর দিনপঞ্জীতে পাই—"রামকৃষ্ণ —সংসার গহন, সংসার গহন কর কেন। কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে চলে যাও। কিসের ভয়? যে বুড়ি ছোঁয়, সে কি আর চোর হয়? প্রেমভক্তি বস্তু, আর সব অবস্তু। যে-বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ি হয়—সে-বুদ্ধি চিঁড়ে-ভেজা বুদ্ধি। যে-বুদ্ধিতে ঈশ্বরলাভ হয়, তাই ঠিক বুদ্ধি।"

১ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে তিনি লিখে রেখেছেন: "হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস—এর নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এভাবটি খুব ভাল। কাশীতে মৃত্যু হলে সাক্ষাৎ হয়। বলেন—আমার এ সাকার রূপ, ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি। এই দ্যাখ (?) অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই। কলিতে নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগ চাই।"

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এর দিনলিপিতে লেখা রয়েছে—"সকালে উঠে লিখি ও 'রামকৃষ্ণকথামৃত' পড়ি। 'আমি মুক্ত'—একথাটি খুব ভাল। এ অভিমান বটে, কিন্তু ভাল অভিমান। এই ভাবতে ভাবতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি পাপী'—একথা বলতে বলতে সে-লোক বদ্ধই হয়ে পড়ে। বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করচি—আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি।—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। 'Fear is the greatest sin.'—বিবেকানন্দ।"

১৯৪৩ সালেই আরেকদিনের লেখায় পাই—"যখন শুদ্ধাভক্তি—কোন কামনা থাকবে না, সেই ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। কর্মফল ভক্তের কাছে ঘেঁষে না। তাতে মত্ত হলে অসৎ-বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি চলে যায়। অহংবুদ্ধি চলে যায়। ভক্তির তমো আনতে হয়। যে বলে, আমার হবে না—তার হয় না। যে বলে, আমার নিশ্চয়ই হবে—তার হয়। যে বলে, ভগবানের নাম করেচি, মুক্তি হবে না কি? নিশ্চয়ই হবে। তার হয়ে যায়।" আরেকদিন লিখেছেন: "Fool! You know not the secret—the infinite one comes within my fist under the bondage of love.—Vivekananda's Letter from New York."

১১ অক্টোবর ১৯৪৩-এ বিভূতিভূষণ লিখে রেখেছেন: "ঠিক ভক্তের ধারণাশক্তি হয়। শুধু কাঁচে ছবি ওঠে না—ভক্তিরূপ কালি মাখানো চাই। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়। অনেকে জগতের সৌন্দর্যই দেখে—কিন্তু কর্তাকে খোঁজে না। ঠিক ঠিক বিশ্বাস চাই, তাহলে রত্ন মেলে।"

এমনি বহু কথাই বিভূতিভূষণ 'কথামৃত'-এর পাতা থেকে তুলে রেখেছেন তাঁর দিনপঞ্জীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি 'ভগবান' বলে বোধ করতেন এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে আলোকিত করেছিল। একদিন ছেলে বাবলুর জ্বরের জন্য তাঁর মন বড় খারাপ। ১৯ মে ১৯৫০-এ তিনি লিখেছেন: "ভগবান রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছবির কাছে বাবলুর জন্যে প্রার্থনা করি। পেনিসিলিন নিয়ে যখন আসচি, তখন শুধুই ভাবছি বাবলুকে গিয়ে কেমন দেখব। বাড়ি এসে শুনি ফোঁড়া ফেটে গিয়ে জ্বর কমে গেছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! ভগবান তো বাবা—তাঁকে কি জানাব!" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বাস-ভক্তির এ এক জ্বলন্ত নিদর্শন। ❑

সমাধান: শব্দচেতনা ২৪

পাশাপাশি: (১) সারদানন্দ, (৪) নাগ, (৫) নাগ, (৬) দানা, (৭) রাম, (৮) শাল, (৯) নয়নতারা, (১৩) গোপালের মা, (১৪) যোগ, (১৫) চাবি, (১৮) বসু, (২০) নট, (২১) ছয়, (২২) শরৎচন্দ্র।

ওপর-নিচ: (১) সারদা, (২) নরেন, (৩) জগদ্দল, (৪) নাওরা, (৯) নব, (১০) নর, (১১) বিলে, (১২) শ্রীমা, (১৪) যোগানন্দ, (১৬) বিজয়, (১৭) অধর, (১৯) সুরেন্দ্র।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম:

স্বামী অম্বিকেশানন্দ, স্বামী মৈত্রীপ্রকাশ আরণ্য, অণিমা সর্বাধিকারী, মনোজ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব নন্দী, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা ব্যানার্জি, অভিবৃতা দাস, জয়িতা লাল, রত্না ঘোষ, অলক পাল চৌধুরী, রমণীমোহন বর্মণ, শশাঙ্ক অধিকারী, মুক্তি সেন, সুনন্দা সরকার, কাকলি গুপ্ত, রমা ঘোষ, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, ছবি ভড়, মানবেন্দ্র শীল, সুনীতি পাল, সরোজ দাস, পার্বতী দাস, নিখিলেশ পাল, অর্চনা বেরা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলি।

বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র

বরুণ রায়চৌধুরী

অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখকের কথা আমরা নানা উপলক্ষ্যে স্মরণ করি। তাঁদের জন্মশতবর্ষ, জন্মদিন ইত্যাদি পালন করে থাকি। তারই মধ্যে প্রতি বছর নিঃশব্দে পেরিয়ে যায় ২৬ জুন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তাঁকে 'সাহিত্যসম্রাট' শিরোপা দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আজকের বাঙালির চিন্তা-ভাবনায়, আলোচনায়, বইমেলায়, ইণ্টারনেটে বঙ্কিমচর্চা বিস্ময়করভাবে কম। এমন হতে পারে, তাঁর ভাষা খুব কঠিন, আজকের দিনে অচল। কিন্তু অন্য ভাষার সাহিত্যও তো আমরা কষ্ট [illegible] পড়ি। যাই হোক, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করা [illegible] নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে তাঁকে অন্য [illegible] চেষ্টা করা হয়েছে—তিনি যুক্তিবাদী এবং [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র পেশায় বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞা[illegible]বেষক যে ছিলেন না, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিজ্ঞানচর্[illegible] ভাবে করা যায়—বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব কোন [illegible]-রেখে যাওয়া অথবা বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের ম[illegible] ছড়িয়ে দেওয়া। এই দ্বিতীয় কাজে অনেক মনীষী [illegible]ভাবে এগিয়ে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁদের একজন [illegible] হঠাৎ হুজুগে নয়, সাহিত্য-সৃষ্টির পাশাপাশি আগাগোড়া [illegible] বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। [illegible] ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁ[illegible] বিজ্ঞানের একটি দিক। বঙ্কিমচন্দ্রও তখন[illegible] অনুযায়ী আলোর গতি, সৌরজগতের বর্ণনা, মহাকাশের কথা, পার্থিব জগতের নানা তথ্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'বিজ্ঞান-রহস্য' প্রবন্ধসমষ্টিতে। ভাবলে অবাক লাগে, সমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ থেকে আরম্ভ করে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং এরোপ্লেনের আবিষ্কার থেকে শুরু করে আকাশে তারার সংখ্যা—এত বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভুলভাবে জানানোর জন্য তাঁকে কত পড়াশুনা করতে হয়েছিল। এবং তা তিনি করেছিলেন দায়িত্বশীল উচ্চপদে থাকাকালীন এবং চোদ্দটি উপন্যাস লেখার পাশাপাশি। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র যে কত বড় পাঠক ছিলেন, তা এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

শোনা যায়, প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ রিচার্ড ফাইনম্যান নাকি ছোটবেলায় তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ডাইনোসর কতটা উঁচু? তিনি উচ্চতার হিসাব ফুট বা মিটারে না দিয়ে বলেছিলেনঃ "দোতলার পাশে ডাইনোসর দাঁড়ালে জানালা থেকে সোজা তার মুখ দেখা যাবে।" শিশু ফাইনম্যানের মনে তখন থেকেই এই সহজ করে ভাবতে শেখার পদ্ধতি গেঁথে গিয়েছিল। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও এইরকমই—জটিল তত্ত্বকে সহজ করে পরিবেশন করা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরচনায় তার ছাপ পাওয়া যায়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত, সেটা তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন—একটা ট্রেন যদি দিনরাত একটানা ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে চলে, তবে ৫২০ বছর ৬ মাস ১৬ দিনে তা সূর্যে পৌঁছাবে। বিজ্ঞানপ্রবন্ধ লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মতত্ত্বও আলোচনা করেছেন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে। বরং এই দিকেই বিজ্ঞানমনস্ক, অনুসন্ধিৎসু বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশি করে পাওয়া যায়।

[illegible]ষয়ে তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণীয় রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র'। [illegible] অবতার কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি অ[illegible] ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যেমন, আ[illegible]রা শুনি শৈশবে কৃষ্ণ পূতনা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। কিন্তু 'পূতনা' বলতে শিশুর 'পেঁচোয় পাওয়া' রোগও [illegible]ঝায়। আসলে সবল শিশু কৃষ্ণ নিয়মিত [illegible]পান করে ঐ রোগ কাটিয়ে উঠেছিলেন। তৃণাবর্ত নামে যে-অসুর কৃষ্ণকে আকাশে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তা আসলে সাইক্লোন। 'যমলার্জুনভঙ্গ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেনঃ "একদা কৃষ্ণ বড় 'দুরন্তপনা' করিয়াছিলেন বলিয়া যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া একটা উদূখলে বাঁধিয়া [illegible]লেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলা[illegible] [illegible]টো গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া [illegible] গাছের মূলে বাঁধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি [illegible] গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল। একথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? অর্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙিয়া যাইতে পারে।"[১] কৃষ্ণ সম্বন্ধে চালু আরো কয়েকটি গল্পকে তিনি অতিরঞ্জন বা রূপক বলে বাতিল করতে দ্বিধা করেননি।

অন্যান্য দেবদেবী এবং বৈদিক ধর্মের ধাপে ধাপে সাহসী ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বলেছেন, 'দেবতা' বা 'দেব' শব্দ এসেছে 'দিব্' ধাতু থেকে। যা

উজ্জ্বল—তাকেই দেব বলা হতো। আকাশ, চাঁদ, সূর্য, আগুন ইত্যাদি উজ্জ্বল, এইজন্য এসমস্ত 'দেব'। কালক্রমে অন্য প্রাকৃতিক শক্তি—বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদিও দেব বলে গণ্য হলো। তিনি লিখেছেন ঃ "বেদের অনুশীলনে এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নামমাত্র নাই। আবার আধুনিক হিন্দুদের কাছে যেসকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্রও পাওয়া যাইবে না।"[২] প্রচলিত হিন্দু-মতে দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু বেদে মাত্র তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে ভক্তদের কল্পনা বলেই মনে করেছেন।

প্রচলিত বিভিন্ন রূপকের অন্তর্নিহিত বাস্তব অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, বজ্রধারী ইন্দ্র মানে আসলে বজ্রপাত-সহ বর্ষার আগমন এবং বৃত্র, নমুচি ইত্যাদি অসুর হলো বর্ষানিরোধক প্রাকৃতিক ঘটনাবলী। ইন্দ্রের অসুরবধ আর কিছুই নয়, বৃষ্টির বিঘ্নসকল বিনাশ করে বর্ষণ ঘটানো। তাঁর মতে, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ সম্বন্ধে ইন্দ্রের চরিত্রহীনতার গল্পটা মোটেই ঠিক নয়। 'অহল্যা' মানে যে অনুর্বর ভূমি লাঙল (হল) দ্বারা কর্ষিত হয় না। বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র বা প্রাকৃতিক বৃষ্টি সেই কঠিন ভূমিকে কোমল বা জীর্ণ করেছিল। তাই ইন্দ্র 'অহল্যা-জার'। 'ইন্দ্র' মানে বৃষ্টিধারী আকাশ, তার সহস্র চোখ মানে হাজার হাজার তারা।

একইভাবে অন্যান্য দেবদেবীর আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে, সূর্য, আকাশ, অগ্নি, নদী প্রভৃতি জড়পদার্থমাত্র। তাদের উপাসনা কেবল হিন্দুধর্মে নয়, অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়। বহু উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সব সভ্যতা বা সব জাতিরই ধর্মচর্চা বা ঈশ্বরবিশ্বাস আরম্ভ হয়েছিল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা দিয়ে। তবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবতা কল্পনা করে যতই পূজা করা হোক, তারাও বিশেষ কিছু নিয়মের অধীন। যে-নিয়মে হাতের গণ্ডূষের জল পড়ে যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। ঘোল বানানো আর হাওয়ায় সমুদ্রের আলোড়ন একই নিয়মে হয়। সেইসব নিয়মেরও কারক ও নিয়ন্তা কেউ একজন আছেন। এই উপলব্ধিটাই হলো সরল ঈশ্বর-জ্ঞান। তবে এই জ্ঞান হলেই যে দেবদেবীর উপাসনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, এমন নয়। ইন্দ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিও ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু তারা মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন এবং ঈশ্বর-কর্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। এ হলো লৌকিক হিন্দুধর্ম। এর বিশ্বাস—একজন ঈশ্বরই সর্বস্রষ্টা, তবে দেবগণও আছেন ঈশ্বরনিযুক্ত লোকরক্ষক হয়ে। তারপর জ্ঞানের আরো বিকাশ হলে উপাসক বুঝতে পারবেন যে, ঈশ্বর একজনই। কিন্তু তাঁর বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য। কার্যভেদে তাঁর নামও তাই অগণিত। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি নামে সেই এক ঈশ্বরকেই ডাকা হয়। সুতরাং বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থা—প্রথমে দেবোপাসনা অর্থাৎ জড় প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা, পরে ঈশ্বর ও দেব দুয়েরই উপাসনা, শেষে এক ঈশ্বরের উপলব্ধি।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ "বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।... গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম এবং ধর্মের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা—ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুরা এসকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।"[৩] বস্তুত, 'ধর্মতত্ত্ব' হোক কিংবা 'বিজ্ঞান-রহস্য'ই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ফুটে উঠেছে এক নিষ্ঠাবান যুক্তিবাদীর নির্মোহ বিশ্লেষণ। বেদ, পুরাণ সংক্রান্ত আলোচনায় অলৌকিকতা ও কল্পনার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিকতা এবং যুক্তিসিদ্ধতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানকে ভালবেসে তার চর্চা করেছেন। শুধু যে তিনি পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা নয়। তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার যে নমুনাগুলি তুলে ধরা হলো, তা থেকেই অনুমান করা যায়—তিনি কতখানি বিজ্ঞানমনস্ক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এর সঙ্গে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও বাস্তববুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্বাধীন চিন্তার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানা এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারা—এসবের মধ্য দিয়ে একটা তথ্যই বেরিয়ে আসে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানপ্রেমী ছিলেন না, ছিলেন বিজ্ঞানমনস্কও। ❑

১ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, সাহিত্য, ১ম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৪৫

২ ঐ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৯৩

৩ ঐ, পৃঃ ৩২৩

উপলব্ধি

শান্তিকুমার ঘোষ

॥এক॥

ঐ বিশ্বজগতের চিরনৈঃশব্দ্য
ভয় জাগায় মনে।
যাচ্ঞা করি গুরুর কাছে একবার দুবার ঃ
"আচার্য! ব্রহ্মবিদ্যা শেখান আমাকে।"
শিক্ষাগুরু নীরব। একই প্রার্থনা
যখন জানাই তৃতীয়বার,
বলেন তিনি ঃ "আমি তো শেখাচ্ছি তোমাকে ঠিকই,
কিন্তু ধরতে পারছ কি তুমি?
নৈঃশব্দ্যই ব্রহ্ম।"

॥দুই॥

গুরুগৃহ থেকে ফিরে পিতার কাছে
ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে গিয়ে
জ্যেষ্ঠ পুত্র আবৃত্তি করে চলে বেদ;
পিতা নিশ্চুপ।
ওদিকে কনিষ্ঠ পুত্র থাকে নতনেত্র ও নির্বাক।
তখন প্রসন্ন হয়ে পিতা বলেন তাকে ঃ
"বৎস, তুমিই কিছুটা উপলব্ধি করেছ ব্রহ্মকে।
ব্রহ্ম যে কি, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না।।"
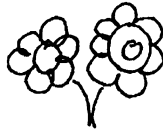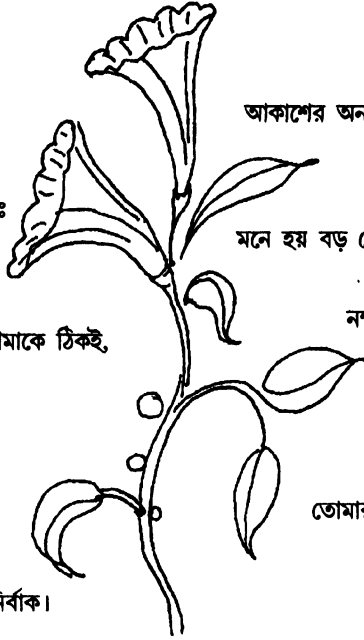
তোমার ইঙ্গিত পেলে

রেণুপদ ঘোষ

আকাশের অনন্ত বিস্তার, তবু তারও চেয়ে বড় তুমি

গ্রহাণুপুঞ্জের ভিতরে সে কোন্
সংসার যেন!

মনে হয় বড় চেনা চেনা কণ্ঠস্বর, যেন কথা বল তুমি

আলোহীন পৃথিবীর অন্ধকারে সহসা
নক্ষত্রের মায়াবী লোক থেকে নেমে এসে
করতল ভরে দাও।

জোয়ার-ভাটার মতো বাড়ে কমে
পার্থিব পাওয়া
বা না-পাওয়া।

তোমার ইঙ্গিত পেলে তুচ্ছ সব... তখনি তো
অন্ধকারে নেচে ওঠে আমাদের
শ্যামা ও দোয়েল

আর
শিস্ তুলে ছোটে নদী যেন ঘণ্টাধ্বনি, আহা,
মন্দিরে মন্দিরে যেন, আরতির নির্মল বিভায়!

সেই ছোট খাটটি

নন্দিনী মিত্র

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে আছেন।
খাটের পাশে পূর্বদিকে অবহেলায় পড়ে আছে
একাধারে তুচ্ছ ও মহান একটি পাপোশ।
পাপোশটি পরিত্যাগ করে মাস্টার মহাশয় উঠে গেছেন—
রেখে গেছেন ভগবৎ-শক্তির জমাট প্রভাব যা
সততই দৃষ্টির অগোচর।
এই যেন কিছুক্ষণ আগে এখানে অসাধারণ
এক আনন্দের হাট ভেঙে গেছে,
তবুও তো তা মননের গোচর।
কান পাতলে 'কথামৃত'-ভাগীরথীর অবিরাম জলকল্লোল
আজও শোনা যায়।
আর সেই আনন্দের হাটের মহামিলন দৃশ্য?
পরতে পরতে চোখের সামনে নিত্য ধরা দেয় গভীর বোধে।
একদিন ছোট খাটটি থেকে যে-শক্তি
সঞ্চারিত হয়েছিল অন্তরঙ্গজনে—
জগৎ পরিব্যাপ্ত করে সে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে
বয়ে চলেছে চিরন্তন ভবিষ্যতের পানে।

সমতল করো

অজিত বাইরী

আমাকে সমতল করো, উঁচু-নিচু
মাটি কুপিয়ে চাষি যেমন সমতল করে জমি।
আমাকেও সমতল করো দশজনের মাঝে
দশজনের মতো।

একক বিচ্ছিন্ন গৌরবের তিলক
আমি চাই না;
আমার মাথা থেকে
নামিয়ে নাও অহঙ্কারের মুকুট।

আমাকে সমতল করো সুখে, শোকে;
আমাকে সমতল করো ভালবাসায়, বেদনায়।
আমাকে সমতল করো অনেকের সঙ্গে
ঢেলা-ভাঙা, মই-টানা, চষা-খেতের মতো।

অসীমায়ন

সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রিয়তেই রুদ্ধ আছিস তরঙ্গে,
সামনে আকাশ উড়ছে সুনীল বিহঙ্গ,
মায়ার খেলার নাচটি দেখায় ভুজঙ্গে,
পোড়ার নেশায় জ্বলছে যেমন পতঙ্গ।

দুই হাতে তুই ধরবি আকাশ সাধ্য কি?
করতলের ফাঁক গলে যায় মেঘ সুদূর,
ভাঙতে ভাঙতে যাবিই মিশে অনন্তে,
বালুতটের ঐ পারে সেই সমুদ্দুর।

প্রভু বলো

দীপালি রায়

প্রভু, পথ কোথায়
অন্তহীন রাত্রি চিরে চিরে ঘন তমসায়
বলো, পথ কোথায়।

আমার মন্ত্র, আমার দুঃখ, আমার গান
আমার ভূমিশয্যা—বিদীর্ণ হয় তোমার
রথচক্রের ঘর্ঘরে; আমি করিনি সাজ
তুলিনি ফুল, গাঁথিনি মালা
অন্ধকারে একা রাত্রির শ্লেটে অনুভবের
হাত রেখে, ঝঞ্ঝা বুকে নিয়ে
অজানা রহস্যে পথ চলা
প্রভু বলো, পথের শেষ কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি

গৌরী মুখোপাধ্যায়

নিত্য তোমায় অর্চনা করি, বন্দনা করি গান—
ফিরে এস আজ এই ধরাতলে ছাড়ি তব ব্রজধাম।
শূন্য নয়নে ধরার মানুষ আছে চারিধারে চাহি—
যদি দেখা পাই রাখিব কেমনে, সম্বল কিছু নাহি।
ভুলেছি আমরা তোমার মন্ত্র, ভুলেছি তোমার বাণী
তুমি বলেছিলে, 'জল' সেই একই নামভেদে হয় 'পানী',
কিন্তু আজিকে হানাহানি করে হিন্দু-মুসলমান
ব্রজধাম হতে নেমে এস আজ শোনাও মন্ত্রগান।
টাকাকে তো তুমি মাটিই বলেছ—'টাকা মাটি, মাটি টাকা"
সেই টাকাতেই চলছে আজকে গোটা দুনিয়ার চাকা—
আরো চাই, আরো আরো আরো চাই—
ছুটছে টাকার পিছে—
মানুষ ভুলেছে সত্যমিথ্যে মূল্যবোধ তো মিছে।
ভোগবাদী আজ হয়েছে মানুষ ভোগের ঘরেতে বাসা
এত কিছু পায় তবুও তাদের মেটে না মনের আশা।
ফিরে এস আজ ব্রজধাম হতে, শুনাও অমৃতবাণী
বিশ্ব জাগিবে, নির্ভয় হব, দূর হবে সব গ্লানি।

চোর

দিলীপকুমার ঘোষ

মনে পড়ে, সে এক রাতে
আমি তখন ঘুমের হাতে
ভেঙেচুরে ঘুমের দেওয়াল
ঢুকল যে চোর ঘরে।

ভয়ে ভয়ে দেখছি তখন
সন্ধানী চোখ খুঁজছে কি ধন!
এসে শেষে আমার কাছে
মন নিতে চায় কেড়ে।

কাতর স্বরে বলিনু তারেঃ
"নিও না মন, দাও না ছেড়ে
মনটি নিলে থাকবে কি আর
বাঁচব কেমন করে?"

"এস বরং কদিন পরে,
চাও যা তুমি দেব ভরে।"
কি জানি সে শুনল কিনা,
গেল যে মন ছেড়ে।
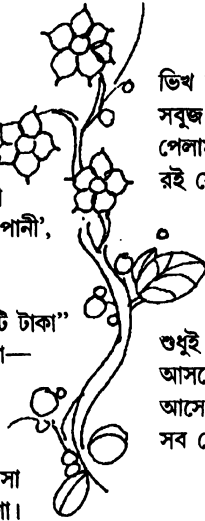
ভিখ মাগি তাই দুহাত পেতে
সবুজ অবুঝ সবার কাছে
পেলাম যেটুকু বেঁধে তারেই
রই যে এখন বসে।

আসন পেতে গভীর রাতে
ভাবি বসে, ঐ সে আসে
চোখের জলে জলছবি সব
যায় সে হাওয়ায় মিশে।

শুধুই ভাবি কত রাতি
আসবে কি আর পরম জ্যোতি
আসে যদি সেই 'মহাচোর'
সব দেব তার হাতে।

বেশ বুঝি যে আমি এখন,
সে ছিল মোর মনোহরণ,
ফিরায়ে তারে চোর হয়েছি
অসীম কালোর পথে।।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দু-সপ্তাহ*

স্বামী স্মরণানন্দ

রামকৃষ্ণ সেন্টার অফ সাউথ আফ্রিকা, ডারবান তাঁদের হীরকজয়ন্তী উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদেরই আমন্ত্রণে চলেছি। যাত্রার প্রথম পর্বে মরিশাসের ছয়টি উপভোগ্য দিন শেষ করে সেখান থেকে জোহানেসবার্গ যাওয়ার জন্য সাউথ আফ্রিকান এয়ার-ওয়েজের বিমানে যাত্রা করলাম ১ মে ২০০২। সাড়ে ৪ ঘণ্টা লাগে পৌঁছাতে। বিকাল ৪টে ২০তে বিমান উড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫০-এ জোহানেসবার্গ পৌঁছায়। কোয়া জুলু নাটাল প্রদেশের রাজধানী ডারবানে যাওয়ার জন্য ঐ একই কোম্পানির বিমানে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় যাত্রা করে ডারবানে পৌঁছালাম ৯টা ৪০-এ।

এই সেই দক্ষিণ আফ্রিকা, খ্রিস্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত যার দক্ষিণ ও মধ্য ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত ছিল। ইউরোপীয়ানরা—প্রধানত ডাচ বা নেদারল্যাণ্ডবাসী, জার্মান এবং পরবর্তী কালে ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার জন্য একটি সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, কলম্বাস ভারতবর্ষে পৌঁছানোর সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার জন্য তাঁর বিখ্যাত সমুদ্রযাত্রা শুরু করে শেষপর্যন্ত পশ্চিম গোলার্ধে পৌঁছান। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগিজরা আফ্রিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপটিকে প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে আসার জন্য একটি পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সাহস করে ভারতের দিকে এগোবার আগে ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সোনার খোঁজে ও শ্রমিক হিসাবে কাজের জন্য ক্রীতদাসদের ধরার উদ্দেশে পর্তুগিজরা দেশের মধ্যভাগে আচমকা আক্রমণ করত।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

এদের পর ডাচরা ধীরে ধীরে এই মহাদেশের সর্বদক্ষিণভাগে বসবাস করতে শুরু করে। পরবর্তী কয়েক শতক ধরে ওদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়ানদের একটানা সংগ্রাম চলতে থাকে। কখনো কখনো ঐ সংগ্রাম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের নিজেদের মধ্যেও চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশরা পূর্ণরূপে বসবাস করতে শুরু করে। জায়গা দখল নেওয়া ও ক্রীতদাসদের বন্দী করার ক্ষেত্রে তখন আগ্নেয়াস্ত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এরপর শুরু হয় ডাচ, জার্মান, ব্রিটিশ ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপনের লড়াই। এই সংগ্রামই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিধ্বংসী অ্যাংলো-বোর যুদ্ধে পরিণত হয়। মূলত এই যুদ্ধ হয়েছিল সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক (ডাচ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান ঔপনিবেশিক)-এর সঙ্গে ব্রিটিশদের। উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। স্মরণ করা যেতে পারে, সেইসময় মহাত্মা গান্ধী ডারবানে আইনব্যবসায় রত ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটি কর্মিদল গঠন করেছিলেন।

ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পর ট্রান্সভাল, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং কেপ উপনিবেশগুলিতে সংগঠিত হয়। শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের তখন নাগরিকত্ব দেওয়া হতো। স্ত্রীলোক, কৃষ্ণাঙ্গ, অশ্বেতকায় ও ভারতীয়দের সেদেশের নাগরিকত্ব ছিল না। যদিও তখনো পর্যন্ত দাসপ্রথা শুরু হয়নি, তবুও অশ্বেতকায়দের শ্রমিক-রূপেই পর্যবসিত করা হয়েছিল। তাদের কোনকিছুরই অধিকার ছিল না।

---

* গত ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ প্রকাশিত মূল ইংরেজি লেখার বঙ্গানুবাদ করেছেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' ১৯০৬-১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা অশ্বেতকায়দের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের দাবি করতে থাকে। যদিও গান্ধীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ে, তবুও এই সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৯৬১-তে 'সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক' গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়দের মধ্যে জঘন্য পৃথকীকরণ কূটনীতি (জাতিবিদ্বেষ) চালু হয়। এই শাসনপ্রণালী তুলে নেওয়া হয় ১৯৯৪-তে। ততদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে পারত না, যেহেতু সেদেশের জন্য কোন পাসপোর্ট দেওয়া হতো না।

১৯৯৪-তে এদেশে কৃষ্ণাঙ্গরা সরকার গঠন করে। দেশের রাষ্ট্রপতি হন নেলসন ম্যাণ্ডেলা। ভারত সরকারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর তখনি দুদেশের নাগরিকদের মধ্যে উভয় দেশে যাতায়াত শুরু হয়।

ডারবানে শিশু-উৎসব—মন্দিরের প্রার্থনাগৃহে

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। দেশের ভাষা আফ্রিকান্স ও ইংরেজি। আফ্রিকান্স হলো ডাচ, জার্মান ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি ভাষা। এছাড়াও এদেশের নয়টি প্রদেশের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কথ্যভাষা আছে। কৃষ্ণাঙ্গরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ, বাকিরা হলো শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়।

কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ভীষণরকম দারিদ্র্য থাকলেও বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি 'উন্নত' দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুনির্মিত রাস্তাসকল দেশের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করেছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই দেশেই সবচেয়ে বেশি সোনা ও হীরার উৎপাদন হয়। সারা দুনিয়ার মোট সোনা উৎপাদনের ৪৭ শতাংশ হয়ে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এদেশ অনেকপ্রকার খনিজ পদার্থেও সমৃদ্ধ। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে আখের উৎপাদনই সবচেয়ে বেশি। এইভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে এদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ডারবান ও জোহানেস-বার্গের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি লাগানো থাকে। তাতে লেখা থাকে—'বার্গ্লার অ্যালার্ম—আর্মড রেস্পন্স' অর্থাৎ চোর প্রবেশের সঙ্কেত-জ্ঞাপক যন্ত্র (লাগানো রয়েছে)—সশস্ত্র জবাব (দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে)। এর থেকে প্রতীত হয়, এসব জায়গায় চুরি ও অপরাধপ্রবণতা অতিমাত্রায় রয়েছে। আর অনেক বেসরকারি সংস্থা চুক্তিবদ্ধভাবে এইসব বাড়ির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রামকৃষ্ণ সেণ্টার

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে রামকৃষ্ণ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী নিশ্চলানন্দ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ধনগোপাল নাইডু। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও ভাবধারায়, বিশেষত তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি চিঠি লেখেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজীকে। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁকে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার জন্য উৎসাহিত করেন। এরপর সাধুজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্য তিনি বেলুড় মঠে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বামী বিরজানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। সেসময় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন কেন্দ্র স্থাপন করার মতো অবস্থা ছিল না। কিন্তু ধনগোপাল নাইডু দক্ষিণ আফ্রিকাতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কাজেই তিনি উত্তরাখণ্ডের দিকে চললেন। এখানে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য বশিষ্ঠ গুহার স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হয় 'স্বামী নিশ্চলানন্দ'।

এরপর তিনি তাঁর গুরুদেবের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে ১৯৫৩-তে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ফলে রামকৃষ্ণ সেণ্টারের কাজকর্ম বিস্তার-

লাভ করতে থাকে। প্রার্থনা, বক্তৃতা, আধ্যাত্মিক শিবির, আলোচনাচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেন। প্রয়োজনে তিনি ত্রাণকার্যও পরিচালনা করেছেন। এছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবামূলক কাজ তিনিই প্রথম শুরু করেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি আকস্মিক দেহত্যাগ করেন। এতে ভক্তবৃন্দ খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর একমাত্র সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী শিবপদানন্দ তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে শরীরত্যাগ পর্যন্ত তিনি সেই কার্যধারাকে সম্প্রসারিত করেছেন। নাটাল প্রদেশের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলি পরস্পর সুসম্বদ্ধ হয়েছে। কার্যধারা আরো সুদৃঢ় এবং সেণ্টারটি এই অঞ্চলে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বর্তমানে স্বামী শিবপদানন্দের শিষ্য স্বামী সারদানন্দ এই সেণ্টারের অধ্যক্ষ। সেণ্টারের পরিচালন সমিতির সভ্যদের মধ্যে রয়েছেন ডারবানের বিশিষ্ট নাগরিকগণ। ১৯৯৪ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইসময় থেকে রামকৃষ্ণ সেণ্টার উদারপন্থী নাগরিকদের প্রশংসা লাভ করে। ভারতবর্ষেও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আন্দোলনের যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভ্রমণ

আগেই জানিয়েছি, ১ মে ২০০২ ডারবান বিমানবন্দরে পৌঁছাই রাত ৯টা ৪০-এ। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন ভক্ত-সহ স্বামী সারদানন্দ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে আশ্রমে পৌঁছাতে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগল।

পরদিন সকালটি ছিল খুবই উজ্জ্বল ও মনোরম। ৯ একর জমিতে অবস্থিত আশ্রমটি ঘুরে দেখলাম, খুব সুন্দরভাবে এটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। শুরুতে আশ্রমের জমি ছিল মোট ১৪ একর। পরে রাস্তা তৈরির জন্য সরকার ৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তরঙ্গায়িত জমি এক মনোরম দৃশ্য উপস্থাপিত করেছে। মন্দিরটি বেশ বড়। মন্দিরে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি এবং শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট। নাটমন্দিরে প্রায় ৪০০ ভক্তের স্থানসঙ্কুলান হতে পারে। বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো, আশ্রমের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় ভক্তদের স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে। কয়েকজন উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক 'মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল'-এ রোগীদের দেখেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। গরিব রোগীদের জন্য এ এক মহৎ সেবা, কারণ এই অঞ্চলে চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট নয় এবং চিকিৎসাও ব্যয়সাধ্য।

এদিন বিকালে বাচ্চাদের একটি অনুষ্ঠান ছিল। ৪০০ জনের বেশি বালক-বালিকা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারা ভজন ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে। তাদের উদ্দেশে আমাকে প্রায় ২০ মিনিট বলতে হলো। আরতির পর অতিথি সন্ন্যাসীকে প্রণামের জন্য তারা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে হয় চকোলেট কিংবা ফল ছিল। প্রত্যেকেই প্রণামের সময় সেগুলি দিতে লাগল। ফলে চকোলেট ও ফলের এক বিরাট স্তূপ তৈরি হলো। সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলি কি হবে? তিনি বললেন, এর কিছু অংশ নিকটবর্তী কৃষ্ণাঙ্গদের একটি অনাথ আশ্রমে দেওয়া হবে আর বাকি অংশ বিতরিত হবে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে। খুব সুন্দর অভিপ্রায়।

রামকৃষ্ণ সেণ্টারের হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণরত লেখক

৩ মে বেশ বিশ্রামের মধ্যে কাটল। প্রতিদিন আশ্রম-চত্বরে সকালে হাঁটার সময় সঙ্গ দিতেন ডঃ অনুপ সীব্রান। হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা চলত। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ তিনি ও ডঃ প্রভু আমাকে ডারবানের শহরতলিতে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। ডারবান দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত হলেও ডারবান পাহাড়পূর্ণ। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এটি। অনেক জায়গায় বাড়িগুলি পাহাড়ের

ঢালে অবস্থিত। শ্বেতাঙ্গরা ভাল ভাল জায়গাগুলো নিয়েছে। ভারতীয়রা বিচ্ছিন্নভাবে বাড়ি করেছে। কৃষ্ণাঙ্গরা পেয়েছে নিকৃষ্ট জায়গাগুলো।

সন্ধ্যায় মেরিয়ানা হিল কনভেন্টের সিস্টার অ্যাগনেস, মৌলানা রফিক ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আহারের ব্যবস্থা ছিল। মৌলানা রফিক খুব উদার ও হাসিখুশি। সিস্টার অ্যাগনেস তাঁদের কনভেন্ট পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য আমাকে আন্তরিক অনুরোধ জানালেন।

৪ মে 'রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কার্যধারা' বিষয়ে টেলিভিশনের জন্য আমাকে একটি সাক্ষাৎকার ও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তারপরই ছিল 'ভক্তি' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য। বিকালে ডারবান শহরের বহির্দেশে ফোনিক্স নামক বসতিতে একটি ভাড়া করা সভাগৃহে রামকৃষ্ণ সেন্টারের হীরক জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এখানে প্রায় ১,৫০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিকাল পৌনে ৪টে নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছালাম। ৪টে নাগাদ সভাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যদিও শ্রোতৃমণ্ডলীতে প্রধানত ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই উপস্থিত ছিলেন, তবে ২০০ কৃষ্ণাঙ্গ ও কিছু শ্বেতাঙ্গও ছিলেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সদস্য-বৃন্দ, নাটাল প্রদেশের উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ, বাণিজ্য-দূত সংক্রান্ত দলের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতিরা, দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এস. এস. মুখার্জি, ডারবানে ভারতীয় বাণিজ্য-দূত অজিত কুমার, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য অনেক সম্মানিত এবং পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বক্তব্যের বিষয় ছিল—'আধুনিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'। আমি প্রায় ২৫ মিনিট বললাম। বক্তব্যে গুরুত্ব দেওয়া হয় ধর্মসমন্বয় ও সেবার ওপর।

সম্মেলনে উপস্থিত ভক্তসমাবেশের একাংশ

অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সিসুলওয়াজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের নাচগান। তাদের নাচের সঙ্গে মধ্যভারতের উপজাতিদের নাচের খুব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তারপরই ছিল আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নৈশাহারের ব্যবস্থা। সবই খুব সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

৫ মে সকালে স্বামী সারদানন্দ আমাকে 'শ্রীসারদাদেবী আশ্রম' নামে একটি মেয়েদের কেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রধান কেন্দ্র থেকে এটি ২০-৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানে একটি সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। খুব বড় না হলেও কেন্দ্রটি একটি সুন্দর বাড়িতে চলছে। ঠাকুরঘর-সহ সভাকক্ষটি রুচিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত। সুসজ্জিত বেদিটির ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি এবং শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি স্থাপিত। সভাকক্ষে ৪৫০ জনের স্থান হতে পারে। তা প্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদা আন্দোলনে স্ত্রী-ভক্তদের ভূমিকা ও দায়িত্ব' সম্বন্ধে বললাম। ১৯৮৪ সালে এই কেন্দ্রের শুরু। বর্তমানে প্রব্রাজিকা ইষ্টপ্রাণা ও দুজন প্রবীণ মহিলা কেন্দ্রটির দেখাশোনা করেন।

পরদিন সকালে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার ভিসার মেয়াদ ১৮ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য হোম অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অফিসে যেতে হলো। সঙ্গে ছিলেন ডঃ প্রভু। ভুলবশত এই ভিসার সময়সীমা ৭ জুন পর্যন্ত করা হয়েছিল। এটি ঠিক করে না নিতে পারলে আমায় যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হতো। ডঃ প্রভুর সঙ্গে ঐ বিভাগের লোকজনদের পরিচয় থাকাতে কাজটি খুব সহজেই হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় গেলাম ফোনিক্সে। সেখানে একটি মন্দিরে প্রায় ২০০ ভক্তের উপস্থিতিতে *'দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতা'* বিষয়ে ৩৫-৪০ মিনিট বললাম। এখানে ভক্তরা চমৎকার আরতিস্তব ও অন্যান্য ভজন গাইতে পারেন। সন্ধ্যা ৮টা ৪৫ নাগাদ আশ্রমে ফিরলাম।

সিস্টার অ্যাগনেসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ৭ তারিখ সকালে মেরিয়ানা হিল-এ তাঁদের কনভেন্ট দেখতে গেলাম। সিস্টার একজন জার্মান মহিলা। কনভেন্টটি খুব বড় জায়গা নিয়ে অবস্থিত। সুন্দর বাড়িগুলি-সহ এর পরিবেশটি চমৎকার। কফি-পান করতে করতে কিছু আলোচনা হলো। আলোচনায় আরো চার-পাঁচজন সন্ন্যাসিনী যোগ দিলেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কাজেই তাঁদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ বসতে হলো।

এখান থেকে গেলাম ফোনিক্সের বসতি এলাকায়। এই জায়গাতেই মহাত্মা গান্ধী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২১ বছর বাস করেন। ১৯৮৫-তে এই বসতি বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৯০-তে তা পুনর্নির্মিত হয়। এখানে একটি প্রেস

ছিল, যেখান থেকে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' (পরবর্তী কালে 'দি ওপিনিয়ন') পত্রিকা মুদ্রিত হতো। স্থানটি বর্তমানে একটি জাতীয় স্মারক হিসাবে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে।

বিকালে ১০০ কিমি. দূরে বেশ বড় শহর পিটারমারিজবার্গের উদ্দেশে রওনা দিলাম। জায়গাটি পাহাড়ি। রাস্তা ও বাড়িগুলি ব্রিটিশ রাজত্বকালের স্থাপত্য ও নির্মাণরীতির সাক্ষ্য বহন করছে। রাস্তাগুলির নাম ভারতীয়, যেমন—বম্বে রোড, নাগপুর রোড, ইণ্ডিয়া স্ট্রিট ইত্যাদি। এখানকার রামকৃষ্ণ সেণ্টারটি সরোজিনী স্ট্রিটে অবস্থিত। সেণ্টারের বাড়িটি বিশেষ বড় নয়; তবে ২-৩ জন সাধুর বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট। মন্দিরটি চমৎকার সাজানো-গোছানো। প্রার্থনাকক্ষে প্রায় ২০০ জনের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। এখানে আমি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ভক্তি-সাধনা' বিষয়ে বললাম।

নৈশাহারের পর রমেশ ঈশ্বরলাল নামে এক ভক্ত আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর পাহাড়ি বাঙলো এখান থেকে ১৫০ কিমি. দূরে ড্রাকেনবার্গ নর্থে অবস্থিত। বাড়িটি অতি সুন্দর। কাছেই 'জায়েণ্টস ক্যাসেল' নামে একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। পর্বতটি শক্ত কালো-পাথরের, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৩০০ মিটার উঁচু। সম্ভবত শীতের মধ্যভাগে বরফে ঢাকা পড়ে যায়।

রাতটি রীতিমতো ঠাণ্ডা ছিল। ঝলমলে রোদ-সহ পরদিনটির শুরু। বাইরে খুব তুষার পড়েছে। তা সত্ত্বেও বেরিয়ে একটু পাহাড়ে চড়াই করলাম। শ্রীমতী রমেশ ও শ্রীমতী সীব্রান রাত্রে ওখানেই ছিলেন। তাঁরা আমাদের জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সকাল ৯টা নাগাদ পিটারমারিজবার্গ হয়ে ডারবানের পথে রওনা দিলাম। প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণের যথাযোগ্য টিকিট থাকা সত্ত্বেও ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গান্ধীজী এই পিটারমারিজবার্গ রেলস্টেশনেই সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই ঘটনার স্মারক-ফলকটি আমরা স্টেশনে গিয়ে দেখলাম।

৮ মে সকালে ডাঃ অনুপ সীব্রান আমাকে একটি বইয়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমার পছন্দের কোন বই সেখানে পেলাম না। তাও দুটি বই কেনা হলো। সন্ধ্যায় গেলাম চেস্টসওয়ার্থ আশ্রমে। এটি ডারবান কেন্দ্রের একটি শাখা। এখানে প্রায় ১০০ শ্রোতার সামনে 'ব্যবহারিক বেদান্ত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতিসাধন' বিষয়ে আমাকে বলতে হলো। নৈশাহার সেরে ডারবানে ফিরলাম রাত সোয়া ৯টা নাগাদ।

পরদিন সকালে স্বামী সারদানন্দ আমাকে 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি'র আশ্রমে নিয়ে গেলেন। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সহজানন্দজী। তিনিই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আশ্রমটি ৫ একর জমিতে অবস্থিত। অনেক রকম ধর্মীয় পুস্তক সোসাইটির মুদ্রণালয়ে ছাপা হয়। মুদ্রণালয়টি বেশ আধুনিক। বাড়ির মধ্যে একটি ছোট বাঁধানো পুকুর আছে। এর জল পবিত্র করা হয় গঙ্গাজল দিয়ে। সহজানন্দজী কিছু গঙ্গাজল দিলেন পুকুরে ঢেলে দেওয়ার জন্য।

সন্ধ্যায় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, শ্রীমতী রাবিয়া, একজন অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল, কমল পাণ্ডে এবং একজন পার্লামেন্টের সদস্য। শ্রীপাণ্ডে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর মতপ্রকাশ করে বললেন যে, ভারতীয়দের উচিত এদেশীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা বৃদ্ধি করা।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ

১০ মে সকালে সরকার পরিচালিত 'মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল' দেখতে গেলাম। কয়েকজন ভক্ত ডাক্তার এই হাসপাতালে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ দিয়ে থাকেন। ৪০০ শয্যার হাসপাতালটি সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এখানে শয্যাসংখ্যা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

হাসপাতাল থেকে 'ভারলান কেয়ার সেণ্টার' নামে একটি বৃদ্ধাবাসে গেলাম। এই সংস্থাটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের এখানে ভাল যত্ন নেওয়া হয়। তাঁদের দেখেও বেশ সুখী মনে হলো। এখানে তাঁদের উদ্দেশে আমাকে কিছু বলতে হলো।

এরপর 'ওসিণ্ডসোয়েনি হসপিটাল'-এর শিশুবিভাগটি দেখতে গেলাম। এখানেও ভক্ত-চিকিৎসকরা বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বিকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া হলো। এখানে সমুদ্রতীর বন্ধুর পর্বতসঙ্কুল। কিন্তু তার মধ্যে চুপচাপ সময় কাটানোর জন্য নির্জন নিভৃত জায়গাও রয়েছে। এখানে ভারত মহাসাগর তেমন বিক্ষুব্ধ নয়।

সন্ধ্যাটি অতিবাহিত হলো 'রামকৃষ্ণ সেণ্টার অফ সাউথ আফ্রিকা'র কর্মকর্তা ও সভ্যদের সঙ্গে এবং সেণ্টারের শাখাগুলির অধ্যক্ষ ও পরিচালকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে। তাঁদের উদ্দেশে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পরিচালন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ' বিষয়ে বললাম।

১১ মে সকালে গেলাম একটি অনাথদের জন্য বিদ্যালয়ে। এখানে প্রায় ৫০ জন কৃষ্ণাঙ্গ অনাথ ছেলেমেয়ে থাকে ও পড়াশুনা করে। তাদের চকোলেট প্রভৃতি দেওয়া হলো। তাদের উদ্দেশে আমাকে কিছুক্ষণ বলতে হলো। আমার কথাগুলি জুলুতে ভাষান্তর করে দেওয়া হচ্ছিল। অনাথ আশ্রমের বাড়িটি জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ সেণ্টার সেটিকে সম্পূর্ণরূপে মেরামত করে নবরূপ দান করেছে। এইসব অবহেলিত কৃষ্ণকায় শিশুদের জন্য এটি একটি প্রশংসনীয় সেবাকর্ম।

বিকাল ৪টায় ব্যবস্থা ছিল সৎসঙ্গের। উপস্থিত প্রায় ২৫০ ভক্তের মধ্যে বেশ কিছু যুবকও ছিল। প্রায় ৫০ মিনিট 'ভগবদ্গীতার বাণী' বিষয়ে বললাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে পিটারমারিজবার্গের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ্বর। পিটারমারিজবার্গে নৈশাহার সেরে রাত্রিবাস। এখানে কিছুক্ষণ ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তাও হলো। এই কেন্দ্রটি দেখাশোনা করেন সুনীল ও অবিতা।

১২ মে সকালে লেডি স্মিথ নামক জায়গার উদ্দেশে রওনা দিলাম। সময় লাগে ২ ঘণ্টা। কীর্তির বাড়িতে প্রাতরাশ সেরে গেলাম রামকৃষ্ণ সেণ্টারে। এখানে একটি সুন্দর প্রার্থনাকক্ষ রয়েছে। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটি ভাড়া করা বড় হলঘরে। এখানেই নর্থ নাটাল সম্মেলন রামকৃষ্ণ সেণ্টার অফ সাউথ আফ্রিকার হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেছিল। এই প্রথাগত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ও পদাধিকারী ব্যক্তিরা। প্রায় ২৫০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। কমল পাণ্ডে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। 'সাংস্কৃতিক বিবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের অবদান' বিষয়ে আমি বললাম। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন প্রব্রাজিকা ইষ্টপ্রাণা, বারবারা মাসে ও দিলীপ হুল্লজী। কীর্তির বাড়িতে দুপুরের আহার ও সামান্য বিশ্রাম সেরে ডাণ্ডী রওনা হলাম। সেখান থেকে যাওয়া হলো নিউ ক্যাসেলে। এই জায়গায় সেণ্টারের একটি শাখা আছে। রাত ছিল বেশ ঠাণ্ডা। ডারবানের ডঃ প্রভুর বাবা এখানকার বাসিন্দা। সকালে তিনি বললেন, রাত্রে তাপমাত্রা –২° ছিল।

১৩ মে রোদ-ঝলমলে সকালে নিউ ক্যাসেল থেকে রওনা দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে লেডি স্মিথে কীর্তির বাড়িতে পৌঁছালাম। এখানে প্রাতরাশ সেরে ৯টায় বেরিয়ে পড়লাম। ডারবানে পৌঁছালাম সাড়ে ১১টা নাগাদ। পরদিন জোহানেসবার্গ যাওয়ার প্রস্তুতি।

জোহানেসবার্গ

খুব সকাল সকাল স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে বিমান-বন্দরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। জোহানেসবার্গ পৌঁছালাম সকাল ৯টা ২০তে। হর্ষদ মাস্টার ও তাঁর ছেলে মনোজ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। হর্ষদ মাস্টার নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাদের লিনোসয়ায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। জোহানেসবার্গের এই অঞ্চলটিতে ভারতীয়রা বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন।

চা-পানের পর লায়ন্স পার্ক দেখতে গেলাম। এই পার্কে সিংহদের ছেড়ে রাখা হয়েছে। তাই গাড়ি থেকে বেরনোর কোন উপায় নেই, গাড়িতে বসেই দর্শন। আফ্রিকার এই সিংহেরা ভারতের গির অরণ্যের সিংহদের চেয়ে চেহারায় বড় ও শক্তিশালী মনে হলো। একটি আলাদা খাঁচায় ৪-৫ মাস বয়সের সিংহশাবকদের রাখা হয়েছে। খুব কম সময়ের জন্য দর্শনার্থীদের ঐ খাঁচায় যেতে, এমনকি বাচ্চাগুলিকে আদর করতে দেওয়া হয়। কেউ কেউ তাদের কোলে নিয়ে ছবিও তোলে।

বিকালে কিছু সময় ভ্রমণের পর সন্ধ্যা ৬টায় বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মন্দিরের বেদিতে বিভিন্ন দেবদেবী রয়েছেন। ভজনগান হচ্ছিল। কিন্তু তার সুর খুবই আধুনিক শোনাল! সেখান থেকে অরবিন্দভাইয়ের বাড়িতে রাত্রের আহারের জন্য গেলাম।

১৫ তারিখ প্রাতরাশের পর কিছু সময় হাঁটা হলো। তারপর গেলাম রামেশ্বরম মন্দিরে। খুব সুন্দর মন্দির। বিকালে স্বামী সারদানন্দ, হর্ষদভাই এবং অন্যান্য ২-৩ জনের জন্য 'গীতা'র ওপর একটি ঘরোয়া আলোচনা করলাম। সান্ধ্য ভ্রমণের পর অন্য আরেকটি মন্দিরে গেলাম। এখানে 'গীতার বাণী' বিষয়ে বলতে হলো।

পরদিন সকালে বিদায় নেওয়ার পালা। যদিও উড়ান ছিল সকাল ১০টা ২০তে, কিন্তু আমাদের যাত্রা করতে হলো সকাল সোয়া ৬টা নাগাদ। কারণ, সকালে রাস্তায় গাড়ি চলাচল অত্যন্ত বেশি। স্বামী সারদানন্দ ও অরবিন্দ-ভাইকে বিমানবন্দর থেকে আগেই চলে যেতে হলো। হর্ষদভাই শেষ পর্যন্ত থেকে আমাকে বিদায় জানালেন।

উড়ান ছিল দীর্ঘ সময়ের—সাড়ে ৯ ঘণ্টার। এই যাত্রাটি খুব ক্লান্তিকর! গন্তব্যস্থল দক্ষিণ আমেরিকার সাওপাওলো। পরে এবিষয়ে বলার ইচ্ছা রইল। ❑

> এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

স্বামীজীর পত্রে উল্লিখিত 'নরসিংহ' কোন্‌জন?

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৯ সংখ্যার 'পত্রাবলী' বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ২০ আগস্ট ১৮৯৪ তারিখে মিসেস জর্জ ডব্লু. হেলকে লেখা পত্রটিতে স্বামীজী লিখছেনঃ "মাদ্রাজ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে যে, নরসিংহকে লেখা তাদের চিঠির উত্তর পাওয়া মাত্র শীঘ্রই তাকে টাকা পাঠাবে।" 'নরসিংহ' সম্পর্কে পাদটীকায় বলা হয়েছে—"রাও বাহাদুর আর. এ. নরসিংহচারিয়া মহীশূর সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। তিনি স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।" তথ্যটি সঠিক নয়। রাও বাহাদুর আর. এ. নরসিংহচারিয়া এবং স্বামীজীর পত্রে উল্লিখিত নরসিংহ দুজন আলাদা ব্যক্তি। দ্বিতীয় জনের সংবাদ আমরা পাই স্বামীজীর প্রথমবার আমেরিকা-যাত্রার পর। তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রাচ্যধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২ নভেম্বর ১৮৯৩ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে এঁর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেনঃ "নরসিংহাচার্য নামে একটি ছেলে আমাদের মধ্যে এসে জুটেছে। সে গত তিনবছর যাবৎ শিকাগো শহরে নিষ্কর্মাভাবে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় আর যাই করুক, ছেলেটিকে আমার পছন্দ। তবে তার সম্পর্কে তোমার জানা থাকলে জানিও। সে তোমাকে চেনে। যে-বছর প্যারিস-প্রদর্শনী হয় (১৮৮৯), সে-বছর সে ইউরোপে এসেছে।" উত্তরে আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামীজীকে জানানঃ "নরসিংহাচার্য একটি বাউণ্ডুলে ছেলে, তার জন্য তার মাকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে।" মেরি লুই বার্কের 'Swami Vivekananda In the West : New Discoveries' গ্রন্থ-সূত্রে জানা যায়, এই 'নিষ্কর্মা' ভদ্রলোক এর-ওর কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইত, এমনকি স্বামীজীর কাছেও ৫০ ডলার চেয়েছিল। যদিও তখনকার বিচারে ৫০ ডলার কিছু কম নয়, কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন স্বামীজী ২৮ মে ১৮৯৪ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লেখেনঃ "অধোগতির চরম সীমায় পৌঁছে নরসিংহ আমাকে সাহায্যের জন্য লেখে। আমিও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। যাহোক, তুমি তার আত্মীয়স্বজনকে বলবে, তারা যেন শীঘ্র তাকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ভাড়া পাঠায়।... বেচারা বেশ কষ্টে পড়েছে। যাতে সে অনাহারে না থাকে, সেদিকে আমি অবশ্যই নজর রাখব।"

এথেকেই পরিষ্কার, আর. এ. নরসিংহচারিয়া এবং স্বামীজী পত্রে উল্লিখিত 'নরসিংহ' দুজন আলাদা ব্যক্তি।

প্রসেনজিৎ দাস

দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪

শব্দের মাধ্যমে চেতনা বিস্তার

'Crossword Puzzle' একটি নেশা ধরানো মজার খেলা, যা বয়সের অপেক্ষা রাখে না। এরকম 'Puzzle' আমরা নানা কাগজে ও সাময়িক পত্রিকায় পাই। এতে সাহিত্যের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর 'শব্দচেতনা' মনের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার নিরসনও ঘটায়। এ যে খেলার ছলে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও বেদান্তের বাণীকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার এক অভিনব প্রচেষ্টা!

'শব্দ' যে সত্যিই 'চেতনা'র উদ্রেক করে তা এই 'শব্দচেতনা'র সমাধান করতে গেলে বেশ বুঝতে পারি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', 'ভক্তমালিকা', 'গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যখন এর সমাধান খুঁজতে বসি, তখন কেমন নেশার ঘোরে ঐ গ্রন্থগুলি থেকে খানিকটা পড়েই ফেলি। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায়, বুঝতে পারি না। এ বেশ মজার ব্যাপার হয়েছে! সারাদিন মনটা এক তৃপ্তির আনন্দে ভরে থাকে। 'শব্দচেতনা'র মাধ্যমে ক্রমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় বিভাগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিবেদিতা সেনগুপ্ত

আই. আই. টি., খড়্গপুর, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৩০২

প্রসঙ্গঃ ডায়াবিটিস ও কুটিলাগম

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীকুমুদবন্ধু স্বামীর 'ডায়াবিটিস প্রসঙ্গে দু-চার কথা' পড়ে আমি আজ প্রায় দু-মাস যাবৎ 'কুটিলাগম'-এর সঙ্গে তালমিছরি মিশিয়ে খাচ্ছি। খাওয়ার আগে আমার ব্লাডসুগার (PP) ২২৫ ছিল, এখন ১৬৫ থেকে ১৭৫-র মধ্যে আছে। কুটিলাগমের দাম তিনি লিখেছিলেন প্রতি কিলোগ্রাম অনধিক ৩০০ টাকা, আমাদের বরাক উপত্যকার দোকানে কিলোগ্রাম প্রতি ৪০০ টাকা করে নিচ্ছে।

শিলচরের একজন ডায়াবিটিস-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে কুটিলাগমের উপকারিতার কথা বলেছিলাম। তিনি বলেন, এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা তাঁর জানা নেই। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে কোন বিশেষজ্ঞ এসম্বন্ধে আলোকপাত করলে উপকৃত হব। তবে আমি কুটিলাগম খাওয়ার পর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা বুঝতে পারিনি, বরং বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

প্রবোধ ভট্টাচার্য

হাইলাকান্দি, অসম-৭৮৮৮০১

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির জবাবে জানাই, অসমে এটি 'কুটিলাগম' নামে পরিচিত, তবে স্থানবিশেষে একই জিনিসের বিভিন্ন নাম থাকা অস্বাভাবিক নয়।

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জায়গায় এটি আবার 'কোত্তিলাগম' বা 'কতিলা' নামেও পরিচিত। কলকাতার বড়বাজারের পাইকারী বনৌষধি দোকানে এটি পাওয়া যায় বলে অনেকে আমাকে জানিয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় জিনিসটির যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতে এটি সেই 'কুটিলাগম'ই। তবে এটি ধুনার মতো মিহি করে গুঁড়ো করা যায় না, যেহেতু জিনিসটি আঠালো। রং মোটামুটি সাদা বলা চলে, অবশ্য মাঝে মাঝে লালচে রঙও চোখে পড়ে। কারণ, এটি যে-গাছের আঠা, সে-গাছের সামান্য অংশ এতে কখনো জড়িয়ে থাকে এবং জলে ভেজানোর পর লাল অংশ আলাদা হয়ে জলে ভাসতে থাকে। এর কোন গন্ধ বা স্বাদ নেই। আমার ধারণা, ঐ 'কপিলাগম' এবং 'কুটিলাগম' একই জিনিস।

অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই, কারণ আমি সবসময় এই চিকিৎসা এড়িয়ে চলি। এই বৃদ্ধ বয়সে (৭৫ বছর) আমি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক ও হোমিও চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি বেশ সুস্থ জীবনযাপন করছি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমি নিজেই করি। শ্রীমুখোপাধ্যায় যে হোমিও ওষুধটির (Syzygium Jumbolicum Q—কালো জামের নির্যাস) কথা লিখেছেন, সেটি দিনে ৩-৪ বার অন্তত ২-৩ মাস নিয়মিত সেবন না করলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। তবে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, তিনি যদি নিয়মিত 'কপিলাগম' (কুটিলাগম) খেতে থাকেন, তাহলে আর অন্য ওষুধের প্রয়োজন হবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু 'কপিলাগম' (কুটিলাগম) ও হোমিও ওষুধটি মাস তিনেক ব্যবহার করে পরবর্তী পর্যায়ে হোমিও ওষুধও ছেড়ে দিয়ে শুধু 'কপিলাগম' (কুটিলাগম) সেবন করে তিনি সুস্থ দেহে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ জীবন কাটাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমার জানা বহু রোগী অন্য ওষুধ না খেয়ে শুধু কপিলাগম (কুটিলাগম) নিয়মিত খেয়ে সুস্থ জীবনযাপন করছেন। তবে এইসঙ্গে অন্যান্য নিয়মগুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে পারলে আরো ভাল হয়।

কুমুদবন্ধু স্বামী
প্রযত্নে চম্পা চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যালেরিয়া অফিস
পোঃ ও জেলা—ধুবড়ি, অসম-৭৮৩৩০১
ফোন : ০৩৬৬২-২৩১৫১৪

খাদ্য ও ক্যান্সার

খাদ্য ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি কিছু খাদ্য মানুষের শরীরে নানান অসুখ সৃষ্টি করে মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। সেকারণে এই খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সচেতন থাকা একান্তই দরকার। এমন অনেক খাদ্য আছে, যা শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে সুস্থভাবে মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে। এই খাদ্য ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ অসুখকেও ঠেকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এদের মধ্যে রসুন।, বাঁধাকপি, সয়াবিন, পিঁয়াজ, গাজর, টম্যাটো এবং অন্যান্য গাঢ় হলুদ ও সবুজ সবজির মধ্যে এই বিশেষ গুণটি আছে। তাছাড়া কিছু ফল, যেমন—সাইট্রাস, যেকোন তেলা মাছ, চা, দুধ প্রভৃতির ক্যান্সার প্রতিহত করার ক্ষমতা রয়েছে। অন্যদিকে মাংস, উচ্চ স্নেহপদার্থযুক্ত খাদ্য, ভেজিটেবল অয়েল, যেমন—কর্ণ অয়েল, অতিরিক্ত মদ্যপান ক্যান্সার হতে সাহায্য করে।

আমেরিকার ন্যাশানাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের অভিমত —প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্সারই আমাদের খাবারের সঙ্গে যুক্ত। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ রিচার্ডওলেরও অভিমত—প্রায় ৬০ শতাংশ ক্যান্সারই খাদ্যবস্তুজনিত। প্রায় ১,৬৫,০০০ মানুষের ওপর পরীক্ষার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। দেখা গেছে, যারা বেশি টম্যাটো খান, তাঁদের ক্যান্সারের ভয় কম থাকে। টম্যাটোর লাল রঙের মধ্যে লাইকোপেন থাকার জন্যই এমনটা সম্ভব হয়। ডঃ হেলমুট সাই তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, এই লাইকোপেন বিটা কার্বোনেটের দ্বিগুণ ক্ষমতা ধরে। যে টক্সিক অক্সিজেন মলিকিউল ক্যান্সার হতে সাহায্য করে, এই লাইকোপেন তাকে ধ্বংস করে ফেলে। আমাদের খাদ্যে লাইকোপেনের যোগান টম্যাটো থেকেই বেশি আসে। কাঁচা বা রান্না করা টম্যাটো, টম্যাটোর সস, পেস্ট, ক্যাচাপ—সকলের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে এই পিগমেণ্ট ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। এপ্রিকট ও তরমুজেও, এটি প্রচুর পরিমাণে আছে।

ক্যান্সার থেকে বাঁচতে আমাদের খাদ্যতালিকায় রান্না করা বা কাঁচা সবুজ সবজি ও বেশ কিছু সহজলভ্য ফল থাকা দরকার। সাইট্রাস, যেমন—কমলালেবু, আঙুর, পাতিলেবু, লিমন সম্বন্ধে খাদ্য ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ টক্সিকোলজিস্ট হারবার্ট পিয়ারসন বলেছেন, সাইট্রাস ফলে ক্যান্সার প্রতিরোধের অসীম ক্ষমতা আছে। প্রকৃতিগতভাবেই এদের মধ্যে আছে ক্যারোটিনয়েড, ফ্লেভোনাইড, টারপেন্স, লিমনাইডস, কুমারিন্স ইত্যাদি, যা ক্যান্সারের কেমিক্যাল কার্সিনজেনকে ধ্বংস করে ফেলে। গবেষকরা দেখেছেন, এদের মধ্যে ৫৮ রকমের পরিচিত ক্যান্সার কেমিক্যাল ধ্বংসকারী বস্তু আছে। ডাঃ পিয়ারসনের মতে, এই সাইট্রাসে বিভিন্ন প্রকার সাইটো-কেমিক্যাল আছে—যা সফলভাবেই ক্যান্সার-রোধকের কাজ করে। কমলালেবুর এই রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতা অসীম। এতে আছে ঘনীভূত গ্লুথিয়ল, গ্লুক্যারেট ও অন্য আরো ক্যান্সার-ধ্বংসকারী বস্তু। নিয়মিত কমলালেবু খেলে পাকস্থলীর ক্যান্সার থাকে না। ক্যান্সার সম্বন্ধে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, কেননা প্রথম অবস্থায় ক্যান্সার ধরা পড়লে ৮৫ শতাংশ রোগীই প্রাথমিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। সেই কারণে প্রত্যেক মানুষেরই বছরে অন্তত একবার ক্যান্সার নির্ণয়কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো দরকার। অতি সামান্য খরচেই এই পরীক্ষা সম্ভব।

হীরেন সিংহরায়
লাভ অ্যাণ্ড কেয়ার ফাউণ্ডেশনের স্বাস্থ্য সচেতন বিভাগ
ভাসি, মুম্বাই-৪০০ ৭০৫

অধিকার

ছন্দে শ্রুত 'কথামৃত'

এক দেশে এক বৈদ্য ছিলেন, তাঁর নামডাক শুনে
দূর দূর থেকে রোগীরা আসত, যার চিকিৎসাগুণে
অনেকেরই রোগ সারে,
ধন্বন্তরী হিসাবে বৈদ্যমশায়ের যশ বাড়ে।
একদিন এক রোগী এল অনেক দূর থেকে,
বৈদ্যমশায় ওষুধ দিলেন লক্ষণগুলি দেখে।
দিয়ে বললেন—শোন, তুমি আরেকদিন এস চলে,
কি খাওয়া বারণ, সেকথা সেদিন ঠিকঠাক দেব বলে।
মাত্র কদিন পরে—
বহু দূরে থাকা রোগীটি হাজির সেই বৈদ্যের ঘরে।
বৈদ্য বলেন—খাবে সাবধানে, হাবিজাবি খেতে মানা,
গুড় খাওয়া খুব খারাপ জানবে, খাবে নাকো এক দানা।
রোগী চলে যেতে বৈদ্যের ঘরে বসে-থাকা একজন
বলল—রোগীকে আসার কষ্ট দিলেন তো অকারণ।
গুড় খেতে নেই, সেটুকু শুনতে দূর থেকে ছুটে এল,
একে রোগী, তায় আসা-যাওয়ায় কত না কষ্ট পেল!
বৈদ্য বলেন—কষ্ট দেওয়ার আছে গো একটা কারণ,
সেদিন রোগীকে গুড় খেতে আমি করব কি করে বারণ?
এই ঘরটায় গুড়ের নাগরি রাখা ছিল থরে থরে,
তাই গুড় খাওয়া খারাপ বলতে মনটা দ্বিধায় পড়ে।
আজকে রোগীকে বারণ করার পেয়েছি তো অধিকার,
নাগরিগুলোকে সরিয়ে ফেলেছি, মনে দ্বিধা নেই আর।
না হলে ও রোগী ভাবত, বৈদ্য নিজে ঠিক গুড় খান,
কাজেই বারণ যতই করি না, মানত না ও বিধান।
'আপনি আচরি... অপরে...' শেখাতে তবে মেলে অধিকার—
একথা বোঝাতে ঠাকুরের এই কাহিনীর বিস্তার।
তিনি বললেন—নিজে ভোগী হয়ে ত্যাগের শিক্ষা দিলে
সে-শিক্ষা কেউ করে না গ্রহণ, ফল মেলে গরমিলে।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

মা

করুণাময়ী, দয়াময়ী তুমিই জগজ্জননী,
তোমার আশীর্বাদেই হয় দিন ও রজনী।
মা তুমি সকলের—যথা মূর্খ-দুঃখী-দীন,
কোমলনয়না তুমি কঠোরতাহীন।
সন্তানের প্রতি আছে তোমার অসীম স্নেহ,
এমন স্নেহ নিজের সন্তানকে দেন না গর্ভধারিণী কেহ।
সন্তানেরা আসবে বলে উঠতে তুমি ভোরে,
ধুলো লাগবে বলে তুমি ঝাঁট দিতে ঘরদোরে।
ডাকাত পড়ল যখন তুমি যাচ্ছিলে কলকাতায়,
শুধরালো সেই ডাকাত সর্দার তোমার অসীম কৃপায়।
কৃপাময়ী তুমি সকলেরই জননী,
মমতাময়ী মাতা তুমি শ্রীশ্রীসারদামণি।

ছবি ও ছড়া : নবনীতা চক্রবর্তী
সপ্তম শ্রেণি, বেগম রোকিয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা

বি.দ্র. : ওপরের 'অধিকার' ছড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্পকে ভিত্তি করে রচিত। এরকম আরো অনেক ছড়া আছে—'শুকদেবের গুরুদক্ষিণা দান', 'নেমন্তন্ন বাড়িতে শুরুতে শব্দ, শেষে নিঃশব্দ', 'দাঁত গেছে তাই পাঁঠাবলি বন্ধ', 'সূর্যঘড়ি', 'বাবলা গাছ দেখে', 'মর্কট বৈরাগ্য', 'ভোলেনি সংস্কার' ইত্যাদি। আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা আগামী দুমাসের মধ্যে উপরি উক্ত সাতটি গল্প-ভিত্তিক সাদা-কালো ছবি পাঠাতে পার। মনোনীত হলে তা ছাপা হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা—
'সবুজ পাতা', প্রযত্নে—সম্পাদক, 'উদ্বোধন', ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩

আদি শঙ্করাচার্য

২৪

শিশু ও কিশোর বিভাগ

***প্রশ্ন ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন ঃ 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'', বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য কতখানি ? কৃপা করে উত্তর জানালে বাধিত হব।*

—তন্ময় বসাক, বাঁশবাড়ি, মালদা

উত্তর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ এই ''টাকা মাটি, মাটি টাকা'' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্রঃ ১ম খণ্ড, সাধকভাব, পৃঃ ৯০)। যেকোন মহাপুরুষের জীবনী আলোচনাকালে সাধারণভাবে আমরা একটা মস্ত ভুল করে থাকি। তা হলো, আমরা আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের জীবন ও বাণীর বিচার করি। বৈরাগ্যের যে চূড়ান্ত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ঘটেছিল, সংসারের প্রতি সেই অকল্পনীয় মানসিক অনীহা এবং ঈশ্বরলাভের তীব্রতম ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি হলো—''টাকা মাটি, মাটি টাকা''। এই কথার তাৎপর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের মনেও সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় স্বার্থসিদ্ধির জন্যও সংসারী মানুষ মহাপুরুষদের বাণী উদ্ধৃত করে থাকে। যে অকল্পনীয় বৈরাগ্য এবং দিব্য প্রেরণায় ঠাকুর এক হাতে টাকা এবং অন্য হাতে মাটি নিয়ে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তার কণামাত্র হৃদয়ে ধারণা করতে পারলে মানুষের সংসার-দুঃস্বপ্ন চিরকালের মতো ঘুচে যায়। অবশ্য সেই দুঃস্বপ্ন ঘোচাতে তার যদি আগ্রহ থাকে। সুতরাং এই কথার অর্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করো। মন যত শুদ্ধ হবে, শাস্ত্রবাণীর মর্ম ততই মনে পরিষ্কার ফুটে উঠবে।

***প্রশ্ন ঃ** আমরা যুবকরা পড়াশুনা, কাজকর্ম করার পর সাধন-ভজন করার ইচ্ছা থাকলেও ঠিকমতো করে উঠতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সেবাকার্য, ধর্মালোচনা প্রভৃতি অনায়াসেই করে থাকেন। আপনি কৃপা করে এর রহস্য জানালে সংশয়মুক্ত হতে পারি।*

—সোমেন রায়, গড়িয়া, কলকাতা

উত্তর ঃ স্বামীজী যাঁকে 'রামকৃষ্ণের ছাঁচ' বলে বর্ণনা করেছেন, সেই ছাঁচের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। সেই 'ছাঁচ'টি কি? যেমন, জপধ্যানের সঙ্গে কর্মের প্রয়োজন। আবার কর্ম করতে গেলে জপধ্যানের আবশ্যক। জ্ঞানবিচার থাকলে কর্ম 'বন্ধন'-এর কারণ না হয়ে 'মুক্তি'র কারণ হয়। মনুষ্যজীবনের প্রাণরস নিহিত আছে ভালবাসা এবং ভক্তিতে। সুতরাং ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা, সেবাকর্ম এবং জ্ঞানবিচারের সঙ্গে যদি ধ্যানজপ একটা রুটিন করে করা যায়, তাহলে সবকিছুরই সমন্বয় ঘটতে পারে। মঠ-মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঠিক এভাবেই অভ্যাস করে থাকেন। যেকোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট রুটিন অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে পূজা, জপধ্যান, তার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ, যেমন অর্থ-সহ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ইত্যাদির সুসমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। দৈনন্দিন সাংসারিক সমস্যা সবসময়েই থাকবে এবং সকলেরই আছে। সেই সমস্যার অজুহাতে নিজস্ব রুটিনকে বিঘ্নিত করার প্রয়োজন নেই। বরং নব উদ্যমে 'রামকৃষ্ণের ছাঁচ'-এ নিজের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে জীবনবৃক্ষের একটা নির্দিষ্ট আকারপ্রাপ্তি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : স্বামী বিবেকানন্দকে 'অদ্বৈতবেদান্তী' বলে জানি। অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে কেবল শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। সুতরাং সেবা, দান, সহানুভূতি প্রভৃতির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব থাকাতে তার সঙ্গে ঐ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হবে কি করে?

—বিপ্লবকুমার রুদ্র, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি

উত্তর : তুমি বলেছ—স্বামী বিবেকানন্দ 'অদ্বৈতবেদান্তী' ছিলেন। তাই বলে আমরাও সকলে যে অদ্বৈতবেদান্তী, তা নয়। সাধকের তিনটি অবস্থার কথা স্বামীজী নিজেই স্বীকার করে গেছেন। কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আবার কেউ বা অদ্বৈতবাদী। ঠাকুর যেমন বলতেন—"যার পেটে যা সয়।" কাজেই দ্বৈতবাদীর অন্তরে জোর করে অদ্বৈতবেদান্ত পুরে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যেমন, যার পূজার্চনা ভাল লাগে তাকে সেই কাজ স্বাধীনভাবে করতে দেওয়াই কল্যাণকর। যে অন্যের সেবা করতে চায়, তার জোর করে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে করতে যখন মনের মলিনতা দূর হয়ে চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আপনি উদ্ভাসিত হবে। ঠাকুর বলতেন : "নারকেলের বেল্লো আপনি খসে পড়বে।" সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্গে সেবা, দান, সহানুভূতির কোন বিরোধ নেই।

প্রশ্ন : (ক) স্বামীজীর 'রাজযোগ' সম্পর্কিত আলোচনার একজায়গায় অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আছে। আমার মতো অল্পবয়সী মায়েরা, যারা সংসারাশ্রমে আছি, তাদের জন্য ব্রহ্মচর্য কিভাবে প্রাসঙ্গিক এবং পালনীয়?

(খ) 'অপরিগ্রহ' বলতে আমরা কি বুঝব? অনুগ্রহ করে উত্তর দান করলে ধন্য হব।

—অজন্তা দেব (কর), তুরা, মেঘালয়

উত্তর : (ক) গত ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যার 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে তোমার প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই বলা হয়ে গেছে। মানুষের জৈবিক প্রবণতাগুলিকে সংযত করে মোড় ঘুরিয়ে উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়াকেই 'ব্রহ্মচর্য পালন' বলা হয়। মন যখন একটি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, বুঝতে হবে সে সেই বিষয়ে আনন্দ পাচ্ছে বলেই সেই পথে যাচ্ছে। মনকে সংযত করে এমন কোন দিব্যচিন্তা বা ধ্যানের বস্তু মনকে যদি উপহার দেওয়া যায়—যেখানে সে বিষয়ভোগের আনন্দ অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশি আনন্দ লাভ করতে পারে, তাহলে মন সেইদিকেই ধাবিত হবে। সুতরাং সবচেয়ে আগে দরকার নিজের ধ্যানের বস্তুকে ভালবাসা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানকালে মন তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইবে না, যদি তাঁর প্রতি মনের অসীম ভালবাসা থাকে। সংসারে নিজের চলার পথে যদি বাধা আসে, তখন কি হবে? তখন সেই ইষ্টের কাছেই আন্তরিক প্রার্থনা জানাতে হবে, যাতে সেই বাধা দূর হয়। ভক্ত ভগবানের চিন্তা করলে ভগবানেরই দায়িত্ব ভক্তের পথের কাঁটা দূর করা। 'গীতা'য় আছে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।" (৯।২২)

—অনন্যচিত্তে যাঁরা আমাকে [অর্থাৎ ভগবানকে] চিন্তা করতে করতে ধ্যান করেন, সেই নিত্যযোগযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি [অর্থাৎ ভগবান] বহন করি।

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মিক যোগস্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে তিনিই সব দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করবেন।

(খ) সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষের মনে ভগবদ্ ইচ্ছায় একটি স্বভাব পরিলক্ষিত হয়। তা হলো—'এটা চাই, ওটা চাই'। শিশুর মধ্যে এই স্বভাব শিশুসুলভ। কিন্তু পরিণত বয়সে এই স্বভাবের কারণে মন অনেকসময় অপ্রয়োজনীয় বস্তুর দিকেও ধাবিত হয়। তার পরিণাম প্রায়শই দুঃখপ্রদ হয়। 'অপরিগ্রহ' শব্দের অর্থ—মন থেকে এই 'চাই, চাই ভাব' সম্পূর্ণ নির্মূল করা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা জুটেছে তার সাহায্যে সব মানিয়ে চলাই অপরিগ্রহের একটা লক্ষণ। সাধনপথে অগ্রসর হলে সাধক বুঝতে পারেন, নিজের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তুর অধিক গ্রহণ করাই অপরিগ্রহের পরিপন্থী। অপরপক্ষে, এই পরিগ্রহ মানুষকে স্ব-স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ 'ঈশ্বর সত্য'—এই ধারণা মন থেকে মুছে গিয়ে 'জগৎ সত্য'—এই ধারণায় মন স্থিত হয়। তখন আসক্তিবশত মানুষের মন অস্থির বা চঞ্চল হয়ে পড়ে। চঞ্চল মনে কখনো শান্তি আসে না। শান্তির অভাবে সুখেরও অভাব ঘটে। মানুষ দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। তাই এই যুগে 'অপরিগ্রহ' সাধনা কেবল সন্ন্যাসী নয়, গৃহীদেরও বিশেষ উপকারী।

ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার পথে ৩২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাবিলনে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি সেলুকাস সিরিয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ভারতের গ্রিক রাজ্যসমূহ পুনরুদ্ধারের আশায় মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। গ্রিকদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সেলুকাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং তিনি পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তানের মকরান প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং তাঁর মেয়ে হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করার পর ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ মধ্য এশিয়ায় জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের বাণীপ্রচারকল্পে বেশ কিছু সন্ন্যাসী প্রেরণ করেন। ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রসারলাভ করে। মুসলমান ঐতিহাসিক ও আরবের শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ আফগানিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশে জৈনধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাসের কথা স্বীকার করেছেন। তারা আরো বলেছেন, মুহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধুজয়ের সময় ঐসমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছাড়াও জৈনধর্মাবলম্বী বহু মানুষের বসবাস ছিল। যাই হোক, মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণের সময় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হিন্দুরাজা দাহিরকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা কোনরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেনি। মুসলমান আক্রমণের সময় তারা নিষ্ক্রিয় ছিল, উপরন্তু ঐসব সম্প্রদায়ের একাংশ মুসলমানদের পরোক্ষভাবে সমর্থনও করে। এছাড়া কিছু নিম্নবর্ণের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণির পার্বত্য গোষ্ঠীর মানুষ খাদ্য ও অর্থের লোভে মুসলমান সৈন্যদলে যোগ দেয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুহম্মদ-বিন-কাশিম নামক জনৈক আরব সেনাপতির সিন্ধুবিজয় সম্ভব হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরবের মুসলিম শাসক বা খলিফা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ ওবেদুল্লা ও বুদাইল নামে দুজন সেনাপতির অধীনে সিন্ধুতে দুটি অভিযান পাঠান। ঐ দুটি অভিযানেই সেনাপতিদ্বয়-সহ বহু আরব সৈন্য নিহত হয় এবং আরবদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। আরব সৈন্যরা রাওয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। রাওয়ার জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল অদূরদর্শী রাজা দাহির পলায়মান আরব সৈন্যদের যদি পিছু ধাওয়া করতেন এবং সেই সৈন্যদের নিহত করতেন, তাহলে তারা পুনর্বার সিন্ধু আক্রমণ করার সাহস পেত না এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রবেশ

মদনমোহন সাহা

মৌর্য সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সম্রাট অশোক, কুশান নৃপতি কনিষ্ক, যশোবর্মন ও সম্রাট হর্ষবর্ধনের পর থেকে সিন্ধুরাজ দাহির পর্যন্ত আফগানিস্তান-সহ এই উপমহাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের রাজা ও রাজবংশের রাজকুমারগণ রাজত্ব করতেন। ফলে এইসব অঞ্চলে ঐসব বংশের ধর্মের প্রভাব পড়েছিল, এমনকি দেশের জনগণও সেই ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিল। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, একসময়ে ক্ষত্রিয় হিন্দু রাজা শাহশী সিন্ধুপ্রদেশে রাজত্ব করতেন। 'চাচ' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সিন্ধুতে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। চাচের পর তাঁর ভ্রাতা 'চন্দ্র' সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা চন্দ্রের পর চাচের পুত্র দাহির সিন্ধুর রাজা ও শাসনকর্তা নির্বাচিত হন। আলোর ছিল সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী। ইতিপূর্বে 'শাহী' নামে এক শক্তিশালী রাজবংশ এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, কিন্তু রাজার নাম সঠিক জানা যায়নি। তবে কাশ্মীরের বিখ্যাত রাজপণ্ডিত ও ঐতিহাসিক কলহন মিশ্র রচিত ইতিহাসগ্রন্থে দুর্লভনারায়ণের পৌত্র মুক্তাপিসা ও তার ভ্রাতা চন্দ্রপিসা এবং ললিতাদিত্য প্রমুখ কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গেছে।

সিন্ধুর ব্রাহ্মণ সন্তান রাজা দাহির বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেসময় সেখানে জৈন, বৌদ্ধ ও কয়েকটি লৌকিক ধর্মের উপজাতীয় মানুষ সিন্ধুতে বসবাস করত। তারা হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করত। তবে জৈনধর্মের প্রভাব বা জনপ্রিয়তা তেমন ছিল না। বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হওয়ার মুখে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মই ছিল দেশের প্রধান ধর্ম, এমনকি পার্বত্য উপজাতির লোকেরাও হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় বসবাস করত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বেশি থাকার ফলে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের লোকেরা পর্যায়ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকে। তাই অনেক অঞ্চলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি ছিল না। এছাড়া দাহিরের বিরুদ্ধে সিন্ধুর বৌদ্ধ ও জৈনদের কিছু অভিযোগ ছিল। রাজা দাহির বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসারের জন্য সিন্ধুতে নতুন জৈনমন্দির ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণে কোনরূপ অর্থব্যয় করেননি—এইসব অভিযোগ মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত। জৈনধর্মের ইতিহাসে এর সত্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পরপর এই পরাজয়ের প্রতিশোধহেতু হাজ্জাজ তাঁর জামাই ও ভাইয়ের ছেলে মুহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে কাশিমের জয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সিন্ধুরাজ্য তাঁদের দখলে আসেনি। আলোর, ব্রহ্মণাবাদ, দাইবুল বন্দর, নিরুন, সিওয়ান, রাওয়ার দুর্গ প্রভৃতি নগরগুলি সিন্ধুর অধিকারে ছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন রাজা দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এরপর তাঁর পত্নী রানীবাই ও এক পুত্র রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দুর্গটি রক্ষার জন্য সৈন্যদের উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি নিজেও সৈন্য-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্গের পতন আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি দুর্গের মধ্যেই প্রাণবিসর্জন দেন। তবে পরিমলদেবী ও সূর্যদেবী নামে দুই রাজকুমারী বন্দী হন।

অপরদিকে দাহিরের আরেক পুত্র আলোর দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রবল বিক্রমে মুসলমান সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করেন। প্রায় তিন-চার মাস আলোর দুর্গ দখল নিয়ে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহতের পর দুর্গটির পতন ঘটে। এইভাবে হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দ্বারা শাসিত সিন্ধুর কয়েকটি অঞ্চল আরব সৈন্যরা বলপূর্বক দখল করে। এই নগরগুলি বর্তমানে পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদের নিকট অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রাচীন নগরগুলির নাম ছিল নিরুন, সিওয়ান, সিসাম প্রভৃতি। এখানকার ৮০ শতাংশ মানুষই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি, বরং আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কারণ, বৌদ্ধরা ছিল অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করে রাজ্যজয় করা তাদের ইচ্ছা ছিল না। সেহেতু বিনা যুদ্ধে তারা দখলিকৃত অঞ্চলগুলি মুসলমান শাসকদের ছেড়ে দেয়। যদি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষরা রাজপুত, জাঠ, মেড প্রভৃতি জাতিগুলির ন্যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, হিন্দু সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করত, তাহলে সিন্ধুর বিরাট বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চলগুলি মুসলমানদের দখল করা সম্ভব হতো না।

তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সিন্ধুবিজয় মুসলমানদের সাফল্য আনতে পারেনি। রাজপুত, জাঠ, মেড ও খট্টক বাহিনী মিলিতভাবে সিন্ধুর কয়েকটি অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে পুনরায় সেখানে হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁরা হিন্দুদেবতা শিবের বাহন ষাঁড়ের প্রতীকযুক্ত মুদ্রার প্রচলন করেন।

সিন্ধুজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলেও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই জয় কোন সুদূরপ্রসারিত ফলপ্রসব করতে পারেনি। আরবরা সিন্ধু অধিকার করলেও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্যবিস্তারে ব্যর্থ হয়। কারণ, সিন্ধুর দক্ষিণদিক থেকে চালুক্য রাজ্য, পূর্বদিক থেকে গুর্জর ও প্রতিহার এবং উত্তরদিক থেকে কর্কট রাজন্যবর্গের প্রচণ্ড আক্রমণ ও বাধাদানে আরব হানাদাররা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ৭২৪ থেকে ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধগুলি সংগঠিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজনৈতিক জীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কার্যত আরবের মুসলমান শক্তিকে সিন্ধুতেই প্রায় ২৫০ বছর আবদ্ধ থাকতে হয়। কাজেই তাদের সিন্ধুবিজয়ের কোন প্রতিফলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে হয়নি। এটি এক বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলের মতে, আরবদের সিন্ধুজয় ছিল ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি সামান্য ঘটনামাত্র এবং এটি একটি নিষ্ফল যুদ্ধজয়—"Causes of the failure of Arab power in Sind." তিনি আরো মন্তব্য করেছেন ঃ "The Arab conquest of Sind is an episode; In the history of India and of Islam a Triumph without result."

'ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা ইতিহাসবিদ্ জনাব কে. আলি স্বীকার করেছেন, ৭৩৮-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে অন্তঃকলহের দরুন সিন্ধু থেকে আরব বিজেতাগণ পশ্চাদপসরণ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে আরো জানিয়েছেন, খলিফা হিশামের রাজত্বকালে 'আল-জুনায়েদ' হাবিবের পদমর্যাদা অধিকার করেন। আল-জুনায়েদের পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে সিন্ধুতে মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। জুনায়েদের পরবর্তী আরব শাসনকর্তা তামিনের সময় সুলতান ব্যতীত ভারতে আরব-বিজিত সমগ্র ভূখণ্ড মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। সেখানে পুনরায় হিন্দু রাজবংশের অধিকার কায়েম হয়। বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক এই মতকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

অমুসলিম প্রজাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ

সিন্ধুতে মুসলমান শাসকদের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর ও জিজিয়া কর। উৎপাদিত গম ও বার্লির দুই-পঞ্চমাংশ ভূমিকর হিসাবে ধার্য হতো। অবশ্য জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে এই কর ধার্য হতো, অন্যথায় তা এক-চতুর্থাংশে নেমে আসত। খেজুর, আঙুর ও উদ্যানে উৎপাদিত অন্যান্য ফলমূলের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসাবে গ্রহণ করা হতো। নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে রাজস্ব আদায় করা হতো। এসমস্ত ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো। যারা সৈন্যবিভাগের কাজ থেকে মুক্ত ছিল এবং মুসলমানদের রক্ষণাধীনে বাস করত, তাদের থেকে এই জিজিয়া কর আদায় করা হতো। মুসলমানদের জিজিয়া কর দিতে হতো না। এছাড়া যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ বা কবুল করত, তাদের জিজিয়া কর থেকে রেহাই দেওয়া হতো।

জিজিয়া কর আদায়ের উদ্দেশে মুহম্মদ-বিন-কাশিম দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম স্তরের বাসিন্দাদের বছরে ৪৮ দিরহাম ওজনের রূপো

দিতে হতো। দ্বিতীয় স্তরের লোকদের ২৪ দিরহাম এবং তৃতীয় স্তরের লোকদের ১২ দিরহাম রূপো জিজিয়া কর হিসাবে দিতে হতো। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে মুহম্মদ-বিন-কাশিম স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োগ করেন এবং তাদের নির্ধারিত হারে খাজনা আদায়ের কঠোর নির্দেশ দেন। আইন অমান্যকারী কর্মচারীকে প্রচুর সাজা ভোগ করতে হতো।

মুহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যু

সিন্ধুবিজয়ী মুহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যু সম্বন্ধে যে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, সেসম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কথিত আছে, রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর পরিমলদেবী ও সূর্যদেবী নামে তাঁর দুই কন্যাকে মুহম্মদ-বিন-কাশিম বন্দী করে খলিফার (ধর্মগুরুর) হারেমে পাঠান। এই কন্যাদ্বয় খলিফার (ওয়ালাদি) কাছে অভিযোগ করেন যে, তাঁর দরবারে আসার পূর্বে মুহম্মদ-বিন-কাশিম তাঁদের সতীত্ব হরণ করেছেন। অতএব তাঁরা খলিফার ভোগের যোগ্য নন। এই কথায় খলিফা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে কাঁচা চামড়ার থলিতে পুরে রাজধানীতে পাঠানোর আদেশ দেন। খলিফার প্রতাপ এত বেশি ছিল যে, মুহম্মদ-বিন-কাশিম এই আদেশ পেয়ে নিজেই কাঁচা চামড়ার থলিতে প্রবেশ করেন। 'তারিখ-ই-মাসুম'-এর লেখক মীর মাসুমের মতে, তিনি তিনদিন পর মারা যান। তাঁর মৃতদেহ খলিফার নিকট প্রেরণ করা হয়। কাশিমের মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষের লোকেরা খলিফার নিকট অভিযোগ করেন—সিন্ধুবিজেতা কাশিম নির্দোষ, বরং রাজকন্যাদ্বয় মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। কাশিমের পক্ষের লোকজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য অস্থিরমতি খলিফা পুনরায় হুকুম দেন—ঐ কন্যাদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে ঘোরানো হোক যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয়। কাশিমের লোকজন আনন্দের সঙ্গে খলিফার আদেশ পালন করেন। কন্যাদ্বয়ের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়।

মুহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যু সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, এই কাহিনীর পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। তবে তাঁর মৃত্যু যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা, সেসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। খলিফা ওরালিদের মৃত্যুর পর সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য মুহম্মদ-বিন-কাশিমকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁরই আদেশে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হয়, হত্যাকারীর মৃত্যু হত্যা দিয়েই ঘটে। উল্লেখ্য যে, পারস্য সুলতান বর্বর লুটেরা নাদির শাহ দিল্লির উপকণ্ঠে একদিনে দশহাজার নব মুসলমানকে (মোঙ্গল জাতির বংশধর) নির্মমভাবে হত্যা করেন। ভাগ্যের পরিহাসে প্রতাপশালী সেই নাদির শাহকে সামান্য এক গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সেইরকম ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু অঞ্চলের প্রথম বিজেতা মুহম্মদ-বিন-কাশিমকেও কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণ দিতে হয়। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হেস্টিংসেরও একই অবস্থা হয়েছিল। এটাই বোধহয় ইতিহাসের নিয়ম।

সিন্ধুবিজয়ের পিছনে আরবদের কয়েকটি উদ্দেশ্য

(১) আরব বণিকদের নিরাপদে বাণিজ্য করার জন্য সিন্ধুর বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর 'দাইবুল' হস্তগত করা। খুব সম্ভবত করাচি বন্দরটি প্রাচীনকালে 'দাইবুল' বন্দর নামে পরিচিত ছিল।

(২) আরবদের বহুদিনের আশা ছিল—ঐশ্বর্যপূর্ণ ভারতের মন্দিরগুলিতে সঞ্চিত ধনরাশি ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ বা লুণ্ঠন করে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া।

(৩) যেকোন উপায়ে বিশাল ভারতীয় ভূখণ্ডে অমুসলিম জনগণকে ইসলামধর্মের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা ও ইসলামধর্মের প্রসার ঘটানো।

(৪) ভারতের উর্বর জমি এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে সারা বছর সহজেই খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে—এই আশায় মরুভূমি অঞ্চলের আরবদের ভারত অভিযান।

হিন্দু রাজাদের পরাজয়ের কারণ

(১) সেসময়ে ভারতে কোন ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকার না থাকা।

(২) শক্তিশালী জাঠ ও রাজপুত বাহিনী থাকলেও তাদের মধ্যে অনৈক্য ছিল।

(৩) পুরনো সমরাস্ত্র ব্যবস্থা ও নতুন ধরনের সমরাস্ত্র তৈরি না করা।

(৪) আরবদের দ্রুতগামী ঘোড়া-উটের ব্যবহারের কাছে মন্থরগতি হস্তিবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করা। এছাড়া আরবদের নৌবহরের তুলনায় দাহিরের নৌশক্তি পর্যাপ্ত ছিল না।

(৫) আরব মুসলমানদের দলে নাম লেখালে জীবিকা ও অর্থ উপার্জন করতে পারবে—এই আশায় পার্বত্য উপজাতির লোকেরা স্বধর্ম ত্যাগ করে কাশিমের দলে নাম লিখিয়েছিল। এইসব উপজাতি বাহিনী নিয়েই মুহম্মদ-বিন-কাশিম সিন্ধুজয় করেন। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) চিরন্তন ভারত—নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র ও লাডলিমোহন রায়চৌধুরী

(২) মুসলিম মুদ্রা, হস্তলিখন শিল্প—ডঃ ইয়াকুব আলি, রাজশাহী, ঢাকা একাডেমি, বাংলাদেশ

(৩) পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস—জবাব কে. আলি, ঢাকা, বাংলাদেশ

(৪) Indian Coins—Dr. P. L. Gupta

(৫) A Short History of Muslim Rule in India—Iswari Prasad

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

যার মনে যা, লাফ দিয়ে ওঠে তা

স্বামী গোপেশানন্দ

সাধারণত আমরা যা বুঝি, তার থেকে যা বুঝি না তাতে অনেক বেশি আনন্দ পাই। সিদ্ধাই আমরা বুঝি না, অথচ মহাপুরুষ বাদে অন্যান্যদের এর জন্য কী প্রচণ্ড আকর্ষণ! কত রথী-মহারথী এর জন্যই রসাতলে গেছেন এবং কতজনের যে সর্বনাশ করেছেন তার খবর কজনে জানে? যে-যাদুখেলা আমরা বুঝি না তাতে যেমন আনন্দ পাই, জানা যাদুতে তেমন আনন্দ পাই না। এর জন্য বোধহয় যা বুঝি তা বলে বা লিখে তেমন আনন্দ পাই না, যেমন আনন্দ পাই যা বুঝি না তা লিখে বা বলে। 'উদ্বোধন'-এর সদা ক্ষমাশীল পাঠকবর্গ আমার বক্তব্য বুঝতে পারলে যে তাঁদের আনন্দের হানি হবে, সেবিষয়ে সতর্ক আছি বলে আজ আলোচনার বিষয় হচ্ছে—'যার মনে যা, লাফ দিয়ে ওঠে তা'। অর্থাৎ নানারকম উল্টোপাল্টা চিন্তা। এই উল্টোপাল্টা নানান চিন্তা ভক্ত-সমাজে প্রকাশ করার সাহস যুগিয়েছে—উল্টো অক্ষরে 'মরা' জপে বাল্মীকি।

আমরা নানা ভাবের মানুষকে নানা ভাবে দেখি, কিন্তু প্রত্যেককে পৃথক ভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। পরিশ্রম লাঘবের জন্য সকল মানুষকে আমি আপাতত দুই ভাগে ভাগ করছি। এর মধ্যে পাগল থেকে মহাপুরুষ—সকলেই আছেন। কেউ যাতে বাদ পড়ে গোঁসা না করেন, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি। দুই ভাগে ভাগ না করে এক ভাগেই শেষ করলে কোন বৈচিত্র্য থাকত না, কোন পরিশ্রম করতে হতো না, চুপ হয়ে যেতাম, আপনারাও আমার হাত থেকে রেহাই পেতেন। পাঠকবর্গের দুর্ভাগ্য, তা হলো না। প্রথম ভাগে রেখেছি তাঁদের—যাঁদের মন এলোমেলো, সদা চঞ্চল। পৃথিবীতে এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এঁদের কথা প্রথমে বলব। আরম্ভ করছি একটি শোনা গল্প দিয়ে।

মহাষ্টমীর দিন জোড়হাত করে এক মাতাল বলছে—দুর্গা রে দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক; কার্তিক? অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, মাঘ; মাগ? ছেলে, পিলে; পিলে? যকৃৎ; যকৃৎ? আমাশা, মাথাব্যথা, কাশী; কাশী? বৃন্দাবন, দ্বারকা, বাগদাদ; বাগদাদ? আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না; চায়না? বেলেডোনা, নাক্সভোমিকা, রাক্সটক্স...। আপনারা মাতালের তথা পাগলের কাণ্ডজ্ঞান জানলেন। আমরাও অনেকে দিনরাত এভাবেই চলেছি। এমন কেন হচ্ছে তার অনুসন্ধানে মনোবিজ্ঞানীরা নিযুক্ত আছেন। থুড়ি—ভুল হলো, কেন এমন হচ্ছে তা তাঁরা খুঁজছেন না; কি নিয়মে এমন হচ্ছে সেটি তাঁরা আবিষ্কার করতে চাইছেন। নিয়ম ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু বোঝেন না, নিয়ম একটা চাই-ই চাই, তা না হলে তাঁদের তৃপ্তি হয় না! ভক্তেরা বলেন—ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মে সবকিছু চলছে, হচ্ছে এবং আরো বলেন—যিনি নিয়ম করেছেন তিনি নিয়ম পালটাতেও পারেন; কারণ তিনি জড় নন, তিনি কোন নিয়মের অধীন নন। হায় ভগবান! দাঁড়াই কোথায়? তুমিও যে পাগল দেখছি!

কবি উপলব্ধি করেছেন ঃ "বাসনার বশে মন অবিরত, ধায় দশ দিশে পাগলের মতো।" আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারি, আমরা সকলেই এক একজন সনাতন পাগল—কেউ বিখ্যাত পাগল, কেউ অখ্যাত পাগল, কেউ বদ্ধ পাগল, কেউ হাফ পাগল, আর কেউ মুক্ত পাগল। তা না হলে যিনি অচল, অটল, সুমেরুবৎ—তাঁর পাগল হওয়ার আহ্লাদ হবে কেন? প্রমাণ? তিনি নিজেই গাইছেন ঃ "আমায় দে মা পাগল করে।"

সত্যি! তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে সহস্র প্রণাম।

এবার দ্বিতীয় দলের কথা, এঁরাও পাগল তবে 'জাতে মাতাল, তালে ঠিক'। একটা প্রচলিত কথা আছে—'যার মনে যা লাফিয়ে ওঠে তা'। এই দ্বিতীয় দলকে সেই দিক দিয়েও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এবার পরের মুখে ঝাল না খেয়ে আমার নিজ চোখে দেখা ঘটনা আপনাদের কাছে বিচারের জন্য পেশ করছি। সাক্ষ্য দেওয়ার লোক আছে। এখনি নাম প্রকাশ করছি না।

আমেরিকা থেকে মিঃ ফুচু যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পাচক তাঁকে প্রসাদ ও চা দেওয়ার পর কথায় কথায় বললাম, এর বাড়ি কামারপুকুরে। এই কথা শুনে ফুচু সাহেবের মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাচকের সঙ্গে তিনি আলাপ করতে চাইলেন। আমি বললাম, এ ইংরেজি জানে না, বাঙলা বলতে পারে। আর যাবে কোথায়! ইংরেজি জানে না! দেবভাষায় কথা বলে! বিহ্বল সাহেব পাচককে আলিঙ্গন করে হাতের ঘড়িটি তার হাতে পরিয়ে দিলেন। আমি স্থিরনেত্র, পাচকের চোখে মুখে আনন্দধারা।

সাহেব আমার বড় উপকার করলেন! পাচক আর বাঙালি অতিথিদের পাত্তা দেয় না, অবাঙালিদের পিছনে

ঘুরঘুর করে আর বোঝানোর চেষ্টা করে তাদের চোদ্দ-পুরুষের বাস কামারপুকুরে এবং কেউ ইংরেজি জানতেন না, এখনো জানেন না। আর আড়ালে আমাকে কৃপণ বলে গালি দেয়।

ইংরেজি না জানা ও বাঙলাতে কথা বলার মাহাত্ম্য কখন কোথায় দরকার—সেটা গ্রামের মানুষ ও তাদের প্রতিনিধিরা যতটা ভাল বোঝেন, শহরের মানুষ ততটা ভাল বোঝেন না। যাই হোক, মিঃ ফুচুকে দেখে যদি আপনারা সিদ্ধান্ত নেন, 'যার মনে যা, লাফ দিয়ে ওঠে তা' সর্বতোভাবে, সর্বদেশে, সর্বজনের জন্য সত্য, তাহলে আমি খুশিই হব।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আপনাদের জানা বিষয় আপনাদেরই মনে করিয়ে দিতে চাই। ভগবান শ্রীচৈতন্য পথে চলতে চলতে শুনলেন, এই মাটিতে খোল তৈরি হয়। আর যাবে কোথায়! সেই খোলে হরিনাম-সঙ্কীর্তন হয় ভেবেই 'হরি হরি' বলে দুবাহু তুলে অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতে করতে একেবারে অন্তর্দশা! ভগবান যখন ভক্ত হয়ে বিলাস করেন, তখন তাঁরও এমনই অবস্থা হয়!

আপনাদের জানা আরেকটি কথা বলি। একটি মানুষ সমুদ্রে ডুবেছিল, কিন্তু যেকোন কারণেই হোক, না মরে লঙ্কায় সমুদ্রের তীরে পৌঁছে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এখবর মুখে মুখে লঙ্কায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। রাক্ষসেরা নৃত্য করতে লাগল, কারণ বহুদিন পরে তারা জিভের স্বাদ বদলাবে। যারা নরমাংস খায়—তাদেরকে বোধহয় 'রাক্ষস' বলে। এর জন্য এদের নিন্দা করা উচিত নয়। এদের কাছেও আমাদের জানার ও শেখার অনেক কিছু আছে, অবশ্য যদি আন্তরিকভাবে শিখতে চাই। যেসময়ের কথা বলছি, সেই সময় তাদের ঐশ্বর্য ও ভোগের ব্যবস্থা এমন ছিল যা আজ পৃথিবীর লোক চিন্তাই করতে পারে না। বর্তমানে যাঁরা ভোগে ও ঐশ্বর্যে শীর্ষে, বীরদর্পে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন—তাঁরা লঙ্কার রাক্ষসদের কাছে গোষ্পদতুল্য। এখন অবশ্য সেই লঙ্কা নেই। হনুর লেজে আগুন দেওয়ার জন্য সে রাগ করে স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছে। বলবানের লেজে আগুন দিয়ে রাক্ষসেরা মহাভুল করেছিল। অবশ্য হনুরও মুখ পুড়েছিল। ক্রোধের ফল এমনই হয়, ইতিহাসে তাই বলে। যাই হোক, আমি এখন একটু নরমাংসের গুণকীর্তন করব। আপনারা মন বজ্রের মতো কঠিন করে অবধান করুন। গুণকীর্তনে আমি কৃপণ নই, তবে বড় দরিদ্র। নরমাংস সম্বন্ধে কতটুকু আর জানি, যদিও জন্ম থেকেই এর সঙ্গে বাস করছি।

আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন, স্বাদে গন্ধে এমন মাংস ত্রিভুবনে আর নেই। একবার যে খেয়েছে সে মজেছে। প্রচলিত প্রবাদই তো রয়েছে—"সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ তাহার উপরে নাই।" বুদ্ধির অভাবে এই মহামূল্যবান মাংস প্রত্যহ চিতায় কিংবা মাটির তলায় নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে এই মাগ্‌গি-গণ্ডার যুগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর অপচয় দেখে সমাজসেবকরা কি করছেন তা তো বোঝা যায় না। অথচ এই কিছুদিন আগেও ফিজি দ্বীপের লোকেরা বুড়ো বাপকে রান্না করে ভোজ লাগাত। বর্তমান যুগের সমাজসেবকরা তথা 'সোস্যাল ওয়ার্কার'রা কি গরুর থেকেও অধম হয়ে গেলেন? আমার স্বভাববশত এবার আমাকে একটু গরুর গুণগান গাইতে দিন। আমার মতে, গরুর মতো 'সোস্যাল ওয়ার্কার' আর নেই। গরু খায় কি? ঘাস। দেয় কি? দুধ। চামড়া তো আজ মহামূল্যবান বস্তু। প্রয়োজনে অনেকে একে অবলীলাক্রমে ভোজনও করে। হাড়ে হয় সার, নাড়ি-ভুঁড়ি ধনুরীর হাতিয়ার। আর চাই কি!

তাহলে আমি এবার পূর্ব প্রসঙ্গে যাই। আপনারা জানেন, 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্'। যদি মৃত্যুকে যথার্থভাবে

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

স্বামী ঈশানানন্দজী তাঁর মাতৃস্মৃতিতে লিখেছেনঃ "কলিকাতা যাইবার পথে মা কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিজ হাতে ঠাকুরের ও নিজের ফটো দুইখানি বসাইয়া বিশেষ পূজা করিলেন এবং কিশোর দাদাকে দিয়া হোম ও অন্যান্য ক্রিয়া করাইলেন।" কোয়ালপাড়ায় এই নবনির্মিত আশ্রম সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "কোয়ালপাড়া হলো আমার বৈঠকখানা। এইসব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ।" শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে এবার কোয়ালপাড়ার সেই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরগৃহটি দেখা যাচ্ছে।

ভালবাসতে পারেন, তাহলে একবার চিতার পাশে দাঁড়িয়ে দেখবেন, কী সুন্দর মড়াপোড়ার গন্ধ! এ-গন্ধের কাছে আতরের গন্ধ অতি তুচ্ছ, অতি বোঁটকা। আমাদের জানা একমাত্র সার্বজনীন বস্তু হচ্ছে 'মৃত্যুভয়'। এই মৃত্যুকে ভালবাসতে পারলে মৃত্যুরূপা মা কালী হাতের মুঠিতে! তখন মার গলায় হার হয়ে ঝুলতে পারবেন। যাই হোক, জ্যান্ত শরীরে ঐ চিতায় অনুগ্রহ করে এখনি উঠবেন না। উঠলে পরে ভুল বোঝাবুঝি হবে। নবজাগরণের ধুয়া তুলে আধুনিকারা কোরাস গাইবেন—এবার উল্টোপুরাণের পালা, সতীদাহ রদ করে মোরা পতিদাহ শুরু করেছি। এবিষয় আর নয়, এবার লঙ্কায় যাই।

রাক্ষসরা তো আনন্দে নৃত্য করছে, আর ওদিকে বিভীষণ ধুমধাড়াক্কা করে ঐ মানুষটিকে নিয়ে এসে হাজার এক উপচারে পূজা আরম্ভ করে দিল। কারণ, ভগবান স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র-রূপে অর্থাৎ মানুষের ছদ্মবেশে এসেছিলেন, তাই মানুষকে দেখেই রামচন্দ্রের কথা মনে পড়া এবং তারপর রামময় হয়ে যাওয়া। সুতরাং বিভীষণ একজন ভক্ত।

তাই যাঁরা নারীমূর্তি দেখামাত্র মনে করেন, এই মূর্তিতেই ব্রহ্মময়ী ওরফে আদ্যাশক্তি ওরফে মা কালী ওরফে জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদা এসেছিলেন, তখন তাঁদের মন হোমাপাখীর মতো চোঁচা শ্রীশ্রীমায়ের দিকে দৌড়াতে থাকে। তখন তাঁকে 'ভক্ত' বলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এমনই হতো। তাই স্বামী বিরজানন্দজী ঠাকুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ "স্ত্রীষু নিত্য-মাতৃরূপ-শক্তি ভাব ভাবুকম্। জ্ঞান-ভক্তি-ভুক্তি-মুক্তি-শুদ্ধ-বুদ্ধি-দায়কং। তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্।।" ❑

শব্দচেতনা ২৬

স্বামী বিবেকানন্দের রচিত কবিতা ও স্তোত্র অবলম্বনে রচিত শব্দছক।

■	১	■	■	■	■	২	■	৩	■
৪			৫	■	৬		■	৭	
■		■		■	■		■		■
৮		■	■	৯	১০	■	১১		১২
■	১৩		১৪	■	১৫	১৬	■	■	
১৭	■	■	১৮	১৯	■	২০		২১	■
২২	২৩		■	২৪		■	■	২৫	
■		■	২৬	■	■	২৭	■		■
২৮		■	২৯		■	৩০			
■		■		■	■	■	■		■

পাশাপাশি ঃ (৪) নিঃশেষে নিভিছে ——, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ (৬) খেলা —— হলো শেষ (৭) ঐ দেখ, আসে মহাবেগে/ মহাশক্তি, যাহা —— নয় (৮) হও তুমি চল-স্রোতস্বতী ——/ স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত (৯) অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু —— বিদ্যমান (১১) তরু ও প্রস্তরসম চেতনাবিহীন/ আর একদিকে তার —— পতন (১৩) ঘুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয়/ —— না দোষী কেহ আর (১৫) সেথা —— বহে কারণ-ধারা (১৮) পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে হায়/ ভগ্ন তার —— আশা (২০) —— জনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ (২২) অতীত জীবনধারা নাই তাঁর মাঝে/ অথবা আগামী কোন —— মরণ (২৪) তবু তারা প্রস্তর ও —— হয়ে থাকে (২৫) লভিয়ে সেই সাগরে জনম/ —— ঘোর রোলে ছাইল গগন (২৮) সমুদ্র সংগ্রামে দিল ——, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি (২৯) বঞ্চন ——কাঞ্চন, অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ (৩০) ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু/ আমি ছাড়া —— —— নয়।

ওপর-নিচ ঃ (১) করালি! —— —— নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে (২) এ জাতির জনয়িতৃগণ-/ সত্যের —— যাঁরা সবে (৩) —— দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ/ চিরশান্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ। (৫) জয়ে গণি হীন ——বলে/ আমি ছাড়া দোষী কেহ নয় (১০) ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, —— পদে অনুরাগ (১২) পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে —— পথ পালাবার (১৪) ধরিয়ে বাসনা —— উজালা (১৬) —— স্বরস্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ (১৭) কেন্দ্র যার 'অহমহমিতি'/ ——স্বয় বাহির অন্তর (১৯) যত উচ্চ তোমার হৃদয়, —— দুঃখ জানিহ নিশ্চয় (২১) নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা —— —— (২৬) 'স্বার্থ' স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির —— (২৭) ফাটে গোলা লাগে —— গায়/ কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতি।

জয়দীপ ঘোষ

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম কার্তিক ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এক অভিনব উদ্যোগ

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়
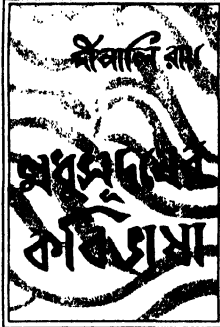
মধুসূদনের কবিভাষা
দীপালি রায়
প্রকাশক ঃ
মন্মথ দাশ
মহাদিগন্ত, বারুইপুর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
মূল্য ঃ ৩০০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৩৮২
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৯

মধুসূদন দত্তের কল্পলোকাশ্রিতা ভাষাকে বলতে হয় ব্যাকরণের নিগড়-ভাঙা আর্ষ ভাষা, শিষ্ট ভাষা এবং স্বাধীন ভাষা। তাঁর ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ তথা বাঙলা ভাষা-জাগরণের প্রাণস্বরূপ। সেযুগের ভাষা-জাগরণকে কেন্দ্র করে কবি মধুসূদনের ভাষা আপন বেগোচ্ছাসে আপন কলেবর বিস্তার করেছিল। মধুকবির মধুভাষার এক গবেষণামূলক আলোচনা উপহার দিয়েছেন অধ্যাপিকা ডঃ দীপালি রায় ছয়টি অধ্যায় সম্বলিত **'মধুসূদনের কবিভাষা'** শীর্ষক গ্রন্থে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমাংশে নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে কবিমানসের প্রতিক্রিয়া, নবজাগরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং বিবরণ প্রদানকালে প্রসঙ্গক্রমে সংযোজিত হয়েছে নানা কাব্যোক্তি, সু-উক্তি এবং কবি মধুসূদনের অতি নিকট বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর প্রতি কবি মধুসূদনের লেখা পত্রাংশ। নানা তথ্যে ভরপুর গ্রন্থের প্রথমাংশটি পাঠকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগায়।

শব্দ ও ছন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা বীজ আর অঙ্কুরের সম্পর্কের মতো। প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শংসাপত্র-সম্বলিত এই গ্রন্থটি পড়ে মনে হয়, লেখিকা সেই অমিতব্যয়ী শব্দবিলাসী মধুকবির কবিত্বকে খণ্ডিত করে শুধু তাঁর লেখনীপ্রসূত কাব্যের বেড়ায় বেঁধে দিয়েছেন। গ্রন্থাবয়বে কবিকৃত নাটক, প্রহসন, সনেট ইত্যাদির ভাষা-গবেষণা স্থান পেলে ভাল হতো। পাঠকবর্গ আরো আনন্দিত হতেন। লেখিকা কবি মধুসূদনের লেখনীপ্রসূত শব্দের যে-তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে অধুনা লোকমুখে প্রচলিত তৎসম শব্দও স্থান পেয়েছে। মনে হয় 'অজ্ঞান' শব্দটি ঐ তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। খাঁটি বাঙলা শব্দের কথা বলতে গিয়ে 'ইস্কুল' শব্দের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১২৬) লেখিকা। আবার সু উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের তালিকায় (পৃঃ ১৫২) 'সুরেন্দ্র', 'সুরপতি', 'সুরসৈন্য' ইত্যাদি শব্দের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা ডঃ রায় তার পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। 'কালানল' ইত্যাদি শব্দ 'অনুবাদসূত্রে প্রচলিত বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের অনুরূপ বাঙলা শব্দের প্রয়োগ' (পৃঃ ২৪৯) হওয়া বোধহয় সমীচীন নয়। 'কালাগ্নিসদৃশঃ তেজে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ'—এই কবি-উক্তিই তার প্রমাণ। 'কালাগ্নি' আর 'কালানল' একই অর্থ প্রকাশ করে। আসলে সমালোচনা একটু না করলেই নয় বলে একথাগুলির উল্লেখ করা হলো। ডঃ রায়ের গবেষণালব্ধ মন্তব্য অনুধাবন করে মধুকবির শব্দচেতনার সঙ্গে ছন্দচেতনার সম্পর্ক বিষয়ে অনেক তথ্য আমরা জানতে পারি।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কবি মধুসূদন দত্তের সংস্কৃত শব্দানুরাগ একটি গবেষণার বস্তু। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়ক বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে তৎসম শব্দের তালিকা-সম্বলিত অধ্যায়ব্যাপী শব্দতালিকা পাঠকবর্গের কাজে লাগবে, যদিও মুদ্রণপ্রমাদ কিছু রয়ে গেছে। এই গ্রন্থে শব্দের 'সংস্কৃতিকরণ'কে কবিমানসের বিশেষ প্রবণতা বলা হয়েছে (যথা—দানব-দমনী)। মনে হয় মুদ্রণপ্রমাদেই 'সংস্কৃতীকরণ' শব্দটি 'সংস্কৃতিকরণ' হয়ে গেছে। লেখিকার গবেষণায় একটি সত্য বস্তু ধরা পড়েছে। কবি মধুসূদন ছিলেন ইউরোপীয় জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি লোভাতুর। (পৃঃ ৮৩) সেকালের হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র মধুসূদন বিলাতী কায়দায় কৃতবিদ্য ছিলেন বলেই হয়তো তাঁকে 'লোভাতুর' বলা হয়েছে। কিন্তু রাবণের বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের বিপরীতে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে বিদেশী অনুপ্রবেশকারীর মোড়কে সাজিয়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। কবি মধুসূদনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে বিধৃত হয়নি, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক বড় মাপের ছিল।

সার্বিকভাবে এই গ্রন্থটি পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদনে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখিকার এই অভিনব উদ্যোগের জন্য তিনি যথার্থই অভিনন্দিত হবেন, সেব্যাপারে সন্দেহ নেই। ❑

*

ভ্রমণসাহিত্যের গাইডবুক

সুকান্ত বসু
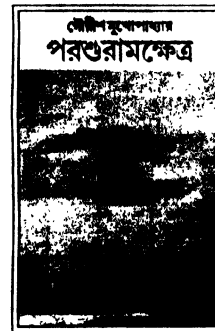
পরশুরামক্ষেত্র
গৌরীশ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ
গৌরীশ মুখোপাধ্যায়
মধুমিতা প্রকাশন
৪/এইচ২/১৩৩ হো চি মিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৬১
মূল্য ঃ ৫০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ২১২
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৮

ধর্মীয় ভ্রমণসাহিত্য ইতিহাসের আর্ট গ্যালারিতে এক নব সংযোজন 'মাস্টারমশাই' গৌরীশ মুখোপাধ্যায়ের **'পরশুরামক্ষেত্র'** গ্রন্থটি। লেখার মুনশিয়ানায় ভ্রমণপিপাসু পাঠকের

যেমন গ্রন্থটি ভাল লাগবে, অন্যদিকে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাজে এটি বিশেষ সহায়ক হবে।

৪২-এর দুকূলপ্লাবী আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়া বর্ধমানের বেলেগুা নামে এক অখ্যাত গ্রামের এই প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় পীঠস্থানে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থটিতে।

গ্রন্থখানি নিছক ভ্রমণসাহিত্য নয়, এটি একটি তথ্যমূলক গ্রন্থও বটে। লেখক অনাবশ্যক সাল-তারিখের মিছিলকে বাদ দিয়ে পরশুরামক্ষেত্র ভ্রমণের বিবরণ সিক্ত করেছেন গল্পকথায়। ফলে এটি শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া মুশকিল। তাই সব দিক থেকেই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে ধর্মীয় ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাসে এক জীবন্ত পর্ব। ভ্রমণপ্রিয় পাঠক অবশ্যই লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন এই ধরনের একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনার জন্য।

লেখক গ্রন্থটিতে পশ্চিমের মালাবার উপকূল বরাবর নানা দর্শনীয় স্থান-সহ কন্যাকুমারিকার সাগরতীরে শ্রীপদপরাইয়ের ওপর স্থাপিত বিবেকানন্দ শিল্প-স্মারক মন্দির, অন্তরীপের মাইল-খানেক উত্তরে গড়ে ওঠা বিবেকানন্দপুরম, দেবী কুমারীর মন্দির এবং বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। উল্লেখ করেছেন সাম্প্রতিক নানান পট পরিবর্তনের এক চালচিত্র। এর সঙ্গে আদি শঙ্করের জন্মস্থান কালাডির ভ্রমণবর্ণনার ভঙ্গিটি চমৎকার। স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে উপনীত হয়েছিলেন কন্যাকুমারিকায়, অধ্যাত্ম ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীপাদপরাইয়ে ধ্যানস্থ হয়ে—সেই স্থানটির কথা লেখক সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বর্ণনায়।

গ্রন্থে রয়েছে মোট ২১টি পরিচ্ছেদ। তার মধ্যে কালাডি, পুথেন মালিগা প্যালেস মিউজিয়াম, থিরুবনন্তপুরম (চিড়িয়াখানা), থিরুবনন্তপুরম (শ্রীচিত্র আর্ট গ্যালারি), কন্যাকুমারী—এই পরিচ্ছেদগুলি থেকে পাঠক অনেক না-জানা তথ্য পাবেন।

এই গ্রন্থে পাঠকের উপরি পাওনা—২৯টি মূল্যবান সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। গ্রন্থটিতে প্রখ্যাত শিল্পী পুর্ণেন্দু রায়ের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা অসাধারণ। ছাপা সুন্দর, বাঁধাইও ভাল।❑

তথ্যের পাশাপাশি বিশ্লেষণও কাম্য

সন্তোষকুমার দত্ত

প্রসঙ্গ—ইতিহাস
(ভারতীয় ও ইউরোপীয় দৃষ্টিতে)
প্রণয়বল্লভ সেন
প্রকাশক ঃ
প্রণয়বল্লভ সেন
'কমলা নিলয়'
৩এ, নেবুবাগান লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৩
মূল্য ঃ ১৮ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১৬+৪৮
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৭

ভূমিকা, সূচীপত্র, গ্রন্থপঞ্জী এবং শুদ্ধিপত্র বাদে সাকুল্যে ৪৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ **'প্রসঙ্গ—ইতিহাস'**। এর মুখবন্ধে লেখকের মন্তব্য ঃ "যতদূর জানি, নিছক ইতিহাসকে অবলম্বন করে 'তাত্ত্বিক' পুস্তক বাঙলা ভাষায় রচিত হয়েছে মাত্র তিনটি।" নামগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন—(১) অতীন্দ্রনাথ বসুর 'ইতিহাস দর্শন', (২) সুশোভনচন্দ্র সরকারের (ছদ্মনাম—অমিত সেন) 'ইতিহাসের ধারা' এবং (৩) প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি'। কিন্তু গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য স্ববিরোধী। প্রথম গ্রন্থখানি সম্বন্ধে তাঁর মত—লেখক "বিষয়বস্তুরূপে ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করার কোন প্রচেষ্টা করেননি।" দ্বিতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "ইতিহাসের ধারায় বিশেষ একটি মতবাদের ধারা অবলম্বিত হয়েছে—বিষয়বস্তুরূপে ইতিহাসের সামগ্রিক বিচার কেন জানি না, তিনি করেননি।" আর শেষ গ্রন্থটি "মূলতই দর্শনের পুস্তক—ইতিহাস গৌণ বলেই মনে হয়েছে।" তা যদি হয় তবে ইতিহাস অবলম্বনে 'তাত্ত্বিক' গ্রন্থের মর্যাদা এগুলি পায় কি? অবশ্য একথা সত্য, ঐতিহাসিক সুশোভনচন্দ্র সরকার তাঁর 'ইতিহাসের ধারা'র পঞ্চম সংস্করণের মুখবন্ধে বলেছেন ঃ "বইখানি পণ্ডিতমহলের জন্য নয়, তাঁরা অনেক জানেন,... এই লেখা কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য।" সেই কারণে একে 'তাত্ত্বিক পুস্তক' অভিধায় আখ্যায়িত করা যায় কিনা সন্দেহ; কারণ ঐ গ্রন্থের ১১টি অধ্যায়ে লেখক কোন তত্ত্বালোচনা করেননি, সহজভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

লেখক তাঁর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানিকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বর্ণনায় তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে তথ্যের উল্লেখে তাঁর যতখানি আগ্রহ, সেইসব তথ্যের আনুপাতিক বিশ্লেষণে ততখানি উদ্যম অনুপস্থিত। তবু নির্দ্বিধায় বলা যায়, দু-একটি ক্ষেত্রে তিনি সফল। 'ভারতের secularist communist ঐতিহাসিকদের' সম্বন্ধে (পৃঃ ২২) এবং ইসলামধর্মী ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে তাঁর তথ্য ও ব্যাখ্যা (পৃঃ ২৬) রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি মনে করিয়ে দেয়—"চেঁচিয়ে কথা বলা আর সত্যকথা বলা এক নয়।" লেখক এখানে উচ্চকণ্ঠ নন, বরং নম্রভাবে সত্যকথা প্রকাশ করেছেন।❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

● **ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—কার্তিকচন্দ্র সাহা**। প্রকাশক ঃ লাবণ্যপ্রভা সাহা, 'মাতৃ-নিকেতন', ১৭৪ প্রফুল্ল নগর, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১৭৬। মূল্য ঃ ৪৫ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ১৪০৮।

● **সারদা অন্তর্যামিনী—স্বরাজ মজুমদার**। প্রকাশক ঃ মিতা মজুমদার, লোকসংগ্রহ প্রকাশন, ১৬/১ কিষণপুর (রাজপুর), দেরাদুন-২৪৮০০৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ২৮+৪। মূল্য ঃ ১৫ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০২।

● **মৃত্যুরহস্য—স্বামী অভেদানন্দ**। প্রকাশক ঃ স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯এ এবং বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ২৬৪। মূল্য ঃ ৭০ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০২।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ব্যাঙ্গালোর মঠ (কর্ণাটক)ঃ গত ৩০ মে থেকে ১ জুন ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিবেকানন্দ বালক সঙ্ঘ'-এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৩,০০০ বালক ও ভক্ত এবং ২০ জন সাধু যোগদান করেন।

চেন্নাই মঠ (তামিলনাড়ু)ঃ গত মে মাসে ৮-১৫ বছরের বালক-বালিকাদের জন্য একটি শিক্ষণশিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে প্রায় ৪০০ বালক-বালিকা অংশগ্রহণ করেছিল। ভজন, স্তোত্রপাঠ, যোগাসন ইত্যাদি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। এছাড়া, এই মঠ টিরুভারুর জেলায় সাড়ে তিনমাসব্যাপী ১৮ জন দরিদ্র বালিকার জন্য একটি 'নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স' পরিচালনা করে।

তমলুক মঠ (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ২৪ ও ২৫ মে ২০০৩ যথাক্রমে যুব ও ভক্ত-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সুমনসানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী ও স্বামী বিধানানন্দজী। সম্মেলন-দুটিতে স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। যুব ও ভক্ত-সম্মেলনে যথাক্রমে ৩২৫ জন যুবপ্রতিনিধি ও ৩৫০ জন ভক্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বারাসত মঠ (কলকাতা-১২৪)ঃ গত ৯ জুন ২০০৩ মঠের চিকিৎসালয়ের নতুন গবেষণাগারের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ পরিচালিত ২০০৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ফলাফলঃ **সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের** একটি ছাত্র ৩য় স্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া **বরানগরের** ১৪৫ জন, **মালদার** ৮৫ জন ও **রহড়ার** ১৯৪ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'স্টার' পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের পরিসংখ্যানঃ **আসানসোল**—৮৭/১২৬, **বরানগর**—১০৫/১৪৫, **কামারপুকুর**—৩৪/৭৬, **কাটিহার**—১৪/৮৯, **মালদা**—৭৬/৮৫, **মনসাদ্বীপ**—১৬/৭৩, **মেদিনীপুর**—৬৩/৯৫, **পুরুলিয়া**—৬৬/৮৩, **রহড়া**—১৫৭/১৯৪, **রামহরিপুর**—৩২/৭৫, **সারগাছি**—২৬/৭২, **সরিষা** (দুটি বিদ্যালয়)—৭৫/২৭৪, **টাকি**—১১/৫৮।

নরেন্দ্রপুর মিশনের ছাত্রকৃতিত্বঃ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সম্প্রতি প্রকাশিত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ—

মাধ্যমিকঃ পরীক্ষার্থী—১২৩, স্টার—১১৮, প্রথম বিভাগ—১২৩। নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের ১০ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই 'স্টার' পেয়েছে। **উচ্চ মাধ্যমিকঃ** ১ম, ৩য় (যুগ্ম), ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ১০ম স্থান। পরীক্ষার্থী—১৪৯, প্রথম বিভাগ—১৪৬, ৯০%-এর বেশি নম্বর প্রাপক—৩৭। **স্নাতকঃ** পরীক্ষার্থী—১২০, ফার্স্ট ক্লাস—৪৪। **জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ**—১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম, ১৪শ এবং ১৯শ স্থান। **মেডিকেল বিভাগ**—১ম, ৪র্থ (সং), ১০ম ও ১৬শ স্থান।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ পরিচালিত ২০০৩ সালের সি. বি. এস. ই. পরীক্ষায় **দেওঘর বিদ্যাপীঠের** ৬৯ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া অরুণাচল প্রদেশের **আলঙের** ৮৮ জনের মধ্যে ৫৩ জন, **নরোত্তমনগরের** ২৯ জনের মধ্যে ২৫ জন এবং ত্রিপুরার **বিবেকনগরের** ৪০ জনের মধ্যে ৩৭ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণের পরিসংখ্যানঃ **আলং**—১৬/৮৮, **দেওঘর**—৬৩/৬৯, **নরোত্তমনগর**—১১/২৯ এবং **বিবেকনগর**—২৫/৪০।

কর্ণাটক সরকার পরিচালিত ২০০৩ সালের এস. এস. এল. সি. (দশম শ্রেণি) এবং পি. ইউ. সি. (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষায় **মহীশূর বিদ্যাশালার** ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল এরকমঃ এস. এস. এল. সি.-র ৯৫ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই এবং পি. ইউ. সি.-র ৪৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া 'ডিস্টিংশন' পেয়েছে যথাক্রমে ৩৫/৯৫ এবং ২৮/৪৬ জন।

দেহত্যাগ

স্বামী অর্হানন্দজী (ললিত মহারাজ)ঃ গত ৩০ জুন ২০০৩ ভোর ২টা ২০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। পাকস্থলীতে ক্যান্সার এবং হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত আড়াই মাস তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ছিলেন।

তিনি ১৯৪৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কাশী সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তিনি বেলুড় সারদাপীঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত ৪ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন সহজ-সরল, স্নেহপ্রবণ ও রসিক প্রকৃতির। তাই তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালবাসতেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ২৭ জুলাই ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

চিত্তরঞ্জন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) ঃ গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণকুমার চক্রবর্তী, শোভনা চক্রবর্তী ও অনিমা দাশ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী, স্বামী অবধূতানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী গুড়াকেশানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী, অধ্যাপক অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। উৎসবে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গত ১১ মার্চ পাঠচক্রের নবনির্মিত একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী।

দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ১৫ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেদ ও 'কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী ও অধ্যাপিকা ইলা গুহ। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কালীপদ মান্না প্রমুখ।

বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৫-১৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দজী এবং বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু ও চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ১৫-১৭ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, লীলাগীতি, পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণদান করেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী ও স্বামী সুবীরানন্দজী। উৎসবের দ্বিতীয়দিন দুপুরে প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা (হুগলি) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, উষাকীর্তন, পাঠ, লীলাগীতি, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রেয়া দাস, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সকালের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী এবং বৈকালিক সভায় আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, নৃত্য, বাউল গান, দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর বাণী পাঠ করে ১২ বছরের বালক-বালিকারা এবং বাউলগান পরিবেশন করেন গৌরসুন্দর গায়েন। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী। নারায়ণ চক্রবর্তীর স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দেন ডঃ কমল নন্দী ও চন্দ্রমাধব শীল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সুধীরকুমার রাহা।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের (পশ্চিম মেদিনীপুর) উদ্যোগে গত ১৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে **কালিন্দীর সমন্বয় ভবনে (কলকাতা-৭৫)**। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অধ্যাপক চন্দন রায়, নির্মলকুমার রায় প্রমুখ। 'কথামৃত' এবং 'ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও মধুসূদন ঘাটা। 'অমিয় বাণী' পাঠ করেন যোগবিলাস মুখার্জি। ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী আত্মবোধানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন দেবনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী নিত্যবোধানন্দজী।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী।

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হাওড়া) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী যতীশানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

বাগ আঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (নদীয়া) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। পূজা করেন স্বামী তদ্বোধানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপ্তিকুমার বসু। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দজী ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। উল্লেখ্য, স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী দয়ানন্দজীর জন্মস্থানে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (হাওড়া) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ১,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও ডঃ জয় ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষ্যে ৫৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ৪০ জন দরিদ্র মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

ধুচনিখালী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও বুলবুল গাঙ্গুলি। তরজাগান ও 'ভক্তের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক পরিবেশন করেন যথাক্রমে শিবপদ মণ্ডল ও সম্প্রদায় এবং নিবেদিতা কালচারাল ইউনিট। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও বুলবুল গাঙ্গুলি। এদিন দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কলকাতা-৬৩) ঃ গত ২৬ মার্চ ২০০৩ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বিহার) ঃ গত ২৭-২৮ মার্চ ২০০৩ নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী পরাশরানন্দজী, স্বামী নির্গুণাত্মানন্দজী, স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত ৮-১২ এপ্রিল বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়দিন প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কাঁচড়াপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (নদীয়া) ঃ গত ২৯ ও ৩০ মার্চ ২০০৩ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'ভাগবত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ডঃ নমিতা দত্ত। কীর্তন পরিবেশন করেন সারদা রায় ও সম্প্রদায়। দুদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বামী উমেশানন্দজী, স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী ও ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলা ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু বস্ত্র ও পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) ঃ গত ২৯-৩০ মার্চ ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'গীতা' এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে স্বামী ব্রহ্মাত্মা পুরী ও অশোককুমার সমাজপতি। প্রথমদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী এবং দ্বিতীয়দিনে স্বামী লোকনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী ও স্বামী দেবেশ্বরানন্দজী। প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া) ঃ গত ৩০ মার্চ ২০০৩ বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব ও শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী হৃষীকেশ সিংহ। সম্মেলনে প্রায় ২০০ শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী অঘোরেশানন্দজী, মহাদেব মণ্ডল, সুনীলকুমার রায় ও মহাদেব সিংহ। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী অঘোরেশানন্দজী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ডানকুনি ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র (হুগলি) ঃ গত ৩০ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন রেশমী বসু ও সেবাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা। ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা সচ্চিৎপ্রাণাজী, মাধবী ঘোষ ও কাশীভাই। এদিন প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গুড়িখালী শ্রীশ্রীমা সারদা রামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ৩০ মার্চ ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর বাণী পাঠ, ভক্তিগীতি, তরজাগান এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী যতীশানন্দজী ও ব্রহ্মচারী জয়গুরু।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রাউরকেলা, ওড়িশা) ঃ গত ৩০ মার্চ ২০০৩ 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ছবি দাশ, মালা রায় প্রমুখ। আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী।

বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৪-৬ এপ্রিল ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তসম্মেলন, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবের বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অসিত পাল, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, তমালী দত্তচৌধুরী প্রমুখ। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী চেতসানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী চেতসানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। এছাড়া বাউলগান, শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের গীতি-আলেখ্য ও 'নটী বিনোদিনী' নাটক পরিবেশিত হয়।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম) ঃ গত ৪-৬ এপ্রিল ২০০৩ নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সমিতির প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন ও ভাষণদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। প্রথমদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী এবং ডাঃ প্রণবকুমার বড়ুয়া। দ্বিতীয়দিন প্রায় ৩৫০ জন ভক্তের সমাবেশে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়দিন বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা ভিন্ন কীর্তন ও ৪,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুলিয়া শহরে গত ৫-৬ এপ্রিল ২০০৩ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় **পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে**। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সূচনা করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবী মুখার্জি। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পূতানন্দজী। অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্যের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী উমানন্দজী, স্বামী স্বগতানন্দজী, ডঃ শ্রীনিবাস মিশ্র প্রমুখ।

সীতারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ৫ ও ৬ এপ্রিল ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে যুবসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী শৈলজানন্দজী। দ্বিতীয়দিনে বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী সুবীরানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়।

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৬-৮ এপ্রিল ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, রামায়ণগান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। পূজা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। স্থানীয় শিল্পীরা ভক্তিগীতি এবং দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা শঙ্করপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। প্রথমদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বেহালা, কলকাতা-৬০) ঃ গত ৬-৯ এপ্রিল ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন দিনে কীর্তন পরিবেশন করেন রূপা ঘোষ ও সম্প্রদায় এবং বাউলগান পরিবেশন করেন বন্দনা দাস ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সোমানন্দজী। উৎসবে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চাঁদুর শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (তারকেশ্বর, হুগলি) ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০৩ প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, পূজা, ভক্তিগীতি, নববস্ত্র বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অমরাত্মানন্দজী, স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও স্বামী গৌতমেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,৫০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

বিরাটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (কলকাতা-৫১) ঃ গত ১৩ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'গীতা' পাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নটরাজ চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় স্বামী বিধানানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী ও সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত।

বন্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ) ঃ গত ১৩ এপ্রিল ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। পূজা, পাঠ, ভজন ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভজন পরিবেশন করেন স্বামী বিনির্মুক্তানন্দজী। ধর্মসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুব্রতানন্দজীর স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী। উৎসবে উপস্থিত প্রায় ৩০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, কাংড়া জেলার এই পার্বত্য গ্রামের ৮০০ মানুষের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন রামকৃষ্ণ মঠ থেকে দীক্ষিত।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জলপাইগুড়ি) ঃ গত ১৮-২০ এপ্রিল ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভক্তসম্মেলন, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী সুমনসানন্দজী, জেলাশাসক শ্রীকুমার মণ্ডল, প্রধানশিক্ষক শান্তনু দত্ত ও অধ্যাপিকা নমিতা মোদক। হাওড়ার শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ সংস্থা গীতিনাট্য পরিবেশন করে। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২০ এপ্রিল ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও 'চণ্ডী' পাঠ, কীর্তন এবং ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেবাশ্রমের ভক্তবৃন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় অধ্যাপক কমলকুমার মান্নার স্বাগত-ভাষণান্তে বক্তব্য রাখেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী ও স্বামী হরিদেবানন্দজী। এদিন প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার (কলকাতা-৩) ঃ গত ২২ এপ্রিল ২০০৩ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে লক্ষ্মীনিবাসে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণের শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ফলক উন্মোচন করে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দজী। অনুষ্ঠানে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী-সহ বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে ধীরাজ বসু ও রাজনারায়ণ দত্ত।

তেঁতুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মুর্শিদাবাদ) ঃ গত ২৩-২৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও রেবতীভূষণ মণ্ডল। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজী, স্বামী গৌতমেশানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা বাসুদেবপ্রাণাজী, অধ্যাপক

ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। তৃতীয়দিন দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (অসম)ঃ গত ২৪-২৭ এপ্রিল ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদের ১৯তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় খারুপেটিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (অসম)। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল অধিবেশনের প্রধান অঙ্গ। অধিবেশনে 'গানে গানে কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী। অধিবেশনের উদ্বোধন করে ভাষণ দেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী। আলোচনা করেন স্বামী উদ্গীতানন্দজী, স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী, স্বামী অনন্তানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৯টি সদস্য আশ্রম থেকে ৯৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। অধিবেশনের শেষদিনে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চাঁদপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২৬-২৭ এপ্রিল ২০০৩ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা ও যুবসম্মেলনের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। পরদিন যুব-সম্মেলনে ভজনচন্দ্র দাসের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী স্বগতানন্দজী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিপুলকুমার রায় ও ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবেকগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। এছাড়া প্রশ্নোত্তরপর্ব ও বাউলগান অনুষ্ঠিত হয়।

সেবাব্রত

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ১৫ মার্চ ২০০৩ ইছাপুর মঠের সহযোগিতায় একটি চিকিৎসাশিবিরে ২৯০ জনের চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাক্তন ছাত্রসংসদ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (কলকাতা-৩৬)ঃ গত ৩০ মার্চ ২০০৩ হুগলি জেলার ভূরকুণ্ডা গ্রামে একটি সাধারণ চিকিৎসাশিবিরে ২৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)-নিবাসী জয়দেব সাধুখাঁ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি বহু জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শৈলবালা শিশু নিকেতন, ভাঙড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘের সভাপতির পদে বৃত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নাগপুর (মহারাষ্ট্র)-নিবাসী অজয়কুমার মিত্র গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। নাগপুর রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কর্মনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা ও রসবোধ ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, উত্তর চব্বিশ পরগনা-নিবাসী গোষ্ঠবিহারী সরকার গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী জয়ন্তকুমার সেন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। সুমধুর ব্যবহার ও কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দুর্গাপুর-নিবাসী ডাঃ মণিকান্ত পণ্ডা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চাতরা (বীরভূম)-নিবাসী রাধাশ্যাম ব্যানার্জি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত সন্ন্যাসী স্বামী বোধাত্মানন্দজীর ভ্রাতা এবং চাতরা পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী পুলিনবিহারী দেব গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, আরামবাগ-নিবাসিনী জয়ন্তী ভট্টাচার্য গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। কামারপুকুর ও জয়রামবাটী আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, শিলচর-নিবাসিনী অমিয়বালা রায়চৌধুরী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্থানীয় সারদা সঙ্ঘের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, গড়িয়া (কলকাতা)-নিবাসী অরুণকুমার দাশ গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তিনি আসানসোল ও বেলুড় বিদ্যামন্দিরে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ছিলেন বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের আমৃত্যু সভাপতি। কর্মজীবনে তিনি দায়রা জজ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। স্থানীয় কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। ❑

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। —শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। —শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। —স্বামী বিবেকানন্দ

No work is secular. All work is adoration and worship.
SWAMI VIVEKANANDA

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা ঃ হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন-৭১১ ১০১, ফোন ঃ ২৬৬০-৯৯৩২
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা ঃ শ্যামপুর-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ-৭১১ ৪০৯
- **নির্মল ঘোষ,** ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন ঃ ২৬৫৪-৪০৪৫
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র,** রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী)-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন ঃ ২৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি,** ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা-৭১১ ১০১, ফোন ঃ ২৬৬০-১০৮৪
- **শুকদেব সাঁতরা,** গ্রাম ঃ উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৬
- **পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পানিত্রাস-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল-৭১১ ৪০৪
- **সাঁকরাইল সেন্ট্রাল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  এফ২/১ ভারত কোঃ অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
  সাঁকরাইল-৭১১ ৩১৩, ফোন ঃ ২৬৭৯-৩৩৪৯/৭০৭২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  শুঁড়িখালী, খলিসানি, কালীতলা
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম,** জঙ্গলপুর, পোঃ আর্গোরি-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর)-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়-৭১১ ৪০৫, ফোন ঃ ২৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,** পোঃ অভয়ানগর, বেলানগর-৭১১ ২০৫
  ফোন ঃ ২৬৫৯-১১৪৪
- **দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ দেউলপুর-৭১১ ৪১১, ফোন ঃ ২৬২৯-০০৪৮
- **দীনবন্ধু পণ্ডিত,** প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্কাশী, থানা ঃ বাউড়িয়া-৭১১ ৩০৭
  ফোন ঃ ২৬৬১-৮১১২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে মিশন**
  ৮/২ পি. কে. রায়চৌধুরী সেকেণ্ড বাই লেন
  বোটানিক্যাল গার্ডেন-৭১১ ১০৩ ফোন ঃ ২৬৬৮-০০১৪
- **বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ বেলাড়ী, ভায়া ঃ উলুবেড়িয়া-৭১১ ৩১৫

জেলা ঃ মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- **রামকৃষ্ণ মঠ,** তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৬৬০০৫/২৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ,** পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ,** গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন ঃ (০৩২২৭) ২৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম,** পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,** ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ,** আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,** খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম,** খড়ার-৭২১ ২২২
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৬২১০৫
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,** দাসপুর-৭২১ ২১১
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৫৪১৮৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম ঃ বরুণা (ভুতা), পোঃ ভুতা, থানা ঃ দাসপুর
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম,** ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
  ফোন ঃ (০৩২২৫) ২৬০২৭১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র,** জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ,** চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র,** রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর-৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির**
  গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর-৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়,** গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর-৭২১ ১৬৬
- **ঘাটমুড়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  পোঃ ঘাটমুড়া-৭২১ ২০১, ফোন ঃ (০৩২২২) ২৭০৩৪৬

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone : 2554-2248, 2554-2403

**Vol. 105
No. 8
AUGUST
2003**

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) '**উদ্বোধন**' **১০৫তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র '**উদ্বোধন**' আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **'উদ্বোধন'**-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০৩-এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে '**উদ্বোধন**'কে পৌঁছে দিতে হবে। '**উদ্বোধন**' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ '**উদ্বোধন**' এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি '**উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল**', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ** এবং **স্বামী গম্ভীরানন্দ** মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। '**উদ্বোধন**'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '**Ramakrishna Math, Baghbazar**' —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে '**Udbodhan Office, Kolkata**'—নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন।

সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

শারদীয়া সংখ্যা

উদ্বোধন

।। ১০৫ ।।

"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।
আর পানকৌটির মতো, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।
আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে, কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

পরিবারে পরিবারে রান্নার গ্যাস বলতেই ইন্ডেন।
নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট - নিশ্চিন্ত ভরসার প্রতীক।
চাইলেই কানেকশন, ফুরোলেই রিফিল, হাসিমুখে সেবা।
জীবনে কিছু জিনিস থাকে যা বদলায় না।
ইন্ডেন

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যেমন চায়, সে তেমন পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত?
ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।
আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য কী?

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' : **১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি : ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**

ফোন : ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে : আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১

পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উদ্বোধন কার্যালয়ের সকল বিভাগ ২ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর (২০০৩) বন্ধ থাকবে।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি...

...তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।

এই গান নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যখন গাহিতেছেন—"সমাধিমন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি", শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সমাধিস্থ।

৬ নভেম্বর ১৮৮৫। আজ শুভ শ্যামাপূজা। অমাবস্যার রাত্রি। শ্যামপুকুরবাটীতে কালীপূজার আয়োজন হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই গিরিশ প্রমুখ ভক্তগণ জনে জনে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। পূজা সাঙ্গ হইলে পর নরেন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি..."।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে ১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ছয়বার নরেন্দ্রনাথকে এই গানটি গাহিতে দেখা যায়। প্রতিটি দৃশ্যপটেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

বাহিরের আঁধার যত ঘনীভূত হয়, সাধকের অন্তরের রশ্মিচ্ছটায় ততই চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠে। নিবিড় আঁধারে যখন মায়ের রূপরাশি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, যখন বাহিরের সকল বাজি অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনি বাজিকরকে সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজলিবাতি তখন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। তখন নিশীথ রাতে গঙ্গার জলপ্রবাহের সহিত সমানতালে যেন গাঢ় অন্ধকারের স্রোত প্রবাহিত হইত। বেলুড় মঠে একদিন নিস্তব্ধ রাত্রে গঙ্গার উপরে ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন ঃ "অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে।"

কেহ অন্ধতামসিকতার আবরণে সত্ত্বের আলোক-লাভের আশায় অন্ধকারকে ভালবাসিয়া আকাঙ্ক্ষা করে। কেহবা আলো-আঁধারে থাকিয়া জীবনের বাসনা-কামনার পরিপূর্তির জন্য সচেষ্ট হয়। কাহারো জীবনে অন্ধকার নামিয়া আসে বিধাতার অমোঘ বিধানে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনান্ধকারে কিঞ্চিন্মাত্র আলোর অস্তিত্বই তাহাকে 'নিবিড় আঁধারে'র আস্বাদন করিতে দেয় না। বাজিকরের বাজি সেখানে কখনো কখনো সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। আশালুব্ধ হৃদয়ে সে পুনরায় রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের 'আনন্দময়' জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে সচেষ্ট হয়। এমনকি তাহার নিকট মায়ের 'ও রূপরাশি'-ও যেন বাজিকরের ভেলকি বলিয়াই প্রতীত হয়।

পরম সুহৃদের অসুস্থতার কালে আরেক সুহৃদ আসিয়াছে তাহাকে দেখিতে। দেখিয়া সে হাসিতেছে, মৃদু মৃদু। অসুস্থ ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ "আমি অসুস্থ, আর তুমি হাসছ?" সুহৃদ উত্তর করিল ঃ "আমি তোমাকে দেখিতে আসি নাই। আসিয়াছি তোমার শরীরের মধ্যে যিনি বিদ্যমান থাকিয়াও অপ্রকাশিত ছিলেন, এখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছেন—সেই শরীরীকে দেখিবার জন্য। দেহর মধ্যে দেহীকে।"

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দ মঠের ত্যাগব্রতীদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ঃ "সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভালবাসে।" ঘন অন্ধকারে মানুষ ডুবিয়া গেলেই মায়ের দিব্য হাসির ঝলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে

শারদ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা

বাঙালির পরম আকাঙ্ক্ষিত শারদ উৎসব সমাগত। এই শুভলগ্নে আমরা 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা—উৎসবের দিনগুলি যেন আমরা শান্তি ও আনন্দে, প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ে অতিবাহিত করিতে পারি। আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন জাগ্রত রাখিতে পারি। মা আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।—সম্পাদক

তাহার অন্তর। যাহার জীবনে অন্ধকার নাই, জীবন জাগতিক আনন্দে পূর্ণ, অর্থ, মান, সম্ভ্রম, দারা-সুত-পরিজন, ভোগের যাবতীয় উপকরণ হাতের কাছে, চাহিলেই পাওয়া যায়—সে কেমন করিয়া বুঝিবে 'নিবিড় আঁধার'ই বা কি, মায়ের 'ও রূপরাশি'ই বা কি। আসলে 'ঝড়ের রাতে'ই তো মায়ের 'অভিসার'। তখনি তিনি আশ্রয়দাত্রী জগজ্জননী, 'পরাণ সখা বন্ধু হে আমার'।

সন্তান যখন অনুভব করে—"দীপ নিভে গেছে মম", তখনি তাহার অন্তরে বিশ্বমায়ের করুণা-দীপ জ্বলিয়া উঠে। শরণাগত ভক্তের বাহির-অন্তর যখন হতাশা, জ্বালা-যন্ত্রণার গাঢ় অন্ধতমিস্রায় আচ্ছন্ন, ঠিক তখনি কৃপাসুমুখী জগজ্জননী আবির্ভূতা হইয়া স্বয়ং সেখানে মহোৎসবের সূচনা করিয়া থাকেন।

অবশ্য সেই নিবিড় গাঢ়তম আঁধারের সাক্ষাৎকার কি যাহার-তাহার হইতে পারে? না। অধিকারী হওয়া চাই। নিত্যনৈমিত্তিক এই জীবনধারায় আলো-আঁধারের দোলায় আমরা সতত দোদুল্যমান। কাহারো জীবন পর্যাপ্ত আলোয় আলোকিত হইয়াও কোন্ গোপন কোণে একমুঠি অন্ধকারের জ্বালায় বিধ্বস্ত। কাহারো বা অপার আঁধারে আবৃত জীবনে একটি আলোর রশ্মি প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহাকে বারংবার বাঁচাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উভয়েই মায়ের ঐ 'চিন্ময় মুখমণ্ডলে' চিরায়ত অট্টহাসির দিব্যদর্শন হইতে বঞ্চিত।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্য দৃষ্টয়ঃ।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৪৮)

অর্থাৎ পেচকাদি কোন কোন প্রাণী দিবসে অন্ধ। কাক প্রভৃতি রাত্রে অন্ধ। কিঞ্চুলুক (কেঁচো) জাতীয় প্রাণী দিন ও রাত্রিতে দৃষ্টিহীন। আবার বিড়ালাদি প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন।

সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নাই। এই রূপ-রসাদির মোহাবর্তে মনুষ্য ও পশু উভয়েই নিয়ত ভ্রমণশীল। মানুষের কি স্বাতন্ত্র্য নাই? আছে। কাহারো অন্তরে জগৎ-সংসার, কাহারো অন্তরে জ্যোতির্ময়ী মুরতি 'মা'-র। ইহার কারণ কি? মহামায়ার ব্যামোহ-কারিণী অবিদ্যাশক্তিই ইহার কারণ। 'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি'—বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানিগণও এই মোহগর্তে পতিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবীর পাদপদ্মে শরণাগতিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

অম্বিকাচরণের চরিত্রস্খলন ক্রমশ দুর্নিবার হইয়া উঠিল। সদ্‌বংশের গৌরব, সমৃদ্ধি লইয়া আদরের কন্যা যোগীন্দ্রমোহিনী সারাজীবন আনন্দে অতিবাহিত করিবে ভাবিয়া পিতা প্রসন্নকুমার মিত্র সুপুরুষ অম্বিকাচরণের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় কি! এ যে ইন্দ্রিয়লালসায় জর্জরিত কলিযুগের হিরণ্যকশিপু! উন্মার্গগামী পতির বাহুডোর হইতে মুক্তিকামী যোগীন্দ্রমোহিনীর তখন একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিলেন অপার স্নেহশীল পিতা। শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য প্রসন্নকুমার কিন্তু অপেক্ষা করেন নাই। পিতার অকালপ্রয়াণে যোগীনের সকল আলোই যেন নিভিয়া গেল। অসহ্য শ্বশুরালয় অবশেষে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়া একমাত্র বালিকা কন্যা গণুকে লইয়া সে ফিরিল পিত্রালয়ে—পথের ভিখারীর ন্যায়। কিছুদিন পূর্বে একমাত্র পুত্রের দেহান্ত হইয়াছে। একমাত্র কন্যাই এখন তাহার জীবনের সম্বল। দীক্ষা কুলগুরুর নিকট হইয়াছে। গুরু বলিয়াছেন, ভগবান মঙ্গলময়। তবু গণুর মায়ের বুকে এক বিশাল 'কিন্তু' চাপিয়া বসিয়া আছে। "ভগবান মঙ্গলময়। কিন্তু..., কিন্তু মঙ্গল কি স্বাভাবিক পথে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া আসিতে পারে না?" সহসা বিধাতার বিধানে একমাত্র কন্যাও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
চ'না গো, মা, চ'না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে যে উন্মাদ-প্রায় রমণীর উদ্দেশে অপূর্ব সুধাঢালা কণ্ঠে শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন, তিনিই গণুর মা। ঐ আহ্বানের মোহিনী আকর্ষণে লোকলজ্জা ভুলিয়া গণুর মা নৌকায় গিয়া বসিল। মায়ের

'ও রূপরাশি' তাহার হৃদয়-মাঝে তখন চমকাইতে শুরু করিয়াছে।

পদ্মবিনোদ গাহিতেছে—"উঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটিরদ্বার"। সহসা উর্ধ্বপানে চাহিয়া দেখিল, জগজ্জননী মাতৃরূপা সারদা জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতেছেন, প্রসন্ন দৃষ্টিতে। জীবনদীপ নিভিয়া যাইবার ঠিক পূর্বে পদ্মবিনোদ দেখিল, 'মা' তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। চরিত্রহীন, পানাসক্ত উন্মত্ত পদ্মবিনোদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের 'নিবিড় আঁধারে' সে দেখিয়াছিল মায়ের 'ও রূপরাশি' ঝলকাইয়া উঠিতেছে। মরণকালে সে দেখিয়াছিল মায়ের সেই "ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি-কনকোত্তমকান্তি", অনৈসর্গিক রূপের অপূর্ব দিব্যজ্যোতি।

জীবনের ভয়ঙ্কর কালরাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই সাধক অনুভব করেন ঃ "যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে/ জানি নাই যে তুমি এলে আমার ঘরে।"

কিন্তু কিভাবে এই ভয়ঙ্কর ঘোর অন্ধকারের অবসান হইয়া থাকে? তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 'অনন্ত আঁধার কোলে' কি করিয়া 'মহানির্বাণ হিল্লোলে' সেই দিব্যায়ত জ্যোতির্ময়ী মূর্তির উদ্ভিন্নচ্ছটা 'চিরশান্তি পরিমলে অবিরল' ভাসিয়া যায়, যোগী তাহা বুঝিয়া উঠেন না। কারণ, তখন অস্তি-নাস্তির এক বিচিত্র ইন্দ্রজালে তাঁহার নিকট এক আদিভূতা মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি ভিন্ন অপর কোন সত্তার প্রকাশ নাই।

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"

একা মাত্র আমিই এই জগতে শক্তিস্বরূপিণীরূপে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে?

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।"

আমিই একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, সকল দেবতারূপে বিশ্বচরাচরে ওতঃপ্রোত হইয়া বিরাজিতা।... আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের অভীষ্ট বস্তুপ্রদাত্রী, পরব্রহ্মকে আত্মা হইতে অপৃথগ্রূপে সাক্ষাৎকারিণী।

করুণাময়ী সেই সত্তা কি কেবল স্বীয় অপার করুণাপরবশ হইয়াই নিচে নামিয়া আসেন আপন সন্তান-সমক্ষে? এই প্রাকৃত জীবনক্ষেত্রে মাকে আহ্বান করিয়া নামাইয়া আনিবার জন্য সন্তানের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্যই কি নাই? অবশ্যই আছে। ঈশ্বরী জগন্মাতা ভক্তাধীনা। তাঁহার অঘটনঘটনী শক্তির এক অভিনব অভিব্যক্তি তাঁহার ভক্ত-বাঞ্ছা-পরিপূরণী ইচ্ছা। ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণের ইচ্ছাপূরণার্থে জগন্মাতা মহিষমর্দিনী কিংবা চণ্ডিকা, অথবা কৌশিকী কিংবা কালী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ভক্তহৃদয়ের অসুরদলনে তাঁহার আবির্ভাব মাতৃমূর্তিতে।

"মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আর আমায় দেখা দিবিনি?"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়নি। জগদতীত ব্রহ্মশক্তি রূপপরিগ্রহপূর্বক কল্যাণীবরাভয়করা রূপে আবির্ভূতা হইলেন সন্তানের তীব্র বিরহযাতনা প্রশমিত করিবার জন্য।

চরম ব্যাকুলতার পরেই আসে নিবিড় প্রশান্তি। তখন মায়ের 'অভয়পদকমলে' সর্বদাই যেন 'প্রেমের বিজলি খেলে'। দিব্যপ্রেরণায় সুপ্রবুদ্ধ মাতৃভক্ত যোগী তখন দেখেন 'মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি' ক্রমশ কালী, মহাকালী, চণ্ডিকা কিংবা ভগবতীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্নরূপে বিরাজিত। তখন সেই মাতৃমূর্তির "চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি।"

এ যেন মায়ের নিজের কাছেই নিজের পরাজয়! একরূপে সেই মহামায়া "সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী"। অপর পক্ষে "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী"। নিজেই নিজের মায়াকে অপসারিত করিয়া সাধকের মুক্তির দ্বার স্বহস্তে খুলিয়া দিয়াছেন। সেই কারণেই ঐ অপরূপা শ্রীবদনে যেন "শোভে অট্ট অট্টহাসি"। সে-হাসির বর্ণনা হয় না। উহা কেবল অনুভববেদ্য।

দেবতাগণও বিপদে পড়িলে উদ্ধারের নিমিত্ত এই আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতকারীর প্রতি মা ভীষণা, রুদ্রাণী—তখন তাঁহার নাম 'চণ্ডী'। অসুরবিনাশে ব্রহ্মশক্তি কোপময়ী সংহারকর্ত্রীরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

স্বেচ্ছাবৃত অন্ধকারে মাতৃভক্ত যোগীর চিরায়ত জাগৃতি।

"কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে...।"

দুর্দমনীয় দুঃখভারে নিপীড়িত হইয়াই যে মায়ের দর্শন লাভ করিতে হইবে—তাহা কখনো হইতে পারে না। যাহার মন বহির্গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার বাহিরে অন্ধকার, অন্তরে আলো।

মায়ের করালবদনে লোলজিহ্বায় রক্তক্ষরণ এবং মেঘগর্জন সদৃশ ঘন ঘন অট্টহাসি কখন যে অভয়প্রতিষ্ঠ কল্যাণস্মিত মৃদু হাসিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তখন "সাম্বা শিবা মম গতিঃ সকলেঽফলে বা।" তখন চণ্ডিকারূপিণী সেই দেবী অম্বাই বরাভয়া মঙ্গলমূর্তি, সাধকের পরমা গতি, চরম ব্যর্থতায় কিংবা পূর্ণ সাফল্যে। মায়ের ও-রূপরাশি তখন ভক্তের অন্তরে, বাহিরে সর্বত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ❑

প্রাচীন সঙ্গীত-রত্নাবলী

আজ থেকে ১০৪ বৎসর পূর্বে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। বানান ইত্যাদি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। নান্নুর, আহাম্মদপুর স্টেশন হইতে প্রায় নয় ক্রোশ। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৩৩৯ শকে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলী আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
যে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী যিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন-সূতা দিয়া, তাহার চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে।
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল॥

জ্ঞানদাস

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কাঁদরা গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম। জ্ঞানদাসের মঠ এখনও কাঁদরা গ্রামে আছে। মনোহরদাস ১৬০০ শকে প্রাদুর্ভূত হন। জ্ঞানদাস, মনোহরদাসের বন্ধু; সর্ব্বদা উভয়ে একত্র থাকিতেন। সুতরাং জ্ঞানদাসেরও আবির্ভাব-কাল ১৬০০ শক।

ভাটিয়ারী

মানস গঙ্গার জল,
ঘন করে কল কল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ,
পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখন না জানে কান,
বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥
ন্যায়ার নাহিক ভয়,
হাসিয়া কথাটী কয়,
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে,
এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল,
নৌকা নাহি পার হৈল,
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি,
স্থির হৈয়া থাক দেখি,
এখনি না ভাবিহ বিষাদ॥

✳

বৈজুবাওরা

পাঠান-সম্রাট্ আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালে [আনুমানিক খৃস্টীয় ১৫শ শতক] ব্রাহ্মণবংশে বৈজুবাওরা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাদশাহকে সঙ্গীত রচনা করিয়া শুনাইতেন। প্রবাদ এইরূপ, বৈজুবাওরা সংসারবিরাগী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বনে বাস করিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া বনের হিংস্র পশুও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

ভৈরব-চৌতাল

জয় সরস্বতী গঙ্গা গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ
শক্তি সূরয সর্ব্ব দেব ধ্যাবৈ।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইশ মুরছনা উনপঞ্চাশ
কূট তান দেহো আবৈ।
উরপ তিরপ লাগ্‌ডাট রাগ রাগিণী পুত্রবধূ
সহিত কণ্ঠসমাবৈ।
কহে বৈজুবাওরে সর্ব্বদেব দয়াকরো
রাগ রংগ তান তাল লয় অক্ষর গাবৈ॥ ❑

বা ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। তাঁরা কোন মহিলা বা অল্পবয়স্কার পাশে বসবেন না, এমনকি ভিড়ে ঠাসা গাড়িতেও নয়। তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না বা একসঙ্গে হাঁটবেনও না।

অবশ্য এদেশের নারীদের দোষ দেওয়া উচিত নয়, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরাই দায়ী। আমরা সেটা জানি, কিন্তু কিছু করতে পারি না। আমাদের এই ধরনের নিয়ম চালু করতে হয়, কারণ মহিলাদের বিষয়ে আমরা এখানকার সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারের সঙ্গে পরিচিত নই; বিশেষত যখন আমাদের উচ্চতর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে এই ধরনের সামাজিক স্বাধীনতার ধারণাকে বিশাল প্রতিবন্ধক ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

প্রথমে আমি যখন এখানে এইসব নিয়মের প্রবর্তন করি, তখন আমাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ও তীব্র প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আমি অবশ্য জানতাম এসবই হবে। কিন্তু এখন প্রভুর ইচ্ছায় আমি রীতিমতো সফল। আমাদের প্রভু—জগদীশ্বর—আমাকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, কেউ কখনো আমার যুক্তিকে পরাস্ত করতে পারেনি। এইসব কঠোর নিয়মগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাকে একের পর এক বক্তৃতা দিতে হয়েছে। প্রথম প্রথম বিরাট বাধা এসেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সবাইকে চুপ করে যেতে হয়েছে। বিভিন্ন জনসভায় ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমার ওপর শত শত প্রশ্নের ঢল নেমেছে—লিখিত ও মৌখিক আকারে এবং সেগুলির প্রত্যেকটির জবাব দেওয়া গেছে বিশেষ প্রত্যয় ও সামর্থ্যের সঙ্গে—সত্যের নামে—আমাদের প্রভু, আমাদের রক্ষাকর্তার নামে। তাঁর শক্তিতে ও তাঁর কৃপায় এই উত্তরগুলির কোনটি ব্যর্থ হয়নি। এবং আজ, তাঁর (এবং তোমার ও অন্য সবার) এই দাস—যে তার নিজের বিচারে একটি গণ্ডমূর্খ ছিল এবং এখনো আছে—এই সংগ্রামে লাভ করেছে মহান বিজয়; প্রভুর কাজে সে অর্জন করেছে এক মহাসাফল্য।

এই মন্দিরে আমি একটি মঠ স্থাপন করেছি। (ভাই, ক্ষমা কর—এই চিঠিতে আমি কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের কথা বলে ফেললাম; কিন্তু না বলে পারলাম না। আসলে আমি তোমাকে আমাদের এখানকার কাজের কিছু ধারণা দিতে চেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, প্রিয় ভাই আমার, ঈশ্বরের কৃপায় আমি এখনো ভুলিনি যে আমি তাঁর এবং তোমার, ও অন্য সকলের এক সামান্য দাসমাত্র। তোমাদের শুভেচ্ছায় ঈশ্বর আমার মধ্যে এই বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা দৃঢ়তর করুন।)

আমি পাঁচজন আমেরিকান নাগরিককে পেয়েছি, যারা এই মঠে বাস করছে এবং সংসার ত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের প্রভুর বাণী প্রচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রচারক হতে তাদের অন্তত দুবছর সময় লাগবে। আমি ওদের 'ব্রহ্মচারী' বলি এবং সংস্কৃতে 'গীতা' পড়াই। ওরা ইতোমধ্যেই সুন্দরভাবে সংস্কৃতে গীতা পড়তে শিখেছে। তারা সবাই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সম্বন্ধে এই সোসাইটির উপরি উক্ত কঠোর নিয়মাবলী (করমর্দনাদির ব্যাপার) মেনে চলে। সোসাইটির সব সদস্যই নিয়মগুলি মানে। এমনকি এই বিরাট শহরের অনেক ব্যবসায়ীও আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই করমর্দন না করে হিন্দুপদ্ধতি মেনে নমস্কার জানান।

বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি,... প্রকাশানন্দ... অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এইসব কঠোর নিয়ম পালন করে। সে আমেরিকার মুক্ত সমাজের ভোগের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছে।

আমি নিজেও এখানে আমার জীবনে এইসব কঠোর নীতির কিছু কিছু মেনে চলছি। আমি কোন পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে করমর্দন করি না; কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর মুখের দিকে তাকাই না; কোনরকম সামাজিক বা ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি না; কোন মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাই না—তা সে-ব্যক্তি সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও; কোন পুরুষ বা মহিলার কাছ থেকে উপহার নিই না বা দিইও না। একথা সত্য যে, আমাকে এখন মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়; কারণ সোসাইটি এখনো স্বনির্ভর না হওয়ায় এবং প্রধানত সদস্য-অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আমাকে এখনো বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্তরে) শিক্ষাদান করে যেতে হচ্ছে—যে-পদ্ধতিটি আমার আর ভাল লাগছে না। মহিলাদের দ্বারাই মহিলাদের এবং পুরুষদের দ্বারাই পুরুষদের শিক্ষাদান হওয়া উচিত। বর্তমান সমস্যা হলো এই যে, সদস্যদের নিরানব্বই শতাংশ এই শর্তে এবং কেবল এই শর্তে সদস্য হয়েছে যে, তারা শিক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষালাভ করবে।

সোসাইটির কিছু কিছু মহিলা সদস্যকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা আমাদের ভাবধারা অনুযায়ী স্বদেশীয় মহিলাদের শিক্ষাদান করতে পারে। তারা সংস্কৃতে গীতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে এবং ইংরেজিতে তার ব্যাখ্যা করতে শিখছে—ঠিক যেমনভাবে কোন হিন্দু আচার্য গীতার বাস্তবমুখী নীতিসমূহের ব্যাখ্যা করেন। তারা প্রায় আক্ষরিকভাবেই দিবারাত্র পড়াশোনা করছে। এরা ইতোমধ্যেই দুবার রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জির সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছে। এরা এখন গীতার সংস্কৃত শ্লোকসমূহ পড়তে, উচ্চারণ করতে ও আবৃত্তি করতে পারে—

আমাদের বাঙালিদের চেয়ে অনেক ভাল করে। (আমরা বাঙালিরা তো যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারি না।) তারা ঠিক বেনারসে জাত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতের ছাত্রের মতো উচ্চারণাদি করে। তারা যে কী সুন্দরভাবে ও ভক্তিসহকারে পবিত্র গীতা আবৃত্তি করে, তা শুনলে তুমি চমকিত হতে। শ্রীশ্রীপ্রভুর এমন পাঁচজন শিষ্যা ইতোমধ্যেই সোসাইটির গীতা-ক্লাস নিতে আরম্ভ করেছে। এটি একটি অভাবিত সাফল্য। গত সোমবার মিসেস সি. এফ. পিটারসেন (সংস্কৃত নাম 'ধীরানন্দ') গীতা-ক্লাস নিয়েছিল। প্রভুর কৃপায় সেটি অসাধারণ হয়েছিল। শ্রোতার সংখ্যা ছিল ৩০। এমনকি আমাদের গীতা-ক্লাসেও এত ছাত্রছাত্রী হয় না। অবশ্য প্রকাশ্য বক্তৃতায় প্রচুর লোকসমাগম হয়। আমি এখানে তিনবছর আগে সংস্কৃত ক্লাস শুরু করেছিলাম। আর বছর দুয়েকের মধ্যে সংস্কৃতের এই ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিতভাবে গীতা পড়াতে পারবে। সংস্কৃতের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা হলো মিসেস এ. এস. উলবার্গ (সংস্কৃত নাম 'প্রসূতী'), মিসেস সি. ফ্রেঞ্চ (সরলা), মিসেস সি. বেটি (দুর্গা), মিস আইডা আনসেল (উজ্জ্বলা), মিস্টার ই. সি. ব্রাউন (সজ্জন) এবং মিস্টার হোরওয়ার্থ। এছাড়া সংস্কৃত ও গীতার আরো অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যারা শিক্ষক হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে—অবশ্য কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, প্রবল অনুরোধে এবং বিশেষ প্রয়োজনে, অনিবার্য কারণবশত। যাদের কথা বলা হলো, সংস্কৃত ও গীতার সেইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও সোসাইটির অন্যান্য মহিলা ও পুরুষ সদস্য আছে, যারা আমাদের ভাবধারায় (যেটিকে তারা তাদেরও নিজস্ব বিশ্বাস বলে প্রচার করে থাকে) জনসভায় বক্তৃতা করতে একইভাবে সম্মত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে মিস্টার ও মিসেস অ্যালান, ডঃ শ্যাণ্ডেলিয়র, মিস্টার স্ক্যাণ্ডারলিয়েন, মিস্টার সি. এফ. পিটারসেন (নির্মল), মিস্টার এ. এস. উলবার্গ (কর্মবীর), মিস্টার ল্যাকনার (মুনি), মিস্টার মারকেন্স (মুমুক্ষু), মিস্টার ক্রুগার (নির্দ্বন্দ্ব) প্রমুখ। আমার বিচারে এইসব সদস্য শিক্ষাদান করতে সমর্থ—শুধু যে সাহিত্যের দিক দিয়ে তা-ই নয়, আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও; কারণ এরা আপন উদ্দেশ্য ও কর্মে বিশেষ নিষ্ঠাবান এবং অত্যন্ত সুন্দর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে। এদের বেশির ভাগই ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এই মঠেই থাকে, কেউ কেউ গৃহে।

আর একমাসের মধ্যে সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটি মঠও (nunnery) প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গত বৃহস্পতিবার আমি এটির সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা দিয়েছি; আবার সামনের বৃহস্পতিবার একটি জোরালো বক্তৃতা দেব। আমি নিশ্চিত যে, সন্ন্যাসিনীদের মঠ বিশেষভাবে সফল হবে। কারণ, আমি জানি, এটি ঈশ্বরের কাজ।

তুমি মনে করলে এই চিঠির কোন কোন অংশ ভারতের সবকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে পার; তাতে ভালই হবে। যেমন তোমার ইচ্ছা।

আমার শরীর খুব একটা ভাল নেই; অবশ্য খুব খারাপও নয়—আমার বিচারে। আমি এখনো কোন অসুবিধা ছাড়াই সারা দিনরাত কাজ করতে পারি।

এইসঙ্গে ২৯.৯৯ ডলারের (২৯ ডলার ৯৯ সেন্টের) একটি মানি অর্ডার পাঠালাম, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে (খুব সম্ভবত এটি ৯২ টাকা ৬ আনার সমান হবে)—

(১) ৫০ টাকা—স্বামীজীর স্মৃতি-ভবনের জন্য।
(২) ২৫ টাকা—বেলুড় মঠে আমাদের প্রভুর আসন্ন মহোৎসবের জন্য।
(৩) ৫ টাকা—বেনারসের বাড়িটির জন্য।
(৪) ৫ টাকা—স্বামী অ'র অনাথাশ্রমের জন্য।
(৬) ৫ টাকা—আমাদের কনখল অনাথাশ্রমের জন্য।
(৬) বাকি টাকা মঠে জিলিপি-ভোগের জন্য।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ*

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও আমাদের শান্তি আশ্রমের 'টাইটেল ডিড' সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি; যদিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের বর্তমান আইনকানুন অনুযায়ী, আমাকে 'প্রোবেট' নিতে হবে। 'ডিড'টি আছে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুগামীদের নামে। এখন কোর্ট জানতে চায়, আইনানুগ মালিকরা এখনো জীবিত আছে কিনা এবং সম্পত্তিটি তারা ভোগদখল করছে কিনা। আমি এখানে বেশ কয়েজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বললেন যে, বেলুড় মঠকে [কর্তৃপক্ষকে] একটি ট্রাস্টি মিটিং ডাকতে হবে, অথবা ট্রাস্টিরা একত্রিত হতে দেরি হলে

* পত্রের শুরুতে সারদানন্দজীকে এই অংশটি আগে পড়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী।—সম্পাদক

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট যেন আমাকে অবিলম্বে ক্ষমতা অর্পণ করে পরিচয়জ্ঞাপক একটি পরিষ্কার 'অফিসিয়াল' সার্টিফিকেট পাঠান, যাতে লেখা থাকবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা চিহ্নিত অনুগামীদের—যাঁরা তাঁর সম্পত্তির তৎকৃত ট্রাস্টি—তরফে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমিই 'হেড এজেন্ট' এবং সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমিই রামকৃষ্ণ মিশনের 'হেড রিপ্রেসেন্টেটিভ'। 'হেড এজেন্ট' এবং 'হেড রিপ্রেসেন্টেটিভ' না বসালে 'টাইটেল' পাওয়া যাবে না। এটি অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও ভাই।...

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে যখন পত্র দেবে... তখন তাঁকে আমার সাষ্টাঙ্গ জানিও। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং অন্য সকল সন্ন্যাসী ও ভক্তদের (স্ত্রী-ভক্তগণসহ) আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি জানিও। ইতি

সতত প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
দাস সারদা

[২]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপাদপদ্মভরসা

The Hindu Temple
2963 Webster St.
San Francisco, Calif., U.S.A.
Jan 23, 1912

প্রিয় সারদানন্দ স্বামি,—

শোক শীঘ্র ভোলা দুষ্কর। অতিরিক্ত কার্য্যবশতঃ, কোনও রকম ক'রে মনটাকে ব্যস্ত রাখিয়াছি। এবার আমার পালা। আমার ও সুশীলের* শরীর ভাল আছে। আশা করি তোমরা সকলেই ভাল আছ। মনে করি, নিদেন একবার ফিরে যাই, তোমাদের সকলকে দেখে আসি। কিন্তু, ঘটনাবশতঃ আর এখন ১০।১২ বছরের মধ্যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শ্রীশ্রীমা যেখানে আছেন, সেখানকার ঠিকানা খামে লিখে তাঁর চিঠিখানি অনুগ্রহ করিয়া ডাকে ফেলিয়া দিও।

এই চিঠির মধ্যে £8-3-3d দামের এক foreign M.O. পাঠালাম। Bank of Bengal-এ Cash করিও। আগামী March মাস হইতে, ইহার ভিতর হইতে প্রতি মাসে ঠাকুরের নিত্যসেবার জন্য ৫, মঠের নিত্য ভক্তসেবা জন্য ৫, মাঠাকুরানীর নিকট যেসকল স্ত্রীভক্ত থাকেন বা থাকিবেন তাঁদের নিত্যসেবার জন্য ৫ মাসিক, এবং শ্রীশ্রীমার নিজের হাত খরচের জন্য মাসিক নগদ ৫ (ইহা যেন, ভাই, মাঠাকুরানীর হাতে directly পড়ে।) তিনি জয়রামবাটী বা অন্যত্র থাকিলে, উহা ডাকযোগে অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাই পাঠাইয়া দিও প্রতিমাসে। একুনে ২০ টাকা মাসে। ৬ মাসের ১২০ পাঠালাম। বক্রী ২।০ বা ২৷৶০ জমা রাখিও। সেই বড় ছবির নেগেটিভ [?] যা তুমি আমার নিকট হইতে পাইবে, তাহা ভুলি নাই। আদায় হইলেই পাঠাব। আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিও তোমরা সকলে। ইতি।

দাস সারদা

* স্বামী প্রকাশানন্দ।—সম্পাদক

প্রপন্নগীতা

(নির্বাচিত অংশ)

অনুবাদক ঃ **স্বামী বিনির্মলানন্দ***

'প্রপন্নগীতা' মূলত একটি সঙ্কলনগ্রন্থ। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা ও স্তব এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অত্রি, ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, অর্জুন, ভীম প্রমুখের স্তব সংগৃহীত হয়ে 'প্রপন্নগীতা' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। তবে বহু প্রাচীন এই সঙ্কলনটি কে, কবে গ্রন্থনা করেছেন, তা আমাদের জানা নেই।

ব্রহ্মা উবাচ

যে মানবা বিগত-রাগপরাবরজ্ঞাঃ
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষচেতনাস্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি।।১।।

অন্বয় ঃ *ব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলেন) যে (যেসকল) বিগতরাগ-পর-অবরজ্ঞাঃ (আসক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ) মানবাঃ (মনুষ্যগণ) সুরগুরুং (দেবগুরু) নারায়ণং (নারায়ণকে) সততং (সর্বদা) স্মরন্তি (স্মরণ করেন) তে (তাঁরা) তেন ধ্যানেন (সেই স্মরণের দ্বারা অর্থাৎ নারায়ণের ধ্যানের দ্বারা) হতকিল্বিষচেতনাঃ (তাঁরা নির্মলচিত্ত হয়ে) মাতুঃ (মায়ের) পয়োধররসং (মাতৃদুগ্ধ) পুনঃ (পুনরায়) ন পিবন্তি (পান করেন না)।*

ব্রহ্মা বলেন—যেসকল আসক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞ মানব সুরগুরু নারায়ণকে সর্বদা স্মরণ-মনন করেন, সেই স্মরণ-মননের ফলে শুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরা পুনরায় মাতৃদুগ্ধ পান করেন না অর্থাৎ তাঁদের আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

মন্তব্য ঃ বিষয়াসক্তি অর্থাৎ বাসনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। মুক্ত হতে গেলে নির্বাসনা হতে হবে। তাই শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "নির্বাসনা হলে এক্ষুণি হয়" অর্থাৎ নির্বাসনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে যায়। এই বাসনা তিনপ্রকার ঃ সন্তান, সম্পদ ও মান-যশ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—"পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি..." (৪।৪।২২) অর্থাৎ (সন্ন্যাসিগণ) পুত্র, বিত্ত ও লোককামনা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে অর্থাৎ এগুলি ত্যাগ করে ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করবেন অর্থাৎ মাধুকরী করে জীবিকানির্বাহ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরো সংক্ষেপে বলেছেন—'কাম-কাঞ্চন ত্যাগ'।

শ্রীমহাদেব উবাচ

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরম্।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।।২।।

অন্বয় ঃ *শ্রীমহাদেব উবাচ (মহাদেব বলেন), নবচ্ছিদ্রং শরীরম্ (নয়টি ছিদ্রযুক্ত শরীর—দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি নাসারন্ধ্র, পায়ু, উপস্থ ও মুখ চ (এবং) ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরম্ (পীড়া আক্রান্ত দেহ) [শরীরের একমাত্র] ঔষধম্ (ওষুধ) জাহ্নবীতোয়ম্ (গঙ্গাজল) বৈদ্য (চিকিৎসক) নারায়ণ-হরিঃ (নারায়ণ হরি)।*

শ্রীমহাদেব বলেন, নয়টি ছিদ্রযুক্ত ও রোগাক্রান্ত শরীরের একমাত্র ওষুধ গঙ্গাজল এবং চিকিৎসক হলেন ভগবান নারায়ণ।

মন্তব্য ঃ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভক্তের কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত, তা এই শ্লোকের মাধ্যমে দেবাদিদেব মহাদেব বর্ণনা করেছেন। অসুস্থ ভক্তের চিকিৎসক নারায়ণ হরি এবং ওষুধ গঙ্গাজল। উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ শেষসময়ে এইভাবে অবস্থান করে শরীরত্যাগ করেছিলেন। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত একবার অত্যন্ত অসুস্থ হলে কোন চিকিৎসককে না দেখিয়ে এবং কোন কিছু ওষুধ না গ্রহণ করে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক সেবন করে সুস্থ হয়েছিলেন।

প্রহ্লাদ উবাচ

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি।।
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাঽপসর্পতু।।৩।।

অন্বয় ঃ *প্রহ্লাদ উবাচ (প্রহ্লাদ বলেন), নাথ (হে প্রভু), অহং (আমি) যোনিসহস্রেষু (বিভিন্ন প্রকার মাতৃগর্ভের মধ্যে) যেষু যেষু (যে যে) ব্রজামি (গর্ভে জন্মগ্রহণ করি) [না কেন] তেষু তেষু (সেইসব) [জন্মে] ত্বয়ি (তোমাতে) [যেন] অচলা অচ্যুতা ভক্তিঃ (স্থির, দৃঢ়া ভক্তি) অস্তু (থাকে) অবিবেকানাম্ (অজ্ঞব্যক্তিগণের) বিষয়েষু (জাগতিক বিষয়সমূহে) যা (যে) অনপায়িনী (অবিনাশী) প্রীতিঃ (ভালবাসা) সা (সেই ভালবাসা) ত্বাম্ (তোমাকে) অনুস্মরতঃ (স্মরণকারী) মে (আমার) হৃদয়াৎ (হৃদয় থেকে) [যেন] মা অপসর্পতু (দূরীভূত না হয়)।*

প্রহ্লাদ বলেন, হে প্রভু! আমি হাজার হাজার বার যেকোন মাতৃগর্ভেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা দৃঢ়া ভক্তি থাকে। অজ্ঞব্যক্তিগণের জাগতিক বিষয়ে যে ঐকান্তিক অবিনাশী প্রীতি, তোমাকে সর্বদা স্মরণকারী আমার হৃদয় থেকে যেন সেই প্রীতি দূরীভূত না হয়।

---

* রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শাস্ত্রপ্রেমী সন্ন্যাসী

বশিষ্ঠ উবাচ

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক-কোটয়ঃ।।৪।।

অন্বয় ঃ *বশিষ্ঠ উবাচ (বশিষ্ঠ মুনি বলেন), কৃষ্ণ ইতি নাম ('কৃষ্ণ'—এই নাম) মঙ্গলম্ (কল্যাণপ্রদ) যস্য (যাঁর) বাচি (বাক্যে) [এই নাম] প্রবর্ততে (প্রযুক্ত হয়েছে) তস্য (তাঁর) আশু (শীঘ্র) মহাপাতককোটয়ঃ (কোটি কোটি মহাপাপ) ভস্মীভবন্তি (ভস্মীভূত হয়ে যায়)।*

বশিষ্ঠ মুনি বলেন, কৃষ্ণনাম কল্যাণপ্রদ। এই নাম যাঁর বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে, তাঁর কোটি কোটি মহাপাপ শীঘ্র ভস্মীভূত হয়ে যায়।

বিশ্বামিত্র উবাচ

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্।।৫।।

অন্বয় ঃ *বিশ্বামিত্র উবাচ (বিশ্বামিত্র বলেন), নরাণাং (মনুষ্যদের) মনসি (মনে) স্থিতম্ (অবস্থিত) যো (যে) দেবং (দেবতাকে) নিত্যং (সর্বদা) ধ্যায়তে (ধ্যান করা হয়) তস্য (তাঁর) দানৈঃ কিম্ (দানের কি) [প্রয়োজন] তীর্থৈঃ কিং (তীর্থদর্শনের কি [আবশ্যক]) তপোভিঃ কিং (তপস্যার কি [প্রয়োজন]) অধ্বরৈঃ কি (যজ্ঞের কি [প্রয়োজন])।*

বিশ্বামিত্র বলেন, মানবের মনস্থিত (হৃদয়স্থিত) ঈশ্বরকে যিনি সর্বদা চিন্তা করেন—তাঁর দান, তীর্থভ্রমণ, তপস্যা বা যজ্ঞের কি প্রয়োজন?

মন্তব্য ঃ আমরা পুণ্য অর্জনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন, কঠোর তপশ্চরণ, দীন-দরিদ্রকে অর্থাদির সাহায্যে দান ও বিভিন্ন তীর্থসেবা করে থাকি। কিন্তু যদি আমরা হৃদয়স্থিত ভগবানকে সর্বদা স্মরণ-মনন করতে পারি, তাহলে তীর্থাদি দর্শনের ফলাপেক্ষা অধিক পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হব। শ্রীরামকৃষ্ণ-গীত একটি গীতে আছে—"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।।... দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়। মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়।।"

কুন্তী উবাচ

স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে।।৬।।

অন্বয় ঃ *কুন্তী উবাচ (কুন্তী বলেন), হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ) অহম্ (আমি) স্বকর্মফলনির্দিষ্টাং (স্বীয় নিরূপিত কর্মফলবশত) যাং যাং (যে যে) যোনিং (মাতৃগর্ভ) ব্রজামি (গ্রহণ করি না কেন) তস্যাং তস্যাং (সেই সেই) [জন্মে] ত্বয়ি (তোমাতে) [যেন] মে (আমার) দৃঢ়া ভক্তিঃ (অচলা ভক্তি) অস্তু (হোক, থাকে)।*

কুন্তীদেবী বলেন, হে হৃষীকেশ! নিজের নিরূপিত কর্মফলানুযায়ী যেকোন মাতৃগর্ভে জন্মাই না কেন, সেইসব জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

মাদ্রী উবাচ

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে।।৭।।

অন্বয় ঃ *মাদ্রী উবাচ (মাদ্রী বলেন), যে (যাঁরা) কৃষ্ণে রতাঃ (কৃষ্ণে একাগ্রমনা) রাত্রৌ (রাত্রিতে) চ (এবং) পুনঃ উত্থিতা (জাগরণে, দিবসে) কৃষ্ণং কৃষ্ণং (কৃষ্ণের নাম বারবার) অনুস্মরন্তি (স্মরণ করেন) যথা (যেমন) হবিঃ (ঘি) হুতাশে (অগ্নিতে) মন্ত্রহুতং (বিভিন্ন মন্ত্রে আহুতি প্রদান করা হয়) [তেমনি] তে (তাঁরা) ভিন্নদেহাঃ (বিভিন্ন শরীরবিশিষ্ট হলেও) কৃষ্ণং (কৃষ্ণে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)।*

মাদ্রীদেবী বলেন, কৃষ্ণে নিবিষ্টচিত্ত যাঁরা দিনরাত কৃষ্ণের নাম স্মরণ-মনন করেন, বিভিন্ন শরীরবিশিষ্ট হলেও যেমন ঘি বিভিন্ন মন্ত্রে উচ্চারিত হয়ে একই অগ্নিতে প্রবেশ করে; তেমনি তাঁরা কৃষ্ণেই প্রবেশ করেন।

দ্রুপদ উবাচ

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাঽব্যভিচারিণী চ।।৮।।

অন্বয় ঃ *দ্রুপদ উবাচ (দ্রুপদ বলেন), কেশব (হে কৃষ্ণ)! কীটেষু (কীটাদিতে) পক্ষিষু (পাখি প্রভৃতিতে) মৃগেষু (পশু প্রভৃতিতে) সরীসৃপেষু (সর্পাদিতে) রক্ষঃ পিশাচম্ (রাক্ষস, পিশাচ) অনুজেষু (অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীতে) অপি (এমনকি) যত্র যত্র (যে যে স্থানে) মে (আমার) জাতস্য (জন্মের, জন্ম) ভবতু (হোক না কেন) তে (তোমার) প্রসাদাৎ (কৃপায়) ত্বয়ি (তোমাতে) এব (যেন) অচলা (স্থির) চ (এবং) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিকা) ভক্তিঃ (ভক্তি) [থাকে]।*

দ্রুপদ বলেন, হে কেশব! কীট, পাখি, পশু, সাপ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি, এমনকি নিকৃষ্ট প্রাণিকুল—যেখানেই আমার জন্ম হোক না কেন, তোমার কৃপায় সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা, ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে।

দুর্যোধন উবাচ

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাম্ মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে।।৯।।

অন্বয় : *দুর্যোধন উবাচ (দুর্যোধন বলেন), হৃষীকেশ! অহং (আমি) ধর্মং চ জানামি (ধর্মতত্ত্বও জানি) [কিন্তু তাতে] মে (আমার) ন প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ নেই), অধর্মং চ জানামি (অধর্ম বিষয়েও জানি) [কিন্তু তা] মে (আমার) ন নিবৃত্তিঃ (ত্যাগ করার ইচ্ছা নেই) হৃদি (হৃদয়ে) স্থিতেন (অবস্থিত) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) যথা নিযুক্তঃ অস্মি (যেমন নিযুক্ত হই) তথা করোমি (সেরূপ করি)।*

দুর্যোধন বলেন, হে হৃষীকেশ! আমি ধর্ম জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই। আবার অধর্মও জানি, তাতেও আমার নিবৃত্তি নেই। তুমি আমার হৃদয়ে থেকে যেমন করাচ্ছ, সেরূপ আমি করছি।

অন্বয় : *হি (যেহেতু) মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যকে যিনি বিনাশ করেছেন) যন্ত্রস্থ (যন্ত্রের, আমার) গুণদোষৌ (গুণ ও দোষ) ক্ষম্যতাম্ (ক্ষমা করুন)। অহং (আমি) যন্ত্রং (যন্ত্র) ভবান (আপনি) যন্ত্রী (চালক) মম (আমার) দোষঃ ন বিদ্যতে (আমার কোন দোষ নেই)।*

হে মধুসূদন, আমার গুণ-দোষ ক্ষমা করুন। যেহেতু আমি যন্ত্র আপনি যন্ত্রী, সেজন্য যন্ত্রস্বরূপ আমার মধ্যে দোষ থাকতে পারে না।

ভীমসেন উবাচ

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা
বিষাণকোট্যাঽখিলবিশ্বমূর্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা
স মে স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রসীদতাম্।।১০।।

অন্বয় : *সচর-অচর ধরা (স্থাবরজঙ্গমময় পৃথিবী) জলৌঘমগ্না (জলোচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত) যেন (যে) অখিলবিশ্বমূর্তিনা (জগৎপিতা) বরাহরূপিণী (বরাহরূপী) বিষাণকোট্যা (লক্ষ লক্ষ শিঙের সাহায্যে) সমুদ্ধৃতা (উত্তোলন করেছিলেন) স স্বয়ম্ভু ভগবান্ (সেই স্বয়ম্ভু ভগবান) মে প্রসীদতাম্ (আমার প্রতি প্রসন্ন হোন)।*

স্থাবর-জঙ্গমের সঙ্গে অর্থাৎ স্থিতি ও গতিশীল প্রাণী-সহ পৃথিবী যখন জলোচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত, তখন যে বরাহরূপী জগৎপিতা এই ধরাকে ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান স্বয়ম্ভু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

অর্জুন উবাচ

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমব্যয়ং
বিভুং প্রভুং ভাবিতবিশ্বভাবনম্।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিচারকারকং
হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্।।১১।।

অন্বয় : *অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলেন), অচিন্ত্যম্ (চিন্তার অতীত) অব্যক্তম্ (যা মুখে বলা যায় না) অনন্তম্ (যাঁর অন্ত বা শেষ নেই) অব্যয়ম্ (শাশ্বত) বিভুম্ (বিষ্ণু) প্রভুম্ (প্রভু) ভাবিতবিশ্বভাবনম্ (বিশ্বচিন্তক) ত্রৈলোক্য-বিস্তারবিচার-কারকম্ (বিস্তৃত ত্রৈলোক্যের তত্ত্বনির্ণায়ক) মহাত্মনাং গতিং (সাধু-মহাপুরুষের একমাত্র অবলম্বন) হরিং (হরির) প্রপন্নঃ অস্মি (শরণাগত হই)।*

অর্জুন বলেন, যিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অব্যয়, বিশ্বচিন্তক, বিষ্ণু, প্রভু, বিস্তৃত ত্রৈলোক্যে তত্ত্বনির্ণায়ক, সাধু-মহাপুরুষদের একমাত্র গতি—সেই হরির আমি শরণাগত।

নকুল উবাচ

যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবন্ধো
যদি কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।।১২।।

অন্বয় : *নকুল উবাচ (নকুল বলেন), যদি কালপাশবদ্ধঃ (যদি মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়ে) গমনম্ অধস্তাৎ (নরকে গমন করি) যদি কুলবিহীন পক্ষিকীটে জায়তে (যদি পক্ষিকীটাদি কুলহীন হয়ে জন্ম হয়) চ (এবং) কৃমিশতম্ অপি গত্বা জায়তে (শতবার যদি কৃমি হয়েও জন্মাই) [তবু] মম হৃদিস্থে অন্তরাত্মা কেশবে (আমার হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী কৃষ্ণে) যেন একা ভক্তিঃ (একনিষ্ঠ ভক্তি) ভবতু (থাকে)।*

নকুল বলেন, যদি আমি মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়ে নরকে গমন করি, কীটপক্ষী প্রভৃতিতে কুলবিহীন হয়ে জন্মাই কিংবা শতবার কৃমি হয়েও যদি জন্মাই, তথাপি আমার হৃদয়স্থিত অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যেন একনিষ্ঠা ভক্তি থাকে।

সুভদ্রা উবাচ

একোঽপি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।।১৩।।

অন্বয় : *সুভদ্রা উবাচ (সুভদ্রা বলেন), একঃ (অদ্বিতীয়) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) সকৃৎ অপি (একবার মাত্র) প্রণামঃ (প্রণাম) দশাশ্বমেধ-অবভৃথেন তুল্যঃ (দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান) দশাশ্বমেধী (দশ অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর) পুনঃ (আবার) জন্ম এতি [পুণ্যক্ষয় হলে] (জন্মগ্রহণ করতে হয়) [কিন্তু] কৃষ্ণপ্রণামী (কৃষ্ণপ্রণামকারীর) ন পুনঃ ভবায় (পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না)।*

সুভদ্রা বলেন, অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের একবার মাত্র প্রণামের ফল দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য। দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে আবার এই পৃথিবীতে জন্মাতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামকারীর আর জন্মাতে হয় না। ❑

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ভক্তমণ্ডলীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রধানত যেটা মনে হয় তা হলো—আমাদের জীবনে তাঁর জীবন ও উপদেশের উপযোগিতা কোথায়? তা না হলে শুধু তাঁর কথা বললে, তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার করেছেন—এই বললেই যথেষ্ট হয়। অনেকের ধারণা, সাধারণ মানুষের জীবন ধর্মকে বাদ দিয়েও চলে। কারণ আমাদের খাওয়া, পরা, ভাবনা—এসবে তো কোন বাধা হয় না। ধর্মে বিশ্বাস করে না—এমন লোকও অনেক আছে। তাদের তো কোন অসুবিধা হয় না। কাজেই যারা ভগবানকে উপাসনা করে, ভগবানে বিশ্বাস করে তাদের কী বিশেষ লাভ—এটাই ভাববার কথা।

মানুষের জীবনে যেন দুটো দিক আছে। একটা দিক—তার খেয়ে-পরে, সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা। এসবের জন্য ভগবানের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা নয়। আরেকটা দিক হলো মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলা, তাহলেই সে শান্তিতে থাকতে পারে। এই সদ্ভাব রাখার জন্যও যে ভগবানের খুব প্রয়োজন আছে, তাও নয়। কারণ, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ভগবানে বিশ্বাস না করেও বেশ সম্মানের সঙ্গে এসমাজে বাস করছেন এবং ভগবান ছাড়া তাঁদের বেশ কেটেও যাচ্ছে।

সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, ভগবানকে ভাববার প্রয়োজন কোথায়? এখানেই আরো একটু তলিয়ে দেখতে হয়। যারা কেবল খাওয়া-পরা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আছে—তাদের জীবনকে বলা হয় পশুর জীবন। পশুপাখিরা এরকমই জীবন কাটায়—খায়, থাকবার জায়গা খোঁজে, তার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে নেয়। যেখানে খাবার পায় সেখানে যায়, তাদেরও সহানুভূতি আছে। একজনের বিপদে অপরে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সামাজিক হয়ে বেঁচে থাকার উপযোগী গুণগুলি তাদের মধ্যেও আছে। তাদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মানুষ খেয়ে-পরে, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলেও তার আরো কতগুলি অভাববোধ আছে। সেই অভাববোধ না মেটা পর্যন্ত তার এইসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রুচিকর বোধ হয় না। হয়তো সকলের পক্ষে একথা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু এই মানুষই যখন সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থাকে, তখনো তার ভিতরে কিছু অসন্তোষ, কিছু অপূর্ণতাবোধ থাকে। মনে হয়, কিছু যেন পাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু পাওয়া হয়নি। এই বোধটি মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে রেখেছে। পশুদের এই বোধ নেই।

তবে হয়তো অনেকের জীবনে এই বোধটি জাগ্রত হয়নি। কিন্তু যখন মানুষ কেবল খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যাপৃত না থেকে একটু উন্নত চিন্তা করে, যখন একটা উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়—তখন ঐ আদর্শের অনুসরণ করতে করতে সে এমন একটা জিনিস চায়, যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে বা ভোগ করতে পারছে না। এই যে অভাববোধ, এই যে অপূর্ণতা, অসন্তোষ—এটিই তাকে ক্রমশ উন্নতির দিকে, তার উচ্চতম আদর্শের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই উচ্চতম আদর্শের যে-পরাকাষ্ঠা, তাকেই আমরা এককথায় বলি 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর'। 'ঈশ্বর' মানে আমাদের আদর্শের পূর্ণতা। এখন সেই ঈশ্বর কাল্পনিক কিনা তা বুদ্ধির সাহায্যে হয়তো এখনি ব্যাখ্যা করা যাবে না, কিন্তু এরকম আদর্শ যে আছে মানুষকে তা ধীরে ধীরে স্বীকার করতেই হবে।

সেই আদর্শ কিরকম?—আমাদের সমস্ত রকম অপূর্ণতার পূর্ণতা থাকবে তাঁর মধ্যে। যেমন তিনি হবেন সর্বজ্ঞ। আমাদের জ্ঞান সীমিত, তাঁর জ্ঞান হবে অসীম। আমাদের শক্তির সীমা আছে, একটা সীমার পরে আমরা আর যেতে পারি না। তখন আমাদের আদর্শ হবেন এমন একজন—যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর শক্তির কোন সীমা নেই। এছাড়াও মহত্তর আদর্শ যেগুলি, যেমন দয়া, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা—এগুলিরও যেখানে পরাকাষ্ঠা, তাঁকেই বলি 'ঈশ্বর'। আমরা জন্মালাম, দুদিন বাদে মরে গেলাম—তিনি সেইরকম নন। তাঁর সত্তা নিত্য। এছাড়া সংসারে আমরা যে যত আপাত সুখের ভিতরেই থাকি না কেন, মাঝে মাঝে দুঃখ আসছে। কিন্তু তাঁর কোন দুঃখ নেই। মানুষ যেগুলি ভোগ করছে অর্থাৎ রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—এইগুলি যাঁর নেই, তাঁকেই আমরা বলছি 'ঈশ্বর'। এককথায় বলা যায়, সর্বপ্রকার কল্যাণবোধসমূহের যেখানে পূর্ণতা, তাঁকেই আমরা বলি 'ঈশ্বর'।

এখন সেই ঈশ্বরকে যখন ভাষা দিয়ে প্রকাশ করি, তখন আমাদের নিজেদের সংস্কার-পরম্পরা অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে আমরা পুরুষানুক্রমে যা দেখে, শুনে বা শিখে আসছি, তার দ্বারা আমাদের চিন্তা-কল্পনা প্রভাবিত হয়। এইজন্যই ধারণাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে কতকটা ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'কতকটা' এইজন্য বলছি যে, খানিকটা মিল আছে, আবার অনেকটা অমিলও আছে। তার কারণ, আমাদের বোধ ভিন্ন ভিন্ন এবং এইজন্য আমাদের ঈশ্বরের ধারণা একরকম নয়। আমার ধারণা একরকম, আমার প্রতিবেশীর ধারণা অন্যরকম। বাইরের দেশের লোকের ধারণা আবার আরেক রকম। স্বভাবত মানুষে মানুষে এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। ঈশ্বরকে যদি সবাই অনুভবের ভিতর দিয়ে যাচাই করে নিতে পারতাম, তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন ধারণাগুলি থাকত না এবং এইগুলির মধ্যে একটা একত্ব থাকত। যেহেতু সেইরকম অনুভব আমাদের হয়নি, সেইজন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই এক বস্তুকে প্রকাশ করি।

বহু বিচিত্র এই ধারণাগুলি। কিন্তু এদের মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত সাদৃশ্য বা ঐক্যও দেখতে পাওয়া যায়। অল্প কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের সমস্ত জীবনের প্রচেষ্টা এই অন্বেষণেই কেন্দ্রীভূত। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা অন্যান্য ভাবের মানুষেরা ঐ উচ্চতম আদর্শ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। তাঁদের গবেষণা কেবল বুদ্ধির সাহায্যে নয়, জীবনের ভিতর দিয়ে ঐ উচ্চতম সত্য সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁরা যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যে-ধারণা প্রকাশ করেছেন—সেগুলি গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে এক-একটি ধর্মরূপে পরিচিত হয়েছে। সেইসব প্রবক্তা বা প্রথম প্রচারকদের নামে ধর্মগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন যিশুর ধর্ম, মহম্মদের ধর্ম, বুদ্ধের ধর্ম ইত্যাদি।

এইরকম অনেকগুলি ধর্ম, আবার ধর্মগুলির ভিতরেও নানা বিভাগ বা উপধর্ম আছে। খ্রিস্টানদের ভিতরে আছে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক। এদের ভিতরেও আবার অনেক ভেদ আছে। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। যেমন বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা—হীনযান ও মহাযান। তাদের মধ্যেও পরে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার সৃষ্টি হয়েছে। মহম্মদের প্রচারিত ইসলাম ধর্মেও শিয়া ও সুন্নি দুটি বিভাগ। তারও মধ্যে আউলিয়া, সুফী প্রভৃতি আরো বিভাগ আছে। এই বিভেদগুলি কেন হয়? মানুষের মনের বৈচিত্র্যের জন্য। আমাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই আদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও হয় ভিন্ন ভিন্ন।

কেউ কেউ বলেন—যেহেতু ধর্মের মধ্যে এত বিভেদ, সেহেতু বুঝতে হবে যে, এর মধ্যে কোন সত্য নেই। সত্য থাকলে সকলে সেই সত্যকে জেনে একমত হতে পারত। যেমন বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তরূপে মেনে নেওয়া হয়, ধর্ম সম্বন্ধে তেমন সর্ববাদিস্বীকৃত মত কোথাও পাওয়া যায় না। এইজন্য অনেকে বলেন, ধর্ম একটি মনগড়া বস্তু—যা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে কোনরকমে সুখসুবিধা লাভ করার জন্য মানুষকে দলবদ্ধ করে নেয়। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে একই সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি। বিভেদ খুঁজতে গেলে অনেক আছে, কিন্তু সমস্ত বিভেদের মধ্যেই আবার ঐক্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"সব শিয়ালের এক রা।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', গুরুভাব দ্বিতীয়ার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়) অর্থাৎ সব শিয়াল একরকম করে ডাকে। 'শিয়াল' মানে যাঁরা ভগবানকে অনুভব করেছেন, দর্শন করেছেন। তাঁদের সকলের বর্ণনা একইরকম। ভাষা-ভঙ্গি বিভিন্ন, কিন্তু তত্ত্বটি অভিন্ন। তবে এরকম লোকের সংখ্যা বিরল। কারণ, ভগবানকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, ধর্মজীবনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করার মতো মানুষ কম। তার ওপর আবার ঈশ্বরকে জীবনে অনুভব করেন আরো অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এবং অন্যের পথে চলে তার অনুভবের সঙ্গে নিজের অনুভবকে মিলিয়ে দেখার সামর্থ্য বা ইচ্ছা আরো বিরল।

সব ধর্মের মধ্যেই আপাত পার্থক্য আছে। কিন্তু যখন অনুভব হবে, তখন কতকগুলি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন, ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, প্রেমময়—এগুলি সব ধর্মে আছে। তিনি আমাদের রক্ষক—একথা সকলেই মানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভেদ হচ্ছে এইজন্য যে, ধর্মকে আমরা যেসব পোশাক পরিয়ে দেখি, সেই পোশাকগুলি বিচিত্র। একই ব্যক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধান করে, তাহলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখব। পোশাকগুলি যদি ছাড়িয়ে ফেলা যায়, তাহলে দেখব এক। আমরাও ভগবানকে নানান পোশাক পরিয়ে আমাদের মনের মতো করে সাজিয়ে দেখি। তাই তাঁকে বিভিন্ন দেখি এবং সেই বিভিন্নতা ততদিন থাকবে যতদিন না আমরা ঐসমস্ত পোশাকগুলি খুলে দিয়ে তাঁকে স্বস্বরূপে দেখতে পাচ্ছি। সেইরকম ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। আর তাঁরাও যখন আমাদের বোঝাবেন, তখন আমরা ভাল করে বুঝব না; কারণ আমাদের বুদ্ধি কতকগুলি সংস্কারের ভিতর দিয়ে কাজ করছে। তাই তাঁদের কথারও আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করব। কাজেই এইভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এবং শুধু নিজের উপলব্ধি নয়, অপরের উপলব্ধিগুলিকেও নিজের জীবনে অনুভব করেছেন—এমন যদি কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর কথা আমাদের সকলের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইরকম একটি চরিত্র। এই একজন মহামানব—যিনি বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই ধর্মের চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। ঐ উপলব্ধির পর তিনি বলেছেনঃ "সব শিয়ালের এক রা।" আরো বলেছেনঃ "আমার ধর্ম ঠিক, আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে 'গড্', কেউ বলে 'আল্লা', কেউ বলে 'কৃষ্ণ', কেউ বলে 'শিব', কেউ বলে 'ব্রহ্ম'। যেমন পুকুরে জল আছে। এক ঘাটের লোক বলছে 'জল', আরেক ঘাটের লোক বলছে 'ওয়াটার', আরেক ঘাটের লোক বলছে 'পানি'। হিন্দু বলছে 'জল', খ্রিস্টান বলছে 'ওয়াটার', মুসলমান বলছে 'পানি'—কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক-একটি ধর্মের মত এক-একটি পথ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়।" ('কথামৃত', ৩।৪।৪)

সুফীদের ভিতর প্রচলিত একটি গল্প আছে। কয়েকজন লোক আরবের মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। তাদের খুব তেষ্টা পেয়েছে। একজন বলছে—এইসময় কিছু আঙুর পেলে বেশ হতো। তখন আরেকজন বলল—না, না। আঙুর নয়, অমুকটা পেলে বেশ হতো। আরেকজন বলছে—আরে না, না, ও কিছু কাজের নয়; এইটা পেলে বেশ হতো। এমনভাবে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ, ঝগড়া হচ্ছে। এমন সময় একজন মাথায় করে একঝুড়ি আঙুর নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে একজন বলল—আমি তো এর কথাই বলছিলাম। অন্যরাও একই কথা বলল। তার মানে তাদের ভাষাগুলি ছিল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তারা চাইছে একই জিনিসকে। সেইরকম জল একই, সকলেরই পিপাসার নিবৃত্তি তাতে হয়, কিন্তু ভাষা ভিন্ন ভিন্ন।

ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু আমিও যাঁকে চাইছি, মুসলমান বা খ্রিস্টানরাও তাঁকেই চাইছে। অন্যান্য ধর্মমতের লোকও তাঁকেই চাইছে। কেবল গোলমাল হচ্ছে প্রকাশের ভঙ্গি নিয়ে। মানুষের ভিতরে এই যে-মতপার্থক্য, সেইটি দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাই তিনি বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করলেন, করে একই পরমেশ্বরকে আস্বাদন করলেন। প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বললেনঃ "যত মত তত পথ"। যত ধর্মমত, সাধনপথও তত। মতগুলি চরম কথা নয়, সেগুলি সত্যে পৌঁছানোর পথ মাত্র। এইসব মতের ভিতর দিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছানো যায়, সেটি হলো একই সত্য। ভিন্ন ভিন্ন পথ একই গন্তব্যে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে এবং সেখানে পৌঁছানোর পর আর কোন বিভিন্নতা নেই।

কোন একটা পাহাড়ের উচ্চ শিখরে যেতে হবে। যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তা আছে। নানা জনে নানা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যখন যাচ্ছে তখন একজনের থেকে আরেকজনের দূরত্ব অনেক। কিন্তু যত শিখরের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে তত তাদের পারস্পরিক দূরত্ব কমছে। আর যখন তারা শিখরে পৌঁছে গেল, তখন দেখল যে সেইসব বিভিন্ন পথ একই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এইটি বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণের আবিষ্কার এবং বর্তমান যুগের জন্য এই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। তিনি এটিকে দেখিয়ে গেলেন, শুধু দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবেই নয়, বিচারের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে নয়—সাক্ষাৎ অনুভূত সত্য হিসাবে। উপলব্ধির দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি বললেনঃ "যত মত তত পথ"।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা এখানে তার মধ্যে প্রধান দুটি আলোচনা করলাম, যা আমাদের বস্তুমুখী, ভোগমুখী জীবনকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন। এর একটি হলো আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা, আর অপরটি হলো পরমতসহিষ্ণুতা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে অনুধ্যান করি, তাহলে দেখতে পাব তাঁর জীবন এই দুই বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা। সেই শুদ্ধ জীবনকে অনুসরণ করলেই আমাদের নিজেদের মন আরো সূক্ষ্ম হবে, শুদ্ধ হবে, সত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষা হবে। জীবন পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে এবং সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে আমরা দেখতে পাব—'শিবমহিম্নস্তোত্র'-এ যেমন বলা হয়েছে—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

অর্থাৎ ত্রিবিধ মন্ত্রাত্মক চতুর্বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈবাগম, বৈষ্ণবতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে 'এটাই শ্রেষ্ঠ, ওটাই সবচেয়ে শুভকর'—এরকম বুদ্ধি আছে বলেই লোকে নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে। কিন্তু নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি তুমিও সকল মানুষের একমাত্র গতি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বিষয়াভিমুখী মনকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করে আমাদের পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যান। আমাদের জীবন যেন সার্থক করে দেন।* ❑

* পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি। ভাষণটির স্থান ও তারিখ অজ্ঞাত।

আশ্বিন ১৩১০
সেপ্টেম্বর ১৯০৩

স্বামীজীর কথা

(স্বামী শুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত)

১। ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?—ভক্তি তোমার ভিতরেই আছে, কেবল তাহার উপর কামকাঞ্চনের একটি আবরণ পোড়ে [পড়ে] রয়েছে, উহা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা আপনি প্রকাশ হবে।

২। জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

৩। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কর্ম্মযোগের উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

৪। ধর্ম্ম একটা কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ জিনিষ। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বইপড়া পণ্ডিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৫। একসময়ে স্বামীজী কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করেন, তাহাতে তাঁহার নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, "কিন্তু সে আপনাকে মানে না", তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ কচ্চে [করছে], এই সে প্রশংসার পাত্র।"

৬। আসল ধর্ম্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশের কোন অধিকার নেই।

৭। কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন-ভজন কোরে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম কত্তে [করতে] হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?—তোমরা দুটো জিনিষ গোল কোরে ফেলছো। কর্ম্ম মানে এক জীবসেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া কারু অধিকার নাই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা কত্তে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্চে।

৮। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর যেদিন থেকে বড়লোককে খাতির আরম্ভ হবে, সেইদিন থেকে তার পতনের আরম্ভ।

৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যেরূপ ভাবের (Feelings) বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

১০। অসৎ কর্ম্ম কত্তে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে কর্ব্বে [করবে]।

১১। গোঁড়ামী দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম্মপ্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়া একটা উচ্চপথে তুলিয়া দেওয়াতে দেরী হইলেও পাকা ধর্ম্মপ্রচার হয়।

১২। সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

১৩। সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই হয়ে যাবে।

১৪। গুরুর আশীর্ব্বাদে শিষ্য না পোড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

১৫। গুরু কাকে বলা যায়? যিনি তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ বোলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

১৬। আচার্য্য যে সে হতে পারে না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার সমুদয় জগৎ স্বপ্নবোধ। কিন্তু আচার্য্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্যজ্ঞান চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হোলো, তবে তিনি ত সাধারণ লোকের মত হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন? আচার্য্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্যদের শরীরে ব্যাধি আদি হয়, কিন্তু কাঁচা হলে উহা তার মনকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, সে পড়ে যায়। আচার্য্য যে সে হতে পারে না।

১৭। এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বোলে বুঝতে পার্ব্বে [পারবে]।

[সংবাদ]

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির কথা উদ্বোধনে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সেবাবিভাগের কার্য্য ছাত্রবৃন্দের দ্বারা অতি উদ্যমের সহিত চলিয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতার্থ ইঁহাদের ১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আগস্ট পর্য্যন্তের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। আশা করি, এই সদুদ্যমে বাগবাজার পল্লীনিবাসী সকল সহৃদয় ব্যক্তিই যোগদান করিয়া আপনাদের পল্লীকে কলিকাতার আদর্শস্বরূপ করিবেন এবং অন্যান্য স্থানের ছাত্রবৃন্দও ইঁহাদের সৎকার্য্যের অনুকরণ করিয়া আপনা-দিগকে উন্নত এবং দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

৬ মাসে প্রতি রবিবার বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া ৫৫॥ ৭ চাল সংগ্রহ হয় এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫ জনকে ৪৫।৫ চাল সাহায্য করা হয়। কতিপয় উদারচেতা মহোদয়গণ দয়াপরবশ হইয়া চালের সহিত পয়সাও দিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা চাল না দিয়া মাসিক কিছু কিছু দিয়া থাকেন। এইরূপে সমিতির তহবিলে ১৩॥৶০ জমিয়াছে। সমিতির সহকারী সম্পাদক মহাশয় হাঁড়ীক্রয়ার্থে ৭ এবং লোকের বাড়ী বাড়ী চাল পৌঁছিয়া দিয়া আসিবার কারণ একটী ঠেলাগাড়ীর জন্য ৩॥৶০ দিয়াছেন।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীদুর্গাতত্ত্ব

নিরঞ্জন রায়

দনুজদলনী মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গা এই উপমহাদেশে বহুকাল থেকেই পূজিতা হয়ে আসছেন। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। বসন্তকালে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য প্রথম এই পূজা করেন, পরে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধ উপলক্ষ্যে শরৎকালে করেন। বর্তমানে বাংলার ঘরে ঘরে এই শারদীয়া পূজাই উৎসবের আকার ধারণ করেছে। হিন্দুধর্মে যত পূজা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে দুর্গাপূজাই সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ।

অবশ্য বৈদিক যুগ থেকেই শক্তিময়ী নারীর সাধনা এদেশে প্রচলিত ছিল। 'শক্তি' শব্দটি স্ত্রীবাচক। ভারতবর্ষে নারীমূর্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা ও উপাসনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নারী বা পুরুষ নন, মহাশক্তি। আর সেই মহাশক্তির অংশরূপিণী নারীশক্তি আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমানা এবং এই নারীশক্তির অবমাননাতে ধ্বংস অনিবার্য। মনুসংহিতায় আছে—"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" অর্থাৎ যেখানে নারীরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে, সেখানেই দেবতা বিরাজ করেন। কিন্তু আমরা বুঝতে না পেরে অজ্ঞানবশত নারীদের কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী [illegible] দেখে নানাবিধ ব্যাধি, দুঃখ ও অশান্তিতে ভুগছি। [illegible] মুগ্ধ হয়ে আমরা বিষয়বাসনা ও ভোগবিলাসে আরো ডুবে যাচ্ছি। মায়াতে আমরা এমনই বদ্ধ হয়ে আছি যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারি না। কোনমতে হুঁশ [illegible] না, ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। মহামায়ারূপী এই নারীশক্তিই সর্বশক্তির আধার হিসাবে যুগ যুগ ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন। দুর্গাপূজার মধ্য দিয়ে আমরা সেই বিশ্বপ্রসবিণী, জগৎপালনী মহামায়াকে পূজা করি—যাঁর কৃপা ভিন্ন ইহ ও পরত্র কোন লোকেই মানুষ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

মহাদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে ধনৈশ্বর্যের আধাররূপা মহালক্ষ্মী ও সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশরূপী গণদেবতা, বামে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বিদ্যারূপিণী বাগ্দেবী সরস্বতী এবং শৌর্য-বীর্য ও পৌরুষের প্রতীক কৌমার্যশক্তির আধাররূপী দেবসেনাপতি কার্তিক বিরাজমান। ঊর্ধ্বে চালচিত্রে সদামঙ্গলময় দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত। দেবীর দক্ষিণ পদতলে মহাবল বাহন সিংহ এবং বাম পদতলে ছিন্নমুণ্ড মহিষের দেহ থেকে সমুত্থিত দুর্ধর্ষ মহিষাসুর বিরাজিত। সিংহ পশুরাজ ও মহিষাসুর অসুরপতি। তারা সমগ্র পশুশক্তি ও অসুরশক্তির প্রতীক। উভয়ই মহাদেবীর পদানত, অর্থাৎ মা দুর্গা সমস্ত পশুশক্তি ও অসুরশক্তির ঊর্ধ্বে বিরাজিতা। অতএব যাবতীয় পাশবিক ও আসুরিক স্তর অতিক্রম না করলে দেবীর প্রসাদ লাভ করা যায় না।

মহাদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রতীকরূপে 'কলা বউ' পূজিতা হন, যার শাস্ত্রীয় নাম 'নবপত্রিকা'। নবপত্রিকা হলো নয়টি গাছের সমন্বিত রূপ। কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান—এই নয়টি গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা বেষ্টন করে 'কলা বউ' সাজানো হয়। সমষ্টিগতভাবে মা দুর্গার প্রতিনিধিরূপে এদের অর্চনা করা হয়। নবপত্রিকা উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি, মা দুর্গা উদ্ভিদ জগতেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই নিখিল বিশ্বের সমস্ত উদ্ভিদে মহামাতৃকা-রূপে স্থিতা জগন্মাতা দুর্গাকে 'কলা বউ'-এর মাধ্যমে প্রণাম জানিয়ে আমরা প্রার্থনা করি—মা, নিখিল বিশ্বে সর্বত্র বিরাজমানা তুমি আমাদের সকল ভয় থেকে রক্ষা কর, আমাদের যথার্থ কল্যাণ বিধান কর।

যদি মা দুর্গাকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণ অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি দুই-ই লাভ হয়। অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় বিশেষ বিশেষ কার্য সাধিত হয়, কিন্তু শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় মানবজীবনের সার্বিক মঙ্গল অর্জিত হয়। এতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলই লাভ হয়। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের [illegible]সায় কখনো দেবমূর্তিতে, কখনো বা দেবীমূর্তিতে আবির্ভূত হন এবং ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। [illegible] গাইতেন ঃ "নমো নমো মা দুর্গা নমো নারায়ণী/ কখনো বা পুরুষ হও, কখনো বা রমণী।/ রামরূপে ধর ধনু [illegible]রূপে বাঁশি,/ ভুলালি শিবের মন হয়ে এলোকেশী।" প্রকৃতপক্ষে তিনি নারীও নন, পুরুষও নন—মহাশক্তি। যেহেতু 'শক্তি' কথাটি আভিধানিক অর্থে স্ত্রীবাচক, সেহেতু তাঁকে মাতৃ (নারী)-মূর্তিতে উপাসনা করা হয়। তাই আমাদের আকুল [illegible]নে কল্যাণময়ী মা দুর্গা আমাদের মাঝে আবির্ভূতা হন। আসুন আমরা সমবেত হই তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। এই শুভলগ্নে অতীতের সকল গ্লানি, দুঃখ-বেদনা ও দ্বেষ-বিবাদ ভুলে এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে আমরা সত্যের সন্ধানে ব্রতী হই, দেশ, জাতি তথা বিশ্বের শান্তিকামনায় সঙ্কল্পগ্রহণ করি।

মহিষমর্দিনী দেবীর রূপ অপার মহিমান্বিত ও অপূর্ব ভাবব্যঞ্জক। তিনি সিংহারূঢ়া, ত্রিনয়না, যেমন সুমনোহরা তেমন অতি ভয়ঙ্করী। দশহস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করে শরণাগত দীনার্তকে সর্বদা দশ দিক থেকে তিনি রক্ষা করছেন। আবার ঐসকল অমোঘ অস্ত্রসকল দেববিদ্বেষী অসুরকূল অর্থাৎ সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশেও সর্বদা সমুদ্যত। তিনি ক্রিয়াশক্তিরূপে কালিকা, সদ্রূপা ইচ্ছাশক্তিরূপে মহালক্ষ্মী এবং চিদ্রূপা জ্ঞানশক্তিরূপে মহাসরস্বতী। দেবীর এই ত্রিমূর্তি। সকল বস্তুতে বিরাজিতা বিশ্বজননী মা দুর্গা ব্রাহ্মীরূপে সৃষ্টি করেন, বৈষ্ণবীশক্তিরূপে পালন করেন এবং শিবাণীরূপে সকল বস্তুর পরিণতি বিধান করেন। মা বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী। তোমাকে প্রণাম। ❑

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার নবম পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি।—সম্পাদক

১৩১৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস (অক্টোবর ১৯০৭)। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চলছে। শ্রীশ্রীমা তখন অসুস্থ অবস্থায় জয়রামবাটীতে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা, শ্রীশ্রীমা যেন এবার দুর্গাপূজায় তাঁর বাড়িতে আসেন।

গিরিশচন্দ্র ও তাঁর দিদি দক্ষিণাদেবী তাঁদের অন্তরের আকুল আর্তি জানিয়ে স্বামী সারদানন্দের মাধ্যমে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে পত্র পাঠালেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্মতি পেলে গিরিশচন্দ্র তাঁর পাথেয় পাঠিয়ে দেবেন বলে পত্রে জানালেন।

ম্যালেরিয়ায় ভুগে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ থাকলেও তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে অসুস্থ শরীর নিয়ে কলকাতায় আসতে সম্মত হলেন। পরে যথাযথ ব্যবস্থানুসারে শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের বাড়ির কাছেই বলরাম বসুর বাড়িতে বলরাম-মন্দিরে এসে উঠলেন; ওখানেই তাঁর বাসের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল। পরের দিন গিরিশচন্দ্রের দিদি এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে জানালেন, তিনি আসায় তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কারণ, গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শ্রীশ্রীমা এই পূজায় না এলে তিনি পূজা বন্ধ করে দেবেন।

বলরাম-ভবনে সপ্তমীর দিন সকাল থেকেই দলে দলে ভক্ত এসে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি শত শত ভক্তের প্রণাম গ্রহণ করলেন। তারপরে গিরিশ-ভবন থেকে সংবাদ পেয়ে সেখানে গেলেন এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সামনেই 'কল্পারম্ভ' হলো। শ্রীশ্রীমা আসার আগে গিরিশচন্দ্র প্রতিমার সামনে বসে গান ধরেছিলেন—"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।" সেই সময় শ্রীশ্রীমা সদলে সেখানে এসে উপস্থিত হন। গোলাপ-মায়ের হাত ধরে তিনি পূজার দালানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে চলে যান অন্দরমহলে। গিরিশচন্দ্র তখন গাইছেন—"এবার নিতে এলে বলব হরে, উমা আমার ঘরে নাই।" গানের এই শেষ কলিটি শ্রীশ্রীমা শুনলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পূজার দালানে এলেন মহিলা ভক্তদের সঙ্গে। দেবীর চরণে তিনি পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ প্রথমে মা দুর্গা এবং শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী আশুতোষ মিত্র লিখেছেন: "একই পূজার দালানে একদিকে প্রতিমার পাদমূলে স্তূপীকৃত ভক্তদের পত্র-পুষ্পরাশি, অপরদিকে সজীব প্রতিমা শ্রীমায়ের চরণতলে তাঁহাদের ভক্তি-অর্ঘ্য-চিহ্নস্বরূপ বিল্বদল ও তুলসী-সহ চন্দনে চর্চিত পদ্ম-জবাদি নানাবিধ পুষ্পরাশি। এ এক অভাবনীয় অপূর্ব শোভা! গিরিশচন্দ্র ও ন-দিদি দক্ষিণাদেবী ধন্য হইলেন শ্রীমার করস্পর্শ দ্বারা আশীর্বাদলাভে এবং তদীয় ভবনে ভক্ত-পদধূলি প্রাপ্তে।"[১]

মহাষ্টমীর দিনেও শ্রীশ্রীমা বলরাম-ভবনে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করলেন; গিরিশ-ভবনেও তাই। তখন তাঁর শরীর অসুস্থ থাকলেও চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি সকলের পূজা গ্রহণ করলেন, কাউকেও ফেরালেন না। স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন: "মা অষ্টমীপূজার দিন ভাবাবেশে মিষ্টান্নাদি খেলেন।... জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, সেদিন আমি 'আমি' ছিলুম না।"[২]

যাই হোক, দুদিন ধরে এই পরিশ্রমের পর স্থির হলো, সন্ধিপূজায় মা উপস্থিত থাকবেন না। সেবার গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর দিদি সংবাদ পেয়ে দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যার পর খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন, শ্রীশ্রীমা আসতে পারবেন না। গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন, মা না এলে তিনি সন্ধিপূজা দেখতে আসবেন না। এদিকে সন্ধিপূজার কিছু আগে শ্রীশ্রীমা বিছানায় বসেই বললেন: "ও গোলাপ, ও যোগেন, চল গিরিশবাবুর বাড়ি যাব।" বলেই তিনি গায়ে ভাল করে মোটা একখানা চাদর জড়িয়ে নিলেন। সারা বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল। গাড়ি ডাকার তখন সময় নেই, তাই তিনি বলরাম-ভবনের পশ্চিমদিকের সরু গলি দিয়ে স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে হেঁটে গিরিশবাবুর খিড়কির দরজায়

সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দ্বারে আঘাত করে বললেন ঃ "আমি এসেছি।" সে-সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্বত্র প্রচারিত হলো। পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। শ্রীশ্রীমা সোজা পূজার দালানে চলে এলেন। সন্ধিপূজা আরম্ভ হতে তখন আর দেরি নেই।[৩]

প্রত্যক্ষদর্শী সিন্ধুনাথ পাণ্ডা লিখেছেন ঃ "গিরিশবাবু উপরের বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ছিলেন। মা আসিলেন না—এই অভিমানে সন্ধিপূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপেই যান নাই। এমন সময়ে সাড়া পড়িয়া গেল, মা আসিয়াছেন। সকলে তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে ছুটিয়া গেলেন। আমিও তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি, দেবীমূর্তির সম্মুখে উত্তর-পশ্চিমের কোণটিতে মা প্রতিমার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মানা, সমাধিস্থা। ভক্তগণ রাশীকৃত ফুল ও বেলপাতা লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতেছেন। সকলের দেখাদেখি আমিও অঞ্জলি দিলাম এবং অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। গিরিশবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া উল্লাসপূর্ণ গদগদস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম, আমার পুজোই হলো না। এমন সময় দরজায় ঘা দিয়ে বলছেন—আমি এসেছি।' "[৪]

অপর প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী প্রেমানন্দ জানিয়েছেন ঃ "ঠিক সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আসিয়া হাজির। আমরা অবাক! গিরিশবাবু আনন্দে অধীর! আবার অন্যদিকে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি ঘৃণ্য আর পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একসঙ্গে। এও এক অভিনব দৃশ্য!"[৫]

মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো সন্ধিপূজা। পরদিন নবমীপূজাও শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হলো। সেদিনও তিনি সকলের প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করলেন। গিরিশচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন, পরিচিত-অপরিচিত, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রী—কেউই বঞ্চিত হলো না।

এইভাবে পূজার তিনদিনই গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে মৃন্ময়ী প্রতিমার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা চিন্ময়ী জননীরূপে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় তিনি উপস্থিত থাকলেও সেবারের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।[৬]

গিরিশচন্দ্রের বাড়ির পুরনো নম্বর ছিল—১৩, বোসপাড়া লেন। কারণ, এই বাড়ির প্রধান ফটকটি বাড়ির উত্তরদিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বোসপাড়া লেনের ওপর ছিল। বর্তমানে এর ওপর দিয়ে 'গিরিশ অ্যাভিনিউ' নির্মিত হওয়ায় গলিটির পূর্ব অংশ বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর দক্ষিণে এবং পশ্চিম অংশটি গিরিশ অ্যাভিনিউ পোস্ট অফিস-এর উত্তর দিকে পড়েছে। গিরিশবাবুর এই বিশাল দু-মহলা বাড়ির খিড়কির দরজা (যেটি দিয়ে শ্রীশ্রীমা প্রবেশ করেছিলেন) ছিল দক্ষিণমুখে, অর্থাৎ নিবেদিতা লেন যেখানে শুরু হয়েছে, তার প্রায় সামনে। ১৯৫৬ সালে বাড়ির বেশির ভাগ অংশ ভেঙে গিরিশ অ্যাভিনিউ তৈরি হওয়ায় চারদিকে রাস্তার মাঝখানে এটিকে একটি দ্বীপের মতো দেখায়। দোতলার বৈঠকখানার পূর্বদিকে ছিল

শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য গিরিশ-ভবন। বাঁদিকে বারান্দা-যুক্ত দ্বিতল অংশটির ডানদিকের সংলগ্ন দুর্গাদালানের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। গিরিশবাবুর প্রপৌত্র বাবুল ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই আলোকচিত্রটি ১৯৫৬ সালে নিবেদিতা লেনের দিক থেকে গৃহীত। উক্ত দ্বিতল ভবনটির অংশবিশেষের বর্তমান আলোকচিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠায়।

গিরিশবাবুর শয়নঘর এবং এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল দুর্গাদালান। এটি ছিল দু-তলা সমান উঁচু। এর সামনে ছিল উঠান। বর্তমানে বাড়ির বৈঠকখানার সামান্য একটু আদি অংশ বিদ্যমান। অংশটি দোতলা। এইটিকে সংস্কার করে 'গিরিশ মেমোরিয়াল' বা 'গিরিশ স্মৃতি মন্দির' নামে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং দোতলায় একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকাটি ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—ভিতরে চারদিকে ফুলের গাছ—বাড়ির দক্ষিণ দিকে গিরিশচন্দ্রের একটি পূর্ণাবয়ব শ্বেতপাথরের মূর্তি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ির এই অংশটি ভক্তদের কাছে মহাতীর্থ। ❑
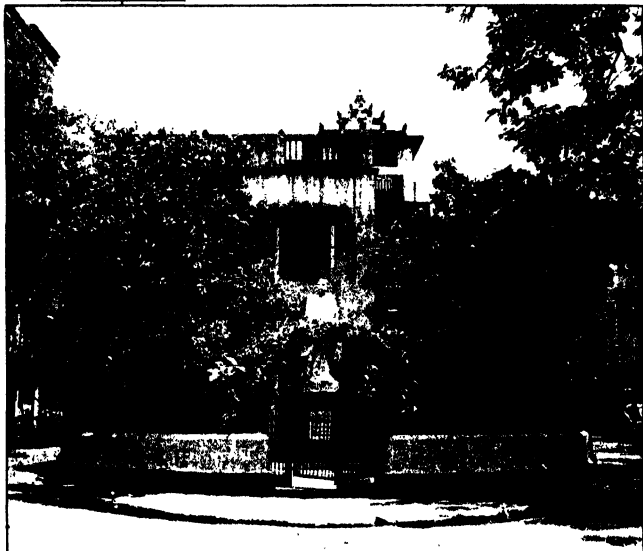
পথনির্দেশ : ঠিকানা—'গিরিশ স্মৃতি মন্দির', গিরিশ অ্যাভিনিউ, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে গিরিশ অ্যাভিনিউর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই বাড়িটিকে যেমন দক্ষিণদিকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ থেকে সরাসরি দেখা যায়, তেমনি উত্তরে চিৎপুর ব্রিজ থেকেও দেখতে পাওয়া যায়।

গিরিশ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি—এখন যেমন; নাট্যাচার্যের একটি মর্মরমূর্তি সম্মুখে স্থাপিত আছে।

আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা

১ শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, ১৯৪৪, পৃঃ ১০৭
২ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, ১৩৭৪, পৃঃ ৭৩-৭৪
৩ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২৯১
৪ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ৭৩
৫ ঐ
৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৬৫

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অনুষ্ঠান-সূচী : কার্তিক ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১৯ কার্তিক	বুধবার	৫ নভেম্বর ২০০৩
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২১ কার্তিক	শুক্রবার	৭ নভেম্বর ২০০৩

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	৭ কার্তিক	শুক্রবার	২৪ অক্টোবর ২০০৩
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	১৬ কার্তিক	রবিবার	২ নভেম্বর ২০০৩
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	২২ কার্তিক	শনিবার	৮ নভেম্বর ২০০৩

একাদশী-তিথি

৫, ১৮ কার্তিক বুধবার, মঙ্গলবার ২২ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর ২০০৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীত কয়েকটি সঙ্গীতের অর্থ প্রসঙ্গে

স্বামী প্রমেয়ানন্দ*

সঙ্গীতের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। সুর ও কাব্যের মিলনে যে অপরূপ ভাবের সৃষ্টি হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

সঙ্গীত ভগবৎ-আরাধনার একটি উপায়। সঙ্গীতে হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হয়ে মানুষকে যে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে—এটা ইতিহাস-স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক, ত্যাগরাজ, তুকারাম, কবীর, পুরন্দরদাস, সাধিকা মীরাবাঈ প্রমুখ বহু সঙ্গীত সাধক-সাধিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের স্বরতরঙ্গ তার কোমল সরস স্পর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবকে সহজেই ঈশ্বরমুখী হতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র সুমধুর কণ্ঠে নিখুঁত তাল, সুর ও লয়ে গীত সব সঙ্গীতই এই পর্যায়ে পড়ে না। সঙ্গীত যেমন হবে সুরবিন্যাসে সমৃদ্ধ, তেমনি হবে উচ্চ ভাবরাশিতে সুপুষ্ট। এরূপ সঙ্গীতই শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে, প্রাণে সাড়া জাগায়। কিন্তু ভাবহীন সঙ্গীত এটা করতে অসমর্থ। তাই সঙ্গীতে ভাবই মুখ্য। ভাবেই তার মাধুর্য। ভাবের সঙ্গে যখন ভাষা, সুর, তাল ও মানের মিলন ঘটে, তখনি সঙ্গীত পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর এখানেই সঙ্গীতের সার্থকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। 'কথামৃত'-এর পাতায় তার বহু নিদর্শন রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন শ্রুতিধরও। একবার যা শুনতেন তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। সে-যুগে বাংলার পল্লী অঞ্চলে বহুবিধ ভজন, কীর্তন ও লোকগীতি প্রচলিত ছিল। ঐসব গান শুনে শুনেই তিনি মুখস্থ করে ফেলতেন এবং উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে গেয়েও শোনাতেন। এত ভাবের সঙ্গে তিনি গাইতেন যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত; তখন তাদের মন যেন অন্য এক জগতে বিচরণ করত। এমনই ছিল তাঁর গানের আকর্ষণ। পরবর্তী কালেও লক্ষ্য করা গেছে, কেউ হয়তো কথাপ্রসঙ্গে কোন একটি কঠিন তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তিনি একটা গান গেয়ে অথবা গানের অংশবিশেষ শুনিয়ে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন। 'কথামৃত'-এ এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অর্থবোধে গানের মাধুর্য বর্ধিত হয়, ভাব গভীরতর হতে সাহায্য করে। তাই গানের সঙ্গে অর্থবোধ থাকাও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, সুর, কাব্য, ভাব ও অর্থবোধের সঙ্গমে গড়ে ওঠা সঙ্গীতই আদর্শ সঙ্গীত।

এমন অনেক গান আছে, বিশেষ করে দুরূহ তাত্ত্বিক গান—যার অর্থ সহজে বোধগম্য নয়। 'কথামৃত'-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন অসংখ্য গান। সেগুলির কোন কোনটি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গেয়েছেন, কোন কোনটি অন্যরা গেয়েছেন এবং তিনি শুনেছেন। আমরা এখানে 'কথামৃত' অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যেসব গান গেয়েছেন, তার দু-চারটির অর্থ আমাদের বোধসামর্থ্য অনুযায়ী আলোচনার চেষ্টা করব। এবিষয়ে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে, হয়তো এর মাধ্যমে তার কিছুটা নিবৃত্ত হতে পারে।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল, রবিবার। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় ভক্ত অধরলাল সেন তাঁকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সঙ্গে আগত বন্ধু। সারদাচরণের বড় ছেলেটি সম্প্রতি মারা গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি শোকে কাতর। পুত্রশোকসন্তপ্ত পিতা যাতে সান্ত্বনা পান সেজন্য অধর সেন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিয়ে এসেছেন। অধরের নিকট তাঁর বন্ধুর পুত্রশোকের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন মনে নিম্নোক্ত গানটি গাইলেন ঃ

"জীব সাজো সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।
আরেক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে।।"[১]

কথাগুলির অর্থ এরকম—সাজো সমরে = যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, কাল = যম বা মৃত্যু, ঘরে = দেহে, ভক্তিরথে

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের সদস্য এবং প্রাক্তন 'উদ্বোধন' সম্পাদক।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

চড়ি = ভক্তিরূপ রথে আরোহণ করে অর্থাৎ 'ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা'—এটি জেনে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে,' লয়ে জ্ঞানতূণ = জ্ঞান-বিচাররূপ বা সৎ-অসৎ বিচাররূপ তূণকে (বাণ রাখার আধার) সর্বদা সঙ্গে নিয়ে, রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ = যার দ্বারা নাম উচ্চারিত হয় সেই রসনা বা জিহ্বাতে প্রেমগুণ বা অনুরাগের রজ্জু সংযোজিত করে অর্থাৎ রসনারূপ ধনুকের জ্যা (ধনুকের ছিলা) হবে প্রেমরজ্জু, ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র = ব্রহ্মময়ীর নামরূপ ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ কর।

আরেক যুক্তি রণে = আরেকভাবেও সহজে শত্রুনাশ করা যায়, চাই না রথরথী = সে-যুদ্ধে রথরথী বা অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন নেই, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি = মৃত্যুরূপ শত্রু নাশ করার সহজ উপায় হবে, রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে = রণভূমি অর্থাৎ সাধনক্ষেত্র যদি ভাগীরথীর তীরে বা সংসার-কোলাহল থেকে দূরে নির্জন কোন স্থানে হয়।

মানুষ মরণশীল। 'জন্মিলে মরিতে হবে'—কথাটা ধ্রুবসত্য। এটি সত্য জেনেও মানুষ সর্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত। এই মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্বলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে এই অমৃতত্বলাভের নানা উপায়ের, নানা পথের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য গানের রচয়িতা ভক্ত দাশরথি রায় মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্বলাভের দুটি উপায়ের কথা এখানে বলেছেন। বলেছেন, কাল তোমার ঘরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ মৃত্যু তোমার দেহে প্রবেশ করছে। কাজেই এই কালের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। তার সঙ্গে যুদ্ধ কর। কিভাবে যুদ্ধ করবে? করবে 'ভক্তিরথে চড়ি' অর্থাৎ 'ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা' জেনে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যুদ্ধজয় করতে হলে যেমন রথের ওপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি মৃত্যুজয় করতে হলে ভগবানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ভগবন্নির্ভরতাই ভক্তিরথ। এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "তিনিই কর্তা।... তাঁকে আম-মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।"[২] কি কি যুদ্ধাস্ত্র থাকবে? সর্বদা সঙ্গে রাখবে 'জ্ঞানতূণ'—জ্ঞানবিচাররূপ, সৎ-অসৎ বিচাররূপ তূণ। তোমার যুদ্ধের ধনুক হবে জিহ্বা, সেই ধনুকের জ্যা (ধনুকের ছিলা) হবে ঈশ্বরে অনুরাগরূপ রজ্জু বা দড়ি। সেই ধনুকে ব্রহ্মময়ীর নামরূপ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করে অর্থাৎ সর্বদা তাঁর নামগুণগান করে যুদ্ধ কর। জয় অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্বলাভের আরেকটি উপায় আছে। সেটি হচ্ছে—যদি ভাগীরথীর তীরকে যুদ্ধক্ষেত্র করতে পার অর্থাৎ সংসার-কোলাহল থেকে দূরে কোথাও নির্জন স্থানে একান্ত মনে ব্রহ্মময়ীর নাম করতে পার, তাতেও মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্বলাভ করতে পারবে। মাতৃসাধক কমলাকান্তের একটি গানে আছে—'নামেতে কালপাশ কাটে'। 'কথামৃত'-এও দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের ঈশ্বরের নামগুণগান ও নির্জনবাসের কথা বারবার বলেছেন। তাঁর মতে, ভক্তের পক্ষে অধিক শাস্ত্রাদি পড়ার চেয়ে নির্জনে ঈশ্বরকে ডাকা ভাল। বলেছেন ঃ "দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাক।"[৩]

'কথামৃত'-এর সাতটি জায়গায়[৪] 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে' গানটির উল্লেখ আছে। তার মধ্যে চারটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সম্পূর্ণ গানটি গেয়েছেন, দুজায়গায় প্রসঙ্গক্রমে গানের দু-একটি পঙ্‌ক্তি গেয়ে শুনিয়েছেন এবং একজায়গায় তাঁর আদেশক্রমে মাস্টারমশাই ও অন্য একজন ভক্ত গানটি গেয়েছেন। সম্পূর্ণ গানটি এরকম—

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।।
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি-সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে।।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।।
সে-ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ নারে মন ঠারেঠোরে।।"

কথাগুলির অর্থ এরকম—তত্ত্ব কর = সন্ধান কর, তাঁরে = ঈশ্বরকে বা চৈতন্যময় পুরুষকে, উন্মত্ত = বিক্ষিপ্ত মন, আঁধার ঘরে = অজ্ঞানতার সংসারে, ভাবের বিষয় = শাস্ত্রাদিতে যেসব ভাবের কথা বলা আছে—নিজের মনের অনুসারী তার একটি ভাবকে আশ্রয় করে, শশী = মন বা মনোগত কামনা, শক্তিসারে = নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, কোঠার ভিতর = শরীরের মধ্যে, চোর-কুঠরি = গোপন মণিকোঠায় অর্থাৎ হৃদয়মন্দিরে, ভোর হলে = জীবনের দিন ফুরিয়ে এলে, সে যে ভক্তিরসের রসিক = চৈতন্যময় পুরুষ ভক্তিতেই আনন্দিত হন, পুরে = দেহে, মাতৃভাবে তত্ত্ব করি যাঁরে = 'মা কালীই পরব্রহ্ম'—এই তত্ত্ব জেনে আমি যাঁর ধ্যান ও চিন্তা করি, চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি = এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সর্বসমক্ষে বলার নয়, যথার্থ মরমীই এই তত্ত্বের প্রকৃত সমঝদার।

এই গান প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "ভাব-ভক্তি—এর মানে তাঁকে ভালবাসা। যিনি ব্রহ্ম, তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।...

"রামপ্রসাদ মনকে বলছে 'ঠারেঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলেছে—তাঁকেই আমি

'মা' বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি।... তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস।"[৫]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এপ্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "পাগল ও উতলা অন্ধ-মন নিয়ে যদি অজ্ঞানতার সংসারে বাস করে কেউ, তবে ভাবাতীত পরমতত্ত্বের সন্ধান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পরমতত্ত্বকে পেতে অর্থাৎ উপলব্ধি করতে গেলে যেকোন একটি ভাবকে (সন্তানভাব, দাস্যভাব প্রভৃতি) আশ্রয় করতে হয় নিজ শক্তি অনুযায়ী—তাও সময় থাকতে সাধন-ভজন ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই পরমতত্ত্বকে জানার চেষ্টা করতে হয়। নচেৎ 'ভোর হলে সে লুকাবে রে' অর্থাৎ ভোর হলে বা জীবনের দিন শেষ হলে সেই পরমধন—যা দেহের মধ্যে গোপন ও রহস্যময় মণিকোঠা হৃদয়পদ্মে সর্বদাই বিরাজ করছেন—তাঁকে আর পাওয়া বা জানা হবে না। তাছাড়া অগ্রে (সর্বপ্রথমে) শশীকে বশীভূত করতে হয়। শশী বলতে মন। মনকে বশীভূত করলে মন স্থির হয়ে স্বরূপচৈতন্যে রূপায়িত হয়, তবেই ভক্তিরসের রসিক—যিনি চৈতন্যময় পুরুষ, শরীরের মধ্যে বিরাজ করছেন—তাঁকে লাভ করে কৃতার্থ হয় মানুষ। আসলে অন্তরে যদি কোন ভাবের বিকাশ থাকে, তবেই চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে—তেমনি ভাবজগতের রসিক-চূড়ামণি রসঘন ভগবান ভক্তকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন ও পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটান। রামপ্রসাদ বলেছেন, এই ভাব লাভ করার জন্য কত বড় বড় যোগী যুগ যুগ ধরে ধ্যান করেন ও পরিশেষে ভাবগ্রাহী জনার্দন ভগবানকে লাভ করেন। রামপ্রসাদ নিজেই ছিলেন পরম ভাবজগতের সাধক। তিনি পরমব্রহ্মকে মাতৃরূপে চিন্তা ও ধ্যান করে পরিশেষে কালীব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি করেছিলেন। দুর্জ্ঞেয় ও পরম রহস্যময় এই তত্ত্ব। এ-তত্ত্ব যেখানে-সেখানে—হাটে-বাজারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সাধারণ জনসমাজে বলার ও প্রকাশ করার এই জিনিস নয়, যথার্থ মরমী যে—সেইমাত্র এই গূঢ় পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে।"[৬]

'কথামৃত'-এর দুটি জায়গায়[৭] 'মা, আমি কি আটাশে ছেলে' গানটি পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গানটি গেয়েছেন এবং অপর জায়গায় গানের অংশবিশেষ কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সম্পূর্ণ গানটি হলো—

"মা, আমি কি আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।।
সম্পদ আমার ও রাঙাপদ শিব ধরেন যা হৃৎকমলে।
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে।।
শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়েতে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।।
জানাইব কেমন ছেলে মকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে।।
মায়ে-পোয়ে মকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে।।"

আটাশে = যে-সন্তান আটমাসে জন্মেছে অর্থাৎ দুর্বল, ডিক্রি = আদালতের হুকুম, সওয়াল = জেরা, দস্তাবিজ = দলিল, গুজরাইব = দাখিল করব, মিছিল চালে = মকদ্দমার নথিপত্রে।

মাকে সন্তানের নিজস্ব করে পাওয়ার অধিকার—এটি চিরন্তন। কোন কিছুর পরিবর্তেই সন্তান এই অধিকার ছাড়তে চায় না, আর ছাড়তে পারেও না। সন্তান হিসাবে মায়ের সম্পত্তিতে তার আইনী উত্তরাধিকার—হিস্‌সা রয়েছে। তাই জোরজার করেও সে তার এই হিস্‌সা, এই অধিকার আদায় করবে। আর জোরজার, আবদার তো আপনজনের কাছেই করা চলে। সন্তানের কাছে মায়ের চেয়ে আপনজন, ভালবাসার জন আর কে হতে পারে? তাই তো তার যত জোর, আবদার সবই মায়ের কাছে। মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা কত গভীর হলে, তাঁকে কত আপনার বোধ হলে তবেই তার পক্ষে বলা সম্ভব—'মায়ে পোয়ে মকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে'। আলোচ্য গানটিতে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সন্তান বলছে—মা, তুমি মনে করো না যে, আমি আটাশে ছেলে অর্থাৎ দুর্বল, চোখ রাঙালেই আমি ভয় পেয়ে যাব! মোটেই না। আমি কার সন্তান জান? আমি সর্বশক্তিস্বরূপিণী ভবভয়হারিণী জগন্মাতা স্বয়ং তোমারই সন্তান। দেবাদিদেব মহাদেবও স্বয়ং যাঁর কৃপালাভের জন্য তাঁর শ্রীচরণ নিজ বক্ষে ধারণ করে আছেন, আমি সেই মায়ের সন্তান। এমন মায়ের সন্তান কি কখনো দুর্বল হতে পারে? কখনো না। কাজেই আমি কাউকে ভয় করি না, এমনকি তোমাকেও না। সুতরাং তুমি যদি আমার প্রাপ্য হিস্‌সা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও অর্থাৎ তোমার কোলে আমাকে টেনে না নাও, তবে তোমাকেও আমি ছাড়ব

না। আমি তখনি ক্ষান্ত হব 'যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ অল্প কয়েকটি কথায় গানটির মর্মার্থ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যার আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। তাঁর কথায়—"তোমার যে আপনার মা গো! এ কি পাতানো মা, এ কি ধর্ম-মা! এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে?"[৮] বলছেন ঃ "ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর।"[৯]

'কথামৃত' অনুযায়ী 'শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি' গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ দুবার[১০] গেয়েছেন। প্রথম তিনি গানটি গেয়েছেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর—কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে স্টিমারে ভ্রমণ করার সময়। দ্বিতীয়বার তিনি এই গানটি গেয়েছেন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে—দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেদার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করার সময়। সম্পূর্ণ গানটি হলো—

"শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার-বাজার মাঝে)।
(ঐ যে) আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়াদড়ি।।
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি।।
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।।"

ঘুড়ি = মানুষরূপ ঘুড়ি, ভবসংসার-বাজার মাঝে = সংসাররূপ বাজারে, আশাবায়ু = এষণারূপ বা কামনারূপ বায়ু, মায়াদড়ি = সংসারাসক্তিরূপ (স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মোহরূপ) দড়ি, কাক = সুখ-দুঃখযুক্ত জীবাত্মা, গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা = জীবাত্মা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আবদ্ধ অর্থাৎ দেহরূপ গণ্ডিতে আবদ্ধ, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি = মানুষরূপ ঘুড়ির কাঠামো তৈরি হয়েছে পাঁজরা, নাড়ি, হাড় ইত্যাদি দিয়ে, বিষয়ে = কাম-কাঞ্চনে, মাঞ্জা = ঘুড়ির সুতোয় লাগানোর জন্য কাঁচের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি আঠা, ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে = এক লক্ষের মধ্যে দু-একজন মানুষ মুক্ত হয়, দক্ষিণা বাতাস = অনুকূল বাতাস বা অনুকূল পরিস্থিতি।

সংসারকে এখানে বাজারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সংসার-বাজারে বিচিত্র রকমের জিনিস পাওয়া যায়। শ্যামা মা লীলাময়ী। তিনি লীলাচ্ছলে এই সংসার-বাজারে মনুষ্যরূপ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, আর লীলার অধীন মানুষও এই মায়ার সংসারে খেলা করছে। মায়ারূপ দড়িতে অর্থাৎ বিষয়ানন্দরূপ দড়িতে সেই ঘুড়ি বা মানুষ বাঁধা, কেননা মায়া বা বিষয়াসক্তি না থাকলে কোন লীলাই সম্ভবপর নয়। আশারূপ বায়ুতে সেই মায়ার দড়ি এদিক-ওদিকে উড়ছে। কাম-কাঞ্চনরূপ বিষয়ে এই দড়ি মাঞ্জা দিয়ে কর্কশ করা হয়েছে। কাজেই মানুষের সাধ্য নেই যে, মায়ার এই বিচিত্র খেলার সীমা অতিক্রম করে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। লক্ষের মধ্যে দু-একটি মানুষ মায়ার সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। 'গীতা'য় আছে—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।"[১১] শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ "তিনি লীলাময়ী। এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"[১২]

'কথামৃত'-এর চারটি[১৩] জায়গায় 'দোষ কারু নয় গো মা' গানটির উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গানটি গেয়েছেন, একবার বেলঘরিয়ার একজন গায়ক গেয়েছেন এবং দুবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে গানটির দু-এক পঙ্ক্তির উল্লেখ করেছেন। গানটি হলো—

"দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে-কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা।।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী—বিগুণ করেছে স্বগুণে,
কিসে এ-বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে।
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন
কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, কটাক্ষেতে
করে পার।।"

স্বখাত সলিলে = নিজের খোঁড়া গর্তে, কোদণ্ড = কোদাল, পুণ্যক্ষেত্র = শরীর, কালরূপ জল = মৃত্যুরূপ জল অর্থাৎ এই ভয়ানক সংসার, কাল-মনোরমা = মা কালী, বিগুণ = গুণহীন, স্বগুণে = নিজের গুণে (অর্থাৎ নিজের কর্মফলে), কক্ষে = কোমর পর্যন্ত, বক্ষে = বুক পর্যন্ত (অর্থাৎ যে স্বখাত-সলিল কোমর পর্যন্ত ছিল তা এখন বুক পর্যন্ত উঠেছে, পরিত্রাণের আশা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে)।

মানুষ সাধারণত নিজের ব্যর্থতার জন্য বা মন্দ ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়ী করে। এটা তার স্বভাব। সে বুঝতে পারে না বা অনেক সময় বুঝতে চায়ও না যে, তার নিজের কর্মফলই—'শুভে শুভ, মন্দে মন্দ' তার জীবনকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ "জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়।"[১৪]

তাই অন্যের ওপর দোষারোপ করা নিরর্থক। তা না করে বরং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নজর দেওয়া এবং সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল।

আলোচ্য গানটিতে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রচয়িতা মাতৃভক্ত দাশরথি রায় বলেছেন—আমার মন্দ ভাগ্যের জন্য আমি অন্যকে দায়ী করি না বা দোষারোপ করি না। আমার নিজের খোঁড়া গর্তে আমি নিজেই পড়েছি। ষড়্‌রিপুকে আমি বশ করতে পারিনি। তারা কোদালস্বরূপ। এই কোদাল দিয়ে আমি আমার দেহরূপ পুণ্যক্ষেত্রে কূপ খনন করেছি। অর্থাৎ দেহকে সাধন-ভজনের অনুপযুক্ত করেছি। তাই সেই কূপের মৃত্যুরূপ জল চারদিক থেকে আমাকে বেষ্টন করেছে। আমার যে কি গতি হবে তা আমি ভেবে পাই না। আমার নিজের কর্মই আমাকে গুণহীন করে এই অবস্থায় এনেছে। এখন এই মৃত্যুরূপ বারি আমি কিভাবে রোধ করব? মৃত্যু ধীরে ধীরে আমার সমস্ত শরীরকে গ্রাস করছে।

মানুষ যখন নিজ দোষে গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তা অল্পই থাকে, ক্রমে ক্রমে সে-কর্ম আরো বর্ধিত হয়। তারপর তা থেকে আর পরিত্রাণের উপায় থাকে না। "ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে"—গানের এই কলিটির মধ্যে এভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। তখন ভগবানের শরণ নেওয়া ছাড়া মানুষের অন্য কোন উপায় থাকে না। তাই ভক্ত বলছেন—মা, তুমি ছাড়া আমার কোন গতি নেই। আমি তোমার অপেক্ষায় দিন গুনছি। তুমি কৃপা করে আমাকে নিমেষে এই সংসারসমুদ্র থেকে উদ্ধার কর।

এই যে কালরূপ জল অর্থাৎ সংসার, তাতে কিন্তু জীব একবারই পতিত হয় না; স্বদোষে, নিজ কর্মফলে বারবার তাতে নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ বারবার এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর অধীনস্থ হয়। তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় জগজ্জননীর নিকট মুক্তিপ্রার্থনা। তিনি যদি কৃপাকটাক্ষে সমস্ত কর্মফল ও সংসারবন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করে দেন, তবেই মানুষের উদ্ধার হয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করে সে অমৃতত্বের অধিকারী হয়। ❑

তথ্যসূত্র

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ১৯৮
(২) ঐ
(৩) ঐ, পৃঃ ৮০০
(৪) ঐ, পৃঃ ৫৮, ১২৩, ১৪৯, ৪০৮, ৭৫৩, ৭৮৪, ১১০৭
(৫) ঐ, পৃঃ ৫৯
(৬) বাণী ও বিচার—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৬৫-২৬৬
(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ২৭৬, ৭৫৮-৭৫৯
(৮) ঐ, পৃঃ ৭৫৯
(৯) ঐ, পৃঃ ৭৫৮
(১০) ঐ, পৃঃ ৯৭, ৫২৭
(১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।৩
(১২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯৭
(১৩) ঐ, পৃঃ ১৯২, ১৯৭, ২৪৬, ৪১১
(১৪) ঐ, পৃঃ ১৯৭

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

১৯১৪ সালে দুর্গাপূজার পর মহারাজ কাশী থেকে মঠে এসেছিলেন। মহারাজকে পেয়ে সকলেরই প্রাণে খুব আনন্দ। শীত পড়েছে। একদিন বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) তাঁকে বললেন ঃ "মহারাজ, ছেলেরা যাতে নিয়মমতো জপধ্যান করে তুমি একটু বলে দিও।" মহারাজ নিয়ম করলেন—"শেষরাত ৪টের সময় ঘণ্টা দেওয়া হবে। সকলে আমার ঘরে এসে জপধ্যান করবে।" মহারাজ ৪টের আগেই উঠতেন। আমি তাঁর পাশের ঘরে থাকতাম। তাঁর ওঠার আওয়াজ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিতে যেতাম। তারপর তামাক সেজে দিতাম। তিনি তামাক খেতেন। ইতিমধ্যে অনেকেই এসে তাঁর ঘরে জপধ্যান আরম্ভ করে দিত। তামাক খাওয়ার পর তিনি ছোট খাটটিতে বসে জপ-ধ্যান করতেন।

মহারাজ একদিন জপধ্যান করার সময় বললেন ঃ "এই সময় মনকে এদিক-ওদিক নিয়ে গিয়ে চঞ্চল করো না। মন স্থির করে জপ কর; সেইসঙ্গে ধ্যান কর। মন্ত্রের উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া চাই। তা না হলে কাজ হয় না। তাড়াতাড়ি করো না।" কাউকে কাউকে তিনি বলেছেন ঃ "সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ রাত্রি-দিনের সংযোগ ভোর ও সন্ধ্যায় জপ করবে। ঐসময় অন্তত এক-হাজার জপ ও তৎসহ ধ্যান করবে। ঘুম পেলে চোখ চেয়ে জপ করবে, নতুবা দাঁড়িয়ে জপ করবে।"

প্রাতঃকালে জপধ্যানের পর স্তোত্রপাঠ হতো। তিনি কালী, শিব বা গোপালের স্তোত্রগুলির মধ্যে যেটি নির্দেশ করে দিতেন, তাই পাঠ হতো। তারপর ভজন। বিশ্ব মহারাজ (বিশ্বরঞ্জন, পরবর্তী কালে স্বামী হরিহরানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শিষ্য ও সেবক) ভজন গাইতেন। আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে গাইতাম। তারপর সকলে মহারাজকে প্রণাম করে ঠাকুরের দৈনন্দিন কাজে চলে যেত।

একদিন মহারাজ বললেন ঃ "তোমরা সাধু হয়েছ। বেশ করে জপধ্যান করতে হবে। এই জীবনেই যাতে তাঁকে লাভ করতে পার, তার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে শুধু ডাল-চচ্চড়ি খেয়ে মঠে পড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। তোমাদের এখন বয়স অল্প। এই বয়সই জপধ্যান করার উপযুক্ত। পরে আর কিছু হবে না। উঠেপড়ে লেগে যাও। অনর্থক সময় নষ্ট করো না। যেসময় যাচ্ছে সেসময় আর ফিরে পাবে না।" ব্রহ্মচারীদের কেউ কেউ অন্যত্র বসে জপধ্যান করত। মহারাজ কয়েকদিন লক্ষ্য করেছেন, দুজন তাঁর ঘরে আসে না। ঐ দুই ব্রহ্মচারীর একজনকে লক্ষ্য করে মহারাজ একদিন বললেন ঃ "সকলে আমার ঘরে জপধ্যান করতে যায়, কৈ তোমাকে তো দেখতে পাই না। তুমি জপধ্যান কর তো?" ব্রহ্মচারী বলল ঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ।" মহারাজ ঃ "কোথায় বস?" ব্রহ্মচারী ঃ "ঠাকুরঘরে।" মহারাজ ঃ "তা হবে না। কাল থেকে আমার ঘরে যেতে হবে।" অপর ব্রহ্মচারীর সামনে গিয়ে তিনি বললেন ঃ "কৈ তোমাকেও তো দেখতে পাই না। তুমি কোথায় বস?" সে বলল ঃ "স্বামীজীর ঘরে।" মহারাজ ঃ "বাঃ! কেউ ঠাকুরঘরে, কেউ স্বামীজীর ঘরে। সব বড় বড় ঘর বেছে নিয়েছ। আমরা যেন কেউ নই! আর ভারি সুবিধে। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট করলে বা না করলে, কে আর দেখতে যাচ্ছে! ওসব চলবে না। কাল থেকে সকলকে আমার ঘরে যেতে হবে। তা না হলে খ্যাঁট বন্ধ করে দেব। ভিক্ষে করে খেতে হবে।"

একদিন মঠে ভাণ্ডারা হচ্ছে। প্রচুর পায়েস হয়েছে। তিনি বললেন ঃ "আগে পায়েস খেয়ে পরে ভাত খাবে। তা না হলে ভাত খেয়ে পেট ভরে আর পায়েস খেতে পারবে না।" আমার কাছে এসে বললেন ঃ "শ্যামাচরণ কি জোলাপ নিয়েছিলে নাকি?" বালকস্বভাব মহারাজ ঘুরে-ফিরে ফষ্টিনষ্টি করে আনন্দ করছেন। স্বামী দিব্যানন্দের কাছে গিয়ে বললেন ঃ "ভোলা যেন দিনদিন তিলভাণ্ডেশ্বর হচ্ছে।"

এইভাবে শীতকালটা বেশ আনন্দে মহারাজের ঘরে জপ, ধ্যান, পাঠ, ভজনে কেটে গেল। গরমের সময় গঙ্গার

* শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, ১৯৬৪ সালে প্রয়াত হন।

ধারে বারান্দায় জপধ্যান হতো। বর্ষাকালে তখন মঠে বেশ ম্যালেরিয়া হতো। একবার মহারাজের জ্বর হয়েছে। তখন ভাদ্র মাস। আমি তাঁর কাছে থেকে কিছু সেবার কাজ করছিলাম। তিনি একদিন বললেন ঃ "দুটি পাখি রয়েছে। একটি আনন্দে মগ্ন হয়ে সাক্ষিস্বরূপ বসে আছে। অপরটি সুখদুঃখ ভোগ করছে।" আমায় লক্ষ্য করে বললেন ঃ "বুঝেছিস?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ মহারাজ, একথা মুণ্ডক উপনিষদে আছে।" মহারাজ ঃ "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।" আমার মনে হলো—তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

পরদিন মহারাজের গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছি। তিনি বললেন ঃ "এখানে বসে টেপো।" তবুও আমি দাঁড়িয়েই টিপছিলাম। তিনি বললেন ঃ "তুই কি আমাকে ভালবাসিস না?" আমি ঃ "তা নয় মহারাজ, আপনার বিছানায় বসতে আমার সঙ্কোচবোধ হয়।" চার-পাঁচদিন পর মহারাজ সুস্থ হলেন। ইতিপূর্বে আমি যখন মঠে নতুন এসেছি, নিত্য তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম না। একদিন কানাই মহারাজের (স্বামী অনন্তানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের সেবক) ঘরে আমাকে বললেন ঃ "সকলে আমাকে করে, কৈ তুমি তো আমাকে প্রণাম কর না। দেখ, আমি নেহাত খারাপ সাধু নই।" বললাম ঃ "আমি আপনাকে পিতার মতো মনে করি। বাবা-মাকে নিত্য কখনো প্রণাম করিনি।" যাহোক, আমি তখনি তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। সেই অবধি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের নিত্য প্রণাম করতাম্। অহেতুক কৃপাসিন্ধু মহারাজ এভাবে আমার ভুল সংশোধন করে দিলেন।

তখন মঠে প্রসাদগ্রহণের সময় শ্লোক পাঠ করা হতো। কোন একটি উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে। কেউ কেউ শ্লোক পাঠ করছেন, আমিও করছি। 'গীতা', 'চণ্ডী', 'উপনিষদ্', 'ভাগবত' থেকে শ্লোক আবৃত্তি হতো। আমি 'চণ্ডী' থেকে একটি শ্লোক বলাতে তিনি আমার কাছে এসে বললেন ঃ "বাবা, এঁটো মুখে 'চণ্ডী'র শ্লোক বলতে নেই।" তিনি আমাকে 'গীতা'র পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে শ্লোক পাঠ করতে বললেন। আমি তাই করলাম।

১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ সাল) চৈত্র মাসে আমরা কয়েকজন কেদার-বদ্রী যাওয়ার পথে কাশীতে আসি। মহারাজ তখন কাশীতে আছেন। বিশ্বনাথ দর্শন করে আমরা কাশীতে কয়েকদিন ছিলাম। তখন অদ্বৈত আশ্রমে নিত্য 'কাশীখণ্ড' পাঠ হতো। বিশ্ব মহারাজ পাঠ করতেন। মহারাজও উপস্থিত থাকতেন। সেবাশ্রম এবং অদ্বৈত আশ্রম—উভয় আশ্রমের সাধুদের অনেকেই পাঠ শুনতেন। একদিন পাঠের সময় 'শাকের কড়ি মাছে, মাছের কড়ি শাকে'—এই ভাবের কথা হচ্ছিল। মহারাজ চন্দ্র মহারাজকে (স্বামী নির্ভরানন্দ, মায়ের শিষ্য) বললেন ঃ "শুনছ চন্দ্র।" চন্দ্র মহারাজ মাথা চুলকাতে লাগলেন। কয়েকদিন পর আমরা মহারাজকে প্রণাম করে কাশী থেকে কনখলে গেলাম।

কনখলে তখন হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ছিলেন। আমরা কিছুদিন কনখলে থেকে কেদার-বদ্রী যাত্রা করলাম। কেদার-বদ্রী দর্শন করে কিছুকাল উত্তরকাশীতে ছিলাম। সেখানে থাকাকালে বাবুরাম মহারাজের পত্র পেলাম। তিনি আমাকে মঠে ফিরতে লিখেছেন। পূর্বাশ্রম থেকে মায়ের কাতর ক্রন্দনে বাবুরাম মহারাজের দয়ার্দ্র চিত্তে করুণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি আমাকে বাড়ি যেতে আদেশ করেছেন। আমার তখন আসার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মহারাজকে একথা লিখলাম। মহারাজের সচিব অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) উত্তরে জানালেন যে, মহারাজ বলেছেন ঃ "আমি তার কি জানি। তার ইচ্ছা হয় যাক।" আমি কিছুই ঠিক করতে না পেরে কাশীতে মহারাজের কাছে এলাম। তাঁকে প্রণাম করে কাছে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় অমূল্য মহারাজ তাঁকে বললেন ঃ "এই ছেলেটি উত্তরকাশীতে বেশ সাধনভজন করছিল। বাবুরাম মহারাজের পত্র পেয়ে চলে এসেছে।" শুনে মহারাজ একটু বিরক্ত হলেন। কারণ, মহারাজ সাধনভজনের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এলে কেন?" আমি জানালাম ঃ "বাবুরাম মহারাজ লিখেছেন—'আমার কথা যদি তুমি না শুন, তবে তোমার মঠে স্থান হবে না।'" মহারাজ বললেন ঃ "নাই বা হলো মঠে স্থান। মঠে থাকবার জন্য কি সাধু হয়েছ?" আমি বললাম ঃ "মঠে থাকবার উদ্দেশ্য আপনাদের সঙ্গ লাভ করা। তা না হলে বাইরে থেকে সাধনভজন করে থাকা যায় বটে, তবে আপনাদের দুর্লভ সঙ্গ লাভ হয় না।"

পরদিন মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের বাগান দেখছিলেন। তিনি যখন যেখানে থাকতেন, নানারকম ফুলফলের গাছ লাগাতেন এবং যত্ন করতেন। আমাকে দিয়ে বাগানে কিছু জল দেওয়ালেন। পরে অমূল্য মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "দেখ, বিশ্বরঞ্জনের শরীর খারাপ হয়েছে। বুলবুলও (পরিচারক) চলে যাচ্ছে। তুমি কিছুদিন এখানে থেকে যাও। পূজার পর আমরা মঠে যাব, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" দুই কারণে আমি রাজি হইনি। এক—মহারাজের সেবায় যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় সেই ভয় এবং দুই—বাবুরাম মহারাজের আদেশ। সাধুজীবনে এই আমার

প্রথম ভুল হলো। মহারাজ কৃপা করে আমার সেবাগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে এমন সুবর্ণ সুযোগ হারালাম। সেইদিনই আমি মঠে ফিরলাম।

মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার পূর্বাশ্রমে যাওয়ার প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে বললেন ঃ "শ্যামাচরণের মা তাকে একবার বাড়ি যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। কিন্তু ও কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল।" মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিরে, কি হয়েছে?" আমি তাঁকে সব বললাম। শুনে তিনি বাবুরাম মহারাজকে বললেন ঃ "অনেক কষ্টে মানুষ আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটিয়ে সংসার ত্যাগ করে আসে, আবার তাকে ফিরে যেতে বলা ঠিক নয়। ফিরে গিয়ে আবার আসতে পারে কিনা কে জানে! ওর গিয়ে কাজ নেই।" বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "যা ব্যাটা, তুই বেঁচে গেলি।"

একদিন স্নান করার আগে মহারাজকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলাম। বাবুরাম মহারাজ আমাকে ভাঁড়ারে না দেখে খোঁজ করে জানলেন, মহারাজের কাছে আছি। খাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই ভাঁড়ার ছেড়ে কোথায় যাস?" আমি বললাম ঃ "মহারাজকে তেল মাখাতে গিয়েছিলাম।" তিনি বললেন ঃ "মহারাজকে তেল মাখাবার আর লোক নেই?" অমূল্য মহারাজ শুনে বললেন ঃ "মহারাজ যদি ওকে ডাকেন, ও কি করবে?" বাবুরাম মহারাজ আর কোন কথা বললেন না। আরেকদিন মহারাজের হাত-পা টিপে দিচ্ছিলাম। ভাদ্র মাস। খুব ঘেমে গেছি দেখে মহারাজ বললেন ঃ "তুই তো বড় ঘেমে গেছিস! তোর কষ্ট হচ্ছে। এখন থাক।" আমি জানালাম ঃ "মহারাজ, আপনার সেবা করে যে-আনন্দ পাচ্ছি, তার তুলনায় এ-কষ্ট কিছুই নয়।"

রান্নাঘরের পশ্চিমদিকে একটা ছোট ফুলের বাগান ছিল। সেখানে গোলাপ, বেল, যুঁই প্রভৃতির গাছ ছিল। মহারাজ সেখানে একটি ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার গাছও লাগিয়েছিলেন। বেশ ফুল। খুব সুমিষ্ট গন্ধ। ফোটা ফুলগুলি তুলে ঠাকুরের পূজায় দিতাম। অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলগুলি খানিকটা ডালসুদ্ধ কেটে তোড়া সাজানো হতো। একদিন হরিপদ ফুল তুলতে গিয়ে ঐরূপ ডালসুদ্ধ ফুল নিয়ে আসার সময় মহারাজের সামনে পড়ে যায়। মহারাজ দেখে খুব রাগ করলেন। তিনি বললেন ঃ "এতখানি ডালসুদ্ধ ফুল তুলতে তোকে কে বলেছে? কত কষ্টে গাছটি বাঁচানো হয়েছে! এরকম ডাল কেটে গাছটাকে মারবি নাকি?" তারপর ভাঁড়ারিকে বলে দিলেন ঃ "ওর আজ ভাঁড়ার নেবে না। ওকে আজ বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে খেতে হবে।" ভাগ্যে সে আমার নাম করেনি, তাহলে আমাকেও ভিক্ষায় যেতে হতো। হরিপদ বাইরে গিয়ে কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় মঠে ফিরে এল। ভাঁড়ারি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "হরিপদ এসেছে। কি করব? রাতে খাবার দেব? সারাদিন খাওয়া হয়নি।" মহারাজ বললেন ঃ "হ্যাঁ, রাতে ও ডবল খাবে।"

কেউ কেউ কুলগুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে কোনরূপ উন্নতি হচ্ছে না দেখে মহারাজের কাছে এসে বলত ঃ "কি করব? কিছুই হচ্ছে না।" তিনি বলতেন ঃ "অবিশ্বাস করতে নেই। একই তো মন্ত্র। কুলগুরুই দিন আর আমরাই দিই। মন্ত্রের কোন দোষ নেই। বিশ্বাস করে জপধ্যান করতে থাক, কালে বুঝতে পারবে।"

একসময়ে আমি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলাম। মঠে এসে শরীর কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল। একদিন বিপিন ডাক্তার (জামাই) মঠে এসেছিলেন। তিনি আমাকে অসুস্থ দেখে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) তখন মঠে আছেন; মহারাজ বলরাম-মন্দিরে। বিপিনবাবু মহাপুরুষ মহারাজকে বলে আমাকে কলকাতায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন একদিন মহারাজের সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। আমার শরীর তখনো একইরকম দেখে তিনি আমাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠালেন। মহারাজও কিছুদিন পর কাশীতে এসেছিলেন। সেটা ১৯২১ সাল। সেই বছর কালীবাবু (কালীচরণ—স্বামী কালিকানন্দ) প্রমুখ অনেকে মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কাশীতে মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমের ওপরের ঘরটিতে থাকতেন। বাঙালমায়ী ঐ ঘরটি মহারাজের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। একদিন কথায় কথায় মহারাজ বলছিলেন যখন বৃন্দাবনে কুসুম সরোবরে তিনি তপস্যা করতেন—সেই সময়ের কথা। বলছিলেন ঃ "কুসুম সরোবর বড় সুন্দর জায়গা। বেশ নির্জন। বসামাত্র ধ্যান জমে যেত। গভীর রাত্রে এক বাবাজী এসে আমি কি করছি দেখতেন। ঘুমিয়ে থাকলে জাগিয়ে দিতেন। কিন্তু ঐ বাবাজীকে কখনো দিনের বেলায় দেখতে পাইনি।" মহারাজ বলতেন ঃ "জপধ্যান যখন তখন এলোমেলো-ভাবে করলেই হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় জপ করতে হয়। বৃন্দাবনের সময় রাত্রি ২টা থেকে ৪টা। কাশীর সময় রাত ৩টা থেকে ভোর। বেলুড় মঠে ৪টা থেকে ভোর। ঐসময় **Spiritual Current** (আধ্যাত্মিক তরঙ্গ) বইতে থাকে। ঐসময় জপধ্যান করলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়। ভদ্রকে (ওড়িষ্যার অন্তর্গত, বলরামবাবুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত) দেখলাম সম্পূর্ণ

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

অন্যরকম। সেখানে ভোররাত্রি, সন্ধ্যাতে বসে দেখলাম কোনসময়ে মন বসছে না। ভাবলাম কি হলো? একদিন দুপুরে ২টার সময় বসেছিলাম। বেশ জমে গেল। ওখানে বেলা ২টা থেকে ৪টা জপধ্যানের উপযুক্ত সময়।"

১৯১৬ সালে আমরা ১২ জন একসঙ্গে মহারাজের কাছে সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে ২-৪ জন করে প্রায়ই সন্ন্যাস হয়েছে। এতজনের একসঙ্গে সন্ন্যাস মহারাজ এই প্রথম দিলেন। পরের বছর আরো বেশি—বোধহয় ১৬ জন। একদিন গঙ্গার দিকে বারান্দায় বেঞ্চে মহারাজ বসে আছেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি এবার কি সন্ন্যাস নেবে?" আমি বললাম ঃ "আপনি কৃপা করে দেন তো নেব।" মহারাজ বললেন ঃ "আচ্ছা, এবার তুমি দণ্ডী হও।" আমি চুপ করে রইলাম।

সেবার Relief (ত্রাণ)-এ যাওয়ার জন্য লোকের দরকার। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এসেছেন বাগবাজার থেকে। তিনি বাবুরাম মহারাজকে কাজের লোকের কথা বললেন। মানুষের কষ্ট হচ্ছে, তাদের সাহায্য করা দরকার। দেখেশুনে কয়েকজনকে দিতে হবে। বাবুরাম মহারাজ বললেন ঃ "এই তো সব ছেলেরা রয়েছে, দেখ তুমি কাকে কাকে চাও। মঠের সব কাজকর্মও রয়েছে।" ২-৪ জনকে জিজ্ঞাসা করাতে তারা আপত্তি জানাল। শরৎ মহারাজ দুঃখ করে বললেন ঃ "মঠ তো এখন হৃষীকেশ হয়েছে। লোক পাওয়া যাবে কি করে?" তিনি খাবার সময় শ্লোক বলা লক্ষ্য করে একথা বলেছিলেন।

মহারাজের কাছে একথা উঠল। বিকালে মহারাজ সকলকে ওপরের বারান্দায় বসে কার কি আপত্তি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। শরৎ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গিরিজা মহারাজ (স্বামী গিরিজানন্দ, মায়ের শিষ্য) অগ্রণী হয়ে আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন ঃ "Relief-এ কাজ করতে গিয়ে আমাদের জপধ্যান হয় না। রাতদিন কেবল খাটতে হয়।" তিনি তপস্যা করতে যাবেন বলাতে মহারাজ বললেন ঃ "এত কী খাটতে হয় তোমাদের? প্রথমটা একটু খাটনি বেশি পড়ে বটে, পরে তো তত খাটতে হয় না। সুতরাং তোমাদের জপধ্যানের কিরূপ ক্ষতি হয় বুঝতে পারছি না। বাইরে ভিক্ষে করে খেয়ে তোমরা যে খুব বেশি সাধনভজনে রত থাক—তাও তো শুনতে পাই না। হৃষীকেশে গেলেই খুব সাধনভজন হয় নাকি? অনেক সময় তো শুনি ফাঁকি দিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট কর। তার চাইতে মঠে থেকে কিছু কাজকর্ম করা, আর সময় সময় গরিবদুঃখীদের জন্য কিছু কিছু কাজকর্ম—এ তো খুব ভাল। হৃষীকেশে গিয়ে না হয় তোমাদের এদিক, না হয় ওদিক। এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পাও—শুদ্ধ অন্ন। ছত্রের অন্ন খেয়ে হজম করা কঠিন। খুব সাধনভজন না থাকলে হজম করা যায় না। মাড়োয়ারিদের দানে হাজার কামনা-বাসনা থাকে।" আর কারো কিছু বলার আছে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। মহারাজের ঐরকম কথা শুনে আর কেউ কিছু বলতে সাহস করল না।

যে-বছর শ্রীশ্রীমায়ের শরীর যায় অর্থাৎ ১৯২০ সালে অনঙ্গ (পরে স্বামী ওঁকারানন্দ) মঠে যোগদান করে। তখন মঠে পণ্ডিত তারাসার বেদান্ততীর্থ ছিলেন। তাঁর কাছে সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) এবং আমরা অনেকেই 'ব্রহ্মসূত্র' পড়তাম। সবে তিনি 'ন্যায়' পড়ে এসেছেন। তাঁর ন্যায় পড়াবার খুব ঝোঁক ছিল। অনঙ্গ তাঁর কাছে 'তর্কসংগ্রহ' পড়তে শুরু করল। কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) একদিন মহারাজকে বললেন ঃ "এই ছেলেটি তারাসারের কাছে ন্যায় পড়ছে।" শুনে মহারাজ বললেন ঃ "ন্যায় বেশি পড়তে নেই। ওতে মনকে বড় বহির্মুখী করে দেয়।" অনঙ্গ বলল ঃ "ও একখানা প্রাথমিক বই। ব্রহ্মসূত্র পড়তে গেলে একটু একটু দরকার হয়।"

অনেকেই মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করতে চাইত। তিনি তাঁর পাতের অবশিষ্ট ভাত, পায়েস, ফল একসঙ্গে একটু ঘি দিয়ে মেখে সকলকে দিতেন। তার এক অপূর্ব স্বাদ হতো। মহারাজ তার নাম দিয়েছিলেন—'স্যার উইলিয়াম ভট'। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "ভট কেমন হয়েছিল?" সকলেই বলত—বেশ হয়েছিল।

একদিন কাশীতে মহারাজ সূর্যকে (স্বামী নির্বাণানন্দ) দিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজকে একখানা গরদের কাপড় ও চাদর পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন ঃ "চন্দ্রকে এটা পরিয়ে দিয়ে আরতি করবি।" চন্দ্র মহারাজ কাপড় পড়ে চাদর গায়ে দিয়ে বসলেন, সূর্য আরতি করল। মহারাজ ছাদে দাঁড়িয়ে দেখে খুব আনন্দ করছিলেন। চন্দ্র মহারাজকে অনেকে 'মোহন্ত' বলত। মহারাজ এভাবে মোহন্তের প্রতিষ্ঠা করলেন। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। প্রতি মাসে আমাদের দপ্তরে উৎসব-সংবাদ এত বেশি আসে যে, সেগুলি প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাতে স্বাভাবিক-ভাবে সংবাদ-মূল্যও হ্রাস পায়। তাই সাধারণভাবে বছরে কোন সংস্থার ২টির বেশি সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আশা করি প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক দীপশিখা ঃ ভারতীয় রাজনীতির অভ্রান্ত বাতিঘর

স্বামী শিবপ্রদানন্দ*

গত কয়েক শতাব্দীতে বিশ্ব ইতিহাসের পট দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন এত আকস্মিক যে, বিহ্বলতা প্রকাশের ফুরসৎ মেলা ভার! ধনতন্ত্রের কুৎসিত আগ্রাসন, গণতন্ত্রের চরম বিভ্রান্তি এবং মার্ক্সবাদ তথা সমাজতন্ত্রের প্রায়োগিক ব্যর্থতা মানুষকে যেমন মুহ্যমান করেছে, তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরির অবিশ্বাস্য অগ্রগতিকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' মেতে উঠেছে সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজ। অথচ আমাদের জীবনে প্রার্থিত শান্তি আসেনি। আমাদের রক্তের বিপন্ন বিস্ময় আমাদের ক্লান্ত করেছে। অন্তরের গভীরের কী এক শূন্যতাবোধ ঘুণপোকা হয়ে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। তবু ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মানুষ তারই রক্ত দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য আঁকতে চেয়েছে শ্রীমণ্ডিত আলপনা। কারণ, মানুষ বেপরোয়া স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। যদি নতুন জীবনের স্বাদ বিকল্প পথে হাতের মুঠোয় আসে! যদি উন্নয়নের ফসল পৃথিবীর সব মানুষের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে সহমর্মিতার শপথকে সার্থক করে। তবে আজ এই মুহূর্তে সেই ঈপ্সিত ক্ষণের জন্য প্রহর গোনা শুরু হতে পারে।

সমস্যা-জর্জর বর্তমান ভারতবর্ষ ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। তার অন্তরের তাগিদ একদিন অবশ্যই জীবনের অন্ধকারে প্রদীপ হয়ে জ্বলবে, তার কাঁটা রঙিন গোলাপ হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষকে বাঁচাতেই হবে, কারণ ভারতবর্ষ ধ্বংস হলে বিশ্ব-সংস্কৃতিই বিপন্ন হবে। বিবেকানন্দের ঘুম-ভাঙানিয়া বাণী এই আত্মপ্রত্যয়ের বার্তাবহ। ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আমাদের দৃষ্টিকে সেই দিকে নিবদ্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে-কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী!... তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার জনক—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।"

বর্তমানকালে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্পর্কে মানুষের মনে যে-সন্দেহ জেগেছে, তার মূলে রয়েছে মার্ক্স-উত্তর মার্ক্সবাদীদের ব্যর্থতা। কারণ, তাঁরা মার্ক্সবাদকে আধুনিককালের 'চলতি হাওয়ার পন্থী' করে তুলতে সক্ষম হননি। মার্ক্স নিজেই বলেছিলেন, মার্ক্সবাদ কোন আপ্তবাক্য নয়, তা নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির জীবনে মুক্তি অর্জনের দিশারী মাত্র।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্ক্সের জীবনাবসানের ৩৪ বছর পরে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেক্ষাপটে মার্ক্সবাদকে ব্যবহারযোগ্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সৃষ্টি হয়েছিল লেনিনবাদ, যা প্রায় ৩৫টি গ্রন্থখণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে যেমন বিস্তর অধ্যয়ন, গবেষণা ও ত্যাগের মানসিকতা দরকার, তেমনি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা পরিবর্তিত না হলে তা তত্ত্বগতভাবে সত্য হলেও বাস্তবে প্রাসঙ্গিকতা হারাবেই।

---

* রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার প্রধান শিক্ষক, গবেষক, সুলেখক।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

মার্ক্সবাদ যদি একটি সমাজ-বিজ্ঞান হয়, তাহলে তার গতিপথ একই বিন্দুতে বন্দি থাকার যুক্তি ধোপে টেকে না।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে নানান পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং বর্তমানে বিশ্বায়নের হিড়িকে সেই পার্থক্যের রেখাটা ফিকে হয়ে আসছে। আজকের আধুনিক পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের থেকে উন্নততর ব্যবস্থা বলে দাবি করলে তা বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ভেঙে পড়ার আগে সেইসব দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল। কৃষির বদলে যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে ভারি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের দিকে অত্যধিক ঝোঁক ছিল, অথচ বিশ্বের বাজারে সেগুলি রপ্তানি করতে গিয়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। পশ্চিমের বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ার পর উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কল-কারখানার সম্প্রসারণের জন্য বৈদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। সেই ঋণ শোধ করতে দেশের খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য বিক্রি করতে হয়েছে বাইরের বাজারে, ফলে দেশের মানুষের পেটে টান পড়েছে। টাকার অভাবে কল-কারখানার আধুনিকীকরণ হয়নি। ফলে সেগুলি রুগ্নশিল্প হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মানে এসেছে অবনমন। ক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিবিপ্লবের প্রবল চাপে সমাজতন্ত্রের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে।

তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন রাষ্ট্রীয়করণের ফলে অধিকাংশ মানুষই শ্রমদানে বিমুখ হয়েছে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ত্যাগের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের সম্পত্তিকে আপন মনে করতে পারেনি। প্রতিযোগিতা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি, ভূমি ও সম্পত্তির ওপর আকর্ষণও ব্যক্তিগত তথা জন্মগত। তাই অর্ধশতাব্দী ধরে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে দেশ ও জাতির সীমানা মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবি বলেছিলেন, মার্ক্সবাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে জাতীয়তাবাদ। গত শতাব্দীতে অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করতেন, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে জাতীয়তাবাদই একদিন পরাস্ত হবে। তাঁরা ভেবেছিলেন, জাতীয়তাবাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আছে, কিন্তু মার্ক্সবাদ বিশ্বমানবতার পথ দেখিয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ হলো ঃ দেশাত্মবোধক গানগুলিতে সমৃদ্ধ হয় অস্ত্রের কারখানা। ফলে দেশপ্রেমের নামে বহুবার লক্ষ লক্ষ মানুষ অকারণ যুদ্ধে প্রাণ দেয়। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করায় কি কোন যুক্তি থাকতে পারে? কিন্তু বাস্তবে মার্ক্সবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের লড়াইটা তেমন দানা বাঁধেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মার্ক্সবাদে দীক্ষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষের মস্তিষ্ক প্রবল প্রতাপে অধিকার করে আছে জাতীয়তাবাদ। সেসব দেশে জাতীয়তাবাদ নির্মূল করার চেষ্টা হয়নি, পরন্তু চীন ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। অথচ মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সীমান্ত থাকারই কথা নয়। তবুও এই দুই বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরোধ তীব্রতর হতে হতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, এই দুই রাষ্ট্র তাদের আদর্শের প্রবল প্রতিপক্ষ পুঁজিবাদী আমেরিকার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল!

জাতিভেদের করাল গ্রাসের কাছে মার্ক্সবাদও অসহায়। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন—"চেক ও শ্লোভাকদের মধ্যে রীতিমতন ঈর্ষার সম্পর্ক, শ্লোভাকরা চেকদের তুলনায় নিজেদের বঞ্চিত মনে করে।" ভারত ও পাকিস্তানের চিরবৈরিতার কেন্দ্রবিন্দু যেমন কাশ্মীর, তেমনি হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া পাশাপাশি দুটি দেশের মধ্যে রয়েছে আরেক কাশ্মীর—এখানে তার নাম 'ট্রান্সিলভানিয়া'। হাঙ্গেরিতে 'হিস্ট্রি অফ ট্রান্সিলভানিয়া' নামে বই প্রকাশিত হলে রুমানিয়া সেই গ্রন্থকে ইতিহাসের বিকৃতি বলে নিষিদ্ধ করে দেয়। আবার রুমানিয়া সরকার একবার সে-দেশে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করায় হাঙ্গেরিতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ট্রান্সিলভানিয়াকে কেন্দ্র করে দুটি রাষ্ট্রের প্রবল দ্বন্দ্বের আজও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি।

গত শতাব্দীতে মার্ক্সবাদের আদর্শ মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে গিয়ে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। এশিয়ার কোন কোন রাষ্ট্রে এবং পূর্ব ইউরোপে ঘটেছে নির্বিচার গণহত্যা, শারীরিক ও মানসিক গণপীড়ন, জীবনের মৌলিক অধিকার থেকে বলপূর্বক বঞ্চনা, এককথায় মানবিক মূল্যবোধের সার্বিক অবমূল্যায়ন সমাজতন্ত্রকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি হলো এই যে, এই ব্যর্থতার কথা মিথ্যার বাতাবরণ দিয়ে গোপন করার নিরন্তর প্রয়াস। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়করা ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে সংশোধনের চেষ্টা করলে হয়তো এমন বিপর্যয় এড়ানো যেত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ছিল—শ্রেণি-বিলোপ, উৎপাদনের সমবণ্টন, রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের জীবিকা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি। কিন্তু গত শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে—শ্রেণি-বিলোপ ও সাধারণ মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার পরিবর্তে তারা গড়ে তুলেছে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

সম্প্রদায়। আসলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই হয়নি, সর্বহারাদের হাতেও ক্ষমতা যায়নি। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ধ্বজাধারী বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর হাতে। মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনা করা যেমন অন্যায়, তেমন মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াও একই রকমের অন্যায়। আজ তাই স্টালিন, চেসেস্কু, টিটো, ওয়ালেশ থেকে শুরু করে মাও-সে-দঙের দিকে সমালোচনার আঙুল উঠেছে।

১৯৩০-এর দশকে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সমাজের কৃতিত্বের তালিকায় স্থান পেয়েছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিজ্ঞানের প্রসার, ব্যাধি ও বার্ধক্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক বীমার প্রবর্তন এবং দ্রুত শিল্পায়নের পথে দেশের অগ্রগতি। এসব কৃতিত্বের পর্যায়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু বিপ্লব তার প্রাথমিক শর্ত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক অম্লান দত্ত লিখেছেন ঃ “রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই উনিশ শতকের শেষভাগে বিসমার্কের যুগে সামাজিক বীমা চালু হয়ে গিয়েছে জার্মানিতে। বিশ শতকের গোড়াতেই ব্যাপক সাক্ষরতার প্রসার প্রচলন হয়েছে জাপানে। জাপান ও জার্মানিতে দ্রুত শিল্পায়ন শুরু হওয়ার পর রুশ দেশেও সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। স্তালিনী পথের দোষগুণ নিয়ে তর্ক সম্ভব, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের জন্য কোন পথ ছিল না—এমন দাবি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।” মার্ক্স ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার গতি-প্রকৃতি বুঝতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি মার্ক্সবাদের বিচারের নিরিখে কি সেইভাবে ধরা সম্ভব হয়েছে? লেনিন ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা ছিল যে, রুশ বিপ্লবের পর সেই বিপ্লবের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়বে উন্নততম পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায়। অথচ বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত! অসাম্য ও বেকারত্বের বিপত্তি ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে নাড়া দিলেও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট দলগুলি আজও দুর্বল। একদিকে যেমন শিল্পোন্নত একটি দেশেও বিপ্লব ঘটেনি, তেমনি অন্যদিকে গত তিন দশকে সেসব দেশে—যেমন ফ্রান্সে, মার্ক্সবাদী আন্দোলন শক্তি হারিয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণির কর্তৃত্ব সাম্যবাদীদের অভীষ্ট। লেনিনের তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লবীদের সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণি সংগঠিত হয়, কারণ ক্ষমতা দখল করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আসলে ক্ষমতা দখলের মাদকতা মানুষের মনের সদসৎ বিচারকে ক্ষীণ করে দেয়, যার ফলে কোন উপায়কেই আর অসাধু মনে হয় না। ক্ষমতা দখলকেই পরম লক্ষ্য মনে রেখে কৃষক-মজুরের কর্তৃত্বের পরিবর্তে একদলীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করে—যার পরিণতি দুর্নীতিগ্রস্ত উৎপীড়ন। শ্রেণিতত্ত্বের মধ্যেই অসহিষ্ণুতার একটা ঝোঁক আছে, যার প্রভাব থেকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে মুক্ত করা কঠিন। বর্তমান উত্তর কোরিয়ার ঘটনাবলী সেই ভয়াবহ চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, অথচ উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে কিম্-ইল-সুঙের স্বপ্ন ছিল পৃথক। ভারতবর্ষে কেউ যদি বলেন—‘গর্বের সঙ্গে বল, আমি হিন্দু’, তখন প্রশ্ন জাগে—গর্বের সঙ্গে কেন, বিনয়ের সঙ্গে নয় কেন? বিনয়ের মধ্যে নিহিত থাকে অন্তরের শক্তি অথচ গর্বের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে ক্ষমতার মত্ততা ও অসহিষ্ণুতা, যা সম্প্রীতি বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ যতটা অনিষ্টকর, অসহিষ্ণু শ্রেণিতত্ত্বও সমধিক ক্ষতিকারক। অধ্যাপক অম্লান দত্ত এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ “যুদ্ধের উত্তেজনায় অথবা তাত্ত্বিক উন্মাদনায় দলীয় স্বৈরাচারকেও গৌরবময় বলে ভ্রম হয়। উন্মাদনার মতোই অস্থির ও অস্থায়ী সেই গৌরব।”

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সঙ্কট সামরিকবাদ এবং ভোগবাদ—যা থেকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুক্ত নয়। আমেরিকায় এই দুই বাদের প্রবল উপস্থিতি সমালোচিত হয়। আমেরিকার মতো ধনী দেশের পক্ষে এই ধাক্কা সামলানো যদি কঠিন কাজ হয়, তবে দরিদ্রতর দেশের কথা সহজেই অনুমেয়। এমনকি গর্বাচভের আমল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে, তার মূলেও রয়েছে সামরিকবাদ ও ভোগবাদের অশুভ আঁতাত এবং প্রতিপত্তি।

পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞান যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবতম আবিষ্কার দেহগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিতৃপ্তি বিধান করে চলেছে। নব প্রযুক্তি মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে নতুন নতুন ভোগের উপকরণ তথা উত্তেজনা। ভোগবাদের এই আকর্ষণ এত তীব্র যে, তাকে ঠেকানো বড় কঠিন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ভোগের উপকরণ প্রস্তুতির জন্য প্রচুর অর্থ লগ্নী করে আগ্রাসী চাহিদার স্বপ্নজালে মানুষের সুস্থ চিন্তা ও চেতনাকে বদ্ধ করছে। ভোগবাদের জন্য অনেকে বাণিজ্যিক প্রচার ও প্রচারমাধ্যমকে দায়ী করেন। কিন্তু বর্তমান যুগচেতনার বিকৃতি ও বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত যুগমানসের সঙ্গে কোথাও ঐ প্রচারের মিল নিশ্চয়ই আছে, তাই প্রচারের এত সাফল্য। ভোগের উপকরণকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা বাড়ছে, যা মানুষকে মানুষের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ভাঙছে সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী রাষ্ট্র এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল

রাষ্ট্রগুলির জনজীবন ভোগবাদের কামনার তীব্র ছোবলে বিপন্নবোধ করছে।

পৃথিবীর সম্পদ সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে সীমাহীন অভাববোধ আমাদের সভ্যতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যা কোন ভোগের দ্বারা শান্ত হবে না। মানবসমাজ যদি পারমাণবিক অস্ত্রে বিনষ্ট না হয়, পরিবেশ দূষণের বিষে জর্জরিত নাও হয়, তবু এক আত্মিক সঙ্কট অথবা অন্তরতর যন্ত্রণা এই সভ্যতাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিতেই পারে।

আমাদের সমাজে একনায়কতন্ত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে না। তুলনায় সংসদীয় গণতন্ত্র ভাল। তবে একথাও ঠিক যে, সংসদে আইন পাশ করে আদর্শ সমাজ সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের অলিন্দে কিছু ক্ষমতালোভী মানুষের চলাচল দেশীয় পরিকাঠামোয় অধিকাংশ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা দরকার। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ এবং বিপ্লববাদীরা রাজনীতির প্রাথমিকতায় আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেই আস্থা আজ ভেঙে পড়েছে। সমাজের ভিত্তি-প্রতিম মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারালয়, সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি এবং দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে না পারলে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগে কেউ যদি নিজেকে প্রগতিবাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে তিনি ধর্মকে অবশ্যই নস্যাৎ করবেন। এই ধরনের প্রগতিবাদীদের কাছে ধর্ম সম্পর্কে অবজ্ঞা ও উদাসীনতা আধুনিকতার নামান্তর। 'ধর্ম' বলতে তাঁরা বিশেষ বিশেষ আচারগত মতাদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে আচারগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ধর্মীয় মতাদর্শ বিভাজিত হয়ে বিশ্লিষ্ট পথে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মের বৈচিত্র্যকে বৈপরীত্যের ভ্রান্ত আলোয় বিচার করতে গিয়ে তা জীবনেতিহাসকে কলহমুখর করে তোলে। আজকের দুনিয়ায় ধর্মের বিরুদ্ধে একটি প্রবলতর অভিযোগ হলো ধর্মান্ধতা। ধর্মান্ধতা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে, অসহিষ্ণু করে। 'আচারের মরু বালুরাশি' একদিকে গ্রাস করে জীবনের সবুজ-স্বপ্ন, শুষে নেয় জীবনের সহজ-জল, অন্যদিকে মানুষের অগ্রগতির পথকে গ্লানির রক্তে পিচ্ছিল করে দেয়।

ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য অভিযোগের আকারে উপস্থিত হলে তার প্রত্যুত্তর সম্পর্কে সমধিক সহিষ্ণুতা বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয় মতাদর্শ যদি অগ্রগতির পরিপন্থী হয়, তাহলে রাজনৈতিক মতাদর্শ, আর্থ-সামাজিকমতাদর্শ অথবা সামরিক মতাদর্শ একই দোষে দুষ্ট। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এইসব তথাকথিত মতাদর্শগুলি মানবাত্মাকে সর্বাধিক পীড়িত করছে, জীবন-নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করেছে, বাঁশি-সঙ্গীতহারা জীবনের বাতাসকে বিষময় করে তুলেছে, জীবনের অমল আলোকে নিভিয়ে তাকে দুঃস্বপ্নে ক্লিষ্ট করেছে। অন্যদিকে যথার্থ ধর্মাচরণ মানুষকে পরমতসহিষ্ণু করেছে, প্রেমিক করেছে, ক্ষমাশীল করেছে। মানুষের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে ইতিহাসের গতিপথকে পরিবর্তিত করেছে কল্যাণকর লক্ষ্যে, মঙ্গলকর ধারায়। ধর্মের ইতিহাসে যেসব মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের জীবন অনুসন্ধান করলে এই সত্যই আত্মপ্রকাশ করে।

হজরত মহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে সংযম ও ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধাবনত করে। খাইবারে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং বিজয়ী হন। সেখানে এক ইহুদি রমণী পয়গম্বরকে বিষমিশ্রিত খাদ্য পরিবেশন করেন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এই খাদ্য গ্রহণ করে প্রাণ হারান। মহম্মদ মুখে খাবার তুলেই সাবধান হয়ে যান এবং খাওয়ার আগেই তা ফেলে দেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনুমান করা হয় যে, এই কারণেই তিনি অবশেষে প্রাণ হারান। উক্ত ইহুদি রমণীকে মহম্মদের সামনে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। প্রশ্নের উত্তরে ঐ রমণী বলেন, স্বজাতির অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি একাজ করেছেন। ক্রোধের বশে কিছু করা মহম্মদ ধর্মবিরুদ্ধ মনে করতেন, তাই সেই রমণীকে তিনি ক্ষমা করলেন। ইহুদি রমণী কর্তৃক পরিবেশিত বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে অসুস্থতা এবং আনুমানিক সেই কারণে মৃত্যুবরণ করেও হজরত মহম্মদ ক্ষমাপ্রদর্শনের মাধ্যমে সহিষ্ণুতা ও উদারতার অনন্য নজির গড়েছিলেন।

এমনই নজির গড়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট। ধর্মের নামে কুসংস্কারের নাগপাশে বাঁধাপড়া সাধারণ মানুষকে পুরোহিততন্ত্রের শোষণ থেকে মুক্ত করে তাদের জন্য যিশু স্বর্গের পিতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই কিছু কুচক্রী মানুষ ও পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রে বন্দি করে যিশুকে রোমের শাসনকর্তা পিলাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই শাসনকর্তা যিশুকে চিনতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাই যাজকদলের অন্যায় দাবি মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। কিন্তু অবশেষে অবস্থার চাপে পড়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে বাধ্য হন। কুচক্রীর দল যিশুকে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করে, কিন্তু আত্মসমাহিত যিশুর মুখমণ্ডল প্রসন্ন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁকে বধ্যভূমিতে দুজন সাধারণ চোরের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তবু তাঁর ক্ষমাসুন্দর মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে

বললেন ঃ "পিতা! এদের ক্ষমা কর। এরা জানে না, এরা কি করছে!" এইভাবেই একটি মহৎ জীবনের পরিসমাপ্তি হলো, কিন্তু তাঁর বাণী অমরত্ব লাভ করল। যিশু ক্ষমা দিয়ে জয় করলেন হত্যাকে, জীবন দিয়ে জয় করলেন মৃত্যুকে, ধর্ম দিয়ে জয় করলেন অধর্মকে।

যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেন। ক্লান্তদেহে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগের সঙ্কল্প করে অরণ্যে প্রবেশ করে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন। এমন সময় 'জরা' নামে এক ব্যাধ হরিণ ভেবে তাঁর উন্মুক্ত চরণে শরবিদ্ধ করে। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়। তাঁর দেহত্যাগের সময় অনুশোচনায় কাতর সেই ব্যাধ তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। শ্রীকৃষ্ণ শান্তচিত্তে তাকে শুধু ক্ষমাই করেননি, একই সঙ্গে প্রাণঢালা আশীর্বাদে তার অন্তরকে আনন্দে পূর্ণ করে দেন। সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মৃত্যুকে সমদৃষ্টিতে বিচার করা অথবা জীর্ণ বস্ত্রত্যাগের উদাসীনতা নিয়ে দেহত্যাগের বাণীমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ আজও ক্ষমা ও করুণার দিশারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, সহানুভূতির সঙ্গে তেজস্বিতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মিলন ও সৃজনের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। তিনি অধ্যাত্মবাদী হলেও যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আগামী পৃথিবীর জন্য নবতম সংস্কৃতির দিঙ্‌নির্দেশ করতে গিয়ে, বোধকরি, সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম তথা দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত 'যুক্তি ও ধর্ম' বিষয়ক একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, যুক্তি দিয়ে ধর্মের বিচার হওয়া আবশ্যক। আর ধর্মের কোন অংশ যদি যুক্তিবিরোধী হয়, তবে সেটা ত্যাগ করাই ভাল। অথচ তিনিই আবার বলেছেন, বিশ্বের সব ধর্মের উচ্চতর সত্য যুক্তির অতীত, অর্থাৎ সেই সত্য যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়। ফলে এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে দেখা ভাল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "সকল ধর্মই উপদেশ দিতেছে, নিঃস্বার্থ হও। কেন নিঃস্বার্থ হইব? অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া অবগত হও যে... অজ্ঞ ব্যক্তিতেও তুমি, বিদ্বানেও তুমি, দুর্বলের মধ্যেও তুমি, সবলের মধ্যেও তুমি।" স্বার্থ ও অহমিকা থেকে উৎপন্ন ভেদবুদ্ধিতে সংসার ও সমাজ সদা আচ্ছন্ন। তাকে অতিক্রম করে যে শুদ্ধ সংযুক্তির আনন্দ, তাতেই মানুষের আত্মিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, / বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।" আমরা যুক্তির ঊর্ধ্বে পৌঁছাতে পারি, সেখানে অন্তরের উপলব্ধি আমাদের সম্বল। যিশু যখন তাঁর শত্রু ও হত্যাকারীকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন সেই আচরণ যুক্তিবিরোধী নয়, তবু যুক্তির অতীত। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অম্লান দত্ত বলেছেন ঃ "মানুষ সেখানে যুক্তি দিয়ে পৌঁছায় না, কিন্তু পৌঁছাবার পর সেই শুদ্ধতাকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলেও মনে হয় না।"

ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন ঃ "ধনীদের স্বার্থপরতা, বিশেষাধিকার বজায় রাখার চেষ্টা, একনায়কতা আমেরিকাকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে।" পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের সময় আমেরিকার প্রশাসনের ঔদ্ধত্যের নিরিখে বিবেকানন্দের মন্তব্যকে অধিক প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ "কেউ ধনী হবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে, দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হবে... এজিনিস চলতে পারে না। স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।" বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে যে বিপ্লবের বার্তা নিহিত আছে, সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, কোন্ পথে আসবে এই বিপ্লব? শ্রেণিসঙ্ঘর্ষ কিংবা শ্রেণিসমন্বয়? ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুসন্ধান করে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন যুগে শ্রেণিসঙ্ঘর্ষ অনেক সময় অবধারিত হলেও অনিবার্য হয়নি। বিভিন্ন কালে যুগপুরুষগণ সমন্বয়ের পথে ভারতবর্ষকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাদের প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে অসহনীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এই কর্মকাণ্ডকে ত্যাগ করে জ্ঞানকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইল। এছাড়া সমকালে আরো একদল ভোগবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে, যারা পার্থিব সম্ভোগকেই একমাত্র কাম্যবস্তু হিসাবে স্বীকার করল। শ্রুতি সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই বিভিন্ন মত সৃষ্টি করল দ্বন্দ্বের, একালের পরিভাষায় যাকে শ্রেণিসঙ্ঘর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই বিভিন্নতাকে একসূত্রে গাঁথতে চাইলেন। 'গীতা'য় উচ্চারিত হলো ঃ পথ আলাদা হলেও লক্ষ্য একই। একই সত্যবস্তুকে নানাভাবে দেখা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করতে প্রয়াসী হন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণাধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফলে পুরোহিততন্ত্রের অবসান ঘটল ও কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য হ্রাস পেল। এই ঘটনা শ্রেণিসঙ্ঘর্ষের ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তী কালে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ সমাজে শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হন। বিকৃত বৌদ্ধধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের প্লাবনে বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বৈদিক ধর্মের আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে শঙ্করাচার্য মোহান্ধকারে প্রত্যয়ী প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন।

কৃষ্ণ ও বুদ্ধ উভয়ই সকলের জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেও পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ অব্যাহত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর সাহিত্যে দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষের ওপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শোষণ সম্পর্কে বিবরণ প্রচ্ছন্ন আকারে রয়েছে। ফলে শোষিত জনসাধারণ হারিয়েছে আত্মপ্রত্যয়। এই জনগণ তাই বহিরাগতদের আক্রমণ রোধ করতে কখনো সমর্থ হয়নি। ভারতবর্ষকে বিভিন্ন সময়ে শাসন করেছে হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বহিরাগত জাতিবর্গ এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের সম্মিলিত প্রতিবাদকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম গণ-উত্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তা ব্যর্থ হলেও গণচেতনার উন্মেষের প্রেক্ষিতে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ ইতিহাসকার এই গণ-উত্থানকে 'বিদ্রোহ' হিসাবে উল্লেখ করে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, স্বাধিকারের দাবিকে আর যাইহোক বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য করা পক্ষপাতদোষ থেকে মুক্ত নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনের দোষগুণ ব্যাখ্যা করার পর বৈশ্যশাসন সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৈশ্যযুগে ভাব ও ঐহিক বিদ্যার আদানপ্রদান হলেও আড়ালে চলতে থাকে ভয়াবহ শোষণ। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বললেন, ইংরেজদের সমৃদ্ধির কথা, যা পূর্ণ মাত্রায় পরাধীন ভারতের জনজীবনের শোষণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন—এরপর আসবে শ্রমজীবী মানুষের বা শূদ্রের (অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে) শাসনকার্য পরিচালনা করার পালা। ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণেরা যদি নিম্নবর্ণের ন্যায্য অধিকারপ্রাপ্তিতে সাহায্য না করে, যদি তাদের বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান না করে, তাহলে তাঁর মতে—সাধারণ জনগণ জেগে উঠে উচ্চবর্ণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। শূদ্রশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অকল্যাণকর দিক হলো সাংস্কৃতিক মানের অবনমন। বিবেকানন্দ তাই সমাধান খুঁজলেন শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে। ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সুফল হয়তো তাঁকে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। তাঁর বিপ্লবচিন্তা কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি, সর্বস্তরের জনসাধারণকে নিয়ে তা গড়ে উঠেছে। তিনি তাঁর ধারণাকে শুধু রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তাকে মানবজীবনের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের বিপ্লবচিন্তা প্রচলিত বিপ্লবচিন্তা থেকে পৃথক। কারণ তিনি জানতেন—"ভারত আবার উঠিবে। কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে। বিনাশের বিজয়-পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া।" স্বামী বিবেকানন্দ শূদ্রশাসন স্থাপন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও ঐ শাসনযুগকে ইতিহাসের 'শেষ যুগ' বলে মনে করেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ঐ যুগের পরে আবার ব্রাহ্মণ আদর্শ দেখা যাবে। চৈতন্যের শক্তিতে ভারতের পুনর্জাগরণের ভাবনাটি সেদিক থেকে ইঙ্গিতবহ। কারণ, বিবেকানন্দ ইতিহাসের মধ্যে সেই যুগ-আবর্তনকেই দেখতে পেয়েছেন।

মার্ক্সবাদীরা ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার বলে বর্জন করতে চেয়েছেন, কারণ তাঁরা পৌরোহিত্য ও ধর্মকে অভিন্ন মনে করেছেন। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদান্ত ও অধিকার' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন ঃ "পুরোহিততন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ। সেইজন্যই যেখানে পুরোহিততন্ত্রের উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। বেদান্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে; ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। তৎপূর্বে কোন ধর্ম আসে না।" তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্ক্স ও লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেই ধর্ম আসলে ধর্মের পোশাক-পরিহিত পুরোহিততন্ত্র। তা শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর 'জীবপ্রেম'। সেই কারণে পৌরোহিত্য শোষণের হাতিয়ার হলেও ধর্ম হলো বিশেষ সুবিধাতন্ত্রের ওপর আঘাত হানার হাতিয়ার। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য, রামানুজ প্রমুখ চরিত্রের উল্লেখ করে বিবেকানন্দ প্রমাণ করেছেন, এইসমস্ত ধর্মনায়ক পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণের ন্যায্য মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যে-ধর্মপ্লাবন এনেছিলেন, তার পরিণামে এসেছে সমাজ-বিপ্লব, ফলে সমাজে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের আর্থিক কল্যাণ তথা সার্বিক কল্যাণকে রূপ দিতে সক্ষম নয়—এরকম অবাস্তব ধর্মমত মানুষের জীবনে স্থান পেতে পারে না। তাঁর ভাষায় ঃ

"প্রত্যেক ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা বয়ে চলেছে। মানুষের ওপর কিছু ধর্মের প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সে পরিচালিত হয় অর্থনীতির দ্বারা। সুতরাং যখনি কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য আছে। এই ধরনের হাজার সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য লড়াই করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে-ই প্রাধান্যলাভ করে। পেটের চিন্তা, অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম চিন্তা।" বিবেকানন্দ মোটের ওপর ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যে কল্পিত ব্যবধান, তা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ঐহিক উন্নতির সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছেঃ "মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন...।"

'ধর্ম' মানে শুধু মতবাদ নয়, 'ধর্ম' মানে সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা। এই নিরন্তর প্রয়াস মানুষকে চরিত্রবান করে। আর চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্রশক্তি অর্জন করা। বিবেকানন্দ চেয়েছেনঃ "ধর্মকে এমন হতে হবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেখানেই তার সাহায্য পেতে পারে—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপতনের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চশিখরে—ধর্ম যেন সবসময় সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করতে পারে।"

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজ-সচেতন অর্থনীতিবিদ্। রমেশ দত্ত বা দাদাভাই নৌরজীর মতো তিনি অর্থনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক সমস্যা-সম্বলিত পৃথক কোন প্রবন্ধ রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর বহু বক্তৃতা, চিঠিপত্র, আলাপচারিতা এবং মৌলিক রচনায় তিনি অর্থনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত আধুনিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভারতে তিনিই সর্বপ্রথম সমকালীন পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল ত্রুটি নির্দেশ করে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বরূপকে উন্মোচিত করেছিলেন এবং ভারতের উন্নয়নের জন্য তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাকে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে একজন 'সমাজতন্ত্রী' হিসাবে ঘোষণা করলেও তিনি 'ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল' মনে করেননি। তবু শূদ্র-জাগরণের বা দরিদ্র মানুষের উত্থানের প্রশ্নে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা' হিসাবে প্রয়োগ করার প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় তিনি রেখেছিলেন। জগতে ভাল-মন্দের মিশ্রণ চিরকাল থাকবে। তাই সমাজতন্ত্রও আদর্শ ব্যবস্থা হতে পারে না। "তবে নতুন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (Yoke) এক কাঁধ থেকে তুলে আরেক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত" পরীক্ষা করতে বিবেকানন্দ রাজি ছিলেন।

গত শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পর বর্তমানের প্রেক্ষিতে তাকে প্রয়োগ করতে গেলে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে যদি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে প্রয়োগের ভাবনা করা যায়, তাহলে তা পৃথক ফল দান করতে পারে। সেই ফল কেমন হবে তা অনাগত ভবিষ্যৎই বলতে পারে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নব্যভারতে কোন আর্থ-সামাজিক মতাদর্শ (ism) প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়ার আগে ভারতবর্ষকে যথার্থ ধর্মের জোয়ারে (অবশ্যই তা কোন রাজনৈতিক দলের চিহ্নিত ধর্ম নয়) পরিপ্লাবিত করতে হবে। তার অর্থ দাঁড়াল এই যে, ধর্ম ভারতের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হতে পারে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে ভুলের মাশুল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও জনসাধারণকে গুনতে হচ্ছে। কারণ, যথার্থ জীবনমুখী ধর্মকে উপেক্ষা করার ফলে আজ ধর্ম সম্বন্ধীয় বিকৃতি ভারতের উন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করছে। যাঁরা অর্থনীতির তথাকথিত বিশুদ্ধতার ছুঁতমার্গে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে এই বক্তব্য গ্রহণীয় নাও হতে পারে। কিন্তু অমর্ত্য সেনের 'মানবিক অর্থশাস্ত্র' যদি নোবেল সমিতির স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে, তাহলে 'আধ্যাত্মিক অর্থশাস্ত্র' নিয়ে নিরীক্ষার প্রস্তাবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যখন স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ' সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চীন আজ বাজারীকরণের দিকে ঝুঁকছে, সমাজতন্ত্রের নামাবলীকে সরিয়ে রেখে বহুজাতিক সংস্থার জিন্স ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত বদল হচ্ছে। ভারতের সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের একথা বুঝতে হবে। দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমবণ্টন হয়তো সমাজনীতি করতে পারে, কিন্তু মানব-সম্পদের পরিপুষ্টি এবং তার অন্তরতর শক্তির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। যথার্থ ধর্মাচরণ অন্তরের শুদ্ধি ও ঋদ্ধি আনে, যা জীবনের শীর্ষে পৌঁছেও মানুষের চরিত্রে কোন চিড় ধরাতে পারে না। গত শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যদি দেশের সম্পদ রক্ষার সঙ্গে মানব-সম্পদের উৎকর্ষসাধনের কথা চিন্তা করতেন, তাহলে সমাজতন্ত্রের পতনের পর তাঁদের উদ্দেশে চারিত্রিক নিন্দাবাদ ও সমালোচনার ঝড় বইত না। স্বাধীন ভারত যদি ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাকে উপেক্ষা না করত, তাহলে আজ এদেশ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের শিকার হতো না। চুরি, কর্তব্যে

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

অবহেলা, শোষণের বিকৃত ও বিচিত্র পদ্ধতির উদ্ভব এবং দেশপ্রেমের অভাব ভারতের জীবনকে হতাশার দিকে ঠেলে দিত না। আমাদের দেশের সংবিধানের মধ্যে যে 'Socialistic pattern of society' গঠনের পরিকল্পনা আছে, তার মধ্যে উন্নয়নের জোয়ার আনতে গেলে তাকে চিরায়ত মূল্যবোধ তথা আধ্যাত্মিকতার সাগরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে বেদান্তধর্ম পথপ্রদর্শক হতে পারে। ভারতের উন্নয়ন শুধু সভ্যতা-নির্ভর বা বহিরঙ্গের বিস্তারকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হতে পারবে না, তাকে সংস্কৃতি বা অন্তরঙ্গ জীবনসম্পদেও ঋদ্ধ হতে হবে। এজন্য বহুদিনের লালিত ভ্রান্তধারণা থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কিছু পরে সমাজতন্ত্রী চীনে বাজার অর্থনীতির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে চীনের নেতা লিউ-শাও-চি যে খোলামেলা মন্তব্য করেছিলেন, তার জন্য প্রথমে তাঁর কপালে তীব্র লাঞ্ছনা জুটলেও পরে নেতৃবর্গ তাঁকে সগৌরবে ফিরিয়ে এনেছিলেন। লিউ-শাও-চি মন্তব্য করেছিলেন ঃ যে-বিড়াল ইঁদুর ধরে, তার রঙ সাদা কি কালো দেখার দরকার নেই।

বিবেকানন্দ লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন কিনা তা নিয়ে যাঁরা বিতর্কে লিপ্ত হতে চান, তাঁরা সেই নিয়েই থাকুন, কিন্তু ইতিহাস বলছে—দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের বেদনার রক্তে পা ডুবিয়ে ভারতের উন্নয়নের প্রশ্নটিকে স্বাগত জানাতে তিনি ঘৃণাবোধ করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—'অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে' ভারতে দেব-ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হয়ে গিয়েছে। গত শতকে রুশ মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্ ই. পি. চেলিশেভ ভারতের মার্ক্সবাদীদের উদ্দেশে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমাকে ভারতবর্ষের এমন একজন যথার্থ মার্ক্সবাদীর নাম বলুন, বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নন! আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যেসব মার্ক্সবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি অথবা অজ্ঞতাবশত বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসাবে ধরে নিয়ে বসে আছেন।" বেদান্তধর্ম যে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে, সেবিষয়ে বিবেকানন্দের ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভারতের নেতৃবর্গ সংবিধান-স্বীকৃত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবেন, কারণ দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা হিসাবে এই মতাদর্শ সহজে ম্লান হবে না। তবে সেই সমাজতন্ত্রের চেহারা কেমন হবে? সেক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে মুখ থুবড়ে পড়া সমাজতন্ত্র অবশ্যই বিচার্য বিষয় নয়। বিবেকানন্দ যে নতুন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তার রূপায়ণের পথ খুঁজতে হবে। বিবেকানন্দের 'মানসপুত্র' সুভাষচন্দ্র একবার মন্তব্য করেছিলেন ঃ "ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কার্ল মার্ক্সের বই থেকে জন্ম নেয়নি, বিবেকানন্দের চিন্তায় তা আবির্ভূত।"

বিবেকানন্দ জানতেন, ভারতের শাস্ত্রে আছে মহাসাম্যবাদ অথচ কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। তাই আধুনিকালের প্রেক্ষিতে যখন তিনি বেদান্তের মহান আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের আহ্বান জানালেন, ঠিক তখনি উন্মোচিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার একটি নতুন দিগন্ত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বাল্যবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ "ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর উচিত স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে ফিরে যাওয়া। দেখতে হবে সেখানে কি আছে, তিনি কোন্ পন্থা নির্দেশ করেছেন। যদি বিবেকানন্দের পথে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন করা যায় তবে তার সফলতা সুনিশ্চিত।" হরিকুমার চক্রবর্তী অনুভব করেছিলেন, পরাধীন ভারতে "স্বামীজীর আদর্শে গণবিপ্লবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত ছিল অথচ তা করা হয়নি, তখন তৈরি আদর্শ চলে এল রাশিয়া থেকে এবং আমাদের একটি বড় দল কমিউনিজমকে গ্রহণ করল।" ফলে মার্ক্সবাদের মতো বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিয় অনুশাসনের মধ্যে হয়তো এখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি, তবে বর্তমান শতাব্দীর মানুষ এই আদর্শের সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর ইতিহাস ও সমাজচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যা চিরকালীন সত্যের দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। ফলে তা যুগান্তকালে মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিকে নাড়া দিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বর্তমানে ভারতের বামপন্থী তথা মার্ক্সবাদ-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যখন কিছুটা বিভ্রান্তির সম্মুখীন, তখন বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিকমতাদর্শ তাকে সঠিক দিশা নির্দেশ করতে পারে। লিও টলস্টয় চেকোশ্লোভাকিয়ার বিখ্যাত চিন্তাবিদ্, রাজনীতিবিদ্ এবং বিপ্লবী জান মাসারিককে বলেছিলেন ঃ "বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।" টলস্টয় তাঁর জীবনের শেষ বছরে (১৯১০) নির্দ্বিধায় বলেছিলেন ঃ "বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের ওপর।" সেই সত্যের রূপ কী? জীবনের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ দুর্জয় শক্তিতে মাথা তুলেছিলেন অনন্ত আকাশে। তাই জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

জীবনের অতীত। তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতা ও আবিলতা-মুক্ত শ্রমজীবী, মুদি, ভুনাওয়ালা সম্প্রদায় আপন অন্তরতর বৈভবের দীপ্তিতে শিবের সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয়। শুধু শ্রমজীবী মানুষ নয়, সব কালের সব দেশের সব শ্রেণির মানুষ—সফল অথবা ব্যর্থ—তাঁর উপাস্য ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ "তোমরা যাকে ভুল করে মানুষ বল, আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরের উপাসনা করি।" সেই কারণে বোধকরি কমিউনিস্ট চীনের খ্যাতনামা পণ্ডিত হুয়ান-কিন্-চুয়ান মন্তব্য করেছেন ঃ "আমরা বিবেকানন্দকে প্রশস্তি করি, কারণ তিনি তথ্য থেকে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।"

ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা এবং প্রায়োগিক সতর্কতা সম্পর্কে রাশিয়ার বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী লেখক ই. পি. চেলিশেভের সাবধানবাণী কমিউনিস্ট বন্ধুরা স্মরণ করতে পারেন। তিনি লিখেছেন ঃ "ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্ক্সবাদী হিসাবে আমি মনে করি, যেকোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কমিউনিস্টের যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে, তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।... বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন ও অবস্থার উপযোগী করে তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন।... বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে।"

গত শতাব্দীতে কবি জীবনানন্দ দাশ দেখেছিলেন, পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত আঁধার নেমেছে। সেই আঁধারকে স্বীকার করেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ঃ শেষ রাতের আঁধার ঘন হলে বুঝতে হবে সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই। বিবেকানন্দ প্রদর্শিত বিকল্প পন্থা আমাদের জীবনের বিপুল অন্ধকারে হয়তো সেই আশ্বাসেরই ফুল ফোটাবে। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) আমার ভারত অমর ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ
(২) চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
(৩) জগতের ধর্মগুরু—প্রকাশক ঃ স্বামী অসক্তানন্দ
(৪) ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(৫) মার্ক্সের পর মার্ক্সবাদ—শমিত কর
(৬) বিকল্প সমাজের সন্ধানে—অম্লান দত্ত

শব্দচেতনা ২৭

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অবলম্বনে রচিত শব্দছক

১		২		■	৩	৪		৫
	■		■	■	■		■	
৬		■	৭	৮		■	৯	
	■	১০	■		■	১১	■	
■	১২			■	১৩			■
১৪	■		■	১৫	■		■	১৬
১৭		■	১৮			■	১৯	
	■	২০	■	■	■	২১	■	
২২				■	২৩			

পাশাপাশি ঃ (১) দুর্গার এক নাম (৩) এই মাসে দুর্গাপূজা রীতি-বিরুদ্ধ (৬) যা দেবি সর্বভূতেষু ——রূপেণ সংস্থিতা *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (৭) —— মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে *(শ্রীদুর্গাস্তবরাজ)* (৯) বরুণদেব মা দুর্গাকে এই আয়ুধ দিয়েছিলেন (১২) —— দেহি জয়ং দেহি *(অর্গলাস্তোত্র)* (১৩) কার্তিকের শক্তি দেবী (১৭) লক্ষ্মি —— মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (১৮) একান্ন পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ (১৯) তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে —— *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (২২) ঘোরাননা —— ভালে শোভে বালশশী *(আগমনীসঙ্গীত)* (২৩) শিবশিবশুম্ভনিশুম্ভ —— তর্পিতভূত-পিশাচরতে *(মহিষাসুরমর্দিনীস্তোত্রম্)*।

ওপর-নিচ ঃ (১) —— ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (২) জয় জয় —— জয়ে জয়শব্দ... *(মহিষাসুরমর্দিনীস্তোত্রম্)* (৪) দুর্গাতনয়া, দুর্গারই এক রূপ (৫) চণ্ডীর আরেক নাম, —— স্তোত্র (৮) সা ঘণ্টা —— নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (১০) শিবকে লাভ করতে গিয়ে দুর্গার এই নাম হয়েছিল (১১) ——দায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় *(হরগৌর্যষ্টকম্)* (১৪) ——র্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)* (১৫) চণ্ডীর হাতে নিহত অন্যতম অসুর (১৬) সদা মঙ্গলময় শিব (২০) —— দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে *(শ্রীদুর্গাস্তবরাজ)* (২১) ত্বং —— ত্বং স্বধা চ *(শ্রীশ্রীচণ্ডী)*।

শিশির রায়

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম অগ্রহায়ণ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অব্দ ঃ বঙ্গাব্দ ঃ রামকৃষ্ণাব্দ

হরিপদ ভৌমিক

৭০-৮০ বছর আগের পঞ্জিকার পাতা ওল্টালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পাওয়া যায়। এব্যাপারে অশীতিপর গণেশ বিশ্বাস 'উদ্বোধন'-এ একবার লিখেছিলেন (স্মৃতিকথা, কার্তিক ১৪০৯ দ্রষ্টব্য)। সল্ট লেক-নিবাসী হরিপদ ভৌমিকের সংগ্রহে ১০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন যেসব পঞ্জিকা এবং সংবাদপত্র রয়েছে, তার সাহায্যে এবং যুক্তিনির্ভর হয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এই ধারণার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর রামচন্দ্র দত্ত। এখন আমরা আছি ১৬৮ রামকৃষ্ণাব্দে।

অব্দ অর্থাৎ বছর। বঙ্গাব্দে বছর শুরু ১ বৈশাখ, খ্রিস্টাব্দ শুরু ১ জানুয়ারি। সভ্যতার কোন্ সময় থেকে মানুষ এই গণনা শুরু করেছিল তা জানা যায় না, তবে সেই সুপ্রাচীন গণনার ধারা আজও প্রচলিত। পুরনো গ্রন্থের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে এই অব্দ গণনার একটি হিসাব মনুসংহিতায় (১।৬৫-৬৭) দেওয়া রয়েছে। এই গ্রন্থ-মতে, 'চোখের আঠারো পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে এক দিনরাত। দিন মানুষের কর্ম করার জন্য, আর রাত নিদ্রার জন্য। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ—দুই পক্ষে এক মাস। বারো মাসে এক বছর। মানুষের এক বছর দেবগণের এক রাত্রি এক দিন। এই দৈব এক রাত্রিকে বলা হয়েছে 'দক্ষিণায়ন' এবং দিনকে বলা হয়েছে 'উত্তরায়ণ'।

বৈদিক যুগের হিসাবে উত্তরায়ণে ছয় মাস এবং দক্ষিণায়নে ছয় মাস ছিল। মাস ও ঋতুর তালিকা এইরকম ঃ

উত্তরায়ণ		দক্ষিণায়ন	
মাস	ঋতু	মাস	ঋতু
তপঃ	শিশির	নভস্	বর্ষা
তপস্যা	শিশির	নভস্য	বর্ষা
মধু	বসন্ত	ইষ	শরৎ
মাধব	বসন্ত	উর্জ	শরৎ
শুক্র	গ্রীষ্ম	সহস্	হেমন্ত
শুচি	গ্রীষ্ম	সহস্য	হেমন্ত

উত্তরায়ণে ছয় মাস শিশির বা শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণায়নে ছয় মাস বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত—এই তিন তিন ছয় ঋতু ও বারো মাসে এক বছর গণনা করা হতো। 'মাস' কথার অর্থ হলো চন্দ্র বা চাঁদ। যে-তিথিতে মাস (চন্দ্র) পূর্ণ হতো, তাকে বলা হতো পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা)। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা—এই মাসকে বলা হলো পূর্ণিমান্ত মাস। চাঁদ নিজের কক্ষপথে ঘোরার সময় এক একদিন এক একটি নক্ষত্রের কাছে এসে পড়ে, এই কক্ষপথে চাঁদের সঙ্গে দেখা হয় সাতাশটি নক্ষত্রের। পুরাণের যুগে সাতাশটি নক্ষত্রকে কন্যারূপে কল্পনা করে চাঁদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়েছে, চন্দ্রকে একদিন করে এই নক্ষত্র-কন্যারা পাবে। সাতাশটি নক্ষত্র-কন্যা হলো—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তর-ভাদ্রপদা এবং রেবতী।

এই নক্ষত্রদের মধ্যে যে-নক্ষত্রের কাছে এসে চন্দ্রকলা পূর্ণ (পূর্ণিমা) হয় সেই নক্ষত্রের নামে 'মাস'-এর নামকরণ হয়। এইভাবেই আমরা পেলাম নাক্ষত্রমাস। কোন্ নক্ষত্রে কোন্ মাস হবে তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে ঃ

বিশাখা	নক্ষত্রে	পূর্ণিমা	হওয়ায়	চান্দ্র	মাস	বৈশাখ
জ্যেষ্ঠা	,,	,,	,,	,,	,,	জ্যৈষ্ঠ
পূর্বাষাঢ়া	,,	,,	,,	,,	,,	আষাঢ়
শ্রবণা	,,	,,	,,	,,	,,	শ্রাবণ
পূর্বভাদ্রপদা	,,	,,	,,	,,	,,	ভাদ্র
অশ্বিনী	,,	,,	,,	,,	,,	আশ্বিন
কৃত্তিকা	,,	,,	,,	,,	,,	কার্তিক
মৃগশিরা	,,	,,	,,	,,	,,	মার্গশীর্ষ
পুষ্যা	,,	,,	,,	,,	,,	পৌষ
মঘা	,,	,,	,,	,,	,,	মাঘ
পূর্বফাল্গুনী	,,	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন
চিত্রা	,,	,,	,,	,,	,,	চৈত্র

এই হলো চান্দ্র পথের হিসাব। চান্দ্র মাস দিয়ে মাসের নাম পেলেও জ্যোতির্বিদ্যায় গুরুত্ব কিন্তু সূর্যের। সূর্যকে ব্যবহার করা হয়েছে দৈর্ঘ্য মাপার কাজে। এই মাপের হিসাবটি করেছিলেন বরাহমিহির 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে। সূর্য যে-পথে ঘুরছে (অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে) সেই পথে বারোটি নক্ষত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই বারোটি রাশিকে একত্রে বলা হয় 'রাশিচক্র'। মজার কথা, সূর্য উঠলে তারা দেখা যায় না। আবার তারা দেখা গেলে সূর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। তাহলে হিসাব হবে কিভাবে? সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে ঠিক তার উল্টোদিকের আকাশে যে-নক্ষত্র থাকবে তা থেকেই রাশিচক্রের রাশি ও মাসকে খুঁজে পাওয়া যাবে। পূজা, পার্বণ—কোন ক্রিয়াতেই বার বা মাসের গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব রয়েছে তিথি-নক্ষত্রের। কোন্ রাশিতে সূর্যের প্রবেশে কোন্ মাস ও কোন্ ঋতু তা বোঝা যাবে নিচের তালিকা থেকে ঃ

মেষ	রাশিতে	সূর্যের	প্রবেশে	বৈশাখ	মাস,	ঋতু	গ্রীষ্ম
বৃষ	,,	,,	,,	জ্যৈষ্ঠ	,,	,,	গ্রীষ্ম
মিথুন	,,	,,	,,	আষাঢ়	,,	,,	বর্ষা

কর্কট	রাশিতে	সূর্যের	প্রবেশে	শ্রাবণ	মাস,	ঋতু	বর্ষা
সিংহ	,,	,,	,,	ভাদ্র	,,	,,	শরৎ
কন্যা	,,	,,	,,	আশ্বিন	,,	,,	শরৎ
তুলা	,,	,,	,,	কার্তিক	,,	,,	হেমন্ত
বৃশ্চিক	,,	,,	,,	অগ্রহায়ণ	,,	,,	হেমন্ত
ধনু	,,	,,	,,	পৌষ	,,	,,	শীত
মকর	,,	,,	,,	মাঘ	,,	,,	শীত
কুম্ভ	,,	,,	,,	ফাল্গুন	,,	,,	বসন্ত
মীন	,,	,,	,,	চৈত্র	,,	,,	বসন্ত

বঙ্গাব্দের শুরু বৈশাখের ১ তারিখে। প্রাচীনকাল থেকে কিন্তু এই হিসাব ছিল না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৩৫) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।" অর্থাৎ বারো মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ। মার্গ হচ্ছে রাস্তা, শীর্ষ হচ্ছে মাথা বা প্রথম। সেই যুগে মার্গশীর্ষ বা বছরের প্রথম মাসটি ছিল অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণের অর্থও একই—'অগ্র' অর্থাৎ আগে, 'হায়ণ' অর্থে বর্ষ। তাই 'অগ্রহায়ণ' বছরের প্রথম মাস। এই মাস ধরে যে-বছর গণনা করা হতো তার নাম ছিল 'মার্গশীর্ষ-বর্ষ'।

আরেকটি বছরের নাম 'শরৎ-বর্ষ'। এই বছরের শুরু আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার অষ্টমী-নবমীর সন্ধিকালে সন্ধিপূজার শুভ মুহূর্তে। দুই বর্ষের সন্ধিক্ষণে প্রদীপ জ্বালিয়ে কামনা করা হতো—নববর্ষের দিনগুলি আলোকোজ্জ্বল হোক। বর্তমানে সন্ধিপূজায় ১০৮ প্রদীপ জ্বালানো সেই স্মৃতির সাক্ষ্য। শরৎ-বর্ষের নবসূর্যকে অভ্যর্থনার জন্য আশ্বিনে ঘরদোর পরিষ্কার হতো। মানুষ নতুন জামাকাপড় পরত। আগে কাউকে আশীর্বাদ করার সময় 'শত শরৎ আয়ু হোক' বলা হতো। এর অর্থ—শতবর্ষ বেঁচে থাক। শরতে নববর্ষ শুরু বলেই এমনটি বলা হতো।

'কার্তিক-বর্ষ'-এর শুরু ছিল কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে। কার্তিকী অমাবস্যায় কালীপূজার রাতে প্রদীপ নিয়ে ঘরদোর আলোকিত করা হয়। দীপাবলী বা দেওয়ালী নববর্ষ শুরুর উৎসব। গুজরাটে আজও নববর্ষের উৎসব বা নতুন খাতার শুভ মহরৎ হয় দীপাবলীর দিন। বছরের প্রথম মাস বলে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশে আকাশ- প্রদীপ দেওয়ার রেওয়াজ বহুকাল থেকে চলে আসছে। কার্তিক-বর্ষের শুরু যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের যুগ থেকে হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন।

'ফাল্গুনী-বর্ষ'-এর শুরু ধরা হতো ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে। এই দিন ছিল উত্তরায়ণের শুরু। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—এই দুই ভাগকে সূর্যরূপী বিষ্ণুর দুবার দোল খাওয়ার সময় বলা হয়েছিল। 'দোল' শব্দের অর্থ দোলা, দোলন, কম্পন। ফাল্গুন মাসের দোল আজকের 'হোলি'। 'হোলি' বা রঙ খেলা নববর্ষে সকলের মনকে আশার নানা রঙে ভরিয়ে আনন্দ করার উৎসব। উত্তর ও মধ্য ভারতে এই দিন অশ্লীল গান ও খেউড় শোনে। পুরনো কলকাতাতেও এমনটি হতো বলে জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ "তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করে গায়ে রক্ত, কাদা মেখে মোষের মুণ্ড মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হতো। আর বৃদ্ধ পিতামহ হাতে খাতা নিয়ে তাঁর সমবয়স্কি লোক, পুত্র, পৌত্র নিয়ে কাদামাটির গান করত। সেসব অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য গান। বাড়ির মেয়েদের সামনেও সেইসব গান গাওয়া হতো এবং পাছে ভুল হয় এজন্য হাতে লেখা খাতা রেখে দেওয়া হতো। একে অপর কথায় খেউড় গান বলত।"

ফাল্গুনী নববর্ষের সঙ্গে এই অশ্লীল গানের সম্পর্ক কি? সেকালে বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু-কর্ণ বা দেহ অশুচি করলে সেবছর যমদূতঐ অশুচি দেহ স্পর্শ করবে না। তাই দেহকে অশুচি করার জন্য এই গান ও কাদামাটি খেলা। ফাল্গুনী দোল উত্তরায়ণের স্মৃতি, আর বসন্তে সূর্যরূপী বিষ্ণু দ্বিতীয়বার দোলা শুরু করেন। এই দোলকে বলা হয় 'হিন্দোল' বা 'ঝুলন'। হিন্দোল দক্ষিণায়নের স্মৃতি।

চৈত্র পূর্ণিমায় নববর্ষ শুরুর কথা জানা যায় তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।৫।৮) থেকে। সেখানে বলা হয়েছে—"চিত্রা পূর্ণমাসে দিক্ষেরণ মুখং বা এতৎ সম্বৎসরস্য যৎ চিত্রা পূর্ণমাসো মুখত এব..."—চৈত্র মাসের পূর্ণিমা হলো বর্ষের মুখ (আদি), ঐদিনই যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে।

বৈশাখ মাসে যে-বছরের শুরু তার নাম 'বঙ্গাব্দ'। গত ১ বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৪১০ বছরে পড়েছে। ইংরেজি অব্দে হিসাব করলে দাঁড়ায় ২০০৩—১৪১০ = ৫৯৩ । অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দের সূচনা হয়। বঙ্গের সভ্যতার বিকাশ ঐসময় থেকেই শুরু হয়েছিল। বঙ্গাব্দের সঙ্গে বঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও 'বঙ্গ' জনপদ খুব প্রাচীন।

মহাভারত এবং মৎস্যপুরাণ-মতে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র—এই পঞ্চপুত্রের জন্ম হয়। এঁদের নামানুসারেই পাঁচটি রাজ্যের নাম হয় । মহাভারতের আদিপর্বে (১০৪।৫০) আছে—

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"

মৎস্যপুরাণে (৪৮) লেখা রয়েছে ঃ

"তদংশস্তু সুদেষ্ণায়া জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ব্যজায়ত।
অঙ্গস্তথা কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মস্তথৈব চ।

বঙ্গরাজশ্চ পৌণ্ড্রেতে বলেঃ পুত্রাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ।
ইত্যেতে দীর্ঘতমসা বলের্দত্তাঃ সুতাস্তথা॥"

দীর্ঘতমার নাম পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ইনি উতথ্যের পুত্র, মাতার নাম মমতা। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের ৪।৬ সহ অনেকগুলি সূক্ত তিনি রচনা করেছেন। সুতরাং বৈদিক যুগে বঙ্গ রাজ্যের আলাদা অস্তিত্ব ছিল বলে মানতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। বঙ্গের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'ঐতরেয় আরণ্যক' (২।১।১)-এ ঃ

"তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানী-
মানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।"

এখানে অবশ্য 'বঙ্গ'কে পাখির দেশ বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এই মন্তব্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ঃ "ঐতরেয় আরণ্যক গোষ্ঠী পূর্বপ্রান্তের সমগ্র জনপদ পক্ষীর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যক গোষ্ঠী নিকৃষ্ট অর্থে পক্ষীর দেশ উল্লেখ করলেও তাঁরা নিজেদের অজান্তে একটি বিশেষ বিষয়ে অতি সত্যি কথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন।...

" 'পক্ষী' অর্থে গায়ক (The Bards [শেক্সপীয়ারকে বলা হতো 'The Bard of Avon']) আবার 'পক্ষিকুল' অর্থে গায়ককুল বা গায়ক গোষ্ঠী—যাঁরা মুখে মুখে গান রচনা করে এবং গায়। ঐতরেয় আরণ্যক গোষ্ঠী ঐ গায়কদের দেশকে নিকৃষ্ট অর্থে পক্ষীর দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।... এই ধরনের চারণ বা গায়ন কিংবা সম্প্রদায়ের কথা পাই আইরিশ বা কেল্টিক সভ্যতায়—'They have also Lyric poets whom they call bards.'

"আজও হাতে একতারা নিয়ে বাউল সম্প্রদায় গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ঐ প্রাচীন লোকায়ত ধারাকে বজায় রেখে চলেছে, যাকে ঐতরেয় আরণ্যক গোষ্ঠী নিকৃষ্ট অর্থে পক্ষীর কুল হিসাবে চিহ্নিত করেন। আরো লক্ষণীয়, আইরিশ বা কেল্টিক সভ্যতায় ঐ সম্প্রদায়ের নাম ছিল গাউল (Gaul)। কী সুন্দর মিল গাউলে-বাউলে! 'Oral tradition of Gaul'-এর সঙ্গে অসম্ভব মিল পাওয়া যায়। বর্তমান 'Oral tradition of Gaul'-এর সঙ্গে—যা ঐ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বিভিন্ন মহাকাব্যেও দেখতে পাই যথাক্রমে 'কুশীলব' গোষ্ঠী, 'সূত' গোষ্ঠী।... 'কুশীলব' সম্প্রদায়ের কথা মহাকাব্যের স্রষ্টা সম্ভবত 'লবকুশ' চরিত্রের রূপদানের মধ্য দিয়ে ঐ প্রাচীন রীতিকে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করেছেন।" (বঙ্গাব্দের প্রত্ন ইতিহাসের খোঁজে, 'মান্দাস' পত্রিকা, শারদীয়া ১৯৯৬, পৃঃ ৩-৪)।

মহাভারতের যুগেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। দুজায়গায় অবশ্য দুরকম মন্তব্য করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, বঙ্গজন সুজাতি, আবার অন্যত্র নীচুজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাচীন 'বঙ্গ' থেকেই 'বাংলা' নামটি এসেছে। দীর্ঘতমার পুত্র বঙ্গের নাম থেকে এই নামকরণ বলা হলেও সুকুমার সেন এর অন্য একটি অর্থ করেছেন। তাঁর মতে ঃ "বাংলা, বাঙালি—এই নাম দুটি 'বঙ্গ' শব্দ থেকে উৎপন্ন। ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' জাতের নামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সন্দেহ নেই। এ-নামটির অর্থ কী জানতে আগ্রহ হয়। আমার মনে হয়, সেকালে যে-জাত কাপাসের চাষে বা কাপাস তুলোর কাজে অর্থাৎ দড়ি পাকাতে ও কাপড় বুনতে বিশেষ দক্ষ ছিল, তারাই 'বঙ্গ' নাম পেয়েছিল। কেননা 'বঙ্গ' শব্দটির একটি প্রাচীন অর্থ হলো 'কাপাস' গাছ। উদ্ভিদশাস্ত্রে বলে যে, কাপাস গাছ বাংলাদেশেরই বিশিষ্ট উদ্ভিদ। অন্য কোন দেশ থেকে উড়ে আসা উদ্ভিদ নয়। কাপাস-এর চাষে আর সূক্ষ্ম সুতোর কাপড়ের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের খ্যাতি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"

এত কথা বলার কারণ, সুপ্রাচীন বঙ্গে অব্দগণনা প্রাচীনকাল থেকেই চলেছিল। সূর্যসিদ্ধান্ত-মতে হিসাবটা এমন—

"মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং অহরুচ্যতে।
সুরাসুরাণামন্যোন্যমহোরাত্রং বিপর্যয়াৎ॥
তৎষষ্টিঃ ষড়্‌গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ।
তদ্দ্বাদশসহস্রানি চতুর্যুগমুদাহৃতম্॥"

বারো মাসে এক বর্ষ । এক সৌর বর্ষে দেবতাদের একদিন (অহোরাত্র)। দেবতাদের দিনরাত এবং দৈত্যদের দিনরাত পরস্পর বিপরীত হয় অর্থাৎ দেবতাদের যখন রাত্রি (দক্ষিণায়ন), অসুরদের তখন দিন। ৩৬০ সৌরবর্ষে হয় এক দিব্যবর্ষ। দেবতাদের এক বছর আমাদের ৩৬০ সৌরবর্ষ। বারো হাজার দিব্যবর্ষে চতুর্যুগ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের সমষ্টিকে 'চতুর্যুগ' (মহাযুগ) বলে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নিয়ে চার যুগের হিসাব হলো ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষ। এই চার যুগের পরিমাণকে দশ দিয়ে ভাগ করে ৪, ৩, ২ ও ১ দিয়ে গুণ করলে যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের সময়সীমা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক যুগের ষষ্ঠাংশে তাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ধরা হয়। প্রতিযুগের আদি সন্ধিকে 'সন্ধ্যা' ও অন্তঃসন্ধিকে 'সন্ধ্যাংশ' বলে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নিয়ে সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ সৌরবর্ষ। ত্রেতা যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ সৌরবর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ সৌরবর্ষ। কলি যুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ সৌরবর্ষ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

বঙ্গ সুপ্রাচীন স্থান হলেও বঙ্গাব্দের শুরু কিন্তু মাত্র ১৪০৯ বছর আগে। কেউ কেউ দাবি করেন, সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মত, সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

বঙ্গাব্দ, বৌদ্ধাব্দ, চৈতন্যাব্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য নাম স্মরণে 'রামকৃষ্ণাব্দ' নামে ১১০ বছর আগে যে নতুন অব্দ প্রচলন করার শুভ প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, তা আজও সার্বজনীনভাবে চালু হয়নি। একটি অব্দ চালু করা বা চালু রাখার প্রথম শর্ত হলো, বহু সংখ্যক মানুষকে অব্দের নামটি ব্যবহার করতে হবে। প্রাচীনকালে কোন রাজা রাজ্যজয় করে বা নিজের সিংহাসন আরোহণের সময়কে স্মরণীয় করে রাখতে নিজের নামে অব্দ প্রচলন করতেন। রাজা চালু করতেন, রাজ্যের প্রজাগণ রাজার প্রচলিত অব্দটি মেনে চলতেন। মেনে চলাটাই অব্দ চালু রাখার প্রথম শর্ত।

রাজার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসন ধরে 'রামকৃষ্ণাব্দ' চালু করেন রামচন্দ্র দত্ত, কিন্তু মেনে চলার সুযোগ তৈরি ছিল না বলে তা শুরু করেও চালু থাকেনি। তিনি বছর গণনার যে-পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তা সার্বজনীনভাবে গ্রহণে অসুবিধা ছিল। '৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ' লিখে ১২৯৯ সালের ১৯ চৈত্র স্টার থিয়েটারে তিনি ১৮টি বক্তৃতার প্রথমটি দেন। শেষ বক্তৃতার তারিখ '৬৩ রামকৃষ্ণাব্দ'—১৬ চৈত্র ১৩০৩ সন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনকে (১২৪২ সনের ৬ ফাল্গুন, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্লপক্ষ, বুধবার) বছরের প্রথম দিন ধরে তিনি রামকৃষ্ণাব্দের গণনা শুরু করেন। ১৮টি বক্তৃতার তারিখ ও রামকৃষ্ণাব্দের গণনার দিকে চোখ রাখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে—

স্টার থিয়েটার ঃ

রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা?—১৯ চৈত্র ১২৯৯, ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৮ বৈশাখ ১৩০০। রামকৃষ্ণাব্দের উল্লেখ নেই।

রামকৃষ্ণোক্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের সমন্বয়—২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০। রামকৃষ্ণাব্দের উল্লেখ নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত গুরুতত্ত্ব—১৯ আষাঢ় ১৩০০। রামকৃষ্ণাব্দের উল্লেখ নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত পরকাল—২২ শ্রাবণ ১৩০০। রামকৃষ্ণাব্দের উল্লেখ নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব—১২ ভাদ্র ১৩০০।৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

সিটি থিয়েটার ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত ব্রহ্ম-শক্তি—১৬ আশ্বিন ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

১৯৩৫ সাল/১৩৪১ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকার একটি পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত জ্ঞান ও ভক্তি—২০ কার্ত্তিক ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত বিবেক ও বৈরাগ্য—১৯ অগ্রহায়ণ ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত ঈশ্বরসাধনা—১৮ পৌষ ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

মিনার্ভা থিয়েটার ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সাধনের স্থান নির্ণয়—২৩ মাঘ ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত সাধনের অধিকারী—২১ ফাল্গুন ১৩০০। ৫৯ রামকৃষ্ণাব্দ।

সিটি থিয়েটার ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত আত্মা—১৯ চৈত্র ১৩০০। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম—২৪ বৈশাখ ১৩০১। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত ঈশ্বরলাভ—২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। ৬০ রামকৃষ্ণাব্দ।

মিনার্ভা থিয়েটার :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত বিশ্বজনীন ধর্ম—২৭ শ্রাবণ ১৩০২। ৬১ রামকৃষ্ণাব্দ।

স্টার থিয়েটার :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত জমা খরচ—১৫ ভাদ্র ১৩০৩। ৬২ রামকৃষ্ণাব্দ।

শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—১৬ চৈত্র ১৩০৩। ৬৩ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিনকে বছরের প্রথম দিন ধরে রামকৃষ্ণাব্দ গণনা শুরু হলে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে আরেকটি নতুন অব্দের নতুন তারিখ চালু করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি এই ভাবনা অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে মনে হবে। বঙ্গাব্দের শুরু ১ বৈশাখ। খ্রিস্টাব্দের শুরু ১ জানুয়ারি আর রামকৃষ্ণাব্দ শুরু করতে হবে ৬ ফাল্গুন। এটা না করে ১ বৈশাখকেই 'রামকৃষ্ণাব্দ' বছরের শুরু ধরা হোক। ১২৪২ সনকে ০ বছর গণনা করে রামকৃষ্ণাব্দ শুরু হোক। এই হিসাবে আগামী ১ বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ হবে ১৬৯ রামকৃষ্ণাব্দ। সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত মিশন, সঙ্ঘ এবং ভক্ত-পরিবারের সকলকে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'রামকৃষ্ণাব্দ' ব্যবহার শুরু করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নামাঙ্কিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকা, উৎসবের আমন্ত্রণপত্র-সহ সর্বক্ষেত্রে 'রামকৃষ্ণাব্দ' ব্যবহার করতে হবে—বাঙলা তারিখের পাশে। ভক্ত-পরিবারে বাড়ির কর্তাকে গৃহপ্রবেশ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন-সহ সমস্ত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে 'রামকৃষ্ণাব্দ' লিখতে হবে।

একদিনেই সকলে 'রামকৃষ্ণাব্দ' লেখা শুরু করবেন—এমনটি ভাবা ঠিক হবে না। তবে সকলের মিলিত আন্তরিক চেষ্টায় ঠাকুরের নামে অব্দটি চালু হলে অব্দের ইতিহাসে 'রামকৃষ্ণাব্দ' আলাদা জায়গা করে নেবে। খ্রিস্ট-ভক্তমণ্ডলী যেমন গর্ব করে বলতে পারেন—'খ্রিস্টাব্দ' সমগ্র পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। 'রামকৃষ্ণাব্দ' সেই গর্বের জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না-ই বা কেন? আগেই বলা হয়েছে, অব্দ প্রচলনের প্রথম ও প্রধান কথা মেনে চলা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ছড়িয়ে রয়েছেন, সকলে যদি মানেন তাহলে 'রামকৃষ্ণাব্দ' দিয়েও বিশ্বজয় সম্ভব। ❑

পাঁচগাঁও দুর্গাবাড়ির দুর্গোৎসব

কমলেশ দাস ও কৌশান রায়

সম্বৎসর পরে দেবীর আগমন। আর তাঁর আগমনেই মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় পাঁচগাঁওয়ের দুর্গাবাড়ি। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৌলভিবাজারের ২০ কিলোমিটার দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম পাঁচগাঁও। প্রতি বছর এইখানেই হাজার হাজার ভক্তের ঢল নামে পূজার চারদিন। নানা ওঠাপড়া, শতেক জনশ্রুতি, ঐতিহ্য আর পরম্পরা—এই নিয়ে কিংবদন্তির প্রবহমান ধারায় আজও সজীব দুর্গাবাড়ির ইতিকথা। এর বিশেষত্ব, পারিবারিক পূজা হলেও এই পূজামণ্ডপ পীঠস্থানের রূপ নিয়েছে। অনেকে বলেন, ৩০০ বছর পূর্বে এই পূজার সূচনা। তবে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে সূচনা হয়েছিল এই পূজার এবং তারপর থেকে এর নির্দিষ্ট ইতিহাসও রয়েছে। সেইসময় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিবছরই আয়োজন করা হয় শারদীয়া দুর্গাপূজার। জনশ্রুতির হাত ধরেই আমাদের যেতে হয় পূজার সূচনাকালে।

আজকের কথা নয়। এই পাঁচগাঁও গ্রামে প্রায় ১৫০ বছর আগে সর্বানন্দ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সরকারি মুনশি সর্বানন্দের কর্মস্থল ছিল অসমের শিবসাগর জেলায়। একবার দুর্গাপূজার সময় তিনি কামাখ্যাধামে গমন করেন এবং কুমারীপূজার মনস্থ করেন। মহাষ্টমীর দিন এক পঞ্চমবর্ষীয়া কুমারীকে পূজার আয়োজন করা হয়। ৬ ঘণ্টাব্যাপী পূজার শেষে সর্বানন্দের সামনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কুমারীর গাত্রবর্ণ ধীরে ধীরে লোহিতবর্ণ ধারণ করে। দেবীর এই আশ্চর্য প্রকাশ সর্বানন্দের বুঝতে বিলম্ব হলো না। তিনি তদ্গতচিত্তে কুমারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করলেন। দেবী আশীর্বাদ করে বললেন যে, তিনি সর্বানন্দের পাঁচগাঁওয়ের গ্রামের বাড়িতে সদা অধিষ্ঠিতা থাকবেন। দেবী নিজ মস্তকের স্বর্ণসিঁথি প্রসাদস্বরূপ সর্বানন্দকে দিলেন, যা আজও বংশপরম্পরায় রক্ষিত হচ্ছে।

দেশে ফিরলেন সর্বানন্দ। পরবর্তী বছর পাঁচগাঁওয়ে নিজের বাড়িতে তিনি পূজার আয়োজন করলেন। দেবীর অঙ্গের বর্ণ কুমারীর ন্যায় লোহিতবর্ণ করা হলো। কিন্তু দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ আছে, তাঁর গাত্রবর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়। তাই সর্বানন্দের জ্ঞাতিবর্গ ও পুরোহিতগণ এই লোহিতবর্ণ নিয়ে আপত্তি তুলে পূজার কাজে বিরত থাকলেন। ষষ্ঠীরদিন রাত পর্যন্ত পূজামণ্ডপে কেউই এলেন না। পুরোহিতের অভাবে 'বোধন' করা গেল না। সর্বানন্দ পাগলের মতো হয়ে গেলেন, আর আকুলভাবে মাকে ডাকতে লাগলেন। নিশা অবসান প্রায় সমাগত। এমন সময়ে দৈবক্রমে কুলপুরোহিত সেখানে উপস্থিত হয়ে পূজায় সম্মতি দিলেন এবং দেবীর বোধন সম্পন্ন হলো। উষালগ্নে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদে চতুর্দিক মুখরিত

পাঁচগাঁওয়ের দুর্গাপ্রতিমা ● *কমলেশ দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত*

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

করে মহাসপ্তমীর পূজা শুরু হলো। আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখলেন না সর্বানন্দ।

সর্বানন্দের কুলপুরোহিত রোহিণী ভট্টাচার্যের পিতামহ তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁরই উপদেশে পূজায় ১০,০০০ হোম, মহাবলি ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। দেবীর পূজাকার্য প্রতিবছর যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য সর্বানন্দ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে একখানা নির্দেশনামা দিয়ে যান। এই নির্দেশনামা বংশপরম্পরায় অদ্যাবধি অনুসৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময় পূজার আড়ম্বর নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠলেও নির্দেশনামার শর্তাবলী পরিবর্তন করতে কেউই সাহস করেনি। নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে বছর বছর পূজার আয়োজন হতে থাকে।

১৮৫৫ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। আর্থিক সচ্ছলতা কমে আসতে থাকে পরিবারে। কিন্তু পূজার কাজে ঘাটতি দেখা যায়নি। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উৎসবের জৌলুস ক্ষীণ হলেও পূজা বন্ধ হয়নি। কিন্তু দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয় আরো পরে। বাংলায় তখন চলছে মুক্তিসংগ্রাম। তার সঙ্গে চলছে লুণ্ঠন আর নরহত্যা। তখন পূজার কার্য সম্পন্ন করতেন সর্বানন্দের বংশধর উমাপ্রসন্ন দাস। এসময় দেবীর নানাবিধ অলঙ্কার লুণ্ঠিত হয়। দেবীর স্বর্ণসিঁথি কুলপুরোহিতের নিকট গচ্ছিত রাখা ছিল, ফলে সেটি লুণ্ঠিত হয়নি। ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গে পূজা অনুষ্ঠিত হয়নি। এসময় জনৈক ব্যক্তি দুর্গাবাড়ির মণ্ডপে ফুল-বেলপাতা দ্বারা ঘটেই দেবীর পূজা করেন। দুর্গাবাড়ির ইতিহাসে এই একবারই পূজায় ব্যতিক্রম ঘটে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হলো। আবার নতুন করে গড়ার দিন। পরবর্তী বছরে পূজাও শুরু হলো যথাবিহিতভাবে। পূজার আড়ম্বর তিল তিল করে বাড়তে লাগল। পরিবারের বাইরের সদস্যরাও যুক্ত হতে থাকলেন এই পূজার কাজে। কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দুর্গামণ্ডপে দালান তৈরি করা হয়, পাকা করা হয় যজ্ঞকুণ্ড, রান্নাঘর। পাঁচগাঁওয়ের পূজা শুধু সে-অঞ্চলেই আবদ্ধ থাকল না, ক্রমে তা শ্রীহট্টের সর্বত্র এবং ধীরে ধীরে সারা বাংলাদেশে পরিচিতি পেতে থাকল।

পাঁচগাঁও হিন্দু-মুসলিমের গ্রাম। গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ও আজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূজার কাজে, তাঁরা যুক্ত হয়েছেন শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে। পূজার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারও প্রতিবছর সশস্ত্র পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করেন। কোন কোন বছর বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি পূজাপ্রাঙ্গণে আসেন।

অক্ষয় তৃতীয়াতে মাটি ফেলা থেকে শুরু করে দশমীর নিরঞ্জন পর্যন্ত প্রতিটি কাজ আজও উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর পূজায় যুক্ত কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সপ্তমীর দিন থেকে হাজার হাজার ভক্ত আসতে থাকেন এবং পূজার চারদিন এখানেই প্রসাদ পান। দেবী-প্রদত্ত স্বর্ণসিঁথি দ্বারা মহাস্নান, আরতি, অন্নভোগ, হোম চলে তিনদিন ধরে। মহাষ্টমীর দিন অঞ্জলি প্রদান করেন কয়েকশো ভক্ত। নবমীর দিন হয় মহাবলি (মহিষ বলি)। ১০,০০০ হোমের (১০,০০০ বিল্বপত্র দ্বারা যে হোম) শেষে সম্পন্ন হয় পূর্ণাহুতি। ভক্তেরা দেবীর নিকট মনস্কামনা করে নানাবিধ অলঙ্কার, বস্ত্র ও অর্থ নিবেদন করেন। দশমীর অপরাহ্ণে প্রতিমার নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসব। অপেক্ষা আবার একবছরের।

কালের স্রোতে সবকিছুরই রঙ বদলায়। পাঁচগাঁও দুর্গাবাড়ির পূজারও রূপ বদলেছে। কিন্তু এবাড়ির ঐতিহ্য নতুন আর পুরনোকে মিলিয়ে দেয় মহাপূজার দিনগুলিতে। আশ্বিনের শারদপ্রাতে ঢাকের বোলে জেগে ওঠে পাঁচগাঁও। সর্বানন্দের পুণ্যধামে, ভক্তের হৃদয়মানসে অধিষ্ঠিতা হন জগদীশ্বরী। ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২৫

পাশাপাশি ঃ (১) রাগে, (২) জন, (৪) ভজ, (৫) জগ, (৬) দেহা, (৭) হর, (৮) দেব, (৯) দিবি, (১০) কিং, (১১) এক, (১২) আভা, (১৩) সদা, (১৪) পিতৃ, (১৫) বক্তা, (১৬) যঃ, (১৭) মিত্রে, (১৮) যং, (১৯) তত্র, (২০) সদা, (২২) যথা, (২৩) শর্ব, (২৪) কস্য, (২৫) তত, (২৬) দুরী, (২৭) জরা, (২৮) তাত, (২৯) রস।

ওপর-নিচ ঃ (১) রাজহংসঃ, (২) জগদেকপিত্রে, (৪) দেহাদিভাবং, (১৬) যস্য, (১৭) মিত্র, (১৮) যদা, (১৯) তথা, (২০) সর্ব, (২১) তস্য, (২২) যততা, (২৩) শরীর, (২৪) করালী।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, ব্রহ্মচারী রণজিৎ, মানবেন্দ্রনাথ শীল, অলক পাল চৌধুরী, দিলীপকুমার মৌলিক, সুদীপ্ত বসু, অণিমা সর্বাধিকারী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা পাল, কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলি, মনোজ মুখোপাধ্যায়, রুণা রায়চৌধুরী, সুনীতি পাল।

শতাব্দীর আলোকে উদ্ভাসিত 'কথামৃত'

স্বামী প্রভানন্দ*

আমাদের আলোচ্য বিষয়—'শতাব্দীর আলোকে উদ্ভাসিত কথামৃত'। এই 'শতবর্ষ' পূর্ণ হলো কবে? কথামৃতকার শ্রীম ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পরই (১৮৮২)—এধারণা নিয়ে শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়। সেটি ছিল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ। 'কথামৃত'-পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের প্রথম সাতটি দর্শনের সঠিক তারিখের উল্লেখ নেই। পঞ্চম দর্শন ঘটেছিল বলরাম-ভবনে। মাস্টারমশায়ের স্মৃতিতে দিনটি ছিল দোলপূর্ণিমা, সেইজন্য সহজে লিখতে পেরেছিলেন ১১ মার্চ ১৮৮২। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে, ঐবছর দোলযাত্রা ছিল ৪ মার্চ। এদিকে বাঙলায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে। গত বছর (২০০২) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন 'কথামৃত' প্রকাশনার শতবর্ষ পূর্ণ হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারকে শ্রীম মনে করতেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। সে-ঘটনার তারিখ তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। এর কারণ এই হতে পারে যে, তিনি ঐ সাতটি দর্শনের কাহিনী ডায়েরিতে সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতে পারেননি। ঐ কয়দিনের ঘটনা, বিশেষ করে প্রথম চারটি সাক্ষাৎকারের ঘটনা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি ঘটনাগুলি বারবার স্মরণ-মনন করেছেন, অনুধ্যান করেছেন। সেগুলি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য দর্শনের সঠিক তারিখ মনে না থাকলেও ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয় স্মৃতিকোঠায় সঞ্চিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বা মার্চে। তারিখ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। তিনি প্রথমে লিখলেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের এক রবিবারে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কয়েকটি সংস্করণ পরে তিনি তা পালটে লিখলেন—ফেব্রুয়ারি মাস। আরো কয়েকটি সংস্করণ পরে তিনি আবার সংশোধন করে লিখলেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের এক রবিবারে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর জীবিতকালের মধ্যে 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগের ১২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বাদশ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৩৬-এ। সত্যনিষ্ঠ মাস্টারমশায়ের সততা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে-গ্রন্থাকারে আমরা 'কথামৃত' দেখতে পাই—তার যদি শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতেই হয়, তাহলে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার দিন অর্থাৎ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ ঠাকুরের জন্মতিথির দিন বুধবার, ২৮ ফাল্গুন ১৩০৮ অথবা মাস্টারমশায়ের শরীর যাওয়ার পর পঞ্চম ভাগ প্রকাশের দিনটি (৮ ভাদ্র ১৩৩৯) ধরে অগ্রসর হওয়া উচিত।

বর্তমান আকারে 'কথামৃত' আত্মপ্রকাশ করলে বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা একই সঙ্গে তা ছাপাতে আরম্ভ করল। একই লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হলো। আবার যে-লেখা গত মাসে বেরিয়েছে, সেই লেখা নতুন করে পরের মাসে আরেকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এধরনের অ-সাধারণ ঘটনা আর কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা জানা যায় না। এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

আরো একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। কপিরাইটের সময়সীমা ৫০ বছর উত্তীর্ণ হলে পর ১ জানুয়ারি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের বাজারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। একসঙ্গে ৭-৮টি সংস্থা 'কথামৃত' প্রকাশ করল। কলেজ স্ট্রিটে 'কথামৃত' কেনার জন্য বড় বড় লাইন পড়েছিল। ভিড় সামলাবার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ পর্যন্ত করতে হলো। প্রকাশন-জগতে এটি একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে' শীর্ষক রচনা প্রকাশিত হলো। পরদিনের প্রতিবেদনের শিরোনামা ছিল—'কপিরাইটের গণ্ডি ছাড়িয়ে কথামৃত ছড়াচ্ছে বন্যাবেগে'। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘকাল 'কথামৃত' বেস্ট সেলারের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

গ্রন্থটির নাম কি প্রথম থেকে 'কথামৃত'ই ছিল? বোধহয় না। মাস্টারমশায় প্রথমে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত'

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের সদস্য, গবেষক; বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক।

নাম পছন্দ করেছিলেন। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে এই তথ্য পাওয়া গেছে। মাসিক পত্রিকা 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে প্রকাশিত লেখাটিও ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' শিরোপাভূষিত। পরে তিনি নামটি পরিবর্তন করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। সহজ কারণ হলো—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, তাঁকে ভাগবতের কথক হতে হবে। মাস্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতের কথক। আরো কথা। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ একটি অসাধারণ শ্লোক রয়েছে—'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং...' ইত্যাদি। স্বয়ং ব্যাসদেব বলছেন, শ্রীভগবানের মুখের কথা অমৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও অমৃত। সেজন্য বোধকরি মাস্টারমশায় তাঁর রচনার নামকরণ শেষপর্যন্ত 'কথামৃত' স্থির করেছিলেন।

সংস্কৃতে 'কথা' শব্দটির অর্থ বিবরণ, বর্ণনা। যেমন—রামকথা, কৃষ্ণকথা, কথাসরিৎসার ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কথা' শব্দের অর্থ—বাণী, উক্তি, sayings। অবশ্য এর অন্যথাও আছে। ভারতের কথা, দেশভ্রমণের কথা বলতে বিবরণ বোঝায়। মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় 'কথা' বলতে বোঝায় বিবরণ এবং বাঙলাতে বোঝায় উক্তি, বাণী ইত্যাদি। 'ভাগবত'-এ দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা রয়েছে, আবার তাঁর বাণীও রয়েছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর মধ্যে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী ও বাণী।

আরো একটি ঘটনা স্মর্তব্য। মাস্টারমশায় নিজে ইংরেজিতে লিখতে আরম্ভ করে তার শিরোনাম দিয়েছিলেন—'The Gospel of Sri Ramakrishna'। 'Gospel'-এর মধ্যে উক্তিও রয়েছে, বিবরণও রয়েছে। সুতরাং 'কথামৃত' বললে বুঝতে হবে বাণী ও বিবরণের সমাহার। এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে মাস্টারমশায় নিজে একজায়গায় বলেছেন ঃ "ফিল্ডে brilliance বাড়ায় কিনা ডায়মণ্ডের। সেটিং-এর জন্য ডায়মণ্ডের সৌন্দর্যের কমতি বৃদ্ধি হয়।"[১] ঠাকুরের বাণীর সৌন্দর্য-মাধুর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কিছু আঙ্গিক দরকার। আবার আরেক জায়গায় তিনি বলছেন ঃ "এমন বর্ণনা দিতে হয়, যাতে উদ্দীপন হয়। Scene-টি concretised করতে হয়।"[২] সেইজন্য 'কথামৃত' যে-আকার ধারণ করল, সেখানে দেখতে পাই—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্য কিছু বিবরণ রয়েছে, ব্যাখ্যা রয়েছে, উপস্থাপনার অসাধারণ কৌশল রয়েছে; তাছাড়া মাঝে মাঝে রয়েছে শ্রীম-র মন্তব্য। তাঁর উপলব্ধসঞ্জাত মন্তব্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই সবকিছু নিয়েই 'কথামৃত'।

'Logo' মানে পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীক, পরিচয়চিহ্ন। 'কথামৃত'-এর একটি পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীক দেখতে পাওয়া যায়। কথামৃত ভবন প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর মধ্যে রয়েছে একটি ছবি। ছবিটিতে একটি পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে। তার কয়েক মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মাস্টারমশায়কে বলছেন ঃ "যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?"[৩] মাস্টারমশায় সে-ছবি শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর থাকতে থাকতে যোগাড় করতে পারেননি। পরে একটি ছবি যোগাড় করেছিলেন। সুন্দর একটি রঙিন ছবি। এবং তিনি 'কথামৃত'-এর প্রত্যেকটি খণ্ডে এটি জুড়ে দিয়েছেন। তার কারণ সম্ভবত এই যে, সমগ্র 'কথামৃত'-এর মধ্যে যে-শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ভাসিত হয়েছেন, তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে ঐ ডিমে তা-দেওয়া পাখির ছবিটি। পাখির মন পড়ে আছে ডিমের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের মন সর্বদাই ঈশ্বরে নিহিত, সর্বদাই তিনি আত্মস্থ। বাইরের জগতের দিকে তাঁর মনের একটি অংশ মাত্র নিযুক্ত, তা দিয়েই তাঁর আচার-ব্যবহার; তা দিয়েই তিনি কথা বলছেন, গান গাইছেন, কখনোবা ভাবে নৃত্য করছেন, আর কখনো ভাবসায়রে ডুব দিচ্ছেন। তখন শরীর নিথর, দৃষ্টি স্থির। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অসাধারণ অবস্থাটি বোঝাবার জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে ভাবমুখের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

এবার 'কথামৃত' বিকাশের ইতিহাস সামান্য আলোচনা করা যাক। মাস্টারমশায় প্রথম প্রথম শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সঙ্কলন করেই ছাপতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর এই কাজে হাত দেওয়ার আগে ও পরে কয়েকজন এই কাজ করেছেন। যেমন কেশবচন্দ্র সেনের 'পরমহংসের উক্তি', সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', স্বামী ব্রহ্মানন্দের সংগৃহীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি', রামচন্দ্র দত্তের 'তত্ত্বসার' ও 'তত্ত্ব প্রকাশিকা', ম্যাক্সমুলার লিখিত গ্রন্থ ও ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকাতে সঙ্কলিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পূর্বেই তাঁর উপদেশ নিয়ে চারটি বই প্রকাশিত হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্কলিত ঠাকুরের উপদেশের প্রথম গুচ্ছ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ইতোপূর্বে তিনি নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে গিয়ে তা শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। মা তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন।

১ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৮
২ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৬৬

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

প্রকাশিত বাণীগুচ্ছের সংগ্রাহক 'সাধু মহীন্দ্রনাথ গুপ্ত' এবং প্রকাশক 'সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন'। দুটিই মাস্টারমশায়ের ছদ্মনাম। বইটি হু-হু করে কেটে গেল। প্রথম ভাগটি দেখে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন ঃ "You have hit Ramkristo in the right point."

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'The Dawn' এবং 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় মাস্টারমশায় ইংরেজিতে 'Leaves from the pages of the Gospel of Sri Ramakrishna' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। হৈহৈ পড়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম লেখাটি পড়ে বললেন ঃ "Now you are doing just the thing." আর দ্বিতীয়টি পড়ে লিখলেন ঃ "I am really in a transport when I read them." অপরদিকে প্রতিবাদ উঠল—ঠাকুরের মুখের ভাষা বাঙলা, তাই বাঙলাতে এই রচনা হওয়া প্রয়োজন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকা অনুরোধ জানাল ঃ "তিনি বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিলেন কেন?" মাস্টারমশায় মেনে নিলেন। বাঙলায় লিখতে আরম্ভ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি পড়ে শোনালেন। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভাতেও তিনি পড়ে শোনালেন। পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে থাকল। অন্তত ১৭টি সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কথামৃত' বেরতে থাকল। অসাধারণ ব্যাপার! প্রকাশনা-জগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

অজ্ঞাতপ্রায় একটি তথ্য এই যে, 'কথামৃত' রচনার পিছনে প্রধান প্রেরণাশক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তিনি যদি না থাকতেন, 'কথামৃত' বেরত কিনা এবং বর্তমান রূপ পেত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। এটি এক ভিন্ন ইতিবৃত্ত। তার মধ্যে আমরা প্রবেশ করব না। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'কথামৃত' রচনাকালে শ্রীম-র মনের আকাশে যে-ধ্রুবতারাটি জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল সেটি হলো শ্রীশ্রীমা।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম-র প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে, কিন্তু আমরা 'কথামৃত'-এ বিবরণ পাচ্ছি ১ জানুয়ারি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১০ মে ১৮৮৭ পর্যন্ত। তার মধ্যে ১৮১ দিনের বিবরণ রয়েছে। অবশ্য ১৯ দিনের বিবরণ রয়েছে পরিশিষ্টে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি একত্রে বইয়ের আকারে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ এসেছিল সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে ও মৌখিকভাবে। মাস্টারমশায় হয় সময় পাচ্ছিলেন না, অথবা সঙ্কোচবোধ করছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এগিয়ে এসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর প্রথম ভাগ প্রকাশ করলেন। মনে হয়, তিনি নিজেই এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতঃপর মাস্টারমশায় সাগ্রহে একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করলেন। প্রথম ভাগটি বেরিয়েছিল ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন—২৮ ফাল্গুন। 'উপক্রমণিকা' লেখার তারিখ ছিল ১ ফাল্গুন, সরস্বতীপূজার দিন। দ্বিতীয় ভাগ বেরল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে, চতুর্থ ভাগ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। এবং পঞ্চম তথা শেষ ভাগ বেরল মাস্টার-মশায়ের মহাসমাধির আড়াই মাস পরে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই বেরিয়েছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে, যা 'কথামৃত'-এর পরিশিষ্ট নামে পরিচিত এবং বর্তমানে পঞ্চম ভাগের সঙ্গে সংযোজিত।
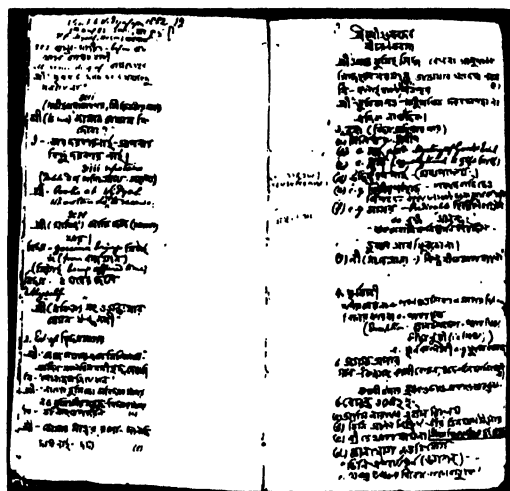
শ্রীম-র ডায়রীর পাতার অংশবিশেষ

'কথামৃত'-এর প্রধান গর্বের বস্তু তার প্রামাণিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছিল প্রথম থেকেই। এব্যাপারে মজার একটি কাহিনী রয়েছে। প্রথমদিকে দক্ষিণ ভারতের একজন ভদ্রলোক—নাম বঙ্গরাপ্পা, তিনি এলেন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি খুব ভাল করে মাস্টারমশাইকে লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন কথা বলে সিদ্ধান্ত করলেন যে, মাস্টারমশায়ের কথাবার্তার স্টাইল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাগুলির স্টাইল ভিন্ন। এধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে।

শুধু কি তাই? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনেও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে তিনি ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে

একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "পরমহংসদেবকে একদিন দশ মিনিটের জন্য দূর থেকে দেখেছি।... পরমহংসদেবের কথোপকথনের যে-বিবরণ আমি পড়েছি তার কোন কোন অংশ মনে হলো বিদেশী সাধকদের কথা থেকে সংগৃহীত।" আবার দেখি, তারিখবিহীন পরবর্তী একটি চিঠিতে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ঐ ব্যক্তিকেই লিখেছেন ঃ "পরমহংসদেব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু লিখি এই তোমার ইচ্ছা। পরমহংসদেবের কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহুকাল পূর্বে পড়েছিলেম। মনে ধারণা হয়েছিল বানানো কথা আছে। কিন্তু সেটা আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। যাঁরা তাঁর পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদেরই কর্তব্য বিশেষ প্রমাণের দ্বারা তাঁর বাণীকে শোধন করে নেওয়া। যিনি বলেন আর যিনি বচন সংগ্রহ করেন তাঁদের মধ্যে শক্তির পার্থক্য ও প্রকৃতিভেদ থাকাতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় অনেক বিকার ঘটে থাকে। সেই বিকারের দ্বারা মহাপুরুষদের পরিচয়ের মূল্য কমে যায়। অনেক কথা যা কানে ঠিক লাগে না, বুঝতে পারিনে সে-কথাগুলি সম্পূর্ণ কার। অনেক স্থলে দেখা গেছে আমাদের দেশের লোকের ঐতিহাসিক বুদ্ধির সততা নেই, সেই অসত্যে তাঁরই পূজাকে অশুদ্ধ করা হয় যিনি পূজনীয়।"[৪]

'কথামৃত'-এর চতুর্থ ভাগ প্রকাশের পর 'গ্রন্থকারস্য' শীর্ষকে মাস্টারমশায় একটি ভূমিকা লিখলেন। খুব সম্ভবত নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি লিখেছিলেন অসাধারণ কয়েকটি কথা ঃ " 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' চারিভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীম বা মাস্টার বা M (a son of the Lord and servant) একই ব্যক্তি। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যেসকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তদিগের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনী ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। যেইদিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, সেইদিনই সমস্ত স্মরণ করিয়া ডায়েরিতে লেখা হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার।" মাস্টারমশাই একথাগুলি এই সময়েই লিখেছিলেন তা নয়। 'ব্রহ্মবাদিন্'-এ প্রথম যে-লেখাটি বেরিয়েছিল, সেখানেও তিনি ছোট্ট করে পাদটীকাতে লিখেছিলেন ঃ "These records are based on notes put down by M on the very day of the meeting shortly after the meeting was over. And the purpose was to give the Lord's own words as far as possible." এই কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পঞ্চম ভাগে যেসকল দিনের বিবরণ স্থান পেয়েছে, মাস্টারমশায় তার সবকিছু গুছিয়ে দিয়েছিলেন বটে, তবে তার জন্য যে বিশেষ ভূমিকা লেখা দরকার ছিল, সেটা লিখে যেতে পারেননি। সেখানে যেসব বিবরণ স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের আগেকার বর্ণনা। ১ জানুয়ারি ১৮৮১ থেকে আরম্ভ করে বেশ কয়েকদিনের বিবরণ সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম কয়েকটি সাক্ষাৎকারের সঠিক তারিখ জানা নেই। কারণ মাস্টারমশায়ের তখন দুঃসময়। প্রতিদিন ডায়েরি লেখা তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। অবশ্য কিছুদিন পর থেকেই মাস্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরিতে নিয়মিত লিখে রেখেছেন। তিনি এত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, তিনি কোথাও উদ্ভাবন করে লেখেননি। জীবনের শেষ প্রান্তে পঞ্চম ভাগ রচনার সময় এবিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাঁর ডায়েরির ওপর নির্ভর করে তিনি যতটুকু নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে পেরেছেন, ততটুকু বিস্তার করে লিখেছেন। ভুলে যাওয়া অংশ উপস্থাপিত করার জন্য কল্পনা আশ্রয় করে তিনি কিছু জুড়ে দেননি বা বাদ দেননি। তাঁর লেখা 'Gospel'-কে 'কথামৃত'-এর ইংরেজি অনুবাদ না বলে তাঁর ডায়েরির ভিত্তিতে ইংরেজিতে নতুন রচনা বলা ভাল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Gospel'-এ সত্যনিষ্ঠ মাস্টারমশায় নিজের প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "It is the spring of 1882." শ্রীম 'February' বা 'March' কোন কিছু লিখলেন না। শুধু বললেন— 'Spring of 1882'।

আরো কথা। শ্রীম-র রচনা সম্বন্ধে তাত্ত্বিকগণও প্রশ্ন তুলেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাশীর প্রমদাদাস মিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, শ্রীম-র রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী-রূপে বিধৃত। তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মাস্টারমশায় নিজের অভিমত সমর্থন করে তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ "My object has been to present scenes from his daily life as well as his teachings, as I understand them." এই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, 'কথামৃত' হচ্ছে মাস্টারমশায়ের ধ্যান-ধারণাতে বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা এবং বাণী।

একটি অভিযোগ উঠেছে, ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'Gospel' মূল বাঙলা 'কথামৃত'-এর হুবহু হয়নি। অর্থাৎ অনুবাদ যথাযথ বা মূলানুসারী হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে

৪ রবীন্দ্র সমীক্ষা—সম্পাদক ঃ অনাথনাথ দাশ, বিশ্বভারতী, ৩০ সঙ্কলন, ৭ পৌষ, ১৪০৩, পৃঃ ৭-৮

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

প্রকাশিত স্বামী নিখিলানন্দের অনূদিত 'Gospel' সম্বন্ধে আরো একটি অভিযোগ এই যে, মূলের কোন কোন অংশ বাদ পড়েছে। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত করা। কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ যেগুলি ইংরেজিতে উপস্থাপিত করলে গ্রন্থখানি দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে, সেসকল অংশ তিনি বাদ দিয়েছেন। বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্য শুধু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'কথামৃত'-এ রয়েছে অথচ অনূদিত ইংরেজিতে নেই, এধরনের একটি অংশ—"আঁতুড়ঘরের ধূলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্ ড্যাম্ শব্দের ভেলকি লাগে না। বাজিকর কি করছে সে ঠিক দেখতে পায়।"[৫] 'আঁতুড়ঘরের ধূলহাঁড়ি' সম্পর্কে 'কথামৃত'-বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রেমেশানন্দ যে-টীকা লিখেছেন, সেটি ইংরেজিভাষী বিদেশীদের নিকট বোধগম্য করে তুলতে হলে অনেকখানি লিখতে হয়। এটা বাংলার গ্রামীণ জীবনে তদানীন্তনকালে প্রচলিত একটি অনুষ্ঠান, যাতে জড়িত লোকবিশ্বাসটি আজ মনে হবে একটি হাস্যকর কুসংস্কার। শুধু ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রেই নয়, গুজরাটি, কানাড়া ইত্যাদি অনুবাদের মধ্যেও এধরনের কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

এসব আলোচনার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, 'কথামৃত' কি? 'কথামৃত' বলতে কি বুঝব ? আমরা দেখেছি, 'কথামৃত' মাস্টারমশায়ের ধ্যান-ধারণাতে বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-কাহিনী ও বাণী। সেটি তিনি সাহিত্যিক কুশলতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। মাস্টারমশায় চতুর্থ ভাগের ভূমিকায় লিখে-ছিলেন, আরো কয়েক ভাগ 'কথামৃত' লিখবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আরো কয়েক ভাগ 'কথামৃত' লেখা হয়ে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি প্রামাণিক জীবনী লিখবেন। শ্রীশ্রীমা তাগাদা দিচ্ছিলেন—মাস্টারমশায়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, শরীরও ভাল না; মাস্টারমশায় কেন তাড়াতাড়ি লিখছেন না? বিভিন্ন লোককে দিয়ে তিনি মাস্টারমশাইকে বলিয়েছেন। দেখা যায়, ১৯১০ থেকে আরম্ভ করে শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধি ১৯২০ পর্যন্ত মাস্টারমশাই নতুন কিছু লেখেননি এবং এর পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শ্রীম বিশ্বাস করতেন, 'কথামৃত' তাঁর রচনা নয়। তিনি একজন 'রিপোর্টার' মাত্র। এটা বোঝাবার জন্য তিনি স্পষ্টই লিখেছেন—'শ্রীম-কথিত'। শ্রীম-রচিত নয়। ১৬ খণ্ডের 'শ্রীম দর্শন'-এ এই নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা আছে। শ্রীম-র বক্তব্য—তিনি যা শুনেছেন, যা রেকর্ড করেছেন ডায়েরিতে, তাই তিনি সুবোধ্য করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই রচনা একটা 'Report', প্রতিবেদন মাত্র। অবশ্য পরিণতিতে দেখা গেল, ধর্মসাহিত্যের মধ্যে এক অসাধারণ সাহিত্য-কৃতি সৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীম-র সাহিত্যসাধনা তাঁর ধর্মসাধনার অঙ্গ বৈ তো নয়। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চালিত একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত যন্ত্র (automatic machine) মাত্র। 'কথামৃত' রচনা সম্বন্ধে তিনি বলতেন ঃ "এ কি আর আমি করেছি! ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করছেন। তিনি মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার ভিতর আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন। তিনিই কর্তা ও কারয়িতা। আমরা বুঝি আর না বুঝি।"[৬] তাঁর বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যখন তিনি বলেছেন ঃ "তিনিই সব। ট্রামের ট্রলি, যতক্ষণ তারের সঙ্গে যোগ—গাড়ি, আলো, পাখা সবই ঠিক চলছে, ট্রলিটাকে নিচু করে দাও তো কিছুই আর চলবে না। এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনিই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আর শেষটুকু তিনিই নিয়ে যাবেন।"[৭] এপ্রসঙ্গে আমাদের স্বভাবতই মনে পড়ছে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কথা। সেখানে কবিরাজ কৃষ্ণদাসের নিবেদন ঃ "সেই লিখি মদনমোহন যে লেখায়। কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।"[৮] মনে পড়ছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর লেখক স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য ঃ "ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছা ছিল করিয়ে নিয়েছেন। এখন 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়লে মনে হয়, এসব কি আমি লিখেছি? অবাক হয়ে যাই।"[৯]

পূর্বেই বলা হয়েছে 'কথামৃত'-এর শ্রেষ্ঠ গৌরব হচ্ছে তার উপাদানের সত্যতা, নিঃসংশয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এর আগেকার ধর্মীয় গ্রন্থগুলি, যেমন—'Gospel according to St. Mathew', 'St. Luke' ইত্যাদি গ্রন্থ, বুদ্ধদেব সম্পর্কিত প্রামাণিক মৌলগ্রন্থগুলি অথবা চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী সংক্রান্ত মুখ্য গ্রন্থসম্ভারের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়, 'কথামৃত'-এর নির্ভর-যোগ্যতা ও প্রমাণনির্ভরতা কত উঁচুমানের। একজন মনীষী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই গ্রন্থের 'Stenographic exactitude'-এর প্রতি। অপর একজন মন্তব্য করেছেন ঃ "Never have the small events of a contemplative's life been described with such a wealth of intimate detail. Never have the casual and unstudied utterances of a great religious teacher

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৯৫
৭ ঐ, ৬৫ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭০, পৃঃ ৩১৬
৯ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১৯৫৫, পৃঃ ১৪৮

৬ 'উদ্বোধন', ৬৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭২, পৃঃ ৪৩৪
৮ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।৮।১৪২

been set down with so minute a fidelity." একজন মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপনার ভঙ্গিমাকে 'nowness' বলে বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তার অনুবাদ করেছেন 'বর্তমানতা'। মনে হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের চোখের সামনে। তিনি আমাদের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বা বসে কখনো কথা বলছেন, কখনো বা গাইছেন, নাচছেন, কাঁদছেন, কখনো বা তরুণ ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন। শ্রীম-র কলমের গুণে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন। পাঠকের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কাছের মানুষ, তাঁর উপস্থিতির উত্তাপ যেন অনুভব করা যায়।

হঠাৎ একদিন একটা বিষয়ের গভীরার্থ অনুধাবন করে বিস্মিত হলাম। খুব সম্ভবত ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। 'কথামৃত' পড়তে পড়তে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণই প্রধান ও দীপ্তিমান চরিত্র। অধিকাংশ স্থলে তিনি স্বয়ং উপস্থিত অথবা তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কোন কোন দৃশ্যে তিনি অনুপস্থিত। কিন্তু মাস্টার-মশায় একমাত্র চরিত্র, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পরে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছেন সমগ্র 'কথামৃত'-এর মধ্যে। অবশ্য তিনি নিজেকে ঢাকবার অনেকরকম চেষ্টা করেছেন। তাতে তিনি এতটাই সফল হয়েছেন যে, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজিতে লেখা তাঁর রচনা পড়ে একটা সার্টিফিকেট দিলেন ঃ "Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden." রচনার মধ্যে মাস্টারমশায়কে যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'কথামৃত'-এর সর্বত্রই মাস্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নেই, সেখানেও তিনি রয়েছেন। আরো লক্ষণীয়, মাস্টারমশায় নিজেকে নানা ছদ্মনামে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি প্রায় এগারোটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে চারটি প্রধান— 'মাস্টার', 'মণি', 'ভক্ত' ও 'মোহিনী'। এই নামগুলি এলোমেলোভাবে ব্যবহৃত হয়নি, এগুলি সুচিন্তিতভাবে উপস্থাপিত। এই চরিত্রগুলি যেন চারটি ভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র। নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই দেখবেন, 'মাস্টার' হচ্ছেন শ্রীম-র সাধারণ রূপ। তিনি বিদ্বান, বিনয়ী, ছাত্রদরদী, মিষ্টভাষী শিক্ষক। 'ভক্ত' হচ্ছেন একজন গোবেচারা মানুষ, সংসার-আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছেন; তিনি ভগবদ্ভক্ত, নিজের মুক্তির জন্য ব্যগ্র। তৃতীয় চরিত্র 'মণি' হচ্ছেন জিজ্ঞাসু, কবিত্বপ্রিয়, যুক্তিপ্রবণ দার্শনিক, একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। আর 'মোহিনী' একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নমুনাস্থল। ঘরে স্ত্রী পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায়, সাংসারিক সমস্যায় বিধ্বস্ত। তিনি সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর পায়ে ছিল ছেঁড়া জুতো, হাতে ছিল একটা ভাঙা ডাঁটির ছাতা। এই চারটি চরিত্র-দর্পণের প্রত্যেকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীম-র অখণ্ড ব্যক্তিত্বের চারটি দিক। চারটি দর্পণে প্রতিফলিত ছবিগুলিকে একটি ফ্রেমে ধরে রাখতে পারলে শ্রীম-র সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের আঁচ পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে, মণির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শ্রীম-র অন্তর্জগতের মুখ্য দিকটি উদ্ভাসিত। মোহিনীর কথাবার্তার ফাঁকে শ্রীম-র যে-রূপটি ধরা পড়েছে, সেদিকে তাকালে পাঠকের বেদনা অজস্রধারায় ঝরে পড়ে। এসকলের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে মাস্টারমশায়ের আত্মচরিত। ইংরেজি সাহিত্যে জীবনী ও আত্মজীবনী খুবই সমাদৃত। সেসব গ্রন্থে আত্মচরিত সম্বন্ধে যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাদের যেকোন একটির মানদণ্ডে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে, 'কথামৃত'-এর মধ্যে বিধৃত রয়েছে শ্রীম-র আত্মচরিত— একটি উঁচুমানের আত্মচরিত। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

মুখের কথাঃ "এতে সমগ্র life-টা রয়েছে—the unfoldment of the mind and soul. এই সবগুলি scene-এতে আমি present ছিলাম। কিভাবে mind-এর উপর influence করেছে ঐসব দিন ও বাণী, এতে সব লেখা আছে।" শ্রীম-র অন্তরাত্মার বিজয়যাত্রার ইতিবৃত্ত এখানে বিস্ফুরিত। বিস্মিত হয়ে দেখি, তাঁর গুরুদেবের মহিমাকে উন্মোচিত করার জন্য তিনি নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু গোপন করেননি। নিজের দোষত্রুটি, অপমানজনক ঘটনাদিও তিনি নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন। এটি এক অসাধারণ চারিত্র্য, যা আজকের সমাজে নিতান্ত দুর্লভ।

ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্মরণ করি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা—"ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমিয় চরিত্র দিয়ে ভক্তগোষ্ঠীর হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিলেন। 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় দেখি, ভক্তদের নিয়ে যেন শ্রীভগবানের মজলিস বসেছে। ভক্ত ভগবান ছাড়া থাকতে পারেন না, ভগবানেরও চাই ভক্তকে। চিহ্নিত ভক্ত মণির সঙ্গে কখনো একান্তে, কখনো অন্যদের সম্মুখে তিনি কথা বলছেন; কখনো ভক্তদের সম্মুখে গান গাইছেন, কখনো নাচছেন, কখনোবা ভাবসায়রে ডুব দিচ্ছেন। কখনো ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তাঁর দুর্লভ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কাহিনী শোনাচ্ছেন, আবার কখনো নরেন্দ্র প্রমুখ তরুণ ত্যাগী ভক্তদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বাসগৃহে, কলকাতায় ভক্তগৃহে তিনি মজলিস করছেন। আবার ভক্তগণ নিজ নিজ বাড়িতে একান্তে বসে স্মরণ-মনন করে দেখতে পান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ হৃদয় জুড়ে আনন্দবিলাস করছেন। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীভগবানের অবতরণ ও ভক্তসঙ্গে লীলাবিলাসের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তার বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায় 'কথামৃত'-এর মধ্যে এবং অনুভব করা যায় এর তাৎপর্য, আস্বাদন করা যায় এর মাধুর্য। ভক্ত-ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নিয়ে রচিত হয়েছে নতুন যুগের ভাগবত 'কথামৃত'। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে 'শ্রীমদ্ভাগবত', শ্রীরামকে আশ্রয় করে 'শ্রীরামচরিত-মানস', তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। সাংসারিক জ্বালায় ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রই হতাশাগ্রস্ত হয়ে বলেন, সংসার একটা ধোঁকার টাটি বৈ তো নয়; কিন্তু যিনি বিজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছেন, তিনি দেখেন এ-সংসার মজার কুটি—জগৎ-জননীর এক মজার আগার। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি পাঁচবছরের ছেলের মতো হেসে-খেলে বেড়াচ্ছেন, গাইছেন, নাচছেন, ছবি আঁকছেন, মজা করছেন, সবাইকে নিয়ে আনন্দ করছেন। আবার কখনো হতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে ভরসা দিচ্ছেন এবং এই বিশাল জগৎ-রহস্যের পিছনে যে এক পরম সত্য ও আনন্দময় সত্তা রয়েছে—তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। রসিক ব্যক্তিদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কথামৃতকার বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের এই মধুর কাহিনী সরস ভাষায় অনুপম পটুতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। 'কথামৃত'-সেবকমাত্রই স্বপ্ন দেখেন স্বর্ণ-সম্ভব ভবিষ্যতের। এখানে সবার জন্য রয়েছে আশার কথা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সে-কারণে বোধকরি 'কথামৃত' শুধু বাঙলা ভাষাতে নয়, বিভিন্ন ভাষাতে পৃথিবীর অন্যতম সেরা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকৃত রস যাঁরাই গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাঁদের জীবনে উপস্থিত হয়েছে আলোক-উজ্জ্বল পরিবর্তন, তাঁদের জীবন হয়েছে অমৃতায়িত।

মধ্যযুগে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ভক্তিভাবের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল। তামিলনাড়ু থেকে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ভক্তির জোয়ারে প্লাবিত হয়েছিল। এই ভক্তির জোয়ারে ভেসে উঠেছিল প্রাণমাতানো গান—বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া গানে ভরে গিয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস। মীরাবাঈ, দাদু, কবীর, একনাথ, তুলসীদাস প্রমুখ সাধক গায়ক-গায়িকা ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস গানে গানে ভরপুর করে দিয়েছিলেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রমুখ একই ভাবধারা নিয়ে এসেছেন। বোধকরি সে-ধারা একটি পরিণতি লাভ করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের রচিত কোন গানের সন্ধান আমরা পাইনি। কিন্তু অপরের রচিত গান গেয়ে, কীর্তনে আখর দিয়ে, ফরমাস মাফিক গান শুনে তিনি গানে গানে ভরিয়ে দিয়েছেন 'কথামৃত'-এর ভুবন। সমগ্র 'কথামৃত'-এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের গাওয়া গানের সংখ্যা ১৮২টি। তিনি আরো ২২টি গান নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর সমগ্র 'কথামৃত' জুড়ে রয়েছে ৪৭২টি গান। তিনি গান শুনেছেন, কখনো অপরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছেন। গানের মাধ্যমে তাঁর উপদেশ শ্রোতার মনে গেঁথে দিয়েছেন। কখনোবা তিনি গানের সঙ্গে ভাবে নৃত্য করেছেন, আবার ভাবের গভীরতায় সমাধি-সরোবরে ডুব দিয়েছেন। সবকিছু নিয়ে ভক্তিপথের সাধকদের জন্য সহজলভ্য সহায়ক একটি সাধনযন্ত্র-বিশেষ এই 'কথামৃত'।

আবার কখনো মনে হয়েছে, 'কথামৃত' হলো হৃদয়গ্রাহী তৈলচিত্রের সাজানো সারি (gallery of paintings)। এর বিষয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস। নানান দৃশ্য, নানান ভাবের সমাবেশ। তার মধ্যে বিরাজ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সবকিছুর মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা। নিপুণ শিল্পী শ্রীম তাঁর প্রাণপ্রিয়

ঠাকুরকে নানা আঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর মুনশিয়ানার ছাপ। উপরন্তু শ্রীম তাঁকে ভালবেসেছিলেন প্রাণ-মন দিয়ে—নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে। ঠাকুরকে তিনি কিভাবে চিত্রিত করবেন, তিনি যেন স্থির করতে পারছেন না! অঙ্কনের পর অঙ্কন করে যেন তৃপ্তি পাচ্ছেন না! অসাধারণ একটি ব্যাপার! শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে সংস্কৃত, বাঙলা, ওড়িয়াতে ছোট-বড় বেশ কিছু গ্রন্থ আছে, আছে গদ্যে ও কবিতায়। কিন্তু সে-সকলের মধ্যে 'কথামৃত'-এর মতো বর্ণাঢ্য-চিত্র দুর্লভ। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম-র যে-বর্ণনা, তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের যে-আকুতি প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।"[১০] 'কথামৃত' মিছরির রুটির মতোই আস্বাদনীয়। যেভাবেই গ্রহণ করি না, মনে হয় তা যেন মধুমাখা।

বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নানা সমস্যায় দীর্ণ-জীর্ণ সমাজের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। এবং তা করেছেন নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। শাস্ত্র বলে চার আশ্রমের কথা। তার মধ্যে গৃহস্থ আশ্রমকে বলা হয়েছে জ্যেষ্ঠাশ্রম। গৃহস্থ আশ্রম সুস্থ সবল ও শক্তিশালী না হলে অন্যান্য আশ্রমের স্বাভাবিক উন্নতি সম্ভব হয় না। গৃহস্থ আশ্রমের সংস্কারের জন্য তিনি নাগমশায়, মাস্টারমশায় প্রমুখকে 'মডেল' হিসাবে তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁদের যেন গৃহস্থ সন্ন্যাসিরূপে তৈরি করেছিলেন। 'গৃহস্থ-সন্ন্যাসী' যদি বল, কথাটি সোনার পাথরবাটির মতো অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয় এবং কথাটি নতুনও নয়। 'দেবীভাগবত' গ্রন্থে এই ভাবনার পরিচয় পাই। 'কথামৃত' গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীম নিজেই তার ইংরেজি অনুবাদ করে বলেছেন—'ascetic householder'। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাপোষা সংসারী মাস্টারমশায়কে গৃহস্থ-সন্ন্যাসিরূপে গড়ে তুলছিলেন। বর্তমান যুগে সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রয়োজন গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরই। গৃহস্থাশ্রমের পথপ্রদর্শক হবেন গৃহস্থ-সন্ন্যাসী—শ্রীম-র মতো শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসী। মাস্টারমশায় একজন হতাশাগ্রস্ত ছাপোষা সংসারী থেকে কিভাবে আদর্শ গৃহস্থ-সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেন, তার ইতিবৃত্ত হচ্ছে 'কথামৃত'-এর অন্যতম ঐশ্বর্য। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে 'an interesting case study'। মাস্টারমশায়ের পরিবর্তিত রূপ 'শ্রীম' প্রকৃতপক্ষে সংসার-আশ্রমীদের এক প্রেরণাপ্রদ আদর্শ।

'কথামৃত'-এ কি আছে, কি নেই এবং যা 'কথামৃত'-এ নেই তা প্রামাণিক বলে গ্রাহ্য হবে কিনা—এসব গোঁড়ামি তথাকথিত 'কথামৃত'-প্রেমিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে এক ভক্তগোষ্ঠীর আসরে গিয়ে দেখি, লাল শালুতে মোড়া পাঁচ খণ্ডের 'কথামৃত' ব্যাসপীঠের ওপর স্থাপন করে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করা হচ্ছে। তবে এটা সুখবর যে, এধরনের সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এখন বেশ কিছু ভক্তের হৃদয় অধিকার করেছে।

'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা নেই—সেটা গ্রহণযোগ্য নয় মনে করা হাস্যকর। মনে রাখতে হবে, মাস্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণকে মোট চুয়ান্ন মাসের মধ্যে বেশ কয়েকদিন মাত্র দেখেছেন, অবশ্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁকে দেখেছেন। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেছেন—ও তো 'Sunday meetings'। রবিবারে ছুটির দিনে কলকাতার বাবুরা যেতেন, মাস্টারমশায়ও যেতেন। এধরনের মন্তব্যও গোঁড়ামি বৈ তো নয়। মনে রাখতে হবে, মাস্টারমশায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁর ভাবপ্রচারের জন্য শিক্ষণ ও আদেশপ্রাপ্ত।

যাহোক, নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য 'কথামৃত'-এ নেই, কিন্তু তাদের সত্যতা ও প্রামাণিকতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনজীবন সমাপনান্তে জগন্মাতার কাছ থেকে তিনবার আদেশ পেয়েছিলেন—তাঁকে 'ভাবমুখে' থাকতে হবে। 'ভাবমুখ' ও তার তাৎপর্য নিয়ে লীলা-প্রসঙ্গকার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 'ভাবমুখ' কথাটি 'কথামৃত'-এ নেই। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জনপ্রিয় উক্তি—"যত মত তত পথ" 'কথামৃত'-এ নেই। সেখানে আছে—"মত, পথ।" অন্য এক স্থানে আছে—"অনন্ত মত, অনন্ত পথ।" তৃতীয়ত, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখদের সামনে একটি অসামান্য ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিন মুখনিঃসৃত বাণীর ওপর ভিত্তি করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' প্রবর্তন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এঘটনা 'কথামৃত'-এ স্থান পায়নি। অপরপক্ষে তাতে এমন সব মূল্যবান বস্তু আছে যা আবার অন্যত্র নেই। অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের সার্কাস বা ফোর্ট উইলিয়ামে কলমবাড়া রাস্তা দেখার ঘটনা, স্টার থিয়েটারে পাঁচ-পাঁচটি নাটক দেখার তথ্য, দয়ানন্দ সরস্বতী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় 'কথামৃত'-এই পাই।

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৬৮৭

'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রোতাদের মধ্যে মহিলাদের প্রায় অনুপস্থিতি আধুনিক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃন্দে ঝি, ভগবতী দাসী প্রমুখ দু-চারজন ক্ষণিকের শ্রোতা ভিন্ন মহিলাদের শ্রীরামকৃষ্ণের আসরে দেখা যায় না। প্রধান কারণ—তখনকার সমাজে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলাদের পর্দানশিনতা। শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কয়েকজন মহিলা-ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ভিন্ন অপর কোন মহিলাকে পুরুষ প্রতিবেদক শ্রীম-র সম্মুখে দেখা যায়নি। 'কথামৃত'-এর প্রতিবেদক শ্রীম, তাঁর উপস্থিতিতে কোন মহিলা ভক্তকে না দেখাই স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষ-ভক্তদের পুনঃ পুনঃ বলতেন—কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান হও। বিশ্বস্ত সূত্রে, যেমন স্বামী শুদ্ধানন্দের রচনা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মহিলা-ভক্তদেরও পুরুষ-কাঞ্চন থেকে সাবধান করে দিতেন। শুধুমাত্র 'কথামৃত' পড়ে ধারণা হতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝি নারী-বিদ্বেষী ছিলেন; বলা যেতে পারে, 'কথামৃত' হচ্ছে 'male dominated literature'। এখানে পুরুষের আধিপত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এধারণার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই লিখেছেন ঃ "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উড্ডীন সম্ভব নহে। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রী-গুরু'গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন। সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।"

আরো কথা। 'কথামৃত'-এ রয়েছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য, যা অন্যত্র নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে এত অনীহা ছিল যে, তিনি 'আমি', 'আমার' বলা পর্যন্ত এড়িয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর ঘরের দেওয়ালে ছিল তাঁর নিজের ফটো। 'কথামৃত'-এ উল্লেখ দেখতে পাই, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের আগেই তাঁর ছবি গাজিপুরে পওহারী বাবার গুহায় স্থান পেয়েছে। তাঁকে এবং কেশবচন্দ্র সেনকে একটি বড় অয়েল পেন্টিং-এর মধ্যে দেখতে পাই। 'কথামৃত'-এ পাই, কলকাতার অন্তত দুটি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে সেই পেন্টিং শোভা পাচ্ছে। সে-চিত্র নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্যও মূল্যবান। শুধু তাই নয়, 'কথামৃত'-এর মধ্যে তখনকার পরিবার ও সমাজ সম্বন্ধে এমন এমন মজার কাহিনী রয়েছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও রয়েছে বেশ কিছু সরস ঘটনা। এই সবকিছুই 'কথামৃত'-এর ঐশ্বর্য।

যদিও শ্রীম এই গ্রন্থের প্রতিবেদক, তিনি এর ভাষ্যকারও বটে। এই ভাষ্য-অংশ না থাকলে গ্রন্থের মাধুর্য আস্বাদন যে অনেকটা ব্যাহত হতো, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

১৭ অক্টোবর ১৮৮২। মণি অর্থাৎ শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলছেন ঃ "স্ত্রী যদি বলে—আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব। তাহলে কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরস্বরে উত্তর করেন ঃ "অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে, আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক—যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।" এরপর শ্রীম-র মন্তব্য ঃ "গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন।" শ্রীম-র এই ধরনের মন্তব্যগুলি মূল্যবান। এধরনের মন্তব্য এবং 'সেবক-হৃদয়' শীর্ষক ছোট-বড় নিবন্ধের মধ্যে শ্রীম-র তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে প্রথম কয়েকটি খণ্ডে। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দু-দশক পরে লেখা পঞ্চম ভাগে, সম্ভবত সময়াভাবে, অনেকাংশে বাদ পড়েছিল। কিন্তু যেখানে যেখানে শ্রীম মন্তব্য করেছেন, যেখানে তিনি কিছু ভাষ্যটীকা লিখেছেন—সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং 'কথামৃত'-সাহিত্যের সম্পদ। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীম-র ২৯ মার্চ ১৮৮৩ তারিখের প্রতিবেদনের একাংশ ঃ

"রাখালের অসুখ। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দেখ, রাখালের অসুখ, সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

"এইকথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুতভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহধারণ করে এসেছেন। একদিকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালক ভক্ত রাখাল, অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু—সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ'—এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে-ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব। ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির! 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির! ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে।

শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে! আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?" পাঠক! ভেবে দেখুন, ভক্তাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম-র এই মূল্যবান মন্তব্যটি বাদ পড়লে কিরূপ হতো?

২ জুন ১৮৮৩। রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে কথকঠাকুর হরিশ্চন্দ্রের কথা পাঠ করছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্মশানঘাটে শৈব্যার কাতর-ক্রন্দন শুনে সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন, এস্থলে শ্রীম মন্তব্য করছেন ঃ "ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন—একেবারে স্থির—একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উদ্‌গত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের অকথিত দিকের প্রতি শ্রীম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২৮ নভেম্বর ১৮৮৩। শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে শেষবারের মতো দেখতে তাঁর 'লিলি কটেজ' নামক বাড়িতে উপস্থিত। শ্রীম-র মন্তব্য ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা।" অষ্টম পরিচ্ছেদের ভূমিকায় শ্রীম-র এই মন্তব্য রচনাটি কিরূপ সরস করে তুলেছে তা লক্ষ্য করার মতো।

আরো একটি কথা! শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এর মধ্যে বিস্ফুরিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনের আভাস। এই বিষয় নিয়ে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে এবং স্বাভাবিক কারণে কিছু কিছু বিপরীত ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে সাধারণভাবে একটু আলোচনা করা যাক। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি 'কথামৃত' পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সর্বজনপূজ্য কালীর সাধনা করে পরমহংসদেব তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য এনেছিলেন।" একটি অসাধারণ উক্তি। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি অনুগামীদের অপপ্রচারের ফলে শিক্ষিত যুবকেরা প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত প্রতিমা-উপাসনা ইত্যাদি নস্যাৎ করতে উদ্যত হয়েছিল। কালীপ্রতিমা পূজা করে, প্রতিমা-পূজার গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, এই পূজার মাধ্যমে চরম সত্য উপলব্ধি করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুদের চিন্তাভাবনায় আবার ভারসাম্য এনেছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রঘুবীর বা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যোগদানের কিছু সময়ের মধ্যে মা কালী তাঁর জীবনের ভরকেন্দ্র দখল করেছিলেন। 'Indian Association for the Cultivation of Science'-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার শুনেছিলেন যে, মা কালী একজন 'সাঁওতাল মাগী' বৈ তো নয়! তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীম ব্যাখ্যা করেছিলেন মা কালীর—বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের পূজিত মা কালীর স্বরূপ। শ্রীম তাঁকে বলেছিলেন ঃ "তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কালী মানে আলাদা। বেদ যাঁকে 'পরম ব্রহ্ম' বলে, তিনি তাঁকেই 'কালী' বলেন। মুসলমান যাঁকে 'আল্লা' বলে, খ্রিস্টান যাঁকে 'গড' বলে, তিনি তাঁকেই 'কালী' বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে 'আত্মা' বলেন, ভক্তরা যাঁকে 'ভগবান' বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই 'কালী' বলেন।"[১১] এখানে শ্রীম-র ধারণায় বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের কালী-ভাবনা উৎকৃষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কিছুটা এধরনের ব্যাখ্যা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও করেছিলেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ব্রাহ্মনেতা। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'Theistic Quarterly Review'-তে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কালীপূজা সাধারণ কালীপূজা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি লিখেছিলেন ঃ "He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna, and is a confirmed advocate of Vedantic doctrines. He is an idolator and is yet a faithful and most devoted mediator of the perfection of the One, formless, infinite Deity, whom he terms Akhanda Sachchidananda." তুলনামূলকভাবে বলা চলে, প্রতাপ মজুমদারের বর্ণনার তুলনায় শ্রীম-র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্পষ্টতর ও বেশি শক্তিশালী।

শ্রীরামকৃষ্ণের মা কালীই 'কথামৃত'-এর মা ভবতারিণী, তিনিই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দেবোত্তর দলিল অনুযায়ী 'শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী কালীঠাকুরানী'। শ্রীম ঠাকুরের কাছে শুনেছিলেন একটি ব্যাখ্যা—"মায়ের বাম হস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা। আর একদিকে মা ভক্তবৎসলা। দুটি ভাবের সমাবেশ।" অবশ্য অধিকাংশ স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার করুণাময়ী রূপটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ভক্তদের সেদিকেই দৃষ্টি

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১০৬৭

দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলেছেন। উপরন্তু, ৯ আগস্ট ১৮৮৫ তারিখে শ্রীম বিস্মিতভাবে শুনছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঃ "তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।" এসব দেখেশুনে শ্রীম সিদ্ধান্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে মা কালীই কথা বলতেন। সে-কথাই লিপিবদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতকথা বা 'কথামৃত' বলে পরিচয়লাভ করেছে।

তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনটা কি দাঁড়াল? তাঁর মতবাদের মূলকথাটি কি? শ্রীম-র অভিমত, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-ধারণায় বিস্ফুরিত হয়েছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শ্রীম 'সেবকহৃদয়' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ "ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না।" বলেন ঃ "তাহলে ওজনে কম পড়ে।" মায়াবাদ নয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেননা ঠাকুর জীবজগৎকে অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। বলছেন—ঈশ্বর সত্য আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বিচি, খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।[১২] শ্রীম-র এই অভিমত নিয়ে প্রমদাদাস মিত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে প্রমদাদাসবাবুর ধারণা হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অদ্বৈতবাদী।

মজার কথা। বছর চল্লিশ আগে কট্টর অদ্বৈতবেদান্তী স্বামী শাশ্বতানন্দজীর কাছে কিছু পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ঐ 'কথামৃত' থেকেই ১৮টি লাইন বেছে নিয়ে আমাদের শিখিয়েছিলেন যে, ঠাকুর ছিলেন খাঁটি অদ্বৈতবাদী। অবশ্য, স্বচ্ছদৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় এসকল মতভিন্নতার ঊর্ধ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

যে-'কথামৃত' শতবছর পূর্বে একটি ক্ষীণধারায় আবির্ভূত হয়েছিল—সে-গঙ্গা আজ প্রবাহিত শতধারায়, তার আকার বিশাল। বিভিন্ন ভাষারূপ প্রণালী ধরে 'কথামৃত' আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। কোন কোন ভাষাতে, যেমন জার্মান ভাষাতে দুজনের দুটি অনুবাদ দেখতে পাই। ইদানীংকালে প্রকাশিত হয়েছে জাপানি ভাষায় সম্পূর্ণ 'কথামৃত'-এর অনুবাদ। তাছাড়া এই দেশের কয়েকটি উপভাষাতে—যেমন খাসি ভাষা, করবরক ভাষা ইত্যাদিতে 'কথামৃত'-এর সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে 'কথামৃত' ও তার ভাব-ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, এমনকি নতুন নতুন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেও 'কথামৃত'-এর প্রবল অনুপ্রবেশ সুস্পষ্ট। আধুনিককালের ধর্মসাহিত্য নাড়াচাড়া করলেই দেখতে পাওয়া যায় 'কথামৃত'-এর প্রভাব কত ব্যাপক।

শেষ কথা। সামগ্রিকভাবে তাকালে চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি রূপ। একটি রূপে তিনি ভক্তদের নিয়ে লীলাবিলাস করছেন। তিনি কথা বলছেন, হাসছেন, গাইছেন, নাচছেন। মানুষের কল্যাণাকাঙ্ক্ষায় ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে ভগবৎকথা শোনাচ্ছেন, তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন, তাদের আশার বাণী শোনাচ্ছেন। অপর রূপটির প্রতীকী চিত্র দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম-র চতুর্থ সাক্ষাতের শেষাংশে। মাস্টারমশায় ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদর ফটক পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। দেখতে পান, ঠাকুর নাটমন্দিরে। আধো আলো আধো অন্ধকার। শ্রীম-র বর্ণনা—"সেই ক্ষীণালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী—নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপনমনে একাকী বিচরণ করিতেছেন।

১২ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৮০৮

আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে। অনপেক্ষ।" মাস্টারমশায় অবাক হয়ে দেখছেন।

'কথামৃত'-এর বিভিন্ন অংশে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের প্রাবল্যে ডুব দিয়েছেন, সমাধির গহনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, বিন্দু যেন সিন্ধুতে মিলিয়ে যায়। নানান ধরনের সমাধি। "ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাস্টারমশায় অবাক হইয়া থাকেন। তিনি ভাবেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়!" এভাবে দেখা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্বে দুটি ভাব এবং প্রত্যেকটি ভাবেরই পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে। এই দুটি ভাবের সমন্বয়ে গঠিত 'কথামৃত'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের মতে, ঐ দুটি ভাবের সমন্বয় ঘটেছিল 'ভাবমুখ' আশ্রয় করে। ভাবমুখী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য নিবেদিত। দু-চারজন সাধু-মহাত্মার পরিত্রাণের জন্য তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল মনে করলে ভুল হবে। সর্বশ্রেণির সকল মানুষকে 'মানহুঁশ' করাই 'কথামৃত'-এর চরম লক্ষ্য।

'কথামৃত'-এর ভারি মাহাত্ম্য। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে, তাঁর জীবন সম্বন্ধে যা ভাবসম্পদ রয়েছে তা এমনই শক্তিশালী যে, এর বীজ কারো মনে একবার প্রবেশ করলে সেটা একদিন না একদিন সক্রিয় হয়ে উঠবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, অশ্বত্থের বীজ যদি কোন একটা বাড়ির কার্ণিশে পড়ে, সে-বাড়ি ভেঙে গেলেও সেই বীজ থেকে অশ্বত্থগাছ উঠবে। অশ্বত্থের বীজের মতো 'কথামৃত'-এর এই বীজ শক্তিশালী। একবার যদি হৃদয়ে স্থান পায়, তা থেকে সবুজ চারা অঙ্কুরিত হবেই। ক্রমে তা পল্লবিত হয়ে হৃদয়ক্ষেত্রকে স্বর্ণাভ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা দিয়ে বলেছেন ঃ "আমি ভাবে বলছি, মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।"

অপর একদিক থেকেও 'কথামৃত'-এর মহিমা ভাবতে পারি। এর মধ্যে দেখতে পাই একটি চমৎকার ভাবচ্ছবি। ১৬ অক্টোবর ১৮৮২। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম বলেন তাঁর একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্নবৃত্তান্ত। স্বপ্নে তিনি দেখছেন—এক প্রচণ্ড জলপ্লাবন। হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে কয়েকটি নৌকা ডুবে গেল। শ্রীম ও আর কয়েকজন একটা জাহাজে উঠে পড়েন। তাঁর নজরে পড়ে, অকূল সমুদ্রের ওপর দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন—জলের নিচে বরাবর একটি সাঁকো থাকাতে হাঁটতে কোন অসুবিধাই নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ জানান, তাঁর গন্তব্যস্থল ভবানীপুর। শ্রীম তাঁর সঙ্গে যেতে চান। ব্রাহ্মণ বলেন, তাঁর তাড়া আছে। অবশ্য তিনি ভরসা দিয়ে বলেন—এই পথ দেখে রাখ, তুমি তারপর এসো। এ-কাহিনী শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ দুবার বলেন ঃ "আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।" এই চিত্রকল্পের সেতুটি হচ্ছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। এই মহাগ্রন্থকে সঠিকভাবে আশ্রয় করলে ভবসাগর অতিক্রম করা সহজসাধ্য।

ধন্য 'কথামৃত', ধন্য কথামৃতকার। কবি আনন্দ বাগচী যথার্থই লিখেছেন ঃ

"নির্ভুল বুকের চাবি মানুষের, চিরায়ত মুক্তির সংহিতা।
সর্বধর্মশাস্ত্রসার 'কথামৃত', অবিস্মরণীয় লোকগীতা।"* ❑

* গত ২ আগস্ট ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত 'স্বামী বিরজানন্দ স্মারক বক্তৃতা'র আলোকে রচিত।
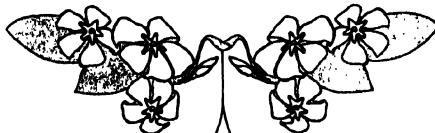
নারীশিক্ষাসেবাব্রতী গৌরীমা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ*

শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধ সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কুলুকুলু ধ্বনিরতা। উষাকাল। শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান বকুলতলায়। ইশারায় পুষ্পচয়নরতা গৌরীমাকে ডেকে বললেনঃ "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।" রহস্যময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথার গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে গৌরীমার উত্তর ঃ "এখানে কাদা কোথায় যে চটকাব? সবই যে কাঁকর।" স্মিতহাস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু; তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" বকুলগাছের একটি শাখা তখনো শ্রীরামকৃষ্ণের বামহাতে, ডানহাতের পাত্র থেকে জল ঢালছেন তিনি। আর অতি নিকটে নহবৎখানায় বসে গুরু-শিষ্যার এই কথোপকথন শুনছেন শ্রীশ্রীমা। স্নেহপূর্ণ অধরে তাঁর মৃদু মৃদু হাসি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়া গৌরীমার অন্তরে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হলো এক অপূর্ব অনুভূতি—"অজ্ঞতা ও অবিবেক পুঞ্জীভূত হয়ে মূক নারীহৃদয়ের ওপর পাষাণভারের মতো চেপে আছে। সত্যই তো নারীর ব্যথা যদি নারী না অনুভব করে, নারীর ব্যথা যদি নারী দূর না করে, তবে করবে কে?" কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি গভীর চিন্তায় অভিভূত—তাঁর পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব পূরণ করা অসাধ্য। নিজের অক্ষমতার কথা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করলেনঃ "সংসারী লোকের সাথে আমার পোষাবে না। হৈহৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সাথে কতকগুলি মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।" শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জানিয়ে বললেন ঃ "না গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধন-ভজন ঢের হয়েছে। এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা। ওদের বড় কষ্ট।"

সর্বসাধনে সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ভারতের নারীজাতিকে আচ্ছন্ন করে আছে। ফলে সর্ববিষয়ে তারা বঞ্চিতা। যথার্থ ধর্মশিক্ষা ব্যতীত নারীজাতির উন্নতি তথা ভারতের কল্যাণ সম্ভব নয়। তাই যুগ-প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ এনেছিলেন মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমাকে এবং গৌরীমা প্রমুখ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্না সাধিকাদের। গৌরীমার অপূর্ব প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও সাধনপূত জীবন নারীজাতির সেবায় নিয়োজিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের ঐ পুণ্য উষালগ্নে। আর বাস্তবিক শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ আদেশ শিরোধার্য করে গৌরীমা তাঁর তপস্যাপূত জীবনের শেষ চল্লিশ বছর নারীশিক্ষার সেবাব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, গৌরীমা 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' নামে একটি আদর্শ সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন—যা একশো বছর অতিক্রম করে আজও বিদ্যমান। প্রচারবিমুখ ও জনসমাজে অনালোকিত এই সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘকে বর্তমানে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ শ্রীসারদা মঠের পূর্বসূরি বললে অত্যুক্তি হয় না।

গৌরীমা

হাওড়ার শিবপুরের নিষ্ঠাবান ও শান্তস্বভাব পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্না, সুগায়িকা, লেখিকা ও মা কালীর সেবিকা গিরিবালাদেবীর চতুর্থ সন্তান মৃড়ানী তথা গৌরীমা (১৮৫৭-১৯৩৮) ছিলেন জন্মযোগিনী। বাল্যকাল থেকেই তিনি ভক্তিপরায়ণা এবং পূজানুষ্ঠান ও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবাদিতে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তাঁর দানশীলতা, দীনদরিদ্রের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সত্যনিষ্ঠা, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাঁকে দৈবী সম্পদে উন্নীত করেছিল। তাঁর জীবন সাংসারিকতার বহু ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক অপরিচিতা ব্রজরমণীর কাছ থেকে কালীভক্ত মৃড়ানীর

* বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, সুলেখক ও গবেষক।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

'দামোদর শিলা' লাভ এবং শ্রীশ্রীমা-কথিত 'পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে' তাঁর জীবন অতিবাহিত করার অপূর্ব ইতিহাস নারীজাতির কাছে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্য ও শিক্ষাগুণে সেই মৃড়ানী পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছিলেন 'উদারদৃষ্টিসহায়সম্পন্না', রামকৃষ্ণ-সারদার 'গৌরদাসী'। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে 'গেরুয়াবস্ত্র' প্রদান করেছিলেন। বিবেকানন্দের আদরের 'গৌর-মা' এবং জনসাধারণ ও ভক্তমহলে সুপরিচিতা গৌরীমার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনের প্রথম অর্ধাংশ ব্যয়িত হয়েছিল কঠোর কৃচ্ছ্রতা, তিতিক্ষা, তপস্যা ও সাধনায়।

গৌরীমার পরিব্রাজক জীবন শুরু মাত্র তেরো বছর বয়সে—পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর মেলা থেকে। তখন থেকেই পরিব্রাজক বেশে ভারতের তীর্থে তীর্থে গমন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তাঁকে 'তপস্বিনী, ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী'রূপে জন-সমাজে সুপরিচিতা করে তুলেছিল। এইসময়ে তিনি দেখেছিলেন ভারতীয় নারীদের দুঃখ-দুর্দশার মর্মস্পর্শী চিত্র। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—"উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারী আদর্শ গৃহলক্ষ্মী হতে পারছে না, সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারছে না, সংসারের সুখ-শান্তির অধিকারিণী হতে পারছে না। কেবল দৈহিক বল নয়, আত্মবলের অভাবে ও অতিতুচ্ছ কারণে নারীকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়।" এসকল সমস্যা-দর্শনে নারীজাতির প্রতি তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তিনি এর প্রতিকারের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ—যা এতদিন তাঁর হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে তা অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে শাখাপল্লব বিস্তার করতে লাগল। গৌরীমার মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী বাণী—'মায়েদের বড় কষ্ট'। নারীশিক্ষার পরিকল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত করার জন্য গৌরীমা দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন।

ইতিমধ্যে পরিব্রাজনকালে গুজরাটের পোরবন্দরে শ্রীকৃষ্ণ-সখা সুদামার নামাঙ্কিত সুদামাপুরীর নিকটবর্তী গ্রামে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীদের সেবায় গৌরীমা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাভ করেছিলেন পরম তৃপ্তিও।

১৮৯৫ সালে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করে গৌরীমা ভ্রমণ করেন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি স্থাননির্বাচন ও আশ্রমস্থাপন। অবশেষে গঙ্গাতীরে ব্যারাকপুরে মাঝি-সর্দার মুচিরাম দাসের আহ্বানে এবং তাঁরই মনোনীত স্থানে গৌরীমা ঐবছর এক শুভদিনে একটি আশ্রম স্থাপন করলেন। জায়গাটি গৌরীমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। কারণ, জমির মধ্যভাগে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হয়ে 'পঞ্চবটী' রচিত হয়েছিল। সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। গৌরীমার অনুভব হয়েছিল, স্থানটি কোন সিদ্ধপুরুষের সাধনভূমি।

গৌরীমা এই জমিটি ক্রয় করেছিলেন কলকাতার দুজন দানশীলা মহিলার অর্থানুকূল্যে। তিনি আশ্রমের নাম রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের নামে—'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'। আশ্রম স্থাপনের পূর্বে গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ইচ্ছা ফলবতী হতে চলেছে জেনে শ্রীশ্রীমাও গৌরীমাকে প্রভূত আশীর্বাদ এবং উৎসাহ দান করে বলেন : "আরম্ভ কর মা, আশ্রমের অশেষ কল্যাণ হবে।"

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার দিন কলকাতা ও পাশের গ্রাম থেকে বহু ভক্ত এসেছিলেন ব্যারাকপুরে। পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কুমারী ও ব্রাহ্মণ-ভোজন, দরিদ্রনারায়ণসেবা ছিল উৎসবের অঙ্গ। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত মহিলারা দলে দলে এসে পূজা ও রান্নার কাজে সহায়তা করেছিলেন। উপস্থিত সকলে প্রসাদ পেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এভাবে নীরবে নিভৃতে নারীশিক্ষার সেবাব্রতের একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হলো, যা ভারতের ধর্মেতিহাসে একটি নতুন দিগন্ত।

লোকচক্ষুর অন্তরালে এক মহীয়সী নারী তপস্যার জীবন পরিত্যাগ করে নারীজাতির কল্যাণে এভাবে আত্মবলিদান দিলেন। প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। সে-সময়কার কথা চিন্তা করলে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। মর্ত্যধামে শ্রীশ্রীমা থাকাকালে তাঁর নামে এটিই প্রথম আশ্রম। আবার সে-আশ্রম শুধু নারীদের জন্য এবং এক সন্ন্যাসিনী কর্তৃক পরিচালিত। এই আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের ছিল পূর্ণ সমর্থন ও প্রখর দৃষ্টি। অবাক হতে হয়, আশ্রম পরিচালনার জন্য গৌরীমা সর্ববিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং শ্রীশ্রীমাও সাগ্রহে নিজস্ব মতামত ও পরামর্শ দিতেন। গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের সেইসব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম' পরিচালিত হতো বলে আমাদের ধারণা। তিনি কয়েকবার ব্যারাকপুরে গৌরীমার আশ্রমে শুভ পদার্পণ করে তাঁকে উৎসাহও দিয়েছেন।

আশ্রমের শুরু কিন্তু একটি পর্ণকুটির দিয়ে—গোলপাতার চালা, ছেঁচা বেড়ার প্রাচীর, সানের মেঝে। ধীরে ধীরে ভক্ত ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রায় পঁচিশজন কুমারী, সধবা এবং বিধবা ছিলেন আশ্রমবাসিনী। তাঁরা ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করতেন, তারপর পাঠাভ্যাস ও গৃহকর্মে রত হতেন। ঘরের বারান্দায় এবং গাছতলায় পাঠ চলত। দুপুরে বালিকারা আসত। গৌরীমা নিজেই সকলকে সস্নেহে শিক্ষা দিতেন, পরিণত-বয়স্কাদের ধর্মোপদেশ দান করতেন এবং ছোট ছোট বালিকাদের সঙ্গে খেলতেন। তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আশ্রম চালাতেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজী এসে কিছু অর্থসাহায্য করেছিলেন।

পরবর্তী কালে গৌরীমা বলেছিলেন : "ঠাকুর আমাকে মাতৃসেবা-মহাযজ্ঞে ব্রতী করিয়া দিয়া তোমাদের সম্মুখে

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

নামাইয়া দিয়াছেন। এখন বৎসসকল, তোমরা মিলিয়া এই মহাযজ্ঞ পূর্ণ কর। মঙ্গলময় হরি, সর্বমঙ্গলা মা যজ্ঞেশ্বরী কৃপাবিতরণ করুন।... এস যোগ্য সন্তানগণ, মাতৃগণোন্নতি-সাধনসেবনে স্বার্থত্যাগ করিয়া মহাপবিত্র হও, সচ্চিদানন্দ-লাভের যোগ্য হও।" (সুবক্তা গৌরীমা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যাদের মধ্যে প্রথম তদানীন্তন পূর্ববাংলার ঢাকা, হবিগঞ্জ, সিলেট, পাবনা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রামে ১৩১৭ সাল থেকে ১৩২২ সালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচার করেন। হবিগঞ্জ-ভক্তদের উদ্দেশে প্রেরিত তাঁর বাণীর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে)।

গৌরীমা নারীশিক্ষাসেবাব্রতের যে-সূচনা করেছিলেন, তাকে প্রধানত চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ প্রথমত, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশে শিক্ষাব্রতধারিণীদের একটি সঙ্ঘগঠন। তৃতীয়ত, দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাদের আশ্রয়দান এবং চতুর্থত, আদর্শ জীবনযাত্রার পথে নারীদের সহায়তাদান।

প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মগুলি গৌরীমা তাঁর আশ্রমে প্রবর্তন করেছিলেন। আবার আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যা মঙ্গলপ্রদ, তাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই যুগোপযোগী শিক্ষা-দানের জন্য গৌরীমা আশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন। এভাবে তাঁর একনিষ্ঠ সেবাব্রত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ব্যারাকপুরে গৌরীমার আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ দুবার এসেছিলেন। তাঁর সেবাব্রত দেখে স্বামীজী পরম সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, গৌরীমার সংগঠনশক্তির কথা—"ঐরূপ মহতী ও চৈতন্যসঞ্চারিণী শক্তিতে দীপ্ত হাজার মা আমাদের প্রয়োজন।" স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল—শ্রীশ্রীমাকে 'Centre' করে গৌরীমা প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যারা একটা 'বেড়োল হুজ্জুক মাচিয়ে' দিক। মেয়েদের একটা মঠ হবে, গৌরীমা হবেন প্রথম 'মোহন্ত'। তাঁরাই সব করবেন। 'গৌর-মা' তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। একবার গৌরীমার আশ্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ "হুড়হুড় করে টাকা আসা উচিত ছিল। তখন বললুম গৌর-মাকে, চল আমার সঙ্গে আমেরিকায়। ওরাও বুঝত আমাদের দেশে কেমন মেয়ে জন্মায়। একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধা হতো! তা উনি গেলেন না, জাত যাবে বলে।"

শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ আশীর্বাদধন্যা কন্যা দুর্গামাকে দেখে স্বামীজী গৌরীমাকে বলেছিলেন তাকে ইংরেজি শেখাতে। কিন্তু গৌরীমার এতে সায় ছিল না। শ্রীশ্রীমা তখন বিধান দিলেন ঃ "আমার মেয়ে কিন্তু ইংরেজি পড়বে।" গৌরীমা নির্দ্বিধায় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা আশ্রমবাসিনীদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, পাঠাভ্যাসে ভাল ছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করতেন, কাউকে কাউকে পুরস্কারও দিতেন। শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "মেয়েরা পড়াশুনা করবে, বিদ্যালাভ করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের ছুঁচের মতো বুদ্ধি ভাল নয়। তারা ঠকে সেও ভাল, জিতে দরকার নেই। তারা সরল হবে, পবিত্র থাকবে।" অর্থাৎ মেয়েরা যেমন বিদ্যালাভ করবে, তেমনি যেকোন মূল্যে তার পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করবে। কারণ, তারাই আদর্শ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ।

গৌরীমা, দুর্গামা-সহ কয়েকজন কুমারীকে নির্বাচিত করেছিলেন—যাঁরা ভবিষ্যতে ত্যাগের জীবন অবলম্বন করে আশ্রমের হাল ধরবেন। সেভাবে তিনি তাঁদের বিশেষ শিক্ষাও দিয়েছিলেন। এরকম কয়েকজনকে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে সঁপে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁদের স্নেহাশিস-দানে কৃতার্থ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁদের অনেকেই সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করে নারীশিক্ষাব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। গৌরীমার কৃতিত্ব এখানেই।

আগে আশ্রমের নিয়ম ছিল—পূজা ও গরমের ছুটিতে আশ্রমবাসিনীরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে। শ্রীশ্রীমা নির্দেশ দিলেন ঃ "এই যে একবার করে আমড়ার অম্বল চাখতে বাড়ি যাওয়া, এতে আশ্রমে থাকায় যেটুকু লাভ হয়, তা উবে যায়। এ ভাল নয়। মেয়েরা একাদিক্রমে তিনবছর বা পাঁচবছর আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করবে, তারপর যার বাড়ি যাবার ইচ্ছে সে যাবে। আর যারা ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে, তারা ঠাকুরের চরণ ধরে আশ্রমেই পড়ে থাকবে।" শ্রীশ্রীমায়ের বিধানমতো গৌরীমা আশ্রম-বাসিনীদের একাদিক্রমে তিনবছর থাকার নিয়ম করলেন। এতে তিনি পেয়েছিলেন কয়েকজন ত্যাগব্রতধারিণীকে।

আশ্রমের আর্থিক অনটন প্রায় লেগেই থাকত। তা জেনে শ্রীশ্রীমা গৌরীমাকে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে। নারাজ গৌরীমা বলেন ঃ "আমি তাঁর পায়ে লিখে দিয়েছি—শুদ্ধাভক্তি ছাড়া আর কিছুই চাইব না। তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরাই আশ্রমকে দেবে, আমি চাইব কেন?" ঈষৎ হেসে শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "গৌরদাসী যখন চাইবে না, আমিই তোমাদের ভোজ্য পাঠাব, সকলকে ভাগ করে দিও। কাল খাবে, পরশু খাবে বলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রেখো না।" এভাবে শ্রীশ্রীমা সর্বতোভাবে গৌরীমার আশ্রমকে পুষ্টিসাধন করেছিলেন।

ক্রমে ক্রমে গৌরীমা অনুভব করেছিলেন, কলকাতা মহানগরীর মতো বিশাল ক্ষেত্রই কাজকর্মের উপযুক্ত স্থান।

তাঁর মনকে বারবার আন্দোলিত করছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ—"শহরে বসে কাজ করতে হবে।" ১৯১১ সালে গৌরীমা তাঁর 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'কে ব্যারাকপুর থেকে নিয়ে এলেন কলকাতার বুকে ১০ নং গোয়াবাগান লেনে। লক্ষ্য করার বিষয়, আশ্রমে প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার ফটো পূজিত হতো। এখানে অর্থাৎ গোয়াবাগানের আশ্রমে স্বয়ং শ্রীশ্রীমা প্রথম শুভ পদার্পণ করে নিজের প্রতিকৃতি নিজেই প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেছিলেন—যা আজও 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'-এ পূজিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীমা এই আশ্রমে বহুবার শুভাগমন করেছিলেন। তিনি আশীর্বাদ করেন—"আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হবে।" তাঁর আশীর্বাদে আশ্রমের ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। গোয়াবাগানের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদও এসেছিলেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী প্রমুখ। আর ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দুই সঙ্গিনী—গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো রামলালদা ও শিবরামদা এবং ভাইঝি লক্ষ্মীদিও অনেকবার আশ্রমে এসেছেন।
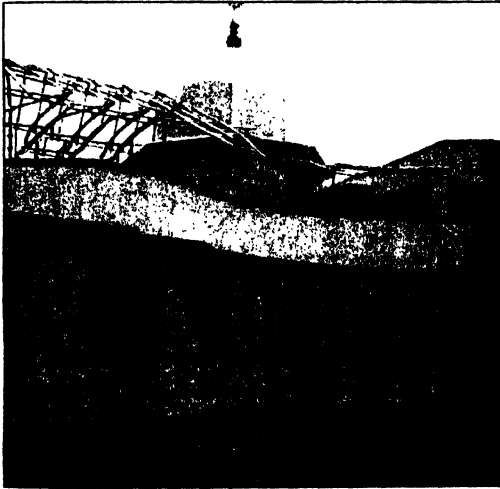
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

কার্যের প্রসার হওয়ায় গোয়াবাগান থেকে আশ্রমকে গৌরীমা নিয়ে আসেন ৯৭।৩ শ্যামবাজার স্ট্রিটে। পরে আরো দুটি স্থান ঘুরে অবশেষে ২৬ গৌরীমাতা সরণিতে (কলকাতা-৪) আশ্রমের স্থায়িরূপ দেন গৌরীমা। শ্রীশ্রীমায়েরও ইচ্ছা ছিল, আশ্রম ভাড়াবাড়িতে না থেকে নিজস্ব জমিতে হোক। তাঁর সেই ইচ্ছানুযায়ী ১৯২৪ সালে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) জগদ্ধাত্রীপূজার দিন গৌরীমা আশ্রমের নিজস্ব জমিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরের বছর ২৭ অগ্রহায়ণ আশ্রমভবনে গৃহপ্রবেশ করেন। এখানে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ এবং দৈনিক ছাত্রীসংখ্যা তিনশতাধিক। কাজের প্রসার হওয়ায় এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গৌরীমা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি 'পরামর্শসভা' এবং কয়েকজন শিক্ষিত মহিলাকে নিয়ে 'মহিলা সমিতি' গঠন করেন। এছাড়া কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' এবং ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাদের নিয়ে গঠিত হয় 'মাতৃসঙ্ঘ'। গৌরীমা হলেন আশ্রমের প্রধান পরিচালিকা ও 'মাতৃসঙ্ঘ'-এর সভানেত্রী। তৎকালীন কলকাতার বহু গণ্যমান্য ও স্বনামধন্য পুরুষ ও মহিলা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। এভাবে আশ্রমের সেবাব্রতের জন্য গৌরীমা সর্বসাধারণের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন।

গৌরীমা আশ্রমের সবকিছুর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ওপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ "যিনি কাজে নাবিয়েছেন, তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিঘ্ন এলেও আমার কোন দুঃখু নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।"

একশো বছরের অধিক পূর্বে গৌরীমা নারীসমাজের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তা কালের ইতিহাস বিচার করবে। সেসময়ে অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে তিনি কখনো প্রশংসালাভ করেছেন, আবার কখনো প্রবল বাধা-বিঘ্ন, তীব্র অভাব-অনটন ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়চিত্তে আশ্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অমিত শক্তি তাঁকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়িনী করেছে। কেউ তাঁকে উপহাস করেছে কৃপাপাত্রী বলে, কেউ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে তাঁর আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু কোন নিন্দাস্তুতি তত্ত্বদর্শী গৌরীমার অন্তরকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু রামকৃষ্ণ-সারদার ওপর নির্ভর করে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নারীশিক্ষাসেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক নারীই নারীশিক্ষার উন্নয়নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে জীবন ধন্য করছেন ও ভবিষ্যতেও করবেন। ❑

তথ্যসূত্র

ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, ১৩৮০, পৃঃ ৪৮০-৫০১

খ) শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা—স্বামী তেজসানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, ১ম সং, ১৩৬৩, পৃঃ ১৩২-১৫৪

গ) সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরীদেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১০ম মুদ্রণ, পৃঃ ১৯১-৯৪, ৩৪৭-৩৫৮

(ঘ) গৌরীমা—শ্রীদুর্গাপুরীদেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪২-১৬৪, ২২২-২৭১

বাউল ধর্ম-দর্শন ও মানবপ্রেমের সাধনা

দিলীপকুমার দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন নিজের সম্পর্কেঃ "বাউলের দল এল, নাচলে, গাইলে, চলে গেল। কেউ চিনল না।" ভবিষ্যতে বাউলের বেশে তিনি নাকি আসবেন—একথাও বলেছেন। অর্থাৎ 'বাউল'—ঈশ্বরের প্রীতিভাজন। দিলীপকুমার দত্ত তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনার জীবনের বাইরে বাউলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

॥ ১ ॥

'বাউল' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কানে বেজে উঠতে থাকে মিষ্টি সুর আর ভাবের মাধুর্যে ভরা অপূর্ব গানগুলি। বাস্তবিক, বাংলার গ্রাম্যজীবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা ধর্মসাধনাগুলির মধ্যে এই বাউল ধর্মসাধনা তার মাদকতাময় সহজ সরল সুমিষ্ট সুর ও কথার ঐশ্বর্যে ভরা অজস্র গানের মধ্য দিয়েই বাংলার [illegible]-জীবনে এবং সেইসঙ্গে দেশ-বিদেশেও আজ [illegible] বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার আসন লাভ করে[illegible] হিসাবে, মরমী দর্শন হিসাবে, গৌরবময় [illegible]-সা[illegible] দিঙ্‌নির্দেশক হিসাবে এবং সর্বোপরি মানুষের [illegible] ও মানবসাধনার বাহক হিসাবে আমাদের [illegible] অশিক্ষিত বা অতি সামান্য শিক্ষিত সাধকদের রচিত ও সুরারোপিত এই বাউল গানগুলি দেশের প্রাণগরিমার এক অতি উজ্জ্বল ও মূল্যবান সম্পদ।

ভাষা-গবেষকদের মতে, 'বাউল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'ব্যাকুল' কিংবা 'বাতুল' থেকে এসেছে। 'বাতুল' (অপভ্রংশে 'বাউর') কথার অর্থ—নানা অসংলগ্ন বা খাপছাড়া কথাবার্তা বলে এমন পাগল বা উদাসীন মানুষ। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ওপরের শব্দদুটির কোন একটি থেকে নয়—উভয় শব্দেরই ভাবগত অর্থ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে 'বাউল' শব্দটির মধ্যে, অর্থাৎ দুটি শব্দই মিলেমিশে সহজ উচ্চারণে 'বাউল' শব্দটি তৈরি করেছে। বাঙলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের কাল বা তারও আগে থেকে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা গেলেও বর্তমানে 'বাউল' বলতে যে এক বিশেষ সাধক সম্প্রদায়কে বুঝি, চৈতন্যযুগে ঠিক সেধরনের কোন বিশেষ সাধক সম্প্রদায় ছিল না।[১] তখন এই শব্দটি হয় ঈশ্বরের সন্ধানে 'ব্যাকুল', আর নয়তো ভাবের ঘোরে নানা খাপছাড়া কথা বলা 'বাতুল'—এই দুটি সীমাবদ্ধ অর্থেই ব্যবহার করা হতো। কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-জীবনী ও বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যগ্রন্থের অনেক জায়গাতেই 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়ঃ "আমি তো বাউল, আন কহিতে আন কহি।/ কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি।।"[২] (আন=অন্য)

শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তির মধ্যে 'বাউল' শব্দটিতে বহিরঙ্গে 'বাতুল' অর্থ বোঝালেও অন্তরে গভীর কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল ও বিভোর ভাবসাধক বা প্রেমভক্তির সাধক—এই অর্থটাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে; কিন্তু বর্তমান কালের মতো 'বাউল' নামধারী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুগামী সাধক—এমন কোন অর্থ এখানে ফুটে ওঠেনি।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম নানা সহজিয়া ধর্মশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম, তন্ত্র ধর্ম, নাথ ধর্ম, সুফী ধর্ম প্রভৃতিরও কিছু কিছু প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সেই সহজিয়ারই একটি বিশেষ শাখা হিসাবে ঈশ্বরপ্রেমে ব্যাকুল, ভাবরসে বিভোর ও উদাসীন এবং সেকারণে আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন ও নানা অসংগতিতে ভরা, রাগমার্গের সাধনাকারী এবং বিশেষ করে ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমায় ভরা স্বর্গীয় ঐশীরূপের নয়—মর্ত্যের জাতি-বর্ণের ভেদহীন প্রত্যক্ষ মানুষরূপের বা মানবরূপী ঈশ্বরের ভজনাকারী এক বিশিষ্ট সাধক সম্প্রদায়ই ক্রমে বাউল সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবও শাস্ত্রীয় বিধিমার্গকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে [illegible]গের সাধনাকেই একমাত্র সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অলৌকিক ঐশীরূপকে সম্পূর্ণ বর্জন করে বৃন্দাবনের নররূপী কৃষ্ণের শুধু মাধুর্য-বিস্তারকারী রূপকেই একমাত্র ভজনীয় করে তুলেছিলেন; কেননা—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা"[৩] বা "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।"[৪] অর্থাৎ শুধু মাধুর্যময় নরলীলার কারণেই একমাত্র গোকুল বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণই বৈষ্ণবদের কাছে হয়ে উঠেছেন পূর্ণতম কৃষ্ণ। শুধু কৃষ্ণেরই মানুষরূপের মহিমা নয়, সেই দৈবীসর্বস্বতা বা

১ বাউল গানের অন্যতম গবেষক ও সঙ্কলক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অনুমান-সহ সিদ্ধান্ত হলো—বাউল ধর্ম বাংলাদেশে পালযুগের চারশো বছর ধরে প্রকাশ্য ও প্রধান ধর্ম ছিল। (এই হিসাবে বাউল ধর্মের উদ্ভব বা অপরিণত প্রাথমিক সূচনাকাল আনুমানিক ১০ম শতাব্দী।) পরে তা সমাজের অন্তরালে শ্রেণিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুনরায় ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর উদ্ভব হয়ে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে এই ধর্ম পূর্ণরূপ ধারণ করে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হিন্দু, বৈষ্ণব ও মুসলমান ফকিরের মিলিত ধর্ম হিসাবে সারা বাংলায় বাউল ধর্মের প্রসার ঘটে। (দ্রঃ বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২য় সং, ১৩৭৮, ভূমিকা, পৃঃ ঞ, ট)

২ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১।১২৪

৩ ঐ, ২১।৮৩ ৪ শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীরূপ গোস্বামী, ২।১।২২৩ (মথুরা শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান প্রকাশিত, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ সং)

দৈবী-প্রাধান্যের যুগে বাস করেও সামগ্রিকভাবে মাধুর্য-রূপের উৎস—জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গহীন মানব-সমাজকেই মহিমান্বিত করে গেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রেম ছিল অদ্বিজচণ্ডালে বিতরিত। বৈষ্ণব মহাজন কবি গোবিন্দদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ স্মরণীয় ঃ "অবিরত প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে/ অখিল মনোরথ পূর।"[৫] বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রীচৈতন্যের মুখ্য নির্দেশও ছিল—"আচণ্ডাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান।"[৬]

একারণেই বাউল গানগুলির মধ্যে চৈতন্যপ্রসঙ্গ, চৈতন্যবন্দনা এবং চৈতন্যপ্রভাবের অন্যান্য আরো অজস্র নজির পাওয়া যায়। যেমন—"এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন/ তাই তো মানুষরূপ গটলে নিরঞ্জন।"[৭]—লালনের এই গানের মধ্যে যেন চৈতন্য-আত্মাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। লালনের গানের "কেঁদে কয় লালন আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে"[৮] বা "গৌর এসে হৃদয়ে বসে করে আমার মন চুরি"[৯] ইত্যাদি যেন সমস্ত বাউল সাধকেরই মনের কথা। লালন ফকির, ফকির পাঞ্জ শাহ প্রমুখ বহু বাউল সাধকের সঙ্গীতসম্ভারে বা পদাবলীতে [illegible] ছড়িয়ে আছে গৌরলীলার নানা প্রসঙ্গ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত [illegible] গোপী ও গোকুল-বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ। এছাড়া [illegible] পাশাপাশি নিত্যানন্দ, জয়দেব-পদ্মাবতী, বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, রামী-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি-লছিমাবাঈ ইত্যাদি নানা বৈষ্ণব প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে বাউল গানগুলিতে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সেখানে নানা ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। তাছাড়া বাউল গানে সাধনার লক্ষ্য হিসাবে 'জেন্তে মরা' (জীবন্মৃত) কথাটি প্রায় সকল বাউল সাধকই বারবার উচ্চারণ করেছেন। এই 'জেন্তে মরা' আর কিছুই নয়—ভাব বা প্রেমরসে বিভোর হয়ে সচেতন সত্তার বিলোপ বা বিস্মৃতিতে মনের বিবশ অবস্থা —যা অনেকখানি শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞানহারা দিব্যোন্মাদ বা ভাবোন্মত্ত অবস্থার মতো। সাধক পাঞ্জ শাহর গানে এর পরিচয় পাওয়া যায়—"যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব,/ ও সে জেন্তে মরে কৃষ্ণপ্রেমের করিছে আলাপ।/ অনুরাগের জোরে বিধির কলম নাহি সে মানে,/ বেদ-বেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেমালাপ।।" (৩২০) আর সাধক দুদ্দু শাহের ভাষায়—"যে দেখেছে সেই রূপের বিহার।/ আপছে সে ছেড়ে গেছে এ সংসার।।.../ স্বীয় কামে দিয়ে ফাঁসি/ সদায় চিন্তা শ্রীরূপ-শশী,/ পলানুপল দিবানিশি,/ জেগেছে সেই সারাৎসার।" (৩৮১) সাধনার লক্ষ্যে এই 'জেন্তে মরা' হতে পারলে, ফকির লালনের মতে, মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই জয়ের অধিকারী হওয়া যায়—"মরার আগে যে মরতে পারে,/ তারে কোন্ বাঘে কি করতে পারে,/ মরা সে কি আবার মরে,/ মরিলে সে অমর হয়।।" (১৮৮) সুতরাং বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বাউল ধর্মের স্বাতন্ত্র্য কিছু থাকলেও বাউলের গান ও সাধনার ভাবজগৎটি যে মুখ্যত শ্রীচৈতন্যপুষ্ট, তা অস্বীকার করা যায় না।

এপ্রসঙ্গে বাউল ধর্মে ইসলাম ধর্মের বিবর্তনে সৃষ্ট উদার প্রেমধর্মাত্মক সুফী ধর্মের প্রভাবের বিষয়টিও অবশ্যই স্বীকার্য। সুফী ধর্ম ও সাধনার আদর্শ নানা পরস্পরবিরোধী বৈচিত্র্যে পূর্ণ হলেও[১০] তা প্রধানত রাগমার্গীয় প্রেমাশ্রিত ভক্তিধর্ম ও সাধনার আদর্শ। ঈশ্বরের একান্ত ভক্ত সাধক সেখানে 'আউলিয়া' অর্থাৎ আল্লার সমীপস্থ সাধক হিসাবে পরিচিত, বাহ্য ব্যাপারে তাঁরা একান্তই উদাসীন। বাউল সম্প্রদায়ও তাই। 'আউলিয়া'—এই সুফী শব্দের সাদৃশ্যেই বাউল সাধকদের সম্পর্কে 'আউল' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 'সুফী' শব্দটির মতো ঈশ্বরসমীপস্থ বা ঈশ্বরের ভাবে বিভোরও হয়, আবার সংস্কৃতের 'আকুল' শব্দের অর্থও প্রযুক্ত হতে পারে—উভয়ের ভাবগত রূপ একই। তাছাড়া বাউলের 'জেন্তে মরা' অর্থে যেমন শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ বা ভাবোন্মাদ অর্থ অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনি সুফীসাধনার লক্ষ্য 'ফণা-ওয়া-বাকা' (Fana-wa-Baqa) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের গভীরতায় আত্মবোধ বিলোপ বা বিস্মৃতি (ফণা) এবং নিত্য ঈশ্বর-বিভোরতায় অবস্থান[১১] অর্থাৎ এক তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্তি—এর সঙ্গেও মেলানো যেতে পারে। এই অবস্থাই 'আউলিয়া' বা 'দিওয়ানা' (Diwana) অর্থাৎ উন্মত্ত অবস্থা। লালনের

---

৫ বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), ২য় স্তবক, পদ নং ১ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৮ম সং, ১৯৬২)

৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫।৪২

৭ বাংলার বাউল ও বাউল গান, গান নং ১। এই রচনার পরবর্তী অংশে বাউল গানের বিভিন্ন উদ্ধৃতির পাশে বন্ধনীমধ্যে ব্যবহৃত সংখ্যা উল্লিখিত গ্রন্থে সঙ্কলিত বাউল গানের ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে নির্দেশিত।

৮ বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃঃ ২১৯

৯ ঐ, পৃঃ ১৯৮

১০ "Sufism... is a very complex phenomenon." (A History of Sufism in India—Saiyid Athar Abbas Rizvi, Vol. I, New Delhi, 1978, p. 397)

১১ "Fana-wa-Baqa—dying to self and living in God." (Sufism and Vedanta—Dr. Roma Choudhuri, Part II, p. 44)

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

গানেও সেই অবস্থা-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা শোনা যায়—"পাগল দেওয়ানার মন কি ধন দিয়ে পাই।.../ ও সে পাগল ভেবে পাগল হলাম,/ আপন পর তো ভুলি নাই।" (১০৭) এই 'দিওয়ানা' সুরায় নয়, কিন্তু সুরায় উন্মত্ততার মতোই ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ততা—"Drunk is the Man of God, drunk without wine."[১২] আরবি ভাষায় এই অবস্থা 'ফিলা-ফণা' নামেও পরিচিত, যার সঙ্গে বাউলের 'জেন্তে মরা'র বৈশিষ্ট্য অনায়াসে মিলে যায় এবং যা শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থারই সমগোত্রীয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও সুফী শব্দ 'দিওয়ানা' এবং 'বাউল' বা 'বাউর' শব্দ সমার্থক জ্ঞান করেছেন।[১৩] সাধকগণের প্রতি পারস্যের সুফীসাধক 'রূমী'র উপদেশ—"Be prisoner of Love"[১৪], বাউলের 'জেন্তে মরা' এবং শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মত্ততা—এসবই একই আদর্শের বাহক। রূমী-জামী-সাদী-হল্লাজ-হাফিজ-ওমর খৈয়াম প্রমুখ সুফী কবি-সাধকদের রচনা[illegible] নানা অংশে এমন প্রেমোন্মত্ততার পরিচয় উজ্জ[illegible]য়ে আছে। তাছাড়া বাউলদের মানবসাধনা ও [illegible]প্রেম, মানবমহিমা ও মানবকল্যাণের সম্প্রসারণ[illegible]ক শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মে পূর্ণ সমর্থন [illegible] পেয়েছে সুফীসাধনার মধ্যেও। সেখানেও সক[illegible] প্রতি এসাধনার নির্দেশ হলো—সকলকে ভাল[illegible] অপরের কল্যাণব্রতে আপনার স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ-[illegible] সাধন।[১৫] মানুষের সাধনাই বাউল ধর্মসাধনার কেন্দ্রীয় কথা।

সঙ্গীত বাউলের সাধনমন্ত্র, তার আত্মার বাণীর প্রকাশ-সাধক। এই গানেই বাউলশ্রেষ্ঠ ফকির লালন শাহ[illegible] শুনিয়েছেন, মানবজন্ম শুধু দেবদুর্লভই নয়, সৃষ্টির অন[illegible] রূপের মধ্যে এই জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ—"এমন মানবজন্ম [illegible] কি হবে।/ মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে॥/ অন[illegible] রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,/ শুনি মানবের উত্তম কি[illegible] নাই॥" (১) বাস্তবিক কোন শাস্ত্র বা সংহিতা নয়, অপূর্ব সুরের মাদকতায় ভরা এমন অসংখ্য গানের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে বাউলদের বিভিন্ন বিচিত্র মানসিকতা—তাদের সকলপ্রকার বিধিবহির্ভূত অন্তরঙ্গ সাধন-ঐতিহ্যের কথা, জীবন থেকে আহৃত সহজ জীবন-দর্শনের কথা, জাতি-বর্ণের ভেদসৃষ্টিকারী সমাজের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার মূল ধরে নাড়া দেওয়ার কথা, গভীর মানবপ্রেম ও মানবমহিমার কথা, জীবনমাধুর্যের কথা, লীলাবাদের কথা—যা দেশ-বিদেশের কবি-দার্শনিক-সাধক-গবেষক-সহ অগণিত সাধারণ মানুষের বিমুগ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে বহুকাল ধরেই।

॥ ২ ॥

বাউল গান একদিকে যেমন তার উপকরণহীন অন্তরঙ্গ সাধনমহিমায় আকর্ষণ করেছে বিশ্ববরেণ্য অধ্যাত্মসাধক, "যত মত তত পথ" বাণীর উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে, তেমনি অপরদিকে ভূমার সহজ প্রাণময় রূপের সন্ধান দিয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে। বাউলের অন্তরঙ্গ অনাড়ম্বর সাধনমহিমায় আপ্লুত হয়ে প্রকৃত সাধকদের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষভাবে স্মরণ করতেন এই বাউলদের প্রসঙ্গ। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ দেখি, বলরাম বসুর পিতাকে যথার্থ সাধনার স্বরূপ শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ "সাধক—তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল।"[১৬] আবার, পথিক ভিখারির কণ্ঠে বাইরে কোথাও নয়—আপন মনের মধ্যে [illegible]র মানুষের অন্বেষণের কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথও [illegible]কেছেন এই বাউল গানের ভাবরসে, তার সংগ্রহে, [illegible] অকুণ্ঠিত চিত্তে আপন কাব্য ও সঙ্গীতসম্ভারে [illegible]ংশ্লেষ ঘটাতে। তাঁর 'জীবনদেবতা' মিশে গেছে [illegible] সেই মনের মানুষের সঙ্গে। এবিষয়ে কবির [illegible] গর্বিত স্বীকৃতি শুনি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে ঃ [illegible] আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্র-[illegible]দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে [illegible]ষ্ঠান; সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার [illegible] তাকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের [illegible], এই স[illegible]ুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা [illegible]ই 'R[illegible]gion of Man' বক্তৃতাগুলিতে।"[১৭]

বলা বাহুল্য, মর্ম-ছোঁয়া ভাষাতেই বাউলের ভূমার ঐশ্বর্যে ভরা মর্মকথাটি এখানে অতি সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়, গগনের গাওয়া 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির সুর রবীন্দ্রনাথ সংযোজন করেছিলেন তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানে। এছাড়াও বিভিন্ন বাউল গানের সুর ও ভাব কবির বহু গানের সুর

---

১২ Kulliat-i-Shams-i-Tabriz—Translated by Rev. J. W. Sweetman, p. 116

১৩ "With the Bengali word 'baul' we may also compare the Sufi word Diwana which means mad."—Obscure Religious Cults, Firma K. L. M. Pvt. Ltd., 1976, p. 161

১৪ Yusuf-O-Zulaykha—Tr. by Rev. J. W. Sweetman, Newal Kisore Press, Lucknow, p. 53

১৫ "Sufi's message to the individual is : Love all, and forget your own individuality in doing good to others."—Shaikh Muhammad Ikbal (The Development of Metaphysics in Persia, p. 105)

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮

১৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সং, পৃঃ ৬৫৯

সংযোজনা ও ভাবরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, এমনকি তাঁর একাধিক গল্প কিংবা নাটকের চরিত্রেও বাউল মানসিকতার সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। 'অচলায়তন' নাটকের ঠাকুরদা কিংবা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি সেই বাউল সাধকেরই চরিত্র যেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি সংলাপ—"যেদিন থেকে জন্মেছি, আমার এই গাঁয়ে তিনি কত দুঃখ সইলেন—কত মার খেলেন, কত ধুলোই মাখলেন—হায় হায়—"[১৮] অনাবৃত প্রকাশ ঘটিয়েছে সেই বাউল-আত্মারই।

আবার বেদান্ত-দার্শনিক বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ ধর্ম ও তার সাধন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে যে গভীর ধারণা জগতে প্রচার করেছিলেন—স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখলে তার অনেকখানিরই সাদৃশ্য মিলবে এই বাউল ধর্মসাধনায়। স্বামীজী গ্রিকদের মতো মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বরকে মানেননি। বলেছিলেন [illegible] "কেবল তাঁদেরই পূজা করা উচিত, যাঁরা ঠিক আ[illegible]ই মতো, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মহত্তর।"[১৯] [illegible] য়ারি ১৮৯৪ তারিখে হরিদাস বিহারীদাস দেশ[illegible] একটি চিঠিতে পাই ঐ একই কথা ঃ "[illegible] দিয়াই ভগবানকে মানা সম্ভব।... যদিও [illegible] বিরাজিত, তথাপি তাঁহাকে আমরা কেবল [illegible] মানুষরূপেই কল্পনা করিতে পারি।"[২০] তাঁর 'বহুরূপে [illegible] সম্মুখে তোমার...' প্রভৃতি মন্ত্রবাণীতে, কিংবা আলাসিঙ্গা প্রমুখ শিষ্যগণকে ধর্ম তথা ঈশ্বরসাধনার পথ সম্পর্কে নির্দেশদানে[২১] এবং মানুষের কল্যাণব্রতে তাঁর কর্মমুখর জীবনাচরণে সেই 'বিরাট মানুষরূপেই' ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা—যাঁকে বাউলের মনের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উপল[illegible] করেছিলেন 'পরম মানবের বিরাটরূপে'। এই মানবসা[illegible] ও মানবমহিমার প্রচারই বাউল সাধনার মর্মকথা, আর এ[illegible] মানুষ বিশ্বস্রষ্টা আলেখ নিরঞ্জনের আপন হাতের সৃষ্টি[illegible] সকল জাতি-বর্ণ-ধর্মের সংস্কার, গোঁড়ামি ও গণ্ডি থেকে মুক্ত। বাউল সাধনায় ধর্ম ও জাতির উর্ধ্বে এই মানুষেরই স্থান, দুদ্দু শাহের কথায়—"আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির নির্ণয়।" (৩৯৬) মুনি-ঋষিরা যাঁকে চার যুগ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বাউলের মতে—"এই মানুষে সেই মানুষ আছে।" (৫০) কিংবা—"মানুষের আকার ধরে,/ খোদ খোদা যে ঘোরে ফেরে।" (৩৯৭) আর সেকারণেই তাঁদের কাছে—"মানুষতত্ত্ব ভজনের সার।" (৮৫) শুধু তাই নয়—এই আদর্শের মাপকাঠিতেই বাউলের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সাধক দুদ্দু—"যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।" (৪১২) বাউল কেদারের ভাষায়—"নররূপে কেঁদে বেড়ায় তোমরা যারে বল নারায়ণ।/... মানসেতে পূজব এবার মানুষ-শ্রীচরণ।" (৪৫৪) কিংবা পাঞ্জ শাহর কথায়—"এই মানুষের রঙ্গ-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার॥.../ পাঞ্জ বলে, মানবলীলা করছেন সাঁই চমৎকার। / মানুষ ভজে' মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভবপার॥" (২৮২) অথবা দুদ্দু শাহের কথায়—"কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই।/ মানুষের চরণ না চিনিলে উপায় নাই॥" (৩৯৭)—এসবই বাউল সাধনার সেই মহৎ মানবপ্রেমের আদর্শই বহন করে চলে।

শুদ্ধ অনুরাগকে আশ্রয় করেই যথার্থ বাউল তার মন রাঙিয়েছে প্রেমরাগে, প্রেমসাধনায়। লালনের গানে আপন অন্তরকেই যেন বাউল সাধক প্রশ্ন করেন—"অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।" (৫৮) কামনাবাসনামুক্ত সেই শুদ্ধ প্রেম ও অনুরাগের সন্ধানেই বাউলদের মুখ্যত গৌড়ীয় ভাবানুগত্য, কৃষ্ণ-রাধা ও অন্যান্য গোপীদের আশ্রয়-প্রার্থনা, গৌরবন্দনায় শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ—"আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ বিনে।" কামের আশ্রয়ে নয়, [illegible]র্ণ বর্জনের মধ্যেই নিহিত আছে এসকল যথার্থ [illegible]কের খাঁটি প্রেমে উত্তরণের সাধনা। তাই [illegible]ক্তি ঃ "আগে কপাট মারো কামের ঘরে।/ [illegible] দেবে নেহারে॥" (১৬৬) বাউল ঈশানের গানে [illegible]কৈতব প্রেমই যেন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়ে [illegible] প্রেমতারে যার মন বান্ধা/ তার কি আছে কোন [illegible]-উর্মিতে তার কি করে।" (৩৪০) বাউল [illegible] এক নগণ্য অংশের কামজয়ের সাধনায় [illegible] শুদ্ধ অনুরাগ-আশ্রয়ী প্রেমোপাসক [illegible]দের তী[illegible] অসন্তোষেরই কারণ হয়েছে। কামজয়ের [illegible]য় সেই [illegible]গণ্য অংশের সাধকদের অপরিহার্য উপকরণ [illegible]লো প্রকৃতি বা সাধনসঙ্গিনী, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়দমনের পরিবর্তে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের পথকেই প্রশস্ত করে। এসকল সাধকের প্রতি যথার্থ প্রেমের উপাসক বাউলগণ তাঁদের গানে বারবার নানান সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এই সাধনার অসারতা ও বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে—"কামে রত যত জনা/ পথ থাকিতে পথ পাবে না,/ ঘাটে গিয়ে হবে কানা সেই সময়।" (২৪৩) কখনো বা নানা উপমার আড়ালে এসকল সাধকের প্রতি তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়—"ধিক্ ধিক্ মন তোমারে, বলব কিরে,/ কাচ

---

১৮ প্রায়শ্চিত্ত (নাটক), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭-২২৮

১৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, সুলভ সং, পৃঃ ২২১

২০ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১০

২১ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১২, ১৭

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

নিলি কাঞ্চনের দরে।/ তোমার থাকতে নয়ন, ফেলে রতন,/ যতন কর ঝুট্‌ পাথরে॥" (২৩১) অথবা—"মন যদি আপনার হতো/ রত্ন মাণিক চিনে নিত,/ তাঁবা দস্তায় হতো না রত,.../ বুঝলি নারে চাষা,/ তাইতে তোর এ দুর্দশা ঘটে গেল।" (২১৫) পদ্মলোচনের গান তাই এদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে একমাত্র হৃদয়ে আবদ্ধ শুদ্ধ প্রেমের জোরেই প্রকৃত রসপ্রাপ্তির কথা—"ওরে হৃদবদ্ধ ঘরে রাগের জোরে/ রসিক যারা রূপ নেহারে॥" (২১১)

বাউলদের সম্পর্কে কোন কোন সমালোচক এমন মত পোষণ করেন যে, তাঁরা বৈষ্ণব ভাবাদর্শ দ্বারা মোটেই প্রভাবিত নন বা তাঁদের কাছে রাধাকৃষ্ণের কোন গুরুত্বই নেই।[২২] অবশ্য এমন মন্তব্য তাঁদের সীমিত অংশের সাধনপ্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়। আসলে বাউল সাধনার দুটি পর্যায়—একটি হলো 'পুথ্যা', অপরটি 'তথ্যা'। পুথ্যা পর্যায়টি হলো পুঁথি বা শাস্ত্র-অনুসারী। এই পর্যায়েই সাধনপ্রক্রিয়া হিসাবে নানা তান্ত্রিক জটিল অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে, আর সে-উদ্দেশ্যেই প্রত্যক্ষভাবে সাধন-সঙ্গিনীর ব্যবহার। এটি বাউল সাধনার [illegible] হলেও অধিকাংশ বাউল সাধকই এ[illegible] সমর্থন করেন না। তাঁরা সে-সকল অনুষ্ঠানকারী বাউলদের বস্তুবাদী আখ্যায় ভূষিত করেন—"বস্তুবাদী বাউল অন্য কেহ কেহ হয়।" (৩৭৩) আর এই স্বাতন্ত্র্য নিরূপণে সেই বস্তুবাদী (পুথ্যা) বাউলদের প্রতি আচার-সংস্কারহীন ভাববাদী প্রেমমার্গের (তথ্যা) যথার্থ বাউল সাধকদের ভর্ৎসনার সুরই স্পষ্ট। উল্লিখিত পদাংশটিতে 'কেহ কেহ' শব্দটির ব্যবহার ঐ শ্রেণির সাধকদের সংখ্যার স্বল্পতাই নির্দেশ করে। এই পর্যায়ের সাধন অবশ্যই চৈতন্য-সমর্থিত নয়। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে সাধকের পক্ষে রাগাত্মিকা সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি প্রেমরাগের সাধনা প্রযোজ্য নয়, তা কেবল কৃষ্ণ-পরিকরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে সাধকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাগানুগা অর্থাৎ কৃষ্ণ-পরিকরদের আনুগত্যে প্রাসঙ্গিক রসের সাধনার। সুতরাং মধুর রসের সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সাধনসঙ্গিনী বা প্রকৃতি-আশ্রয়ী সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধনপথ নয়। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ এসাধনার স্পষ্ট বিরোধিতাই পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যকণ্ঠেঃ "প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।/ দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"[২৩] এবং প্রকৃতি-আশ্রয়ী সেরূপ প্রত্যক্ষ রাগসাধনাকে 'মর্কট বৈরাগ্য' বলে তিনি ভর্ৎসনাই করেছিলেন।[২৪] আর এইসঙ্গেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ভাগবতের নির্দেশবাহী "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা..." অর্থাৎ মাতা কিংবা ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও নির্জনে একাসনে থাকবে না, কারণ ইন্দ্রিয় অতিশয় বলবান, তারা বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে থাকে।[২৫]

পুথ্যা পর্যায়ের কারণেই সমালোচক মহলে কোথাও বাউলদের গৌড়ীয় ভাবানুগত্য অস্বীকৃত হয়েছে, আবার কোথাও বাউল গান 'শিল্পরসের বিচারে বিচিত্র গীতিরসসিক্ত ও প্রতীকধর্মী' বলে উচ্চপ্রশংসিত হলেও বাউল সাধনা তার তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য ভর্ৎসিত হয়েছে।[২৬] এ দুয়ের কোনটিই নিয়ম-শাসন-বহির্ভূত, মানবপ্রেমের সাধক অধিকাংশ বাউল সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। গৌরলীলা ও গৌরবন্দনার অজস্র পদ ছাড়াও কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীপ্রসঙ্গের বহু পদ এবং প্রেমভক্তিসর্বস্ব ভাবসাধনার মহিমা প্রকাশে সাধকদের অকুণ্ঠিত আবেগের প্রকাশ তাঁদের বৈষ্ণব ভাবানুগত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমন এই পদটি—"যে ভাব গোপীর ভাবনা,/ সামান্যের কাজ নয় সে-ভাব জানা॥/ বৈরাগ্য-ভাব বেদের বিধি,/ গোপিকা-ভাব প্রেমের নিধি,/ ডুবে থাকে তাহে নিরবধি/ রসিক জনা॥.../ যেজন গোপী-অনুগত,/ জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব;/ লালন কয় রসিক মত্ত/ পেয়ে সেই রসের ঠিকানা॥" (১১৩) লালনের পদে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। (দ্রঃ পদ নং ১২৩, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০ প্রভৃতি) ফটিক গোঁসাই তাঁর পদের ভণিতা করেছেন—"গোঁসাই ফটিক বলে, বাঁচতে পারে/ নিঃস্বার্থ প্রেম করে যারা।" (১২৪) বাউলের লক্ষ্য যে 'জেন্তে মরা'—তার উৎস এই নিষ্কাম অনুরাগই, লালনের কথায়—"একান্ত যে অনুরাগী/ জেন্তে মরা ভয় ত্যাগী।" (১৫৭) গোপী-অনুগত এই নিঃস্বার্থ প্রেম বা একান্ত অনুরাগের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেমভাবনাই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। তাই বাউল হাউরে গোঁসাই প্রেম বা ভক্তির আদর্শ নির্দেশ

২২ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতঃ "They (i.e. Bauls) have not allowed themselves to be influenced by Vaisnavism. Radha and Krishna have no meaning to them." (History of Ancient Bengal—R. C. Majumder, G. Bharadwaj & Co., Kolkata, 1971, pp. 531-532, Vol. I) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়েরও একই সিদ্ধান্তঃ "শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ-রাধা কল্পনা তাহাদের নিকট কোন অর্থই বহন করে না।" (বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ২য় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১ম সং, ১৯৮০, পৃঃ ৬৭৮)

২৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২।১১৬

২৪ দ্রঃ ঐ, ২।১১৮

২৫ শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।১৯।১৭

২৬ দ্রঃ বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১ম সং, ১৯৬৬, পৃঃ ১১৮১-১১৮২

করতে গিয়ে সে-ভাবনার সঙ্গেই একাত্ম হয়ে বলতে পেরেছেন—"নির্মল-সত্তা কর আত্মা, স্ব-সুখসত্তা ত্যাগ করি।/ মিছে সঙ সেজো না, ঢঙ করো না, ভজবে যদি শ্রীহরি॥" (৩২৮) সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, সমালোচকদের ভর্ৎসনা বা বিরূপতা এধরনের সাধকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এই শ্রেণির সাধকগণ—'মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়', 'যাতে জনম তাতেই মরণ', 'বে-হুঁশিয়ারী হলে পরে হারাবি অমূল্য ধন', 'মেয়ে যাকে স্পর্শ করে পাঁজরাকে ঝাঁঝরা করে', 'তোর দফারফা হয়ে গেছে কুহকেতে পড়ে' ইত্যাদি নানা সাবধানবাণী উচ্চারণ করে সেই ভর্ৎসনাযোগ্য পথ চিরকাল পরিহারই করে এসেছেন। (দ্রঃ ৫৭৬, ৫৭৯, ৫৮০ ইত্যাদি পদ)

॥ ৩॥

বাউল গানের সবচেয়ে বেশি গৌরবময় দিক হলো তার অসাম্প্রদায়িকতা। মূলত গৌড়ীয় ও সহজিয়া বৈষ্ণব এবং সুফী বা ফকিরী সাধনার সংমিশ্রিত ভাবধারার আশ্রয়ে বাউল ধর্মসাধনা পুষ্ট হওয়ায় হিন্দু [illegible]মান উভয় সম্প্রদায়ই এর প্রতি গভীরভাবে [illegible] ক্ষিতিমোহন সেন গৌরব প্রকাশ করে [illegible]ছিলেন "হিন্দু, মুসলমানের সবচেয়ে সহজ ও অপূর্ব [illegible] হইয়াছে বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে।"[২৭] য[illegible] মুসলমান নির্বিশেষে বাউল সাধকগণ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে জাতিধর্মের চিহ্নটিকে সযত্নে এড়িয়ে মানবধর্মের সাধক হিসাবেই নিজেদের পরিচয় দান করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মানবত্বকে বাদ দিয়ে বাইরে থেকে চাপানো তথাকথিত জাতিধর্মের বিচারে মানুষকে গ্রহণ করার যে সামাজিক প্রবণতা, তাকে বারবার আঘাতের দ্বারা বাউল সাধকগণ সেই বিভেদের মূল বীজটিকেই ধ্বংস [illegible] মানব-সম্প্রীতির মাধুর্যে ভরা এক নতুন সমাজব্যব[illegible] গড়তে চেয়েছেন তাঁদের গানে ও জীবনচর্যায়। এই ম[illegible] লক্ষ্যেই গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া মুসলমান উভয়কেই কঠোর ভাষায় তীব্র ভর্ৎসনায় জর্জরিত করতে এতটুকু ভীত হননি তাঁরা।[২৮] কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের নিরিখে ভারতের ক্রমাবনতি ও শক্তিহীনতার মূল কারণটি তাঁদের কাছে অতি স্বচ্ছ—"জাতাজাতি সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে দিলে।/ যত সব কায়েত বামন অবশেষে এই বুঝিলে॥" এই ভর্ৎসনার আড়ালে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁদের অখণ্ড জাতীয়তাবোধ, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং আদর্শ সমাজসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—"শূদ্র, বৌদ্ধ, ইতর, মুসলমান/ সবি তো এক মায়ের সন্তান,/ ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ,/ কেউ না দেখিলে॥/ রচিয়া জাতির বেড়া/ দেবতায় করলে দেশছাড়া,/ মানুষ ছাড়িয়া নোড়া/ সবাই পূজিলে॥" (৪০২) এই ধর্মনিরপেক্ষতা বাউল-মাত্রেরই ধ্যানমন্ত্র। আপন বোধবুদ্ধি অনুসারে তাঁরা সকলেই এই মন্ত্রের প্রচারে এবং সেই অনুসারে জীবনাচরণে একনিষ্ঠ। দুদ্দু স্মরণ করিয়ে দিলেন, সকল সৃষ্টির মূলে অদ্বিতীয় একের কথা—"ধলা-কালার একই বীজ ভাই,/ সর্ব জাতি যাতে হয় উদয়।" (৪০৪) ভিন্ন ভাষায় লালনও রেখেছেন সেই একই আবেদন—"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।/ হিন্দু কি যবন বলে/ তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥" (১০২)

শোনা যায় বাউলশ্রেষ্ঠ এই ফকির লালন শাহ হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার ও অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় এক বাউল ফকিরের কাছে বাউলধর্মে দীক্ষিত হন। লালন তাঁর পরবর্তী জীবনে তীব্র সংগ্রাম করে গেছেন এই সাম্প্রদায়িক চেতনা ও তার আশ্রয়ে নানা বিদ্বেষ-হানাহানির বিরুদ্ধে। জাতি সম্পর্কে মানুষের নানা প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে তিনি তাদেরই পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন—"সব লোকে কয় [illegible] কি জাত সংসারে।/ লালন কয় জেতের কি রূপ, [illegible] এ নজরে॥.../ কেউ মালা কেউ তসবী গলায়/ [illegible] কি জাত ভিন্ন বলায়,/ যাওয়া কিংবা আসার বেলায় [illegible] রয় কার রে॥" (১৬০) বিশ্বজুড়ে লোকে যে জা[illegible]য় গৌরব করে, এই গানের ভণিতায় তিনি [illegible]—"লালন সে জেতের ফাতা/ বিকিয়েছে সাত [illegible]॥" কখনো বা অন্য দৃষ্টান্তের সাহায্যেও তিনি [illegible]ছেন—"সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি [illegible] বলে আমার আমি না জানি সন্ধান॥/ একই [illegible] আসা যা[illegible],/ একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,/ কেউ খায় [illegible]রও [illegible]ওয়া,/ বিভিন্ন জল কে কোথায় পান॥"[২৯] মানুষকে তিনি শুধু মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, আচার বর্ণ বা জাতির চিহ্নধারী হিসাবে নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ধর্মের প্রতি লালনের নিঃশেষ আত্মনিবেদন মূলত একারণেই—"ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে প্রেমের গুণ গায়।/ জাতের বোল রাখলে না সে তো করলে একাকারময়।" (৭৫) সমাজের জাতিকেন্দ্রিক বিভেদনীতির বিরুদ্ধে লালনের চরম বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে এই গানে—"জাত না গেলে পাইনে হরি/ কি ছার জাতের গৌরব করি/ ছুঁসনে বলিয়ে।/ লালন কয়, জাত হাতে

---

২৭ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃঃ ৯৯

২৮ দ্রঃ পদ নং ৪০৬, ৪০৭

২৯ বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, পৃঃ ২৪৩

পেলে পুড়াতাম/ আগুন দিয়ে।" (১২২) ইত্যাদি নানা পদে পাওয়া যায়। জাতিভেদ সম্পর্কে এমন বিদ্রোহী মনোভাব ছড়িয়ে আছে অন্যান্য বহু বাউলের গানেই। যেমন পাঞ্জ শাহর গান—"জেতের বড়াই কি।/ ইহকাল-পরকালে জেতে করে কি॥/ আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি॥" (৩১৫) কেননা—"মৃত্যু হলে যাবে চলে,/ জেতের উপায় হবে কি॥" লালনের পরবর্তী কালে এই পাঞ্জ শাহই বাউল সমাজে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হন। আল্লার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ তাঁরও বহু গানে একাকার হয়ে আছে। শুদ্ধ প্রেমানুরাগের প্রতি বিশ্বাস যে কত গভীর হয়ে উঠতে পারে, সে-পরিচয় ধরা পড়েছে তাঁর এই গানে—"একবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়,/ সুধা বলে গরল দেখ পান করে সদায়।/ ও তার গরল সুধা হয়ে যায়॥" (২৮৬)

অনুরাগের এই গভীরতা বাউল গানে সাধ্য ও সাধকের সম্পর্ককে করে তুলেছে একান্ত আন্তরিক ও মদীয়[illegible]। তাই বাউল সাধক কাতর মিনতির প[illegible] সেই মদীয়তাময় গভীর অনুরাগের জোরেই এম[illegible] জানাতে পারেন তাঁর সাধ্য দয়াল সাঁইয়ে[illegible]—"[illegible] নামের মহিমা যাবে জানা এই অধীনে চর[illegible] (২৬৭) এই আত্মগৌরবী আন্তরিকতা বাউল সা[illegible] বিশেষ মাত্রা দান করেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার লীলাবাদের স্বরূপ বাউল সাধকেরা জানেন তাঁদের সহজ অনুভূতির মাধ্যমে—উপনিষদের দর্শন চর্চা করে নয়। জানেন—জীবসাধককে বাদ দিয়ে সে-লীলা অসম্পূর্ণ, কেননা ভক্ত সাধক সে-লীলার পরম আশ্রয়—স্রষ্টার লীলারস আস্বাদের অপরিহার্য উপকরণ। তাই তাকে ব[illegible] দিয়ে সেই দয়াল সাঁইয়ের কোন গৌরব, এমনকি অ[illegible] পর্যন্ত শূন্য হয়ে যায়। বাউল সাধক অনায়াসে সে-গর্ব তু[illegible] ধরেন তাঁর গানে—"আমি বিনে তোমার কি আর বড়া[illegible] / কেবা ছোট, কেবা বড়, বিচার কর বিচার চাই॥/ যদ্যপি না থাকি আমি,/ কে বলে তোমায় তুমি,/ কিসের তুমি কিসের আমি,/ আমি গেলে তুমি নাই॥" (৩৪৬) পদটিতে প্রেমের সুমহান গর্ব ও অপরিসীম বিশ্বাসে সাধক দ্বিজদাস তাঁর স্রষ্টাকে নির্দ্বিধায় শোনাতে পেরেছেন—"একদিন যদি আমায় ছাড়,/ দেখি কেমন থাকতে পার,/ ছাড়াতে চাই বেড়ে ধর,/ দায়ে ঠেকেছি আমি তাই।।" এই গান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র সেই গানটি—"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর/ তুমি তাই এসেছ নিচে।/ আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,/ তোমার প্রেম হতো যে মিছে। / আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,/ আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,/ মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে/ তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।..." এই গানে বাউল মানসিকতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। উদ্ধৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতের শেষাংশের পূর্বরূপ মেলে বাউলের কায়াসাধনায়, যেমন লালনের গানে—"বেদে কি তার মর্ম জানে।/ যেরূপ সাঁইর লীলাখেলা/ আছে এই দেহভুবনে॥" (৮৫) কিংবা—"খুঁজলে আপন ঘরখানা/ তুমি পাবে সকল ঠিকানা।" (৫৩) অথবা—"একবার আপনারে চিনলে পরে অচেনারে যায় চেনা।।" (৮২) আর এই পরম বোধ থেকেই বাউলদের মানুষ-ভজনার বিস্তার—মানুষের মধ্যে মানুষ-রতনকে চিনে নেওয়ার আকুল বাসনা। ভারি সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে 'রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা সাধক-কবি তুলসীদাস তাঁর একটি দোঁহায় গেয়েছিলেন—"সব কি ঘট্‌মে হরি হেঁয়, পহছানতে নাহি কোই।/ নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত, ঢুঁরত ব্যাকুল হোই॥"[30]

বাউল সাধনা অনেকাংশেই শ্রীচৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব সাধনার দ্বারা পুষ্ট হলেও সে-সাধনার পরিণামে বা লক্ষ্যে [illegible]উল সাধক কিন্তু মুক্তি বা মোক্ষকামী। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব [illegible] সাধন ও সাধ্য—দুই-ই নিরুপাধি বা বাসনাশূন্য [illegible] প্রেম, তাই প্রেমই তাঁদের কাছে পরম পুরুষার্থ। [illegible] বাউল সাধকগণ অতীন্দ্রিয় প্রেমের সাধক [illegible] পুরোপুরি নিরুপাধি বা অহৈতুকী প্রেমের সাধক [illegible]ননি। গৌড়ীয় প্রেমের যুগপৎ ভেদ ও [illegible] অচিন্ত্য আদর্শের সমর্থন কিংবা অনুভূতি দু-[illegible] বাউল গানে যে ধরা পড়েনি তা নয়। তেমনি [illegible]র সন্ধান পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেনের '[illegible]' গ্রন্থে বাউল গানের একটি আংশিক [illegible]তে। [illegible]র বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বাউল সাধক [illegible]ছেন: "অনিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।" (পৃঃ ৫৭) কিন্তু প্রেমসাধনার পরিণাম ক্ষেত্রে দ্বৈতচেতনার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে নিত্য ঐক্যচেতনা অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে অব্যাহতিলাভে অদ্বৈত সত্তায় উত্তরণই তাঁদের লক্ষ্য। অতএব বাউলের সাধন প্রেম হলেও সাধ্য হলো অদ্বৈত মুক্তি। তাই লালনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—"এসো দয়াল আমায় পার করো ভবের ঘাটে।" (২০) বা—"পারে লয়ে যাও আমায়।" (১৬) এধরনের মিনতি দুদ্দু বা অন্যান্য বাউলদের পদেও পাওয়া যায়—"আমার আসা যাওয়া ফুরাবে কবে।/ ভবনদীর মাঝে বারে বারে যাই গো ডুবে॥" (৪১৭) এ-জাতীয় মুক্তিভাবনা

৩০ দোঁহাবলী (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত), বসুমতী সং, দোঁহা নং ৫০, পৃঃ ১৭

বাউলদের আবার বেদান্ত-সাধনারও উত্তরাধিকারী করে তুলেছে।

আসলে বাউল ধর্ম একটি বিমিশ্র ধর্ম, সেকারণেই তাদের কোন সুনির্দিষ্ট কৃত্য বা ভাবনার সীমাবদ্ধতা নেই। নানা জনের নানা কালের নানা অঞ্চলের বিভিন্নমুখী ভাবরসে বিমিশ্র সঙ্গীতসম্ভারেই তাদের বিচিত্রমুখী ভাবদর্শন গড়ে উঠেছে—যাতে বেদান্ত, উপনিষদ্, মহাকাব্য থেকে বৈষ্ণব-সুফী-সহজিয়া-তান্ত্রিক প্রভৃতি মতের অজস্র ছাপ পড়েছে, আর সেসবই চলতি সমাজ-প্রবাহ বা আপন অন্তরের উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত, ইতিহাস বা দর্শন চর্চার মাধ্যমে নয়। সাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি একইভাবে গড়ে উঠেছে গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে..." বাণীর মতোই পরম উদারতা। তাই বাউল-গীতারও বাণী—যে যা ভাবে সে সেইরূপ হয়। (২২) অন্তরের সায়বিহীন বিধিনির্দিষ্ট সাধনা যে রসহীন তিক্ততাই সৃষ্টি করে—এই পরম সত্য তাঁরা কোন শাস্ত্রপাঠে নয়, সহজ উপলব্ধিতেই উদ্ঘাটন করেছেন। সহজ সরল গ্রাম্য উপমায় গীতার সেই পরম সত্যকেই যেন [illegible] উচ্চারণ করেছেন তাঁর গানে—"মন যাতে নয়,/ পূজায় কি হয় ফুল দিয়ে শত শত॥/ যার মনে যা লাগে তাই,/ সে করুক তাই,/ তাতে গোল কেন আর অত।" এর পরেই ভণিতায় সেই সহজ উপমা—"লালন বলে লাথিয়ে পাকালে সে-ফল/ হয় না মিঠে, হয় তিতো।" (৯৩)

সমাজে বাউল সাধনার বহু নিন্দাও আছে। বিশেষত নানা গুহ্য যোগাচার ও কামজয়ে কামাচার সাধনার দিকটি সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য নয়। এদিকটি সংশ্লিষ্ট সাধকদের পদে নানা দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিকতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর নিন্দা-উপেক্ষা-ভর্ৎসনা বা কঠিন সমালোচনা তাঁদের সম্পর্কে সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। বাহ্য আচারসর্বস্বতা ও জাতিভেদের তীব্র বিষ নির্মূল করতে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সংস্কারাচ্ছন্ন উদারতাহীন অন্ধ দিকগুলিকে প্রেমরসিক বাউলেরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই বারবার আঘাত করেছেন, প্রসারিত করতে চেয়েছেন সকল কলুষ ও ভেদমুক্ত মানবধর্ম। তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ভেদসৃষ্টিকারী সমাজপতিদের প্রতি নির্ভীক সমালোচনার সুর। যেমন লালনের গানে—"আসতে একা আলি রে মন,/ যেতে একা যাবি রে মন,/ সিরাজ সাঁই বলে, রে লালন,/ কার নাচায় নাচো মিছে॥" (২৭) ফলে বিভিন্ন জাতিধর্মের গোঁড়া, আচারবিধিসর্বস্ব মানুষরা তাঁদের প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র নিন্দা-সমালোচনায় তাঁদের উদার মনোভাবকে, তাঁদের অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। বাউলরা অধিকাংশই অন্ত্যজ-ব্রাত্য-নিরক্ষর, ফলে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন বলে কুলীন-সমাজে সেই নিন্দার গতি অবাধে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই নিন্দা গ্রহীতার প্রাপ্য নয় মোটেই, প্রাপ্য দাতার। ধর্মের যথার্থ উপাসকগণ কিন্তু বাউল গান ও তার সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে পরম শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করেছেন বারবার।

বাউল-ভাবনার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবশেই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হরিনাথ মজুমদার পরিচিত হয়েছিলেন 'কাঙাল হরিনাথ' বা 'ফিকিরচাঁদ বাউল' নামে—যাঁকে আধুনিক বাউল গান ও সম্প্রদায়ের কেন্দ্র বলে মনে করেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেননা—"'হরিনাথের শিক্ষিত তরুণ শিষ্যেরা পুরাতন বাউল ঢঙে অনেক গান" লিখেছিলেন।[৩১] আবার আধুনিক গীতিকাব্যের জনক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীও বাউল গানের প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে বিভিন্ন সময়ে রচনা করেন কুড়িটি বাউল গান—যেগুলি তাঁর 'বাউল বিংশতি' কাব্যে সঙ্কলিত। এ কাব্যের সার নির্যাস হয়তো শেষ গানটির এই প্রশ্নাত্মক পঙ্‌ক্তিটি ঃ কেন অন্য জনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশ্রয়?

আজ তাই দেশে-বিদেশের বরেণ্য ও সাধারণ মানুষজনের শ্রদ্ধা লাভ করেছে বাউল ভাবসাধনার জগৎটি। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাউলদের গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"Indeed we can say about these (i.e. Baul songs) what Keats says about the songs of Nightingale of heaven—

... divine melodious truth
Philosophic numbers smooth."[৩৩]

ঈর্ষা, হানাহানি ও রক্তপাতে জর্জরিত আজকের অশান্ত বিশ্বে মানুষের আন্তর ঐশ্বর্য-গরিমায় ভরা জগৎকে পুনরায় মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত করতে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক বাংলার বাউল গানের ভাব ও ভাষা, তার মানবসাধনা ও মানবধর্মের মর্মস্থিত রসভাণ্ডার—যা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় অবিচল। তথাকথিত শিক্ষিতরা স্বীকার করুন আর নাই করুন—সে-রসভাণ্ডার ব্রাত্য সমাজের অন্তরে উত্থিত হলেও তা কিন্তু শাশ্বত ভারতেরই গরিমাময় আত্মার বাহক। ❑

---

৩১ দ্রঃ বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯০
৩২ বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃঃ ১৯০
৩৩ Obscure Religious Cults, p. 157

জয় জয় দুর্গে

স্বামী গর্গানন্দ

দেবী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী যা হি বিশ্বস্য নিত্যা
আদ্যাশক্তির্দনুজদলনী মাতৃরূপা জ্বলন্তী।
দিব্যাস্ত্রাঃ শ্রীময়দশভুজা দৈবতেজো-বিমূর্তা
সা শ্রীদুর্গা ভবতু তনয়ে সুপ্রসন্না সদৈব॥১

বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবী—যিনি নিত্যা, আদ্যাশক্তি, দানবদলনী, জ্বলন্ত মাতৃমূর্তি, দিব্যাস্ত্রধারিণী, ললিত দশভুজা এবং দেবগণের তেজ থেকে মূর্তিধারিণী—সেই শ্রীদুর্গা সর্বদা সন্তানের প্রতি অতিশয় প্রসন্না থাকুন। ১

সর্বালঙ্কার-মণিমুকুটা চন্দ্রচূড়া বরাঙ্গী
সারাৎসারা কনকরুচিরা নূপুরা রক্তবস্ত্রা।
সিংহাসীনা নিখিলনমিতা চারুকেশা ত্রিনেত্রা
সা শ্রীদুর্গা ভবতু তনয়ে সুপ্রসন্না সদৈব॥২

যিনি সর্বাভরণ-মণিমুকুট-বিভূষিতা, চন্দ্রচূড়া, শ্রেষ্ঠ তনুধারিণী, সারাৎসারা, সুবর্ণপ্রভাময়ী, নূপুর ও রক্তবস্ত্র-শোভিতা, যিনি সিংহাসীনা, জগতের প্রণম্যা, সুন্দর কেশমণ্ডিতা, ত্রিনয়না—সেই শ্রীদুর্গা সর্বদা সন্তানের প্রতি অতিশয় প্রসন্না থাকুন। ২

দীনার্তেভ্যঃ পরমকরুণা তে সুতেভ্যোঽপি নিত্যং
ভক্তির্জ্ঞানং বিতরসি মতির্মঙ্গলং ভুক্তি-মুক্তিঃ।
সৌম্যা পূর্ণা ত্বমসি কিমহো স্নেহশীলা শরণ্যা
মায়ামুগ্ধং পাহি ভগবতি মাং দেবি দুর্গে নমস্তে॥৩

দীন ও আর্তদের ওপর তোমার পরম করুণা এবং সন্তানের প্রতিও সেরূপ প্রতিনিয়ত; তুমি ভক্তি, জ্ঞান, সুমতি, মঙ্গল, জাগতিক বৈভব ও মুক্তি বিতরণ কর। সৌম্যা, পূর্ণা আহা! তুমি কী অপরূপ স্নেহশীলা ও শরণ্যা; হে ভগবতি দেবি দুর্গে! মায়ামুগ্ধ আমাকে রক্ষা কর, তোমায় প্রণাম। ৩

আবির্ভূতা ত্বমসি ভুবনে শান্তি-সংবর্ষণায়
ঘোরে শৌর্যে রণময়ি ভৃশং মাহিষঘ্নি প্রচণ্ডে।
বিশ্বশ্রেষ্ঠে প্রথিতচরিতে পূজিতে সর্বদেবৈঃ
হে সর্বেশে জয় জয় শিবে ব্রহ্মবিদ্যে বিশিষ্টে॥৪

জগতে সম্যক্ শান্তিবর্ষণের জন্য তুমি আবির্ভূতা হও; হে ঘোরে, শৌর্যে, ভীমরণরঙ্গিণি, মহিষাসুরমর্দিনি, প্রচণ্ডে, বিশ্বশ্রেষ্ঠে, প্রথিতচরিত্রে, সর্বদেবতাপূজিতে, হে সর্বেশে, বিশিষ্টে, ব্রহ্মবিদ্যে, শিবে! জয় হোক তোমার জয় হোক। ৪

অভয়ে বরদে সিদ্ধে ভদ্রকালি সনাতনি।
চিন্ময়ি চণ্ডিকে দুর্গে কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥৫

হে অভয়ে, বরদে, সিদ্ধে, ভদ্রকালি, সনাতনি, চৈতন্যময়ি, চণ্ডিকে, কাত্যায়নি, দুর্গে! তোমায় প্রণাম। ৫

অসুরদলনী দুর্গতিনাশিনী অন্তরবাসিনী হে মা দুর্গা!

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আজ দুর্গামায়ে বাঁধব এবার ছাড়ি প্রলোভন সত্য ধরে—
তাই দুর্গানামের বুলির 'পরে দেখব বেটি কোথায় সরে।
স্বর্ণময়ী মা যে আমার, ঘুরে বেড়ায় আপন পুরে—
তারে নিত্য চিনে আনব জিনে রোখে কে আজ দেখব মোরে?
মা যে গো মোর ক্ষ্যাপা শিবের ঘরনি, তা সবাই জানে—
আমি যে মার ঐ চরণের ধূলির ধূলি, কে না চেনে?
রত্নমালা গলে রত্নমালিনী মা, অসুর বধে—
আমি অধম সন্তান, তাই ডুবি মায়ের শুভদ-মদে।
মার মোহিনী রূপের ছটায় ত্রিভুবন সব আলোয় আলো—
বলে অভাজন—"সেই কারণে মাকে সদাই বাসি যে ভাল।"
সেই মায়েরই অরূপবীণা দোলায় আমার চিত্তখানা—
তারই ঝঙ্কারে প্রবৃত্তি শানা মায়ের নিবৃত্তিতেই মরে।
মার বিভূতি ইতিউতি ছুটছে পাপীতাপীর প্রতি—
কল্যাণী মা, রিক্ত ভালে পরায় টিকা আদর করে।
বিশ্বমায়ের ঘুরনচাকে ঘুরছে মানুষ পাকে পাকে—
তবু কি তার বুদ্ধি থাকে মার চরণে রইতে পড়ে?
বলি তাই আজ, শোন রে পাগল, সরিয়ে মনের বন্ধ আগল
সার কর ঐ মায়েরই কোল, নইলে বাছা যাবিই মরে!
আজ দুর্গামায়ে বাঁধব এবার ছাড়ি প্রলোভন সত্য ধরে—
তাই দুর্গানামের বুলির 'পরে দেখব বেটি কোথায় সরে!

তাবতী মহিনা সংবভূব

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তর্গত 'দেবীসূক্ত'-এ অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্‌ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলছেন ঃ

আমিই ঈশ্বরী, এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আমিই একক অধীশ্বরী।
আমিই সংহার করি, সৃষ্টি করি, আমি সর্বব্যাপী
বহুধা বিভক্ত হয়ে আমি ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে।
আমি একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, আদিত্য দ্বাদশ
মিত্র ও বরুণ আর ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার
সোমদেব, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ আর যত হবিষ্মান
বিশ্বের কল্যাণব্রতী নিয়ত আহুতিদানে রত
যজমান যে-ব্রাহ্মণ, তাদের পালন করি আমি।
আমিই একাকী সব এদের ধারণ করে আছি।
সমস্ত দেবতাগণ, তারা তো আমারই প্রতিরূপ।

আমিই ঈশ্বরী, এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ—
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম সুখ দুঃখ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি
আমি তার অধীশ্বরী। আমি বিতরণ করি সবে
যে পরম ব্রহ্মজ্ঞান আকাঙ্ক্ষিত দেব মানবের
আমারই প্রসাদে তাহা অনায়াসলব্ধ হয়ে যায়।
আমি সেই আদি প্রাণ, সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত আমি,
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতনার মূলে অধিষ্ঠিত।
আমিই প্রথম প্রাণ, আমি এক, বহু হয়ে আছি
ব্রহ্মচৈতন্যের মাঝে আমার নিয়ত অবস্থান।

আমিই ঈশ্বরী, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিনী
আমিই ধারণ করি, আমিই পালন করি সবে
আমিই সংহার করি, রুদ্ররূপা আমি সে শঙ্করী
প্রলয় নাচনে নাচি কখনো কখনো লীলাচ্ছলে।
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমি সেই আনন্দস্বরূপা,
আমারই ইচ্ছায় কেউ ব্রহ্মা হয়, কেউ ঋষি হয়।
এই জন্ম-মরণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে
আমারই প্রসন্ন আশীর্বাদে হয় ব্রহ্মমেধাবী।
আমার প্রসাদে তার অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত হয়
অনায়াসে হয় সর্ব দৈবী সম্পদের অধিকারী
সেই সাধকের কুলকুণ্ডলিনী সদা জাগরিত
অমিত সম্পদশালী হয় সে অমিত বিত্তবান।

আমিই অন্নের প্রাণ, দর্শনের কর্ত্রী—সেও আমি,
আমারই আশ্বাসে চলে জগতের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
অন্তর্যামিনী আমি, শ্রবণের মর্মমূলে বসে
নিশিদিন মত্ত আছি সে আমার আপন লীলায়।
সর্বভূত মোর সৃষ্ট, সর্বলোক আমারই সৃজিত
স্বচ্ছন্দে বায়ুর মতো বিচরণ অন্তরে বাহিরে
করি আমি সেই লোকে, সেই লোক আমারই মায়ায়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে স্নেহসুধারসে সঞ্জীবিত।

যদিও অতীত আমি এ আকাশ এই পৃথিবীর,
তথাপি ইহারা সৃষ্ট আমার আপন মহিমায়।
আমিই প্রপঞ্চরূপে সর্বভূতে জীবরূপে আছি
দেশাতীত কালাতীত, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী।

শরৎশোভা-মনোলোভা

সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোর ভাটিয়ার ভোরাই সুরে
শিশির দিল আলপনা,
আগমনীর অমল আলোয়
সেই গানেরই তাল শোনা,
মৃদুল ঘাসে চরের কাশে
স্বপ্ন-রঙিন জাল বোনা,
পোটোর ধাঁচে স্মৃতির আঁচে
'উদ্বোধন'-এর কাল গোনা।

নীল আকাশের প্রতিভাষে
উড়ছে মেঘের ফুলঘুড়ি,
টগর, বকুল, পারুল, হেনায়
ফুটছে নওল ফুলকুঁড়ি,
দুগ্‌গা মায়ের হাত-ভরা ঐ
শিউলি রঙের ফুলচুড়ি,
রাতের কালোয় জ্যোৎস্না আলোয়
জ্বলছে তারার ফুলঝুরি।

বোধন
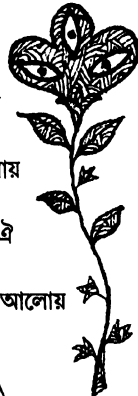
বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য

আবার শরৎ এল, বেজেছে বাজনা,
দশভুজা মা আমার তুমি তো এলে না?
তুমি রাধা, তুমি সীতা, তুমি 'জ্যান্ত দুর্গা',
তোমা-হারা হয়ে আজ এদেশ দুর্ভাগা।
হরিশদলনী মাতা, তুমি জগদ্ধাত্রী,
জগতের মাতা তুমি, তুমি পালয়িত্রী।
কালী, লক্ষ্মী, তারা, দুর্গা—কিছুই জানি না,
জানি শুধু মা তোমাকে, আর কিছু চাই না।
শারদীয়া পূজা ম্লান তোমাকে না পেয়ে,
এস মা সারদাময়ী আছি পথ চেয়ে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

মাতৃসঙ্গীত

সুদিন বিশ্বাস

মনের ভ্রমর গুঞ্জনে যে
তোরই কথা শুধু বলে
কতকাল আর থাকবি রে বল
ভুলায়ে কত মিথ্যে ছলে

মনেরই কালি আছে যত
অঙ্গে নিয়ে হলি রত
অসুরকুল নিধনে মা
নিয়ে তোরই সঙ্গিদলে।

এধরাতে আবার এসে
দাঁড়া মা তুই হাসিমুখে,
দেখে ও রূপ থাকি মজে
চাই না ও মা ভবসুখে।

আকাশের ঐ সূর্য-তারা
তারা যে তোর আঁখি-তারা
সবই দেখে তবু কেন
ভাসাও মোদের আঁখিজলে।

কেমন করে এমন হলি
বল না মা গো শ্যামা
জানতে যে মন আকুল
চুপ করে আর থাকিস না মা।

কতকাল আর এমন করে
থাকবি নিজ স্বামীর 'পরে
চেয়ে দেখ সন্তানেরে
প্রলয়-নাচন এবার থামা।

পৃথিবী অশান্ত যে
সে কি শুধু তোরই তরে?
দেখা মা আলোক-পথ
অবোধ যত নারী-নরে।

সুদিনের এই বাসনা
পূরাও মা শবাসনা,
সহে না এ যাতনা
ওগো হর-মনোরমা।

শব্দ কথা ছবি

বরুণ মজুমদার

কোন্ শব্দে জাদু আছে তা তুমি জানো না
কোন্ শব্দে তোমাকে সে কাছে ডেকে নেবে
সেটাও তোমার কাছে অজ্ঞাত এখন
মুগ্ধ করেছে তাই যাদুকর তোমাকে তবুও।

কোন্ কথা হৃদয়েতে শিহরণ তোলে
কোন্ কথা বলা হলে বেহিসাবী হয়?
হারিয়ে যাবার বেলা তবু ধরে রাখি
অতীতের স্বপ্নগুলো, রঙিন ছবিটা।

কোন্ ছবি আঁকা হলে তুমি সুখী হবে—
সেটা জানা থাকে যদি তুলিটার টানে।
ক্যানভাস হয়ে ওঠে জীবন্ত মানুষ
শীতসূর্য অস্তমিত হয়েছে এখন।

কোন্ কথা, কোন্ শব্দ, কোন্ ছবিটা
তোমার আনন্ত্যে দ্রবীভূত, বলাটা কঠিন।

সর্বময়

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সবাই আপন সবাই সুজন
কে আছে ভুবনে আপন-পর
বিশ্ব ব্যাপ্ত অখণ্ড সেই
সৃষ্টিলীলায় আমার ঘর।

একদেশী মন কূপমণ্ডুক
সে নহে আমার প্রাপ্তির সুখ
নিখিলের মাঝে অসীম সুদূর
সব ঠাঁই আছে এ অন্তর।

একে ও বহুতে সূক্ষ্ম বৃহতে
অণু-পরমাণু সর্বময়,
রয়েছে ভূমার পরশ মধুর
সেই তো সবাতে শান্তিময়।

জন্মসীমার শুধু ঋজু পথে
থাকে কি জীবন কর্ম সুমতে?
বাঁধা আছে জানি এ দেব ভূমায়
সৃষ্টি-নিখিল মহত্তর।

গৈরিক কন্যা

অজন্তা সেন

রাগে শঙ্কর হয়েছ পাথর
চিত্ত করেছ শুভ্র বরফ
হাজার তেজেও গলে না তা
আকাশ জুড়ে তুলেছ মাথা
ধ্যানে বসেছ অনন্তকাল
সূর্য চুমে পদ সকাল বিকাল
সারাদিন ধরে করে বন্দনা
ঝরে ফুল-পাতা,
ফলে বৃক্ষ নোয়ায় মাথা।

যবে হাহাকার আসে
বাতাসে ভেসে
ছুটে গৈরিক কন্যা
মর্ত্যে নেমে আসে
পরম স্নেহে আঁচলে দেয় ঢেলে
কাঁচা সোনা, মরি মরি,
শস্য-শ্যামলে সন্তানে বাঁচাতে করে
ব্যবস্থা নানা—শাকম্ভরী।

আকাশে ওঠে ভেসে পর্বতের ছায়া
নানা রং ধরে জীবে রচে মায়া
টেনে লয় কাছে পাঠায় অন্তরীক্ষে
ধ্যানে মগ্ন শিব দিতেছে দীক্ষে।

ছেড়ে ধরণীর মায়া ধাইছে জীবন
কোথা আছে আরো মানব এমন
সেথা আছে কি এমন মরণ-বাঁচন?

নানাদিক হতে এসেছে
কি বিচিত্র ভাবনা
মিলেমিশে করিছে
কি বিশ্বরচনা—
ধরণীর কোল হতে আকাশ পারে
কল্পনা গড়তে চায় আত্মীয়তা—
স্বর্গ নামে,
এই ধরণীরে
করতে চায় বন্দনা!!

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

অস্তিত্ব

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

দীঘন নিকষ অমাবস্যার রাত
স্রোতস্বিনী গঙ্গা আজ ভীষণ উত্তাল।
নিস্তব্ধ নিশ্চুপ জননগরী অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন।
শব্দভেদী বাতাস নিশুতি রাতের কোল চিরে
গঙ্গার অতলান্ত বুকের গভীর থেকে ডাক পাঠায়
মানবজীবনের অমোঘ মৃত্যুঘণ্টার।
কে যায় গঙ্গাবক্ষে বাসুকির ফণা তুলে
ভৈরবীর আগমনী গান গেয়ে?
গঙ্গাতীরের দেবালয়ের চাঁদনিতে গহন রাতে
শোনা যায় নূপুরের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে পাদচারণা।
ঘুমন্ত গঙ্গাতীর, ঝাউবন, আমলকী আর পঞ্চবটীর সমাহার
সর্প আর শ্বাপদের চলে রাতভোর পৈশাচিক আনাগোনা।
জীবনকে তুচ্ছ করে এরই মাঝে মানবকল্যাণে
ঘোর মৌন মহাযোগী যোগীবর
যোগাসনে ধ্যানমগ্ন।
হে অতীত! কথা কও।
কথা কও আর্তের আর ব্রাত্যের।

ঘরেতে রাখা আসনে বসা
ঠাকুরের সেই ধ্যানমগ্ন ছবি—
আধখোলা চোখ,
সদা হাসিমুখ,
হাতে হাত রাখা যেন ঘরজোড়া
এক বিরাট অস্তিত্ব।
আমি অনুভব করি—
আমার প্রাত্যহিক জীবনের
শক্তি আর প্রত্যয়ের
জীবন্ত প্রতীক।
ঠাকুর, তুমি আছ বলেই
রোজ যত তারা ওঠে আকাশে,
ফুল ফোটে বাগানে
নদী হাসে, সূর্য ওঠে,
অসম্ভব হয় সম্ভব।
ঠাকুর, তুমিই আমার জীবনদেবতা।
তোমারই 'কথামৃত'
পান করি চুয়ে চুয়ে
প্রতিদিন, প্রতি পলে পলে—
যতদিন বাঁচি—
আছি তোমারই চরণ ছুঁয়ে।
তোমায় প্রণাম।

হে রামকৃষ্ণমুরারি

শিশুতোষ ধাওয়া

এত যে ঐশ্বর্য সুখ চরাচর ধাম
পূর্ণ পরিজন প্রেম পূর্ণ আত্মারাম
ধায় নিত্য গরিমার আলাপ-সংলাপ
তবুও না মেটে আশ চিত্তে মনস্তাপ।

তবু শান্তিহারা হই যেন সব মিছে
দুঃখ রাশি রাশি সেথা সংসার ব্যাপিছে;
কৃষ্ণা-রাত্রি মেঘাবৃত নভ তারাহীন
খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হিয়া অতিশয় দীন।

এ-দৈন্য ঘুচাও প্রভু, আরতি তোমায়
দাস তোমা মাগে ক্ষুদ্র করুণা-সহায়,
অন্তরে জ্বলুক দীপ বহুক বাতাস
সুস্বর সুনাম গীতি—'রামকৃষ্ণ ভাষ'।

জয় রামকৃষ্ণ জয় দুঃখের কাণ্ডারি,
জয় জয় রামকৃষ্ণ, জয় হে মুরারি।

হাত পেতে আছি

অরুণ মৈত্র

জন্মাবধি হাত তো পেতে আছি—
দুপুর শেষে—আঁধার পথে নামে
কিছুই হাতে ধরতে পেলাম না
চোখের আলো নিভছে ডানে, বামে।

পথে নেমেই তোমার পরশ খুঁজি
হাতের নাগাল কাছেও আসে না
তোমায় যে চাই—এইটুকু তো পুঁজি
(তবু) তোমার প্রেমে হৃদয় ভাসে না।

তুমি যদি ডাকলে না দাও সাড়া
অনন্তকাল চোখের জলে ভাসি
তুমি যদি হাতটা না দাও মেলে
সাধ্য তো নাই তোমার কাছে আসি।

রূপেতে অরূপ

তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্ত হয়ে ভগবানে করিয়া সৃজন,
অর্পণ করিলে তাঁহে দেহ-প্রাণ-মন।

কেহ না দেখিল তাঁরে, দেখিল তোমায়,
অপূর্ব ভাবাবেগে, অপূর্ব মায়ায়।

মায়ের স্বরূপে তুমি আসিলে ধরায়,
তোমার স্বরূপে সবে দেখে মহামায়।

ভক্তি-তত্ত্ব বুঝাইতে আপনা ভুলিলে,
মাতৃরূপে দেখা দিলে মাতৃ-পরিমলে।

ভক্তিরসধারা বহি সর্ব-অঙ্গ মাঝে,
বিলাইলে সর্বধর্মে বিশ্ব-হিত-কাজে।

শতরূপে ভক্তিরস আসিয়া মিলিল,
তোমারই সে দেহমাঝে এক হয়ে গেল।

সেই দেহ খণ্ড করি জ্ঞান-অসি দিয়া,
মিলাইলে অবশেষে ব্রহ্মেতে আসিয়া।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

পূজা

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চভূতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে করিস নতি
কেন রে তুই! কার পূজাতে দেখাস আরতি?
নাচাস তারে দুইটি করে
কোন্ দেবতার মুখের 'পরে
কোন্ অজানার চরণে তুই জানাস মিনতি?
এই জীবনের বুক জ্বেলে কার গোপন প্রণতি?

লুকিয়ে করিস কার পূজা তুই নিদ্রা জাগরণে
প্রণবধ্বনির মন্ত্র গভীর বাজাস সঙ্গোপণে।
কাহার ধ্যানে দিবারাত্র
ইহকালের পুষ্পপাত্র
রোজ দুবেলা ভরিস রে তুই কুসুম-চন্দনে,
আবার গন্ধধূপ জ্বেলে দিস কাহার দরশনে।

কার খোঁজে তোর নয়ন-দুটি রাখিস পাহারাতে!
অশ্রুজলের মালাখানি গাঁথিস দিনেরাতে!
ভজন করিস ব্যথার গীতে
বিশ্ব হতে বিশ্বাতীতে
জড়ের বাঁধন যতই রে তুই কাটিস আপন হাতে
জ্ঞানের শিখা ততই কাঁপে মায়ার ঝঞ্ঝাবাতে।

তিলেক স্নেহ তোর মনে কি নাই রে সৃষ্টিছাড়া?
দেহের হবি এমনি করে জ্বালিয়ে করিস সারা?
নিত্য ভোগের পঞ্চপদে
আকুল করে সুখের মদে,
জীবনলীলার ইন্দ্রজালে নাচিয়ে নয়নতারা
নিমেষ মাঝে আবার তারে করিস সর্বহারা।

চক্ষু মেলে আজ দেখি যা, কাল দেখি আর নাই
এ কোন্ পূজার গুপ্তলীলা অন্ত নাহি পাই।
দীপালির ঐ উজ্জ্বলতার
নিচেই দেখি কী অন্ধকার!
পঞ্চোপচার সাজিয়ে যখন মুখের পানে চাই
চোখের তারা নিথর তোমার দৃষ্টিলেশও নাই।

আলোক যখন নিভবে রে আর জ্বলবে নাকো শিখা,
দুই নয়নে নিভবে আলো, নামবে যবনিকা,
তখন কি তুই সব হারিয়ে
পাবি তারে হাত বাড়িয়ে?
আঁধার শূন্যে জ্বালবি রে তোর আলোর নীহারিকা?
যজ্ঞ-চিতার ভস্মে নিজের আঁকবি রে জয়টীকা?

এই তো

ভক্তি দেবী

পথ চলে চলে ক্লান্ত পথিক একটু এখানে এস
এই গাছতলাতে বস।
ওগো, চেয়ে দেখ তোমারই মতন আরো কত-শত যাত্রী
এইখানে দিনরাত্রি
দুস্তর পথে দিশা খুঁজে খুঁজে শেষে এসে মাথা কুটে
এরই ছায়াতলে জুটে
দুঃখ-ব্যথার বোঝাটি নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।
এই গাছ তখন তাকে
শত বাহু দিয়ে পাতাকে দুলিয়ে হাওয়া দেয়—কাছে
নেয়—
অবসাদ মুছে দেয়।
তাপিত মানুষ জুড়ায় এখানে, ভুলে যায় ক্ষয়-ক্ষতি।
এই তো শরণাগতি।

দৃশ্যে তুমি নেই অথচ...

বলদেব দাস

এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষের দিন শেষ
এখন তৃতীয়পক্ষ হয়ে তুমি—
আমাদের সব অন্যায় ও অবিবেচনা নির্দ্বিধায়
তোমার রেশমী পতত্রে দিয়েছ ঢেকে।
যদিও বিক্ষুব্ধ বাতাসে ইতস্তত খসে যায়
দু-একটি পালক তার, তবু আজ পৃথিবীর
মনুষ্যকৃত সব গ্লানি তারই শীতল ছায়ায়
পেয়েছে অপার্থিব প্রশ্রয় ও মুগ্ধতা!

বৈশাখী প্রলয় শেষে রাত্রির মতো
দাঙ্গাবিধ্বস্ত রাত্রি শেষে সকালের মতো, অথবা
প্রসবযন্ত্রণাযতি সদ্যোজাতের জ্যোতির্বলয়ে উত্থিত
কান্নার মতো করুণ সান্ত অথচ প্রশান্ত
মুহূর্তের জন্য তোমার অদৃশ্য উপস্থিতি—
দৃশ্যে তুমি নেই, অথচ করুণাঘন সেই
পতত্রবিস্তারে অবিশ্বাসী হই—সাধ্য কৈ!

প্রথমপক্ষে তোমাকে মানি বা না মানি
দ্বিতীয়পক্ষে 'আমি'র সপ্রশ্ন দণ্ড অনুপলগুলি
যেন তৃতীয়পক্ষের সেই অলৌকিক শীতলতা পায়—
চৈতন্যের আশ্রয়ে প্রজ্ঞাপিত কবিকৃত্য হয়ে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

কন্যাকুমারিকা

অপূর্বসুন্দর মৈত্র

সহসা কি খুলে গেল রূপের দুয়ার?
সম্মুখে হরিৎরত্ন তরলিত অনন্ত বিস্তার
বাতাহত তরঙ্গের ফেনপুঞ্জ শুভ্র ফণা তুলি
ক্রুদ্ধ ফণীসদৃশ হিল্লোলে
সৈকতের খণ্ড কৃষ্ণ পরিকীর্ণ উপলের কোলে
ক্রমাগত আছাড়িয়া পড়িছে সরোষে,
যেন ক্রোধে গ্রাস করি' লবে
ভারতের প্রান্ত শেষ ভূখণ্ডের অখণ্ড প্রকাশ
ভূমির ভৌমিক সত্তা সলিলে রচিবে সর্বনাশ।
যতদূরে চাই
সম্মুখে দক্ষিণে বামে শুধু অম্বু, অন্য কিছু নাই,
শুধু মরকতকান্তি রৌদ্রালোকে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল,
নীলাকাশ প্রেমার্ত বিহ্বল
দিগন্তবিস্তৃত বুকে বাঁধিয়া সাগরে
শুয়ে আছে সুখাবেশে
দিগন্তের কোলে দূরদূরান্তরে।
অদূরে সলিল-মধ্যে গৈরিক মন্দির
সপ্তচূড়ে সপ্তধ্বজ পবনে অস্থির,
চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত মত্ত তরঙ্গের দোল
দুঃখাহত ধরা যেন ক্ষুব্ধ উতরোল
গর্জনে চাপল্যে তোলে বাণীহীন শব্দ প্রতিবাদ
মন্দিরের পদপ্রান্তে আক্ষিপ্ত বিষাদ।
এদিকে সাগরকূলে প্রাচীন প্রাচীর
বেষ্টন করেছে কোন্ গত শতাব্দীর
একটি প্রেমের শুভ্র শিলীভূত জ্যোতি
মর্ত্যের কুমারী-রূপে স্বর্গের পার্বতী।

নিটোল নির্মল তনু। মণিময় প্রশান্ত নয়ন,
প্রদীপের আলোকে তার তীব্র প্রজ্বলন
যেন স্থির বিদ্যুতের মতো
দর্শকের নেত্রপথে হৃদয়ের অন্ধকার
করে অপসৃত।
এক হাতে বরাভয়, এক হাতে মালা
প্রতীক্ষায় দিন যাপে বালা
কবে তার আরাধ্যের সান্নিধ্য লভিবে,
সর্বসিদ্ধ চিরবৃদ্ধ শিবে বরমাল্য পরাবে যতনে
জীবনের পূর্ব এসে উত্তরে মিশিবে সনাতনে।
একদিন যার বাণী পশ্চিমের সুপ্ত চোখে দিয়েছিল আলো
বেদান্তের মূর্তিরূপে যে-সন্ন্যাসী নিজেরে জাগাল,
দিশাহারা দুঃখাহত পৃথিবীর মাঝে
জ্ঞান-কর্মযোগ মন্ত্রে যার সত্য
আজও নিত্য বাজে—
সে-ত্যাগীর তেজোদীপ্ত বীর প্রতিচ্ছবি
ধাতুর ভাস্কর্যে হের পরাকৃতি লভি
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গধৌত গৈরিক মন্দিরে
দাঁড়ায়ে মেলেছে দৃষ্টি ভারতভূমার সত্তা ঘিরে।
তটপ্রান্তে প্রেম মায়া সংসারবন্ধন
দূরের সমুদ্রজলে বৈরাগ্যের শান্ত আবাহন।
একদিকে ভোগলিপ্সু জীবনের মাধুর্য প্রকাশ
অন্যদিকে ত্যাগমন্ত্রে নিত্যশুদ্ধ অনন্তের সঙ্গ-অভিলাষ।
ভারতের শেষপ্রান্তে সীমার ও অসীমের
লীলা-প্রহেলিকা
জীবন-সাধন সিদ্ধ কন্যাকুমারিকা।

নৈবেদ্য

উমা দে শীল

মাগো! "দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি"
লবণাক্ত জলে নৈবেদ্য সাজাই।
জীবনভরা দুঃখভোগের মন্থনে উঠেছে এই নিবেদন,
অমৃতময় হয়ে উঠুক সে-জল
তোমার মহিমায়।
আকস্মিক উপলব্ধিতে মুছে যায় বিহ্বলতা,
আমার অশ্রুবারির আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে
এক অতল পারাপারহীন সাগর হয়ে
গর্জনের দীপ্তসঙ্গীতে
তার নিরন্তর ঊর্মিমুখর প্রণামে
ধৌত করুক তোমার পদতল।

একবার অন্তত

বিশ্বজিৎ রায়

আমার এক চোখে দাহ, অন্য চোখে দিগন্ত অপার
আমাকে কোন্ সুদূর দেখাতে চাও প্রভু?

আজন্মলালিত এই আখ্যান শুধু তোমাকে দিলাম,
গন্ধ পুষ্প অপাপজলে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

গেঁথে রাখা কালো মেঘ সরিয়ে প্রস্ফুটিত কর আলো
অক্ষমতা মুছে চিহ্ন এঁকে দাও তোমার।

আমার দিনলিপি ঘর অঙ্গার করে
জেগে থাকা ডালপালা রক্তাক্ত করে—
একবার অন্তত তোমাকে ছুঁতে দাও প্রভু,
অন্তত একবার।

গুরু নানক ও শিখপন্থের মূলমন্ত্র

অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী

বর্ষীয়ান প্রাবন্ধিক অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে সম্প্রতি গুরু নানক বিষয়ে গবেষণা প্রায় শেষ করে এনেছেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বার্তা গুরু নানক যেভাবে অ-বাঙালিদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, বাঙলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ততটা নয়। কাজেই বাঙলায় গুরু নানক সম্পর্কে ভাল আলোচনার প্রয়োজন আছে। তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ এই আলোচনা, আশা করি পাঠকের জ্ঞান ও আনন্দ দুই-ই বৃদ্ধি করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রায় বলতেন : "ভক্তিগ্রন্থ তিনটি। বাঙলা ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, হিন্দি ভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ আর গুরুমুখী ভাষায় গুরু নানকের গ্রন্থসাহিব।"[১]

গুরুমুখী ভাষাকে পাঞ্জাবি ভাষার শাখা হিসাবে ধরা যেতে পারে। ঐসময়ে পাঞ্জাবে লাণ্ডা মহাজনী ভাষায় লেখার প্রচলন ছিল। গুরু নানকের বাণীও ঐ লাণ্ডা ভাষায় লেখা। ভাষাটি একটু খটমটে। সহজে পাঠোদ্ধার করা যেত না এবং অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ থাকত। একে গুরু নানকের বাণী হেঁয়ালিভাবে লেখা, তার ওপর যেন তার ভুল ব্যাখ্যা না হয়—সেজন্য তাঁর শিষ্য গুরু অঙ্গদ পুরনো লাণ্ডা মহাজনী ভাষার বর্ণমালাকে সংস্কার করে সংস্কৃতের দেবনাগরী বর্ণমালার ধাঁচে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেন। যেহেতু এই নতুন ভাষায় গুরুর মুখের বাণী লেখা হলো, সেজন্য এর নাম দেওয়া হলো 'গুরুমুখী' ভাষা।[২]

গুরুমুখী ভাষার 'শিখ' শব্দটি সংস্কৃতের 'শিষ্য' শব্দ থেকে এসেছে। অবশ্য কোন কোন গবেষক এই 'শিখ' শব্দের উৎপত্তি পালি ভাষা থেকে আনার চেষ্টা করেছেন। পালিতে এর অর্থ—'মুক্তিলাভার্থে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত'। কিন্তু 'শিষ্য' থেকে যে 'শিখ' শব্দ এসেছে, তা সর্ববাদি-সম্মত। কারণ 'শিষ্য' শব্দ 'গুরু' শব্দের পরিপূরক। আর ঐ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে যুগযুগান্তের এক জীবন্ত ধারা।

শিখ পন্থ বা শিখ পথের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের জন্ম পাঞ্জাবের তালবন্দি নামে ছোট এক গ্রামে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বেদি শ্রেণির ক্ষত্রিয় পরিবারে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর কার্তিক পূর্ণিমায়। আবার অন্য মতে, তাঁর জন্ম ১৪ এপ্রিল—বৈশাখ মাসে।[৩] জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'নানক নিরঙ্কারি'। অর্থাৎ বিশ্বমানবের সেবক নানক। তাঁর মায়ের নাম ছিল তৃপ্তা। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও কর্তব্যপরায়ণা। নানকের পিতা কালু ছিলেন ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী ও হিসাব-পরীক্ষক।

গুরু নানকের জীবন-ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের লেখাটিই বিশেষ প্রচলিত। গুরু নানকের বাল্যসঙ্গী বালা সাধুর দেওয়া তথ্য এবং গুরু নানকের কাকার কাছে পাওয়া তাঁদের কুলপুরোহিত পণ্ডিত হরিদয়ালের তৈরি জন্মকোষ্ঠী নিয়ে শুরু হয় জীবনী রচনার প্রচেষ্টা।[৪] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি অনাদৃত বা পরিত্যক্ত হয়ে ইণ্ডিয়া অফিসে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের কূটনৈতিক কারণে আর্নেস্ট ট্রাম্প নামে এক গবেষক জার্মান পাদরির ওপর এটি অনুবাদের ভার পড়ে। ট্রাম্প ঐ জীবনী ও গুরুগ্রন্থসাহিবের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন। স্পষ্টবক্তা ট্রাম্পের গবেষণায় শিখসমাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে ম্যাকাস আর্থার ম্যাকলিফ নামে এক কূটনৈতিক ইংরেজকে অনুরোধ করা হয় এই গ্রন্থদুটি আবার অনুবাদ করার জন্য। ম্যাকলিন শিখসমাজকে সন্তুষ্ট করে আরেকবার গ্রন্থ-দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।[৫]

*

প্রথম থেকেই বালক নানকের অসামান্য ধর্মানুরাগ ও প্রতিভার বিকাশ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। পাঁচবছর বয়স থেকেই নানান শাস্ত্রীয় কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। অবশ্য তাঁর দিনগুলি অলসভাবেই কাটত।

তালবন্দি গ্রামের চতুর্দিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী লোকালয় থেকে চলে আসতেন। দুটি কারণ—প্রথমত নির্জন জায়গায় সাধনা ভাল হয়, কেউ বিরক্ত করে না। দ্বিতীয়ত, বিধর্মীদের অত্যাচারের ভয়। সমস্ত জন্মবৃত্তান্তই এক মত যে, বালক নানকের সারাদিনই ঐ গহন বনে কাটত সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে। সারা ভারত পরিভ্রমণ করে সন্ন্যাসীরা ধর্মশাস্ত্রে ও দর্শনে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতেন। বালক নানক তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিতেন। পাঠশালায় শিক্ষা নেওয়ার আগেই এই সাধুসঙ্গ তাঁকে আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল।[৬]

সাতবছর বয়স হলে গোপাল নামে এক শিক্ষকের কাছে বালক নানককে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠানো হলো। পণ্ডিতমশাই পঁয়ত্রিশটি বর্ণমালা লিখে বালককে মুখস্থ করতে দিলেন। বালকের মুখ থেকে উচ্চারিত হলো

—'ওঁ সৎ গুরু প্রসাদি' অর্থাৎ সদ্‌গুরুর কৃপা। এখানে লক্ষণীয়, ঐসময়ে ওঁকারের আগে 'এক' কথাটি তিনি উচ্চারণ করেননি। এরপর বালক একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা রচনা করে শিক্ষককে অবাক করে দিলেন। গোপনে পণ্ডিতমশাই নানককে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে ফারসি শেখার জন্য কুতুবুদ্দিন মোল্লা আর সংস্কৃত শেখার জন্য বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের কাছে পাঠানো হয়। সেখানেও একই কাণ্ড করে নানক ঘরে ফিরে আসেন।[৭]

বাল্যজীবন থেকে শুরু করে গুরু নানকের ৩০-৩২ বছর বয়স পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনা বা তাঁর প্রাক্ পরিব্রাজক জীবনের ইতিহাস আমরা এই জন্মবৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাঁর নবাবের দরবারে কাজে যোগদান, বিবাহ এবং দুই সন্তানের জন্ম। এর মধ্যেই সাধুসেবা, স্নানাদি নিত্যকর্ম, দান, ভগবানের নামগুণকীর্তন কোনদিনই বন্ধ ছিল না।

সকাল হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি নদীতে স্নান করতে যেতেন। সেই নদীর ধারেই ছিল গভীর বনভূমি। এখানেও তালবন্দির জঙ্গলের মতো বহু পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সাধনার জায়গা করে নিয়েছিলেন। শৈশবের মতো গুরু নানক এখানেও ঐ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কর্মজীবনের অবসর সময়টুকু কাটাতেন। একদিন স্নানের পর তাঁকে আর পাওয়া গেল না। জন্মবৃত্তান্তে প্রকাশ—নদীতে ডুবে যাওয়ার পর স্বর্গীয় দূত এসে নানককে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। ভগবান নানককে বলেন—তিনি সর্বদাই নানকের সঙ্গে আছেন এবং নানকের মাধ্যমে জীব-উদ্ধার হবে। নানক যেন সর্বদা তাঁকে মনে রাখেন, পূজা করেন এবং তিনি যে স্বয়ং ব্রহ্ম আর নানক যে গুরু তাও ভগবান তাঁকে জানিয়ে দেন। নানক যেন পবিত্র শরীর নিয়ে জপ করেন। শোনা যায়, এইভাবে তিনদিন ভগবানের সুধারসে মগ্ন থেকে নানক পুনরায় নদী থেকে উঠে আসেন এবং পাশের জঙ্গলে একদল সাধুর সঙ্গ নেন।[৮]

এই তথ্যের ভিন্ন মতও আছে। কোন কোন গবেষক বলেন, যে-নদীতে নানক স্নান করতেন, তার পাশে একটা গুহা ছিল। তিনি স্নান করতে গিয়ে সেই গুহাতে আশ্রয় নেন, সেখানে তিনি মানুষের অগোচরে তিনদিন সমাধিতে থাকেন। সমাধি অবস্থায় তাঁর এক দৈব অনুভূতি হয় এবং মন্ত্র বা নামপ্রাপ্তির পর মন্ত্রপাঠ করতে করতে তিনি পুনরায় ঘরে ফিরে আসেন।

এইখানেই তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উদাসী হয়ে পরিব্রাজক জীবনের শুরু হয়। জানা যায়, ঐসময়ে 'জপজী' রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে। পরবর্তী কালে জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি উদাসীর বেশে পরিভ্রমণান্তে জীবনের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে রাভি নদীর তীরে কর্তারপুরে তাঁর সংসারাশ্রম গড়ে তোলেন এবং পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষদের ধর্মোপদেশ দান, 'জপজী' ও তাঁর অন্যান্য বাণী রচনার কাজ শেষ করেন। এই জপজীর প্রথমেই শোভিত শিখপন্থের মূলমন্ত্র—'এক ওঙ্কার'।

স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন গুরু নানক হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র 'ওঁকার'কে তাঁর প্রবর্তিত শিখপন্থের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন?

ওঁকার ব্রহ্মের প্রতীক। সমগ্র ত্রিভুবন সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। তিনি অদ্বৈত, স্বয়ম্ভু, নির্গুণ; আবার যখন সোপাধিক হন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ সগুণ। তাহলে গুরু নানক কোন্ প্রয়োজনে এই প্রণব বা ওঙ্কারকে নিজের পন্থের শীর্ষে স্থান দিলেন?

কারণ নিশ্চয় আছে। তৎকালীন ভারতবর্ষ, বিশেষত পাঞ্জাবপ্রদেশ ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও জাতিদ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল। একতাবদ্ধ সমাজের লক্ষ্যে সেই দুঃসময়ে শাশ্বত ভারতের মূলতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গুরু নানকই প্রথম উপলব্ধি করেন, বহুদেবতা-বাদের জায়গায় অদ্বৈত ব্রহ্মকে উপস্থাপন করে সমস্ত মানুষকে একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের বা ধর্মের সর্বোদয় ঘটবে না। সম্ভবত এই কারণেই তিনি ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের ওপর এত জোর দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী মধ্যযুগের সন্তকবিরা এই এক ঈশ্বরের ওপরও জোর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালীন পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সেগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সাধ্য হয়তো তাঁদের ছিল না।[৯]

দীর্ঘ পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গুরু নানক বুঝেছিলেন, মুসলমানরা 'প্যাগান' আরবের বহুদেবতার স্থানে তৎকালীন ঐ প্যাগানদেরই শ্রেষ্ঠ দেবতা 'আল্লা'কে এক অদ্বৈত ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হতে পেরেছে এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় বিশাল ভারতবর্ষকে প্রায় আত্মসাৎ করতে বসেছে। সুতরাং সেই একতাবদ্ধ জাতিকে প্রতিরোধ করতে গেলে জাতিদ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বিভক্ত ভারতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে। সেজন্য তিনি ভারতের জাতীয় এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্রহ্মের প্রতীক ওঁকারকে তাঁর শিখপন্থের বীজমন্ত্র বা মূলমন্ত্র হিসাবে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পরমেশ্বর নিশ্চয়ই এই মন্ত্রটি অর্থাৎ ওঁকারের পুনঃপ্রচারের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। গুরু নানক ও তাঁর রচিত বাণীতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের বাচক ওঁকার-এর মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত রামকলী রাগে দক্ষণী 'ওঁকার'-এ তিনি ওঁকারকে বিশ্বের সর্বপদার্থ, জীব ও বেদের উৎপত্তির কারণ হিসাবে স্বীকার করেছেন—"ও অংকারি ব্রহ্ম

উতপতি॥ ও অংকারি কীয়া জিতি চিতি ও অংকারি শৈল জুগভ এ॥ ও অংকারি বেদ নিয়মেএ॥ ও অংকারি সবদি উধরে॥ ও অংকারি গুরুমুখি তরে॥ ও নম অখর সুনহু বীচরু॥ ও নম অখরা ত্রিভুবন সারু॥ অর্থাৎ ওঁকার থেকে উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মার, যিনি হৃদয়ে ওঁকার ধারণ করেছিলেন। ওঁকার থেকে পর্বত ও যুগসমূহের উৎপত্তি। ওঁকার থেকে বেদের সৃষ্টি। আবার ওঁকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। গুরুমুখীজন অর্থাৎ গুরুর নিকটজন ওঁকার দিয়ে ভরে যায়। ওঁকার—এই অক্ষর শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে বিচার কর। ওঁকার—এই অক্ষর ত্রিভুবন-সার।

গুরু নানক যা যা বলেছেন তাঁর পরবর্তী গুরুরাও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তৃতীয় গুরুও 'রাগ মারুতে' বলেছেন ঃ "ও অংকারি সভ সৃষ্টি উপাই।" অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির কারণ ঐ ওঁকার।[১০] পঞ্চম গুরু অর্জুন 'রাগ মারুতে' ঐ একই কথা বলেছেন। ওঁকার অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্রহ্ম থেকে চারটি বেদ ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত বস্তু ও জীবের উৎপত্তি হয়েছে। মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে সেই এক কথাই বলা হয়েছে।

শিখপন্থের আদিগুরু নানক ও তাঁর পরবর্তী নজন গুরুর বাণী যে-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, তাকে 'শ্রীগুরু-গ্রন্থসাহিব' বলে। সেই গ্রন্থকে শিখরা সর্বাধিক সম্মান দেখান। এই ধর্মপুস্তকের বহু স্থানে সনাতন হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র ওঁকারের মাহাত্ম্য বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

এই ধর্মপুস্তকের প্রথমে আছে 'জপজীসাহিব'। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'সাহিব' কেন? সেই সময়ে 'সাহিব' কথাটি একটি বিশেষ সম্মানসূচক ছিল। 'জপজী' গুরু নানকের নিজের রচিত বাণী বা শব্দ। এটি সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সার বলে অনেকে মনে করেন এবং বাকি অংশগুলি জপজি-সাহিবের ব্যাখ্যা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

এই জপজীর প্রথমেই আছে শিখ ধর্মগ্রন্থের মূল বীজমন্ত্র—এক বা ইক ওঁকার। পরে এই মূলমন্ত্রের বিশেষণ বা সূত্র। যথা—

"সতিনামু করতা পুরুখু নিরভউ নিরবৈর
অকাল মুরতি অজুনী সৈভং গুরু প্রসাদি।"

কালাতীত কাল থেকে 'ওঁকার' ব্রহ্মের প্রতীক। আবার ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্ম বা ওঁকারের গুণবাচক। একই জিনিস যদি সংস্কৃতে বা পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা যায়, তাদের ভাষাগত কিছু পার্থক্য থাকবেই। যেমন—

(১) 'সতি নামু'—এখানে সতির ই-কার এবং নামুর উ-কার অনুচ্চারিত থাকবে। তাতে 'সত(ৎ)নাম' হলো, অর্থাৎ যে-নাম অপরিবর্তনীয়, যাঁর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। গুরু অর্জুন বলেছেন, সৎ—এই নাম তোমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অন্য সব কৃত্রিম।

(২) 'করতা' বা কর্তা। ব্রহ্মের প্রতীকরূপী ওঁকার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। যিনি সমস্ত সৃষ্টির কারণ ও প্রভু।

(৩) 'পুরুখু' অর্থাৎ পুরুষ। সমস্ত জগতে যিনি অদ্বিতীয়রূপে ও পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তিনিই পুরুষ।

(৪) 'নিরবৈর' অর্থাৎ বৈর-রহিত। পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরের কোন শত্রু থাকা সম্ভব নয়।

(৫) 'অকাল মুরতি' অর্থাৎ যে-মূর্তি কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। কাল যার অন্ত করতে পারে না।

(৬) 'অজুনী' অর্থাৎ যিনি কোন যোনি থেকে উৎপন্ন নন, যাঁর কোন জন্মদাতা নেই।

(৭) 'সৈভং' অর্থাৎ স্বয়ম্ভু। যিনি আপন থেকে আপনি জন্মেছেন।

(৮) 'গুরু প্রসাদি' অর্থাৎ গুরুপ্রসাদে বা আশীর্বাদে এই বীজমন্ত্র লাভ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, এই মন্ত্রটি শিখপন্থের ধর্মীয় মূলমন্ত্র। শিখপন্থের আদিগুরু নানক থেকে দশম গুরু গোবিন্দসিংহ পর্যন্ত সকলেই এই মন্ত্রকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সনাতন ধর্মের মূলমন্ত্র এই ওঁকারের দ্বিতীয়টি আর নেই। সুতরাং এই ওঁকার এক ও অদ্বিতীয়। শিখপন্থের এক ওঁকার পরমেশ্বরের নাম স্মরণের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুগ্রন্থের প্রতিটি বাণীর প্রারম্ভে এটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও ব্রহ্মের বাচক এই ওঁকার ধর্মের মূলমন্ত্র হিসাবে স্বীকৃত। সনাতন ধর্মের মধ্যে প্রচুর সম্প্রদায় থাকলেও প্রতিটি মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারিত না হলে কোন মন্ত্রই সিদ্ধ হয় না।[১১]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—শিখ ধর্মগ্রন্থে 'এক ওঁকার' বলা হলো কেন? কোন ধর্মপুস্তকে তো কোথাও ওঁকারের প্রথমে 'এক' কথাটি লেখা নেই। এসম্বন্ধে টীকা-কারদের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। যতগুলি শিখ ধর্মগ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার বা টীকাকার সম্প্রদায় আছেন, তাঁদের মধ্যে ফরিদকোটের পণ্ডিতবর্গের টীকা সর্ববাদিসম্মত। সেই টীকাকারগণ এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বেদে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ওঁকার উচ্চারণের অধিকার নেই। সুতরাং কি করা যায়। ওঁকারও উচ্চারণ করতে হবে অথচ বেদের আদেশ অমান্য করা যাবে না। এই বিবেচনা করে গুরু নানক ওঁকারের পূর্বে 'এক'—এই আবরণ বা পর্দা যোগ করে 'এক ওঁকার' করলেন। এই 'এক ওঙ্কার' উচ্চারণে কোন দোষ নেই। সকলেই বলতে পারে। অন্যান্য টীকাকারগণ বলেন, 'এক' কথাটি আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, আবার ঈশ্বর যে এক—সেটার ওপরও জোর বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। হিন্দুধর্মের বহু প্রচলিত কথা—"একম্ ব্রহ্ম দ্বিতীয়ঃ নাস্তি"।[১২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিখ গুরুমন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ 'ইক' বা এক ওঁকারই তাঁদের ধর্মের মূলমন্ত্র এবং তার পরবর্তী অক্ষরগুলি ব্রহ্মেরই গুণবর্ণনা বা শিখ ব্রহ্মসূত্র। প্রশ্ন করা যায়—সূত্র বলা হচ্ছে কেন?

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) 'সূত্র' সম্বন্ধে সুন্দর একটি বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন—মানবজাতির সাহিত্যে সূত্রসাহিত্য একটা অভূতপূর্ব বস্তু। বহু বিষয়কে অতি অল্প কথার মধ্যে প্রকাশ করাকে সূত্ররূপে প্রকাশ বলে। বহুবিষয়ক বহু কথাকে যখন মনে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন তা সূত্রাকারে প্রকাশ করে মনে রাখার চেষ্টা শুরু হলো। ভানুমতীকার সূত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "সূত্র হবে সংক্ষিপ্ত, সংশয়াবকাশরহিত, সার-কথাযুক্ত, অসার ও অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জিত, ভ্রমপ্রমাদমুক্ত ও সর্বপ্রকার দোষহীন।" "অর্ধমাত্রা লাঘবেন পুত্রোৎসবঃ মন্যতে" অর্থাৎ সূত্রের একটি অপ্রয়োজনীয় অক্ষর কমাতে পারলে সূত্রকারদের পুত্রোৎসবের আনন্দ হতো।[১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গুরুগ্রন্থের এই এক ওঁকারের গুণ-বর্ণনা বা সংক্ষিপ্ত বিশেষণসূচক অক্ষরগুলি সূত্রগুণান্বিত। ব্রহ্মসূত্রের মতো এটিও অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অর্থবোধ অত্যন্ত কঠিন। সম্ভবত সেজন্য ফরিদকোট টীকাকারদের ভাষ্যের প্রয়োজন হয়েছে। তাছাড়া সারা গুরুগ্রন্থে গুরু নানক সময়োপযোগী রাজনৈতিক প্রয়োজনে এমন দ্ব্যর্থভাষায় ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তাঁর প্রকৃত বক্তব্য বোঝার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। এজন্য দায়ী তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও দমননীতি। সেজন্য নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছিল এবং দেশ ও জাতির মঙ্গলার্থে গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুর বাণী বা শব্দসকলের আরো নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

এবার দেখা যাক, নানক-বর্ণিত বীজমন্ত্র ওঁকার বা এক ওঁকারের উৎস কোথায় এবং তাঁর এই মূল মন্ত্র প্রচারের পূর্বে এই ওঁকার কোথাও ব্যবহার হয়েছে কিনা?

গুরু নানকের জন্মবৃত্তান্ত অনুযায়ী, তিনি তাঁর গুরু পরমেশ্বরের কাছ থেকে ঐ মন্ত্রটি পেয়েছিলেন বিশ্বে প্রচার ও জপ করার জন্য। তাহলে 'এক ওঁকার' কি নতুন মন্ত্র, যা গুরু নানক তাঁর শিষ্য বা শিখদের জন্য প্রচার করলেন? দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার বছর আগে অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকে এই ওঁকার সনাতন হিন্দুধর্মে ব্রহ্মের প্রতীক-রূপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে এবং এককথায় 'ওঁ'ই হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ। ওঁকার আর প্রণব একার্থক।[১৪]

যোগসূত্রকার লিখেছেন ঃ "তথ্যবাচক প্রণবঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাচকই প্রণব অর্থাৎ ওঁ বললে ঈশ্বরকে বোঝায়। এখন দেখা যাক, যে-শব্দ উচ্চারণ করলে ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়, শ্রুতি ও স্মৃতিতে সেই শব্দটি কিভাবে বলা হয়েছে।

যজুর্বেদে মাধ্যমিক শাখায় (১৯।১৫) সর্বপ্রথম 'প্রণব' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়—'ওম্রতি' (২।৩)। এরপর কৃষ্ণযজুঃ প্রভৃতি শাখার সংহিতা ভাগে 'ওম্' বা প্রণব শব্দের উল্লেখ আছে। এতে জানা যাচ্ছে যে, সেই প্রাচীনতম বা স্মরণাতীত কাল থেকে ঋষিগণ ওঁকার-তত্ত্ব প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

কঠ উপনিষদ্ বলছেন ঃ সমস্ত বেদ যাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলে নির্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা যা প্রতিপাদন করে থাকে এবং সাধুগণ যে-বস্তু পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করে থাকেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলছি। 'ওম্'ই সেই পদ। (১।২।১৫) এছাড়া সমস্ত মাণ্ডুক্য উপনিষদেও ওঁকারের গুণবর্ণনা আছে। এই ওঁকারের গুণবর্ণনা বা মাহাত্ম্যবর্ণনা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে বিদ্যমান। গুরু নানক তাঁর গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্রই পুনঃপ্রচারের জন্য লাভ করেছিলেন এবং সমস্ত গুরুগ্রন্থসাহিবে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের গুণবর্ণনা।[১৫]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি এই কালাতীত বা অকাল ব্রহ্মের স্বরূপ এক ওঁকার আর সনাতন হিন্দুধর্মের ওঁকার বা প্রণব এক হয়, তাহলে ওটি প্রচারের জন্য নতুন করে গুরু নানককে নিয়োগ করার প্রয়োজন কোথায়?

কাল-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মে গ্লানির উদয় হয় এবং সেই গ্লানি মুক্ত করার জন্যই যুগে যুগে ভগবানের অবতারগণ আবির্ভূত হন। তাঁরা ধর্মকে সংস্কার করে যুগোপযোগী করেন।

গুরু নানকের জন্মের সময় পাঞ্জাবের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। বিদেশীদের অত্যাচার ও অপশাসনে এবং জোর করে অর্থাৎ 'ছলে বলে কৌশলে' ধর্মান্তরণের অপপ্রচেষ্টাতে হিন্দুধর্ম বিধ্বস্ত ও গ্লানিগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। এছাড়া সনাতন ধর্মে বিভেদ ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মের ওপর অশ্রদ্ধা, জাতিদ্বন্দ্বে ধর্মবিভাজন, বহুদেবতা থাকায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতাভক্ত মানুষে বিভেদ এবং এই সুযোগে বিধর্মীদের প্রচারে ও প্রলোভনে হিন্দুদের মধ্যে অশিক্ষিত, বেদে অধিকারবর্জিত মানুষের ধর্মান্তরণের আবহাওয়া ছিল প্রবল, বিশেষত এই পাঞ্জাবে অর্থাৎ ভারতের প্রবেশদুয়ারে। সেই সন্ধিক্ষণে একজন সংস্কারক বা গুরুর প্রয়োজন ছিল, যিনি ধর্মের গ্লানি মুক্ত করে ধর্মকে যুগোপযোগী করবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪।৭) বলা হয়েছে, যখনি ধর্মে গ্লানি দেখা যায়, তখনি তা দূর করতে বা তাকে পুনর্জীবিত করতে ভগবান আবির্ভূত হন। এই কথাকেই প্রতিধ্বনিত করেছেন ভাই গুরুদাস তাঁর কবিতার ছন্দে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাল-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মে গ্লানি স্বাভাবিকভাবে জমে উঠেছিল। মানুষ বৈদিক যুগের একতাবদ্ধ সম্পদের কথা এবং ঈশ্বরের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং ধর্মের মূলমন্ত্র ওঁকার প্রচারের ভার গুরু নানকের ওপর অর্পণ সেই স্মরণাতীত কালপ্রবাহেরই ধারা।

এবার দেখা যাক, শিখদের মূলমন্ত্রের পরবর্তী সূত্রে যে-কথাগুলি আছে, ভারতীয় সনাতন ধর্মে সেগুলি পূর্বে কোথাও ছিল কিনা?

(১) 'সতি নামু' বা সৎনাম। অর্থাৎ তিনি সত্য, তাঁর ধ্বংস বা বিনাশ হয় না। ঋগ্বেদে (১।১৬৪।৪৬) বলা হয়েছে, এক অদ্বিতীয় সত্তা—যিনি সৎনামবাচ্য, তাঁকে ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলেছেন। আসলে তিনি একক, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) বলা হয়েছে, অগ্র বা আদিতে তিনি সৎ মাত্র ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে সত্যকে পরমেশ্বর হিসাবে দেখানো হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা আছে, ঈশ্বরের যত নাম আছে—'সৎ' নামটি সর্বপ্রথমে শোভা পায়। গুরু অর্জুন তাই বলেছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (২।১৭) বলা হয়েছে—যার দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাকে তুমি সৎ বা অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম বলে জানবে।

(২) 'করতা' অর্থাৎ কর্তা—যিনি করেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (৩।১।১) বলেছেন, পরমেশ্বরই কর্তা। তিনি পুরুষ, এমনকি তিনি বিশ্বসৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন। (মনুস্মৃতি) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন, যা থেকে এই ভূতসমূহের জন্ম হয়, জীবিত অবস্থায় থাকে, আবার প্রলয়কালে লয় হয়—তিনি ব্রহ্ম বা কর্তা। উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় সূত্রে আছে—বস্তু থেকে বিশ্বের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে। তাই ব্রহ্ম হলেন কর্তা।

(৩) 'পুরুখু' অর্থাৎ পুরুষ। 'পুরুষ' শব্দটি হাজার হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বোঝায়। যাস্ক-নিরুক্তে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হয়েছে—'পুর' ধাতু থেকে। যার অর্থ সমস্ত জগতের অন্তরে যিনি পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন, তিনিই পুরুষ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৯।৩) বলা আছে—তাঁর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নেই, তাঁর তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র বা মহান আর কিছু নেই। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বপ্রকাশ। নিজ মহিমায় অবস্থিত পুরুষই এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত। মুণ্ডক উপনিষদে (২।১।১০), শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৪।৩৭) এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১১। ১৮) ঐ একই পুরুষকে আমরা দেখতে পাই। বেদের সময় থেকেই পুরুষ শব্দে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই বোঝায়।

(৪) 'নিরভউ'—পাঞ্জাবী শব্দ, অর্থাৎ নির্ভয়। অভয় ও নির্ভয় সমার্থক। পরমেশ্বর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন (৬।৮)—তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে অধিক কাউকেও দেখা যায় না। গীতাতেও (১১।৪৩) সেই একই কথা বলা আছে।

অতএব অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভয়ের কোন কারণই নেই। তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্তারূপে চিন্তা করা বহু পূর্ব থেকে হিন্দুশাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। শুধু এখানেই শেষ নয়, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা পরমেশ্বরকে ভয় করে ক্রিয়াশীল রয়েছে। তাঁর ভয়ে সিদ্ধ, বুদ্ধ, সুর, অসুর, নাগ, জীব, মানুষ—যে যার নিজের কাজ করছে। একমাত্র পরমেশ্বর নির্ভয়। কঠ উপনিষদ্ (২।৩।৩), তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২। ৮), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩।৮।৯), শ্রীমদ্ভাগবত (৪। ২৯।৩০-৪০), গুরুগ্রন্থসাহিব আসাদিবার (শ্লোক-৪)-এর মন্ত্রগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদে (২।২৭।১১) পরমেশ্বরকে 'অভয়জ্যোতি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নির্ভয় বা অভয়সূত্র বহু হাজার বছর পূর্ব থেকে হিন্দুধর্মের সূত্র হিসাবে প্রকাশিত। এটি নতুন কথা নয়।

(৫) 'নিরবৈরু' অর্থাৎ নির্বৈর। পরমেশ্বরের সঙ্গে কারো শত্রুতা থাকতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১১। ৫৫) ঐ কথাই বলা হয়েছে। কেউই তাঁর প্রিয় নয়, আবার অপ্রিয়ও নয়। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বদাই বিরাজিত। সুতরাং তাঁর সৃষ্ট জীব ও জগতের ওপর কিভাবে বৈর ভাব থাকবে? রাজা থেকে দরিদ্র পর্যন্ত সবাই তাঁর চোখে এক।

(৬) 'অকাল মুরতি' অর্থাৎ পরমেশ্বরের মূর্তি বা স্বরূপ কোন কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।১৬) বলছেন, তিনি কালকর্তা অর্থাৎ কালেরও কাল, কাল তাঁর অন্ত করতে পারে না। কঠ উপনিষদ্ (১।২।২৫) বলছেন, যে-মৃত্যু সকলকে ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাকে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করেন। সুতরাং এটি নতুন কিছু নয়।

(৮) 'অজুনী' অর্থাৎ অযোনীসম্ভব—যিনি মাতৃগর্ভ থেকে জন্মাননি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।৯) ও কঠ উপনিষদ্ (২।২।১৮) বলছেন, তাঁর জন্ম নেই, সুতরাং মৃত্যুও নেই। মনুস্মৃতিতে ব্রহ্মের আবির্ভাব স্ব-ইচ্ছাতে, মাতৃগর্ভে নয়।

(৯) 'সৈভং' অর্থাৎ স্বয়ম্ভু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬। ১৬) বলেছেন, ব্রহ্ম আপনা থেকে উদ্ভূত। মনুস্মৃতি (১। ৬) বলছেন, ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান স্বয়ম্ভু, সংসারী জীবের ন্যায় তাঁর শরীরধারণ কর্মাধীন নয়। দেবাদিদেব মহাদেবকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয়। ব্রহ্মের গুণবাচক এই শব্দটি বহু পূর্ব

থেকেই চলে আসছে। ৮নং মন্ত্রে ঈশ উপনিষদে পরমেশ্বরকে স্বয়ম্ভু বলা হয়েছে।

(১০) 'গুরুপ্রসাদ' অর্থাৎ গুরুকৃপায় লব্ধ এই মন্ত্র এবং মন্ত্রবাচ্য পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়। এটি নানকজীর মূল সূত্র। 'ওঁকার' যেমন মূলমন্ত্র, তেমনি গুরুপ্রসাদ হচ্ছে শিখধর্মের মূলসূত্র। গুরুর কৃপা ব্যতীত ঈশ্বরলাভ হতে পারে না। উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ আছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে লাভ করতে গেলে গুরুর নিকট যেতে হবে। মুণ্ডক উপনিষদ্ (১।২।১২), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।২৩), ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬। ১৪।২) এবং বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (৪।৪।১০) এই গুরুপ্রসাদ বা কৃপালাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা আছে।

(১১) 'জপু' অর্থাৎ জপ কর। গুরুমুখ হয়ে অর্থাৎ গুরুর অনুগত হয়ে জপ করতে হবে। গুরুগ্রন্থসাহিবের সব জায়গায় এই কথা বারবার বলা হয়েছে।

এই জপ নতুন কোন প্রক্রিয়া নয়। হাজার হাজার বছর আগে ঋগ্বেদে (১।১৫৬।৩) বিষ্ণুর নামজপের মহিমা ব্যক্ত (১।১৩৬।৩) হয়েছে। ব্রহ্মের প্রতীক ওঁকার বা প্রণব জপের কথা উপনিষদে সর্বত্র দেখা যায়। সনাতন ধর্মশাস্ত্রে ও পুরাণে জপমাহাত্ম্য প্রচারিত। এছাড়া গান বা সুরের সাহায্যে যা বারবার উচ্চারণ করা যায়, তাকে বলে 'কীর্তন'। গুরু নানক ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেব উভয়েই পরমেশ্বরের নামকীর্তন ভক্তিলাভ ও ঈশ্বরকৃপালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতেন।

এরপর গুরু নানক ব্রহ্ম বা সত্যের গুণগান করেছেন। তিনি বলেছেন—সত্য পূর্বেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। অর্থাৎ 'সৎ' তাঁর নাম। সনাতন ধর্মের 'ওঁ তৎ সৎ'-এর অর্থও তাই। আবার এর অর্থ ব্রহ্ম, জীবজগৎ।[১৬] বেদ-উপনিষদ্ যুগের প্রারম্ভ থেকে 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দটি প্রচলিত, যার মাধ্যমে বলা হয়েছে—হে ওঁকার প্রতীকরূপী পরমেশ্বর, তুমিই সর্বকালে সৎ অর্থাৎ সত্য।

সনাতন হিন্দুধর্মের বহু মত, বহু পথ; কিন্তু পরমেশ্বর ব্রহ্ম এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বরলাভের পথ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। তেমনি গুরু নানক তাঁর বাণী অটপদীয়ায় (৫-৯) হিন্দু-মুসলমান কলহের অবসান ও হিন্দুদের ওপর কট্টরপন্থীদের অত্যাচারের অবসানের কথা বলেছেন ঃ

"রাহ দৈবে খসমু একু জানো।
গুরুকৈ সবদি হুকুম কৃপছানু।।"[১৭]

অর্থাৎ পন্থা-দুটি পৃথক বটে (ভাষাও তাই), কিন্তু উভয়ের আরাধ্য পরমেশ্বর তো অভিন্ন, এক। তবে কেন পরস্পরকে শত্রু বলে মনে করবে? কেন পরস্পরকে মিত্র বলে মনে করবে না? একথা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভক্তিমার্গের সাধক গুরু নানক বিলাবল রাগে অষ্টপদীয়ায় (১-৬) বলেছেন ঃ

"বেদ পুকারে ভক্তি সরোতি।
শুনি শুনি মানৈ বেখৈ জ্যোতি।।"[১৮]

অর্থাৎ বেদ ভক্তিপথ প্রচার করেছেন, তা যে শোনে বা গ্রহণ করে, সে জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন পায়।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার তাঁর 'শ্রীজপজী সাহিব'-এর (পৃঃ ১২) আলোচনায় লিখেছেন—বীজমন্ত্রে গুরু নানক পরমেশ্বরের যে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, সেটি বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তা বৈদিক শাস্ত্রের বিশেষত বেদের উপনিষদ্ ভাগে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন।

গুরু নানকের মতো আমরা কেন বলব না, মূল যখন এক, বীজ (মন্ত্র) যখন এক, তখন ডাল, পাতা, ফল তো একই হবে। তবে কেন মানুষ পরস্পরকে মিত্র বা ভাই বলে মনে করতে পারবে না? ❑

১। উপদেশ সংগ্রহ—অমৃতলাল সেন, পৃঃ ১০৬
২। History of the Sikh—Hariram Gupta, U. C. Kepmi, July 1973, p. 82
৩। Ibid., p. 37 এবং শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী (বাঙলা অনুবাদ)—অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ২য় সং, পৃঃ ১০
৪। ঐ, পৃঃ ১১ এবং ADI GRANTHA—Dr. E. Trumpp, 1989, p. XLVII
৫। The Sikh Religion—M. A. Macliffe, Vol. 1, 1963, Preface, p. VII
৬। Ibid., p. 10
৭। শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী, পৃঃ ১২
৮। ঐ, পৃঃ ১৫ এবং History of the Sikh, p. 38
৯। The Sikh Religion, Introduction, Preface, pp. XLI-XLIX
১০। শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী, জপজী, পৃঃ ১৩
১১। বিশ্বকোষ, পৃঃ ৫৪৫-৫৫১
১২। ফরিদকোটিওয়ালী টীকা (পাঞ্জাবী), পৃঃ ১ এবং শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী, পৃঃ ১৬
১৩। 'শ্রীচরণ মণ্ডল-প্রমীলাবালা মণ্ডল স্মারক বক্তৃতামালা'—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ১৯৮১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪। বিশ্বকোষ, পৃঃ ৫৪৫-৫৬০
১৫। শ্রীগুরুগ্রন্থসাহিবজী, পৃঃ ১৪-১৮
১৬। বেদবিবিত্তম—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃঃ ২৯৭
১৭। নানকগাথা—যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নানক ফাউণ্ডেশন, নভেম্বর ১৯৬৯, পৃঃ ১৬
১৮। ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩

সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার এবং বৈদিক সভ্যতা

স্বামী মুখ্যানন্দ*

গত ৪ নভেম্বর ২০০০ 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় 'হরপ্পার রহস্যের মর্মোদ্ধার' শিরোনামে সারদ কে. মনির একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ধনপান (ধনপত) সিং ধানিয়া কর্তৃক হরপ্পীয় (সিন্ধু সভ্যতা) শিলালিপির পাঠোদ্ধারের দাবি সম্বন্ধে একটি বিবরণী দেওয়া হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র খনন এবং আবিষ্কার বিভাগের নির্দেশক ডঃ আর. এস. বিস্ত বলেছেন ঃ "হরপ্পীয় শিলালিপির মতো এত জটিল হরফের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়ে গেছে বলে শুধুমাত্র দাবি করলেই তো চলবে না; তার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে হবে এবং একমাত্র তখনি সেই দাবি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।" ধানিয়া এক অদ্ভুত যুক্তি সহযোগে দাবি করেছেন ঃ "সিন্ধুনদের উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষ 'ভান' ভাষায় কথাবার্তা বলত, যাকে নাকি সংস্কৃত ভাষার উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। সারা বিশ্বে আমিই একমাত্র ব্যক্তি—যে সেই ভাষা পড়তে, লিখতে এবং সেই ভাষায় কথা বলতে সক্ষম।" ধানিয়া প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "যেহেতু পৃথিবীতে কেউই সিন্ধু উপত্যকার সেই ভাষাটির সঙ্গে পরিচিত নন, অতএব আমার এই দাবির সত্যাসত্য যাচাই করার মতো যোগ্য মানুষ কোথায়?"

ভিত্তিহীন যেকোন একটি দাবি পেশ করার এটি এক অদ্ভুত চতুর উপায়। তাঁর এই দাবির অসারতা খুবই সুস্পষ্ট, কারণ যদি কেউ কোন অনাবিষ্কৃত প্রাচীন হরফের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন, তবে অতি অবশ্যই তাঁকে সেই পাঠোদ্ধার প্রণালীর অন্তর্নিহিত কৌশলটি প্রকাশ করতে হবে। অতি সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে ঐ সঙ্কেত-লিপিগুলির বিভিন্ন হরফ, প্রতীকের চরিত্রগত ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন শব্দের গঠনরীতি এবং তার পাঠোদ্ধারের প্রক্রিয়াটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে—যাতে যেকোন উৎসাহী ব্যক্তিই তৎকালে প্রচলিত মুদ্রাগুলির ওপর খোদিত লিপির অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। বস্তুত, ঐ লিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে কোনরকম কল্পনার স্থান থাকতে পারে না। সেই কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্য নিতে হবে, প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য থাকলে তার রহস্য উন্মোচন করতে হবে, যথেষ্ট সংখ্যক উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপিত বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে এবং ঐ মুদ্রাগুলির সঠিক অর্থ উদ্ধারের প্রয়োজনীয় নমুনা পেশ করে সেই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বোপরি সমস্ত পদ্ধতিটিকে হতে হবে নিয়মানুগ এবং সুসম্বদ্ধ। এসম্বন্ধীয় পূর্বের সকলপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টার যথাযথ মূল্যায়ন, সেগুলির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের দিকগুলির উল্লেখ এবং সেগুলির মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি কোথায় ছিল, তাও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এই রচনাটির মধ্যে আরো বেশ কিছু তথ্যগত ত্রুটি এবং অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঃ (ক) বলা হয়েছে, এযাবৎ আবিষ্কৃত মুদ্রার সংখ্যা ২,৫০০; কিন্তু আসলে সেই সংখ্যাটি প্রায় ৪,০০০। (খ) অশ্রুত 'ভান' ভাষাটি যে সংস্কৃত ভাষার উৎসস্বরূপ—এই তথ্যটি সম্বন্ধে মিঃ ধানিয়া কিভাবে স্থিরনিশ্চিত হলেন, সেবিষয়টিও পরিষ্কার নয় এবং ঐ মুদ্রাগুলি যে 'ভান' হরফে লিখিত, সেটিও বোধকরি একটি অলীক অনুমানমাত্র। (গ) প্রাচীন লিপি 'ব্রাহ্মী' এবং 'খারোস্ঠী'কে যথাক্রমে 'ব্রাহ্মা' এবং 'খ্রাস্তো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (ঘ) ঐ মুদ্রাগুলির লিপি যে সংস্কৃত ও তামিল ভাষার সংমিশ্রিত রূপ—এবিষয়টি সম্বন্ধে ডঃ নটবর ঝা (অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ফরাক্কা) কোথাও কোন উল্লেখ করেননি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, এটি হলো বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। মহাদেবন—যাঁকে এখানে 'মাধবন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি তাঁর 'The Indus Script: Texts, Concordance & Tables' (আর্কিও-লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৭৭) শীর্ষক গ্রন্থে কোথাও ঐ মুদ্রাগুলির ভাষা সম্বন্ধে কোনকিছুই ইঙ্গিত দেননি। পরন্তু তিনি বলেছেন ঃ "সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার পর্বের সমস্যাগুলি বর্তমান কাজের পরিধিভুক্ত নয়।"

এই তথ্যগুলি ধানিয়ার যাবতীয় দাবি নস্যাৎ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। সোনি অথবা ধানিয়া বোধকরি কেউই (১) 'Indus Script Deciphered'-এর রচয়িতা (আগাম কলা প্রকাশন, নিউ দিল্লি, ১৯৮২) এস. ভি. কৃষ্ণরাও এবং পৃথিবীর অন্যতম

* বেলুড় মঠের বিদগ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী, একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

অগ্রণী প্রত্নতত্ত্ববিদ্, বিখ্যাত লোথাল পোতাশ্রয়টির আবিষ্কারক ও 'The Decipherment of the Indus Script'-এর রচয়িতা (এশিয়া পাবলিশিং, মুম্বাই, ১৯৮২) ডঃ এস. আর. রাওয়ের হরপ্পীয় এবং সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার সংক্রান্ত উপরি উক্ত সাম্প্রতিকতম কর্মযজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত নন। তাঁদের কাজের অগ্রগতি থেকে এটুকু অন্তত সুস্পষ্ট যে, সেই কর্মধারা আপাত সুসম্বদ্ধ এবং সন্তোষজনক না হলেও তার গতি সঠিক পথেই পরিচালিত। ১৬ মার্চ ১৯৮১ তারিখে মুম্বাই থেকে

চিত্র—১

প্রকাশিত 'The Bhavan's Journal'-এ প্রভূত উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা-সম্বলিত ডঃ এস. আর. রাওয়ের 'Indus Script Deciphered' রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকার সম্পাদক এই রচনাটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন: "এই অনন্য রচনাটির মাধ্যমে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভারতীয় ইতিহাস নতুন করে পর্যালোচনার ওপর। তিনি বলেছেন, সিন্ধুনদের সভ্যতার ওপর দ্রাবিড়ীয় প্রভাব এবং আর্যগণের আক্রমণের ফলে তার ধ্বংসপ্রাপ্তির ধারণাটির প্রতি পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরাই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'দক্ষিণ প্রদেশীয়' এবং 'উত্তর প্রদেশীয়' মানুষের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপন করে তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।"

বস্তুত, ডেভিড ফ্রলি, সুভাষ কাক, ডঃ এন. এস. রাজারাম, শ্রীকান্ত তালাগেরি, জিম শেফার, ভগবান সিং প্রমুখ বেশ কয়েকজন ব্যক্তির অতি সাম্প্রতিক ব্যাপক এবং প্রামাণিক গবেষণার ফলস্বরূপ 'আর্য-আক্রমণ' সংক্রান্ত ঐ পৌরাণিক ধারণাটি চিরতরে অবলুপ্তির পথে। কিছু অজ্ঞ এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিই আজ ঐধারণাটি আঁকড়ে ধরে আছেন। বেশ কিছু গবেষক অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন, যে-তামিলভাষা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে পুঁথিগত ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্যভাবে 'ব্রাহ্মী' হরফের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তার সঙ্গে প্রাচীন সিন্ধুনদের শিলালিপির কোন সম্পর্কই নেই। এই সত্যটি আজ গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোনরকম আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়—বৈদিক যুগের মানুষ স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে, তুরস্কে, এমনকি ইউরোপেরও নানা স্থানে দলে দলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পুরাণশাস্ত্রের অগ্রণী ছাত্র এফ. ই. পারগিটার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি রচনায় এই মত প্রকাশ করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে বহুসংখ্যক মানুষের বহির্গমন ঘটতে থাকে।
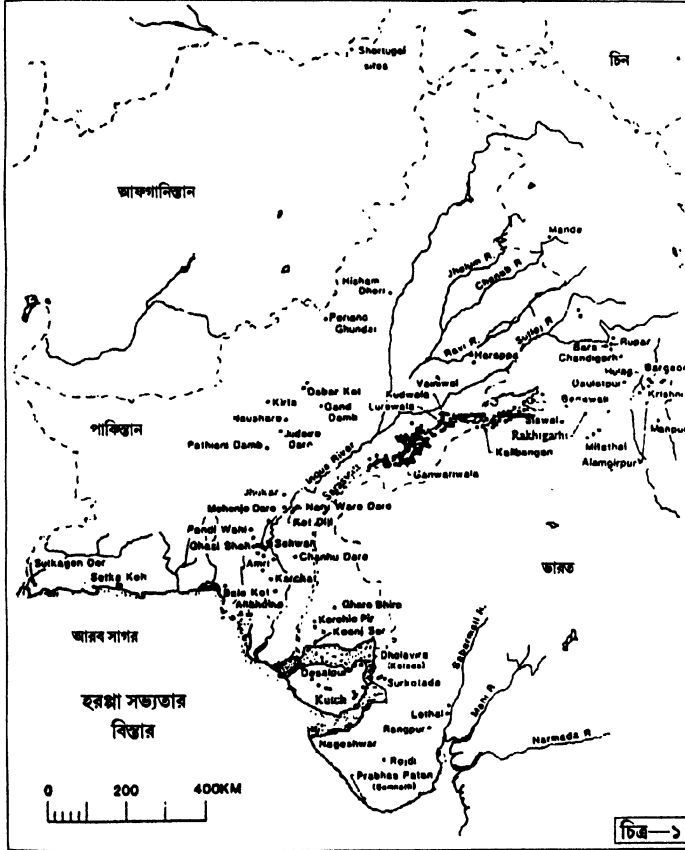
আর্য-আক্রমণের এই তত্ত্বটি সংস্কৃত এবং ইন্দো-ইউরোপীয়ান (আর্য) ভাষার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থেকে পরিকল্পিত এবং মিশনারি ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত। এবিষয়ে কোনরকম পুঁথিগত অথবা প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই ধারণাটির যখন প্রচার ঘটে, তখন শুধু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার কথাই মানুষ জানত। কিন্তু বর্তমানে একদিকে ইরানের সীমান্তরেখা থেকে শুরু করে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত এবং

অপরদিকে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রের গোদাবরী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে প্রায় একহাজারেরও বেশি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এগুলির মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো গুজরাটের লোথার এবং ধোলাভিরার অতি আধুনিক বন্দর অঞ্চল এবং রংপুর, কালিবানগান, কুনাল ও আরো বেশ কিছু স্থান।

চিত্র—২
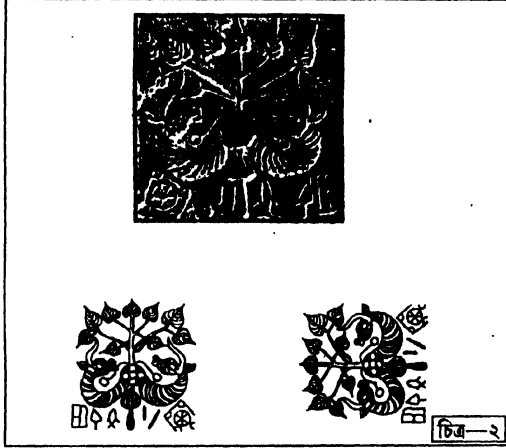
সিন্ধু শিলালিপিতে ওঁকার মুদ্রা

মহাশক্তিশালী বৈদিক নদী সরস্বতীর সুবিস্তৃত শুষ্ক বেলাভূমি এবং তার গতিপথসমূহ পুনরাবিষ্কারের ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শুধু বেদসমূহের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য আহরণের ক্ষেত্রেই নয়, এই আবিষ্কার বৈদিক যুগের কালনিরূপণের ক্ষেত্রেও এক মহামূল্যবান পথনির্দেশক। কারণ, তা আমাদের প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের সন্ধান দেয়। সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রাপ্ত নিদর্শনের সংখ্যার চেয়ে সরস্বতী নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত এজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সেগুলি একইসঙ্গে প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের (চিত্র-১)। ঐ নদীর তীর ধরে হরিয়ানা, রাজস্থান এবং কারনাল, জিণ্ড, সোমজাত, রোহটক, ভিওয়ানি, মহেন্দ্রগড়, গুরগাঁও, হিসার, কপূরথালা, হনুমানগড় প্রভৃতি বহু স্থানে অসংখ্য প্রাচীন জনবসতির সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। বৈদিক মতানুসারে, ঠিক এই স্থানগুলিতেই বৈদিক সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। আরো বড় কথা হলো, এসব অঞ্চলের বহু স্থানে বৈদিক বলিকাঠের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এই পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে অতীতের যাবতীয় কর্মোদ্যোগের যথাযথ মূল্যায়ন ও সেই গবেষণালব্ধ ইতিবাচক দিকগুলির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত বেদবিশেষজ্ঞ ও প্রাচীন হস্তলিপিবিদ্ ডঃ নটবর ঝা এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বিজ্ঞান-গবেষক বিজ্ঞানী ডঃ এন. এস. রাজমের লেখা অসংখ্য উদাহরণ, তথ্য ও বিশ্লেষণনির্ভর অতি সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'The Deciphered Indus Script'-এ (প্রকাশক—আদিত্য প্রকাশন, নতুন দিল্লি)।

'বিদ্ধি মাম্ বৃষমুত্তমম্'
(মহান বৃষরূপে আমাকে জান)

'একশৃঙ্গ... দিব্যদর্শন'

'ত্রিককুট তেন বিখ্যাতা'
(তিনটি শারীর অঙ্গের দ্বারা পরিচিত)

চিত্র—৩

সিন্ধু শিলালিপিতে ভগবান বিষ্ণুর নানা প্রতীক

বৈদিক যুগের প্রাচীন ইতিহাস, এযাবৎ আবিষ্কৃত অসংখ্য মুদ্রা ও সিন্ধুনদের শিলালিপি এবং বৈদিক যুগের সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে উক্ত দুজনেরই অনেক গ্রন্থ ও রচনা আছে। এঁদের সাম্প্রতিক গ্রন্থটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত এবং এই বিশেষ বিষয়টির সকল বিভাগের এক সামগ্রিক গবেষণাস্বরূপ। এই গ্রন্থে সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের আলোচনা, সেগুলির উত্তরদান এবং ঐ পাঠোদ্ধারের একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে—যার সাহায্যে সংস্কৃত ও বৈদিক সাহিত্যে পর্যাপ্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ যেকোন ব্যক্তিই ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হবেন। গ্রন্থকারদ্বয় ঐ পাঠোদ্ধার প্রক্রিয়ায় অতীতের সকল প্রচেষ্টা এবং তার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের দিকগুলি

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে শব্দ এবং বাক্যরচনাপদ্ধতি প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারী।

প্রথম বিভাগ	[illegible]	
	[illegible]	অপঃ
	[illegible]	অগ্নিঃ
	[illegible]	অর্যমা
দ্বিতীয় বিভাগ	[illegible]	
	[illegible]	রুদ্রঃ
	[illegible]	ঈশ্বরঃ
	[illegible]	ইন্দুঃ
তৃতীয় বিভাগ	বিবিধ	
	[illegible]	মৃত্যুঃ
	[illegible]	যম
	[illegible]	কর্তাঃ
	[illegible]	ভরিত্
	[illegible]	দশরাত্র
	[illegible]	এর্কাপ্ত বেশ্মো

চিত্র—৫

সিন্ধুসভ্যতার শিলালিপির অনাবৃত্তিকরণের উদাহরণ

এটি সম্ভব হয়েছে কারণ, সৌভাগ্যবশত প্রাচীন মহাভারত অধ্যয়নকালে ডঃ ঝা উদ্ধার করেন কিভাবে প্রাচীন বৈদিক শব্দপ্রকরণবিদ্ 'যাস্ক' অবলুপ্ত প্রাচীন লিপি বা তার বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন এবং কাশ্যপ কর্তৃক রচিত প্রাচীনতর একটি গ্রন্থ 'নিঘনতুকপদক্ষয়ণ'-এর সাহায্য নিয়ে তিনি প্রাচীন বৈদিক শব্দ ও তার অর্থ-সম্বলিত 'নিরুক্ত' শীর্ষক সঙ্কলনগ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে সেটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। ডঃ ঝা এটিও লক্ষ্য করেছেন, মহাভারতের কয়েকটি শ্লোকে বিধৃত বর্ণনাসমূহ এবং প্রতীকাদির সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সিন্ধু-নদের তিনটি শিলালিপির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। এই দুটি তথ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঐ শিলালিপি-গুলির হরফ ছিল বৈদিক সংস্কৃত।

এপর্যন্ত সিন্ধুসভ্যতার প্রায় ৪,০০০ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ লেখকদ্বয় সেগুলির প্রায় অর্ধেকের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্য যে বর্ণমালা, আনুষঙ্গিক সঙ্কেতচিহ্ন ও প্রতীকের সন্ধান দিয়েছেন এবং ঐ পাঠোদ্ধারের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন, তার সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত ও বৈদিক সাহিত্যে অভিজ্ঞ যেকোন ব্যক্তিই ঐ পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।

এই পাঠোদ্ধারের সত্যতার সমর্থনে লক্ষ্য করা যায়, বেশ কিছু শিলালিপির 'নিরুক্ত' এবং 'নিঘনতু' থেকে প্রাপ্ত শব্দের উল্লেখ আছে। (উক্ত গ্রন্থে এমন শতাধিক শব্দের নমুনা দেওয়া হয়েছে।) বোঝার এবং আয়ত্ত করার সুবিধার জন্য এগুলি ছাড়াও এই শিলালিপিগুলির আরো অনেক হ্রস্ব ও দীর্ঘ হরফ অতি সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, এটিই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ যা হরপ্পা/সিন্ধুনদের সভ্যতার শিলালিপির রহস্য অতি সন্তোষজনকভাবে উদ্ঘাটন করেছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার আগে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় বিশ্ব প্রত্নতাত্ত্বিক কংগ্রেস'-এ ডঃ ঝা বৈদিক ও হস্তলিপি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর জ্ঞানগর্ভ গবেষণা এবং মহাভারত থেকে আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের ওপর ভিত্তি করে সিন্ধুনদের শিলালিপির পাঠোদ্ধার বিষয়ক একটি গবেষণামূলক রচনা পেশ করেন। এবিষয়ে তিনি হিন্দিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'Vedic Glossary on Indus Seals' (প্রকাশক—গঙ্গা-কাবেরী পাবলিশিং হাউস, বারাণসী) শিরোনামে প্রামাণিক ও তথ্যভিত্তিক অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু সারগর্ভ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর এবার তিনি বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ডঃ রাজারামের সঙ্গে যুগ্মভাবে উচ্চ মানের গ্রন্থ-বিবরণী ও নির্দেশিকা-সম্বলিত অতি বিশদভাবে বর্ণিত এই গ্রন্থটি উপহার দিলেন।

এই বিশেষ গ্রন্থটি ছাড়াও ডঃ রাজারামের 'From Sarasvati River to the Indus Script (A Scientific Journey into the Origins of the Vedic Age)' (প্রকাশক—মিত্র মধ্যমা, ব্যাঙ্গালোর) গ্রন্থ, এম. ভি. রাও, ডঃ এস. আর. রাও ও অন্যান্যদের রচিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি এবং ভগবান সিংয়ের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'The Vedic Harappans' গ্রন্থটি (প্রকাশক—আদিত্য প্রকাশন, নতুন দিল্লি) অতি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, সিন্ধুনদের শিলালিপির ভাষা বৈদিক সংস্কৃত এবং হরপ্পার সভ্যতা হলো বৈদিক সভ্যতারই পরবর্তী ধারা। ডঃ আর. এস. বিস্তের তত্ত্বাবধানে কচ্ছের রাণের কাছে হরপ্পীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র 'ধোলাভিরা'র আবিষ্কার খ্রিস্টপূর্ব ৩,৫০০ অব্দের এক সুপরিকল্পিত নগরীর সন্ধান দেয়। বিস্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সরস্বতী নদীকে কেন্দ্র করে বৈদিক আর্যগণই হরপ্পা সভ্যতার সূচনা করেন।

যে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি প্রমাণ করছে, হরপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই একটি ধারাবাহিক প্রবাহস্বরূপ এবং মুদ্রাগুলির হরফ হলো বৈদিক সংস্কৃত—সেগুলির অতি উল্লেখযোগ্য ও অভিনন্দনযোগ্য অবদান হলো হরপ্পা

সভ্যতার একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রকাশ তথা বৈদিক যুগের আর্যগণের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের উদ্ঘাটন। এপ্রসঙ্গে লেখকদ্বয় 'Frawley's Paradox' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন—

"নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে, বৈদিক যুগের আর্যগণের অবদান সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রাচীন নিদর্শনের বৃহত্তম অংশ। শুধু আয়তনের বিচারেই সেগুলি বেশ কয়েক যুগ প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতার সমবেত সাহিত্যসৃষ্টিকে অতিক্রম করে যায়। তবুও ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই সুবিশাল সাহিত্যের স্রষ্টাগণের অথবা তাঁদের আগ্রাসী প্রচেষ্টার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অথবা ভৌগোলিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরদিকে হরপ্পা সভ্যতা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলিও প্রাচীনকালে খুব সুবিস্তৃত ছিল, কিন্তু তার কোন সাহিত্যমূল্য নেই। এই ঘটনা একটি ধাঁধার মতো, যাকে বলা যেতে পারে—'Frawley's Paradox' (ফ্রলির ধাঁধা)। তার মধ্যে একইসঙ্গে পাওয়া যায় শিক্ষিত হরপ্পীয়দের সাহিত্যমূল্য-রহিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং এক বিশাল সাহিত্য—যেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত বৈদিক যুগের আর্যগণের (যাঁদের বলা হয় যাযাবরজাতীয় অনুপ্রবেশকারী) ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক অথবা ভৌগোলিক পরিচয়। এই জটিল ধাঁধা থেকে মুক্ত হওয়ার সহজতম উপায় হলো প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক এই অবদানের কৃতিত্ব একই মানবগোষ্ঠীর ওপর আরোপ করা। তাঁরা হলেন বৈদিক আর্যগণ—যাঁরা যুগপৎ বেদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে, আমরা যাদের হরপ্পীয় বলি, তাদের সকল জাগতিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।"

লক্ষণীয় বিষয় হলো, দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বেদসমূহ পরিপূর্ণভাবে ইতিবাচক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেগুলি যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক—সকলপ্রকার উন্নতির পথ প্রদর্শন করে। এসম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। এটি এই মত পোষণ করে যে, উভয়ই সেই এক ও পরম সত্যের দুটি ধারা। পরন্তু বৈদিক এবং হরপ্পীয়—এই দুই যুগ একে অপরের পরিপূরক ও অবিচ্ছিন্ন; আর আর্য-আক্রমণের বিষয়টি একটি অপ্রমাণিত, বিচ্ছিন্ন ও অবাস্তব কাহিনী-মাত্র। বোধ করি সেই কারণেই মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মতো অবলুপ্ত না হয়ে বৈদিক সভ্যতা আজও নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও তার ধারাবাহিক অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে।* ❑

---

* 'বেদান্ত কেশরী' মে ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত মুল ইংরেজি লেখাটি বাঙলায় ভাষান্তর করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গ্রাহকদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, **পত্রিকা সময়মতো না পেলে** পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ডাকে না পেলে বা হারিয়ে গেলে অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

বাংলার ধর্ম, লোকধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শান্তি সিংহ

বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবু আরো কিছু না বলা থেকেই গেছে। লোকসংস্কৃতি-গবেষক শান্তি সিংহ পুরুলিয়ায় বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার সুবাদে ঐ জেলার তথা সামগ্রিকভাবে বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশ গ্রামবাংলার লোকায়ত জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, হচ্ছেন। প্রবন্ধকার সে-প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

।।এক।।

একদা যাযাবর আর্যরা দুরন্ত প্রাণবেগে উত্তর ভারত থেকে পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হলে ছোটনাগপুর ও বঙ্গভূমির আদি-অধিবাসীদের সঙ্গে প্রবল সঙ্ঘাতের মুখোমুখি হয়। অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australiod) মানুষদের তারা 'অন্যব্রত' এবং 'অনার্য' নামে অভিহিত করে। অথচ বিজিত ও কৃষিজীবী আদি-অস্ত্রালদের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শে ঘটে জীবনচর্যা ও সংস্কৃতিভাবনায় আশ্চর্য সমন্বয়।

বৈদিক দেবতা রুদ্র, সূর্য, অর্যমা, বরুণ প্রমুখ কালের বিবর্তনে বাংলার জনজীবনে ঘরোয়া দেবতা-রূপে পূজিত। তাই তেজস্বান রুদ্রের রূপান্তর কৃষক-শিবে। কৃষক-বধূ হিসাবে দেবী পার্বতী স্বামীকে চাষে মনোযোগী হতে বলেন। বিশ্বকর্মার সহযোগিতায় বৃষবাহন শিব ত্রিশূল থেকে তৈরি করেন চাষের যন্ত্রপাতি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে আছে—

"বিশাই (বিশ্বকর্মা) বুঝিয়া কার্য কৈল সমাধান।
লাঙল-জোয়াল-ফাল করিল নির্মাণ।"

লক্ষণীয়, সুমহান রুদ্র থেকে ধ্যানগম্ভীর কৈলাসাধিপতি বাঙালির কাছে ঢিলেঢালা ঘরোয়া মানুষ হয়েছেন। যোগিরাজ শিব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন ঃ "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[১]

বাংলার রাঢ় অঞ্চলে দৈবী শিলাস্তূপ, যা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম এবং শৈবচেতনারও অনুসারী—সেখানে চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় গাজনে লোকায়ত শিব অনেক জায়গায় হয়েছেন 'ধর্মঠাকুর'। শুধু কি তাই? সূর্যপূজা মিশে গেছে ধর্মঠাকুরের পূজায়। ধর্মপূজার বিধানে আছে—"শূন্যদেবং দিবাকরম্"। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে—"সূর্য ও ধর্মপূজা অভিন্ন।"[২]

সূর্য আবার উর্বরতাবৃদ্ধির দেবতা (Fertility God)। অনাবৃষ্টির প্রতিকারে পূজা-অর্চার মধ্য দিয়ে বরুণদেবকে অর্থাৎ পর্জন্যদেবতার আবাহন। ধর্মপূজায় 'কামিন্যা আনয়ন' অনুষ্ঠানে বৃষ্টি-আবাহনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে একটানা খরা চললে শিবের মাথায় এবং ধর্মশিলায় জল ঢেলে বৃষ্টির প্রার্থনা লোকবিশ্বাসের ধর্মীয় প্রকাশ।

বাঁকুড়ার সুপ্রাচীন বহুলাড়ার মন্দির। ● *আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই*

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে সূর্যদেবতার প্রতীক অশ্ব। ঋষি-কবিদের কল্পনায় সূর্যদেব সপ্তাশ্ববাহিত। তাঁর আলোর মাঝে আছে সাতটি রং। সেই সাতরঙের মিলনে সপ্তাশ্বের কল্পনা! শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য বসন্তরঞ্জন রায় ছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির আবিষ্কারক-গবেষক। তাঁর খুড়তুতো ভাই হলেন চিত্রশিল্পী যামিনী রায়। তাঁদের জন্মস্থান হিসাবে শ্রুতকীর্তি বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রাম। সেই গ্রামে লোকায়ত জীবনের পটশিল্প ও ধর্মরাজের গাজন আজও সুবিদিত। লক্ষণীয়, বেলেতোড়ের ধর্মরাজের গাজনে স্নানযাত্রা পর্বে বৃহদাকার কাঠের ঘোড়া ধর্মীয় প্রথায় মান্য করা হয়। অশ্বারূঢ় ধর্মরাজের পূজায় আছে সূর্যপূজার ইঙ্গিত। দ্রুতগামী অশ্ব সূর্যদেবতার প্রতীক হিসাবে পৃথিবীর বহু স্থানে মান্য—"Through its swiftness, strength and activity, it was itself a symbol of the Sun."[৩]

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

সৌরমণ্ডল ও তার সম্পৃক্ত পৃথিবীর অপার সৃষ্টিরহস্যে আর্যরা বিমুগ্ধ চিত্তে রচনা করেছেন অনেক স্তোত্র। সেইসব বন্দনাগীতে সৃষ্টিরহস্যের ধ্বংসাত্মক রূপের গভীরে আছে সদর্থক প্রার্থনা সঙ্গীত। অথচ তথাকথিত অনার্য—যারা ভারতের আদি অধিবাসী, তাদের চেতনায় ঝড়বৃষ্টি, খরা-বন্যা, মড়ক-মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্নিরীক্ষ্য শক্তির ধ্বংসাত্মক দিকের প্রতি ভয়সঞ্জাত ভক্তি জেগেছে অধিক। তাই বাঘ, সাপ প্রভৃতি জীবজন্তুর আক্রমণে অসহায় মানুষ আধিভৌতিক শক্তির তুষ্টির জন্য ব্যাঘ্রদেবতা, সর্পদেবতা থেকে আধিদৈবিক শক্তিসম্ভূতা শীতলা দেবী, ষষ্ঠী দেবী প্রমুখের পূজাও করেছে।

বাঁকুড়ার পাঁচালের রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ ● *আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই*

প্রাগ্‌বৈদিক হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর যুগেও ছিল মাতৃকাপূজার (Cult of Mother Goddess) রীতি। 'গৃহ্যসূত্র'-এ নাগপঞ্চমীর পূজায় জীবিত সর্পপূজার ইঙ্গিত রয়েছে। সেই পূজাভাবনা কালক্রমে মনসাগাছের পূজার সঙ্গে মিশে গেছে। অথর্ববেদে বিষনাশিনী ঘৃতাচীর কথা আছে। মহাযানী বৌদ্ধরা বৈদিক ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে জাঙ্গুলীদেবীর উপাসনা শুরু করেন। সেই জাঙ্গুলীদেবী কালক্রমে সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিতা।

মনসাদেবীর পূজায় আবার উর্বরতাবাদ (Fertility Cult) মিশে গেছে। বিস্তীর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় জ্যৈষ্ঠমাসের 'দশহরা'র দিন এবং শ্রাবণ সংক্রান্তি ও আশ্বিন সংক্রান্তিতে বিশেষভাবে মনসাপূজা হয়। আশ্বিন সংক্রান্তির আঞ্চলিক নাম—'ডাক সংক্রান্তি'। ঐদিন মনসাপূজা যেমন হয়, তেমনি কৃষিভিত্তিক লোকজীবনে বিশেষ লোকায়ত বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে 'গর্ভবতী' ধানের চারাগুচ্ছকে অর্থাৎ 'থোড়-জাগা' ফুলন্ত ধানগাছদের স্ত্রী-আচারের মাঙ্গলিক রীতি অনুসারে 'সাধভক্ষণ' করানো হয়। লক্ষণীয়, তার পূর্ববর্তী নাগপঞ্চমীর দিনে সর্পদেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার লোকজীবনে 'খইধারা' বা 'খইঢেরা' পালন করা হয়। সেদিন বর্ণহিন্দু বহু কৃষিজীবী পরিবারে শুধুমাত্র আমিষই নিষিদ্ধ নয়, অন্নগ্রহণও নিষিদ্ধ। সেদিন দুধ-কলা-চিঁড়ে, ফলমূল ইত্যাদি আহার বিধি। আবার বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ ঐদিন মনসাদেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য পাঁঠা-হাঁস ইত্যাদি বলি দেয়। সেই প্রসাদী মাংস সানন্দে ভক্ষণ করে।

আমরা জানি, উত্তর ভারত এবং একদা বিহার-ছোটনাগপুর তথা রাঢ়বঙ্গেও জেগেছিল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তরঙ্গ। অথচ বাংলার পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী এবং সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অনুসারী হওয়ায় বঙ্গভূমে জৈনধর্মের ভাটা পড়ে। তাই নাগছত্র-চিহ্নিত জৈন পার্শ্বনাথ রাঢ়দেশে কোথাও বিষ্ণু, আবার কোথাও শিবে রূপান্তরিত। বাঁকুড়ার সুপ্রাচীন বহুলাড়া মন্দিরের জৈন পার্শ্বনাথ কালের বিবর্তনে সিদ্ধেশ্বর শিব। বিষ্ণুপুরের অদূরে ধরাপাটের সপ্তমুখী নাগছত্রচিহ্নিত জৈন পার্শ্বনাথ কালের কুটিল গতিতে জনমানসে মনসাদেবী-রূপে পূজা পাচ্ছেন। আবার পুরুলিয়ার পাক্‌বিড়র্‌য়া গ্রামে জৈন তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভ এবং ঋষভনাথ স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে কালভৈরব-রূপে পূজিত। তাঁর প্রসন্নতার জন্য একদা পশুপাখি বলিও হতো।

লোকজীবনে শুধু নয়, উচ্চ বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝেও দেবী চণ্ডী খুবই মান্য। অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসু শাস্ত্রবিদ্‌গণ জানেন, চণ্ডী বৈদিক দেবী নন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শক্তিদেবতার নামোল্লেখে 'দুর্গা', 'নারায়ণী' ইত্যাদি দেবীর নাম থাকলেও চণ্ডীর নাম নেই। দ্বাদশ শতাব্দী বা তার পরবর্তী কালের লেখা 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে, অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি জনগোষ্ঠীর পূজিতা 'চাণ্ডী' নামে এক দেবী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মাঝে চণ্ডী-রূপে এসেছেন। লক্ষণীয়, পুরাণে দেবী চণ্ডীকে 'কান্তারবাসিনী', 'কোকামুখী', 'বিন্ধ্যবাসিনী' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেবী চণ্ডী আর্যসংস্কৃতির গণ্ডির বাইরে থেকে পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজে এসেছেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক লোকধর্মে তাঁকে 'হাড়ির ঝি' অর্থাৎ অন্ত্যজ বংশোদ্ভূতা বলা হয়েছে। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী কালী ও দেবী চণ্ডিকা দেবীশক্তির অভিন্ন রূপ। তা থেকে বোঝা যায়, তন্ত্রের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক আখ্যানে দেবী চণ্ডীর আগমন। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' গ্রন্থে দেবী কালীর ধ্যানমন্ত্রে ভয়ালমধুর দেবীমূর্তির রূপ বিধৃত।

বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবি বড়ু চণ্ডীদাস বাসলি দেবীর ভক্ত ছিলেন। বীরভূমের নানুর গ্রামেও বাসলি দেবীর পূজারী ছিলেন পদাবলীর কবি

চণ্ডীদাস। গবেষকদের বিশ্বাস, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী বজ্রেশ্বরী লোকজীবনে দেবী বাসলি বা বাসুলি। ছাতনার দেবীর ধ্যানমন্ত্রে 'প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে' এবং 'পিব পিব রুধিরং বাসুলি' শব্দগুলি যেমন আছে, তেমনি তাঁর আবাহন-মন্ত্রে আছে—"ওঁ আহ্বায়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্" ইত্যাদি। অথচ বীরভূমের নানুরের বাসলি দেবীর ধ্যানমন্ত্র আলাদা। তাই কেউ কেউ তাঁকে দেবী সরস্বতীর লোকায়ত রূপ মনে করেন।

বাঁকুড়ার প্রাচীন জনপদ পুষ্কর্ণার রাজা চন্দ্রবর্মা বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের নরপতি। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের দুর্গম প্রস্তরগাত্রে তিনি বিষ্ণুচক্র ও শিলালিপি উৎকীর্ণ করেনঃ "The Susunia inscription also furnishes the earliest record of Vishnu worship in Bengal. Chakraswamin (the wielder of the discus) is a well-known name of Vishnu and it is more than apparent that King Chandravarmana, who has been mentioned as the chief of the servants of Chakraswami, was a worshiper of Vishnu."[8]

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও ছান্দার পরিমণ্ডলে বাংলার সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা বিষ্ণুপূজার প্রসার ঘটেছিল। গোকুলনগর, দ্বারিকা, রাধানগর, ডিহর, জয়কৃষ্ণপুর, পাঁচাল প্রভৃতি গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি তারই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

বিষ্ণুপুররাজ, শাক্ত-শৈব বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় বিষ্ণুপুর-রাজগণ বংশ-পরম্পরায় বৈষ্ণব ভাবানুরাগী হয়ে ওঠেন। তার প্রমাণ বিষ্ণুপুরের মন্দিরমালা এবং তাদের অলঙ্করণরীতি। তার প্রভাব মানভূম-পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজপরিবারে এবং স্থানীয় অন্যান্য ভূস্বামিবর্গের উপাসনারীতির মাঝে দেখা যায়। পুরুলিয়ার চেলিয়ামায় রাধাবিনোদ-মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পে, বরাবাজারের অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চে, বাগমুণ্ডি রাজবাড়ি-সংলগ্ন রাধাগোবিন্দ মন্দিরের অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যে এবং নবরত্নবিশিষ্ট রাসমঞ্চে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রকাশিত।

বিষ্ণুপুর-রাজাদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানায় হিন্দু-মুসলমান সাঙ্গীতিক প্রতিভার যেমন মিলন ঘটেছে, তেমনি বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত প্রজাদের পাশে শাক্ত-শৈব এবং মুসলমান ধর্মানুরাগী মানুষদেরও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই কুরুমন শাহ নামে একজন মুসলমান ফকির বীর হাম্বিরের কাছে সম্মানিত হন। নির্বিবাদে তাঁর ধর্মসাধনার জন্য বাসভূমি ও মাসোহারার বরাদ্দ বিষ্ণুপুর-রাজ করেন। সেই মুসলিম সাধকের নামযুক্ত কুরুমনতলায় আজও হিন্দু-মুসলমান নরনারী ভক্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।
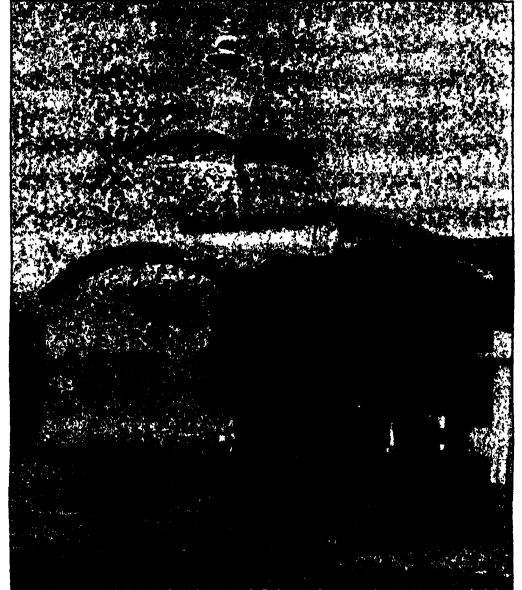
বাঁকুড়ার পাঁচালের রত্নেশ্বর শিবমন্দির ● *আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই*

স্বার্থান্ধ মানুষের ভেদবুদ্ধির ফলে নানা সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। অথচ রাঢ় বঙ্গের অসংখ্য গ্রামের অগণিত নরনারী আবহমান কাল থেকে মন্দির এবং পীরের দরগায় মানত করে, সিন্নি ও মাটির হাতি-ঘোড়া দিয়ে পূজা দেয়। বিষ্ণুপুরের কাছে জয়পুর থানার লোকপুরে পীর ইসমাইল গাজীর নাম লোকমুখে প্রচারিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বর্ণিত গড় মান্দারণের কথা আমাদের জানা। বাঁকুড়া ও হুগলি-সংলগ্ন সেই গড় মান্দারণে পীর ইসমাইলের সমাধিতে সব ধর্মের মানুষ আজও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। ষোড়শ শতকে বিখ্যাত কবি রূপরাম চক্রবর্তী স্থানীয় লোকবিশ্বাসের কথা তাঁর 'ধর্মমঙ্গল'-এ লিখেছেন—

"মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীর ইসমাইলি।।
পীর ইসমাইলি সঞরিয়া পথ চলি যায়।
মেঘে নাহি মারে তারে, বাঘে নাহি খায়।।"

আদি-অস্ত্রাল মানুষ শিকারপ্রিয় ছিল। তাদের লোকবিশ্বাস-উদ্ভূতা 'শিকারদেবতি' কালক্রমে 'রঙ্কিণী দেবী' হয়েছেন। অষ্টভুজা এই দেবী নৃমুণ্ডমালিনী। বিকটদশনা, শৃগালবাহিনী দেবীর পদতলে ভৈরব। তাঁর ভয়ঙ্করী মর্মরমূর্তি আছে বাঁকুড়ার লক্ষ্মীসায়রে। বাঁকুড়ার

বড়জোড়া-সংলগ্ন কৃষ্ণনগর ও পাত্রসায়র অঞ্চলের লোকজীবনে রঙ্কিণী দেবীর পূজা এখনো হয়।

বাঁকুড়ার আটবাইচণ্ডী গ্রামের দেবী চণ্ডিকা 'আটবাইচণ্ডী' নামে বিখ্যাত। নৃমুণ্ডমালিনী এই দেবী দশভুজা, নানা অস্ত্রে শোভিতা—৩×২ শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ। বিকটদর্শনা দেবীর কোমরেও ঝুলন্ত কৃপাণ। তিনি এক বলবান পুরুষকে পদমর্দিত করছেন বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায়। প্রতিবছর ১ মাঘ এই গ্রামে বিশেষ মেলা হয়। অনুরূপভাবে পুরুলিয়ার বহু গ্রামে ঐদিন খেলাইচণ্ডীর মেলা হয়। তার মধ্যে কাশীপুররাজ-ধন্য গদিবেড়ো গ্রামের পাহাড়তলির খেলাইচণ্ডী মেলা বিখ্যাত। বাঁকুড়ার বিশিণ্ডা গ্রামে আছেন বিশাই চণ্ডী, শিহড়ে বসনচণ্ডী, খুদকুড়ি গ্রামে খুদাই চণ্ডী। এই চণ্ডীদেবী ওঁরাওদের চাণ্ডীদেবীর সমগোত্রীয়া।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছে জয়পুর থানার বৈতলে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে এক মন্দির নির্মাণ করেন। সেই মন্দিরে পূজিতা হন সহস্রদল পদ্মের ওপর অষ্টভুজা দেবীমূর্তি। তাঁর হস্তে শোভিত নানা ধরনের অস্ত্র এবং মালা ও করমুদ্রা। তাঁর বাম পদতলে সিংহ এবং দক্ষিণ পদতলে হস্তী। বৈতলের অনতিদূরে নারায়ণপুরে আছেন অষ্টভুজা দেবী দুর্গা। এই দুই দেবী দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে পূজিতা হন এবং লোকবিশ্বাসে প্রথমজন ঝগড়াভঞ্জিনী মা, দ্বিতীয়জন তাঁর সহোদরা। তাই ভাদ্র মাসে প্রীতির উৎসব 'সয়লা-পরব' উপলক্ষ্যে অসংখ্য গ্রামবাসী এই দেবীদের কাছে পূজা দিতে আসেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, তাঁরা দুই বোন 'সয়লা' অর্থাৎ 'মিত্রতার দেবী'। তাই যাবতীয় বিবাদ-শত্রুতা তাঁরা দূর করেন।

।।দুই।।

মল্লভূম বাঁকুড়ার মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের আমলে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বিষ্ণুপুর ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে দেনার দায়ে নিলামে ওঠে। তার তিরিশ বছর পর বৃহত্তর মল্লভূম পরিমণ্ডলে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁর শ্রীমুখে বিষ্ণুপুর-গরিমার নানা কথা আমরা শুনেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাঢ় বাংলার জনগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বৌদ্ধিক বিষয় অপেক্ষা জীবনরসসমৃদ্ধ সমন্বয়ী ভাবনাকে প্রাণমন দিয়ে গ্রহণে আগ্রহী। তাই আচার্য শঙ্কর অপেক্ষা প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অধিকতর শিকড়সঞ্চারী হয়েছে ঘনরসময়ী বাংলার মাটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকায়ত জীবন ও লোকধর্মের মহত্তম রূপকার। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই অনুভব করেছেন—"কদাচিৎ কেহ উৎসের সন্ধানে যান। বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মানুষটি কান পাতিয়া নিজের অন্তরের বাণী শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্তরতর সমুদ্রের পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই সমুদ্রের সহিত মিলন ঘটিয়াছিল এবং এইরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল উপনিষদের বাণী—'আমি জ্যোতির্ময় দেবতাদের অপেক্ষাও প্রাচীন। আমি সত্তার প্রথম সন্তান। আমি অমরত্বের শোণিতবাহী শিরা-উপশিরা।' "[৫] সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ-উপনিষদের সারসত্য, শাক্ত-বৈষ্ণব ভাবনা, মুসলমান-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মমতের অন্তর্নিহিত সত্য এবং বাংলার লোকধর্ম-আচরিত মনসা-ধর্মরাজ-চণ্ডী প্রমুখ

বাঁকুড়ার বেলেতোড়ের ধর্মরাজ শিলা ● *আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই*

লৌকিক দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কারণ, তাঁর উপলব্ধ সত্য—"যত মত তত পথ"। এই সমন্বয়ী অনুভব তাঁর আন্তর সত্যেরই প্রতিফলন। ঋগ্বেদে ঋষিকবি বলেছেন : "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"।[৬] অর্থাৎ 'ধর্ম' এক, অথচ 'ধর্মমত' বহুতর। তাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনদিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন জগতের সকল ধর্মের (অর্থাৎ ধর্মমতের) সম্মিলিত রূপ এবং ধর্মের (মানবতাবোধ-যুক্ত সদর্থক ধর্ম) সংস্থাপক। লক্ষণীয়, শান্তিনিকেতন-ঘরানায় একদা বেড়ে ওঠা এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' প্রবন্ধে গভীর বোধিদৃষ্টির আলোয় মন্তব্য

করেছেন ঃ "রাজার (রামমোহন রায়) প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার ফলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণধর্মের (Folk Religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।... ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি, ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন।... যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার। ... ঠিক সময়ে করুণাময়ের কৃপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।... তিনি জনগণের ধর্ম (Folk Religion), আচার-ব্যবহার, ভাষা —সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন।"

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে অন্তরঙ্গজন তথা ভক্তজনের কাছে শুধুমাত্র নয়, তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার মনীষী-বিদ্বজ্জনের কাছেও নিজস্ব ভঙ্গিতে সহজ-সরসভাবে কথাবার্তা বলতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের (উত্তরজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ) সহোদর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের অভিজ্ঞতা এরকম ঃ "দক্ষিণেশ্বর থেকে এই যে লোকটি এসেছে, একেই কি বলে 'পরমহংস'? দেখিলাম, লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো... কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষার মতো নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমনকি কলিকাতা শহরের রুচিবিগর্হিত।"[৭] আবার তৎকালীন ইংরেজ যখন বিজিত ভারতবাসীদের উপেক্ষা-অবজ্ঞার চোখে দেখতেই অভ্যস্ত, তখন স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে একসঙ্গে 'লাঞ্চ' খেয়েছেন! ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বলেছেন—'Thunderbolt of Bengal', আর ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'Punch' পত্রিকা সরস মন্তব্য করেছে —'Big as a lion'। সেই কেশবচন্দ্রও গভীর বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে—"কী আশ্চর্য! নিরক্ষর ব্যক্তি এসব কথা কিরূপে বলছেন! এ যে ঠিক যিশুখ্রিস্টের মতো কথা! গ্রাম্য ভাষা! সেই গল্প করে করে বোঝানো—যাতে পুরুষ-স্ত্রী-ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে।"[৮]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'Folklore'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকবিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করেছেন।[৯] সেই 'লোকবিজ্ঞান'-এর প্রাথমিক শর্ত হলো—"A way of life (i.e. 'Yāna') among the people (i.e. 'loka') which is carried down by tradition without any book-learning and sophistication."[১০]

বেলেতোড়ে ধর্মরাজের ঘোড়ার শোভাযাত্রা ● *আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই*

আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ কালজয়ী কথাকোবিদ্ ও লোকশিক্ষক শুধুমাত্র নন, তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিরকালের একজন ধ্রুপদী 'লোকবিজ্ঞানী' (Folklorist)-ও। আবহমান কালের বাংলা ও বাঙালি জীবনে 'প্রেমময়ী' রাধা চিরন্তনী মাধুর্যের প্রতীক। সেই লোকবিশ্বাস উজ্জীবিত হয়েছে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলায়। তিনি তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরি নরেন্দ্রনাথকে 'চাপরাস'-দান করার সময় এক টুকরো কাগজে স্বহস্তে লিখেছিলেন—"জয় রাধে পৃমমেহি (প্রেমময়ী), নরেন শিক্ষে দিবে জখন (যখন) ঘুরে বহিরে (বাহিরে) হাক (হাঁক) দিবে [।] জয় রাধে"। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি প্রেমময়ী রাধাকে স্মরণ করে তিনি সেদিন শাশ্বত ভারতের লোক-বিশ্বাস ও লোকায়ত চেতনাকেই উচ্চ মর্যাদাদান করেছেন। ❑

তথ্যসূত্র

(১) রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃঃ ৬৪৮
(২) Obscure Religions Cults—Sashibhusan Dasgupta, Kolkata, pp. 337-339
(৩) The Ocean of Story—N. M. Penzer, London, 1925, Vol. IV, p. 14
(৪) West Bengal District Gazetteers, Bankura—Ed. Amiya Kumar Banerjee, 1968, p. 68
(৫) রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ (ঋষি দাস অনূদিত), ১৯৮২, পৃঃ ১০-১১
(৬) ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬
(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৮০, পৃঃ ২৯-৩০
(৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৩।৫
(৯) লোকসাহিত্য—আশরাফ সিদ্দিকী, ভূমিকা—ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা, ১৯৬১, পৃঃ ১-৮
(১০) Indian Folklore, Vol. I, Part II, April 1956.

শতবর্ষের আলোকে সরোজকুমার রায়চৌধুরী

শঙ্কর ঘোষ

বাঙলা ভাষার অধ্যাপক শঙ্কর ঘোষ কল্লোল যুগের সাহিত্যিক সরোজ রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এবছর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও জন্মশতবর্ষ। তাঁকেও আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। আসলে সাহিত্যিক সরোজ রায়চৌধুরীর নাম স্বল্পালোচিত বলেই প্রবন্ধকারের এই প্রয়াস।
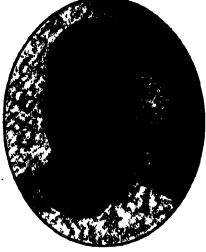
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকের ভিড়ে যখন 'কল্লোল'-এর যুগ জমজমাট, সেসময় গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে সরোজকুমার রায়চৌধুরী এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। হয়তো সেই কারণেই খানিকটা স্বল্পালোচিতও। কল্লোল যুগের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সীমান্তরালে অবস্থান করে উর্মিমুখর যে উত্তালতা, তাকে নিয়ত পরিহার করেছেন সরোজকুমার। নামি লেখকের ভিড়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু তাঁর উপন্যাস এবং গল্প-সাহিত্যে এমন এক নিষ্কম্প গভীরতা আছে, দীঘির জলের মতোই যা নিস্তরঙ্গ হলেও সামগ্রিকতায় তা গাঢ় হয়ে আছে।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবং গঠনমূলক স্বদেশী কর্মধারার আহ্বানে সারা ভারতবর্ষে এক নতুন আদর্শ-সাধনার উদয়াচল ক্রমশই যেন আলোকিত হয়ে উঠছিল। তখনকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী সেই দুর্গম পথের অভিযাত্রী হয়েছিলেন—বিদেশী রাজশক্তির কারাগারে দুজনেরই জুটেছিল আতিথ্যলাভ। পরবর্তী সময়ে দুজনেই লেখালেখিতে মনঃসংযোগ করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেনঃ "শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী কতকটা তারাশঙ্করবাবুর সমান-ধর্মা। ইঁহারও এক-আধটি গল্প কল্লোলে বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাস-কাহিনীতে ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর রচনার মানচিত্র ইহারই সংলগ্নভূমি পশ্চিম মুর্শিদাবাদ।"[১]

মুর্শিদাবাদের মালিহাটীতে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন সরোজকুমার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা শেষ করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন-কংগ্রেস রাজনীতিতে। পরে নিয়োজিত হন সাহিত্যসেবায়। এক্ষেত্রে তাঁর সাংবাদিক জীবন খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা 'কৃষক' এবং 'নবশক্তি'তে তিনি সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেছিলেন। পরে যোগ দেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে এবং এখান থেকেই অবসর নেন। কিছুদিন 'বর্তমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। আত্মজীবনী লেখার কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। সে-তথ্য দিয়েছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত —"মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'অনুক্ত' নামে একটি ত্রৈমাসিকে আত্মজীবনী প্রকাশ শুরু করেছিলেন।"[২]

সাংবাদিকতা বা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও সরোজকুমার বাঙালি পাঠকসমাজে ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার হিসাবেই সমধিক পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা', 'নীলাঞ্জন', 'নাগরী', 'নীল আগুন', 'কালো ঘোড়া', 'নতুন ফসল', 'অনুষ্টুপ ছন্দ' 'শতাব্দীর অভিশাপ', 'হংসবলাকা' প্রভৃতি। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে অকৃত্রিমতা ও ভাষার ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের মতো তাঁর শিল্পচেতনাও গ্রাম্যজীবনের প্রতি স্বভাব-প্রীতিমান। বৈষ্ণবদের নিয়ে তারাশঙ্করের গোড়ার দিকের ছোটগল্পে যে-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, সরোজকুমারের উপন্যাসেও সেই ধারারই অনুবর্তন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

বৈষ্ণব জীবনের সত্যচিত্র হিসাবে সরোজকুমারের 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা'—এই তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসত্রয় স্মরণযোগ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈরাগী-বৈরাগিণীরা বাস্তব সমাজজীবনের সঙ্গে বেশ সুসংবদ্ধ। এঁরা খানিকটা উদাসীন। নীড় রচনার ক্ষেত্রে আগ্রহহীন এঁদের সাধন-পূজনে আড়ম্বর নেই, নিয়ম-নিষেধের কাঠিন্য নেই। মনে রয়েছে সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ। মুখে মুখে গানের ফোয়ারা। রসময়, গৌরহরি ও ললিতার মধ্যে সহজ সুন্দর নির্লিপ্ত মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ললিতার মন এমনই সংস্কারমুক্ত যে, তারাপদর কাছে আত্মসমর্পণ করেও তাঁর কোন গ্লানি নেই। বিনোদিনীর সঙ্গে গৌরহরির অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সত্ত্বেও গৌরহরির মনে বিমূঢ়তাই জেগেছে বেশি। এই চরিত্রগত

বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণব সমাজের বৈরাগী নরনারীর মধ্যে রসিকতা ও মেলামেশার নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা এই উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে বেশ সরসভাবে বর্ণিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেনঃ "লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র-পরিকল্পনায় ও মন্তব্য প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই।"[৩]

'নীলাঞ্জন' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র সমরেশ এবং তাঁর বিমাতা হরসুন্দরী। জমিদারবাড়ির দুই শাখার মধ্যে তীব্র ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী এই 'নীলাঞ্জন'। দুই শাখার মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনা-পটভূমিকা লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। প্রধান দুটি চরিত্রই আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ। আন্তর রহস্যের দুর্বোধ্যতা একটি কাহিনীকে কোন্ মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে 'নীলাঞ্জন' তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

অপূর্ব ও সুমিত্রার ভিন্নমুখী দাম্পত্যজীবনের এক করুণ কাহিনী 'নাগরী'। সুমিত্রার মন গৃহাভিমুখী নয়। নৃত্যকলাতেই তাঁর আকর্ষণ। স্ত্রীর ঔদাসীন্য অপূর্বকে ক্লান্ত করেছে। প্রথমা মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে ধ্যানসংযোগে মিলিত হতে চেষ্টা করে অপূর্ব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন স্বামী হারানোর আশঙ্কায় সুমিত্রা স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

সরোজকুমারের সাড়া-জাগানো উপন্যাস 'নীল আগুন'। উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপটে একাহিনীর বিস্তার। শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অজস্র উদ্বাস্তু পরিবারের ভিড়। এর মধ্যে তিনটি পরিবার এবং তাদের তিনটি মেয়ের জীবন-সমস্যা সমাধানের দুঃস্বপ্ন বিভীষিকায় ভরা প্রয়াসই হলো উপন্যাসটির বর্ণনীয় বিষয়। অঞ্জনা, রঞ্জনা ও খঞ্জনা—এই তিনটি কিশোরী মেয়ের শুধু নামেই মিল নেই, দুর্ভাগ্যের শিকার এরা তিনজনেই। ঔপন্যাসিকের কাছে যা প্রত্যাশিত, তা হলো ব্যক্তিচরিত্রের ওপর ঘটনাবলীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার পরিস্ফুটন। বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে সরোজকুমার পাঠকদের হতাশ করেননি। তাঁর লেখায় অতিরঞ্জন প্রবণতা নেই বললেই চলে। সুর চড়াবার প্রবণতা সর্বদা তিনি পরিহার করেছেন। তাঁর জীবনচিত্রণ মননধর্মী এবং বস্তুনিষ্ঠ। ফলে উপন্যাসগুলি আমাদের কাছে সতর্ক ও সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন দাবি করে। 'নীল আগুন' উপন্যাসটির নামকরণই তো তাৎপর্যমণ্ডিত। অঞ্জনার চোখে মাঝেমধ্যে যে গভীর ঘৃণা, যে বেপরোয়া বিদ্রোহের নীল আগুন ঝলসে উঠতে দেখা যায়, তা পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করতে বাধ্য। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের এই জীবন-নাটকটি অতি বস্তুনিষ্ঠ ও মানসবিপর্যয়ের দ্যোতনায় অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। ঐসময়ের সমাজচিত্র ছিন্নমূল মানুষগুলির জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'জয়া' যে বারোজন লেখক মিলে সম্পূর্ণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সরোজকুমারও রয়েছেন।

সরোজকুমারের গল্প ও উপন্যাসে গ্রামের উদাস মেঠো সুরের বাঁশির মিঠে তান যেমন, তেমনি অজস্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভে আলোড়িত সমসাময়িক শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনবেদনা ও মাধুর্য সকরুণ সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। গ্রামের মাঠের অলস দুপুরের বিষণ্ণ মেদুরতা আর শহরের গলিপথের উদাস বেদনা একসূত্রে যেন বাঁধা পড়েছে। শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর এবং সরোজকুমারের প্রকাশ-প্রকরণে আপেক্ষিক সাদৃশ্যের উপকরণ রয়েছে ঠিকই, তবুও মৌলিক পার্থক্যের উপাদানও কিছু কম নেই। আর এই কারণেই স্ব-স্ব সৃজনভূমিতে এঁরা সকলেই স্বতন্ত্র। অনেক দিক থেকেই সরোজকুমার সমকালীন লেখকদের সান্নিধ্যবর্তী হয়েও সকলের থেকে স্বতন্ত্র এক শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

সরোজকুমারের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মনের গহনে', 'ক্ষণবসন্ত', 'শ্মশানঘাট', 'দেহযমুনা', 'বহ্ন্যুৎসব', 'রমণীর মন', 'সন্ধ্যারাগ' প্রভৃতি। সাহিত্যিক-সাংবাদিকের মতো সমকালীন তথ্যচেতনা কতখানি অতন্দ্র ছিল তাঁর, ছোটগল্পগুলিই তার প্রমাণ। তাঁর গল্পের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি গল্পের মূলে শিল্পীর একান্ত জীবন-অনুভবের স্পর্শ যেমন রয়েছে, সেইসঙ্গে আছে একটি করে জীবনকাব্য। গলা চড়িয়ে সেই বক্তব্যকে কখনো ঘোষণা করেননি সরোজকুমার। মূল বক্তব্যকে গল্পের শরীরে, প্লটের সর্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন তিনি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'তিনপুরুষের কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল 'নিরূপমা বর্ষস্মৃতি' নামে একটি পূজাবার্ষিকীতে। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্প 'দুনিয়াদারি'। পাঠকেরা প্রথম সচকিত হয়ে উঠেছিল যে-গল্পটি পড়ে, তার নাম 'ক্ষণবসন্ত'। সাহেব কোম্পানিতে মাত্র ৩৫ টাকার মাইনের অকিঞ্চিৎকর চাকরি জুটেছিল কৃত্তিবাসের। মাইনের পরিমাণটা পর্যন্ত বন্ধুমহলে মুখে আনা কঠিন, তবু ঐটুকু না হলে চলে না। কৃত্তিবাসকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে তাঁর মা একটি একটি করে গহনা খুলে দিয়েছেন, বাবাও চেয়ে আছেন তার দিকে। ছোট ছোট ভাইবোনেরা আছে। আর

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

আছে কল্যাণী। শহর থেকে স্বামী আসবে—এই প্রত্যাশায় সেও দিন গুনছে। বহুদিন পরে গ্রামের স্টেশনে পৌঁছে কুলিকে পয়সা দিতে হবে বলে সে নিজেই মালপত্র নিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বাড়িতে পৌঁছায়। রাত্রে কল্যাণী যখন স্বামীর সেবার্থে হাজির হয়, তখন কৃত্তিবাস গাঢ় ঘুমে অচেতন। প্রবাসী কেরানির বিরহতপ্ত জীবনে ক্ষণবসন্ত একটি রাত্রি এসেছিল এইভাবে, তবে তা ফিরে গেছে ব্যর্থ হয়ে। জীবন-যন্ত্রণার প্রতি সরোজকুমারের অবধান যে কতখানি নির্ভুল, এ-গল্পই তার প্রমাণ।

গ্রাম্যজীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সরোজকুমারের আত্মিক যোগ সুনিবিড়। তবু গ্রামের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ ভক্তিকে তিনি কখনো ক্ষমা করেননি। এই অন্ধ সংস্কারকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন এক কৌতুককর গল্প —'ব্যাঘ্রদেবতা'। গ্রামে হঠাৎ এক বাঘের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে। সারাদিনের পর যখন বাঘটি অনায়াসে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন জানা গেল—আগে থেকেই বসন্ত রোগ হওয়ায় বাঘটি অর্ধমৃত হয়েছিল। তা না হলে অত সহজে, অত অল্পেই তার বিনাশ ঘটানো সম্ভব হতো না। মৃত বাঘটি নিয়ে মোষের গাড়িতে চাপিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানোর মধ্যে সে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা! সবশেষে বাঘের গাড়ি এসে পৌঁছাল চাটুজ্যেদের বাড়ির সামনে। চাটুজ্যেগিন্নি বাঘের পায়ে এক ঘটি জল ঢেলে দিলেন। বললেন, কোন্ শাপভ্রষ্ট দেবতা শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী চাটুজ্যেগিন্নির অনুসরণ করলেন। তিনিও বাঘের পায়ে জল ঢাললেন। এ-সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল গ্রামে। বসন্তরোগগ্রস্ত বাঘ পরিণত হলো 'ব্যাঘ্রদেবতা'য়। সে এক কৌতুক চিত্র—কৌতুকের লঘু চালে অবশ্য তা রচিত হয়নি, গড়ে উঠেছে লেখকের সহজাত প্রগাঢ় প্লট-শরীরের সহজ আধারে।

সরোজকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প সম্ভবত 'তৃতীয় পক্ষ'। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের রামহরি জেলাবোর্ডের ওভারসিয়ার। দুই বৌয়ের মৃত্যুর পর রামহরি বিয়ে করে নিয়ে এলেন নন্দরানিকে। তাঁর প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে অমলার চেয়েও বয়সে ছোট এই নন্দরানি। বিধবা যুবতী অমলা শুনতে না চাইলেও স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতার কথা নন্দরানি রোজ শোনাবে তাকে। নন্দরানির নির্দেশে অমলা তাকে ডাকে 'বৌমা', নন্দরানি ডাকে 'ছোট মা'। আজন্ম মাতৃহীনা নন্দরানি প্রথম দিনেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল অমলার মাতৃক্রোড়ে। একদিন অমলাকে কঠিন অসুখে ধরে। অনেক ডাক্তার-বদ্যি করেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে শয্যাপার্শ্বে সবাই উপস্থিত। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ "সেইদিন দুপুরে অমলার বৈধব্যজীবনের অবসান হলো।" শেষবারের মতো চোখ বোজার আগে বাপের অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে অমলার চোখ 'ঝলমল' করে উঠেছিল, ঠোঁটের কোণে খেলে গিয়েছিল 'একটুখানি বাঁকা হাসি'—সে কি ব্যঙ্গের, কৌতুকের, না অন্য কিছুর? গল্পের শেষবাক্যটি কতখানি অর্থবহ তার মূল্যায়ন করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক ভূদেব চৌধুরী—"এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে শিল্পীচেতনার অন্তর্নিহিত যে জীবন-যন্ত্রণার প্রগাঢ় প্রযত্নোচ্চারিত অভিব্যক্তি ঘটেছে, তাকে বিদ্রূপ বললেও যেন কিছুই বলা হয় না।"[৪]

আরেকটি উপন্যাসের কথা না বললেই নয়—'অনুষ্টুপ ছন্দ'। এই ছন্দে আলোড়িত হয়েছিল দুটি হৃদয়—প্রণব আর সুচরিতার। ধর্মপ্রাণ মায়ের অনুরোধ রাখতে প্রণবকে বিয়ে করতে হয় গ্রাম্যবালিকা সৌদামিনীকে। দীর্ঘ চারবছর পরে প্রণব যখন বিদেশ থেকে ফিরল, তখন সৌদামিনী একজন যুবতী। দুজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অভাববোধ মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। সে-অভাব প্রণবের মনে। ইতিমধ্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে প্রণবের সঙ্গে আলাপ হয় সুচরিতার। পুত্র বিমান আর কন্যা মাধুরীকে রেখে একদিন পরলোকে চলে যায় সৌদামিনী। প্রণবের একাকীত্বের জীবনে তখন অনেকটাই সুচরিতা। তবু মনের কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারে না প্রণব। একজনের অভাব আরেকজনের কাছে দুর্বিষহ। দীর্ঘদিনের না-বলা কথার ভারে ভারাক্রান্ত সুচরিতাও। যে-ভালবাসার দ্বন্দ্ব বছরের পর বছর তার মনপ্রাণ আবিষ্ট করে রেখেছে, তা কি আবার পূর্ণতায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে? এমন দ্বন্দ্বসঙ্কটের চরম মুহূর্ত তৈরি করেছেন সরোজকুমার। উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের বহির্জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় যেমন তুলে ধরেছেন তিনি, ঠিক তেমনি অন্তর্জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশের বিশেষ নিদর্শনও রেখেছেন। তাঁর কিছু স্মরণীয় গল্প ও উপন্যাসের কিঞ্চিৎ মূল্যায়ন করে তাঁর প্রতি আমরা শতবর্ষের প্রণাম নিবেদন করি। ❑

তথ্যসূত্র

(১) বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮, পৃঃ ৩১৫

(২) সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃঃ ৫৪৮

(৩) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৩৭২, পৃঃ ৫৪৩

(৪) বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৯৬২, পৃঃ ৬৩২

নাস্তিকতা বলে কিছু নেই

অসীমকুমার চৌধুরী

ভক্তিতে নয়, যুক্তিতে নির্ভর হয়েই 'সমাজবাদী ভাবনা'র সম্পাদক অধ্যাপক অসীমকুমার চৌধুরী প্রমাণ করেছেন, আমরা সকলেই আস্তিক। স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, "যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক।" আজ আদর্শ-সঙ্কটের যুগে, দেশী-বিদেশী নানান মতবাদে পুষ্ট ভারতীয় সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্রের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ধর্মহীনতাকেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে এই 'ধর্মনির-পেক্ষতা'র যথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে। এই প্রবন্ধে সেই কাজটির সূচনা করে প্রবন্ধকার পাঠকের ওপরেই বাকি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।

নাস্তিকতার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সহজ কথায়, নাস্তিকরা হলেন দেহবাদী। এঁদের মতে, আত্মা দৈহিক বিষয় বৈ কিছু নয়। কারণ, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের সংমিশ্রণ মানবদেহে রূপান্তরিত হয় এবং আত্মা সেই দেহেরই অঙ্গ। সুতরাং দেহসুখ বৃদ্ধি করা মানুষের ধর্ম। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ৪৩৫ বছর আগে আফ্রিকার অন্তর্গত সাইরিন-নিবাসী অ্যারিস্টিপাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৫-৩৫৬) এথেন্সে এসে সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রবর্তিত দর্শন ছিল—"দেহসুখই একমাত্র সুখ।" অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানের সুখকে পরিহার করা মূর্খতা। এপিকিউরিয়াসের (৩৪২-২৭০ খ্রিস্টপূর্ব) বক্তব্য আরো স্পষ্ট। তাঁর প্রচারিত অহংসর্বস্ব সুখবাদের চারটি সূত্র হলো : (ক) দুঃখবিহীন সুখ সর্বদা গ্রহণীয়; (খ) যে-দুঃখ কোন সুখ দিতে পারে না তা বর্জনীয়; (গ) বৃহত্তর সুখের প্রতিবন্ধক সাময়িক সুখ বর্জনীয় এবং (ঘ) যে-দুঃখ বৃহত্তর দুঃখ প্রতিহত করে মহত্তর সুখভোগ সুনিশ্চিত করে, সে-দুঃখ সহনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) পুঁজিবাদের বিকাশের পটভূমি রচনাকল্পে যে 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' বা 'হিতবাদ' প্রচার করেছিলেন তা গ্রিক সুখবাদ থেকেই উৎসারিত। হিতবাদের বক্তব্য হলো, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের দুঃখমোচন করে তাদের সুখবর্ধন করা। সবটাই বস্তুগত।

অধ্যাপক এল. দ্য লা ভাল্লে পাঁউসে, গারবে প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকদের অভিমত, ভারতবর্ষে বস্তুবাদী দর্শন বা জ্ঞানলিপ্সার গুরুত্ব কোনদিন ছিল না। এঁদের কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, 'ফিলসফি' বিষয়টিই ভারতবর্ষে [illegible] অজ্ঞাত। ভারতীয় 'দর্শন' সংস্কৃত 'দৃশ্' ধাতু থেকে উ[illegible] প্রথমে 'দর্শন', তারপরে 'জ্ঞান'। বৈদিক ঋষিগণ যেসব মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিল তাঁদের দর্শনলব্ধ, জ্ঞানলব্ধ নয়। তাই 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। সুতরাং ভারতীয় ভাষাগুলিতে 'ফিলসফি'র অনুবাদ 'দর্শন' করা হলেও এখানে জ্ঞানলিপ্সা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল বলে অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্ মনে করেন।

তবে তাঁরা যে-অভিমতই পোষণ করুন না কেন, প্রকৃত ইতিহাস হলো—লোকায়ত দর্শন নামে পরিচিত ভারতীয় জড়বাদী চিন্তা বা জীবনব্যাখ্যা গ্রিক 'হেডোনিজম' বা 'সুখবাদ' থেকেও প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় ডঃ ভগবৎকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত গবেষকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, ধর্মভিত্তিক জীবনদর্শন প্রচলনের আগে ভারতবর্ষে যে বৈচিত্র্যময় উপজাতীয় জীবনধারা ছিল, তা অ-ধর্মীয় হলেও কৃষ্টিরহিত ছিল না। বৈদিক মন্ত্রসকল উচ্চারণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'অবিশ্বাসী' মানুষদের ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

পৌরাণিক চরিত্র দেবগুরু বৃহস্পতি অন্যতম পৌরাণিক চরিত্র মনুর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পূর্বে ঘোরতর দেহবাদী ছিলেন। ভারততাত্ত্বিক জার্মান দার্শনিক ম্যাক্সমুলারের মতে, বৃহস্পতি-সূত্র বা 'বার্হস্পত্য' কেবল বস্তুবাদীই নয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণও বটে। বৃহস্পতি বা তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের সম্পর্কে যেসব পৌরাণিক উপাখ্যান রয়েছে, তা থেকে এইরকম সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক নয়। দেবগুরু বৃহস্পতির সন্তান হিসাবে দৈত্যগুরু শুক্রের যে পৌরাণিক চরিত্রটি রচিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, শুক্রাচার্য অসুরকুলকে তপস্যার মাধ্যমে দৈবী শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠায় বাধা দেওয়ার জন্য সুখবাদে দীক্ষিত করে তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তুলেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে সুখবাদের শিকড়টি ইতিহাসের বেশ গভীরে প্রোথিত রয়েছে।

ভারতবর্ষে সুখবাদ বা বস্তুবাদ সাধারণভাবে 'চার্বাকমত' বলে প্রচারিত। চার্বাক কে ছিলেন বা আদৌ কেউ ছিলেন কিনা তা নিয়ে যে-মতপার্থক্য, সেটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে চার্বাক যে বার্হস্পত্যের প্রতিনিধি, সেবিষয়ে দ্বিমত নেই। ঋগ্বেদে (১০ মণ্ডল, ৭২ সূক্ত, ৩ ঋক) ঋষি বৃহস্পতি বলছেন যে, "প্রথমেঽসতঃ সৎ জায়ত"—অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হয়েছে। 'অসৎ' শব্দের অর্থ যদি 'জড়' হয় এবং 'সৎ'-এর অর্থ 'চৈতন্য' হয়; তাহলে এই উক্তির অর্থ দাঁড়ায় : জড় থেকে চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে। "জড় স্বভাব ভূতচতুষ্টয় থেকে উদ্ভূত"—এটিই চার্বাকের মত। সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা অলীক। কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোক প্রভৃতির পরিকল্পনা লোকবঞ্চনার্থে রচিত, তাই পরলোক বা পরকালে সুখভোগের আশায় ইহলোকের সুখকে অবহেলা করা মূর্খতা। স্বভাবই জগৎকারণ। প্রত্যক্ষই প্রমাণ।

চার্বাক বা লোকায়ত মত সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। নাস্তিকেরা রইলেন, কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস পায়নি। এখন প্রশ্ন হলো—'ঈশ্বর' কী? প্রচলিত অর্থে, ঈশ্বর হলেন সর্বনিয়ন্তা, অসীম, অনন্ত। মানুষ আমরা, তাই আমাদের কল্পনায় ঈশ্বর হলেন মহামানব। সাকারবাদীরা দেবদেবীর অনিন্দ্যকান্তি নানা মৃন্ময়মূর্তি গড়ে পূজা করেন। নিরাকারবাদীরা বিরাটের ধ্যান করেন। কিন্তু নাস্তিকেরা আগেই বলে রেখেছেন, এসবে তাঁরা তুষ্ট হবেন না। তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান। প্রচলিত অর্থে, গৌতম বুদ্ধ লোকায়ত-মতাবলম্বী, কিন্তু দার্শনিক। ভারতীয় অর্থেই দার্শনিক। লোকায়ত থেকে যে লোকাতীত হওয়া যায়, সে-সত্যটি তিনি তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধের লোকায়ত দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ 'বুদ্ধ' হয়ে যায়।" "বুদ্ধ কী জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা করে করে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।... যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

দেহবাদী নাস্তিকেরা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হলেন না। অতএব, দেহতত্ত্বেই আসা যাক। স্নায়ুবিজ্ঞান বলে, মানুষের দেহ হলো স্নায়ুপুঞ্জ। কত যে স্নায়ু দিয়ে এই দেহ গঠিত, তার ইয়ত্তা নেই। তবে এটি জানা গেছে, মানুষের দেহের মধ্যে অবিরাম স্নায়ুস্পন্দন চলেছে এবং স্নায়ুস্পন্দনের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের ভাব বা আচরণের প্রকাশ ঘটে, বিভিন্নতা ঘটে। স্নায়ু অন্তঃশূন্য। কিন্তু তার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের প্রকম্পন হওয়ায় তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটে। এক বা বহু স্নায়ু থেকে শক্তিরেখা বেরিয়ে আসায় একটি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহকে বলা হয় 'মন'।

স্নায়ুবিজ্ঞানীরা স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—এইভাবে স্নায়ুর প্রকারভেদ করেছেন। আমরা মনকে যেপ্রকারে স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে সমর্থ হই, আমাদের ভাবের প্রকাশও তদ্রূপ হবে। যিনি যতখানি মনকে সূক্ষ্ম স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারবেন বা সূক্ষ্ম স্নায়ুকে জাগ্রত করতে পারবেন, তিনি ততখানি বিশাল ভাব উপলব্ধি করতে পারবেন। তেমনিভাবে যিনি যত মনকে স্থূল স্নায়ুতে রাখবেন, তিনি তত বিচ্ছিন্ন বা নিকৃষ্টভাবে জগৎকে দেখবেন। আমরা যে 'উচ্চ' বা 'নীচ'-মনা মানুষ বলে থাকি, তা আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনের স্নায়ু অবস্থিতির প্রকাশ।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান' গ্রন্থে অনেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি বিস্তার করেছেন। তিনি একবার এমন একজন নিপাট ভালমানুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, যাঁর পেশা সার্কাসে বাঘের খেলা দেখানো। কেমন করে এই ভয়ঙ্কর খেলাটি নির্ভয়ে খেলেন তা জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন—খেলা দেখানোর আগে তিনি মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করেন, যেন তিনি বাঘের চেয়েও শক্তিশালী হিংস্র প্রাণী। এই মনোভাবে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তিনি বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করেন এবং তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক নিজের চেহারায় সেই হিংস্র ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত ভয় পেয়ে সরে আসেন। ভদ্রলোক স্বীকার করেছিলেন যে, খেলা দেখানোর পর অনেকক্ষণ তিনি একাকী থাকেন নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য। অর্থাৎ বাঘের খেলা দেখানোর সময় তিনি নিজের স্নায়ুতন্ত্রকে নিকৃষ্টতম হিংস্র প্রাণীর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যেতেন।

আজ যাঁরা দেহসুখের পিছনে নিরন্তর ছুটে চলেছেন, নিত্যনতুন উত্তেজনা খুঁজছেন, তাতে উন্মত্ত হচ্ছেন বা ক্ষমতান্ধ হয়ে যাঁরা ধর্মের নামে জেহাদি ত্রাস সৃষ্টি করছেন কিংবা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারী হয়ে পররাষ্ট্র আক্রমণ করছেন—তাঁরা সকলেই স্থূল স্নায়ুর নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে রয়েছেন। যত তত্ত্বকথাই আওড়ানো হোক না কেন, কখনো মনকে সূক্ষ্মতর স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার চেষ্টা আমরা করি না। নিজ নিজ 'অহং'কে নিয়েই আমরা ব্যস্ত! ওসব তত্ত্ব, আদর্শ ইত্যাদির কথা বলা আসলে 'অহং'কে পরিপাটি করে প্রকাশ করার জন্যই। একেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'কাঁচা আমি'। 'কাঁচা আমি' কখনো 'মান হুঁশ' হতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন, শুধু শাস্ত্র পড়ে কিছুই জানা যায় না। শাস্ত্রে কী লেখা আছে জেনে নিয়ে তার সাধনা করতে হয়। তিনি উপমা দিয়েছেন ঃ "চিঠিতে লেখা আছে, পাঁচ সের সন্দেশ এবং একখানি রেলপাড় ধুতি পাঠাইবে। ব্যস, চিঠির কাজ শেষ, এবারে সন্দেশ আর ধুতি জোগাড় করতে লেগে পড়।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলেছেন ঃ "দুধ না খেলে দুধের স্বাদ বোঝা যায় না।" অর্থাৎ ঠিক ঠিক জানতে হলে চাই কঠোর সাধনা, তবেই বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বা যুক্তিবাদীরা তা কি আদৌ বুঝবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনেক ঘটনা কারো কাছে অলৌকিক, কারো কাছে বিস্ময়কর, কারো কাছে তা পাগলামি। কোন কোন বস্তুবাদী আবার তাঁর অনেক আচরণকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে গ্রন্থও লিখেছেন। আসলে এসবই স্থূল স্নায়ুতে অবস্থিত মানব-মনের ব্যাখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকেই মনকে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে রাখতে

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

পারতেন। তখন তিনি সেটি বুঝতেন না। পরে সাধনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি জেনেছিলেন শুধু নয়, মনকে আর স্থূল স্নায়ুর উচ্চ পর্যায়েও নামাতে সমর্থ হতেন না। তাঁর মন তখন সবসময়ই সূক্ষ্ম স্নায়ুতে অবস্থান করত। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে তাঁর যে-ভাবসমাধির কথা বর্ণিত হয়েছে, স্নায়ু-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঐ অবস্থায় তাঁর মন অতি সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। তাঁর স্থূলদেহ পরীক্ষা করেও দেখা গিয়েছে যে, তাতে কোন সাড় নেই। তাঁর মন মহাকারণ স্নায়ুতে প্রবেশ করতে পারত বলেই তিনি চূড়ান্তভাবে বেদান্ত আস্বাদন করতে পারতেন। তাঁর কথায়—একবার বৈদান্তিক তোতাপুরী ধুনি জ্বেলে বসেছেন, তিনিও কাছাকাছি বসেছেন। এমন সময় একজন লোক তামাক খাওয়ার জন্য কলকেতে আগুন দেওয়ার জন্য ঐ ধুনি থেকে আগুন নিতে গেছে। অমনি তোতাপুরী লোকটিকে চিমটে দিয়ে মারতে তাড়া করলেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন ঃ "দূর শালা, দূর শালা!... এই মুখে বলছিলে—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সবকথা ভুলে মানুষকেই মারতে উঠেচ!" এমনই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 'অব্যক্ত' বোধ যে, তিনি নানান জীব, লতাপাতা, ঘটিবাটিকেও অখণ্ডের অংশ বলে অনুভব করতেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম এসব নিয়ে ঠাট্টা করলেও পরে বুঝেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তা উপলব্ধি করে মাঝে মধ্যে প্রকাশও করেছিলেন।

বাঘের খেলা দেখানো মানুষটির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, মনের স্নায়ুগত অবস্থিতিকেই দেহ প্রকাশ করে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের দেহ থেকে একধরনের আভা বিকীর্ণ হতো। আসলে তাঁরা মনকে কোনসময়েই সূক্ষ্ম স্নায়ুর নিচে নামাতেন না। সেটিই ছিল ওঁদের স্বাভাবিক অবস্থা। স্নায়ুপুঞ্জ সাম্যভাবে স্পন্দিত হওয়ায় গায়ের বর্ণ অন্যরকম হয়ে উজ্জ্বল ভাব প্রকাশ পায়। ত্বক্ মসৃণতা পেয়ে একধরনের স্বচ্ছ আভা প্রকাশ করে। গায়ের রঙ দিয়ে বিচার করলেও সাম্যস্পন্দনের তারতম্য বেশ বোঝা যায়। একজন সাধকের গায়ের বর্ণ সাধারণ লোকের চেয়ে উজ্জ্বল হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস সাম্যভাবে থাকে, চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়। আমাদের সমাজে এমন মানুষ দেখা যায়, যিনি অত্যন্ত সুপুরুষ, সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী এবং বাগ্মী। কিন্তু সাধকের স্পন্দিত স্নায়ুর সাম্যভাবটি তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। 'অহং'টি খুবই প্রকট। অপরদিকে বাহ্য সৌন্দর্য ব্যতিরেকেও প্রকৃত সন্ন্যাসীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সূক্ষ্ম স্নায়ুতে তাঁদের মনের অবস্থিতি। তাঁদের আচরণেও তা প্রতিফলিত হয়। প্রকাশিত হয় তাঁদের আন্তর সৌন্দর্য।

সাম্যস্পন্দন যখন কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে বলে 'নাদ'। 'নাদব্রহ্ম' কথাটি বহুশ্রুত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে বেশ কয়েকবার এই 'নাদ' নির্গত হতে শুনেছেন। তার মধ্যে একটি ঘটনা—স্বামীজী লণ্ডনে এক সন্ধ্যায় বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত প্রায় দুশোজন নরনারীর সামনে বক্তৃতা করছেন। শ্রোতারা সকলে চেয়ারে বসে। ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে করতে সহসা তাঁর মুখের ভাবটি অনির্বচনীয় হয়ে উঠল। চোখের ভাব স্নিগ্ধ অথচ সে-চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। তিনি হাত-দুটি তুলে যেন আশীর্বাদ করছেন। "হঠাৎ তাঁর দেহ হইতে এক নতুন ব্যক্তি আবির্ভূত হইল।... তাঁহার কণ্ঠ হইতে সাম্যস্পন্দনযুক্ত নাদ নিঃসৃত হইতে থাকিল। সংস্কৃতে তিনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ/ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।।' " স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে নাদ নিঃসৃত হওয়ামাত্র সকলে অভিভূত হয়ে নিজ নিজ চেয়ার পিছনদিকে সরিয়ে দিলেন এবং জানু পেতে করজোড়ে এমনভাবে নতমস্তক হলেন যেন তাঁরা আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। ঘর এমনই নিস্তব্ধ যে স্বামীজী ভিন্ন সেখানে যেন আর কেউ নেই! সংস্কৃত ভাষা শ্রোতাদের অজানা। তবু মনে হচ্ছে, শ্লোকের প্রতিটি শব্দ, মাত্রা, যতি ও ছন্দ তাঁদের স্নায়ুতন্ত্রে ধ্বনিত হচ্ছে। পরে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়ে এনে স্বামীজী ইংরেজিতে স্বস্তিবাচনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীর জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনা উৎসুক পাঠক-পাঠিকাদের জানা আছে। তবু আলোচনার প্রয়োজনে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মঠে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' কেনা হয়েছে। স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী নতুন ঝকঝকে বইগুলি দেখে তাঁকে বলেন ঃ "এত বই একজীবনে পড়া দুর্ঘট।" শিষ্য তখনো জানেন না যে, স্বামীজী ইতোমধ্যে দশটি খণ্ড শেষ করে একাদশ খণ্ডটি পড়া শুরু করেছেন। তিনি শিষ্যকে নির্দেশ করলেন, কোন্ পৃষ্ঠায় কী আছে তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে। শিষ্য নির্দেশ পালন করে তাজ্জব হয়ে গেলেন। উত্তরে স্বামীজী বলেন, মনোসংযোগের দ্বারা একাজ সম্ভব এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যই কেবল সেই মনোসংযোগ এনে দিতে পারে। তিনি কোন গ্রন্থই পঙ্‌ক্তি ধরে ধরে পড়তেন না, পৃষ্ঠাগুলি কোণাকুণিভাবে পড়তেন। এমনই ছিল তাঁর ধীশক্তি যে, কোন কোন পৃষ্ঠা না পড়েও তিনি বলে দিতে পারতেন কোন্ পৃষ্ঠায় কী আছে। এও কিন্তু ধ্যান বা স্নায়ুর সাম্যস্পন্দন। চিৎ শক্তি যখন সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে যায়, তখন বাহ্য স্নায়ুসকল নিমিত্ত হয়ে পড়ে।

আমরা খণ্ডিত বা বিশ্লিষ্টভাবে চিন্তা করি বলে 'অখণ্ড'কে বুঝতে পারি না। এভাবে চিন্তা করা স্থূল স্নায়ুর কাজ। আমাদের ভাবগুলিও তাই খণ্ডিত, অনেক সময় সঙ্গতিবিহীন। স্নায়ুবিজ্ঞান বলে, চিন্তা সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে গেলে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর সমভাবে সূক্ষ্ম স্নায়ু থাকায় চিৎ শক্তির প্রবাহ সর্বত্র সমানভাবে হয়ে থাকে। এইজন্য বলা হয়—মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, স্নায়ু দিয়ে চিন্তা কর; ভাবসকলকে স্নায়ুর ভিতর নিয়ে এস। ভাবে তন্ময় হয়ে যাও।

বস্তুবাদীরা হয়তো মানবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো অন্তর্দর্শী কবিরা ভাবে তন্ময় হয়েই 'সুন্দর'কে বলেছেন 'ঈশ্বর'। সত্য ও সুন্দরের প্রতীক মনে করা হয় বলেই শিবের ঐ রূপকল্পনা। 'সুন্দর'কে বর্ণনা করা যায় না, তা অনুভববেদ্য। ইন্দ্রিয়াতীত যা, তাতে শুধু তন্ময়ই হওয়া যায়। একটি আত্মকথন বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছাত্রাবস্থায় বর্তমান লেখককে একবার দার্জিলিঙে যেতে হয়েছিল। অনুষ্কা ও উষার মধ্যবর্তী সময়ে (যেটি তখন জানা ছিল না) হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গের দিকে চোখ পড়ল। একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। অনির্বচনীয় সে-দৃশ্য! তা কেবল অনুভব করে তাতে তন্ময় হওয়া যায়। কতক্ষণ সে-অবস্থায় ছিলাম জানি না। ঘরে ঠাণ্ডা আসায় এক বন্ধু উঠে এসে আমাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হতবাক। কয়েকবার 'কী করছিস এখানে' জিজ্ঞাসা করার পর তুষারশৃঙ্গের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিলাম। ৪৬ বছর আগেকার সেই স্মৃতি আজও আনমনা করে তোলে। অনেকের কাছে গল্প করেছি, কিন্তু উপলব্ধিকে সংবাহিত করতে পারিনি। আজ মনে হয়, ঐ অব্যক্ত 'সুন্দর'-তন্ময়তাই ঈশ্বরোপলব্ধি। আনন্দে বুক ভরে ওঠে আপন সৌভাগ্যে। 'সুন্দর'কে আর তো কোনদিন অমন করে পাইনি। তখন উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথের বেদনা—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই/ চিরদিন কেন পাই নে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, উপলব্ধি কেবল মানুষেরই হতে পারে। কারণ, তার সত্তাটি ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা তা জানি না, বুঝি না, বুঝতেও চাই না। তাই স্বামীজী যখন বলেনঃ "অভীঃ হও", তখন বোমা-পিস্তল হাতে তুলে নিই। তিনি যখন বলেনঃ "যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক", তখন অহঙ্কারে বক্ষ বিস্তার করে ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করি। ভুলেও ভাবি না যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের 'আত্মপ্রত্যয়ী' হতে বলেছেন—অহঙ্কারী নয়। যিনি আপন সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই পারেন আত্মপ্রত্যয়ী হতে। বাকি আমরা আস্তিকতা-নাস্তিকতার জ্ঞানাস্ফালনে মেতে রই। ❑

তথ্যসূত্র

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
- স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়
- স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়
- Charvaka-Shashti (Indian Materialism) forwarded by Mahamahopadhyay Dr. Bhagabat Kumar Shastri & Dakshinaranjan Shastri, The Book Company, Kolkata
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

১৩১৪ সাল। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত শ্রীশ্রীমা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। বাগবাজারে দো-মহলা গিরিশ-ভবনে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সাড়ম্বর আয়োজন করা হয়েছে। মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীতে শ্রীশ্রীমা গিরিশচন্দ্রের গৃহে পূজা দর্শন করেন ও স্বয়ং পূজা গ্রহণ করেন। সন্ধিপূজার সময়ে, গভীর রাত্রেও অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি গিরিশের আরাধিতা দশভুজার সম্মুখে উপস্থিত হন। গিরিশ-ভবনের ঠাকুরদালানের মূল আকৃতির সঙ্গে চিত্রকরের কল্পনা প্রচ্ছদে মিশে একাকার হয়েছে। সেই দালানে দশভুজার সেই সম্মোহনী রূপ। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে সবকিছু যেন উচ্ছল ও আনন্দমুখরিত হয়ে উঠেছে। কৃতকৃতার্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মায়ের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছেন—গভীর ভাবস্থ।

চিত্রকরঃ সৌরীশ মিত্র *কম্পিউটার গ্রাফিক্সঃ স্বামী হররূপানন্দ*

শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনা

রেণুপদ ঘোষ

শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনা ব্যাপারটি অভিনব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের নানা দিক নিয়ে বহু আলোচনা হলেও, কিভাবে তিনি শিবচরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এপ্রসঙ্গ নেই। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রেণুপদ ঘোষ এই দিকে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর চিন্তাভাবনার বাণীরূপ এই আলোচনাটি।

প্রারম্ভিক কথা

শিব-ভাবনা শরৎ-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিক। স্নেহ-ভালবাসা আর সহানুভূতি ও মঙ্গল ছাড়া শরৎ-সাহিত্যে বোধকরি একটুও ফাঁকা জমি নেই। আর যদি তা থাকেও, মনে হয়, সেখানেও শিব-মহিমা পাঠকের সঙ্গ ত্যাগ করে না—বিশেষত, শরৎচন্দ্রের পারিবারিক কাহিনীগুলিতে। শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনার প্রকাশ এই পারিবারিক কাহিনী-গুলিতেই বেশি। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র বহু আলোচিত হলেও শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনা নিয়ে কোন লেখা তেমন চোখে পড়ে না। কেন যে লেখেননি কেউ—সেটাই বড় বিস্ময়ের। এ-লেখার তাগিদটা সেই কারণেই।

আরেকটি কথা। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনেও শিব-প্রভাব ছিল। সে-ঘটনা সাধারণ হতে পারে, কিন্তু গুরুত্বে তা কম নয়। সকলেই জানি, ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল 'ন্যাড়া'। লোকমুখে 'ল্যাড়া'। শরৎচন্দ্র অল্পবয়সে এই নামটি নিয়ে মজা করতে পছন্দ করতেন। কখনো কখনো 'ন্যাড়া'কে লিখতেন 'লারা' (Lara)। কখনো ইংরেজিতে লিখতেন—'St. C. Lara'। পরিচিতজনেরা এর অর্থ কৌতুকের সঙ্গে গ্রহণ করতেন—'শরৎচন্দ্র ল্যাড়া'। তবে অন্য লোকেরা আচমকা লেখা-নামটি দেখে ভাবতেন—এ হয়তো হল্যাণ্ড কিংবা বেলজিয়ামের কোন সন্ন্যাসীর নাম—'সেণ্ট ক্রিস্টোফার লারা'। জানা যায়, ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রকে যে 'ন্যাড়া' বলা হতো, তার মূলে ছিল শিবের মানত। শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে সেই মানতরক্ষার জন্যই শিবের কাছে মস্তকমুণ্ডন করে বালক শরৎচন্দ্র সেবার ন্যাড়া হয়েছিলেন। আমরা মনে করি, যাবতীয় কৌতুক ছাপিয়েও এঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি হয়তো শরৎচন্দ্রের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। এই সাধারণ ঘটনাটিই হয়তো তাঁর ভাবী সাহিত্যে শিবচরিত্রের ভূমিকাও প্রস্তুত করেছে। আমরা শরৎচন্দ্রের পরিবারের এমন এক মানুষের কথাও জানি, যিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ইনি শরৎচন্দ্রের ভাই, নাম প্রভাসচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ইনি প্রায় ১২ বছরের ছোট ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর এঁর নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি নিজেও ১৯০২-এ নাগা সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র গৃহী হয়েও ছিলেন উদাসীন। সংসার করার স্বভাব তাঁর ছিল না। মনে হয়, বৈরাগ্যই তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল।

শরৎ-সাহিত্যের আসল সম্পদ চরিত্রসৃষ্টি। তখন পর্যন্ত গল্প অর্থাৎ প্লট-ই ছিল প্রধান। প্লটের জায়গায় শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙলা সাহিত্যে চরিত্র নিয়ে এলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র জানিয়েছেন, প্লট সম্বন্ধে তাঁকে কখনো ভাবতে হয়নি ঃ "কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র।" সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের 'চরিত্রায়ণ' অংশে (পৃঃ ১৪০) কথাগুলি আছে। ঐ গ্রন্থেরই একটি হিসাব থেকে জানা যায়—শরৎ-সাহিত্যে ৩৩০টি চরিত্রের মধ্যে পুরুষ-চরিত্রের সংখ্যা ১৭৭টি, নারী-চরিত্র ১২০টি এবং বালক-বালিকা ৩৩টি। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রগুলি প্রধানত প্রবল হৃদয়াবেগসম্পন্ন, নিরাসক্ত, ঢিলেঢালা স্বভাবের। আমাদের মনে হয়, শরৎ-সাহিত্যে শিব-চরিত্রের প্রভাবই এর মূল কারণ। কেবল পুরুষ-চরিত্রই নয়, নারী-চরিত্রেও শিব-প্রভাব দেখা যায়। একথা ঠিক, প্রধানত চরিত্রকে আশ্রয় করেই শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তাই, শিব-চরিত্র বলতে কী বুঝায়, অথবা শিব-চরিত্র কী—বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে সে-কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

প্রথমদিককার বৈদিক ভাবনায় 'শিব' শব্দটিকে আমরা পাই বটে, কিন্তু শব্দটি সেখানে সাধারণ বিশেষণ মাত্র অর্থাৎ

সর্বমঙ্গলকর। শেষদিকের বৈদিক ভাবনায় এই বিশেষণটিই পরিণত হয়েছে বিশেষ্যে। মহাদেব বেদের রুদ্র, না পৌরাণিক শিব তা স্পষ্ট নয়। অনেকে মনে করেন, বুদ্ধদেবের ধর্মীয় প্রভাবে শিবের চরিত্র কল্পনা করা হয়। কেউবা শিবকে দেখেন ভারতের আদি ও নিজস্ব দেবতারূপে। একদা ঋগ্বেদে রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে সকল প্রকার অনিষ্টের হাত থেকে নিস্তার পেতে।[১] রুদ্র সেখানে মঙ্গলকারীও। অথচ, শিব যেন আলাদা চরিত্র। তিনি যোগী, শান্ত, কামনাজিৎ এবং একপত্নীব্রত গৃহী।[২] এই শিবই আবার বিশ্বের আদি বীজ, সৃষ্টি-স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক। 'শিবায়ন'-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবের বন্দনায় লিখেছেন ঃ

> "সিন্ধু কালি পত্র ক্ষিতি চির লিখে সরস্বতী
> তবু অন্ত না পায় মহিমা।"[৩]

অর্থাৎ সমুদ্র যদি লেখার কালি হয়, পৃথিবী যদি লেখার পত্র হয় এবং স্বয়ং দেবী সরস্বতী যদি চিরকাল ধরেও লিখে যান, তবু শিবের মহিমা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। শিব-মহিমা এমনই অনন্ত, অসীম। ভারতীয় দর্শনেরও সারাৎসার শিব। 'বায়বীয় সংহিতা'র চতুর্থ অধ্যায়ে মুনিগণ বায়ুকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ শিবের শিবত্ব কী এবং কেনই বা তাঁকে শিব বলা হয়? "কিং শিবত্বং কুতঃ শিবঃ?" এর জবাবে বায়ু জানিয়েছেন ঃ পরমেশ্বরের শক্তিকে বলা হয় 'মায়া' এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ মায়াতে আবৃত হন। নিজ চিত্তের আচ্ছাদককে জ্ঞান-আবরক মল বা 'তমঃ' বলা হয়। আর স্বাভাবিক বিশুদ্ধি অর্থাৎ ঐ মলশূন্যতার নামই শিবত্ব—

> "মায়া মাহেশ্বরী শক্তিশ্চিদ্রূপো মায়য়াবৃতঃ।
> মলশ্চিচ্ছাদকো নৈজো বিশুদ্ধিঃ শিবতাস্বতঃ।।"[৪]

তিনিই ঋগ্বেদের রুদ্র দেবতা। যদিও বৈদিক যুগের বহু পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। তিনি কপর্দকহীন, শ্মশানবাসী, বৃষবাহন। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'তে তিনি গিরিশ, অথর্ববেদে এবং মহাভারতে কিরাতরূপী। মানুষের নিয়ত মঙ্গল করেন বলেই তিনি শিব। সংসারে আসক্তি সীমাহীন অথচ বন্ধনে শিবের চির উদাসীনতা।

বাঙলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় ('শিবায়ন'-এ তো বটেই) শিবের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আমরা জানি, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই শিব ভারতীয় জনসমাজে পূজিত হচ্ছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময়ও পঞ্চনদ প্রদেশে শিবপূজা প্রচলিত ছিল। অশোকও প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। সুঙ্গ, কান্ব, শক ও গুপ্ত-রাজগণের মধ্যেও শৈব প্রভাব ছিল। রাঢ় অঞ্চলে রাজা শশাঙ্কের সময় এবং তারপর সেনরাজাদের সময় শৈবধর্মের প্রসার ঘটে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' প্রভৃতিতে এর সমর্থন পাওয়া যাবে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার বুকে তুর্কি আক্রমণের দুর্যোগ নেমে আসে। প্রায় দুশো বছর ধরে তার জের চলে। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলার জনজীবনে আবার স্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যুগের প্রয়োজনে জন-মানসে প্রাচীনের সঙ্গে নবীন ভাবনার মিশ্রণ ঘটতে শুরু করে। বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি নবরূপ পেয়ে আবার সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বৈদিক রুদ্র, পৌরাণিক ধ্যানমৌনী রজতগিরিনিভ শিব গঞ্জিকাসেবী কৃষক শিবে পরিণত হন। বাংলার জনজীবনের সঙ্গে শিব-চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তিনি গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হতে থাকেন। শিব হয়ে ওঠেন বাঙালির আদর্শ চরিত্র। সুখ-দুঃখের বোধহীন নিষ্কলুষ দেবচরিত্রের তুলনায় গৃহী হয়েও এই বৈরাগী শিবই বাঙালির মনের মানুষ হয়ে ওঠেন। শিবের স্ত্রী অন্নপূর্ণা। তিনি বাঙালির ক্ষুধার অন্ন যোগান, দুঃখে অভয় দেন, ভক্ত-সন্তানের কাছে সর্বদা শক্তিময়ী, অভয়দাত্রীরূপে বিরাজ করেন। বাঙালি জানে, রাধাকৃষ্ণ থাকেন হৃদি-বৃন্দাবনে। কিন্তু শিবদুর্গা থাকেন বাঙালির সুখ-দুঃখে ভরা এই সংসারে। তাই বাঙালি শিবেরই গান গাইতে ভালবাসে। সে-ভালবাসা এমনই প্রবল যে, ধান ভানতেও তাকে শিবের গীতই গাইতে হয়! এক সময় ব্রতের মাধ্যমে বাঙালি মেয়েরাও শিবের মতো বর প্রার্থনা করত। বাঙালি শরৎচন্দ্রও আসলে এই শিবের কথাই শুনিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে।

শরৎ-সাহিত্যে শিব

শরৎ-সাহিত্যের শিব-চরিত্রগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক—আত্মভোলা, সদাশিব চরিত্র। যিনি সংসার-উদাসীন হয়েও হৃদয়ের সুধাভাণ্ডটি শেষপর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করে যান। দুই—রুদ্র, কিন্তু আশুতোষ চরিত্র। তিন—নীলকণ্ঠ চরিত্র। চার—শিব-দুর্গা চরিত্র। পাঁচ—অন্যান্য শিব-চরিত্র। মূলত এই পাঁচটি সূত্রকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সংসারে আমরা মানুষের চরিত্রে দেবতা শিবের আদলটি লক্ষ্য করব।

(১)

আলোচনার প্রথম পর্যায়টি 'বিন্দুর ছেলে' ও 'নিষ্কৃতি' দিয়ে শুরু করা যাক। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪) সম্পূর্ণ একটি পারিবারিক গল্প। যাদব আর মাধব দুই ভাই। দুই ভায়ের দুই স্ত্রী—অন্নপূর্ণা ও বিন্দু। পরিবারের একমাত্র ছেলে অমূল্য অন্নপূর্ণার সন্তান। কাহিনীতে গর্ভধারিণী মায়ের থেকেও কাকিমার বাৎসল্যের অতলান্তিক গভীরতা প্রদর্শিত হয়েছে। এ-গল্পে যাদব মুখুয্যের চরিত্রটি অদ্ভুত। সংসার-উদাসীন আত্মভোলা এ-চরিত্রে স্পষ্টতই শিব-চরিত্রের আদল রয়েছে। তিনি জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবি করেন, বাড়িতে পুজো-আচ্চা করেন আর গড়গড়া টানেন। সন্ধ্যাবেলায় আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলা এক সমস্যা! অন্নপূর্ণার কথা তিনি যেন কানেই শুনতে পান না। একবার ঐ মৌতাতের সময় দরজার শিকলটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

যাদব বহু কষ্টে চোখদুটি খুলে বলে ওঠেন ঃ "কে ও?" স্ত্রী অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকে বলেন ঃ "ছোটবউ কি বলতে এসেছে, শোন।" যাদব ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেন ঃ "ছোট মা? কেন মা?" তিনি বিন্দুকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। যদিও মাধব যাদবের সহোদর ভাই নয়—বৈমাত্রেয় ভাই, তবু নিজের দারিদ্র্য সত্ত্বেও ছোটভাই মাধবকে লেখাপড়া শিখিয়ে আইন পাশ করিয়েছিলেন। ধনাঢ্য জমিদার-কন্যার (বিন্দুবাসিনীর) সঙ্গে তার বিবাহও দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে বাঙালি পরিবারে ভাসুর-ভাদ্রবউয়ে কথা বলতে হলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন হতো। বিন্দুর হয়ে তাই এখানে মধ্যস্থতা করেছেন বাড়ির বড়বউ।

একবার অন্নপূর্ণা বিন্দুর এক আর্জি নিয়ে এসে স্বামীকে বললেন ঃ "ওর (বিন্দুর) ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ির মধ্যে একটা পাঠশালা করে দিতে হবে।" যাদব গড়গড়ার নলটা হাত থেকে হঠাৎ ফেলে দিয়ে শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ "কে চোখে খোঁচা মারলে? কই দেখি, কি-রকম হলো?" অন্নপূর্ণা নলটি আবার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে হেসে বললেন ঃ "এখনো কেউ মারেনি—যদির কথা হচ্ছে।" যাদব সুস্থির হলেন। বললেন ঃ "ওঃ, যদির কথা। আমি বলি বুঝি—।" এমন স্বামীকে নিয়ে স্ত্রীর জ্বালাও অনেক। অন্নপূর্ণা তাই রুষ্ট হয়েই বলেন ঃ "আপিঙের নেশায় মানুষের চোখই বুজে যায়, কানও কি বুজে যায়? বললুম কি, আর ও শুনলে কি!... আমার হয়েছে যেন সব দিকে জ্বালা।"

পিসতুতো বোন এলোকেশী উত্তরপাড়া থেকে হঠাৎ আসে তার বখাটে ছেলে নরেনকে সঙ্গে নিয়ে। এসেই সুখের সংসারে যত অনর্থ, অশান্তি বাধিয়ে তোলে। পরিণামে দু-ভায়ের সংসারে ফাটল ধরে। সংসার পৃথক হয়ে যায়। এ-কাহিনীতে অন্নপূর্ণা বুঝি প্রকৃতই অন্নপূর্ণা। তাঁর স্বামীও যেন ভোলা-মহেশ্বর। সংসারের যাবতীয় স্বার্থ, গ্লানি ও তিক্ততার ঊর্ধ্বে আত্মমগ্ন প্রশান্তচিত্ত যাদবকে দেবতা শিবেরই মানব সংস্করণ বলে মনে হয়। বিন্দুর খেয়ালি আচরণে তাঁকে বুড়ো বয়সেও জীবিকার জন্য অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে তবু তাঁর হৃদয়ে সেসব কোন দাগ কাটেনি। বিন্দুর কঠিন রোগের কথা শুনে তিনি প্রায় অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ "কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বউ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।" বট্‌ঠাকুর যাদব মুখুয্যে সম্বন্ধে বিন্দুর উক্তিও সরাসরি শিব-চরিত্রের দিকেই ইঙ্গিত করেছে—"ধন-দৌলত, আমোদ-আহ্লাদ অনেকেই পায়, সেটা বেশি কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মতো ভাসুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই।" কাহিনীর শুরুতে যাঁকে নেশাগ্রস্ত, সংসার-উদাসীন, কিছুটা হাস্য-উদ্রেককারী চরিত্র বলেই মনে হয়েছিল, কাহিনীর শেষদিকে তাঁর নির্মল দেবচরিত্রের দীপ্তি পাঠকের মনে আলো ছড়ায়। তাঁর আপাত ঔদাসীন্য এবং অমনোযোগের অন্তরালে যে মনোযোগী ও দায়িত্ব-সচেতন মানুষটির প্রকাশ ঘটেছে তাতেও আমরা শিবের সাহচর্যই খুঁজে পাই।

শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র (১৯১৭) কাহিনীও পারিবারিক। এতে ভবানীপুরের একান্নবর্তী চাটুয্যে পরিবারের কথা বলা হয়েছে। দুই সহোদর ভাই—গিরীশ ও হরিশ এবং খুড়তুতো ছোট ভাই রমেশ। গিরীশ ও হরিশ উকিল। রমেশ বেকার। তখনকার দিনে গিরীশের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা। হরিশও বছরে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপার্জন করত। অর্থাৎ ধনী পরিবার। রমেশ বার দু-তিন আইন পরীক্ষায় ফেল করে বড়দার দেওয়া হাজার তিনেক টাকা ব্যবসায়ে লোকসান করে বাড়িতে বসে আছে। খবরের কাগজে লেখালিখি করে সে দেশোদ্ধারে ব্যস্ত! বাড়ির বড়বউ সিদ্ধেশ্বরী। মেজবউ (অর্থাৎ হরিশের স্ত্রী) নয়নতারা। ছোটবউ (রমেশের স্ত্রী) শৈলজা বা শৈল। এবাড়িতে মেজবউ ও ছোটবউয়ে বনিবনা নেই। হরিশ আগে সপরিবারে মফস্‌সলে থেকে 'প্র্যাকটিস' করত। সম্প্রতি সদরে ফিরে এসেছে। হরিশের স্ত্রী নয়নতারা হালফ্যাশনের সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত। তার ছেলে অতুলের জন্য দরজি ডাকিয়ে ষাট-সত্তর টাকা দামের 'সুট' গড়িয়ে দেয়। এবাড়িতে তখন 'সুট' শব্দের মানেই কেউ বুঝত না। অন্তত বাড়ির বড়বউ সিদ্ধেশ্বরী 'সুট' কথাটা সেই প্রথম শুনেছে। আসলে এ-সংসারে অশান্তির আগুন জ্বেলেছে নয়নতারাই।

অন্যদিকে বাড়ির কর্তা গিরীশ নিজের কাজ, মকদ্দমা নিয়েই থাকেন। যদিও তিনি 'বিন্দুর ছেলে'র যাদব মুখুয্যের মতো আফিং খান না, কিন্তু নিজের কাজেই মগ্ন। সংসারের কোন কথাই তাঁর কানে ঢোকে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যেন সংসারের কোন সাতে-পাঁচেই তিনি নেই। অথচ শেষে দেখা যায়, 'বিন্দুর ছেলে'র যাদবের মতো এ-কাহিনীতেও বাঞ্ছিত পরিণতি ঘটাচ্ছেন তিনিই। গিরীশ হিমালয়ের মতোই স্থৈর্যশীল। শেষপর্যন্ত উদাসীনও মনে হয় না তাঁকে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌম্যমূর্তি এই মানুষটি ছোটভাই রমেশকে 'চোর-জোচ্চোর', 'বেহেড', 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে যেমন গালমন্দ করেন, তেমনি আবার পাটের দালালির জন্য এককথায় হাজার চারেক টাকাও ভাইকে দিয়ে দেন। কখনো দেশের বাড়ির মেরামত বাবদ পাঁচশো, কখনো এটা ওটা কেনাকাটা বাবদ আরো তিনশো, কখনো কোন কারণ ছাড়াই আটশো টাকা দিয়ে দেন ভাইকে। ভাইয়ের জন্য এইরকম খরচের কথা উঠলে গিরীশ হাসতে হাসতেই বলেন—এ হলো তাঁর 'শিব-স্থাপনা'।

বিবাদ এড়াতে বেকার রমেশ বউ ও ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েও নিষ্কৃতি পায় না। মেজকর্তার ওকালতি বুদ্ধি; সে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়। ওদিকে অসহায় রমেশ স্ত্রী শৈলর শেষ অলঙ্কারটিও নিয়ে যায় মকদ্দমার তদবিরের প্রয়োজনে। ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরছে,

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

দুশ্চিন্তায় শৈলরও কঙ্কালসার দেহ। এই অবস্থায় নিজের নামে কেনা দেশের বিষয়-সম্পত্তি সব ছোটবউমা শৈলজার নামে দানপত্র করে রেজিস্ট্রি করে দেন গিরীশ। এতে খুশি হন সিদ্ধেশ্বরী। সংসারের সমস্ত কাজে অত্যন্ত করিতকর্মা এই শৈলকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। একসময় তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধেশ্বরী বলেনঃ "শৈল আমার পুরুষমানুষ হলে এতদিনে জজ হতো।" শৈলর নামে দানপত্রের কথা শুনে কাহিনীর শেষে সিদ্ধেশ্বরী স্বামীকে বলেনঃ "তোমাকে যার যা মুখে এল গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন কোনদিন নয়।"

এই উদারহৃদয় মানুষটিকে চিনতেই পারেনি স্বার্থসর্বস্ব মেজভাই হরিশ এবং তার হীনমনা স্ত্রী নয়নতারা। চিনেছিল নিরীহ ছোটভাই রমেশ ও তার স্ত্রী শৈল এবং সিদ্ধেশ্বরী স্বয়ং। একবার নয়নতারার মুখের ওপর তাই সিদ্ধেশ্বরী বলেছিলেনঃ "দেখ মেজবৌ, এই ভাসুরের মান-মর্যাদা তোমরা বুঝলে না, কিন্তু বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাসুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।" শৈলর নামে নিজের কেনা বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে গিরীশ যেমন নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বেকার খুড়তুতো ভাই রমেশকে, তেমনি চাটুয্যে পরিবারেরও নিষ্কৃতিলাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবিষয়ে 'বিন্দুর ছেলে' ও 'নিষ্কৃতি'—উভয় কাহিনীতেই বেশ মিল। যাদব এবং গিরীশ দুজনেই আপাত উদাসীন, আত্মমগ্ন; কিন্তু উদার চরিত্রের মানুষ। এইধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে সদাশিব মহাদেবকেই আমরা খুঁজে পাই।

(২)

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে শিব চরিত্রের রুদ্র কিন্তু আশুতোষ রূপটি আমরা খোঁজার চেষ্টা করব। 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬) উপন্যাসে গোকুল মজুমদার বড় ছেলে, তার সৎমা ভবানী। গোকুল লেখাপড়ায় ভাল নয়। জয়গোপাল মাস্টারের ভাষায় 'গাধার সর্দার'। পরীক্ষায় সে বারবার ফেল করবে, তবু মাস্টার মশাইয়ের ইঙ্গিত সত্ত্বেও বই খুলে লিখবে না। ছেলের এই সততার জন্যই বাবা বৈকুণ্ঠ মজুমদার গোকুলকে স্কুল ছাড়িয়ে গঞ্জের মুদিখানায়—দোকানের কাজে লাগিয়ে দেন। নিজের কাছে রেখে ব্যবসা শিখিয়ে পড়িয়েও নেন। বিনোদ গোকুলের বৈমাত্রেয় ভাই। সে মেধাবী। স্কুলে 'ডবল প্রমোশন' পায়। পরে সোনার মেডেলও পায়। তা নিয়ে কত অহঙ্কার গোকুলের। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের নয়নতারার মতোই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা। সর্বদা কেবল নিজের আখের গোছানোর ফিকির করে। মনোরমার বাবা বন্দিপাড়ার নিমাই রায় ডাকসাইটে জাঁহাবাজ মানুষ। নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের সর্বেসর্বা। বৈকুণ্ঠ মজুমদার মৃত্যুর আগে উকিল ডেকে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বড় ছেলে গোকুলের নামে উইল করে যান। ভবানী নিজের ছেলে বিনোদকে বঞ্চিত করে গোকুলের নামে উইল করার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেন এবং উইলে সাক্ষী হিসাবে নিজের নামও স্বাক্ষর করেন। কারণ, কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়ে কুসংসর্গে পড়ে তার স্বভাব নষ্ট হয়েছে। বাড়ি থেকে তাকে আনতে দুজন কর্মচারীও পাঠানো হয়। তারা দুদিন বিনোদের বাসায় বৃথা অপেক্ষা করে ফিরে আসে। বিনোদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

চালাক-চতুর জাঁহাবাজদের ভিড়ে নির্বোধ সাদাসিধে গোকুলকে দেখে অনেকেরই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'র কথা। কেউ কেউ গোকুল এবং রামকানাইকে একাসনেই বসাতে চাইবেন হয়তো। কিন্তু আমরা মনে করি, এই নির্বুদ্ধিতা উভয় ক্ষেত্রে এক নয়। পিতৃসত্য পালনের দায় বহন করে বুদ্ধিমানদের কাছে যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে গোকুল—সেটি তার অর্জিত ন্যায়পরায়ণতা নয়, সেটি তার জন্মগত ও কুণ্ঠাহীন সংস্কার। যা তার শৈশবে স্কুলের বিরুদ্ধ পরিবেশেও সে নিজের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছিল এবং পরে বাবার সান্নিধ্যে নিবিড় আনুকূল্য পেয়ে তা আরো বর্ধিত হয়ে ওঠে। এই কারণেও আমরা গোকুল-চরিত্রে শিব-ভাবনার মহত্তর প্রকাশ ঘটেছে বলে ভাবতে পারি। আবার এই আপাত-নিরীহ মানুষটির চরিত্রে শিবের রুদ্র রূপের প্রকাশও দেখি আমরা। উইল সংক্রান্ত পিতৃসত্য পালনের ক্ষেত্রে শ্বশুর নিমাই রায়ের কটুকথা যখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা বিমাতা ভবানীর প্রতি কটূক্তি যখন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে, তখন বোমার মতো ফেটে পড়ে গোকুল। শ্বশুরের মুখের ওপর সদম্ভে বলেঃ "চোপরাও বলচি! আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব।" সে একবার নিজেই বলেছেঃ "গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর।" রেগে গেলে সে তার স্ত্রী মনোরমাকেও ছেড়ে কথা বলে না। আবার তার ক্রোধ মা ভবানীকেও রেহাই দেয় না। তবে সে আশুতোষও। রাগ তার দীর্ঘস্থায়ী নয়; অল্পেই তুষ্ট হয় সে। বিনোদ, ভবানীকে মুখে সে যাই বলুক, তাদের জন্য হৃদয়ে সর্বদাই একটা টান অনুভব করে। সমগ্র কাহিনীর যা মূলধন, তা মূলাধারও বটে। এইখানেই তার শিব-চরিত্রের আদলটি নিহিত।

কাহিনীর শেষে আমরা তাকে ভয়ঙ্কর রূপে জ্বলে উঠতে দেখি। সমাজের যত মান্যগণ্য মানুষদের সামনে গোকুল তার পা বিনোদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উদ্ধত চিৎকারে বলে ওঠেঃ "আয় হতভাগা, এদিকে আয়। এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি, ছুঁয়ে বল—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই তো আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।" তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে সে বলে ওঠেঃ "বাবা শুনচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন, 'গোকুল, এই রইল তোমাদের দু-ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিও বাবা তার যাকিছু পাওনা।' ওপর থেকে বাবা দেখচেন, সেই বিষয় আমি

যক্ষের মতো আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসবে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি, আর ও বলে আমি জোচ্চোর। আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েচে।" সুতরাং আপাত নির্বোধ গোকুল চরিত্রে আমরা পৌরুষের রুদ্র পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করি। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, এই পৌরুষ মানুষের পেশি-শক্তির ভিতর জন্মায় না—জন্মায় মানুষের শিবানুভূতির গভীরে; হৃদয়ের মহাপ্রাণতায়। এই কারণেই 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর কাহিনীও সত্য, শিব ও সুন্দরের বাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে মানুষের চিরকালীন ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছে।

(৩)

শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনার তৃতীয় পর্যায়ে 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) উপন্যাসের কথা আলোচনা করা যাক। এখানে শিব-চরিত্রের নীলকণ্ঠ রূপটিই প্রধান। সমাজ-সংসারের সমস্ত গরল নীলকণ্ঠ-শিব ছাড়া কেইবা ধারণ করবে! 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয় মুখুয্যেকে একডাকে সবাই চেনে। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, গরিব এবং দরদি। কিছুটা বাতিকগ্রস্তও—হোমিওপ্যাথি নিয়ে তার নির্বিচার উৎসাহ-আগ্রহ। অথচ বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে একটি রোগীও জোগাড় হয় না। তাঁর সেই বাস্তববুদ্ধিও নেই। আমাদের মনে পড়ে 'শিবায়ন'-এর কৃষক শিবের কথা। বাস্তববুদ্ধির অভাবের জন্যই শিবের জমিতে মাত্র 'আড়াই হালা ধান'-ই জন্মায়। এই কারণে প্রিয়নাথও ব্যর্থ চিকিৎসক। অনেক লাঞ্ছনা-অপমানও তাঁকে সইতে হয়।

শরৎ-সাহিত্যের সবচেয়ে নৃশংস, জঘন্যতম চরিত্র হলো 'বামুনের মেয়ে'র গোলোক চাটুয্যে। পাষণ্ড গোলোকের কার্যকলাপ কেবল দেশে নয়, মহাদেশও অতিক্রম করে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়া চালান দেওয়ার গোপন কারবার তার। কসাইয়ের কাজে গরু চালান দেওয়ার জন্য মুসলমান কারবারিকে চড়া সুদে সে টাকা ধার দেয়। তার লাম্পট্যেরও শেষ নেই। নিজের আশ্রিতা অনাথা এক বিধবার চরম সর্বনাশেও সে কুণ্ঠিত নয়। অবশেষে সে-লাম্পট্যের বোঝা বইতে হয়েছে মহাপ্রাণ শিবতুল্য মানুষ প্রিয় মুখুজ্যেকে। গোলোক চাটুয্যে নিজের কলঙ্ক, অপরাধ তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করেও দিয়েছে।

আসলে প্রিয়নাথ ও গোলোক—সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্র। শরৎচন্দ্র অ-শিব চরিত্রের যাবতীয় আয়োজনে গড়ে তুলেছেন গোলোক চরিত্রকে। এ-কাহিনী পাঠ করে সহৃদয় পাঠকের মনে হবে—ভণ্ড গোলোক চাটুয্যেদের বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা-নীচতার ঘৃণ্য রূপ যেন এ-সমাজেরই অবক্ষয়িত দিক। আর এই অবক্ষয় থেকেই জন্ম নেয় হলাহল। প্রিয়নাথ মুখুয্যের মতো মানুষদেরই সে-বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হতে হয়। শুধু ব্রাহ্মণ বলেই নয়, প্রিয়নাথকে গাঁয়ের সাধারণ মানুষেরা যে 'পাগলাঠাকুর' বলে ডাকত, সে হয়তো তাঁর এই শিবতুল্য চরিত্রের জন্যও। কাহিনীর শেষে, প্রিয় ডাক্তার যখন চিরকালের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন মেয়ে সন্ধ্যাও বাপের সঙ্গী হতে চায়। মেয়ে দেখে, মা জগদ্ধাত্রীর ঘরের দরজা বন্ধ; ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না তাঁর। মায়ের সেই রুদ্ধ ঘরের চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে মেয়ে জন্মের মতো শেষপ্রণাম করে বলেঃ "মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম, তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না। কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হলো তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্তত একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।" এখানে, মেয়ের জবানিতে শরৎচন্দ্র বোধকরি, বাপের মনের কথাই বলতে চেয়েছেন। কাহিনীর একেবারে শেষে, প্রিয়নাথ শান্তভাবেই জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের বীভৎস গরল গ্রহণ করে অমৃতপুরুষ হয়ে উঠেছেন। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে শিব-চরিত্রের এমন মহৎ প্রকাশ আর নেই!

(৪)

আলোচনার চতুর্থ পর্যায়ে দেখব শিব-দুর্গার আদলটিকে। শরৎ-সাহিত্যে শিব-দুর্গা (বা হর-গৌরী)-র প্যাটার্ণ আমরা হামেশাই লক্ষ্য করি। এই প্যাটার্ণ কখনো চরিত্রের নামকরণে, কখনো বা নাম ও আচরণ—উভয়ত দেখা যায়। যেমন—'বিন্দুর ছেলে'র যাদবের স্ত্রীর নাম অন্নপূর্ণা। 'নিষ্কৃতি'র গিরীশের স্ত্রীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথের স্ত্রীর নাম জগদ্ধাত্রী। যদিও এই নামের পিছনে শিব-চরিত্র নির্মাতা শরৎচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটির কথাও পাঠক নিশ্চয় স্মরণে রাখবেন।

তবে 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে দেখি, এই প্যাটার্ণে কিছু অভিনবত্ব রয়েছে। এখানে শিব-দুর্গার আদলটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শিব-তুল্য বড় ছেলে গোকুল মজুমদারের আচরণে, আর বিমাতার 'ভবানী' নামের মধ্যে। অবশ্য তাঁর আচরণেও 'ভবানী' নামের সঙ্গতি আছে। আবার এই প্যাটার্ণটি 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ ও জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর মধ্যেও পাওয়া যায়।

(৫)

আলোচনার পঞ্চম পর্যায়ে 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'গৃহদাহ' (১৯২০) এবং 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) উপন্যাসের কথা ভাবা যেতে পারে। হয়তো 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসের নামও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শরৎ-সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে যেসব শিব-চরিত্র রয়েছে, এখানে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ এই রকমই এক শিব-চরিত্র। প্রণয়াবেগ ছাড়াও এই চরিত্রে মহৎ আদর্শ, সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা আর অসামান্য মানবিকতার বিপুল সমাবেশ ঘটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। নিঃসন্দেহে এ এক মহত্তর সৃষ্টি।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

অনেকে ইবসেনের 'An Enemy of the people' নাটকের নায়ক ড. স্টকম্যানের সঙ্গে 'পল্লীসমাজ'-এর নায়ক রমেশের মিল খুঁজে পান। সত্যিই, ড. স্টকম্যানের মতোই রমেশও যাদের উপকার করতে গিয়েছিলেন, তাদের কাছেই চরম আঘাত পেয়েছিলেন। যে-সমাজ রমেশের দ্বারা উপকৃত, সেই সমাজেরই নিষ্ঠুর আঘাত সইতে হয়েছে তাঁকে। তবু রমেশ কিন্তু শেষপর্যন্ত অপরাজিতই থেকে গিয়েছেন। বেণী, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, ভৈরব আচার্য, এমনকি রমাও তাঁর প্রতি নির্মম আঘাত হেনেছে। কিন্তু পতন ঘটানো সম্ভব হয়নি। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি রমাকে হারান বটে, কিন্তু মাতৃভূমিকে হারান না। জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী আসলে রমেশেরই পরিপূরক। তাঁর আশ্রয়ও। এই কারণে কেবল ইবসেনের চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজেই তৃপ্ত থাকলে চলবে না; মনে রাখতে হবে, রমেশ ও সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রে শিব-ভাবনার যে-আদর্শটুকু ছড়িয়ে আছে, তা শরৎচন্দ্রের সচেতন সৃষ্টি।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান নায়ক মহিম একধরনের ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র বলেই মনে হয়। তাঁর ঔদাসীন্যও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ। মহিম নিজের স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডির মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকতে চান। কিন্তু প্রতিনায়ক সুরেশ সাধু নয়—পাষণ্ডও নয়। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটিকে যেন পাগল করেই নির্মাণ করতে চেয়েছেন। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ীর সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে। তবে কিরণময়ী পাগল হয়েছিল শেষে, সুরেশ ছিল প্রথম থেকেই। এই ধরনের পাগলামিতে যে লৌকিক শিবেরই অনাচারের ছায়াপাত ঘটেনি, তাই বা কে বলবে?

'শেষপ্রশ্ন'র রাজেন চরিত্রে শরৎচন্দ্রের শিব-ভাবনার পরিচয় অনেকটা সরাসরিই পাওয়া যায়। এমন ভয়শূন্য সাধুচিত্ত পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না। এই চরিত্র যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবলীলায় ফেলে দিতেও পারে। এই আশ্চর্য নিস্পৃহতা শরৎচন্দ্রের শিব-ভাবনারই অন্যতম প্রধান দিক বলে মনে হয়।

শেষকথা

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মতোই বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও রয়েছে। তবে, দেশীয় প্রভাব—বিশেষত শিব-চরিত্রের প্রভাব, সেখানে এতই প্রবল যে, পাশ্চাত্য প্রভাবকে ছাড়িয়ে যেতে দেয়নি। মূলত এই কারণেও শরৎচন্দ্র বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আধপাগল, নেশাগ্রস্ত কমলাকান্ত-চরিত্রে বিদেশী প্রভাব থাকলেও এ-চরিত্রে শিবের লৌকিক আদলটিও দুরনিরীক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর চরিত্রটি ব্রাহ্ম আদর্শেই গড়া। তবে, এ-চরিত্রেও শিবের আদলটি রয়ে গিয়েছে।

শরৎচন্দ্র শিব-চরিত্রের উত্তরাধিকার হয়তো কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন। একসময় শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের নিবিড় অনুকরণের চেষ্টাও করেছিলেন। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭) থেকে জানা যায়—একদা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রবল টান শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করতে পারেননি। ঐ গ্রন্থেরই ২১৬ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক সেন আমাদের জানিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও শরৎচন্দ্রের কাহিনিতে আগাগোড়াই বর্তমান। উৎসাহী পাঠক তা পড়ে নিতে পারেন। 'শিক্ষার বিরোধ' রচনায় শরৎচন্দ্র নিজেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গুরুতুল্য পূজনীয় বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। (দ্রঃ শরৎ সাহিত্য সমগ্র, অখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১৯৬২)

এছাড়াও, শরৎচন্দ্রের সমকালীন একান্নবর্তী পরিবার-গুলির কথাও আমরা মনে রাখতে চাই। সেকালের যৌথ পরিবারগুলিতে এই শ্রেণির উদাসীন, আত্মভোলা, বাঙালি চরিত্রের অভাবও ছিল না। বিশেষত, শৈশবে ও বাল্যে শরৎচন্দ্র এই ধরনের একান্নবর্তী পরিবারেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে বৈমাত্রেয় ভাই, খুড়ি-মামি, দেওরের ছেলে, ভাইপো-ভাগ্নে প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে সুনিবিড় স্নেহবন্ধনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শিব-চরিত্রের উত্তরাধিকার শরৎচন্দ্র ঐ একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যেও পেয়ে থাকতে পারেন। শরৎচন্দ্রের পিতৃদেবের চরিত্রও অনেকটা এইরকম ছিল। তাঁর দারিদ্র্য এবং ঔদাসীন্যও আমাদের অজানা নয়।

শেষকথায় আমরা এখন নিজেদের দিকেই ফিরে তাকাতে চাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পাঠ করতে বসলে আমরা নিজেদের অজান্তেই চোখের জলে অন্ধ হয়ে যাই। সব অক্ষর হারিয়ে যেন পৌঁছে যাই অপরাহত হৃৎকমলে। সেথায় উদ্‌গত কান্নায় শরৎচন্দ্র কথা বলেন তাঁর পাঠকের সঙ্গে। এই তাঁর দস্তুর! পরে যখন চোখের জলেই ধুয়ে আমরা আবার ফিরে পাই নিজেকে, তখন দেখি, শিবত্বের যে-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আমাদের বুকের মধ্যে, হৃদয়ের গভীরে—কাহিনীতে তাকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক। অসুন্দরের ওপর সুন্দরের এই প্রতিষ্ঠা দেখে—এযুগেও সেই দুর্লভ আনন্দে বড় তৃপ্ত হই আমরা। শরৎ-সাহিত্যে শিব-ভাবনা তাই একালের পাঠককেও রেহাই দেয় না। ভবিষ্যতের জন্যও এক্ষেত্রে আমরা সমান আশাবাদী। ❑

সূত্র

(১) 'ঋগ্বেদ-সংহিতা', ১ম খণ্ড, ১ম মণ্ডল, সূক্ত ১১৪, মন্ত্রসংখ্যা ৭-১১, হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩

(২) 'পৌরাণিকা'—অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৬৭

(৩) 'রামেশ্বর রচনাবলী'—পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১, পৃঃ ৩৫৬

(৪) 'শিবপুরাণ', নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২, শ্লোক সংখ্যা ১৯, ২০, পৃঃ ৭১২

কথামৃত ভবন—এক মহাতীর্থ

দীপক গুপ্ত

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের 'শতবর্ষ' সম্প্রতি উদযাপিত হলো (১৯০২-২০০২)। কাজেই 'কথামৃত' এবং শ্রীম সম্পর্কিত নানা আলোচনা গত বছরে এবং ২০০৩-এও বহুস্থানেই আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করেছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেও এপ্রসঙ্গে লেখা বেশ কয়েকটি প্রকাশিত হলো। এখনো যে এই বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথ নির্ণীত হয়েছে বলা যায় না। তীর্থী যেখানে বাস করেন কিংবা গমন করেন, তা তীর্থে রূপান্তরিত হয়। কথামৃতকার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর প্রপৌত্র দীপক গুপ্তের এই প্রামাণ্য রচনাও এই 'শতবার্ষিকী স্মরণ'-এর একটি অঙ্গ হিসাবেই প্রকাশিত হলো।

বিশ্ববন্দিত মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর গ্রন্থকার শ্রীম-র প্রকৃত নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ভক্তমণ্ডলীতে ছদ্মনামে তিনি 'মাস্টার মহাশয়' বা 'শ্রীম' নামেই বিশেষ পরিচিত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য ও লীলাপার্ষদ ছিলেন তিনি। তাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগবত রচনা করার জন্য সঙ্গে এনেছিলেন। তাই অনেকেই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের ব্যাসদেব বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর পৈতৃক বসতবাটী 'কথামৃত ভবন' বা 'শ্রীম-র ঠাকুরবাটী' নামে বিশেষ পরিচিত। কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর কলেজের খুব কাছেই এই 'কথামৃত ভবন' (১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কাছে শ্রীম-র ঠাকুরবাটী বা কথামৃত ভবন এক মহাতীর্থ। এই ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার পদার্পণ করেন। শ্রীশ্রীমা এই বাড়িতে তিনবার বসবাস করেছেন—যথাক্রমে একুশদিন, দশদিন ও একমাস যাবৎ। এই বাড়ির দোতলার একটি কোণের ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীমও এই ঘরে বেশ কিছুকাল ছিলেন। তিনি এই ঘরটিকেই 'কথামৃত' রচনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন—কেননা স্বয়ং মা যে এই ঘরে থাকতেন! 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগ লেখা শেষ করে ১৯৩২ সালের ৪ জুন ফলহারিণী কালীপূজার দিন "গুরুদেব, মা, আমায় কোলে তুলে নাও"—এই শেষবাক্য উচ্চারণ করে শ্রীম এই ঘরেই দেহত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফলহারিণী কালীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীপূজা করেছিলেন। শ্রীম মনে করতেন, এই তিথিটি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ তিথি। হয়তো তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাওয়ার জন্য এই তিথিটিই বেছে নিয়েছিলেন! স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ এবং ঠাকুরের কয়েকজন গৃহী শিষ্য এই কথামৃত ভবনে উপস্থিত থেকে শ্রীম-র সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা এই ঘরেই শ্রীম-র সঙ্গে মিলিত হতেন।

বর্তমানে এই ঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিসপত্রাদি সংরক্ষিত আছে। একটি কাঁচের আলমারিতে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাঞ্জাবি, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, চুমকী ঘটি প্রভৃতি। আবার শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত একটি ছোট ঘটি এবং 'কথামৃত' রচনাকালে শ্রীম-র ব্যবহৃত একটি দোয়াতদানিও রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনদলের ছবি—যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শ্রীমকে উপহার দিয়েছিলেন। এই ঘরের একপাশে শ্রীম-র ব্যবহৃত তক্তপোশের ওপর বিছানায় তাঁর বৃদ্ধ-বয়সের যোগিজনোচিত প্রতিকৃতি এবং তক্তপোশের সংলগ্ন একটি গ্লাসকেসে তাঁর ব্যবহৃত পাদুকা সংরক্ষিত আছে।

কথামৃত ভবনে বসার ঘরে শ্রীম-র প্রতিকৃতি

এই কথামৃত ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের এক অপূর্ব লীলা সংগঠিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন, তখন একদিন শ্রীম ঠাকুরকে তাঁর মনের দুটি ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা জানান। একটি হলো—তিনি ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পুণ্য জন্মস্থান কামারপুকুর গিয়ে তাঁর বাল্য ও কৈশোর লীলার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করবেন এবং তাঁর শ্রীমুখ থেকেই তাঁর লীলাকাহিনী শুনবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ইচ্ছার কথা শুনে শ্রীমকে বলেন ঃ "দেখো, মা যদি শরীরটা রাখেন তো দুজনে একসাথে যাওয়া যাবে।" কিন্তু অল্প কিছুকালের মধ্যেই ঠাকুর মহাসমাধি-লাভ করেন এবং তাই শ্রীম-র এই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছাটি ঠাকুর পূর্ণ করেন। শ্রীম তাঁর বসতবাটিতে দুর্গাপূজা

করার ইচ্ছা ঠাকুরকে জানালে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হয়ে বলেন ঃ "সে তোমার হয়ে যাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ১৮৮৮ সালের শারদীয় দুর্গোৎসবের কয়দিন আগে থেকেই শ্রীশ্রীমা শ্রীম-র বসতবাটিতে বেশ কিছুকাল ছিলেন। সেইসময়ই একরাত্রে শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ পান। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে বলেন ঃ "সামনে দুর্গাপূজা, এখানে ঘটস্থাপনা করে পূজার ব্যবস্থা করো।" সেইমতো ৬ অক্টোবর, শনিবার শ্রীশ্রীমা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ছাদ-সংলগ্ন একটি ঘরে প্রবেশ করে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পট এবং শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীর ঘট প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। এইভাবেই শ্রীম-র স্বগৃহে দুর্গাপূজা করার বাসনা পূর্ণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন থেকেই ঘরটি 'ঠাকুরঘর' এবং বাড়িটি 'ঠাকুরবাড়ি' বলে পরিচিত হয়। সেইদিন থেকে আজ অবধি শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত ঘটে শিবদুর্গাজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়েরই নিত্যপূজা হয়ে আসছে। দুটি কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনের একটিতে আছে স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গৃহীত আলোকচিত্র এবং অপর সিংহাসনে আছে শ্রীম-র প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের পট। এই দুই সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ঘটের ঠিক পাশেই একটি গ্লাসকেসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত পাদুকা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের কেশ ও নখ, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত জপের মালা, সিঁদুরকৌটা প্রভৃতি নিত্য পূজিত হয়। অপর একটি ছোট গ্লাসকেসে শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন সংরক্ষিত ও নিত্য পূজিত হয়। এই ঘরে শ্রীশ্রীমা যেমন অনেক ভক্তকে দীক্ষাদান করে কৃতার্থ করেছিলেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তবৃন্দ কত পূজা, জপ, ধ্যান করেছেন। শ্রীম একদিন বলেছিলেন ঃ "ওঃ, এখানে কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে!"

শ্রীম-র সহধর্মিণী নিকুঞ্জদেবী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্যা, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা এবং সেবিকা। নিকুঞ্জদেবীর মুখে শোনা যায়, শ্রীম প্রায়শই বলতেন ঃ "আহা! ঠাকুর ও মাঠাকরুনের কী অসীম ও অনন্ত ভালবাসা আর কৃপা! এক ভক্ত ঠাকুরকে দুর্গাপূজার কথা বললেন, আর তিনি স্বয়ং জ্যান্ত দুর্গাকে দিয়ে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করলেন।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঠাকুরঘরের সংলগ্ন ছাদে একটি সুপ্রাচীন বেদি আছে। স্বামীজী, শ্রীম প্রমুখ অনেকে এই বেদির ওপর বসে ধ্যান করেছিলেন। শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে থেকে সাধন করেছিলেন, তখন একদিন (২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে (ছদ্মনামে 'মণি'কে) আদেশ করেছিলেন ঃ "দেখ, ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে—'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী। তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী'। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়।" উল্লিখিত বেদির ওপর শ্রীম প্রায়শই ধ্যানশেষে এই গানটি গাইতেন। শোনা যায়, একদিন ঐ বেদির ওপর এই গানটি গাইতে গাইতে শ্রীম ভাবাবিষ্ট অবস্থায় জগন্মাতার দর্শন পেয়েছিলেন। তাছাড়া, ছাদে তাঁর স্বহস্তে রোপিত একটি গুলঞ্চফুলের গাছ আজও বর্তমান। কোন একসময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে এই গাছের ডালটি এনে রোপণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীম প্রথম দর্শন করেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি। দর্শন করা মাত্র শ্রীম বোধ করেন—"যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ-কীর্তন করিতেছেন।" প্রথম দর্শনের দিন থেকে যখনি তিনি ঠাকুরের কাছে যেতেন ও তাঁর সঙ্গ করতেন—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে, বলরাম মন্দিরে, অন্যান্য ভক্তগৃহে, পণ্ডিত দর্শনে, ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে, শ্যামপুকুরবাটীতে ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে—তিনি যা যা দেখতেন ও শুনতেন পারিপার্শ্বিক বিবরণ-সহ সবকিছুই ছোট্ট করে সাঙ্কেতিকভাবে বার-তিথি-নক্ষত্র-তারিখ-সহ তাঁর দিনলিপি বা ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। আর প্রায়শই ঐ ডায়েরিতে ডুবে থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানচিন্তা করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ঘটস্থাপনার পরই শ্রীম-র প্রাণে জেগে ওঠে 'কথামৃত' রচনার প্রেরণা। তিনি বোধ করেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তাঁর বুকে এই প্রেরণাটি জুগিয়েছেন। এইসময় থেকেই ঐ ডায়েরিকে অবলম্বন করে নানা দিনের শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা এবং তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশগুলি হুবহু পরিবেশন করার পরিকল্পনাটি শ্রীম-র মনে উদিত হয়। ঠিক এই ধাঁচেই প্রথমে তিনি ইংরেজিতে 'Gospel of Sri Ramakrishna' এবং পরে তাঁর গুরুভাইদের অনুরোধে, বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে শ্রীম বাঙলায় 'কথামৃত'-রচনায় মনোনিবেশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি ও কৃপায় পরিপুষ্ট হয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের অবিরাম অনুপ্রেরণায় শ্রীম রচনা করলেন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত মহাগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদস্পর্শে মহাপবিত্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীম প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের অবস্থানে ধন্য এবং মহাগ্রন্থ 'কথামৃত' রচনার পুণ্যক্ষেত্র হিসাবে কথামৃত ভবন আজ এক মহাতীর্থ। শ্রীশ্রীমায়ের শুরু করে যাওয়া নিত্যপূজা ছাড়াও প্রতিবছরই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, শ্রীম প্রমুখের জন্মোৎসব এবং মহাষ্টমীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত ঘটে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় এই কথামৃত ভবনে।❑

প্রাচীন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র

ঐশী চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিদ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'ধনুর্বেদ'-এ বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। শ্রীমতী ঐশী চক্রবর্তী বিভিন্ন পুরাণাদি ও সাম্প্রতিক গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে নানা তথ্য উপস্থাপিত করেছেন।

প্রাচীন ভারতের সেনাবাহিনী সাধারণত·চতুরঙ্গ হতো। অর্থাৎ পদাতিক, রথী, অশ্বারোহী এবং গজারোহী। বৈদিক যুগে দুরকমের বাহিনীর কথা জানা যায়—পদাতিক ও রথী। বেদ-পরবর্তী যুগে আরো দুরকমের বাহিনী যোগ হয়ে চতুরঙ্গে দাঁড়ায়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেমন, প্রাচীন ভারতেও পদাতিক বাহিনীই প্রধান ছিল। এরা সাধারণত জোটবদ্ধভাবে রথীকে অনুসরণ করত এবং রথীর মৃত্যু হলে হয় পালিয়ে যেত, নয়তো শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতে মারা যেত।

যতদূর জানা যায়, পদাতিক বাহিনী তাদের সমান উচ্চতার ধনুক ব্যবহার করত। বাঁ পায়ের চেটো দিয়ে ধনুকের একপ্রান্ত চেপে রেখে, ডান হাত দিয়ে ছিলা আকর্ষণ করে তীর নিক্ষেপ করত। কিছু কিছু পদাতিক তীর-ধনুকের বদলে বর্শা ব্যবহার করত। কিন্তু প্রায় সকলেরই একটা করে চওড়া ব্লেডের তরবারি থাকত। সেটা তারা প্রয়োজনবোধে দুহাতে খাঁড়ার মতো তুলে প্রতিপক্ষের পদাতিকের ওপর চালাত। তাদের মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ থাকত না। ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল পিছনে ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকত। পরনে থাকত জানু পর্যন্ত লম্বা ঢলঢলে হাতাওয়ালা জামা এবং ধুতি। জামা গলার কাছে এবং পেটের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত এবং ধুতি হাঁটু ছাড়িয়ে মাটি স্পর্শ করত। পায়ে থাকত ফিতেবাঁধা উঁচু জুতো।

বৈদিক যুগ থেকেই রথের ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদে রথের উল্লেখ আছে। মহাকাব্যে, বিশেষ করে মহাভারতে রথী-মহারথীদের অনেক বীরত্বব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে রথ সাধারণত দুইচাকার ছিল। সেটা দুটো ঘোড়া টানত। মাঝে মাঝে তিন-চারটে ঘোড়ার ব্যবহারও দেখা যেত। রথ হতো হাল্কা কাঠের। সাধারণত রথী দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করত। রথে বসার ব্যবস্থাও ছিল, যাতে প্রয়োজন হলে সে বসতে পারত। পরবর্তী মহাকাব্যের যুগে গুরুত্ব অনুযায়ী দুইচাকা এবং চারচাকা—দুরকম রথ ব্যবহৃত হতো। অর্জুনের রথ দুচাকার ছিল, কিন্তু সেই রথের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল চার। রথের মাথার ওপর চিত্রিত কিংবা কারুকার্যময় ছাতা থাকত। তার ওপর লাগানো থাকত ধ্বজা। মহাভারতের যুগে মহারথীরা এক একজন এক একধরনের ধ্বজা ব্যবহার করত। বৈদিক যুগে রথী রথের বাঁদিক ঘেঁষে অবস্থান করে যুদ্ধ করত। কিন্তু পরবর্তী যুগে রথী রথের মাঝখানে অবস্থান করেই যুদ্ধ চালাত। রথের একটা প্রধান সুবিধা ছিল, এতে প্রচুর অস্ত্র বহন করা যেত।

বৈদিক যুগে অশ্বারোহণের কথা জানা যায় বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাদের ব্যবহারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধারণত যুদ্ধে অশ্বের একক ব্যবহার ছিল না। গজারোহী যোদ্ধাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের কাজ ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজা পুরু যে আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তার মূল কারণ ছিল আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর ক্ষিপ্র, তেজী, শিক্ষিত ঘোড়ার কাছে পুরুর মন্থরগতি হস্তিবাহিনীর পরাভব। অশ্বারোহীরা মূলত বিভিন্ন আকারের তরবারি ব্যবহার করত। কেউ কেউ বর্শা, গদা, ধনুক, মুদ্গর ইত্যাদিও ব্যবহার করত। সেকালে যুদ্ধের ঘোড়াদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ এবং ধনুর্বেদ সংহিতাতে বিশদ বিবরণ আছে।

যদিও ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদে হাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বৈদিক যুগে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার দেখা যায় না। বেদ-পরবর্তী যুগে এবং মহাকাব্যের যুগে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার ছিল, যদিও তার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। সাধারণত হাতির ওপর তিনজন যোদ্ধা এবং একজন মাহুত থাকত। অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে, গজযুদ্ধে দুজন মাহুত, দুজন ধনুর্ধর এবং দুজন অসিযোদ্ধা থাকা উচিত। মহাভারতে দেখা যায়, গজারোহী যোদ্ধারা ছুরি, কুকরি, পাথর এবং অন্যান্য নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করত। অবশ্য গুপ্তযুগের সময় থেকে তীর-ধনুকই গজারোহী যোদ্ধার প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে।

বৈদিক এবং বৈদিকোত্তর মহাকাব্যের যুগে তীর-ধনুকই প্রধান অস্ত্র ছিল। শিবধনুর্বেদ এবং অগ্নিপুরাণে এসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। উচ্চমানের ধনুক সাধারণত চার হাত, মাঝারি মানের সাড়ে তিনহাত এবং নিম্নমানের ধনুক তিনহাত লম্বা হতো। সুশ্রী ভুর মতো ধনুক মাঝখান থেকে দুধারে সরু হয়ে আসত। ধনুকের মাঝ বরাবর একখণ্ড কাঠ লাগানো হতো, যাতে ধনুকটা শক্ত করে ধরে রাখা যায়। মহাভারতে দেখা যায়, অর্জুনের ধনুক গাণ্ডিব তৈরি হয়েছিল গণ্ডারের শিরদাঁড়া থেকে এবং কর্ণের সুবর্ণখচিত ধনুক তৈরি হয়েছিল মোষের সিং থেকে। ধনুক সম্বন্ধে শিবধর্নুবেদে বলা হয়েছে, ভাল ধনুক ধনুর্ধরের থেকে একটু

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

কমজোরি হবে। সেই মতে উত্তম ধনুক সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা হওয়া উচিত। অনেক প্রাচীন বিশেষজ্ঞের মতে, সাড়ে চার হাত লম্বা ধনুকই যথার্থ। ধনুকের ছিলা শর, বাঁশ বা কাঠের তৈরি হতো। আবার নানারকম পশুর নাড়ি থেকেও ছিলা তৈরি হতো। লক্ষ্য স্থির করার উদ্দেশে তীরের নিচের দিকে পালক লাগানোর প্রথা ছিল। শিবধনুর্বেদ অনুযায়ী শকুন, সারস, ময়ূর, হাঁস, বনমোরগ—এসব পাখির পালকই ব্যবহার করা হতো। সাধারণত তীরে ছ-ইঞ্চি লম্বা চারটে পালক ব্যবহৃত হতো। তীরের ফলাও হতো বিচিত্র রকমের, যেমন ত্রিকোণাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, পেঁচার ঠোঁটের মতো, খুরের মতো, বাছুরের দন্তপঙ্‌ক্তির মতো, গরুর লেজের মতো ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী শিবের ধনুক সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা এবং বিষ্ণুর রত্নখচিত ধনুক শিঙের তৈরি ছিল। মহাভারতে 'নারাচ' নামে এক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে, সেটা বড় বড় পালক লাগানো লোহার তৈরি একরকমের শর। খুব শক্তিশালী ধনুর্ধর ছাড়া এটা চালাতে পারত না। লক্ষ্যভেদের যে 'ট্রেনিং' ছিল, তাতে মনে হয় ভাল ধনুর্ধর দুশো চল্লিশ হাত, মাঝারি ধনুর্ধর একশো ষাট হাত এবং অধম ধনুর্ধর ষাট হাত পর্যন্ত তীর-নিক্ষেপে সক্ষম ছিল। ধনুর্ধরের পিঠের ডানদিকে তূণীর থাকত, তাতে মোটামুটি দশ থেকে কুড়িটা তীর রাখা যেত।

তরবারি চালনার কৌশল যদিও বৈদিক আর্যদের জানা ছিল, কিন্তু তা কদাচিৎ যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম তরবারিকে অস্ত্র হিসাবে অগ্রগণ্য বলেছেন, কিন্তু তা অবশ্যই ধনুর্বাণের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অনুমান করা যায়, বৈদিক যুগের পরে এবং বিশেষ করে মহাকাব্যের সময় যুদ্ধে তরবারির ব্যবহার বহুল পরিমাণে চালু হয়। কোথাকার তরবারি সুদর্শন, কোথাকার তরবারি আঘাত হানার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত—এসম্বন্ধে [illegible]পুরাণে বিশদ উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে, উত্তম তরবারি লম্বায় পঞ্চাশ আঙুলের বেশি এবং চওড়ায় পঁচিশ আঙুলের কম হবে না। যুক্তি কল্পতরুতে বলা হয়েছে, ভাল তরবারি হবে হালকা, তীক্ষ্ণ, শক্ত অথচ নমনীয় এবং অধম তরবারি তাকেই বলা যায়, যেটা হ্রস্ব, ভারি, সরু, অনমনীয় এবং বিদ্ধক্ষমতায় দুর্বল। তরবারি কোমরের বাঁদিকে বেল্টের সঙ্গে ঝোলানোর প্রথাই অধিক প্রচলিত ছিল। তরবারির কোষ বা খাপ সাধারণত গরু, বাঘ, ভেড়া ইত্যাদির চামড়ায় তৈরি হতো।

বর্শা অতি প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধে এবং শিকারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৈদিক যুগেও এর ব্যবহার ছিল। মহাভারতে বর্শাকে সুবর্ণ বা রত্নখচিত এবং কখনো কখনো ছোট ছোট ঘণ্টা লাগানো মারাত্মক অস্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে তোমর, প্রাশ, ভিন্দিপাল ইত্যাদি অস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। তোমর একপ্রকারের নিক্ষেপযোগ্য বর্শা। এটা লোহার মুখযুক্ত, কারুকার্যখচিত অতি মারাত্মক অস্ত্র বলে বর্ণিত হয়েছে। তোমর সাধারণত প্রতিপক্ষের বাহুকে আঘাত করত। প্রাশও অনেকটা এই ধরনের অস্ত্র। মহাভারতে এই অস্ত্রেরও বহু উল্লেখ রয়েছে। ভীষ্মপর্বে প্রাশকে ব্যাঙের মতো মুখযুক্ত, তীক্ষ্ণ, নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র বলা হয়েছে।

গদা প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত একটি অতি প্রাচীন অস্ত্র। মহাভারতের সময় গদাযুদ্ধ তরবারির থেকেও উচ্চে স্থান পেত। মুশল, [illegible] এইসব অস্ত্রও গদা পর্যায়ের ছিল। গদা মূলত লোহার পেরেক লাগানো, সোনা বা নানা রত্নখচিত অতি [illegible] ভারি ছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে গদাকে চার হাত লম্বা এবং ছয়কোণা-বিশিষ্ট বলা হয়েছে। আবার আটকোণা গদারও উল্লেখ পাওয়া যায়। [illegible] পঞ্চাশ আঙুলবিশিষ্ট, [illegible] ত্রিশ আঙুলবিশিষ্ট বলা হয়েছে। নীতিপ্রকাশিকাতে গদাযুদ্ধের কুড়ি রকম কৌশলের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ বর্ণনার সময়ও কৌশলগুলির উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণ অবশ্য গদাযুদ্ধ বা গদাকৌশলকে বারো রকমের বলেছে। ঋগ্বেদে কুঠারের উল্লেখ আছে, কিন্তু যুদ্ধে [illegible] হতো এরকম দেখা যায় না। যুদ্ধকুঠারকে [illegible] পাওয়া যায়। সাধারণত উচ্চশ্রেণির [illegible] এটা ব্যবহার করত বলে মনে হয়। এটা [illegible] মতো মুখাকৃতি এবং চব্বিশ [illegible] কুঠারকে একটা বাহুর সমান দীর্ঘ, [illegible] যুক্ত, চকচকে এবং চওড়া অর্ধচন্দ্রা[illegible] হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের কথা আমরা সবাই জানি। মহাভারতে চক্রকে তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, লোহা বা স্টিলের তৈরি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র বলা হয়েছে। মৎস্যপুরাণ বলেছে, এটি একটি তৈলসিক্ত, বৃত্তাকার চাকাবিশেষ। নীতি-প্রকাশিকা বলছে, এটি মাঝখানে ত্রিকোণ ছিদ্রবিশিষ্ট একটি গোলাকার থালার মতো। রামায়ণ, মহাভারতে শতঘ্নীর উল্লেখ আছে। এটার আকার সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তবে এটা যে প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতো—তা মোটামুটি স্বীকৃত মত। নীতি-প্রকাশিকাতে শতঘ্নীকে হাতুড়ির আকারের লৌহনির্মিত কাঁটাযুক্ত ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলা হয়েছে। ❑

এ কোন্ সকাল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ইতিহাস নয়। বরং পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত কোথাও কোন এক মোহনীয় জায়গায় সাহিত্য পাঠকের মনকে নিয়ে যায়, যেটা ইতিহাস পারে না। ঐতিহাসিকগণ সহমত নাও হতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস যে সাহিত্য নয়, বলা যায় সাহিত্য-ঘেঁষা, তা কেউ অস্বীকার করবে না। কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের ঘটনাকে সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অসাধারণত্ব লেখাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫, শনিবার। আশ্বিন মাস। একেবারে ভরা শরৎ। বর্শার ফলার মতো ঝকঝকে রোদ্দুর। শরৎ-সূর্যের সান্ত্রিবাহিনী যেন প্রভাতী কুচ-কাওয়াজে বেরিয়েছে। পঞ্চবটীর বর্ষায় ভেজা মাটিতে শুকনোর টান ধরেছে। ভিজে ভিজে উত্তাপ উঠছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ নিয়ে। চতুর্দিকে বীজমন্ত্রের মতো নতুন ঘাসের উদ্গম। সদ্যোজাত সবুজ ফড়িং আর বাহারী প্রজাপতি পৃথিবীর আনন্দে দিনের ছাড়পত্র নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমে গঙ্গার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, গঙ্গা যেন গঙ্গাস্নান করে উঠল! মা ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া যেন সূর্যপ্রণামে স্থির। সিক্ত দ্বাদশ শিব কাশীমন্ত্র পাঠ করছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির-অঙ্গন নিত্যকার উৎসবে জেগেছে সেই উষাকালে।

অতি নিরীহ একটি ঘোড়ার গাড়ি এইমাত্র প্রধান ফটক ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কেউ দেখল, কেউ দেখল না। কেউ স্নানে ব্যস্ত। কেউ মন্ত্রপাঠে। কালীঘরে, বিষ্ণুঘরে কর্মচারীদের মহা ব্যস্ততা। ভোগ রান্না হচ্ছে। রোজ যেমন হয়, মতের অমিলে মতান্তরের কথা কাটাকাটি। মন্দিরে চলেছে পূজার এলাহি আয়োজন। অতিথিশালায় পরিযায়ী সাধু-সন্ত-ফকিররা নানা কথা বলছেন। পরিগ্রাহীরা একে একে আসছেন। বদান্য রানী রাসমণি দুপুরের ভোজনের ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। কুঠিবাড়িতে ছোটবাবু রয়েছেন সপরিবারে। গাড়ির আরোহী কোনদিকে তাকালেন না।

মাকে হয়তো বলেছিলেন ঃ খেলা ভেঙে গেল মা। লাটাই তোমার হাতে। ওড়াও, ঘুড়ি ওড়াও। 'রামকৃষ্ণ ডাকিয়াল'। সুতো ছাড়বে, সুতো গোটাবে। শ্যামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি। মায়ের দালানের যে-জায়গাটায় রানী জপের মালা হাতে বসে তাঁর গান শুনতেন, সেইদিকে তাকিয়ে হয়তো বললেন ঃ খুব হয়ে গেল গো রানী, যা আর কোনদিন হবে না। ঘটনারা সব শিবের মাথায় পদ্ম। স্রোতে ভেসে ভেসে চলে যায় অনন্তের অখণ্ড সমুদ্রে। কাল যেখানে ভৈরবের কুম্ভক।

মন্দির-সংলগ্ন যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি উঁকি মেরে পশ্চিমে গঙ্গার শোভা দেখছে। সেই ছবিটা! যদুর তিনতলা বাড়ির নিচের তলায় একটি ঘরে ঝুলে রইল। সাধারণের চোখে সেটি একটি ছবি। অনেক ছবির মধ্যে একটি ছবি। চক্রযানের অলৌকিক আরোহী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঐ ছবি তাঁর দীক্ষা। মাতা মেরির কোলে বালক যিশু।

১৮৭৩ সালের মার্চ মাসের এক বিকেল। ব্যাকুল বসন্ত। শীত ঝেড়ে প্রকৃতি সবুজের হোলি খেলছে—যত কোকিল ছিল ডেকে এনে পঞ্চবটীর সভায়। প্রকৃতির প্রকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ 'মল্লিক-উদ্যানে' বেড়াতে বেড়াতে ঘরে ঢুকে ঐ ছবিটির সামনে দাঁড়ালেন। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথমে বললেন ঃ সুন্দর! নিমেষে চলে গেলেন অলৌকিকে।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অদূরে শম্ভুচরণ মল্লিকের বাগানবাড়ি। শম্ভুচরণ তাঁকে 'বাইবেল' শোনাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছবিটির সামনে সমাহিত। জোসেফ ঈশ্বরের যে-কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কানে সেই কালাতীত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।

"Behold, a virgin shall be with a child, and bear a son, and you shall call His name JESUS, for He will save His people from their sins."

পুব আকাশে আমরা একটি অতি উজ্জ্বল নতুন তারা দেখেছি। "Wiseman from the East" জেরুজালেমে এসেছেন। ঈশ্বরের প্রেরিত সেই মহামানব কোথায় অবতীর্ণ হয়েছেন আকাশে তারার নিশান তুলে! আমরা তাঁর বন্দনায় এসেছি। তিনি যে ইহুদীদের রাজা!

সর্বনাশ! রাজা হেরড গোপনে সেই জ্ঞানীদের ডেকে আদেশ দিলেন ঃ "যান, শিগগির যান, দেখে এসে আমাকে জানান, কোথায় সেই শিশুটি জন্মেছেন। আমিও তো যাব তাঁর অভ্যর্থনায়!"

তারার আলোয় পথ চিনে চিনে তাঁরা উপস্থিত হলেন সেই কুটিরে—যেখানে ভগবান এসেছেন। তাঁরা দেখছেন সেই অলৌকিক দৃশ্য, মাতা মেরির কোলে বালক যিশু।

শম্ভুচরণ ঠাকুরকে সেই কাহিনী শোনাচ্ছেন। বন্দনা, উপাসনা করে উপঢৌকনাদি নিবেদন করে জ্ঞানীরা যখন বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন দৈববাণী হলো —ফিরে যাও ভিন্ন পথে। রাজা হেরডের কাছে যেও না। সে আর এক 'কংস'!

জ্ঞানীরা দৈবনির্দেশে ভিন্ন পথে ফিরে গেলেন। রাজা হেরড বৃথাই কিছুদিন বসে রইলেন যিশুহত্যার পরিকল্পনা নিয়ে। অঙ্কুরেই বিনাশ! মৃত্যুর আশীর্বাদ হাতে। কংস যেমন পুতনাকে পাঠিয়েছিলেন। স্তন্যপান করানোর স্নেহে থাকবে মৃত্যুর নীল গরল। মীরাবাঈকে তাঁর স্বামী পাঠিয়েছিলেন জহর।

জ্ঞানী মানুষরা চলে যাওয়ার পরেই আবার দৈববাণী। এইবার স্বপ্নে স্বয়ং ভগবান জোসেফকে বললেনঃ "Arise, take the young child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word; for Herod will seek the young child to destroy Him." মা আর নবজাতককে নিয়ে এখনি মিশরে চলে যাও।

গভীর অন্ধকারে অজানা পথ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে চলে গেছে নীলনদের দেশে। দুই পথিক চলেছেন, জোসেফ আর মাতা মেরি। মায়ের বুকের কাছে রক্ষা ও স্নেহের আলিঙ্গনে ভগবান পুত্র।

একই চিত্র, কংসের কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন বসুদেব। "তখন মেঘসকল মন্দমন্দ গর্জন ও বর্ষণ করিতেছিল, অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া সেই বারিপাত নিবারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিলেন। প্রবল জলরাশিপূর্ণ ও উত্তালতরঙ্গ-ফেনিল যমুনা বসুদেবকে যাইবার পথ করিয়া দিলেন।" এরপরেই শুরু হলো কংসের ধ্বংসযজ্ঞ। কংসের অনুচররা বলল ঃ ঠিক ঐসময় যত শিশু জন্মেছে, আমরা আজই প্রত্যেককে টিপে টিপে মারব। কংস বললেন ঃ পুতনাকে ডাক। বিষস্তনী পুতনাকে নির্দেশ দেওয়া হলো— মোহিনী-মূর্তি ধারণ করে নন্দব্রজে যাও। কাল যত শিশু জন্মেছে, সবকটাকে শেষ করে এস।

রাজা হেরড যখন বুঝলেন, পুবের জ্ঞানী মানুষরা তাঁকে নির্বোধ বানিয়েছেন, তখন ভীষণ রেগে গিয়ে অমাত্যদের ডেকে পাঠালেন। হিসেব করুন, জ্ঞানীরা কবে এসেছিলেন, মাঝখানে কতটা সময় অতিবাহিত হয়েছে! হিসাবের পর সিদ্ধান্ত হলো—বেথলেহেম এবং তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জেলায় ঘাতকবাহিনী পাঠিয়ে দাও, দুবছর এবং দুবছরের নিচে যত শিশুপুত্র আছে সব মেরে ফেল। সাবধানের মার নেই।

ঠাকুর সেই কারণেই 'যিশুখ্রিস্ট' না বলে বলতেন 'ঋষিকৃষ্ণ'। ঠাকুরের গাড়ি আলমবাজারে ঢুকেছে। তিনি কি তাঁর সেই সাধনকালের উন্মাদ দিনগুলির কথা ভাবছেন? ঐ তো আমার রাম চাটুজ্যের বাড়ি। কি অবস্থাই গেছে! দক্ষিণেশ্বরে যাব না আজ। খেয়াল। কোন বামুনের বাড়িতে খাব! তিন জায়গার যেকোন একজায়গায়—বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, এঁড়েদা। বেরিয়ে পড়লুম। আলমবাজারে রাম চাটুজ্যের বাড়ি যেতুম।

আজ এই ২০০৩ সালে বসে ধ্যানে দেখি, ঘরে ঘরে আজ যিনি পটে, মূর্তিতে পূজিত—ছবির সেই বিভোল শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে খেয়ালের টানে বেরিয়ে পড়েছেন। হনহন করে হাঁটছেন আলমবাজারের পথে। অবেলা। দ্বিপ্রহর তাঁরই মতো দ্রুত চলেছে অপরাহ্ণের দিকে। চাটুজ্যেবাড়ির হেঁশেলের পাট উঠে গেছে। দিবানিদ্রার ঝিমলাগা বাড়ি। একটু পরেই কলে জল আসবে।

গিয়ে বসতুম। মুখে কোন কথা নেই। 'নির্জন দালানে কে অমন চুপটি করে বসে! কি চাই?'—'আমি এখানে খাব।' অসময়ে চুপটি করে, আপন মনে বসে থাকা সেই মানুষটি আজ 'ভগবান'। তখন চিনতে পারিনি কেন? তাই তো হয়। ভগবান কৃপা করে চলে যান। চেনালে চেনা যায়। ধরা দিলে ধরা যায়। এই তো লীলা!

ঘোড়ার পায়ে খপ্‌খপ্ শব্দের ছন্দ। গলায় বাঁধা ঘণ্টার ঝুনুর ঝুনুর। লোহার বেড় পড়ানো চাকার পথ-ঘষড়ে যাওয়ার শব্দ। ঠাকুর সুর, তাল, লয়, ছন্দের মানুষ। বেতালা, বেসুরো কিছু পছন্দ হতো না। ঐ তো যুগলবাবুর ঠাকুরবাড়ি। কেমন আছে যুগল!

ঠাকুর বোধহয় একবার তাকালেন ডানদিকে। এই সেই তাঁতিপাড়ার মোড়। এই পথ এঁকেবেঁকে কত দূরেই না চলে গেছে। কোথায় গেল বলতে পার সেইসব দিন! বেলা তিনটে, কি চারটে। পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ঐ রাস্তা ধরে, সঙ্গে হৃদয়। আঃ, অমন ছেলেটা কি যে করে ফেললে! কর্তারা বের করে দিলে। আমার খুব সেবা করেছে, আবার দুর্ব্যবহারও কম করেনি। ওর জ্বালায় একবার আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলুম। তখন হৃদয় আমার সঙ্গে থাকত। হাঁটছি। হনহন করে হাঁটছি। তখন খুব হাঁটতে পারতুম। প্রথমেই কবিরাজ ঈশানের বাড়ি। তারপরে ভাগবত পণ্ডিতের বাড়ি। এই সরু রাস্তা। চারপাশে জঙ্গল। একটা লণ্ঠন হাতে রোজ সন্ধ্যায় 'ভাগবত' শুনতে আসতুম। শ্রীকৃষ্ণকথার এমনি টান! একটু ভেতরে ঢুকলেই পাঠবাড়ি। সে কী কম জায়গা! মহাপ্রভুর পার্ষদ রঘুনাথ উপাধ্যায়ের ভজনকুটির ছিল।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

একদিন তিনি এলেন পুরী যাওয়ার পথে। গঙ্গায় নৌকা বাঁধা রইল। 'রঘুনাথ, আমি যে তোমার 'ভাগবত' পাঠ শুনতে এলুম।' সেই কুটিরে তিনি তিনদিন ছিলেন। শ্রীরঘুনাথের পাঠ ও ব্যাখ্যায় মুগ্ধ মহাপ্রভু বললেন ঃ "রঘুনাথ আজি হইতে তুমি হইলা ভাগবতাচার্য।" বৈষ্ণব মহাজনদের আশ্রমকে সাধারণত বলা হয় 'শ্রীপাট' অথবা 'পাঠবাড়ি'। শ্রীরঘুনাথের আশ্রমের নাম হলো 'পাঠবাড়ি'।

পাঠবাড়িকে ডানদিকে রেখে কাঁচা পথ এঁকেবেঁকে পৌঁছে গেল হরকুমার ঠাকুর স্ট্র্যাণ্ডে। উত্তরসীমায় গঙ্গার ধারে জয় মিত্রের কালীবাড়ি। মায়ের নাম 'কৃপাময়ী'। এই পথের আরোহী হয়ে ঠাকুর এই মন্দিরে মাঝে মাঝেই আসতেন। এই পথের স্মৃতির সঙ্গে ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা মুক্তার বিন্দুর মতো আটকে থাকল। ইতিহাস হবে।

হরকুমার ঠাকুর। দর্পনারায়ণ, চন্দননগরে ফরাসি সরকারের দেওয়ান। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত। দর্পনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতবিদ্য গোপীমোহন ঠাকুর। বহু ভাষাবিদ্। সঙ্গীতপ্রেমী। সংস্কৃত, ফরাসি, পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু ভাষা জানতেন। শক্তির উপাসক। মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করতেন। বহু পদস্থ ইংরেজ, এমনকি গভর্ণর জেনারেলও সেই পূজায় উপস্থিত হতেন। পূজা, মন্ত্র, নাচ, গান, খানাপিনা। সে এক মহা উৎসব। সেবার আসরে এসেছেন সুবিখ্যাত ডিউক অফ ওয়েলিংটন। হঠাৎ টানাপাখার দড়ি ছিঁড়ে গেল। বিশাল পাখা, বিপুল ভার। জটায়ুর মতো সকলের ঘাড়ে এসে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে জেনারেল সাহেব আহত হননি। মা বীরকে রক্ষা করলেন। ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ানকে পরাভূত করে শেষে কি সুতানুটির টানাপাখায় প্রাণ যাবে। গোপীমোহনের মহাকীর্তি মূলাজোড়ে মা ব্রহ্মময়ীর মন্দির। সে আরেক কাহিনী। ঠাকুর সব জানেন।

গোপীমোহনের দুই পুত্র—হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। 'বঙ্গদেশের দুই উজ্জ্বল রত্ন'। হরকুমারের পরিচয়—"সংস্কৃত ভাষায় অতীব দক্ষ। সংস্কৃত চর্চা, পূজাপাঠ আর দেবারাধনাতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। 'দক্ষিণার্চ্চ-পারিজাত', 'হরতত্ত্ব-দীধিতি', 'পুরশ্চরণ পদ্ধতি', 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। এমন মহাসাত্ত্বিক, স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, মহাপণ্ডিত ধনীসন্তান বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মেছিলেন।"

হরকুমারের দুই পুত্র স্বনামখ্যাত মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর আর রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এই দুই ঠাকুরের সঙ্গেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'এনকাউণ্টার' হয়েছিল। বড়লোকদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের মুহূর্তে ঠাকুরের ভিতর যেন কেউ একজন হিহি করে হেসে উঠত।

যতীন্দ্রমোহন বিরাট ব্যক্তি। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক। যদুলাল মল্লিক ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। সেই হিসাবে তিনি আবার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য।

গাড়ি চলছে দুলকি চালে। অতীত মনে পড়ছে। ঠাকুর নিজেকেই নিজের গল্প শোনাচ্ছেন। যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছে। আমিও সেখানে আছি। আমি তাকে বললাম ঃ 'কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কিনা!' যতীন্দ্র বললে ঃ 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন!' তখন আমার বড় রাগ হলো। বললাম ঃ 'তুমি কিরকম লোক গা। যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না!' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।

গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ভাবনাও ছুটছে। হরকুমারের আরেক কৃতী পুত্র স্যার সৌরীন্দ্রমোহন। কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। 'তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যাকথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হলো। সে বলে পাঠালে—আমার গলায় বেদনা হয়েছে। এদের পিতার নামাঙ্কিত রাস্তাটি গঙ্গার ধারে শুয়ে আছে। উত্তরপ্রান্তে জয় মিত্রের দুই নহবতওলা কালীবাড়ি ও উদ্যান। রানী রাসমণি কালীবাড়ি স্থাপনের প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিয়েছিলেন নাকি! জয় মিত্তিরের বাড়ির দুর্গোৎসব। বাপরে! সপ্তমীর দিন থেকে শুরু হতো বলি। একনাগাড়ে চলত নবমী পর্যন্ত। "ছেদিত ছাগগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতেন। একাদশীর দিন খাতা দেখিয়া পৈতৃক আমল হইতে যে যে ব্রাহ্মণের বার্ষিক ছিল, তাঁহাদের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।" নবমীতে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! "কেবল মহিষ মেষ ছাগ কুষ্মাণ্ড ও আখ বলি নহে, গোধিকা, কপোত, মাগুরমাছ, নানাবিধ লেবু, সুপারি এবং গোলমরিচ পর্যন্ত বলিদান হইত।"

ঠাকুর যেন হৃদয়ের সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছেন। জয় মিত্তিরের কালীবাড়ির আগেই তো প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন। সেই

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

বিরাট পুকুর। তারই উল্টোদিকের বাড়িটা। বিপিনের বাড়ি। বিপিন সাহা। কতবার এসেছি! আর কি আসা হবে! মা তুমি জান। সিঁদুরিয়াপটীর মণিলাল মল্লিক। তারও তো সুন্দর একখানি বাগানবাড়ি এই কাছেই। অমৃতলাল দাঁ রোডে। পিছনদিকে গঙ্গা। ব্রাহ্ম তো। তাই মাঝেমধ্যে কাজের ফাঁকে একা পালিয়ে আসত এই বাগানে। আমার তখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। নিজের খেয়ালে চলে এসেছি। মণি, আমি খাব। ব্যম্মুন খাব। বিচ্ছিরি! কেমন একটা ঘেন্না হলো। মণি বাগানে এসেই আমার কাছে ছুটে আসত। আমি যে উদ্যান-ভ্রমণ প্রিয়। বেশ কয়েকবার গেছি তার বাগানে।

হরকুমার স্ট্র্যাণ্ড দক্ষিণে এসে বাঁদিকে বেঁকবে। আমি হাঁটতে থাকব সোজা দক্ষিণে। গঙ্গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি শহরের দিকে। একটুখানি এগোলেই বাঁদিকে ঐ তো সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। ঠিক পিছনেই আমার 'ঠাকুরদাদা'র বাড়ি। অমন কথকতা আর কে করবে। আমার কথক-ঠাকুর। নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসল নাম। লোকে বলে 'ঠাকুরদাদা'।

থাক সব থাক যেমন আছে। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগরের জমিদার। মা দয়াময়ী আছেন সেখানে। আমার দক্ষিণেশ্বরের মায়ের আরেক রূপ। ঐ ভবনে তিনি থাকুন। মা! আমি যে আর আসতে পারব না। ওদিকের রাস্তা ধরে সোজা গেলেই প্রামাণিক ঘাট রোডে মা ব্রহ্মময়ী। শ্মশান পেরোলেই দশমহাবিদ্যা। মথুরের সঙ্গে এসেছি। পরেও এসেছি। মথুর মনে হয় একটু কৃপণ ছিল। আমার কথা খুব শুনত। বললুম—মথুর, বড়ই দুর্দিন। মায়ের নিত্যভোগের ব্যবস্থা করে দাও। শুনেছিল।

গাড়ি বরানগর বাজারের মোড়ে এসে গেছে। ঐ তো ফাগুর দোকান। ফাগু! তোমার দোকানের খাস্তা কচুরি আমার খুব প্রিয়। কিন্তু এখন আমি খেতে পারব না। আমার গলায় কি হয়েছে! পরশু দিন রক্ত পড়েছে। আমি কলকাতায় যাচ্ছি চিকিৎসার জন্য। বেশি কথা বলি তো! পাদরিদেরও অনেকসময় এইরকম হয়। ঐ তো মা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। তোমরা মাকে প্রণাম কর। ডাকাত-কালী। একসময় নরবলিও হতো।

রতনবাবু রোডের মোড়। এই রাস্তা পেরোতে না পেরোতেই একদিন আমাদের ঘোড়ার গাড়ির চাকা খুলে বেরিয়ে গেল। ওদিকে ফিটন হাঁকিয়ে ত্রৈলোক্য আসছে। চাদরের আড়ালে মুখ লুকো, মুখ লুকো। ত্রৈলোক্য দেখে ফেলবে। সে ভীষণ লজ্জার। বেণী শা যে কেন গাড়িটার ছিরি ফেরায় না। ঘোড়াটা খেতে পায় না।

বিবি বাজারের মোড়ে মদের দোকান। খোলেনি এখনো। আচ্ছা, অবাঙালি মালিক আমাকে কি কারণে এত ভক্তি করে! গাড়িটা দেখলেই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাতালদের ফুর্তি দেখে আমি একদিন চলন্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার একটা পা ভেতরে, একটা পা পাদানিতে। চিৎকার করছি—বাঃ, বাঃ, খুব খাও। আনন্দ কর, আনন্দ কর। মানুষের জীবনে আনন্দের যে বড় অভাব। সবাই বলছে—পড়ে যাবেন, পড়ে যাবেন। পড়ব কেন! আমি তো গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখেছি! ঘোড়ার ওপর একপায়ে বিবি দাঁড়িয়ে। ঘোড়া ছুটছে।

ঠাকুরের গাড়ি বাগবাজারের খাল পেরোল। আরেকটু পরে, আরেকটু দূরে গাড়ি থামবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরা দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিটে ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। ছাদ থেকে গঙ্গা বেশ দেখা যায়। এই রাস্তাতেই একসময় 'পক্ষীর দলের' আড্ডা ছিল। একটি শৌখিন চালা। গুলিখোরদের নেশা করার জায়গা।

ঠাকুর গাড়ি থেকে নামছেন। এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছেন। কোথায় উদ্যানশোভিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির! গঙ্গা, পোস্তা, চাঁদনী, পঞ্চবটী, বেলতলা! আর কোথায় এই বাগবাজারের গলি! বাতাসে চম্পা, চামেলির গন্ধ নেই। গঙ্গার জল থেকে উঠে আসছে না বিশ্বেশ্বরের জটার গন্ধ। এখানকার বাতাস গুমোট হয়ে আছে গৃহস্থবাড়ির ভোগ আর দুর্ভোগের আঁসটে গন্ধে।

ঠাকুর প্রবেশ করলেন, এই ঘর! এত ছোট! শেষে তোমরা কি আমাকে গঙ্গাযাত্রা করালে! এখানে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা বাপু অন্য বাড়ি দেখ। ঠাকুর রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। ভাড়া-করা ঘোড়ার গাড়ি চলে গেছে। রাস্তায় পড়ে আছে কয়েক টুকরো খড়কুটো। ঘোড়ার খাবার। গাড়ির পিছনে চটের বস্তায় থাকে। ঠাকুর হাঁটছেন। ভক্তদের বলছেনঃ চলে এস, চলে এস। রাজপথে এই তাঁর শেষ পাদস্পর্শ। আগে আগে চলেছেন ঠাকুর, অনুসরণ করছেন ভক্তবৃন্দ। "মামেকং শরণং ব্রজ।" এস, এস, আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাদের মুক্ত করব। "মা শুচঃ।" শোক করো না!

সকাল প্রায় সোয়া নটা। গিরিশচন্দ্রের বোসপাড়া জেগে উঠেছে। ঠাকুর হাঁটছেন। এই অঞ্চল তাঁর অঞ্চল। অলিগলি সব চেনা। এসে দাঁড়ালেন তাঁর বলরাম ভবনের সামনে। তাঁর 'দ্বিতীয় কেল্লা'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'গম্ভীরা'।

বলরাম! আমি এসে গেছি।

আসুন, আসুন, আসুন। ত্রেতার শ্রীরাম আসুন, আসুন দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ, আসুন কলির শ্রীরামকৃষ্ণ।

বলরাম! এ আমার বাড়ির মতো। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলায় উঠছেন। পায়ে বার্ণিশ করা চটি। সকাল নটা

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

বেজে পনেরো মিনিট। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। পুজোর আর পনেরো দিন বাকি।

ঐদিন সন্ধ্যায়। দক্ষিণেশ্বর। নিত্য সান্ধ্য ব্যস্ততা। সূর্য পশ্চিমে অস্ত আলোর আভা রেখে দিনের ইতি-আরতি করে গেছেন। মশালচি আলোর আয়োজনে ইতস্তত ঘুরছে। মা ভবতারিণীর মন্দিরে, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আলোর ঝাড় আলোকিত হয়েছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে প্রদীপ জ্বলেছে। বকুলতলার ঘাট থেকে জোয়ারের জল ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে। গঙ্গায় এখন ভাটার টান। চাঁদনি আলো দেখেছে। আমকাঠের সিন্দুকের ওপর ক্লান্ত এক বালক। দর্শনার্থীরা মায়ের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। আরতির সময় হলো। নাটমন্দিরের মাথায় উত্তরমুখী ভৈরব মূর্তি। দিনের শেষ আলোয় ধ্যানস্থ, সুগম্ভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ পুজায় বসার আগে এই কালের সাক্ষী ভৈরব মূর্তিটির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন।

শূন্যতা তাকিয়ে আছে শূন্যতার দিকে। ঠাকুরঘরের তিনটি দরজাই হাটখোলা। প্রদীপ জ্বলেছে। ধুনোর ধোঁয়া ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় সেই আনন্দস্বরূপ! আজ তুমি আমাদের সঙ্গে হাততালি দিতে দিতে নাম করবে না, নাচবে না, গাইবে না। অসহায় ঐ চৌকিটি তুমি আজ অধিকার করবে না। সাদা চাদর নিভাঁজ পাতা রইবে সারা রাত। ভক্তরা কোথায়! নরেন্দ্রনাথের তানপুরা দেওয়ালেই ঝুলে থাকবে। উদ্দাম নামসঙ্কীর্তন ঘরের বাইরে উপচে পড়বে না। তুমি যে বলতেঃ আমি দিনের মধ্যে সাতবার বাঁচি, সাতবার মরি। এই ঘর তোমার সেই অলৌকিক সমাধি-মূর্তি আর দেখবে না! শ্রীরামের ধনুর্বাণ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি আর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি। চটির ধীর শব্দ নহবতের দিকে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য উপস্থিতিকে জানাবে না—ওগো! আজ নরেন রাতে থাকবে। কাল অতি ভোরে নহবতের সামনে দিয়ে পদশব্দে মিশে একটি কণ্ঠস্বর ঝাউতলার দিকে যেতে যেতে বলে যাবে না—সারদা জাগো। ভোর হলো। জপে বসো।

অন্ধকার চুপি চুপি সরে গেল নহবতের দিকে। মৃদু আলো। গঙ্গার বাতাসে চিকের আবরণ মৃদু মৃদু দুলছে। মা, তুমি বসে আছ মা। উনুনে আগুন? তিন সের আটা ঠাসা। ডালের সুগন্ধ! দুধ ঘন। পান সাজা।

আমার কাজ চলে গেছে বাবা। জিওল মাছের হাঁড়ি খটখটে। আর খলবল করবে না।❏

আদিবাসী লোকৌষধ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণারত। এই সংস্কৃতির মধ্যে যেমন রয়েছে ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প ও স্থাপত্য, তেমনি আছে তাদের ঔষধ ও চিকিৎসা—যার অনেকটাই এখনো মূলধারার মানুষের কাছে অজানা। সেই অজানা তথ্য আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই জানা প্রয়োজন।

লোক-চিকিৎসা সম্পর্কিত লোকজ্ঞান

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের একটি চিত্র উপস্থাপিত করছি। বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। মারা গিয়েছে প্রায় ছয় কোটি মানুষ। একদিন (১৪ মে ১৭৯৬) এক গোয়ালিনী হাতে ফোসকা, গায়ে ব্যথা, জ্বর-জ্বর ভাব নিয়ে চিকিৎসার জন্য ডাঃ এডওয়ার্ড জেনারের কাছে এলেন। জেনার তাঁকে বসন্ত রোগ সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বললেন। কিন্তু গোয়ালিনী এই ইংরেজ চিকিৎসককে অবাক করে দিয়ে বললেন—তাঁর গো-বসন্ত আগেই হয়েছে, এটা একবার হয়ে গেলে অন্য বসন্ত আর হবে না। গোয়ালিনীর কথায় ডাঃ জেনার পেয়ে গেলেন আবিষ্কারের সূত্র। তিনি ঐ গোয়ালিনীর হাতের ফোসকা গেলে রস নিয়ে একটি বালকের শরীরে টিকা দিলেন। তারপর বসন্তের বীজ তার শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, বালকটি সুস্থ রইল! কারণ, গুটি বসন্তের বীজ টিকা হিসাবে নেওয়ার ফলে বালকটির শরীরে বসন্ত রোগ-প্রতিরোধক শক্তি গড়ে উঠেছিল। জেনারের এই আবিষ্কার সেকালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৈরি হয়েছিল জীবনদায়ী বসন্তের টিকা।

আসলে ঐ গোয়ালা সমাজে বহুকাল ধরেই গো-বসন্ত জনিত ঐ ধারণাটি প্রচলিত ছিল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত ঐ লোকজ্ঞান একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উৎস হয়ে উঠল। ঠিক এমনি করেই বহু লোকজ্ঞান অনুপ্রেরণা দিয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রবাহকে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ডাঃ হিরোশি নাকাজিমার (ডিরেক্টর জেনারেল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) বক্তব্যটি : "The knowledge and technology already exist.... Health is a product of social action. Active community participation and supportive social policies are necessary for progress in health."

লোকৌষধ কাকে বলে?

লোকসমাজে কিছু অব্যর্থ ওষুধ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে—এই সত্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে, লোকৌষধ কি? আদিম গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বনচারী মানুষ তার বিশ্বাস-সংস্কারকে ভিত্তি করে প্রাকৃতিক সাহচর্যে নিজেদের শারীরিক, মানসিক এবং গোষ্ঠীগত রোগ সারানোর জন্য যেসব ঔষধ ব্যবহার করে এসেছে, তার একটা লোকায়ত ধারা এখনো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ বহন করে চলেছে। দেশ-ভেদে, পরিবেশ-ভেদে, রোগ-ভেদে এবং পরিস্থিতি-ভেদে ঔষধ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এই ধারা অব্যাহত। এটা লোক-পরম্পরায় বাহিত, গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত এবং গোষ্ঠীর মধ্যে পালিত। সাধারণভাবে এই চিকিৎসা এবং চিকিৎসার ঔষধ 'লোকচিকিৎসা' ও 'লোকৌষধ' বলে গণ্য। প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় লোকৌষধ ব্যবহারের ধারাটি আজও জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক, যা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উদ্ভাবনার নিরিখে কোনভাবেই মৃতকল্প নয়, বরং লোকজীবনে তা কখনো খরস্রোতা নদীর মতো, কখনো বা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে—যাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রায়ই 'বিকল্প চিকিৎসাধারা' (Alternative medical system) হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রবাদ এবং লোকচিকিৎসা

শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থেকে বাঁচবার একটি আপ্তবাক্য এইরকম—"Prevention is better than cure." এই প্রবাদবাক্য থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে, উপশম-সহায়ক বা আরোগ্য-সহায়ক লোকৌষধ (Curative folk medicine) যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রতিষেধক বা নিবারক বা নিবৃত্তিমূলক লোকৌষধ (Preventive folk medicine)। লোকচিকিৎসার একটি বড় অঙ্গ হচ্ছে দেহসংরক্ষক লোক-খাদ্য (Protective folk food) গ্রহণ, যা প্রায়শই প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে লোকসমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। বাঙলা প্রবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। কোন্ মাসে কি কি মরশুমি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত সে-সম্পর্কিত একটি প্রবাদ এইরকম—"চৈতে গিমা তিতা, বৈশাখে নালিতা মিঠা/ জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল,/ আষাঢ়ে খই, শাওনে দই।/ ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা,/ কার্ত্তিকে খলসের ঝোল/ আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল/ ফাল্গুনে চূড়ান্ত বেল।"

অর্থাৎ বাংলার খাদ্যতালিকায় চৈত্র মাসে গিমে শাক, বৈশাখ মাসে নালতা বা মিঠা পাট শাক, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, আষাঢ় মাসে খই, শ্রাবণে দই, ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা, কার্ত্তিকে খলসে মাছ, অগ্রহায়ণে ওল, পৌষে কাঞ্জি

(পান্তাভাতের জল), মাঘে তেল এবং ফাল্গুন মাসে বেলকে অবশ্যই রাখতে হবে। দেখা যাচ্ছে, খাদ্যগুলি মূলত মরশুমি এবং ঐসকল মাসেই তা সহজলভ্য। অর্থাৎ হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন দ্রব্যগুণসম্পন্ন খাদ্যকেই এই খাদ্যতালিকায় সংযোজন করা হয়েছে।

বাঙলা প্রবাদে ভেষজগুণসম্পন্ন বহু উদ্ভিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাকে লোকৌষধরূপে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

(১) "নিম নিসিন্দা বেলের পাত, আমঘোড়স আর কল্পনাথ/ বজ্রদন্ত ইসবগুল, এ থাকতে কেন রোগী যায় গঙ্গার কূল।" (২) "আদা সব রোগেই আধা।" (৩) "আম নিম জামের ডালে/ দাঁত মাজিও কুতূহলে।" (৪) "চক্ষু রোগে কেন মর? নিমের মূলটি কণ্ঠে ধর।" (৫) "কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন, পুরানো তেঁতুল বিকারে।" (৬) "নিম নিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা।" (৭) "লেখা জোখায় যেজন মরে, শুঁধ পিঁপুলে তার কি করে।" (৮) "আম খেও জাম খেও তেঁতুল খেও না।/ তেঁতুল খেলে পেট দুখাবে ছেলে হবে না।" (৯) "খালি পেটে বদরিকা ভরা পেটে বেল।/ কবিরাজ দেখে বলে এই রোগী তো গেল।" (১০) "একটা হরীতকী সারা গাঁয়ের উপকারী।"

আদিবাসী সমাজের সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। নানা অসুখ-বিসুখে তারা অরণ্য থেকে সংগ্রহ করে নেয় ভেষজ ঔষধ। কোন্ অসুখে কি ব্যবহার করতে হবে, এটা তাদের কেউ কেউ বংশানুক্রমে জেনে আসে। ওষুধ হিসাবে দেখা যায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ, যেমন—পাতা, ডাল, শিকড়, ছাল, ফল, ফুল ইত্যাদি ছাড়াও জীবজন্তুর চর্বি, বিড়ালের প্ল্যাসেন্টা, মৃত বাদুড়ের নখ বা চর্ম, বাছুরের প্রস্রাব, গোময় বা গোমূত্র-যুক্ত মাটি ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকচিকিৎসা ও লোকৌষধ

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ঐতিহ্যময় বিধিব্যবস্থাকে অবহেলা করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সাধারণভাবে সবকিছুকেই যুক্তির ওজনে মাপতে শুরু করেছে এবং বহু পুরনো বিশ্বাসকে নিরর্থক বলে বাতিল করে দিয়েছে। এমনকি লোকচিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিশীলিত রূপ যে আয়ুশ্ বা প্রাণরক্ষার বেদ বা আয়ুর্বেদশাস্ত্র, তাও এখন আর আদরণীয় নয়। তার ফলে অতীত গরিমা সত্ত্বেও বনৌষধি বা ঔষধি গাছপালার ব্যবহার আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। অথচ প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির ফলাফল চমকপ্রদ। অনুন্নত আদিবাসী সমাজের মধ্যে নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতি আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভারতের বহু জনগোষ্ঠী বনৌষধি দিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করে এসেছে। তবে এধরনের লোকচিকিৎসায় অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য দৈবী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রমাণও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড পি. ও. বোডিং রচিত 'Santal medicine' বইটির প্রায় ৫০টি রোগের লোকচিকিৎসার বিধান প্রণিধানযোগ্য। যেমন, রক্তহীনতায় ৮৬নং প্রেসক্রিপশনে হৌমুস (anaemia) রোগের কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"When one has suffered a long time from spleen, the blood in the body dries up causing the body to become pale." সেখানে জংলী পানলতার ছাল ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন, পাগলা কুকুর-শিয়ালের কামড় খেয়েও সাঁওতালরা নিজেদের টোটকা চিকিৎসায় সুস্থ থেকেছে। কুকুর কামড়ের একটি প্রেসক্রিপশন এইরকম—চার, অরিঞ ও মাঠা শাকের শিকড় একত্র বেটে আধ ছটাক মহুয়া মদ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ক্যান্সার বা টিউমার যদি বহিরঙ্গে হয়, তবে সাঁওতাল চিকিৎসানুসারে বিরশণ বা wild hemp বা বুনোশন-এর পাতা এবং আলৌগ জৌড়ি বা স্বর্ণলতা একত্রে বেটে ক্ষতস্থানে লেপন করতে হবে। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের বনাঞ্চলে বহেড়া, হরীতকী, আমলকী (একত্রে 'ত্রিফলা' তৈরি হয়) বিস্তর পরিমাণ জন্মায়। আদিবাসীরা চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করে। 'সিউড়ির মোরব্বা : অতীত-বর্তমান' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার মণ্ডল উল্লেখ করেছেন এক সাঁওতাল বৃদ্ধার, যিনি আমলকীর মোরব্বা কিনছিলেন—"বুড়াটো খাবে, আবার কি হোবে। উয়ার যি শুদি কাঁশি হইছে।" এই সাঁওতালরা হলো ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আদিবাসী গোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক লোকসমাজ আছে, তবে বর্তমান আলোচনায় পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের আদিবাসী সমাজ অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বর্ধমানের পশ্চিমাংশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, বেদিয়া, কোঁড়া, ভূমিজ, বীরহোড়, মাহালী, কুর্মালী, লোধা-খেড়িয়া এবং শবরদের ব্যবহৃত লোকৌষধই আমাদের আলোচ্য। ডি. সি. পাল এবং এস. কে. জৈন 'Tribal Medicine' বইটিতে সাঁওতাল, লোধা, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি লোকসমাজে প্রচলিত ২০০০টি প্রেসক্রিপশনের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ১০০৬টি পূর্বে অনুল্লিখিত নতুন সুপারিশ বলে তিনি দাবি করেছেন। লোকচিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, ব্রত-পূজার প্রচলন থাকলেও দ্রব্যগুণ-সম্পন্ন ভেষজ ও প্রাণিজ ঔষধ প্রচলন সর্বজনবিদিত। বর্তমানে সেখানে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঔষধ যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, এমন নয়। তবে আদিম সমাজভুক্ত

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

অনেক প্রবীণই আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঔষধপত্র অপদেবতার স্পর্শজনিত ক্ষতিকর জিনিস সাব্যস্ত করে ফেলে দেয়। অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী গুরুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রতন্ত্র শিষ্যপরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যবহার, সাপ ধরার কৌশল, গাছ-গাছড়ার পরিচয় ও ব্যবহার জানার জন্য শিষ্যরা গুরুর কাছে 'নাড়া' বাঁধে। টোটকা ওষুধের সবই যে নিতান্ত কুসংস্কার, তাও নয়; অনেক ক্ষেত্রেই তা বিজ্ঞানসম্মত। এই ক্রমক্ষীয়মাণ প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতের সনাতন চিকিৎসাপদ্ধতির অঙ্গ হওয়ায় তার নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকচিকিৎসক.

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসমাজে চিকিৎসক হিসাবে 'বৈদ্য'র খুবই সম্মানীয় অবস্থান। সাধারণভাবে এরা সমস্ত রোগের চিকিৎসা করলেও কেউ কেউ নির্দিষ্ট কতকগুলো রোগের চিকিৎসা করে থাকে। কেউ শিশুরোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ, কেউ বা স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ। কোন কোন লোকচিকিৎসক কোন একটি নির্দিষ্ট রোগ চিকিৎসার সঠিক ও কার্যকরী ওষুধটি বংশানুক্রমিকভাবে জেনেছে। সাধারণ রোগ-ব্যাধি, যেমন কাটা, পোড়া, ব্যথা-বেদনা, জ্বর, উদরাময় কিংবা মাথাধরার ওষুধ সম্পর্কে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেই জানে। আদিবাসী সমাজে স্বীকৃত চিকিৎসক ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসাজ্ঞানী অনেক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে প্রসূতির সন্তান প্রসবের সময় অভিজ্ঞা মহিলা দাইয়ের ডাক পড়ে। আরেক ধরনের মানুষ রয়েছেন, যাঁরা হলেন ভবিষ্যদ্বক্তা। যেমন বৈয়াকরস, আচার্য—এঁরাও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক কথাই বলেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেন। এছাড়া গুনিন, ওঝা, জানগুরু, জানসখা প্রভৃতি নামে লোকচিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা অপদেবতার প্রভাবজনিত রোগ এবং সর্পদংশনের চিকিৎসা করে। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের আদিবাসী সমাজে প্রাণী-চিকিৎসককে বলা হয় 'দাগা'। এরা পশুরোগ, বিশেষত কার (গবাদি পশুর ঘা), রিকা (আমাশয়), গার্গতি (গলার রোগ) এবং অন্যান্য সাধারণ রোগব্যাধির ভেষজ চিকিৎসা করে থাকে।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকদেবতা এবং লোকচিকিৎসা

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকচিকিৎসার সঙ্গে লৌকিক দেবতা ও অপদেবতার এক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আদিবাসীদের বিশ্বাস, বিভিন্ন কারণে দেবতা বা অপদেবতা রুষ্ট হলে মানুষ রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তাই রোগমুক্তির জন্য মনসা, শীতলা, ওরাক বোঙ্গা, সিমা বোঙ্গা, দন্তেশ্বরী, খাজুটি ঠাকুর, বাঁটুল বুড়ি, দুবোই বাবা, আটেশ্বর, সাতবউনী, হাড়ির ঝি চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ঝোলাই চণ্ডী, বড়াম, জ্বরাসুর, বাবা ঠাকুর, ঢেলাই চণ্ডী, ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ও মানত করা হয়। অনেক সময় লৌকিক দেবতার থানে রোগীকে লোকৌষধ ও তাবিজ কবচ-সহ মন্ত্রপূত সামগ্রী দেওয়া হয়। রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী দেবতার মূর্তির কাছে কোন গাছে বা স্থানে ঢিল বাঁধা মানত করে, হত্যা দেয়, ডাঁড়ুকা পরায় ও মুদা বাঁধে। দেশে কোন ব্যাধির প্রকোপ মহামারী বা মড়করূপে প্রাদুর্ভূত হলে তারা বিশেষ পূজার বন্দোবস্ত করে। মানুষের মধ্যে সাময়িকভাবে দেবতা বা অপদেবতার অধিষ্ঠানজনিত 'ভর' হওয়ার কথা প্রায়ই শোনা যায়। ভর হওয়া ব্যক্তি বহু দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ দিয়ে থাকে। মনসা, হাড়ির ঝি চণ্ডী বা মা কামিক্ষ্যার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মন্ত্রপাঠ করলে সাপে কামড়ানো রোগী বিষমুক্ত হয় বলে বিশ্বাস। শীতলাকে তুষ্ট করলে বসন্ত, কলেরা, হাম প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বড়াম সন্তুষ্ট হলে বন্যপ্রাণী ও সর্প থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না বলেই আদিবাসী মানুষদের বিশ্বাস। বোঙ্গাকে তুষ্ট করলে আন্ত্রিক, নিউমোনিয়া, গলগণ্ড, ড্রপসি, পক্ষাঘাত, বাত, কুষ্ঠ, মৃগী প্রভৃতি রোগ থেকে নিরাময় সম্ভব। পল্লীর জনসাধারণের বিশ্বাস, ওলাইচণ্ডী ওলা ওঠা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাতবউনীর প্রত্যেকেই (রঙ্কিণী, সনকিনী, চমকিনী প্রভৃতি) এক-একটি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোন রোগ মহামারীরূপে আবির্ভূত হলে কোন কোন স্থানে সাতভগিনীর পূজা গ্রামগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জ্বরাসুরকে ভক্তরা সর্বপ্রকার জ্বরের নিরাময়কারী দেবতা বিশ্বাসে পূজা করে। বীরভূমের সিউড়িতে শিশুর দন্তোদ্গমে বিলম্ব হলে দন্তেশ্বরীর পূজা করা হয়। নানুর থানার বালীশ্বর গ্রামে খাজুটি ঠাকুরের থানে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বিশেষ পূজা ও ভর হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সন্তানলাভের উদ্দেশে ওষুধ নেয়। বীরভূমের অনেক গ্রামে দুবোই বাবার থান রয়েছে। সাপে কাটা রোগী এই দেবতার প্রসাদী ফুল-বেলপাতায় আরোগ্য লাভ করে বলে বিশ্বাস। বনের পশুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলার আদিবাসী লোধা-সাঁওতালরা আটেশ্বরকে বনদেবতা-জ্ঞানে পূজা করে। মেদিনীপুরের মাধবপুর গ্রামে বড়াম ঠাকুরের মন্দিরে রিকেটের চিকিৎসা হয়। চন্দ্রকোণা এবং ঘাটালে ধর্মঠাকুরের থানে বন্ধ্যাত্ব মোচন, বিভিন্ন স্ত্রীরোগ, চক্ষুরোগ, একশিরা, ছুলি, ধবল, কুষ্ঠ, চর্মরোগ, পেটের পীড়া, জণ্ডিস, বাত ইত্যাদির জন্য ভেষজ লোকৌষধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শালবনীর গোদামৌলী গ্রামে লোকদেবতা পুটুবুড়ার কাছে পশুদের রোগব্যাধি নিরাময়ের

জন্য পূজা দিতে আসে সাঁওতাল, মাহাতো, মাঝি, এমনকি বৈষ্ণবরাও। কাঁথি মহকুমায় খেজুরী থানার অন্তর্গত মৌহাটি গ্রামে চন্দ্রগোলের কাছে গোরুর রোগ নিরাময়, গাইয়ের দুধবৃদ্ধির কারণে পূজা দেওয়া হয়। সর্পদংশনের চিকিৎসায় মন্ত্রের সজীবত্ব বজায় রাখতে প্রতিবছর মা মনসার পূজা দেওয়া আবশ্যক। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বলিহারপুরে গেঁড়ি বুড়ির থান। এখানকার পূজারীরা বংশপরম্পরায় ছুলি, ধবল, হাঁপানি, নানা স্ত্রীরোগ ইত্যাদির চিকিৎসা করেন।

সাহিত্যের পুনরীক্ষণ (Review of Literature)

গবেষকগণের মতে, আদিবাসী মানুষেরা ঐতিহ্য পরম্পরায় যে-ওষুধ ব্যবহার করে আসছে—যার সঙ্গে তাদের আত্মিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক এবং মানসিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে—তাকেই বলা যেতে পারে 'লোকৌষধ'। তাঁদের মতে, লোকৌষধ শুধু দ্রব্যগুণসম্পন্ন ওষুধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বাস, সংস্কার, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, বশীকরণ, মারণ-উচাটন, বাণমারার মতো বিষয়ও।

প্রদ্যোতকুমার মাইতি 'মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে মেদিনীপুরের লোকচিকিৎসা পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) মন্ত্রের প্রয়োগ এবং (২) গাছ-গাছড়ার ব্যবহার। তিনি মন্তব্য করেছেন, কোন প্রচলিত বা সুনির্দিষ্ট অর্থপ্রকাশের মধ্যে মন্ত্রশক্তি সীমাবদ্ধ নয়। মন্ত্রের মাধ্যমে উৎসারিত শব্দ-স্পন্দনের মধ্যেই মন্ত্রের গূঢ় ক্রিয়াশক্তি নিহিত আছে। শব্দের সনাতন এবং চিরন্তন এক সত্তা আছে। শব্দ মনুষ্য-রচিত আকস্মিক বা অস্থায়ী কোন বস্তু নয়। তন্ত্রেও মন্ত্রোত্থিত শব্দের এক চিরন্তন সত্তায় বিশ্বাস করা হয়েছে।

ডেভিড জে. হাফোর্ড পেনসিলভেনিয়ার ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলেছেন, লোকচিকিৎসক দুধরনের—১) ভেষজবাদী (Herbalist) বা প্রাকৃতিক চিকিৎসক (Natural Healers) এবং ২) পাউউও (Powwow) বা অতিপ্রাকৃতিক চিকিৎসক। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'ন্যাচারাল' (Natural) অর্থে 'এম্পিরিক্যাল' (Empirical) বা 'র‍্যাশনাল' (Rational) এবং 'সুপার ন্যাচারাল' (Super Natural) অর্থে 'ইর‍্যাশনাল' (Irrational) বোঝানো হয়ে থাকে। যদিও তিনি মনে করেন, এই ধরনের শ্রেণিবিভাগ সঠিক নয়। তাঁর মতে, আঁচিল সারিয়ে তোলার মধ্যে মন্ত্রের জাদুমায়ার আবরণ থাকলেও অভ্যন্তরে রয়েছে লোকচিকিৎসকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, যার জন্য তিনিই পদার্থচূর্ণ অথবা মাকড়সার জাল দ্বারা চেপে ধরে আঁচিলের রক্তপ্রবাহকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক লোকৌষধ হচ্ছে সম্মোহন মনঃসমীক্ষণ দ্বারা রোগ নিরাময়ক (Folk Psychotherapy)।

অলোক চান্তিয়া এবং ঋতু গার্গ কুমায়ুন হিমালয়ের আদিবাসী লোকসমাজে সমীক্ষা চালিয়ে জেনেছেন, তারা বিশ্বাস করে প্রাকৃতিক কারণে রোগব্যাধি হলে তা ডাক্তাররা সারিয়ে তুলতে পারলেও অতিপ্রাকৃত শক্তির কারণে মানুষ আক্রান্ত হলে (যেমন 'পরী কি পাকড়' বা 'পরী লাগনা') তাদের লোকচিকিৎসক 'ডাঙ্গারিয়া'র কাছে যেতেই হবে। গবেষকদ্বয় কুমায়ুনের দেবদেবী এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির শ্রেণিবিন্যাস করেছেন এইভাবে—(১) উচ্চতর দেবদেবী (Superior Gods & Goddess), যেমন—শিব, শক্তি। (২) স্থানীয় বা লৌকিক দেবদেবী (Local Gods & Goddess), যেমন—শিব এবং শক্তির স্থানীয় রূপ। (৩) রাজঙ্গিস (Rajangis) বা ঐ অঞ্চলের পূর্বতন শাসকের পুণ্যাত্মা, যেমন—গোলু, হারু, সৈম প্রমুখ। (৪) ভূতাঙ্গিস (Bhutangis) বা পূর্বপুরুষের আত্মা। (৫) নিম্নতর দেবদেবী, ভূতপ্রেত, পরি ও অপদেবতা (Lower Gods & Goddess of water, air, hillocks, crematorium and ghosts)।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, মর্যাদার স্তর অনুযায়ী অতিপ্রাকৃত শক্তির বিন্যাস এইরকম—

দেবদেবী (deities, gods & goddess)

শক্তি (Spirits)

শুভ বা মঙ্গলময় (Benevolent)	অশুভ বা ক্ষতিকারক (Malevolent)	নিস্পৃহ (Indifferent)

চিত্রাপোরচেলভাম্ তামিল লোকসমাজের ঐতিহ্যবাহী ওষুধকে (Traditional medicine) মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) প্রকৃতিদত্ত ঔষধ (Naturopathy medicine) এবং (২) ধর্মীয়-সামাজিক ঔষধ (Socio-Religious medicine)। প্রথম বিভাগটিকে তিনি আরো তিনটি উপবিভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন—(ক) ভেষজ ঔষধ (Herbal medicine), (খ) প্রাকৃতিক ঔষধ (Naturo medicine) এবং (গ) প্রাণী, পাখি, পতঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ঔষধ (Animal, bird, insect medicine)।

ডি. সি. পাল এবং এস. কে. জৈন তাঁদের 'Tribal Medicine' গ্রন্থে লোকৌষধের বিস্তারণ দেখিয়েছেন এইভাবে—(১) আদিবাসী লোকৌষধ (Tribal medicine), (২) পশুনিরাময়ক (Veterinary medicine), (৩) বিষ (Poison), (৪) লোকপানীয় (Folk Beverage), (৫) লোকনেশাকর (Folk Narcotic), (৬)

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

মায়া বা ভ্রম উৎপাদনকারী ভেষজ (Hallucinate), (৭) মৎস্য বিষ (Fish poison), (৮) কীটনাশক (Pesticide), (৯) কীট-বিতাড়ক (Insect repellent), (১০) উল্কি (Tattooing) এবং (১১) যাদু-ধর্ম বিশ্বাস (Magico-Religious Belief)।

পশ্চিমবঙ্গের দাই এবং অভিজ্ঞ ও প্রবীণ মহিলারা সন্তান প্রসবকালে প্রসূতিকে যেভাবে পরিচর্যা করেন, বর্তমান নিবন্ধের লেখকদ্বয় তাকেও লোকচিকিৎসার অঙ্গ বলে মনে করেন। সোমা মুখোপাধ্যায় লোকধাত্রী বা দাইয়ের কার্যকলাপের বিস্তারণ যেভাবে দেখিয়েছেন তা এইরকম—

উপাদান এবং পদ্ধতি
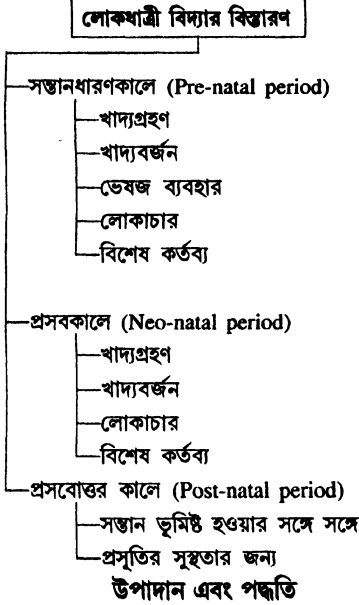
(Materials and Methods)

বর্তমান নিবন্ধের লেখকদ্বয় পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকৌষধের বিবরণ ও সুপারিশ বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত তথ্য থেকে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধ্যান করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার কিছু হাটবাজারে লোকৌষধের সম্ভার নিয়ে বসা ব্যাপারী চিকিৎসকের সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তাও বলেছেন। কথাবার্তা বলেছেন উদ্ভিদবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক-গবেষকদের সঙ্গেও। আদিবাসী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও পরামর্শ করা হয়েছে। প্রাপ্ত লোকচিকিৎসার সুপারিশ-গুলিকে পর্যালোচনা করে লোকৌষধের বিস্তারিত শ্রেণি-বিন্যাসের চেষ্টা করা হয়েছে।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার অরণ্য-সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়। এরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের তথাকথিত 'অন্তেবাসী' বলে মনে করা হয়। সাঁওতাল জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় হলো—মুণ্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ, মাহালী, কোড়া, লোধা, খেড়িয়া, বীরহোড় প্রভৃতি। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকৌষধ বলতে কেবল আদিবাসী লোকৌষধকেই (Tribal medicine) গণ্য করা হয়নি, ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী নিম্ন হিন্দুসমাজের লোকৌষধকেও এক্ষেত্রে গণ্য করা হয়েছে।

ভেষজের ব্যবহার

(ক) বীরুৎ (Herb)—(১) মুণ্ডারা বরবটি (Vigna trilobata) পাতার কাথ প্রতিদিন প্রায় ২০ মিলিলিটার পরিমাণ খাইয়ে অনিয়মিত জ্বর সারায়। (২) লোধারা মেক্সিকান ডেইজি (Tridax Procumbens) গাছের ৩ সেন্টিমিটার মাপের শিকড়ের টুকরো ব্যবহার করে ৩-৪ মাসের গর্ভপাত করায়। (৩) সাঁওতালরা কাকমাছি (Solanum nigram) গাছের কাথের সঙ্গে গোলমরিচের লেই ৫ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে প্রসূতিকে খাইয়ে সন্তানজন্ম ত্বরান্বিত করে। (৪) ওঁরাওরা সন্তানসম্ভবাকে হাজারদানা (Scoparia dulcis) গাছের কাথ প্রতিদিন ১০ মিলিলিটার খাইয়ে তার প্রসবোত্তর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে। (৫) লোধারা ভুঁই-আমলা (Phyllanthus fraternus) গাছের রস দই সহকারে জণ্ডিসের চিকিৎসায় সেবন করে।

(খ) গুল্ম (Shrub)—(১) ওঁরাওরা গোক্ষুরো (Xanthium strumonium) বীজের তেল ক্যান্সার-জনিত ক্ষতে ব্যবহার করে। (২) ওঁরাওরা অশ্বগন্ধা (Withania somnifera) ফল গায়ে ঘষে খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগ প্রতিহত করে। (৩) লোধারা রেড়ি (Ricinus communis) পাতার কাথ অসিদ্ধ ডিমের সঙ্গে ৩ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে শিশুদের খাইয়ে রাতকানা রোগ সারায়। (৪) মুণ্ডারা সর্পগন্ধা (Rauvolfia serpentina) পাতার কাথ এবং গোলমরিচের কাথ ৫ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে নিউমোনিয়ার রোগীকে খাওয়ায়।

(গ) বৃক্ষ (Tree)—(১) ওঁরাওরা অজীর্ণরোগে হরীতকী (Terminalia chebula) ফলের কাথ গোলমরিচের কাথের সঙ্গে ৩ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে সেবন করে। (২) সাঁওতালরা সাধারণ দেহ-দৌর্বল্যে বহেড়া (Terminalia bellirica) কাণ্ডের ছালের কাথ গোলমরিচের কাথের সঙ্গে ৫ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে সেবন

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকৌষধের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Folk Medicines)

লোকৌষধ (Folk Medicine)

- (ক) মানব-ব্যবহার্য লোকৌষধ (Human Medicine)
  - ১) উপশম বা আরোগ্য-সহায়ক লোকৌষধ (Curative)
  - ২) প্রতিষেধক বা নিবৃত্তিমূলক (Preventive)
  - ৩) বিষঘ্ন (Poison)
  - ৪) অন্যান্য (Others)
    - পানীয় (Folk Beverage)
    - নেশাকর (Folk Narcotic)
    - মায়া বা ভ্রম উৎপাদনকারী (Hallucinate)
- (খ) প্রাণিরোগ নিবারক (Veterinary Medicine)
- (গ) কীটনাশক (Pesticide)
  - ১) কীটনাশক (Insecticide)
  - ২) ছত্রাক নাশক (Fungicide)
  - ৩) কীট বিতাড়ক (Insect Repellant)
  - ৪) ব্যাক্টেরিয়া নাশক (Bacteriocide)

- দ্রব্যগুণসম্পন্ন
  - জীবজ (Biological)
    - উদ্ভিজ্জ
      - বীরুৎ (মূল, বল্কল, পাতা, ফুল, ফল)
      - গুল্ম
      - বৃক্ষ
      - অন্যান্য
    - প্রাণিজ
      - পতঙ্গজ
      - মৎস্যজ
      - বিহঙ্গজ
      - সরীসৃপজ
      - পশুজ
  - জৈব (Organic)
  - অজৈব (Inorganic)
    - শিলা এবং খনিজ পদার্থ
    - মাটি
    - জল
- যাদুধর্মীয়
  - ঝাড়ফুঁক (Mantra Cult)
    - বিষঝাড়া
      - সর্পদংশন
      - বিষাক্ত কীট দংশন
      - হিংস্র জন্তুর কামড়
      - অন্যান্য
    - ভুতঝাড়া ও অতিপ্রাকৃত শক্তি বিতাড়ন
    - ব্যথাবেদনা ঝাড়া (সটকা লাগা বা গ্যাঁচ ধরা, দুধ ঠুনকি, গা বেলসানোর চিকিৎসায়)
    - অন্যান্য
      - তাবিজ
      - কবচ

      (পেঁচোয় পাওয়া, কু-বাতাস লাগা, কাঁদন পাওয়ার চিকিৎসায়)
  - বাণমারা (Magic Cult)
    - ধ্বংসাত্মক (Black)
    - নিবৃত্তিমূলক (White)
  - অন্যান্য
    - তুকতাক
    - ফুসমন্তর
      - চালপড়া
      - ধুলাপড়া
      - তেলপড়া
      - আদাপড়া
      - জলপড়া
      - ঘি পড়া
      - সিঁদুর পড়া
    - কু-নজর
- অন্যান্য
  - সূর্যালোক
  - উত্তাপ

করে। (৩) সাঁওতালরা সেগুন (Tectona grandis) ফুলের লেই ও করঞ্জা (Pongamia pinnata) বীজের তেল একত্রে মিশিয়ে চুলের টনিক হিসাবে ব্যবহার করে। (৪) আদিবাসীরা কুচলা (Strychnos nux-vomica) বীজের ক্বাথ মধুর সঙ্গে ৫ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে শিশুদের শয্যা-প্রস্রাব নিবারণের জন্য সেবন করায়।

পতঙ্গজ লোকৌষধ ঃ (১) চিনি-যোগে ছারপোকা সেবন করলে অর্শরোগ ভাল হয় বলে বিশ্বাস। (২) রবিবার দিন রাত্রে জোনাকি পোকা কলার মধ্যে পুরে রোগীকে না জানিয়ে খাওয়ালে রাতকানা রোগ ভাল হয়।

মৎস্যজ লোকৌষধ ঃ (১) রুই মাছের পিত্ত সেবনে রাতকানা রোগ নিরাময় হয় বলে বিশ্বাস।

বিহঙ্গজ লোকৌষধ ঃ (১) রাত্রে জ্বরের চিকিৎসায় নিশাচর পাখির হাড় কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, কিংবা নিশাচর পাখির উচ্ছিষ্ট ফল খেতে দেওয়া হয়।

সরীসৃপজ লোকৌষধ ঃ (১) কানে পুঁজ হলে বেদের কাছে নিয়ে গিয়ে সাপের লেজ কানের ভিতর দিলে আরোগ্য লাভ হয়। (২) রবিবার যে-টিকটিকি পূর্বদিকে মুখ করে থাকবে তার লেজ কেটে পাকা কলার ভিতর পুরে একশিরা রোগীকে খাওয়ানোর বিধান আছে। ঐ লেজ রৌদ্রে শুকিয়ে সঞ্চয় করে রাখলেও কাজ হয় বলে বিশ্বাস। (৩) হাতে পায়ে টান ধরলে কোঁড়া উপজাতি গোসাপ এবং শূকরের চর্বি থেকে প্রস্তুত তেল মালিশ করে।

পশুজ লোকৌষধ ঃ (১) বিড়ালের বাচ্চা হওয়ার পর যে ফুল (প্লাসেণ্টা) পড়ে—সেটির একাংশ কলার ভিতর পুরে, জলে নিমজ্জিত অবস্থায় বন্ধ্যা রমণী খেলে অচিরেই সন্তানবতী হয়। (২) কোঁড়ারা রাতকানা রোগীকে ছাগলের পিত্ত ছাগমাংসের সঙ্গে সিদ্ধ করে খাওয়ায়। (৩) শিয়ালের বিষ্ঠায় কাঁকড়ার দেহাংশ থাকলে তা পুড়িয়ে শিশুকে খাওয়ালে বিষম কাশি ভাল হয়। বাঁদরের উচ্ছিষ্ট খেলে বাঁদর-কাশি বা খুকখুকে কাশি ভাল হয়। (৪) হরিণের চামড়ার টুকরো হাতে বেঁধে দিলে মূর্ছা রোগ ভাল হয়।

জৈব লোকৌষধ ঃ (১) শিশুর প্লীহা বাড়লে গো-বৎসের প্রস্রাব কম্বলে ভিজিয়ে প্লীহার ওপর সেঁক দিয়ে আরোগ্য লাভ করা যায়। (২) কেটে রক্তপাত হলে কোঁড়ারা ক্ষতস্থানে রোগীর প্রস্রাব মালিশ করে থাকে। (৩) শিশুর চোখে ঠাণ্ডা লাগলে সকালে জলের পরিবর্তে মায়ের দুধ দিয়ে চোখ পরিষ্কার করানো হয়। (৪) শিশুর চলচ্ছক্তিহীনতায় পানের বোঝা বাঁধা বিচালির দড়ি বা ছোঁট কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়। (৫) হাতির বিষ্ঠা মাখিয়ে দিলে শরীরের মেদবৃদ্ধি হয়।

অজৈব লোকৌষধ ঃ (১) মাথা ধরলে সাঁওতালরা কাস্তে পুড়িয়ে সেটির অগ্রভাগ দিয়ে অথবা ঝাঁটার কাঠি পুড়িয়ে কপালের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘন ঘন ছেঁকা দিয়ে উল্কির মতো দাগ দেয়। (২) লাঙলের ফালে লেগে থাকা মাটি নিয়ে শিশুর লিঙ্গে লেপন করলে ঘা বা ক্ষত নিরাময় হয়। (৩) দেওয়াল থেকে কয়লার টুকরো খুঁজে বের করে মাটিতে ঘষে চোখের পাতায় লেপে দিলে আঞ্জনি সারে। (৪) নবজাতকের কানে পুঁজ হলে শ্মশানে রবিবার পরিত্যক্ত হাঁড়িকুড়িতে বৃষ্টির জমা জলে শিশুকে স্নান করিয়ে, পিছনে না তাকিয়ে চলে আসতে হয়।

ঝাড়ফুঁক ঃ (১) সর্পদংশনের বিষঝাড়া ঃ ওঝা এসে প্রথমেই 'বিষখারা' মন্ত্র প্রয়োগ করে, যাতে বিষ রক্তে বেশি না মিশতে পারে। সর্পদংশনে শরীরে 'মোয়া' (Infection) হয়। মন্ত্রপ্রয়োগে এই 'মোয়া' ঝাড়া (Cure) হয়। ঝাড়নের জন্য বাসক গাছের ডাল এবং আপাং গাছের শিকড় ব্যবহৃত হয়। 'মোয়া' ঝাড়নের জন্য কখনো কখনো পিঠের ওপর মন্ত্রপূত কাঁসার থালা বসিয়ে দেওয়া হয়। (২) ভূতঝাড়া ঃ ওঝা এধরনের অস্বাভাবিক লোক বা স্ত্রীলোকের হাত-পা বেঁধে শক্ত ঝাঁটা দিয়ে তাকে নির্মমভাবে মারতে থাকে, চুলের মুঠি ধরে আর মন্ত্র পড়তে থাকে অনর্গল। (৩) ব্যথাবেদনা ঝাড়া ঃ স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ সঞ্চিত হয়ে অনেক সময় অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। তাকে বলে 'দুধ ঠুনকি'। এই ব্যথাও ঝাড়ন মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া 'সটকা লাগা' বা 'গ্যাঁচ ধরা' ব্যথাও ঝাড়ন মন্ত্রে সারানো যায় বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস।

বাণমারা ঃ গুনিন গোপনীয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করে মন্ত্র পড়ে এবং কখনো কখনো কিছু ক্রিয়া করে শত্রুকেও বাণ মারে। তাই দেখা যায়, গাছের ফলকে অকালে ঝরিয়ে দিতে, গাছকে শুকনো করে দিতে, মানুষের দেহকে ক্রমশ ক্ষীণ করে দিতে, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিতে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা হয়। ভাল কাজে বাণমন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষ চোখে পড়ে না। তবে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিষেধক হিসাবে এবং রোগীর প্লীহা বড় হলে বাণ মেরে তা নষ্ট করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আছে।

কু-নজর ঃ শিশুদের ওপর কু-নজর পড়লে সন্ধ্যাবেলায় তিনটি শুকনো মরিচ ও তিনটি লেবুর পাতা আগুনে দিয়ে শিশুকে সেঁকা হয়।

ফুসমন্তর ঃ ফুসমন্তর হলো কোন বস্তুকে ফুক দিয়ে ঔষধরূপে ব্যবহারের পদ্ধতি। পেটের ব্যথায় চালপড়া খেতে দেওয়া হয়। এখানে 'পড়া' অর্থ মন্ত্রপূত করা। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে পাকা কলা পড়া খেতে দেওয়া হয়। কাটা ঘায়ের রক্ত বন্ধ করার জন্য ধুলাপড়া দেওয়া হয়।

তুকতাক ঃ (১) শিশুদের মাসিপিসি রোগ হলে মাসিপিসিদের দিয়ে হাত বুলানো হয় বা তাদের কাপড় দিয়ে ঝেড়ে দেওয়া হয়। (২) সদ্যোজাত শিশুর নাভির স্ফীতি হলে মামা তিনবার বৃদ্ধাঙ্গুলি ঠেকিয়ে দিলে নাভি বসে যায়। (৩) গায়ে ছুলি হলে মামার গামছায় গা মুছলে আরোগ্য লাভ হয় বলে বিশ্বাস। (৪) শিশুর পেটের অসুখ হলে শিশুকে 'উনান বুড়ি'র কাছে প্রণাম করানো হয়। (৫) শিশু সামান্য আঘাত পেলে সাঁওতাল মা আটাসি পাটাসি বা তুকতাক করে। (৬) মায়ের স্তন চুলকালে শিশুর জ্বর হয় বলে বিশ্বাস। তখন মাকে চালভাজার কুঁচিকাঠির গুচ্ছ আগুনে ঠেকিয়ে স্তনে বুলিয়ে দিলে ভাল হয়।

প্রাণিরোগ নিবারক বা নিরাময়ক (Veterinary Medicine) ঃ (১) লোধারা খয়ের গাছের (Acacia catechu) কাণ্ডের ছাল ক্বাথ হিসাবে ৫০ মিলিলিটার দিনে দুবার গবাদি পশুর উদরাময় (Diarrhoea) রোগে ব্যবহার করে। (২) লোধারা গুহ বাবলা (Acacia farnesiana) গাছের ফল গোখাদ্য হিসাবে গবাদি পশুর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যবহার করে। (৩) আপাং (Achyranthes aspera) বীজের ক্বাথ গাছ পিপলা (Pothos scandens) ফলের ক্বাথের সঙ্গে ৫ ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে গবাদি পশুর পাগলা কুকুর কামড়-জনিত চিকিৎসায় ওঁরাওরা ব্যবহার করে। (৪) মুরগির এঁটুলি পোকার চিকিৎসায় লোধারা বচ (Acorus calamus) গাছের শিকড়ের গুঁড়ো ঘুঁটের ছাইয়ের সঙ্গে ১ ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে ব্যবহার করে। (৫) সাঁওতালরা ছাতিম (Alstonia scholaris) গাছের তরুক্ষীর (Latex) গোলমরিচের ক্বাথের সঙ্গে ৪ ঃ ৩ অনুপাতে মিশিয়ে গবাদি পশুর আমাশয় রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে। (৬) সাঁওতালরা আতা (Annona squamosa) বীজের গুঁড়ো গবাদি পশুর কৃমির আক্রমণ-জনিত ক্ষত সারাতে ব্যবহার করে। (৭) লোধারা শিয়ালকাঁটা (Argemone mexicana) গাছের রস পিঁয়াজের ক্বাথের সঙ্গে ৩ ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে গৃহপালিত পশুর পরজীবী পতঙ্গ মারতে ব্যবহার করে। (৮) সাঁওতালরা কাঞ্চন (Bauhinia racemosa) কাণ্ডের ছাল থেকে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম তন্তুকে গবাদি পশুর দেহে গভীর ক্ষত সেলাই করতে ব্যবহার করে। (৯) আদিবাসীরা গবাদি পশুর ফোঁড়া বা ক্ষতের ম্যাগট মারতে পলাশ (Butea monosperma) বীজের গুঁড়ো ব্যবহার করে। (১০) লোধারা বাঁদর লাঠি (Cassia fistula) বীজের গুঁড়ো ৫ ঃ ৩ অনুপাতে চুনের সঙ্গে মিশিয়ে গবাদি পশুর গলাফোলা রোগ নিবারণের জন্য ব্যবহার করে।

মৎস্য বিষের ব্যবহার ঃ (১) লোধা এবং অন্যান্য আদিবাসীরা নিমের খোল মাছ মারতে ব্যবহার করে। (২) অ্যাগেভ-এর (Agave angustifolia) থেঁতলানো পাতা মাছ মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। (৩) আদিবাসীরা করঞ্জার (Pongamia pinnata) খোল মাছ মারতে ব্যবহার করে। (৪) আদিবাসীরা মহুয়ার (Madhuka longifolia) খোল মাছের বিষরূপে ব্যবহার করে।

সর্প বিতাড়কের ব্যবহার ও সর্পদংশনের চিকিৎসা ঃ (১) ওঁরাওরা গুহ বাবলা (Acacia farnesiana) কাণ্ডের ছাল ব্যবহার করে। (২) সাপের ওঝারা ফণীমনসার (Opuntia stricta) কাঁটা সাপ ধরার জন্য হুক হিসাবে ব্যবহার করে। (৩) ওঝারা সর্পদংশন বা বিষাক্ত কীটের চিকিৎসায় ঝাড়নের জন্য বাসক গাছের ডাল, বেগনে পাতা বা আপাং গাছের শিকড় ব্যবহার করে। (৪) ওঁরাওরা সর্পদংশনের চিকিৎসায় সর্পগন্ধার (Rauvolfia serpentina) শিকড়ের ক্বাথ গোলমরিচের ক্বাথের সঙ্গে ৩ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে সেবন করায়।

কীটনাশকের ব্যবহার ঃ (১) আদিবাসীরা পলাশ কাণ্ডের ছালের ক্বাথ মাছি মারার জন্য ব্যবহার করে। (২) লোধারা কাঁটা আলু (Dioscorea pentaphylla) কন্দের শুকনো গুঁড়ো উকুন মারতে ব্যবহার করে। (৩) সাঁওতালরা পাহাড়ি শিরিষ (Albizia procera) কাণ্ডের ছাল কীটনাশক-রূপে ব্যবহার করে। (৪) ওঁরাওরা আতা বীজের গুঁড়ো উকুন ও ছারপোকা মারতে ব্যবহার করে। (৫) সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীরা নিমগাছের খোল কীটনাশকরূপে ব্যবহার করে।

কীটবিতাড়কের ব্যবহার ঃ (১) গুহ বাবলার (Acacia farnesiana) তাজা মূল শস্যগোলায় ইঁদুর তাড়াতে ব্যবহৃত হয়। (২) আদিবাসীরা অপক্ক নোনা ফলের গুঁড়ো শস্যগোলায় ব্যবহার করে। (৩) আদিবাসীরা ধানখেতের মাজরা পোকা তাড়াতে নিসিন্দা (Vitex negundo) গাছের টাটকা ডাল জমিতে পুঁতে দেয়। লোধারা শুকনো পাতার গুঁড়ো ছারপোকা তাড়াতে ব্যবহার করে।

বিষের ব্যবহার ঃ (১) কাঞ্চন (Bauhinia purpurea) গাছের শিকড়ের ছাল থেকে বিষ তৈরি করা হয়। (২) আদিবাসীরা বিশালাঙ্গুলী (Gloriosa superba) কন্দের ক্বাথ বিষাক্ত তীর বানাতে ব্যবহার করে। (৩) লোধারা করবী (Nerium indicum) বীজের গুঁড়ো বন্য প্রাণী, বিশেষত ইঁদুর মারার বিষ হিসাবে ব্যবহার করে।

সিদ্ধান্ত

আদিবাসীরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তাই তাদের ব্যবহার্য লোকৌষধগুলির পরিধিও বিস্তৃত। উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড়বস্তুর প্রায় সবই তারা লোকৌষধরূপে ব্যবহার করে। তাদের ধারণা, রোগব্যাধি বিমুক্তির উপায় প্রাকতিক উপাদানের

মধ্যেই নিহিত আছে। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিবাসীরা সম্ভবত লোকৌষধগুলির অভ্যন্তরস্থ 'প্রাণের নির্যাস' বা 'Life essence'-কে রোগবিমুক্তির কারণ মনে করে।

যেসমস্ত রোগ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা সারানো যাচ্ছে না, তার চিকিৎসার সূত্র মিলতে পারে আদিবাসী লোকৌষধগুলি থেকে। তাই লোকৌষধগুলিকে গবেষণাগারে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার, তার মধ্যে কোন্ বিশেষ সক্রিয় উপাদানটি রয়েছে। প্রাণিজ ঔষধ ব্যবহারের তুলনায় ভেষজ এবং অজীব-প্রকৃতিজ ঔষধ ব্যবহারে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রাণিজ, বিশেষ করে পশুজ লোকৌষধ, যেমন হরিণের চামড়া, বাঘের মাংস প্রভৃতি ব্যবহারে সেইসব প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। তুলনায় উদ্ভিদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় অত্যন্ত বেশি এবং দ্রুত। তবে কিছু বিরল প্রজাতির উদ্ভিদকে যথেষ্ট মাত্রায় সংরক্ষণ না করে শুধু সংগ্রহ করলে পরিশেষে সেগুলিও লুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। অব্যর্থ ও কার্যকরী লোকৌষধ এবং প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার্য ভেষজ উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ সংগ্রহের মাধ্যমে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটতে পারে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, চীন, জাপান ও কোরিয়া বুনো মাশরুম এবং তা থেকে উৎপাদিত মহার্ঘ ওষুধ বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কেননা ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বুনো মাশরুমজাত ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, যেখানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছায়নি, সেখানে লোকচিকিৎসা ও লোকৌষধই একমাত্র ভরসা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে প্রবহমান লোকচিকিৎসাধারার বৈজ্ঞানিক দিকটির সন্ধান করা এবং তাকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা। ❑

উল্লেখপঞ্জি

(১) আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা—অমলকুমার দাস, 'লোকশ্রুতি', ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯০, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, পৃঃ ৩৬-৫৩

(২) রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—অমলেন্দু মিত্র, 'সুবর্ণরেখা', কলকাতা

(৩) Healing through the supernatural—A psycho-cultural study of 'Pari Ki Pakarh' in Kumaun of U.P.—Alok Chantia and Ritu Garg, 'Tribal Health Bulletin', Vol. 7, No. 2, July 2001

(৪) অরণ্য সংস্কৃতি—আবদুস সাত্তার, 'মুক্তধারা', স্বাধীন বাঙলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

(৫) ঔষধি গাছপাতা—এস. কে. জৈন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

(৬) Traditional Medicinal Practices among the Tamil Folk with special reference to animals, birds and insects—Mrs. S. Chitraporchelvam, 'Fossil News', No. 22, Feb. 2002, Thiruvananthapuram, Kerala, pp. 17-18

(৭) A Call for action: Promoting Health in Developing Countries, Division of Health Education, World Health Organization, Geneva, 1990, pp. 2-4

(৮) বাঙলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২০৪-২০৭

(৯) Tribal Medicine—D. C. Pal and S. K. Jain, Naya Prokash, 1998, Kolkata-6

(১০) লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত—ত্রিপুরা বসু, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃঃ ৩৯-৫৩

(১১) Maternal and Child health care among Birhors of Madhya Pradesh—G. D. Pandey and U. R. Lakra, 'Tribal Health Bulletin', Vol. 6, No. 1, 2000

(১২) মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি—প্রদ্যোতকুমার মাইতি, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক

(১৩) Studies in Santal Medicines and Connected Folklore —P. O. Bodding, Part I and Part II, pp. 1-427

(১৪) আবাস সন্নিহিত ভেষজ উদ্ভিদ—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), পরশুরাম কামিল্যা, প্রবীররঞ্জন শূর, কল্যাণ চক্রবর্তী, সায়েন্স ফর সোসাইটি (ইণ্ডিয়া), কলকাতা

(১৫) The Lodhas of West Bengal: A Socio Economic Survey—P. K. Bhowmik, Punthi Pustak, Kolkata

(১৬) জঙ্গল মহলের লোককথা—মধুপ দে, বিপ্লবী সব্যসাচী প্রকাশনী, মেদিনীপুর

(১৭) অনুন্নত দেশগুলিতে লোকৌষধের গুরুত্ব—মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাস ভট্টাচার্য, কল্যাণ চক্রবর্তী, সাধন দে, পুলক মণ্ডল, অমরনাথ পাল, বিমলকুমার থান্দার, সমীরকুমার সরকার, বিকাশ কান্তি মিদ্যা কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত 'ফোকলোরিস্টিক্স ইন দি মডার্ণ কনটেক্সট' কর্মশালায় পঠিত, ২২ অক্টোবর—২ নভেম্বর ২০০২, কলকাতা

(১৮) বাঙলা প্রবাদে অখণ্ড কৃষির খণ্ডিত চিত্রালোক—মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস ২০০২, ২৮ ফেব্রুয়ারি—২ মার্চ, বিশ্বভারতীতে পঠিত গবেষণাপত্র

(১৯) Use of Midicinal Plants for health care: Looking back—D. P. Roy, A. K. Das, S. Sahoo

(২০) Folk healers, Handbook of American Folklore—Richard M. Dorson (Ed), David J. Hafford, Indiana University Press, Bloomington, U.S.A, pp. 306-313

(২১) সিউড়ির মোরব্বা—সুনীতিকুমার মণ্ডল, 'কালধ্বনি', ১১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০২, পৃঃ ৬৬-৬৭

(২২) অরণ্য ও আদিবাসী সমাজ—সুহৃদকুমার ভৌমিক, 'লোকশ্রুতি', ১৮শ সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃঃ ৭৩-৮১

(২৩) পশ্চিমবঙ্গের দাই—সোমা মুখোপাধ্যায়, 'লোকশ্রুতি', ১৮শ সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃঃ ১৮৩

মহারাজ নন্দকুমারের গুহ্যকালী

স্বামী অচ্যুতানন্দ*

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আছে, কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্টিমারে যেতে যেতে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভিন্ন তা নানাভাবে বলেছিলেন ঃ "ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নামরূপভেদ।"

কেশবচন্দ্র যখন হাসতে হাসতে বলেন ঃ "কালী কতভাবে লীলা করছেন সেই কথাগুলি একবার বলুন।" তখন ঠাকুরও হাসতে হাসতে বলেন ঃ "তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়—রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়—তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।... মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি-নাশের পর ঐরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।... কালী কি কালো? দূরে তাই কালো—জানতে পারলে কালো নয়।..." এরপর ঠাকুর গান ধরেন—"মা কি আমার কালো রে, কালোরূপে দিগম্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে।" গানের শেষে তিনি আবার বলেন ঃ "তিনি ভব-বন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।... তিনি লীলাময়ী। এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

তন্ত্রেও আছে—"উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ। চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজা অষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী।।"—হে মা, উপাসকগণের কল্যাণার্থে এবং জগতের দানব বিনাশার্থে তুমি নানা রূপ শরীর ধারণ কর। তুমি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা ও অষ্টভুজা। তুমিই আবার এই বিশ্বরক্ষার্থে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে থাক।

কত রূপে যে মা সন্তানদের মনের সাধ মেটান তা কে জানে! "সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।"

কথা হচ্ছিল আমার যাত্রাসঙ্গী এক ভক্তের সঙ্গে। আমরা বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ যাচ্ছিলাম ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ ধরে। পথে মুর্শিদাবাদ ও বীরভুমের সীমান্তের কাছে মোড়গ্রামের মোড়ে আসতেই সহযাত্রী বললেন ঃ "এতক্ষণ তো মা কালীর কথা হচ্ছিল—এই কাছেই আছেন দুই বহু প্রাচীন কালী, ঐতিহাসিকও বটে। যাবেন দেখতে? বেশি সময় লাগবে না।" আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম। উনি না বললেও আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিতেই বলতাম। কারণ, এই পথে দেবীমন্দির-দুটি দর্শনের জন্যই আজ সকাল সকাল যাত্রা করা। তবে রাস্তাটা জানা ছিল না। এখন ভদ্রলোক প্রস্তাব করতেই ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ভদ্রপুর-আকালীপুরের রাস্তা জানেন কিনা? তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমরা এই জায়গারই ছেলে—আমরা সব জানি। আপনি আগে কেন বলেননি? চলুন, আমিই সব দেখিয়ে দেব।" বলেই তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে বাঁদিকে গাড়ি নামিয়ে আরেকটা পাকা রাস্তা ধরলেন। বাঁদিকে লোহাপুর রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তা পার হয়ে গেল। এটি নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথের স্টেশন, এখান থেকে কাছেই। রেলপথের যাত্রীরা এই স্টেশনে নেমেই মন্দির-দর্শনে আসেন। আর বহরমপুর বা মালদহ থেকে যাত্রীরা ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ ধরে এই মোড়ে নেমে অন্য বাস ধরে ভদ্রপুর-আকালীপুরে পৌঁছান।

---

* বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, 'উদ্বোধন'-এর পাঠকমহলে পূর্বপরিচিত, সুলেখক

আমরা অল্পসময়ের মধ্যেই দুপাশের ধানখেত ছাড়িয়ে লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়লাম। গ্রামটির নাম 'ভদ্রপুর'। বাংলার ইতিহাসে এই গ্রামটি একসময় বিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবদের হিতৈষী, বিশেষ করে মীরজাফরের বন্ধুস্থানীয় মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান ও বাসস্থান হিসাবে ভদ্রপুরের খ্যাতি খুবই ছিল। আজ এই ছোট গ্রামখানি বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই গ্রাম পেরিয়ে গাড়ি আরো পশ্চিমদিকে এগিয়ে আরো ছোট একটি গ্রামের প্রান্তে এসে থামল। এই গ্রামের নাম 'আকালীপুর'। এটি ভদ্রপুরের এক মাইল পশ্চিমে। আমাদের ডানদিকে একটি নতুন রং করা বাড়ি, তার মাথায় লেখা 'আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম'। গাড়ি থামতেই কয়েকজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তাঁরা আমাদের পরিচয় জেনে নিয়ে আশ্রমের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এখানে শ্রীশ্রীমা-ই মূল বিগ্রহ। ঠাকুর, স্বামীজী দুপাশে। ঠাকুর-মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেই দেখা হলো দুজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। এঁরাই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। এখন এই আশ্রম মায়েদের হাতে দিয়ে তাঁরা কাছেই অন্যত্র একটি আশ্রম করে চলে গিয়েছেন। এঁদের প্রধান বাগীশানন্দ পুরী—সুদর্শন, অল্পবয়সী, শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত। খুব আন্তরিকভাবে তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। আমাদের আসার উদ্দেশ্য শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন ঃ "চলুন, আমি আপনাদের দর্শনাদির সব ব্যবস্থা করে যা জানবার আছে সব বলব।"

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে আসার উদ্দেশ্য আমার সার্থক হলো। আমাদের প্রথমে সামান্য জলযোগ করিয়ে তিনি আরেকজন সাধু ও গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে সামনেই রাস্তার দক্ষিণদিকে একটু মাঠের ভিতরে মায়ের মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এটিই মহারাজ নন্দকুমারের আনীত ও প্রতিষ্ঠিত দেবী গুহ্যকালীর মন্দির। এখানকার অভিনব কালীমূর্তি শুধু বাংলাদেশে কেন, সারা ভারতে আছে কিনা সন্দেহ।

মন্দির এখনো খোলেনি। পূজারীকে খবর দেওয়া হলো। তিনি স্নান করছেন—একটু পরে আসছেন। ইত্যবসরে বাগীশানন্দজী আমাদের নিয়ে মন্দির-চত্বরে এলেন। বহু প্রাচীন মন্দির। ইতিহাসের হিসাবে ফাঁসিকাঠে মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যু হয় ১৭৭৫ সালের ৮ জুলাই। তার আগেই তিনি এই মূর্তি এনে মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি শেষ দেখে যেতে পারেননি।

গুহ্যকালী-মন্দির

আমরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখলাম। আটকোণা ছোট গর্ভমন্দির, মাথায় কোন চূড়া নেই। সামান্য জায়গা নিয়ে গলির মতো সঙ্কীর্ণ পথে মন্দির-পরিক্রমার ব্যবস্থা আছে। তার বাইরে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীন বাংলার ইঁটের তৈরি এই মন্দিরটি অসমাপ্ত, ইঁটের গায়ে প্লাস্টার পর্যন্ত করা হয়নি। প্রাচীর ও গর্ভমন্দিরের তিনটি দরজা আছে। দক্ষিণে প্রধান দরজা, পূর্বে ও পশ্চিমে আরো দুটি। দেবীর বিগ্রহ এই তিনটি দরজা দিয়েই দেখা যায়। দক্ষিণমুখী দরজাটির চৌকাঠ কালো ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি। বেশ উঁচু। অন্য দরজার চৌকাঠও একই পাথরের। প্রাচীরের গায়ে বড় বড় ফাটল—সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। প্রাচীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অংশ ভেঙে গিয়েছে। মাথার ছাদ সম্পূর্ণ ভাঙা। প্রবাদ, এই মন্দিরের চূড়া দৈবদুর্যোগে ভেঙে যায়। শুধুমাত্র গর্ভমন্দিরের মাথায় ছাদটুকু আছে। তাও মনে হলো সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। দেখে বোঝা যায়, মন্দিরটি এককালে বিশাল উঁচু ছিল। মন্দিরের পশ্চিম দরজার কাছে একটি বহু প্রাচীন তেঁতুল ও অশ্বত্থ গাছ পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি বহু প্রাচীনকালের সাক্ষী। এছাড়া অন্য দুটি দরজার কাছেও দুটি প্রাচীন বেলগাছ আছে। মায়ের মন্দির দক্ষিণমুখী। মন্দির থেকে ৩০-৪০ হাত দূরেই শ্মশান। তার পরেই একটি নদী, এখন পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিতা। আগে এই জায়গাতে নদীটি উত্তরমুখে প্রবাহিতা ছিল। একটা বাঁকের

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

মুখে পড়ে স্রোত ঘুরে গিয়েছে। এখনো ক্ষীণধারায় নদীটি বয়ে যাচ্ছে। নদীর নাম 'ব্রহ্মাণী'। এই নদীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ ছিল। এই নদীপথেই গঙ্গা থেকে বজরা করে মহারাজ নন্দকুমার ও স্থানীয় লোকেরা তখন ভদ্রপুর-আকালীপুর অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। আজ সে-স্রোত আর নেই। তবে শ্মশান এখনো চালু। এখান থেকেই শ্মশান দেখা যায়।

ইতিমধ্যে অল্পবয়সী পুরোহিত দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এসে গেলেন। বহুকাল যাবৎ এঁদের পূর্বপুরুষেরা বংশ-পরম্পরায় মহারাজ নন্দকুমারের পারিবারিক পুরোহিতের কাজ করছেন। তিনি মাকে স্মরণ করে মন্দিরের দরজা খুললেন। তিনটি দরজা খুলতেই বাইরের আলোতে আমরা মায়ের অভিনব বিগ্রহ দর্শন করে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পুরোহিতের আহ্বানে সম্বিত ফিরে পেয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রাণভরে দেখতে লাগলাম।

ভারতের নানা জায়গায় নানা ধরনের কালীমূর্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু এই রূপের প্রতিমা আর কোথাও দেখিনি। পুরোহিতকে মায়ের ধ্যানমন্ত্রটি শোনাতে বললাম। সেটি তিনি আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দু-তিনবার আবৃত্তি করলেন। ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে মায়ের প্রতিমায় অনেকটা মিল দেখলাম—"মহামেঘপ্রভাং॥ দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীম্। লোলজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্॥ নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্ধকৃত-শেখরাম্। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং সবং স্বয়ম্॥ নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদিনীম্। পঞ্চাশৎ মুণ্ডসংযুক্তবর্ণমালাং মহোদরীম্॥ সহস্রফণাসংযুক্তমনন্তশিরস্যুপরি। চতুর্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্॥ তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কনভূষিতাম্। অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কনাম্॥ নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম্। বামে শিবস্বরূপন্তৎ কল্পিতং বৎসরূপকম্॥ দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগ-যজ্ঞোপবিতীনিম্। নরদেহসমা-বদ্ধ কুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্॥ প্রসন্ন-বদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাম্। নারদাদিভিঃ মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম্। অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্॥"—ঘনমেঘের মতো দীপ্তিবতী দেবীর পরনে কালো কাপড়, মুখে মৃদু হাসি, কোটরগত চোখ, সতৃষ্ণ জিহ্বা আর দাঁতগুলি ভীষণাকৃতির। তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র, গলায় সাপের মালা, পৈতা ও পঞ্চাশ মুণ্ড। তিনি সর্পশয্যায় শায়িতা ও বিশাল উদরবিশিষ্টা যেন আকাশ ব্যাপ্ত লেলিহান শিখা দিয়ে স্বয়ং যজ্ঞ রচিত হয়েছে। যাঁর অনন্ত মাথার ওপর সহস্রফণাযুক্ত ও চারদিকে বেষ্টিত সাপ। তাঁর বাম ও ডান হাতের বালাদুটি হলো তক্ষক ও অনন্তনাগ। কল্পনা করা হয়েছে সাপের জিহ্বাসমূহ যেন তাঁর রত্ননূপুর, বামে শিবস্বরূপ সন্তান। তাঁর কুণ্ডলে (কর্ণে) মানুষের দেহ। তিনি নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা, শিবগেহিনী, সৌম্যা, ভয়ঙ্কর অট্টহাসিনী, নবরত্নভূষিতা, প্রসন্না ও সাধকের অভিষ্টদায়িনী—এরূপ দ্বিবাহু দেবী গুহ্যকালীকে ধ্যান করবে।

মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত দেবী গুহ্যকালী

অপরূপা দেবী কষ্টিপাথরের। একটি যন্ত্রের মতো বেদির ওপর কালোপাথরের হাতখানেক উঁচু আরেকটি আয়তাকার আসন। তার ওপর দেবী উপবিষ্টা। শোনা গেল, পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তার ওপর দেবীর যন্ত্রাঙ্কিত সর্বনিম্ন বেদিটি স্থাপিত। তার ওপর বেদি-সহ একটি অখণ্ড কালোপাথরে মায়ের বিগ্রহ নির্মিত। আয়তাকার বেদির চারকোণে চারটি দণ্ডায়মান সাপ। তার ওপর দেবী দুটি কুণ্ডলীকৃত সাপের আসনের ওপর অর্ধপদ্মাসনে দক্ষিণ চরণের ওপর বাম চরণ স্থাপন করে বসে আছেন। দেবীর দক্ষিণ চরণ একটি সাপের মাথায়। অন্য সাপের মাথাটি দক্ষিণ চরণের হাঁটুর নিচে। দেবীর কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা, দুকানে দুটি শবশিশুর কর্ণভূষণ। সারা শরীর নিরাবরণ। বাঁকাঁধে সর্পের যজ্ঞোপবীত, দুহাতে সর্পবলয় ও কোমরে সাপের কোমর-বন্ধনী, মাথায় সহস্রনাগের মুকুট—পাঁচ থাক। দেবী ত্রিনয়ণা, লোলরসনা, শ্বেতদন্ত-পঙ্ক্তিশোভিতা, ভয়ঙ্করী। বিস্ফারিত নেত্রে মা তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। এত ভীষণা মূর্তি হলেও মায়ের দুই করে কিন্তু বরাভয়। যেন বলতে চাইছেন—আমার ভীষণা মূর্তি দেখে ভয় পেও না, এস কাছে এস। সমস্ত অমঙ্গল দূর করে তোমাকে অভীষ্ট

পথে পৌঁছে দিতেই আমি এখানে বসে আছি। সাধকের অভীষ্ট দান করাই যে আমার কাজ। যে আমার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পায়, সে আমাকে পায় না। যে এই মূর্তি দেখেও কাছে আসে, সে আমার অভয় ও বর দুই-ই পায়।

এইসময় পুরোহিত মায়ের বেশ পরিবর্তন করবেন। মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালাম—"মহাচণ্ড-যোগেশ্বরী গুহ্যকালী। করালী মহাভ্রামরী সাট্টহাসা।। জগন্তাসিনী চণ্ডিকা পালিকেতি। ত্বমেকা পরব্রহ্ম রূপেণসিদ্ধা।।... করালোন্মুখী কালিকে ভীমকান্তা। কটি ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা দানবহন্তা।। হুং হুং কড়্মড়্নাদিনী কালিকা ত্বং। প্রসন্না সদা মাং প্রপন্নান্ পুনাতু।"—হে গুহ্যকালি! তুমি মহাচণ্ডী, যোগেশ্বরী, করালী, চণ্ডিকা, অট্টহাস্যহাসিনী ও জ্যোতিঃস্বরূপিণী। তুমিই অদ্বিতীয়া পরব্রহ্ম রূপে সিদ্ধা, ভীমকান্তা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্মে আবৃতা, দানবহন্তা। হে কড়্মড়্নাদিনী কালি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হয়ে আমাকে পবিত্র কর।

শুনলাম, দেবীর আসনের বামদিকে বেদিতে শ্বেতপাথরের একটি প্রাচীন উপবিষ্ট শিবের মূর্তি ছিল। দুই ফুটের সামান্য বেশি উঁচু সেই মূর্তির ডান কোলে গণেশ ও বাম কোলে পার্বতী বিরাজিতা ছিলেন। কিছুদিন আগে সেই বিগ্রহটি চুরি হয়ে গিয়েছে। এখন তার জায়গায় একটি চীনামাটির শিবের ছোট মূর্তি রেখে দেওয়া হয়েছে। বাগীশানন্দজী আমাকে জানালেন, সেই অপহৃত মূর্তির একটি পুরনো ফটো তোলা আছে, সেটি তিনি আমাকে সংগ্রহ করে দেবেন। পরবর্তী কালে তিনি তা পাঠিয়েও দেন। শোনা যায়, একবার ডাকাতেরা এসে মায়ের বিগ্রহটি তুলতে না পেরে তাঁকে দড়ি দিয়ে ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে টানার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। মাকে তারা নিয়ে যেতে পারেনি।

দেবীকে প্রণাম এবং বাইরে এসে মন্দির প্রদক্ষিণাদি করে বাগীশানন্দজীর সঙ্গে কিছুটা দক্ষিণে শ্মশানে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই একটি বহু প্রাচীন বটগাছ। তার তলায় একটি প্রাচীন চাতাল। লাল সিমেন্টের সমচতুষ্কোণ বাঁধানো জায়গার মাঝখানে গোলাকার বেদির মতো। এটি একেবারে শ্মশানের মাঝে। পাশেই ব্রহ্মাণী নদী বয়ে চলেছে। একটু দূরে নদীতে নামার বাঁধানো ঘাট। এখানে প্রায়ই শবদাহ হয়। কাছেই রয়েছে শবযাত্রীদের জন্য ঘর, দু-একটি প্রাচীন সমাধিবেদি এবং কোন সাধুর অন্তিম সংস্কারস্থান। এই ঘাট দিয়েই মা এখানে এসেছিলেন প্রায় ২৫০ বছর আগে। এখানে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে বাগীশানন্দজী আমাকে সেই প্রাচীন কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

জনশ্রুতি, তন্ত্রপ্রসিদ্ধ গুহ্যকালীর বহু প্রাচীন বিগ্রহ এটি। এর মূল রয়েছে বহু সহস্র বছর আগে পৌরাণিক যুগে। ইনি ছিলেন মগধাধিপতি জরাসন্ধের কুলদেবী। এখানে প্রশ্ন করা বৃথা, শুধু শোনা—কোথায় মগধ-জরাসন্ধ, আর কোথায় ইতিহাসের নন্দকুমার!! সে যাই হোক, তারপর এঁকে দেখা যায় ইংরেজ আমলে কাশীর

আকালীপুরের শ্মশানে দেবী গুহ্যকালীর আদি পঞ্চমুণ্ডীর আসন

রাজা চৈৎ সিংহের প্রাসাদে তাঁদের গৃহদেবতা হিসাবে। ইংরেজ সেনাপতি ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কাশীর রাজপ্রাসাদ লুঠ করেন, তখন বহু সম্পদের সঙ্গে এই দেবীবিগ্রহও লুণ্ঠিতা হন। তারপর আবার একটু ধোঁয়াশাচ্ছন্ন অধ্যায়। আবার জনশ্রুতি—ইংরেজ সেনাপতিদের মতে, এই দেবীকে যবনস্পর্শের ভয়ে গঙ্গায় লুকিয়ে রাখা হয়, অথবা ফেলে দিতে চাওয়া হয়। সেইসময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী মহারাজ নন্দকুমার কোনভাবে এই দেবীবিগ্রহের খোঁজ পেয়ে তাঁকে নৌকায় করে নিয়ে আসেন মুর্শিদাবাদে তাঁদের প্রাসাদ কুঞ্জঘাটাতে নয়—একেবারে তাঁদের গ্রামের বাড়ি বীরভূমের ভদ্রপুরে। গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মাণী নদীর যোগ

থাকায় নদীপথেই মাকে সোজা নিয়ে এসে তিনি তোলেন এই আকালীপুরের জঙ্গলাকীর্ণ শ্মশানের পাড়ে। আরো প্রবাদ, দেবীকে নিয়ে ভদ্রপুরে তাঁর নৌকা থামতে পারেনি, তীরবেগে চলে এসে এক মাইল দূরের এই শ্মশানঘাটেই থেমে যায়। রাজা নন্দকুমার বুঝতে পারেন, মা এই শ্মশানবাসিনীই হতে ইচ্ছুক। তাই এই প্রাচীন বটগাছের তলায় তিনি একটি সাময়িক বেদি তৈরি করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডাসন তৈরি করে তার ওপর মায়ের সাময়িক অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই অঞ্চলটি তাঁর জমিদারির মধ্যেই ছিল। তারপর তিনি সামান্য দূরে একটি উপযুক্ত সুন্দর মন্দির তৈরি করে সেখানে মাকে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হন।

কিন্তু বিধি বাম! ওয়ারেন হেস্টিংসের চক্রান্তে মোহনপ্রসাদ নামে এক সাজানো লোকের অভিযোগক্রমে বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টি করে মহারাজ নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে বন্দী করা হয়। তিনি নিজে আর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করতে পারেননি, ছেলে গুরুদাসের ওপর এই কাজের ভার দিয়ে যান। গুরুদাস পিতার ইচ্ছায় এই মন্দির তৈরির ভার নেন। জনশ্রুতি, দেবী নাকি গুরুদাসকে স্বপ্নাদেশ দেন—বটবৃক্ষতলা থেকে যত পা ফেলে তিনি মন্দিরে আসবেন, ততগুলি বলি দিতে হবে। আর সেগুলি হবে নরবলি। গুরুদাস সে-ইচ্ছা মানেননি। তিনি মেষ, মহিষ ও ছাগ বলি দিয়ে মন্দিরের কাজ শেষ হওয়ার আগেই মাকে মন্দিরে স্থাপন করেন। কারণ, মহারাজ নন্দকুমার ফাঁসি হওয়ার আগেই জেনে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁর আরাধ্যা দেবী অস্থায়ী আসন ছেড়ে নিজস্ব মন্দিরের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অসমাপ্ত মন্দিরে মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে চতুর্দশী সংযুক্ত আশ্বিন পূর্ণিমায় দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহারাজ নন্দকুমার জেলে বসেই শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, দেবী গুহ্যকালী তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। তবে গুরুদাসও মন্দিরের সমস্ত কাজ শেষ করতে পারেননি। কি এক রহস্যময় কারণে দেবীর গর্ভমন্দিরের ভিতরেও তখন ইঁট বেরিয়ে। দেবীর অষ্টকোণাকৃতি মূল মন্দির ও বহিঃপ্রাকার পুরোটাই শুধু ইঁটের, তার ওপর চুনবালির কোন আস্তরণ নেই। আরো প্রবাদ, মন্দিরের চূড়া চেষ্টা করেও তিনি তৈরি করতে পারেননি। আজও এই সুবিশাল মন্দির অর্ধসমাপ্ত ও অর্ধভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। গর্ভমন্দিরে মাও গম্ভীরভাবে তাঁর নিজস্ব মহিমায় শ্মশানের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টির শেষ পরিণতির কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

শ্মশানবাসিনী মায়ের মন্দিরের চূড়া তারপরে আর কেউ নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করেননি। এই কথাগুলি শুনতে শুনতে পুরোহিত আমাদের ডেকে মন্দিরের কাছে নিয়ে গেলেন। মায়ের বেশবাস হয়ে গিয়েছে। সহকারী পূজার যোগাড় প্রায় শেষ করে এনেছে। এবার আমার প্রশ্নমতো তিনি এই দেবীর পূজাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা জানালেন।

দেবীর মন্দির নিত্য খোলা হয় সকাল আটটা-সাড়ে আটটার সময়। তারপর মায়ের স্নান, পূজা ও বেশ পরিবর্তন করে নিত্যপূজায় সামান্য ফলমূল, মিষ্টি নিবেদন করা হয়। ধ্যানমন্ত্র তো আগেই বলা হয়েছে। তবে বীজমন্ত্রে যা উচ্চারণ করা হয় তা 'বিশ্বসারতন্ত্র'-এ লেখা আছে—'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং শ্রীমৎ গুহ্যকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।' এই মন্ত্রে দেবীর পূজা ও তর্পণ করা হয়। দুপুর একটা-দেড়টার সময় মায়ের অন্নভোগ হয় দশ পোয়া আতপচালে। ডাল, কয়েকটি তরকারি ও চুনো মাছের টক—এগুলি নিত্য দিতে হয়। তবে কেউ টাকা দিলে তার জন্য আলাদা
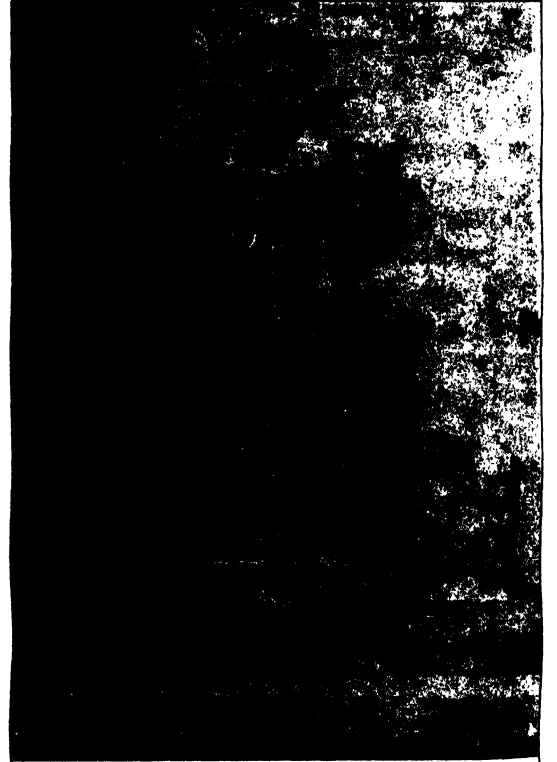
গুহ্যকালীর প্রাচীন আলোকচিত্র। পাশে শিব-দুর্গার মূর্তি দেখা যাচ্ছে।

ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। মাকে নিত্য মাছ দিতে হয়। তারপর মায়ের বিশ্রাম। গর্ভমন্দিরে ছোট খাটে মাকে মনে মনে শয়ন দেওয়া হয়। বিকালে আবার মন্দির খোলার পর সন্ধ্যারতি ও তারপর শীতল দিয়ে শয়ন। আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে মন্দির বন্ধ করে সবাই চলে যান। তখন এখানে কেউ থাকতে পারেন না। শ্মশানবাসিনী মায়ের নৈশলীলা দেখা নিষিদ্ধ।

এখানকার বিশেষ পূজা দুটি—একটি চতুর্দশী সংযুক্ত কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সকালে। এখানে অন্যান্য কালীপূজার মতো রাত্রে পূজা হয় না। রাত্রিটা মায়ের নিজস্ব লীলার জন্য সংরক্ষিত। সকালে মায়ের বিশেষ পূজা, বিশেষ ও বিরাট অন্নভোগ, হোম এবং বলিদান হয়। এখানে বলিদানেরও একটা বিশেষ বিধি আছে—গর্ভমন্দিরে পুরোহিত পূজাদি সাঙ্গ করে ঘণ্টাধ্বনি করে সঙ্কেত দিলে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ—তিন দরজার সামনে একসঙ্গে তিনটি বলি হয়। মা তাঁর ত্রিনেত্র দিয়ে তিনটি বলিই একসঙ্গে দর্শন করেন। পরে দক্ষিণের দরজার সামনে আরো বলিদান হয়।

এছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজার দিনও ঠিক এইভাবে দেবীর বিশেষ পূজা, হোম ও বলিদান হয়। এদিনও অনেক লোক মায়ের প্রসাদ পান। তাছাড়া পৌষসংক্রান্তি, দীপান্বিতা কালীপূজা ও দুর্গাপূজার মহানবমীতে পূজা ও বলিদান হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন মকরস্নানের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু জনসমাগম হয়। মন্দিরের কাছে একদিনের জন্য বিরাট মেলা বসে। মহারাজের বহরমপুরের বংশধরেরা এখনো মন্দিরের সেবায়েত। তাঁরা সাধ্যমতো সেবাপূজার ধারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন স্থানীয় ও দূরাগত ভক্তেরাও সাহায্য করেন। বর্তমান মৎস্যমন্ত্রীর চেষ্টায় মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

এই মন্দিরে তারাপীঠ থেকে বামাক্ষেপা মাঝে মাঝে মাকে দর্শন করতে আসতেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর রহস্যময় আলাপ হতো। তিনি দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন: "কিরে বেদের বেটি, কেমন আছিস?" সর্বাঙ্গে সর্পভূষণসজ্জিতা মাকে তিনি বেদের মেয়ে বলেই সম্বোধন করতেন। এখানে কখনো তিনি রাত্রিবাস করতেন না বা কিছু খেতেনও না। কাছেই শীতলপুর গ্রামের পূর্ণাভিষিক্তা এক তান্ত্রিক সাধিকা খড়ম পায়ে, হাতে খাঁড়া নিয়ে প্রতি রাত্রে এই মন্দিরে আসতেন। তিনি কারণ দিয়ে পূজা-তর্পণ করতেন। লোকে তাঁকে 'জটি-মা' বা 'জটে-মা' বলত। তিনি এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেন বলে প্রবাদ আরেকজন তান্ত্রিক সাধক কয়েক বছর আগে শ্মশানে দেবীর পরিত্যক্ত প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে কয়েক রাত জপধ্যান করার পর আর বসতে সাহস করেননি। তিনি তৎকালীন পুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন: "এ বেটিকে আর পারা গেল না। এ বেটি শুধু মারধোর করে।" তারপর তিনি এখান থেকে চলে যান। এক নেপালী সাধু একবার এখানে এসে মাকে দেখে বলেন: "এ যে আমাদের নেপালী মা।" নেপালে নাকি এরকম নাগপরিবৃতা দেবীকে পূজা করা হয়। বৌদ্ধতন্ত্রমতে, এই ধরনের বহু মূর্তি ঐসব অঞ্চলে আছে। বৌদ্ধ চীনাচার প্রথায় নানারকমের ভয়ঙ্করী মূর্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই মূর্তি তারই কোন প্রতিরূপ কিনা কে জানে!

মহারাজ নন্দকুমার মূলত বৈষ্ণব বংশীয় ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্য পরম্পরার রাধামোহন ঠাকুরের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও মনে মনে অন্যান্য তৎকালীন হিন্দুরাজাদের মতো মাতৃভক্ত ছিলেন। না হলে কাছেই ভদ্রপুরে তাঁদের কুলদেবী হিসাবে ভদ্রকালী মায়ের প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হলো? আর এই ভদ্রকালী থেকেই গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর' হয়েছিল। আর কেনই বা তিনি এই গুহ্যকালীকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন?

যাই হোক, এপ্রসঙ্গ শেষ করার আগে জানাই, কিছুদিন আগে মহারাজের বংশধরদের কাছে একটি ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া গিয়েছে। তাতে জানা যায়, অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানী ভবানী নন্দকুমারের গুহ্যকালীর কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। তখন তিনি থাকতেন মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের কিছু উত্তরে বড়নগরে গঙ্গাতীরের প্রাসাদে। তিনি সেখান থেকে কাছেই বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দেবী গুহ্যকালীকে দর্শন করে ভক্তিভরে ভূসম্পত্তি—১২৫৫ বিঘা জমি, ৫ খানি গ্রাম ও ২৫১ খণ্ড সোনা দান করেন। বহু প্রাচীন এই দলিলখানি রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে দেওয়া হয়েছে।

পুরোহিতের বক্তব্য শেষ হলো। তাঁকে এবার পূজায় যেতে হবে। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আবার মায়ের মন্দিরে গেলাম। মা তখন সুন্দর শাড়ি পরে গলায় জবাফুলের মালা দিয়ে সেজেগুজে বসে আছেন। বিকট-দর্শনা মাকে বড় সুন্দর লাগছিল। প্রাণভরে তাঁকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র 'নারায়ণী-স্তুতি' অনুসরণে—"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তি-হারিণী। ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।।"

ভয়ঙ্করী মায়ের বরাভয় কর দুখানি শেষ আশীর্বাদের মতো দর্শন করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ❑

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গা পূজা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

একদিন বলেছিলেন— মঠে 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করবেন। দেখেছ, তিনি তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি। হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রতিমাপূজার পাশি তিনি 'জ্যান্ত' মায়ের পূজা করছেন।
শুধু কি তাই। স্বামীজী চাইছেন, এই ভীরু দুর্বল বাঙালি জাতিকে সাহসী ও শক্তিশালী করে তুলতে। সেজন্যই তো বলেছেন—মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করব। মায়ের ছেলে বীর হবে। দুঃখে, যন্ত্রণায়, প্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে। এ শুধু ফুল-বেলপাতার পুজো নয়। এ ভাবের পুজো।
আমাদের মা আগেই এসেছেন। দেবীর প্রতিমাও এসে গেল। মৃন্ময়ী আর চিন্ময়ীর এবার একসঙ্গে পুজো।
ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় গঙ্গাতটে শুরু হলো দেবীর বোধন। পূজক ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হলেন শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পিতা তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ভাবে বিভোর স্বামীজী অপূর্ব কণ্ঠে মায়ের আগমনী গান ধরলেন।
গিরি গণেশ আমার শুভকারী...
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন...
আজ মহাসপ্তমী। ভোর হতেই বেজে উঠল সানাই। বেজে উঠল শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল। শুরু হয়ে গেল মহাপূজা। গভীর আবেগভরা কণ্ঠে পূজারীর মন্ত্রপাঠ চারিদিকে এক পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের সৃষ্টি করল। স্বামীজীর নির্দেশে সঙ্কল্প হলো শ্রীশ্রীমায়ের নামে। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে মানুষ এই অপূর্ব পূজা দেখতে ছুটে এল।
জটাজুটসমাযুক্তাং...
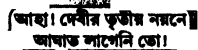
গতকাল মঠে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রাটা বেশ ভালই হয়েছে, বল।
ঠিক বলেছ। আমারও খুব ভাল লেগেছে।
আহা! দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো।
ওমা, এ কী হলো? এখন কী হবে?
কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্য যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।
স্বামীজীর এই মহানুভবতায় বিস্মিত হলেন শ্রীশ্রীমা।
ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।...
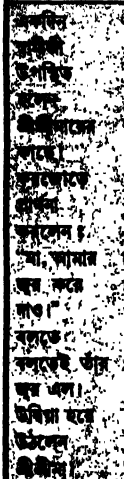
অবশেষে চলে এল নবমীর রাত্রি। পরদিন দেবী দুর্গা চলে যাবেন পতিগৃহে। সকলের মনই দুঃখে ভারাক্রান্ত। মঠের সাধু, ব্রহ্মচারী, ভক্ত—সকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছেন দেবীর কাছে। স্বামীজীও এসেছেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গেয়ে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গানগুলি। পূজার পরিবেশ হয়ে উঠেছে আরো ভাবময়।

বিজয়া দশমীর বিকালবেলায় মঠে লোকে লোকারণ্য। দলে দলে মানুষ আসছে বিসর্জন দেখতে। বেজে উঠেছে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, এমনকি ব্যাণ্ডও। গঙ্গার নৌকার [illegible] তোলা হয়েছে। এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এলেন। ভাবে নৃত্য করতে [illegible] বারান্দা থেকে দেখতে লাগলেন স্বামীজী।

নৌকা এগিয়ে চলল মাঝগঙ্গার দিকে। বিসর্জন হয়ে গেল দেবী দুর্গার মৃণ্ময়ী প্রতিমার। আর মঠে আলো করে বসে আছেন স্বামীজীর চিন্ময়ী প্রতিমা—'জ্যান্ত দুর্গা' জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা।
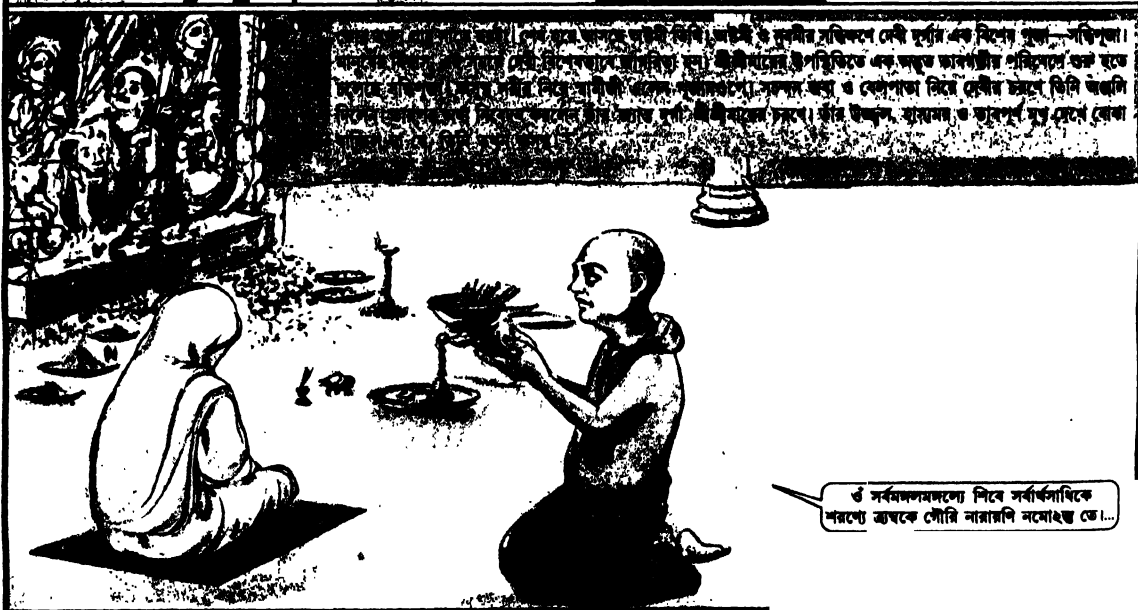
কম্পিউটার কি দাবার শেষকথা?

বন্দ্যোপাধ্যায়

দাবাখেলার প্রচলন ভারতবর্ষে অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ছিল না। একদিন যন্ত্রের মধ্যে গণিতের সূত্র ধরে দাবা প্রবেশ করল। খেলাটি যান্ত্রিক হয়ে উঠল। ঠিক এইভাবে না দেখে বরং একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করলেই বোধহয় ভাল হয়। বিজ্ঞান তার নিজস্ব দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলবেই। জীবনকে যান্ত্রিকতা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষেরই ওপর বর্তায়। কারণ, মানুষই তো বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা এবং নিয়ন্তা। সে-শক্তি ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন প্রেমের মাধ্যমে। ক্রীড়াজগতের মূল্যায়নে এই সর্বজনীন প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, অনন্তের তৃষ্ণাই চিরকাল মানুষকে কম্পিউটারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

মানুষ অনেক এগিয়েছে। অনেক বিষয়েই তাকে আর চিন্তা করতে হয় না। কেননা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান কম্পিউটার এসে মানুষের কাজ অনেক হালকা করে দিয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো দাবাতেও আজ সবকিছুই কম্পিউটার-নির্ভর। কম্পিউটারকে আজ দাবার পণ্ডিত করে তোলা হচ্ছে। কম্পিউটারকে দাবার নিয়ম তো শেখানো হচ্ছেই, শেখানো হচ্ছে কেমন করে সবচেয়ে সেরা চাল দিতে হয়, কেমন করে সে একজন মানুষকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিতে পারে। এই নিয়ে নানা দেশে গবেষণা হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

একটি কম্পিউটার যে একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে—এঘটনা বিশ্ববাসী প্রথম প্রত্যক্ষ করে ১৯৯৭ সালে। সুপার গ্র্যাণ্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভকে আই. বি. এম. ডিপ-ব্লু সুপার কম্পিউটার ছয় গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে শোরগোল পড়ে যায় ক্রীড়া-সমাজে। অবশ্য পরে আনাতলি কারপভ ও বিশ্বনাথন আনন্দ এই কম্পিউটারকে বশীভূত করতে সক্ষম হন আপন মেধা ও বুদ্ধির ঐশ্বর্যে। ১৯৬৮-তে ব্রিটেনের এক দাবাবিশারদ ও সাংবাদিক ডেভিড লেভি মন্তব্য করেছিলেন, কম্পিউটার কখনো একজন গ্র্যাণ্ডমাস্টারকে হারাতে পারবে না। সাত-আটের দশকে এধরনের বহু 'গেম' খেলা হয়েছে। প্রতিবারই কম্পিউটার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে মানুষের ধীশক্তি ও মনীষার কাছে। ১৯৯৭-এ এসে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়। সুপার কম্পিউটার ডিপ-ব্লু ছিল বিশেষভাবে নির্মিত, অসংখ্য প্যাকেজ-সম্বলিত। গ্যারি কাসপারভ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে তার কাছে তিনটি গেম খুইয়েছিলেন।

কম্পিউটারের কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রতিদিনই কম্পিউটার উন্নতি করে চলেছে। বলা যায়, কম্পিউটারকে উন্নত করে তোলা হচ্ছে। যন্ত্রটি হেরে গেলে দুঃখ পায় না, লজ্জাও পায় না। তার স্মৃতিতে একবার যা প্রবেশ করানো হয়, তা সে কখনোই ভুলে যায় না। একজন গ্র্যাণ্ডমাস্টার একনাগাড়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করলে তাঁর শরীরে এবং মনে ক্লান্তি আসে, কিন্তু কম্পিউটারের ক্লান্তি নেই। সে দিনের পর দিন একনাগাড়ে কাজ করে যেতে পারে। ফলে তাকে 'টাইম প্রেসারে' পড়তে হয় না। আসলে দাবা খেলায় মানুষের বুদ্ধি, ধৈর্য, জ্ঞান, শিল্প ও বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়তে বোর্ডে মুখোমুখি বসে। আর সেই খেলায় রয়েছে কত নাটকীয়তা, কত রোমাঞ্চ, কত আবেগ! কম্পিউটারে এর কোনকিছুই প্রতিফলিত হয় না।

বড় বড় দাবাড়ুদের কয়েক হাজার খেলার যাবতীয় 'থিওরি' ও 'থিওলজি' মনে রাখতে হয়। মনে রাখতে হয় ওপেনিং, মিডল ও এণ্ড গেমের জটিলতম পরিস্থিতিগুলি। মনে রাখতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে কতগুলি চাল দিতে হবে, তার প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা কোথায়
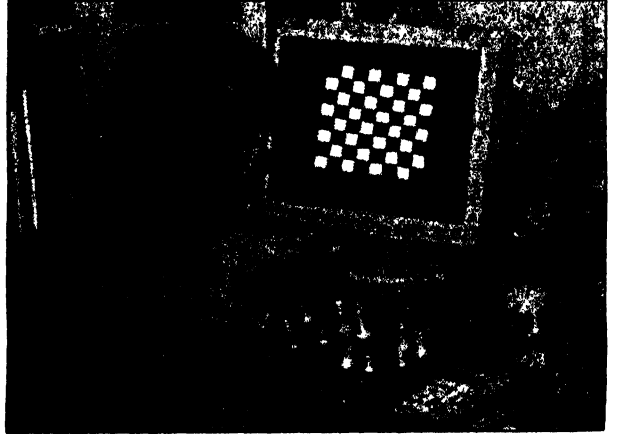
ইত্যাদি। এমনই হাজারো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একজন দাবাড়ু তার খেলার মৌলিক দিকটি গড়ে নেয়। রুশ গ্র্যাণ্ডমাস্টার স্টাইনিৎজ বলেছিলেন, তিনি দাবা খেলায় প্রতিপক্ষের কথা ভাবেন না। ছকের ওপর ঘুঁটি যেভাবে রয়েছে—সেটাই তাঁর একমাত্র বিচার্য বিষয়। কিন্তু সেটা পুরো সত্য নয়। দাবা খেলায় মুখোমুখি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী

দুজনেই দুজনকে প্রভাবিত করে, সেটাই অনেক সময়ে ম্যাচে জয়-পরাজয়ের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি কম্পিউটারের সেদিক থেকে কোন চিন্তা নেই। সামনে যেই থাকুক না কেন, কম্পিউটার বোর্ডের ওপর ঘুঁটির অবস্থান অনুযায়ী খেলে। প্রতিপক্ষ কে, কত বয়স, কি নাম, কি তার ট্র্যাক-রেকর্ড—এসব তার মাথায় আসে না, কেননা তার মাথায় এসব তথ্য ঢোকানোই হয় না।

প্রশ্ন হলো, দাবার পরাকাষ্ঠা তো যন্ত্র দেখাল, কিন্তু একে কি দাবা বলা যাবে? দাবা বলতে গত দেড়হাজার বছর ধরে মানুষ যা বুঝে এসেছে, তার সঙ্গে এর সঙ্গতি কোথায়? কম্পিউটারকে কি আরো উন্নত করে তুলে এমন করা উচিত, যেখানে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা প্রতি ক্ষেত্রেই তার কাছে হেরে যাবে? এ এক অদ্ভুত সমস্যা! মানুষের চেয়ে যন্ত্র বড় হয়ে উঠবে, তা কেউ চায় না। তবে যন্ত্রও মানুষেরই সৃষ্টি। সেহিসাবে ঐ উন্নততর হয়ে ওঠা যন্ত্রটি তো মানুষেরই বুদ্ধির ফসল। সেখানে মানুষকে মানুষই হারাচ্ছে—পরোক্ষভাবে এমনটাই বলা চলে।

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে কম্পিউটার নয়, ছোট ছোট ক্যালকুলেটিং মেশিনের মতো যন্ত্রগুলিকে 'দাবাড়ু' তৈরি করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এগুলির সুবিধা হলো, একজন ইচ্ছা করলে এক 'অমানব' প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেখানে খুশি, যখন খুশি দাবা খেলতে পারবে। এই যন্ত্রে মানুষ যা চাল দেবে, তা যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো সুইচ বা বোতামের সাহায্যে জানিয়ে দেওয়া যাবে এবং যন্ত্রটি কিছু পরে তার চাল জানিয়ে দেবে। একটা সাজানো দাবার ছকে একজন খেলোয়াড় এবং যন্ত্র চাল দিতে থাকবে। এরকম একটি দাবার নাম রাখা হয়েছে 'বরিস'। সে কি করতে পারে? ব্রিটিশ চেস ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে—

"বরিস হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের চেস কম্পিউটার। একে সমস্তরকম বহুল পরিচিত দাবার চাল শেখানো হয়েছে। সাদা নিয়েও বরিস খেলতে পারে, কালো নিয়েও পারে। সে আপনাকে দাবাখেলা শেখাতেও পারে। যখন আপনি বুঝতে পারছেন না কি চাল দেবেন, তখন বরিস সাহায্য করবে। গেম চলাকালীন বরিস কথাও বলবে। কোনরকম বে-আইনি চাল সে বরদাস্ত করবে না।"

এখন আরো উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার বিশ্বদাবা সার্কিটে এসে গেছে। ছোট বয়স থেকেই পশ্চিমী দাবাড়ুরা এই কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ল্যাপটপ, ডি. টি. এস টার্মিনাল সহযোগে নিজেদের প্রশিক্ষিত করছে। ভারতেও যারা সচ্ছল পরিবারের দাবাড়ু, তারা এই ধরনের সুবিধাভোগ করছে। দিব্যেন্দু বড়ুয়া যেখানে দাবাজীবনের মধ্যপর্বে এসে ভাল চাকরির সুবাদে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহচর্য পেয়েছেন, সেখানে হরিকৃষ্ণ, শশীকিরণরা কৈশোরেই এর যাবতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে টিন এজেই 'গ্র্যাণ্ডমাস্টার'।

তবে অত্যধিক কম্পিউটার-নির্ভরতা অন্যদিক থেকেও ক্ষতিকারক। এর ফলে খেলোয়াড়ের মৌলিক গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ হয় না, কিংবা হলেও অনেক দেরিতে হয়। মানুষের মননশক্তি এবং বুদ্ধি কতকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়। এই বিষয়গুলি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উদ্দীপনার ফসল। জিনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে যে মেধা, ধীশক্তি, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির স্ফূরণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ প্রকাশিত হয়, তা একটা যন্ত্র কিভাবে মানুষের মধ্যে আনতে পারে? এখানেই যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা। তবে ল্যাপটপ, কম্পিউটার একটা বিশেষ স্তরের পর কার্যকরী। আধুনিক দাবার ইতিহাস একশো বছরের বেশি পুরনো। এই শতাধিক বছরে খেলা হয়েছে অজস্র ম্যাচ। নানাধরনের ওপেনিং, মিডল, এণ্ড গেম দেখেছে দাবাজগৎ। কত বিচিত্র তার প্রকাশভঙ্গিমা! কত ধরনের থিওরি! এসব হিসাব রাখা একমাত্র কম্পিউটারের পক্ষেই সম্ভব। তাই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র কম্পিউটারই। আবার ভবিষ্যতের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দাবার আঙ্গিক ও গঠনতন্ত্রের ধারণাও বেরিয়ে আসে কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাই একে অস্বীকার করারও উপায় নেই।

তবে যতই কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আসুক, ববি ফিশার, গ্যারি কাসপারভ, আনাতলি কারপভ বা আমাদের বিশ্বনাথন আনন্দের মতো সুপার গ্র্যাণ্ডমাস্টাররা কিন্তু আপন মেধা, বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী মনস্বিতার ফসল। কম্পিউটার তাঁদের অনুশীলনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত উৎকর্ষপূর্ণ পরিণতি দিতে পারে না। নিজস্ব সৃজনশীলতা, বৈচিত্র্য, আত্মপ্রত্যয় ও যাবতীয় মৌলিক গুণাবলীই একজন দাবাড়ুর সার্বিক উত্তরণের চালিকাশক্তি। যতই স্যাটেলাইট বা ইন্টারনেট দাবার প্রসার হোক, দুজন সমমানের শক্তিশালী গ্র্যাণ্ডমাস্টারের মুখোমুখি লড়াই আমাদের যে-উত্তেজনা ও আনন্দের খোরাক দিতে পারে, তার তুলনা মেলা ভার! সুপার কম্পিউটার হয়তো এক-আধবার গ্যারি কাসপারভকে হারাবে, কিন্তু তাতে দাবার কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞান কখনো মানুষের আত্মলব্ধ দক্ষতা, প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিপূরক হতে পারে না। ইতিহাসে তাই থাকবেন ফিশার, কাসপারভ, আনন্দরাই। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক লেখিকাদের।—সম্পাদক

'জাইরোসনিক' এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদ 'ওমনিসনিক শব্দের পরবর্তী পদক্ষেপ জাইরোসনিক' প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি বক্তব্য পেশ করতে চাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ব্রহ্মাণ্ডে চারটি 'element' রয়েছে—'Matter', 'Energy', 'Space' এবং 'Time'। বেদান্তে সৃষ্টির মূল উপাদান পাঁচটি—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা বলেন, চেতনা বা 'consciousness' হলো ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির মৌলিক উপাদান। বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীব সৃষ্টি হয় এবং জীবের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের এতাবৎ অভিমত হলো, চেতনা বিশুদ্ধ উপকরণ নয়, এটি 'by-product of interactions between matter and energy'। এবিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা অন্য মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যময় ব্রহ্মেরই প্রকাশ। বিশ্বচরাচর জুড়ে রয়েছে একমাত্র নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা—বিশ্বচরাচরে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই। ব্রহ্ম সচেতন। সচেতন ব্রহ্ম নিজের ইচ্ছায় বস্তু (Matter), শক্তি (Energy), সময় (Time) এবং স্থান (Space) সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক নামক স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করি, তার সূক্ষ্ম সত্তা হলো পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌ ইত্যাদি। ব্রহ্ম ছাড়া কোন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা নেই। তাই ব্রহ্ম 'knowledge absolute'; ব্রহ্ম সুখ-দুঃখাতীত আনন্দস্বরূপ। তাই ব্রহ্ম 'bliss absolute'। ব্রহ্মের অস্তিত্বেই সর্বপদার্থ অস্তিত্ববান, তাই ব্রহ্ম 'existence absolute'।

তাহলে বলা যায়, স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের একটা সূক্ষ্ম অস্তিত্ব রয়েছে—যেখানে বস্তু বা matter নেই, শক্তি বা energy নেই, স্থান বা space নেই, সময় বা time নেই, আছে কেবল অনন্ত চেতনা। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ধ্যানলব্ধ এই জ্ঞানের প্রতিধ্বনি আমরা বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানে দেখতে পাচ্ছি।

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় Space-Time দ্বারা সতত পরিবর্তনশীল এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্থায়ী নয়। এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব একজন সচেতন দ্রষ্টার ওপর নির্ভর করে। দ্রষ্টা বা 'observer' না থাকলে দ্রব্য বা বস্তু বা 'object'-এর অস্তিত্ব থাকে না।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, বিশ্বচরাচরে আছে কেবল 'Quantum Soup'—যার মধ্যে Space, Time, Matter, Energy নেই। অথচ Space-Time, Matter-Energy সমন্বিত এই স্থূল বস্তুজগৎ Quantum Soup থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আইনস্টাইনের বিখ্যাত ফর্মুলা $E = mc^2$ অনুযায়ী বস্তু এবং শক্তি (Matter & Energy) অভেদ। সেইরূপ Space এবং Time পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ঋষিদের মতে, ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বলেন ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। জগতের সব বস্তুতে চেতনা রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের পরিমাণ বিভিন্ন। পাথরের চেয়ে গাছের মধ্যে চেতনার প্রকাশ বেশি। আবার আরশোলা থেকে মানুষের মধ্যে এর প্রকাশ বেশি।

আমাদের শরীরের মধ্যে সেই চেতনার আশ্রয়স্থল কোথায়? মধ্যযুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বক্ষস্থলই হলো চেতনার গর্ভগৃহ। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, এর অবস্থান মস্তিষ্কে। কিন্তু এই মত তেমন প্রমাণিত হয়নি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন 'electrical impulses' মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায়। বিজ্ঞানীরা আমাদের 'Cerebral Cortex'-এর বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এর একটা বিশেষ অংশ চোখের জন্য, একটা অংশ কর্ণের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন অংশই চেতনার জন্য সংরক্ষিত নয়।

আমাদের চেতনা ছড়িয়ে আছে দেহের প্রতিটি কোষের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। এই চেতনাই জীবচৈতন্য। এই চেতনা সৃষ্টি করে, আবার প্রয়োজনে ধ্বংসও করে। প্রতিটি কোষে চেতনার উপস্থিতি থাকায় সবরকমের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতি মুহূর্তে জীবদেহের মধ্যে হাজার হাজার রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে চলেছে। সেই বিক্রিয়াগুলি এলোমেলো পথে (haphazardly) হলে জীবদেহের ক্ষতি করে। কে তাদের সুশৃঙ্খলিত (organised) করে? সে আমাদের চেতনা, সে আমাদের অন্তরাত্মা—যাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, জলে ভেজানো যায় না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি পোড়াতে পারে না, অস্ত্রাদি ছিন্ন করতে পারে না। আমাদের এই চেতনা বা জীবাত্মা সর্বত্র বিরাজিত।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী এই 'body-mind complex'-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তাই এখন বলা হয়—'Most if not all diseases are psychosomatic'; রোগের উৎপত্তি হয় মনে এবং শরীরে তার প্রকাশ দেখা যায়। যার মন কাম-ক্রোধাদি রিপু দ্বারা বিচলিত না হয়ে সুস্থ এবং স্বস্থ থাকে—তার শরীরও ভাল থাকে। যে-ব্যক্তির মন সর্বদা রিপুতাড়িত, যার মন সর্বদা 'negative thoughts' (কাম, ক্রোধ, ভয়) দ্বারা পরিপূর্ণ—তার শরীরের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি (bio-chemical functions) বিশৃঙ্খল হয়ে যায়—তাই সেইসকল শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদির মাধ্যমে পঞ্চভৌতিক এই শরীরকে সবল এবং সুগঠিত করা যায়। সংযত জীবনযাপন এবং ধ্যান-ধারণাদি যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা

চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে সুস্থ এবং স্বস্থ করা যায়। সুস্থ মন সুস্থ শরীরের 'pre-requisite' অর্থাৎ পূর্বশর্ত।

আধুনিক যুগের মানুষের ধৈর্যের বড়ই অভাব। ধৈর্য নেই সেই আয়াসসাধ্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার। তাই শ্রীসজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তিনি এমন একটি পদ্ধতি দান করেছেন, যা নিজের ওপর প্রয়োগ করলে নিমেষে মন স্থির হয়ে যায়। এ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। স্থির স্বস্থ মন 'Nervous System' (স্নায়ুতন্ত্র) এবং 'Endocrine System' (অন্তঃক্ষরণ সম্পর্কিত)-এর ওপর তার মঙ্গলময় প্রভাববিস্তার করে সমগ্র দেহের প্রতিটি কোষের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে সুসংগঠিত পথে পরিচালিত করে। বিক্ষিপ্ত, উদ্বিগ্ন, কলুষিত, চঞ্চল মন যে জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছিল, স্থির মন তার কল্যাণময় প্রভাব দ্বারা শরীরকে আবার সুস্থ করে তোলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করতে সাহায্য করবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদ্ধতি।

ডাঃ অরুণকুমার লাহা
অবিনাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া-৭১১ ১০৪

প্রসঙ্গ 'মহাভারতের চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা'

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত 'মহাভারতের চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা' প্রবন্ধটি পড়ে দু-চার কথা বলার জন্যই এই পত্র। লেখাটি মনস্বী লেখকের ধ্যান-ধারণার ফলশ্রুতি বলেই তার গুণগত মান যথেষ্ট উচ্চ। ঐ প্রবন্ধে পাণ্ডবপক্ষকে ধর্মচালিত এবং কৃষ্ণকে ধর্মসংস্থাপক বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা অর্থাৎ আমাদের সকলের আত্মা—এইভাবে চিন্তা করলে পরনির্ভরতা বোধ হয় না, বরং স্বাতন্ত্র্যই বোধ হয়। আর যন্ত্রের গৌরবই বা থাকবে কেমন করে? যন্ত্রের নিয়ন্তা চেতন যন্ত্রী; যন্ত্র ইচ্ছাশক্তিহীন, নিয়মে চলে। অর্জুন বীর ও যোদ্ধা হলেও আত্মতত্ত্বের ব্যাপারে তাঁর অপূর্ণতা ছিল। কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'সখা', 'প্রভু' ইত্যাদি দৃষ্টিতে দেখেছেন। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলেই অর্জুন ও নিজেকে এক করে দেখেছেন। জ্ঞানবিচারের দিক থেকেও এটিই যথার্থ। আবার প্রভুবিহনে অর্জুন যেন শক্তিহারা। ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র উত্তমরূপে পাঠযোগ্য ও বিচার্য। দুর্যোধন সম্ভ্রমের যোগ্য হলেও তাঁর তেজ যেন অনেক ক্ষেত্রেই দম্ভপ্রকাশক—যা স্ববংশ নিধনের কারণ ও কর্তব্যাকর্তব্য বোধের বিনাশক। আদর্শ রাজা অন্যায়ভাবে অপরের অধিকার ছিনিয়ে না নিয়ে বরং প্রজাসন্তুষ্টিই বিধান করেন। আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, দ্রোণাচার্য কর্ণকে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা শেখাননি। কারণ, কর্ণ তপস্বী ক্ষত্রিয় ছিলেন না বলে ব্রহ্মাস্ত্রের যোগ্য হননি। এব্যাপারে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত 'মহাভারত' দ্রষ্টব্য। আমার এই মন্তব্য 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে তুলে ধরলে আনন্দিত হব। শ্রদ্ধেয় শঙ্করীবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার।

শুভেন্দু বসাক
রবীন্দ্রনগর, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর

সম্পাদকীয় মন্তব্য

উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে শুভেন্দুবাবুর মতো আরো অনেকের নানা বক্তব্য আছে ধরে নিয়েই সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষে জানাই যে, এবিষয়ে ভবিষ্যতে আর কোন পত্র প্রকাশিত হবে না।

শ্রদ্ধেয় শঙ্করীবাবুর সঙ্গে সাধারণ কথোপকথনের সময়ে মনে হয়েছে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁর মতে, ভক্তি এবং সাহিত্য —এদুটিকে সমার্থক ভাবা সমীচীন নয়। মহাভারতে যেসকল মহান, প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্রের উল্লেখ আমরা প্রায়শই করে থাকি, সেসব চরিত্রের মহনীয়তা নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঐসব চরিত্রের বিচারকালে তাঁদের মানবীয় গুণাবলীকে উপেক্ষা করে শুধু দৈবী গুণকে তুলে ধরলে ভুল হবে। কারণ, দৈবীসম্পদসম্পন্ন ঐসব চরিত্র মানুষ হিসাবেই আমাদের কাছাকাছি আসতে পারেন, দেবতা হিসাবে নয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এও স্বামী সারদানন্দজী তাই বারংবার শ্রীরামকৃষ্ণের মানবভাবের অনুধ্যান আমাদের বিশেষ কল্যাণকর বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে মহাভারতীয় চরিত্রগুলির বিচারে সাহিত্য ও ইতিহাসের তুলনায় বোধ করি মানুষের আত্মিক তথা মানসিক বিবর্তনই শেষকথা। বস্তুত, মহাভারতের মহাকবি বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন তাদের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, মহত্ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব। এক একসময় মনে হয়েছে, এ যেন আমাদের সমাজেরই খুব চেনা কোন চরিত্র। আমাদের সৌভাগ্য, তিনি তাঁর এই অমর সাহিত্যকে এই পৃথিবীর ক্লেদ ও মালিন্যের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে তুলে নিয়ে গেছেন এক উন্নততর সভ্যতার ভূমিতে। তিনি প্রতিটি মানবচরিত্রকেই এক মানসিক বিবর্তনের পথ ধরে রূপান্তরিত করেছেন দেবচরিত্রে। তাই তাঁর সৃষ্টি অমর। এমন অপূর্ব মানবিক মহাকাব্য রচনা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। একারণেই ভগবান ব্যাস একটি চিরন্তন নাম।

পূর্বেও 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে আরো কিছু পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেসব পত্রে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রবন্ধকারের বক্তব্যে অসূয়ার অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রবন্ধকার সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মহাভারতকারকে বিশেষরূপে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কারণ ঐ মহাকাব্যে মহাকবি পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন করতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। প্রবন্ধকার সকলকে আরো একবার তাঁর প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধও করেছেন। ▲

রবীন্দ্রনাথ, মহলানবীশ ও ডাইনোসর

বরুণ রায়চৌধুরী

প্রায় ১৪ কোটি বছর আগে অতিকায় ডাইনোসর ঘুরে বেড়াত পৃথিবীর বুকে। কিভাবে তারা সৃষ্টি হলো, কিভাবে বেঁচেছিল, কেনই বা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হলো—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবু চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল গত ২৫-২৯ আগস্ট 'ডাইনোসর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করেছে। তরুণ অধ্যাপক বরুণ রায়চৌধুরী কলকাতারই অচেনা ডাইনোসরের তথ্য পরিবেশন করেছেন এই নিবন্ধে।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির এক জাদুঘর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে চিন থেকে প্রদর্শনীর জন্য আনা ডাইনোসরের ফসিল। (দ্রঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৩ জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৫) চোরের হাত থেকে ডাইনোসরেরও রেহাই নেই বলে এক ঘরোয়া আড্ডায় হাসি-ঠাট্টা চলছিল। হঠাৎ এক বন্ধু বলে উঠলেনঃ "আপনারা কি জানেন, এই কলকাতাতেই আস্ত একটা মস্ত ডাইনোসর আছে?" মনে হয়েছিল, এটাও ঠাট্টা। কিন্তু আড্ডায় উপস্থিত ভূবিজ্ঞানী শঙ্কর নারায়ণ দাস জানালেন, আদৌ তা নয়। কলকাতার বনহুগলিতে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূতত্ত্ব বিভাগে সত্যিই আছে অতিকায় এক ডাইনোসরের ফসিল হয়ে যাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল। ১২ ফুট উঁচু ও ৪৭ ফুট লম্বা এই কঙ্কালের মালিক প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করত। তখন তাকে নাম ধরে ডাকার কেউ ছিল না। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাই একে খুঁজে বের করে নাম দিয়েছেন—'বড়পাসরাস টেগোরি' (*Barapasaurus tagorii*)।

বর্তমানে মহারাষ্ট্রের গড়চিরুলি জেলার একটি গ্রামের নাম পুচমপল্লী। জায়গাটা মহারাষ্ট্রে হলেও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তে। সেখানে গোদাবরী নদীর উপত্যকায় কয়েক দশক আগে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করেছিলেন তিন ভারতীয় বিজ্ঞানী—এস. এল. জৈন, তপন রায়চৌধুরী এবং শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। বিজ্ঞানীদের দলটির নেত্রী ছিলেন প্রথিতযশা পুরাজীববিদ পামেলা রবিনসন। প্রায় ৩০০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে চুনযুক্ত কাদাপাথরের মধ্যে তাঁরা কোটি কোটি বছরের পুরনো হাড়ের নমুনা খুঁজে পেয়েছিলেন। তখন

কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত 'বড়পাসরাস টেগোরি'র ফসিল হয়ে যাওয়া কঙ্কাল

জায়গাটা ছিল চন্দ্রপুর জেলার অন্তর্গত। স্থানীয় চাষিরা বিরাট এক পাথরের চাঁই খেতের আল বাঁধার কাজে ব্যবহার করছিল। কাদামাটির প্রলেপ ছাড়ানোর পর দেখা গেল, ওটা আসলে ডাইনোসরের পায়ের একটা হাড়। চার ফুটেরও বেশি লম্বা। বিজ্ঞানীদের গাড়িচালক অভিভূত হয়ে বলে উঠেছিল : "এত বড় পা!" শেষপর্যন্ত আবিষ্কৃত হলো জুরাসিক যুগের এমন এক নিরামিষাশী ডাইনোসরের কঙ্কাল, যার অস্তিত্বের কথা কেউ আগে জানত না। এই ডাইনোসরের বৈশিষ্ট্য এর বিশালাকার চারটি পা। তার সঙ্গে গাড়িচালকটির বিস্ময়প্রকাশ এত লাগসই হলো যে, বাঙালি বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন 'বড়পাসরাস'। ডাইনোসরের নামকরণ কিন্তু এরকম সাধারণ শব্দ দিয়েই করা হয়ে থাকে। যেমন 'ডাইনোসর' শব্দটির অর্থ—'ভীষণাকৃতি টিকটিকি'। আধুনিককালে সুপার ক্রক্ (Super Croc) শব্দটি বহুল প্রচলিত। তবে এতদিন বিদেশী ভাষাই ব্যবহার করা হচ্ছিল, এই প্রথম কোন ভারতীয় তথা বাঙলা ভাষায় নাম দেওয়া হলো।

এই আবিষ্কার হয়েছিল ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ, যখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি হয়েছে। সেই আবেগকে স্থায়ী রূপ দিতে ডাইনোসরটির সম্পূর্ণ নাম

চিনের লিয়াওনিং অঞ্চল থেকে পাখির পূর্বসূরি এই চার ডানাওয়ালা ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গেছে। সরীসৃপ-ডাইনোসর থেকে পাখিতে বিবর্তনের পথে এ-ও একটা 'মিসিং লিঙ্ক'। এর থেকে আন্দাজ করা হয়, প্রাগৈতিহাসিক পাখি ডানা ঝাপটে আকাশে ওড়ার আগে প্রথমে গাছ থেকে গাছে উড়ে ঝাঁপ দিয়ে যেতে শিখেছিল। বিবর্তনবিশারদেরা কেউ বলেন, সরীসৃপ থেকে খেচরের উদ্ভব হয়েছিল [illegible] গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে; আবার কেউ বলেন, মাটিতে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে। দ্বিতীয় মতটিই বেশি সমর্থিত। কিন্তু চিনা বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির জিং ঝু ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ 'নেচার' পত্রিকায় সম্প্রতি [illegible] প্রথম মতটিকেই সমর্থন করেছেন।

দেওয়া হলো—'বড়-পা-সরাস টেগোরি'। পাথর হয়ে যাওয়া অসংখ্য হাড়ের টুকরো জুড়ে গোটা কঙ্কালের কাঠামোটি তৈরি হলো। সব হাড় অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিছু কিছু অংশ কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হলো। সব মিলে কোটি কোটি বছর বাদে আবার উঠে দাঁড়াল সরীসৃপদৈত্য। ১৯৭৭ সালে তাকে রাখা হলো বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' বা 'আই. এস. আই'-এর জিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাস যে ধরে রেখেছিল, আশা করা যায় দুই ভারতীয় মনীষীর স্মৃতি সে আরো বহুদিন বহন করবে।

মহলানবীশ নিজেই আই. এস. আই-তে ভূতত্ত্ববিদ্যার গবেষণার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। ভূবিজ্ঞানী পামেলা রবিনসনকে তিনি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন এখানে। রবিনসনেরই ছাত্র বা গবেষকরা বড়পাসরাস আবিষ্কারের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী। এই আবিষ্কার শুধু একটি প্রজাতির ডাইনোসরকে খুঁজে পেয়েছে তা নয়, এর মাধ্যমে এক 'মিসিং লিঙ্ক'-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাগৈতিহাসিক জীব সম্বন্ধে অধ্যয়নকে 'পুরাজীববিদ্যা' (Palaeontology) বলা হয়। সেই অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার পরবর্তী সময়কে কয়েকটি সীমায় ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীতে ডাইনোসর আসে 'মেসোজোয়িক' (Mesozoic) যুগে, যার সূত্রপাত প্রায় ২৩ কোটি বছর আগে। প্রথমদিককে বলা হয় 'ট্রায়াসিক' (Triassic) যুগ, যখন সবে উভচর থেকে স্থলবাসী সরীসৃপের বিকাশ ঘটছে। পরবর্তী কাল অর্থাৎ প্রায় ১৯ থেকে ১৪ কোটি বছর সময়সীমাকে বলা হয় 'জুরাসিক' (Jurassic) যুগ। চলচ্চিত্রের কল্যাণে নামটা আমাদের খুব চেনা। এই সময়কালেই ডাইনোসরের সবচেয়ে বেশি বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। অতিকায় নিরামিষাশী ব্রন্টোসরাস, ডিপ্লোডকাস, ট্রাইসেরাটপস যেমন ছিল, তেমনি দৈত্যাকৃতি মাংসাশী টিরানোসরাস, অ্যালোসরাসও ছিল। এই জাতীয় বিবর্তনের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার হিসাব সবসময় বজায় থাকে না। সেরকমই এক বিচ্ছিন্ন সূত্র জোড়া লেগেছে বড়পাসরাসের খোঁজ পাওয়াতে। পরবর্তী কালের ডাইনোসরদের বিকাশের পূর্ববর্তী অবস্থার হিসাব পাওয়া গেছে। বিশাল চতুষ্পদ বড়পাসরাসের পাগুলি ছিল দীর্ঘ আর মজবুত। গলা আর লেজ দুই-ই খুব লম্বা। এরা জিরাফের মতো অতটা মাথা তুলতে পারত না। গরু-ছাগলের মতো মাটিতে মুখ দিয়ে ঘাসও খেতে পারত না। গাছ বা গুল্মের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করত। তাই নিরামিষাশী হলেও এরা ঠিক তৃণভোজী নয়, গুল্মভোজী।

প্রকৃতি তার ইতিহাসের বিবরণ লিখে রাখে ভূপৃষ্ঠের এক-একটি স্তরে ফসিলের অক্ষরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেসব প্রাণী বাস করত, তাদের মৃতদেহ বন্যার জলে ভেসে, বৃষ্টিতে ধুয়ে জমা হতো নদীর তলদেশে, হ্রদে কিংবা সমুদ্রে। অথবা ডাঙাতেই কাদার নিচে চাপা পড়ত। তার ওপর যুগ যুগ ধরে জমা হতে থাকত পলিমাটির আস্তরণ। তার চাপে

আর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনেকে যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তেমনি কারো নরম মাংসল অংশ নষ্ট হয়ে গিয়ে খোলস বা হাড়গোড় থেকে যেত। কাদা, বালি বা পাথরের কণা এসে সেই ফাঁকফোকরগুলি ভরাট করে দিত। এরকমভাবেই তৈরি হয় জীবাশ্ম বা ফসিল। ক্রমে ক্রমে জীবদেহের জৈবিক অংশটি চলে গিয়ে সবটাই প্রায় পাথরে রূপান্তরিত হয়। প্রাণীটির চেহারা যেমন ছিল তেমনি রয়ে যায়, পরিণত হয় পাথরে। কিংবা দেহ বা দেহের অংশটি আর থাকেই না, থেকে যায় তার ছাপ। ডাইনোসরের হাড়, শামুকের চলার দাগ, গাছের গুঁড়ি সবকিছুরই ফসিল পাওয়া যায়। সাধারণত ফসিল পাওয়া যায় পাথর বা পাথুরে মাটির মধ্যে। স্তরীভূত শিলার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কারণ, প্রাকৃতিক শক্তি —যেমন বৃষ্টি, জলপ্রবাহ, বায়ু, তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে ভূপৃষ্ঠের সবসময়েই ক্ষয় হচ্ছে। সেই ক্ষয়ে যাওয়া মাটি, বালি, পাথরের কণা হাওয়ায় ভেসে, জলে ধুয়ে এক এক জায়গায় জমা হতে থাকে। যুগে যুগে আরো নতুন নতুন পলিমাটির স্তর এসে তার ওপর জমতে থাকে। একে 'স্তরীভবন' (sedimentation) বলা হয়। কখনো আগ্নেয়গিরির লাভা বা বিভিন্ন রাসায়নিক মিশে যায়। বহু যুগের চাপ ও রাসায়নিক পরিবর্তনে পলিমাটি পাথরে

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সহায়তায় বিজ্ঞানী সেরেনো ও তাঁর [illegible] বর্তমান কুমীরজাতীয় সরীসৃপের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক [illegible] সরীসৃপদের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণা [illegible]। [illegible]

রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে যদি প্রাগৈতিহাসিক জীব বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে যায়, সেটাও ফসিল হয়ে সংরক্ষিত থাকে। এইসব স্তর ভেদ করে পুরাজীববিদ্‌রা তার গঠনপদ্ধতি, ফসিলের বয়স ও আরো নানা প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারেন। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের কোটা গ্রামে এক বিশেষ ধরনের চুনাপাথরের স্তর পাওয়া যায়। গ্রামটার নামে ঐজাতীয় স্তরগঠনের পদ্ধতিকে 'কোটা ফর্মেশন' নাম দেওয়া হয়েছে। পুচমপল্লী গ্রামে এই বিশেষ ধরনের স্তরের মধ্য থেকেই বড়পাসরাসকে পাওয়া গিয়েছিল। সেইসঙ্গে বড় বড় গাছের গুঁড়ির ফসিলও ছিল। অনুমান করা হয়, প্রবল বন্যায় জন্তুগুলি মারা পড়েছিল। তাদের মৃতদেহ ভেসে যেতে যেতে গাছে আটকে গিয়েছিল।

এছাড়া আরো অনেক ডাইনোসরের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে ভারতের নানা জায়গায়, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে। আই. এস. আই-এর ভূবিজ্ঞানীরা এবিষয়ে অগ্রণী গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রাগৈতিহাসিক অধ্যয়নে ভারতে তাঁরাই প্রথম দিশারী। গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহশালাতেও এক-একটি চমকপ্রদ বস্তুর সংযোজন হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, একদা ভারতবর্ষে ছিল একটা সত্যিকারের 'জুরাসিক পার্ক'। আই. এস. আই-এর জিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে দানবীয় বড়পাসরাসের এক পাশে কাঁচের বাক্সে রাখা আছে সেযুগের ছোট প্রাণী রিঙ্কোসরের কঙ্কাল। আকারে একটা কুকুরের সমান। কিন্তু বয়স তার অনেক বেশি। ট্রায়াসিক যুগের এই বাসিন্দা গেঁড়ি-গুগলি খেয়ে জীবনধারণ করত। আরেক পাশে রাখা আছে অতিমহাকায় টাইটানোসরের কোমরের কিছু অংশ। সম্পূর্ণ প্রাণীটা দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুটেরও বেশি হতো, অর্থাৎ বড়পাসরাসের দ্বিগুণ বা এখনকার অনেক তিমির চেয়ে বেশি। এরা সকলেই ছিল ভারতবাসী। কাঁচের শোকেসে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বড় বেলের আকারের ফসিল। সেগুলি ডাইনোসরের ডিম; গুজরাটের খেড়া এবং মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর থেকে পাওয়া। এছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও উভচর প্রাণীর ফসিল, ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর দানবাকৃতি পূর্বপুরুষের মাথা এবং 'সিলাকান্থ' নামে একধরনের মাছের ফসিল। কইমাছের চেয়ে কিছু বড় এই মাছ দেখতে আহামরি কিছু নয়, কিন্তু জৈববিবর্তনের এ এক বিস্ময়। এই মাছ ডাইনোসরের যুগেও ছিল, এখনো বিরল প্রজাতি হিসাবে টিকে আছে। একে বলে 'জীবন্ত ফসিল'। জলে প্রথম জীবের বিকাশ ঘটেছিল' জল থেকে ডাঙায় উঠে আসার প্রথম প্রচেষ্টা যারা করেছিল, সিলাকান্থ তাদের অন্যতম। এর পাখনা এবং ফুসফুসের গড়ন জলচর থেকে উভচর হওয়ার যে দীর্ঘ বিবর্তন, তার প্রাথমিক আভাস দেয়।

সব মিলে নেহাত ছোট নয় আই. এস. আই-এর ভূতত্ত্ববিভাগের মিউজিয়ামটি। তবে সর্বসাধারণের প্রবেশ অবাধ নয়, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তবেই দেখা যায়। একবার ভিতরে ঢুকলে মনে হয় না, যানজটিল বি. টি. রোডের ধারে আছি। তখন কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়ঃ "কথা কও হে অতীত"। ❑

তথ্যসূত্র ঃ শঙ্কর নারায়ণ দাস; ছবি ঃ দিলীপ সাহার সৌজন্যে।

ভক্তিসাহিত্যের অঙ্গনে এক অপূর্ব গ্রন্থপ্রকাশ

স্বামী দেবময়ানন্দ
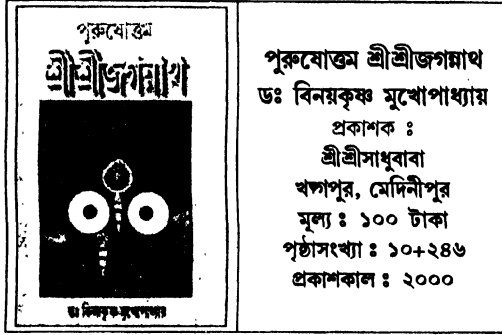
পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ
ডঃ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রীসাধুবাবা
খড়্গপুর, মেদিনীপুর
মূল্য ঃ ১০০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১০+২৪৬
প্রকাশকাল ঃ ২০০০

লীলাময় শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-রহস্য ও তাঁর মাধুর্যঘন দিব্যলীলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অবশ্য বাঙলাভাষায় এধরনের গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি বলে মনে হয় না। এহেন প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, ভগবৎপ্রেমিক এবং প্রখ্যাত লেখক ডঃ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত **'পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ'** গ্রন্থখানির প্রকাশ ঘটল ভক্তিসাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে। শুধু ভক্তিরসাপ্লুত হয়ে লেখক এই বৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করেননি; পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি অনেক আকর ও গবেষণামূলক গ্রন্থের গভীরে প্রবেশ করে গ্রন্থরচনার উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ঐগুলিকে গ্রন্থের মধ্যে, তাঁর বক্তব্যের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে, তিনি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই কারণে তিনি পাঠকসমাজের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। এই গ্রন্থপাঠে ভক্তিমান পাঠক পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে তাঁর কৃপায় শ্রেয়ের পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরম কারুণিক শ্রীজগন্নাথের আরাধনা, নিত্যদর্শন ও মনন ভারতীয় জনজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সুরক্ষিত এবং প্রসারিত করে রেখেছেন। গ্রন্থকার আলোচনার সুবিধার্থে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর স্বরূপ, তাঁর দিব্যলীলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'নবকলেবর'। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হলো—যদিও শ্রীভগবান স্বরূপত নির্গুণ, নিরাকার, কূটস্থ, অক্ষর, তথাপি জগতের সার্বিক কল্যাণে পাঞ্চভৌতিক বস্তু দিয়ে গঠিত রূপের বন্ধনে ধরা দেন, ভক্তদের হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করে তাঁদের কৃতার্থ করে তোলেন। কালের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শবরদের 'কিটুং' দেবতা ক্রমান্বয়ে 'নীলমাধব', 'কমলা পুরুষোত্তম' এবং বর্তমানে দারুব্রহ্ম 'জগন্নাথ প্রভু'রূপে পূজিত হচ্ছেন—তাঁরই বিস্তৃত বিবরণ লেখক ইতিহাস, পুরাণ, প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য আখ্যায়িকা এবং গবেষণাপ্রসূত রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

কিছু গবেষকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথের নবকলেবর অনুষ্ঠান প্রথম উদ্‌যাপিত হয়। বারবার বিধর্মীদের দ্বারা এই মন্দির আক্রান্ত হয়েছে, ফলে দেবতাদের নবকলেবর ধারণ করতে হয়েছে। নবকলেবর ধারণের অর্থ—পুরাতন মূর্তির ভিতরে সযত্নে রক্ষিত ব্রহ্মবস্তুকে নতুন মূর্তির অভ্যন্তরে সংস্থাপন। নবকলেবর তৈরির জন্য শাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধান থেকে শুরু করে রত্নবেদিকায় নব মূর্তিত্রয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৫ দিনব্যাপী মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিবরণ গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ধৃত অংশের উৎস হিসাবে গ্রন্থের নাম, অনুচ্ছেদ এবং প্রয়োজনে শ্লোকসংখ্যা উল্লিখিত হয়নি —ফলে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাঠকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—'স্নানযাত্রা'। অশক্ত, অক্ষম, বৃদ্ধ, ব্রাত্য ও পঙ্গু ভক্তদের দর্শনদানে কৃতার্থ করার জন্য পুরুষোত্তম জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা ভ্রমণ করার অছিলায় নেমে আসেন জনপথে সাধারণ মানুষের মাঝখানে। স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লোক-কল্যাণের স্মারক হিসাবে শ্রীভগবানের অবতরণের গূঢ় তাৎপর্য, ইতিহাস এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ পর্যায়ক্রমে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'শ্রীমন্দির পরিক্রমা'র ক্ষেত্রে গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করে শ্রীমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত ভূমির পরিমাণ, মন্দিরের প্রবেশদ্বার ও তার গঠনশৈলী, মন্দির-সংলগ্ন অন্যান্য মন্দিরের বিস্তৃত ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই অধ্যায়ে দেবী মহালক্ষ্মী ও দেবী বিমলার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, গবেষকদের মতে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বিমলার আবির্ভাব ঘটে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে। দেবী দুর্গার আরেক নাম 'বিমলা'। সেই কারণে শারদীয় উৎসবের সময় দেবী বিমলার ১৬ দিনব্যাপী বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায় 'মহাপ্রসাদ'। এই অধ্যায়ে লেখক 'মহাপ্রসাদ' নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীজগন্নাথকে ভোগ নিবেদন করার পর সেই নিবেদিত অন্নভোগের নাম 'প্রসাদ'। সেই প্রসাদ বিমলা দেবীর গ্রহণের পর 'মহাপ্রসাদ' নামে অভিহিত হয়। এই মহাপ্রসাদে আদ্বিজচণ্ডাল সকল মানুষের সমান অধিকার। এর মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যভাবের পরাকাষ্ঠা দ্যোতিত হয়। মহাপ্রসাদ প্রস্তুতির প্রক্রিয়া এবং সেবনের আনুষ্ঠানিক বিধি উল্লেখ করে গ্রন্থকার এই অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

শ্রীমন্দির-মধ্যে রত্নবেদির ওপর বিরাজিত শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম এবং সুভদ্রা—এই মূর্তিত্রয়ের রহস্য উন্মোচন প্রসঙ্গে লেখক ক্রমান্বয়ে চারটি অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। লেখকের মতে, শ্রীজগন্নাথের অপাণিপাদ হওয়ার মূলে রয়েছে তাঁর অসীমতা; তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাই ভক্তেরা তাঁকে একইসঙ্গে অরূপ-স্বরূপ, নির্গুণ-সগুণ এবং সর্ববেদান্তের সার বলে অভিহিত করেন। তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আপন আপন দেবতার (যেমন ঋষভদেব, আদিবুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, ভৈরব এবং মহাকালী) স্পষ্ট প্রকাশ উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন।

প্রত্যূষে দ্বারভিতা ও মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে মধ্যরাত্রিতে অনুষ্ঠিত পহুড়া পর্যন্ত বিভিন্ন নিত্য-পূজানুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়ার জন্য 'মহাপ্রভুর দিনরাত্রি' নামে একটি পৃথক অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। শ্রীবলরাম এবং সুভদ্রার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতের যে প্রচার এবং প্রসার ঘটেছিল—সেসমস্ত গ্রন্থকার চৌম্বক আকারে উল্লেখ করেছেন—"স্কন্দপুরাণের মতে ইনি বিষ্ণুই। ভগবান যাঁর সাহায্যে ত্রিভুবন পালন করছেন হলায়ুধধারী বলরাম তাঁর ডানপাশে রয়েছেন।" জগন্নাথ এবং বলরামের সঙ্গে স্বমহিমায় বিরাজমানা দেবীমূর্তি—তাঁদের ভগিনী সুভদ্রা। এটি প্রচলিত মত। যদিও তাঁর পূজার বীজমন্ত্র দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী ভুবনেশ্বরীর। এঁরা আদিতে শবর বা আদিবাসীদের দেবতা ছিলেন। কালের সরণি বেয়ে ইতিহাসের নানা ঋজু-কুটিল গতিপথ অতিক্রম করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দেবতাত্রয় কৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই তিন-চারটি অধ্যায়ে লেখক এই তত্ত্ব নানা যুক্তি, ইতিহাস ও পুরাণ অবলম্বনে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ডে সুভদ্রাকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মীর অপর নাম 'সুভদ্রা'। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—"কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে...।"

লেখক নির্দ্বিধায় এব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন।

শ্রীমন্দির-মধ্যে 'সুদর্শন' নামে অভিহিত আরেকটি মূর্তি দেখা যায়। প্রত্যেক দেবতাদের নিজস্ব অস্ত্র রয়েছে। শিবের আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দেবতাদের তেজ সংহত করে এই মহাস্ত্র তৈরি করেন। ভগবান বিষ্ণু দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকে এই অস্ত্র পান। পুরাণে এইরূপ বর্ণনা রয়েছে। এই মহাস্ত্রের প্রতীক হিসাবে দণ্ডাকার বস্ত্রাবৃত এই দেবতা মন্দিরের বামপার্শ্বে স্থানলাভ করেছেন। পরিশেষে এই অস্ত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন—জগৎ পরিবর্তনের নিয়মাধীন। কিন্তু অপরিবর্তনীয়ের থেকে পরিবর্তনের যাত্রা শুরু। জাগতিক নিয়মকানুনের সঙ্গে যিনি সর্ব নিয়মের ঊর্ধ্বে, তিনিও রহস্যজনকভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। জাগতিক নিয়ম এবং মহাজাগতিক শক্তির মধ্যে 'সুদর্শন' সংযোগসূত্র।

ভক্তদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অধ্যায় হলো 'শ্রীজগন্নাথলীলা ঃ ভক্তসঙ্গে'। করুণাঘনবিগ্রহ লীলাময় শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, চিরকালীন, প্রেমমাধুর্যে পরিপূর্ণ। ভক্তদের কৃপা করার জন্য তিনি সতত উদ্‌গ্রীব—তার প্রমাণ ইতিহাস এবং পুরাণের মধ্যে নানাভাবে বর্তমান। গল্পের মধ্যে তার কয়েকটি বাস্তব চিত্র লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। উদাহরণ হিসাবে গ্রন্থকার অর্জুন মিশ্র (যিনি 'গীতা পাণ্ডা' নামে পরিচিত), বন্ধু মহান্তী, দাস বাউরী প্রমুখ প্রাচীন ভক্তদের জীবনের দু-একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীভগবানের ভক্তানুকম্পার প্রেমমধুর সুন্দর চিত্র প্রকটিত করেছেন। এই অধ্যায়টি তত্ত্ব এবং তথ্যের ভার থেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় সকল পর্যায়ের পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পরিবেশনার কৌশলও হৃদয়গ্রাহী।

পরবর্তী অধ্যায় 'জগন্নাথতত্ত্ব'। এর মধ্যে রয়েছে—'শূন্যবাদ ও জগন্নাথ'। এই অধ্যায়ে শ্রীজগন্নাথকে শূন্য পুরুষরূপে গণ্য করা হয়েছে। নাগার্জুন প্রবর্তিত শূন্যবাদের অবতারণা করে এই তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এব্যাপারে গ্রন্থকার সার্থক এবং সফল হয়েছেন বলে মনে হয় না। কারণ, বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্বাণের পর বৌদ্ধরা হীনযান এবং মহাযান—এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক—এই দুই ভাগ হীনযান সম্প্রদায়ের; বিজ্ঞানবাদ (যোগাচার) এবং শূন্যবাদ (মাধ্যমিক)—এই দুই শাখা মহাযান সম্প্রদায়ের। শেষোক্ত দুই সম্প্রদায় বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

স্বীকার করে না। মাধ্যমিক মতবাদ বাস্তবিক নাস্তিত্ববাদ নয়। কেননা এই মতবাদ সবকিছুকে অস্বীকার করে না। 'শূন্য' বলতে বোঝায় অবাচ্য অনভিলাপ্য, যেহেতু পরমতত্ত্ব চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত। শূন্য বলতে ব্যবহারিক দিক থেকে আপেক্ষিকতাকে এবং পারমার্থিক দিক থেকে বহুত্ব বা প্রপঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ-মুক্ত তত্ত্বকে বোঝায়। যাইহোক এখানে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। নাগার্জুন মূলত মাধ্যমিক দর্শনের প্রবক্তা; তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১ম বা ২য় শতকে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উড়িষ্যায় কখন এবং কিভাবে মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমিক বা শূন্যবাদের প্রচার এবং প্রসার ঘটেছিল—সেসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। ১৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছেঃ "ওড়িশার জনসাধারণের উপর বৌদ্ধ হীনযানী সম্প্রদায়ের অপরিসীম প্রভাব ছিল।" এই বক্তব্য যদি যথার্থ হয় তবে শূন্যবাদের প্রভাব কীভাবে এবং কখন থেকে শুরু হলো তার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

এই অধ্যায়ের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়েছে—"রাধা, কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী—এই ত্রিমূর্তির তিনটি বীজ হ্রীং/শ্লীং/ক্লীং। এই ত্রিবীজকে মন্ত্রে রূপান্তরিত করলে হরে রামকৃষ্ণ পাই।" ব্যাপারটি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট নয়। আমরা সাধারণত শ্রীরাধিকার বীজ হিসাবে 'হ্রীং শ্রীং রাং' এবং শ্রীকৃষ্ণের 'ক্লীং' বীজ পূজাপদ্ধতিতে দেখতে পাই। তিনি যদি ক্রমানুসারে বলে থাকেন, তবে রাধার 'হ্রীং' কৃষ্ণের 'শ্লীং' এবং চন্দ্রাবলীর 'ক্লীং' বীজ হয়। আকরগ্রন্থের উল্লেখ থাকলে বিষয়টি পাঠকদের মিলিয়ে দেখার সুযোগ হতো।

'ইতিহাসে জগন্নাথ' অধ্যায়টিতে গ্রন্থকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কালের প্রেক্ষাপটে শ্রীজগন্নাথ-ভাবের বৃদ্ধি, প্রকাশ এবং পরিণতি সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এর চারটি পর্যায় লক্ষণীয় ঃ (১) ৩৫০-৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিঙ্গে বিষ্ণু-উপাসক মাথারা রাজাদের রাজত্বকাল। (২) ৫০০-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আদি গাঙ্গেরা এবং তারপরে শৈলোদ্ভবেরা রাজত্ব করেন। এই সময়ে পুরুষোত্তমতত্ত্ব বিকাশলাভ করে। (৩) ৭৫০-১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিঙ্গ ছিল কৌম এবং সোম-বংশীয় রাজাদের অধীন। (৪) পরবর্তী কালে গাঙ্গেরা—বিশেষত যযাতি কেশরী জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করেন। কারো কারো মতে, মন্দিরনির্মাণের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন গাঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব। তিনি বস্তুত শৈবভাবাপন্ন হলেও বৈষ্ণবভাবের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন বলে গবেষকদের অভিমত। এই অধ্যায়ে লেখক ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি কখন কাদের দায়িত্বে মন্দির তথা শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজাদি পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

'সাহিত্যে জগন্নাথ' অধ্যায়টিতে ওড়িয়া সাহিত্যে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে যেভাবে চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল—তার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার সংযোজন ঘটেছে এই অধ্যায়ে, যা আধুনিক সভ্যতায় লালিত বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকসমাজের পক্ষে নির্বিচারে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য।

'সংস্কৃতি সমন্বয়ে অগ্রদূত শ্রীজগন্নাথ' অধ্যায়টি গ্রন্থখানির সর্বশেষ অধ্যায়। গ্রন্থকার অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখেছেন, যে-মঙ্গলসূত্র দিয়ে ওড়িশার সঙ্গে বাংলার (তথা ভারতবর্ষের) মেলবন্ধন ঘটেছিল—সেই সূত্রের প্রতীক নীলাচল-নিবাসী শ্রীজগন্নাথ। এই পুরুষপ্রবরকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে কালজয়ী লোকসংস্কৃতির ধারা, পালা-পার্বণ এবং রচিত হয়েছে নব নব সাহিত্যসম্ভার। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলার জনজীবনে উৎকল ভাবাদর্শ প্রভাববিস্তার করেছিল—তার বিস্তৃত বিবরণ লেখক সোৎসাহে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্যভাবে বিভোর হয়ে জীবনের শেষার্ধ পুণ্যভূমি শ্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত করেছেন। এই যুগে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের অনেকে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে এসেছেন এবং তাঁর দিব্য মহিমামণ্ডিত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য, বাংলার বিশিষ্ট কবি, শিল্পী, গবেষক, চিন্তাবিদ্ প্রমুখ সকলেই স্বকীয় দর্শন ও অনুভূতির মাধ্যমে তাঁদের রচনায় শ্রীক্ষেত্র তথা শ্রীজগন্নাথ-মহিমার প্রচার করেছেন এবং বাংলার অগণিত পাঠকের মনে শ্রীজগন্নাথের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভক্তিপ্রেমের জোয়ার এনেছেন।

এই বৃহৎ ভারতভূমিতে শ্রীজগন্নাথের গৌরবময় মাহাত্ম্য অদ্বিতীয় এবং অপরিসীম। লেখকের মতে—"তিনি শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন, আচণ্ডাল সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অবতার, পতিতের পাবন, পরম অহিংসক, তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সর্বদেশ, সর্বলোক একাকার।... এই জাতিবিহীন মহাতীর্থে আসিয়া নানকী, কবীরী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী—নানামতের নানামুনি সেই একই জগন্নাথদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে।" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'ওড়িশার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধ থেকে এবং সেইসঙ্গে যশস্বী ওড়িয়া লেখকদের রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার শ্রীজগন্নাথের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধানিবেদনপূর্বক গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেছেন। 'পরিশিষ্ট'-এ শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর মধ্যে ব্রহ্মগিরির শ্রীশ্রীআলোরনাথ সম্পর্কিত আলোচনার সংযোজন ঘটেছে।

সবদিক থেকে বিচার করলে আমাদের নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয়, গ্রন্থখানি ভক্তিমান এবং শিক্ষিত পাঠকদের উপযোগী হয়েছে। এই গ্রন্থপাঠে সাধারণ পাঠকও শ্রীজগন্নাথের গৌরবময় দিক ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পরিচিত হতে পারবেন। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট, ছাপার মান, বাঁধানো খুবই ভাল। ভাষাও খুব সাবলীল ও সুন্দর। বক্তব্য এবং মন্তব্যকে স্পষ্ট ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার অনলস প্রচেষ্টা গ্রন্থমধ্যে পরিব্যাপ্ত। ভাব এবং যুক্তি, আখ্যান এবং শ্রুতি, প্রাচীন এবং নবীনের মেলবন্ধন সঙ্ঘটিত হয়েছে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। এই বিশাল এবং জটিল কর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে লেখককে অনলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। এব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। গ্রন্থখানি বাংলার পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ❑

শ্রম, নিষ্ঠা ও মননের এক সার্থক মেলবন্ধন

স্বামী দিব্যানন্দ
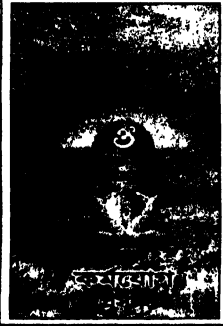
কর্মযোগ প্রসঙ্গ
স্বামী অমৃতত্বানন্দ
প্রকাশক ঃ
স্বামী অমৃতত্বানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর
বাংলাদেশ
মূল্য ঃ ৮০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১৮+২৮৮
প্রকাশকাল ঃ ২০০১

লেখক স্বামী অমৃতত্বানন্দজী **'কর্মযোগ প্রসঙ্গ'** গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে বলেছেন ঃ "ত্যাগ ও সেবা—এই হলো জীবনমন্ত্র, সমগ্র ধর্মধারণার মূল সুর।" এই গ্রন্থখানি আনুপূর্বিক পাঠে সেই উপলব্ধিই পাঠকের মনে প্রতিভাত হবে। কর্মযোগ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পূর্বে লেখক সুচিন্তিতভাবে বৈদিক কর্মবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এরপর কয়েকটি অধ্যায়ে 'মনুসংহিতা', 'মহাভারত', 'গীতা' এবং পুরাণোক্ত কর্মযোগের প্রাঞ্জল ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর সেই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য এবং প্রশংসার্হ।

সাধারণ মনে কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু অস্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করলে বিভিন্ন শাস্ত্র এবং গ্রন্থে উল্লিখিত কর্মযোগের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের একটি স্পষ্ট ধারণা সহজেই হয়ে যাবে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগনায়ক বিবেকানন্দ কর্মযোগ সম্বন্ধে যেসমস্ত কথা বলে গেছেন—সেগুলি অত্যন্ত সতর্কতা, সুনিপুণ বৈদগ্ধ্য এবং অনলস পরিশ্রম সহকারে লেখক সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং রসসিক্ত যুক্তিজাল অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হৃদয়কে নবীন ভাবনায় সমৃদ্ধ করবে। অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বিষয়গত বৈচিত্র্যের স্বরূপ উন্মোচন গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। কর্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের কর্মযোগ সম্পর্কিত অমৃতনিষ্যন্দী বাণীসমূহের সঙ্কলন গ্রন্থখানিতে এক অপূর্ব সংযোজন। সরলভাবে উপস্থাপিত কর্মযোগের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা আগ্রহী পাঠকের মনকে গভীরভাবে আপ্লুত করবে সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্টে স্বামী অখণ্ডানন্দের মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষসেবার অনলস পরিশ্রমের কাহিনী, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দের মধুর বাক্যালাপ এবং সেবাপরায়ণতার আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। পরিশিষ্ট-২এ কর্ম ও কর্মযোগ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা প্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দজীর অভিমত গ্রন্থখানিতে অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। আকরগ্রন্থপঞ্জির সবিশেষ উল্লেখে বুঝতে পারা যায়, লেখক কত পরিশ্রম সহকারে সর্বজনপাঠ্য এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ মর্যাদাদানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তবে দ্রুত সম্পাদনার জন্য এই গ্রন্থখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় অমার্জনীয় মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে অনভিপ্রেত ত্রুটিগুলি সংশোধিত হবে—এই প্রত্যাশা করা যেতে পারে। ❑
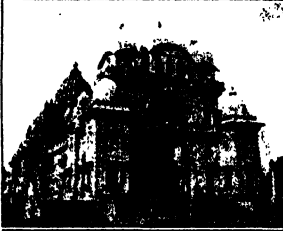
রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

একালের মহাতীর্থ বেলুড় মঠ

মন্দির অধ্যাত্ম সংস্কৃতির স্মারক। ভক্তের প্রয়োজনে এর সূচনা। মন্দিরের পবিত্র পরিবেশে ভক্ত ও ভগবানের একান্ত আলাপনের সুযোগ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-আদর্শের প্রতিভু, যা তাঁর জীবন ও বাণীতে প্রতিভাত—তারই আধার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। ত্যাগ ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্তরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই রূপই তাঁর আকর্ষণী শক্তি। সে-আকর্ষণে ভক্ত-সাধক প্রতিনিয়ত তাঁরই দিকে ধাবিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে লীন হন ১৮৮৬ সালে। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাথার মণি' নরেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তখনো তাঁর মধ্যে জগদ্বরেণ্য বিবেকানন্দের রূপটি প্রকাশিত হয়নি। নিজের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার আগেই একটা প্রবল বাসনার তাড়নায় তিনি তখন হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন। সেটি হলো গঙ্গার ধারে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একটি মন্দির স্থাপন করে তাঁর পূত ভস্মাস্থি সেখানে রক্ষা করা। সে এক ইতিহাস।

মঠ তখন বরানগর থেকে আলমবাজারে উঠে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত ভস্মাস্থি সেখানে নিত্যপূজা করেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। এদিকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে তোলপাড় করেছেন 'সাইক্লোনিক হিন্দু সন্ন্যাসী' স্বামী বিবেকানন্দ। সেই ঐতিহাসিক সংবাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ একের পর এক এসে পড়ছে ভারতের বেলাভূমিতে, সমগ্র ভারতবর্ষ যেন উল্লসিত হয়ে উঠছে এক অননুভূত উদ্বেল আনন্দে। এমতাবস্থায় আমেরিকা থেকে স্বামীজী গুরুভাইদের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে বিস্তৃতভাবে মঠের নিয়ম-নীতি লিখে পাঠালেন। বলা যেতে পারে, একটি মন্দির স্থাপন এবং তাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সৃষ্টির বাসনাকে বাস্তবায়িত করার এ এক মূল্যবান পদক্ষেপ। ২৭ এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে স্বামীজী তাঁর স্বাভাবিক বলিষ্ঠ লেখনভঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন ঃ "সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরনোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারি করতে হবে। পুরনোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এযুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি-দান—আবালবৃদ্ধবনিতা।"

পরবর্তী কালে যখন বেলুড় মঠের সাংগঠনিক নিয়মাবলী রচিত হলো, তার প্রথম সূত্রতেই স্বামীজী বললেন ঃ "This Math is established to work out one's own liberation and to train oneself to do good to the world in everyway along the lines laid down by Bhagavan Sri Ramakrishna." এই কথাগুলি স্মরণে রেখে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাঠামোই হোক,, মঠের স্থাপত্যই হোক কিংবা প্রচার ও সমাজকল্যাণধর্মী ক্রিয়াকলাপই হোক—বোঝবার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। আর এই প্রণালীতেই বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রামকৃষ্ণ মিশন সদ্যোজাত অবস্থা থেকে আজ যৌবনে পদার্পণ করেছে।

১৮৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আলমবাজার থেকে মঠ উঠে এল বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। সেখান থেকে বর্তমান বেলুড় মঠের জমিতে এল ১৮৯৯ সালের ১ জানুয়ারি। এইদিন থেকেই এই জমিতে বসবাস শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই ১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর স্বামীজী মাথায় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত দেহাবশেষ ('আত্মারামের কৌটো') নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি থেকে এনে স্বহস্তে বেলুড় মঠের জমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন যাকে 'পুরনো মন্দির' বলা হয়, সেখানে ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এটি পূজা করা হয়েছিল। পরদিন ১৪ জানুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্তমান মন্দিরে সেই 'আত্মারামের কৌটো' স্বহস্তে প্রোথিত করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। অবশ্য তখনো মন্দির নির্মাণকার্য চলছিল। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় ১৯৩৯ সালে।

মঠ আলমবাজারে থাকাকালেই ১৮৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বেলুড়ে ভাগবৎ নারায়ণ শীলের ঐ জমি প্রথমে ১০১ টাকায় বায়না করা হয়। ঐবছর ৪ মার্চ আরো ৩৯,৮৯৯ টাকায় (মোট ৪০,০০০ টাকায়) প্রায় ২২ বিঘা জমি খরিদ করা হয়। জমি কেনার ব্যাপারে মিসেস ওলি বুল

এবং মিস হেনরিয়েটা মুলারের প্রদত্ত ৩৯,০০০ টাকাই ছিল প্রধান ভরসা। হোরমিলার স্টিমার কোম্পানির বজরা ও মালবাহী নৌকা সারাইয়ের স্থান ছিল এই জমি। কয়েকটি দেবদারু ও অন্যান্য গাছের সঙ্গে বজরা ও নৌকাগুলি বাঁধা থাকত। গঙ্গার ধার থেকে প্রায় ৬০ ফুট ভিতরে এলে স্বামীজীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে সেই আমলের কয়েকটি বিশাল দেবদারু বৃক্ষ এখনো চোখে পড়ে। সমগ্র জমিটাই তখন ছিল অত্যন্ত উঁচুনিচু।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য হরিপ্রসন্ন (পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) আলমবাজারে মঠে ব্রহ্মচারিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। মঠে যোগদানের পূর্বে তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের Executive Civil Engineer ছিলেন। তাঁর ওপর বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির গড়ে তোলার ভার পড়ল। ঐ অবস্থায় তাঁর প্রথম করণীয় হলো জমি সমতল করা এবং মঠের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত বাড়িটির (যে-বাড়িতে পরে স্বামী বিবেকানন্দ বসবাস করেন) সংস্কার করা। ঐ বাড়িটিকে 'পুরনো মঠবাড়ি' বলা হয়। সেখানেই ছিল মঠ লাইব্রেরি, অতিথিদের থাকার স্থান এবং অফিস। খাওয়া হতো বর্তমান মঠ অফিসের ঘরগুলিতে এবং সম্মুখের বারান্দায়। রান্না হতো পাশেই টিনের চালার নিচে।

আগেই বলা হয়েছে, আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দের মনে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত দেহাবশেষ রক্ষার জন্য একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করার পরিকল্পনা ছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এক অনিবার্য সত্যের ছবি—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে আশ্রয় করে এক নতুন জাতি, এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, সূচনা হবে নতুন যুগের। সুতরাং এটিকে শুধু একটি সাধারণ স্মৃতিমন্দির নয়, মানবজাতির ভাবী আত্মবিকাশের সর্বাত্মক প্রতীক হিসাবে গড়ে তোলার কথা স্বামীজীর মনে হলো। বিশেষত আমেরিকা থেকে ফিরে যখন তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও পর্যটন করছিলেন, তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেশ কিছু সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সেই স্থাপত্যসমূহের তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন স্বামীজী। পরবর্তী কালে যখন বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর নির্দেশে 'মন্দিরের নকশা' প্রস্তুত করেন, তখন কয়েকটি বাতিল করে অবশেষে একটি নকশায় স্বামীজীর সম্মতি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, চিন্তাধারাকে রূপদান করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অথচ সেই দুরূহ কাজে বিজ্ঞানানন্দজীর সাফল্য সত্যই আশ্চর্যজনক। কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বামীজীর মনোনীত নকশাখানির অদলবদল কিছু করতেই হয়েছে। কিন্তু মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্পর্কে স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল মোটামুটি এরকম ঃ

(১) ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাইরের স্থাপত্যশিল্পের এক অদ্ভুত সমাবেশ হবে এই মন্দিরে।

(২) একনজরে এই মন্দির দেখে হিন্দুমন্দির বলে বোধ হবে।

(৩) শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তির ওপরে গম্বুজাকৃতির ছাদ হবে।

(৪) খ্রিস্টীয় চার্চগুলিতে যেমন গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির যুক্ত থাকে, এখানেও তাই হবে।

(৫) দূর থেকে দেখলে মন্দিরটি ওঙ্কার বলে মনে হবে।

(৬) নাটমন্দিরটি এত বৃহৎ হবে যে, একহাজার লোক একত্রে বসে ধ্যানজপ করতে পারবে।

বহুদিন স্বামীজীর এই স্বপ্ন ও মন্দিরের নকশা অর্থ ও যোগ্য সাংগঠনিক কার্যকারিতার অভাবে অন্ধকারে পড়ে থাকার পর ১৯২৯ সালে স্বামী শিবানন্দ মন্দির নির্মাণের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পার্ষদই তখন ব্রহ্মলীন হয়েছেন। আর মহাপুরুষজীও যেন শুনতে পেয়েছিলেন প্রভুর আহ্বান। সুতরাং 'মার্টিন বার্ণ কোম্পানি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে মন্দির নির্মাণের ভার দেওয়া হোক—এরকম একটা প্রস্তাব এল। এই উদ্যমের পিছনে একটা কারণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণের শুভ সঙ্কল্পের কথা শুনে আমেরিকার বস্টনের স্বামী অখিলানন্দের শিষ্যা মিস হেলেন এফ. রুবেল ('ভক্তি') এক দৈবী প্রেরণায় নিজের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বেলুড় মঠকে দান করেন। মার্টিন বার্ণ কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বামীজীর মনোনীত পুরনো সেই নকশাটির ভিত্তিতে একটি নতুন নকশা প্রস্তুত করলেন এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ওঙ্কারের আদলে মন্দির তাঁদের মতো বিখ্যাত এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তৈরি করা সাধ্যের অতীত। অপরদিকে মার্টিন বার্ণ কোম্পানিরই গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার ও ড্রাফ্‌টসম্যান সুশীলবাবুর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি নকশা প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়টি মঠ-কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালের ১৩ মার্চ, রবিবার মহাপুরুষ মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব। তিনি অবশ্য এই প্রচেষ্টার শেষ দেখে যেতে পারলেন না। ১৯৩৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মহাপুরুষ মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হলেন। কাজ ইতোমধ্যে সামান্যই অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, বিরাট মন্দির নির্মাণের পক্ষে যেস্থানে মহাপুরুষজী তাম্রফলক ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, সেটি নানা কারণে সুবিধাজনক হয়নি। তাই ১৯৩৫ সালের ১৬ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সেই তাম্রফলক তুলে এনে প্রায় ১০০ ফুট দক্ষিণে স্থাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উচ্চতা ১১২.৫ ফুট এবং মোট আয়তন ৩২,৯০০ বর্গফুট। মন্দিরের অধিকাংশ চুনাপাথর এবং সম্মুখের কিছুটা অংশ সিমেন্টের তৈরি। মন্দিরের সু-

উচ্চ প্রবেশপথ দক্ষিণ ভারতীয় গোপুরমের কথা মনে করিয়ে দেয়। উভয় পার্শ্বের থামগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলির অপূর্ব নিদর্শন। শীর্ষদেশে রাজপুত মোঘল রীতির তৈরি তিনটি ছত্রী কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের খড়ের চালার ছাউনিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবেশপথের ওপরে অর্ধবৃত্তাকার অংশে ঘটেছে অজন্তা রীতির সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যের অদ্ভুত মেলবন্ধন। এর ঠিক ওপরেই শিবলিঙ্গের একটি অনুকৃতি দেখা যায়। নাটমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে স্বভাবতই গির্জার কথা মনে আসবে। এর উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ স্তম্ভগুলি ডোরিক বা গ্রিসীয় এবং অলঙ্কারগুলি মীনাক্ষী-মন্দিরের অনুসারী।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ওপরের ঝোলানো বারান্দা ও জানালাগুলিতে রাজপুত ও মোঘল স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। গর্ভমন্দিরের চারিদিকে পরিক্রমার জন্য প্রশস্ত বারান্দায় বৌদ্ধ চৈত্য ও খ্রিস্টীয় গির্জার স্থাপত্যকর্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গর্ভমন্দিরের বাইরে নবগ্রহের মূর্তি সমগ্র মন্দিরের সৌন্দর্যে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে। মন্দির-শীর্ষে একটি স্বর্ণকলস এবং কলসের নিচে একটি ছোট আকৃতির মহাপদ্ম বা আমলক এবং তার মধ্যে একটি আলোকবর্তিকা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। বড় গম্বুজ ও অন্যান্য গম্বুজগুলিতে ইসলামীয়, রাজপুত ও লিঙ্গরাজ-মন্দিরের স্থাপত্যরীতির ছায়া দেখা যায়। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বের স্তম্ভগুলি চিতোরের কীর্তিস্তম্ভের এবং উভয় দিকে সিদ্ধি ও শক্তির প্রতীক গণেশ ও মহাবীরের মূর্তি দর্শককে আকর্ষণ করে। গর্ভগৃহে ডমরু আকৃতির বেদির ওপর শতদল পদ্ম। তার ওপরে শ্বেতপাথরের পূর্ণাবয়ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। বেদির সম্মুখে ব্রাহ্মীহংসটি পরমহংসের প্রতীক। গর্ভগৃহের ওপরে দোতলায় কয়েকজন পার্ষদের পূত দেহাবশেষ রয়েছে। তিনতলায় আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিটি প্রখ্যাত ভাস্কর গোপেশ্বর পাল (জি. পাল) নির্মাণ করেন। মন্দিরের কিছু অংশ অলঙ্করণ করেন বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসু।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির মহাসমন্বয়ের পীঠস্থান। এর কোন অংশেই কোন বিশেষ স্থাপত্যরীতিকে অনুকরণ করা হয়নি। এখানে সমস্ত শিল্পভাবনাকে অঙ্গীভূত করে অনন্য ও অভিনব রূপকল্পনা করা হয়েছে। এর প্রবেশদ্বারে স্বামীজীর পরিকল্পিত প্রতীকচিহ্নটি শুধু কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় সূচিত করে না, এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এবং স্বামীজীর শিল্পভাবনার এক অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। প্রতীকচিহ্নটির নিচে রয়েছে শাশ্বত একটি প্রার্থনা—"তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ"—পরমাত্মা আমাদের প্রেরণা দান করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নঘর ঃ মন্দিরের তিনতলায় শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নঘর। বরানগরের অবিনাশচন্দ্র দাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বসা ছবি তুলেছিলেন। সেই ছবির যে-কয়টি প্রিন্ট করা হয়েছিল, তার একটি এখানে আছে। এই ছবিটিই পুরনো ঠাকুরঘরে প্রথমে পূজিত হতো। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

ব্রহ্মানন্দ-মন্দির ঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাজা মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ-পদে বৃত ছিলেন। তিনি বেশির ভাগ সময়ই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে আরূঢ় থাকতেন। সাধারণ অবস্থায় যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন তাঁর মধ্যে বালক ভাব পরিলক্ষিত হতো। তিনি ফল-ফুল খুব ভালবাসতেন। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি বহু দুর্মূল্য ফল ও ফুলের গাছ এনে মঠে লাগিয়েছিলেন। তবে সেই বাগান দেখার সুযোগ এখন আর নেই। কিন্তু তাঁর স্বহস্তে রোপিত কিছু গাছ এখনো মঠে আছে।

১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল বলরাম-মন্দিরে রাজা মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হন। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে তাঁর দেহ পবিত্র চিতাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে সেই স্থানেই তাঁর স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভমন্দিরটি নবরত্ন মন্দির অর্থাৎ এর নয়টি চূড়া—চারকোণে চারটি, মধ্যে মধ্যে চারটি 'shallow dome' খানিকটা কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের ছাউনির আদলে, আর মাঝখানে একটি বড় 'dome' বা গম্বুজ। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর মন্দিরও নবরত্ন মন্দির। ওপরে বিষ্ণুচক্র শোভিত।

মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৩২ ফুট ৬ ইঞ্চি; উচ্চতায় ৩০-৩৫ ফুট। গর্ভমন্দিরের চারদিকে পরিক্রমার পথ ৮ ফুট। এটি শ্বেতপাথরের তৈরি। গর্ভমন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৩ ফুট। মন্দিরটি দোতলা। গর্ভমন্দিরের ওপর প্রধান গম্বুজ। পরিক্রমার প্রান্তভাগের স্তম্ভগুলি নকশাযুক্ত আর্চের দ্বারা সংযুক্ত। চতুর্দিকে পাঁচটি করে মোট আর্চের সংখ্যা ২০টি। মন্দিরের প্রধান গম্বুজ ছাড়া চারকোণে চারটি একই আকারের অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ। প্রধান গম্বুজ ও অন্যান্য গম্বুজের মধ্যে চারচালা মন্দিরের মতো চারটি চাল আছে। প্রতি গম্বুজের শীর্ষদেশে বাঁকি, আমলক, কলস ও বিষ্ণুচক্র স্থাপিত। প্রধান দরজা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে আরো দুটি দরজা।

গর্ভমন্দিরের ভিতরের মেঝে শ্বেতপাথরের। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে ৩.৫ ফুট পাথর বসানো। ৬ ফুট×২ ফুট ৩ ইঞ্চি মাপের একটি বেদির ওপর আরেকটি ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি ×১ ফুট ৬ ইঞ্চি বেদির ওপর ব্রহ্মানন্দজীর শ্বেতপাথরের মূর্তি সমাসীন। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা রাখাল মহারাজের সঙ্গে থাকেন নয়নমনোহর একটি বালগোপাল মূর্তি। দোতলায় রাজা মহারাজের শয়নকক্ষে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি রক্ষিত আছে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ঃ ১৯২০ সালের ২০ জুলাই শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর তাঁর দেহ উদ্বোধন থেকে বরানগর ঘাট হয়ে মঠে নিয়ে আসা হয়। যে-স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের পূত দেহ চিতাগ্নিতে অর্পণ করা হয়েছিল, সে-স্থানেই এই পূর্বমুখী মন্দির। ভারতীয় রীতিতে সাধারণত মন্দির পশ্চিম বা দক্ষিণ-মুখী হয়ে থাকে। মা গঙ্গা দেখতে ভালবাসতেন বলে তাঁর মন্দির পূর্বমুখী। পুরাকালে সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ে গড়ে উঠেছিল একান্ন পীঠ। বর্তমান যুগে সতীর সমগ্র দেহটি একই স্থানে রয়েছে। তাই বলা হয়, বেলুড় মঠ হলো একান্ন পীঠের সমাহার। ১৯২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী সারদানন্দ। মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালের ২১ ডিসেম্বর—শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে।

মন্দিরে কাঠের আসনে শ্রীশ্রীমা বসে আছেন গঙ্গার দিকে মুখ করে। সিংহাসনটি জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাসগৃহের চালের অনুরূপ। গর্ভগৃহে গোপালের মা কর্তৃক শ্রীশ্রীমাকে প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বহু প্রাচীন ফটোটি রক্ষিত আছে। মন্দিরে রক্ষিত বাণলিঙ্গও বহুকাল ধরে পূজিত হচ্ছে। মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারের ওপরে রক্ষিত আছে মহিষাসুরমর্দিনীর একখানি মূর্তি।

স্বামীজীর মন্দির ও বিল্ববৃক্ষ ঃ স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ১৯০২ সালের ৪ জুলাই। স্বামীজীর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর নির্দেশিত স্থানে পবিত্র চিতাগ্নিতে তাঁর দেহ আহুতি দেওয়া হয়। ঐ স্থানেই ১৯০৭ সালে স্বামীজীর মন্দিরটির নির্মাণকার্য শুরু হয়। সমাধিমন্দির-সহ দোতলা মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয় ১৯২৩ সালে। উদ্বোধন করা হয় ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি। স্বামীজী এমন একটি প্রতীক সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে ধর্মমত-নির্বিশেষে সকল মানুষ এসে আশ্রয় নিতে পারে। মহান ওঁকার হলো সেই প্রতীক। এই প্রতীক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে স্বামীজীর মন্দিরের দোতলায়।

স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিল্ববৃক্ষের নিচে স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে এসে বসতেন। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে গান গাইতেন—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।"

বর্তমানে পুরনো বেলগাছটি নেই। তার পরিবর্তে একটি নতুন গাছ এই স্থানেই লাগানো হয়েছে।

সমাধিপীঠ ঃ স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণে গঙ্গার ধারেই অবস্থিত সমাধিপীঠ। এই স্থানের ওপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ সাতজন পার্ষদের পূতদেহ এই স্থানে চিতাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ। গঙ্গার ধারে পৃথক একটি আয়তাকার ভূমিখণ্ড রয়েছে, সেখানে বর্তমানে সন্ন্যাসীদের দেহত্যাগের পর তাঁদের দেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়।

গিরিশ মেমোরিয়াল (পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের বাসগৃহ) ঃ ১৯১২ সালের পর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সহায়তায় এই বাড়িটি তৈরি হয়। প্রথমে এটি অতিথিভবন ছিল। বাড়িটির দোতলা নির্মিত হয় ১৯২২ সালে। মিস ম্যাকলাউড এখানে থাকতেন। অনেক পরে ১৯৬৫ সালে এটি পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট মহারাজের বাসভবনে রূপান্তরিত হয়। এখানে ওকগাছের গুঁড়ি থেকে তৈরি একটি কাঠের গোলটেবিল আছে, যেটা নাকি স্বামীজী Thousand Island Park-এ যে ওকগাছের নিচে বসতেন, তা থেকেই নির্মিত।

প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল ঃ দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য এই বাড়িটি তৈরি করা হয় ১৯১৬ সালে। তখন একতলাটা নির্মিত হয়েছিল। দোতলা নির্মিত হয় স্বামী প্রেমানন্দজীর স্মৃতিতে ১৯১৮-১৯২২ সালের মধ্যে। বর্তমানে এটি সাধুনিবাস।

ছোট গেট ঃ প্রথমে মঠের প্রবেশদ্বার ছিল দক্ষিণদিকে। লালাবাবু সায়র রোড থেকে অমৃতলাল লেন হয়ে শরৎ আটা লেনে এসে মঠে প্রবেশ করতে হতো। অতিথিভবনের পাশ দিয়ে গেলে মঠের এই প্রাচীন প্রবেশদ্বারটি পড়বে। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের স্মৃতি-বিজড়িত প্রবেশদ্বারটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। শ্রীশ্রীমা কখনো নৌকাযোগে এসে, কখনো কলকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতেন। ১৯০০ সালের ৯ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে গেটটি বন্ধ দেখে টপকে মঠে ঢুকেছিলেন।

নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি (পুরনো মঠ) ঃ এই ঐতিহাসিক বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তবটি—

"খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥..."

বেলুড় মঠের জমি কেনার পূর্বে এই বাড়িতে বেশ কয়েকবার শ্রীশ্রীমা তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে বাস করেছেন। তিনি বাড়ির দোতলায় উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতে থাকতেন। বাইরে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঠাকুরঘরে (বর্তমানে নেই) ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ স্বামীজী মিস মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হয় 'ভগিনী নিবেদিতা'। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের একবার এক অদ্ভুত দর্শন হয়। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। গঙ্গায় জ্যোৎস্নার আলোতে মনে হচ্ছে, গলিত রূপা যেন প্রবাহিত। শ্রীশ্রীমা গঙ্গাতীরস্থ সোপানে বসে সেই শোভা দেখছেন। এমন সময়ে

বেলুড় মঠ তীর্থপরিক্রমা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ

এযুগের মহাতীর্থ বেলুড় মঠ—গঙ্গাবক্ষ থেকে
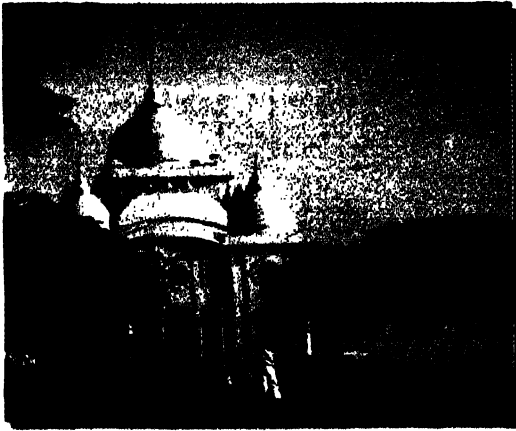
স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিমন্দির

শ্রীসারদাদেবী স্মৃতিমন্দির

স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির

মঠের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত সমাধিপীঠ

পুরাতন মঠবাটী ও স্বামীজীর স্মৃতিপূত আম্রবৃক্ষ

শ্রীরামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির (মিউজিয়াম)

হঠাৎ তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পিছন থেকে এসে দ্রুতপদে গঙ্গায় নেমে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাজলে মিশে গেলেন। সেই সময় কোথা থেকে স্বামীজী এসে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে সেই জল চারদিকে অগণিত নরনারীর মাথায় সিঞ্চন করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা দেখলেন, অসীম জনসঙ্ঘ সেই জলস্পর্শে সদ্যোমুক্তি লাভ করছে।

বেদ বিদ্যালয়ঃ স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি পদক্ষেপ বেদ বিদ্যালয় স্থাপন। এটি স্থাপিত হয় ১৬ আগস্ট ১৯৯৩ সালে। নতুন দিল্লির রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এবং নাগপুরের কবিগুরুকুল কালিদাস সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত এই বেদ বিদ্যালয়ে চতুর্বেদ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, ভূগোল, কম্পিউটার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্ররা নিখরচায় এখানকার সুন্দর আশ্রমিক পরিবেশে থেকে পড়াশোনা করে।

পুরনো মঠবাড়ি ও স্বামীজীর বাসগৃহঃ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি ছেড়ে মঠ নিজস্ব জমিতে উঠে এসেছিল ২ জানুয়ারি ১৮৯৯। প্রথমে একতলা বাড়িটি কেনা হয়। বাড়িটি '*L*' আকারের। ১৮৯৮ সালে স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যারা—মিসেস সারা ওলি বুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ এবাড়িতে বাস করেছেন। ১৮৯৯ সালে দোতলা নির্মিত হয় ও কয়েকটি ঘর সংযোজিত হয়। বাড়িটির দোতলার উত্তর-পূর্বের ঘরে থাকতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং উত্তর-পশ্চিমের ঘরে থাকতেন স্বামী শিবানন্দজী। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরটি ব্যবহৃত হতো অফিস ও লাইব্রেরি-রূপে। পরে সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজগণ এখানে থাকতেন। সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী পর্যন্ত এই ঘরে ছিলেন। এই বাড়ির দোতলায় থাকতেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ও স্বামী সুবোধানন্দজী এবং নিচের তলায় স্বামী অদ্বৈতানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামীজীর শিষ্যরা—স্বামী শুদ্ধানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, স্বামী নির্ভয়ানন্দজী প্রমুখ।

দোতলায় তিনটি ঘর। দক্ষিণদিকের ঘরটি ঠাকুরঘর এবং উত্তরের ঘরটি ঠাকুরের শয়নঘররূপে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে দক্ষিণদিকের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ আলোকচিত্র রাখা আছে এবং উত্তরদিকের ঘরে রয়েছে স্বামী শিবানন্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। পশ্চিমের ঘরটিকে 'ধ্যানঘর' বলা হতো। নিচের ঘরগুলি তখন রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাওয়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এটি 'মঠ অফিস'।

মঠ অফিসের লাগোয়া পূর্বদিকের বাড়িটির দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরে স্বামীজী থাকতেন এবং এর উত্তরের বারান্দাতে তিনি বসতেন, পাদচারণা করতেন। স্বামীজীর ঘরে তাঁর ব্যবহৃত বহু জিনিস রয়েছে। বড় একটি খাট রয়েছে, যা আমেরিকার শিষ্যদের দেওয়া। স্বামীজী অবশ্য ব্যবহার করতেন ছোট ক্যাম্পখাটটি। এই ঘরেই তিনি মহাসমাধিতে লীন হন ৪ জুলাই ১৯০২। এই বাড়িটির সামনে উঠানে যে-আমগাছের নিচে তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, কালের প্রবাহে সেই গাছটি আজ বৃদ্ধ। তবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার যথাযথ চেষ্টা চলছে।

মঠ অফিসের পিছনদিকে রয়েছে 'লেগেট হাউস'। দুর্গাপূজার সময় মঠে এসে শ্রীশ্রীমা এখানে থাকতেন। তবে এটি সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য নয়।

মিশন অফিসঃ বেলুড় মঠের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে ডানদিকে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখ্য কার্যালয়—'মিশন অফিস'। ২১ এপ্রিল ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মিশন অফিস শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের বিপরীতদিকে একটি দ্বিতল-গৃহে অবস্থিত ছিল। পরে এটি বর্তমান বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

রামকৃষ্ণ সংগ্রহমন্দিরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভারে সমৃদ্ধ এই মিউজিয়ামটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মিউজিয়াম দর্শনের সময়—

এপ্রিল—সেপ্টেম্বর	ঃ	সকাল ৮.৩০ মিঃ—১১.৩০ মিঃ
		বিকাল ৪.০০ মিঃ—৬.০০ মিঃ
অক্টোবর—মার্চ	ঃ	সকাল ৮.৩০ মিঃ—১১.৩০ মিঃ
		বিকাল ৩.৩০ মিঃ—৫.৩০ মিঃ

ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সকল শাখাকেন্দ্র থেকে ব্রহ্মচারীদের এখানে দুবছরের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে আসতে হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যব্রত দেওয়া হয়। এটি সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য নয়।

আরোগ্যভবনঃ পীড়িত ও বৃদ্ধ সাধুরা থাকেন 'আরোগ্যভবন'-এ। ১৯৮০ সালে দুটি তলা এবং ১৯৮৩ সালে তৃতীয় তলাটি নির্মিত হয়। এখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ অনুমতিসাপেক্ষ।

দাতব্য চিকিৎসালয়ঃ ১৯১৩ সালে 'প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল'-এ দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য এটি শুরু হয়েছিল। পরে ১৯৩৮ সালে মঠের প্রধান ফটকের ডানদিকে তা স্থানান্তরিত করা হয়।

পল্লীমঙ্গলঃ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের প্রেরণায় ১৯৮০ সালে 'পল্লীমঙ্গল' নাম দিয়ে একটি গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রকল্প শুরু হয়েছিল। এখন সেটি কামারপুকুরকে কেন্দ্র করে বিশাল আকার ধারণ করেছে। মঠের পুরনো ফটকের পাশেই পল্লীমঙ্গলের 'শো-রুম' অবস্থিত। ❑

প্রতিবেদকঃ **স্বামী পরিপূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণচৈতন্য**

উৎসব-অনুষ্ঠান

জয়রামবাটী মাতৃমন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ১ জুলাই ২০০৩ প্রস্তাবিত অতিথিশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ২০ জুলাই ২০০৩ স্থানীয় তারকনাথ হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে বেদ ও 'কথামৃত' পাঠ, গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সীমা চ্যাটার্জি ও রত্না মুখার্জি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী এবং স্বামী দীননাথানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। সম্মেলনে দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল ও বাঁকুড়া থেকে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। উপস্থিত সকল ভক্ত ও শতাধিক অনাথ শিশুকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবেকনগর আশ্রম (ত্রিপুরা) ঃ গত ২৫ জুলাই ২০০৩ আশ্রম-বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং চা উৎপাদন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

বড়িষা মঠ (কলকাতা-৮) ঃ গত ২৭ জুলাই ২০০৩ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

মুজফ্‌ফরপুর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (বেলা, বিহার) ঃ গত ২৭ জুলাই ২০০৩ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, সাধুসমাগম ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী এবং স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী নিখিলানন্দজী, স্বামী রঘুনাথানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মেশানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী প্রমুখ।

বিশেষ উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পটের সম্মুখে রক্ষিত মঙ্গলঘটের আবরণ উন্মোচন, প্রদীপ প্রজ্বলন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকযুক্ত মনোগ্রাম-সহ মন্দিরশীর্ষে পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি প্রতীকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম'টির স্বত্বাধিকার রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদান করা হয়। এদিন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী আশ্রমের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ও দায়িত্ব শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের হাতে সমর্পণ করেন। আশ্রমটির নতুন নামকরণ করা হয়—**'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মুজফ্‌ফরপুর'**। বর্তমানে সেবাশ্রমটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বামী রঘুনাথানন্দজী। এই আশ্রমের ঠিকানা ঃ **স্বামী বিবেকানন্দ পথ, বেলা, মুজফ্‌ফরপুর, বিহার-৮৪৩ ১১৬।**

সেবাশ্রমটির ইতিবৃত্ত বেশ ঐতিহ্যবহ। ১৯২৬ সালে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিত স্বামী ঋতানন্দজী। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি আশ্রমের সূচনা করেন। এরপর অ্যালোপ্যাথিক বহির্বিভাগ, চক্ষু চিকিৎসার অন্তর্বিভাগ, প্যাথোলজি, অবৈতনিক বিদ্যালয়, এক্সরে ক্লিনিক, মহিলাদের জন্য সেলাই স্কুল প্রভৃতি সেবাকার্যের প্রসার ঘটে তাঁর সময়ে। ১৯৬৬ সালে তাঁর দেহত্যাগের পর সেবাশ্রমের দায়িত্ব পান স্বামী অসীমানন্দজী। ১৯৮৪ সালে তাঁর শরীররক্ষার পর সেবাশ্রমের দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজীর ওপর। তাঁরই আত্যন্তিক প্রয়াসে সেবাশ্রমের পরিচালন অধিকার রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদান করা হয়। সেবাশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের ১৩১তম শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হলো।

আশ্রম-কৃতিত্ব

সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন (বেলুড় মঠ) ঃ গত ১৫ জুলাই ২০০৩ সারদাপীঠের অন্তর্ভুক্ত শিল্পায়তন 'National Council of Education Research and Training (NCERT)' থেকে শিল্পে বেস্ট 'স্কুল ইণ্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ' পুরস্কার লাভ করেছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

রহড়া মহাবিদ্যালয়ের ৮৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৮০ জন প্রথম বিভাগে (৪১ জন 'স্টার') উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিদ্যামন্দিরের (সারদাপীঠ) ৮৭ জন ছাত্র সকলেই প্রথম বিভাগে (৫৫ জন 'স্টার') উত্তীর্ণ হয়েছে।

বহির্ভারত

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) ঃ গত ১৩ জুলাই ২০০৩ বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, জপ-যজ্ঞ, প্রশ্নোত্তর পর্ব, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সন্তুতানন্দজী, ব্রহ্মচারী লোকপালচৈতন্য ও প্রদীপকুমার চক্রবর্তী। আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দজী এবং অরুণরঞ্জন সরকার, ইন্দ্রভূষণ রাউত প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৯০ জন ভক্ত যোগদান করেন। প্রত্যেক ভক্তকে একটি করে 'গৃহস্থ ধর্ম' পুস্তিকা প্রদান করা হয়। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাবতিথি পালন ঃ গত ১২ আগস্ট এবং ২৬ আগস্ট ২০০৩ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

বিহার-ঝাড়খণ্ড রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০৩ ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় **গোমিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (বোকারো, ঝাড়খণ্ড)।** তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী, স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দজী, স্বামী তদ্‌রূপানন্দজী এবং গোমিয়া সেবাশ্রমের সম্পাদক ডঃ এ. কে. ঝা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিবেক পাইন।

চন্দাবলী অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (ভদ্রক, ওড়িশা) ঃ গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দীনেশানন্দজী এবং দিগম্বর পাত্র, বিশ্বরঞ্জন সতপতি, ত্রিলোচন সাহু ও ক্ষিরোদচন্দ্র থাতই। দ্বিতীয়দিনে একটি যুবশিক্ষণ শিবির এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী-সম্বলিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী দীনেশানন্দজী। বিশেষ উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমা ওড়িশার এই চন্দাবলীতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন।

আগরা সারদামণি পল্লীমঙ্গল সংস্থা (পশ্চিম মেদিনীপুর) ঃ গত ২৭ এপ্রিল ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত একটি যুবসম্মেলনে ভক্তিগীতি, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী লোকেশানন্দজী, স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, শরৎ রায় প্রমুখ। সম্মেলনে ১৫১ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে।

ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১ মে ২০০৩ ফিঙ্গাপাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বেদপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, জপ-ধ্যান, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। সম্মেলনে ৯৭ জন ভক্ত যোগদান করেন।

সুভাষনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৬৫) ঃ গত ১-৪ মে ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, নগর পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, যাত্রাপালা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কেয়া ঘোষ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণাজী, ডঃ কমল নন্দী, তারকনাথ দে ও অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

বনগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৩-৪ মে ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। বাউল ও তরজা গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে বিষ্ণুপদ সরকার ও সম্প্রদায় এবং কার্তিকচন্দ্র মল্লিক ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী যতীশানন্দজী ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (হুগলি) ঃ গত ৪ মে ২০০৩ বিশেষ পূজা, পাঠ, সমবেত জপ-ধ্যান, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনাসভার মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালিত হয়। প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনাসভা পরিচালনা করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী। শিবিরে ২০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভক্তদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয় এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৪-৫ মে ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সভায় স্বামী মুক্তিকামানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন সন্তোষকুমার ঘোষ ও সুব্রতকুমার বোস।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র (হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৫ মে ২০০৩ সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ গায়েন ও আশুতোষ মণ্ডল। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দজী, অসিতকুমার বসু, রেবা গায়েন প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে কমলা মণ্ডল ও শোভা মণ্ডল। সম্মেলনে ৩০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল।

ধুবড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম) ঃ গত ৯-১১ মে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পরাশরানন্দজী। স্বামীজীর ধুবড়িতে পদার্পণের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'উত্তিষ্ঠত' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

কাসুন্দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ১০ ও ১১ মে ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তরুণ সরকার, অসীম দত্ত প্রমুখ। ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজী ও স্বামী গোকুলেশানন্দজী। দ্বিতীয়দিনে প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজীর সভানেতৃত্বে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা যোগেশপ্রাণাজী প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ। উল্লেখ্য, গত ৪ মে এই আশ্রমের পক্ষ থেকে 'তারাপদ বসু পুরস্কার' প্রদান করা হয় অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমানকে। এই উপলক্ষ্যে ভাষণ দেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, ডঃ নিমাইসাধন বসু ও তরুণকুমার ঘোষ।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৪ মে ২০০৩ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি

করেন স্বামী শান্তিদানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সরোজ নাইয়া, পিয়ালী ভট্টাচার্য প্রমুখ। ধর্মসভায় স্বামী শান্তিদানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন. স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী রঘুনাথানন্দজী, স্বামী ওঁকারাত্মানন্দজী ও স্বামী ব্রজেশানন্দজী। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সভাপতি কৃষ্ণগোপাল নস্কর।

মণ্ডলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ১৬ মে ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী সোমাত্মানন্দজী, অধ্যাপক কল্পতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলেন্দু সামন্ত।

তেলুয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (তেলোভেলোর চটি, হুগলি) : গত ১৬ মে ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শ্রীশ্রীমায়ের 'ডাকাতবাবা (সাগর সাঁতরা) স্মৃতিমন্দির'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে প্রসাদ এবং স্থানীয় দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন স্বামী অমেয়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী।

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১৬ মে ২০০৩ বুদ্ধপূর্ণিমার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট স্থাপন করেন স্বামী সুনিশ্চিতানন্দজী। অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন এবং আলোচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত প্রায় ৫০০ মানুষকে প্রসাদ ও ঠাকুরের একটি করে ছবি প্রদান করা হয়।

রায়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর দিনাজপুর) : গত ১৭ এবং ১৮ মে ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পল্লব দাশগুপ্ত ও যোগেশ দাস। দ্বিতীয়দিন ভক্তসম্মেলনে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন মালদহের 'ত্রিতীর্থ' সম্প্রদায়। আলোচনা করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী ও সুজিতভূষণ রায়।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলি) : গত ১৮ মে ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় এবং ৩০০ ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সপ্তর্ষি ঘটক, সোমা ভট্টাচার্য প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, কল্যাণ আশিস মুখোপাধ্যায়, সুজয় লাহিড়ী, দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রজ্জ্বল দত্ত। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ১৮ মে ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ৪০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি ও বাউলগান পরিবেশন করেন যথাক্রমে ধনেশ্বর বর্মন প্রমুখ এবং মালদহের 'নবোদয়' সম্প্রদায়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অজেয়ানন্দজী ও সঞ্জয় শীল। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্তিকচন্দ্র পাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা (কলকাতা-৮) : গত ১৮ মে ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি সান্ধ্য ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, অজয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দেন প্রেমাংশু রায়চৌধুরী।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (হাওড়া) : গত ১৮ মে ২০০৩ বৈদিকস্তোত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর 'পত্রাবলী' থেকে পাঠ এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে ৮০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন। গত ২৩ মে আয়োজিত একটি মহিলা ভক্ত-সম্মেলনে ৪৪ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাঠ, জপ-ধ্যান ও সঙ্গীত ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়।

ইটালগাছা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭৯) : গত ১৮ মে ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সাথী চক্রবর্তী। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দীপেন পাল।

সেবাব্রত

শুকজোড়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বাঁকুড়া) : গত ১৭ এপ্রিল ২০০৩ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পুরন্দরপুর ও নারায়ণপুর গ্রামের মানুষের মধ্যে ২০০ জনকে রান্নাকরা খাবার এবং ২০০ জনকে 'টিফিন' দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুঃস্থ মানুষের ঘর ছাওয়ার জন্য কিছু টিন দেওয়া হয়েছে।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া) : গত ১৭ এপ্রিল ২০০৩ জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের সহায়তায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আয়মা, বালিবিন, হিজলডিহা, কুলসাহের প্রভৃতি গ্রামের মানুষের মধ্যে ৮০ কার্টুন পোশাক-পরিচ্ছদ, নতুন ধুতি, শাড়ি এবং ৩৩০টি পরিবারের মধ্যে টিন, কাঠ ও খুঁটি বিতরণ করা হয়েছে।

ঘোষ কদম্বপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বীরভূম) : গত ২১ মে ২০০৩ একটি অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

গুয়াহাটি বিবেকানন্দ পাঠচক্র (অসম) : গত ২২ জুন ২০০৩ আয়োজিত একটি চিকিৎসা-শিবিরে ৩২৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয় এবং প্রায় ২০,০০০ টাকার ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। ❑

মনে রাখবেন
ভারত সরকার কেবল
আসল মার্কার
ওপরই ® চিহ্ন লাগাবার
অধিকার দেন।
তাই সবসময়ে
আসল দুলালের ®
তালমিছরির লেবেলে
শিশুর খাদ্য,
রোগীর পথ্য এবং
সর্দিকাশি উপশমে
ঘরে ঘরে সমাদৃত
ভারত সরকারের
R
চিহ্ন দেখেই কিনুন
GOVT OF INDIA
দুলালের
তালমিছরি কিনুন
৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২২৩৯-৫৬৭৩, ২২৩০-০৫৪৩
PRASA/96

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। মানুষকে ভালবাসলে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়। তার দুঃখ-কষ্ট থাকে না।

শ্রীমা সারদাদেবী

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ

No work is secular. All work is adoration and worship.
SWAMI VIVEKANANDA

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ **রামকৃষ্ণ মিশন**, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ **সত্যনারায়ণ রায়**, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল ঃ satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ফোন ঃ (০১১) ২৬৪৭-১৫৪৯, ২৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন ঃ (০১১) ২৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০৪ ফোন ঃ (০৩১৯২) ২৩২৪৩২

অসম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা ঃ কামরূপ-৭৮১০০৭
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা ঃ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** গোসাইগাঁও, জেলা ঃ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা ঃ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পোঃ বি. চারালী, জেলা ঃ শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা ঃ শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম** পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যাণ্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি** খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্‌হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ** সেক্টর-১বি, বোকারো স্টিল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি** বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ** কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার
- **চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়** কোয়ার্টার নং ২৮/এস, ওয়েস্টল্যাণ্ড, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি খামারিয়া, জব্বলপুর-৪৮২০০৫, ফোন ঃ ০৭৬১-২৪৩০২০৬

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **এম. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি ডি. নাম্বার ঃ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এ/৭, রচনা সোসাইটি বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড ভালসাড-৩৯৬০০১, ফোন ঃ ০২৬৩২/২৪২৩৭৩ ই. মেল ঃ pkmukrji@yahoo.com

রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

শ্রীরামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ গাহ নাম।
শ্রীরামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জপ নাম।।
চরণধ্যান কর নিয়ত, স্মরণ কর মুরতি তাঁর
প্রেমমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রেমময় নাম যাঁর।
"যেই রাম যেই কৃষ্ণ"—"শ্রীরামকৃষ্ণ নাম এবার"
"জীবে শিব কর জ্ঞান"—অমৃতময় বাণী তাঁর।
"যত মত তত পথ"—"এক লক্ষ্য অনেক নাম"
আমি শরণ যাচি চরণে তাঁর—শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তিধাম।।

If you can but follow one of the Master's teachings, you get everything.

Sri Ma Sarada Devi

Call on the Lord who pervades the entire Universe. He will shower His blessings upon you.

Sri Ma Sarada Devi

সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

মদীয় আচার্যদেবের [শ্রীরামকৃষ্ণের] জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্মের মধ্যে যে মূল ঐক্য রহিয়াছে তাহা ঘোষণা করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

The knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge.

Sri Ramakrishna

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' বেশি মূল্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ

"বলতে পার কোন্ অধিকারে মানুষ মানুষের প্রাণ সংহার করে? প্রাণ নেওয়ার পর—তা কি ফিরিয়ে দিতে পার? যা নেওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই—তা নেওয়ার অধিকারও তোমার নেই।"

—শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর (ভগবানের) উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এসব কর্মের বেশি দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

শারদীয় অভিনন্দন :—

মনে ভাববে—আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।
শ্রীমা সারদাদেবী

Call on the Lord who pervades the entire Universe. He will shower His blessings upon you.

Sri Ma Sarada Devi

জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত চিররঞ্জন বিশ্বাস প্রায় ৮০ বছর বয়সে (বাড়ি—বিলা, রোড চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর) গত ৮ই ডিসেম্বর ২০০০, শুক্রবার, সকাল ৬টায় রামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডলি বিশ্বাস

রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়

মানুষের মধ্যে যে-দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।
স্বামী বিবেকানন্দ

WORK IS WORSHIP.

Swami Vivekananda

মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে যান।

শ্রীমা সারদাদেবী

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা।
সাথে ফ্রি জীবনবীমা
আমার জন্য ভালো।
আমার পরিবারের পক্ষেও ভালো।

এ বা র এ লো

প্রকল্পের সময়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
ফ্রি জীবনবীমার* নিরাপত্তা

এত দারুণ সুযোগ তো কেবল পিয়ারলেসই দিতে পারে

• পাঁচ বছরের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম • মাসে ৫০০ টাকা করে অথবা ১০০ টাকার গুণিতকে জমান • মেয়াদ পূর্তিতে ৫.৮০% কার্যকরী সুদ • মেয়াদপূর্তির আগে এক বছর পর টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ • আপনার পরিচিত, নির্ভরযোগ্য পিয়ারলেস এজেন্ট আপনার বাড়িতে আসবেন। লাইনে দাঁড়ানো নেই। দেরী হবে না • কোন ডাক্তারি পরীক্ষা লাগবে না • প্রত্যেক ডিপোজিটারের জন্য বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস্ কার্ডএর সুবিধা।

Contrad 0703 (B)

*arranged through Allianz
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, 'পিয়ারলেস ভবন', ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

আপনার কাছের পিয়ারলেস এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা যোগাযোগ করুন : ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : কলকাতা (০৩৩) ২২৪২ ০৮০৯/১০০১/১৫৫৪ • নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : গুয়াহাটি (০৩৬১) ২৫২ ৩৮৭৮/২১৪৬ • নর্দার্ন রিজিওনাল অফিস : নিউ দিল্লী (০১১) ২৩৩৪ ৬৪২১, ২৩৭৪ ৪৮৬৯ • ওয়েস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : মুম্বাই (০২২) ২২৮২ ৫৮০৭, ২২৮৮ ২০৮৯, ২২৮৪ ৬০৯৬ • সাউথ সেন্ট্রাল রিজিওনাল অফিস : হায়দ্রাবাদ (০৪০) ২৭৬১ ৭১৭৬/৭১৭৭, ২৭৬৪ ৪৪০২, ২৭৬০ ২২৪৩ • সাদার্ন রিজিওনাল অফিস : চেন্নাই (০৪৪) ২৮৫৩ ০৩৩২/৫৩২৬

* শর্তসাপেক্ষে

www.peerless.co.in

Statutory advertisement published in GANASHAKTI and BUSINESS STANDARD on 04 07 2003

UDBODHAN
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone : 2554-2248, 2554-2403

Vol. 105
No. 9
SEPTEMBER
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N 8793/57
Postal Regn. No. MM&PO-WB/RNP-15/2003

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) 'উদ্বোধন' ১০৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✿ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✿ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✿ 'উদ্বোধন'-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০৩-এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল - বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন — এই প্রার্থনা।

✿ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor**, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফট পাঠাবেন।

সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৫

কার্তিক ১৪১০ ■ ১০ম সংখ্যা

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

Stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny. All the strength and succour you want is within yourselves. Therefore make your own future.

Swami Vivekananda

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৫।।

১০৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৪১০ অক্টোবর ২০০৩

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ **১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই **যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

উর্ধ্বে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতরদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য।।

—হে ত্রিলোকের পাপনাশিনি, প্রকাশিতদশনে (প্রকাশিত দন্ত) মা! তোমার 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং' মন্ত্র এবং 'দক্ষিণে কালিকে' নাম জপ করতে করতে তোমার উর্ধ্ব বামহাতে কৃপাণ, নিম্ন বামহাতে ছিন্নমুণ্ড, উর্ধ্ব ডানহাতে অভয় ও নিম্ন ডানহাতে বরমুদ্রা যারা ধ্যান করে, শিবের অষ্টসিদ্ধি তাঁদের করায়ত্ত হয়ে থাকে।

☆

বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিললিতং তত্ত্রয়ং কূর্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি।।

—হে সহাস্যবদনে, মদনান্তকমোহিনি মা! যারা তোমার স্বরূপ চিন্তা করতে করতে র-কার বিশিষ্ট এবং চন্দ্রবিন্দু ও ঈ-কার শোভিত ক-কাররূপ 'স্বাহা' যোগ করে জপ করে অর্থাৎ 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁং হুঁং হ্রীং হ্রীং স্বাহা'—এই মন্ত্র জপ করে, তারা লক্ষ্মীর লীলাকমল পত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট এবং ইচ্ছানুযায়ী দেহধারণে সমর্থ হয়।

☆

প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
তন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে
বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে।।

—হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে, স্বপ্রকাশস্বরূপিণি দেবি! যারা সর্বদা তোমার ধ্যানপূর্বক তোমার নামের সঙ্গে অতি গোপনীয় একটি, দুটি বা তিনটি বীজ সংযুক্ত করে কিংবা তোমার সমগ্র বীজসমন্বিত মন্ত্রটি জপ করে, তাদের নয়নকমলে লক্ষ্মী ও চন্দ্রবদনে সরস্বতী বিরাজ করেন।

(দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্, ৪-৬)

চার্বাকদর্শন, শিক্ষা এবং র‍্যাগিং

রাষ্ট্র বা মনুষ্যজীবনের পাঁচটি মূল প্রয়োজন—আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। যে-রাষ্ট্রে মানুষের এই পাঁচটি উপাদানের যথেষ্ট সরবরাহ আছে, উহা উত্তম রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হয়। সনাতন ধর্মে রাষ্ট্রের ধারণা কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। ভিন্নতর না বলিয়া ব্যাপকতর বলাই যুক্তিযুক্ত। সেখানে শিক্ষাই প্রথম। এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে ধরিয়া লইয়াই ‘ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ’কে মনুষ্যজীবনের মূল প্রয়োজন বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। পশুসমাজে ধর্ম-অর্থ ইত্যাদি মূল প্রয়োজন হইতে পারে না। মানুষ পশু নহে বলিয়াই মনুষ্যসমাজের মূল প্রয়োজন ভিন্নতর। তাহার পরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ মোক্ষ। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্যই বাকি তিনটি উপাদানের প্রয়োজন। তাই ধর্ম, অর্থ, কামকেও ‘পুরুষার্থ’ বলিয়াই চিহ্নিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সংহিতা বা পুরাণে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির যেসকল বর্ণনা আছে তাহার সারাংশ স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় বিধৃত রহিয়াছে। নিজের অভিমত স্বামীজী প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ “আমার বিশ্বাস, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলে কোনরকম শিক্ষাই হতে পারে না।” এই গুরুগৃহবাসেরই আধুনিক রূপ ‘ছাত্রাবাস’ বা ‘বোর্ডিং’ বা ‘হস্টেল’। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? স্বামীজী বলিলেন ঃ “যাতে character form হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে—এইরকম শিক্ষা চাই।” শিক্ষা কি নয়? স্বামীজীর ভাষায় ঃ “মাথায় কতগুলো তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, সেগুলো হজম না হয়ে চিরকাল এলোমেলো বিশৃঙ্খলভাবে সেখানে ঘুরপাক খেতে লাগল—একে শিক্ষা বলে না।” স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ কতটা বাস্তবসম্মত কিংবা উহা কতটা বাস্তবায়িত হইতে পারে বা হইয়াছে সেপ্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং তাহার অবস্থা লইয়া কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চারজন ছাত্র এক নবাগত ছাত্রকে ‘র‍্যাগিং’ করিয়াছে। এইপ্রকার ঘটনা সাধারণত কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া র‍্যাগিং-বিলাসী ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত থাকে। এক্ষেত্রে ঘটনা এতদূর গড়াইয়াছে যে, অভিযুক্ত ছাত্রচতুষ্টয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরে জামিনে মুক্তি পাইলেও বিচারক নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহাদের স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়া নিত্য প্রার্থনাদি করিতে হইবে। আজকাল কারাগারকে ‘সংশোধনাগার’ বলা হয়। এক্ষেত্রে বিকৃতচরিত্র বা বিকৃতমস্তিষ্ককে সংশোধন করিবার এই প্রয়াসের জন্য বিচারক যথার্থই আন্তরিক এবং অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। অবশ্য কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি জানাইয়াছেন সোচ্চারে। বরং মিশনের সেবামূলক কার্যে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের যুক্তি তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেও সান্ধ্য প্রার্থনাতে যোগদানের ন্যায় মামুলি ‘নির্দেশ’-এ বিশেষ কিছু ফললাভ হইবে না বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস। ইঁহারা চার্বাকপন্থী কিনা বলিতে পারি না, তবে বস্তুবাদী। ভারতবর্ষে চার্বাকপন্থীগণ বহুকাল পূর্ব হইতেই ছিলেন এবং এখনো আছেন। এবং যথার্থ চার্বাকগণের ঐহিক দর্শনের তীব্রতার নিকট এই ‘মাইক্রোসফ্‌ট’-এর যুগের বস্তুবাদিতাও যেন লঘু বলিয়াই মনে হয়। সেপ্রসঙ্গে পরে আসিতেছি।

কিন্তু ছাত্রসমাজের এই উন্মার্গগামিতার মূল কোথায়? মূলীভূত সেই কারণ অনুসন্ধান এবং কি করণীয় তাহা নির্ধারণ করা বিচারকের দায়িত্ব নহে। তাহা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের শিক্ষানীতি-পরিকল্পনাকারিগণের এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদে আসীন প্রশাসকবৃন্দের। বৃক্ষের পত্রে পত্রে বারিসিঞ্চন করিয়া কিছু ফল হইবে না, সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র।

র‍্যাগিং-এর পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোধকরি এখনো নির্ধারিত হয় নাই। কারণ, অতীতে যাঁহারা র‍্যাগিং করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন দেশের কর্ণধাররূপে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে পদাসীন। তাঁহারা নিজ নিজ গৌরবময়(?) অতীতের স্মৃতিচারণ করিয়া বলেন: "আমরা র‍্যাগিং-এর শিকার হইয়াছিলাম, নিম্ন শ্রেণির ছাত্রদের আমরাও র‍্যাগিং করিয়াছি—এইভাবেই চলিতেছে এবং চলিবে।" এক অর্থে কথাটি ঠিক, কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ এই 'র‍্যাগিং'-এর যে ঐতিহ্যময়(?) ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সহসা বন্ধ হইবার নহে। অপরপক্ষে প্রশ্ন একটাই। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ এবং সুচিন্তিত প্রয়াস ও প্রয়োগপদ্ধতির সাফল্যে একসময়ে এই 'র‍্যাগিং' সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া পারস্পরিক অসূয়া একদিন সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও স্নেহে রূপান্তরিত হইবে—একথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিভাবে তাহা হইবে বস্তুবাদিগণ সেকথা ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। কারণ, 'টাকা'ই যেখানে সর্ববস্তুর পরিমাপক, সেখানে প্রেম-প্রীতির পরিমাপ 'টাকা'র সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই 'কনজিউমারিজম্'-এর সাফল্য—সভ্যতার বিস্তারে, ব্যর্থতা—সভ্যতার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায়। আজকের 'ই-কমার্স' এক অবিশ্বাস্য ধ্বংসের দিকে মনুষ্যজাতিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—তাহা আধুনিক চার্বাকপন্থীগণ দেখিতে পাইতেছেন কি? র‍্যাগিং-এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পূর্বে চার্বাকদর্শনের সারকথাটি বলিয়া লইলে মন্দ হয় না।

চার্বাকদর্শন: কেহ কেহ বলেন, চারু (সুন্দর) বাক্ যাহার, সে-ই চার্বাক। কেহ বলেন, বৃহস্পতির (অপর নাম চারু) উচ্চারিত বাক্যই চার্বাক। আবার কেহ বলেন, 'চার্বাক' নামে এক মুনির শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ যে-দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই চার্বাকদর্শন। বেদান্তদর্শনে তিনপ্রকার 'প্রমাণ' (method of knowledge) স্বীকৃত হয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম। অগ্নিতে হাত পুড়িলে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইল অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। আকাশের রঙ নীল—ইহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা কিছু অনুভব করি, তাহাই 'প্রত্যক্ষ-প্রমাণ'। অনুমানের দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় তাহা 'অনুমান-প্রমাণ'। ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম রাস্তা ভিজা। অতএব অনুমিত হইল, বৃষ্টি হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না, তাহাকে 'আগম-প্রমাণ' (শাস্ত্র-প্রমাণ) বলিতে পারা যায়। 'আত্মা' অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, প্রেমস্বভাব। এই কথাটি প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। অতএব উহা শাস্ত্র-প্রমাণ বা আগম-প্রমাণ।

চার্বাক বলেন, প্রত্যক্ষ-ই একমাত্র প্রমাণ। যাহা দেখি না, শুনি না ইত্যাদি—তাহার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারটি মৌলিক পদার্থ ব্যতিরেকে বিশ্বে অপর কোন বস্তু নাই। কাম ও কাঞ্চনই জীবনের একমাত্র উপজীব্য বা পুরুষার্থ। ['প্রমাণমেকং প্রত্যক্ষং তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্'—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।] এই কাম ও কাঞ্চন-জনিত সুখই স্বর্গসুখ। ইহার বাহিরে স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই। কণ্টকাদিজনিত দুঃখ, শূলবেদনাজনিত দুঃখই নরক। নরক বলিয়া পৃথক কিছু নাই। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম, অধর্ম, কর্মফল ইত্যাদি সবই অলীক পদার্থ। মৃত্যুই মুক্তি।

মদ্যপান করিলে মাদকতা বা নেশা হয়। মদ্য যেসব উপাদানে তৈরি, সেগুলি ভক্ষণ করিলে মাদকতা আসে না। অথচ ঐসব উপাদান একত্র মিশাইলেই মাদকতা আসে। সেইরূপ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ (অগ্নি) ও মরুৎ (বায়ু) বিশেষ অনুপাতে একত্র মিশ্রিত হইলেই আত্মা বা চৈতন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। 'আত্মা' বলিয়া আলাদা পদার্থ কিছু নাই। উহা বস্তুর গুণ মাত্র। অতএব দেহই আত্মা, চৈতন্য দেহেরই ধর্ম।

প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অধিক কোন প্রমাণ নাই বলিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব শাস্ত্রে যাহাকে 'আত্মা' বলা হইয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে—এই দেহই আত্মা। এই কারণে 'জন্মান্তর' বলিয়াও কোন বস্তু বা ব্যাপার নাই। এই জন্মই সারকথা। যাহা কিছু ভোগ এই জন্মেই করিতে হইবে। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—দেহ ভস্মীভূত হলে আর কি পুনরাগমন হয়? বোকা লোকেই পুনর্জন্মের কথা চিন্তা করিয়া থাকে।

চার্বাকপন্থী বলেন, জীবের স্বভাবই হইল অপরকে দাবাইয়া নিজে বড় হওয়া। সুতরাং মারদাঙ্গা খুনোখুনি অবশ্যম্ভাবী। বনে সিংহ অন্য পশুকে দাবাইয়া স্বয়ং রাজা হয়। পথের কুকুর প্রতিবেশী কুকুরসমূহকে দাবাইয়া নিজে বড় হয়। সভ্য মনুষ্যজাতি অসভ্য মানুষকে অত্যাচার করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ধনী ব্যক্তি নির্ধনকে পদদলিত করিয়া আপন মহিমা বৃদ্ধি করে। সুতরাং 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" অর্থাৎ ঋণ করিয়া ঘি খাইবে, যতদিন বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে। যদি কেহ সুখলাভে বঞ্চিত হয়, উহা তাহারই অকৃতিত্ব। নিজের সুখবৃদ্ধির জন্য অন্যের প্রাণনাশের প্রয়োজন হইলে তাহাই করিবে। শারীরিক ইন্দ্রিয়পিপাসা চরিতার্থ হইয়া গেলে সেখান হইতে সরিয়া পড়িবে। কারণ, সেখানে থাকিলে তোমার সুখের হানি হইবে, হয়তো পুলিশ আসিয়া হাতকড়া লাগাইবে।

সকলেই পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চায়। চার্বাকপন্থীগণ মনে করেন, জীবের 'স্বভাব' হইল স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করাই স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা সেইখানে, যেখানে যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়চারিতার কোন নিষেধ নাই। নারীস্বাধীনতা কাহাকে বলা হইবে? যেখানে নারীগণ যাবতীয় ঐহিক সুখের জন্য সকলপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। এই স্বাধীনতালাভের জন্য বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই, উপরন্তু ঐসকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যও নাই, কারণ উহারা পরস্পরবিরোধী। কতকগুলি ধূর্ত ব্যক্তি ঐসকল শাস্ত্র রচনা করিয়া মানবসভ্যতার মূলোচ্ছেদ করিবে ভাবিয়াছিল। তাহারা জানিত না যে, তাহাদের অপেক্ষাও ধূর্ত ব্যক্তি জগতে জন্মিয়া থাকে। জাতিভেদ-প্রথা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া—সবই সেইসব ধূর্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্বকপোলকল্পিত বিষয়মাত্র। দেহজাত সুখ ছাড়িয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহসা উপবাস, সংযম, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইবে?

যদি বলা হয়, কাম-কাঞ্চনজনিত কিছু সুখ আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা দুঃখই যেন বেশি। চার্বাকগণ তাহার উত্তরে বলিবেন, মাংসভক্ষণ করিতে গেলে হাড়গোড় কিছু থাকিবেই। শুভ্র তণ্ডুলের সুবাসিত অন্ন ভক্ষণ করিতে গেলে তুষাদি বর্জ্যবস্তুর ভয়ে উহা ভক্ষণ করিব না বলিলে চলে না। গৃহনির্মাণকার্যে দুঃখ আছে বলিয়া কি কেহ মুক্ত অম্বরতলে বাস করে? যেটুকু দুঃখভোগ না করিলে সুখ ভোগ করা যায় না, মানুষ সেটুকু দুঃখভোগ স্বীকার করিয়াই জীবিত থাকে। অতএব কাম-কাঞ্চনজনিত সুখ ত্যাজ্য নহে। সুতরাং কণ্টকাদিজনিত দুঃখ (unwanted suffering)-ই নরক, কাম-কাঞ্চনাদি সুখই স্বর্গ এবং লোকপ্রসিদ্ধ রাজা প্রভৃতিই ঈশ্বর বা ভগবান (অর্থাৎ বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ ক্ষমতাধর ব্যক্তিই ঈশ্বর!!)।

চার্বাকগণের মধ্যে স্থূলবুদ্ধি চার্বাক এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি চার্বাকগণ আছেন। স্বভাব অনুযায়ী মানুষ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে, দস্যুবৃত্তি এবং রাজাদিগের তোষামোদ করিয়া আপন সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে—একথা স্থূলবুদ্ধি চার্বাকগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উন্নততর চার্বাকদর্শনও আছে, যেখানে অনুমান-প্রমাণকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এবং শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সেখানে শিল্প-সঙ্গীত ইত্যাদি জনিত সুখকে শারীরিক সুখাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলা হইয়া থাকে। এই চার্বাকদর্শনে কাম-কাঞ্চন ভোগের সহায়ক হিসাবে শিল্প, কলা, সঙ্গীতাদির পরিপোষক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু সকল চার্বাকপন্থী বিশ্বাস করেন, দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা দুশ্চর তপস্যা, জপ, ধ্যান, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা জন্মান্তরের সুখের জন্য লোককে প্রবৃত্ত করায়—তাহারা মহাপ্রতারক। আর যাহারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে—তাহারা অতি মূঢ় ব্যক্তি।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং 'আকাশে নক্ষত্র নাই'—এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর ও অবাস্তব। দর্শনশাস্ত্রের প্রকারভেদ অনুযায়ী সর্বনিম্নে চার্বাকদর্শনের অবস্থান—সারা ভারতবর্ষেই এই রীতি বিদ্যমান। কারণ, 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ'—এই কথাটিই শিশুসুলভ, হাস্যকর ও অবাস্তব।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতি বস্তুত প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-প্রমাণের উপর সমভাবেই নির্ভর করিতেছে। পদার্থবিজ্ঞানের শতকরা নব্বইভাগ সিদ্ধান্তই অনুমান-নির্ভর। [Red-shift ইত্যাদির কোনটিই প্রত্যক্ষ নহে], সুতরাং বৈজ্ঞানিক শ্রীরামকৃষ্ণের অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করা যায় না!

অথচ এই একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যেন এই চার্বাকী সিদ্ধান্তেই সর্বাধিক আস্থাবান! ইহার কারণ মনে হয়, আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং পাশ্চাত্যের উন্নত মানের জড়বিজ্ঞানের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত। আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও যে সামাজিক চিত্র ছিল, মূলত গ্রামবাংলা বা শহর-বাংলার কথাই বলিতেছি, তাহা যেন আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ স্কুল-পড়ুয়া বালক-বালিকাবৃন্দ হাতের মোবাইল ফোন হইতে বন্ধু-আত্মীয়বর্গকে ঘন ঘন 'মেসেজ' প্রেরণ করিয়া থাকে, কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে মাতাপিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের অবস্থা যেন পশুশালার খাঁচাবন্দীর ন্যায়!

র‍্যাগিং-এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ এমতাবস্থায় চার্বাকদর্শনের ব্যাপৃতি কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। র‍্যাগিং-এর পশ্চাতেও এই চার্বাকদর্শন ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। "র‍্যাগিং করিলে 'সিনিয়র' ও 'জুনিয়র'-এর মধ্যে আত্মীয়তার বৃদ্ধি ঘটে"—এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে। বস্তুত, স্নেহ ও প্রেমসহায়ে যে অপরকে কাছে টানিতে পারে না, তাহার জন্য 'র‍্যাগিং' নামক শারীরিক অত্যাচার জাতীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া অপরকে নিকটে টানিবার আর কি পদ্ধতিই বা থাকিতে পারে? প্রতিপক্ষ যদি প্রবল হয়, তখন তাহাকে দাবাইবার জন্য দলবদ্ধভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা

দুর্বলতারই পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দ মোটেই শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্বল প্রতিপক্ষ ছিলেন না। কিন্তু 'এল ও ভি ই'-র মূর্তরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা নরেন্দ্রনাথকে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ঃ "দাস তোমা দোঁহাকার, জনমে জনমে।" স্বামীজী বলিতেন, অন্যের উপর অত্যাচার করা দুর্বলতার পরিচয়বাহী। যাহারা র‍্যাগিং করিতেছে, তাহারা নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে। যে যথার্থ শক্তিধর, ক্ষমাই তাহার মনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। একটি পিপীলিকা দংশন করিবামাত্র তাহাকে পিষিয়া হত্যা করার মধ্যে কোন বাহাদুরি নাই, কারণ মানুষ পিপীলিকা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শক্তিশালী। কাল্পনিক ও ভুতুড়ে গল্পের অবতারণা করিয়া নবাগত একটি ভীত-সন্ত্রস্ত ছাত্রের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করিয়া কেহ কখনো বীর বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিবে না। ব্যক্তিগত স্তরে র‍্যাগিং ক্রমে সমষ্টিগত স্তরে রূপান্তরিত হয়, যখন নবাগত ছাত্র প্রতিবাদ করিয়া জ্যেষ্ঠ ছাত্রের আদেশ অমান্য করে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের সেই ছাত্রের এমন ক্ষমতা নাই যে, নবাগতকে ভালবাসিয়া তাহাকে দিয়া যথেচ্ছ কাজ করাইবে—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দিয়া করাইয়াছিলেন। তখন সে আরো পাঁচটি বন্ধুকে ডাকিয়া দলবদ্ধভাবে এই নবাগতকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এবং নবাগতের অসহায় দৃষ্টি, বেদনা-বিকৃত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহাদের মন পাশব আনন্দে পুলকিত হয়। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না, যথার্থ বীর, যথার্থ প্রেমিক মানুষের চক্ষে তাহারা দুর্বল কাপুরুষমাত্র বলিয়াই চিহ্নিত হইবে চিরকাল।

একদা কোন বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বলিয়াছিলেন ঃ "ক্যাম্পাস-ইন্টারভিউতে আমরা সাধারণত খড়্গপুর আই. আই. টি বা সমগোত্রীয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হইতে বেশি ছাত্র মনোনীত করিয়া থাকি।" কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "ঐসকল প্রতিষ্ঠানে 'সিনিয়ার' ছাত্ররা 'র‍্যাগিং' করিয়া 'জুনিয়ার' ছাত্রদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দেয়। এবং 'জুনিয়ার' ছাত্রগণ 'প্রতিবাদ করা' ব্যাপারটি ভুলিয়া যায়। অত্যন্ত অনুগত হয় বলিয়া এইসকল ছাত্রের দ্বারা আমাদের ব্যবসায়ে অন্তবর্তী বিরোধিতার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আমরা যেমন চালাইতে চাহি তেমনি চলে।" অর্থাৎ প্রজাকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিবার সেই আদিম ইংরেজ-শিক্ষানীতি এখনো প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

এবং ইহার পশ্চাতে অভিভাবক এবং শিক্ষককুলের নিষ্ক্রিয়তা বা মৌন সম্মতি ছাত্রসমাজকে ক্রমশ মনুষ্য হইতে মনুষ্যেতর স্তরে ঠেলিয়া দিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন ঃ "মনের একাগ্রতা সাধনই শিক্ষার প্রাণ।" বর্তমান শিক্ষানীতিতে কখনো 'মনের একাগ্রতা সাধনের শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অলিম্পিক গেমস-এ যাহারা অংশগ্রহণ করে তাহাদের ধ্যান-সাধন পৃথগ্‌ভাবে শিখিতে হয়। যাহারা ডাইভার, তাহারা ইভেন্টে অংশগ্রহণের পূর্বে নিদেনপক্ষে অর্ধঘণ্টা ধ্যান করিয়া থাকে!

আধুনিক বঙ্গসমাজে ছাত্রের মন যত বেশি বহির্মুখী হইয়া থাকে, শিক্ষক, অভিভাবকগণ ততই সুখী হইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যেসব অভিভাবক বা শিক্ষক যথার্থই ছাত্রদরদী, তাঁহারা প্রাণপণে সাবধান করিতে থাকেন। কিন্তু 'কাকস্য পরিদেবনা'! কে কাহার কথা শোনে! "দোষিগণকে নিত্য প্রার্থনায় যোগদান করিতে হইবে"—আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাইবার লোকসংখ্যা তাই নগণ্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন ঃ "আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ ঘৃণাভরে বলিয়াছিলেন ঃ "এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া! তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে।... কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে সরল হয়, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ওকথা কেউ বলবে না।... চিল-শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর! পণ্ডিত অনেক বই-শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়তে পারে, কি বই লিখেছে; কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করেছে। সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি? কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল 'ঈশ্বর', 'ঈশ্বর' করছে; পাগলা! এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি—টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। কাকও মনে করে—আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে! কাক দেখো না, কত উড়ুরপুড়ুর করে, ভারি স্যায়না! (সকলে স্তব্ধ)" অর্থাৎ 'র‍্যাগিং'কারী ছাত্রদের চালাকির দৌড় ঐ মহাবিদ্যালয়ের ফটক পর্যন্ত। উহার চৌহদ্দি পার হইয়া যখন সংসারে ঢুকিবে, তখন তাহাদের সকল বীরত্ব অতীত-গৌরব হইয়া আজকের এই সমাজ সৃষ্টি করিবে, যেখানে তথাকথিত 'সভ্য'দের দৌরাত্ম্যে সভ্যতার সমাধি হইতেছে। ❑

সমসাময়িক সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দ

'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য, সেই বছরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। এর ৩০ বছর পর শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক আবির্ভাব। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের সংবাদ ভারতের যেসকল প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তখন বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অগ্রগণ্য। সেখানে প্রকাশিত একটি পত্র অনূদিত আকারে এখানে উপস্থাপন করা হলো। *অনুবাদক : জয়দীপ ঘোষ*

ইণ্ডিয়ান মিরর, ২২ এপ্রিল ১৮৯৪

সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

এটা লক্ষ্য করে আমার খুব খারাপ লাগছে, স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্য খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্মমহলে ব্যাপক ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে এবং তার জন্য তাঁরা মনে মনে জ্বালা অনুভব করছেন। তাঁরা স্বামীজীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টাও চালাচ্ছেন। স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে তাঁরা মৌখিক এবং লিখিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা একটি হেরে যাওয়া যুদ্ধেই লড়াই করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমানে এক প্রবল শক্তিস্বরূপ। তাঁর সংস্কৃতিমনস্কতা, তাঁর বাগ্মিতা এবং তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সমগ্র পৃথিবীকে আজ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা দিয়েছে। আমেরিকার সমস্ত সংবাদপত্র আজ দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিয়েছে, তিনিই ছিলেন ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং দার্শনিক গভীরতা তথা চিন্তার স্বচ্ছতার বিচারে কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুধর্মের এই যোগ্য এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রচার-কার্যের জন্য সমগ্র ভারতবাসীরই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম সেই বিদেশের মাটিতে হিন্দুধর্মের সত্য এবং প্রকৃত ধারণাটি উন্মোচিত হলো, যেখানে বিশিষ্ট খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দুদের চিরকাল 'হিদেন শয়তান' বলে এসেছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর মুদ্রিত এবং প্রচারিত বক্তৃতাসমূহ এক-একটি মহামূল্যবান রত্নস্বরূপ। এগুলি গভীরভাবে পাঠ, অনুধ্যান এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যই এক-একটি চিন্তার সংগ্রহমন্দির এবং একথা ভাবলে অবাক হতে হয় যে, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি কীভাবে সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন!

বিবেকানন্দের ধর্ম স্বর্গের মতো মহিমময় এবং হিন্দুধর্মের আদর্শই তাঁর আদর্শ। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের তথা বিস্ময়করও বটে যে, ধর্মমহাসভার জনৈক বক্তা—যিনি তরুণ প্রজন্মকে নৈতিকতার উপদেশ দিলেন—শুরু থেকেই এসম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার করে গেলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ-প্রতিনিধি শ্রীধর্মপালের দ্বারা কীভাবে তাঁদের মিথ্যাচারিতা ধরাও পড়ে গেল। হিন্দুধর্মের প্রত্যেক দার্শনিক তত্ত্বের অতি মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ অতি স্বল্প পরিসরে, অতি মনোময় ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করেছেন। প্রত্যেক হিন্দু—যাঁদের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান আছে—অনুভব করতে পারবেন যে, বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান কত অনুপম এবং গভীর। শ্রীধর্মপাল যথার্থই বলেছেন, ইংরেজি ভাষায় তাঁর অপরিসীম দখল, ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর অতীব সহিষ্ণুভাব এবং তাঁর আশ্চর্য আত্মত্যাগ শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত।

সম্প্রতি আমরা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এ প্রকাশিত এক স্কুলছাত্রসুলভ সমালোচনা লক্ষ্য করেছি। প্রতিবেদনটি অতি হাস্যকর এই কারণে যে, সম্পাদক মহাশয় 'শকুন্তলা' এবং 'মেঘদূত' থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দুর্জ্ঞেয় বৈদিক মতবাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে দ্বিধাবোধ করেননি!

ইতোপূর্বে, স্বামীজী খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করেছেন—এই অভিযোগ তুলে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরণ করেছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, উক্ত পত্রিকার [ইণ্ডিয়ান নেশন] সম্পাদক মূল ভাষণটি না শুনেই বিচারকের আসন গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর ভাষণে এরূপ একটি বাক্যও নেই, যার দ্বারা অন্য কোন ধর্মকে আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতার প্রতীক। তিনি সকল ধর্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ভাষণ গোঁড়ামি ও অলীক বিশ্বাসের প্রতি এক মৃত্যুবাণের মতো। ঈর্ষা আর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ যা খুশি তাই বলতে পারে, কিন্তু স্বামীজীকে এজাতীয় নিন্দা করার অপচেষ্টা আসলে পাথরে নিষ্ফল মাথা ঠোকার মতো। মাদ্রাজ ও বোম্বাই স্বামীজীর মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং আমেরিকা তো বর্তমানে তাঁর পূজা করছে। এবার তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় গর্বে সামিল হওয়ার পালা বঙ্গদেশের। বিবেকানন্দ যে চমকপ্রদ সমাদর লাভ করেছেন, তার জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই গর্ববোধ করা উচিত। সম্পাদক মহাশয়, আমি এটা দেখে খুবই আনন্দলাভ করছি যে, আপনি এই প্রশংসনীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সর্বসাধারণের অবগতির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

ইতি

ভবদীয়

TRUTH

(Correspondence)

স্বামী সুবোধানন্দের দুখানি পত্র

১৯২৭ সালে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে* লিখিত

১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শুক্রবার, ২৪ অগ্রহায়ণ
B-24 Doranda Menoo P.O.
Ranchi, B. N. Rly

শ্রীমান কালীপ্রসন্ন—

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে একটা কাজ নিয়ে থাকা খুব ভাল। জগন্নাথ কলেজের একজন প্রফেসর নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মাইজ্‌পাড়ায় বাড়ি, তুমি তাহাকে আমার নাম করিয়া বলিবে, খোকা মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছে তোমাদের বাড়ির সকলে কেমন আছেন? বোধ হয় মহাপুরুষ এতদিনে বোম্বাই মঠে পৌঁছিয়াছেন, তিনি তোমাকে যেমন বলিয়াছিলেন, তুমি সেইমতো শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিন্তা করিবে ও আন্তরিক প্রার্থনা করিবে। মঙ্গলময় নিশ্চয়ই তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। আজকাল শৈলেশ কোথায় আছে ও কেমন আছে জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। শ্রীমতী গুরুদাসীদের বাসার সকলকে জানাইবে। শ্রীমতী কুন্তলার ছেলেটি কেমন আছে? টিকেটুলি মঠের সকলকে আমার ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানাইবে। এখান হইতে ১৬/২০ দিন পরে পাটনা যাইবার ইচ্ছা। এখন শারীরিক ভাল আছি। সকলের কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের **সুবোধানন্দ**

২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

মঙ্গলবার। পাটনা
22.2.27

শ্রীমান কালীপ্রসন্ন—

তোমার পত্র আমি এখানে পাইয়া সকল সমাচার অবগত ও সুখী হইলাম। ইন্দুবাবু পাটনাতে আছেন, শীঘ্রই রাঁচিতে যাইবেন। তাঁর কাছে তোমার কাজকর্ম সম্বন্ধে বলিলাম, তিনি বলিলেন এখন তো কোন কাজকর্ম দেখি না, আর যখন কোন কাজ পড়ে এইসব দেশের লোককে দেয়। আমি আজকাল ভাল আছি, শীঘ্রই ৺কাশীর মঠে যাইব, এখন মধ্যে মধ্যে ভাত একবেলা খাই। গতকল্য রাত্রে এখানে বৃষ্টি হইয়াছিল, আজ ভোরেও বৃষ্টি ছিল। আকাশ মেঘলা আছে হয়তো আরো বৃষ্টি হইবে। গুরুদাসীদের বাসার শ্রীমতী কুন্তলার ছেলেটির কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তার এই প্রথম সন্তান ছিল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। ভগবানের হাত, যিনি দেন, তিনি নেন, মানুষের হাত নাই মানুষ শুধু কাঁদিবার ভাগি। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। শ্রীমতী গুরুদাসীদের জানাইবে ও মিশনের সকলকে জানাইবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

৺কাশীর ঠিকানা দিলাম—রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। লক্‌সা। বেনারস সিটি, পোঃ। U.P.

পুঃ—গুরুদাসীর মার সহিত দেখা করিয়া আমার কথা জানাইবে, অনেকদিন তাঁহাদের আমি পত্র লিখিতে পারি নাই তবে সংবাদ পাইতাম। আমি সংবাদ পাইয়াছি, মহাপুরুষ মহারাজ বোম্বাই মঠে, শারীরিক ভাল আছেন, শীঘ্রই তিনি নাগপুরে আসিবেন, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া পরে জামশেদপুরে আসিবেন, তারপর বেলুড় মঠে আসিবেন। এখানে লোকমুখে শুনিলাম, আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো আশ্রমের প্রকাশানন্দ স্বামী ডায়াবিটিস অসুখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সমস্ত সংবাদ বেলুড় মঠ হইতে এখনো আমি পাই নাই। তোমরা কিছু সংবাদ পাইয়াছ কি?

affly yours
Subodhananda

* ঢাকার নিকটস্থ উয়াড়ী-নিবাসী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যার পর

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

শ্লোকার্থঃ *শ্রীভগবান কহিলেন, এই অবিনাশী যোগের বিষয়ে আমি [প্রথমে] সূর্যকে (বিবস্বান্) উপদেশ দিয়াছিলাম। সূর্য মনুকে ইহা উপদেশ করেন এবং মনু [স্বীয় পুত্র] ঈক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।*

ব্যাখ্যাঃ 'ইমং যোগম্' অর্থাৎ এই যোগ বা কর্মযোগ। আমি কি অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি, আমার স্বরূপের সঙ্গে দেহ-মন-বুদ্ধির সম্পর্কই বা কী—একথা জানিয়া লইয়া মনকে কোনরূপে উত্তেজিত হইতে না দিয়া ঈশ্বরের প্রতি মন সর্বদা নিবিষ্ট রাখিয়া কর্ম করাই যথার্থ 'কর্মযোগ'।

যেমন, ভৃত্য ষোল আনা মন দিয়া কর্ম করিল। কর্মান্তে টাকা লইয়া গৃহে ফিরিল—আরামে থাকিবে বলিয়া। গৃহে পরম আরামে থাকাই তাহার উদ্দেশ্য।

সকলেই কথায় কথায় নারায়ণবুদ্ধিতে সেবা করিবার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু চিৎ [নারায়ণ] কী, দেহ-মন-বুদ্ধির প্রক্রিয়াই বা কী, মানুষের অন্তরে নারায়ণ কোথায় বর্তমান আছেন ইত্যাদি না জানিলে যথার্থ সেবা কেমন করিয়া হইবে?

দেখিয়াছি, কাশীতে সেবকের দল নারায়ণসেবা করিতেছে। বলিতেছেঃ "এ্যাই নারায়ণ ওঠ, মুখ ধো!"—ইহার নাম নারায়ণসেবা!

স্বামীজীর আদেশে তাঁহার শিষ্যবর্গ তখন সকলে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এখন আর সেই দিন নাই। এখন সব বুঝিয়া-শুনিয়া সাবধানে চলিতে হইবে। নতুবা ঐ সেবাই সেব্যের নিকট অত্যাচারে পরিণত হইবে।

[**মন্তব্যঃ** এই শ্লোকে শ্রীভগবান সম্প্রদায়-স্তুতি করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী। গুরু-পরম্পরার মাধ্যমেই এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হয়। এই নিষ্ঠাদ্বয়াত্মক যোগ (অর্থাৎ সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ) মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া ইহাদের নাম অব্যয় যোগ।—**সম্পাদক**]

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

শ্লোকার্থঃ *হে পরন্তপ (অর্জুন), এই প্রকার [ক্ষত্রিয়] পরম্পরার দ্বারা প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। এই ভারতে সুদীর্ঘ কাল-প্রভাবে এই যোগ নষ্ট [লুপ্ত] হইয়াছে।*

ব্যাখ্যাঃ 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ কী? Science, দর্শন (Philosophy) প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা শিখি, অর্থাৎ যাহা কিছু তথ্য বা information আমাদের স্মৃতিকক্ষে প্রবেশ করে, দীর্ঘকালের অনভ্যাসে তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু এই যে যোগ-প্রক্রিয়ার কথা শ্রীভগবান বলিতেছেন, বুদ্ধির দ্বারা ইহার ধারণা হয় না। ইহা বোধে বোধ হয়। তাই মস্তিষ্ক দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু যাহা বোধে বোধ হইয়াছে তাহা অব্যয়—মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে উহার বিনাশ ঘটে না। [**মন্তব্যঃ** অর্থাৎ সেই অধ্যাত্মসাধনার সকল তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় যদিও নথিভুক্ত আছে, তথাপি মূল অধ্যাত্মসাধনাটি কাল-প্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে—ইহাই শ্রীভগবানের উক্তির অভিপ্রায়।—**সম্পাদক**]

প্রথমেই শ্রীভগবান সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। অর্জুন সেই সূর্যেরই বংশজাত। সুতরাং পূর্বপুরুষের অধিগত এই বিদ্যা অর্জুনের পক্ষেও যথেষ্ট সুগম ও সুসাধ্য হইবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

এই পূর্বপুরুষের ধারণা বা বংশগৌরব সকল দেশেই মানবজাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আছে। ক্ষত্রিয়গণের

মধ্যে এক অংশ সূর্য হইতে, অপর অংশ চন্দ্র হইতে জাত। আবার ব্রাহ্মণগণও এখন বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কেহ বলেন, তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র অর্থাৎ শাণ্ডিল্য মুনির বংশধর, কেহ বলেন তাঁহারা কশ্যপ হইতে জাত। অন্যান্য জাতির মধ্যে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তাহারা কেহ সিংহ হইতে, কেহ ব্যাঘ্র হইতে, কেহবা হস্তী হইতে জাত। এখনো বহু শিক্ষিত মানুষের উপাধি পশুর নামে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী জাতির অনেক মানুষ নানা পশু-পক্ষী, এমনকি বৃক্ষকেও নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়া জানে। ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও রামায়ণের পরমজ্ঞানী ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমানকে বাঁদর এবং মহামতি সুগ্রীবকে ভল্লুকের বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করেন! এক বংশ হইতে অপর বংশকে পৃথক করিবার জন্য এই অদ্ভুত উপায় চিরকালই অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। খ্রিস্টান পাদরিগণ সারা পৃথিবীর অসভ্য জাতির সহিত মিশিয়া এইরূপ অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ বংশপরিচয়কে 'টোটেম' বলিয়া থাকে।

মহাপুরুষগণ কোন প্রচলিত সংস্কার (কুসংস্কার হইলেও) ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন না, বরং উহার উৎসাহব্যাঞ্জক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সেই সংস্কার অবলম্বনে ঊর্ধ্বে উঠিবার একটি বা একাধিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সূর্য হইতে মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে কিনা, সেকথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন কি করিতেন না তাহা অপেক্ষা তিনি যে এই প্রচলিত বিশ্বাসটি অবলম্বন করিয়াই অর্জুনকে উৎসাহিত করিলেন—ইহাই আমাদের বিবেচ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহুকাল পূর্বেই এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ন্যায় বীরকে উত্তম অধিকারী বুঝিয়া এই উপদেশ দিতেছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *আজ [অদ্য] আমি তোমাকে সেই পুরাতন যোগ বিষয়ে উপদেশ করিলাম। কারণ, তুমিই আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগও একটি উৎকৃষ্ট রহস্যবিদ্যা।*

ব্যাখ্যা ঃ এই রহস্যাবৃত যোগবিদ্যা যেকোন সময়ে, যেকোন স্থানে, যেকোন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া যায় না। যেমন পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে গেলে নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে গিয়া হাতেনাতে করিয়াই তাহা বুঝিতে হয়, তদ্রূপ। ব্রহ্মবিদ্যারও পরীক্ষাগার বা প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে, যেখানে নির্দিষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা না করিলে কিছুই অনুভব হয় না। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের নিকট Science একটি রহস্যবিদ্যাই বটে। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও রহস্যবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বামীজী বলিতেন—'Exact Science' অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিজ্ঞান। সকল বিজ্ঞানেই তিনটি স্তরভেদ আছে—(১) শ্রবণ, (২) অপরে করিতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখা এবং (৩) স্বয়ং করিয়া দেখা ও বুঝিয়া লওয়া। যেস্থানে উৎপাত বেশি, সে মনুষ্যজনিত বা প্রকৃতিজনিত যে-কারণেই হউক, সেই স্থানে বিজ্ঞানিগণ laboratory নির্মাণ করেন না। তাঁহারা নির্জন, নিরুপদ্রব স্থানে তাহা নির্মাণ করেন। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ল্যাবরেটরিও নির্জনে স্থাপন করিতে হয়। "রহসি স্থিতঃ" অর্থাৎ জনমানবশূন্য স্থানে অবস্থিত (গীতা, ৬।১০)।

শ্রীভগবান বলিলেন ঃ 'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'—তুমি আমার ভক্ত। তুমি আমার সখা। ভক্তির অর্থ fitness বা কতটা প্রস্তুত, তাহার পরিমাপ। 'সখা'—যাহার সহিত সখ্য আছে, অসূয়া নাই। অসূয়া থাকিলে এই বিদ্যাশ্রবণে কিছু কাজ হয় না।

বর্তমানে এইরূপ ব্যক্তি-বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিছুদিন পূর্বেও অধিকারী বিচার করিতে গিয়াই সব ফুরাইত, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা আর হইয়া উঠিত না। গুটিকয়েক ব্যক্তি এই বিদ্যাকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়া নিজেদের আলস্য ও অনভ্যাসবশত একটি কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুরূপে জগতে প্রচার করিত। স্বামীজী আসিয়া ঐ বিদ্যা দিবালোকে সর্বসমক্ষে প্রচার করিলেন। "অধিকারী বিচার করিতেই দিন গেল"—এই কথায় কেহ যেন ভুল না বুঝেন যে, সকলেই এই বিদ্যার অধিকারী ছিল। [বরং যাহারা নিজেদের অধিকারী বলিয়া প্রচার করিত, তাহারা স্বয়ং যথার্থ অধিকারী কিনা তাহাও যথেষ্ট বিবেচ্য।] স্বামীজী এই বিদ্যার ভিতরের রহস্যের কথা বলিয়া গেলেন। যাহার যাহার প্রয়োজনবোধ হইবে, সেই সেই ব্যক্তি উহা অভ্যাস করিবে। পূর্বে এই অভ্যাসের সুযোগটুকুও পাওয়া যাইত না—ইহাই অভিপ্রায়। এই বিদ্যা মুক্তাঙ্গনে (অধিকারী-অনধিকারী বিচার না করিয়াই) প্রচার করিবার পশ্চাতে স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করা। নতুবা সভ্যতা-সংস্কৃতি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অতঃপর কেহ এই যোগ [কর্মযোগ] অভ্যাস করিবে কি করিবে না—ইহা তাহার ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভরশীল।

[ক্রমশ] ।।বারো।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

উদ্বোধন

কার্ত্তিক ১৩১০
অক্টোবর ১৯০৩

জাপানদর্শন

আমরা উদ্বোধনের পাঠকগণকে জানাইয়াছি, গত জুলাই মাসে বেলুড় মঠের স্বামী সদানন্দ জাপানদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। তিনি চীন ও জাপান হইতে এতদুভয় দেশের আচার, ব্যবহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে যেসকল কথা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

১৫ রোকু চোম,—
হংগো, টোকিয়ো

পিনাংএর পর আর তোমাকে চিঠি লিখি নাই। তাহার পর সিঙ্গাপুর,—ইংরাজ রাজের কি কারখানা, দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। যেমন শ্রী, তেমনি দৃশ্য। ব্যবসা, ব্যবসা, ব্যবসা, কত দেশের কত জাহাজ আসছে, কত আমদানি, কত রপ্তানি, দেশের লোকের মুখে কিন্তু অন্ন নাই! তাঁরা Jinrikshwa টেনে মরছেন। তারপর হংকং চীনের দেশ, কিন্তু ইংরাজের রাজ্য। ব্যবসা সবই ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসি প্রভৃতির হাতে; চীনেরা কেবল নৌকা টানে, Jinrikshwa ও পাল্কি বয়, আর কুলিগিরি করে; ব্যবসার মধ্যে শূকরের মাংস বিক্রি; আর ভাবলে বুঝতে পারবে, আমাদের দেশে যে জুতা বিক্রি, এখানেও তাই। তারপর সাংহাই। ইহাও চীনের বন্দর, কিন্তু ইংরাজের হাতে। ব্রিটিশপ্রধান, তবে সবদেশের কনসলগণ আছেন। তাঁহারা একত্র বসিয়া যাহা আইন করেন, তাহাই হয়। জাহাজ, জাহাজ আর জাহাজ—আসছেন আর যাচ্ছেন। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফ্রান্স, ইটালি ইত্যাদি।

এবার চীনের দেশ ছাড়িলাম, ঢংও বদলাইল। এ বন্দরের নাম মোজি—জাপানের প্রথম বন্দর ও inland সমুদ্রের প্রবেশদ্বার। দুই দিকে পাহাড়ের কি শোভা, মাথাগুলি প্রায় সবই তোপে সাজান। চীন আর জাপানের মানুষের ভেদ এত—ঠিক যেন বাঙ্গালিতে আর উড়েতে। চীনের প্রকৃতি আগাগোড়া উড়ের মত।... জাহাজের উপরে বিলাতি ইউনিফরম, কাপ্তেন, প্রথম অফিসার, দ্বিতীয় অফিসার—এরা অবশ্য বিলাতি, অন্য সব জাপানি। ইহারা অল্প অল্প ইংরাজি কয়, কিন্তু জার্ম্মান ভাষার খুব ব্যুৎপত্তি আছে। এখানকার স্কুলে জাপানি ভাষাতে সব Higher subjects পড়ান হয়। তারপর কলেজ,—কলেজে জার্ম্মান না শিখিলে কিছু হইবার যো নাই। এখানকার রব Applied Chemistry ও Mechanics, বড় বড় যাঁরা, তাঁরা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১০।১২।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে অবস্থানান্তর ভূয়োদর্শন লাভ করিয়া এখানকার Director অধ্যাপক প্রভৃতি হন এবং উত্তম উত্তম গ্রন্থ Chemistry ও Mechanics সম্বন্ধে লিখেন ও শিক্ষা দেন, তাইতে দেশ এত উন্নত। আমাদের দেশের ছেলেদের পক্ষে একটু কষ্টকর, কারণ যাহা শিখিয়া আইসেন, তাহা এখানকার উপযুক্ত নয়। বলিয়াছি, স্কুলেতেই Higher Mathematics জাপানি ভাষায় শেষ হয়। Elementary Science ও অন্যান্য সকল বিষয়ই স্কুলে শেষ হয়, যথা Botany, Chemistry, Physics, Zoology, Geology, Psychology ইত্যাদি। কলেজে কেবল Practical ও Applied Science শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাষা শেখবার জন্য নয়, সর্বত্র Practical পুস্তক এসব সম্বন্ধে জাপানি ও জার্ম্মান ভাষায়। বলুন আমাদের দেশের B. A., M. A. এখানে আসিয়া কি করিবেন?... সত্যসুন্দর দেব বলিয়া একটী ব্রাহ্ম বালক আসিয়াছেন, অতি সুন্দর ছেলে। তিনি drawing জানেন, কি করিয়া Procelain প্রস্তুত হয়, শিখিতে আসিয়াছেন। বেচারাকে আগাগোড়া জার্ম্মান ভাষায় শিখিতে হইবে। আসিয়া বুঝিলাম, জীবনটা নষ্ট হইয়াছে মাত্র, আর আমাদের দেশের লোকও কিছু জানে না। এখানে মেয়ে পুরুষে খাটে। সবাই শিক্ষিত; কুলিরা পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে। শতকরা ৬০ জন শিক্ষিত বলিয়া প্রবাদ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অল্প খরচে ভদ্রলোক সবাই; কারণ, ব্যক্তিবিশেষে অর্থের ন্যূনাধিক্য নাই (Distribution of wealth)। মনে করিবেন না, ১০।১২ টাকা মাসে আয়ের লোক এখানে থাকিতে পারে। বেরুতে গেলেই জুতা চাই, নচেৎ পুলিশ। গুটীকতক বালক খেলা করিতেছিল; একটীর পায়ে জুতা ছিল না, পুলিশ আসিতেছে দেখিয়া মা তৎক্ষণাৎ আসিয়া জুতা পরাইয়া দিল—বুঝিবে কি কড়াকড়। আর লোকের বিশেষ অভাব নাই, ভিক্ষা সাধু ভিন্ন অপরের নিষেধ। তাহাদেরও পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। জাপান স্বাধীন, একটী সামান্য লোকের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। ইতর ও ভদ্র নাই, স্বভাব যেন ছাঁচে ঢালা। বলিবে, তা কি হয়? সেটা তোমাদের বুঝিবার দোষ। আমরা ভাল আছি। আমার ভালবাসা সকলকে জানাইবে—

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হলিউডে শ্রীশ্রীকালীপূজা

কাজরী দাশগুপ্ত

প্রাক্কথা

শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণায় এবং বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, হলিউড আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বাহানন্দজী মহারাজের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালে আমেরিকার মেরীল্যাণ্ডে 'বেদান্ত সোসাইটি অফ গ্রেটার ওয়াশিংটন, ডি. সি.' আশ্রমটি শুরু হয়। রেসিডেন্ট স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দজীর নিরলস তত্ত্বাবধানে এবং বহু ভক্তের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ও পরিশ্রমে শীঘ্রই এটি একটি প্রাণবন্ত আশ্রমে রূপান্তরিত হয়।

স্বামী স্বাহানন্দজী এই আশ্রমটিরও অধ্যক্ষ। ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে বছরে দুবার তিনি এখানে আসেন। ২০০১ সালের মে মাসে মহারাজ এই আশ্রমে থাকাকালীন আমি হলিউডে শ্রীশ্রীকালীপূজা দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইলে উনি সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। প্রসঙ্গত, গত প্রায় ৫০ বছর ধরে হলিউড আশ্রমে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়ে আসছে। মায়ের সেই পূজা দেখা আমার কাছে এক মধুর স্মৃতি হয়ে আছে।

যাত্রা

২০০১ সালের নভেম্বরে কালীপূজার দিন খুব ভোরে আমরা ওয়াশিংটনের ডালাস বিমানবন্দর থেকে লস এঞ্জেলেস শহর অভিমুখে রওনা দিলাম। পথে মিনিয়াপোলিস শহরে একবার বিমান বদল করতে হলো। মিনিয়াপোলিস ছাড়ার প্রায় ৩ ঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন হঠাৎ ঘোষণা করলেন, আমরা ৩৫,০০০ ফুট উঁচু থেকে অবতরণ করে প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে যাব। এতে আমাদের লস এঞ্জেলেস পৌঁছানোর ঠিক আগে আমেরিকার কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে সুবিধা হবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পর কলোরাডো স্টেটে কোথাও বরফের আস্তরণে ঢাকা পাহাড়, কোথাও পাহাড়ের গায়ে নিবিড় অরণ্যের শ্যামলিমা চোখে পড়ল। দিনটি ছিল সুন্দর রৌদ্র-ঝলমলে। কিছুক্ষণ পরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিখ্যাত 'গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন' দেখা দিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কোন এক অজানা কারিগরের তৈরি বিশাল ক্যানিয়ন ল্যাণ্ড। পাথরের বুক চিরে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে কলোরাডো নদী, অনেকাংশেই মানুষের দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত। তাকে মাঝে মাঝে শুধু রুপোর সুতোর মতো দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে এল মাইলের পর মাইল জোড়া ধূসর বালুরাশি—মোহাভি মরুভূমি। আবার পাহাড়-পরিবেষ্টিত লেক মিড।

অতঃপর হলিউডে

কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছালাম লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে। সেখান থেকে বেলা ২টা নাগাদ বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, হলিউড আশ্রমে পৌঁছালাম। সুন্দর তিনটি সাদা গম্বুজ দিয়ে শোভিত হলিউড মন্দির। বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সূত্রপাত হয় ১৯৩০ সালে। পূজনীয় স্বামী প্রভবানন্দজী মহারাজ ছিলেন এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ।

বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, হলিউড আশ্রম

শান্ত পরিবেশ। বহু বছরের পুণ্য স্মৃতিবাহী পবিত্র স্থান। মন্দির দুপুরে বন্ধ ছিল। আশ্রমের বড় রান্নাঘরে তখন মায়ের পূজার আয়োজন চলছে। ভোগের আয়োজনে অনেকে সেখানে ব্যস্ত। বিকালে মন্দিরে প্রণাম করতে গেলাম। মা কালীর মূর্তি তখন পাশে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। মায়ের পূজার নানা আয়োজনে হলিউড আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীরা আজ খুবই ব্যস্ত। হলিউড আশ্রমে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের থাকার জন্য আলাদা আলাদা মঠ রয়েছে। সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা গীতাপ্রাণাজী নিজেই কালীমূর্তি তৈরি করেছেন। শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর অনুসরণে বহুদিনের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই প্রতিমাখানি।

মায়ের পূজার জন্য যেসব সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলি সন্ন্যাসিনীদের হাতে তুলে দিলাম। তাঁরা অতি যত্নসহকারে সেগুলি ভিতরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরেই পূজনীয় স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন।

পূজা শুরু হলো

রাত ১০টায় পূজা আরম্ভ হলো। ইতোমধ্যে মায়ের মূর্তির আবরণ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়ের সে কী অপরূপ সুন্দর বরাভয়দায়িনী মূর্তি। মায়ের মাথায় রত্নখচিত মুকুট, পরনে সুন্দর লাল বেনারসি শাড়ি। মায়ের কর্ণ, কণ্ঠ, বাহু, কটিদেশ নানা অলঙ্কারে ভূষিত। পায়ে নূপুর, পশ্চাতে আলুলায়িত কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি।

পূজার আসনে বসলেন ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দজী। তন্ত্রধারক হলেন অরিগণ স্টেটের পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তরূপানন্দজী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বামী ইষ্টানন্দজী এবং স্বামী সর্বদেবানন্দজী।

পূজনীয় স্বামী স্বাহানন্দজী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভিক নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর মায়ের মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী অপরানন্দজী। মঞ্চের নিচে নির্দিষ্ট স্থানে ভক্তরা পূজা চলাকালীন স্তবপাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করছিলেন। একজন জাপান-জাত সন্ন্যাসিনীর অতি সুমিষ্ট গলায় গাওয়া 'মা ত্বং হি তারা' গানটি এখনো বেশ মনে পড়ে। ভারতীয় ও আমেরিকান ভক্তবৃন্দের এক ভক্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখলাম সেদিন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের প্রাণের ভালবাসা ও প্রণাম নিবেদিত হলো মায়ের চরণে। আমেরিকার অন্যান্য বহু অঞ্চল থেকে ভক্তেরা এই পূজায় উপস্থিত ছিলেন। মা যে দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নন, তা যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

ইতোমধ্যে সন্ন্যাসিনীরা রূপার ট্রে-তে করে পূজার নানারকম সামগ্রী নিবেদনের উদ্দেশে নিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁদের নিষ্ঠা ও যত্ন দেখে মায়ের সঙ্গে যে তাঁদের একটি অনাবিল নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক আছে, সেটি বেশ বোঝা যাচ্ছিল। পূজারী মহারাজ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মাকে প্রতিটি উপচার নিবেদন করলেন। প্রথম ট্রে-তে করে আনা হলো মায়ের প্রসাধনসামগ্রী—সুগন্ধী তেল, ক্রিম, লোশন, পারফিউম। মহারাজ প্রতিটি শিশি খুলে মাকে নিবেদন করলেন। মাকে সেবা করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, তাই ভক্তদের নানা উপচার দান করার অনুমতি দেওয়া থাকে সেইদিন। এরপরে এল মায়ের গয়নার ট্রে। মায়ের হাতে ও গলায় মহারাজ পরিয়ে দিলেন কয়েকটি অলঙ্কার এবং কয়েকটি ছুঁইয়ে দিলেন মায়ের গায়ে। অতি মনোহর ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হলো মাকে। সন্ন্যাসিনীরা রং মিলিয়ে সেই মালা নিজেরাই তৈরি করেছেন। এবার আনা হলো নানা রঙের শাড়ি ও পরিধেয় বস্ত্র। মায়ের চারপাশে ও পায়ের কাছে মহারাজ সেইসব সামগ্রী নিবেদন করলেন। মৃন্ময়ী মূর্তি যেন চিন্ময়ী-রূপে প্রকটিত হলেন।

পূজার শেষপর্বে আমরা গেলাম মন্দিরের অনতিদূরে একটি বাড়ির একতলায় বড় বসার ঘরে। ঘরের একপাশে ফায়ার প্লেস তৈরি করা আছে। স্তোত্রপাঠ করে ফায়ার প্লেসে অগ্নি প্রজ্বলন করে হোম শুরু করলেন সন্ন্যাসীরা। হোমের শেষে স্বাহানন্দজী মহারাজ প্রত্যেকের কপালে হোমের টিকা পরিয়ে দিলেন। আমরা আবার মন্দিরে ফিরে গেলে পূজারী মহারাজ সবার মাথায় শান্তিজলের ছিটা দিলেন—শরীর ও মন শুদ্ধ ও পবিত্র হলো। তখন রাত ২টা বেজে গেছে। আমরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে নানারকম প্রসাদ পেলাম। আশ্রমের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের তখনো প্রচুর কাজ বাকি। প্রসাদ-বিতরণ ও খাওয়ার পর্ব শেষ হলে আমরা তাঁদের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে কিছু সাহায্য করে মন্দিরের উল্টোদিকে কটেজে ফিরে গেলাম। মহাসমারোহে জগজ্জননীর পূজা সমাপ্ত হলো।

নিরঞ্জনের অভিনব অনুষ্ঠান

দুদিন পরে শনিবার মায়ের নিরঞ্জন। যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্তানেরা জননীকে বিদায় জানাবেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অভিনব। একটি অতি সুন্দর আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকলকে একসূত্রে গেঁথে, 'সামনের বছর আবার এসো মা'—এই ভাবটি নিয়ে মা কালীকে এইভাবে বিদায় জানানোর রীতিটি মনে গভীর রেখাপাত করে।

হলিউড আশ্রমের কালীপ্রতিমা

এদিন সকাল থেকেই নিরঞ্জনের প্রস্তুতি চলছে। প্রব্রাজিকা গীতাপ্রাণাজী কয়েকজন ভক্তসঙ্গে মায়ের প্রতিমা মন্দির থেকে নামিয়ে একটি লম্বা স্টেশনওয়াগন গাড়ির সামনে রাখলেন। সেই গাড়ি করেই মাকে নিয়ে যাওয়া হবে কিছুদূরে সমুদ্রতটে—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। আন্তরিক মমতায় আমেরিকাজাত কন্যা তাঁর মাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, অসীম স্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—দৃশ্যটি ভোলার নয়। বাস্তবিক, দেশ-কাল-পাত্র, স্বদেশ-বিদেশ, নারী-পুরুষ—সকলের উর্ধ্বে বিশ্বব্যাপিণী মাতৃসত্তা। একটু পরেই গাড়িতে মাকে তোলা হলো। সঙ্গে গেলেন গীতাপ্রাণাজী এবং আরেকজন সন্ন্যাসিনী। প্রসঙ্গত, ক্যালিফোর্নিয়া তথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের এক বিরাট অংশ পাহাড় ও সমুদ্রের এক অপরূপ মিলনক্ষেত্র। লস এঞ্জেলেস শহর থেকে অল্প কিছুদূর গেলেই চোখে পড়ে উন্মুক্ত প্রশান্ত মহাসাগর।

একটি গাড়িতে স্বাহানন্দজী মহারাজ ও সর্বদেবানন্দজী মহারাজ নিউপোর্ট বিচের উদ্দেশে রওনা হলেন। আমরাও নিজ নিজ গাড়িতে তাঁদের অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিউপোর্ট বীচে এসে পৌঁছালাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন; সমুদ্রের তীরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তেরা সপরিবারে উপস্থিত হচ্ছেন সেখানে। সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁদের প্রণাম গ্রহণ করছেন, কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। সকলে একটি বড় পরিবারের অংশ—এই ভাবই

প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁদের হৃদ্যতায়। দশমীর শুভ বিজয়া অনুষ্ঠানের ছোঁয়া যেন পেলাম সেদিন।

জলের কিনারায় নোঙর করা রয়েছে সবুজ রঙের একটি বেশ বড় দোতলা লঞ্চ। লঞ্চের একতলায় একটি টেবিলের ওপর মায়ের মূর্তি দাঁড় করানো হয়েছিল। চারদিকে খোলা জানালা; একদিকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাওয়া যায়। নিচে বসার জন্য চারদিকে কাঠের বেঞ্চ তৈরি করা আছে। মহারাজ মায়ের কাছেই বেঞ্চে বসলেন। নির্দিষ্ট সময়ে লঞ্চ যাত্রা শুরু করল। সমুদ্রের তটভূমি পিছনে ফেলে রেখে লঞ্চ এগিয়ে চলল গভীর জলের দিকে। ভিতরের দৃশ্য তখন অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ। স্থানীয় ভক্ত মহিলারা মাকে সিঁদুর পরিয়ে, মুখে সন্দেশ ছুঁইয়ে প্রাণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছেন। আমিও তা-ই করলাম। অনুভব করলাম নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি অপূর্ব ঐকতান। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে নানা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল। খোল বাজিয়ে একটি আমেরিকান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ভজন গাইলেন। তারপর চার-পাঁচজন আমেরিকান যুবক উঠে দাঁড়িয়ে শ্রুতিনন্দন সংস্কৃত স্তব ও স্তোত্রের মাধ্যমে মাতৃবন্দনা করলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে এইসব অনুষ্ঠানের পর টেবিল থেকে আস্তে আস্তে বেদিশুদ্ধ মায়ের মূর্তি তুলে ধরলেন এই যুবকেরা এবং ধীরে ধীরে বিসর্জন দিলেন সমুদ্রের জলে। সমবেত ভক্তরা করজোড়ে মাকে প্রণাম জানালেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে মা মিলিয়ে গেলেন। লঞ্চটি কয়েক মিনিট ঐ স্থানে কয়েকবার ঘোরার পর আবার ফিরে চলল পাড়ের দিকে।

মাকে বিদায় দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সকলের মন ভারাক্রান্ত। এইসময় একটি মস্ত বড় কাগজের বাক্স বের করলেন কয়েকটি ভক্ত। তার মধ্যে দেখলাম রঙিন কাগজে মোড়া ছোটবড় নানা আকারের অনেকগুলি প্যাকেট। প্রত্যেকের সামনে বাক্স ধরা হলো এবং প্রত্যেকে তার মধ্য থেকে লটারির মতো করে একটি জিনিস বেছে নিলেন। আমিও একটি বাক্স তুলে নিলাম। দেখলাম তার মধ্যে রয়েছে মাকে নিবেদন করা চুড়ি। মাকে নিবেদন করা প্রতিটি অলঙ্কার ও প্রসাধনসামগ্রী সুন্দর করে রঙিন কাগজে মুড়ে ভক্তদের মাঝেই আবার বিতরণ করে দেওয়া হলো। এইভাবে সবাই আবার মায়ের স্নেহ একটু একটু করে লাভ করলাম।

এই উৎসবের আরেকটি বিশেষ অঙ্গ হলো—সমুদ্রতটে পিকনিক তথা প্রসাদগ্রহণ। ভক্তেরা নানারকম খাবার নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। সমুদ্রের পাড়ে পার্ক, বিশ্রাম করার জন্য বেঞ্চ করা আছে। ঘাসের ওপর চাদর বিছানো হলো। টেবিলে কাগজের প্লেট-গ্লাস সাজিয়ে প্রসাদবিতরণের কাজে ভক্ত মহিলারা মেতে উঠলেন। স্বাহানন্দজী একটি বেঞ্চে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন। লাইনে দাঁড়িয়ে সুস্বাদু প্রসাদ পেলাম। আমাদের কয়েকজনের একটি দল তারপর সর্বদেবানন্দজীর সঙ্গে সমুদ্রতীর ধরে বালির ওপরে

নিরঞ্জনের পথে লঞ্চে প্রতিমা ধরে আছেন প্রব্রাজিকা গীতাপ্রাণামাতাজী

হাঁটা শুরু করলাম। মাথার ওপরে অনন্ত আকাশ, সামনে দিগন্তবিস্তৃত উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগর। আমাদের সঙ্গে হলিউডের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী আত্মতত্ত্বানন্দজী ও ব্রহ্মচারী আনন্দ ছিলেন। সর্বদেবানন্দজী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে চললেন, জনকোলাহল বহু দূরে পড়ে রইল। মহারাজ খুব সঙ্গীতপ্রিয়। কিছুদূরে গিয়ে আমরা সকলে বালির ওপরে খানিকক্ষণ বসলাম। কয়েকজন বাঙলা ও ইংরেজি গান করলেন। মধুর স্মৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলাম হলিউড আশ্রমে।

বিদায়

পরদিন খুব ভোরে ওয়াশিংটনে ফিরে আসার জন্য আমরা স্বাহানন্দজী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। হলিউড আশ্রম থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম এক অনাবিল শান্তি ও গভীর তৃপ্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখলাম এই আশ্রমের পূজায়। আর দেখলাম প্রেম ও গভীর প্রীতি দ্বারা দেশ ও জাতির গণ্ডি অতিক্রম করে চরম সত্যকে উপলব্ধি করার একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। এক দৈব সাহচর্যের স্বর্গীয় আনন্দ এখনো মনে মনে অনুভব করি। ❑

দানাকালীর বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

> শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার দশম পর্যায়ে দানাকালীর বাড়ি।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহিশিষ্য কালীপদ ঘোষ বা দানাকালীর উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়িতে যেমন ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল, পরবর্তী কালে শ্রীমা সারদাদেবীরও এই বাড়িতে শুভাগমন হয়।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কালীপদ ঘোষের খুব হৃদ্যতা ছিল। প্রথম জীবনে দুজনেই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের অমোঘ কৃপালাভের পর তাঁদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। প্রথম জীবনে দানবীয় প্রকৃতির জন্য কালীপদ ঘোষকে স্বামী বিবেকানন্দ 'দানাকালী' বলতেন এবং এই নামেই তিনি ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

কালীপদ ঘোষের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়—'ইংরেজি ১৮৮৪ অব্দের প্রথমভাগে গিরিশচন্দ্রেরই সহিত তিনি (কালীপদ ঘোষ) শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসে তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া জীবন ধন্য করেন। পরেও ঠাকুর কয়েকবার তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।"[১]

কালীপদ ঘোষের বাড়ির যে-অংশে (২০ শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪) ঠাকুর পদার্পণ করেছিলেন, সেই অংশের দোতলার বারান্দার দেওয়ালে লেখা আছে—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তবর কালীপদ ঘোষ (দানা)-কে কৃপা করে এই গৃহে ১৮৮৪ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে শুভ পদার্পণ করেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্যামপুকুরবাটীতে যখন অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য বাস করছিলেন, সেইসময় ৬ নভেম্বর কালীপূজার রাত্রে, কালীপদ ঘোষের বাড়ি থেকে সুজির পায়েস প্রস্তুত করে ঠাকুরসেবার জন্য পাঠানো হয়েছিল; তাই আজও সেই পুণ্যময় স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিবছর শ্যামপুকুরবাটীতে কালীপূজার রাত্রে ঠাকুরের 'বরাভয় মূর্তি' পূজা উপলক্ষ্যে কালীপদ ঘোষের বংশধরগণ সেই প্রথা বজায় রেখেছেন।
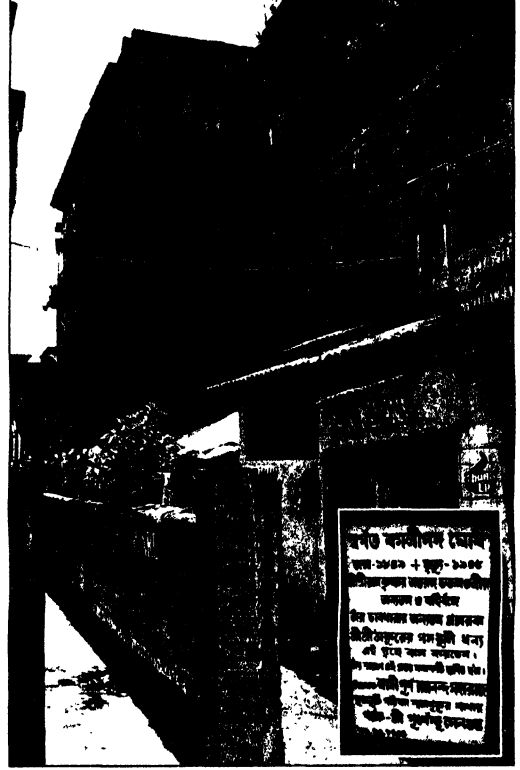
আলাদা মনে হলেও উভয় বাড়িই কালীপদ ঘোষের। সামনের অংশটিতে (৩০ শ্যামপুকুর স্ট্রিট) শ্রীশ্রীমা এসেছিলেন এবং পরের অংশটিতে (২০ শ্যামপুকুর লেন) শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছিলেন বলে শোনা যায়। (ইনসেটে সম্প্রতি স্থাপিত ফলকের আলোকচিত্র) *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

ঠাকুরের কাছে কালীপদ ঘোষের কৃপালাভের পূর্বেই অবশ্য তাঁর স্ত্রী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন। সুরাপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল স্বামী কালীপদকে সুপথে ফেরানোর উদ্দেশ্যেই তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর জীবনের তীব্র অশান্তি ও দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে নিবেদন করেন। রসিক ঠাকুর সব শুনে কালীপদ-গৃহিণীকে নহবত-ঘরে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে রঙ্গ করে 'ওষুধ' নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপন্না নারী সেইমতো শ্রীশ্রীমায়ের শরণাপন্ন হলে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের রসিকতা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য একটি বেলপাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম লিখে তাঁকে দেন। পরে অবশ্য তাঁর ব্যভিচারী স্বামীর মতিগতি ফেরানোর ভার ঠাকুর স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তী কালে সত্যই ঠাকুরের কৃপায় কালীপদ ঘোষের জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঠাকুরের পরম ভক্তে পরিণত হন। স্বামীকে সুপথে ফেরানো উপলক্ষ্যে কালীপদ-গৃহিণীও একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেছিলেন।

কালীপদ ঘোষের শ্যামপুকুরের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমন সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে; শ্রীশ্রীমায়ের এই বাড়িতে (৩০ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪) শুভাগমন ও আনন্দোৎসবে যোগদান সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—"ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাটীর মহিলাগণ মাতাঠাকুরানীকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুযায়ী মা, সারদানন্দজী এবং আরো কতিপয় সাধু তাঁহাদের গৃহে গিয়াছিলেন। তথায় কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়, কন্যাগণ গীতার অংশবিশেষ এবং মোহমুদ্গর আবৃত্তি করেন। লক্ষ্মীদিদি পালাকীর্তন গাহিয়াছিলেন। ঐদিন তিনি বৃন্দারানীর অভিনয় করেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরা হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইবেন, বৃন্দারানী শ্রীরাধার উদ্দেশে হাত দোলাইয়া বলিতেছেন, 'আমি প্রভুকে আনতে যাই।' আবার মাতাঠাকুরানীর সম্মুখে হাত দোলাইতে দোলাইতে বলিতেছেন, 'আমি রামকৃষ্ণকে আনতে যাই।' "[২]

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবাহী এই বাড়িটি আজো বর্তমান এবং ঘোষ-পরিবারের বংশধরগণ ও আত্মীয়গণই এই বাড়িতে বাস করেন। প্রথমে বাড়িটির একটি ঠিকানা থাকলেও পরবর্তী কালে শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার পর বাড়িটির দুটি অংশের দুটি আলাদা ঠিকানা হয়েছে। ❑

পথনির্দেশ: শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য কালীপদ ঘোষের বাড়ির ঠিকানা: ৩০ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪। উত্তর কলকাতার বিধান সরণিতে অবস্থিত টাউন স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেছে শ্যামপুকুর স্ট্রিট। এই পথে খানিকটা এগিয়ে গেলে চৌমাথার কিছুটা আগে বাঁদিকে পড়বে এই বাড়িটি।

তথ্যসূত্র

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৭
২ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, পৃঃ ২০৩

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা :
রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি : শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার পর]

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক-পৌষ ১৪০৯ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) সংখ্যায় এই আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। গত আষাঢ় ১৪১০ সংখ্যায় শুরু হয়েছে এই আলোচনার শেষাংশ।

■ শিলাইদহে মতান্তর

দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর এই স্মৃতিচারণে, আশ্চর্যের বিষয়, একবারও জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ নেই। হয়তো দক্ষিণারঞ্জন নিবেদিতা-ক্রিস্টিনের দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যক্ষত যুক্ত ছিলেন, তাই সেবিষয়েই রোমন্থন করেছেন। অথবা জগদীশচন্দ্ররা প্রায়ই শিলাইদহে কবির কাছে আসতেন বলে সেব্যাপারে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

কারণ যাই হোক, অন্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে আমরা আগেই নিশ্চিত হয়েছি, জগদীশচন্দ্রও সস্ত্রীক তখন শিলাইদহে উপস্থিত। তাই ধারণা করাই যায়, নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ আলোচনা তথা বিতর্কে তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন এবং সম্ভবত যোগও দিতেন। কিন্তু বুদ্ধগয়ার বিতর্কের মতো এক্ষেত্রেও পরবর্তী কালে তাঁর কোন লেখাতেই এধরনের বিতর্কিত আলাপনের কোন আঁচ পাওয়া যায় না। বরং কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই ঘটনার বহু পরে জুলাই ১৯২২-এ লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষক উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সনের এক প্রশ্নের উত্তরে কবি এই চিঠিটি লেখেন।

এই চিঠি থেকেই জানতে পারা যায়, শিলাইদহে তাঁর অতিথি (হ্যাঁ, তাঁরই অতিথি, জগদীশচন্দ্রের নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্তত ঘটনার বহু বছর পর তেমনই জানিয়েছেন।) হিসাবে থাকার সময় কবিকে মৌলিক গল্প শোনানোর অনুরোধ জানান। কবি শোনান এক আইরিশ যুবকের গল্প। সে ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষকে ভালবেসে ভারতবর্ষের একজন হিসাবেই থেকে যেতে চায় এবং এখানকার রীতিনীতি আত্মীকরণ করে সেইমতো এদেশের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু তার সেই বিদেশী শিকড়ের জন্য তার প্রিয়জন তথা শিষ্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই গল্প নিবেদিতাকে প্রচণ্ড আহত করে। তিনি নিজে আইরিশ। ভারতবর্ষকে তিনি নিঃস্বার্থভাবে আপন করে নিয়েছেন এবং স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষা করেন, ভারতবাসীরাও তাঁকে আপন করে নেবেন। সেখানে তাঁরই মুখের ওপর এমন এক গল্পের প্লট শোনানো, নিবেদিতার মনে হয়, কার্যত তাঁকেই অস্বীকার করা এবং তাঁর জীবনব্রতকে অপমান করারই নামান্তর।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক গল্পের এই চুম্বকটুকু শুনেই বুঝতে পারবেন, এটির আদলেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'গোরা'। একথাও তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে না, 'গোরা'র সমাপ্তির সঙ্গে এই খসড়ার একটি মূলগত তফাত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথও পিয়ার্সনকে চিঠিটিতে লিখেছিলেন : "You asked me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest in Shilaida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in Gora as it stands now—but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind." ('উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন'—প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪৩)[৫৭]

কোন্ বিষয়টি নিবেদিতার মনে গভীরভাবে প্রোথিত করে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? বিদেশী হয়ে অন্য কোন দেশকে আপন করে নেওয়া বা অন্য কোন দেশের কাছে আপন হয়ে ওঠা যায় না—তাঁর এই অপ্রিয় বিশ্বাসটিকে কি? যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে, অতিথিকে গল্প শোনানোর অছিলায় রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার অনেক পরে ১৯০৭-এর জুলাই মাস নাগাদ তিনি 'গোরা' লেখা শুরু করেন এবং উপন্যাসটি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে ভাদ্র ১৩১৪ থেকে ফাল্গুন ১৩১৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[৫৮] রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকরা এই উপন্যাসের বহিরঙ্গে কিছু বিদেশী রচনার ছায়া দেখতে পান। তবু, নিবেদিতার অসন্তুষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাহিনীর সমাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনা বদল করেছিলেন—এমন একটা সম্ভাবনাও যথেষ্ট যুক্তি নিয়ে উপস্থিত। এবং এই আপত্তির প্রকাশ শিলাইদহে তীব্র মতভেদের উগ্রতায় নয়, নেহাতই ভক্ত পাঠক তথা বন্ধুর আবদারের ভঙ্গিতে। সেকথা জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর কথোপকথনে। 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থে বনফুল সেই সংলাপের বিবরণ দিয়েছেন :

"... [গোরার] শেষটা বদলে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। নিবেদিতা নাছোড় হয়ে ধরে বসল। আবার ঢেলে সাজালাম সব।"

"গোরার শেষটা অন্যরকম ছিল?"

"হ্যাঁ। আমি গল্পটা বিয়োগান্ত করেছিলাম।... গল্পটা ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বেরুচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল—গোরার শেষটা কিরকম করেছেন দেখি। দেখালাম। পড়েই সে বলে উঠল—না না, এরকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না, কাব্যের জগতেও কবি সেটা ঘটিয়ে দেবেন না! কাব্যের ওজগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে। এমন জেদ করতে লাগল যে রাজি হতে হলো। সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।"[৫৯]

'গোরা'র প্রকাশকাল মনে রাখলে, এই ঘটনা ১৯০৯ সালের শেষার্ধের। তবে এমন ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠবেই।

পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং বনফুলের কাছে তাঁর এই স্মৃতিচারণ—দুটিই সমান সত্য হওয়া বেশ অবাস্তব। তাছাড়া একটি বাঙলা মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে চলা এই উপন্যাসের সমাপ্তি কেমন হবে সেসম্পর্কে সাধারণ পাঠকসমাজে নিশ্চিতভাবেই আগ্রহ-উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু সে-আগ্রহ নিবেদিতার ব্যস্ত সময়সূচীকেও সংক্রামিত করবে—এতটা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে এমন হতে পারে, গোরার সঙ্গে নিজেকে নিবেদিতা একাত্ম করে ফেলেছিলেন। তাই বিদেশী শিকড়ের কারণে আইরিশ যুবকটির অপমান বা পরাজয়কে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না।

পরবর্তী সমালোচকরাও কেউ কেউ গোরার চরিত্রলক্ষণের সঙ্গে নিবেদিতার অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। ভিন্ন মতাবলম্বীরা অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ছায়ার কথাও তোলেন। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। আপাতত আমাদের আলোচ্য, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতা তর্ক তথা মতানৈক্যের বিষয়। এবং এই তর্কের অন্য কোন প্রসঙ্গের কথা জানার আর কোন উপায় না থাকলেও 'গোরা' সংক্রান্ত ঘটনাটিই যে যথেষ্ট জোরালো, তাতে সন্দেহ নেই। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্ক করে এবং বিশেষ করে তাঁর গল্পের প্লট শুনে তাঁর প্রতি এক তীব্র বিকর্ষণ বোধ করলেন নিবেদিতা।

বাগবাজারে ফিরে এসে ৫ জানুয়ারি ১৯০৫ শ্রীমতী ওলি বুলকে নিবেদিতা লিখলেন: "With all our trust and regard for the Poet—and I am grateful to him for having been born!—So tenderly does he love the Bairn [Jagadish Ch. Bose], and so assiduously does he serve him!—We are learning now to understand what it was that Swamiji felt about them all. গত শুক্রবার যে-উদ্দীপনা লইয়া আমরা [নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন] যাত্রা করিয়াছিলাম, ক্রমশ তার সবই নিঃশেষিত হইল। তখন আমরা উভয়েই পারিপার্শ্বিকের এক চাপ অনুভব করিতেছিলাম, যেখানে আমাদের দম বন্ধ হইয়া আসে—যেখানে সকল কিছুই খুব মামুলি বলিয়া মনে হয়। এমন পরিবেশে both Bo [? Abala Bose] and the Poet were absolutely happy and in place—but in which the Bairn seemed distorted somehow. সোমবার [২ জানুয়ারি ১৯০৫] দুপুর নাগাদ আমার মধ্যে আর বলিবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকিল না—না তাহাকে [?], না ঈশ্বরকে।

"আর এই চার দেওয়ালের মধ্যে ফিরিয়া আসিবামাত্র সবকিছু যেন বদলাইয়া যাইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন পুনরায় বলসঞ্চার হইতেছে...।"[৬০]

বোঝাই যায়, কবির প্রতি কী বিদ্বেষ এবং ক্ষোভ নিয়ে নিবেদিতা শিলাইদহ থেকে ফিরলেন। এর আগে বুদ্ধগয়াতেও তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়নি, কিন্তু এবারের তীব্রতা আরো অনেক বেশি। তাঁর মনে পড়ছিল স্বামীজীর সাবধানবাণীর কথা। ১১ মার্চ ১৮৯৯ স্বামীজী বলেছিলেন: "মার্গট, তুমি যতদিন ঐ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চালিয়ে যাবে, ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে যেতেই হবে।"[৬১] আবার মৃত্যুর ঠিক আগের রবিবার ২৯ জুন ১৯০২ ওকাকুরার সঙ্গে অতি-ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে সাবধান করে দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন: "পূর্বে তোমার ছিল ব্রাহ্মদের প্রতি প্রত্যয়, টেগোরের প্রতি প্রত্যয়, আর এখন এইসব [ওকাকুরা-সংক্রান্ত] প্রত্যয়। এটিও যাবে, যেমন অন্যগুলো গেছে!"[৬২] যখন স্বামীজী কথাগুলি বলেছিলেন, তখন শুনতে ভাল লাগেনি। এখন এইসব কথার প্রতিই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে।

এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় এর পরের ঘটনাপ্রবাহ দেখলে—যেখানে নিবেদিতা তাঁর জীবৎকালে অর্থাৎ পরবর্তী প্রায় সাড়ে ছয় বছর সময়কালে আর কখনো রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হননি বা হওয়ার আগ্রহ দেখাননি। দেরিতে হলেও স্বামীজীর নিষেধাজ্ঞাকে শিরোধার্য করে, এর পর থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের দূরে দূরেই থেকেছেন। এবং দুজনে দুজনের কর্তব্য-কর্মে ব্যস্ত থাকলেও রবীন্দ্রনাথও এই অবস্থার বদল ঘটাতে উদ্যোগী হননি।

■ মতান্তর-পরবর্তী তিক্ততা

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, পরস্পর পরস্পরের মুখদর্শন করবেন না—এমন এক তিক্ততায় তাঁরা সম্পর্কটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ি গিয়েছিলেন, সেকথা তাঁর হিসাবের খাতা থেকেই জানা যাচ্ছে।[৬৩] সম্ভবত তার পরদিন বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিতব্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগ দেওয়া সংক্রান্ত আলোচনা

করতেই রবীন্দ্রনাথের সেদিন নিবেদিতার কাছে যাওয়া। কিন্তু সে-অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলেও নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন বলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অনুষ্ঠানের বিবরণীতে লেখা হয়ঃ "বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০/৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।... স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"[৬৪]

সন্দেহ নেই, এইসব যোগাযোগের তেমন কোন গভীরতা ছিল না। শিলাইদহ থেকে ফেরার পর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশের সঙ্গে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উত্তাল হয়েছিলেন, কিন্তু যুগ্মভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন বলেও জানা যায় না।

বুদ্ধগয়া ও শিলাইদহের তীব্র মতভেদকে অবশ্য এই পরিস্থিতির জন্য এককভাবে দায়ী করলে ভুল হবে। এর মূলে আছে উভয়ের মতাদর্শগত, বিশেষত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত এক মৌলিক পার্থক্য। এবং ভ্রমণকালে তাঁদের মুখোমুখি যে মতভেদ, তার মূলেও রয়েছে এই পার্থক্যের অনড়তা—যেকথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামিনী নিবেদিতার ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মবিশ্বাসের যে বিরোধ থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। নিবেদিতার সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিল যে চরমপন্থী বিপ্লববাদ—তাকেও যে রবীন্দ্রনাথ অপরিণামদর্শী মনে করতেন, তা-ও খুব স্পষ্ট।

কিন্তু এইসব মৌলিক আদর্শগত বিরোধ বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার মধ্যে এক ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বও ছিল বিলক্ষণ। এবং এই দ্বন্দ্বের জন্য হয়তো বুদ্ধগয়া এবং শিলাইদহে থাকাকালীন মতানৈক্য এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মৌখিক আলাপচারিতার সময়েও নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে আবেগতাড়িত নিবেদিতা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে উঠতেন, সেকথা তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকের স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই স্বভাব একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না।

এই দ্বন্দ্বের কারণেই অরবিন্দমোহন বসুকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ-অবলা বসু তিক্ততায় রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার নেপথ্য হস্তক্ষেপ কল্পনা করেছিলেন।[৬৫] "ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতি ভাগিনেয় অরবিন্দমোহনের অতিরিক্ত আকর্ষণ অবলা বসু পছন্দ করেননি এবং রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁদের নির্ধারিত কর্তব্যপথ থেকে অরবিন্দ যেন ভ্রষ্ট না হন, তার জন্য 'এখন হইতে... তাহাকে সর্বদা আমাদের নিকটেই রাখিব' ঘোষণা রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করে।... প্রায় একই কারণে কয়েক মাস আগে দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এত একাত্ম অনুভব করতেন যে, এক্ষেত্রে তাঁর বেদনা ছিল অনেক বেশি। এরপরেও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি নানা কর্মসূত্রে জড়িত থেকেছেন, কিন্তু পূর্বের ভারহীন সম্পর্ক আর ফিরে আসেনি।"[৬৬]

নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র-অবলা বসুর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া তাঁর স্নেহের 'নেফ্যু' (< nephew) অরবিন্দমোহনের ওপরও নিবেদিতার এক ইতিবাচক প্রভাব ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সন্দেহকে খুব একটা অযৌক্তিক বলা যাচ্ছে না।

এমন বিভিন্ন সময়ের নানা বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে রবীন্দ্রনাথের মনে নিবেদিতার প্রতি ক্রমে এক তীব্র বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

■ নিবেদিতার মহাপ্রয়াণ ও তারপর

জগদীশচন্দ্র, অবলা বসুদের সঙ্গে দার্জিলিঙে পূজাবকাশ কাটাতে গিয়ে ১৩ অক্টোবর ১৯১১ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। সারা দেশে, বিশেষত বাংলার শিক্ষিত মহলে এক গভীর শোকের ছায়া ঘনিয়ে আসে এবং দেশীয় সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক পত্রিকাসকল তার সশ্রদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতাতেই। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর নির্লিপ্ত নীরবতা। ১৭ অক্টোবর তিনি জোড়াসাঁকোয় রাখীবন্ধন ও অরন্ধন উৎসব করছেন, ২১-২২ অক্টোবর কালীপূজায় শান্তিনিকেতনে ঘুরে আসছেন, ২৩ অক্টোবর ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণরক্ষা করছেন।[৬৭] অথচ নিবেদিতা সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্যে একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না! যেন দেশের এত বড় এক ক্ষতি তাঁকে স্পর্শও করছে না। অথবা নিবেদিতার প্রতি তাঁর অভিমান ও বিকর্ষণবোধকে তিনি বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

ধারণা করাই যায়, এই সময় বহু পত্রিকাই তাঁর বক্তব্য সংগ্রহে আগ্রহী ছিল এবং হয়তো তারা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের অনড়তা ভাঙার চেষ্টা করে চলেছিল। তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ 'প্রবাসী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁকে রাজি করাতে জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে অনুরোধ পাঠান।

রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত রাজি হলেন। ৪ নভেম্বর ১৯১১ শিলাইদহ থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি জানিয়েছেনঃ "নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্যে জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম তাই সেইটে লিখচি।"[৬৮]

সব নির্লিপ্তি আর মানসিক বাধাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর আশ্চর্য স্বকীয়তায়। না, স্মৃতিচারণের নস্ট্যালজিয়া বা স্তুতির অন্ধ আবেগ—শোকনিবন্ধ লেখার সেই গতানুগতিক সহজ পথে তিনি হাঁটেননি। ব্যক্তি

নিবেদিতার পূর্ণ পরিচয়টুকুকে নিজস্ব বোধে জারিত করে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে।

লেখাটি শুরু হয়েছে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের কথা স্মরণ করে। তাঁর ছোট মেয়ের ইউরোপীয় শিক্ষার ভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো এবং নিবেদিতা কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যানের খবর। রবীন্দ্রনাথের মনে কিন্তু তার জন্য এখন আর কোন বিরক্তি নেই। বরং নিজস্ব পরিবারের আভিজাত্য ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন : "মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোন একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।"[৬৯]

এরপর তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের আর কোন স্পষ্ট স্মৃতির কথা উল্লেখ করেননি। এমনকি যখন তিনি লিখছেন : "তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।..." তখনো এই ঘটনা যে শিলাইদহে তাঁর আতিথ্যে থাকাকালীন, সেকথাও রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গেছেন। বরং অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে নিবেদিতার সংগ্রামের মূল মহিমাটুকুকে তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন : "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সেসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"[৭০]

আরো কিছু পরে তিনি লিখছেন : "লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন।... তাহার মধ্যে যাহা-কিছু ভাল, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু নিত্য পদার্থ আছে—তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন।... এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে-সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ।"[৭১] এই প্রবন্ধ লেখার আরো বেশ কিছুকাল পর নিবেদিতার 'The Web of Indian Life' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ২১ অক্টোবর ১৯১৭ রবীন্দ্রনাথ এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন : "She [Sister Nivedita] had won her access to the in most heart of our society... and came to know us by becoming one of ourselves." বোঝাই যায়, নিবেদিতার প্রতি কতটা উচ্চ ধারণা তিনি মনে মনে পোষণ করতেন।

কিন্তু সেইসঙ্গে, শোক-নিবন্ধের রীতি ভেঙে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মতের অনৈক্য এবং স্বভাবের বৈপরীত্যের কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন : "যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি, তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন এক বলবান আক্রমণের বাধা।"[৭২]

পরক্ষণেই কিন্তু নিজস্ব বিরূপতাকে সামলে নিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন : "আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আরেকদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" অনেক সমালোচক এইটুকু পড়েই ধারণা করেছেন যে, নিবেদিতা কর্তৃক রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদ ও প্রচারের প্রয়াসকে স্মরণ করেই নাকি এই কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই স্পষ্ট, এই উপকারের প্রভাব অনেক গভীরে : "তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"[৭৩]

এপ্রসঙ্গে এডওয়ার্ড জন টমসনের স্মৃতিচারণ স্মর্তব্য : "Speaking to me once of Sister Nivedita's 'Violence', [Rabindranath Tagore] added, 'But there could be no doubt of her devotion to my people. I have seen her, a delicately nurtured lady, living uncomplaining and cheerful in conditions of sheer squalor. And' (his face brightened) 'she could be *ferocious* at any worng or injustice done to my people.' "[৭৪] ভারতবাসীকে আবেগভরে 'my people' বলার রীতিটিও একান্তভাবেই নিবেদিতা-অনুসারী।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন এই প্রবন্ধেই : "বস্তুত, তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে-মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।"[৭৫]

নিবেদিতার এই 'লোকমাতা' উপাধি পরবর্তী লেখকদের আগ্রহে আজ বহুবিদিত। কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই প্রবন্ধেরই শেষলগ্নে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে আরেক ব্যতিক্রমী বিশেষণে উদ্ভাসিত করেছেন : "এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে-তপস্যা করিয়াছেন, তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল।"[৭৬]

'সতী' সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার সাযুজ্য ধরা ঠিক সহজ নয় বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত এই সম্মাননাটি ঠিক প্রচলিত হয়নি। কবি নিজেও বোধহয় বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এই বিশেষণটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে দেশের হৃতদরিদ্র, অশিক্ষিত, জীর্ণকুটীরবাসী জনগণই যেন দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, অদ্ভুত আচরি মহেশ্বর। "মানুষের মধ্যে যে-শিব আছেন, সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"[৭৭]

কবির এই ব্যাখ্যা অবশ্য রবীন্দ্রানুরাগীরাও নির্দ্বিধায় মেনে নেননি। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন ঃ "এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'সতী' বলেছেন, সতী শব্দের ধাতুগত অর্থ যাই হোক, এর ব্যবহারিক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক কোন সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝায় না—যেমন দেশপ্রেম জনকল্যাণ ইত্যাদি কর্মের নিষ্ঠাকে সতীত্ব বলে না। সতী শব্দে নারীর কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা ও সমগ্র জীবনের আত্মনিবেদন প্রকাশিত হয়। সতী শব্দের ব্যবহারে তাই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের অবিচল প্রভুত্বের কথাই বলেছেন।"[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পূর্বোক্ত চিঠিটি যেদিন লেখেন—সেই ৪ নভেম্বর ১৯১১-তেই তাঁর প্রবন্ধটি লেখা শেষ হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ঐদিনই তিনি লেখেন ঃ "আজ সেই নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় লেখাটি শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব, কিন্তু রেজেস্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না—প্রায় এক ফর্মা হইবে।"[৭৯] এইদিনই প্রবন্ধটি পাঠানো সম্ভব হয়। কিন্তু অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের মনে কিছু কথা সংযোজনের ইচ্ছা জাগে। ৬ নভেম্বর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন ঃ " 'নিবেদিতা' প্রবন্ধটি বোধকরি পাইয়াছ। তাহার প্রুফ চাই, কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি তোমাদের অসুবিধা হইবে? এখান হইতে প্রুফ যাতায়াতে ঠিক চারদিন লাগিবে। যদি তেমন অসুবিধা হয় তবে যেমন আছে তেমনই থাক।"[৮০]

সংযোজন করা সম্ভব হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। প্রবন্ধটি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে (পৃঃ ১৬৩-১৭৩) মুদ্রিত হয়।[৮১]

কী যোগ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? প্রবন্ধের বর্তমান রূপটি উক্ত সংযোজনের পরবর্তী রূপ কিনা তা জানা যায় না। নাকি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কিছু স্মৃতিচিত্র যোগ করতে চেয়েছিলেন? নিঃসন্দেহে তা করলে প্রবন্ধটি উজ্জ্বলতর হতো। অথবা, স্বামী বিবেকানন্দের অনুষঙ্গ কি তিনি কিছুটা যোগ করতে চেয়েছিলেন?

বাস্তবিক, নিবেদিতার সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিবেকানন্দের উল্লেখমাত্র না করা এই প্রবন্ধের এক বড় অসম্পূর্ণতা। বিদেশিনী নিবেদিতার এদেশকে আপন করার পিছনে মূল চালকশক্তিটি যে স্বয়ং স্বামীজী তা সেসময়েও সকলেরই সম্যগ্‌ভাবে জানা ছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে সে-সত্যটি স্বীকার করতে পারেননি। উপরন্তু নিবেদিতা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।"[৮২] এখানে স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটা প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ থাকছেই।

অথচ স্বামীজীর মূল্যায়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত কিন্তু এই কালে আর পুরনো বিরাগে আচ্ছন্ন নয়, বরং যথাযথ শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল। এর কয়েক বছর আগেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের সামনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামে যে-প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন এবং 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকা-দুটির ভাদ্র ১৩১৫ সংখ্যায় যেটি একযোগে প্রকাশিত হয়[৮৩], সেখানে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন ঃ "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৮৪] এই প্রবন্ধটির যে সংক্ষিপ্ত পাঠ 'বঙ্গদর্শন'-এর ভাদ্র ১৩১৫ সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক বক্তব্য আরো স্পষ্ট ঃ "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতম মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি।"[৮৫]

কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমের মিলনপ্রয়াসে বিবেকানন্দের ভূমিকা প্রসঙ্গে যিনি এতটা শ্রদ্ধাশীল, তিনি আইরিশ মার্গারেটের ভারতীয় নিবেদিতা হয়ে ওঠার মহিমা আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করবেন না কেন? তাহলে কি ব্যক্তি বিবেকানন্দের প্রতি আর নয়, এখন বরং নিবেদিতার আমৃত্যু বিবেকানন্দ-আনুগত্যের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের মূল

বিরাগ? এই প্রসঙ্গে মনে পড়তেই পারে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠিটির কথা—যেখানে নিবেদিতার স্বামীজী-ভক্তির প্রাবল্য নিয়ে কিছু পরিহাস করা হয়েছে।[৮৬] চিঠির ভাষায় মনে হয়, কবি এবং বিজ্ঞানী দুজনেই নিবেদিতার এই শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা নিয়ে কৌতুকবোধ করেছেন।

আবার এই প্রবন্ধ লেখার অনেক পরে ২৪ নভেম্বর ১৯২১ কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়াছেন।"[৮৭] ধারণা হয়, তাঁর এই অসুস্থ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরেই দৃঢ়ভাবে পোষণ করেছেন।

আর এই একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্ধ উপস্থিতি তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা'র মূল্যায়নে এক বড় ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল। [ক্রমশ]

তথ্যসূচী

৫৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৮৭৮
৫৮ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০
৫৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৮৭৮
৬০ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 711
৬১ Ibid., Vol. I, p. 82
৬২ Ibid., p. 526
৬৩ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৮
৬৪ 'উদ্বোধন', ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১১, পৃঃ ৮৮
৬৫ রবিজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯৩, পৃঃ ২৪৪
৬৬ ঐ, পৃঃ ২০০ ৬৭ ঐ, পৃঃ ২৪০
৬৮ 'দেশ', শারদীয়া ১৩৭৩, পৃঃ ১৯
৬৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩
৭০ ঐ ৭১ ঐ, পৃঃ ৫৩৬
৭২ ঐ, পৃঃ ৫৩৩ ৭৩ ঐ
৭৪ Rabindra Nath Tagore: Poet and Dramatist—Edward J. Thompson, Riddi, Calcutta, 1979, p. 284
৭৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৬
৭৬ ঐ, পৃঃ ৫৩৮ ৭৭ ঐ
৭৮ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, 'শনিবারের চিঠি', বিবেকানন্দ-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭০, পৃঃ ৬৮
৭৯ চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃঃ ১২
৮০ ঐ, ১৪শ খণ্ড, ১৪০৭, পৃঃ ৫২
৮১ রবিজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৪
৮২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫
৮৩ ঐ, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ১২০৭
৮৪ ঐ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪২৩
৮৫ 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৭০, পৃঃ ৩৯
৮৬ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৪০
৮৭ রবিজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪৪

শব্দচেতনা ২৮

'সঙ্গীত-সংগ্রহ' অবলম্বনে রচিত বিশেষ শব্দছক

১		২			৩	৪		৫
৬			৭	৮			৯	
		১০				১১		
	১২				১৩			
১৪				১৫				১৬
১৭		১৮					১৯	
		২০				২১		
২২					২৩			

পাশাপাশি : (১) লুকায়ে থেকো না কর দ্রুত পদে —— (৩) ছেলের মুখে মা মা বাণী শুনবেন বলে —— (৬) —— হয় শিব শ্রীপদপরশে, তবে আমি মাগো এতই ঘৃণ্য কিসে (৭) নাহিক —— ভাব অবিরাম কেমনে করিবে তাপিতে উদ্ধার (৯) —— কড়ি চাই না মাগো, দেখা দিতে তাও পার না? (১২) ভক্ত জনন —— ধন এক রাম নাম (১৩) —— সবকে মধ্যে তীনোঁ হি একা (১৭) —— বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার (১৮) —— মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি (১৯) নাম—— পানে রহ মত্ত অবিরাম (২২) প্রসাদ বলে রণে চলে মা —— হয়ে (২৩) —— ধাই অভিসারে তাঁর।

ওপর-নিচ : (১) গুরু মুখে শুনি তুমি মা ভবানী —— শিবে সবার জননী (২) —— যে আমার খাদে ভরা, তোমার ভাবে কৈ মা গলে (৪) মাতা পিতা, —— সখা, সবহি রাম নাম (৫) —— মণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে (৮) দিব তাঁর চরণে ভার, —— বিনে ভার কে আর লবে (১০) জ্ঞানেন্দ্র উপেন্দ্র যোগেন্দ্রাদি কত চরণে পড়িয়া —— রজনী (১১) তোমারে করি —— সব দুখ যায় ভুলে (১৪) রুণ্ড মুণ্ড গলে বিরাজিত অজর অমর —— রে (১৫) যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, —— নেবার কথা কয় (১৬) জীব গতি —— ব্রহ্মাণী করালিনী (২০) কোই গাওয়ত পঞ্চম তান বংশীপুকারো রাধা —— (২১) অকালবোধনে —— কাত্যায়নী, পূর্বেতে জাগিয়া যেন মা আপনি।

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পৌষ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শিকাগো-বক্তৃতা আজো প্রাসঙ্গিক

বিনয় চক্রবর্তী

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। বিশ্বমানব স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার চিহ্নিত দিন। শতবর্ষ পরেও তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের মিলন-বাণী বিশ্বসভ্যতার বেলাভূমিতে বিপুল প্রাণসত্তা নিয়ে সগৌরবে আজো আছড়ে পড়ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি অন্য কারো সঙ্গে তাঁর ঐ বক্তৃতা তুলনীয় কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভারতবর্ষ যে আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ—সে-সংবাদ মদগর্বিত বলদর্পীর দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ববাণী হয়ে ছুটে চলছে দেশে দেশে, দিকে দিকে—দুর্বার গতিতে।

এ হেন ধর্মমহাসভার তথ্যাদি এবং সংবাদ জানার কৌতূহল থাকা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই প্রশ্ন রাখা যায়—(১) ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষ ভারত থেকে আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণপত্রে কোন্ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার উল্লেখ করেছিলেন? (২) ভারত থেকে কতজন প্রতিনিধি ধর্মমহাসভার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ও তাঁদের পরিচয় কি? (৩) কতজন সেখানে সশরীরে যোগদান করেছিলেন এবং যোগদানকারীরা কোন্ মঞ্চ থেকে তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন? এত সব তথ্যাদি সংগ্রহ স্বাভাবিক কারণেই সহজ ব্যাপার নয়, তাহলেও সঠিক বিবরণাদি সংগ্রহ করতে হলে শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের বিবরণাদি-সমন্বিত গ্রন্থাদি প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী বহুকাল পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে প্রচার করে আসছেন। বেদ-এ 'ব্রাহ্মণ' আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত কোন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উল্লেখ নেই, আছে ব্রাহ্মণ বর্ণের কথা। বেদ-পরবর্তী কোন এক সময়ে বৈদিক ধর্ম হিন্দুধর্ম-রূপে চিহ্নিত হয়ে বর্তমানে সারা বিশ্বে 'হিন্দুধর্ম' নামেই স্বীকৃত হয়ে আছে। কিন্তু বেদ, পুরাণকালীন গ্রন্থাদিতে 'হিন্দুধর্ম' বলে কোন শব্দ নেই। বিদগ্ধজনেরা ব্রাহ্মণধর্মকে 'য'-ফলা যুক্ত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-এ রূপায়িত করেন এবং তাকেই হিন্দুধর্ম বলে উল্লেখ করে থাকেন। তবে যিনি হিন্দু, তিনি ব্রাহ্মণ নাও হতে পারেন; কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁকে অবশ্যই হিন্দু হতে হবে। অথচ মনু-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-এর সংজ্ঞা অনুসারে এ-যুক্তি টেকে না।

ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা 'ব্রাহ্মণ' বলতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মণ বর্ণকে নয়। তাহলে অনুমান করা যায়, ব্রাহ্মণ বর্ণের সঙ্গে হিন্দুধর্ম অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে---এ-সংবাদ নিশ্চয়ই উদ্যোক্তাদের অজানা ছিল না। তাঁরা 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণকে না বুঝে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বুঝেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁরা পরিষ্কারভাবে রেখেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো—ধর্মমহাসভার চেয়ারম্যান জন হেনরি ব্যারোজের কথায়—"To secure from leading scholars, representing the Brahmans, Buddhists, Confucian, Parsee, Mahammedan, Jewish and other faiths."[১] সুতরাং 'Brahmin faith' বলতে যে হিন্দুধর্মকেই বোঝানো হয়েছে—এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ধর্মমহাসভার চেয়ারম্যান মিঃ ব্যারোজ আরো জানিয়েছেন ঃ "...since Religion lies back of Hindu literature with its marvelous mystic development...."[২]

ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি চার্লস ক্যারল বনি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন ঃ "This remarkable program presents—Theism, Judaism, Mohammedanism, Hinduism, Buddhism, Taoism."[৩] সুতরাং 'হিন্দু' ও 'হিন্দুধর্ম'—এই দুটি শব্দ ব্যবহারই প্রমাণ করে যে, তাঁরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞাত বা সচেতন ছিলেন।

১ The World's Parliament of Religions—Dr. J. H. Barrows, Vol. 1, p. 18
২ Ibid., p. 3 ৩ Ibid., p. 70

শিকাগো ধর্মমহাসভাতে ভারতবর্ষ থেকে যেসব প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—(১) মণিলাল দ্বিবেদী, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ, (৩) লাহোরের কায়স্থ সভার সেক্রেটারি নরসিংহচারী, (৪) মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শনের প্রতিনিধি, দেবধর্ম মিশনের মোহনদেব, (৫) পার্থসারথি আয়েঙ্গার, (৬) জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী, (৭) ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি ডঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (৮) থিওজফিস্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, (৯) বি. বি. নাগরকার, (১০) মাদ্রাজের মিশনারি রেভারেণ্ড মরিস স্লেটার। চেয়ারম্যান ডঃ জে. এইচ. ব্যারোজ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধিদের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার, মাদ্রাজের মিশনারি রেভারেণ্ড মরিস স্লেটার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত আলোচনা হয়েছিল—উক্ত প্রতিনিধিরা কি সকলেই সশরীরে ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন? এসম্পর্কে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায়, তা হলো—মণিলাল দ্বিবেদী নামে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 'বৈদিক হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। অন্য তথ্যে জানা যায়, মণিলাল দ্বিবেদী শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। এব্যাপারে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ১ম খণ্ডের (১০ম সং) ৩৩৩ পৃষ্ঠায় তথ্যপঞ্জির কয়েকটি পঙ্ক্তি স্মর্তব্য—"হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি, সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি একজন ছিলেন, নাম মণিলাল দ্বিবেদী।" এই গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে (৭ম সং) ৩৫০ পৃষ্ঠায় ব্যক্তিপরিচয়ে পাওয়া যায়—"উত্তরপ্রদেশের এই ব্রাহ্মণ 'বৈদিক হিন্দুধর্মের' প্রতিনিধিরূপে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রামাণিক যেসব তথ্যাদি রয়েছে, সেসবের ভিত্তিতে বলা যায়—'বাণী ও রচনা' গ্রন্থে উক্ত যে টীকা রয়েছে, তাতে কিন্তু প্রমাণিত হয় না মণিলাল দ্বিবেদী সশরীরে শিকাগোতে উপস্থিত ছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ ডঃ হেনরি ব্যারোজের বিশাল ১৬০০ পৃষ্ঠার রিপোর্টে লেখা হয়েছেঃ (১) ধর্মমহাসভার 'cronical' অংশে (p. 113)—"Hinduism by Manilal N. Divadi of Bombay India read by Virchand R. Gandhi." (২) দ্বিবেদীর দীর্ঘ বক্তৃতার রিপোর্টের শুরুতে (p. 316) তাঁর নাম ও শহরের নাম 'Nandad, Bombay Prasidency' লেখা আছে। (৩) ডঃ ব্যারোজের গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষদিকে (p. 1585) প্রতিনিধিসকলের পরিচয়পঞ্জির সঙ্গে দ্বিবেদী সম্বন্ধে বর্ণনা আছে—"Divadi Manilal Mabhubhai (Nabhubhai) B. A. born 1858, member of highest caste of Brahamans, Justice of peace of the town of Nandad and prominent member of the Philosophical Society of Bombay." দ্বিবেদীর লেখা দুটি দীর্ঘ ভাষণ সাড়ে বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে ডঃ ব্যারোজের গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং তাঁর একটি ছোট ছবিও আছে (p. 259)। এছাড়া অনেক অনুপস্থিত প্রতিনিধিদের চিত্রও ডঃ ব্যারোজের উক্ত গ্রন্থে আছে।

শিকাগো শহরের প্রধান সংবাদপত্র 'The Chicago Daily Tribune'-এ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর দ্বিবেদীর ভাষণের অনুলিপিতে আছে—"Dr. Jenkin Lloyd Jones introduced Virchand R. Ganthi [Gandhi] a bachelor of Arts from an Indian College, who read a paper on 'Hinduism' written by his fellow collegian Manilal N. Divadi who is unable to attend the Parliament in person." আবার একই সংবাদপত্রে ২৫ সেপ্টেম্বরের ঘটনা হিসাবে পরদিন ২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল 'Scientific Section' শিরোনামে—"The paper of the afternoon session were answers of the Advaita Philosophy to religious problems by Manilal N. Divadi, read by Prof. Godspeed of the University of Chicago." অর্থাৎ দ্বিবেদীর দুটি বক্তৃতাই অন্যেরা পড়েছিলেন। শিকাগোতে গৃহীত কোন ফটোগ্রাফের মধ্যে দ্বিবেদীকে দেখা যায় না।

অপরদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মণিলাল গান্ধীর সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নান্দিয়াড়ে। তিনি ২৬ এপ্রিল হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে এক চিঠির শেষে লিখেছিলেনঃ "নান্দিয়াড়ে শ্রীযুক্ত মণিলাল নাড়ু ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি অতি বিদ্বান ও সাধু প্রকৃতির ভদ্রলোক। তাঁর সাহচর্যে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।" অথচ এমন পছন্দসই মানুষের সঙ্গে শিকাগোতে তাঁর আবার দেখা হয়েছে—স্বামীজী এমন কথা লেখেননি।

শিকাগো ধর্মমহাসভা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিবরণ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পাঁচটি প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি হলো—(১) দি ওয়ার্লডস পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন, চেয়ারম্যান জন হেনরি ব্যারোজ সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ১৮৯৩, শিকাগো। (২) নিলস্ দি পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেস, ওয়ালটার আর. হটন সম্পাদিত, ১৮৯৩। (৩) দি ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ রিলিজিয়ান্স অ্যাট দি ওয়ার্ল্ড কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন,

জে. ডব্লিউ. হ্যানসন সম্পাদিত, নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৪। (৪) রিভিউ অফ দি ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়াস কংগ্রেসেস, এল. পি. মার্সার সম্পাদিত, শিকাগো, ১৮৯৩। এবং (৫) এ কোরাস অব ফেইথস, লেখক—জেনকিন লয়েড জোন্স, শিকাগো, ১৮৯৪। এগুলির মধ্যে ডঃ ব্যারোজ সম্পাদিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড সর্বাপেক্ষা বিশাল ও সর্বাধিক প্রচলিত। উক্ত গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য, এমনকি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও সবগুলি নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী অধুনালুপ্ত বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে সংখ্যায় ডঃ ব্যারোজের গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। ডঃ ব্যারোজের গ্রন্থটি ছাড়া বাকি গ্রন্থগুলিতে ধর্মমহাসভার উদ্যোগকর্তারা যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার ইঙ্গিত বিদ্যমান।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মণিলাল দ্বিবেদী ধর্মমহাসভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, তবে তিনি 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, যা দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী পাঠ করেন। শিকাগোর প্রধান ও বিখ্যাত পত্রিকা 'Chicago Daily Tribune'-এর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটির সারমর্ম ও প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন মাদ্রাজের মিশনারি রেভারেণ্ড মরিস স্লেটারও 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই মণিলাল দ্বিবেদীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাই তিনি ঐ প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন এবং সেটা 'হিন্দুধর্ম' (Hinduism) শিরোনামে ধর্ম-মহাসভার কার্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পূর্বোক্ত প্রতিনিধিদের তালিকার মধ্যে নরসিংহচারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ছাড়া বাকি কেউই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরাও মণিলাল দ্বিবেদীর মতো লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন। নরসিংহচারী ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিবেকানন্দের মতো 'বিজ্ঞান শাখায়' ভাষণ দিয়েছিলেন। মোহনদেব ও পার্থসারথি আয়েঙ্গারের প্রবন্ধগুলি পাঠ করেছিলেন বিজ্ঞান শাখার সভাপতি স্বামীজীর বিশেষ বন্ধু মারউইন মেরি স্নেল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, থিওজফিস্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হিন্দু প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন। কারণ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি তখন দেশে-বিদেশে হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করতেন; এমনকি ব্রাহ্ম ডঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বি. বি. নাগরকারও 'উদার হিন্দুধর্মের' (Liberal Hinduism) প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে অভ্যর্থনার উত্তরে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন) বলেছিলেনঃ "Modern India has sprang from ancient India by a Law of Evolution a process of continuity, which explains some of the most difficult problems of our national life. The Greeks and Seythins, The Turks and Tatars, the Mongals and Muslims rolled over our country like torrents of destruction. Our independence, our greatness, our prestige all had gone, but nothing could buy away our religious vitality, we are Hindus still and shall always be."[৪]

মণিলাল দ্বিবেদী হিন্দুত্বের সংজ্ঞা সম্বন্ধে লিখেছিলেনঃ "But we may agree to use the term in the sense of that body of philosophical and religious principles which are professed in part or whole by the inhabitants of India."[৫]

ইদানীংকালে ভারতবর্ষে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সেসম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ধর্মমহাসভায় অনিমন্ত্রিত অথচ শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণকারী স্বামী বিবেকানন্দের প্রদত্ত ভাষণেও হিন্দুত্বের সংজ্ঞা উপরি উক্ত রকমেরই ছিল। এসম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা বলেছেনঃ "এইরূপে কোন ব্যক্তি নিজ হিন্দু আখ্যাকে আর্য, ব্রাহ্ম, বৈদিক বা সনাতনপন্থী—এইসকল বিশেষণে বিশেষিত করুন বা নাই করুন, তাঁহার (বিবেকানন্দের) মতে সে-ব্যক্তি হিন্দুই।"[৬] আমাদের ধারণা, ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারাও এই অর্থেই হিন্দুধর্মকে দেখতেন। সেজন্য ভারতবর্ষের সকল প্রতিনিধিকেই তাঁরা 'হিন্দু' বলে গণ্য করতেন। তাই হিন্দু তথা ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্পর্কে ডঃ ব্যারোজ বলেছেনঃ "India, mother of religions, was represented by the spiritually minded Mazoomdar, a master of eloquence Vivekananda, 'the orange monk', who exercised a wonderful influence over his

---

৪ The World's Parliament of Religions, Vol. I, pp. 86-87

৫ Neely's History of the Parliament of Religion by Walter R. Houghton, 4th ed., p. 105

৬ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ২য় সং, ১৭ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৪৬-২৪৭

auditors, the keen and courteous Nagarkar, the attractive Narasima, the acute and philosophical Gandhi, the metaphysical Chakravarti...."[৭] স্বামী বিবেকানন্দ ও মণিলাল দ্বিবেদীর সংজ্ঞা গ্রহণ করে ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা ভারত থেকে আমন্ত্রিত সকলকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-রূপে চিহ্নিত করেছেন; তন্মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধরাও একসূত্রে গ্রথিত ছিলেন।

১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩—মোট ১৭ দিন ধরে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ১৭ দিনে স্বামীজী মূল মঞ্চে ৬টি এবং বিজ্ঞান মঞ্চে ৪টি ভাষণ প্রদান করেন। প্রদত্ত ভাষণগুলির মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান-মনস্কতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও বিশ্বজনীন উদারতার চিত্র পরিস্ফুট। প্রথম দিনের ভাষণে তিনি বলেন: "Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilisation and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come; and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honour of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal." এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেখা ধ্যানলোকের ঋষি নরনারায়ণের কঠোর সাবধানবাণী। বিস্ময়কর ঘটনা! শতাধিক বর্ষ পর গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এক নারকীয় নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো সেই আমেরিকাতেই।

ধর্মমহাসভাতে যখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, তখন ১৫ সেপ্টেম্বরের ভাষণে স্বামীজী কুয়োর ব্যাঙের গল্পটি বলে ধর্মীয় নেতাদের কূপমণ্ডুকতাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। নবম দিনে (১৯ সেপ্টেম্বর) 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তিনি তাঁর লিখিত একমাত্র ভাষণটি পাঠ করেছিলেন। সে-ভাষণে তিনি বলেন: "কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরো নিকৃষ্ট।" সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের সমন্বয় করে তিনি মূর্তিপূজা-বিরোধীদের তীব্রভাষায় বলেন: "খ্রিস্টানেরা কেন গির্জায় যান? ক্রুশই বা তাঁদের কাছে এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি রয়েছে কেন? প্রোটেস্টান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব হয় কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করে জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময় রূপবিশেষের সাহায্য না নেওয়াও আমাদের পক্ষে সেরকম অসম্ভব।... এজন্য হিন্দুরা উপাসনার সময় বাহ্য প্রতীক ব্যবহার করেন।" স্বামীজী দশম দিনের (২০ সেপ্টেম্বর) ভাষণে বলেন: "তোমরা খ্রিস্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে (ভারতে) ধর্মপ্রচারক পাঠাতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু বলো দেখি, অনাহার-দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তাদের দেহগুলি বাঁচানোর জন্য কোন চেষ্টা তোমরা কর না কেন?"

স্বামীজী বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে গভীর চিন্তাপ্রসূত প্রশস্তি করেছেন, তার তুলনা বিরল। তিনি বুদ্ধকে নিজের 'ইষ্ট' পর্যন্ত বলেছেন এবং বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের সার্থক পরিণতি বলে ঘোষণা করেছেন। ষোড়শ দিবসে (২৬ সেপ্টেম্বর) বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া যেমন হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না, তেমনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না।" এই কারণে তিনি উভয় ধর্মকে গোঁড়ামি ত্যাগ করতে বলেছেন। মহাসম্মেলনের শেষদিনের সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন: "আমি কি চাই যে খ্রিস্টানরা হিন্দু হোন? ঈশ্বর তা না করুন।... খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হবে।... যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তাঁকে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, তাঁর মতো লোকদের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হবে—'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'" ❑

৭ The World's Parliament of Religions, Vol. II, p. 1562

অনুচিন্তন

গৌরী রায়চৌধুরী (বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঠাকুর যেন বলছেন—
'ওরে আমাকে আবার তোরা
ভাগ করবি কিরে?
আমি তো সবার মধ্যেই আছি।
তোর ঘরে যে-ঠাকুর,
রামের ঘরেও যে, শ্যামের ঘরেও সে।'
মা বললেন ঃ "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।"
সে-ই তো অখণ্ডমণ্ডলাকার।
তবে?
তোর ঠাকুরের গলায় ফুলের মালা,
আমার ঠাকুর ধূলিধূসরিত।
তোর ঠাকুর জিলিপি খাচ্ছে,
আমার ঠাকুর উপোসী।
ঠাকুর যে হাসে!
ওরে, কাকে কেটে ভাগ করিস?
সেই অকাট্য, অখণ্ডকে?
স্তম্ভমধ্যে নৃসিংহাবতার দেখিসনি?
ঠাকুর যেন বললেন—
'ওরে! সবটা খা, চেটেপুটে খা।
খণ্ড খেলে খণ্ড পাবি।
ভেদবুদ্ধিতে ভগবান নেই,
আছে শুধু মানুষের কূটবুদ্ধি।
যেই জল—সেই পানি, যেই কৃষ্ণ—সেই খ্রিস্ট,
যেই রাম—সেই রহিম, যেই রাম—সেই কৃষ্ণ,
অভেদ বুদ্ধিতে রামকৃষ্ণ!'

মুখ ফেরাও সূর্যের দিকে

দেবেন বিশ্বাস

শোকতাপ নয়, হাঁটু মুড়ে অষ্টাবক্র মুদ্রার
প্রদর্শনীও নয়—
শিরদাঁড়া খাড়া কর
মুখ ফেরাও সূর্যের দিকে।
উষ্ণবীর্য দীপ্রদহনে নাশ কর
বিঘ্নমালিন্যের সকল কাঁটালতা।
তুমিও উপেক্ষার তীক্ষ্ণ শরে দহন কর
ক্লীবতার শীতল পৌরুষ,
সিংহবীর্যে পরাভূত কর
সকল কাপুরুষতা।

তোমার মধ্যে

জয়নাল আবেদীন

কেউ ফিরিয়ে দিলে
তোমাকে মনে পড়ে
একটুখানি ভালবাসি
কেউ আঘাত করলে
তোমাকে দেখতে পাই
আর একটু কাছে আসি।

আলোতে সাঁতার দিলে
তোমাকে ভুলে থাকি
তোমাকে মনে করতে পারি না
বাতাস ছুঁয়ে গেলে
তোমাকে দূরে ঠেলে দিই।

ঘরে আগুন লাগলে
বুকটা খা খা করে
তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
তোমার মধ্যে হারিয়ে যাই।

তোমার পরশ

রবি দত্ত

ধরার মাঝে ত্রিতাপ-শরে হৃদয় যখন ব্যথায় ভরে—
অশ্রু হয়ে আস।
গ্রীষ্মনাশী বর্ষা সম শীতল করি অঙ্গ মম
দুঃখদাহ নাশ॥
পশি যবে অন্ধবনে ব্যর্থ হয়ে জীবনরণে,
গভীর হতাশায়।
সঞ্জীবনী আশা হয়ে জীয়নকাঠি আস লয়ে
মনের আঙিনায়॥
ষড়রিপু যুক্তি করি' ভর করি' মোর দেহতরী,
সংসার-খাঁচায়।
আড়াল থেকে সূত্র ধরে অঙ্গুলিহেলনে মোরে
পুতুল নাচায়॥
দেহমনে ক্লান্ত হয়ে সারাদিনের গ্লানি বয়ে
হলে মুহ্যমান।
নিদ্রারূপে চুপে চুপে আসি কর দেহকূপে
পীড়া অবসান॥

বিস্মরণ

বুদ্ধদেব রায়

রাস্তায় এক বৃদ্ধকে দেখলাম
এলোমেলোভাবে হেঁটে যাচ্ছেন,
কোথায় যাবেন জানেন না।
অনেক লোক তাঁকে ঘিরে প্রশ্ন করছে ঃ
"আপনার বাড়ি কোথায়?"
উত্তরে তিনি বলছেন ঃ
"মনে করতে পারছি না।"
তিনি কিন্তু পাগল নন,
শুধু স্মৃতিভ্রংশের শিকার।

তাঁরই কথা ভাবতে ভাবতে
আমি নদীর ঘাটে এসে বসলাম
পড়ন্ত বিকেলে;
পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবুডুবু।
দেখতে দেখতে—
টুপ করে লাল সূর্যটা
দিগন্তের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।
তখনো কিন্তু লালিমা রয়েছে আকাশ জুড়ে।
সেই আভা নদীর জলে ছড়িয়ে
জলটাকেও করে দিল লাল।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় লীলা দেখতে দেখতে
হঠাৎ মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।
দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে,
প্রাণের গভীরে বেজে উঠল
বিষাদের সুর
মনটা হঠাৎ হুহু করে উঠল।

মনে হলো—
আমিও সেই বৃদ্ধের মতো
বিস্মরণের শিকার।
মনে করতে পারছি না
কোথায় আমার ঘর।
অথচ যেন বুঝতে পারছি
কোথাও আছে আমার আসল ঘর,
যেখানে ফিরতে হবে আমাকে।

গোধূলির ম্রিয়মাণ আলোয়
পাখির দল সার বেঁধে ফিরছে কুলায়।

বুকটা আরো টনটন করে উঠল—
মনে হলো আমি কত অসহায়।

আনন্দ

সুবল কর

আনন্দ, সে শুধু আনন্দময়ের
স্মরণে মননে।
সর্বস্ব উজাড় করা
আত্মনিবেদনে।

চিত্তের যে উল্লাস সে প্রীতিতেই
আনন্দ-রমণ।
অনির্বচনীয় এক অনুভবে
আত্ম-বিস্মরণ।
এ-ই তো অমৃত আস্বাদন—
পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনে।

পরার্থে যে আত্মত্যাগ ব্রত,
তাতেই তো চিত্তশুদ্ধি।
আনন্দ সে মুক্তিরই প্রোজ্জ্বলতা,
অব্যক্ত এ উপলব্ধি।

সৃষ্টির যে আদ্যাশক্তি সে আনন্দ,
এ-বিশ্ব আনন্দলীন।
আনন্দেই সত্তার সঠিক অভিব্যক্তি,
নিরানন্দ গতিহীন।

তাই জীবনের সার্থকতা সেই—
আনন্দানুসন্ধানের নিত্য আকিঞ্চনে।

জাগাও আমাকে

তারাপ্রসাদ সাঁতরা

ছিন্ন পাতার মতো
খসে পড়ে জীবনের আয়ু...
নিঃসীমতায় চলে যাব এরপর
আলো-ঝলমল বিশুদ্ধ প্রভাতে দাঁড়াব কখন?

বারান্দায় জমছে অন্ধকার
কতকাল নীরব পাথরের মতো
যে-পাথরে ফুটবে না ফুল
দেখব না রোদ্দুর, মাঠের ফসল!

কেবলই ঢেউ ভাঙে...
ছবি ভাঙে... হারায় অবয়ব...

অথচ আমি চেয়েছি
জাগাও আমাকে, হে ঈশ্বর!
অনন্ত প্রেমের ভিতর।

সাধু তুকারাম

স্বামী বিনির্মলানন্দ

পথের দুইপার্শ্বে হরিৎ শস্যে ভরা খেত। কোথাও বৃহৎ বৃক্ষের গর্বিত শিরোত্তোলন। অদূরে ছোট ছোট নয়নাভিরাম পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যানী। কোথাও আবালবৃদ্ধবনিতার সমাবেশে উচ্চাসনে উপবিষ্ট বালকের কথকতা। আবার কোথাও হরিকথা-সঙ্কীর্তনে উদ্দাম নৃত্য—এরূপ বিচিত্র পরিবেশে সমাকীর্ণ দেহু গ্রাম। একদিন ব্যাকুলহৃদয়ে বিঠ্‌ঠলজীর নামগুণগান করতে করতে গ্রামের পথে চলেছেন তরুণ সাধক তুকারাম।

ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, ভালবাসা ও নামগুণগানে তাঁর প্রেমাশ্রু দেখে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং আনন্দ পেত তাঁর হরিকথা-সঙ্কীর্তনে যোগদান করে। কিন্তু তাঁর এই প্রভাব ও খ্যাতি গ্রামের প্রতিপত্তিশালী মম্বাজী গোস্বামীর ঈর্ষার কারণ হলো। তাই তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি ভক্তের ভান করে হরিকথা-সঙ্কীর্তনে প্রত্যহ যোগ দিতে লাগলেন।

আজ সেই সুযোগ। তুকারামকে নির্জন স্থানে একা পেয়ে একটি কাঁটাগাছের ডাল নিয়ে তিনি অতর্কিতে তাঁর পিঠে আঘাত করতে লাগলেন। আঘাতে আঘাতে পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু ভগবৎ নামগানে মগ্ন, দেহবোধ-বিরহিত সাধকের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে বিস্মিত হলেন মম্বাজী। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি লজ্জিত হলেন এবং গৃহে ফিরে ক্লান্ত দেহে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এদিকে নিয়মিত হরিকথা-সঙ্কীর্তনে মম্বাজীর অনুপস্থিতি দেখে তুকারাম তাঁর বাড়ি গেলেন এবং বিনীতভাবে বললেনঃ "গোঁসাই, দোষ আমারই। বহুক্ষণ ধরে আমায় মেরে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; এজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। কিছুক্ষণ পদসেবা করছি। অনুগ্রহ করে আপনি কীর্তনাঙ্গনে চলুন।"[১] তুকারামের এই মধুমাখা কথা শুনে এবং অমানুষী ক্ষমা ও বিনয় দেখে অনুতপ্ত-হৃদয় মম্বাজী কেঁদে ফেললেন। তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেনঃ "শুনেছি, তুমি ভক্ত ও মহৎ। কিন্তু তুমি যে এত মহৎ তা জানতাম না! তুমি আমার মতো অন্ধকে কৃপা করে আলোর পথ দেখাও। আমি তোমার চরণে নিজেকে সঁপে দিলাম।"[২] তুকারাম তখন আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করে আপনার করে নিলেন।

দেহুতে সাধু তুকারামের মর্মরমূর্তি

মহারাষ্ট্রের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল দেহু গ্রামে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় তুকারাম বা তুকার। দেহু মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে প্রায় ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। তাঁর বংশের উপাধি ছিল 'মোড়ে' এবং জাতিতে তাঁরা ছিলেন শূদ্র। মোড়ে পরিবার ছিল বংশানুক্রমে পণ্ঢরপুরের বিঠ্‌ঠলজীর (শ্রীকৃষ্ণের) অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত। পিতা বোহ্লাবা ছিলেন সৎ ও উদারচেতা এবং মাতা কনকাবাঈ ছিলেন পতিব্রতা, ভক্তিমতী ও দয়াশীলা। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাওজী বিষয়-বিরাগী ও উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কান্নাইয়া ছিলেন বিষয়ানুরাগী ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁদের পারিবারিক উপার্জনের একমাত্র উৎস। আয়ও হতো প্রচুর। গ্রামের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সরল-স্বভাবের বালক তুকার বেশ আনন্দে দিন কাটছিল। স্বাভাবিক সংস্কারবশত বিঠ্‌ঠলজীর প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়। একদিন তুকা কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে বিঠ্‌ঠলজীর এক বিশেষ উৎসবে পণ্ঢরপুরে যান। সেখানে সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ক্লান্তশরীরে যখন বৃক্ষতলে বিশ্রাম করছিলেন, সেইসময় স্বপ্নে এক দিব্যকান্তি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁকে দীক্ষাদান করেন। এই দীক্ষাদান বিষয়ে একটি গাথায় তুকা বর্ণনা করেছেনঃ "বাবাজী আপলে সাক্ষিতলে নাম মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরী।"[৩] অর্থাৎ তাঁর গুরুর নাম বাবাজী এবং মন্ত্র দিলেন 'রামকৃষ্ণহরি'। তারপর নিজ গ্রামে ফিরে এসে তিনি পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে বিঠ্‌ঠলজীর নামজপ ও সঙ্কীর্তনে যোগদান করতে সুযোগ হারাতেন না। এইভাবে প্রায় ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত চলেছিল তাঁর অনাবিল শান্তিময় জীবন।

কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস! মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুঃখ-দুর্বিপাক। ইতোমধ্যে পিতা বোহ্লাবা তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য বালিকা

রুক্মাবাঈয়ের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ করালেন এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়ার পরলোকগমনে স্বাভাবিক সংসারবিমুখ সাওজী সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই অল্পসময়ের ব্যবধানে হারাতে হয় পিতা-মাতা উভয়কেই। অকস্মাৎ তুকার স্কন্ধে এক বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। সংসার-অনভিজ্ঞ তুকার পারিবারিক আয় কমতে থাকে। ব্যবসাও নষ্টের পথে। জমিজমা যা ছিল, বৃষ্টির অভাবে চাষবাস করা গেল না। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। খাদ্যশস্য ও জলাভাবে গৃহপালিত পশু মরে যেতে শুরু করল। এমনকি খাদ্যাভাবে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু হলো। এসকল মর্মান্তিক ঘটনা তাঁকে সংসারের প্রতি স্বতই বীতশ্রদ্ধ করে তুলল।

খরার প্রাবল্য হ্রাস পেলেও তুকার সাংসারিক দারিদ্র্য চরমে উঠল। দারিদ্র্যের মোকাবিলা করতে ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। পূর্বে যারা তাঁকে একটু সাহায্য করতে পেলে ধন্য মনে করত, তারাই এখন সরে পড়তে লাগল এবং ঋণদাতারা ঋণ দিতে অস্বীকৃত হলো। এমনকি প্রতিবেশীরাও এই দুঃসময়ে সরে থাকল। স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে যেমন দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হয়ে অন্ধকারময় জগতের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন 'সখার প্রতি কবিতা'য়—"হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল, সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ; তবে পাবে এ-সংসারে স্থান।" তেমনি তুকা মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং জগৎ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে একটি গাথার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন তাঁর মনোভাব ঃ

"বরে জালিযাকে অবধে সাংগাতী
বাঈটাচে অন্তী কোণী নাহী।
ধনবন্তালাগী সর্ব মান্যতা আহে জগী॥"[৪]

অর্থাৎ, যদি তুমি ধনবান হও, তাহলে মানুষ তোমার কাছে আসবে। কিন্তু যদি দরিদ্র হও, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে।

পারিবারিক সচ্ছলতা ও সুখ আনয়নের জন্য নিকট প্রতিবেশীরা পরামর্শ করে তুকাকে আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করল ধনীকন্যা জিজাবাঈয়ের সঙ্গে। ঋণদায়ে নিমজ্জিত তুকার প্রতি সমব্যথী জিজাবাঈ তাঁর পিতার কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ এনে স্বামীকে দিলেন, যাতে তিনি পুনরায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়ে ঋণমুক্ত হন এবং সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। কিন্তু 'উল্টা সমঝিলি রাম'। খরিদ্দাররা ধারে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা দিত না। আবার কারো দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ দেখলে তুকা অযাচিতভাবে নিজের দোকানের জিনিস দিয়ে তাকে সাহায্য করতেন। তাই শীঘ্র দোকানটি 'ডকে' উঠল। ফলে দারিদ্র্য 'যে-তিমিরে সেই তিমিরে' রইল।

তুকারাম যেমন ছিলেন ধীর-স্থির, শান্তপ্রকৃতির ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি; বিপরীতক্রমে তাঁর স্ত্রী জিজাবাঈ ছিলেন রূঢ়, কর্কশভাষী, অস্থির ও কলহপ্রিয়া। স্ত্রীর স্বভাব ছিল অনেকটা সক্রেটিস-জায়া যানথেফির মতো। একদিন বাড়ির সিঁড়িতে চিন্তামগ্নভাবে বসে আছেন সক্রেটিস। তাঁর পত্নী কোন কারণে ক্রুদ্ধা হয়ে তাঁকে কটূক্তি করতে লাগলেন। কিন্তু এই রূঢ়বাক্য সক্রেটিসকে অশান্ত করতে পারল না। ফল হলো বিপরীত। যানথেফি আরো ক্রুদ্ধা হয়ে ওপর থেকে এক বালতি ময়লা জল স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন। ওপরের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে সক্রেটিস বললেন ঃ "এমন গর্জনের পর যদি বর্ষণ না হয়, তবে তো গর্জন বৃথা হয়ে যায়।" অনুরূপ ঘটনা ঘটে তুকার ক্ষেত্রেও। অভাব-অনটনের সংসারে গরিবদের মধ্যে গৃহের আবশ্যকীয় জিনিস অকাতরে বিতরণ করতে দেখে জিজাবাঈয়ের ক্রোধ চরমে উঠল। ঘরে আর কিছু না পেয়ে একটি ইক্ষুদণ্ড দিয়ে তিনি তুকার পিঠে আঘাত করতে লাগলেন। দণ্ডটি ক্রমে অদ্বৈতভাব বজায় রাখতে না পেরে দ্বিখণ্ডিত হলো। জিজার চেঁচামেচি, গালাগালি, চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এল। শান্তস্বভাব তুকা দ্বিখণ্ডিত আখের অংশ-দুটি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন ঃ "আমার জিজার কী বুদ্ধি! আমাদের দুজনের জন্য দুটুকরো আখের দরকার ছিল; তা কী অপূর্ব কৌশলে এটি দুভাগ করে নিল!"[৫]

এইভাবে ভার্যার ভর্ৎসনা ও গঞ্জনা, সাংসারিক দারিদ্র্য ও মানুষের অবজ্ঞা লাভ করে তুকা সংসার থেকে যতই মনকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন, ততই বিঠ্ঠলজীর প্রতি তাঁর অনুরাগ, প্রীতি ও শরণাগতি বাড়ছিল। তাই সংসারের ভার ছোটভাই কান্নাইয়ার ওপর অর্পণ করে তিনি দেহুর অদূরে ভাবনাশ পাহাড়ে মাঝে মাঝে গিয়ে তপস্যায় মগ্ন হতে লাগলেন। সাধন-ভজনে দিনের পর দিন সেখানে কেটে যেতে লাগল। কিন্তু সেখানে স্ত্রী ও ভাইয়ের আগমন এবং প্রত্যাবর্তনের তাগাদায় তিনি স্থানপরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। চলে গেলেন নির্জন ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে। এইকালে প্রবল বৈরাগ্যানলে তিনি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সর্বদা বিঠ্ঠলজীর ঐকান্তিক স্মরণ-মনন ও ধ্যানে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে তিনি যেন বিঠ্ঠলজীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ যেন তিরোহিত হয়েছিল। পাণ্ডবজননী কুন্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন সর্বদা তাঁকে দুঃখদান করেন, তাহলে সর্বদা ভগবৎচিন্তন করতে বাধ্য থাকবেন; তেমনি তুকা সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি, অভাব-অনটন ও মানুষের অবজ্ঞাকে ঈশ্বরের অসীম কৃপা বলে মনে করেছিলেন। কারণ, ঐ দুঃখ-কষ্ট যদি না থাকত, তাহলে ঈশ্বরের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারতেন না। তাঁর একালের মনোভাব স্বতোৎসারিত হয়েছিল একটি বিখ্যাত গাথায়—

"বরে জালে দেবা নিঘালে দিবালে
বরী যা দুষ্কালে পীড়া কেলী।

অনুতাপে তুঝে রাহিলে চিন্তন জালা হী বমন সংবসার
বরে জালে দেবা বাঈল কর্কশ বরী হে দুর্দশা জনমধ্যে।
বরে জালে জগী পাবলো অপমান বরে গেলে
ধনগৃহে ঢোরে॥"[৬]

অর্থাৎ এটা ভাল হলো যে, আমি দেউলিয়া হয়েছি। এটা ভাল হলো যে, দুর্ভিক্ষ আমাকে উৎপীড়িত করেছে, আর এইসঙ্গে জাগতিক প্রলোভন সবেগে ধাবিত কুকুরের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এটা ভাল হলো যে, আমার জায়া কলহপ্রিয়া। এটা ভাল হলো যে, আমি গরু, বাছুর, অর্থ সবই হারিয়েছি এবং এপৃথিবীতে আমি অপমানিত হয়েছি। এসকল চরম দুঃখ-কষ্টে না পড়লে হয়তো আমি তোমাকে মন-প্রাণ ঢেলে স্মরণ করতে পারতাম না। সেজন্য তোমার কৃপার কথা কি আর বলব!

তুকারাম এসময় সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই জাগতিক ভোগসুখ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এজগতে অধিকাংশ মানুষ জগদীশ্বরকে ভুলে জাগতিক ভোগ্যবস্তুর প্রতি প্রলুব্ধ হয় দেখে একটি গাথার মাধ্যমে তিনি ব্যক্ত করেছিলেনঃ "জেথে পাহে তেথে কান্তিতী ভূস চিপাড়ে চোখুনি পাহতী রস।"[৭] অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আখের ছিবড়ে চিবাতে ভালবাসে। আর তাই করছেও।

সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তুকারাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'ভাগবত' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সাধকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রমুখের রচনাবলী পাঠ করতেন। ক্রমশ তিনি বিঠ্ঠলজীর দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ব্যাকুলতা বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেনঃ "ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই—তাদের ব্যাকুলতা আসে না।"

সাধক তুকারামের সারাদিন কোথা দিয়ে চলে যেত তা তিনি টের পেতেন না। ব্যাকুলভাবে কান্না এবং তন্ময় হয়ে জপ-ধ্যান ও মধুর কণ্ঠে নাম-সঙ্কীর্তনে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। অবশেষে বিঠ্ঠলজী কৃপা করে তুকারামকে দর্শনদানে ধন্য করলেন। বিঠ্ঠলজীর দর্শনলাভের পর তুকারাম বিষয়ী মানুষের সঙ্গশূন্য হয়ে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কেবল যারা ভক্ত, তাদের কাছে তিনি তাঁর গাথা ও ভজন পরিবেশন করে আনন্দ পেতেন। তাঁর সাধুতা, ঈশ্বরনির্ভরতা ও ঐকান্তিক ভক্তির কথা শুনে পণ্ঢরপুরে থাকাকালীন একদিন ছত্রপতি শিবাজী তাঁকে দর্শন করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। তাঁকে আনয়নের জন্য শিবাজী সম্মানসূচক ছত্র, যান ও বিভিন্ন উপহার দিয়ে একজন কর্মচারীকে পাঠান। কিন্তু নির্লোভ তুকারাম কর্মচারীর সঙ্গে শিবাজীর রাজধানীতে গেলেন না, উপহারাদিও গ্রহণ করলেন না। শুধু কয়েকটি গাথা লিখে পাঠালেন। শিবাজী সব দেখেশুনে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হলেন না; বরং গাথাগুলি পাঠ করে তাঁর ওপর আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। অবশেষে শিবাজী একদিন সাধারণ বেশে বিনীত, নম্র শিষ্যের মতো তুকারামের কাছে এলেন। কথিত আছে, সাধু তুকার সঙ্গ করে এবং তাঁর 'হরিকথা' শুনে শিবাজী এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকৃত হয়ে সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষী হন। তখন তাঁর মা জিজাবাঈ উদ্বিগ্ন হয়ে তুকারামের শরণাপন্ন হন। তুকা শিবাজীকে বুঝিয়ে রাজকার্যে উৎসাহিত করে তাঁর মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।[৮]

হরিকথা-সঙ্কীর্তনে মগ্ন তুকারাম। উপবিষ্ট রয়েছেন ছত্রপতি শিবাজীও।

এরপর থেকে তুকারামের সুমধুর কণ্ঠের হরিকথা শোনার আগ্রহে এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হওয়ার জন্য বহু ভক্ত দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল। এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাও তাঁর মতো শূদ্রের কাছে শিষ্যত্বগ্রহণে উৎসুক হয়ে তাঁর সঙ্কীর্তনাঙ্গনে আগমন করত। তিনি কখনো দেহুতে, কখনো লোহাগ্রামে, কখনোবা কোন ভক্তের বাড়িতে হরিকথা-সঙ্কীর্তন করতেন। বিভিন্ন গাথার মাধ্যমে তিনি উপদেশ দিতেন—ভাই, নিরন্তর গোবিন্দের নাম জপ করে যাও। জপের ফলে তুমি গোবিন্দস্বরূপ হয়ে উঠবে। তোমার আর তোমার প্রভুর মধ্যে সকল পার্থক্য ঘুচে যাবে। ভাই, তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভাবছ কেন? তুমি যে এ-বিশ্বের মতো মহান।[৯]

তাঁর ভক্তসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও শত্রুর অভাব ছিল না। অবশ্য প্রথমে তারা তাঁর প্রতি শত্রুতাচরণ করলেও পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর চরণে নিজেদের সঁপে দিত। লোহাগ্রামের সিবাবা কাসার নামে এক বণিক প্রথমে তুকারামের প্রতি

শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গগুণে এবং নামসঙ্কীর্তন শুনে তাঁর একান্ত অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। এই পরিবর্তনে তাঁর পত্নী খুবই অসন্তুষ্ট হন। পাছে তাঁর পতি ব্যবসাপত্র ত্যাগ করে সর্বদা সাধুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, সেজন্য তিনি সাধু তুকারামের প্রাণনাশের কথা ভাবলেন। সে-সুযোগ মিলতে বিলম্ব হলো না। একদিন তুকারাম ভক্তগণ-পরিবৃত হয়ে সিবাবার বাড়িতে হরিকথা-সঙ্কীর্তন সমাপন করে বাড়ির বাইরে এলে সিবাবার স্ত্রী এক হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল তাঁর মাথায় ঢেলে দেন। ফলে তাঁর সারা শরীরে বড় বড় ফোসকা পড়ে যায় এবং ক্রমে মারাত্মক ঘায়ে পরিণত হয়। কিন্তু বিঠ্ঠলজীর কৃপায় তা শীঘ্র সেরেও যায়। পরে সিবাবার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তুকার শরণাগত হন এবং শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। এইভাবে অনেকে তাঁকে সম্যক না বুঝে অনিষ্ট করতে এসে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং তাঁর সঙ্গগুণে পবিত্র জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

সাধু তুকারাম শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন।

পণ্ঢ়রপুরে তুকারামের সঙ্গে সাধু রামদাসের মিলন ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অধ্যাত্মসাধনায় উচ্চারূঢ় দুই দিকপাল পরস্পরকে দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। রামদাসজী ছিলেন এক অদ্ভুত ত্যাগী সাধু, যিনি বিবাহ করতে বসে বিভিন্ন ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের পর বিশেষ মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার আগে হঠাৎ শুনলেন—'সাবধান'। (মারাঠি ভাষায় এর অর্থ—মনকে একাগ্র করে মন্ত্র উচ্চারণ কর)। ঐ একটি শব্দেই তাঁর সুপ্ত বৈরাগ্য জাগ্রত হয় এবং তিনি তখনি বিয়ের আসর ত্যাগ করে গভীর জঙ্গলে চলে যান। তারপর তীব্র অধ্যাত্মসাধনায় নিমজ্জিত হয়ে তিনি ইষ্টদর্শনে ধন্য হন। যাহোক, এই দুই মহাপুরুষের মিলনে সেখানে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উভয়ের প্রসন্ন মুখমণ্ডল দর্শনে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়েছিল।

১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। দেহুতে তখন বাস করছেন তুকারাম। যদিও তাঁর জীবনদীপ ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করেছে, তথাপি হৃদয়ে সর্বদা প্রজ্বলিত রয়েছে ইষ্টরূপী জ্ঞানদীপ। তিনি এখন সদা আনন্দে নিমগ্ন। বিঠ্ঠলজীর স্মরণ-মনন ও ধ্যানজপে তাঁর দিনরাতের ভুল হয়ে যাচ্ছে। আত্মারাম তুকা তাঁর এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একটি গাথায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—দিনরাতের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না। এখন আমি যে পরম শান্তি উপভোগ করছি, তা বর্ণনা করতে অসমর্থ।[১০] পরক্ষণেই সাধু তুকার প্রাণদীপ নির্বাপিত হলো। সাশ্রুনয়নে ভক্তরা তাঁকে ইন্দ্রায়ণীর জলে সমাহিত করলেন। মহাত্মা তুলসীদাস মহাপুরুষগণের জীবন-মরণ বিষয়ে একটি দোঁহায় বলেছেন ঃ

"তুলসী যব্ জগমে আয়ো জগ্ হসে তুম্ রোয়।
অ্যায়সে কর্ণি কর্ চলো তুম্ হসে জগ্ রোয়।"

অর্থাৎ তুলসী, তুমি যখন জগতে এসেছিলে, জগৎ তখন হেসেছিল। এখন এমন কাজ করে যাও যে, তুমি হাসতে হাসতে চলে যাবে এবং জগদ্বাসী কাঁদতে থাকবে। এইরকম এক উজ্জীবিত জীবনযাপন করে গেছেন সাধু তুকারাম। যে-জীবন মহৎ, অসাধারণ ও অধ্যাত্মপূর্ণ; নশ্বরদেহের নাশের পরও নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় না, তা মানুষের মনের মণিকোঠায় শাশ্বত হয়ে বিরাজ করে। সাধু তুকারামের নশ্বর শরীর বিনষ্ট হলেও তাঁর সেই জগৎকল্যাণকর, পাবন ও প্রেরণাপ্রদ জীবন সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজও সমভাবে মানুষের কাছে শ্রদ্ধার্হ। ❑

তথ্যপঞ্জি

১ দ্রঃ ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়, ৩য় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭০, পৃঃ ১৬৭
২ দ্রঃ ঐ
৩ Some Poet Saints of India, Patna R.K. Mission Ashrama, p. 61
৪ Ibid., p. 60
৫ দ্রঃ ভারতের সাধক, পৃঃ ১৭৩
৬ Some Poet Saints of India, p. 60
৭ Ibid., p. 60
৮ জীবনীকোষ—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯৬
৯ দ্রঃ ভারতের সাধক, পৃঃ ১৭৫
১০ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৮০

এই রচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

স্মৃতি সঞ্চয়ন

(ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত)

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি ভক্তমহলে অতীব সমাদৃত। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই তথ্যবহুল স্মৃতিকথাটির পুনর্মুদ্রণ ভক্তমানসে আনন্দের সঞ্চার করবে বলে আমাদের মনে হয়। বানান ইত্যাদি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।—সম্পাদক

কোথায় বাঙলাদেশের একজন নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ, যাঁর সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সমন্বয়কারী উদার বাণী শ্রবণে ও ত্যাগবৈরাগ্যময় পবিত্র জীবনের আদর্শ দর্শনে মুগ্ধ হোয়ে ছুটে এলেন পাশ্চাত্য দেশের সভ্যজাতির বড় বড় পণ্ডিতেরা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনপীঠ দর্শন করতে, সেই সিদ্ধ ভূমির মাটি এবং পঞ্চবটীর পাতা সংগ্রহ করতে, আর কোথায় এ দেশের নব্যশিক্ষিত বাবুভায়ারা, যাঁরা এতো নিকটে থেকেও ঘরের মানুষটিকে চিনতে পারলেন না!

এঁরা তাঁর আদর কদর বুঝবেন কোন্ বুদ্ধিবলে?—যে বুদ্ধিতে পরের নিন্দাকুৎসাকে সৎ চর্চ্চা ব'লে বুঝেছেন?—যে বুদ্ধিতে হিংসাবিদ্বেষের দলাদলির তুষের আগুনে অন্তরটা পুড়ে খাক হোয়ে যাচ্ছে?—যে বুদ্ধিতে মিথ্যা ছল চাতুরীর বচনবিন্যাসে লোকবঞ্চনাকে কণ্ঠমালা ক'রে রেখেছে?—যে বুদ্ধিতে সমাজের হোমরা-চোমরা নেতা সেজে গরীবদুঃখী ভাইবোনের গলায় স্বার্থের ছুরী চালিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন?—যে বুদ্ধিতে ভায়ের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টেনে নিয়ে 'বাহাদুরী' দেখানো হয়?—সংসার-মায়ায় মোহিত হোয়ে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লোকে কতোই না মতলব ভাঁজে! যেখানে স্বার্থ, সেখানে কুটিলতা, জটিলতা এমন কতো আবিলতা জমে।

লেখকঃ মশায়! দূর দেশের লোকেরা সাহেবরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা টের পেলেন আর এদেশের লোকেরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রইলো!

গিরিশবাবুঃ যদি কেউ ইচ্ছা ক'রে চোখ বুঁজে থাকে, বিধি বিড়ম্বনায় তাকে অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয়। মনের বাঁক না গেলে স্বার্থের অন্ধকূপ থেকে কেউ উঠতে পারে না। ঠাকুর বলেছেন—"লণ্ঠনের আলোর নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে।" সেইরকম মহাপুরুষের আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীরা তাঁকে চিনতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁর কথা শুনে তাঁর উদার গুণে মোহিত হয়। "বজ্রবাঁটুলের বীচি তলায় পড়ে না, অনেক দূরে ছিটকে পড়ে, সেখানে তার অঙ্কুর বেরোয়, গাছ জন্মায়। তেমনি মহাপুরুষদের ভাব দূরেতেই প্রকাশ পায়, সেখানকার লোকে আদর করে।"—এটিও ঠাকুরের উপমা।

দ্যাখো! ভগবান একচোখো নন। তাঁর কাছে সাদা কালো বর্ণের, জাতির বিচার নেই। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' সর্ব্বজীবে সমদর্শী। আসল কথাটা এই—যার যেমন সাধন, তার তেমন উপলব্ধি। যার অন্তরে যেমন জিনিস থাকে, সেইরকম ভাবের কথা তার মুখ থেকে বেরোয়। আমাদের স্বদেশী ভায়ারা খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শ্রীমান, বহু উপাধি, মান পান, কিন্তু এইসব মানের দায়ে তাঁরা অভিমানের গাঁটে আটকে পড়ে যান। তাঁদের অন্তর সংশয়ের অন্ধকারে ভরা। মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলায় তাঁরা অন্তঃসারশূন্য হোয়ে থাকেন। সাহেবদের ভিতরে এমন একটি বস্তু আছে যে, সেই বস্তুশক্তির গুণে যে-কোনো সাধু মহাত্মার গুণ, মহিমা উপলব্ধি করতে তাঁদের দেরী লাগে না। সেই বস্তুটি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা, গুণগ্রাহিতা। এই মহৎগুণে তাঁরা এতো উন্নত জাতি হোয়েছেন। আর এই অভাগা দেশের তমোগুণী লোকে খুঁড়িয়ে বড় হোতে চায়, সকলের ওপোর টেক্কা দিতে যায়! 'নত' হোতে না পারলে, দম্ভে কৈউ কি কখনো 'উন্নত' হোতে পেরেছে? 'তমোর' মৌতাতে এদেশের লোকে ঝিমিয়ে পড়েছে, অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না।

এবারে ঠাকুরের লীলার প্রচারকৌশলটা বুঝে দ্যাখো। প্রথমে জগদ্‌বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে দর্শন করবার (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) পরে তাঁর খবরের কাগজে (সুলভ সমাচার, সানডে মিরর) 'সাধুর উক্তি' ছাপিয়ে এদেশের ঢাক পিটে দিলেন। তারপরে 'রাম দাদা' (রামচন্দ্র দত্ত) লেক্‌চার দিয়ে ঠাকুরের অবতারত্বের কথা ছড়িয়ে দিলেন দেশময়। ভাগ্যিস্ ঠাকুরের প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে বেদান্তের ভেরী বাজালেন, তাই পৃথিবীর চারিদিকে ধর্ম্মের একটা সোরগোল প'ড়ে গেল, নইলে দক্ষিণেশ্বরের পূজারী বামুনকে চিন্‌তোই বা ক'জন? ভক্ত না থাক্‌লে ভগবানকে কে জান্‌তো? প্রজা না থাক্‌লে কোথাকার রাজা?—থাক্‌লোই বা তাঁর ঐশ্বর্য্য। প্রজাই রাজাকে বাঁচিয়ে রাখে। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ আছে, তাই তাঁকে জানবার ইচ্ছা হয়, আবশ্যক বোধ হয়, নতুবা কে তাঁকে জানতো? কী আবশ্যক ছিল? সংসারী দুঃখী জীব কষ্টযন্ত্রণার মধ্যে ভাবে, যদি তার কেউ বড় লোক আত্মীয় বন্ধু থাকিত, তবে তার সব দুঃখকষ্ট দূর

করিতে পারিতো, তার ভার নিতে পারতো। ভগবানের মতো জীবের দরদী সুহৃদ্ নেই, তাই তাঁর আশ্রয় নেবার জন্যে সরলচিত্ত আগ্রহবান হয়।

আমেরিকায় চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বিবেকানন্দ স্বামীজির বিজয়-গৌরববার্ত্তা ভারতবর্ষে পৌঁছিলে তখনকার দিনে বাঙলাদেশের শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন অধিকর্ত্তা (director) তাঁর কোনো বন্ধুর কাছ থেকে যখন শুনলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা আমেরিকা তোলপাড় ক'রে দিয়েছে, তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে বলেছিলেন—"বলো কি! সেই নিরক্ষর পরমহংসের এতো প্রভাব! আমার সহপাঠি বন্ধু মাইকেল মধুসূদন তাঁকে দর্শন কর্‌বার জন্যে একসময়ে আমায় অনুরোধ করেছিল, তখন আমার শোনা ছিল যে, সেই মূর্খ সাধু কালীমন্দিরের পূজারী বামুন, তার কাছে গিয়ে শাস্ত্রের এমন কি গূঢ় নূতন তথ্যের সন্ধান পাবো? সুতরাং সেখানে যেতে আমার আগ্রহ হয়নি—সেইটিই আমার কুগ্রহ, আমার বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারই তাঁর দর্শন পাওয়ার অন্তরায় হোয়েছিল। প্রতিভাসম্পন্ন বন্ধু মধুসূদনের বিদ্যার দম্ভ ছিল না, স্বভাবকবির প্রাণটা সরল ও উদার ছিল ব'লে কোনো সূত্রে তার ভাগ্যে মহাপুরুষের দর্শন ঘটেছিল।"

দ্যাখো! বেশী পড়্‌লে শুন্‌লে অহংকারে নিজেকে বড় দ্যাখে, মানুষ কারোর কাছে নত হোতে চায় না, অবিদ্যার প্যাঁচে প'ড়ে যায়। অন্তরে অভিমান পুষে রেখে পণ্ডীতি ফলিয়ে ধর্ম্ম হয় না। যার বিদ্যার অভিমান নাই, সরস্বতীর কৃপায় তার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়,—বিদ্যার উদ্দেশ্যও তাই। অবিদ্যা জান্‌তে দ্যায় না যে অহংকারে তার কতো ক্ষতি হোয়েছে।

বুঝতেই পাচ্ছো গুণী মানী সাহেবরা যখন শ্রদ্ধায় নত হোয়ে পড়্‌লেন, তখন এ দেশের বিদ্যাদিগ্‌গজদের চোখ ফুট্‌লো। লোকের চোখ ফোটানোর কৌশলটি ঠাকুরের বিলক্ষণ জানা ছিল। কোথায় একজন সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ, আর কোথায় বিলাতের পার্লামেণ্ট সভার অসামান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মেম্বর (সভ্য) সার উইলিয়ম ডিগ্‌বী সাহেব, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে দিব্য জ্ঞানের নূতন আলোক দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হোয়ে গেলেন এবং অভিমান ও পক্ষপাতশূন্য হোয়ে নিজের দেশের বড় বড় নামজাদা পণ্ডিতদের তুলনায় নিরক্ষর **রামকৃষ্ণেরই সমধিক মাহাত্ম্য** সংক্ষেপে সারকথায় প্রচার করে মহানুভবতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন!

লেখক: রাজনৈতিক কচ্‌কচির মধ্যে ডিগ্‌বী মহোদয়ের এমন শুভবুদ্ধির প্রেরণা কোথা হোতে এলো?

গিরিশবাবু: স্বামীজির (বিবেকানন্দের) লণ্ডনে অবস্থানকালে (১৮৯৫-৯৬) ডিগ্‌বী সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক দীব্য জীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে *direct inspiration* পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে, তাই এমন Inspired writing প্রকাশ পেয়েছে। স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টির বারিবিন্দু ঝিনুকের গর্ভে পড়্‌লে মুক্তা ফলে, এ ক্ষেত্রেও ঐ সাহেবের অন্তরে যে মুক্তা লুক্কায়িত ছিল—সেই তাঁর অন্তরের দিব্য অনুভূতি মুক্তার মতো ঝক্‌ঝকে ভাষায় চির উজ্জ্বল হোয়ে থাক্‌বে। উপযুক্ত ভক্তের মুখেই ভগবানের মহিমা এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়, যাতে তাঁর মধুর স্মৃতি সুধীজনের মানসপটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরমহংসদেবের উদ্দেশে এমন মহিমোজ্জ্বল মনোজ্ঞ রচনাটি রাজনীতি বিষয়ে আলোচ্য পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যেই ঢাকা পড়ে থাকায় সাধারণের নজরে সেটি এসে পড়েনি।

লেখক: আশা করা যায় যে, পরাধীন ভারতের শোষণ নীতির নির্ভীক সমালোচনার গণ্ডীর মধ্যেও স্বাধীনচেতা ডিগ্‌বী সাহেব বহুদূরদেশে অবস্থান ক'রেও যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ হোয়ে তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যের ও ভারতের কল্যাণ বিষয়ক স্বাধীন চিন্তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন জগৎময়—যে আলোর পরশ ভগবানের করুণায় এদেশে পৌঁছে গিয়েছে, সে জন্যে এদেশবাসী ধর্ম্মানুরাগীদের অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার আসন যেন অচঞ্চল থাকে।[১] ❑

---

১ Only in spiritual things has India made any show at all. Ram Mohun Roy, Keshub Chunder Sen, Rama Krishna, *Bengalies to a man,* to mention spiritual workers only who have passed away, who are known everywhere and who are honoured as amongst humanity's *noblest spiritual teachers.* What are these amongst so many? What especially are they in a land which contains more real spirituality than, may be, all the rest of the world put together? Opportunity has been denied to India to show her vast superiority in this or in any other respect. When Europe produced a Martin Luther, she gave the world a religious reformer. At the same period India produced here religious hero : he was an Avatar of the Eternal, and is today worshipped by vast numbers of devout men and women as the Lord Gouranga.

During the last century the finest fruit of British intellectual eminence was, probably, to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they are *mere gropers in the darkness* compared with the uncultured and illiterate Rama krishna of Bengal, who, knowing naught of what we term 'learning', spake as no other man of his age spoke, and *revealed God to weary mortals.* (Page 99. Extract from "*Prosperous British India*" by : Wm. Digby, C. I. E., M. P.).

শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন

স্বামী অচ্যুতানন্দ

এর আগে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, মহাকাল, বৈদ্যনাথেশ্বর এবং ওঙ্কার-মান্ধাতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার একাদশ পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীশৈলাধিপতি মল্লিকার্জুন।—লেখক
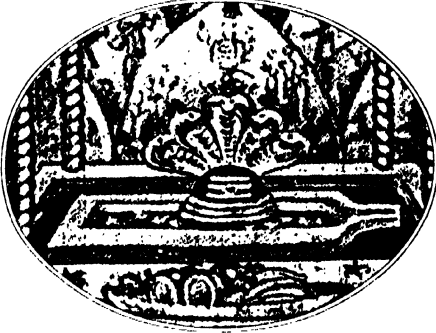
একটু ঘুম এসে গিয়েছিল। জোরে ব্রেক কষায় ঘুম ভেঙে যেতেই আমার সহযাত্রী বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীরেড্ডি আমাকে অনুরোধ করলেনঃ ''সেই ভোর ৬টায় বেরিয়েছেন, এবার একটু প্রাতরাশ করে নিলে হয় না? আমাদের গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে।'' তাঁর কথায় রাজি হয়ে বাস থেকে নেমে দেখলাম, একটা বেশ বড় বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছি। জায়গাটার নাম 'কালোয়াকুর্তি'। বহু বাস নানা জায়গা থেকে আসছে-যাচ্ছে। পাশেই ভাল খাবারের দোকান। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। একটা জায়গায় বসে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলাম। খেতে খেতে অধ্যাপক রেড্ডিকে শ্রীশৈলের বিষয়ে কিছু জানতে চাইলাম। তিনি পণ্ডিত লোক, এবিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা রয়েছে। বললেন, বাসে উঠে বলবেন।

আমাদের দুজনের সিট বাসের একধারে পড়েছিল। বাস চলতে আরম্ভ করলে তিনি প্রথমে আচার্য শঙ্কর রচিত বিখ্যাত 'শিবানন্দলহরী'র একটি স্তোত্রাংশ আবৃত্তি করে বললেনঃ ''আচার্যপাদ সশিষ্য এই শ্রীশৈলের শিবক্ষেত্রে এসে কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। এখানে তখন তান্ত্রিক কাপালিক রাজা ক্রকচের রাজ্য ছিল। তাঁর গুরু উগ্রভৈরব ঘোর কাপালিক। এই শ্রীশৈল পর্বতে তিনি তন্ত্রসাধনার নামে নানা উৎকট সাধনা করছিলেন। তাঁরা নরবলিও দিতেন। এই সময় আচার্য শঙ্কর এখানে আসেন। তারপর যে-ঘটনা ঘটে তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'' আমি তা জানি বলায় তিনি সেটি এখন আর না বলে শুধু সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলেন—''সন্ধ্যারম্ভবিজৃম্ভিতং শ্রুতি-শিরোস্থানান্তরাধিষ্ঠিতম্। সপ্রেমভ্রমরাভিরামং সকৃৎ সৎবাসনাশোভিতম্।।'' এর অর্থ—শ্রীশৈলস্থিত মল্লিকার্জুন নামক মহাশিবলিঙ্গকে আমি সেবা করি। যিনি পার্বতী দেবী ভ্রমরাম্বিকা কর্তৃক আলিঙ্গিত, সন্ধ্যাসমাগমে আরাত্রিক-কালে যাঁর শোভাবৃদ্ধি হয়, যিনি বেদান্ততত্ত্বের মূল বিষয়। উপনিষদ্ স্বীয় তত্ত্বের দ্বারা এই জ্যোতির্লিঙ্গের আদি তত্ত্ব প্রতিপাদন করে থাকেন।

শ্রীরেড্ডি বলতে লাগলেনঃ ''এই তীর্থ বহু প্রাচীনকালের। নানা পুরাণে, প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চলকে 'শ্রীশৈল', 'শ্রীপর্বত', 'শ্রীগিরি', 'শ্রীনাগ-ঋষভ পর্বত'—এইসব নামে অভিহিত করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বীরপুরুষদত্তের আমলে এই শ্রীপর্বত ও সেখানকার অধিষ্ঠিত দেবতা মল্লিকার্জুন ও দেবী ভ্রমরাম্বার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেসময় এই শ্রীপর্বত প্রায় ১৫০ কিলোমিটার লম্বা ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, এই অঞ্চল গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা ছিল। এখানকার প্রাচীন আদিবাসীরাই এই দেবতাদের প্রধান রক্ষক ছিল। তার প্রমাণ—এখানকার আরেকটি নাম 'নাল্লামালাই'। 'নাল্লা' মানে পবিত্র শ্রী আর 'মালাই' মানে পর্বত—সেখান থেকেই এই পাহাড়ি নাম; পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হাতে সংস্কৃত হয়ে 'শ্রীপর্বত' ও 'শ্রীশৈল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেন, এই শিবের আদি পাহাড়ি নাম ছিল 'মাল্লাইক্কারসার'। পরে সেটি হয় 'মল্লিকার্জুন'। প্রাচীনকালে এ-স্থানে ছিল শ্রীপর্বত। এখনো স্থানীয় অধিবাসীদের পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ডে সঙ্কল্পের সময় শ্রীপর্বতের উল্লেখ করতে হয়। এই নাল্লামালাই পাহাড় কুর্ণুল জেলার নন্দীকুটকুর তালুকের মধ্য অবস্থিত। এই তীর্থের ডানদিকে পাহাড়ি খাতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পবিত্র কৃষ্ণা নদী। এই তীর্থপর্বত সমুদ্রতল থেকে ৪৭৬ মিটার উঁচু। প্রাচীনকালে এখানে গভীর জঙ্গলে কলাগাছের বন ছিল এবং এই জঙ্গলের মধ্যেই ছিলেন জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রীমল্লিকার্জুন স্বামী ও দেবী ভ্রমরাম্বা। এঁদের আদি পূজক বা রক্ষক ছিল এই অঞ্চলের জঙ্গলের অধিবাসী চেঞ্চু সম্প্রদায়। এখনো বিশেষ পর্বদিনে স্থানীয় চেঞ্চু আদিবাসীদের এখানে প্রথম

পূজাধিকার চলে আসছে। কৃষ্ণা নদী এখানে প্রায় ১০০ মিটার চওড়া ও পাহাড়ের চূড়া থেকে সোজা নেমে যাওয়ায় পাকদণ্ডী পথ এখনো আছে। এখানে ঐ ঘাটের নাম 'পাতালগঙ্গা'। কৃষ্ণা নদী এই অঞ্চলে গঙ্গার মতো পবিত্র। এই নদীর দুই পাড়ই একসময় বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও মন্দিরে সুসজ্জিত ছিল। আজো বহু স্থানে তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখনো অনেক জায়গা গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্য পশুর আশ্রয়স্থল। অবশ্য পাতালগঙ্গার এক কিলোমিটার নিচে শ্রীশৈলম হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজ শুরু হওয়ায় ঐসব জঙ্গল এখন অনেক পরিষ্কার হয়ে গিয়ে নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও ঘরবাড়ি নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বদলে যাচ্ছে।

"আজ থেকে ২০ বছর আগেও ঐসব অঞ্চলে চলাফেরা কষ্টকর ছিল। তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে আসতে হলে কৃষ্ণানদীর ডানদিক দিয়ে দুটি ও বামদিক দিয়ে দুটি বন্যপথে চেঞ্চুদের সাহায্য নিয়ে আসতে হতো। এখন সরকারি ব্যবস্থায় পাকা রাস্তা হয়ে যাওয়ায় আমরা অনেক সহজে আসতে পারছি।

"সে যাই হোক, নানা জায়গায় প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায়—খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে সাতবাহন রাজা গৌতমপুত্র সাতকর্ণীর আমলে শ্রীপর্বত তাঁর রাজ্য-মধ্যে ছিল। তখন আদিবাসী টুটুরা এই অঞ্চল দেখভাল করত। সাতবাহন রাজত্বের পরে তৃতীয় শতাব্দীতে আসেন ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজারা। এঁরা পুরোপুরি বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁরাও এই শিবক্ষেত্রের অনুরাগী ছিলেন। দেখা যায়, তাঁদের কারো কারো নামের সঙ্গে 'শিব' নাম যুক্ত ছিল। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম মাল্লাসাতকর্ণী। এই মল্লিকার্জুনের আদিনাম 'মাল্লানা' থেকেই সম্ভবত নেওয়া বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

"এরপরের শাসকরা ছিলেন পহ্লব-কদম্ববংশীয়। এঁরা ছিলেন গোঁড়া শৈব ভক্ত। এঁরাই শ্রীশৈলতীর্থের প্রাচীনতম মল্লিকার্জুন মন্দিরটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তৈরি করেন। বর্তমানে মল্লিকার্জুন-মন্দিরের ডানদিকে এই মন্দিরটি এখনো আছে। মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। তারপর বিষ্ণুকুণ্ডী রাজবংশের আমলে ৪০০-৫৭০ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতে দেখা যায়, তাঁরা নিজেদের উল্লেখ করেছেন—'ভগবৎ শ্রীপর্বতস্বামীপাদানুধ্যাতনম্'। তাঁরাও মল্লিকার্জুনের ভক্ত ছিলেন। এঁদের এক রাজার উপাধি ছিল 'পরমমহেশ্বর'। এঁরাও প্রাক্ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মানুরাগী হলেও বেশির ভাগই ছিলেন শৈব। এই পঞ্চম শতাব্দী থেকেই দক্ষিণ ভারতে রাজানুগ্রহের অভাবে ও শৈবধর্মের প্রাদুর্ভাবের ফলে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ হীনপ্রভ হয়ে পড়তে থাকে। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এর পিছনে এই শ্রীশৈলের মল্লিকার্জুন স্বামীর খ্যাতি অন্যতম কারণ। পূর্বের সালোঙ্কারণ বংশ, দক্ষিণের পহ্লব বংশ, পশ্চিমের কদম্ব বংশ ও উত্তরের বিষ্ণুকুণ্ডী বংশীয়দের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পৌরাণিক দেবতাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার জোয়ারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৌদ্ধদের প্রভাব ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। এইভাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে অন্ধ্রপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে পালিভাষার বদলে সংস্কৃত ও তেলেগু-তামিলের এক মিশ্র দেশী ভাষারও প্রচলন শুরু হলো। বৌদ্ধতীর্থ নাগার্জুন কোণ্ডার প্রতাপ কমে গিয়ে একই পাহাড়ের অন্য অংশে শ্রীশৈল মল্লিকার্জুনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর নাম তখন ছিল 'শ্রীপর্বতস্বামীন্ মহালিঙ্গ'। তখন থেকেই অনেক সিদ্ধ যোগী সাধক এখানে এসে এই আরণ্যক পরিবেশে পর্বতগুহায় তপস্যা করতেন।"

এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি শ্রীরেড্ডিকে বললামঃ "এবারে ইতিহাস বর্ণনা একটু সংক্ষিপ্ত করলে হয় না? আমি ইতিহাস ভালবাসি, কিন্তু এখন মল্লিকার্জুন সম্পর্কেই বেশি জানতে ইচ্ছা করছে। তাই অল্পকথায় বর্তমান অবস্থায় দয়া করে চলে আসুন।" আমরা এর মধ্যে প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাসে কাটিয়েছি। দুবার বাস পথে দাঁড়িয়েছে। এবার পথের দুপাশে ক্রমশ লোকালয় কমে আসছে। দূরে দূরে সবুজ গাছপালায় ভর্তি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমরা নাল্লামালাই পাহাড়ের কাছে চলে আসছি।

শ্রীরেড্ডি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন ঃ "দেখুন, আমি তো মূলত ইতিহাসের লোক, তাই একজন ভাল শ্রোতা পেয়ে একটু বিস্তারিত বলে ফেলেছি। এখন সংক্ষেপ করে আনছি আমার কথা। এরপরে ক্রমে ক্রমে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট বংশের আমলে শ্রীশৈল পর্বতে ওঠার চারটি দ্বারের কথা জানতে পারা যায়। আজো সেই চারটি রাস্তাই প্রধান পথ—পূর্বদিকে ত্রিপুরান্তক, দক্ষিণে পুষ্পগিরি, পশ্চিমে আলামপুরা এবং উত্তরে উমামহেশ্বর।

"পরবর্তী কাকতীয় বংশের রাজা শৈবধর্মে দীক্ষিত হন শ্রীশৈলের শৈবগুরু শ্রীকালমুখের কাছে। ইনি মল্লিকার্জুন শীল মঠের প্রধান ছিলেন। এটি ১০৯০ খ্রিস্টাব্দের কথা। এর পর থেকে এই মন্দির শৈব তান্ত্রিক সাধকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এঁরা সংলগ্ন নানা মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমান মন্দির সম্ভবত কাকতীয় রাজা গণপতিদেবের বোন মৈলামাদেবী তৈরি করেন ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে।

"নন্দীমণ্ডপের সংলগ্ন বীর শিবের মণ্ডপের দুটি স্তম্ভে (১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত) খোদিত আছে—রেড্ডি রাজা এই মণ্ডপটি উৎসর্গ করলেন তাঁদের উদ্দেশে, যাঁরা এখানে মাথা ও জিভ কেটে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এতেই বোঝা যায়, সেইসময় এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল। এই বংশের এক রাজা পাতালগঙ্গায় নামার সিঁড়ি তৈরি করেন। তিনিই গর্ভমন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেন, এমনকি মন্দিরে ওঠার সিঁড়িও বাধিয়ে দেন। বিখ্যাত বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে এখানে এসে মন্দিরে প্রবেশের প্রধান রাস্তার দুপাশে সুন্দর মণ্ডপ তৈরি করেন। এখনো সেই মণ্ডপগুলি আছে। মূল মন্দিরেরও কিছু সংযোজন করেন তিনি। এছাড়াও সোনার তৈরি নন্দী ও ভৃঙ্গীর মূর্তি, সোনার শিঙ্গা, রূপার তৈরি মল্লিকার্জুনের বেদি লিঙ্গের উত্তরদিকে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অন্যপাশে পাথরের একটি মণ্ডপে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মূর্তিও ঐসময়ের। এই সময় এখানকার বীর শৈব ভক্তরা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ছিলেন। নানা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপও তখন প্রচলিত ছিল।

"বিজয়নগরের পতনের পর ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান আমলে এই তীর্থ কিছুটা হীনদশাপ্রাপ্ত হয়। তারপর একেবারে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী এই তীর্থ পরিদর্শনে আসেন এবং মল্লিকার্জুন স্বামী ও ভ্রমরাম্বা দেবীর পূজা চালু করার ব্যবস্থা করেন। মন্দিরের প্রধান প্রাচীরের উত্তরের দ্বারটি তিনিই তৈরি করে দেন।

"রোহিলাদের আক্রমণের সময় মারাঠা বীররা তাদের পরাজিত করেন। সবশেষে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ আমলের শুরুতে হায়দ্রাবাদের নিজাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে কুর্ণুল জেলা তুলে দিলে মেজর মনরো এই মন্দির ও তীর্থের ভার এখানকার বিখ্যাত শৈব মঠ পুষ্পগিরি মঠের হাতে তুলে দেন। আজ পর্যন্ত এই মল্লিকার্জুন মহাদেব ও দেবী ভ্রমরাম্বার সেবাব্যবস্থা পরিচালনা চলে আসছে ঐ পুষ্পগিরি মঠের সাহায্যে। মূলপূজাদি পুষ্পগিরি মঠাধীশের হাতে থাকলেও মন্দির ও অন্যান্য আয়-ব্যয়, দেখাশোনার ভার বর্তমানে সরকারি পরিচালনায় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে আছে। কারণ, মঠের হাতে থাকাকালীন প্রণামী বাবদ প্রাপ্ত অর্থাদির হিসাব ঠিকমতো রাখা হতো না এবং মন্দিরাদি ও রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও দারুণ অব্যবস্থা ছিল। সেজন্য ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারি পরিচালনায় আনা হয়েছে এবং সেগুলি সুষ্ঠুভাবেই চলছে।"

এই কথা শুনতে শুনতে পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে বাস ক্রমশ নিচের দিকে নামতে নামতে কৃষ্ণা নদীর বুকে ব্রিজ পার হয়ে গেল। রাস্তার দুধারে নতুন বসতি তৈরি হচ্ছে। নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য চারিদিকে যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি, লোকজনের চলাচল। তার মধ্য দিয়ে আমরা গাড়িতে করে নিচে নামতে নামতে বুঝতে পারছিলাম কি গভীর পাহাড়ি খাত বেয়ে আমরা নামছি। এখানে প্রায় ১,০০০ ফুট নিচ দিয়ে কৃষ্ণা নদী বয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাস ওপরে উঠে শ্রীশৈলতীর্থে পৌঁছাল। সময় লাগল প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা।

এখানে পৌঁছে চারদিকের বিরাট চওড়া রাস্তা, মঠ-মন্দির দেখে বুঝলাম, ঐতিহাসিক আমলের রাজাদের কীর্তি যুগে যুগে এই পাহাড়ি উপত্যকাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছে তিলে তিলে। [ক্রমশ]

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গ্রাহকদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, **পত্রিকা সময়মতো না পেলে** পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোনভাবেই কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস পরে জানালে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা ডাকে না পেলে বা হারিয়ে গেলে অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয়, তিনি অবশ্যই **দুমাসের মধ্যে** পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

> এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

ভক্ত আশুতোষ বিশ্বাস

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতদর্শন আরম্ভ হয়েছিল বাল্যকালেই। বর্তমান ছত্তিশগড় রাজ্যের যে রায়পুর শহরে তিনি প্রায় দুবছর কাল (১৮৭৭-১৯৭৯) অতিবাহিত করেছিলেন, সেই পুণ্যস্থান রায়পুরের কথা 'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যার 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম, রায়পুর' স্থাপনা সম্বন্ধে উক্ত প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এপ্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বিবেকানন্দ-আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ যে-জীবনগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে আশুতোষ বিশ্বাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্মৃতিকথা এখনো বহু ভক্তজনের মুখে মুখে শোনা যায়। ইহকাল-পরকালের চিন্তা ত্যাগ করে শুধু ভক্তি এবং ত্যাগাশ্রিত জীবনই তিনি অবলম্বন করেছিলেন।

আশুবাবুর প্রাথমিক জীবনের কর্মব্যস্ততায় স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা খুঁজে পাই না, কিন্তু জীবনের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর ভিতরের মানুষটির এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সকল ব্যস্ততা অকস্মাৎ শেষ হয়ে রইল শুধু স্বামীজীর প্রেরণাবাক্য—"আত্মাই সত্য, অজর, অমর, চির পবিত্র।" "দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" সেই অন্তরের ডাক তাঁকে নাগপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দজীর অতি ঘনিষ্ঠ করে তুলল। সেই সুবাদে রায়পুর এবং রায়পুরবাসী প্রতিটি ভক্তের হৃদয়াসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে দিল। তিনি রায়পুর নগরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার যে-বীজ রোপণ করেন তা পরবর্তী কালে 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রম'-রূপে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাণাঘাটের বোসপাড়ায় ভুবনেশ্বর বিশ্বাসের ঘরে তাঁর জন্ম। পিতা রানিঘাটার রাজার প্রধানমন্ত্রী পদে কর্মরত ছিলেন। রাজার ছোট ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে রাজার সঙ্গে ভুবনেশ্বরকেও অজ্ঞাতবাসে থেকে প্রাণরক্ষা করতে হয়। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালেই আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃহারা হন। কঠিন দিনযাপনান্তে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে তিনি জীবিকার অন্বেষণে কলকাতায় আসেন। সংযোগবশত তিনি এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের গৃহশিক্ষকতার সুযোগ পান। এরপর তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর উদ্যম ও উৎসাহে প্রভাবিত হয়ে আশ্রয়দাতা আপন কর্মের ভার তাঁর ওপর সমর্পণ করেন। কিন্তু যে-দিদির স্নেহযত্নে তিনি পালিত হয়েছিলেন, তাঁরই ছেলের চক্রান্তে একদিন অন্নদাতার বিশ্বাস হারিয়ে একবস্ত্রে বাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এরপর তিনি আসেন রায়পুরে। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় 'রাজকুমার মহাবিদ্যালয়'-এর সুপারিটেণ্ডেন্ট রেবতীমোহন সেনের সঙ্গে। আশুবাবুর গুণে মুগ্ধ শ্রীসেন তাঁকে বনবিভাগের পথনির্মাণ কাজের 'কণ্ট্রাক্ট' পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ঐ কাজে আশুবাবুকে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগে বহুবার বনপথে দিনযাপন করতে হতো। একবার যাত্রাকালে তাঁর গরুর গাড়িটি বাঘের মুখে পড়ে। আক্রান্ত একটি বলদকে বাঘ টেনে নিয়ে যায়, আহত গাড়োয়ান কোনরকমে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু অল্পকাল পরেই সে মারা যায়। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে আশুবাবুকে কে কিভাবে রক্ষা করেছিল তা তিনি বুঝতে পারেননি বটে, কিন্তু অন্তরে এক নতুন আলোক বহন করে তিনি যেন নবজীবনে পদার্পণ করলেন। রায়পুর শহরে পৌঁছে ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির ইন্সপেক্টরের কাজ নিয়ে ঐ শহরেই বাস করতে থাকেন। নিজ দক্ষতায় পদোন্নতি পেয়ে ম্যানেজারের পদ লাভ করলেও জাগতিক ঐশ্বর্য তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না। অন্তরের অনুরাগ তাঁকে নিয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্রয়ে। তার পর থেকে আশুবাবুর জীবন পরিচালিত হতে থাকে শুধুই ঠাকুরের নির্দেশে। পূজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজীর কাছে শুনেছি, নাগপুর ছাত্রাবাসে থাকাকালীন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে প্রভাবিত করেন পূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দজী এবং দ্বিতীয় প্রভাব ছিল শ্রীবিশ্বাসের।

রায়পুর ও বিলাসপুর পূর্বের মধ্যপ্রদেশের দুটি বড় ও উন্নত শহর। আশুবাবু ঐ দুটি শহরের বহু মানুষের সঙ্গে ইনসিওরেন্স কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে যুক্ত ছিলেন। ঘরে ঘরে তাঁর পরিচিত যুবকবর্গকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করানোর সুযোগ পান। তাঁর ভক্তি এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবন সকলকে তাঁর বাড়ির মন্দির-প্রাঙ্গণে টেনে আনত। এমনি করে তাঁর আবাসগৃহটি হয়ে দাঁড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাঁর পরিচিত বহু মানুষের মুখে শোনা গেছে, বিশ্বাসবাড়ির ক্ষুদ্র রন্ধনশালার অবারিত দ্বার বিকাল পর্যন্ত আহুত, অনাহুত সকল অতিথিকে প্রসাদ বিতরণের জন্য খোলা থাকত। কখনো কখনো ২৪-২৫ জন ভক্ত এবং সাধুসন্তের পাতও পড়ত। রায়পুরে এইভাবে তাঁর গৃহই হয়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মন্দির।

আশুবাবুর গৃহ-মন্দির রায়পুর শহরের যুবকদের একত্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের কাজে প্রণোদিত করেছিল। এই সেবাপ্রবণ মানুষটির ত্যাগ ও কর্মক্ষমতা তাঁদের জীবনগঠনে সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী কালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন এবং সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন। আশুবাবু যেকোন সেবার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতেন। প্রকৃতি বা রোগের প্রকোপ, আদিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ, বিপদ—যেখানেই প্রয়োজন পড়ত, সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন। আশুবাবু আপন আর্থিক বলে, লোকসংগ্রহ করে আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতেন যে, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা স্বয়ং শ্রীঠাকুরই করবেন। চাঁদার প্রয়োজন হলে তিনি নিঃসঙ্কোচে দাতার দ্বারে উপস্থিত হতেন। মনে হতো যেন দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই! এমন সময়ও এসেছে, সেসময় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও তাঁকে কেউ কখনো নিরানন্দে অথবা হতাশায় ভেঙে পড়তে দেখেননি। বেলুড় মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ পরমপূজ্য স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ তাঁর সেবাকাজের উল্লেখ করে স্নেহ-বাৎসল্যের ভাবে এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন ঃ "প্রভু নিজ স্কন্ধে ভক্তের বোঝা বহন করেন, আপনি সেই প্রভুর বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।"

সেইসময় রায়পুর প্রশাসনিক অধিকারীদের মধ্যে ছিলেন ভক্তপ্রবর নিবারণনাথ ট্যাণ্ডন। তাঁর স্মৃতিকথায় আশুবাবুর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে, যা প্রমাণ করে ভক্তের ভক্তিই তার শক্তি।

অত্যধিক পরিশ্রম, অল্পাহার ও অনাহারের পরিণামে একসময় আশুবাবু কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নেন। সেসময়ও যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা বলেন—মুখে বা তাঁর আচরণে সেই অবস্থায়ও হতাশার লেশমাত্র ছিল না। ছিল শুধু ইষ্টের প্রতি পূর্ণ সমর্পণের ভাব। তিনি একরাত্রের অনুভূতির কথা বিশেষ বন্ধুদের বলেছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট অবস্থায় আশুবাবুর আরাধ্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের দর্শন হয়। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঁচের গ্লাসে গাঢ়রঙের কোন তরল পদার্থ। ঐ পদার্থের দিকে আশুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর আরাধ্য বলেন—'যা তুই নিরোগ হবি'। ট্যাণ্ডনজী অন্যান্য বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন স্বপ্নে ঐ নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই আশুবাবুর রোগ অলৌকিক উপায়ে প্রশমিত হতে থাকে। তিনি জীবনের অন্তিমভাগে রায়পুর আশ্রমকে পূর্ণরূপে দেখে গিয়েছেন। আধুনিক প্রজন্মের কাছে এঘটনা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু এমন নজির অন্তত এদেশে বিরল নয়।

আশুতোষ বিশ্বাস দুই মাতৃহীন পুত্রসন্তান রেখে মরদেহ ত্যাগ করে ইষ্টপদে বিলীন হন। তাঁর কর্মযজ্ঞ সমাপ্তির পর রায়পুরে রামকৃষ্ণ মিশন-বিবেকানন্দ আশ্রম তাঁরও স্মৃতি বহন করে আজো আর্তের সেবা করে চলেছে।

শোভা মুখোপাধ্যায়
এ. পি. আর কলোনি, কাটাঙ্গা, জব্বলপুর

রামায়ণ-মহাভারতে সূর্যগ্রহণ প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীকালীকিঙ্কর ভট্টাচার্যের 'প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক সত্যান্বেষণ' শীর্ষক চিঠিটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। এই চিঠির শেষদিকে মহাভারতের জয়দ্রথবধের সময়ে এবং রামায়ণে হনুমানের বিশল্যকরণী আনার সময়ে সূর্যের সাময়িক অবলুপ্তি সূর্যগ্রহণের কারণে হওয়া সম্ভব—এই ধরনের যে-মন্তব্য পত্রলেখক করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই পত্রের অবতারণা।

মহাভারতে ভীষ্মের তিরোধান-তিথি মাঘী শুক্লাষ্টমী—যার স্মরণে আজো ঐ তিথিকে 'ভীষ্মাষ্টমী' বলা হয় এবং পঞ্জিকাদিতে তার উল্লেখ থাকে। মূল মহাভারত অনুসারে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হওয়ার পর আটান্ন দিন জীবিত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে পাওয়া যায়, স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের অব্যবহিত আগে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ঃ "আমি অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস এই সমুদয় শিশিত শরনিকরে শয়ান রহিয়াছি।... যাহা হউক এক্ষণে সৌভাগ্য-বশত পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।" (অনুশাসন পর্ব, ১৬৭তম অধ্যায়)

মোটামুটি ২৯ দিনে (তিথির সময়ের হ্রাসবৃদ্ধিতে কখনো ২৮, কখনো ৩০ দিনেও হয়) এক চান্দ্রমাস হয়। সুতরাং ভীষ্মের শরশয্যা ঠিক আটান্ন দিন বা দুই চান্দ্রমাস আগে অগ্রহায়ণের শুক্লাষ্টমী তিথিতে হয়েছিল। তিথির হ্রাসবৃদ্ধির ফলে দু-এক তিথি আগে-পরে হতে পারে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণ এবং চতুর্দশ দিবসে জয়দ্রথবধ হয়। সেক্ষেত্রে জয়দ্রথবধের তিথি মোটামুটি শুক্লা দ্বাদশী অথবা তার কাছাকাছি—পূর্ণিমা তিথিরও কাছাকাছি। সকলেই জানেন, পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যগ্রহণের জন্য প্রয়োজন যে অমাবস্যা তিথির—জয়দ্রথের মৃত্যুদিন তা কোনমতেই হতে পারে না। তাই 'বাস্তবতার খাতিরে' ঐদিনকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন বলা যেতেই পারে না।

পরের প্রসঙ্গ রামায়ণে হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়নকালে সূর্যকে 'বগলদাবা' করার দিন নিয়ে। মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাবণের অন্যতম অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলছেন ঃ

"অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈঃ বৃতঃ।।"

(৬।৯২।৬৭)

অর্থাৎ রাক্ষসরাজ, আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। আজই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আগামী কল্য অমাবস্যায় সৈন্য-পরিবৃত হইয়া আপনি বিজয়ার্থ যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। (সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী-কৃত অনুবাদ)

ঐদিনই (কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন) রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করেন এবং পরদিন অমাবস্যা তিথিতে শ্রীরামের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। বানরবৈদ্য সুষেণের পরামর্শে মহাবীর হনুমান কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতেই বিশল্যকরণী, সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী—এই ওষধি চতুষ্টয়-সহ গিরিশৃঙ্গই উৎপাটন করে আনেন। এই তিথি অমাবস্যার অব্যবহিত আগের তিথি হওয়ায় দুই তিথির সন্ধিক্ষণে বা অমাবস্যার ঠিক শুরুতে সূর্যগ্রহণ সম্ভব বটে, কিন্তু কালীকিঙ্করবাবু যে 'বগলদাবা' সূর্যের কথা উল্লেখ করেছেন, বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণে তার উল্লেখমাত্র না থাকায় এই কাল্পনিক গ্রহণের কোন কার্যকারিতাই নেই।

সূর্যোদয়ের আগেই বিশল্যকরণীর অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা, সূর্যোদয়ের আশঙ্কায় হনুমানের সূর্যকে কুক্ষিগত করা ইত্যাদি কল্পনা আমাদের বাঙালি কবি কৃত্তিবাসের, যা আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে 'সূর্যদেবের মুক্তি' অধ্যায়ে পাই। ঘটনায় চমৎকারিত্ব আনার জন্য তিনি এখানে এবং আরো অনেক জায়গাতেই মূলের ওপরে এধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। মূল রামায়ণে না থাকায় এঘটনাটি রামায়ণের কাল-নিরূপণে গুরুত্ব পাওয়ার উপযোগী অবশ্যই নয়।

শতবর্ষপ্রাচীন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ কথামৃতকার শ্রীম দিনলিপিতে প্রায় প্রতিদিনের তারিখের সঙ্গে যেমন বার-তিথির উল্লেখ করেছেন, কয়েক হাজার বছর আগে লেখা মূল রামায়ণ ও মহাভারতে তেমনি বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মাস-পক্ষ-তিথি-নক্ষত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। চিঠির কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং বর্তমান প্রেক্ষিতে খুব প্রাসঙ্গিক নয় বলে সেগুলির উল্লেখ করা হলো না। শুধু মহাভারত ও রামায়ণের দুটি মাত্র উদাহরণ (ভীষ্ম এবং রাবণের মৃত্যুতিথির উল্লেখ) আগেই দেওয়া হয়েছে।

যদি এই দুই মহাকাব্যের মাস-পক্ষ-তিথি-নক্ষত্রাদির অজস্র উল্লেখ থেকে কম্পিউটার-বিজ্ঞানীদের পক্ষে রামায়ণ-মহাভারতের সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব না হয়, তবে শুধু সূর্যগ্রহণের (যার কোন সঠিক উল্লেখই সম্ভবত এই দুই মহাকাব্যে নেই) হিসাব এব্যাপারে কোন্ কাজে লাগবে?

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর, আসানসোল-৪

প্রসঙ্গ ঃ ডায়াবিটিস ও সুস্বাস্থ্য

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪১০ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে ডায়াবিটিস সম্পর্কে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি হোমিওপ্যাথি ঔষধ দ্বারা সুস্থ হওয়ার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু সফল হচ্ছেন না। দুঃখের বিষয়, এভাবে হোমিওপ্যাথি নামাঙ্কিত ওষুধ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করে কেউই সুস্থ হতে পারেন না।

শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তিনি হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধ সেবন করছেন। যথেচ্ছভাবে হোমিওপ্যাথির সেবন কখনো বিজ্ঞানসম্মত নয়। হোমিওপ্যাথি প্রেসক্রিপশন যত সহজ ভাবা যায়, কার্যক্ষেত্রে ততটা সহজ নয়।

প্রথমত, হোমিওপ্যাথি রোগের নাম ধরে চিকিৎসা করে না—রোগীর চিকিৎসা করে। সুতরাং বহুমূত্রের চিকিৎসা করানো কথাটা অসমাপ্ত কথা। সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে হলে রোগীর বর্তমান অসুস্থ অবস্থার সার্বদৈহিক লক্ষণগুলি জানতে হবে। তৎসহ রোগী অতীতে যেসকল অসুস্থতার সম্মুখীন হয়েছেন—যেমন হাম, বসন্ত, জ্বর, মেয়াদী জ্বর ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ রোগীর সার্বদৈহিক লক্ষণগুলিকে জানা এবং বর্তমান রোগলক্ষণগুলি তার দেহে কতদিন যাবৎ রয়েছে, এর পূর্বে কি কি ব্যাধিতে তিনি ভুগেছেন, কিভাবে ঐ অসুস্থতার চিকিৎসা করানো হয়েছে—এই বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে রোগ কতটা চাপা দেওয়া হয়েছে তা অধ্যয়ন করা দরকার; যেমন মলম-লোশন লেপন দ্বারা চর্মরোগ চাপা দেওয়ায় হাঁপানি, পেটের ক্ষত, প্যারালাইসিস, রক্তবমন, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র বা মানসিক রোগের আবির্ভাব ঘটে থাকে।

এছাড়া রোগীর মানসিক পরিস্থিতি—যেমন ক্রোধ, উগ্রতা, ভয়, লোভ, সন্দেহপ্রবণতা, উদ্বিগ্নতা, হতাশা, আত্মহননের ইচ্ছা ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। গরম বা ঠাণ্ডা খাদ্য, মিষ্টি, টক, ঝাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি কোন্ খাদ্য পছন্দ তা জানা দরকার। জানা দরকার স্নানজল গরম অথবা ঠাণ্ডা—কি পছন্দ। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী তিথিতে কোন অসুবিধা, মল-মূত্রের অসুবিধা, আমাশয়, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। চর্মরোগ থাকলে কোন্ আবহাওয়াতে বৃদ্ধি ঘটে, রক্তঝরা, ফেটে যাওয়া, রস পড়া, নিদ্রা, নিদ্রাহীনতা, স্বপ্ন, কিভাবে শুতে আরাম, উঁচু বালিশ, নিচু বালিশ ইত্যাদি জানা দরকার।

বংশগত ব্যাধিগুলি প্রগাঢ়ভাবে জানা এবং উক্ত রোগলক্ষণগুলির রেপার্টরীকরণ দ্বারা যে-ঔষধটির আঙ্কিক যোগফল সর্বাধিক হবে—সেই ঔষধটিই একমাত্র হোমিওপ্যাথি মতের ঔষধ বলে গণ্য হবে। এ-নীতি থেকে চ্যুত হলে সে অন্য কিছু হলেও অন্তত হোমিওপ্যাথি নয়।

সত্যানন্দ চক্রবর্তী
কামারপুকুর, হুগলি-৭১২৬১২

প্রশ্ন : বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে কিধরনের সমাজব্যবস্থা চেয়েছিলেন?—সনৎ দাস, গোবরডাঙা, চারঘাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উত্তর : প্রথমেই এই বিষয়টি জানা দরকার যে, স্বামী বিবেকানন্দ সাধন-ভজন, গভীর অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—প্রত্যেক মানুষ দিব্য আত্মস্বরূপ। অর্থাৎ মানুষ দেখতে দেহ-মনবিশিষ্ট একটা জীব হলেও আসলে সে দেহ-মনের মধ্যে বিদ্যমান অজর অমর চিরপবিত্র আত্মা—যার মধ্যে সমস্তপ্রকার শুভ গুণ ও সর্বপ্রকার সম্ভাবনা ঘুমন্ত অবস্থায় অপ্রকাশিত রয়েছে। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নিজের মধ্যে বিদ্যমান এই মানবীয় ও দৈব গুণগুলিকে এবং তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা। এর দ্বারা সে নিজে যেমন সর্বাধিক সুখ ও তৃপ্তি পাবে, তেমনি তার দ্বারা সমাজও সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, আদর্শ-চরিত্র মানুষ হওয়া এবং আদর্শ-চরিত্র মানুষ তৈরি করা ছিল স্বামীজীর ব্রত।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দিকগুলি তিনি তাঁর ভাষণে ও কথোপকথনের মাধ্যমে সংক্ষেপে নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, আদর্শ সমাজব্যবস্থা শুধু যে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত করবে এবং জাগতিক ভোগ্যবস্তু অর্জনে সুযোগ দেবে তা নয়, অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহ এবং ঈশ্বরে ও আত্মায় বিশ্বাস, ভক্তি, পবিত্রতা প্রভৃতি দিব্যগুণসমূহের বিকাশে সহায়তা করবে।

কিন্তু কোন সমাজব্যবস্থাতেই এটা সম্ভব হবে না, যদি সেই সমাজব্যবস্থার নেতা ও কর্মিবৃন্দ চরিত্রবান মানুষ না হয়ে শুধু মানবদেহধারী জীবমাত্র হয়। স্বামীজী বলতেন, একটা দেশ বা জাতি যে বড় হয়, শক্তিশালী হয়, মহান হয়—সেটা সেই দেশের শাসনযন্ত্র বড় বড় আইন পাস করে বলে নয়, পরন্তু সেই দেশের মানুষগুলি মহৎ গুণবিশিষ্ট বলে, চরিত্রবান বলে। সেকারণেই দেশ বা সমাজ গড়ার জন্য আদর্শ-চরিত্র মানুষ সৃষ্টি করার ওপর স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই মানুষ গড়ার কাজটি শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে তিনি সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর এই ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে অর্থাৎ আদর্শ-মানুষ সৃষ্টির কাজে নিজের জীবনপাত করেছেন।

বিষয়টি ভালভাবে বোঝার জন্য প্রশ্নকারীকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী এবং স্বামীজীর 'জাগো যুবশক্তি', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভারতকল্যাণ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

প্রশ্ন : স্বামীজী মানুষের পূজা করতে বলেছেন। তাহলে মন্দির-মসজিদে পূজা করার কি কোন দরকার আছে?
—স্বরূপানন্দ বিশ্বাস, গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উত্তর : স্বামীজী মানুষের মধ্যে, শুধু মানুষ কেন, সর্বপ্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের পূজা করতে বলেছেন। 'সখার প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন : "ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,/ মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।" বলেছেন : "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে তিনি শুধু একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বহু দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষের সেবায় আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তবে ঈশ্বরেরই সেবা করছি অথবা ঈশ্বরের সন্তানদের সেবা করছি—এই ভাব অবলম্বন করে তিনি মানুষের সেবা করতে বলেছেন। ঈশ্বরের পূজাবুদ্ধিতে সেবা করতে পারলে সেবক ও সেব্য, বিশেষত সেবক অনেক বেশি ফল লাভ করে। এমনকি সব সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল ঈশ্বরানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করবেন—এটা স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত। এবিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি : "জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়। 'মুক্তিঃ করফলায়তে'।" অর্থাৎ মুক্তি যেন তখন সেবকের হাতের মুঠোর মধ্যে নিশ্চিত এসে যায়। 'সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান' করার অর্থ—জীবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে, 'জীবের মধ্য দিয়ে জীবের দেহস্থিত ঈশ্বর পূজা নিচ্ছেন'—এইরূপ ভাব নিয়ে সেবা করা। এই ভাব ধরে থাকা সহজ কাজ নয়। কখন কীভাবে, ধীরে ধীরে সেবার মাধ্যমে নাম, যশ, প্রতিপত্তি, বিত্ত ও দৈহিক সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা এসে পড়ে এবং সেবককে স্বার্থপর, নীচ করে তোলে—তা ধরাই কঠিন। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত বর্তমান সমাজে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। এর একমাত্র প্রতিষেধক হিসাবে স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁদের অনুগামিগণ সব সেবককে পরামর্শ দিয়েছেন—তারা যেন সত্যনিষ্ঠা, নৈতিক জীবনযাপন, ঈশ্বরচিন্তা, পূজা, ধ্যান, জপ, প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ প্রভৃতি উপায় সর্বদা অবলম্বন করে। এই উপায়গুলির একটা উপায় হলো পূজা। গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা, পঞ্চ উপচারে পূজা, অধিক উপচারে পূজা, এমনকি শুধু মনে মনে (মানসপূজা)—নানা প্রকারের পূজা আছে। মোটকথা পূজা প্রভৃতি সহকারী উপায়গুলির সহায়তা না নিলে সেবাটা পূজায় রূপান্তরিত হয় না। স্বামীজী তাই বাহ্যপূজাকে পরিত্যাজ্য

বোধ করেননি; প্রাথমিক স্তর বলেছেন। যে-ব্যক্তি শুধু মন্দিরের বিগ্রহে পূজা করে, কিন্তু মানুষের দেহে ঈশ্বরের পূজা করে না—তাকে স্বামীজী 'প্রবর্তক' বলেছেন। তাঁর ভাষায়—"দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলের মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে-ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রতিমায় শিব-উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬) এইজন্যই স্বামীজী তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে পূজা, জপ, ধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চা এবং অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও ধর্মদানের দ্বারা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র প্রবর্তন করেছেন।

কনখলে সেবাশ্রম করার সময় তিনি তাঁর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে বলেছিলেন ঃ "দেখ কল্যাণ, আমার ইচ্ছা কেমন জানিস? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে—সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যান-ধারণাদি করবে, তারপর যা ধ্যান করলে practical field-এ (বাস্তব ক্ষেত্রে) তা কাজে লাগবে।" (স্বামীজীর পদপ্রান্তে, ১৯৬৪, পৃঃ ২২৫) শ্রীশ্রীমাও কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা, এমনকি নিজের পটও প্রতিষ্ঠা করে চরকাশিক্ষা, তন্তুবয়ন প্রভৃতি সেবাকর্মের সঙ্গে মন্দিরে পূজা-জপ-ধ্যানাদির প্রবর্তন করেছিলেন। তাই একদিকে মন্দির বা ঠাকুরঘর বা উপাসনালয় এবং অন্যদিকে সেবামূলক কর্মবিভাগ—এটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে গণ্য হয়। ঠাকুরঘর বা মসজিদ বা গির্জা-বর্জিত শুধু সেবাকর্ম অথবা সেবামূলক কর্মবর্জিত শুধু উপাসনালয়ের কোনটাই স্বামীজী চাইতেন না। তিনি এই দুইয়ের (উপাসনালয় ও কর্মবিভাগের) সমন্বয় চাইতেন। তাহলেই সেবা উপাসনায় বা পূজায় ঠিক ঠিক রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ঃ *শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছু হবার সাধ্য নেই। তৃণটিও নড়ে না।" আবার তিনিই বলেছেন কর্মফল ভোগের কথা। কিন্তু সবই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হয়, তবে মানুষ যে ভাল কাজ করে বা মন্দ কাজ করে সেসবই তো ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আবার শ্রীকৃষ্ণ 'গীতা'য় বলেছেন যে, মানুষের শুধু কর্মে অধিকার, ফলে নয়। তাহলে কর্মফলের ভোগ ('সু' অথবা 'কু') মানুষের কেন হয়? মানুষ তো ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনে অসহায়, মানুষের তো স্বাধীন কোন ইচ্ছাই নেই—সবই ঈশ্বরেচ্ছা।*

—দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উত্তর ঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, গাছের পাতাটিও পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না—শ্রীশ্রীমা ও অন্য মহাপুরুষদের একথা সত্য। আবার মানুষ নিজের কর্ম অনুসারে শুভ, অশুভ বা শুভাশুভ মিশ্রিত ফল ভোগ করে—এটাও সত্য। তাই প্রশ্ন হয়, কর্মফলবিধি ও ঈশ্বরেচ্ছার সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে? এবিষয়ে সত্যদ্রষ্টাগণ প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (সেটা প্রারব্ধ ফল হোক বা অন্যপ্রকারের ফল হোক)—এই বিধি বা নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। জগৎস্রষ্টার ইচ্ছাই বিধিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। তাঁর ইচ্ছাটাই জগতের বিধান। বস্তুত, সমাজে বা রাষ্ট্রে যেখানে যত বিধান, যত নিয়ম, গঠনতন্ত্র রয়েছে—সবার পিছনে মানুষের ইচ্ছা, তারও পিছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে। আমরা বলি, ক্রিকেট খেলার কঠিন নিয়মানুসারে ঐ অমুক খেলোয়াড়টি 'আউট' হয়ে গেল। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়মগুলি তো বিশ্ব ক্রিকেট বোর্ডের ইচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। ঐ বোর্ড ইচ্ছামতো এই নিয়ম গড়ছেন বা ভাঙছেন যেকোন সময়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেমন জীবকে ফলভোগ করতে হয়, তেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে তখন শুভ চিন্তা, শুভ কর্ম ও প্রার্থনাদি করে। তখন ঈশ্বরেচ্ছায় তার কর্মফল অনেকখানি কেটে যায়। অথবা তার দেহ কর্মফল ভোগ করলেও সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে দৈহিক দুঃখ সত্ত্বেও বিমল আনন্দ, জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দ 'অম্বাস্তোত্রম্'-এ লিখেছেন ঃ "ইচ্ছাগুণৈঃ নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ।" অর্থাৎ জগতের নিয়মগুলি জগন্মাতার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ "সকলি তোমার ইচ্ছা।" বলেছেন ঃ "সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি খেয়াল তাহার ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।" ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের প্রত্যেকের মনে শুভ ও অশুভ উভয় প্রকারের ইচ্ছা ও সংস্কার রয়েছে এবং কাজ করছে। মহাপুরুষগণ বলেন—ঈশ্বর চান যে, আমরা সকলে অশুভ ইচ্ছাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ধীরে ধীরে শুভ ইচ্ছাকে প্রবল ও প্রবলতম করি, সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত হই এবং প্রত্যেকেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেম-শক্তি অর্জন করে মনুষ্যজন্ম সার্থক করি।

কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নয়—এর তাৎপর্য হলো, আমাদের ক্ষমতার দৌড় কর্ম বা কর্তব্যটি ষোলো আনা মন দিয়ে সুষ্ঠুভাবে করা পর্যন্ত। কর্মের ফল আমরা সৃষ্টি করতে পারি না। ফল অনেকগুলি বিষয়ের (factor) ওপর নির্ভর করে। সেসব বিষয়গুলি (factor) যেমন হবে, ফলও তেমনভাবে আপনা থেকেই হবে। তুমি পড়াশোনা ও লেখাপড়া ষোলো আনা মন দিয়ে করতে পার, কিন্তু তুমি তো তোমার পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করবে না। তোমার ফল তো পরীক্ষকের ওপর এবং আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে—এই তাৎপর্য। শ্রেষ্ঠ ফলের জন্য চেষ্টা কর। কিন্তু ফলের জন্য দুর্ভাবনা করে নিজের মনের শক্তির অপচয় করো না। ঐরূপ দুর্ভাবনা করলে তুমি ভালভাবে চেষ্টা করতেও পারবে না। সেজন্য ফলও খারাপ হবে। এর পরবর্তী স্তরের কথা—যখন কর্মের ফল হবে তখন সে-ফলটা নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার না করে জগতের সেবায়, ঈশ্বরের সেবায় লাগাতে পার তো তোমার ঐ কর্মের দ্বারাই তুমি ব্রহ্মজ্ঞান তথা ঈশ্বরানুভূতি লাভ করতে পারবে। এবিষয়ে সংক্ষেপে এটুকুই বলা চলে। ❑
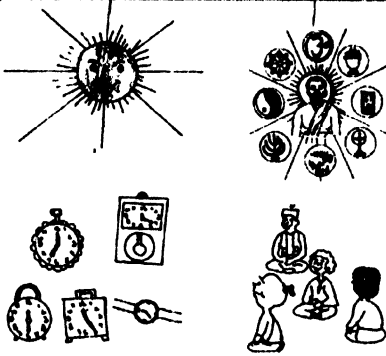
ছবি ঃ অনুস্মিতা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি, ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

সূর্যঘড়ি

মাস্টার ক'ন, সবাই ভাবে
আমার ঘড়ি সব চে' ঠিক,
ভুল সময়ের ঘড়ি সবাই
আমার সাথে মিলিয়ে নিক।
ঠাকুর বলেন, ঠিক বলেছ,
মত আর পথ নানান তো,
সবাই যে তাই নিজেরটিকেই
সঠিক বলে জানান তো।
আমি বলি, ঐ ঘড়ি থাক
সূর্যঘড়ির দিক তাকাও,
তার সঙ্গে তোমার ঘড়ি
ঠিক না বেঠিক, মিলিয়ে নাও।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

দুই বিখ্যাত পুত্রের কাহিনী

ঘটনাটির সূত্রপাত স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামে। শহর ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই সবুজে ছেয়ে যাওয়া মাঠের মধ্যে গ্রামটি। ফ্লেমিং নামে একজন গরিব চাষি সেখানে একটি খামারে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি 'বাঁচাও' বলে চিৎকার শুনতে পেলেন। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে, তৎক্ষণাৎ সেদিকে ছুটে গেলেন তিনি। খামারটির পিছনে একটি কাদায় ভরা জলাশয়। মজে যাওয়া সেই পুকুরের মধ্যে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে একটি অল্পবয়সী ছেলে। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ফল হচ্ছে না। ফ্লেমিংকে দেখতে পেয়েই ছেলেটি কেঁদে ফেলল—"আমি ডুবে যাচ্ছি, কাদায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, অনুগ্রহ করে আমাকে বাঁচান।" নিজের জীবন বিপন্ন করে সেদিকে এগিয়ে গেলেন ফ্লেমিং এবং অনেক কষ্টে মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

পরদিন ভোরবেলায় একটি দামি ঘোড়ার গাড়ি ফ্লেমিংয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সুসজ্জিত এক ভদ্রলোক সেই গাড়ি থেকে নেমে এসে জানালেন, তিনিই সেই ছেলেটির পিতা—যাকে ফ্লেমিং মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বললেন ঃ "আমার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আমি আপনাকে সামান্য কিছু প্রতিদান হিসাবে দিতে চাই। আপনি তো নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই সামান্য কিছু দান গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ বোধ করব।"

এই ধরনের একজন অবস্থাপন্ন মানুষের কাছ থেকে এতটা কৃতজ্ঞতা আশা করেননি ফ্লেমিং। কিন্তু তিনি ছিলেন অন্যধরনের মানুষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ঃ "না, তা হয় না। এর জন্য আমি কোন প্রতিদান গ্রহণ করতে পারব না।"

ঠিক এইসময়ে একটি অল্পবয়সী ছেলে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি আন্দাজ করলেন, এ হয়তো ফ্লেমিংয়েরই ছেলে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই ছেলেটি কি আপনার?" "হ্যাঁ, আমারই ছেলে।"—উত্তর দিলেন ফ্লেমিং।

মুহূর্তে কি ভেবে নিলেন ভদ্রলোকটি। ফ্লেমিংয়ের আরো কাছে এসে আন্তরিকভাবে বললেন ঃ "তাহলে আমার এই প্রস্তাবটি আপনি একটু বিবেচনা করুন। আপনার তো ছেলেকে ভাল জায়গায় রেখে উঁচুমানের শিক্ষালয়ে পড়াবার মতো অবস্থা নয়। আমি যদি আমার ছেলেকে যেভাবে লেখাপড়া ও থাকার সুযোগ দিচ্ছি, ঠিক সেইভাবে আপনার ছেলেকেও তা দিই এবং ও যদি ওর বাবার গুণের কিছুমাত্র পেয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সে এমন একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে—যার জন্য আমরা দুজনেই হয়তো গর্বিত বোধ করব। আশা করি আপনার এতে অমত হবে না।"

কিছুক্ষণ ভাবলেন ফ্লেমিং, তারপর রাজি হলেন। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভদ্রলোকটির মুখ। গরিব চাষি ফ্লেমিংয়ের ছেলে তখনকার সময়ের ইংল্যাণ্ডের যতটা ভাল সম্ভব শিক্ষার সুযোগ পেল এবং বড় হয়ে উঠতে লাগল। পরে সে বিখ্যাত সেন্ট মেরি মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়ে এল। তারপর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ছেলেটির নাম আলোড়িত হলো। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা তাঁর জন্য গর্বে ফেটে পড়ল। সমস্ত দেশ জুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ছেলেটির নাম উচ্চারিত হলো—আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। তিনি আবিষ্কার করলেন প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক বা রোগপ্রতিরোধকারী ওষুধ—'পেনিসিলিন'। সেই প্রথম মানুষ পেল সাংঘাতিক রোগজীবাণুদের বিরুদ্ধে জয় করার হাতিয়ার। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন বাবা ফ্লেমিং ও সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি।

আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল পরের বছর। সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ছেলে ঐসময়কার সাংঘাতিক অসুখ 'নিউমোনিয়া'য় আক্রান্ত হলেন। এ সেই ছেলে—যাকে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংয়ের বাবা বাঁচিয়েছিলেন। মৃত্যুর পথে যাওয়া সেই ছেলেটিকে এবার বাঁচালেন আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং—তাঁর আবিষ্কৃত পেনিসিলিন প্রয়োগ করে। সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নাম লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চার্চিল, আর তাঁর ছেলের নাম স্যার উইনস্টন চার্চিল—ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৪০-১৯৪৫, ১৯৫১-১৯৫৫)।

—সমীর ভট্টাচার্য

আদি শঙ্করাচার্য

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

নদীর বন্যা ও তার প্রতিকারের উপায়—

একজন ভূতাত্ত্বিকের চোখে

গিরিজাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ। অসংখ্য নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে গ্রাম আর শহরকে করেছে সমৃদ্ধ ও সুন্দর। মায়ের মতো আমাদের ভালবেসেছে, আমাদের জীবনকে পবিত্র করেছে, তার শাশ্বত ধারায় আমরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে পেরেছি। কিন্তু কখনো কখনো এই মাতৃমূর্তি কঠোর হয়েছে, আমাদের জীবনে অভিসম্পাত হয়ে নেমে এসেছে, আমরা ঘরছাড়া হয়েছি, আমরা নিরন্ন নিরুপায় অবস্থায় পথের ধূলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডবে আমরা আমাদের আপনজনকে হারিয়েছি।

কেন এই বন্যা? কেনই বা তার আগ্রাসী ক্ষুধা? বছরের পর বছর এই জীবন ও সম্পত্তিহানির কি কোন প্রতিকার নেই? মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে একজন ভূতাত্ত্বিক হিসাবে কাজ করার সময় কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল বর্তমান লেখকের। তারই ভিত্তিতে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে ৫-৬ কিলোমিটার দূর থেকে জমিগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচু এবং শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি। শক্ত হওয়ার দুটি কারণ—(১) এগুলি বেশির ভাগ এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি এবং (২) এই মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে 'ঘুটিং' (caliche) নামক এক পদার্থ, যা মাটিতে ক্ষারের শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। নিচু জায়গাগুলিতে যখন বন্যার জল বাড়ে—এই জায়গাগুলি তখন বিপন্ন গৃহহীন মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

গঙ্গা-ভাগীরথীর সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের ৪-৫ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলির কিন্তু ভিন্ন চেহারা। নদীর পাড়গুলি ভেঙে পড়ে কত যে সম্পত্তি-নাশ, গবাদি পশু ও জীবনহানি হয়—তা সকলেই জানেন। কিন্তু কেন এই বিপত্তি? কারণ, এই অঞ্চলের নদীর তীরভূমি তিনটি মাটির স্তর দিয়ে তৈরি—একদম নিচে থাকে বালিমাটি, তার ওপরের স্তরে পলিমাটি, আর সবার ওপরের স্তরে কাদামাটি। বর্ষার সময় এই বালিমাটির মধ্য দিয়ে জলরাশি ভূগর্ভস্থ জলের (Ground water) সঙ্গে মিশে জলের স্তরকে উঁচু করে দেয় এবং সমগ্র অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়ে পড়ে।

বন্যার এই ভয়াবহ চেহারা বর্ষার ঠিক পরেই আরো ভীষণতর রূপ ধারণ করে। নদীবক্ষ থেকে জল নামতে শুরু করে। ভূগর্ভস্থ জলরাশি ভূখণ্ড থেকে নদীর দিকে নিম্ন ঢাল বয়ে নামতে থাকে ঐ বালিস্তরের মধ্য দিয়ে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকালেই দেখা যায়, জলের ঠিক ওপরে বালিস্তর যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে—সেখান থেকে জল চুঁয়ে চুঁয়ে বেরোচ্ছে আর তার সঙ্গে অল্প অল্প বালিও বেরিয়ে আসছে। এই বেরিয়ে আসা বালিগুলি কিন্তু নদীর পাড়ের বালি নয়। এগুলি যে-ভূখণ্ড থেকে ভূগর্ভস্থ জল নদীতে আসছে—সেই ভূখণ্ডের বালি। ভূগর্ভস্থ জল নদীর ঢালের দিকে আসার সময় ভূখণ্ডের, বিশেষ করে নদীর ধারের বালিস্তর থেকে এই বালিগুলিকে কুরে কুরে নিয়ে আসে। ফলে ভূখণ্ডের এই জায়গাগুলি ফাঁকা হয়ে পড়ে বা দুর্বল হয়ে যায়। তখন এই দুর্বল ভূস্তরগুলি ওপরের মাটির চাপ সহ্য করতে না পেরে ধ্বস আকারে পড়ে যায়। বেশির ভাগ নদীর ভাঙন এইভাবেই হয়ে চলেছে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। ভাঙনের আগে নদীর পাড়ের জমিগুলিতে যে 'বহু কোণ' আকারের অসংখ্য ফাটল দেখা যায়—সেটাও ভূগর্ভস্থ স্তরের দুর্বলতা প্রমাণ করে।

মালদহে গঙ্গার ভাঙনের সাম্প্রতিক নমুনা : ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রাতে গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে গেল পঞ্চানন্দপুরে সেচ দফতরের অতিথিনিবাস 'গঙ্গাভবন'।
সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।৯।২০০৩

এছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে সর্বপ্রধানটি হলো জলরাশির প্রচণ্ড বেগ। ফারাক্কা ব্যারেজ এবং গঙ্গা যেকোন কারণেই হোক পরস্পর লম্বভাবে নেই, অল্প কোণাকুণিভাবে ব্যারেজটি পশ্চিমাভিমুখী। এর ফলে বর্ষায়

ব্যারেজের পশ্চিমদিকের দশ-বারোটি লকগেট যখন খুলে দেওয়া হয়, তখন জলরাশির প্রচণ্ড বেগ নদীর পশ্চিম-কূলকে সজোরে আঘাত করে। নরম ভূস্তরের মাটি এই বেগ সহ্য করতে না পেরে অচিরেই ধ্বসে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের নদীর পাড়গুলি বেশ খাড়া (গড়পড়তা ২০ ফুটের মতো), যার ফলে নদীর পাড় স্থূলকোণে ঢাল থাকলে যতটা নদীর জলরাশির বেগকে প্রতিঘাত করতে পারত ততটা পারে না। তৃতীয়ত, সেচবিভাগ থেকে নদীর ধারে যে বোল্ডার ফেলা হয়, সম্ভবত সেগুলিকে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ফেলা হয় না। যেমন তেমন করে ফেলার ফলে জলরাশি বোল্ডারগুলিতে বাধা পেয়ে ঘুরে গিয়ে পাশের ভূখণ্ডকে আঘাত করে এবং সেখানে ভাঙন হয়। এমন অনেক জায়গা দেখা যায়, যেখানে বোল্ডারের রাশি নদীগর্ভে পড়ে রয়েছে, আর আশপাশের পাড়গুলি ভাঙনের করালগ্রাসে পতিত হয়েছে।

মোটামুটিভাবে ভাঙনের কারণগুলি জানার পর ভাঙন রোধ করার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার, সেগুলিও আলোচনা করা যেতে পারে।

নদীবক্ষের যে-অঞ্চল দিয়ে নদীর প্রধান জলস্রোত প্রবাহিত হয়, ভূতাত্ত্বিক ভাষায় তাকে বলা হয় 'থলওয়েগ' (Thalweg)। ফারাক্কা ব্যারেজের দক্ষিণে গঙ্গার এই থলওয়েগ বর্তমানে পশ্চিম পাড়ের দিকেই সীমাবদ্ধ। জলরাশির এই প্রধান স্রোতোধারাকে গতি পরিবর্তন করিয়ে নদীবক্ষের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া আশু প্রয়োজন এবং এটা সম্ভব হতে পারে শীতকালে নদীবক্ষের মাপ অনুযায়ী 'ড্রেজিং'-এর মাধ্যমে। এটা কঠিন কিছু নয়। ফারাক্কা ব্যারেজ অথরিটি প্রয়োজনভিত্তিক এই ড্রেজিং আগেও করেছেন। এই ড্রেজিঙের ফলে পশ্চিমদিকের নদীর 'থলওয়েগ' যদি মাঝখান দিয়ে যায়, ভাঙন নিশ্চয়ই কম হবে। দ্বিতীয়ত, নদীর খাড়া পাড়গুলি যদি বোল্ডার ফেলে স্থূলকোণে ঢাল করে দেওয়া হয় এবং বোল্ডারগুলি জাল দিয়ে বা সিমেন্টিং করে বেঁধে দেওয়া যায়—ভাঙনের প্রকোপ কমবেই, কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত, সেচবিভাগ থেকে যে-বোল্ডারগুলি ফেলা হয়, সেগুলি জলস্রোতের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। এর পরিবর্তে যদি বোল্ডারগুলিকে জলস্রোতের সঙ্গে দিকের সামঞ্জস্য করে মোটামুটি সমান্তরালভাবে ফেলা যায়, তাহলে জলরাশি সরাসরি ধাক্কা না মেরে নিজস্ব গতিপথেই প্রবাহিত হবে।

একথাগুলি বলার একটিই উদ্দেশ্য—সম্পূর্ণভাবে ভাঙন রোধ করা না গেলেও অনেকাংশেই প্রতিহত করা যাবে। এবং তা মানুষের উপকারেই লাগবে। অবশ্য এটাও ঠিক, সরকার ও জনসাধারণ দুপক্ষকেই সজাগ থাকতে হবে এবং গঠনমূলক ও পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার কথা ভাবতে হবে। জন-কল্যাণমুখী যেকোন কাজ তখনি সফল হওয়া সম্ভব। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ অগ্রহায়ণ ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী প্রেমানন্দ**
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী
১৬ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার
(২ ডিসেম্বর ২০০৩)
শ্রীমা সারদাদেবী
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী
৩০ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার
(১৬ ডিসেম্বর ২০০৩)

একাদশী-তিথি ঃ ৪, ১৮ অগ্রহায়ণ
বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার
(২০ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর ২০০৩)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২৬

পাশাপাশি ঃ (৪) তারাদল, (৬) মোর, (৭) শক্তি, (৮) মতো, (৯) হৃদে, (১১) স্খলন, (১৩) রহিবে, (১৫) হতে, (১৮) শত, (২০) জনক, (২২) জনম, (২৪) তরু, (২৫) মহা, (২৮) হানা, (২৯) কাম, (৩০) কেহ দোষী।

ওপর-নিচ ঃ (১) করাল তোর, (২) মরম, (৩) দেশকাল, (৫) লজ্জা, (১০) দেহ, (১২) নহে, (১৪) বেশ, (১৬) তেজ, (১৭) ভুজ, (১৯) তত, (২১) কমল দোলে, (২৬) আকার, (২৭) বুকে।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ মাহাতো, মানবেন্দ্র শীল, রত্না ঘোষ, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মৌলিক, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজ দাস, পার্বতী দাস, অণিমা সর্বাধিকারী, নির্মলচন্দ্র জানা, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দেবনাথ, মনোজ মুখোপাধ্যায়, অর্চনা বেরা, রুণা রায়চৌধুরী, পুষ্পরেণু হালদার, রমা ঘোষ, কল্পনা চৌধুরী, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীতি পাল, ভবানীপ্রসাদ পাল, আলপনা চক্রবর্তী, অভিবৃতা দাস, পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু চৌধুরী।

অনবধানতাবশত ২৩নং (ওপর-নিচ) সূত্রটি মুদ্রিত না হওয়ায় যাঁরা ঐ সূত্র সমাধানের চেষ্টা করেননি, তাঁদের নামও ওপরের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজকে যাঁরা নাড়া দিয়েছিলেন

জলধিকুমার সরকার
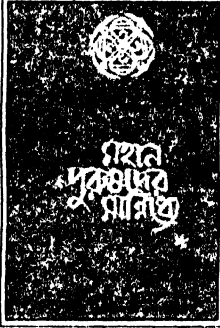
মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে
শিবনাথ শাস্ত্রী
প্রকাশক ঃ
প্রাচী পাবলিকেশনস্
এইচ. রায়চৌধুরী
৩/৪ হেয়ার স্ট্রিট (তৃতীয় তল)
কলকাতা-৭০০ ০০১
মূল্য ঃ ৩০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৮+১২৪
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪

উনবিংশতি শতাব্দীতে বাংলার স্থাণু জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা যখন নানাভাবে ধাক্কা খাচ্ছে, সেসময় বেশ কয়েকজন শক্তিমান পুরুষ এবঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলার সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথনির্দেশ দানের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও যাঁরা প্রবাদপুরুষ বলে গণ্য হতেন, বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁদের অনেকেই প্রায় ভুলে-যাওয়া মানুষ। **'মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে'** গ্রন্থে সেইরকম সাতজন প্রাণপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেকোন কাহিনীর সত্যতা বাড়ে যদি কাহিনীকার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তা বলেন; আর তার বিশ্বস্ততা নির্ভর করে বক্তার চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর। বর্তমান ক্ষেত্রে লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যনিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তিনি যে সাতজন মনীষী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দমোহন বসু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। সেজন্য লেখাগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কারো সম্বন্ধে মূল্যায়ন যে মূল্যনির্ণায়কের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর খানিকটা নির্ভরশীল হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

লেখক যাঁদের কথা লিখেছেন, লেখাগুলি ঠিক তাঁদের জীবনী নয়। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর লিখিত হওয়ায় এবং লেখকের বলিষ্ঠ বর্ণনা-ভঙ্গিমায় চরিত্রগুলির স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার, ধর্মীয় মতানৈক্যের এবং তৎকালীন বাংলার কয়েকটি পত্রপত্রিকার উত্থান-পতনের কিছুটা ইতিহাস। গ্রন্থটিতে ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়, যা সরাসরি কোন ব্রাহ্মধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বিষয়ে এমন সব তথ্য এই গ্রন্থে আছে, যার অনেকাংশই নতুন বলে কৌতূহলোদ্দীপক। গৃহী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন 'মহর্ষি' বলে আখ্যাত হয়েছিলেন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ঈশ্বরবিশ্বাসের স্বরূপ কি ছিল, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দমোহন বসুর নির্ভিক ব্যক্তিত্ব ও স্বাদেশিকতা এবং পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সাংস্কৃতিক ও উচ্চ নৈতিক জীবনাদর্শ কিভাবে জনগণের ওপর প্রভাববিস্তার করেছিল, 'সোমপ্রকাশ' ও অন্যান্য কয়েকটি তৎকালীন পত্রপত্রিকার অভ্যুত্থান ও বিলুপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে কিছু তথ্য জানা যায় এই গ্রন্থে। তবে লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন এবং এই ধর্মে রাঙানো চশমার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন বলে বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার অংশীদার হয়েও তাঁর স্বরূপ লেখকের কাছে ধরা পড়েনি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই চরিত্র-আলেখ্যগুলি পূর্বে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় এবং পরে সেগুলি 'Men I have seen' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী মায়া রায় এটি বাঙলায় অনুবাদ করে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। অনুবাদে গতির স্বাচ্ছন্দ্য একটুও ব্যাহত না হওয়ায় এবং ভাষার দক্ষতার ফলে বোঝাই যায় না যে, এটি অনুবাদ।

গ্রন্থটি তথ্যবহুল ও সুপাঠ্য। আশাকরি এতে বর্ণিত চরিত্রগুলি পাঠকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। যুগের প্রয়োজনে এখন এই ধরনের চরিত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। অন্তত আজকের তরুণ-তরুণীদের কাছে এই গ্রন্থের একটা বিশেষ মূল্য আছে। সেজন্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। ❑

শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ জীবনী

শান্তি সিংহ
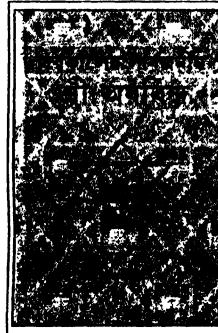
সর্বকালের সার্বজনীন
শ্রীঅরবিন্দ
নীরদবরণ
অনুবাদ ঃ দেবপ্রসাদ
প্রকাশক ঃ
অসীমা প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
মূল্য ঃ ৫০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৮+২৭২
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৩

শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত-গবেষক নীরদবরণ একদা ইংরেজিতে 'Sri Aurobindo for all ages' নামে একটি মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় দেবপ্রসাদ উক্ত গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগ্রন্থের নাম দিয়েছেন—**'সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ'**।

সরস ঝরঝরে ভাষায় লেখা গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলেই মুগ্ধতা জাগে, আবিষ্ট হতে হয়। কারণ, সেকালের বিখ্যাত চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষ মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ই ব্রাহ্মমতে রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে স্বর্ণলতাকে বিয়ে করেন। তাঁদের তৃতীয় সন্তান অরবিন্দ—যিনি বাল্যকালে স্বদেশী আদবকায়দাবর্জিত বিদেশী সহবতে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৩ চোদ্দ বছর অরবিন্দ পড়াশোনার জন্য ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার, লণ্ডন ও কেমব্রিজে কাটান। তখন শেক্সপীয়র রচনাবলী, শেলীর 'Revolt of Islam' প্রভৃতি ইতিহাস ও সাহিত্যগ্রন্থে তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মায়। Classical Tripos B. A.-তে গ্রীক-ল্যাটিন পাঠরত অরবিন্দ ১৮৯২-এ I. C. S. পরীক্ষায় পাস করেন। অথচ চাকরিমনস্ক না হয়ে ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। তারপর বরোদায় শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। সঙ্গে গভীর অধ্যয়ন, প্ল্যানচেট। সেসময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবলোকে তাঁকে নির্দেশ দেন—'মন্দির গড়ো'। (পৃঃ ৪৬)

সেসময় ছোটভাই বারীনের দুরারোগ্য জ্বর ভাল হয় এক নাগা সন্ন্যাসীর যোগশক্তির প্রভাবে। তা দেখেই শ্রীঅরবিন্দ যোগশক্তি বিষয়ে গভীর অনুরাগী হন। এপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ঃ "যোগসাধনায় আমার প্রবেশ পিছনের দরজা দিয়ে।" (পৃঃ ৪৯) প্রাণায়াম প্রক্রিয়ায় তাঁর রচনা-শক্তিতেও স্বতঃস্ফূর্ততা আসে। (পৃঃ ৫১)

ক্রমে তাঁর জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হওয়া ও নেতৃত্বদান এবং স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সংযুক্তির জন্য ইংরেজের হাতে গ্রেফতার হওয়া। পরে আলিপুরে বোমার মামলায় একবছরের কারাবাস। তাঁর কাছে এটি ছিল যেন আশ্রমজীবন! এইসময় তাঁর ধ্যানী চেতনার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে থাকে। গীতার অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনা তিনি নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। দিব্যচেতনার উপলব্ধি (Realisation of the cosmic consciousness)—শরণাগতি।
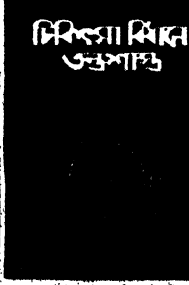
এরপর বিপ্লবী অরবিন্দের ক্রমে ঋষি অরবিন্দে উত্তরণ ঘটে। চন্দননগর থেকে তিনি আসেন পণ্ডিচেরী। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে পণ্ডিচেরীতে তাঁর তপস্যাগভীর জীবন। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে তাঁর শেষ চিঠি লেখার কথা বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায়। ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুসংবাদে ঋষি অরবিন্দের ঐতিহাসিক চিঠিটি ১৯১৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্বশুর ভূপালচন্দ্র বসুকে লেখা। সেটি গভীর মানবিকতাপূর্ণ সংবেদনশীল।

এই গ্রন্থে পণ্ডিচেরীর সাধনজীবনে শ্রীঅরবিন্দের সমীপে বিদেশিনী নারীর 'মীরা মা' হয়ে ওঠার তথ্যঋদ্ধ চিত্র মনোগ্রাহী। 'পূর্ণ যোগ ও অরবিন্দ আশ্রম', 'আশ্রমের সম্প্রসারণ' অধ্যায়-সহ 'পরিশিষ্ট' অংশটি চিত্রময়।

গ্রন্থের অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হলে ভাল হয়।❑

রোগ উপশমে তন্ত্রসাধনা

তাপস বসু

চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র (২য় ভাগ)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর
প্রকাশক ঃ
প্রাচী পাবলিকেশনস্
এইচ. রায়চৌধুরী
৩/৪ হেয়ার স্ট্রিট (তৃতীয় তল)
কলকাতা-৭০০ ০০১
মূল্য ঃ ৪৫ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১০+১৮০
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯১

চব্বিশটি রোগের উল্লেখ করে, তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা কিভাবে আরোগ্য লাভ করা যায়—তা-ই **'চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র'** গ্রন্থের মুখ্য বিষয়। রোগগুলির মধ্যে আছে যেমন সাধারণ স্তরের, তেমনি আবার দুরারোগ্য রোগ সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কণ্ঠ, জিহ্বা, পিত্ত, নাসিকা ইত্যাদি সাধারণ রোগের পাশাপাশি স্পণ্ডিলাইটিস, পক্ষাঘাত, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ, মৃগী ইত্যাদি কঠিন রোগের কথাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থকার আয়ুর্বেদাচার্য। আমরা জানি, রোগ নির্ণীত হলে দুটি উপায়ে তার উপশম হয়। একটি ভেষজবিদ্যার মাধ্যমে, আরেকটি শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে। প্রথমোক্ত পথটি ধরেই তন্ত্রসাধনার স্তরে উপনীত হওয়া যায়।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জলপড়া ইত্যাদি তন্ত্রবিধানের অন্তর্ভুক্ত। আয়ুর্বেদের বহু গ্রন্থ আছে, যেগুলির অপর নাম 'সংহিতা'। আবার আত্রেয় সংহিতা ও চরক সংহিতাকে আত্রেয় তন্ত্র ও চরক তন্ত্ররূপেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিমিতন্ত্র, বিদেহতন্ত্র, মারুতিতন্ত্র, নাগতন্ত্র, কাশ্যপতন্ত্র—এইসব নানা তন্ত্র, যা অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত, তার সংস্কৃত শ্লোক বাঙলায় ব্যাখ্যা-সহ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট রোগের উপশমের কথা গ্রন্থকার একের পর এক সাজিয়ে দিয়েছেন। বাঙলায় ব্যাখ্যাত হওয়ায় সকলের পক্ষেই এবিষয়টি বোঝা সম্ভব। এই পথে রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়।

তবে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুযায়ী ছাপা উন্নত মানের নয়। মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জা আরো ভাল হলে গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করা হতো।❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

ধলেশ্বর কেন্দ্র (ত্রিপুরা) : আগরতলা আশ্রমের এই শাখাকেন্দ্রে গত ৩১ জুলাই ২০০৩ প্রায় কয়েক হাজার ভক্ত এবং কয়েকজন সাধুর উপস্থিতিতে নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

আশ্রম-কৃতিত্ব

ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল (অরুণাচল প্রদেশ) : গত ২৯ আগস্ট ২০০৩ অরুণাচল প্রদেশে জন-কল্যাণার্থে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'পপাম পেরী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' মিশনকে 'ভ্যারিয়ার এলউইন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে। পুরস্কার-মূল্য—একটি শাল ও প্রশংসাপত্র-সহ ২০,০০০ টাকা।

ছাত্রকৃতিত্ব

শিলঙে অনুষ্ঠিত ২০০৩ সালের রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় **চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (মেঘালয়)** দুটি ছাত্র ১ম ও ২য় স্থান লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের** ৩৯ জন ছাত্রের সকলেই প্রথম বিভাগে (২৬ জন স্টার) উত্তীর্ণ হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০৩ সালের বি. এ. এবং বি. এসসি. অনার্স পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়গুলির ফলাফল নিম্নরূপ—

নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইংরেজিতে ১ম, স্ট্যাটিসটিক্স-এ ৩য় ও ৪র্থ, রসায়নে ২য় ও ৫ম, ইতিহাসে ৩য় ও ৮ম এবং পদার্থবিদ্যায় ৮ম স্থান অধিকার করেছে। **রহড়া মহাবিদ্যালয়ের** দুটি ছাত্র পদার্থবিদ্যায় ৪র্থ ও উদ্ভিদবিদ্যায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া **বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ) আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের** ছাত্ররা পদার্থবিদ্যায় ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম, রসায়নে ৭ম, গণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে।

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১২ আগস্ট ২০০৩ 'সংস্কৃত দিবস' উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং 'রামায়ণ' বিষয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। প্রথম অধিবেশনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী রাজীবানন্দজীর স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী শাস্ত্রচৈতন্য এবং অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ অয়ন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। উভয় অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী পররূপানন্দজী।

বহির্ভারত

বেদান্ত সেন্টার অফ সিডনি (অস্ট্রেলিয়া) : গত ৩১ আগস্ট ২০০৩ পুনর্নির্মিত ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পটপ্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও প্রায় ৪৫০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী সিদ্ধার্থানন্দজী (দিব্যাংশু মহারাজ) গত ৩ আগস্ট ২০০৩ রাত ১১টা ১০ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি বহুদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৫ সালে তিনি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে মায়াবতী, সারদাপীঠ (বেলুড়), পুরুলিয়া, মুম্বাই ও কাঁকুড়গাছি কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ২ বছর আলং কেন্দ্রে এবং ৯ বছর জাপান কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিগত ১০ বছর তিনি প্রথমে বেলুড় মঠে এবং পরে কাশী সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন মার্জিত স্বভাব ও শান্ত প্রকৃতির।

স্বামী ধর্মদানন্দজী (সুকুমার মহারাজ) গত ৮ আগস্ট ২০০৩ বিকাল সাড়ে ৩টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবিটিস, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতিতে ভুগছিলেন। স্কন্ধের অস্থিভঙ্গের জন্য তিনি গত মে মাস থেকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার পর তিনি ১৯৫৪ সালে রহড়া বালকাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বৃন্দাবন, আলমোড়া, বাগবাজার, রাঁচি মোরাবাদি, কাশীপুর, শ্যামলাতাল, কাঁথি, জামতাড়া, সেবাপ্রতিষ্ঠান ও তমলুক কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। একসময় তিনি বারাসত মঠের অধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি দীর্ঘ পাঁচবছর অবসরজীবন
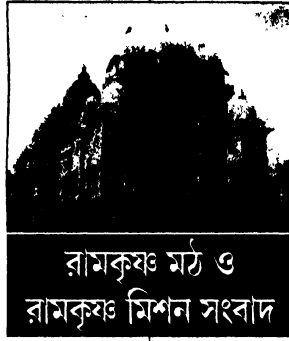
যাপন করছিলেন—প্রথমে বেলুড় মঠে এবং পরে সেবা-প্রতিষ্ঠানে। পূজনীয় মহারাজ ছিলেন কঠোর ও কর্মঠ প্রকৃতির।

স্বামী প্রমথানন্দজী (ধীরেন মহারাজ) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ১২ আগস্ট ২০০৩ রাখীপূর্ণিমার দিন সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে কানাডার টরন্টো কেন্দ্রে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫০ সালে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিন বছর তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কনখল, চেরাপুঞ্জি, পুরুলিয়া ও নরোত্তমনগর কেন্দ্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮২ সালে তাঁকে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের সহাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে তিনি কানাডার টরন্টো কেন্দ্রের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি আমৃত্যু ব্রতী ছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন দক্ষ ও কঠোরকর্মী এবং স্নেহপ্রবণ স্বভাবের।

স্বামী শাস্ত্রানন্দজী (সত্যনারায়ণ মহারাজ) নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৩ আগস্ট ২০০৩ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে ব্যাঙ্গালোরের ইয়েল্লাম্মা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শ্বাসকষ্টের জন্য তিনি এক সপ্তাহ আগে হাসপাতালে ভর্তি হন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার পর তিনি ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটি, হলিউড ও কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ কালচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি চণ্ডীগড় ও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষপদেও বৃত ছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কর্ণাটকের আলসূর আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২০ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা : গত ৩ অক্টোবর ২০০৩ মহাষ্টমীর দিন ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কলকাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কলকাতা-৯) : গত ১৮ ও ১৯ মে ২০০৩ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিবেকানন্দ আদর্শ মিলনমন্দিরে। গোপাল হালদারের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী পূতানন্দজী এবং স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, সুপ্রতীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দিব্যালোক রায়চৌধুরী। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় যুব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের মধ্যে নাটক প্রতিযোগিতা। এছাড়া আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২৪ ও ২৫ মে ২০০৩ ২১তম ষাণ্মাষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় **কালিয়াগঞ্জ সেবাশ্রমে (উত্তর দিনাজপুর)**। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। দুদিনের সম্মেলনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, এবং স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী পরাশরানন্দজী ও স্বামী বিজয়ানন্দজী। এতে ২৯টি আশ্রম থেকে ৫৮ জন প্রতিনিধি ও প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২৫ মে ২০০৩ ১০ম ষাণ্মাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (কলকাতা-১২৮)। এতে ৪০টি আশ্রম থেকে ১৫৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার ঘোষ।

হুগলি জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ১ জুন ২০০৩ পরিষদের ২০তম ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় **তিলকচক শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্রে (হুগলি)**। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। এতে ৩৫টি আশ্রম থেকে ৬২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (বাঁকুড়া) : গত ৫ জুন ২০০৩ বেদ, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রামনাম-সঙ্কীর্তন পরিবেশন করেন

স্বামী অভয়াত্মানন্দজী। ধর্মসভায় সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী অভয়াত্মানন্দজী ও ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, ডাঃ যামিনীকান্ত মাহাত পুকুর ও বাগান-সহ তাঁর দ্বিতল বাড়িটি সেবাসঙ্ঘকে নিঃশর্তে দান করেছেন।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (কলকাতা-৯) ঃ গত ৬-৮ জুন ২০০৩ একটি যুবশিবিরের আয়োজন করা হয় **খড়িবেড়িয়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে (বজবজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)**। শিবিরের উদ্বোধন ও প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন স্বামী রাজীবানন্দজী। মনঃসংযম, মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করেন গৌরগোপাল সাহা, সোমনাথ বাগচী, রঞ্জিৎকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। শিবিরে প্রায় ২০০ যুবক যোগদান করেছিল।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৭-৮ জুন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় প্রথমদিন একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। 'ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় জনসাধারণ ও নারী উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ১৩০ জন যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল। পরদিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব। দুপুরে প্রায় ৩,১০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে ৪০টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

জনান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (বাদুড়িয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৭-৮ জুন ২০০৩ শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম আবির্ভাব উপলক্ষ্যে সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করে ভাষণ দেন স্বামী বীতরাগানন্দজী। ধর্মসভায় এই সংস্থার সভাপতি সুদিন বিশ্বাসের স্বাগত-ভাষণের পর আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার, পৌরপিতা সুশান্ত ঘোষ প্রমুখ। স্বপ্না দাসের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৫৮ জন সফল প্রতিযোগীকে শ্রীশ্রীমায়ের একটি ছবি-সহ শংসাপত্র দেওয়া হয়।

বেলুড় পল্লীমঙ্গল সারদা সমিতি (হাওড়া) ঃ গত ৭-৯ জুন ২০০৩ গ্রামীণ মহিলাদের হস্তশিল্প প্রদর্শিত হয় **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের 'বিবেকানন্দ সেমিনার হল'**-এ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে ভাষণ দেন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী কৃপানন্দজী।

হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটি (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৪ জুন ২০০৩ সাধক রামপ্রসাদের ভিটায় রামপ্রসাদ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও জগন্মাতার স্নানের জন্য পাঁচশতাধিক ভক্তের ঘটে করে গঙ্গাজল আনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে স্থানীয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি পার্কে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রেটারনিটির সভাপতি রতনকুমার ঘোষ। ভাষণ দান করেন বেলুড় মঠের স্বামী অতন্দ্রানন্দজী, বেদান্ত মঠের স্বামী পরমাত্মানন্দজী, নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। সভান্তে সাধক রামপ্রসাদের জীবনী অবলম্বনে লীলাকীর্তন পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ দিনাজপুর) ঃ গত ১৪ ও ১৫ জুন ২০০৩ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি ও খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রেয়সী চ্যাটার্জি। দুপুরে প্রায় ২,০০০ নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ এবং ৫২ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দজী ও প্রশান্তকুমার সিন্‌হা। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রশান্তকুমার সিন্‌হা

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

১৯১১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীশ্রীমা ব্যাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে (বুল টেম্পল রোডে অবস্থিত) শুভ পদার্পণ করেছিলেন। স্থানে স্থানে পথের দুধারে অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমাকে অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমা এঁদের প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ "তাদের খুব ভক্তি!" ব্যাঙ্গালোরে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের পিছনে ছিল ছোট্ট একটি টিলা। একদিন সূর্যাস্তের সময় ঐ টিলার ওপরে উঠে শ্রীশ্রীমা পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়েছিলেন। খবর পেয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ছুটে গিয়ে মাকে দর্শন করে "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে..." স্তবাংশ আবেগভরে আবৃত্তি করেন। সেই টিলার ওপরে বর্তমানে একটি বেদিতে শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র স্থাপনা করা হয়েছে। প্রচ্ছদে সেই টিলার চিত্রটি দেখা যাচ্ছে। এখানে নিত্য শ্রীশ্রীমাকে পুষ্প-চন্দনে পূজা করা হয়।

ও ডঃ শ্যামল গুপ্ত। সন্ধ্যায় বাউলগান পরিবেশন করেন সুকুমার বাউর।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনা শাখা ঃ গত ১৩-১৫ জুন ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় **পান্নালাল ইনস্টিটিউশনে** (নদীয়া)। চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক পদ্ধতি, মনঃসংযোগ, জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা প্রভৃতি ছিল শিবিরের অন্যতম বিষয়। শিবিরের সূচনা করে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন অধ্যাপক পার্থদেব ঘোষ, অধ্যাপক পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। শিবিরে প্রায় ৩০০ যুবক যোগদান করেছিল।

ভদ্রেশ্বর সারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ২৯-৩০ জুন ২০০৩ সঙ্ঘের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুদিনব্যাপী বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন নবনির্মিত সাধুনিবাসের উদ্বোধন করে ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও সুব্রত চক্রবর্তী। আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী শেখরানন্দজী। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও স্বামী বরানন্দজী।

কোন্নগর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা (হুগলি) ঃ গত ৫ জুলাই ২০০৩ সভাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন স্মরণে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'গীতা', 'ভাগবত' ও উপনিষদ্ পাঠ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত-ভাষণান্তে 'গীতাতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী দেবানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, উমা শ্রীমানী প্রমুখ।

ভাণ্ডামোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলি) ঃ গত ৯ ও ১০ জুলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বাস্তুযাগ, বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং কয়েক হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। যজ্ঞ ও পূজা করেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজী, স্বামী লোকেশানন্দজী প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, রতন বাউরী প্রমুখ। রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্যামল দাস অধিকারী। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী বেদান্তানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশানন্দজী, স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী, অধ্যাপক অমর আদক প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সেবাশ্রমের সভাপতি ডঃ অরূপ মুখার্জি ও সহ-সভাপতি মুরারি নাথ। এদিন উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে 'অর্ঘ্য' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, মন্দিরটি নির্মাণে প্রায় ৯ লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে।

বারাকপুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৩ জুলাই ২০০৩ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) ঃ গত ১৩ জুলাই ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। আলোচনা-শেষে সকল যুব-প্রতিনিধিকে একটি করে 'যুবনায়ক বিবেকানন্দ' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

কুমিরমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলি) ঃ গত ১৩ জুলাই ২০০৩ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, লীলাকীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ করেন ব্রহ্মচারী অনন্তভাই। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম পাত্র, রূপালী আদক প্রমুখ। 'কথামৃত', 'বাণী ও রচনা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন সুনীতি সাহা, আলোক দাশগুপ্ত প্রমুখ। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, মিহির দে বিশ্বাস ও হৃষীকেশ সরখেল। দুপুরে প্রায় ১৩০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

ওড়াহার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ) ঃ গত ১৩ জুলাই ২০০৩ গুরুপূর্ণিমার দিন সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও সেবাশ্রমের সম্পাদক নিরঞ্জনকুমার দাস।

সেবাব্রত

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (অসম) ঃ গত ৬ জুলাই ২০০৩ আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক স্বাস্থ্য-শিবিরে ২৯২ জন দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ-পথ্যাদি প্রদান করা হয়।

নোনা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ২০ জুলাই ২০০৩ একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। এদিন বিনামূল্যে ১৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (লণ্ডন)ঃ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সর্বধর্মসমন্বয় উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরতি ভট্টাচার্য, ইভ রাইট, সুস্মিতা দাস প্রমুখ। সিস্টার সিমনের আবৃত্তির পর স্বাগত-ভাষণ দেন রামচন্দ্র সাহা। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্সের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী বীতমোহানন্দজী। প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দান করেন ভারতের হাই কমিশনার রণেন্দ্র সেন। সম্মানীয় অতিথি হিসাবে লণ্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডাইরেক্টর মার্ক বিশরটন ও নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দজী ভাষণ দেন। এছাড়া হিন্দুধর্ম বিষয়ে স্বামী দয়াত্মানন্দজী, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ডঃ এম. বিজিরাঞ্জনা, খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে রেভারেণ্ড স্টিফেন অলিভার, মুসলিমধর্ম বিষয়ে ডঃ এম. এফ. হক, জুরথুস্ট্রধর্ম বিষয়ে রেভারেণ্ড রব্বি লরেন্স রিগাল ও শিখধর্ম বিষয়ে হিম্মৎ সিং সোহি ভাষণ দান করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মণি নন্দী। সভান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সুব্রত গুপ্ত, সুভাষকান্তি দাস প্রমুখ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী প্রভাবতী মজুমদার গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বালী-নিবাসিনী রেখা চট্টোপাধ্যায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বেহালা-নিবাসী অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ২ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে তাঁর যাতায়াত ছিল। অনাড়ম্বর জীবন ও সহৃদয় ব্যবহার ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বেহালা-নিবাসিনী উমারানী বসু গত ৪ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সহজ-সরল জীবন ও সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বনগ্রাম-নিবাসী দেবকুমার সরকার গত ৬ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, নদীয়ার তেহট্ট-নিবাসিনী ঝরনা দাসবৈরাগ্য গত ৬ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সমরকুমার বসু গত ৯ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী অমিয়বালা পাল গত ১৭ মার্চ ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। সরলতা ও সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'উদ্বোধন'-এর তিনি নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলি-নিবাসী কার্তিকচন্দ্র মোদক গত ২৮ মার্চ ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। সহজ-সরল ব্যবহার ও ঈশ্বরনির্ভরতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, গুয়াহাটী-নিবাসী যোগেশচন্দ্র ধর গত ১ এপ্রিল ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। নিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। প্রতি মাসে আমাদের দপ্তরে উৎসব-সংবাদ এত বেশি আসে যে, সেগুলি প্রকাশ করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাতে স্বাভাবিকভাবে সংবাদ-মূল্যও হ্রাস পায়। তাই সাধারণভাবে বছরে কোন সংস্থার ২টির বেশি সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। আশা করি প্রতিষ্ঠানগুলির সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।—**সম্পাদক**

আগন্তুক ঃ আপনি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের [illegible]

ভক্ত ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগন্তুক ঃ আচ্ছা, আমাকে বলুন তো ভক্তের কর্তব্য [illegible]

ভক্তের কর্তব্য ঃ

* ঈশ্বরের নামগুণগান
* সাধুসঙ্গ
* নির্জনবাস
* বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা
* বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে

জনৈক ভক্তের সৌজন্যে

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলি

- **রামকৃষ্ণ মঠ,** আঁটপুর-৭১২৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম,** ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর-৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির,** ৭ নবীন সেন রোড, নবগ্রাম
  কোন্নগর-৭১২২৪৬, ফোন ঃ ২৬৭৩-৯২০৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান-৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ,** অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুন্তুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ** (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী,
  পলতাগড়-৭১২৪০৯, ফোন ঃ ২৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি,** প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর-৭১২৪০৯
  ফোন ঃ ২৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), ডানকুনি-৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী,** প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি-৭১১২২৪
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জি, ৬৪/জি, ডঃ সরোজ মুখার্জি স্ট্রিট
  উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮, ফোন ঃ ২৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,** রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া-৭১২২৫৮
  ফোন ঃ ২৬৬৩-৭০৪৬
- **শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ,** প্রযত্নে বরুণকুমার চক্রবর্তী
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
  ফোন ঃ ২৬৮৪-৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ,** প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী-৭১২৫০৩
- **শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র**
  গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা-৭১২৭০৬
  ফোন ঃ ৯১১২-২৬৬২৫৭/৬৫৫
- **জনাই শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্র,** প্রযত্নে দীপশিখা ঘোষ
  জনাই-৭১২৩০৪, ফোন ঃ ৯১১২-২৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র,** গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম,** গ্রাম+পোঃ ভাঙামোড়া-৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ১৩বি, সান্যাল লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১
  ফোন ঃ ২৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**
  তারকেশ্বর-৭১২৪১০
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙেপাড়া-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রিট, ভদ্রকালী-৭১২২৩২

নদীয়া

- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,** বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ,** চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন,** চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ,** ব্লক-বি, সিভিক সেণ্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি,** এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য,** রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর,** প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **রামকৃষ্ণ আশ্রম,** কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র,** প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ,** রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ,** বগুলা-৭৪১৫০২
- **নব রামকৃষ্ণ অপেরা,** বগুলা হাইস্কুল রোড, বগুলা-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র,** এফ/১২, পোঃ তাহেরপুর

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫
  পিন ঃ ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম,** ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**
  শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী,** প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোলপুর,** ফোন ঃ ০৩৪৬৩-৫৪১৬৪

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী,** বেলডাঙা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙা-৭৪২১৩৩
- **দ্বিজেন্দ্রনাথ মণ্ডল,** সাগরপাড়া বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সাগরপাড়া-৭৪২৩০৬

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,** রামহরিপুর-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র,** কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা-৭২২১৫০

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

সঞ্চয়ের দারুণ সুবিধা।
সাথে ফ্রি জীবনবীমা
আমার জন্য ভালো।
আমার পরিবারের পক্ষেও ভালো।

এবার এলো

প্রকল্পের সময়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
ফ্রি জীবনবীমার* নিরাপত্তা

এত দারুণ সুযোগ তো কেবল পিয়ারলেসই দিতে পারে

• পাঁচ বছরের রেকারিং ডিপোজিট স্কীম • মাসে ৫০০ টাকা করে অথবা ১০০ টাকার গুণিতকে জমান • মেয়াদ পূর্তিতে ৫.৮০% কার্যকরী সুদ • মেয়াদপূর্তির আগে এক বছর পর টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ • আপনার পরিচিত, নির্ভরযোগ্য পিয়ারলেস এজেন্ট আপনার বাড়িতে আসবেন। লাইনে দাঁড়ানো নেই। দেরী হবে না • কোন ডাক্তারি পরীক্ষা লাগবে না • প্রত্যেক ডিপোজিটারের জন্য বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস্ কার্ডএর সুবিধা।

আস্থার প্রতীক

*arranged through Allianz
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, 'পিয়ারলেস ভবন', ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

আপনার কাছের পিয়ারলেস এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা যোগাযোগ করুন : ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : কলকাতা (০৩৩) ২২৪২ ০৮০৪/১০০১/১০৬৯ • নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : গুয়াহাটি (০৩৬১) ২৫২ ৩৮৭৮/২১৬৬ • নর্দার্ন রিজিওনাল অফিস : নিউ দিল্লী (০১১) ২৩৩৪ ৬৪২১, ২৩৭২ ৪৮৬২ • ওয়েস্টার্ন রিজিওনাল অফিস : মুম্বাই (০২২) ২২৮২ ৫৮০৭, ২২৮৮ ২৫৮৯, ২২৮৪ ৩০৯৬ • সাউথ সেন্ট্রাল রিজিওনাল অফিস : হায়দ্রাবাদ (০৪০) ২৭৬১ ৭১৭৬/৭১৭৭ ২৭৬৪ ৪৪০২, ২৭৬০ ২২৪৩ • সাদার্ন রিজিওনাল অফিস : চেন্নাই (০৪৪) ২৮৫৩ ৩৩৩৫/৫৩২৬

www.peerless.co.in

Statutory advertisement published in GANASHAKTI and BUSINESS STANDARD on 04 07 2003

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone 2554 2248, 2554 2403

Vol. 105
No. 10
OCTOBER
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO WB RNP-15 LPWP-01 2003
ISSN 0971-4316 R N 8793 57
Postal Regn. No. MM&PO WB RNP 15 2003

ISSN 0971-4316
9 770971 431004 10

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) 'উদ্বোধন' ১০৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✡ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✡ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✡ 'উদ্বোধন'-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০৩ এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। তাহলেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করবেন—এই প্রার্থনা।

✡ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/**Editor,** ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে গ্রাহকের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ ১৪১০ ◻ ১১শ সংখ্যা

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

পোঃ কামারপুকুর, হুগলি-৭১২ ৬১২

ফোন ঃ (০৩২১১) ২৪৪২২১

একটি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমনে এই স্থান সবসময়ই জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। কেউ আসেন তীর্থপর্যটনে, কেউ আসেন আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হতে, আবার কেউ এর শান্ত সমাহিত মহিমা উপভোগ করেন। ছবির মতো সৌন্দর্যে ভরা এর আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সবসময়ই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে আকর্ষণ করে চলেছে।

হাওড়ায় অবস্থিত মূল কেন্দ্র যা 'বেলুড় মঠ' নামে খ্যাত, কামারপুকুর মঠ ও মিশন তারই একটি শাখাকেন্দ্র। যদিও এই কেন্দ্র স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক ভিটার অবিকল সংরক্ষণ এবং ভক্ত ও সাধুদের সাধন-ভজনের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, তবু এই কাজ ব্যতীত এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকাজকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সেবাব্রতের অঙ্গ হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন মেটাতে এই কেন্দ্র সূচনাকাল থেকেই তৎপর। এইসব সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোন নিজস্ব ভবন না থাকায় এযাবৎ মঠেরই কোন অংশে এগুলিকে স্থান করে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। ফলে ব্যাহত হয়েছে সুষ্ঠু পরিচালন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ এবং সাধু ও ভক্তদের জন্য নির্মিত রন্ধনশালা ও ভোজনগৃহ অত্যন্ত প্রাচীন হওয়ায় জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর আশু পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এই কাজ এখন নিষ্পন্ন করতে না পারলে যেকোন দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এছাড়া একটি পূজাবেদি ও তৎসংলগ্ন দর্শনমঞ্চ একান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় এখন আমরা প্রার্থনাগৃহটিকেই ব্যবহার করি। কিন্তু দিনে দিনে শিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সেজন্য অতি সত্বর একটি স্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণ করা আবশ্যক।

এই কাজগুলি অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাদের যে-অর্থের প্রয়োজন তা নিম্নরূপ—

১।	শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পাকশালা নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
২।	সাধু ও ভক্তদের ভোজনশালার সম্প্রসারণ বাবদ	২০ লক্ষ টাকা
৩।	দেবীপূজা ও অন্যান্য উৎসবের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
৪।	রন্ধনশালার ও অন্যান্য কর্মীদের আবাসন নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অতীতের মতো বর্তমানেও এই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তেরা উদারভাবে এগিয়ে আসবেন এবং অকৃপণভাবে সাহায্য করে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কাজগুলি যাতে সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করবেন। সব দান চেকে বা ড্রাফ্টে ওপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কামারপুকুর শাখা অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মহেশপুর শাখায় **রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর** নামে পাঠাবেন। **সব দানই ১৯৬১-র আয়কর আইনের ৮০জি অনুযায়ী করমুক্ত**। প্রতিটি দানের যথাযথ স্বীকৃতি থাকবে।

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
সম্পাদক

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৫॥

১০৫তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪১০ নভেম্বর ২০০৩

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

—মানুষের বুদ্ধিতে যেসকল কামনা আশ্রিত রয়েছে, তারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

★

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥

—কেউ যদি পরমাত্মাকে 'আমিই ইনি' বলে জানেন, তবে তিনি কোন্ ফলের ইচ্ছায় বা কার প্রয়োজনে শারীরিক দুঃখে দুঃখী হবেন?

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

—মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য। এই ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নেই। যিনি এতে ভেদপ্রায় কিছু দেখেন, তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হন।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥

—ধীমান, ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সেই আত্মাকে জেনে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) অবলম্বন করবেন। বহু শব্দের চিন্তা করবেন না, কারণ তা বাগেন্দ্রিয়ের গ্লানিকর।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।৭, ৪।৪।১২, ৪।৪।১৯, ৪।৪।২১)

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধশতবর্ষপূর্তির পুণ্যলগ্নে

আগামী ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১০ (১৬ ডিসেম্বর ২০০৩) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমায়ের ১৫১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইবে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষপূর্তি হইবে। ইহা যে এক মহাপুণ্যক্ষণ তাহা আর বলিতে হইবে না। দিকে দিকে এই মহা শুভক্ষণের যথোচিত মর্যাদা জ্ঞাপন করিবার জন্য মায়ের সন্তানগণ ইতোমধ্যেই বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ আগামী ১৬ ডিসেম্বর হইতে এক বর্ষব্যাপী নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থান জয়রামবাটীতে এই বর্ষব্যাপী উৎসবের শুভসূচনা হইবে। বেলুড় মঠে উহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে ২০05 সালের জানুয়ারি মাসে। বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেও কিছু কিছু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রও নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী এই শুভ মুহূর্তকে স্মরণ করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত নহে—এমন বহু সংগঠনও এই পুণ্যক্ষণে সাধ্যানুযায়ী উৎসবাদি করিবেন, সে-খবরও আসিতেছে। ভক্তবৃন্দের উৎসাহ-উন্মাদনা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা জগতে ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করিবে বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা যে ক্রমে ক্রমে বাস্তবায়িত হইতেছে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী সকলে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নততর করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছে—একথা এখন প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের যে অসাধারণ ভূমিকা দিন দিন প্রকট হইতেছে তাহা বিস্ময়কর। বস্তুত, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের পূর্বে তাঁহার জীবন ও বাণী প্রচারের আলোয় বেশি আসে নাই। ঐবৎসরই শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দের বহু ঈপ্সিত এই শ্রীসারদা মঠ সম্পূর্ণভাবে নারীগণের দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল। এই সময়ের পর হইতেই শ্রীশ্রীমায়ের কথা আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রসার-লাভ করিতে থাকিল। শ্রীশ্রীমা বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত হইল এবং প্রকাশলাভ করিল। নারীসঙ্ঘের উপর স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, কারণ নারীর উন্নতি বিনা কোন জাতির সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। এবং স্বামীজী ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ নারীসঙ্ঘ কখনোই পুরুষনির্ভর হইবে না। দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মঠের দ্বারা পরিচালিত হইবার পর শ্রীসারদা মঠ একটি স্বাধীন, আত্মনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠনরূপে যখন আত্মপ্রকাশ করিল, তখন আরেকবার স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী রূপায়ণের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইল, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, ঐ নারীসঙ্ঘ হইতে পুনরায় গার্গী, মৈত্রেয়ীর ন্যায় মহীয়সী দিব্য নারীচরিত্রের আবির্ভাব হইবে।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং সর্বোপরি আদর্শ জননী। 'আদর্শ জননী' বলিলে বোধকরি অনেকটাই অনুক্ত থাকিয়া যায়। যিনি নিজেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও জননী বলিয়া ভাবিতে পারেন, বিশ্বপ্রসবিনী সেই মহাশক্তিকে 'আদর্শ জননী' বলিলে কমই বলা হয়। তবু আমাদের ব্যক্তিগত বোধসৌকর্যার্থে ঐ 'আদর্শ জননী' শব্দটিই বেশি অনুমোদনীয়। কারণ, জননীর নৈকট্য অধিক। মাটির মানুষ আকাশচারিণী জননীকে মাটিতে নামাইয়া না আনিলে শান্ত হয় না। তাই আমাদের 'অকালবোধন'। তাই উমা-মেনকার শত শত উপাখ্যান, যেখানে জগজ্জননী আমাদের ঘরের কন্যা, ঘরের বধূ।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসিনী। প্রবল সংসারাসক্তির একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত ছিল তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য। কেহ ভাবিত, রাধুর প্রতি 'মা' এত আসক্ত, এর পরেও 'মা'কে সাক্ষাৎ জগদম্বা ভাবিতে কষ্ট হয়! কেহ কেহ মায়ের শ্রীচরণ সেবা করিতে গিয়া দেখিতেন, ক্রমে রক্তমাংসের চরণযুগল অদৃশ্য হইয়া সেখানে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর দেবোপম উজ্জ্বল দুখানি চরণ শোভা পাইতেছে। কখনো বা আগত শিষ্যের ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া দিয়া 'মা' বলিতেছেন ঃ "আমি তোমার সত্যিকারের মা।" যেদিন শ্রীশ্রীমা অনুভব করিলেন, এই রক্তমাংসের শরীরটা এবার ছাড়িতে হইবে, সেইদিন হইতে রাধুকে আর দর্শন করিতে একবিন্দু 'ইচ্ছা' তাঁহার আর হয় নাই। যে 'রাধু', 'রাধু' করিয়া তিনি মনটি নামাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই রাধুর প্রতি তাঁহার এই অকস্মাৎ বীতরাগ সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। বুদ্ধিমান কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন ঃ "এবার বুঝি নরলীলা শেষ হইতে চলিয়াছে।" সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত বৈরাগ্য এবং ত্যাগের মহিমা ক্রমশ প্রকাশলাভ করিতেছে।

আদর্শ পত্নী হিসাবে শ্রীশ্রীমা যে-আর্তি, ঐকান্তিকতা ও ত্যাগ সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস-মাত্রই দেওয়া সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধা-বিবেচনা এমন উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, তাহার সামান্য ধারণামাত্র যেকোন দাম্পত্যকলহ নিমেষে দূর হইতে পারে বলিলে অধিক বলা হয় না। মা বলিতেন ঃ "সংসারে যা আদর্শ তার চেয়ে ঢের বেশি করেছি।" আদর্শ গৃহিণী কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীশ্রীমা। সকলকে লইয়া চলিবার যে অসাধারণ দক্ষতা তিনি দেখাইয়াছেন তা অপ্রতিম। তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সপ্তম অধ্যক্ষ, ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ যথার্থই বলিয়াছেন ঃ "শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনাবৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক সেই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই, উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারীচরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা, এবং বলিতে গেলে সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি—যাহা সকল জাতি ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।"

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি বলেন ঃ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—একা আমিই বিদ্যমান, এই ত্রিভুবনে দ্বিতীয় আর কোন বস্তু নাই—তাঁহার আবার বয়স কি? শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ ইত্যাদি ব্যাপার যিনি জন্মরহিতা, জ্যোতিঃস্বরূপা, যিনি অনন্তকালব্যাপী মানুষের সৌভাগ্যদায়িনীরূপে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন, শান্তিরূপে, দয়ারূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, ক্ষান্তিরূপে, তুষ্টিরূপে মানবের চিত্ত আলোকিত করিতেছেন—তাঁহার আবার একশো বৎসর, দেড়শো বৎসরের উপাধি কিসের? জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তো এসব ছেলেমানুষী ব্যাপার।

তাহা হইতে পারে। জ্ঞানী জ্ঞান লইয়া থাকিতে চাহেন তো কাহারো আপত্তি নাই। কিন্তু ভক্তের মন তো তাহা মানিতে চাহে না। ভক্ত বলেন ঃ "আমরা কিন্তু মায়ের সন্তান। আমাদের মা অচিন্ত্যা, অকল্প্যা, দিব্যভাবময়ী মা নহেন। আমরা যাঁহাকে দেখিতে পারি, যাঁহাকে ভালবাসিতে পারি, যাঁহার কাছে নিঃসঙ্কোচে যাইতে পারি, বসিতে পারি, প্রাণের কথা কহিতে পারি—এমন মা-ই আমাদের প্রয়োজন। এবং সেই মায়ের শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ, দ্বিশতবর্ষ ইত্যাদি সবই সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করিবার বাসনা এবং প্রয়োজন আমাদের আছে। মায়ের নামে আমরা স্বয়ং মাতিয়া উঠিব, এবং চাহিব বিশ্বচরাচরে মায়ের মহিমার সুবাস পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্ববাসী সকলেই মাতিয়া উঠুক মায়ের নামগানে, মায়ের জয়গানে।" ❑

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র*

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত

৯২১ ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রিট
লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া
২৪ জানুয়ারি ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আজ সকালে তোমার ছোট্ট চিঠিখানা এসেছে। এতে মিস নোবলের [ভগিনী নিবেদিতা] পৌঁছানোর সংবাদ জানলাম, আর বেশি কিছু নয়। এটা যেন শুধু 'কেমন আছি' জানতে চাওয়া। জান, আমি এখন বেশি পরিশ্রম করছি না, কারণ করার মতো যথেষ্ট কাজ পাচ্ছি না। প্রথম মাতামাতিটা শেষ হয়ে গেছে এবং লোকেরা টাকা খরচ করতে চায় না। আমি সান ফ্রান্সিস্কোতে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি। সেটা একটা নতুন ক্ষেত্র। কাজ করে করে আমি সম্পূর্ণ ক্লান্ত এবং আগের মতো কাজ করার সেই উদ্দীপনা আর নেই। যেন চলেছি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য, তাও কোনরকমে। সে যাই হোক, একটা জিনিস হয়েছে এই যে, পূর্বদেশে আমি যা ছিলাম তার চেয়ে শারীরিক দিক থেকে অনেকটা ভাল আছি—ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন অবস্থার চেয়ে তো বটেই। আশা করি সেটা একটা সুস্পষ্ট লাভ।

এখন একনাগাড়ে অন্তত তিন মাইল হাঁটতে পারছি। কিন্তু আমার ভাবনা হলো, আমার জীবনের বাকি দিনগুলিতে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। আরোগ্যকারিণী [চৌম্বক-আরোগ্যকারিণী মিসেস মেল্টন] বলেছেন, আমি সেরে গিয়েছি—বহু বছরের সঞ্চিত রক্তের বিষ ঝেড়ে ফেলে আমাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে এখন প্রকৃতির মাত্র কয়েক সপ্তাহ লাগবে। তিনি জানিয়েছেন, আমার বহুমূত্র বা 'ব্রাইটের ব্যাধি'ও** নেই। তাঁকে আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে, কারণ তিনি আমার সামনেই বিস্ময়কর আরোগ্যসাধন করেছেন এবং ততোধিক বিস্ময়করভাবে রোগনির্ণয় করেছেন।

তুমি কেমন আছ? অবসাদে নিমগ্ন? স্বাস্থ্যোন্নতি ছাড়াও আমার আরেকটা ব্যাপারে বেশি লাভ হয়েছে। এখন আমি আর নৈরাশ্যে ভুগি না। আমি পুরোপুরি শরণাগত।

আমার আশঙ্কা হলো, বাকি জীবনটা আমাকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং যে-বিশ্রাম ও শান্তি আমি খুঁজি, তা আর কখনো মিলবে না। কিন্তু আমার মাধ্যমে 'মা' অপরের মঙ্গলসাধন করেন—অন্ততপক্ষে কিছু পরিমাণে আমার স্বদেশের; আর নিজেকে অপরের জন্য উৎসর্গীকৃত ধরে নিয়ে আপন অদৃষ্টের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বরং সহজ। আমরা সবাই উৎসর্গীকৃত—প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ভাবে। মহাযজ্ঞ চলছে। এটি যে একটি মহৎ উৎসর্গলীলা—এ-দৃষ্টিতে না দেখলে কেউই এর অর্থ খুঁজে পায় না। যারা এই নিয়তিকে বরণ করে নেয়, তারা অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায়। যারা প্রতিরোধ করে, তারা শেষপর্যন্ত ভেঙে প'ড়ে নতিস্বীকার করে এবং বেশি যাতনা ভোগ করে। এখন

---

* এই চিঠির একটি অনুচ্ছেদ স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র অষ্টম খণ্ডে (৪৫৫নং পত্র) ভুল করে মার্গটের (ভগিনী নিবেদিতা) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ চিঠিখানি এখানে মুদ্রিত হলো।

** নেফ্রাইটিস্ বা কিডনি-সংক্রান্ত ব্যাধি।

আমি এই নিয়তিকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে বদ্ধপরিকর। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে আমি পূর্বদিকে যাত্রা করব। যদি তুমি চাও তবে ডেট্রয়েটে তোমার সঙ্গে দেখা করব। মার্চ মাসে কিংবা তার পরে। ভেবো না তার আগে আমি পূর্বদেশে যাব। এমনকি মার্চ মাসেও খুব ঠাণ্ডা। তাই না?

মিসেস ব্লজেট[১] নামে এক শিকাগো-রমণীর গৃহে আমি বাস করছি। তিনি সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর আট কক্ষবিশিষ্ট একটি ছোট কুটির ও একটি রান্নাঘর আছে। এখানে জীবনযাত্রা খুবই সরল। অধিকাংশ সময় আমি নিজের রান্না নিজেই করি। আমি অকারণে হৈচৈ করতে ভালবাসি। আর বেচারা মিসেস ব্লজেট মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, প্রয়োজনের সামগ্রীগুলি আমার পক্ষে অত্যন্ত মামুলী ও সাধারণ হচ্ছে। শুধু তিনি যদি জানতেন আমরা ভারতে কিভাবে বাস করতাম! আমি বরাবর যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এসেছি, এখানকার মজুরদের জীবনযাত্রার মান তার চেয়ে উঁচু। আমি যদি দশলক্ষ ডলারও পাই, তবু আমাকে জীবনযাত্রার সেই মান বজায় রাখতে হবে; অন্যথা আমি স্বজাতিকে সাহায্য করতে পারব না। তাছাড়া আমরা সন্ন্যাসী, গৃহস্থদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হয়।

মার্গট [ভগিনী নিবেদিতা] কি করছে? তার সেখানে থাকাটা তোমার ভাল লাগছে কি? তোমার, মার্গট, মিসেস ফ্রাঙ্কে এবং অন্য সব বন্ধুদের সম্পর্কে সকল সংবাদ জানিও।

ডেট্রয়েটে এবছর বড়ই ঠাণ্ডা। আমি ঠাণ্ডা পছন্দ করি এবং তাতে ভাল থাকি—শুধু [আমেরিকার] উত্তরাঞ্চলের ঘর গরম করার পদ্ধতিটি রীতিমতো ভীতিজনক। এতে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। খবর দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। সুখী আমি নই, অবশ্য সুখী হওয়ার জন্য আমি জন্মাইনি—এখন আমি এর জন্য পরোয়াও করি না। কারণ, এর অপর দিকটাতে আমি এতই অভ্যস্ত। কাজ করার জন্য আমার জন্ম এবং মুখ থুবড়ে না পড়া পর্যন্ত আমি তা করে যাব। এখন আমি পরিতৃপ্ত, এটাই তো সব। এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে আবার কখনো দেখা হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আমি পরিতৃপ্ত এবং শরণাগত। 'মা-ই সবচেয়ে ভাল জানেন'—সবসময়ে আমার এই একই কথা। তোমার বোনেরা কেমন আছে? তোমাকে কিছু সাহায্য করছে কি? তুমি কিছু টাকা জমাচ্ছ তো? বস্টনে যাওয়ার ফলে তোমার কত লোকসান হলো? সবকিছু জানিয়ে চিঠি লিখো।

মিসেস বুলকে [মিসেস ওলি বুল] তোমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে—বেশ কথা। আমি জানতাম, তোমার ভাল লাগবে। তিনি একজন দেবদূতী। তাঁর অন্তরাত্মা মহিমান্বিত হোক। এপ্রিল মাসে তাঁরা সবাই প্যারিস যাবেন। আমি মে মাসের কোন একসময় সমুদ্রপাড়ি দেব এবং লণ্ডনে দুই মাস থাকার পর ভারতের পথে রওনা হব। তোমার ইংল্যাণ্ড-ভ্রমণ বেশ মজাদার হয়েছে! লণ্ডনের কয়েকটি রাস্তা দেখেই আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন! তবে তোমার গৃহকর্ত্রী সুন্দর চকোলেট তৈরি করেছিলেন। তিনি খুব সাবধানী, তাই না? মিসেস ফ্রাঙ্কে একজন রত্নবিশেষ। তাঁর জন্য সকল আশীর্বাদ রইল।

কোন বিশেষ পার্থিব বস্তু লাভ না করলেও আমি অনেক একনিষ্ঠ ও খাঁটি বন্ধুকে পেয়েছি। পাইনি কি? তার জন্য 'মা'কে ধন্যবাদ জানাই। সেটা একটা বিরাট—বিরাট প্রাপ্তি। ক্রিস্টিনা, আনন্দে থাক। এই দুনিয়াতে হতাশার কোন অবকাশ নেই, দুর্বলতার তো নয়ই। মানুষকে সবল হতেই হবে, নইলে চলে যেতে হবে। এই হলো সংসারের বিধান। আমি নিশ্চিত যে, তোমার এই নীরস, একঘেয়ে ও শ্রমসাধ্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় 'মা' নিশ্চয়ই করে দেবেন। আমি সর্বদাই এর জন্য প্রার্থনা করছি। অনেক সময় তিনি আমার প্রার্থনা শোনেন। প্রফুল্ল হও বৎস। অন্ধকার রাত্রি শেষ হলো বলে। একটি মঙ্গলকর্মও বৃথা নষ্ট হয় না, আর তুমি তো অনেক কল্যাণকর কাজ করেছ। এখন ঐসব আত্মপ্রকাশ করবে এবং ফলদান করবে।

সকল ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ

বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার ঠিকানার খাতাটা খুঁজে পাচ্ছি না এবং তোমার চিঠিখানিও ছিঁড়ে ফেলেছি। সংখ্যা ও রাস্তার নাম মনে রাখার ব্যাপারে আমার ভয়ানক স্মৃতিশক্তি! অগত্যা মিসেস ফ্রাঙ্কের প্রযত্নে এই চিঠি পাঠাচ্ছি।

---

১ মিসেস ব্লজেট শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনেছিলেন। এবং এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, স্বামীজীর একটি পূর্ণায়তন ছবি নিজের লস এঞ্জেলেসের বাড়িতে যত্ন করে রেখেছিলেন। স্বামীজী শিকাগোয় যে সাড়া জাগিয়েছিলেন, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দ

'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য, সেই বছরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। এর ৩০ বছর পর শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক আবির্ভাব। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের সংবাদ ভারতের যেসকল প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে তখন বিপুল উৎসাহে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অগ্রগণ্য। 'দি হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত নিম্নে উদ্ধৃত রচনাটি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ পুনঃপ্রকাশিত হয়।

অনুবাদক ঃ জয়দীপ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান মিরর, ৮ মে ১৮৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ

('দি হিন্দু' থেকে)

ধর্মমহাসভায় কৃতিত্বের জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে গত শনিবার পাচায়াপ্পার সভাগৃহে যেভাবে সমবেতভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো, সেব্যাপারে চিন্তাবান হিন্দুদের মধ্যে কোথাও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তাঁর কৃতিত্বের জন্য তাঁর জন্মস্থান কলকাতা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে চলেছে এবং ধর্মমহাসভায় যোগদানের পরিকল্পনার জন্মস্থান যে-মাদ্রাজ, সে এব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারে না। যদি আমরা ঠিকঠাক জেনে থাকি, তাহলে এখানেই স্বামীজী প্রথমবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন—আমেরিকার ধর্মসভায় তিনি যোগদান করবেন। এবং সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার পাথেয়ও সংগৃহীত হয়। মাদ্রাজ নিজেকে সাধুবাদ দিতেই পারে—তার ঔদার্যের জন্য না হলেও কমপক্ষে তার অন্তর্দৃষ্টির জন্য, যার দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। কলকাতা এখন বলছে যে, তিনি মহান। কিন্তু মাদ্রাজ তাঁকে অভিনন্দিত করতে পেরেছিল তার আগেই। কোন মানুষই তাঁর নিজের জায়গায় প্রচারক-রূপে গৃহীত হন না।

গত শনিবার আমাদের কয়েকজন অগ্রণী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে সবিশেষ হিন্দুপ্রথায় স্বামীজীর উদ্দেশে যে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ যোগ্য। কোন কোন বক্তার গভীর আবেগ ছিল স্বামীজীর প্রতি সমুচ্চ শ্রদ্ধাপ্রকাশে এবং সেই আবেগে সম্ভবত শ্রোতারাও নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজীর সু-উচ্চ অবস্থানের প্রেক্ষিতে বিচার করলে এই ধন্যবাদজ্ঞাপন একটি অর্থহীন প্রথামাত্র, আর তাই তা অপ্রয়োজনীয়ও। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মনোরম ভাষায় বলতে গেলে, আমরা—এই পৃথিবীর মানুষেরা নানান প্রথাতে আবদ্ধ থাকি; একজন মহাপুরুষই এসে সেইগুলিকে ভেঙে দিয়ে যান। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, স্বামীজী এমন কী করলেন যে, তাঁকে ঘিরে চারিদিকে এত উচ্ছ্বাস? উত্তরটা খুবই সহজ। যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে শিকাগো-প্রদর্শনী একটি যুগান্তকারী ঘটনা, তেমনি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসে স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রাও এক যুগান্তকারী ঘটনা। কয়েকমাস আগে যখন বোম্বাই থেকে স্বামীজী তাঁর জাহাজের কেবিনে প্রথম পা দিলেন, তখনি আঘাত করলেন অন্ধ কুসংস্কারকে, যে-কুসংস্কার সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল। যাঁরা জানেন না যে, হিন্দুধর্মে প্রথাগতভাবে সন্ন্যাসিগণকেই গুরুজন হিসাবে মান্য করা হয়, তাঁরা বুঝতেও পারবেন না স্বামীজীর এই সমুদ্রযাত্রা কী গভীর প্রভাব রেখে গেল! তাছাড়া ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে তিনি কী বললেন? শুধু ঘৃণা আর বিদ্বেষের ধর্মকেই সত্যের রক্ষক বলে মেনে নিতে হবে, যা শুধু মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে? না। ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা পাঠ করে দেখুন। সেখানে যে-ধর্মকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা ভালবাসা আর শান্তির ধর্ম—যে-ধর্মপথের অন্তে রয়েছে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাওয়া, এমনকি ঈশ্বর হয়ে ওঠা এবং যার লক্ষ্য মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। নিজের দেশের অন্ধ কুসংস্কারগুলোর অনেক ওপরে উঠে একজন সন্ন্যাসী সমুদ্র পেরিয়ে চলে যেতে পারেন শুধু ভাষণ দেওয়ার জন্য নয়, বরং নিজের জীবনযাত্রা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে সত্যিকারের হিন্দুধর্ম কী। এর সুগভীর তাৎপর্য আজ বুঝতে পারবে কেবল সত্যদ্রষ্টা মানুষেরা, আর বুঝবে ভবিষ্যতের অনাগত প্রজন্ম। যেভাবে স্বামীজী আমেরিকা-যাত্রা করলেন তা এক গৌরবোজ্জ্বল পথকে চিহ্নিত করে—যা তাঁর উত্তরসূরিদের পথপ্রদর্শন করবে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা যায়, স্বামীজী তাঁর দেশের জন্য রেখে গেলেন মহত্তম দান—যা শ্বেতকায় জাতিদের সঙ্গে ভারতবর্ষকে বেঁধে রাখবে স্বর্ণসূত্রে, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যকে একে অন্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করবে এবং অর্ধপথেই তারা বাঁধা পড়বে চিরকালীন ভালবাসায়। এই কারণেই তাঁর কাজকে গ্রহণ করা এবং স্বাগত জানানো একান্ত প্রয়োজন। ❑

অগ্রহায়ণ ১৩১০
নভেম্বর ১৯০৩

রামকৃষ্ণ মিশন

আমেরিকা

নিউইয়র্ক

বিগত ১৫ই অক্টোবর [১৯০৩] তারিখে বেলুড় মঠের স্বামী নির্ম্মলানন্দ রুবাটিনো নামক ইটালিয়ান ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া বোম্বাই হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ প্রায় ৭ বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অতিশয় বর্দ্ধিত হওয়াতে একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হইয়াছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দ যাইয়া তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করিবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ ও সাধনভজন করিয়া ইঁহার জীবন বিশেষভাবে গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ইংরাজী বিদ্যায়ও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ইনি বেলুড় মঠের ছাত্রবৃন্দকে অনেক দিন হইতে উপনিষদ্, গীতা, বেদান্ত প্রভৃতি সভাষ্য পড়াইয়া আসিতেছিলেন। হিন্দী ভাষায় দৃষ্টান্তসমুচ্চয় নামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কয়েকটী উপদেশ প্রচারিত হয়, ইনি তাহার সংকলনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং হিন্দীভাষিগণের মধ্যে কিছু কিছু প্রচারও করিয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইঁহার পবিত্র ও উন্নত জীবনের আলোকে এবং হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার সাহায্যে আমেরিকা-বাসিগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো

বিগত ১০ই জুন, ১৯০৩-এর লস্ এঞ্জেলস্ হেরাল্ড নামক আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশ—স্বামী ত্রিগুণাতীত গতকল্য ব্রেণ্ট্‌স্ হলে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অগণ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"প্রাচ্যভূমিতেই সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে। এসিয়াই সকল বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য ও অবতারগণের জন্মভূমি। অপর দিকে পাশ্চাত্য জগৎ ভৌতিক, বৈজ্ঞানিক ও মানসিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন; এখন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মিলনের সময় আসিয়াছে। আমাদের এক্ষণে আদানপ্রদানের সময় সমুপস্থিত। এই কারণেই পাশ্চাত্য জগৎ এক্ষণে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং সুদূরবর্ত্তী প্রাচ্য জাতিসমূহ ভৌতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। আমরা যীশু, বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সকলে বলে, ওসকল অনেক প্রাচীন যুগের কথা, তাঁদের ন্যায় জীবনকে নিয়মিত করা এখন অসম্ভব। আমি তোমাদিগকে এমন একজনের কথা বলিব, যিনি সেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ও আমি তাঁহার শিষ্যগণের অন্তর্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের একটী সামান্য পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার প্রবল পিপাসা, সর্ব্বত্যাগ ও তপস্যা বলে তিনি এমন কতকগুলি ক্ষমতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্য জগৎ এযুগে লাভ করা অসম্ভব বলিয়া অনুমান করে। তাঁহার নিকট যেকোন ব্যক্তি আসিত, তিনি তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবন ও উপদেশ দ্বারা জগৎকে দুইটী অতি উচ্চ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। প্রথম, বেদোক্ত ধর্ম্ম কার্য্যে—জীবনে—পরিণত করা যাইতে পারে; দ্বিতীয়, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ভিতর কতকগুলি মহান সত্য আছে। সকলগুলিই এক স্থানে যাইবার জন্য বিভিন্ন পথ মাত্র। এই পথের বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়াই আমাদের প্রত্যেকের নিকট আমাদের গম্যস্থান পৃথক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক সকলগুলিই সেই এক ঈশ্বরে লইয়া যাইতেছে।"

অন্তঃপুর-প্রচার

বিগত ৯ই কার্ত্তিক [১৩১০] সোমবার ১৭ নং বোসপাড়া লেনে রমণীগণের উপকার জন্য স্বামী সারদানন্দ একটী গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রায় ৫০/৬০ জন অন্তঃপুরচারিণী বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হন। মিসেস ওলিবুল (বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের বিধবা পত্নী—স্বামী বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত) হারমোনিয়ম বাজাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রতি মঙ্গলবার বেলুড় মঠের স্বামী বোধানন্দ গীতাব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক হইতে ঐ স্থানেই বয়স্কা স্ত্রীলোকগণের জন্য স্ত্রীবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার ইহা খোলা থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ক্রিষ্টিনা গ্রীনষ্টাইড্‌ল সেলাই ও অধ্যাপক জগদীশ বসুর ভগিনী লেখাপড়া শিখাইবেন। এতদ্ব্যতীত পরমহংসদেবের স্ত্রীলোক ভক্তগণ আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থিনীগণকে বিদ্যালয়ের গাড়ী করিয়া আনা ও রাখিয়া আসা হইবে।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যার পর

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কর্মরহস্য

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।

শ্লোকার্থ ঃ *অর্জুন বলিলেন—সূর্যের আবির্ভাবের বহু পরে আপনার জন্ম হইয়াছে। অথচ হে কৃষ্ণ, আপনি বলিলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে এই যোগ আপনি সূর্যকে বলিয়াছিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব?*

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন—হে পরন্তপ অর্জুন, পূর্বে আমার এবং তোমার উভয়েরই বহুবার জন্ম হইয়াছে। আমার সেইসকল জন্মবিষয়ে আমি সব জানি। কিন্তু তোমার পূর্ব পূর্ব জন্মের ব্যাপারে তোমার কিছুই স্মরণ নাই।*

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে 'চিত্ত' নামক একটি থলি আছে। সেই থলি দৃষ্টিগোচর না হইলেও উহাতে তাহার সকল কৃতকর্মের স্মৃতির তন্মাত্রা সঞ্চিত থাকে। উহাই তাহার 'সংস্কার'। প্রত্যেকের সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু শ্রীভগবান সকলের সমষ্টিভূত বলিয়া তিনি সংস্কারশূন্য। সেকারণে তিনি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই দেখিতে বা জানিতে পারেন। আবার যখন প্রয়োজন হয় তখন তিনি মানুষের ন্যায় শরীর নির্মাণ করিয়া মানুষের ন্যায় কর্ম করিয়া থাকেন। তাই অবতারপুরুষের মনুষ্যরূপ ধারণ সম্ভব হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন স্থূলশরীর গঠিত হয়, তখন অবতারের বাকি যাকিছু মনুষ্যোচিত হওয়া বিধেয়, সবই তিনি তৈরি করিয়া দেন—জগতে কাজ চালাইবার জন্য।

[**মন্তব্য ঃ** সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও রোগ প্রবেশ করিয়াছিল। অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি শোকে আকুল হইয়াছিলেন। সংস্কারশূন্য হইলে মনুষ্যদেহ ধারণ করাই অসম্ভব, তাই অল্পমাত্র সংস্কার লইয়া অবতারপুরুষগণ জগতে অবতীর্ণ হন বলিয়া স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ করিয়াছেন।]

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমি জন্মরহিত। আমি অলুপ্তজ্ঞানশক্তি-স্বভাব (জ্ঞান কখনো লুপ্ত হয় নাই যাঁহার)। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত যে সর্বব্যাপী মায়ার বশীভূত, সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা [যেন] দেহধারণ করিয়া থাকি।*

ব্যাখ্যা ঃ শ্রীভগবান নিজের স্বরূপের কথা বলিতেছেন—আমি জন্মরহিত। আমি 'unchangeable reality' (অপরিবর্তনশীল সত্যবস্তু)। আমার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। আমি অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্বজীবের সমষ্টি-স্বরূপ। প্রয়োজনে আমার প্রকৃতির (material cause) সাহায্যে একটি দেহ নির্মাণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিয়া থাকি।

[**মন্তব্য ঃ** প্রকৃতি বা 'material cause'-এর অর্থ হইল ঘটের মাটি। অর্থাৎ মাটির সাহায্যে ঘট নির্মিত হইয়াছে। অতএব মাটি হইল ঘটের প্রকৃতি। বস্তুত, অর্জুনের সন্দেহ নিরসনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। জন্মরহিত চিরন্তন অনন্ত সত্তা কিভাবে জন্মগ্রহণ করিবে? শ্রীশঙ্করাচার্য বলিলেন, ইহা লোকবৎ বাস্তব নহে। ইহা মায়িক ঘটনা। আমাদেরই সত্য বলিয়া প্রতীত হয় যে, ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।]

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে ভারত (হে অর্জুন)! মনুষ্যসমাজের অভ্যুদয় (উন্নতি—জাগতিক ও পারমার্থিক) এবং নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ)-এর কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম। যখন সেই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, স্বীয় মায়াশক্তি বলে আমি যুগে যুগে (যেন) দেহবান হই।*

ব্যাখ্যা ঃ ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের একটি সংগঠিত সমাজ বা 'organised society' ছিল। মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্বত্র চারিপ্রকার প্রবণতা বা চরিত্রের লোক দেখা যায়। প্রথম বুদ্ধিনির্ভর, ধীমান—যাহাদের 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়স্বভাবের মানুষ। তৃতীয়ত, বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ—যাহারা কৃষি (agriculture) এবং গো (animal husbandry) রক্ষায় পটু এবং বাণিজ্যমুখী (commerce) মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইহারা সমাজরক্ষার কার্যে অভিজ্ঞ। চতুর্থত, শারীরিকভাবে দৃঢ় এবং কায়িক শ্রমে পটু মানুষ। এই চার শ্রেণির মানুষ সমাজকে সর্বত্রই রক্ষা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এই চার শক্তি—ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি এবং শূদ্রশক্তি প্রবলভাবে অতীতে বিদ্যমান থাকিলেও ক্রমে ক্রমে তাহারা লোপ পাইলে সমাজ বিকৃত রূপ ধারণ করিল।

ভারতে মুসলমান আক্রমণের পরে ক্রমে ক্ষাত্রশক্তি লোপ পাইল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ব্রাহ্মণগণও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ইহার পর, ইংরেজ শাসনের সময়ে বৈশ্যগণের সমূহ শক্তি ইংরেজগণ হরণ করিয়া লইল। পরে প্রাচীন ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে এক দারুণ 'secular education' (ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা) দান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলের সংস্কৃতি নাশ করিল। ফলস্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সব কয়টি পুরুষার্থই মানুষের পক্ষে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল।

আবার পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। বিজ্ঞানের সাহায্যে পরদেশলুণ্ঠন এবং দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখিবার বহুবিধ কৌশল বাহির হইল। প্রাচীনকালে মানবজাতির মধ্যে দেশে দেশে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে কলহ মানবজাতির উন্নতি ব্যাহত করিত, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের বুদ্ধি এবং শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের মনুষ্যত্বের কোন বিকাশ তো হইলই না, বরং উহা পাশবিক কার্যে নিয়োগ করিয়া মানবজাতির উন্নতি আরো ব্যাহত করিল। ভারতের ও জগতের এরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন।

ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক এবং ধর্মনৈতিক অধঃপাতের ফলে পারিবারিক জীবনে কর্তব্যজ্ঞান নষ্ট হইল। পিতা জীবিকা নির্বাহের জন্য ওকালতি করে, তাঁহার পুত্রকে শিক্ষানৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটা কথা বলিবারও অবসর নাই! গ্রামের এক চাষার ছেলে পাঠশালা খুলিল, M.A., B.L.-পাস চাটুজ্যের ছেলে সেই পাঠশালায় ভর্তি হইল। তাহার পর সে ধর্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট হইতে বাহ্যবিষয়ে আবছা আবছা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া অধ্যাপক হইল! উপনয়নের অর্থ ছিল—গুরুসমীপে আনয়ন। কিন্তু তাহার নাম হইল—'পৈতা দেওয়া'! সংস্কৃতশিক্ষার প্রচলন থাকিলেও তাহা এত 'superficial' যে, সংস্কৃতে M.A., B.A. পাশ করা পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের কোন সংবাদই রাখেন না! এইরূপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হইল।

বিদেশী অত্যাচারী অসভ্য রাজা নামক লুণ্ঠনকারীদের কর্তৃত্বাধীনে চাকরি করিয়া এবং দেশের সংস্কৃতি-নাশক আইন অনুসারে দেশশাসন করিয়া ক্ষাত্রশক্তি নষ্ট হইল।

দেশের সর্ববিধ পণ্য বিলাত হইতে আনিয়া দেশবাসী বিদেশীর দাসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাঁতিরা বাধ্য হইয়া আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছে! সূচ, সুতাও বিদেশী। দেশের 'natural drainage' বন্ধ হইল, যেদিকে-সেদিকে 'Railroad', 'District Board'-এর রাস্তা হওয়ায় দেশে জলপ্লাবন দেখা দিল, কৃষির উপযোগী জলসরবরাহের অভাবে কৃষ্টি নষ্ট হইল, বহুপ্রকার সংক্রামক ব্যাধির বৃদ্ধি হইল। রাজসাহায্যের অভাবে 'Grazing Land' না থাকায় গোজাতির অবনতি হইল। এইরূপে বৈশ্যজাতির নাশ হইল।

চা-বাগানে, নীলচাষে, কলে শূদ্রদিগকে 'agreement' করাইয়া কুলিতে পরিণত করা হইল। ফলে সকল উন্নতির আশা হারাইয়া শূদ্রজাতি পশুবৎ হইয়া পড়িল।

বিগত ১,০০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতির উপর কত যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের সব নষ্ট হইলেও ধর্মের তেজ নষ্ট হয় নাই। সেই দুর্দিনেও গৌরাঙ্গদেব, নানক, তুলসীদাস, দক্ষিণদেশে মধ্বাচার্য প্রমুখ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের প্রাণশক্তি ধর্মকে কোনরকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আসিয়া কৌশলে ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রবল উদ্যম করিতে থাকে। ঠিক সেইসময়ই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন [ক্রমশ] ।।তেরো।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

অবতারবরিষ্ঠ

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন। অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেন, ঠাকুরকে অবতারবরিষ্ঠ বলা হয় কেন? রাম, কৃষ্ণ—এঁরা কি তবে inferior? কখনো হেসে বলি—না, তিনি আমাদের ঠাকুর কিনা, কাজেই তিনি বরিষ্ঠ! আরেকভাবে বলি যে, বরিষ্ঠ বলা হয়, কারণ তখনকার দিনে, প্রাচীনকালে মানুষের জীবন সহজ-সরল ছিল। তার সমস্যাগুলিও তত জটিল ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, তত মানুষের জীবনে জটিলতা বাড়ছে। আর সমস্যাগুলিও জটিল হচ্ছে, ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। এত দুঃসাধ্য ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে যে অপূর্ব শক্তির প্রকাশ হয়েছে, তা প্রাচীনকালে দরকার ছিল না, এখন দরকার। এইজন্য অবতার যখন আসেন তখন প্রয়োজন অনুসারে তাঁর ভিতর থেকে—অনন্ত শক্তির ভিতর থেকে যতটুকু প্রয়োজন, তিনি ততটুকু প্রয়োগ করেন। অনন্ত শক্তির প্রকাশ করে তো লাভ নেই কিছু। কেউ ধরতে পারবে না। এইজন্য যখন যেমন শক্তির প্রয়োজন, তখন অবতারের সেরকম শক্তির প্রকাশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে বর্তমান যুগের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যে-শক্তির প্রকাশ হয়েছে, তা অসাধারণ। এই অসাধারণ শক্তির প্রকাশের জন্য তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলা হয়। এই একটা দিক।

আরেকটা দিক, প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এক খণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য খণ্ডের অধিবাসীদের যোগ ছিল না। তার ফলে কোন জায়গায় কোন সমস্যা উঠলে সেই খণ্ডের অধিবাসীরাই শুধু তাতে involved হতো। আর বর্তমান কালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। তার ফলে জগতের যেকোন প্রান্তে একটা সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমস্ত জগতের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমান যুগে ঠাকুর এসে যেসকল সমস্যার সমাধান করেছেন, তাতে সমস্ত জগতের লোক লাভবান হচ্ছে। প্রাচীনকালে অবতারদের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। ঠাকুরের ক্ষেত্র অসীম। এই বিশালতা, ব্যাপকতাকে লক্ষ্য করে তাঁকে 'অবতারশ্রেষ্ঠ' বলা হয়। তা না হলে অবতারের ভিতরে কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ নিকৃষ্ট হলে তাঁদের 'অবতার' বলা যায় না। অবতার ভগবানের—যিনি অনন্ত, যাঁর খণ্ড হয় না, যাঁকে সীমিত করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক অবতারের ভিতরেই অনন্ত শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার বিকাশ হয় যুগের প্রয়োজন অনুসারে।

আর এই যে-শক্তির প্রকাশ, এ তো জড়শক্তি নয়, আধ্যাত্মিক শক্তি। প্রাচীনকালে অবতারেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এবারে 'প্রণাম' অস্ত্র। গিরিশবাবু বলতেন। এবারে আর কোন অস্ত্র নেই। ইতোপূর্বে কোন অবতার কি বলেছেন—আমি কিছু নই, আমি কিছু নই? কোন অবতার বলেননি। কিন্তু ঠাকুর বারবার একথা বলেছেন। এই যে self-effacement (নিজেকে মুছে ফেলা)—এটি ঠাকুরের ভিতর যেমন দেখা যায়, আর কোন অবতারের ভিতর তেমন দেখা যায় না। অথবা পূর্ব পূর্ব অবতারদের জীবনচরিত যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সেই ভাবটি পছন্দ করতেন না। অনন্ত শক্তি ও অলৌকিকত্বের ওপরেই যেন তাঁরা বেশি বিশ্বাস করতেন। আমরা ঠাকুরের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে বুঝেও যেমন সাধারণ মানুষের মতো তাঁকে গ্রহণ করতে পারছি, পূর্বের অবতারদের এরকমভাবে গ্রহণ করা যেত না।

ব্যাপকতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার পরিধি বিশালতম। তবে আগেকার অবতারপুরুষদের শিক্ষাও এখন জগৎকে ব্যাপ্ত করছে। কিন্তু অনেকদিন পরে। এখন বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ার ফলে সেটা জগতে এসেছে। এখন আমরা বুদ্ধদেবকে 'অবতার' বলি। বুদ্ধ-পরবর্তী কালে কজন জানত তাঁকে? তাঁর প্রভাব কতটুকু ছিল? সব অবতারই সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য আসেন ঠিকই, কিন্তু জগতের কল্যাণের প্রয়োজন হয় এক একসময় এক একরকম। সবসময় একরকম প্রয়োজন হয় না। জগৎও আমাদের দৃষ্টিতে এক একসময় এক একরকমভাবে প্রকাশিত হয়।

এখন আমরা বলছি, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যই অবতারের আবির্ভাব, কিন্তু আগে তো এই ধারণা ছিল না। যিশুখ্রিস্ট যখন জন্মেছেন, সকলের বিশ্বাস ছিল—তিনি এসেছেন ইহুদিদের জন্য। তিনি নিজেও তাই মনে করতেন। একটি সামারিটান মেয়েকে তিনি বলছেন ঃ "তুমি আমার কাছ থেকে চাইছ কেন? আমি তো তোমাদের জন্য নয়, আমি তো ইহুদিদের জন্য জন্মেছি।" মেয়েটিও খুব বুদ্ধিমতী। সে বললে ঃ "আজ্ঞে, সেকথা ঠিক। আপনি যখন টেবিলে বসে খাবেন, টেবিল থেকে crumbs (ক্ষুদ্র টুকরো) যাকিছু পড়বে, তা আমি কি একটু পেতে পারি না?" যাহোক, যিশুর সময় তাঁর 'জগৎ' ছিল ছোট্ট। যেখানে জন্মেছেন এবং যেখানে যেখানে গিয়েছেন, সেটাই তাঁর জগৎ। চৈতন্যদেবও অবতার ছিলেন। তাঁর শিক্ষার পরিধিও খুব ছোট। সব জায়গাতেই যত অবতার এসেছেন সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। এখন আমরা

শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেবকে যেভাবে জানছি বা বুঝছি, আগে কি তাঁদের সেভাবে বোঝা হতো? জগতে চিন্তা ও বুদ্ধির যত প্রসার হচ্ছে, তাঁদের ভাবও তত প্রসারিত হচ্ছে।

তবে ঠাকুরের লীলা অসাধারণ। আমরা একথাও বলতে পারি যে, ঠাকুরের নামই কি আগে সকলে জানত বা এখনো কি সকলে জানে? নামের কথা নয়, ভাবের কথা। একটা ঘটনা শুনেছি। দক্ষিণ ভারতের একটি অখ্যাত জায়গা। আমাদের একজন সাধু বেড়াতে গেছেন। সেখানে একটি পানের দোকানে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেখে অবাক হয়ে গেছেন। দোকানিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি এই ছবি কোত্থেকে পেলে?" দোকানি বলল ঃ "জানি না কোত্থেকে পেয়েছি, কিন্তু এ-ছবিটি আমার কল্যাণকর।" আশ্চর্য ব্যাপার!

আরেকজনের কথা। আমাদের প্রাচীন এক সাধু কেদার-বদরী বেড়াতে গেছেন। রাস্তায় একজায়গায় স্নান করছেন। তাঁর গলায় শ্রীশ্রীমায়ের একটা লকেট ছিল। স্নান করার সময় সেটা দেখেছেন অন্য একজন। তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "Who is that lady?" সাধু বললেন ঃ "She is wife of Ramakrishna Paramahamsa." লোকটি শুনে রেগে গিয়ে বলছেন ঃ "Do you not call her Holy Mother?"

বিদেশে আবার অনেকে মনে করেন—ঠাকুর নয়, স্বামীজীই অবতার। আমাদের সঙ্গে একজন অস্ট্রেলিয়ান ব্রহ্মচারী ছিল। নাম 'ওয়েল'। তার কাছে শুনেছি। সে বলত ঃ "স্বামীজী আমাকে পথের ধুলো থেকে তুলে এনেছেন।" সে এক অলৌকিক ব্যাপার! সেদিন ছিল তার জন্মদিন। বাজারে মদ কিনতে গেছে। জন্মদিন 'সেলিব্রেট' করবে। তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছে। ওদের জন্মদিনে মদ্যপান একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ওয়েল মদ কিনে আনছে, এমন সময় পথে একটা 'Vision' হলো—একটা ছবি দেখল। তার মনে হলো—'কে এ? কাকে দেখলাম? নাম তো জানি না। মনে হচ্ছে, কোন সেন্ট হবেন। আর তিনি আমাকে দর্শনই বা দিলেন কেন? নিশ্চয়ই আমার জীবনে কোন পরিবর্তন আনার জন্য।' এই ভেবে সে রাস্তাতেই মদের বোতলগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুহাতে বাড়ি ফিরল। তার বোন বলল ঃ "মদ কোথায়?" সে বলল ঃ "আজ থেকে মদ আমি আর ছোঁব না।" এরপর 'ভিশন'-এ সে যাকে দেখেছে তার খোঁজ করছে, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। দুশো মাইল দূরে সিডনি। চলে গেল সেখানে। যদি কোন খোঁজ পাওয়া যায়। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা বইয়ের দোকানে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল একটা বইয়ের মলাটে স্বামীজীর ধ্যানস্থ ছবি। বইটি 'রাজযোগ'। স্বামীজীর ছবি দেখে ওয়েল বলল ঃ "এই তো সেই, ইনিই তো আমাকে দর্শন দিয়েছেন।" তারপর সেই বই কিনে নিয়ে এল, পড়ল। তাতে অদ্বৈতাশ্রমের ঠিকানা ছিল। সেখানে চিঠি দিল। তখন স্বামী অশোকানন্দ editor ছিলেন। তিনি ওয়েলের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আর মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে বলেছিলেন, সে যেন তার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সব তাঁকে করে। তারপর থেকে সে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করত। একদিন সে সাধু হতে চাইল। মহাপুরুষ মহারাজ লিখলেন ঃ "বাপু, তোমাদের দেশের লোকের এখানে এসে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। কাজেই এসো না।" কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। মহাপুরুষ মহারাজ আবার লিখলেন ঃ "আচ্ছা, তাহলে এস। কিন্তু ফিরে যাওয়ার টাকা এখানে এনে জমা রাখবে। তা না হলে আমরা কোথায় টাকা পাব? টাকা দিয়ে তোমাকে ফেরৎ পাঠাব কি করে, যদি তোমার স্বাস্থ্য এখানে না টেকে?" ঠিক তাই হলো। আসার কয়েক বছর পর তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তখন তাকে ফিরে যেতে বলা হলো। অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গিয়ে সমস্ত জীবন স্বামীজীর ভক্ত হয়েই রইল। একবার তাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়েছিলাম দেখা করতে। কথায় কথায় মাস্টারমশায় বললেন ঃ "ঠাকুর হলেন অবতার।" ওয়েল ঠাকুরের ভক্ত নয়। সে বলল ঃ "স্বামীজীই অবতার।" মাস্টারমশায় আবার বললেন ঃ "স্বামীজী অবতার নন। ঠাকুরই অবতার।" সে কিছুতেই মানবে না।

অন্যত্র স্বামীজী ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন—'ভগবানের বাবা'। 'ভগবান' কিনা অবতার, আর 'বাবা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ 'ভগবানের বাবা' মানেও 'অবতারবরিষ্ঠ'।

অবতারের বিশেষত্ব এই যে, তাঁর ভিতর একটি মানব-ভাব এবং আরেকটি দেব-ভাব—একই সঙ্গে থাকে। ঠাকুর বলেছেন ঃ "এর ভিতর দুটি আছে—একটি ভক্ত, অপরটি ভগবান।" দুটি ভাবই পাশাপাশি আছে। সাধারণত আমরা সেটা বুঝতে পারি না। একটির সঙ্গে আরেকটিকে মিশিয়ে দিলে হবে না। কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির সহাবস্থান আছে। ইচ্ছা করলেই দুটি ভাবের যেকোনটিতেই তিনি থাকতে পারেন। দুটি ভাব বিপরীত। একটি পূর্ণ এবং আরেকটি অপূর্ণ। কিন্তু দুটিই একসঙ্গে একই ব্যক্তিতে অবস্থান করতে পারে। তাই তিনি অবতার। অবতারের ভিতরে যদি মানব-ভাব না থাকত, তাহলে তাঁর অবতারত্ব কিছু হতো না। মানুষের ভিতরে মানুষের মতো হয়ে তাঁকে ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে তিনি কি করে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবেন? শুধু মানব-ভাবে থাকা নয়, মানব-ভাব থেকে দেব-ভাবে তিনি ইচ্ছা করলেই যেতে পারেন এবং অপরকেও নিয়ে যেতে পারেন।* ❑

---

* ক্যাসেটে ধরে রাখা পরম পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত। সঙ্কলক ঃ স্বামী ঋতানন্দ।

এই আলোচনাটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার একাদশ পর্যায়ে ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়।

—সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহিশিষ্য ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত মধ্য কলকাতার 'ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়'-এ এক রথযাত্রা উৎসবের দিন শ্রীশ্রীমা শুভাগমন করেছিলেন। একদা দেবেন্দ্রনাথ কলকাতার নিমু গোস্বামী লেনে তাঁর ভাড়াবাড়িতে ঠাকুরকেও এনে তাঁকে আতিথ্যে পরিতুষ্ট করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রয়াণ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। প্রখ্যাত 'দেবগীতি' গ্রন্থটি তাঁরই রচনা।

ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয় ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

'অর্চনালয়'-এর শতবর্ষে প্রকাশিত এক স্মরণিকায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ জানিয়েছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-গৃহিশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সাহিত্যিক ও গীতিকার। ইণ্টালীর জমিদার মহেন্দ্রবাবুর জমিদারিতে চাকরিরতকালে দেব লেনের ভক্ত হেমচন্দ্র বসুর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়। সেই দিনটি ছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে। সেইসময় থেকে যতদিন পেরেছেন, স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ পাঠ করতেন শ্রীশ্রীগীতা। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের শুভাগমন হয়েছিল। মাত্র দুবছর পরে বর্তমান স্থানে অর্চনালয় স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদেরও শুভাগমন হয়েছিল। স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেন অর্চনালয়ে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যেরা —স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাস্টার মহাশয়, ভাই ভূপতি, হরমোহন মিত্র, মহিমবাবু, গৌরীমা, লক্ষ্মীদি প্রমুখেরা অর্চনালয়ের উৎসবে যোগদান করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের দুই পাশ্চাত্য-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিন অর্চনালয়ের কোন এক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।"[১]
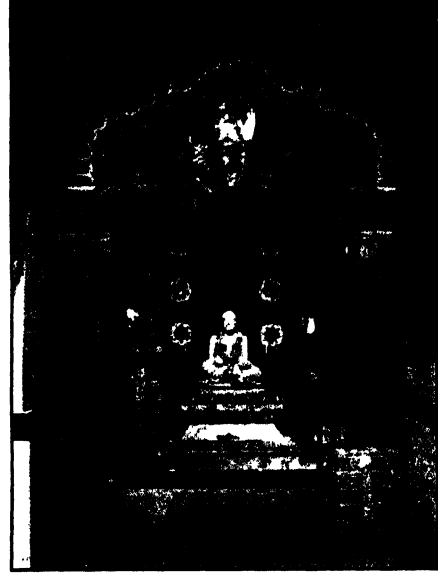
ইণ্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি ● *আলোকচিত্র : ডি. ডি. সাহা*

অর্চনালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায়—"১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার] ইণ্টালীর মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের এস্টেটে দেওয়ান নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় বাহান্ন বৎসর। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সাধ্বী সহধর্মিণী বসন্তরোগে দেহত্যাগ করেন। দেবেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১৩০৭ সালে, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইণ্টালীতে তৎকর্তৃক রামকৃষ্ণ অর্চনালয় স্থাপিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী উহার নাম 'রামকৃষ্ণ মিশন' রাখিয়া যান। এই নাম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। রামকৃষ্ণ মিশন রেজিস্টার্ড হইবার পর উক্ত নাম পরিত্যক্ত এবং বর্তমান নাম পরিগৃহীত হয়।"[২]

অর্চনালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন সম্পর্কে জানা যায়—"১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে অর্চনালয়ে প্রথম

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব হয়। তদবধি প্রতি বৎসরই উহা হইয়া আসিতেছে। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে অর্চনালয়ে বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাটীটি ভাড়া করা হইলে দেবেন্দ্রবাবু উহাতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই দোলের সময় হইতে সেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্র [ভক্ত হেমচন্দ্র বসু] ঠাকুরকে রথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা করিলেন। তদনুসারে সুসজ্জিত বালকদিগকে দেবেন্দ্র-বিরচিত একটি গান শিখাইয়া দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীমা উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়া রথপুরোবর্তী নৃত্যপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন—

'এল তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে!
বেড়াই বলে যেথা সেথা, মা বুঝি তাই কসনে কথা,
শুনি নাই এমন কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র মলে।'

"শ্রীশ্রীমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বালকমুখে দেবেন্দ্র স্বীয় আর্তি তাঁহারই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি পূর্বে তাঁহার সম্মুখে ঘোমটা খুলিয়া কথা বলিতেন না; আজ কিন্তু উহার ব্যতিক্রম হইল—তিনি দেবেন্দ্রকে সম্মুখে ডাকাইয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।"[৩]

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ পাওয়া যায়—"এই গান শুনিয়া শ্রীমা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বালকগণকে কোলে টানিয়া লইয়া আশীর্বাদ করেন এবং তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য দেবেন্দ্রের হাতে দুইটি টাকা দিয়া যান।"[৪]

এর পরবর্তী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বামী ঈশানানন্দ জানিয়েছেন: "ঐসময়ে একদিন ইটালীতে [ইন্টালী] উৎসব দেখিতে যাইবার পথে রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদার কন্যা দক্ষিণেশ্বর হইতে মায়ের নিকট আসিয়াছেন।... লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদা প্রভৃতি চলিয়া গেলে মা আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'দেখ, তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ওকে কাপড় ও টাকা দিতে ভুলে গেছি। তুমি কৃষ্ণলালের সঙ্গে ইটালীতে গিয়ে উৎসব দেখে এস, আর লক্ষ্মীকে টাকা ও কাপড় দিয়ে এস। ইটালীতে ওরা ঠাকুরকে বেশ সাজায়।' এই বলিয়া দুটি টাকা ও একখানি কাপড় বাহির করিয়া দিলেন।"[৫]

বর্তমানে একটি ট্রাস্ট কমিটির দ্বারা অর্চনালয় পরিচালিত হয় এবং এখানে বিভিন্ন উৎসব ও নিত্য ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মন্দির খোলা থাকে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে বেলা ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ অর্চনালয়ের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মঠের সাধুগণ এখানে বিভিন্ন উৎসবে যোগদান করেন। ❑

পথনির্দেশ: শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য 'ইন্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়'-এর ঠিকানা: ৩৯ দেব লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৪। মধ্য কলকাতার মৌলালী থেকে পূর্বদিকে সি. আই. টি. রোড ধরে ফিলিপসের মোড়ের ডানদিক বরাবর এগিয়ে গেলে সি. আই. টি. রোডের ওপরেই ডানদিকে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইন্টালী শাখার পিছনের রাস্তাটি দেব লেন। এই রাস্তায় ঢুকে ডানদিকে গলির মধ্যে 'অর্চনালয়'।

তথ্যসূত্র

১ ইন্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয় কর্তৃক ২১।৩।২০০২ প্রকাশিত 'শতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মরণিকা (১৯০০-২০০০)'
২ নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৩৬
৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৫০
৪ নবযুগের মহাপুরুষ, পৃঃ ৪৩৮
৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড সং, পৃঃ ২৮৭-২৮৮

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

আবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাস্থলগুলির বিবরণ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—'মাতৃতীর্থপরিক্রমা' শিরোনামে। পশ্চিমবঙ্গের যদি কোন ভক্তগৃহে শ্রীশ্রীমা অবস্থান করে থাকেন বা কিছুক্ষণের জন্যও পদার্পণ করে থাকেন (যা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত), তবে সংশ্লিষ্ট ভক্তগণ সেসব স্থানের প্রামাণিক তথ্যাদিসহ নির্মলকুমার রায়ের সঙ্গে দূরভাষের (২৫৫৮-১৫৭১) মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

এলাহাবাদে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের সঙ্গে

স্বামী ধীরেশানন্দ

১৬ মে ১৯২৮

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ দেখ, বাবুগিরি করো না। খুব সাদাসিধেভাবে যেটা না হলে নয়, এরকমভাবে চলবে। জুতা, জামা, কাপড় সবই পরবে—কিন্তু খুব সাদাসিধে। যতটা পারলে তাঁর কাজ করলে, বাকি সাধনভজন করলে। চাই কি যদি পার কোন লোকের খানিকটা উপকারই করে দিলে।

আজ আমার স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে এই প্রথম দর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন পার্ষদের দর্শন—খুব সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নেই। কত যত্ন করে খাওয়ালেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঐ, রাত্রি

বিজ্ঞান মহারাজ (অন্যান্য কথার পর) ঃ আচ্ছা তোমার কথা কিছু বল। মিশনে এসে তোমার কি experience [অভিজ্ঞতা] হলো; কিছু আনন্দ পাচ্ছ?

আমি ঃ আজ্ঞে, সর্বদা রিপুর উত্তেজনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যে একটা শান্তি পাওয়া—এইটার অভাব বোধ করি।

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ ওটা বড় শক্ত। ধীরে ধীরে হয়। অনেক চেষ্টার পরে অনেক কাঠখড় লাগালে [পোড়ালে] তারপর হয়। কত জন্মের সংস্কার রয়েছে। চেষ্টা করে করে সেগুলি ক্রমশ কমে যায়। একেবারে যায় না, তবে সেগুলির আধিপত্য কমে যায়। শরীরের উত্তেজনা একটু হবেই। তবে দেখতে হবে Thought purification [চিন্তার শুদ্ধতা]। Thought [চিন্তা]-টা যেন সর্বদা pure [পবিত্র] থাকে। সর্বদা সৎ চিন্তা। Thought purification না হলে কিছু হবে না। শরীরের ধর্ম তো থাকবেই। ধ্যান, জপাদি করা। আচ্ছা, তুমি এসব কথা শিবানন্দ স্বামীকে কেন জিজ্ঞাসা কর না?

আমি ঃ আজ্ঞে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন ঃ "ঠাকুরকে ডাক, খুব ধ্যানজপ কর, তাহলেই হয়ে যাবে।"

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ তাতেও যদি বেড়ে যায়?

আমি ঃ তাহলে আরো বেশি জপধ্যান করব।

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ হ্যাঁ, প্রথমটা মনে হয় বেড়ে যায়। কিন্তু পরে কমে যায়। Idleness [অলসতা]-এর প্রশ্রয় দিতে নেই। কত সব সাধু আমাদের দেখ না! দিনরাত কেবল আড্ডা, গল্প। সব educated [শিক্ষিত] লোক, তবু কাজে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না।

১৭ মে ১৯২৮, সকাল সাড়ে ১০টা

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ আচ্ছা তোমার পূজাতে বিশ্বাস আছে? ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা খুব পূজা করে।

আমি ঃ কিরকম?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ জীবন্তের পূজা করছে। তাই ওরা জীবন পাচ্ছে। আর আমাদের দেখ না—মৃতের পূজা করছে, তাই মৃত হয়ে যাচ্ছে। মৃতের পূজা করলে মৃত হয়ে যায়। ঐ ঘটা করে একটু একটু করে জল ঢালছে। কি হচ্ছে? না—পিতৃপুরুষদের দিচ্ছে। কী ভ্রান্ত! সে-জল হয় নদীতে, না হয় কুয়োয় পড়ে গেল; সে-জল তারা পাবে কি করে? কুসংস্কার। জীবন্তের পূজা করতে হবে। Indian [ভারতীয়]-দের কথার, কাজের, সময়ের কিছু ঠিক নেই। Time, Space [স্থান, কাল]-এর কোন কিছু ঠিক নেই। সব মুক্তপুরুষ কিনা তাই Time, Space, Causation [স্থান, কাল, পাত্র]-এর বাইরে গেছে! একটু punctuality [সময়নিষ্ঠা] নেই। ঠাকুর এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার একজন লোক এসেছে; ফিরে যাওয়ার সময় ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিহে আবার কবে আসছ?" (ঠাকুর সাধারণত এরকম জিজ্ঞাসা করতেন না) সে বলল ঃ "আজ্ঞে, অমুক দিন আসব।" ঠাকুর সেদিন সেইসময় তাকে expect [আশা] করছেন। একেবারে ছটফট করছেন। কিন্তু লোকটির দেখা নেই। তার কয়েকদিন পর লোকটি এলে ঠাকুর বললেন ঃ "কিহে, সেদিন আসবে বলেছিলে, এলে না যে? বৌ কোঁচার খুঁট ধরে টেনেছিল বুঝি?" লোকটি তো একেবারে অবাক! সে বললে ঃ "মশাই, আমাদের এই ঘরের খবর আপনি জানলেন কি করে?" আমাদের মধ্যে বিবেকানন্দ স্বামীর কথা সাহেবদের মতো ঠিক ছিল। শরৎ মহারাজ পারতপক্ষে কথার বেঠিক করতেন না। আমি আগে কথার খুব ঠিক রাখতুম। এখন আর পারি না, কাজেই বলি—"চেষ্টা করব", "ঠিক নেই, যেতেও পারি" ইত্যাদি।

১৭ মে ১৯২৮, রাত ১০টা

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ জোয়ান বয়সে কিছু করে না নিলে বুড়ো বয়সে কিছু হওয়ার উপায় নেই। এই ধর ২৫ থেকে ৫০। এই ২৫ বছর যদি বেশ সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে নিয়মিতভাবে ভগবানের নাম করে যায়, তবেই বাঁচোয়া। বন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে হলে চেষ্টার দরকার। This world will always cheat you. This body is greatly antagonistic to the path of realising Truth. It will always cheat you. [এই জগৎ তোমাকে সবসময় প্রতারণা করবে। সত্য উপলব্ধির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এই শরীর। এ তোমাকে প্রতারণা করবে।] Passion [কামনা-বাসনা]-গুলোর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে সময়মতো প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। বুড়ো বয়সে কষ্ট হবে। ভাববে, তাই তো করলুম কি? বুঝলে? মাঝে মাঝে ভারি কষ্ট হয়। অনেক বিষয়ে চিন্তা করছি; কিন্তু ঠাকুরের চিন্তার দিকে মন যাক দিকিন—তা যাবে না! মঠে এসব সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলে না?

আমি ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষজী বলেন যে, দুটোই adjust [মিলিয়ে] করে নিয়ে করে যাও। ধ্যানজপ বাদ দিলে কিছুই হবে না।

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ কিন্তু কাজের চিন্তা থাকলে যে ধ্যানের সময়ও ঐসব চিন্তা হয়! আমিও দেখছি বড় শক্ত। কিছু বুঝলে? কাজ—কিছু কিছু করা ভাল। ২।৪ ঘণ্টা কাজ করলুম, বাকি সময়টা নিজের সাধনভজন নিয়ে রইলুম। এ তো বেশ। এতে বেশ society [সমাজ]-এর একটা উপকারও করলুম অথচ নিজের কাজও করছি। এই বেশ। তুমি একটু একটু Medicine [ঔষধ] দেওয়া শিখে নেবে। বুঝলে? Then you will be a useful member of the society. [তাহলে তুমি সমাজের একজন হিতকারী বন্ধু হবে।] ২।৪ খানা ছোট বই পড়ে ওখানে একটু-আধটু ঔষধ দিয়ে শিখে নেবে। মঠে যে আসে তাকেই আমি একথা বলি। বুড়ো বয়সে আমিও শিখতে গিয়েছিলুম; কিন্তু এখন আর মনে থাকে না। বুঝলে? তোমাদের অল্প বয়সে intelligence [বুদ্ধি] আছে। শিখে নেবে। বুঝলে?

আমি ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, শিখে নেব।* ❑

---

* বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, অধুনা প্রয়াত স্বামী ধীরেশানন্দজীর ডায়েরি থেকে স্বামী চেতনানন্দের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ পৌষ ১৪১০

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ

স্বামী শিবানন্দ
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী
৩ পৌষ, শুক্রবার
(১৯ ডিসেম্বর ২০০৩)

যিশুখ্রিস্ট
৮ পৌষ, বুধবার
(২৪ ডিসেম্বর ২০০৩)

স্বামী সারদানন্দ
পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী
১২ পৌষ, রবিবার
(২৮ ডিসেম্বর ২০০৩)

স্বামী তুরীয়ানন্দ
পৌষ শুক্লা চতুর্দশী
২১ পৌষ, মঙ্গলবার
(৬ জানুয়ারি ২০০৪)

স্বামী বিবেকানন্দ
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী
২৯ পৌষ, বুধবার
(১৪ জানুয়ারি ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ৪, ১৮ পৌষ
শনিবার, শনিবার
(২০ ডিসেম্বর ২০০৩,
৩ জানুয়ারি ২০০৪)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২৭

পাশাপাশি ঃ (১) সর্বজয়া, (৩) মলমাস, (৬) স্মৃতি, (৭) অপারে, (৯) পাশ, (১২) রূপং, (১৩) কৌমারী, (১৭) লজ্জে, (১৮) গণ্ডকী, (১৯) তদা, (২২) ত্রিনয়নী, (২৩) মহাহব।

ওপর-নিচ ঃ (১) সংস্মৃতা, (২) জপ্য, (৪) লক্ষ্মী, (৫) সপ্তশতী, (৮) পাতু, (১০) অপর্ণা, (১১) হেমাঙ্গ, (১৪) কালরাত্রি, (১৫) চণ্ড, (১৬) সদাশিব, (২০) জয়, (২১) স্বাহা।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

শব্দচেতনা ২৭-এর কোন সঠিক উত্তরদাতা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা ঃ রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক-পৌষ ১৪০৯ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২) সংখ্যায় এই আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। গত আষাঢ় ১৪১০ সংখ্যায় শুরু হয়েছে এই আলোচনার শেষাংশ।

■ শেষকথা কে বলবে?

এডওয়ার্ড জন টমসন ১৪ নভেম্বর ১৯১৩ দুপুরবেলা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের যে-সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন [তার কয়েক ঘণ্টা পরেই কবির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদবাহী টেলিগ্রাম সেখানে এসে উপস্থিত হয়।], সেখানে কবির নিবেদিতার প্রতি মনোভাব আব্রুহীন-ভাবে প্রকাশিত।[৮৮] তিনি বলছেন ঃ "I did not like her [Nivedita].... She was so violent.... She had a great hatred for me and my work, especially here [সাক্ষাৎকারটি শান্তিনিকেতনে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্যধারা সম্পর্কে নিবেদিতার মতামত বিষয়েই এখানে বলা হচ্ছে।], and did all she could against me. She was so confident that I was unpatriotic and trucking to modern thought."

বাংলায় উগ্র রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে নিবেদিতা কি বহু মানুষের রক্তস্রোত ঘটানোর জন্য দায়ী? সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর এই উসকে দেওয়া প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছেন ঃ "Yes, she used to say most wrong and foolish things." সেইসঙ্গে অবশ্য তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন বাঙালি ছাত্রসমাজের ওপর নিবেদিতার 'Tremendous' প্রভাবের কথাও।

এখন প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথের এইসব বিতর্কিত মতামত কি আদৌ তাঁর নিজের বিশ্লেষণ-প্রসূত? নাকি তা সাময়িক উত্তেজনার ফল? সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত মতামতে অনেক সময়েই সেই ব্যক্তির যথার্থ মত প্রতিবিম্বিত হয় না। পূর্বাপর প্রশ্নোত্তরের রেশ, প্রশ্নকর্তার অভিরুচি ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময়েই তা প্রভাবিত হয়। নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই সরোষ বক্তব্যও সেই ত্রুটি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু এব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব, কারণ এই সাক্ষাৎকারের কোন আনুপূর্বিক বিবরণ রক্ষিত নেই, আছে শুধু এডওয়ার্ড টমসন-কৃত নিজস্ব 'নোটস', যা তিনি এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের তিনদিন পর ১৭ নভেম্বর ১৯১৩ তাঁর স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করেন এবং যেটি নিছকই "intended as a private record for a few friends."[৮৯]

প্রশ্ন জাগে, এমন বক্তব্যই যদি রবীন্দ্রনাথের মনের কথা হবে, তিনি তাহলে কেন নিবেদিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন? সে কি শুধুই ঘনিষ্ঠজনের অনুরোধ আর পরিস্থিতির চাপ? এডওয়ার্ড তাই প্রশ্ন করেন ঃ "I was surprised to see you had written an appreciation of her?" রবীন্দ্রনাথের উত্তর ঃ "Well, she was simply full of love for my country and I have seen her many a time working amid the most dreadful privations, especially for a woman brought up as she was. And she was always so bright and cheerful. So I felt I couldn't refuse to write about her when they asked me."[৯০]

রবিজীবনীকার মন্তব্য করেছেন ঃ "নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ দেওয়া, জাতীয় আন্দোলনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা না-ভাসানো নিবেদিতার অপছন্দের কারণ হতে পারে, কিন্তু 'ঘৃণা' ['hatred'] একটি কঠিন শব্দ—উভয়ের সম্পর্কের আনুপূর্বিক ইতিহাস উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বোঝা শক্ত।"[৯১] রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা কেউই যেহেতু একে অপরের কোন স্মৃতিচারণ রক্ষা করে যাননি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পূর্বোক্ত দুটি চিঠি বাদে দুজনের পত্রালাপের আর কোন হদিশ নেই, তাই তাঁদের 'সম্পর্কের আনুপূর্বিক ইতিহাস উদ্ঘাটিত' হওয়ার আশা আর না করাই ভাল। তবু তাঁদের দুজনের যোগাযোগের যেটুকু বিবরণ জোগাড় করা গেছে, তাতে বিশ্বাস করা শক্ত যে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করতেন অথবা রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্পর্কে এত তিক্ত মত পোষণ করেন।

তবে ভাষার রং ছাড়িয়েও যেটুকু সত্যের কাঠামো সংগ্রহ করা যায়, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না—উভয়ের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত নানা ভুল বোঝাবুঝি, আদর্শগত বিরোধ এবং অভিমানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনেকটাই কর্কশ হয়ে উঠেছিল। হয়তো উভয়কে ঘিরে নিকটজনের যে দুটি আলাদা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তার সদস্যদেরও এই সম্পর্কের ক্রমাবনতির পিছনে অনেকটাই হাত থাকতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে দুজনেরই ঘনিষ্ঠ বান্ধব বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন। আমরা জানি, প্রথম দিকে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই জগদীশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় দুজনের সম্পর্কের ফাটল অনেকটাই হয়তো মেরামত করা যেত। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তেমন কোন উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

১৭ অক্টোবর ১৯০৬ রবীন্দ্রনাথ অবলা বসুকে লেখেন ঃ "নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায়, তাহা আমি জানিতাম না—আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েকদিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে-পত্রের যেন তিনি কোন নোটিস না লন। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে, উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।"[৯২]

এই চিঠি আমাদের অনেক হিসেবি সিদ্ধান্তই এলোমেলো করে দেয়। দেখা যাচ্ছে, শিলাইদহ থেকে ফেরার প্রায় পৌনে দুবছর পরেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার চিঠিতে যোগাযোগ ছিল। এবং কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য অবশিষ্ট না থাকলে নিশ্চয় কারো কাছ থেকে প্রয়োজনে বই ধার চাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষে অমানুষিক সেবাকাজ চালিয়ে কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা ম্যালেরিয়া ও 'ব্রেন ফিভারে' [? সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া অথবা এন্‌কেফেলাইটিস] শয্যাশায়ী।[৯৩] যতটা আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন, বৈরীভাবাপন্ন কোন মানুষের পক্ষে সে-অভিব্যক্তি নিশ্চয় সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সম্পর্ক-ছিন্ন কোন পরিচিত লেখককে তাঁর উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স বদল করার জন্য জোরজার করাও—বনফুলের স্মৃতিচারণ অনুসারে 'গোরা' উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিবেদিতা যা করেছিলেন বলে আমরা আগেই জেনেছি। সে-ঘটনা সত্যি হলে তা ১৯০৯-এর শেষার্ধে হওয়াই সম্ভব। অবশ্য এডওয়ার্ড টমসনের কাছে রবীন্দ্রনাথের নিবেদিতা সংক্রান্ত বিষোদ্গার এর পরে—১৯১৩-র শেষদিকে। আর জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লেখা নিবেদিতা সম্পর্কিত যে আপত্তিকর মন্তব্যের কথা আগেই উদ্ধৃত, সেটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন আরো পরে—২৪ নভেম্বর ১৯২১।

কিন্তু নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এটিই চূড়ান্ত মূল্যায়ন নয়। কালস্রোতে ব্যক্তিগত অভিমান-অনুযোগের জ্বলন মিলিয়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আবার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ব্যক্তি নিবেদিতা এবং বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার আত্মনিবেদনের মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

একালের রবীন্দ্র-গবেষক মনে করেন রবীন্দ্র-সাহিত্যে, বিশেষত তাঁর কাহিনী-সৃষ্টিতে নিবেদিতার ছায়া বারেবারেই এসেছে। যেমন—

(১) "রবীন্দ্রনাথ খুব যত্ন করেই পড়েছিলেন বিবেকানন্দের কবিতাটি এবং নিবেদিতার বইটিও, দুটিই একই শিরোনামাঙ্কিত—'Kali the Mother'। এই দুটি অসামান্য সাহিত্যসৃষ্টি ফলপ্রসূ প্রেরণাবীজের কাজ করেছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। 'পাগল' নামে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় রচনাটি ['বঙ্গদর্শন'-এর শ্রাবণ ১৩১১-এ প্রকাশিত এবং 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে সঙ্কলিত] আমাদের এই সিদ্ধান্তের নির্ভুল নিদর্শন।"[৯৪]

(২) "রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ['সবুজপত্র'-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন ১৩২১ সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত] 'শচীশের ডায়েরি থেকে' অংশটির প্রেরণা-উৎস যে নিবেদিতারই ডায়েরি ['ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৯০৬-১৯১০ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত], এই নিগূঢ় সাহিত্যের সত্যটি এপর্যন্ত কোন গবেষকের চোখে পড়েনি।"[৯৫]

(৩) "নিবেদিতা ['চতুরঙ্গ' উপন্যাসে] দামিনীর মধ্যে তবু সুড়ঙ্গ-গভীর সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসে পাই।"[৯৬]

(৪) "নিবেদিতার রচনাবলীতে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 'রাজা' অভিধাটি প্রায়শ প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।... খুব দূরবর্তী নয় 'চার অধ্যায়'-এর [প্রকাশ ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৪] এলার অন্তিম লগ্নের একটি সংলাপের গড়ন—'অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালবেসেছি, আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।' "[৯৭]

১১ ভাদ্র ১৩৩৫ রবীন্দ্রনাথ 'পথবর্তী' কবিতায় লেখেন ঃ "তব আহ্বানে বরণ করিয়া/ নিয়েছি দুর্গমেরে।/ ক্লান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া/ মোর অঞ্চল-ঘেরে।/... তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,/ না মানিব পরাভব।/ তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে/ যাকিছু আমার সব।"[৯৮] এর দুদিন পর ১৩ ভাদ্র 'মুক্তরূপ' কবিতায় তিনি লিখলেন ঃ "আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহ;/ মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়/ জ্বলিবে মশাল তব, আতঙ্ক দুঃসহ/ রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।"[৯৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুই কবিতায় নিবেদিতার আত্মোৎসর্গের মহিমা স্মরণ করেছেন—এতদিন পর এমন ধারণা করা সহজ ছিল না। কিন্তু মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণ এব্যাপারে আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্তে এনে দেয়—" 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'পথবর্তী' আর 'মুক্তরূপ' বলে দুটি কবিতা আছে। ঐ কবিতাদুটিতে স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত কর্মজীবনের যে-কথাটি আছে সে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী সহকর্মিণী—উভয়ের কর্মক্ষেত্রও এক। কিন্তু 'মুক্তরূপ' কবিতায় নারী তার জীবনের অর্ঘ্য এনেছে পুরুষকেই শক্তি দিতে, তাকে তার নিজ কর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে।...

"নারীর এই শক্তিরূপ পুরুষের মুক্তরূপেই সার্থক। ঐ কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন, যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন?' (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) তখন আমরা নানা কথায় বুঝেছিলাম, নিবেদিতার জীবনের কী গভীর সার্থকতার রূপ কবির মনে আছে। সন্ন্যাসীর জীবনের সঙ্গে যোগ হলো নারীর যে আসক্তি-বন্ধনহীন অবারিত আত্মোৎসর্গ, তখনকার যুগে এদেশে তার আর কোন দৃষ্টান্ত

কি ছিল? কোন যুগেই এমন ঘটনা বেশি নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'মোর রক্ততরঙ্গের মত্তকলরবে বাণী তব মিশে ভেসে যায়'।"[১০০]

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর জীবনসত্যকে জীবনান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাঁর আরব্ধ কর্মকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য তিনি কোন 'নিবেদিতা'-প্রাণা উত্তরাধিকারিণী পাননি—বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন। এই সৌভাগ্যের ললাটলিখন নিয়ে তাঁর পাশের পাড়ার নিকট-বয়সী যুবকটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কি মনে মনে কোন অসূয়া পোষণ করতেন? অথবা কোন গোপন বেদনা? নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের উথাল-পাতালে এমন মনস্কতা কি মাঝে মাঝে প্রভাব ফেলত?

হয়তো অযৌক্তিক কষ্টকল্পনা নয়, তবু এসব কল্পনা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। কারণ এবিষয়ে শেষকথা বলার মতো কোন তথ্যপ্রমাণই আমাদের হাতে নেই। যেটুকু আছে তা বরং প্রমাণ করে, বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন।

মৃত্যুর মাত্র মাস আড়াই আগে ২৩ মে ১৯৪১ রানী চন্দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে কবি রোগশয্যায় শুয়ে হঠাৎ নিবেদিতার আত্মনিবেদনের কথা বলতে লাগলেন: "মেয়েদের একটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস—'emotion'। এ যখন একটা 'character'-এর সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পুজো করতেন বিবেকানন্দকে। তাই তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন তাঁর ধর্মকে। নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এলেন এই দেশে। এই দেশকে, এই দেশের লোককে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তাঁর এই ভালবাসা যে কত সত্যিকারের তা বলবার নয়। সবকিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস, এই আত্মত্যাগ অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। আমি নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতুম। তাঁর যাকিছু ছিল সব গরিব ছেলেদের দিয়ে দিতেন। নিজের চোখে দেখেছি—তাঁর ঘরে কলা টাঙানো থাকত, তাই দিয়ে নিজে ক্ষুধানিবৃত্তি করতেন।

"মেয়েদের যেটা 'emotion', সেটা যদি শুধু 'emotion'-ই হয় তবে তা অতি সহজেই বিকৃত হয়, কিন্তু তার মধ্যে যদি একটা 'character' থাকে তবেই হয় তার সত্যপ্রতিষ্ঠা।

"...বিদেশী মেয়েরা তাদের ভালবাসার প্রতিষ্ঠা করে কাজের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে।"[১০১]

নির্মলাকুমারী মহলানবীশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন, মৃত্যুর কিছুকাল আগে একদিন রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেন: "মেয়েদের কাছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধটা এত বেশি বড় যে, কোন 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ধারণা নিয়ে তারা তৃপ্তি পায় না। সেইজন্যেই তারা বড় বড় আদর্শের পিছনে পুরুষের মতো পাগল হয়ে ছোটে না, কিন্তু যাকে ভালবাসে তার জন্যে অনায়াসেই সবকিছু ছাড়তে পারে, প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারে, দরকার হলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করে না। আমার তো মনে হয়, যখনি কোন মেয়ে বড় কিছু একটা 'আইডিয়া' বা আদর্শের জন্যে সর্বস্ব পণ করে, তখনি খুঁজে দেখলে দেখা যায় তার পিছনে কোন 'ব্যক্তি' রয়েছে, যার প্রতি ভালবাসা তাকে এই পথে টেনে বের করেছে। সে-ভালবাসাকে আমি ছোট করছিনে। বস্তুত ভালবাসা যখন বড়, কেবল তখনি সে আসক্তিমুক্ত। তখনি সে নিজেকে এমনি করে দান করতে পারে, স্বার্থপরের মতো প্রিয়জনকে নিজের কাছে বেঁধে রাখবার চেষ্টা না করে তার আদর্শের কাছে, তার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে। আমার বিশ্বাস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, সিস্টার নিবেদিতা—সকলেরই এই এক ইতিহাস।"[১০২]

নিবেদিতার প্রতি জীবনপ্রান্তে উপনীত কবির এ এক একান্ত নিজস্ব মূল্যায়ন, স্বতঃস্ফূর্ত সম্মাননা। তাঁদের ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির তিক্ত স্মৃতি বা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব-জনিত অস্বস্তি থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে উঠে কবি এখানে শ্রদ্ধাবনত।

অস্তাচলে যাওয়ার আগে দিনান্তের রবি অর্ঘ্য দিয়ে গেলেন তাঁর 'লোকমাতা'কে। [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূচী

৮৮ Alien Homage: Edward Thompson & Rabindranath Tagore—E. P. Thompson, Oxford University Press, Delhi, 1993, p. 110

৮৯ Ibid., p. 109

৯০ Ibid., p. 110

৯১ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭

৯২ ঐ, পৃঃ ৩২২

৯৩ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৪৩

৯৪ নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতির্ময় ঘোষ, ত্রিদীপ প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃঃ ৮৮

৯৫ ঐ, পৃঃ ৯৪

৯৬ ঐ, পৃঃ ১২৫

৯৭ ঐ, পৃঃ ১৪৪

৯৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ ৮০৪

৯৯ ঐ, পৃঃ ৮০৫

১০০ 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৭০, পৃঃ ৬৮

১০১ আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১, পৃঃ ১১১

১০২ বাইশে শ্রাবণ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৭, পৃঃ ৯

■ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** ● অধ্যাপক বার্ণিক রায় ● অধ্যাপক মানস মজুমদার, *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* ● অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল, *রবীন্দ্র-গবেষক* ● রবীন্দ্রনাথ মালাকার, *বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির গ্রন্থাগার* ● শুভজিৎ চক্রবর্তী

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে (১৮১০ শকাব্দের মাঘ মাসে) বারাণসীর 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা' থেকে প্রকাশিত 'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রিকায় এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর লেখক বা সঙ্কলকের নাম জানা যায়নি। সন্তোষকুমার দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই লেখাটির ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।—সম্পাদক

সমুদ্রের জল পান না করিয়া তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব যেমন বলিতে পারা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ড-পতির অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে।

অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে।

অল্পজলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে২ জল পান করিও, কেননা তাহা পরিষ্কার। কিন্তু আলোড়িত করিও না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব! পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না।

যেমন সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত চুম্বকপ্রস্তর অকস্মাৎ জাহাজের সমুদায় লৌহনির্ম্মিত পেরেক প্রভৃতি টানিয়া লইয়া জাহাজ-খানিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞানচৈতন্যের উদয় হইলে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা-পূর্ণ জীবনতরী মুহূর্ত্তের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ঈশ্বরের প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

যেমন সামান্য বালককে সুরাপানের সুখ বুঝান অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবকে ধর্ম্মের স্বর্গীয় সুখ বুঝান অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়; অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।

মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়াতে সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া গেলে যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হইলে সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মায়াকে চিনিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। যেমন কোন গ্রামে এক গুরু শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য নাই। পথিমধ্যে এক মুচিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ওরে আমার সঙ্গে যাবি? উত্তমরূপে আহার করিতে পাবি এবং অতি আদরে থাকিবি, চল না? মুচি বলিল—ঠাকুর মহাশয়, আমি অতি নীচ জাতি, আমি কিরূপে আপনকার দাস হইয়া যাইব? গুরু বলিলেন—তাহাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাহাকেও আপনার পরিচয় দিস্ না এবং কাহারো সহিত আলাপ করিস্ না। মুচি সম্মত হইল। অপরাহ্নে শিষ্যবাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময় অপর একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই ভৃত্যকে বলিতেছে—অমুক স্থল হইতে আমার জুতাযোড়াটা আনিয়া দাও। ভৃত্য কথা কহিল না। ব্রাহ্মণ আবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নীরব। ব্রাহ্মণ তিন-চারিবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নড়িল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিল—আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না, তুই কি জাত, তুই মুচি নাকি? ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে২ সেই গুরুর দিকে তাকাইয়া বলিল—ঠাকুর মহাশয় গো, ঠাকুর মহাশয় গো! আমায় চিনেছে আমি পালাই। এবং সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।
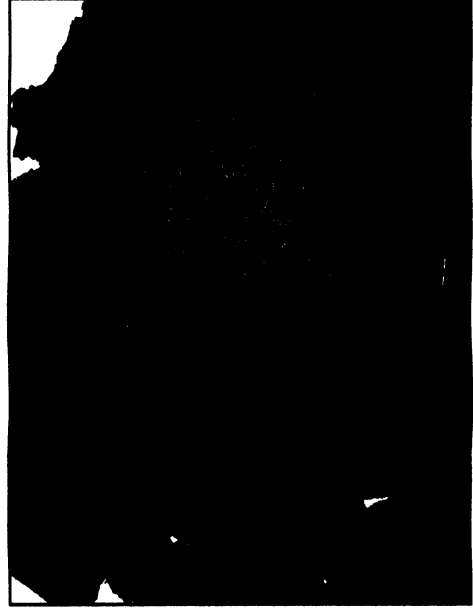
'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রিকার যে-সংখ্যায় এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রচ্ছদ।

বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ বৃথা। বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্ম্মলাভ অসম্ভব।

হস্তীকে ছাড়িয়া দিলে চতুর্দ্দিকের বৃক্ষসকলকে ভাঙ্গিতে যায়। এবং তাহার মস্তকে ডাঙ্গস্ মারিলে সে নিরস্ত হয়। মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানাপ্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং বিবেকরূপ ডাঙ্গস্ না মারিলে সে নিরস্ত হইবে না।

ধ্যান করিবে কোণে, বনে আর মনে।

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনা আপনি জল আইসে তাহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না।

সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থলে ঈশ্বর বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সকল স্থলে যাওয়া উচিত নয়।

যেসকল লোক উপাসনা করিলে উপহাস করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের কুৎসা করে, সাধনার অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবে। ❑

ব্রাজিল, আর্জেণ্টিনা ও উরুগুয়েতে কয়েকদিন

স্বামী স্মরণানন্দ

১৬ মে ২০০২। সকাল ৮টা। আমাদের বিমান দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের মাটি স্পর্শ করল। অভিবাসন এবং শুল্ক সংক্রান্ত পর্বগুলি শেষ করে নির্ধারিত ঠিক ১০টা ২০ মিনিটে 'সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজ'-এর বিমানে সাও পাওলো (ব্রাজিল)-এর উদ্দেশে রওনা দিলাম। প্রায় ১০ ঘণ্টার সুদীর্ঘ উড়ানপথ। মাঝে কোথাও কোন বিরতি নেই। এত দীর্ঘসময় একটানা বিমানে ভ্রমণ করা খুবই ক্লান্তিকর। অবশ্য 'জেটল্যাগ'-এর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য 'নো জেটল্যাগ' ট্যাবলেট দু-ঘণ্টা অন্তর খেয়েছিলাম। উড়ানে আমাকে একরকম খাবার দেওয়া হয়, যার নাম 'এশিয়ান ভেজিটেরিয়ান'। ৩-৪ ঘণ্টা চালানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল।

নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট আগেই বিমান সাও পাওলো বিমানবন্দরে অবতরণ করল। মালপত্র ফিরে পেতে কিছুটা সময় লাগল বটে, কিন্তু অভিবাসন এবং শুল্ক-সংক্রান্ত পর্বগুলি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সাও পাওলো শাখাকেন্দ্রের প্রধান স্বামী নির্মলাত্মানন্দ, বুয়েন্স এয়ার্স (আর্জেণ্টিনা) শাখাকেন্দ্রের প্রধান স্বামী পরেশানন্দ এবং আরো প্রায় ২০ জন ভক্ত আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি বর্ণনা করার আগে সকলের অবগতির জন্য ব্রাজিল সম্বন্ধে কিছু সাধারণ তথ্য তথা পৃথিবীর এই অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন কিরূপ প্রসারলাভ করছে, সেসম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যেতে পারে।

ব্রাজিল

এই দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে একপ্রকার বৃক্ষ থেকে মূল্যবান 'রেড-ডাই-উড' পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের নাম 'পাও ব্রাসিল'। এই নাম থেকেই 'ব্রাজিল' নামটির উৎপত্তি। আয়তনে ব্রাজিল ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ (প্রায় ৮৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার) এবং এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। অতএব সামগ্রিক বিচারে দেশটি যথেষ্ট শক্তিশালী। এদেশে বিশুদ্ধ জল এবং খনিজ সম্পদের (লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি) বিপুল প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। কফি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্রাজিল বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী দেশ। *এদেশের রপ্তানীযোগ্য প্রধান কৃষিপদার্থ হলো সয়াবীন এবং* আখের চিনি।

আয়তন এবং জনসংখ্যা—এই উভয় বিচারে ব্রাজিল লাটিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। অতি উষ্ণ এবং নাতি উষ্ণ উত্তর অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশাল আমাজন অববাহিকাকে বেষ্টন করে নাতিশীতোষ্ণ সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত এদেশের বিস্তৃতি। সেই কারণেই ব্রাজিলকে উপমহাদেশের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইওরোপীয় জাতি হিসাবে পর্তুগিজরা এদেশে বসতি স্থাপন করে। তখন এই দেশের জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষের মতো। এই দেশ দখল করার ক্ষেত্রে সেইসময় পর্তুগিজ, স্পেন, ফরাসি এবং ব্রিটিশদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাজিল স্বাধীন জাতিরূপে স্বীকৃতিলাভ করে।

বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে ব্রাজিল তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী শিল্পসমৃদ্ধ দেশ বলে স্বীকৃত। যুদ্ধোত্তর কালে এই দেশে শহরবাসীর সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। এখন শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ। যদিও এই দেশের অর্থনীতি রপ্তানিনির্ভর, তবু দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা এখনো এক বিরাট সমস্যা। পর্তুগিজ ভাষাই এদেশের সরকারি ভাষারূপে অনুমোদিত, যদিও অবশিষ্ট লাটিন আমেরিকান দেশগুলির সরকারি ভাষা স্প্যানিশ। খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষ এখানে ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাষারূপে ইংরেজি বিশেষ সহায়তা করতে পারে বিবেচনা করে বেশ কিছু শহরবাসীর মধ্যে এই ভাষা শিক্ষা করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাজিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন

আর্জেণ্টিনার বুয়েন্স এয়ার্সে স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাবধারা ধীরে ধীরে এদেশে প্রসারলাভ করতে থাকে। তিনি নিয়মিতভাবে ব্রাজিল যেতেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে বেশ কিছু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আকর্ষণবোধ করতে থাকেন। স্বামী বিজয়ানন্দের তিরোভাবের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্থান থেকে সন্ন্যাসিগণ নিয়মিতভাবে ব্রাজিলে আসতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী ঋতজানন্দ। তিনি ছিলেন ফ্রান্সে অবস্থিত মিশনের শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ। তিনি একাধিকবার সেখানে যাওয়ার ফলে বহু ভক্ত

বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ক্রমে ক্রমে সাও পাওলো, রিও ডি জেনিরো এবং কিউরিটিবাতে সম্পূর্ণ ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি কেন্দ্রের সূচনা হয়। এবিষয়ে আরেকজনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তিনি অযোধ্যা থেকে আগত রামায়ত সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক সাধু স্বামী তিলক। তিনি তাঁর শিষ্য এবং ভক্তদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন। তিনি তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার পূজা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী জীবনে ও কর্মে রূপায়িত করার জন্য উপদেশ দিতেন। দুই দশক পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করলেও ঐসকল অঞ্চলে এখনো তাঁর প্রভাব অব্যাহত।

ব্রাজিলের ভক্তগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে ৩ বছর পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ স্বামী নির্মলাত্মানন্দকে সাও পাওলো আশ্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন থেকেই তিনি অতি নিষ্ঠাভরে সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন এবং স্থানীয় ভক্তদের প্রভূত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁরই উদ্যোগে রিও ডি জেনিরো, কিউরিটিবা এবং বেলো-বেরিজোনটে শাখাকেন্দ্রগুলিতে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হয়। তাঁর নিয়মিত যাতায়াতের ফলে এই অঞ্চলের ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সম্বন্ধে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত

ভ্রমণ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পূর্বেই বলেছি, 'সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজ'-এর বিমান নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট আগেই সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখান থেকে আমাদের আশ্রমে আসতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা। অবশ্য অফিস টাইমে সময় আরো বেশি লাগে।

এম্বু রিট্রিট সেন্টারে ভক্তসঙ্গে

সাও পাওলো দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম শহর এবং বিশ্বের বড় শহরগুলির অন্যতম। এর জনসংখ্যা ১.৮ কোটি। সাও পাওলো এদেশের শিল্পের পীঠস্থান। ব্রাজিলের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সময় থেকে ৫ ঘণ্টা এবং ভারতীয় সময় থেকে সাড়ে ৮ ঘণ্টা পিছিয়ে। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আমাদের আশ্রমে পৌঁছালাম বিকাল ৪টে ১৫ মিনিটে। জেটল্যাগের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে না পারায় অনেকক্ষণ ঘুমাতে হলো।

পরদিন (১৭ মে) প্রাতরাশ সেরে সকাল সাড়ে ৭টায় স্বামী নির্মলাত্মানন্দ আশ্রমের অদূরে 'ইবিরাপুয়েরা' নামের এক বিশাল উদ্যানে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। জায়গাটি বিশাল। সেখানে প্রায় ৩০০ মিটার বিস্তৃত একটি আচ্ছাদিত অংশ আছে। তার ফলে বৃষ্টি হলেও বেড়াবার কোন অসুবিধা হয় না। স্বামী পরেশানন্দ এবং আরো কয়েকজন ভক্ত আমাদের সঙ্গী হলেন। দেখা গেল, দলটি একটি ছোটখাট শোভাযাত্রার রূপ গ্রহণ করেছে।

বিকালবেলায় 'পিনাকোটেক ডা এস্টাডো' নামে একটি মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু মূল্যবান চিত্র ও ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে। এই বিশাল সংগ্রহশালা-সংলগ্ন একটি বাগান আছে, নাম 'জার্ডিম ডা ল্যুজ'। সন্ধ্যাবেলা আরতি এবং জপধ্যানের পর আমি ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

১৮ মে সকাল ৭টার সময় আমরা এক বৃদ্ধ ব্রাজিলীয় ভক্তের দেহত্যাগের সংবাদ পেলাম। তাঁর নাম সমীর। কিন্তু সমস্যা হলো ইতিমধ্যেই ঠিক ঐসময় নিকটবর্তী একটি সিনেমা হল 'সিনেমাটেকা'তে (এটি বর্তমানে চালু নেই) একটি সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। বেলা ১০টার সময় প্রায় ২০০ ব্যক্তির উপস্থিতিতে সভার কাজ শুরু হলো। বক্তাদের মধ্যে আমি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাও পাওলো রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সহাধ্যক্ষ এরনানি বুফ্যোলো, কিউরিটিবায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ জাগুির সি. ওয়াফ্টনার, রিও ডি জেনিরোতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের সম্পাদক ল্যুইস অ্যান্টনিও এস. মনটেইরো, বেলো হোরিজোনটের রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের সহাধ্যক্ষ এলসন ডি. ব্যারোস গোমস, সাও বেনটো ডো সাপুকাইয়ের শ্রীমতী মেরিয়া আর. এস. অ্যাকুইনো (রাধা) এবং ভারতীয় কনসাল জেনারেল দীপক ভোজওয়ানি। সাড়ে ১২টার সময় সভা সমাপ্ত হলে স্বামী পরেশানন্দ এবং স্বামী নির্মলাত্মানন্দের সঙ্গে আমি পরলোকগত সমীরের বাড়ি গেলাম। আশ্রম থেকে মাত্র ৭-৮ মিনিটের হাঁটাপথ।

বিকালে দোভাষীর সাহায্যে আমি স্থানীয় 'বেদান্ত-ব্যুলেটিন' পত্রিকাকে এক সাক্ষাৎকার দিলাম। পরদিন আমরা 'এম্বু'র উদ্দেশে যাত্রা করলাম। মাত্র ৪০-৫০ মিনিটের পথ। এখানে একটি অতি সুন্দর 'রিট্রিট সেণ্টার' আছে। এই যাত্রাপথে আমাদের সাও পাওলো শহরতলীর কিছু অংশ এবং একটি গ্রাম অতিক্রম করতে হলো। ঐ অঞ্চলগুলির দরিদ্র অবস্থা আমাকে কলকাতা তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের কিছু কিছু অংশের কথা স্মরণ

করিয়ে দিচ্ছিল। সকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও বহু মানুষ ঐ উপাসনাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারেননি। তবুও দেখা গেল, প্রায় ৯০ জনের মতো ভক্ত উপস্থিত আছেন।

এই উপাসনাকেন্দ্রটি ৩ একর কিছুটা অসমতল জমির ওপর অবস্থিত। দুটি সুন্দর বাড়ির একটির ওপরতলায় রয়েছে ঠাকুরঘর। সম্প্রতি বাড়িদুটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। পরিবেশ অতি শান্ত ও মনোরম। সদ্য সংস্কার করা ঠাকুরঘরটি আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হলো। সবকিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য আগের দিন থেকেই কিছু মহিলা ভক্ত সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রাধা এবং গোবিন্দ (জুলিও সিজার ভানারিও অ্যাকুইনো)-এর পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হলো। উপস্থিত সকল ভক্ত করতালি সহযোগে সেই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করলেন। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশ আমাকে বারবার ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। স্বামী নির্মলাত্মানন্দ ঠাকুরঘরে পূজা করলেন। পূজা সমাপ্ত হওয়ার পর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ('The Gospel of Sri Ramakrishna') থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হলো। স্বামী পরেশানন্দের একটি ছোট ভাষণের পর আমি প্রায় ২৫ মিনিট বক্তব্য রাখলাম। আমার বক্তব্যের প্রতিটি বাক্য জনৈক ভক্ত অনুবাদ করেন। তারপর আমাকে এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করতে হলো। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো বিকাল সাড়ে ৪টায়। ৭-৮জন ভক্ত ছাড়া প্রায় সকলেই নিজের নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। অরণ্যবেষ্টিত এই নির্জন স্থানে রাত্রে আমরা বাকি কয়জন থেকে গেলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় যাত্রা করে বেলা ১১টার সময় আমরা সাও পাওলো ফিরে এলাম। বিকাল সাড়ে ৫টায় আশ্রমে 'আন্তর্ধর্ম' বিষয়ক এক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুনলাম, সেখানে প্রতি মাসেই এজাতীয় একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বধর্মের মানুষের চেতনা উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ ঐ সভায় মিলিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য সেদিন খুব অল্প মানুষ উপস্থিত হন এবং তাও অনেক বিলম্বে। অতএব সন্ধ্যারতির পর আলোচনা শুরু হলো। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন একজন সুফি, একজন খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ব্রহ্মাকুমারীদের একজন প্রতিনিধি, একজন বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। আলোচনার বিষয় ছিল 'ধর্মসমন্বয়ের লক্ষ্যে সচেতনতার উপায়'।

২১ মে সকাল ৯টায় আমরা হেলিকপ্টার-যোগে সাও পাওলো শহরটি দেখার জন্য বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। স্বামী বিজয়ানন্দজীর শিষ্য, বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ডাঃ বেরিস বারোন এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। শহরের উত্তরপ্রান্তে বিশাল বিশাল জলাশয় দৃষ্টিগোচর হলো। শুনলাম, এই জলাশয়গুলিই এই বিশাল নগরীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় জল সরবরাহ করে থাকে। একইসঙ্গে গগনচুম্বী বহুতল বাড়িগুলির পাশাপাশি অপরিচ্ছন্ন ঘিঞ্জি বস্তিগুলি কেমন সহাবস্থান করছে, সেবিষয়ে হেলিকপ্টার-চালক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বস্তুত, আধুনিক যুগের উন্নত শহরগুলির প্রতি এই একই অভিশাপ। আমরা শহরের মধ্যে প্রবহমান দুটি নদী দেখলাম। দুটি নদীর জলই অত্যন্ত দূষিত। ভ্রমণ শেষ করে আমরা সাড়ে ১০টায় আশ্রমে ফিরে এলাম। মধ্যাহ্নভোজের সময় ডঃ এরনানি বুফ্যোলো এবং তাঁর পত্নী মার্সিয়ানার সঙ্গে আলাপ হলো। এরনানি বিজয়ানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। এদিকে বাইরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। তার মধ্যেই আমরা উদ্যানটির আচ্ছাদিত অঞ্চলে কিছু সময় পায়চারি করলাম। নৈশভোজের সময় বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল।

ফজ ডো ইগুয়াস্যু

২২ মে ২০০২। আমরা সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানযোগে ফজ ডো ইগুয়াস্যুর উদ্দেশে রওনা হলাম। এই শহরটি বিখ্যাত 'ইগুয়াস্যু' জলপ্রপাতের খুব কাছে। বিমানে সময় লাগল ১ ঘণ্টা। রিকার্ডো আগের দিনই সেখানে পৌঁছে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আগের দিনের বৃষ্টিবিঘ্নিত আবহাওয়ার কথা ভেবে তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু আমরা সেখানে পৌঁছে অতি মনোরম আবহাওয়া ও পরিষ্কার আকাশ পেলাম। আমাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল একটি হোটেলে। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল জনৈকা ভক্ত শ্রীমতী বিয়াট্রিসের গৃহে। বিকাল ৩টা নাগাদ আমরা জলপ্রপাত দর্শনের জন্য

ইগুয়াস্যু জলপ্রপাত

রওনা হলাম—পর্তুগিজ ভাষায় যার নাম 'ক্যাটারাটাস'। এই স্থানটিকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় উদ্যান গড়ে উঠেছে। এই উদ্যানের অভ্যন্তরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ। তাই আমাদের গাড়ি ছেড়ে উদ্যানের ভিতরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বাসে উঠলাম।

ইগুয়াস্যু জলপ্রপাতটি নিঃসন্দেহে অতি চমৎকার। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত এই জলপ্রপাতের ছোটবড় মিলিয়ে ২৭৫টি জলধারা আছে। এর মধ্যে ৩০টি ধারা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। জাতীয় উদ্যানটির মোট পরিমাপ ১,৮৫,০০০ হেক্টর। নিবিড় অরণ্যানী, পর্বত এবং ছোটবড় অসংখ্য জলধারার সংমিশ্রণে স্থানটিকে স্বপ্নের রাজ্য বলে বোধ হচ্ছিল। এই জলপ্রপাতের তুলনায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত ক্ষুদ্র বলে পরিগণিত হতে পারে। ইচ্ছা হচ্ছিল, সমস্ত দিন এখানে বসে জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্ধ্যার পর এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় না। অতএব আমাদের ফিরে যেতে হলো।

ইতাইপু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমরা তিনজন সন্ন্যাসী এবং সাও পাওলো থেকে আগত বহু ভক্ত একযোগে ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত 'ইতাইপু' জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি দেখতে গেলাম। ইতাইপু বাঁধটি ১৯৬ মিটার উঁচু এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭,৭৬০ মিটার (৭.৭ কিলোমিটার)। এখনো পর্যন্ত এটিই বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ব্রাজিলের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এই প্রকল্প থেকে। গাড়িতে আমরা প্যারাগুয়ের দিক থেকে যাত্রা শুরু করে ব্রাজিলের প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলাম। দেখলাম, জলাশয়টি জলপূর্ণ এবং তার প্রবাহ প্রায় একটি বৃহৎ জলপ্রপাতের মতোই তীব্র। স্থানে স্থানে এই জলপ্রবাহ বিপুল উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে এবং তার উপরিভাগে শোভা পাচ্ছে একটি অতি সুন্দর রামধনু।

বিকালবেলা আমরা এই জলপ্রপাতটিকে আর্জেন্টিনার দিক থেকে দেখতে গেলাম। একটি টয় ট্রেনে চেপে আমাদের এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করতে হলো। ঐ সেতুটি জলপ্রপাতের একেবারে কাছে পৌঁছে দেয়। 'রেনকোট' ব্যবহার না করলে জলপ্রপাত থেকে ছুটে আসা জলকণা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দেবে। 'ইগুয়াস্যু' জলপ্রপাতটির অনেকগুলি উন্মুক্ত দিক আছে। বলা খুবই কঠিন, কোন্‌দিকটি সুন্দরতর—ব্রাজিল অথবা আর্জেন্টিনার। আমার মনে হলো, দুটি প্রান্তই সমান সৌন্দর্যের দাবিদার।

কিউরিটিবা

২৪ তারিখ খুব ভোরে ব্রাজিলের পারানা রাজ্যের রাজধানী অতি আধুনিক নগরী কিউরিটিবার উদ্দেশে রওনা হলাম। বিমানযোগে সময় লাগল ১ ঘণ্টা। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। স্বামী বিজয়ানন্দজীর শিষ্য এবং প্রাচীন ভক্ত জানডিরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রায় ১,০০০ বর্গমিটার জমির ওপর একটি নতুন আশ্রমের সূচনা হয়েছে। আশ্রমের মন্দিরটি অতি সুন্দর, কিন্তু স্থান এত অল্প যে, ৪০-৫০ জনের বেশি ভক্ত সেখানে বসতে পারেন না। আশ্রমের কর্মকর্তারা একটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হলঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। প্রাতরাশ সেরে সমবেত ভক্তের সঙ্গে নিকটবর্তী একটি উদ্যান পরিদর্শন করতে গেলাম। বিকালে শহরের কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে এলাম। প্রায় ৩৬০ ফুট উঁচু একটি স্থানে উঠে আমরা একনজরে কিউরিটিবা শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম।

সন্ধ্যারতির পর ভক্তরা সমবেত কণ্ঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হলে আমরা তিনজন সন্ন্যাসী পর্যায়ক্রমে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। স্বামী পরেশানন্দের দোভাষীর প্রয়োজন হলো না, কারণ তিনি অতি সাবলীলভাবে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারেন; আর ব্রাজিলের মানুষ এই ভাষাটি খুব ভালই বোঝেন।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তার মধ্যেই আমরা স্থানীয় একটি 'বোটানিক্যাল গার্ডেন'

বোটানিক্যাল গার্ডেন, কিউরিটিবা

দেখে এলাম। বিকালবেলা সমবেত ভক্তদের নিকট আমাকে একটি ভাষণ দিতে হলো। বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল—'ধ্যান, কেন এবং কিভাবে?' মাত্র ৫০-৬০ জন ভক্ত উপস্থিত থাকলেও তাঁদের সকলের বসার জন্য যথেষ্ট স্থান ছিল না। সেখানে আরাত্রিক ভজন ক্যাসেটে বাজিয়ে ব্রাজিলীয় ভক্তরা একসঙ্গে গেয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ওপর পর্তুগিজ ভাষায় রচিত কয়েকটি সঙ্গীতও গাওয়া হলো।

কিউরিটিবায় ভক্তসঙ্গে

পরদিন সকালে আমরা একটি রিট্রিট সেন্টারের দিকে রওনা হলাম। প্রায় ৪৫ মিনিটের পথ। সেখানে যাওয়ার সময় লোহা এবং কাঠের তৈরি একটি বিশাল 'অডিটোরিয়াম' আমাদের দেখানো হলো। এই উপাসনা-গৃহটির মালিক হলেন পূর্বোল্লিখিত মিঃ জানডির। উইল করে তিনি এটি কিউরিটিবা শাখাকেন্দ্রকে দান করেছেন। প্রায় ১৫ একর জমির ওপর স্থাপিত এই গৃহটি পাইন এবং বিভিন্ন ফলের গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত। জানডির এখানে একাই বাস করেন। এখানকার মন্দিরটি খুবই সুন্দর। এছাড়া সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য কয়েকটি সুন্দর ঘর আছে। ভক্তদেরও থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

বিকাল ৪টের সময় উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হলো। প্রায় ৫০-৬০ জন শ্রোতা ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে 'অধ্যাত্মসাধনা—সমস্যা এবং সমাধান' বিষয়ে বলতে হলো। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এলভিস নামে জনৈক ব্যক্তি আমার বক্তব্য অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। ইতিপূর্বে ব্রহ্মচারিরূপে তিনি কিছুদিন ভারতবর্ষে বসবাস করে গেছেন। ভক্তদের সহায়তায় তিনিই এই কেন্দ্রটির কার্যনির্বাহ করেন।

পরদিন বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে জানডিরের ধূপ তৈরির কারখানাটি দেখলাম। তাঁর পিতা ফুলের চাষ ও ব্যবসা করতেন। বর্তমানে জানডির সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে ধূপের ব্যবসাতে চলে এসেছেন। এখান থেকে আমরা ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলাম এবং বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে সেখানে পৌঁছে গেলাম। শ্রীমতী কারমেলিটা এবং আরো কয়েকজন ভক্ত বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরই শহরতলীর এক বাগানবাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় ৫ একর জমির ওপর সুন্দর একটি স্থান। চারদিকে আমগাছ এবং বিভিন্ন প্রকার ফুলের গাছ। ২ বছর আগে কারমেলিটার পতিবিয়োগ হয়। বর্তমানে অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে শহরে থাকেন।

ভারতবর্ষ থেকে আগত স্বামী তিলক এইসব অঞ্চলে এবং স্পেনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সকলেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। আগেই বলা হয়েছে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করার জন্য তিনি সকলকে উপদেশ দেন এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্যের তিনি ভারতীয় নামকরণ করেন। এই শহরেই 'জ্ঞানমন্দিরম্' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সূচনা করেন। সেই মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্রের ঠিক নিচে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের পট শোভা পাচ্ছে দেখে আমরা একাধারে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। একেবারে নিচের সারিতে স্থাপন করা আছে স্বামী তিলক এবং তাঁর গুরুদেবের ছবি। কয়েক বছর আগে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় স্বামী তিলকের মৃত্যু হয়। সমবেত প্রায় ৫০ জন ভক্তের সামনে আমি 'আধুনিক যুগে বেদান্ত এবং যোগের প্রাসঙ্গিকতা' সম্বন্ধে ভাষণ দিলাম।

স্বামী তিলকের 'জ্ঞানমন্দিরম্'

পরদিন সকালে দেখলাম আবহাওয়া অতি সুন্দর—শীতল এবং মনোরম। প্রাতরাশের অল্প পরেই আমরা কারমেলিটা, রাধা এবং সাধন (এক ব্রাজিলীয় ভক্ত)-এর সঙ্গে শহরের কিছু স্থান পরিদর্শন করতে গেলাম। ফার্ণাণ্ডো নামে একজন গাইডকে সঙ্গে নেওয়া হলো।

ব্রাসিলিয়া শহরটির পরিকল্পনা অতি আধুনিক। সেই পরিকল্পনায় আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ প্রভাব

পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ডন বস্কো চার্চ', 'টিভি টাওয়ার' ইত্যাদি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুসেলিনো কিউবিটশেখডি অলিভিরার স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত এক বিশাল মূর্তি চোখে পড়ল। পূর্বতন রাজধানী রিও ডি জেনিরোর ৫৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তিনি এই শহরটি নির্মাণ করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাসিলিয়া নতুন রাজধানী-রূপে স্বীকৃতিলাভ করে।

মেট্রোপলিটন ক্যাথিড্রালটি বিশাল গম্বুজাকৃতি। সমস্ত পরিকল্পনাটিই কিরকম যেন অপ্রচলিত। এই ক্যাথিড্রালের প্রতীকগুলি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু গোথিক স্তম্ভ এবং খিলানবিশিষ্ট সনাতন ক্যাথিড্রালগুলি দর্শন করে মনে যে অধ্যাত্মভাবের উদ্রেক হয়, এই ক্যাথিড্রালটি দর্শনে সেরূপ কোনকিছুই হয় না। এদেশের যেসকল আদিবাসী মানুষ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে একটি স্মৃতিমন্দির তথা সংগ্রহশালা আছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এদেশে প্রায় ২৫,০০০ আদিবাসী বসবাস করে।

বেল্লো হোরিজোনটে

২৯ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটের বিমানে আমরা মিনাস রাজ্যের রাজধানী বেল্লো-হোরিজোনটে পৌঁছালাম। বিকালে গাড়িতে ১ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে 'বেটিম' নামে একটি গ্রামে গেলাম। এখানে কয়েক বছর আগে জনৈক অধ্যাপক অরলিণ্ডো স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিব্যদর্শন লাভ করেন। মহারাজ তাঁকে ঐস্থানে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন। সেইসময় মহারাজ সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তবুও তিনি স্থানীয় দরিদ্র শিশুদের সংগ্রহ করে একটি অনাথাশ্রম শুরু করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রায় ২ শতাব্দী আগে যেসকল আফ্রিকানদের স্থানীয় খনিতে কাজ করার জন্য ক্রীতদাসরূপে এখানে আনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বহু কৃষ্ণাঙ্গের বংশধর ঐসকল দরিদ্র শিশুদের মধ্যে ছিল। অরলিণ্ডো আজ আর জীবিত নেই। ঐ আশ্রমটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, পরবর্তী কালে ব্রাজিল সরকার সকলপ্রকার আবাসিক বিদ্যালয়ের ওপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ঐ আশ্রমটি ক্রমে এক সম্পূর্ণ অবৈতনিক দিবা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এটির ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০। এখন এই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'মিশাও রামকৃষ্ণ' (রামকৃষ্ণ মিশন)। পড়াশোনা ছাড়াও এখানে ছাত্রদের সিমাই জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা, তাঁতবোনা, তারের জাল প্রস্তুত করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এভাবে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ছাত্রদের কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়; উদ্বৃত্ত অংশ বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে ব্যয় করা হয়। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। উদ্যোগটি অতি মহান, সন্দেহ নেই। অনেকটা রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের অনুসারী। জনৈক দোভাষীর সাহায্যে আমি সেখানে প্রায় ১৫ মিনিট ভাষণ দিলাম।

বেল্লো হোরিজোনটে শহরটি চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত। মিনাস রাজ্যটি স্বর্ণ এবং হীরক খনির জন্য বিখ্যাত। সকালে আমরা একজন দীক্ষিত ভক্ত এলসন গোমসের বাড়িতে গেলাম। তিনি আজ নিজের চেষ্টায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ। পাহাড়ের গায়ে একটি অতি সুন্দর বাড়ি তৈরি করে তিনি স্ত্রী এবং চার সন্তান-সহ এখানেই বসবাস করছেন। গোমস প্রকৃত ভারতপ্রেমিক এবং তিনি বহুবার ভারতবর্ষে এসেছেন। অনেকেই তাঁর গৃহকে 'ভারতীয় মিউজিয়াম' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কারণ, বহু ভারতীয় গ্রন্থ, চিত্র এবং হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম এখানে সংগ্রহ করে রাখা আছে। বিকাল ৪টায় প্রায় ৬৫ জন ভক্তের সমাবেশে আমি 'রামকৃষ্ণ মিশন ঃ তার আদর্শ এবং কর্মধারা' শীর্ষক একটি ভাষণ দিলাম।

বেল্লো হোরিজোনটে

৩১ তারিখ সকালে প্রায় ২ ঘণ্টার পথ দূরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের জন্য আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো। আমি এর পরিবর্তে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি উদ্যান এবং পর্বতগাত্র-সংলগ্ন আরেকটি মনোরম উদ্যান দেখতে গেলাম। দ্বিতীয় উদ্যানটির নিকটবর্তী একটি রাস্তা আছে, যেটির নাম 'পিনাট্‌স'। এখানে একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে নেমে এসে কোন গাড়ি যখন সামনের ক্রসিংয়ে থামে, তখন যদি গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করেও রাখা হয়, দেখা যায়—গাড়িটি ধীরে ধীরে পিছনদিকে উঠে যাচ্ছে! এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আজ পর্যন্ত এই ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

বিকালে 'মিশাও রামকৃষ্ণ' কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার দিতে হলো। এই পত্রিকাটির ২,০০০ কপি ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতির পর উপস্থিত ৩০-৪০ জন ভক্তের নিকট আমি 'ভগবৎকৃপা এবং পুরুষকার' শীর্ষক একটি ভাষণ ও ভক্তদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এক্ষেত্রে সুসান দোভাষীর কাজ করলেন। [ক্রমশ]

রামমোহন রায়ঃ ভারতীয় সাংবাদিকতার নান্দীকার

সুমন সেনগুপ্ত

গত শতাব্দীর যেসকল মনীষীর কীর্তি ও সাধনার ওপর বর্তমান বাংলা ও বাঙালির ভাবজীবন প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় অগ্রগণ্য—শুধু [illegible] হিসাবে নয়, জ্ঞান ও কর্মের নবপ্রবুদ্ধ ও বহুবিস্তৃত প্রভাবের জন্যও। ব্যক্তিমাত্রকেই দেশ ও কাল নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু দেশ ও কালের প্রভাবকে স্বীকার করেও যিনি তাকে উত্তীর্ণ হন, তিনিই মহাপুরুষ।

শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা—রেনেসাঁস লক্ষণাক্রান্ত তাঁর উপস্থিতি সর্বত্রগামী। সাংবাদিকতায় রামমোহনের ভূমিকা ও অবদানকে বুঝতে [illegible] তাঁর জীবনের এই সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটেই। তাঁর ব্যক্তিত্বের সমগ্র চিত্রটি এতে এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যার সঙ্গে সম্ভবত অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার তুলনা চলে না।

॥২॥

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারী জেমস অগাস্টাস হিকি (১৭৪০-১৮০২) এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। দিনটি ছিল ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি। রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন এর ৬ বছর আগে (১৭৭৪)। এদেশে সাংবাদিকতা-সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হিকির হাত ধরেই।

২৭ বছর বয়সে (১৮০১ সালে) রামমোহন এলেন কলকাতায়। এইসময় পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাগত চর্চা মূলত ফারসি, আরবি ও সংস্কৃতের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ইতোমধ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। লর্ড ওয়েলেসলি তখন গভর্ণর জেনারেল (১৭৮৯-১৮০৫)। সাহেবদের বাঙলা-সহ দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্যই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা। এরকম এক 'সিভিলিয়ান' ছিলেন জন ডিগবি। ঐসময় থেকেই তাঁর সঙ্গে রামমোহনের আলাপ।

১৮০৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ান টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন রামমোহন। কর্মব্যপদেশে তিনি যান ঢাকা-জালালপুর (অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর)। সেখানে ২ বছর থেকে তিনি জন্মস্থান হুগলি জেলার খানাকুল ঘুরে চলে যান মুর্শিদাবাদ। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪-র জুলাই মাস পর্যন্ত জন ডিগবির দেওয়ান-রূপে তিনি থাকেন রংপুরে। ডিগবির কাছেই রামমোহন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের রসাস্বাদন করেন। ১৮১৫ সালে কলকাতায় তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'আত্মীয়সভা'—ভারতে দেশীয়দের উদ্যোগে গঠিত প্রথম সভা বা সমিতি। ঐবছর থেকেই তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করলেন।

রামমোহন কলকাতায় থাকাকালীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—ভারতীয় ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশ। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে সাময়িক (মাসিক) পত্র হিসাবে 'দিগদর্শন'-এর আবির্ভাব। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' বাংলা ভাষাতেই নয়, যেকোন ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র। বহু ঐতিহাসিক অবশ্য 'দিগদর্শন'কে সংবাদপত্র বা সংবাদ সাময়িকের মর্যাদা দিতে চাননি।

ঐবছরই ১৫ মে ১৮১৮ প্রকাশিত হয় বাঙলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গাল গেজেট'। এর সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। হরচন্দ্র রায়ের ৪৫নং চোরাবাগান স্ট্রিটে অবস্থিত 'বেঙ্গলী প্রিণ্টিং প্রেস' থেকে তা ছাপা হতো। 'বঙ্গাল গেজেট'ই ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র—এমন কথাও বহু গবেষক মনে করেন। একইসঙ্গে ভারতীয় সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র হিসাবেও এর নাম করা যায়।

১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই মুদ্রণব্যবস্থা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা এদেশে অনেকটা ভিত্তি পেয়েছে। অবশ্য সংবাদপত্র বলতে তখন সবই ইংরেজি ভাষায়, অর্থাৎ ইংরেজি-জানা মহলেই তার প্রচার। এর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা স্বভাবতই ছিল হাতে গোনা।

প্রচারক রামমোহনকে আমরা পাই 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠার এক দশক আগে। আরবি-ফারসি ভাষায় ছাপা রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮০৩-১৮০৪ সালে। তিনি সেইসময় মুর্শিদাবাদে। একেশ্বরবাদী এই গ্রন্থের নাম 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদীন'।

১৮১৫ সালে কলকাতায় 'ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানি' প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় রামমোহনের লেখা ১৮৩ পৃষ্ঠার 'বেদান্ত গ্রন্থ'। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা পল ফেরিস ছাপার কাজ শিখেছিলেন হিকির প্রেসে। আবার এই প্রেসেই কাজ করতেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—যিনি ছিলেন 'বঙ্গাল গেজেট'-এর প্রকাশক।

বেদান্ত বিষয়ে রামমোহন আরো ৮টি বই রচনা করেন ১৮১৮ সালের মধ্যেই। এরপর তাঁকে আমরা পাই সতীদাহ প্রথাবিরোধী ভূমিকায়। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের ৬ মাস পর ১৮১৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় তাঁর ২২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা—'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। এর ঠিক ১ বছর পর মিশন প্রেস থেকে ছেপে বেরোয় ৩৩ পৃষ্ঠার 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। সতীদাহ নিয়ে রামমোহনের ১১ পৃষ্ঠার তৃতীয় পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয়' প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সালে। সেই বছরই সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়। অর্থাৎ সংস্কারকের ভূমিকায় রামমোহনকে পাওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রণব্যবস্থার অবদান অনস্বীকার্য।

১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা জার্ণাল'। সম্পাদক ছিলেন জেমস সিল্ক বাকিংহাম (১৭৮৬-১৮৫৫)। প্রথমে এটি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হিসাবে। ১৮১৯ সালের ২ জুলাই থেকে তা দৈনিকে পরিণত হয়। বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের গড়ে ওঠে গভীর মিত্রতা। হাতে-কলমে সাংবাদিকতায় বাকিংহামের প্রভাব পড়েছিল রামমোহনের ওপর—একথা ধরে নিলে সম্ভবত ভুল হয় না।

'ক্যালকাটা জার্ণাল'-এ রামমোহন নিজে কিছু লিখেছিলেন—এমন তথ্য আমাদের কাছে না থাকলেও তাঁর সম্পর্কে ঐ পত্রিকায় নিয়মিত লেখা হতো। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতেও রামমোহন প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। বিশেষ করে তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী ও একেশ্বরবাদী মতামত মিশনারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'দর্পণ'-এ যেমন ১৮১৮-র ২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় ছোট একটি সংবাদ দেখা যায়—"সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"[১]

তবে 'দর্পণ'-এর সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাদর্শনের মৌলিক পার্থক্য ছিলই। খ্রিস্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে রামমোহন সরব হন। এতে মিশনারিরা ক্ষুব্ধ হন। আর বাস্তবেও 'দর্পণ'-এর সঙ্গে মতপার্থক্যের সূত্র ধরেই রামমোহন সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন।

মিশনারিদের প্রচারমূলক প্রকাশনা সেইসময় অল্পবিস্তর চলেছিল প্রায় সব সংবাদপত্রেই (ইওরোপীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র)। অনেকসময় 'দর্পণ'-এ নানা চিঠিপত্র ছাপা হতো, যা আসলে 'দর্পণ'-পরিচালকদেরই মতানুসারী। ১৮২১ সালের ১৪ জুলাই 'দর্পণ'-এ একটি বেনামি চিঠি প্রকাশিত হয়। 'দর্পণ'-কর্তৃপক্ষ ঐ চিঠি ছাপার সঙ্গেই একটি পৃথক মন্তব্য ছাপিয়ে চিঠির বক্তব্যের ওপর বিতর্ক আহ্বান করেন। সেখানে বলা হয়—"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে উহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপানো গেল। ইহার সদুত্তর যেকেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।"[২]

'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত সেই চিঠি এবং তারপর এই নোট দেখে জবাবি চিঠি পাঠান রামমোহন। অবশ্য নিজের নামে নয়। 'শিবপ্রসাদ শর্ম্ম' ছদ্মনামে। কিন্তু তাঁর সেই চিঠি 'দর্পণ'-কর্তৃপক্ষ ছাপেননি। কেন তাঁর চিঠি ছাপা হলো না, তার যুক্তি হিসাবে ১৮২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ'-এ লেখা হয়—"শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্র পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ [illegible] করিয়া কেবল ষড়্দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্বসমেত অসমগ্র ছাপাইবার বাসনা করেন তাহাতে হানি নাই।"[৩]

॥৩॥

রামমোহন এই শর্ত মানলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেই কাগজ বের করবেন। সেপ্টেম্বর মাসেই নিজের পত্রিকা প্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর পত্রিকা ছিল মাসিক। দ্বিভাষিক এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠায় বাঙলা, অন্য পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত। ইংরেজিতে এই পত্রিকার নাম ছিল 'The Brahmunical Magazine—The Missionary and The Brahmin'। বাঙলা নাম—'ব্রাহ্মণ সেবধি; ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ'। রামমোহন 'Magazine' শব্দের অর্থ করেছেন 'সেবধি'। 'সেবধি' শব্দের আভিধানিক অর্থ (সংসদ বাঙলা অভিধানে) 'ঐশ্বর্য' বা 'গচ্ছিত ধন'। মনু বলেছেন—'বিদ্যা ব্রাহ্মণের সেবধি'।

'সেবধি' প্রকাশের উদ্দেশ্য রামমোহন প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছেনঃ "শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষাচরণ করেন না ও আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিস্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।... বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ

অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্র লোকে ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না।"[৪]

এই লেখা থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়টি রামমোহনের কাছে যতটা না খ্রিস্টধর্ম বনাম হিন্দুধর্মের বিবাদ ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল এদেশীয়দের ধর্মাচরণে 'বিজয়ী' খ্রিস্টানদের হস্তক্ষেপ। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়তাবোধই রামমোহনকে বেশি চালিত করেছিল। তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তকরণের। ১৮২১ সালে এই পত্রিকার মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যা 'Brahmunical Magazine' শুধু ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।

রামমোহন বেশিদিন এই পত্রিকাটি কেন চালাতে পারেননি বা চালাননি, তা বলা শক্ত। তবে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আরেকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন। সেই পত্রিকার নাম 'সম্বাদ কৌমুদী'। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮)। সংসদ বাঙলা অভিধানের মতে, শব্দের শেষে 'কৌমুদী' শব্দের ব্যবহার হলে তার অর্থ 'আলোকদায়িনী ব্যাখ্যা'। অর্থাৎ সংবাদের আলোকদায়িনী ব্যাখ্যা। 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেছিলেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গাল গেজেট'-এর পর 'কৌমুদী'ই বাঙালি সম্পাদিত ও বাঙালি পরিচালিত সংবাদপত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন, 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পাদন ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।"[৫]

প্রথম থেকেই পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার শিরোভাগে লেখা থাকত—

"দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটাস্থিতং
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ।"[৬]

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আরো জানানো হয়— "ধর্মনীতি ও রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এককথায় লোকহিত সাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।"[৭]

'কৌমুদী'র দ্বিতীয় সংখ্যাতেই 'দেশীয় লোকদের জন্য সংবাদপত্রের উপকারিতা' বিষয়ে একটি লেখা ছাপা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এখনো পর্যন্ত 'সংবাদ কৌমুদী'র কোন 'ফাইল' পাওয়া যায়নি। 'ক্যালকাটা জার্ণাল', 'এশিয়াটিক জার্ণাল'-এর মতো সমকালীন ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে 'কৌমুদী'র 'কভারেজ' সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন এইসব বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল 'কৌমুদী'তে—(১) দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানিয়ে, (২) নারীশিক্ষার উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে, (৩) আদালতে জুরি প্রথা চালু করার আর্জি নিয়ে, (৪) হিন্দুদের জন্য নদীতীরে একটিমাত্র শ্মশান থাকার জন্য অসুবিধা অথচ খ্রিস্টানদের কবরের জন্য বিশাল জমি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে, (৫) কুলীন প্রথার সমালোচনা করে এবং (৬) প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রসারের পক্ষে আবেদন জানিয়ে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল 'কৌমুদী'। প্রসঙ্গত, সম্পাদক হরিহর দত্ত সতীদাহর বিরুদ্ধে 'কৌমুদী'তে লেখার প্রতিবাদেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' ছেড়ে দেন। এরপর ভবানীচরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ভবানীচরণ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ১৮২২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ 'কৌমুদী' বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২৩ সালে পুনঃপ্রকাশের পর প্রায় ১০ বছর যাবৎ তা প্রকাশিত হয়। 'কৌমুদী'র মূল কপি পাওয়া যায়নি, তাই এখানে রামমোহনের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা পাই না। তবে দেখা যাচ্ছে, 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের ৯৮ দিনের মাথায় ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল রামমোহন প্রকাশ করেন একটি ফারসি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার', যার বাঙলা অর্থ 'সংবাদ দর্পণ'। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল জন অ্যাডামের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণবিধির প্রতিবাদে এই পত্রিকা রামমোহন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল। অর্থাৎ 'মীরাৎ' প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় একবছর।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' পত্রিকারও কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন 'ক্যালকাটা জার্ণাল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় ইংরেজিতে অনূদিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখান থেকে জানা যায়, মাছের আচরণ, চুম্বকের ধর্ম, বেলুনের বিবরণ, শব্দবিজ্ঞান, বাঙলা ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন 'মীরাৎ'-এ প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার ১৮২২ সালের আগস্টের একটি সংখ্যায় রামমোহন খ্রিস্টধর্মের ত্রিতত্ত্ববাদ (Trinity) নিয়ে সমালোচনামূলক একটি লেখা লেখেন, যা তাঁর একেশ্বরবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' বন্ধ করে দেওয়ার পর প্রায় বছর ছয়েক আর কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে রামমোহনকে যুক্ত

থাকতে দেখা যায় না। তিনি এই সময় একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে রবার্ট মণ্টোগোমারি মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও রাজকিষেণ সিংয়ের সঙ্গে তিনি 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন। এর মধ্যে মার্টিন ছিলেন প্রধান স্বত্বাধিকারী বা 'Principal Proprietor'। এই 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এরই বাঙলা ভাষায় 'সহচর' পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত'।

রামমোহন অবশ্য স্বল্পসময় (মাত্র ৯৩ দিন) 'হেরাল্ড'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গদূত' পত্রিকা চলেছিল বেশ কিছুদিন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'বঙ্গদূত' প্রেস থেকেই ১৮৩১ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা 'রিফর্মার'। আর সেবছরই ৮ এপ্রিল রামমোহন ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যান।

॥৪॥

আমরা দেখতে পাই, কলকাতায় জীবনের শেষ ৯ বছরে মোট ৫টি কাগজের সঙ্গে রামমোহন যুক্ত ছিলেন। মুদ্রণ-সংস্কৃতি তথা সাংবাদিকতা থেকে পৃথগ্‌ভাবে রামমোহন-মানসকে চিন্তা করা যায় না। তিনিই সর্বপ্রথম সাংবাদিকতা ও প্রকাশনাকে সামাজিক পরিধিতে জনমত সংগঠনে প্রয়োগ করেছিলেন।

সেই যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে রামমোহন-বিরোধিতায় কাগজের অভাব ছিল না। 'সমাচার দর্পণ', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সম্বাদ তিমিরনাশক' ইত্যাদি কাগজের সঙ্গে রামমোহনের মতাদর্শগত সঙ্ঘাত এই দেশে সাংবাদিকতাকে জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে, তাকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিপক্ষ সংবাদপত্রের সমালোচনার জবাবে শুধু সংবাদপত্রে নয়, পুস্তিকাকেও রামমোহন হাতিয়ার করেছেন। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম-সংক্রান্ত বিতর্কে রামমোহন একাধিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এমন কয়েকটি পুস্তিকার নাম—'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'গুরুপাদুকা', 'পথ্যপ্রদান' ইত্যাদি।

সাংবাদিকতায় রামমোহনের ভূমিকা সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকায়। লক্ষণীয় বিষয়, এই দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রথম থেকেই ছিল পাদপ্রদীপে। হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট'-এর প্রতি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় লিখতেন : "A weekly political and commercial paper open to all parties, but influenced by none." এই 'influenced by none'-এর মধ্যেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর জোর দেওয়ার মনোভাব স্পষ্ট। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির আমলে (১৭৯৮-১৮০৫) প্রথম আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে, যদিও তার বহু আগেই হিকি ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে অসম লড়াইয়ে পরাজিত হন। তাঁর প্রেস নীলামে বিক্রি হয়ে যায়, জেল-জরিমানা ভোগ করে অবশেষে হিকি সর্বস্বান্ত হন।

লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ সালে 'প্রাক্ মুদ্রণ সেন্সরশিপ' চালু করেন। নির্দেশে বলা হয়—প্রতিটি সংবাদপত্রে মুদ্রক, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম জানাতে হবে। আর নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তি—অবিলম্বে ইওরোপে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়টি হলো—কোম্পানি কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য এদেশে আগত ইওরোপীয়রা। কারণ, তখনো ভারতীয় কোন প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন না।

গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস (মারকুইস অফ হেস্টিংস —১৮১৩-১৮২৩)-এর আমলে সেন্সার তুলে নেওয়া হয়। এজন্য তিনি এদেশে এক মহলে প্রশংসিত হন। ২৬ মে [illegible] মাদ্রাজে স্থানীয় ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশকরা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। ১৮২৩ সালের ৯ জানুয়ারি হেস্টিংস ভারত ছাড়েন। তাঁর স্থানে গভর্ণর জেনারেল-পদে অস্থায়িভাবে আসেন জন অ্যাডাম। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন জারির প্রক্রিয়া [illegible] দ্রুততর হয়। অ্যাডাম-প্রশাসন প্রথমেই ব্যবস্থা নেন রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামের বিরুদ্ধে। বাকিংহাম ১৮২৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে সরকারি-পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সমালোচনা করেন। এর চারদিন পর (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩) মুখ্যসচিব বেইলি এক নির্দেশে বাকিংহামকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেন। বাকিংহাম ১ মার্চ ভারত ত্যাগ করেন ও জুন মাসে (১৮২৩) ইংল্যাণ্ডে পৌঁছান। 'ক্যালকাটা জার্ণাল'-এর সহ-সম্পাদক স্যানফোর্ড আর্ণট কাগজ চালালেন কয়েকদিন, কিন্তু তাঁকেও শেষে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে তুলে দেওয়া হয় এবং চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় 'ক্যালকাটা জার্ণাল'। ইতোমধ্যে কিন্তু ২১ আগস্ট ১৮২৩ অ্যাডামের পরিবর্তে গভর্ণর জেনারেল-পদে যোগ দিয়েছেন লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-১৮২৬)।

তবে তার আগেই জন অ্যাডাম ১৮২৩-এর ১৪ মার্চ সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয়, গভর্ণর জেনারেল পরিষদের কাছ থেকে পাওয়া লাইসেন্স ছাড়া কেউ কোন পত্রিকা প্রকাশ করতে পারবেন না। লাইসেন্সের জন্য লিখিত আবেদনপত্র মুখ্যসচিবের মাধ্যমে আসতে হবে। যেকোন লাইসেন্স বাতিলের অধিকার গভর্ণর জেনারেলের থাকবে। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী অর্ডিন্যান্সটি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা

হয় ১৫ মার্চ এবং তা কার্যকরী হয় ৫ এপ্রিল (১৮২৩) থেকে। প্রচণ্ড দমনমূলক এই অর্ডিন্যান্স 'অ্যাডামস গ্যাগ' বা 'অ্যাডামের কণ্ঠরোধকারী আইন' নামে কুখ্যাত হয়।

রামমোহনের জীবদ্দশায় এই আইনের বদল হয়নি, এমনকি বেণ্টিঙ্কের আমলেও নয়। শেষপর্যন্ত আরেক অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল লর্ড থিওফিলাস মেটকাফ ১৮৩৫ সালে প্রেস নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহার করে নেন। মেটকাফের এই উদারতার জন্য তাঁর প্রতি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কলকাতায় গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর একটি বিশাল সুদৃশ্য সভাগৃহকে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। সেটি আজও রয়েছে।

॥৫॥

জন অ্যাডাম ক্ষমতায় আসার পরে ১৮২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে বাকিংহাম ও 'ক্যালকাটা জার্ণাল'-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি রামমোহনকে সক্রিয় করে তোলে। অ্যাডামের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা থেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রামমোহনের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়—

(ক) ১৭ মার্চ ১৮২৩ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা স্মারকলিপি। এতে স্বাক্ষর করেছিলেন রামমোহন স্বয়ং ছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জি এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। স্মারকলিপির খসড়া লেখেন রামমোহন স্বয়ং।

(খ) অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'-এর শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল ১৮২৩) রামমোহনের লেখা দুটি সম্পাদকীয়।

(গ) অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে ব্রিটেনের রাজার কাছে রামমোহনের পাঠানো স্মারকলিপি।

কেন চাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা? এসম্পর্কে রামমোহনের পেশ করা মূল সূত্রগুলি ছিল (সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা স্মারকলিপি)—

"Ever since the art of printing has become generally known among the natives of Calcutta, numerous publications have been circulated in the Bengalee language; which introducing free discussion among the natives and inducing them to reflect and inquire after knowledge, have already served greatly to improve their minds and ameliorate their condition."[৮]

"Every good ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be concious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire, and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained liberty of publication, is the only effectual means that can be employed."[৯]

রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'-এর শেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ফারসি কবিতা উদ্ধৃত করেন—

"আব্রু কে বা-সদ খুন ই জিগর বস্ত্ দিহদ্
বা উমেদ্-ই করম-এ খাজা, বা দারবান মাফরোশ।।"

—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।[১০]

রামমোহনের এই মনোভাব ও লেখনীর মধ্যে রয়েছে, বলা যায়, সুগভীর মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ এবং যুক্তি ও শুভকামনা নিয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে প্রভাবিত করেছেন।

রামমোহন-পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ এবং আরো অনেক পরে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে যে-চেতনার অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করি, তার উৎস রামমোহনের মধ্যেই খুঁজে পাই।

তাই ভারতীয় সাংবাদিকতায় নতুন যুগের নতুন ভাবনার নান্দীকার রামমোহন—একথা সত্য। ❑

১ সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা—হরিপদ ভৌমিক সঙ্কলিত, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩
২ বাঙলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ—ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মণ্ডল এণ্ড সন্স, ১৯৮৮, পৃঃ ৩২
৩ ঐ, পৃঃ ৩৩
৪ বাঙলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৭)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৬, পৃঃ ২৩
৫ ঐ, পৃঃ ২৫
৬ ঐ
৭ ঐ
৮ A History of Indian Journalism—Mohit Moitra, National Book Agency, 1969, p. 169
৯ Ibid., p. 172
১০ বাঙলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৭), পৃঃ ৩৭

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

টুকরো স্মৃতি ঃ মহাতীর্থ বেলুড় মঠে

সালটা সম্ভবত ১৯৪৭। স্বামী মাধবানন্দজীর তখন ভয়ানক অসুখ। একজিমা হয়েছে। তাঁকে কলাপাতায় শোয়াতে হয়। তখন বাজারে পেনিসিলিন বেরিয়েছে। আমার ডাক্তারী বিদ্যা, ফস্ করে বলে ফেললাম ঃ "মহারাজ, পেনিসিলিন দিলে কেমন হয়?" মহারাজ হেসে বললেন ঃ "রাখ তোমার পেনিসিলিন। আগে দেখ না পেনিসিলিনে রোগ সারে কিনা। কতদূর কি হয়।"

কিছুদিন পরে দেখলাম, মহারাজ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন। সিঁড়িতে পা দিয়েই তাঁর মাথাটা একটু টলে গেল। সঙ্গের ব্রহ্মচারীটি দুহাত বাড়িয়ে পিছন থেকে তাঁকে ধরে ফেললেন। ধরতেই উনি বললেন ঃ "ফাজলামী করো না।"

ঐ ঘটনার তিন-চার বছর পর স্বামী প্রেমেশানন্দ আমাকে বেলুড় মঠে পাঠিয়েছেন। আগেই তিনি চিঠিতে আমার ব্যাপারে স্বামী মাধবানন্দকে জানিয়েছেন। আমি মাধবানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই তিনি বললেন ঃ "তুমি এরকম কর কেন?" আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আমি একজায়গায় বেশিদিন থাকতে পারি না।" উনি বললেন ঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতে আর কি হয়েছে। আমাদের ৬৬টা রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি তাতে এক এক জায়গায় ৬ মাস করে থাকলে তোমার জীবন চলে যাবে। এখন বল, তুমি মায়াবতীতে থাকবে, না কনখলে ফিরে যাবে?" আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আমি কনখলেই ফিরে যাব।"

শ্রীশ্রীমা স্বামী মাধবানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাতির দাঁত এমনিতেই মূল্যবান, সোনা দিয়ে বাঁধালে আরো মূল্যবান হলো। সাধুর সাধু। এই ছেলেটি কবি হবে। কবি মানে জ্ঞানী।" মায়ের কথা যে কতখানি ধ্রুবসত্য, তা পরবর্তী কালের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

আরেকটি কথা নামজপ। শত কাজের মধ্যেও মাধবানন্দজী নামজপের সময় করে নিতেন। এরকম জপ করতে আর কাউকে দেখিনি। জপের মালার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান ছিল। তিনি শেষসময়ে শুয়ে শুয়েও মালাজপ করতেন। একবার মহারাজ রাত্রিবেলা চৌকিতে ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ চৌকি ভেঙে গেলে মহারাজ নিচে পড়ে যান। শব্দ হতেই তাঁর সেবকরা দৌড়ে গিয়ে দেখেন, তিনি জপ করে চলেছেন—মেঝেতে পড়েও। পরে দেখা গেল, তাঁর হাত ভেঙে গেছে। এমনি তাঁর জপ করা! জপ তো আমরাও করি। কিন্তু আমাদের এরকম কখনো হয় না।

একদিন মাধবানন্দজী বেলুড় মঠে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেছেন। আমরা কজন আগেই ঠাকুরমন্দিরে গিয়ে প্রণাম করছিলাম। হঠাৎ পিছন ঘুরে দেখি মহারাজ। আমরা ইঙ্গিতে সকলকে বললাম ঃ "সরে যান, মহারাজ এসেছেন।" তিনি বললেন ঃ "সে কি কথা, তোমরা প্রাণভরে দেখ। আমি এসেছি বলে ব্যস্ত হবে না।" কিছুক্ষণ পরে মহারাজ চলে গেলেন। আমরা পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। আমাদের মধ্যে একজন শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মহারাজ বললেন ঃ "বেশিক্ষণ প্রণাম করতে হয় তো ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম কর। অনেক জায়গা। ইচ্ছামতো প্রণাম কর। কেউ বাধা দেবে না।"

একবার মহারাজকে প্রণামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, সহসা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"সূর্য কি করছে? ও মন্ত্র দেয় না কেন? ব্রহ্মানন্দ স্বামী তো ওকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছেন।"

একদিন প্রত্যুষে বেলুড় মঠে গিয়েছি। আকাশ লাল হয়েছে। সূর্য তখনো ওঠেনি। রাজা মহারাজের মন্দিরে ঢুকেছি। প্রণাম করে বাইরে আসতেই একজন সাধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হ্যাঁ মশাই, সূর্য মহারাজকে কীর্তনের দল নিয়ে যেতে দেখেছেন? দল কোন্‌দিকে গেল?" আমি বললাম ঃ "ঠাকুরের মন্দিরের দিকে গেছেন।"

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা, ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখব। শুনেছিলাম, ওগুলি দোতলার ঘরে থাকে। একজন বলল ঃ "আপনি সূর্য মহারাজকে ধরুন।" আমি সেইমতো সূর্য মহারাজকে ধরে বললাম ঃ "আমি ঠাকুরের ব্যবহার করা জিনিস দেখতে চাই।" তিনি বললেন ঃ "কাল সকালে গঙ্গায় স্নান করে আমার কাছে আসবে। আমি তোমাকে ওপরে পাঠিয়ে দেব। একজন লোকের সঙ্গে ওপরে গিয়ে দেখবে।" পরদিন গঙ্গাস্নান করে আমি তাঁর কথামতো ওপরে গেলাম এবং দেখলাম। কিন্তু কি দেখেছিলাম এখন আর কিছু মনে পড়ে না। অনেকদিনের কথা, প্রায় ৫৭ বছর হয়ে গেল।

আরেকদিন কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে কীর্তনের দলের সঙ্গে গাইতে গাইতে আমতলা দিয়ে যাচ্ছি। সূর্য মহারাজ দোতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আমাদের ওপর অগুরু ঢালতে লাগলেন।

একবার সূর্য মহারাজকে প্রণাম করার জন্য স্বামীজীর বাড়ির দোতলায় উঠেছি। হঠাৎ মনে পড়ল, সূর্য মহারাজ তো ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। আমি ভাবতে ভাবতে গিয়ে পৌঁছেছি তাঁর চরণপ্রান্তে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বললেন ঃ "তোদের এই জ্ঞান দিয়ে কি হবে? কি লাভ? এখনি দিলে রাখতে পারবি না।" আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ডাঃ গৌরচন্দ্র পোদ্দার

কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৭০০ ০৮৯

একটি মূল্যবান রচনা

এবছর 'উদ্বোধন' পত্রিকার চৈত্র থেকে ভাদ্র পর পর ছয়টি সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'প্রসঙ্গ ঃ ভাবপ্রচার ও সংগঠন' প্রকাশিত হয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় এই নিবন্ধগুলির জন্য একজন গ্রামকর্মী হিসাবে সম্পাদক মহারাজকে অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। নিবন্ধগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব অনুসরণ করে কাজের তাত্ত্বিক দিকটি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বাস করি, সংগঠন কর্মীরা এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব নিয়ে নানা জায়গায় বহু প্রতিষ্ঠান সাধ্যমতো কাজ করছে। ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গেও বহু প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং আরো হবে। সেটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তত্ত্বকে কাজে রূপ দিতে গিয়ে নানা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ভাবধারা ও তার যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে সংগঠন-কর্মীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও ঘটছে। পরিণামে ক্ষতি হচ্ছে সংগঠনের। কর্মীদের মনেও নানা জিজ্ঞাসা থাকে, সংশয় থাকে। এইসকল সংশয় ও জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্য প্রতি মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকলে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার সংগঠন-কর্মী বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের কাছে বিনীত আবেদন জানাই।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী
গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৫২

শবাসন করার সহজ উপায়

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৯ সংখ্যার 'স্বাস্থ্য' বিভাগে 'শবাসন কী ও কেন?' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এবিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করার উদ্দেশেই এই চিঠির অবতারণা। শবাসন আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ দৈহিক অবস্থান বলে মনে হলেও কার্যত তা নয়। যোগাসনসমূহের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা জটিল এবং আয়াসসাধ্য আসন। শবাসনে মৃতের মতো নিষ্পন্দভাবে শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়, তাই এর মধ্যে কোন জটিলতা বা আয়াসসাধ্য ব্যাপার থাকা অলীক কষ্টকল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি কঠিনই। শবাসনে সঠিকভাবে স্থিতিলাভ করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক অবসাদ কাটিয়ে নতুন কর্মোদ্যম ও সতেজতা লাভ করা যায়—একথার মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। এটি পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু কি উপায়ে শবাসনে সঠিকভাবে স্থিতিলাভ করা যায়—সেটিই শিক্ষার্থীদের নিকট একটি সমস্যা। অধিকাংশ যোগাসনের বইয়ে এবিষয়ে যে-নির্দেশিকা পাওয়া যায়, তা নিতান্তই ভাসাভাসা এবং অভ্যাসকারীদের পক্ষে অনুসরণ করার মতো সুস্পষ্ট নয়। যেমন বলা হয়, চিৎ হয়ে শুয়ে মনকে সর্বপ্রকার চিন্তা ও উদ্বেগশূন্য করা, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল করা, শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর কোন কর্তৃত্ব না রাখা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির কোনটিই কি সহজসাধ্য? চুপচাপ মৃতের মতো শুয়ে থাকলে আংশিক বিশ্রাম হতে পারে, কিন্তু তা শবাসনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্রামের সমতুল হতে পারে না। মনকে চিন্তাশূন্য করা, শরীরকে শিথিল করা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর কর্তৃত্ব না রাখা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা ঠিক ততই কঠিন। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কিভাবে শিথিল করতে হয়, কিভাবে শবের মতো অবস্থা লাভ করা যায়—এব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কলাকৌশলের কথা কোন যোগাসনের বইয়ে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ এজাতীয় সুনির্দিষ্ট কলাকৌশল জানা থাকলে তা অবলম্বন করে শবাসন অভ্যাস করা ও তার সুফললাভ সহজ হয়। আমার নিজ অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত একটি পদ্ধতির কথা 'উদ্বোধন'-এর পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি। আমার বিশ্বাস, যেকেউ এই কৌশল অবলম্বন করে শবাসনের মাধ্যমে শরীর ও মনকে ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

প্রথম স্তর ঃ চিৎ হয়ে শুয়ে হাতদুটি শরীরের পাশে রাখতে হবে। হাতের চেটো ওপরের দিকে থাকবে। কোনরকম টানটান ভাব রাখা চলবে না। এই অবস্থায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর দিতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসকে কোনভাবে প্রভাবিত না করে যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, তার প্রতি কেবল মনোযোগী হতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে—শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে ছন্দ বা সঙ্গতি আছে কিনা, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত না অনিয়মিতভাবে চলছে। কিছুক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হলে বোঝা যাবে, শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসগ্রহণ—এই দুইয়ে মিলে একটি চক্র রচনা করছে। যে-প্রাণবায়ুর রেচন বা নিষ্ক্রমণ ঘটছে, সেই প্রাণবায়ুরই প্রবাহ যেন দেহের অভ্যন্তরে পূরকের মাধ্যমে প্রবেশ করছে। রেচক ও পূরকের দিকে নজর রেখে এরকম কল্পনা করলে উল্লিখিত শ্বাসচক্র বা 'breathing cycle' সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। আর এসম্পর্কে সচেতনতা এলেই শ্বাসপ্রশ্বাসে শৃঙ্খলা এসে যাবে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রক্রিয়া এর পর শুরু করতে হবে। শ্বাস-গ্রহণে যতটুকু সময় স্বাভাবিকভাবে লাগে, এই পর্যায়ে সেই সময়কে দীর্ঘায়িত করতে হবে। তবে শ্বাসত্যাগ ধীরে ধীরে বেশিসময় ধরে করতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন হাঁফ না ধরে। স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ কোনরকম কষ্ট অনুভব না করে যতটুকু প্রলম্বিত করা যায় তাই করতে হবে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের সময়ের অনুপাত হওয়া উচিত ১ ঃ ২। এই হারই হলো শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থা। কোন অবস্থাতেই শ্বাসত্যাগের মাত্রাকে বেশি দীর্ঘায়ত করা চলবে না, যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক প্রবাহ গুণগতভাবে বদলে যায়। অর্থাৎ খুব বেশি সময় ধরে, সাধ্যের অতিরিক্তভাবে শ্বাসত্যাগ করলে শ্বাসগ্রহণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং গভীরভাবে ঘটবে। এটি কাম্য নয়। যাই হোক, শবাসনের পক্ষে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এইভাবে শ্বাসত্যাগ করার পর দু-এক সেকেণ্ডের জন্য শ্বাসগ্রহণ বন্ধ রাখতে হয় অর্থাৎ দু-এক সেকেণ্ডের জন্য বাহ্য

কুম্ভকাবস্থা অবলম্বন করতে হয়। তবে এর জন্য সচেতন প্রয়াসের দরকার নেই—ব্যাপারটি অত্যন্ত সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে, শুধু অভ্যাসকারীকে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হতে হয়।

শবাসনের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত স্তরের শুরু ঠিক এর পরেই। দ্বিতীয় স্তরের প্রক্রিয়া অভ্যাসকালেই বোঝা যায়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনা-আপনি শিথিল ও চাপমুক্ত হতে শুরু করেছে। এই স্তরে শ্বাসপ্রশ্বাসের উৎসস্থল অথবা নাভিমূলের ওঠানামার প্রতি মনোযোগী হতে হয় এবং সেইসঙ্গে শরীরের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের বা যার ওপর শবাসন করা হয়েছে, তার সংযোগ অনুভব করতে হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভূতলের সঙ্গে শরীরের পিছনদিকের সংযোগ অনুভব করতে করতেই ভূতলের ওপর সারা শরীরের ভার বা ওজনের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়।

এরপর ধাপে ধাপে পায়ের পাতা থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে কোমর এবং পাশে থাকা উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত, তারপর কোমর ও কনুই থেকে স্তনগ্রন্থি ও উভয় বগল, বগল থেকে উভয় স্কন্ধ অতিক্রম করে গলা পর্যন্ত এবং শেষে চোখ, কান, সারা মুখমণ্ডল ও মস্তকের ওপর মনোনিবেশ করতে হয়।

এভাবে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক অঙ্গে খানিকক্ষণ মনোনিবেশ করলে প্রত্যেকটি অংশই শিথিল হয়ে পড়ে এবং তা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এই মনোযোগ ও শিথিলকরণের প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার একই ক্রম অনুসারে করে যেতে হয়। কমপক্ষে অন্তত ৪-৫ বার। এই পুরো প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হলে স্বস্তি ও আরাম অনুভব হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘুম এসে যায়, কিন্তু ঘুমানো উচিত নয়। কারণ শবাসন নিদ্রিতাবস্থা নয়। যতগুলি স্তরের কথা উল্লেখ করা হলো, সবক্ষেত্রে শরীর থাকবে নিশ্চল। হাতের চেটো ওপরের দিকে রাখার কথা বলা হলেও সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বাভিমুখী থাকে না। খানিকটা পার্শ্বাভিমুখী হয়। আর শবাসনের প্রক্রিয়া সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে গেলে শোওয়া অবস্থায় পাশ ফিরে, উপুড় হয়ে অথবা চেয়ারে বসেও শরীরকে শিথিল করে শবাসনের সুফল লাভ করা যায়। তবে মনে রাখা দরকার, প্রথমে কথিত অবস্থানটিই শবাসনের পক্ষে আদর্শ অবস্থান।

সমরীকান্ত সামন্ত
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৫০৭

শব্দচেতনা ২৯

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

পাশাপাশি : (১) স্বামীজী যাঁকে 'গ্যাঞ্জেস' বলে ডাকতেন (৪) শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজনে যে-দূষণের কথা বলা হয়েছে (৫) প্রবল সত্ত্বগুণীকেও এই প্রকৃতির বলে কখনো ভ্রম হয় (৬) —— তব জনমে জনমে দয়ানিধে (বীরবাণী) (৭) প্রেমানন্দ রসে হও রে —— (কথামৃতের গান) (১১) যে-তীর্থ দর্শন করে স্বামীজী 'Kali the mother' কবিতাটি লিখেছিলেন (১২) রমতা সাধু, বহতা —— (১৫) ভগবানলাভের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এটি ত্যাগ করতে বলেছেন (১৭) শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্টীমারে এই সাহেবও ছিলেন (১৮) যিনি বলেছিলেন : "স্বামীজীর পরিচয়পত্র চাওয়ার অর্থ হলো সূর্যকে প্রশ্ন করা—তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা।"

ওপর-নিচ : (১) তোতাপুরীর কাছে যে-মতে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন করেছিলেন (২) চিত্তের জড়তা ঘুচি —— জীবন (বীরবাণী) (৩) শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের যে-হলে ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হয় (৪) গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে —— ত্রিশূল রাজে (বীরবাণী) (৭) ভক্ত এটি হতে চায় না, খেতে চায় (৮) আয় ——, বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরুমূলে রে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি (কথামৃতের গান) (৯) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেমন ভাব, তেমনি —— (১০) শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রীমা (১২) 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটির রচয়িতার পদবী (১৩) পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না —— তোমা (বীরবাণী) (১৪) এই বাগানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন (১৬) এই প্রকার বৈরাগ্য সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন : "বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে।"

অরিজিৎ পাল

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মাঘ ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রার্থনামন্ত্র

সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।।

অসত্য থেকে সত্যে আমায়
নিয়ে যাও প্রভু তুমি,
অন্ধকারের গহ্বর নয়
আলো হোক মনোভূমি।।

মৃত্যুর গাঢ় শীতলতা থেকে
দাও অমৃতের পথ,
বিজয়ীর মতো যেন চলে যায়,
সে-পথে আমার রথ।।

(২)

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

জবাকুসুম কল্প তুমি যে
হে কাশ্যপ গোত্র দিবাকর,
পাপহারী দ্যুতি, আলোকের দূত,
প্রণমে তোমারে অন্তর।

(৩)

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

মর্ত্যলোক ও অন্তরিক্ষ এবং
স্বর্গ আবাসস্বরূপ
দিব্যরূপী প্রকাশমান ব্রহ্ম
যিনি অন্তিম রূপ,
সেই জ্যোতি যা আকাঙ্ক্ষিত
সর্ব অন্তঃকরণগামী,
সর্বলোকের বিনাশকারক
সেই মহাতেজ প্রণমি আমি।
সেই আদিত্যপুরুষ যেন
আমাদের বোধ এবং বুদ্ধি
করেন সঠিক মার্গে চালন,
দেন প্রকৃষ্ট হৃদয়শুদ্ধি।।

(৪)

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্,
আবিরাবীর্ম এধি,
বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা
প্রহাসীরনেনাধিতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি,
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু,
অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্,
অবতু বক্তারম্।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

বাক্য আমার মনে থাক প্রভু
বাক্যে থাকুক মনপ্রাণ,
স্বপ্রকাশিত হে প্রভু ব্রহ্ম
ও রূপের দাও সন্ধান।।

এনে দাও কাছে বেদের আলোক
না যেন ভুলি এ শ্রুতি
অধ্যয়নেই হবে প্রযুক্ত
দিনরাত্রির চ্যুতি।।

মনের মধ্যে যেমন সত্য
বাচনেও যেন থাকে,
রক্ষা করুন হে প্রভু ব্রহ্ম,
আচার্য ও আমাকে।।

শান্তির পথ যেন আকীর্ণ
হয় শান্তির জলে,
পৃথিবীতে যেন এসব সত্য
জেগে ওঠে পলে পলে।।

(৫)

মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্তোষধীঃ

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীগার্বো ভবন্তু নঃ।।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ
শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।।

মধুময় হয় মুক্ত বাতাস
সৎ আচরির প্রতি
ঝরে পড়ে মধু যেন দেহ থেকে
যা আছে স্রোতোস্বতী।।

যেন হয়ে ওঠে সব মধুময়
ঔষধি পাতাগুলি,
দিন ও রাত্রি মধুময় হোক
মধু পৃথিবীর ধূলি।।
দ্যুলোকের বুকে যে আছে পিতৃ
হোন তাঁরা মধুময়,
ধরার বাতাসে যেন জেগে ওঠে
মধু মাধুরীর জয়।।

সুমিষ্ট ফল যেন অরণ্য
দেবতারা দেন দানে,
দিবাকর যেন উদয় অস্ত
আনন্দ দেন প্রাণে।।

গাভিকুল সব দুগ্ধের ক্ষীরে
যেন দান করে সুখ,
মিত্র বরুণ সূর্য সুখদা,
আমরা তো উন্মুখ।।

দেবতার দেব ইন্দ্র জগতে
সুখ যেন দেন দানে,
পাদবিস্তারী বিষ্ণুর দয়া
যেন মঙ্গল আনে।।

প্রভু তুমি!

তপতী মিত্র

প্রভু, তুমি যে আমার
স্বামী, পুত্র, পরিবার সবই যে তোমার।
তুমি আমি একাকার
মনে-প্রাণে তবু অহঙ্কার।
দিবানিশি জপি তাই
তুমি, তুমি, তুমি যে আমার।

আমি নির্বিকল্প

অমিতাভ ভট্টাচার্য

যে আদি অনাদি বহ্নি সৃষ্টির অতীত প্রভাতে
ব্যাপিয়া অনন্ত ব্যোম বিকাশিল আপন শোভাতে
আমি এক দীপশিখা তারই। মহাবিশ্ব জুড়ে
বহিছে অমৃত স্রোত যে মধুর সুরে—
আমি সেই গান। বারবার আসিছি ঘুরিয়া
দেশ হতে দেশান্তরে গৃহ হতে গৃহতে ফিরিয়া
আমি এক অনন্য পথিক। মৃত্যুভয়হীন
অসীম যাত্রার পথে স্বতন্ত্র স্বাধীন—
অসির অসাধ্য আমি, অগ্নি মোরে দহিতে না পারে
আনন্দের সত্তা আমি যুগ হতে যুগান্তের পারে।

প্রপন্নার্তি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

এরকম কথা ছিল না।
কী কষ্টে যে কাটল এতদিন!
জল পড়ল, পাতা নড়ল, হাওয়া বইল এলোমেলো
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের আনাগোনায়
পৃথিবী মর্মরিত হলো
কত সুখদুঃখের ফুলে গাঁথা মালার সুতো
ছিঁড়ে পড়ল বারবার
কত সূর্যোদয় প্রতিফলিত করল তোমার হাসি
কত সূর্যাস্ত উদ্ভাসিত করে তুলল তোমার রক্তরাগ
পৃথিবী স্নান করল কতবার কত
শারদ পূর্ণিমায়।
এসবই পুরনো নিয়মে প্রথাসিদ্ধ রীতিতে ঘটে গেল।
শুধু আমার দেখা হলো না তোমার সঙ্গে
শুধু আমার কথা হলো না তোমার সঙ্গে
শুধু আমার চুপ করে বসে থাকা হলো না তোমার কাছে!
অথচ এরকম কথা ছিল না।
কথা ছিল না আমাকে ঐভাবে খুঁজে ফিরতে হবে তোমাকে
নদীতে অরণ্যে আকাশে মৃত্তিকায়
সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে শীতে গ্রীষ্মে
স্তব্ধ পাষাণের প্রসন্নতায়
কথা ছিল না
আমি ঘরবাড়ি বানাব
সংসারের জানলায় দরজায় ঝুলবে পর্দা
ধুলো পড়বে তোমার কাঁচে
রুদ্রাক্ষের মালায় জপের আসনে
কথা ছিল না
তুমি আমাকে ভুলে যাবে এরকম
কেউ এসে একদিন বলবে না—
আপনি কেমন আছেন? উনি জিজ্ঞেস করছিলেন।

সংগ্রাম

সৈয়দ আনিসুল আলম

তখন কে আমি তাই জানিনি
শুরু তবু সংগ্রাম।
সেদিন মা বললেন—খোকা, পা-হাত ভাঙবি?
বুকভরা উদ্যম, সে-লড়াই কত সুন্দর!
এ-লড়াইয়ে হতে হবে জয়ী
হলো কত উদ্বর্তন, কত বিলোপন।
বোবা সে তবু শক্তিমান
মানে না সহজে সে পরাজয়।
তবু তার সাথেই চলতে হবে আমার পথ।
সে-পথ পিচ্ছিল, চড়াই আর উৎরাই
যেন এভারেস্ট বিজয়!
আকাশের তারকারা হাসে।
ছিল গুহায়, এখন চাঁদের বুড়িকে ত্রাসে।
পাবে কী কোনদিন সেই বিজয়ের সিংহদ্বার,
যেখানে সাম্য, সত্য, সুন্দর
চির বসন্ত বিরাজে?

ছবি : শিখর কর্মকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, গড়বেতা হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর

ছোট্ট 'মা'!

দুর্ভিক্ষে হয়নি ধান,
দারুণ খরা দেশে;
গরিব-দুঃখী ক্ষুধার জ্বালায় মরে।
রামচন্দ্র পরম দয়াল,
চোখের জলে ভেসে—
অন্নসত্র দিলেন নিজের ঘরে।

ক্ষুধার্তেরা সারি সারি
বসছে পাতা নিয়ে,
গরম গরম খিচুড়ি হয় ঢালা।
ক্ষুধায় তাদের সহে না তর,
ফুটন্ত সেই খাবার
তুলছে মুখে সহ্য করে জ্বালা।

তালপাতার পাখা নিয়ে
ছোট্ট মেয়ে 'সারু'
দৌড়ে আসে করতে হাওয়া পাতে।
ছোট্ট হাতের পাখার হাওয়ায়
জুড়িয়ে গেল খাবার,
ক্ষুধার্তেরা তৃপ্ত হলো তাতে।

কে জান সেই স্নেহময়ী
ছোট্ট সোনা মেয়ে?
সবাই তারে চিনতে পারে না যে।
সর্বজীবের আপন মা সে,
সদাই আছেন জেগে,
তোমার আমার সবার হৃদয়-মাঝে।

ছড়া : গুণধর বর্ধন

অদ্ভুত সাধু অদ্ভুতানন্দ

বিহারের ছাপরা জেলার বাসিন্দা রাখতুরাম, ওরফে লাটু, ওরফে লেটো, ওরফে স্বামী অদ্ভুতানন্দ। ক-অক্ষর গোমাংস! কিন্তু তাঁর বুদ্ধির সামনে দাঁড়ায় কে? সবচেয়ে মজা হয়েছিল যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুর 'প্রাইভেট টিউটর' হয়েছিলেন। লাটুর পকেটে এক কপর্দক নেই। ফলে ঠাকুর 'ফ্রি'তেই 'টিউশনি' করতেন। অবশ্য সেই টিউশনি শুরুতেই বন্ধ হয়ে গেল। যখন বর্ণপরিচয় হচ্ছে, ঠাকুর বললেন : "বল্ ক।" লাটু তাঁর বিহারী উচ্চারণে বললেন : "কা।" ঠাকুর বললেন : "বল্ খ।" লাটু বলেন : "খা।" ঠাকুর যতই বলেন : "ওরে ওটা ক।" লাটু ততই বলেন : "কা।" ঠাকুর ভুরু কুঁচকে বললেন : "আরে, এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে-ক-এ আকারকে কি বলবি?" তবু লাটু কেবলই বলে "কা।" হতোদ্যম ঠাকুরের প্রাইভেট টিউশনি শেষ হয়ে গেল। বললেন : "যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।" লাটুর বিদ্যাভ্যাসের এখানেই ইতি।

পড়াশোনা নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভয় পেত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গঙ্গাচরণ গেছে স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের কাছে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল : "ভগবান কি মানুষরূপে অবতার হয়ে আসেন?" লাটু মহারাজ বললেন : "ঠিক বাত।" গঙ্গাচরণ প্রশ্ন করল : "ভগবান তো অনেক বড়। মানুষ ছোট। কি করে মানুষের ভেতরে ভগবান ঢুকবেন?" মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন : "শরৎকালে ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু দেখেছ?" গঙ্গাচরণ বলল : "হ্যাঁ।" মহারাজ বললেন : "ভাল করে দেখ, ঐ গোলাকার ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর মধ্যে গোটা আকাশ দেখা যায়। আকাশ তো কত বড়। ঐ ছোট্ট শিশিরবিন্দুর মধ্যে তা ঢুকল কি করে?"

আদি শঙ্করাচার্য ২৬

শিশু ও কিশোর বিভাগ

পরদিন—

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু
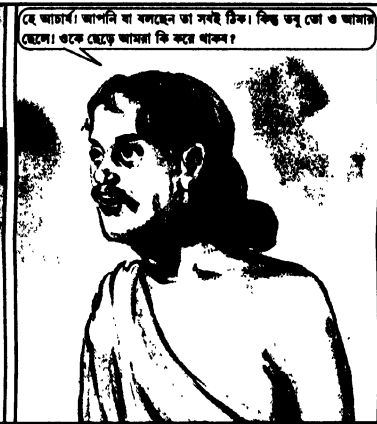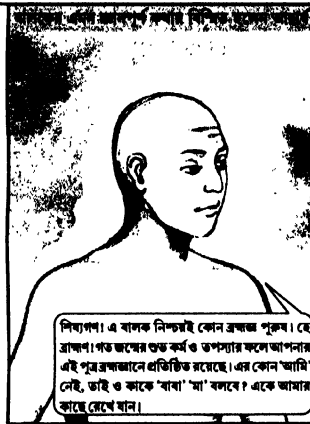
সর্পরূপা দেবী ঝঙ্কেশ্বরী

দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তার একপাশে পাশাপাশি গ্রাম মুসারু, পলসোনা, বড়পোষলা ও ছোটপোষলা। আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যহীন, আর পাঁচটি গ্রামের মতোই—ঝোপঝাড়, মাটির ঘর, খড়ের গাদা, গোয়ালঘর ইত্যাদি। কিন্তু গ্রামের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। 'ঝাঙরাইল' বা 'ঝঙ্কেশ্বরী' নামে পরিচিত গোখরো প্রজাতির সর্প এদের উপাস্য। সর্পের দেবী নন, সর্পবিশেষ এখানে পূজিত। গ্রামে তাই মনসামন্দির নেই, আছে সর্পরূপা দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর মন্দির। 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "ভারতীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্পের দেবী জাঙ্গুলী উপাসনার উল্লেখ দেখা যাইতেছে।... সাধনমালার জাঙ্গুলী যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাগুলীতে পরিণত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।" সাধনমালার জাঙ্গুলীর সঙ্গে ঝাঙরাইল নামের সৌসাদৃশ্য দেখে মনে হয়, এই নামের উৎপত্তিও জাঙ্গুলী থেকেই। তাই বলা যায়, ঝাঙরাইল উপাসনার ঐতিহ্য যথেষ্ট প্রাচীন। গ্রামবাসীদেরও তাই দাবি। ঝঙ্কেশ্বরীর কথায়-উপকথায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে পাঁচালীর ঢঙে লেখা মুরলীমোহন চক্রবর্তীর 'ঝঙ্কেশ্বরী মাহাত্ম্য' নামে পুস্তিকায়—

"নশো এগার সালে কৃষ্ণাপ্রতিপদে।
প্রথম বরিষাকালে পড়িয়া বিপদে॥"

অর্থাৎ বেহুলার অভিশাপে ঝাঙরাইল পালিয়ে এসে উপনীত হন—

"মুসারু পলসোনা দুই পোষলা গ্রামেতে।
সিকণ্ডর মইদান আর নিগনেতে॥...
তদবধি আষাঢ়ের কৃষ্ণাপ্রতিপদে।
সাধ্যমত ফুল জল দেয় তব পদে।"

সন-তারিখের কোন পাথুরে প্রমাণ নেই, কিন্তু লোকবিশ্বাসে আছে দূর অতীতের ইঙ্গিত। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আজও ঝঙ্কেশ্বরীর আবির্ভাবতিথি হিসাবে আষাঢ়ের কৃষ্ণাপ্রতিপদে সাতটি গ্রামই সর্পরূপা দেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে। দুধ-কলা, চিঁড়ে ও সন্দেশ দিয়ে সাজানো নৈবেদ্যে থাকে একটুকরো উচ্ছে। ছাগ ও হাঁসবলির প্রচলনও আছে। অধুনা সিকণ্ডর, মইদান ও নিগন—এই তিনটি গ্রাম থেকে প্রাণী ঝঙ্কেশ্বরী লুপ্ত হয়ে গেছে, বেঁচে আছে হৃদয়ে—দেবী ঝঙ্কেশ্বরী। তাই বাকি চারটি গ্রামের সঙ্গে আলোচ্য তিনটি গ্রামও অংশ নেয় সর্পরূপা দেবীর পূজায়। একসময় এই উৎসবের দিনে গ্রামের নতুন বৌদের বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এই রীতি আজ আর প্রচলিত নেই।

পলসোনা গ্রামে ঝঙ্কেশ্বরী-মন্দির

মুসারু গ্রামের ঝঙ্কেশ্বরী-মন্দিরটি বাঙলা রীতির। ছোট মন্দির। পলসোনা গ্রামের মন্দিরটি নতুন, নাটমন্দিরবিহীন। পুরনো মন্দিরের ভিতের ওপর গড়ে উঠেছে এই মন্দির। চাপা পড়ে গেছে অতীত ইতিহাস। পোষলার মন্দির নির্মীয়মাণ। ঝঙ্কেশ্বরী-মন্দিরে কোন মূর্তি নেই, আছে শুধু বেদি আর বেদির ওপর নুড়ি-পাথর। ফাঁক-ফোকর করে রাখা। সর্পরূপা দেবীর বসবাসের সুবিধার কথা চিন্তা করেই কি? তবে আক্ষরিক অর্থেই—

"দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ—"

সত্যিই তাই। মন্দিরে নয়—সর্পরূপিণী দেবী ঝঙ্কেশ্বরীর দেখা মেলে জমির আলে। দৈর্ঘ্যে প্রায় চার ফুট। তবে এর থেকে বড় আকৃতিরও হয়। গায়ের রঙ কালো। বুক বা পেটের দিকে হলদেটে সাদা। লোকজন দেখেও নির্বিকার, কোন চাঞ্চল্য নেই। মানুষের সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত বলেই হয়তো এমন। কিন্তু তারও আছে ভয়াল রূপ; আর সেই রূপ দেখতে কেউ একটুকরো ঢিল ছুঁড়ে দিলে চকিতে শির উঁচু করে ঝঙ্কেশ্বরী মেলে ধরে তার বিস্তৃত ফণা। চেরা জিভ লকলক করে। তালে তালে মাথা নাড়ায়। শত্রুর মহড়া নিতে পুরো প্রস্তুত। হাপরের মতো ফোঁসফোঁস শব্দ প্রাণে ভয় জাগায়।

এই সাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফণার নিচে ধার ঘেঁষে সুগঠিত চক্রচিহ্ন। গোখরোর মতো এরাও জোড় বাঁধে ঢেমনা সাপের সঙ্গে।

ঝঙ্কেশ্বরী গ্রামের উপাস্য। ঘুম ভেঙে প্রথম ঝঙ্কেশ্বরী দর্শন শুভ বলে মানা হয়। হত্যা দূরের কথা, সামান্য আঘাত পর্যন্ত কেউ করে না। ঘরে ঢুকলে বা বিছানায় উঠলে প্রথমে হাতে তালি দিয়ে বা শব্দ করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। চেষ্টা ফলবতী না হলে ব্রাহ্মণ ডাকতে হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণেরই আছে জীবিত বা মৃত ঝাঙরাইল স্পর্শের অধিকার। তাই প্রয়োজনে তারা হাতও লাগাতে পারে। কোন অব্রাহ্মণ ব্যক্তির বাড়ি বা জমি থেকে মৃত ঝাঙরাইল অপসারণ করতে একই কারণে প্রয়োজন হয় ব্রাহ্মণের। কিন্তু শুধু অপসারণই নয়, ব্যবস্থা করতে হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলতে বোঝায় মৃত সাপকে গঙ্গায় সলিলসমাধি দেওয়া। ব্রাহ্মণ নতুন মাটির হাঁড়িতে মৃত সাপ ভরে সলিলসমাধি দিয়ে আসে প্রায় কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার দূরের গঙ্গায়। ব্রাহ্মণকে অবশ্য এই কাজের জন্য একশো টাকা দক্ষিণা দিতে হয়।

মানুষ দেবতাকে প্রিয় করে। হয়তো এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। ঝাঙরাইল কেটেছে—এমন প্রত্যেকে স্বীকার করেছে, ভুল করে গায়ে পা দেওয়াতেই এই বিপত্তি। সর্পরূপা ঝাঙরাইলকে কেউ দোষারোপ করেনি, মেনে নিয়েছে নিজের দোষ। এক তরুণী মা বলেছিলেনঃ "ছেলে আটমাসের শুইয়ে রেখে কাজ-কাম সারছি। অনেক সময় যাবৎ সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরে এসে দেখি ছেলে হাত-পা নেড়ে খেলছে, আর এক ঝাঙরাইল বিছানায় বসে দিব্যি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছেলেকে খেলা দিচ্ছে।"

ঝঙ্কেশ্বরী কাটলে রোগীকে 'ঝঙ্কেশ্বরী পুকুর' নামে চিহ্নিত বিশেষ এক পুকুরে স্নান করানো হয়। ক্ষতস্থানের ওপর লেপে দেওয়া হয় ঐ পুকুরেরই কাদামাটি। এরপর ব্রাহ্মণের বিষ ঝেড়ে দেওয়ার পালা। অন্য কোন ওঝার সাহায্য নেওয়া হয় না। ঝঙ্কেশ্বরী-দংশনে এটিই গ্রামে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা। আজকাল অবশ্য অনেকে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা যেভাবেই হয়ে থাকুক, ঝাঙরাইলের কামড়ে কারো মৃত্যু হয়েছে শোনা যায়নি। তবে কি ঝঙ্কেশ্বরী পুকুরের জলে, কাদায় ওষধি গুণ আছে? অন্যথায় মানতে হয় ঝাঙরাইল এক নির্বিষ ভুজঙ্গ। দংশনের চিহ্ন দেখে কিন্তু মনে হয় না ঝাঙরাইল নির্বিষ। বিষদাঁত-সৃষ্ট ক্ষত পাশাপাশি দুটি স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রামের লোক ঝাঙরাইলকে বিষাক্তই বলে। তাদের আরো বক্তব্য, কোন এক সরকারি রিপোর্টে ঝাঙরাইলকে বিষাক্ত বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্টের কোন কপি অবশ্য তারা দেখাতে পারেনি। তবে ঝাঙরাইল গোখরো প্রজাতির সাপ। চেনা বামুনের পৈতের মতো এরও কোন রিপোর্টের প্রয়োজন নেই।

ঝাঙরাইল কেটেছে—এমন লোক গ্রামে অনেক আছে। দুজন স্কুলপড়ুয়া মেয়ের সঙ্গে বর্তমান নিবন্ধকারের কথা হয়েছিল। বিষের তীব্র জ্বালার কথা দুজনেই বলেছে। প্রথমজন চিকিৎসা করেছে গ্রামে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা অনুযায়ী। দ্বিতীয়জন বর্ধমান সদর হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছে। দুজনেরই ক্ষতস্থান খানিকটা জায়গা জুড়ে কালচে মতো হয়ে আছে। আঙুলে কামড়েছিল এমন একজনের আঙুল শুধু বিবর্ণ নয়, বিকৃতও হয়ে গেছে। দংশনের পর অনেকসময় ক্ষতস্থানে ঘা হয় এবং এক্ষেত্রে ডাক্তারি চিকিৎসাই করা হয়।

ঝাঙরাইল কতটা বিষাক্ত অথবা আদৌ বিষাক্ত কিনা সেকথা বলবেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এই অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ "যদি কাটে ডোমনা, ডাক তবে বামনা।" অর্থাৎ ডোমনা সাপে কাটলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না; মৃত্যু নিশ্চিত। তাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন শুধু ব্রাহ্মণের। চন্দ্রবোড়া সাপও প্রচণ্ড বিষাক্ত। এর বিষ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে, এমনকি কয়েকদিন ধরেও। সুতরাং সব সাপের বিষ একভাবে কাজ করে না। ঝাঙরাইলের বিষও হয়তো কাজ করে, তবে অন্য কোন উপায়ে। বিষ রক্তের মাধ্যমে গতিশীল না হয়ে রাসায়নিক কোন কারণে জমাট বেঁধে যায় এবং পরিণামে দেহের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই বিষের তীব্র জ্বালা ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হলেও মৃত্যু ঘনিয়ে আসে না। জমে থাকা বিষে চামড়া বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চামড়ায় দাগ থেকে যায় জীবনভোর।

ঝাঙরাইলের খাদ্য শুধু মাছ বা ব্যাঙ নয়, তার খাদ্যতালিকায় আছে অন্য সাপও। সাপের গ্রাম মুসারু, পলসোনা, বড়পোষলা ও ছোটপোষলায় হেলে বা মেটে জাতীয় সাপের দেখা পাওয়া গেলেও কোন বিষাক্ত সাপ চোখে পড়ে না। এখানেই ঝঙ্কেশ্বরীর বৈশিষ্ট্য। ঝঙ্কেশ্বরী তাঁর রাজ্যে অন্য কোন বিষাক্ত সাপের উপস্থিতি সহ্য করে না। গ্রামের লোকেরাও বলেঃ "বিষাক্ত সাপ দেখলে খেদিয়ে দিয়ে আসে।" পাঁচালীকারও একই কথা বলেছেনঃ

"তোমার মহত্ত্ব এক অতি চমৎকার।
অন্য ফণাধারী কভু নাহি দেখি আর॥"

সারা দেশে প্রতিবছর কয়েক হাজার লোক সাপের কামড়ে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এই মৃত্যুর একটিও ঘটে না সাপের গ্রামে। এখানেই ঝঙ্কেশ্বরীর দেবীত্ব। এজন্যই গ্রামে তার পূজা। কিন্তু "মাতা অন্তর্হিতা তিন গ্রাম হতে।" সিকগুর, মইদান ও নিগন গ্রাম থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে ঝঙ্কেশ্বরী, টিকে আছে শুধু মুসারু, পলসোনা, বড়পোষলা ও ছোটপোষলা গ্রামে। তাই সর্পকুলে ঝঙ্কেশ্বরী আজ এক বিপন্ন প্রজাতি। ❑

লাল গ্রহ মঙ্গল

শৈবালকুমার গুহ

২৭ আগস্ট ২০০৩, বুধবার, অমাবস্যা। এমন একটা রাতে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে এসেছিল। আকাশে চাঁদ না থাকায় নিকষ কালো আকাশের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকে ঐ রাতে দেখা গেল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। ৭৮০ দিন অন্তর মঙ্গলের প্রতিযোগ হলেও সুবর্ণ প্রতিযোগ সচরাচর দেখা যায় না। ২৭ আগস্ট রাতে সেটাই ঘটেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঐ রাতটা ছিল একটা মণিকাঞ্চন যোগ। কারণ, ঐদিন ছিল অমাবস্যা। কোন প্রতিসৃত আলো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তার ফলে মঙ্গল জ্বলজ্বল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে। বর্ষার ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা থাকলেও মেঘ সরতেই খালি চোখে পরিষ্কার দেখা গেছে মঙ্গলকে। টেলিস্কোপে মঙ্গলের যে-দিকটা সামনে ভেসে উঠেছিল, সেখানে ঐ গ্রহের খানাখন্দগুলি পরিষ্কার ধরা পড়েছিল। লালচে ঐ গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেছেন বহু মানুষ।

২৭ থেকে ৩০ আগস্ট মঙ্গল গ্রহ আমাদের একেবারে কাছে চলে এসেছিল। তবে প্রায় মাস খানেক যাবৎ পুব আকাশে এই গ্রহকে দেখা যাচ্ছিল। গ্রহটি পৃথিবীর যত কাছে চলে এসেছে, ততই তাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দেখিয়েছে। এরপর আরো ২৫ দিন মঙ্গলকে আকাশে দেখা গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশের দিকে মঙ্গল সরে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

২৭ আগস্ট মঙ্গল গ্রহ ১,০৫,৮৩০ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চলে এসেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। মঙ্গলকে পৃথিবীর এত কাছে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আবার এমন মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা যাবে ৭২৬ বছর পর। তাই এবার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই তৈরি হয়েছিলেন ঐ দিনটির জন্য। অন্যান্য মহাজাগতিক ঘটনার থেকে মঙ্গলের পৃথিবীর কাছে চলে আসার পার্থক্য বিস্তর। শুকতারার থেকেও জ্বলজ্বলে এই গ্রহটিকে খালি চোখে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের চেয়েও পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের স্বাভাবিক অবস্থান ৫,৭৩,৪৪০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। কলকাতার পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গত ২৭ আগস্ট পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছিল ৫,৫৭,৫৮০ লক্ষ কিলোমিটার। মঙ্গল এর থেকেও আরো কাছে আসবে আরেকবার। সেই ঘটনা ঘটবে ২৭২৯ সালে। কী করে এটা ঘটছে তা দেখানোর জন্য কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডল বিশেষ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল।
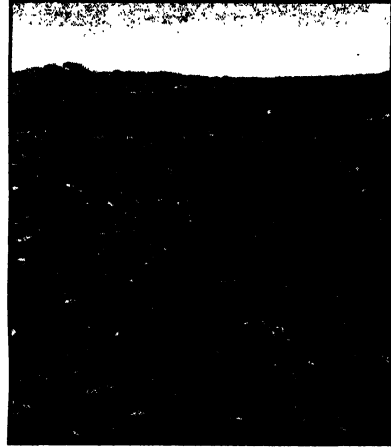
১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই গৃহীত মঙ্গল গ্রহের ভূপৃষ্ঠের চিত্র

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুটি 'ভাইকিং' মঙ্গলে পাঠানো হয়। মঙ্গলে জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা, সেবিষয়ে অনুসন্ধান করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। স্বয়ংক্রিয় ভাইকিং-১ মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই। আর ভাইকিং-২ নামে ৩ সেপ্টেম্বর সেখান থেকে আরো ৭,৪০০ কিলোমিটার দূরে। দুটি মহাকাশযানেই এমন সব যন্ত্রপাতি ছিল, যার সাহায্যে মাটি খুঁড়ে তাতে কোনরকম জৈবপদার্থ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও মঙ্গলের মাটিতে জীবনের কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এজন্য বিজ্ঞানীরা খুবই হতাশ হয়েছেন। কারণ, তাঁদের এতদিনের জল্পনা-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ভাইকিং থেকে যেসব ছবি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, মঙ্গলের উপরিতল পাথর ও বালি-সমাকীর্ণ লাল মরুভূমির মতো। এও জানা গেছে, পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মঙ্গলের মাটির অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে মঙ্গলের মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশি। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন অক্সাইড আছে, তাই মঙ্গলের মাটি এমন মরচের মতো লাল। এই মাটিতে ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন এবং সালফার (গন্ধক)-এরও সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানকার পাথরের গঠন অনেকাংশে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত জমাটবাঁধা লাভার মতো।

মঙ্গলের আকাশ হালকা লালচে, মেঘহীন। বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা। বায়ুচাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের ১০০ ভাগের একভাগ মাত্র। এতে আছে শতকরা ৯৫ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড, ২.৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১.৫ ভাগ আর্গন, ০.১ ভাগ অক্সিজেন, সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প এবং হিলিয়াম, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপরে ওঠেই না। ভাইকিং যেখানে নেমেছিল, সেখানে দিনের বেলা তাপমাত্রা ছিল –৩০° এবং রাত্রে –৮৫° সেন্টিগ্রেড। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আরো জানা গেছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে বিষুব অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৮° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে, আর মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা –১২৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায়। এজন্য মেরু অঞ্চলে দেখা যায় বরফের মুকুট। তবে তা জমাট বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব কারণে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মঙ্গলের পরিবেশ জীবনধারণের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ—'ফোবোস' এবং 'ডাইমোস'। গ্রহদুটি এত ছোট এবং তারা মঙ্গলের এত কাছে রয়েছে যে, খুব শক্তিশালী দুরবীণ ছাড়া তাদের দেখাই যায় না।

ভাইকিং মহাকাশযানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এই উপগ্রহদুটি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। মঙ্গলের উপগ্রহদুটির আকার আগে যেমন ভাবা হয়েছিল ঠিক তেমন নয়—না গোল, না ডিম্বাকার। কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো চেহারা। খানিকটা গোল মতো, আবার খানিকটা লম্বা। অনেকটা নৈনীতাল আলুর মতো। দুটিই পাথর ও পাথরকুচি দিয়ে তৈরি। দুটিরই উপরিভাগে আছে প্রচুর খাদ, জ্বালামুখ, পাহাড় এবং উপত্যকা।

ফোবোস লম্বায় ২২ কিলোমিটার এবং চওড়ায় ১৬ কিলোমিটার। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার। আপন কক্ষপথে মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসতে এর সময় লাগে মাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট। ফোবোসের বুকে বেশ বড় সড় দুটি গহ্বর দেখা গেছে। একটির নাম 'হল', অন্যটি 'স্টিকনে'। এদের ব্যাস যথাক্রমে ৬ এবং ১০ কিলোমিটার। অতটুকু একটি উপগ্রহে এত বড় দুটি গহ্বর সৃষ্টি হলো কিভাবে সেটিই একটি প্রশ্ন।

ডাইমোস লম্বায় ১১ কিলোমিটার এবং চওড়ায় ৯ কিলোমিটার। এর কক্ষপথ অনেক বড়। মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৯,৩০০ কিলোমিটার। আপন কক্ষপথে মঙ্গলের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। ডাইমোসের বুকে সবচেয়ে বড় যে-গহ্বরটি দেখা গেছে তার নাম 'সুইফ্ট', এর ব্যাস ১ কিলোমিটার। কেউ কেউ মনে করেন, হয়তো উল্কার আঘাতে এইসব গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অনেকের কাছে তা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয়। ❑

■ তথ্যসংগ্রহ :

আকাশ ও পৃথিবী—অধ্যাপক ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, শৈব্যা প্রকাশন

মঙ্গল সম্পর্কে সাম্প্রতিক প্রবন্ধ—দেবদূত ঘোষ ঠাকুর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

খ্রিস্টধর্ম প্রসারে কয়েকটি মিশনারি পত্র-পত্রিকা

মিনতি মিত্র

বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিকে অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্য ও ভাষাচর্চার সেই আদিযুগে—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত খ্রিস্টীয় বাঙলা রচনাধারায় খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মিশনারিদের অজস্র 'ট্র্যাক্ট'* জাতীয় রচনা, জীবনী, শব্দকোষ, গল্প-উপন্যাস, নাটক-নাটিকা বিভিন্ন সময়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। এসব কিছুর ওপরে খ্রিস্টীয় সঙ্গীত রচনা তো ছিলই। এই রকমারি প্রচেষ্টার অন্যতম এবং সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিশনারি পত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে এদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। অন্য কোন ধর্ম নয়, একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্মের অপকর্ষ প্রমাণ করাই ছিল তাদের অভিপ্রেত। এই অভিপ্রায়কে কার্যকরী করার জন্য মিশনারিরা নিরন্তর চেষ্টা করে গেছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মিশনারি পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করলে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'খ্রিস্টের রাজ্যবৃদ্ধি'। ট্র্যাক্টের গুণসম্পন্ন কিছু কিছু গল্প, সংবাদ, তৎকালীন সমাজের প্রকৃতি, খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ, প্রচার ইত্যাদির জন্য নানা স্থানের বিবরণ ও তার পরিবর্তনের সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তখনকার বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে মিশনারিদের বিস্তর ক্ষোভের কথাও জানা যায়। যেমন মিশনারিদের ভাবনা ছিল—ভারতবাসীরা গভীর পাপসাগরে নিমজ্জিত, তাদের যে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজন—এ চেতনাটুকুও তাদের নেই!

নিজ ধর্মকে তুচ্ছ করা এবং অপরপক্ষে খ্রিস্টনাম উচ্চারণ ও গ্রহণমাত্র উদ্ধার—এ-সংবাদগুলি মিশনারিদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর এবং আনন্দবর্ধক ছিল নিশ্চয়। অপরপক্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের আদ্যন্ত নীতি হলো—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" (গীতা, ৩।৩৫)

এ তো ছিল সংবাদ পরিবেশনের দিক। ভাষা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়—যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায় নেই বা এই চিহ্ন ব্যবহারে কোন সঙ্গতি নেই। শব্দের সঙ্গে যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগ অথবা যথাযথ বাক্যস্থাপনের কোন শৃঙ্খলাই লক্ষিত হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই একথা স্পষ্ট হবে—

> কেবল একখানি ভগ্নবস্ত্র পরিধান তাহাও মলিন—এই বেশে আসিয়া কহিলেন... আমাকে তাঁহারা পাঁচ মাস কত্রদ করিয়া রাখিয়াছিল।

দ্বিতীয় আলোচ্য পত্রিকাখানির নাম 'মঙ্গলোপাখ্যান'। এই পত্রিকাখানি ইংরেজি এবং বাঙলা দুই ভাষাতেই ছাপা হতো। এর একই পৃষ্ঠায় দুই নাম থাকত এইভাবে—

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র	Evangelist Vol. I
প্রথম কলাম	Serampore
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল	Printed and Published for the
১৮৪৩	Baptist Association of Bengal
	1843

এর সূচীপত্রও একই পদ্ধতিতে বাঙলায় এবং ইংরেজিতে লেখা হতো। বাঙলা অংশের বিষয়গুলি তিন ভাগে লেখা। যেমন—ভূমিকা অংশ, মণ্ডলীর ইতিহাস অংশ, অতঃপর মৃত্যুবিবরণ ও ধর্মবিষয়ক সংবাদ। ভূমিকা অংশে যে-বিষয়গুলি থাকত তা হলো—প্রবন্ধ, উপদেশাদি, খ্রিস্টীয়ানের যুদ্ধাস্ত্র, ভ্রাতৃস্নেহ, ১ ও ২ সংখ্যক লুক ১২ পর্ব ৪০ পদের উপদেশ, মহম্মদীয় ও খ্রিস্টীয় ধর্ম, খ্রিস্টীয়ানের কর্তব্যক্রিয়া, জীবনের বৃক্ষ, খ্রিস্টীয়ানদের প্রতি উপদেশ ইত্যাদি।

মণ্ডলীর 'ইতিহাস' অংশ এইরকম—

১ম অধ্যায়—যিশুখ্রিস্টের আগমনকালে মনুষ্যদিগের ভাববিষয়ক বিবরণ, ২য় অধ্যায়—খ্রিস্টের অবতারাদি বিষয়ক বিবরণ, ৩য় অধ্যায়—এতদ্দেশীয় লোকেদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করনারম্ভ, ৪র্থ অধ্যায়—খ্রিস্টের প্রেরিতগণের সংক্ষেপ বিবরণ, ৫ম অধ্যায়—রোমান লোক কর্তৃক খ্রিস্টীয়ানদিগের তাড়না এবং যিরুশালম নগরের বিনাশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়—খ্রিস্টীয় ধর্মের অতিশয় বৃদ্ধি অ্যান্টিওক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ইগনেটিয়ের বিবরণ, ৭ম অধ্যায়—খ্রিস্টীয়ানদের স্বপক্ষীয় আজ্ঞা। আসিয়াতে তাড়নার পুনরারম্ভ ইত্যাদি।

অতঃপর 'মৃত্যুবিবরণ' অংশে গঙ্গারাম মিস্ত্রি, হরমণি ও তার মা, পাদরি ডিরোট সাহেব ও গঙ্গানারায়ণ শীল —

* 'ট্র্যাক্ট' বা 'Tract'-এর অর্থ 'Short essay' বা ক্ষুদ্রায়তন গদ্য।

এদের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। শেষে 'ধর্মবিষয়ক' সংবাদ অংশে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি দেখা যায়—

> আমেরিকা দেশস্থ ডুব-মতাবলম্বী মিশনারি সোসাইটি আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি পরমেশ্বরের তত্ত্বাবধারণ, এদেশীয় দুইজন খ্রিস্টীয়ানকে মঙ্গল সমাচার ঘোষণার্থ নিযুক্তকরণ কলিকাতা, কলিকাতা সহকারি বাইবেল সোসাইটি, খ্রিস্টীয় ধর্মপালনেতে মনুষ্যের আচরণে সুফল...।

এই পত্রিকায় কয়েকটি ধর্মসঙ্গীতও মুদ্রিত হয়। এগুলির বিষয় যথাক্রমে ডুবের বিষয়ে, স্বর্গ এবং নরক, পরমেশ্বর সর্বদর্শী ইত্যাদি।

'মঙ্গলোপাখ্যান'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৮৪৩) ইংরেজি ও বাঙলা দুই কলামে দুটি ভূমিকা মুদ্রিত হয়। বাঙলা অংশের বিবরণটি নমুনা হিসাবে দেখা যেতে পারে—

> এই বৎসর শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবকমণ্ডলীর প্রথম সভায় একখানি পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। এই সভায় নানা স্থান হইতে দেবপূজক সম্প্রদায়ের বহু লোক উপস্থিত ছিল। তাহাতে তাহারা খ্রিস্টবিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে ভাবিয়া পত্রিকার উদ্যোক্তাবৃন্দ অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠেন এবং জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাঙলাভাষায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের বিষয় স্থির হয়। কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে এই পত্রিকাটি প্রকাশের ফলে সাধারণ লোক খ্রিস্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন। এইরূপে ধর্মচর্চা বৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের চরিত্রও নির্মল হইবে। এই পত্রিকায় প্রচারিত উপদেশাবলী পাঠ করিয়া তাঁহারা নিজেরাও ঐ মর্মে উপদেশ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ইহাও স্থির হয় যে, এই পত্রিকায় ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ, সাধারণ বিষয়ে যেকোন রচনা প্রকাশিত হইতে পারিবে। তবে ইহার মূল প্রেরণা ছিল ধর্মবিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করা। এইজন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার মাসিক মূল্য ছিল চার আনা।

'জীবনবৃক্ষ' শিরোনামে এই পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তার বয়ান ছিল এইরকম—

> বরিসালে মঙ্গল সমাচার প্রচারকরণ সময় কতক ব্রাহ্মণেরা এই কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন যে পূর্বকালে জিবনি নামে এক বৃক্ষ ছিল ঐ বৃক্ষের ফলভোজন করিলে অমরত্ব পাইত তাহাতে করিয়া মনুষ্যেরদের নাশ না থাকাতে সুতরাং লোকভারেতে পৃথিবী বড় ভারাক্রান্ত হইয়া রসাতল হয় এমত হইল দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঐ বৃক্ষসকলের অমরত্ব গুণ হরণ করিলেন তৎপশ্চাৎ ক্রমে সকল লোকেরই মৃত্যু হইল। ইহাতে অনুমান করা যায় এই যে আসল ভাব এই দেশীয় লোকেরা নোখের* পুত্র যে সেম তাঁহা হইতে পাইয়াছে—কারণ তিনি ও তাঁহার সন্তানসন্ততি জলপ্লাবনের পর এই দেশে আসিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে বাস করিতেছিলেন। এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে তিনি আপন পূর্বপুরুষের নিকট এই জীবৎবৃক্ষের বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন সন্তানদিগকে তাহা কহিলেন কেননা তাহার ও সকল মানুষের আদিপিতা যে আদিম (আদম) তিনি যে এদেন (Eden) বাগানেতে যে জীবৎবৃক্ষ ছিল তাহাতে বাস করিতেন।
>
> জীবনবৃক্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র যে বাইবেল তাহাতে যে কেবল পাওয়া যায় যথাপরে য়িহুহ ঈশ্বর পূর্বদিগে এদেশে এক উদ্যান করিলেন ও সে স্থানে স্বনির্মিত মনুষ্যকে স্থাপন করিলেন এবং য়িহুহ ঈশ্বরপ্রিয়দর্শন ও ভক্ষ্য নিমিত্ত প্রত্যেক বৃক্ষ এবং উদ্যানের মধ্যস্থলস্থ জীবনদায়ক বৃক্ত ও সদসৎ জ্ঞানবৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিলেন। (আদি ২ পর্ব্ব ৮ ও ৯)

এইবার উদ্ধৃত করা হচ্ছে এই পত্রিকারই একটি সাধারণ সংবাদ। সংবাদটি এই—

> 'হরকরা' পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে, যৌবনাবস্থা ন্যূনধিক ২৫ জন হিন্দু মিলিয়া এক সভা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা একপ্রকার বৈদান্তিক অর্থাৎ আস্তিক তাঁহারা পারমার্থিক ভজনার নিমিত্তে একত্র হইয়া হিন্দু ও ইংরেজ গীতরচকেরদের হইতে মনোনীত করিয়া যেসকল গীত বৈদান্তিকেরদের ভজনার্থ ব্যবহার্য তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন ঐসকল গীতগান করার্থ কয়েকজন গায়ক নিযুক্ত আছে... হিন্দুলোকেরা ভীরুস্বভাব অথচ চতুরও বটেন এবং এক্ষণে সুশিক্ষার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞান প্রযুক্ত তাহারদের এইরূপ আচরণ সম্ভাবিত বটে

* খ্রিস্টধর্মে বহুপ্রচলিত 'নোয়া'র উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এইসব মিথ্যাকার্য খ্রিস্টীয়ান ধর্ম্মের সভ্যতার দ্বারা দূরীকৃত হইবেক। (ভল্যুম ২, সেপ্টেম্বর ১৮৪৪, পৃঃ ২৬)

আবার ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে তারিখে নটিংহাম প্রদেশে নানা মণ্ডলীর সভায় কেরী সাহেব ইশাইয়াহ আচার্য পুস্তকের ৫৪ পর্বের ২ পদ ধরিয়া বক্তৃতা করেন এবং আপনার উপদেশেতে বিশেষত এই দুই বিষয় প্রকাশ করেন। ঐ দুই বিষয় এইরূপ—

১। মহাবিষয় আমারদের অপেক্ষা করা উচিত।

২। মহাবিষয় পাইবার উদ্যোগ করা উচিত। তৎপরে একত্রীভূত ধর্ম্মোপদেশকেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দেবপূজকেরদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিবার নিমিত্তে ডুবকেরদের মধ্যে এক সোসাইটি স্থাপন করিবার স্থির করা যায় তাহাতে কেটেরিং নগরে ধর্ম্মোপদেশকেরদের পুনর্ব্বার সভা হইলে সেই বিষয়ে মনোযোগ হইবে। (ভল্যুম ২, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২১ সংখ্যক পত্রিকা)

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি আরেকটি খ্রিস্টীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নাম 'দুর্জ্জনদমন মহানবমী'। এর উদ্দেশ্য নামেই প্রকাশ। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ব্যতিরেকে সকল ধর্মাবলম্বীই দুর্জন এবং তাদের দমন করা কর্তব্য। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে নিয়মানুসারে প্রকাশকের বক্তব্যটি এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

ধর্মবিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোনমতে মত স্থির নাই বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ধর্ম্মে অনাস্থা জানিয়া নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর মতস্থাপক হইতে চাহেন—কোন কোন ব্যক্তি অভিপ্রায়মত ধর্ম্মযাজক করাইয়া আপনি ধর্ম্মোপদেশকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। তদতিরিক্ত কেহ কেহ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহ বা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত্ত, কোন কোন মহাত্মারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনা করিতে উৎসাহী, কেহ বা বিধবাদের বিবাহেতে ব্যতিব্যস্ত, কেহ কেহ পিতামাতার অনৈক্যতায় বিপরীত পথানুগামী, স্ব স্ব ধর্ম্মদ্বেষকরতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি এককালেই জলাঞ্জলী দিয়াছেন—এরূপ ধর্ম্ম বিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সম্প্রতি দোষের আকর বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব সর্ব্বদোষনিধি দুর্জনদিগের দমন নিমিত্তে 'দুর্জ্জনদমন মহানবমী' নামে এই পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি।" (সম্পাদক মথুরামোহন দাসগুহ)

এরপর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'শুধাংশু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতে তো বটেই এবং আরো কয়েকটি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সংবাদগুলি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতো। তারই একটি নমুনা 'শুধাংশু' পত্রিকা থেকেই দেখা যাক—

অবগাহনাদি বিষয়ক সমাচার। জুলাই মাসের দশ তারিখে রাত্রিতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বাপ্তিস্ম অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসন্নকুমারবাবু রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্ম্ম প্রতিপাদনে রাজার সহকারী হইয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মশোধন করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে 'রিফার্মর' নামক এক সমাচারপত্র প্রচার করিয়া তদ্দারা এতদ্দেশীয় অলীক ধর্ম্ম এবং কুরীতির মূলোচ্ছেদ করিতে যত্ন করেন, এবং তাহা হইতে অত্রস্থ প্রধান বিদ্যালয় হিন্দুকলেজের অনেক অনেক সুশিক্ষিত ছাত্র স্বদেশের অযুক্ত কুরীতি সমুল্লঙ্ঘনে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। উক্ত মহাশয় স্বদেশের লোকদের আচার-ব্যবহার ও রীতিবর্ত্ম সংশোধন নিমিত্ত যখন ঈদৃশ যত্ন করিয়াছিলেন তখন আপনার আত্মজকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে অবশ্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকিবেন।... তৎসত্ত্বেও জ্ঞানেন্দ্রমোহনবাবু খ্রিস্টীয়ান ধর্ম্মে এই দীক্ষা গ্রহণে এতদ্দেশীয় লোকের উক্ত ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও স্বীকার করিতে পারেন।

এই অংশটি 'শুধাংশু' পত্রিকা হইতে 'উপদেশক' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। (আগস্ট ১৮৫১, পৃঃ ১৮৯)

ওপরের অংশে কয়েকটি শব্দ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন 'রীতিবর্ত্ম', 'সমুল্লঙ্ঘন', 'পৌত্তলিক' ও 'অযুক্তি' প্রভৃতি। শব্দগুলির অর্থ যে নেই তা নয়—তবে শব্দগুলি বেশ অপ্রচলিত এবং কোন কোন জায়গায় একটু টেনেটুনে অর্থ করতে হয়। এর আগের কয়েকটি পত্রে যতিচিহ্নের অভাব আমরা দেখেছি।

আরেকখানি মাসিক পত্রিকা 'উপদেশক', ইংরেজিতে এর নাম 'The Instructor'। মিঃ জে. আয়েঙ্গারের সম্পাদনায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে এটি ছাপা হতো। এর নির্ঘণ্ট এবং সূচীপত্র দেখলেই পত্রিকাটির প্রকৃতি

চিনতে অসুবিধা হয় না। গতানুগতিক এর উদ্দেশ্য। ঐ পত্রিকার একটি নির্ঘণ্ট ও সূচীপত্র নিম্নরূপ—

The Instructor, Christian Periodical in Bengali for 1856, Calcutta, Printed by J. Thomas, Baptict Mission Press, 1857, মূল্য ১/।

নির্ঘণ্ট ঃ " 'ধর্ম্মোপদেশক'-এর পাণ্ডুলেখ্য।

মথি—১১, ২৮, ৩০, রোমীয় ১২, ২, যোহন ৬, ৮, ১, থিকলনীকীয় ৫, ৯, যোহন ১৭, ১৫, কলসীয় ৩, ১৭, ১, থিকলনীকীয় ২, ১৯, রোমীয় ৩, ২৪।"

এবার সূচীপত্র ঃ

'ধর্মশিক্ষা'

প্রভুর রাজ্যবৃদ্ধি, খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বসূচক বচনের শ্রেণিবিভাগ, কীনানীয়* স্ত্রীর প্রার্থনা ও তাহার ফল, পাঠকের প্রতি নিবেদন, ধর্ম্মোপদেশ—মথি ৭, ১৩, ১৪, ভারতবর্ষীয় বিদ্বান জনগণ সমীপে পত্রসমাচার, বারাসত জেলায় সুসমাচার প্রচার, বাকরগঞ্জ জেলাতে খ্রিস্টীয়ান লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য, বিজ্ঞাপন মর্টিন লুথারের জীবনচরিত্র, সুসমাচার প্রচারার্থে কৃষ্ণনগরের প্রচারকদের দেশভ্রমণ, সুসমাচার প্রচারার্থে ঢাকা-নিবাসি প্রচারকদের দেশভ্রমণ, অরুণোদয় নামক পত্রিকার মঙ্গলাচরণ, শ্রীযুক্ত পাদ্রি ফিঙ্ক সাহেবের মৃত্যু, লেখালেখি ইতিহাস—আমেরিকা দেশের অনুসন্ধান, রোমান ক্যাথলিকমণ্ডলীর বৃত্তান্ত, শ্রীযুক্ত ফ্রপে সাহেবের চরিত্র, পর্পেতুয়া নাম্নী স্ত্রীর মরণবৃত্তান্ত, ব্যালেণ্টাইন দ্যুবল সাহেবের চরিত্র, সার্ব্বত্রিক পুরাবৃত্তের সার কবিতা।

দায়ুদের ২১ গীত, অন্য গীত, কবিতা।

দায়ুদের ২২ গীত।

পত্রিকাটির বার্ষিক নির্ঘণ্ট ও সূচীপত্রের পরে এবার পত্রিকাটির একটি সংবাদের নমুনা দেখা যেতে পারে। বিদেশাগত পাদরিদের সঙ্গে এদেশীয়দের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাবে এই সংবাদের মাধ্যমে। সংবাদটি এই—

হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা।

মঙ্গল সংবাদ যদি করে কোন জন।
বাধা দিতে যত্নবান হয় হিন্দুগণ।।
সদসদ জ্ঞান নাহি তাদের অন্তরে।
লৌকিক ধর্ম্মেতে তারা সদা ঘুরে মরে।।
কহে তারা নানা কথা যাতে হয় মনোব্যথা।
আর অর্থ বিনা কহে বহুজন।।...
হিন্দু আর মহম্মদি যত ধর্ম্ম আছে।
ইতিহাস মিথ্যা আর কামক্রিয়া মিছে।।
খ্রিস্ট নাথে কর সার যে পাপিষ্ঠগণ।
জগতের মায়া হতে হবে উত্তরণ।।"

(শ্রী খৈরু সাহা)

খ্রিস্টীয়ানদের সাহিত্যসেবা, পত্রপত্রিকার প্রকাশ অথবা নাটক রচনা যেকোন সৃষ্টিকার্যেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই—পরধর্মপীড়ন আর অপরপক্ষে খ্রিস্টধর্মের উৎকর্ষপ্রতিষ্ঠা। [ক্রমশ]

* কীনানী নামক প্রদেশ

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের চিত্র দৃশ্যমান। এই ঘাটে শ্রীশ্রীমা স্নান করতেন। কেদারঘাটেও কখনো কখনো স্নান করতেন। ১৯১২ সালে শ্রীশ্রীমা যখন কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন কাশী সেবাশ্রমে রোগীদের ভর্তি করার মতো স্থানসঙ্কুলান হলেও অতিথি-অভ্যাগতদের থাকার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই শ্রীশ্রীমা 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ ছিলেন। কলকাতার দত্ত পরিবারের বাগবাজারস্থ 'লক্ষ্মীনিবাস'-এর কথা 'উদ্বোধন'-এ ইতোমধ্যেই (চৈত্র ১৪০৯ দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত হয়েছে। কাশীতেও তাঁদের বাড়ির নাম 'লক্ষ্মীনিবাস'। ইনসেটে বাঁদিকে 'লক্ষ্মীনিবাস' দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের ইনসেটে সেবাশ্রমের মূল অফিসবাড়িটি দৃশ্যমান। সেবাশ্রমে সেবাকার্য দেখে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন—তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।" শুধু তাই নয়, এখানকার কর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি সেবাশ্রমের অর্থভাণ্ডারে একখানি ১০ টাকা দান করেন। ১০ টাকার সেই নোটটি এবং শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিধন্য স্থানের কিছু প্রাচীন অংশ এখনো সেবাশ্রমে সযত্নে রক্ষিত আছে।

উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য

বেণু সান্যাল

উপমার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী
প্রকাশক ঃ
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১ শঙ্কর ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬
মূল্য ঃ ৪০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৯৬
প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৯

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ যে কবিস্বভাব ছিলেন—একথা বিদ্বৎসমাজে, ভক্তসমাজে এবং সন্ধিৎসু পাঠকসমাজে অজানা নয়। সুসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সুদীর্ঘকাল পূর্বে তাঁর সুপঠিত গ্রন্থ 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'-এ এপ্রসঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন।

কাব্যের শোভাবর্ধনের জন্য উপমা, অনুপ্রাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের রীতি সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে এবিষয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। মহাকাব্যের কবিগণ তাঁদের অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে উপমা, মালোপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদি ছাড়াও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে তাঁদের কাব্যশরীর অপূর্ব বাক্‌নির্মিতি তথা মণ্ডন-কলা-সমৃদ্ধ রাগে সজ্জিত করে উপস্থাপিত করেছেন। ব্যাস-বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে মহাকবি কালিদাস, বাণভট্ট প্রমুখ এবং পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, শেক্সপীয়র, শীলর, গ্যয়তে প্রভৃতি অলঙ্কার সৃষ্টির মাধ্যমে কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিলেন। এঁদের অধিকাংশই কিন্তু চর্চা ও অনুশীলন-সাপেক্ষভাবেই তা করেছিলেন। এঁরা কেউই, যতদূর জানা যায়, স্বভাব-কবিত্ব বা সহজাত ঋদ্ধিতে করেছিলেন—একথা বলা যাবে না। অনেকেরই সুসংস্কৃত উত্তরাধিকার ছিল। এঁরা যুগাতিশায়ী, কালাতিশায়ী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ঐতিহ্য তথা উত্তরাধিকারকে বহন করেছিলেন।

যুগপুরুষ, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সেই অর্থে একক, নিঃসঙ্গ, অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। অনাবিল সারল্য, সহজাত প্রজ্ঞা এবং পরিশীলিত-পরিমিতি বোধের মিশ্রণে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন প্রেক্ষিতে বুধজন ও ভক্তজন সান্নিধ্যে উপদেশাদি বিতরণের মুহূর্তে যেসকল উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন, সেগুলির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। মুক্ত, বুদ্ধ এই মহাসাধক ভাবজীবনের গভীরতম তলদেশ থেকে, চরমতম উপলব্ধির বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে সহজাত ঋদ্ধি ও চৈতন্যশক্তি-বলে বহু ব্যাপক অর্থবোধক উপমা, উৎপ্রেক্ষাদি প্রয়োগ করেছেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি অবিসংবাদিতভাবে সার্থক। উপমা ছাড়াও তিনি সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে রূপময়, রমণীয় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে বাক্‌বৈদগ্ধ অপেক্ষা কথক মহাপুরুষের পরম প্রজ্ঞা ও পরিশীলিত চিত্তের মহাজাগতিক বিস্তার উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়ত, লোকায়ত জীবনের তীর স্পর্শ করেই তিনি লোকাতীতের দিশারী ছিলেন। এইসব উপমা-চিত্রকল্পে মানবজীবন তথা লোকায়ত জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য যেমন প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্যপক্ষে সেগুলি শ্রোতা, পাঠক ও ভক্তের আত্মিক বিকাশ তথা আত্মিক উদ্ভাসেরও সহায়ক হয়েছে।

'উপমার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটির কলেবর শীর্ণ হলেও তার ভার কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। লেখক প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী সনিষ্ঠ প্রযত্নে উপমাগুলি বেছে নিয়েছেন এবং বিষয়-ভাবনা অনুযায়ী সেগুলির সুনিপুণ শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। প্রসঙ্গ অনুযায়ী প্রযুক্ত উপমাগুলির উল্লেখ করা যায়—

(১) 'ঠাকুর ও মা' অধ্যায়ে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের যে-উক্তিগুলি চয়ন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো ঠাকুরের স্ব স্বরূপজ্ঞাপক এই অপূর্ব উক্তি—"পরমহংস দুই প্রকার—জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।"

(২) 'কাম-কাঞ্চন' অধ্যায়ে উল্লিখিত উপমাগুলির সুনিপুণ বিন্যাস গ্রন্থকারের নিষ্ঠা ও প্রযত্নের পরিচয়বাহী। যেমন—"টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ—এইসব এসে পড়ে।" এইসব মানসিকতা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়—অতি সরল সত্য, সন্দেহ নেই। আবার সংসারীদের উদ্দেশে ঠাকুরের বক্তব্য ভিন্ন সুরে হলেও সেক্ষেত্রে বাস্তবকে তিনি উপেক্ষা করেননি। এসব ক্ষেত্রে 'ভাবের ললিত ক্রোড়' থেকে রূঢ় বাস্তবের কঠিন ভূমিতে তিনি স্বচ্ছন্দে অবতরণ করেছেন, এখানে তাঁর অনায়াস ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। "তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড়, থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা, সাধুভক্তের সেবা হয়।" আবার তিনি বলছেন ঃ "জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে—আরেকজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়।" উপরি উক্ত বক্তব্যের পরই সংসারী মানুষের ধর্মবোধ প্রসঙ্গে তাঁর কথা ঃ "সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একটা ঘরে আছে, সব বন্ধ, ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়? সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে।"

(৩) 'অবতার' প্রসঙ্গে ঠাকুর যে-কথাগুলি বলেছেন সেগুলির প্রাঞ্জলতা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থকার এই

উপমাগুলিকে বেছে নিয়ে তাঁর বীক্ষণশক্তি ও মননের পরিচয় দিয়েছেন। সনিষ্ঠ গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপমাগুলিকে চয়ন করে পাঠক-ভক্তদের উপহার দিয়েছেন। 'অবতার' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব একটি উপমা—"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি।... নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে নলের ভিতর দিয়ে আসছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বারোজন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।" অবতারপুরুষের প্রকৃত পরিচয় তথা স্বরূপ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম প্রজ্ঞায় এই দুরূহ বিষয়টি প্রাঞ্জলরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে—"ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়। মেথিতে হাত রাঙা হয়, মেথি বাটতে হয়।" এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আরো বক্তব্য—"তিনি (অবতার) মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতরে নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।"

'জ্ঞান ও ভক্তি' প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের নিজস্ব বিশ্লেষণটি উল্লেখ্য—বক্তব্যটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ: "জ্ঞান ভাল। তার চেয়েও ভাল ভক্তি। জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায়, ভক্তি দিয়ে তাঁকে ছোঁয়া যায়।... জ্ঞান বিপাকেও ফেলে।"—গ্রন্থকারের এই বক্তব্য বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। বরং তাঁর সঙ্গে সহমত হওয়া যায় যখন এর পরেই তিনি বলেন: "জ্ঞান থাকলেই বিচার আসে, বিচারের মাত্রাধিক্য হলে বিশ্বাস চলে যায়। বিশ্বাস গেলে সব গেল। জ্ঞানের বিচরণ সীমিত, ভক্তির বিচরণ অবাধ।" ভক্তিমার্গ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণের যে-উপমাটি উদ্ধার করেছেন তা হলো—"কলিযুগের পক্ষে 'নারদীয় ভক্তি'। শাস্ত্রে যেসকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকাল জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়, আজকাল ফিবার মিকশ্চার।"

'অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত আরেকটি অমূল্য উপমা-বিধৃত বক্তব্যের প্রতি গ্রন্থকার পাঠক-ভক্তজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: "কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে—এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।" সংসারী জ্ঞানী প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুন্দর উপমার উল্লেখ সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা পাই—"সংসারী জ্ঞানী কিরকম জান? যেমন, শার্সির ঘরে কেউ আছে। ভিতর-বার দুই দেখতে পায়।"

ওপরে আলোচিত অধ্যায়গুলি চার-পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী। এছাড়াও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে কতকগুলি বিষয়কে একত্রিত করে লেখক 'বিবিধ' অধ্যায়ে পরিবেশন করেছেন। আবার 'পরিশিষ্ট' অংশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যেসকল ঘটনা ও উক্তি (এগুলির কোন শিরোনাম নেই) সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলি পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতেই স্থান পেতে পারত। সেক্ষেত্রে আলোচনাটি আরো গভীর ও ব্যাপক হতো। 'উপমা সৌরভ' অধ্যায় সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

উপমা, রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগ ছাড়াও 'চিত্রকল্প' তথা 'ইমেজ' সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণ অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ও পরিমিতিবোধ আমাদের বিস্মিত করে। এসব ক্ষেত্রে সেই পরমপুরুষ আমাদের রূপ থেকে রূপাতীতে আকর্ষণ করেছেন। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—ভক্ত, পাঠক সেই মহাপুরুষের ইঙ্গিতে রূপলোক থেকে রসলোকে উত্তীর্ণ হয়, এক অনাবিল শান্তি ও আনন্দলোকের উদ্দেশে ধাবিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর চিত্রধর্মিতা তথা ব্যঞ্জনাধর্মিতা প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় সংযোজিত হলে তা গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়ক হতো। সঙ্কলিত উপমাগুলির বিশ্লেষণ থাকলেও ভাল হতো। তবে একথা স্বীকার্য, গ্রন্থকারের বিষয়বিন্যাস, উপমাগুলির বিষয় অনুযায়ী পৃথকীকরণ তথা নির্বাচন এবং সেগুলির ব্যাখ্যা (ক্ষেত্রবিশেষে) সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষা ব্যবহার সার্থক। তা বক্তব্যকে প্রাঞ্জলরূপেই উপস্থাপিত করেছে।

গ্রন্থটির পরিসর অবশ্যই সঙ্কীর্ণ। এই সীমিত ক্ষেত্রেও গ্রন্থকার যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র আরো স্পষ্ট হলে ভাল হতো। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্ত চিত্রটির নির্বাচন প্রশংসনীয়—একদিকে ঐ চিত্রটি পরমপুরুষের কাছে বিশেষ প্রাপ্তির যেমন ইঙ্গিত দেয়, তেমনি প্রভুর আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ রূপটি ভক্ত ও পাঠকচিত্তকে উদ্বোধিত করে, প্রাণিত করে। গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য, বাঁধাই তথা সামগ্রিক সজ্জা উন্নত মানের। লেখকের কাছে আমাদের আরো প্রত্যাশা রইল। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **জন্মান্তরবাদ—হৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য।** প্রকাশক: এইচ. আর. ভট্টাচার্য, ৩০ই দ্বারিক জঙ্গল রোড, ভদ্রকালী, হুগলি, পিন: ৭১২২৩২। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৯৪+৮। মূল্য: ১৫ টাকা। প্রকাশকাল: ২০০২।
- **জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্ম—শ্রীমৎ প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী।** প্রকাশক: বিজয়া দত্ত, সদানন্দ-অস্থি-পরিষদ, ১/১এ খানপুর রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২০৮। মূল্য: ৩০ টাকা। প্রকাশকাল: ২০০২।
- **একটি আত্মত্যাগের কাহিনী—কুমুদরঞ্জন রায়চৌধুরী।** প্রকাশক: অজয় রায়, ১৩৩/১ বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১০+৪৪। প্রকাশকাল: ২০০০।
- **অঞ্জলি লহ মোর—কার্তিকচন্দ্র সাহা।** প্রকাশক: লাবণ্যপ্রভা সাহা, 'মাতৃ-নিকেতন', ১৭৪ প্রফুল্ল নগর, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮০। মূল্য: ২৫ টাকা। প্রকাশকাল: ২০০২।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান

শহর কলকাতার বুকে অত্যাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা-সম্বলিত হাসপাতাল ও নার্সিংহোম এখন বেশ কয়েকটি আছে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান (অনেকের কাছেই যার পরিচিতি 'শিশুমঙ্গল' নামে) তাদেরই একটি। তবে, কলকাতার বুকে যদি এমন কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয়—যেখানে একদিকে আছে সাম্প্রতিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নততম চিকিৎসার ব্যবস্থা, অন্যদিকে তেমনই আছে সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে দরিদ্র মানুষেরও চিকিৎসার নিশ্চিত সুযোগ, তবে বোধহয় সেই তালিকায় খুব বেশি নাম উঠে আসবে না। আর সেই অল্প কয়েকটি নামের অন্যতম অবশ্যই—শরৎ বোস রোডে অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান'। শুধু কলকাতাতেই নয়, 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর উজ্জ্বল অবস্থিতি আজ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের চিকিৎসা মানচিত্রেও। চিকিৎসা মানে এখানে শুধু রোগনির্ণয় বা রোগনিরাময় নয়; চিকিৎসা এখানে 'সেবা'। ডাক্তার-নার্স-কর্মচারি-সন্ন্যাসী সকলে মিলে এখানে নিজ নিজ সাধ্যমতো দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় ব্রতী। ঈশ্বর এখানে প্রত্যক্ষ সেবা গ্রহণ করছেন—শুধু মন্দিরে নয়; মানুষরূপী নারায়ণের রূপে। এখানে তিনি দরিদ্র নারায়ণ, আতুর নারায়ণ, রোগী নারায়ণ। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সবচেয়ে বড় এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বেসরকারি স্বাস্থ্যশিক্ষা পরিষেবাকেন্দ্র।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র এই 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর সূচনা করেন শ্রীমা সারদাদেবীর দীক্ষিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ। প্রসঙ্গত, পূর্বাশ্রমে দয়ানন্দজী ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান

স্কুল অফ নার্সিং-এর ক্যাপিং উৎসব

স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের সহোদর ভাই। একজন আমেরিকান ভক্ত মিস হেলেন রুবেল (ভগিনী ভক্তি)-এর আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠে কেন্দ্রটি। তখন এটি ছিল একটি ছোট্ট প্রসূতিসদন; নাম ছিল—রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান। সেই থেকেই 'শিশুমঙ্গল' নামটি প্রচলিত। পরে ৪ মার্চ ১৯৩৮-এ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ৯৯ ল্যান্সডাউন রোডে (এখনকার শরৎ বোস রোড) একটি ছোট্ট কেনা জমিতে একটি স্থায়ী হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৫০টি শয্যা-সমন্বিত একটি প্রসূতি হাসপাতাল-রূপে এটি সম্পূর্ণ হলে ৩১ মে ১৯৩৯-এ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রটি ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং প্রসূতি ও শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিচিতি ও স্বীকৃতি পেতে থাকে। রজতজয়ন্তী বর্ষে (১৯৫৭) প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয়—'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান'।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে 'সেবা প্রতিষ্ঠান'। বর্তমানে এর প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে—সাধারণ হাসপাতাল, নার্সিং স্কুল, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এবং কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস।

প্রায় ৫৫০টি শয্যাযুক্ত সাধারণ হাসপাতালটিতে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ, যেমন—মেডিসিন, সার্জারি, ই.এন.টি., গাইনো-কোলজি, অর্থোপেডিক্স ইত্যাদি। আছে একটি নিজস্ব ব্লাড ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি। অপারেশন থিয়েটারগুলি-সহ বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, যেমন—হোলবডি সিটি স্ক্যানার, ট্রেড মিল ইসিজি এবং হল্টার মনিটর ইত্যাদি।

নার্সিং স্কুলের সূচনা হয় ১৯৩২-এ। এখানে প্রায় ১০০ জন মহিলা নার্সিং-প্রশিক্ষণ পান। স্কুলে রয়েছে একটি
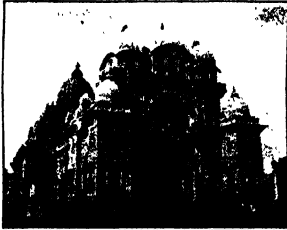
সুসজ্জিত ডেমনস্ট্রেশন কক্ষ, গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ, উপাসনা ও প্রার্থনাকক্ষ।

ল্যাপ্রোস্কোপিক অপারেশনের দৃশ্য

চিকিৎসা ও চিকিৎসা-কর্মি-প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এ রয়েছে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষালাভেরও বিশেষ সুযোগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩ সালে অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর অন্তর্গত 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস'কে মেডিসিনের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র-রূপে স্বীকৃতি দান করে। পরে ১৯৭৭-এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চও এটিকে একটি গবেষণাকেন্দ্র-রূপে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া এই 'ইনস্টিটিউট'কে দ্য মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে MD ও MS-এর জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অন্যান্য কয়েকটি কোর্সের (যেমন DCH, DGO, DO ইত্যাদি) জন্য ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের একটি মেডিকেল লাইব্রেরি আছে। অনেক কৃতবিদ্য ও অভিজ্ঞ ডাক্তার 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্মে রত আছেন এবং তাঁদের গবেষণার ফল দেশবিদেশের নানা মেডিকেল জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বছর DNB পরীক্ষার কেন্দ্র করা হয়েছিল সেবা প্রতিষ্ঠানকে। বিদেশে ভারতীয় ডাক্তারদের স্বীকৃতি নেই। তাই ভারত সরকার এই পৃথক বোর্ড নির্মাণ করেছেন। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সমতুল্য এই উচ্চস্তরের পরীক্ষার কেন্দ্র এখন কলকাতায় একটিই আছে।

কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস (সমাজ-উন্নয়নমুখী স্বাস্থ্য পরিষেবা) হলো 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর অপর একটি সেবাযজ্ঞ। এর অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুটি অঞ্চল—সরিষা ও আড়াপাঁচে 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর ব্যবস্থাপনায় ডাক্তার ও প্যারা মেডিকেল কর্মচারীরা সপ্তাহে দুদিন করে গিয়ে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধের বন্দোবস্ত করেন। ২০০১-২০০২ সালে এইভাবে প্রায় ৩০,০০০ রোগীর সেবা করা হয়। প্রসঙ্গত, 'সেবা প্রতিষ্ঠান'-এর চক্ষুরোগ (Ophthalmology) বিভাগ বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিনামূল্যে 'চক্ষু-চিকিৎসাশিবির' পরিচালনা করে।

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার বাগমারিতে 'সেবা প্রতিষ্ঠান' তার নিজস্ব জমিতে তিন ব্লকে বিভক্ত চারতলা এক আবাসন নির্মাণ করে হাসপাতাল-সংলগ্ন বস্তির ৭৪টি দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেককে বিনাব্যয়ে একটি করে ৩৮৩ বর্গ ফুটের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট দিয়ে পুনর্বাসিত করেছে। ২০০২ সালের ১৪ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে আবাসন উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিশেষ অতিথি ছিলেন।
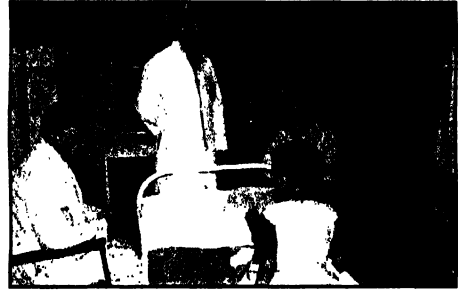
DNB প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার একটি দৃশ্য

উল্লিখিত সব সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 'সেবা প্রতিষ্ঠান' কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহায়তা ও আর্থিক অনুদান লাভ করে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভক্ত, অনুরাগী ও বন্ধুদের আর্থিক ও নানাবিধ সহায়তাও এই প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে চলার পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শিশুরোগ চিকিৎসা বিভাগের আরো আধুনিকীকরণ এবং এমারজেন্সি বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য একটি বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

ইটানগর আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ)ঃ গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ নবনির্মিত হোলবডি সিটি স্ক্যানারের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ভি. সি. পাণ্ডে। এদিন নবস্থাপিত একটি কালার ডপ্‌লার মেসিনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি ভাষণ দান করেন এবং সভাপতিত্ব করেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপাং।

শিক্ষককৃতিত্ব

আলং রামকৃষ্ণ মিশন (অরুণাচল প্রদেশ)ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ আলং বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জাতীয়

পুরস্কার লাভ করেন। জাতীয় শিক্ষক দিবসে ইটানগরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়।

ছাত্রকৃতিত্ব

কলকাতা বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় ঝাড়খণ্ড সরকারের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেণ্ট বিভাগ সম্প্রতি রাঁচিতে রাজ্যভিত্তিক একটি বিজ্ঞান সেমিনারের আয়োজন করেছিল। তাতে **দেওঘর বিদ্যাপীঠের (ঝাড়খণ্ড)** দুটি ছাত্র যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

সেবাব্রত

মুম্বাই আশ্রম (মহারাষ্ট্র) ঃ গত আগস্ট মাসে নাসিকে কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালিত হয়। এতে প্রায় ৬,৯৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী ঋদ্ধানন্দজী (পূর্ণ মহারাজ) গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিকাল ৫টা ২৭ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। শরীরত্যাগের পূর্বে কয়েকবছর ধরে তিনি ডায়াবিটিস ও হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বেলুড় সারদাপীঠে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে পুরী মিশন ও মুম্বাই আশ্রমে সাধুকর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি জলপাইগুড়ি আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ১৯৯১ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন সহজ-সরল, কঠোরকর্মা, শান্ত-সৌম্য ও তপস্বী স্বভাবের। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীকালীপূজা ঃ গত ২৪ অক্টোবর ২০০৩ যথারীতি প্রতিমায় ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) ঃ গত ৩ আগস্ট ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী, চরিত্রগঠন, মনঃসংযম ইত্যাদি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন স্বামী কৈবল্যানন্দজী, বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুরেশানন্দজী ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। শিবিরে ২৮৩ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্বামীজী সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শিত হয় এবং 'চরৈবেতি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

দেউলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১০ আগস্ট ২০০৩ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৈদিক স্তোত্র, 'গীতা', 'কথামৃত' ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সভায় 'যুবসমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডঃ রামচন্দ্র মান্না ও প্রণবকুমার ঘোষাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ২০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ক্ষীরকুণ্ডী প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (হুগলি) ঃ গত ১২ আগস্ট ২০০৩ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, গীতাপাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী ও ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন, আবৃত্তি, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুঁইল্যা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণ সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৩ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষ, প্রদ্যুৎ মিত্র প্রমুখ। আলোচনা করেন তাপস চক্রবর্তী ও সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী। সভাপতিত্ব করেন পুলক মুখোপাধ্যায়। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নির্মলচন্দ্র দাস।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ১৫ আগস্ট ২০০৩ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সুশান্ত দত্ত। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বোধাতীতানন্দজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী, ডঃ প্রিয়তোষ খাঁ ও তরুণ গোস্বামী। সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ২৫০ যুবপ্রতিনিধি এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৩৯) ঃ গত ১৫-১৭ আগস্ট ২০০৩ তিনদিন ধরে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান', 'গৌতম বুদ্ধ থেকে শঙ্করাচার্য ঃ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের বিন্যাস' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ঃ উৎস ও বিভাবনা' বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু ও অধ্যাপক দীপক গুপ্ত। তিনদিনের সভায় স্বাগত-ভাষণ দান

এবং সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শৈলেন্দ্র নন্দী ও অশোককুমার মাইতি। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নিত্যরঞ্জন মণ্ডল।

পাঁশকুড়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (মেদিনীপুর)ঃ গত ১৯ আগস্ট ২০০৩ সারাদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। স্বামীজীর চরিত্রগঠনকারী বাণী নিয়ে আলোচনা করেন রঞ্জিৎকুমার ঘোষ ও সমীরকুমার মাইতি। শিবিরে ৭৯ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেছিল। শিবির-শেষে প্রত্যেককে একটি করে স্বামীজীর ছবি প্রদান করা হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ-এর ২০তম ষাণ্মাসিক অধিবেশন গত ২৩-২৪ আগস্ট ২০০৩ অনুষ্ঠিত হয় **নওগাঁ রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে (অসম)**। অধিবেশনে আলোচনা করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্গীতানন্দজী, সহ-সভাপতি স্বামী অনন্তানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী ও স্বামী ব্রহ্মদেবানন্দজী। এতে ৪২টি আশ্রম থেকে ১০৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এছাড়া দুদিনের অধিবেশনে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাগুইআটি শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির মাতৃসঙ্ঘ (কলকাতা-৫৯)ঃ গত ২৩-৩০ আগস্ট ২০০৩ মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় 'আধুনিকতা ও শ্রীশ্রীমা' এবং 'গীতার মাহাত্ম্য' বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে বেদান্ত মঠের স্বামী আত্মবোধানন্দজী এবং স্বামী সনকানন্দজী। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় 'গীতাজ্ঞান' প্রতিযোগিতা ও নৃত্যের মাধ্যমে গায়ত্রীমন্ত্রের পরিবেশন।

সোদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৩১ আগস্ট ২০০৩ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় লোকসংস্কৃতি ভবনে। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন হিল্লোল রায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতের মাধ্যমে 'শ্রীশ্রীসারদা-পাঁচালী' পরিবেশন করেন স্বাগত রায়, ভারতী সরকার প্রমুখ। এরপর আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী।

বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া)ঃ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বেদপাঠ, সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বেলাড়ী আশ্রমের স্বামী নিত্যবোধানন্দজী, সুভাষিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুবিনয় রায় ও সন্দীপ কপাট। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিদ্যানন্দজী এবং স্বামী স্বরূপানন্দজী, স্বামী নিত্যবোধানন্দজী, ব্রহ্মচারী সেবাচৈতন্য, ডঃ জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ ভাবসমন্বয়কেন্দ্র (কলকাতা-৩৩)ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শিকাগোয় স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণ স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি চেতলা পার্ক থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে এসে সমাপ্ত হয়। নাটমন্দিরে যুবসমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, ব্রহ্মচারী মুরালভাই ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ও সুশান্ত দত্ত।

সাগর মঙ্গল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রুদ্রনগর চৌরঙ্গীতে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জিতাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন ডঃ তাপস বসু, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, প্রভঞ্জন মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শান্তিদানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫,০০০ মানুষের সমাগম হয়েছিল।

বৃন্দাবনপুর কল্যাণব্রত সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ একটি আলোচনাসভার মাধ্যমে 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস' পালিত হয়। 'বর্তমান বিশ্বে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন সুনীতিকুমার দাস ও শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬)ঃ গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস' উপলক্ষ্যে 'স্বামীজীর চিন্তনে আধ্যাত্মিক সমাজবাদ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী এবং রেখা দাভে ও শিবাজী ঘোষ।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ সমিতি (কলকাতা-১৪৪)ঃ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সমিতির বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী ও মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে প্রায় ৬৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান এবং ৬৩ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হয়।

বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র (বীরভূম)ঃ গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খোস-কদম্বপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসমিতির সহযোগিতায় শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী ও 'উদ্বোধন'-এর ১০৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ও 'উদ্বোধন' বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন কুমকুম ভট্টাচার্য। ধর্মসভায় 'প্রাত্যহিক

জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিদ্যানন্দজী, স্বামী শেখরানন্দজী ও অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। দুপুরে ৭৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৩৩টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) : গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শারদীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনা করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী। এদিন প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল, ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

চড়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২১ সেপ্টেম্বর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শঙ্কর মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ২০০ গ্রামবাসীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, জপধ্যান, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নির্মলচন্দ্র ফাদিকার ও স্বপন হালদার। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শান্তিদানন্দজী ও স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (হুগলি) : গত ৩১ আগস্ট ২০০৩ স্থানীয় লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে ১২৫ জনের চিকিৎসা করা হয়।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ একটি রক্তদান-শিবিরে ১৫১ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

১০ মাইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বার্ষিক রক্তদান শিবিরে ৪৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাগণকে একটি করে স্বামীজীর ছবি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে নামখানা ব্লকের পঞ্চানন পড়ুয়ার ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর দুটি চোখ কলকাতা মেডিকেল কলেজে দান করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হুগলির ভদ্রেশ্বর-নিবাসী প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায় গত ৪ এপ্রিল ২০০৩ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি একদা ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাওড়া-নিবাসী জিতেন্দ্রনাথ নাগ গত ৯ এপ্রিল ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহধন্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায় গত ১৯ এপ্রিল ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরলোকগমনকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর পিতা উমাপদ মুখোপাধ্যায় ও মাতা মনোলোভা দেবী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে যোগবিলাসবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বালী ঘোষপাড়া-নিবাসিনী সুপ্তি চক্রবর্তী গত ২১ এপ্রিল ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন মধুর ব্যবহার ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, দুর্গাপুর-নিবাসিনী উমারানী চট্টোপাধ্যায় গত ২৪ এপ্রিল ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী শিবানী মুখোপাধ্যায় গত ২৬ এপ্রিল ২০০৩ পরলোকগমন করেন। সরলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলং-নিবাসী মনোরঞ্জন দেব গত ৪ মে ২০০৩ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। নম্র ও মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী শান্তিভূষণ রায় গত ৬ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ডানকুনি-নিবাসী সুশীলচন্দ্র দত্ত গত ৭ মে ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সৎ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং দৃঢ়তা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পশ্চিম মেদিনীপুর-নিবাসী গৌরহরি মাজি গত ১০ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। ❑

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ

No work is secular. All work is adoration and worship.

SWAMI VIVEKANANDA

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর-৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩১৪৫
- **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ-৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী-৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ২৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ২৫৯৩৯৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম-৭৪৩ ২৩৫
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, বারাকপুর, ফোন ঃ ২৫৯২-১২৩০
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর-৭৪৩ ১৮৭
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর-৭৪৩ ১২৭
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল)-৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া-৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া
  বারাসত-৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ২৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন ঃ ২৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম-৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন ঃ ২৫৫৩৯২
- **অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  পোঃ অশোকনগর, নৈহাটী রোড, বাদামতলা-৭৪৩ ২২২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, সরিষা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা-৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর-৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি-৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা-৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২, ফোন ঃ ২৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর-৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন-৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-২৬০৪৫০
- **দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত-৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা-৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-২৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর-৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা-৭৪৩ ৩৫৭
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর-৭৪৩ ৩৫২

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone : 2554 2248, 2554-2403

Vol. 105
No. 11
NOVEMBER
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB/RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) **'উদ্বোধন' ১০৫তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **'উদ্বোধন'**-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০৩-এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও গ্রাহকপ্রতি মোট খরচ প্রায় ১১০ টাকা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল— বাঙালির ঘরে ঘরে **'উদ্বোধন'**কে পৌঁছে দিতে হবে। **'উদ্বোধন'** একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✡ **'উদ্বোধন'**-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে **স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ** এবং **স্বামী গম্ভীরানন্দ** মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। **'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar' —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-** ৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপ . দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা। সডাক ৯৫্ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০্ টাকা।

১০৫তম বর্ষ উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন ঃ ২৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● ই-মেল ঃ rmsppp@vsnl.com
(বেলুড় মঠের ফোন নং ঃ ২৬৫৪-১১৪৪/৯৫৮১/৯৬৮১/৫৩৯১/৫৭০০-০৩)

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেট

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31-34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
SP2,	কথামৃতের গান
SP-7, SP-8, SP-10–12	(১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
SP-3	শ্রীরামনাম-সংকীর্তন (স্বামী সর্বগানন্দ ও অন্যান্য)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-6	শিবমহিমা
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
SP-17	বীরবাণী
SP-18	গীতিবন্দনা
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)
SP-23	ওঠো জাগো
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা
SP-29	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনাম (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিরচিত)
SP-30	সারদাদেবীর স্মৃতি আলেখ্য
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে ৪র্থ খণ্ড)
SP-35	আগমনী
SP-36	ভজন সুধা
SP-37	সবাই মিলে গাই এসো
SP-38	যুগে যুগে হরি
SP-39	শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্

সদ্যপ্রকাশিত

শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্

(ক্যাসেটে)

আবৃত্তি করেছেন ঃ স্বামী দিব্যব্রতানন্দ

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ সারদাপীঠ, বেলুড়; মিউজিক ওয়ার্ল্ড

অডিও সি. ডি. / মূল্য ১০০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্ (সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণঃ শরণম্)		
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয়)		
Cd/SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	Cd/SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ) (সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)		
Cd/SP-37	সবাই মিলে গাই এসো	Cd/SP-23	ওঠো জাগো
Cd/SP-27	বেদমন্ত্র		

ভিডিও সি. ডি. (রম-সহ) / মূল্য ২০০ টাকা

Vcd/SP-1	Holy Footprints of Sri Ramakrishna	Vcd/SP-1A	শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদচিহ্ন

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

পোঃ কামারপুকুর, হুগলি-৭১২ ৬১২

ফোন ঃ (০৩২১১) ২৪৪২২১

একটি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের আগমনে এই স্থান সবসময়ই জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। কেউ আসেন তীর্থপর্যটনে, কেউ আসেন আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হতে, আবার কেউ এর শান্ত সমাহিত মহিমা উপভোগ করেন। ছবির মতো সৌন্দর্যে ভরা এর আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সবসময়ই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে আকর্ষণ করে চলেছে।

হাওড়ায় অবস্থিত মূল কেন্দ্র যা 'বেলুড় মঠ' নামে খ্যাত, কামারপুকুর মঠ ও মিশন তারই একটি শাখাকেন্দ্র। যদিও এই কেন্দ্র স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক ভিটার অবিকল সংরক্ষণ এবং ভক্ত ও সাধুদের সাধন-ভজনের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা, তবু এই কাজ ব্যতীত এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকাজকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সেবাব্রতের অঙ্গ হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রয়োজন মেটাতে এই কেন্দ্র সূচনাকাল থেকেই তৎপর। এইসব সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোন নিজস্ব ভবন না থাকায় এযাবৎ মঠেরই কোন অংশে এগুলিকে স্থান করে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। ফলে ব্যাহত হয়েছে সুষ্ঠু পরিচালন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ এবং সাধু ও ভক্তদের জন্য নির্মিত রন্ধনশালা ও ভোজনগৃহ অত্যন্ত প্রাচীন হওয়ায় জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর আশু পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এই কাজ এখন নিষ্পন্ন করতে না পারলে যেকোন দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এছাড়া একটি পূজাবেদি ও তৎসংলগ্ন দর্শনমঞ্চ একান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় এখন আমরা প্রার্থনাগৃহটিকেই ব্যবহার করি। কিন্তু দিনে দিনে শিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সেজন্য অতি সত্বর একটি স্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণ করা আবশ্যক।

এই কাজগুলি অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাদের যে-অর্থের প্রয়োজন তা নিম্নরূপ—

১।	শ্রীশ্রীরঘুবীরজীউ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পাকশালা নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
২।	সাধু ও ভক্তদের ভোজনশালার সম্প্রসারণ বাবদ	২০ লক্ষ টাকা
৩।	দেবীপূজা ও অন্যান্য উৎসবের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা
৪।	রন্ধনশালার ও অন্যান্য কর্মীদের আবাসন নির্মাণ বাবদ	৫ লক্ষ টাকা

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, অতীতের মতো বর্তমানেও এই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তেরা উদারভাবে এগিয়ে আসবেন এবং অকৃপণভাবে সাহায্য করে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কাজগুলি যাতে সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করবেন। সব দান চেকে বা ড্রাফ্টে ওপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কামারপুকুর শাখা অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মহেশপুর শাখায় **রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর** নামে পাঠাবেন। **সব দানই ১৯৬১-র আয়কর আইনের ৮০জি অনুযায়ী করমুক্ত**। প্রতিটি দানের যথাযথ স্বীকৃতি থাকবে।

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
সম্পাদক

১০৫তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪১০ ডিসেম্বর ২০০৩

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত হাতে হাতে দেওয়া হবে। যাঁরা ডাকে নেবেন, আশা করা যায় তাঁরা ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর ২য় সপ্তাহেই সংখ্যাটি পেয়ে যাবেন।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' ঃ ১০৬তম বর্ষ, ২০০৪ (মাঘ ১৪১০—পৌষ ১৪১১) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৬তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৪) গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করতে হচ্ছে। হাতে নিলে ৮০্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ১০০্ টাকা। বিদেশে (বাংলাদেশ ভিন্ন) ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা। পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ২৫্ টাকা রেজিস্ট্রি (অন্তর্দেশীয়) খরচ একইসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই **যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮, ২৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

কত সৌভাগ্যে মা এই মনুষ্যজন্ম! খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলব মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম।

✳

যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান।... যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না।

✳

বাবা, সংসার মহাদঁক (পাঁক)। দঁকে পড়লে ওঠা মুশকিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন্ ছার! তাঁর নাম করবে। নাম করতে করতে তিনিই একদিন কাটিয়ে দিবেন।

✳

মনে ভাববে—আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন। ঠাকুর যে বলে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষদিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

অনাসক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত শ্রীমা সারদাদেবী

অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছে কালের গতি। ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমীর সন্ধ্যায় জগৎ যে মহা আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—তাহা কালের গতিতে সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদময় বহু দিন, মাস, বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ ১৪১০ বঙ্গাব্দে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কালানুসারে শ্রীমা সারদাদেবীর সার্ধশত জন্মতিথি পূর্ণ হইয়াছে। এই পবিত্র লগ্নে তাঁহার মহাজীবন অনুধ্যান হইয়া উঠিয়াছে আমাদের পুণ্য কর্তব্য। যিনি অনন্ত শক্তিময়ী হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে ভালবাসিতেন, যিনি পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া সংসারের সকল কর্তব্যকর্ম নীরবে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন—সেই জগজ্জননী সারদাদেবীকে জগতের ভার গ্রহণ করিতে একদা অনুরোধ করিয়াছিলেন জগৎপিতা শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন ঃ "হাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ-ই সব করবে?" শ্রীশ্রীমা নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন ঃ "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" (শ্রীমা সারদাদেবী, ৫ম সং, পৃঃ ১৪৬)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগবতী তনু এপৃথিবীতে বেশিদিন থাকিবে না। তাই তাঁহার যে আরব্ধ কার্য—ত্রিতাপদগ্ধ মানুষকে পরম আনন্দ ও শান্তির একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বরের সন্ধান দেওয়া এবং তাহাদের সেই পরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইয়া উঠিবে না। সেইজন্য তিনি শ্রীশ্রীমাকে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে নামাইতে চাহিয়াছিলেন। ষোড়শীপূজার মাধ্যমে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে জগন্মাতৃত্বকে জাগ্রত করিয়াছিলেন, এবার যেন তাঁহাকে আহ্বান করিলেন বিশ্বমানবকে ত্রাণ করিতে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে শরীরধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনিও মরদেহ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে তিনি মানবলীলার অবলম্বনভূতা যোগমায়া-স্বরূপিণী রাধুকে গ্রহণ করিয়া জগৎকল্যাণে অবতীর্ণা হইলেন। এসম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ "ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে আর প্রার্থনা করছি, 'আর আমার এসংসারে থেকে কি হবে!' সেইসময় হঠাৎ দেখলাম, লাল কাপড় পরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাক।'" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৮ম সং, পৃঃ ২৬৮) এই 'আশ্রয়' করা যে কী অদ্ভুত তাহা ভাবিলে বিস্ময় জাগে। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী স্বয়ং ভগবতী, তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের সমভাগী হইয়া, সর্বোপরি তাহাদের আপন জননী হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহান আদর্শকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ঃ "ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে গেলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন ঃ "পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। সংসার থেকে তফাতে গিয়ে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা মাঝে মাঝে করলে তাতে ভক্তি জন্মে। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে-লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে।" ('কথামৃত', ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৩৮০) শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন সন্ন্যাসি-শিরোমণি। সংসারীর জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা এত উচ্চ ও ভাবময় যে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। তিনি তাই আমাদের জন্য সহজ করিয়া একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাহিলেন। আনিলেন শ্রীশ্রীমাকে।

বস্তুত, সাধারণ মানুষ—কামকাঞ্চনে আসক্ত, ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ—ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারে না। তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না আপন হৃদয়মধ্যে। কোন মহান আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার সামর্থ্যও তাহার

নাই। কারণ, সে সর্বদা কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর আক্রমণে জর্জরিত, জাগতিক বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর আবর্তে বিঘূর্ণিত, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে জানিয়াও ভাল ও পুণ্যের প্রতি ধাবিত না হইয়া সদাই মন্দ ও পাপকর্মে আসক্ত। শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়কে লাভ করিতেই সে সদা আগ্রহী। এ হেন বদ্ধ মুমূর্ষু জীবকে উদ্ধার করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদেরই একজন হইতে হইবে, তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমা তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাণী সন্ন্যাসী, গৃহী, নর, নারী—সকল মানুষই নিজ জীবনে প্রয়োগ করিলে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। সেইজন্য তিনি এই আবিলতাপূর্ণ, ভোগাসক্তিময় সংসারে ঘোর সংসারীর মতো থাকিয়া, 'পাঁকাল মাছের মতো' অনাসক্ত জীবন যাপন করিয়া একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এই অনাসক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে ঃ "পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।/ অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।।" (২।১।২) অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়সমূহের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আসক্ত হয়, ফলে তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্মাদিতে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য বস্তুকে জানিয়া এজগতে কিছুই কামনা করেন না। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে ঃ "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ..." (২।২।৫)—একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও এবং অন্য সকল বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—আমরা যদি কর্মের প্রতি আসক্ত না হই, তাহা হইলে তাহাতে ভালবাসা আসিবে কিভাবে এবং কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হইবেই বা কিপ্রকারে? তাহারই প্রত্যুত্তরে যেন শ্রীভগবান গীতায় বলিলেন ঃ "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।/ অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।।" (৩।১৯) অর্থাৎ সর্বদা অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যকর্ম কর। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ সুনিশ্চিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের শাস্ত্রে যে অনাসক্তি ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীমা সারদাদেবী। দেখা যায়, তিনি সাধারণ গৃহীর মতো জীবনযাপন করিতেছেন, ভাইঝি রাধুর প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়া তাহার নানা আবদার মিটাইতেছেন, তাহার দুষ্টামির কথা উল্লেখ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আবার তাঁহার নাতি ন্যাড়ার মৃত্যুতে অবিরল ধারায় ক্রন্দন করিতেছেন, কখনো কাঁথা সেলাই করিতেছেন, কুটনো কুটিতেছেন, কাহাকে নিজের ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া দিতে বলিতেছেন। তাঁহার এই সাধারণ সংসারীর মতো জীবন দেখে তাঁহার 'জয়া-বিজয়া' গোলাপ-মা ও যোগীন-মা পর্যন্ত তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোলাপ-মা একদিন সরাসরি শ্রীশ্রীমাকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ "মা, মনোমোহনের মা বলছিল, 'উনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি, এত গয়না পরেন—এ ভাল দেখায় কি?' " (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৩৩) যোগীন-মার মনেও একবার সন্দেহ জাগিয়াছিল—"ঠাকুরকে দেখেছি এমন ত্যাগী; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারী—দিনরাত ভাই, ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়েই আছেন।" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬৩) এমনই ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সংসারজীবন। যেন তিনি আমাদেরই মতো একজন।

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, অনাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণ বা দৈবী সম্পদ প্রথম হইতেই বিদ্যমান থাকে—"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।/ দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।/ তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।..." (১৬।২-৩) অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, বাসনাশূন্য মন, অদোষদর্শিতা, দয়া, বিষয়-বিরাগ, কোমলতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, পবিত্রতা, প্রেমময়তা এবং নিরহঙ্কার হইল সেই গুণ যা অনাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠক মাত্রই জানেন, তিনি এই সকল গুণেই বিভূষিতা ছিলেন। অনাসক্তির উপমা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কচ্ছপের আড়ায় মন থাকার কথা কিংবা পানকৌটির জল ঝাড়িয়া ফেলার কথা বলিয়াছিলেন, তাহারও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীমা। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন যখন সারা দিনরাত শ্রীশ্রীঠাকুরের নানান সেবাকাজে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, তখন তাঁহার মন একমুহূর্তের জন্যও ধৈর্যহারা হইত না। তাঁহার 'হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট' সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিত। সদাসর্বদাই তাঁহার মন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিত। বাহ্যত তাঁহাকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মনে হইলেও তাঁহার অন্তরে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো সদা জাগ্রত থাকিত তাঁহার ইষ্ট, তাঁহার প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলিতেন ঃ "[লোকে] কেবল [বলে] অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি...? আমি তো তখন [দক্ষিণেশ্বরে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার কালে] অশান্তি কেমন জানতুম না।"

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৬৩) বস্তুত, পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার মধ্যে আনন্দ ও শান্তির কোন অভাব হয় নাই। নির্বাসনার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। তাই জাগতিক কোন সুখই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেনঃ "[দক্ষিণেশ্বরে] চটের ওপর পটপটে মাদুর পাততুম আর... ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো, এখন এই সবে (খাট-বিছানা দেখাইয়া) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না।" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১০০-১০১)

রাধুর প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ দেখিয়া সকলে ভাবিত, তিনি অত্যন্ত আসক্ত, মায়ায় বদ্ধ। কিন্তু সেই তিনিই শরীরত্যাগের পূর্বে রাধুকে দেখিলে বিরক্তিবোধ করিতেন। রাধুকে একদিন বলিলেনঃ "দেখ, তুই জয়রামবাটী চলে যা! আর এখানে থাকিস নে।" একদিন বেশ জোরের সহিতই বলিলেনঃ "যে-মন তুলে নিয়েছি তা আর নামবে না জেনো।" (ঐ, পৃঃ ৩২৩) শ্রীশ্রীমায়ের এই সমস্ত কথা হইতেই আমরা তাঁহার নিরাসক্তভাব অনুধাবন করিতে পারি।

স্বভাবত মহিলারা গহনা পরিতে ভালবাসেন। শ্রীশ্রীমাও ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণ ত্যাগী হইয়াও তাঁহার জন্য একজোড়া ডায়মণ্ড-কাটা বালা গড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে-মুহূর্তেই শ্রীশ্রীমা তাঁহার গহনা পরা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনিলেন এবং বুঝিলেন সর্বত্যাগী ঠাকুরের ত্যাগে কলঙ্ক রটিতে পারে—সেই মুহূর্তেই তিনি শুধু দুগাছি সোনার বালা রাখিয়া সব গহনা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহা আর কোনদিন পরিলেন না। তাঁহার সংসারাসক্তি বিষয়ে যোগীন-মায়ের যে-সন্দেহ ছিল, লোকান্তরিত শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা একদিন নিরসন করিয়াছিলেন গঙ্গাতীরে জপরতা যোগীন-মায়ের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া। গঙ্গায় ভাসমান রক্তাক্ত ও নাড়ীনাল-বেষ্টিত সদ্যোজাত এক শিশুকে দেখাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ "গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীশ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে। কখনো সন্দেহ করো না।" (ঐ, পৃঃ ৩৬৩) শুদ্ধ, পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ যখন কিছু ধারণ করেন কিংবা কাহাকেও ভালবাসেন, তখন তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে আসক্তি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাঁহাদের অমলিন মনে সংসারের কোন অভিঘাত বিন্দুমাত্রও দাগ কাটিতে পারে না। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ছিল এমনই অনাসক্ত, শুদ্ধ ও পবিত্র।

এ-সংসারে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিত্তহীন মানুষ সংসারে অবহেলিত, অসম্মানিত বলিয়া কথিত। আবার যাঁহারা সংসারাসক্তি-রহিত সন্ন্যাসী, তাঁহারা অর্থগ্রহণ করা তো দূরের কথা, স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হন, এমনকি চাহেনও না। তাঁহারা সর্বদা অর্থ হইতে দূরে থাকিয়া, শুধু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হইয়া জীবনযাপন করিতে ভালবাসেন এবং করিয়াও থাকেন। এইভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সন্ন্যাসি-শিরোমণিগণ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাঞ্চনত্যাগ এমনই স্বাভাবিক ছিল যে, অজান্তে কাঞ্চনস্পর্শ করিলেও তাঁহার হস্ত বাঁকিয়া যাইত। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও শ্রীচৈতন্যদেবের অবর্তমানে নিরাসক্ত তাপসীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীমা সারদাদেবী সাধারণ গৃহীর মতো অর্থ গ্রহণ করিতেন। তবে তাহা না গুনিয়া শুধু মুঠো করিয়া রাখিয়া দিতেন; আবার কোন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তেমনি করিয়া প্রদান করিতেন। একবার তাঁহার এক সেবককে কিছু টাকা দিয়াছিলেন বাজার করিবার জন্য। তিনি বাকি অর্থ ফিরাইয়া দিলে শ্রীশ্রীমা তাহা লইতে অস্বীকৃতা হন; কারণ অত অর্থ তিনি দেন নাই। সেবক যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—কত টাকা তিনি দিয়াছেন, তখন তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। এমনই ছিল তাঁহার অনাসক্তি। এমনকি কাহারো মনে যাহাতে কাঞ্চনাসক্তি না আসে, সেইজন্য বলিতেনঃ "রোজগার মানুষ সৎভাবে করতে পারে না—মন বড় মলিন করে দেয়। জগতে যত অনর্থের মূল—টাকা।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১১৬-১১৭) তাঁহার এই অপূর্ব ত্যাগ ও অনাসক্তি তাঁহার বিষয়াসক্ত ভাইদের মনেও গভীর রেখাপাত করিত। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কালীকুমার বলিয়াছিলেনঃ "দিদির টাকাতে কোন আসক্তি না থাকাতেই এত লোক মানে। দিদি যদি সাধারণ লোকের মতো টাকাতে আসক্তি দেখাতেন, তাহলে এ-মান্য আজ হতো না।" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬৬)

শ্রীশ্রীমা অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরনি হইয়া কেবল ভক্তগণের পুষ্প-চন্দন গ্রহণ করেন নাই; গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের অত্যাচার, রাধুর পীড়ন, পাগলি মামির অকথ্য গালাগালি, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিষয় লইয়া বিবাদ প্রভৃতিও। এই বিবিধ সমস্যাজর্জরিত সংসারে থাকিয়া তিনি নির্লিপ্ত সংসারীর মতো জীবনযাপন করিয়া আমাদের সামনে অনাসক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ যে আদর্শ গৃহী ও সন্ন্যাসীর চিত্র উপস্থাপন করিয়াছেন, নিজের জীবন দিয়া তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন শ্রীমা সারদাদেবী। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের দুটি পত্র

বিভূতিভূষণ ঘোষকে* লিখিত

।।১।।

জয়রামবাটী
৫ই ভাদ্র

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

পরম কল্যাণীয়

বাবাজীবন বিভূতি তোমরা নিরাপদে পোছছিয়াছ [পৌঁছিয়াছ] জানিয়া শুখি [সুখী] হইলাম। রাধু[র] কন্যা ২টার সময় একবার দাঁড়াইয়া ছিল[,] পায়ে বা কোমরে কিছু হয় নাই। তবে চলিতে পারে নাই।

আমি ভাল আছি[,] বাকি সকলে ভাল আছে।

রামেন্দ্রর অনেকটা সুবিধা হইয়া আসিতেছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বৌমার [কমলাবালা ঘোষের] চিঠিখানি রাধু হাতে করিয়াই ছিড়ে [ছিঁড়ে] ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ তাহাতে রাধুকে দঁড়াইবার [দাঁড়াইবার] বা চলিবার কথা লেখা আছে বলিয়া। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ।

আঃ
মাতাঠাকুরানী

।।২।।

জয়রামবাটী
সোমবার

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ পরে

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। রাধুর মধ্যে পেটের অসুখ জন্য একটুকু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে[,] সেইজন্য আর দাঁড়াইবার ও চলিবার চেষ্টা করে নাই, যাহা হউক একবার দাঁড়ানতে [দাঁড়ানোতে] দেখা গেল যে পায়ে বা কোমরের কোনখানে কোনকিছু হয় নাই। তুমি তেল বা ঘি মালিশের কথা লিখিয়াছ কিন্তু রাধু তাহা কোনদিনই করিতে দেয় না। রামেন্দ্রর সম্বন্ধে অন্য চিকিৎসা করিতে এখানকার সকলে নিষেধ করিতেছে[,] তবে ফুলা সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে ও আঙ্গু[ল]টি আর [খসিয়া] পরে [পড়ে] নাই কিন্তু রাত্রে খুব যন্ত্রণা হয়। যাহা হউক মা সিংহবাহিনী যা করিবেন তাহাই হইবে[।] তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মাটি লাগান হইতেছে। বাকি সকলে ভাল আছে[।] তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে[।] আশাকরি তোমরা ভাল আছে। ইতি—

আঃ
মাতাঠাকুরানী

---

* শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং বাঁকুড়া হিন্দু স্কুলের শিক্ষক।

পত্রদুটি বিভূতিভূষণ ঘোষের পৌত্র বিশ্বজিৎ ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীশ্রীমা রামেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার সংবাদ দিয়ে বিভূতিবাবুকে পত্রদুটি লেখেন। ৫ ভাদ্র জয়রামবাটী থেকে পাঠানো পোস্টকার্ডটিতে স্বামী ঈশানানন্দও বিভূতিবাবুকে পত্র লেখেন। সেখানেও রামেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার কথা রয়েছে। এই পোস্টকার্ডে দেশড়া ডাকঘরের [২৪ আগস্ট (১৯)১৯] এবং বাঁকুড়া ডাকঘরের [২৫ আগস্ট (১৯)১৯] ছাপ দেখা যায়।

দ্বিতীয় চিঠিটি সম্ভবত খামের মধ্যে করে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীশ্রীমা দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য তাঁর দুধ খাওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে একটি দুগ্ধবতী গাভি ক্রয় করা হয় এবং গাভিটি দেখাশোনা করার জন্য রামেন্দ্র নামে বাগালকে রাখা হয়। ভাদ্রমাসে মাঠে ঘাস কেটে আনার সময় তার বাঁহাতের তর্জনীতে বোড়া সাপ কামড়ায়। বিভূতিবাবু ও একজন ডাক্তার তার হাতে বাঁধন দিয়ে, হাতের আঙুলে ছুরি দিয়ে চিরে রক্ত বের করে দিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলেন : "ও বিভূতি, ওসব কেন করছ? ওকে সিংহবাহিনীর মাড়োতে দাও এবং ক্ষতস্থানে মায়ের স্থানের মাটির প্রলেপ দাও এবং মায়ের স্নানজল খাইয়ে দাও। ভাল হয়ে যাবে।" তাই করা হলো। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই রামেন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪১০ সংখ্যার পর

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারী সনাতন যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—**সম্পাদক**

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কর্মরহস্য

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।*

ব্যাখ্যা ঃ সমাজে কখনো কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সমাজের 'front bench'-এ (সম্মুখের সারিতে) চলিয়া আসে। সচ্চরিত্র, ভাল লোককে মাথা গুঁজিয়া সমাজের পিছনদিকে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এবারেও দুশ্চরিত্র দুষ্ট ব্যক্তিগণ সমাজের সম্মুখের সারিতে চলিয়া আসিয়াছিল। দেশের শাসনভার যাহাদের হাতে ছিল, তাহারা ছিল শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত। আর সমাজের শিক্ষার ভার যাহাদের হাতে ছিল সেই অধ্যাপক, গ্রন্থলেখক, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণ অতীব দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী ও লোভী ছিলেন। সরকারি কর্মীদের ব্যাপারখানা ছিল কেমন? আপন শিষ্যগণকে গুরু জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ "কিছু উপরি পাওনা আছে তো?" পুত্র পরীক্ষা দিয়া আসিলে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ "নকল করিয়াছ তো?" পাওনাদার বাড়িতে আসিয়াছে দেখিয়া পিতা বালক পুত্রকে বলিলেন ঃ "বলে দাও—বাবা ভাগলপুরে গেছেন।" সরলমন শিশু বাহিরে আসিয়া বলিল ঃ "বাবা বললেন যে, তিনি ভাগলপুরে গেছেন।" সমাজের ইহার অধিক আর কত করুণ অবস্থা আমরা কল্পনা করি! পুলিশের [ব্রিটিশ পুলিশ] দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা ব্রাহ্মণদিগকে হিহি করিয়া হাসিতে শুনিয়াছি! সারাংশ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যাহারা সমাজের 'front bench'-এ আসিয়াছিল, তাহারা—

(১) মূর্খ, অত্যাচারী, অলস জমিদার অথবা

(২) কপট ধূর্ত ইংরেজ শাসনের সহায়ক কপট ধূর্ত উকিল অথবা

(৩) বিদেশি শিক্ষার সাহায্যে দেশের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আগ্রহী অধ্যাপকগণ। সরকারি কর্মীদের কথা তো বলাই বাহুল্য। বিপদে পড়িলে তাহারা স্মৃতিরত্ন, তর্কালঙ্কার মহাশয়দিগকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিত না, উকিলের নিকট ছুটিয়া যাইত। কুষ্ঠাশ্রমে রোগীদের জন্য ক্রীত দুধ ডাক্তারগণ চুরি করিয়া খাইত। তাহাদের সাধারণ মানুষ 'liscenced murderer' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল।

যদি বল ঠাকুর আসিয়া কি করিলেন? সেকথার উত্তর সংক্ষেপে দিব।

প্রথমত, স্বামীজী বিলাতে গিয়া মেমসাহেবকে চেলা করিয়া ভারতে আনিলেন। তখন দেশের লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। দেশের শিক্ষিত সমাজের এমনই দুরবস্থা হইয়াছিল যে, সাহেব-মেম চেলা হইবার কারণে তিনি দেশের লোকের চোখে পড়িলেন, নতুবা কেহ তাঁহাকে পাতেই তুলিত না!

দ্বিতীয়ত, ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর স্বদেশের দিকে লোকের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া দেশের লোক সন্ন্যাসের আদর্শকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিল।

এইভাবে দেখিতে পাইতেছি, ক্রমে দুষ্টব্যক্তিকে পিছনে ফেলিয়া মহৎ ব্যক্তিগণ সমাজের সম্মুখের সারিতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অবতার যখন আসেন, তখন নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে দুষ্টলোকের ক্ষয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান নিজের হাতে নিজেই দুষ্ট লোককে হত্যা না করিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। ইহাকে 'মিথ' বলিতে পার। কিন্তু আমরা তো দুটি বিশ্বযুদ্ধ স্বচক্ষেই দেখিলাম।

[মন্তব্য : শ্রীধরস্বামী গীতার টীকাতে লিখিয়াছেন যে, দুষ্ট নিগ্রহে ঈশ্বরের নির্দয়তা নাই। তিনিই তো সর্বসৃষ্টির মূলে। বালককে শাসন বা দমন করিলে কি বালকের প্রতি মাতার অ-কারুণ্য প্রকাশ পায়? না। বরং বালকের কল্যাণের জন্যই তাহাকে শাসন, নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আছে যে, দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভাদি দৈত্যগণের সম্মুখে নিজ মহিমা প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই অসুর শুম্ভ-নিশুম্ভের বধ হইয়া দুই জ্ঞানীর আবির্ভাব হইল। 'বধ' শব্দের এইভাবেই অর্থ করা হইয়াছে।—**সম্পাদক**]

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৯।।

শ্লোকার্থ : *হে অর্জুন, যিনি আমার এইপ্রকার অলৌকিক বা মায়িক জন্ম-কর্ম (সাধুদের পরিত্রাণ ইত্যাদি অপ্রাকৃত কর্ম) তত্ত্বত (দার্শনিকভাবে ও অনুভূতি দ্বারা) জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন এবং দেহান্তে আর পুনর্জন্মপ্রাপ্ত হন না।*

ব্যাখ্যা : শ্রীভগবান কেমন? তিনি সমষ্টি-দেহ, সমষ্টি-মন। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীর মনগুলিকে একত্রিত করিলে সমষ্টি মন তৈরি হয়। তাই সমাজের কোনস্থানে কোন ক্ষত সৃষ্টি হইলে সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর কালোপযোগী একটি দেহ সৃষ্টি করিয়া সেই ক্ষতের প্রেক্ষিতে কোন্ বস্তুগুলি হেয় (ত্যজ্য) এবং কি কি গ্রাহ্য তাহার আদর্শ স্বয়ং দেখাইয়া যান।

অবশ্য তাঁহার এই দেহনির্মাণ সাধারণ মানুষের ন্যায় নহে। তাঁহার স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর আমাদের ন্যায় পূর্বসংস্কারজাত নহে। সেই শরীর মায়ার দ্বারা নির্মিত। সাধারণ মানুষের এই তত্ত্ববোধ নাই বলিয়া তাহারা তাঁহার রক্তমাংসের শরীরকে প্রাকৃত শরীর বলিয়াই ভাবে। এই জন্মবৃত্তান্তই তাঁহার তত্ত্ব।

তিনি যেসকল কর্ম করেন, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র আসক্ত নন এবং ঐসকল কার্যে তাঁহার কোন দায়িত্ব কিংবা দায়-বদ্ধতাও নাই। কোন 'প্রিয়-অপ্রিয়'-র ব্যাপারও নাই। কারণ, তিনি নিজেকে দেহ-মন হইতে মুক্ত বলিয়া বোধ করেন।

যাঁহারা অবতারের এই দিব্য জন্ম-কর্মের তত্ত্ব ও লীলা জানেন, তাঁহারা মুক্ত হইবেন। যদি কেহ শুধুই লীলাচিন্তা করে? তাহা হইলেও উপাসনাযোগে তাহার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন খসিয়া যাইবে। [ক্রমশ] ।।চোদ্দ।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

শব্দচেতনা ৩০

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত বিশেষ শব্দছক

■	১	২		■	৩	৪		■
৫	■		■	৬	■		■	৭
৮		■	৯			■	১০	
	■	১১	■		■	১২	■	
■	১৩			■	১৪			■
১৫	■		■	১৬	■		■	১৭
১৮		■	১৯			■	২০	
	■	২১	■		■	২২	■	
■	২৩			■	২৪			■

পাশাপাশি : (১) শ্রীশ্রীমায়ের ছোটভাই (৩) শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবিকা (৮) "—— আর বিশ্বাস থাকলেই সব হয়ে গেল।" (৯) মা এই নামে তাঁর অন্যতম সেবক সন্তানকে ডাকতেন (১০) শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা এই তীর্থে এসেছিলেন (১৩) "—— পাপে রাজ্য নষ্ট হয়।" (১৪) শ্রীশ্রীমা একে বগলামূর্তি দেখিয়েছিলেন (১৮) "—— -এ লাভ, এছাড়া কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন?" (১৯) "সর্বদা তাঁর স্মরণ —— করে প্রার্থনা করতে হয়, প্রভু সদ্বুদ্ধি দাও।" (২০) "বহু তপস্যা করলে এই —— শুদ্ধ হয়।" (২৩) "আমার যে শ্বশুর ছিলেন, মা, বড় তেজস্বী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।... মা —— তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন।" (২৪) "মনটাকে বসিয়ে —— না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল।"

ওপর-নিচ : (২) "মনে —— হলো, ভাবলুম ঠাকুর কি তাহলে আমাকে এবার রাখবেন না!" (৪) মা ——পেড়ে শাড়ি পরতেন (৫) বিভূতিভূষণ ঘোষকে মা বলতেন, 'কালো——' (৬) স্বামী শান্তানন্দকে মা এই নামে ডাকতেন (৭) এই তীর্থে শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন (১১) "রাজার পাপে —— কষ্ট ও দৈব উৎপাত, যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ।" (১২) এঁর মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : "একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল। কী ভক্তি-বিশ্বাসই ছিল!" (১৫) "—— ছাড়িতে নারে জীবের দায়, দায়..." (১৬) "দক্ষিণেশ্বরে যেন —— -এর হাটবাজার বসে যেত।" (১৭) "অসুখ হলে ঠাকুরদের —— করলে বিপদ কেটে যায়; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।" (২১) "ভক্তের আবার —— কি? সব ছেলে এক।" (২২) "মন আলগা পেলেই যত —— বাধায়।"

কে. কর্মকার

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ফাল্গুন ১৪১০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক পটভূমিকা

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
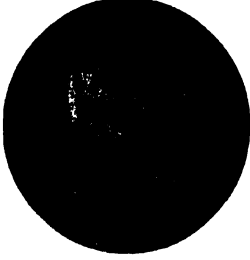
ধর্ম ঃ জাতিগত বনাম আধ্যাত্মিক

ধর্মের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন বিশেষত বিশ্বধর্মের উচ্চে আসীন প্রতিটি ধর্মেরই দুটি দিক প্রকাশ করে—সামাজিক-রাজনৈতিক (socio-political) অভিব্যক্তিরূপে এবং ঈশ্বর উপলব্ধির পথরূপে অথবা তার সমতুল যেকোন বিষয়ের রূপে। প্রথমটিতে রয়েছে ধর্মের বিভিন্ন কর্ম-অকর্ম, খাদ্য, পোশাক, বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক শৃঙ্খলা। এছাড়াও আছে পৌরাণিক কাহিনী, লোকগাথা, সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্বসমূহ ইত্যাদি। এগুলি যেকোন ধর্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান গঠন করে, যা আদমশুমারির নথিতে একটা জায়গা করে নেয় এবং অন্যান্য ধর্মের থেকে একে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। এটি ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গঠন করতে পারে না, শুধু ধর্মের ইতিহাস-নির্ধারিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তিটুকুই প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মবিজ্ঞান ধর্মের শ্রেণিবিভাগ করে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ এবং কর্মযোগ-রূপে। এই দ্বিতীয় দিকটিতে থাকে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ, যার মধ্যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতা, উপাসনা, ভক্তি এবং নিয়মানুবর্তিতার—যা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুনিশ্চিত করে। এগুলির মধ্যে নিহিত থাকে ধর্মের প্রয়োজনীয়, অপরিবর্তনীয় ও সার্বজনীন প্রাণকেন্দ্র আর প্রথমোক্ত দিকটি অনিত্য ও পরিবর্তনীয় অংশটি গঠন করে—যা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যদি সেটা পরেরটির অভিব্যক্তিকে বাধা না দেয়।

ভারতীয় ঐতিহ্যে আগেরটিকে 'স্মৃতি' ও পরেরটিকে ধর্মের 'শ্রুতি' উপাদান বলে। শ্রুতিকে সনাতন ও সার্বজনীন গ্রাহ্যরূপে ধরা হয়, আর স্মৃতির প্রয়োগ আঞ্চলিক ও সাময়িক। এই নীতি অনুযায়ী শ্রুতি সনাতন বা চিরন্তন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, আর স্মৃতি যুগধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট যুগের ধর্ম যা পরিবর্তনযোগ্য। ফলে ভারত যুগধর্মকে ধর্মের সেই গঠনরূপে দেখে, যা পরবর্তী কালের সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কেননা তা মানবজীবনের শর্তগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকে। সুতরাং ভারতীয় ধারা পরিবর্তনের উপযোগী স্মৃতি এবং যুগধর্মের উপায় প্রস্তুত করেছে, পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে যা বাতিল ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে তাকেও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। মানবিক ও সামাজিক অবক্ষয় এইসব সামাজিক ধর্মের পরিত্যক্ত উপাদানগুলির প্রাধান্যেরই ফসল। এগুলি সামাজিক রীতির কঠোরতা, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ, আন্তর্ধর্মীয় ও অন্তর্ধর্মীয় সঙ্ঘাত, অ-সম্প্রীতি, নির্যাতন, স্থবিরতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির গতিহীনতাকে টিকিয়ে রাখতে চায়।

স্মৃতি-শ্রুতির ধারণার এই আলোকে আমরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কেবল একটি দিকেরই অর্থাৎ শ্রুতি উপাদানের নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাই—যা কিনা ঈশ্বর অভিমুখে আধ্যাত্মিক পথ—কিন্তু এর সামাজিক তথা রাজনৈতিক অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্মৃতি উপাদানের সঙ্গে এই বিজ্ঞানকে প্রায় সম্পর্কহীনই বলা চলে। জাতিগত ধর্ম অভিধাটির বৈশিষ্ট্য হলো স্মৃতি উপাদানের দলগত স্বাতন্ত্র্য এবং সঙ্কীর্ণ আনুগত্যের প্রাধান্য। আর এ হলো সেই জাতিগত ধর্ম যা কালক্রমে বদ্ধ হয়ে পড়েছে, সামাজিক পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানও যাবতীয় সৃষ্টিশীল সামাজিক প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে। সমস্ত ধর্মের জাতিগত অংশ কালক্রমে পুরোহিত ও সামন্ততন্ত্রের শক্তির কাছে ক্রমবর্ধমান হারে কুক্ষিগত হয়েছে, আর সার্বজনীন আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে আচার্যপুরুষ [প্রফেট] ও অবতারগণের মধ্যে। ধর্মের জাতিগত দিকটি টিকে থাকবেই, কিন্তু হিন্দু ঐতিহ্য একথাই বলে যে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হলে এই দিকটাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক দিকের অধীনস্থ করে রাখতে হবে।

ভারতের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসে হিংসাত্মক সামাজিক উত্থান-পতন বা রক্তাক্ত বিপ্লবের অনুপস্থিতি এই সামাজিক প্রজ্ঞারই ফল। তার পরিবর্তে আমরা দেখি মূল্যবোধের ভিত্তি অটুট রেখে নতুন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সুস্থির সমঝোতার চিত্র। ভারতীয় সামাজিক উপলব্ধি ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়েছে, বিপ্লবের পথে নয় অথবা বলা যায় বিবর্তনমূলক পরিবর্তনটি বৈপ্লবিক প্রকৃতির, তবে সেখানে গুরুতর সামাজিক বিরোধ ও হিংসার কোন ভূমিকা নেই। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর এবং পরবর্তী সংস্কারকদের প্রভাব সর্বদাই সৃষ্টিশীল, গঠনমূলক, শান্তিপূর্ণ ও পরিব্যাপক। ভারত স্বাভাবিকভাবেই এঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং এপথেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সম্পূর্ণ ভুলভাবে ভারতীয় সমাজকে পরিবর্তনহীন বলা হয়। ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মগতরূপ—উভয় ক্ষেত্রেই, তার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও

ভারতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন ঃ "যাঁরা হিন্দু আইন বিষয়ে হিন্দু ভাষ্যকারদের কাজ সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা জানেন—সেইসব ভাষ্যকারদের প্রভাবে কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। সামাজিক নমনীয়তা হিন্দুধর্মের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সনাতন ধর্মকে তুলে ধরা মানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। এর অর্থ হলো গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি গ্রহণ করে আধুনিক জীবনে তাকে কাজে লাগানো। প্রত্যেক প্রকৃত উন্নতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে সংরক্ষিত রাখে।" (দ্রঃ Religion and Society, pp. 114-115)

ঋগ্বৈদিক দেবতা এবং তাঁদের উপাসনাপদ্ধতি অথবা ঋগ্বৈদিক সমাজ ঋগ্বেদের হাজার বছর পরে প্রামাণ্যরূপে হাজির ছিল না। আসল কথা হলো, বিভিন্ন স্মৃতিই সমাজের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, অন্যথায় প্রথম স্মৃতিটিই সমগ্র সময়কাল জুড়ে চালু থাকত। কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার—শ্রুতি যার প্রতিনিধিত্ব করে—আজও পর্যন্ত অটল ও সুস্পষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের বলিষ্ঠ উক্তি সামাজিক নিয়মের এই পরিবর্তনশীল চরিত্রকে—স্মৃতি যার প্রতিনিধিত্ব করে—চমৎকার বিশ্লেষণ করেছে ঃ "নবাবী আমলের টাকা বাদশাহি আমলে চলে না।"

স্মৃতিসমূহ নিজেরাই সামাজিক পরিবর্তনের এই নীতিকে স্বীকৃতি দেয়। মনুস্মৃতি (১।৮৫) বলে ঃ "কৃতযুগে [সত্যযুগে] মানুষের জন্য ধর্মের এক ধরনের বিন্যাস ছিল, আবার ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই প্রতিটি যুগে তার বিন্যাস ছিল আলাদা আলাদা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মেরও পরিবর্তন হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ধর্মের বিরোধিতা করেননি বা নতুন কোন ধর্ম প্রচারও করেননি। তিনি সব ধর্মকেই ভালবাসতেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর আদর্শকে দূর-দূরান্তে বয়ে নিয়ে গেছেন, যে-আদর্শ ছিল মানবতার আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ। ভারতের ক্ষেত্রে অনড় অটল মনোভাব আর ভারতীয় ধারার কিছু ক্ষয়িষ্ণু উপাদানের মধ্যেই তিনি একাজের প্রধান বাধা দেখেছিলেন, যার মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর হচ্ছে জাতপাত-সর্বস্বতা, অস্পৃশ্যতা ও আত্মকেন্দ্রিক ধার্মিকতা। 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' বক্তৃতায় এবং 'পত্রাবলী'তে তিনি ভারতীয় ধারার স্মৃতি উপাদানের এই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন উপনিষদের শক্তিশালী, সঙ্ঘবদ্ধ এবং উদার আধ্যাত্মিকতা বা বলা যায় ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রুতি উপাদানকে। তিনি তাঁর দেশের ঐতিহ্যে শ্রুতি অঙ্গের শক্তি ও মহিমা দেখেছিলেন তাঁর গুরুদেবের উজ্জ্বল জীবনের মধ্যে। সেজন্য তিনি দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জাতীয় ঐতিহ্যের জাড্য উপাদানগুলিকে নির্ভয়ে ধ্বংস করতে এবং নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে, যা ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার-ভিত্তিক হয়েও আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উত্তরাধিকারকেও গ্রহণ করবে।

এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফল

বিগত ষাট বছরে মৌলিক সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে সমস্ত মানুষের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলই লক্ষ্য করা যায়। এরকম বহু সংস্কার—যেমন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মন্দিরের দরজা হরিজনদের জন্যও খুলে দেওয়া, হিন্দু আইনের সংস্কার রীতিভুক্ত করা, ভারতীয় সংবিধানে আন্তর্দলীয় সম্পর্কে জাতপাত অস্বীকার, জাতপাতের বেড়া এমনকি খাদ্য ও বিবাহের ব্যাপারে কুল ও ধর্মমতের বেড়াও ভেঙে ফেলা এবং সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশযাত্রার বিরোধিতার বিলোপ ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। এধরনের অনেকগুলি আইনের পিছনে শিক্ষিত জনগণের সায় ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের মৌলিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সামাজিক সঙ্ঘাত বাড়তে দেননি, বরং ঐ ঐতিহ্যের পুনঃস্থাপনা ও উন্নতিতে সাহায্য করেছেন।

আধুনিক যুগে ভারতীয় ঐতিহ্যের এই বিবর্তন ও বিকাশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভারতীয় নারীর জাগরণ ও সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্তি। এটা লক্ষণীয় যে, অন্যান্য পশ্চিমী দেশের মতো ভারতের কোন নারীবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নেই। যে-পথে ভারতীয় সামাজিক প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যেই এঘটনার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যখন একটি বিশ্বমত নারীদের আকাঙ্ক্ষা ও দাবির বিরোধিতা করেছে এবং পুরুষরা সেই বিশ্বমতকে সময়ের চাহিদার বিরুদ্ধে সমর্থন করেছে, তখনি নারীবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বর্তমান পাশ্চাত্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সেকথাই বলে। ভারতে কিন্তু পুরুষরাই ভারতীয় নারীর দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপও নিয়েছে। এগুলি পুষ্ট হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক উপাদানের সাহায্যে, যে-ঐতিহ্য বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে, যেমন পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ভারতে কোন বিরোধিতার প্রশ্নই নেই—'আন্তর্জাতিক স্টাডি গ্রুপ' যে-বিষয়টির উল্লেখ করেছে। এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের গ্রহিষ্ণু চরিত্রের আরেকটি উদাহরণ। ভারতীয় সংবিধান তার বৃহৎ গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সার্বিক লক্ষ্যে যুক্ত করেছে প্রজ্ঞার স্পর্শ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও তার আত্তীকরণের ক্ষমতাকে। ভারতীয় গণতন্ত্রের সুস্থ কার্যকারিতা, সাধারণ নির্বাচনের সাফল্য, প্রায় ২০ কোটি ভোটদাতার অংশগ্রহণ বর্তমান বিশ্বে এক বিস্ময়কর গণতান্ত্রিক চিত্র। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাণবন্ততা ও প্রজ্ঞার এটিও একটি অভিনব ফল।* ❑

---

* পূজ্যপাদ মহারাজের 'The Eternal Values for a Changing Society' গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকে নির্বাচিত এই অংশটির অনুবাদ করেছেন সৌমিত্র ঘোষাল—**সম্পাদক**

সেদিন

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যেদিন এ দেহ ছাড়ি,
শোক মোহ পরিহরি,
স্বরূপে মিলিব পুনরায়।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যবে হয়ে শ্বাস রোধ
জড় জগতের বোধ
লুপ্ত হবে পড়িয়ে ধরায়;
জায়া পুত্র সহোদর,
সেদিনে করিবে হায় হায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

যবে কাটি মায়া ডুরী,
গুরুপদ শিয়রে ধরি,
ব্রহ্মালোক ভেদ করি,
উঠিব সেথায়;
নাহি যথা দেশকাল,
মৃত্যুভয় বিকরাল,
অস্তি নাস্তি বিলুপ্ত যথায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যবে গুরু অগ্রে করি,
উন্মুক্ত গগনোপরি,
গ্রহতারা লোক ছাড়ি,
উঠিব ত্বরায়।
হোয়ে আরো অগ্রসর,
গুরু শিষ্যে পরস্পর,
যবে ভেদ মিলিবে আত্মায়।
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

যবে ছাড়ি ত্রিসীমা মায়ার
ভবসিন্ধু হয়ে যাব পার।
দেশকাল ব্যবধান,
হবে যবে অন্তর্দ্ধান,
যবে হব ভূমানন্দ কায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যবে বন্ধু পরিজন,
স্কন্ধে করি আরোহণ,
চিতাভূমে শোয়াবে আমায়;
ভস্ম করি নর দেহ,
ফিরিবে আপন গেহ,
নামরূপ ধুইয়ে গঙ্গায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

যবে রোগ শোকের আশ্রয়
দেহ হবে পঞ্চতত্ত্বে লয়;
যবে চিতাপূতিধূমে,
আচ্ছন্ন করিবে ব্যোমে
হাড় মাংস খশিবে চিতায়,
অথবা কুক্কুর ফেরু
চিবাবে পঞ্জর মেরু
মাঠে ঘাটে কে জানে কোথায়?
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

মরণ যে স্বরগের দ্বার,
এ সিদ্ধান্ত বুঝিয়াছি সার।
আত্মচক্ষু আছি জেগে,
আহিত সংস্কার বেগে,
সুখ দুঃখ, অতিদুর্নিবার,
যা হবার হোকগে আমার;

কিন্তু গুরুকৃপাবলে,
কালদণ্ড অবহেলে,
ভেঙ্গেছি,—ভেঙ্গেছি স্বর্গদ্বার;
ত্রিকাল যে উন্মুক্ত আমার।
এবে শুধু সাবহিত,
জাতবেগ চক্রমত,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিন যায়;
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যবে মুক্ত ব্যোমপ্রায়,
লভি অবিনাশী কায়,
থাকিব জ্যোতিষ্ক স্বপ্রভায়,
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।

সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়;
যেদিন গগন মত
হেথাতথা বিরাজিত,
রাজিব—ঘুচিয়ে অন্তরায়,
না থাকিবে একভিন্ন,
আনন্দ অপরিছিন্ন,
অহমিদমেকত্ব যথায়
সেদিনের আছি প্রতীক্ষায়।।
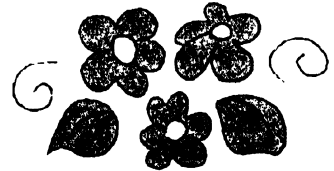
সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগবাজারে বলরাম-মন্দির

নির্মলকুমার রায়

> শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার দ্বাদশ পর্যায়ে বাগবাজারে বলরাম-মন্দির।
>
> —সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত বলরাম বসুর উত্তর কলকাতার বাগবাজারের বাসভবনটি শ্রীশ্রীঠাকুরের শতাধিকবার শুভাগমন ও অবস্থান ছাড়াও শ্রীশ্রীমায়ের বহুবার আগমন ও অবস্থানে পবিত্রীকৃত। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ পার্ষদগণের বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং পরবর্তী কালে এই বাড়িতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের দেহরক্ষা প্রভৃতি ঘটনায় বাড়িটি আজ পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য। বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িতে ঠাকুরের বিভিন্ন লীলা, ভক্তসঙ্গে মিলন, রাত্রিবাস, 'শুদ্ধ' অন্নগ্রহণ, রথটানা, হরিনামসঙ্কীর্তন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, মুহুর্মুহু সমাধি প্রভৃতি ঘটনায় সমৃদ্ধ এই বাড়িটিকে ঠাকুর তাঁর অন্যতম 'কেল্লা' বলে মনে করতেন। বলরাম বসু নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করায় ঠাকুর তাঁকে 'তৃতীয় রসদদার' হিসাবে গণ্য করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঠাকুরের প্রথম ও প্রধান 'রসদদার' ছিলেন মথুরমোহন বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় 'রসদদার' ছিলেন শম্ভু মল্লিক। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর প্রথমে এই বাড়িতেই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা পূত অস্থির ভস্মাধার এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি এনে রেখেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে এই বাড়িতেই স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে "এইরূপে বহুধা পবিত্রীকৃত এই ভবনটি পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'বলরাম-মন্দির' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত হয়।"[১]

বলরাম বসু শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বলতেন ঃ "ক্ষমারূপা তপস্বিনী।"[২] শ্রীশ্রীমাও বলরামবাবু সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "গৃহীদের মধ্যে বলরামবাবু সবচেয়ে বড়। সব ভক্ত হিসাবে বড়।"[৩] শ্রীশ্রীঠাকুর ও বলরামবাবুর মধ্যে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে, শ্রীশ্রীমায়ের ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকা ঠাকুর বলরামের কাছেই গচ্ছিত রেখেছিলেন। বলরামবাবু ঐ টাকা জমিদারিতে খাটিয়ে ছয়মাস অন্তর ৩০ টাকা সুদ শ্রীশ্রীমাকে পাঠিয়ে দিতেন।

ঠাকুর বলতেন ঃ "বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা।" বলরাম বসুর শ্যালক, বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) ছিলেন ঈশ্বরকোটি। তাঁর ভগিনী তথা বলরামবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ তিনি "শ্রীমতীর (রাধারানীর) অষ্টসখীর প্রধানা।" বলরামের তিন সন্তান ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী—সকলেই ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য।

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনপঞ্জী অনুযায়ী এই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন বা অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি এইরকম ঃ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন। সেখান থেকে ৩০ আগস্ট বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন মাসে বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান। ৫ নভেম্বর সেখান থেকে জাহাজে পুরীযাত্রা। ১৮৯০ (আনুমানিক) খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বলরাম বসুর অসুস্থতার সংবাদে বলরাম-ভবনে আগমন; সেই বছরেই আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রক্ত-আমাশয় রোগভোগের পর পুনরায় বলরাম-ভবনে অবস্থান। ১৮৯৪

বাগবাজারে বলরাম-মন্দির

খ্রিস্টাব্দে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) কন্যার মৃত্যুতে কাতর বলরাম বসুর পত্নীর সঙ্গে উড়িষ্যার কৈলোয়ারে গমনের জন্য আগমন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে গিরিশ-ভবনে দুর্গাপূজায় যোগদানের জন্য অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় আগমন ও বলরাম-ভবনে অবস্থান।
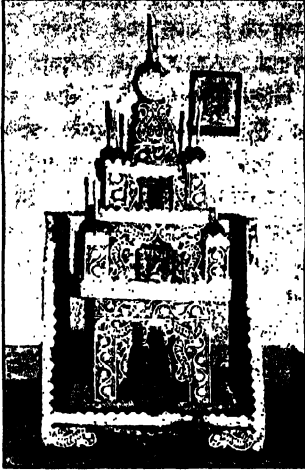
বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপূত রথ

ওপরের তালিকাটি ছাড়াও বলরাম-ভবনে অন্যান্য সময়েও শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমন হয়েছিল বলে জানা যায়। যেমন, দক্ষিণেশ্বরে ও শ্যামপুকুরবাটীতে থাকাকালীন ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা বলরামবাবুর অসুস্থা স্ত্রীকে দেখতে এখানে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে আগমনই এখানে তাঁর প্রথম আগমন বলে অনুমিত হয়। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের নিজমুখের উক্তিঃ "রামের মার (অর্থাৎ বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর মা) অসুখ হয়েছিল। ঠাকুর আমায় বললেন, 'যাও, দেখে এস গে।' আমি বললুম, 'যাব কিসে? গাড়িটাড়ি নেই।' ঠাকুর বললেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে। হেঁটে যাও।' শেষে পালকি পাওয়া গেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসলুম। দুবার এসেছিলুম। আর একবার—তখন আমি শ্যামপুকুরে—রাত্রে হেঁটে রামের মার অসুখ দেখতে আসলুম।"[৪]

বাগবাজারের বলরাম-ভবন ছাড়াও শ্রীশ্রীমা পুরীতে বলরামবাবুর গৃহ 'শশীনিকেতন' ও 'ক্ষেত্রবাসী মঠ'-এ অবস্থান করেছেন এবং তাঁদের জমিদারি কোঠারেও শুভাগমন করেছেন।

বলরাম-ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্মরস-সিঞ্চিত বহু লীলাকাহিনী নানা প্রামাণিক গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। সবগুলির উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়; কেবল দু-একটি ঘটনার কথা এখানে পরিবেশিত হলো।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রখ্যাত জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ "১২৯৫ সালের আরম্ভে (সম্ভবত জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে) শ্রীমা ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া বলরামবাবুর বাড়িতে উঠিলেন। এই সময় কিংবা ইহারই কাছাকাছি কোন একসময়ে শ্রীমায়ের ধ্যানতন্ময়তা ও সমাধির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে ধ্যান করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থা হইয়াছিলেন এবং ব্যুত্থিতাবস্থায় শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখলুম কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদর-যত্ন করছে! আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে! ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে। সে যে কী আনন্দ বলতে পারিনে! একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতরে ঢুকব। ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এল।' "[৫]

আরেকটি উপভোগ্য ঘটনা হলো—১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গিরিশবাবুর গৃহে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসে বলরাম-ভবনে উঠেছিলেন। সেসময় লাটু মহারাজও (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) এই বাড়িরই নিচের একখানা ঘরে থাকতেন। বলরাম-ভবনে মা সেবার প্রায় মাসখানেক ছিলেন। প্রতিদিনই মা লাটু মহারাজের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। মা যেদিন জয়রামবাটীতে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করছেন, সেদিন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকলেই একে একে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসছেন, কিন্তু লাটু মহারাজ মনের দুঃখে মাকে প্রণাম করতে ওপরে গেলেন না। আপনমনে নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেনঃ "সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া!" এদিকে যাত্রার সময় উপস্থিত, মা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। অদ্ভুতানন্দজীর কণ্ঠস্বর তখন কিছু উচ্চগ্রামে। স্নেহময়ী জননী সন্তানের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে করুণাসিক্ত কণ্ঠে বললেনঃ "বাবা নাটু! তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা!" মায়ের এই কথাতেই লাটু মহারাজের সমস্ত দুঃখ-অভিমান মুহূর্তে স্তিমিত হলো। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। মায়ের চোখেও তখন জল। লাটু মহারাজ তাঁর নিজের উত্তরীয় দিয়ে মায়ের চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেনঃ "বাপ-ঘরে যাচ্ছ মা!

কাঁদতে কি আছে? আবার শরোট্ তোমায় শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আসবে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি?”
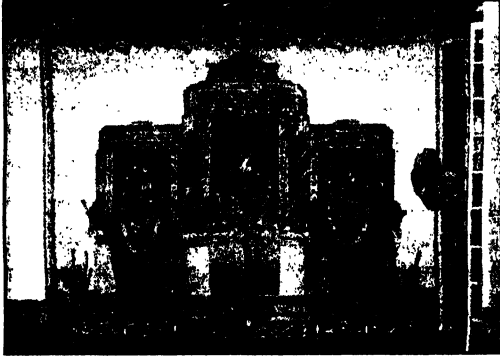
বলরাম-মন্দিরের গর্ভমন্দির

শ্রীশ্রীমায়ের এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর ভবনটি দৈবী মহিমায় অবস্থান করছে।

বলরাম বসুর প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম বসু শ্যামবাজারে তাঁর প্রাসাদোপম ভবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের নাম থেকেই অঞ্চলটির নাম হয় ‘শ্যামবাজার’। সেখান থেকে বলরামবাবুর পিতামহ গুরুপ্রসাদ শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে ওড়িশার জমিদারি কোঠারে চলে আসেন। সেখানেই বলরামবাবু তাঁর পিতা রাধামোহন বসুর সঙ্গে বাস করতেন। পূর্বে বাগবাজারের এই বাড়ির মালিক ছিলেন থিওসফিস্ট দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলরামবাবুর জ্যাঠতুতো ভাই, কটকের উকিল রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই বাড়িটি কেনেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারেই বলরামবাবু সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। হরিবল্লভ ও তাঁর অপর দুই ভাই নিঃসন্তান থাকায় তাঁদের অবর্তমানে বলরামবাবুর একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ বসু এই বাড়ির স্বত্বাধিকারী হন। যদিও এই বাড়িটিকে ‘বলরাম বসুর বাড়ি’ বা ‘বলরাম-মন্দির’ বলা হয়, কিন্তু কোনদিনও বলরামবাবু এই বাড়ির মালিক ছিলেন না। রামকৃষ্ণ বসুর পাঁচ কন্যা ও একমাত্র পুত্র হৃষীকেশ। রামকৃষ্ণ বসু মাত্র ৪৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ পাঁচজনের এক ট্রাস্ট বোর্ড (রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক এই পাঁচজনের বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হন) গঠন করে বাড়িটি ‘দেবত্র’ করে দেন এবং ট্রাস্ট দলিলে জনগণের কল্যাণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে এটি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদবধি ট্রাস্টের অধীনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই বাড়ির বহির্ভাগটি ব্যবহার করতে থাকেন। রামকৃষ্ণ বসুর একমাত্র পুত্র হৃষীকেশের মাত্র ১০ বছর বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বিধবা স্ত্রী খুড়শ্বশুর সাধুপ্রসাদ বসুর কনিষ্ঠ পৌত্র রাধাকান্ত বসুকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তিনি সপরিবারে বলরাম-মন্দিরের উত্তর ভাগে দ্বিতলের একাংশে বাস করতে থাকেন। অতঃপর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ট্রাস্টিগণের মাধ্যমে সমগ্র বাড়িটি বেলুড় মঠের অধীনে আসায় বর্তমানে এটি বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র-রূপে পরিগণিত।

পূর্বে এই বাড়ির ঠিকানা ছিল—৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট, পরে বাড়ির সংলগ্ন নতুন রাস্তা গিরিশ অ্যাভিনিউ তৈরি হলে ঠিকানার পরিবর্তন হয়। বাড়িটি সাবেক ধরনের, দুটি উঠানযুক্ত, দোতলা। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই বাড়ির প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণদিকে। বহির্বাটীতে প্রবেশ করে বামদিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলে ডানদিকে পড়ে একটি বড় হলঘর ও তার সংলগ্ন আরেকখানি ঘর। হলঘরটিতে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মিলিত হতেন, আর সংলগ্ন ঘরটিতে রাত্রিবাস করতেন। বর্তমানে ঠাকুরের শয়ন-ঘরটিকে গর্ভমন্দির করা হয়েছে এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা হয়েছে। হলঘরটি বর্তমানে প্রার্থনাগৃহ-রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়ির অন্দরমহলের দ্বিতলের যে-ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা বাস করতেন, সেখানে তাঁর পট স্থাপন করে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যময় এই বলরাম-মন্দির সম্পর্কে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সেই অমূল্য মন্তব্যটি যেন আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে—“ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে।”[৬] ❑

পথনির্দেশ ঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য ‘বলরাম-মন্দির’-এর ঠিকানা ঃ ৭ গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০০৩। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে গিরিশ অ্যাভিনিউ ও রামকান্ত বসু স্ট্রিটের সংযোগস্থলের পশ্চিমদিকে এই ঐতিহাসিক ভবনটির অবস্থান।

তথ্যসূত্র

১ ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৬
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ১৭৪
৩ ঐ, পৃঃ ২৪০
৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (অখণ্ড), পৃঃ ২১৫
৫ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১৭৯
৬ ‘কথামৃত’, ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

এই রচনাটি ‘স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা’-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ব্রাজিল, আর্জেণ্টিনা ও উরুগুয়েতে কয়েকদিন

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রিও ডি জেনিরো

১ জুন। স্থানীয় ছুটির দিন। সকাল ৯টার সময় আমরা রিও ডি জেনিরোয় পৌঁছালাম। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই শহরটি ছিল ব্রাজিলের রাজধানী। বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট এই শহরটি ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এটি বিশ্বের অন্যতম সৌন্দর্যপূর্ণ নগরী-রূপেও পরিচিত। এই শহরটিকে পরিবেষ্টন করে আছে সমুদ্র এবং ছোট ছোট পার্বত্য টিলা, যেগুলির উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে ২,০০০ ফুট বা তারও বেশি হবে। এই শহরের সমুদ্রসৈকতগুলি, বিশেষত 'কাপাকাবানা' পৃথিবী-বিখ্যাত। প্রতি বছর হাজার হাজার ভ্রমণার্থী এই সমুদ্রসৈকতগুলির আকর্ষণে এখানে ছুটে আসে। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি পর্তুগিজরা প্রথম সমুদ্রযাত্রা করে এই উপসাগরে প্রবেশ করে। ভ্রমবশত তারা মনে করে যে, তারা এক বৃহৎ নদীর মোহনা আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেই কারণেই তারা এই শহরটির নামকরণ করে 'রিভার জানুয়ারি', যা থেকে উৎপত্তি হয় 'রিও ডি জেনিরো' নামটির।

হ্রদের সামনে বন্দনার এক অতি সুসজ্জিত গৃহে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। 'ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স অফ ইউ. এস. এ'-এর জনৈক কর্মী গিলবার্ট নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাদের বিমানবন্দর থেকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। গিলবার্ট, তাঁর স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া এবং তাঁদের দুই পুত্র—সকলেই খুব ভক্ত। স্বামী তিলকের শিষ্যা বন্দনা শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর অনুরাগিণী।

আশ্রমের জন্য সদ্য ক্রয় করা জমিটি আমরা পরিদর্শন করতে গেলাম। গৃহটির সংস্কারকার্য তখনো চলছে। সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলি তখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। বন্দনার গৃহে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে বিকালে আবার ঐ আশ্রমগৃহে ফিরে এলাম। আমাকে নবনির্মিত মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করতে হলো। স্বামী নির্মলাত্মানন্দ প্রায় ১ ঘণ্টা পূজা করলেন। উপস্থিত ভক্তগণ 'নামাবলী ভজন' গাইলেন। দেখলাম, আরাত্রিক ভজন 'খণ্ডন ভববন্ধন' তাঁরা বেশ ভাল গাইতে পারেন। প্রায় ২০০ ভক্তের উপস্থিতিতে আমি 'আধুনিক যুগের মানুষের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলাম।

স্বামী নির্মলাত্মানন্দ প্রায় ৫ লক্ষ রিয়াল মুদ্রার (১ রিয়াল = ২৬ টাকা) বিনিময়ে রিও, বেলো হোরিজোনটে এবং কিউরিটিবার আশ্রমগৃহ-তিনটি ক্রয় করেন। রিও-র ৮৬ বছরের বৃদ্ধা কর্ডেলিয়া এই নতুন আশ্রমের ব্যাপারে খুব উৎসাহী, তিনি স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা।

২ জুন সকালে আমরা ২,০০০ ফুট উচ্চ কর্কোভাদো পর্বতশৃঙ্গে স্থাপিত মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের একটি মূর্তি দেখতে পেলাম। মূর্তিটি প্রায় ৯৯ ফুট উঁচু। যিশুখ্রিস্ট তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে যেন সকলকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। চতুর্দিকে শুধু সমুদ্র এবং পশ্চাদপটে পর্বতরাজি-শোভিত এই স্থানের দৃশ্যাবলী সত্যই অনুপম।

কর্কোভাদো পর্বতচূড়ায় মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের মূর্তি

দূর থেকে আমরা 'সুগার লোফ' পর্বতটি দেখলাম। আরেকটি ক্যাথিড্রালও আমরা দেখতে গেলাম। বিকাল-বেলা পুনরায় 'কাপাকাবানা' এবং 'ইপিনোমা' সমুদ্র-সৈকতগুলি দেখে আশ্রমে ফিরে আমি শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করলাম। তারপর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর-পর্ব। এখানে চন্দ্রা দোভাষীর কাজ করল। আশ্রমেই সান্ধ্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহিলা ভক্তগণ নানারকম আহার্য প্রস্তুত করে এনেছিলেন। আহারপর্ব শেষ হলে আমরা বন্দনার বাড়িতে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে সমুদ্রতীরে কিছুসময় প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে এসে প্রাতরাশের পর উপস্থিত ভক্তদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। তারপর আমরা গেলাম স্থানীয় 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' এবং আরেকটি সমুদ্রতটে। সেখানে বেশ ভাল কচি ডাব পাওয়া গেল।

বিকাল সাড়ে ৫টায় আমরা আবার আশ্রমে গেলাম। মহিলা ভক্তগণ পর্তুগিজ ভাষায় রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কিছু গান গাইলেন। তারপর স্বামী নির্মলাত্মানন্দ, স্বামী পরেশানন্দ এবং আমি সংক্ষেপে কিছু বললাম এবং কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিলাম।

আরতির পর রাত্রের আহার সেরে আমরা সোজা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রায় ৪০ মিনিটের উড়ানপথ অতিক্রম করে রাত প্রায় সাড়ে ১০টায় আমরা পুনরায় সাও পাওলোতে এসে পৌঁছালাম।

৪ জুন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। এদিন কাছেই একটি উদ্যানে বেড়িয়ে এলাম। ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানারকম ধর্মকথা আলোচনা হলো—অবশ্য সবটুকুই দোভাষীর মাধ্যমে।

বুয়েন্স এয়ার্স

৫ জুন অতি প্রত্যুষে আমরা সাও পাওলো থেকে বুয়েন্স এয়ার্সের বিমান ধরলাম। বুয়েন্স এয়ার্স আর্জেন্টিনার রাজধানী। প্রায় ২ ঘণ্টার উড়ান। ১০টা ৪৫ মিনিটে আমরা বুয়েন্স এয়ার্সে অবতরণ করলাম। অনেক পুরুষ ও মহিলা ভক্ত আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে প্রায় ৪৫ মিনিটের পথ অতিক্রম করে বুয়েন্স এয়ার্সের শহরতলী বেল্লা ভিস্তায় আমাদের আশ্রমে পৌঁছালাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শিষ্য স্বামী বিজয়ানন্দজী ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এই কেন্দ্রটির স্থাপনা করেন। এর জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

প্রভূত ধনসম্পদ এবং তুলনামূলকভাবে অতি অল্প-সংখ্যক জনসংখ্যার (৩,৬১,২৫,০০০) অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের জন্যই আর্জেন্টিনা আজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অতি করুণ। দলে দলে মানুষ গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে এসে কলোনি গড়ে বাস করছে। দিনে দিনে সেখানে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারটিও দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। দেখলাম, দলে দলে মানুষ ব্যাঙ্কে গিয়ে তাদের আর্জেন্টিনীয় মুদ্রাগুলি (পেসো) আমেরিকান ডলারে পরিবর্তিত করে নিচ্ছে। এইসব থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজেই তার সুখ এবং দুঃখের জন্য দায়ী।

৬ জুন সকালের আবহাওয়া ছিল বেশ শীতল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হতে থাকে। তারই মধ্যে আমরা সকাল সাড়ে ৯টায় বেল্লা ভিস্তা আশ্রম থেকে ৪৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত 'লুজান'-এ ('লুঁকান'-রূপে উচ্চারিত হয়) একটি গির্জা দেখতে গেলাম। এই বিশাল গির্জাটি মাতা মেরির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। গির্জাটি সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ফারিয়াস' নামে এক পর্তুগিজ ভদ্রলোক 'স্যান্টিয়াগো দেল ইস্তেরো'তে (আর্জেন্টিনার অন্যতম রাজ্য) কুমারী মেরির উদ্দেশে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি তাঁর জনৈক নাবিক বন্ধু আন্দ্রিয়া জুয়ানকে সাও পাওলোর একটি বিখ্যাত দোকান থেকে একটি মূর্তি ক্রয় করে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ বন্ধু তাঁর জন্য দুটি মূর্তি পাঠান—একটি পূতপবিত্র মেরির মূর্তি, অপরটি শিশুক্রোড়ে কুমারী মেরির মূর্তি। নৌকাযোগে বুয়েন্স এয়ার্স পৌঁছানোর পর মূর্তিবাহী শকটটি ধীরে ধীরে লুজান নদীর দক্ষিণতীর ধরে এগিয়ে চলল। তৃতীয় দিন সকালে কোন এক দুর্বোধ্য কারণে শকটটিকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। কোনমতেই তাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। অনেক বলদ শকটটির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে চেষ্টা করা হলো, কিন্তু কোন ফল হলো না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সেই বিস্ময়বিমূঢ় বাহকগণ পূতপবিত্র মেরির মূর্তিবাহক বাক্সটি সেখানেই নামিয়ে দিলেন। বিস্ময়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, শকটটি আবার অতি সহজে চলতে শুরু করেছে। যাঁরা ঐ শকটটি নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা সিদ্ধান্তে নিলেন—মূর্তিটি এই স্থানেই থাকুক, ঈশ্বরের বোধহয় এমনই ইচ্ছা। এই ঘটনাটিকে বলা হয় 'লুজানের অলৌকিক ঘটনা'।

দ্বিতীয় মূর্তিটিকে নিকটবর্তী এক কৃষকের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ইতোমধ্যে এই অলৌকিক ঘটনার কথা লোকমুখে বিস্তারলাভ করতে থাকায় দলে দলে মানুষ এসে সেখানে ভিড় করতে থাকে। কৃষকটি একটি ছোট্ট মন্দিরের মতো নির্মাণ করেন এবং আফ্রিকা থেকে আগত ম্যানুয়েল নামে এক ক্রীতদাস সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে ঐ কুমারীর পূজা-সেবা করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে—তার বেশির ভাগই ছিল রোগমুক্তি বিষয়ক। যেহেতু এখানে ঘন জনবসতি ছিল না, তাই স্থানীয় আদিবাসীরা এই মূর্তির কোন ক্ষতি করতে পারে—এমন আশঙ্কা করেই ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে মূর্তিটিকে লুজান নগরীর

মধ্যবর্তী এক স্থানে নিয়ে আসা হয়। লুজান নগরীর নামানুসারে মূর্তিটির নামকরণ করা হয় 'লুজানের কুমারী মূর্তি'।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানে একজন ফরাসি যাজক নিযুক্ত করা হয়। ঐ অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে কিছু সেবামূলক কাজ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কুসংস্কারবশত স্থানীয় মানুষজন তাঁকে নানারকম ব্যাধির উৎসস্থল বলে চিহ্নিত করে তাঁকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যার হুমকি দেয়। তখন তিনি লুজানের কুমারী মাতার নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন—তিনি যদি তাঁর জীবন রক্ষা করেন, তবে তিনি তাঁর সকল ইতিহাস লিখিতভাবে প্রকাশ করবেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে তিনি সেখানে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, একজন আদিবাসী এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। লুজান গির্জা নির্মাণকাহিনীর এটিই পটভূমিকা।

এই গির্জার আয়তন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার জন্য এটির কয়েকটি পরিমাপ দেওয়া হলো—চূড়ার উচ্চতা ৩৫৫ ফুট, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সর্বাধিক উচ্চতা ২২৬ ফুট, প্রবেশপথ থেকে বেদি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩২৩ ফুট।

সন্ধ্যাবেলা শহরে অবস্থিত আমাদের শাখাকেন্দ্রে গেলাম। খুব সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তায় অবস্থিত এটি একটি দ্বিতলগৃহ। সর্বসাকুল্যে ৫০ জনের মতো বসার জায়গা আছে এখানে। যেহেতু অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে বহু আগে থেকেই প্রচার করা হয়েছে, দেখা গেল অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় ১১০ জন শ্রোতা উপস্থিত। এদিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—'আধুনিক বিশ্বের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী'। মূল ঘরটি ব্যতীত সিঁড়িতে, সংলগ্ন কক্ষগুলিতে—যে যেখানে পারলেন দাঁড়িয়ে অথবা বসে আলোচনা শুনলেন। এই ভবনের দোতলায় একটি ঘর আছে। স্বামী পরেশানন্দ সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকেন। রাত সাড়ে ৯টায় আমরা বেল্লা ভিস্তায় ফিরে এলাম।

পরদিন আবহাওয়া ছিল অতি উত্তম। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। আমরা চলে গেলাম রিও ডি লাপলাটা নদী দেখতে। এই নদীর তীর ধরেই এই শহরটি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর নদীগুলির মধ্যে এটিই সম্ভবত বিশুদ্ধ জলের প্রশস্ততম আধার। এটি প্রায় ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত। নদীর অপর তীর দেখাই যায় না।

বিকাল সাড়ে ৩টায় আমরা স্থানীয় একটি পর্যটনকেন্দ্র টাইগ্রে দেখতে গেলাম। দুই নদী উরুগুয়ে এবং পারানার সঙ্গমস্থলে অসংখ্য দ্বীপ গড়ে উঠেছে। নৌকাযোগে আমরা কিছুক্ষণ নদীবক্ষে ভ্রমণ করলাম। নদীর উভয় তীরেই বেশ সুন্দর সুন্দর বাড়ি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। শুনলাম এই বাড়িগুলির মালিকরা ধনী ব্যক্তি। তাঁরা সপ্তাহান্তে অথবা ছুটির সময় এখানে বাস করেন এবং নৌকাচড়া, সার্ফিং ইত্যাদি উপভোগ করেন।
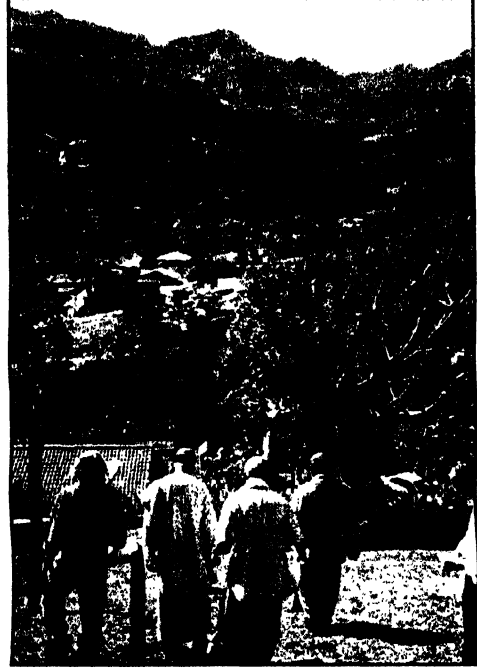
টাইগ্রি নদীর পথে লেখক ও অন্যান্যরা

৮ জুন সকালে বেল্লা ভিস্তা শহরের কিছু স্থান দেখতে যাওয়া হলো। সমগ্র পরিবেশ অতি শান্ত। বাড়িগুলিও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। লক্ষ্য করলাম, বহু বাড়িতেই বিক্রির জন্য নোটিশ লাগানো আছে, যদিও ক্রেতা নেই। সংলগ্ন শহর স্যান মিগুয়েল অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের। সেখানে বেশ কিছু বহুতল বাড়ি নজরে পড়ল। বিকালবেলা আমরা বুয়েন্স এয়ার্সে আমাদের আশ্রমের আরেকটি বাড়িতে গেলাম। ঐ বাড়িতে 'প্রতিভা ফাউণ্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তিনতলাবিশিষ্ট এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেন জনৈকা মহিলা 'শিবা-মা'। ৫৮ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই অঞ্চলে তাঁর ভালই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হতো। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে

যায়নি। আমি সেখানে 'অধ্যাত্মসাধনা—সমস্যা এবং সমাধান' শীর্ষক একটি ভাষণ দিলাম। প্রায় ১৭০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। নৈশাহার সেরে আমরা মূল আশ্রমে ফিরে এলাম।
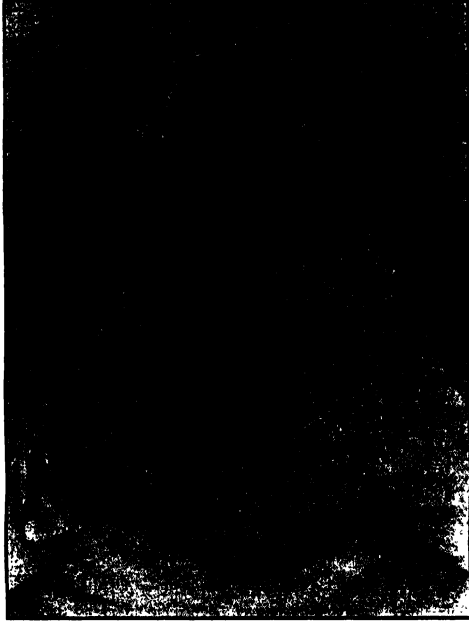
অ্যাঞ্জেলিকা লানচিয়ারি অঙ্কিত শ্রীশ্রীমায়ের চিত্র

৯ তারিখ রবিবার। দিনটির সূচনা হলো আকাশে মেঘের ঘনঘটা দিয়ে। ঐদিনই প্রধান প্রকাশ্য সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকাল থেকেই ভক্তরা সমবেত হতে লাগলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ সুন্দরভাবে সকল কাজ তদারকি করছিলেন। যেহেতু বাইরে খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, তাই সভাটিকে গৃহের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হলো। প্রায় ১০০ জনের মতো ভক্ত এখানেই মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করলেন। বিকাল ৪টায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সান্তা মাদ্রে (শ্রীশ্রীমা) সম্বন্ধে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত কিছু ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হলো। প্রায় ২৩০ জন ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিজয়ানন্দজীর বহু প্রবীণ ভক্ত ও শিষ্যও ছিলেন। কিছু ভক্ত মন্দিরের অভ্যন্তরেই জায়গা পেয়েছিলেন। যাঁরা পাননি, তাঁদের জন্য 'ক্লোজড সার্কিট টিভি'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বামী পরেশানন্দ এবং স্বামী নির্মলাত্মানন্দ প্রায় ৫ মিনিট করে বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমি প্রায় ৫০ মিনিট ভাষণ দিলাম। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আধুনিক যুগ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ'। আমার ভাষণের প্রতিটি বাক্যই স্বামী অরুণানন্দ অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত জানাই, স্বামী অরুণানন্দ ৫টি ভাষায় দক্ষ। তারপর প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে প্রশ্নোত্তরপর্ব চলল। সন্ধান নিয়ে জানলাম, অনেক দূর দূর স্থান থেকেও বহু ভক্ত এসেছেন। এক ভদ্রলোক এসেছেন দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত সুদূর 'প্যাটাগোনিয়া' থেকে। সকলেই বেশ প্রফুল্লচিত্তে ফিরে গেলেন। আমি এখানে জনৈকা মহিলা ভক্ত শ্রীমতী অ্যাঞ্জেলিকা লানচিয়ারি অঙ্কিত শ্রীশ্রীমায়ের একটি ছবির উল্লেখ করতে চাই। ছবিটি এখানে উপস্থাপিত করা হলো।

উরুগুয়ে

১০ জুন সকালে স্বামী পরেশানন্দ, স্বামী নির্মলাত্মানন্দ, স্বামী অরুণানন্দ এবং আমি নদীতীরে অবস্থিত বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিও। বিমানযোগে মাত্র ২০-২৫ মিনিটের পথ। শুনলাম, ৮টা ৪৫ মিনিটের নির্ধারিত উড়ান ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে আবার তা ২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ১৫-২০ জন ভক্ত আমাদের বিদায় জানানোর জন্য শেষপর্যন্ত বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। অবশিষ্ট যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ২-৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করে বিদায় নিলেন। কেক, বিস্কুট এবং হালকা পানীয় সহযোগে আমরা মধ্যাহ্নভোজ পর্ব সমাধা করলাম। অবশেষে ৩টা ২০ মিনিটে আমরা মন্টেভিডিও পৌঁছালাম। শুনলাম, জলপথে এখানকার দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর। স্টিমারে বুয়েন্স এয়ার্স থেকে মন্টেভিডিও যেতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। মন্টেভিডিওতে বেশ কিছু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমরা 'হোটেল এরমিটেজ'-এ এসে উঠলাম। সেখান থেকে হাঁটাপথে খুব কাছেই মেরিয়া ওলগার গৃহে গিয়ে আমরা চা ইত্যাদি গ্রহণ করলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হোটেলের 'মেজিনিন ফ্লোর'-এ সভা শুরু হলো। প্রত্যাশিত ছিল ৩০-৪০ জন উপস্থিত হবেন, কিন্তু উপস্থিত হলেন ৮০-৯০ জন। ৫০ মিনিট ভাষণ দেওয়ার পর কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো আমাকে। স্বামী অরুণানন্দ প্রতিটি বাক্য অনুবাদ করে দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে বেশ গভীর মনোযোগের ভাব লক্ষ্য করলাম। রাতের আহারের জন্য আমরা আবার মারিয়ার গৃহে গেলাম। আহার শেষে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে ফিরে এলাম।

উরুগুয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্রতম দেশ। এদেশের ভাষা স্প্যানিশ এবং জনসংখ্যা ৩৩ লক্ষ, যার মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগই বুয়েন্স এয়ার্সে থাকেন। একদা

ব্রাজিলের অংশ উরুগুয়ে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে।

১১ জুন প্রাতরাশ গ্রহণের পর মন্টেভিডিওর ২৩৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত 'লা পালোমা' দর্শনের উদ্দেশে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে গাড়িতে রওনা দিলাম। বেলা ১টার সময় সেখানে পৌঁছে 'বাহাই' হোটেলে উঠলাম। ভারতবর্ষের সর্বত্র আমরা ঘন জনবসতি দেখতে অভ্যস্ত। সেই কারণেই এখানকার গ্রামাঞ্চলগুলি কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করলেও কোন জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝেমধ্যে হয়তো বা দু-একটি গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়।

লা পালোমাতে আমরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা এক বৃদ্ধা হেব্বে হেসসের বাড়ি গেলাম। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেখানেই গ্রহণ করলাম। হেব্বে হেসসের কন্যা তামার, দেবী এবং আরো অনেক ভক্ত সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। এঁরা সকলে মিলে একটি ছোট আশ্রম করেছেন—'সারদা আশ্রম'।

বিকালে চা-পানের পর হেব্বের গৃহে আমি ভক্তদের

সাও বেন্তো সাপুকাইয়ের একটি দৃশ্য

কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী 'রোচে' শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে একটি ক্লাবঘরে একটি ছোট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৮০-৯০ জন শ্রোতার উপস্থিতিতে 'বর্তমান যুগে বেদান্ত এবং যোগের প্রাসঙ্গিকতা' সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

পরদিন সকালে আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সঙ্গে জোরালো বাতাস বইছিল। শুনলাম, তাপমাত্রা নাকি 0° সেন্টিগ্রেড। সত্যি বলেই বোধ হলো। হোটেলে প্রাতরাশ গ্রহণের পর জনৈক ভক্ত লিওনার্দো আমাকে গাড়িতে একটি স্থানে নিয়ে গেলেন, যেখানে বাতাসের দাপট অপেক্ষাকৃত কম। দেখলাম, তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী। প্রায় আধঘণ্টা আমরা সেখানে হাঁটলাম। লক্ষ্য করলাম, সারদা আশ্রমটি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। তাঁরা আমাকে জানালেন, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের একজন যোগ্য আচার্যের প্রয়োজন। হেব্বে হেসসে, তামার এবং অন্যান্য ভক্তরা মিলে এটিকে কোনমতে চালু রেখেছেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা ২১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মন্টেভিডিও বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। নির্ধারিত সময়েই বিমান আকাশে উড়ল। আমরা সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে সাও পাওলোতে অবতরণ করলাম। দেখলাম, বহু ভক্ত বিমানবন্দরে উপস্থিত।

পুনরায় সাও পাওলো

১৩ জুন। উত্তম আবহাওয়া। উরুগুয়ের তীব্র ঠাণ্ডার তুলনায় সাও পাওলোর আবহাওয়া গরম মনে হলো। কিছুটা বিশ্রামের দিনই বলা যায়। আমি দেশে ফেরার প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নিলাম। অবশ্য ঐদেশীয় কয়েকজন ভক্ত দেখা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। বিকালে কাছেই পূর্বোক্ত ইবিরাপুয়েরা উদ্যানটি দেখতে গেলাম। দেখলাম, বহু পুরুষ এবং নারী সেই উদ্যানে ভ্রমণ করছেন বা দৌড়াচ্ছেন অথবা স্কেটিং করছেন। সন্ধ্যারতি শেষে কিছুক্ষণ জপধ্যানের পর আমি ভক্তদের সঙ্গে ধর্মকথা আলোচনা করলাম।

পরদিন সকালে সেন্ট অ্যান্টনিও দে পিনহাল জেলায় অবস্থিত সাও বেন্তো সাপুকাই শহরে গেলাম। জায়গাটি প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, পর্বত-পরিবেষ্টিত। এর দৃশ্য অতি মনোরম। এই অঞ্চলটিতে বিরল শ্রেণির 'অর্কিড' জন্মায়। দুই দীক্ষিত ভক্ত রাধা এবং গোবিন্দ প্রায় ২৫,০০০ বর্গমিটার (৬ একর) জমির মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। সেখানে একটি সুন্দর ঠাকুরঘর আছে; প্রায় ৪০-৫০ জন ভক্ত বসতে পারেন। আমন্ত্রিত সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য কাছেই আরেকটি ছোট বাড়ি আছে। কমলালেবু এবং অন্যান্য ফলের গাছ দ্বারা শোভিত একটি

সুন্দর বাগান পাহাড়ের গায়ে অতি সুপরিকল্পিত-ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে ক্ষুদ্রকায় ঝরনার কুলুকুলু ধ্বনি এবং চারপাশের অরণ্য যুক্ত হয়ে স্থানটিকে অতি চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

দিনের বেলা একটি রিট্রিটে অংশগ্রহণ এবং বিকালে একটি স্থানীয় ক্লাবে ভাষণ প্রদান ছিল এদিনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সাও পাওলো, বেল্লো হোরিজোনটে, কিউরিটিবা এবং রিও ডি জেনিরো থেকে ভক্তরা এসেছিলেন এই উপাসনায় যোগদান করার জন্য। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম। মধ্যাহ্নভোজ এবং দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে মন্দিরে আরতি শুরু হলো। আরতি সমাপ্ত হলে আমরা ক্লাবেই সোস্যাল হল-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রায় ১৫০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। আমি 'আধুনিক যুগের মানুষের জন্য সনাতন মূল্যবোধ' বিষয়ে ভাষণ দিলাম। স্বামী নির্মলাত্মানন্দ এবং উপস্থিত অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও ভাষণ দিলেন। স্বামী অরুণানন্দ সব অনুবাদ করে দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান সুসমৃদ্ধ না হলেও তাঁরা বেশ কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করলেন।

পরদিন সমস্ত সকালটা অতিবাহিত হলো ভক্তদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে। বিকালে একটি বিদায়সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডাঃ বরিস, জানডির, ল্যুইস অ্যান্টনিও, সুশানা, গোবিন্দ প্রমুখ ভক্তগণ অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। স্বামী নির্মলাত্মানন্দ, স্বামী পরেশানন্দ, স্বামী অরুণানন্দ প্রমুখ সকলেই ভাষণ দিলেন। পরিশেষে আমি 'গার্হস্থ্য জীবনে আধ্যাত্মিকতা' বিষয়ে একটি ভাষণ দিলাম এবং সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি স্থানে প্রায় ১০০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

১৬ জুন মালপত্র গুছিয়ে নেওয়া এবং ভক্তদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে সকালটি অতিবাহিত হলো। বিকাল সাড়ে ৩টায় বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রায় ৩০-৪০ জন ভক্ত আমাকে বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। বিদায়পর্বটি রীতিমতো আবেগপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার অভিবাসন কক্ষে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাঁরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যথারীতি জোহানেসবার্গ পর্যন্ত বিমানযাত্রাটি খুবই দীর্ঘ এবং কষ্টকর লাগল। ১৬ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সাও পাওলো থেকে রওনা হয়ে ১৭ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টায় নির্ধারিত সময়ের ২৫ মিনিট আগে আমরা জোহানেসবার্গ পৌঁছালাম। ব্রাজিলের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার সময় প্রায় ৫ ঘণ্টা এগিয়ে। সময় লাগল প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টা।

ডারবানের দক্ষিণ আফ্রিকা রামকৃষ্ণ সেণ্টারের স্বামী সারদানন্দ, ডারবান থেকে আগত ডাঃ সেব্রান এবং জোহানেসবার্গ থেকে আগত হর্ষদভাই ও অরবিন্দভাই বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। অভিবাসন এবং শুল্ক সংক্রান্ত পর্বগুলি মিটিয়ে নিতে বেশি সময় লাগল না। আমরা লেনাসিয়াতে হর্ষদভাইয়ের গৃহে গেলাম। স্নানাহার সেরে আমি নিদ্রার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। যথারীতি 'জেটল্যাগ' দূর করার ট্যাবলেট কোন কাজই করেনি। বিকালবেলা সারদানন্দ, হর্ষদভাই এবং আরো দু-একজন ভক্তের জন্য কঠ উপনিষদের ওপর ঘরোয়াভাবে একটি আলোচনা করলাম। নৈশভোজ সারলাম অরবিন্দভাইয়ের গৃহে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু নিদ্রাদেবী আমার প্রতি ছিলেন বিরূপ।

পরদিন সকালে মুম্বাইয়ের বিমান ধরার জন্য বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাতে স্বামী সারদানন্দ এবং হর্ষদভাই উপস্থিত ছিলেন। পুনরায় সাড়ে ৮ ঘণ্টার আরেকটি বিমানযাত্রা। রাত্রি ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ১৯ তারিখ মধ্যরাত্রে আমি মুম্বাই পৌঁছালাম। পরদিন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম বেলুড় মঠে।

এই ভ্রমণের ফলে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, আগামী দিনগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা লাতিন আমেরিকায় গভীর থেকে গভীরতরভাবে গৃহীত হবে। ভবিষ্যতে আমাদের ঐসকল দেশে আরো সন্ন্যাসী পাঠানো দরকার হবে। চিলি, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতেও এমন মানুষ আছেন, যাঁরা বেদান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী। সর্বাগ্রে অবশ্য স্থানীয় স্প্যানিশ ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। ব্রাজিলে অবশ্য পর্তুগিজ ভাষার প্রচলন। ক্যাথলিক হওয়ার ফলস্বরূপ লাতিন আমেরিকার মানুষ কুমারী মেরির ভক্ত। সুতরাং তাঁদের মধ্যে অতি সহজেই শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি বিকাশলাভ করবে।

আশা করা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের এক অতি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হবে। [সমাপ্ত]* ❑

* গত মে ও জুন ২০০৩ সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ প্রকাশিত মূল ইংরেজি রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীসারদামণি বন্দনা

গোষ্ঠবিহারী রানা

ধ্যানম্

ধ্যায়েন্নিত্যং পবিত্রাং সিতকমলনিভাং রামকৃষ্ণস্য কান্তাম্
যোগাসীনাং সুভদ্রাং শশধরবদনাং শ্রীময়ীং শান্তচিত্তাম্।
লজ্জাশীলাং সুনম্রাং শিরসি ধৃতবতীং শাটিকাং দর্শনীয়াং
বক্ষো বিস্রস্তকেশাং বলয়িতসুকরাং মাতরং বিশ্বপূজ্যাম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ *শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী বিশ্বপূজ্যা মাতাকে নিত্যই ধ্যান করবে। তিনি শ্বেতপদ্মের ন্যায় পবিত্রা। তিনি যোগাসনে উপবিষ্টা, শ্রীময়ী, সুভদ্রা ও শান্ত-হৃদয়া। তিনি লজ্জাশীলা, সুনম্রা, তাঁর শিরোদেশ দর্শনযোগ্য শাড়িতে পরিবেষ্টিত। তাঁর বক্ষোদেশে কেশরাশি আলুলায়িত। সুন্দর হাতে তিনি বলয় পরেছেন।*

স্তুতিঃ

সংসারে সারদাত্রী ত্বং সারদে করুণাময়ি।
করুণাং কুরু মাতস্ত্বং সন্তানে সততং ময়ি।।
মূকং মাং কুরু বাচালং কথয়ামি কথাং তব।
চরণাশ্রিতপুত্রোঽহং মাং প্রতি সদয়া ভব।।
দরিদ্রব্রাহ্মণালয়ে লীলায়ৈ ত্বমজায়থাঃ।
পরমপুরুষায় ত্বং জনকেন সমর্পিতা।।
লীলাং কৃতবতী মাতঃ পত্যা সার্দ্ধং মহাসতি।
ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং মহামায়া বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী।।
যদ্যপি ন হি সঞ্জাতো জঠরাৎ সন্ততিস্তব।
কর্ণৌ তে প্রাবিশন্নিত্যং মাতর্মাতর্মহারবঃ।।
ন কেবলং সতাং মাতা সর্বেষামপি পাপিনাম-
শুচীনামন্ত্যজানাঞ্চ দস্যূনাং ক্রূরকর্মণাম্।।
শ্বেতাঙ্গকুলসম্ভবাং নিবেদিতাং স্বকন্যাবৎ।
অপশ্যস্ত্বমুদারাক্ষি ধন্যা সা বিস্মিতাভবৎ।।
মহিমানং ন শক্তঃ স্যাৎ কোঽপি বর্ণয়িতুং তব।
স্বভর্তা যামপূজয়ন্নত্বা পদেষু সস্তবঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ *হে করুণাময়ি সারদে, তুমি সংসারে সারবস্তু দান কর। হে মা, আমার মতো সন্তানকে সর্বদাই তুমি করুণা কর। আমি মূক, তুমি আমাকে বাচাল কর, আমি তোমার কথা বলব। আমি তোমার চরণাশ্রিত পুত্র, আমার প্রতি সদয়া হও। তুমি লীলাপ্রদর্শনের জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেছ। পিতা তোমাকে পরমপুরুষের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। হে মহাসতি, তুমি পতির সঙ্গে লীলা করেছ। তুমি লক্ষ্মী, তুমি মহামায়া, তুমি বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী। যদিও তোমার জঠর থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি, তথাপি তোমার কর্ণদ্বয়ে 'মা মা' মহারব নিত্যই প্রবেশ করেছিল। তুমি কেবল সজ্জনের মা নও, তুমি সকল পাপীরও মা। অন্ত্যজ ও নিষ্ঠুরকর্মে রত দস্যুরও মা। তোমার উদার নয়ন দিয়ে তুমি শ্বেতাঙ্গ কুলজাতা নিবেদিতাকে নিজের মেয়ের মতো দেখেছিলে। সে ধন্যা ও বিস্মিতা হয়েছিল। তোমার মহিমা কেউই বর্ণনা করতে সমর্থ নয়, এমনকি তোমার নিজের স্বামী তোমার চরণে নত হয়ে স্বীয় স্তবের দ্বারা তোমাকে পূজা করেছিলেন।*

প্রার্থনা

ভবতু জননীজ্ঞানং সর্বনারীজনং প্রতি।
অস্তু মে সারদাদেবি নক্তন্দিবমিয়ং মতিঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ *হে সারদাদেবি, সকল নারীর প্রতি আমার মাতৃজ্ঞান হোক—দিনরাত যেন আমার এই মতি থাকে।*

শ্রীসারদা ভজন

অশোক পাণ্ডে

অয়ি দ্বিজনন্দিনী জননী সারদামণি জয়রামবাটী-প্রিয়-বিহারিণী মা
প্রসন্না মুরতি সৌম্যাসৌম্য সতি সুভাষিণী সুহাসিনী মা।
ভক্তিপ্রদায়িনী মুক্তিবিধায়িনী জীবব্যথাহারিণী তারিণী মা
অগণিত সন্তান মালিন্যতারণ সুকরুণা আভরণা মা।।
জাহ্নবী স্নেহধারা আবেশে আকুল পারা হৃদাকাশ বিভাবতী প্রভাবতী মা
ঈশপ্রীতি প্রবাহিনী শ্রেয় গতিদায়িনী সুশরণা সুতরণা মা।
জয় সারদেশ্বরী রামকৃষ্ণ-পূতবারি সূত প্রেমে বিলাইতে মা
অমরায় পরিহরি করুণায় তনু ধরি তনয়ে তরাতে এলে মা।।

স্নেহের খনি সারদা

গদাধর রানা

সূর্য আদি জীবনীশক্তি, চাঁদ মনোরম শোভা
রামকৃষ্ণ বিশ্বশক্তি, সারদা জগৎপ্রভা।
দিনমণি গেলে অস্তাচলে নেমে আসে ঘনরাত্রি
আঁধার গগনে চন্দ্রমাসমা সারদা জগদ্ধাত্রী।
দয়া ও মায়ায় মমতাময়ী সারদা করুণারূপিণী
জননীর প্রেমকরুণাপরশে যায় যে দিবসযামিনী।
রামকৃষ্ণরূপ রবির আলোকে প্রকাশে প্রবল জ্যোতি
ও রবিকিরণে উদ্ভাসিতা সারদা ইন্দুমুরতি।
ভুবন ব্যাপিয়া মাতৃত্বের পূত জাহ্নবীধারা
শ্রীমার চরণ বন্দনা লাগি ধরণি পাগলপারা।
তুমি মা সারদা সরস্বতী, ও রাঙা চরণে নমি
মাতৃভাবেতে মহিমান্বিতা, জগজ্জননী তুমি।
গুরুর ভাবেতে জ্ঞানদাময়ী, তুমি পতিসোহাগিনী
চিরবরণীয়া জগতেরি মাতা, তুমি মা স্নেহের খনি।

শান্তি

অনুপ মুখোপাধ্যায়

না না না
আর কভু না
ঘৃণা।

হয়ে যাক দূর
বুক দুরদুর।

রাখ সেই আশা
পায়ে পায়ে আসা
ভালবাসা।

কর মন ধীর
গৃহে গড় বীর
মন্দির।

তাহলে বিশ্ব
নয়তো নিঃস্ব
সব অস্থির
স্থির।

খোঁজ

কান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল বলা, সকল চলা
সকল কাজের মাঝে
ভোরের আকাশ, নীল দিগন্তে
তোমার সুরেই বাজে।

তুমি ছাড়া বিশ্ব ফাঁকা
কোথাও কিছুই নেই
যেদিকে চাই সবখানেতেই
দাঁড়িয়ে আছ। সেই—

গাছে পাতায় ফলে ফুলে
তোমারই নির্মাণে,
শাশ্বত সেই পবিত্রতায়
রয়েছ সবখানে।

ঝড়ের রাতে গোপন আঁধার
ভেবে না পাই কূল,
সেইখানেতেই দাঁড়িয়ে আছ
সোনালি মাস্তুল।

কাছেই আছ দৃষ্টি সজাগ
নেই তুমি চোখ বুজে
তবু আমি দিন-রাত্তির
বেড়াই তোমায় খুঁজে।

ঈশ্বর-দরশন

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস

প্রত্যহ একই সময়ে
বের হতেন মহর্ষি রমণ
মহাজ্ঞানী, প্রৌঢ় বিরাগী।
কোথায় যান, কী করেন
একদল শিষ্যের অদম্য কৌতূহল।
একদিন তারা অনুগামী
হতে চেয়ে—সেকথা
নিবেদিল বিনম্র শ্রদ্ধায়।
স্নেহার্ত ঋষি অগত্যা
রাজি হলেন সে-প্রার্থনায়।
একসময়ে তারা সদলে
উঠে এল টিলায়।

এক কুটিরে মহর্ষি ঢুকলেন
সেখানে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত
এক দীন দম্পতি।
নিঃসঙ্কোচে সেবা-শুশ্রূষা করলেন
মহর্ষি পরম নিষ্ঠায়।
শিষ্যরা আঁতকে উঠল।
তোমাদের ভক্তিহানি হবে
বলে কথাটা অনুক্ত—
আরো বললেন গুরু—
যদি এখানে ঈশ্বর-দরশন
না পাও কোথাও মিলবে না।
শিষ্যেরা খুঁজে পেল ঈশ্বরের দিব্য দরশন।

তিনটি মূর্তির অন্তরালে আমাদের চিরকালের মা

স্বামী পরাশরানন্দ

সীতাদেবীর মূর্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। দুচোখে শুধু বিস্ময়! এই সেই বিখ্যাত বাল্মীকি মুনির আশ্রম—এখনকার বিঠুর* স্টেশনের কাছেই অবস্থিত। দেখতে দেখতে রামায়ণের ঘটনাবলী মনে পড়ে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে অযোধ্যা থেকে বহু দূরে অরণ্যে নির্বাসন দিতে যাচ্ছেন। 'কোথায় যাচ্ছি?' 'কেন যাচ্ছি?' ইত্যাদি প্রশ্ন সীতাদেবী অনেকবার করলেও লক্ষ্মণ কোন সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না। কি করেই বা পারবেন? যাঁকে মায়ের সমান দৃষ্টিতে দেখেন, অযোধ্যার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী যাঁর গর্ভে—তাঁকে দাদা রামচন্দ্রের প্রাণঘাতী নির্দেশ কি করেই বা দেবেন? দুঃখে ও লজ্জায় তিনি যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছেন। কিন্তু রথ থেকে সীতাদেবীকে নামিয়ে রথ ফিরে গেলে সীতাদেবী সবই বুঝতে পারলেন। ব্যথা-বেদনায় ক্লিষ্টা সীতাদেবীকে মহর্ষি বাল্মীকি সাদরে নিজ আশ্রমে স্থান দিলেন। সেখানে জন্ম নিল যমজ পুত্র—লব ও কুশ।

প্রাচীন যুগের ঘটনাই এখানে মোটামুটি সাজিয়ে রাখা আছে—যজ্ঞস্থল পর্যন্ত। সীতাদেবীর মার্বেল পাথরের মূর্তির দিকে তাকাতে তাকাতে মনে পড়ে যাচ্ছিল স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি: "রামচন্দ্র হয়তো কয়েকটি হইয়াছেন, কিন্তু সীতা আর হয় নাই।... সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান।"[১]

শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চার ধামের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তুঙ্গভদ্রা নদী এখানে প্রায় ৩৬০° ঘুরে গেছে। আর সেই তুঙ্গভদ্রার তীরে গড়ে উঠেছে চার ধামের অন্যতম শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠের অন্যতম আকর্ষণ দেবী শারদার (সরস্বতী) মন্দির। গর্ভমন্দিরে দেবী সরস্বতীর ধাতুমূর্তি। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের সংযোগস্থলে ভক্তদের সহস্রার্চনা, লক্ষার্চনা চলছে। তারই মধ্যে একপাশে বসে পড়লাম। দেবীর দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠলাম। স্মৃতিপটে ভেসে উঠল আমাদের বহু পরিচিত জয়রামবাটীর শ্রীমা সারদাদেবীর মূর্তি—সেই প্রেম-ভালবাসায় ভরা মা, পৃথিবীজোড়া ছেলেমেয়েদের কল্যাণচিন্তায় নিরতা। দুচোখে স্নেহ ও করুণা ঝরে পড়ছে।

ভারতের তিন প্রান্তের তিন মূর্তি—সীতা, সরস্বতী ও সারদার মধ্যে সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। যদিও শ্রীমা সারদাদেবীই যে পূর্বে সীতাদেবী-রূপে এসেছিলেন, তা তিনি নিজমুখে বলে গেছেন। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ দেখে মা বলেছিলেন: "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।"[২] শ্রীরামকৃষ্ণ সীতাদেবীর দর্শন পাওয়ার পর তাঁর মতো 'ডায়মণ্ড-কাটা বালা' মাকে গড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার তাঁর সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন: "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"[৩] তবুও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—মূর্তি যাঁরা গড়েছেন, তাঁরা তো নিশ্চয়ই এসব ভেবেচিন্তে করেননি। আর শৃঙ্গেরী মঠের মূর্তি তো অনেক প্রাচীন কালের। করুণা-স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা যদি মূর্তি-গড়ার বস্তু হয়, মাতৃভাব যদি লক্ষ্য হয় আর ঈশ্বর যদি কারিগর হন, তবে সীতা, সরস্বতী ও সারদা একই ভাব নিয়ে মর্ত্যবাসীর কাছে আবির্ভূতা হন।

সীতাদেবীর দর্শন ঠাকুর পেয়েছিলেন। তিনি জনম-দুঃখিনী, রামময়জীবিতা। তিনি এক ভাবগম্ভীর মাতৃমূর্তি। সীতাদেবীই যখন এযুগে সারদাদেবী হয়ে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন সীতাদেবীর ভাগ্য—জনমদুঃখিনী। শিশুকাল থেকেই অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ। শৈশব থেকে খেতের জমিতে গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে তুলা তোলা আর ঐ তুলা দিয়ে পৈতে বানানো, গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটা, মাঠে মুনিশদের জন্য মুড়ি নিয়ে যাওয়া, ভাইদের দেখাশোনা ইত্যাদি।

ছয় বছরে পৌঁছানোর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে প্রতিবেশীদের কাছে 'পাগলের বৌ' 'পাগলের বৌ' শুনতে শুনতে অস্থির। সকলে ঠাট্টা করলে যাওয়ার জায়গা একমাত্র ভানুপিসির বাড়ি। মাঝের কয়েক বছর দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুরে অভাব-দুঃখ-দারিদ্র্য না থাকলেও ঠাকুরের মহাসমাধির পর শুরু হলো অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। কোন আর্থিক সাহায্য নেই—অভাব, অভাব আর অভাব। তাঁর জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "এমন দিনও গিয়াছে যখন শুধু দুটি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, লবণ জোটে নাই।" "শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে গাঁট দিয়া এবং কোদাল-হাতে মাটি কোপাইয়া ও শাক বুনিয়া তিনি কালাতিপাত করিতে একরূপ প্রস্তুত ছিলেন।" "তিনি কামারপুকুরে অনশনে, অর্ধাশনে, কায়ক্লেশে, রুগ্নদেহে দিনাতিপাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন।" "কন্যার ভিখারিণী বেশ দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।"[৪] এই অতি দুঃখের দিন বেশ কিছুকাল ছিল। তারপর আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। ভক্ত শিষ্যরা তাঁর কাছে যাতায়াত করলে ছবিটি অনেকখানি বদলে যায়।

ঠাকুরের মহাসমাধির প্রায় ছয় বছর পর জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী বেহালা বাজিয়ে গান ধরলেন—

"কী আনন্দের কথা উমে (গো মা)।
(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?

---

* উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহর থেকে প্রায় ৫০ কিমি. দূরে অবস্থিত।

অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি।
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
আজ কী সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে;
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে।"

গানটি যেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের হুবহু ছবি। একবার শুনে তৃপ্তি না হওয়ায় গানটি বৈরাগীকে আবার গাইতে হলো। সেখানে তখন স্বামী সারদানন্দজী, কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দজী), বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, যোগীন-মা, গোলাম-পা প্রমুখ রয়েছেন। সকলেই গানটি তন্ময় হয়ে শুনলেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী বললেন ঃ "হ্যাঁগো, তখন সকলেই জামাইকে খেপা বলত, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আমায় কত কথা শোনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ, কত বড়ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা পূজা করছে।"[৫]

সীতাদেবী ছিলেন 'রামময়জীবিতা', আর সারদাদেবী ছিলেন 'রামকৃষ্ণময়জীবিতা'—"রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণপ্রিয়াং তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাম্।"[৬] অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টপথে সাহায্য করার জন্যই তিনি জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং নহবতখানার আট ফুট বাই পাঁচ ফুট আটকোণা খাঁচায় প্রায় বারোবছর কাটিয়ে গেলেন। ঐ ছোট্ট ঘরখানি ছিল জিনিসপত্রে ভর্তি, ওরই মধ্যে রান্না-খাওয়া-থাকা সব। ছাদের শিকে থেকে হাঁড়ি ঝুলত আর সেই হাঁড়ির মধ্যে শিঙ্গি মাছ কলকল করত; মা তারই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের রান্না করে চলতেন। কিন্তু এত শারীরিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আনন্দে তাঁর দিন কেটে যেত। মনে হতো "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা হলেও অনেক সময়ই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পর্যন্ত পেতেন না। তাঁর নিজের কথায়—"কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।" নহবতখানায় থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকত পুরোপুরি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তাঁরই সান্নিধ্যে। ঠাকুরের ঘরে তখন দিনরাত ভগবৎপ্রসঙ্গ, নাচ-গান, ভাবসমাধি চলছে। মা ভাবতেন ঃ "আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।" পরে আবার বলেছেন ঃ "কী আনন্দেই ছিলুম! কতরকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবশরীরে দুরারোগ্য ক্যান্সার আক্রমণ করলে তাঁকে ভাল করার আশায় মা সবরকম দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে অবস্থান করে ঠাকুরের সেবাকাজ নীরবে করে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা ৩৪ বছর স্থূলশরীরে ছিলেন। এই কালেও তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়—অন্তরে তাঁর সঙ্গে নিত্য মিলন, আবার বাইরেও মাঝে মাঝে তাঁর দর্শনলাভ হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে আজ্ঞা করাতেই মা হাতের বালা খোলেননি। ঠাকুরের নির্দেশ মেনে গৌরীমা এর কারণ ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁর বৈধব্য অসম্ভব, কারণ তাঁর স্বামী চিন্ময়; অধিকন্তু তিনি লক্ষ্মী। তিনি ভূষণ ত্যাগ করলে জগৎ লক্ষ্মীহীন হবে।[৯]

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাঁর ত্যাগী শিষ্যেরা সব এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে মায়ের খুব কষ্ট হয় আর মঠের জমির জন্য প্রার্থনা করেন ঠাকুরেরই কাছে, যাতে সেই মঠে ত্যাগী শিষ্যেরা তাঁর ভাব ও উপদেশ নিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে এবং গৃহী ভক্তদেরও প্রাণ জুড়োবার একটা জায়গা হয়। ঠাকুরের তুলনায় মায়ের দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা অনেক; কিন্তু মায়ের মধ্যে না ছিল গুরুভাব, না ছিল লেশমাত্র অহঙ্কার—ছিল শুধু রামকৃষ্ণ-নিবেদিতপ্রাণারই ভাব। দীক্ষাকালে তিনি বলতেন ঃ "ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। আমি তো মা।" ভক্তদের প্রার্থনায় ও আবদারে মাকে বলতে শোনা যেত ঃ "আচ্ছা, ঠাকুরকে বলব।" ভক্ত যদি বলত ঃ "আপনি আর ঠাকুর কি আলাদা?" মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন ঃ "ছি, ছি, ওকথা বলতে আছে! আমি তাঁর দাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলশরীরে থাকাকালীন বা তাঁর অন্তর্ধানের পর—সর্ব অবস্থাতেই মা আক্ষরিক অর্থে ছিলেন 'রামকৃষ্ণময়-জীবিতা'। স্বামী, গুরু, ইষ্ট, মা কালী, সব দেবদেবীর সম্মিলিত রূপে এবং বিভিন্নভাবে তিনি ঠাকুরকে দেখেছেন বা অপরের কাছে বলেছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়।

শঙ্করাচার্য শৃঙ্গেরী মঠে মা শারদা (সরস্বতী)-কে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বলেন, চারটি মঠের মধ্যে এই মঠের মঠাধীশ (পরবর্তী শঙ্করাচার্যগণ) যিনি হবেন, তিনি অবশ্যই সংস্কৃত ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবেন। মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই হলেন মা শারদা। সরস্বতী বিদ্যার দেবী, বুদ্ধিকে ঠিকপথে পরিচালিত করার দেবী—'যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা'। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" সারদা-রূপে আবির্ভূতা দেবী সরস্বতীর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা তাঁর জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছি। এমনই কয়েকটি ঘটনার সাহায্যে আমরা এটি বোঝার চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা অনেকবার করেছেন। একবার ঠাকুর পানিহাটি মহোৎসবে যাবেন, ভক্তেরা মা যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন ঃ "যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" 'ইচ্ছা হয় তো চলুক' বলাতে মা বুঝে

ফেললেন, ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে তিনি যান। তাহলে তো বলতেন—'নিশ্চয়ই যাবে'। তিনি যেতে রাজি হলেন না। ঠাকুর পরে বললেন ঃ "ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত—'হংস-হংসী এসেছে'। ও খুব বুদ্ধিমতী।"[১০]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজী প্লেগ নিবারণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রোগীদের সেবা, চিকিৎসা, ওষুধ ইত্যাদি কাজে বহু টাকার দরকার। কিন্তু এত টাকা কোথায়? মহাপ্রাণ স্বামীজী ভাবলেন, বেলুড় মঠ বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করবেন। দীর্ঘ বারোবছরের বহু প্রার্থনা, চেষ্টা ও কষ্টে টাকা জোগাড় করে বেলুড় মঠের জমি কেনা হয়েছে ও সবে মঠ স্থাপিত হয়েছে। স্বামীজী প্লেগরোগীদের সেবায় সেই মঠই বিক্রি করার সঙ্কল্প করলেন। গুরুভাইদের পরামর্শে স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে একথা বলতে গেলেন। প্রণাম করে বললেন ঃ "মা, রোগীদের সেবার জন্য টাকা নেই। এজন্য মঠের সম্পত্তি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সেবাকাজ চালাব মনে করছি। আমরা তো সাধু, গাছতলায় জীবন কাটিয়ে দেব। আপনার অনুমতি চাই।" মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন ঃ "না বাবা, মঠ বিক্রি করতে পারবে না। এ তোমার মঠ নয়, ঠাকুরের মঠ। তোমরা শক্তিমান ছেলে—গাছতলায় জীবন কাটাতে পার। কিন্তু পরে আমার যেসব ছেলেরা আসবে, তারা গাছতলায় জীবন কাটাতে পারবে না। তাদের জন্য এই মঠ।" স্বামীজী শিরোধার্য করে নিলেন মায়ের আদেশ। মা আরো বললেন ঃ "বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।... বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?" স্বামীজী সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে বললেন ঃ "তাই তো, আবেগভরে আমি কী করতে যাচ্ছিলাম।"[১১] শ্রীমায়ের এই অসাধারণ উত্তর একটু চিন্তা ও বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন তিনি মা সরস্বতী। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দকে যুক্তি দিয়ে যিনি নিরস্ত করতে পারেন, তিনি কে?

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে স্বামীজী মায়াবতীতে এসেছেন। স্বামীজীর স্বপ্নের হিমালয়ে এক নির্জন কেন্দ্র এই মায়াবতী—বিশেষত পাশ্চাত্য ভক্তদের বেদান্তচর্চার জন্য করা। একটু দূরে বরফের পাহাড়চূড়ার সারি। স্বামীজী এখানে এসে খুব খুশি। তাঁর ইচ্ছা ছিল—এখানে ধর্মসাধনায় একমাত্র অদ্বৈতচর্চাই হবে, দ্বৈতভাবের সাধনা (পূজা, গান ইত্যাদি) এখানে হবে না। এটি উল্লেখ করেই স্বামীজী নিজে এই কেন্দ্রের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজী একদিন আবিষ্কার করলেন যে, সেখানকার সন্ন্যাসীরা একটি ঘরকে পুরোপুরি ঠাকুরঘরে পরিণত করে ফেলেছেন। ঠাকুরের ফটো সাজানো হয়েছে, আবার তাতে ফুল, ফল, ধূপ, ধুনো দিয়ে রীতিমতো পূজা শুরু হয়ে গেছে। রাতে সমবেত সন্ন্যাসীদের কাছে এপ্রসঙ্গ তুলে স্বামীজী এর তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন ঃ "এ তো একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা।" ঠাকুরঘর তৈরির নেতা ছিলেন স্বামী বিমলানন্দ (খগেন মহারাজ)। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে সব কথা জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তিনি উত্তরে একটি ঐতিহাসিক চিঠিতে জানান ঃ "আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"[১২] মায়ের এই অপূর্ব সিদ্ধান্তে (হাইকোর্টের রায়ে) ঠাকুরের মত ও পথ কি—এই দ্বন্দ্ব চিরকালের জন্য থেমে গেল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমা কাশীতে সেবাশ্রম দেখতে এসেছেন। অধ্যক্ষ স্বামী শুভানন্দজী তাঁকে হাসপাতালে রোগীদের সব ওয়ার্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখার পর সেখানকার সন্ন্যাসীরা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "দেখলুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন, তাই এসব কাজ হচ্ছে। এসব তাঁরই কাজ।"[১৩] কাজ করলেই বিষয়চিন্তা, আর তা সাধুকে ঈশ্বরবিমুখ করে দেয়, বিশেষত ঠাকুর তো এসব কিছু করেননি—এপ্রসঙ্গ তাঁর কাছে তুললে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ "কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায়। ঠাকুরের কথা বলছ—তাঁর আলাদা। আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছ বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?"[১৪] সাধনজীবনের সঠিক উত্তরণের দিশা নির্ধারণের সঙ্গে গভীর বাস্তববুদ্ধির সমন্বয়স্বরূপ এই সিদ্ধান্তে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষুরধার বুদ্ধিরই পরিচয় পাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, 'লিগ অফ নেশন্স' গঠন হতে চলেছে। বিশ্বশান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৪ দফা শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে এখবর জানালে তিনি বললেন ঃ "ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ।... যদি অন্তঃস্থ হতো তাহলে কথা ছিল না।"[১৫] মায়ের এই কথাটি কয়েক বছর পরেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে যাঁর জন্ম, ওপরের কয়েকটি মাত্র ঘটনায় তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা আমাদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে।

সীতাদেবী ও দেবী সরস্বতীর ভাব ছাড়াও শ্রীমা সারদাদেবীর আরেকটি ভাব ছিল, যেখানে তিনি অনন্যা ও অদ্বিতীয়া। সেটি তাঁর মাতৃভাব। তিনি আমাদের মা। জয়রামবাটীর মূর্তিতে, বেলুড় মঠের মন্দিরে কিংবা 'মায়ের বাড়ি'র ফটোতে, মঠ-মিশনের সব কেন্দ্রে খাবার ঘরে পা

ছড়িয়ে বসে ছেলেদের খাওয়া দেখার অসাধারণ আলোকচিত্র —সবেতেই ঝরে পড়ছে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা ও সন্তানদের কল্যাণকামনা। এই অপূর্ব মাতৃভাব লেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব—তাই মায়েরই জীবনের কয়েকটি ঘটনার দ্বারা আমরা এই মাতৃভাব আস্বাদনের চেষ্টা করব।

ঠাকুর মাকে বলেছিলেন ঃ "তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষ পায় না।"[১৬] কিন্তু জগৎজোড়া ছেলেমেয়ের জননী যিনি হবেন, তিনি শুধু গুটিকয় রত্ন ছেলে নিয়ে তৃপ্ত হবেন কেন? আর যদি তিনি রত্ন ছেলেদের মা হন, তবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? তাই মায়ের ঘোষণা ঃ "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।"[১৭] তাই দেখি, এক যুবতী সাময়িক পদস্খলন হয়ে অনুতপ্ত হলে মা তাকে সাদরে আপন করে নিয়ে বলছেন ঃ "পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?"[১৮] এরকমই এক যুবক ভক্তকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন ঃ "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।"[১৯] আর কোন পরিচয়ের দরকার নেই—লেখাপড়ায় ভাল, স্বভাবচরিত্র উন্নত, বড় চাকরিজীবী—কোনকিছুই দরকার নেই। সবদিক থেকে বঞ্চিত যারা, তাদের প্রাণ জুড়াবার একটা জায়গা অন্তত আছে—যেখানে পরিচয় শুধু মা আর ছেলে। তবে তো সেই ছেলের প্রাণে আশা-ভরসা-আনন্দ আসবে আর বেঁচে থাকার অর্থ সে খুঁজে পাবে।

ভারতের চিরন্তন ধারা হচ্ছে, বাবা করবে শাসন আর মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা পাবে স্নেহ-আদর-ভালবাসা। আমাদের সেই গর্ভধারিণী মাকেই পুরোপুরি দেখতে পাই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে, যখন তিনি বলেন ঃ "আমি যে মা, আমি শাসন করব কি করে?" ছেলেমেয়েদের অনেক দুষ্টুমি জানা থাকলেও মা বাবাকে তা বলেন না; বরং বাবার আড়ালে মায়ের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের একটু বেশি খাওয়ানোর রেওয়াজ আমাদের ঘরে ঘরে। দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা বাবুরাম মহারাজকে দুখানি রুটি বেশি খাওয়ানোয় শ্রীরামকৃষ্ণ আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ, এতে সাধন-ভজনে ক্ষতি হতে পারে। মা উত্তরে বলেছিলেন ঃ "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।"[২০] এই দায়িত্ব শুধু মা-ই নিতে পারেন।

সুগন্ধি চালের পিঠা বানিয়ে জনৈক ভক্ত সন্ধ্যার মুখে মায়ের কাছে এলে ব্রাহ্মণবাড়ির বিধবা হয়েও তিনি ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন ঃ "বাবা! মুখে দেব বৈকি! তুমি এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে এসেছ।... রাতে ঠাকুরকে দিয়ে মুখে দেব। তুমি এজন্য চিন্তা করো না।" বিধবার দুবার অন্নগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ "ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি।"

ঘাটাল থেকে অতি দরিদ্র দীনহীন চেহারার একদল লোক মাকে দর্শন করতে 'মায়ের বাড়ি'তে এসেছে। সেবকের বহু আপত্তি সত্ত্বেও মা তাদের ভিতরে নিয়ে আসতে বললেন। তারা ভিতরে এসে মায়ের স্নেহমাধুর্যের আশ্বাস পেয়ে ধন্য হলো। মায়ের হাত থেকে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে ফেরার সময় তারা প্রাণে প্রাণে বুঝল যে, সত্যই ইনি দীনদুঃখীর মা—তাদের করুণাময়ী জননী।

মায়ের কাছে মুসলমান ডাকাত আমজাদের মাঝেমধ্যে যাতায়াত ছিল। মা-ও তাকে খুব স্নেহ করতেন। গাছের লাউ, কলা নিয়ে মায়ের কাছে এসে সে ভরপেট খেয়ে ও সারাদিন জয়রামবাটীতে কাটিয়ে তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে যেত। একদিন মা তাকে খাওয়াতে বসালে নলিনীদিদি দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন করতে লাগলেন। মা তা দেখে বললেন ঃ "অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি।" খাওয়ার পর মা তার এঁটো জায়গা জল দিয়ে ধুলে নলিনীদিদি বলে উঠলেন ঃ "ও পিসিমা, তোমার জাত গেল।" তাঁকে ধমক দিয়ে মা সেই অপূর্ব উত্তরটি জগদ্বাসীকে উপহার দিলেন ঃ "আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"[২১]

জয়রামবাটীর কাছাকাছি এক গাঁয়ের এক শিক্ষিত যুবক মায়ের কাছে প্রায়ই আসতেন। মায়ের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে নিজের গাঁয়ে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। কিন্তু এক বালবিধবার মোহে পড়ে তিনি পথভ্রষ্ট হন। গাঁয়ে এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ ভক্তগণ মাকে অনুরোধ করেন, সেই যুবক যেন মায়ের কাছে আর না আসেন। মা তাঁদের কথা শুনে খুবই দুঃখপ্রকাশ করে বললেন ঃ "মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।" যুবকটি কিন্তু আগের মতোই মায়ের কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন, এমনকি একদিন সেই মেয়েটিকেও নিয়ে এলেন। মা মেয়েটিকে ভর্ৎসনা করলেও নিজের মেয়ের মতোই আদরযত্ন করলেন।[২২] এই আমাদের চিরকালের মা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সবসময়ে তাঁর কল্যাণী স্নেহ-ভালবাসায় ভরা মাতৃমূর্তি নিয়ে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাতাল পদ্মবিনোদের কাহিনী না বললে মায়ের মাতৃভাবের ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মাস্টারমশায়ের চেষ্টায় তাঁরই স্কুলের ছাত্র বিনোদবিহারী সোম শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়লাভ করেন। ইনি পরে থিয়েটারে যোগ দেন ও 'পদ্মবিনোদ' নামে খ্যাত হন। মা তখন বাগবাজারে 'নীলমণি শান্তিধাম'-এ। রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় মায়ের বাড়ির কাছে এসে তিনি স্বামী সারদানন্দজীকে 'দোস্ত', 'দোস্ত' বলে ডাকতেন। মায়ের ঘুমে ব্যাঘাত হবে বলে কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিতেন না। একদিন কোন সাড়া না পেয়ে পদ্মবিনোদ গান ধরলেন—

"উঠ গো করুণাময়ি খোল গো কুটিরদ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।।
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা তোমায় কতবার।
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার।।

সন্তানে রেখে বাহিরে আছ শুয়ে অন্তঃপুরে।...
এত ডাকি তবু নিদ্রা ভাঙে না কি মা তোমার।।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় মায়ের জানালা খুলে গেল। মায়ের দর্শন পেয়ে তৃপ্ত পদ্মবিনোদ বলে উঠলেন ঃ "উঠেছ মা? ছেলের ডাক শুনেছ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" বলেই রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আবার গান গাইতে গাইতে আনন্দের সঙ্গে চলে গেলেন। পরদিন কেউ কেউ মাকে বললেন যে, গভীর রাতে মায়ের শয্যাত্যাগ করে এরকম দর্শন দেওয়া ঠিক নয়। স্নেহময়ী মায়ের করুণামাখা উত্তর ঃ "ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে।"[২৩]

কিন্তু তিনি তো শুধু বাঙালির মা নন। বিহারী কুলি "তু মেরা জানকী মাঈ হ্যায়" বলে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। পারসি যুবক সোরাব মোদিকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন। আর ব্যাঙ্গালোরের কেভ টেম্পল দেখে ফেরার ঘটনা তো তাঁর মাতৃভাব প্রকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মা ধীর, শান্ত ও সৌম্য মূর্তিতে মন্দিরে বসে সমবেত ভক্তের প্রণাম গ্রহণ করছেন। সামনে মন্দিরভর্তি লোক, কিন্তু কোন কথা নেই! একটু পরে ফিসফিস করে মা সেবককে বললেন ঃ "এদের ভাষা তো জানি না; দুটি কথা বলতে পারলে এরা কত শান্তি পেত!" দোভাষীর সাহায্যে এটি তাদের বলা হলে তারা বলল ঃ "না না, এই বেশ; এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। এরকম ক্ষেত্রে মুখের ভাষার কোন দরকার নেই।"[২৪] একেই বোধহয় শাস্ত্রে বলা হয় "গুরোস্তু মৌনং বাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।" (শঙ্করাচার্য-কৃত 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্')

তাঁর মাতৃভাব তো কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ইংল্যাণ্ডবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন ঃ "বাবা, তারাও তো আমার ছেলে।... আমার কি একরোখা হলে চলে?"[২৫] স্বামীজীর অনুরাগিণী তিন পাশ্চাত্য মহিলার প্রতি মায়ের ভালবাসা ছিল অপরিসীম। মিসেস ওলি বুলের অনুরোধেই লজ্জাশীলা মা তাঁর প্রথম ফটো তোলান, যা আজ ঘরে ঘরে পূজিত। মিস ম্যাকলাউড (যাঁর সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন—"purer than purity itself") মাকে দর্শন করার পর আনন্দে বিভোর হয়ে বারবার বলছেন ঃ "পবিত্রতাস্বরূপিণী মা। আমি তাঁকে দেখেছি।" আর মায়ের 'খুকি' সিস্টার নিবেদিতা মায়ের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি একটি চিঠির মধ্যে প্রকাশ করেছেন—"মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, এজগতের ভালবাসা তা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা—সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো।... সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র।"[২৬]

পৃথিবীর সকলের তিনি মা, চিরকালের মা। ভাল-মন্দ, সতী-অসতী, *শিক্ষিত-অশিক্ষিত*, *ধনী-দরিদ্র*, বামুন-ডোম সকলের তিনি মা। বাঙালির তিনি মা, ভারতবাসীর তিনি মা, আবার পাশ্চাত্যবাসীরও তিনি মা—করুণা ও ভালবাসায় ভরা তিনি জন্ম-জন্মান্তরের মা। এযুগের মহামন্ত্র তাই 'মা'। ৩২ অক্ষরী বা ১৬ অক্ষরী নয়, ১ অক্ষরী নাম—মা। এই একাক্ষরী মা নাম অবলম্বন করেই মায়ের ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে ভবনদী পার হয়ে যাবে। ❑

পাদটীকা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৪৯
২ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ১৯৩
৩ ঐ, পৃঃ ৯২
৪ ঐ, পৃঃ ১১৭-১২৬
৫ ঐ, পৃঃ ১৩৩
৬ স্বামী অভেদানন্দ-কৃত 'শ্রীসারদাস্তোত্রম্'
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, শ্রাবণ ১৪০০ সং, পৃঃ ২০১
৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬৩-৬৪
৯ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩৬৮, পৃঃ ১৫৭
১০ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮৩
১১ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—স্বামী অপূর্বানন্দ সঙ্কলিত, ২য় খণ্ড, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ১ম সং, পৃঃ ২৩৪; 'উদ্বোধন', বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ২০২
১২ 'উদ্বোধন', ৭৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৯, পৃঃ ৫০৫
১৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২১০
১৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৮ম সং, পৃঃ ২১৮
১৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৭৫
১৬ ঐ, পৃঃ ১০০
১৭ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ৩৫১
১৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩০৭
১৯ ঐ, পৃঃ ২৮৩
২০ ঐ, পৃঃ ১০২
২১ ঐ, পৃঃ ২৮৯
২২ ঐ, পৃঃ ২৮৭
২৩ ঐ, পৃঃ ১৬২-১৬৩
২৪ ঐ, পৃঃ ১৯৪
২৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ২৬৩
২৬ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, পৃঃ ১৯০-১৯১

এই নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ **শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।**

—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *বর্তমান যুগে ভোগবাদ আমাদের যুক্তি, বুদ্ধি, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে অসার করে দিচ্ছে। এর থেকে মুক্তির উপায় কি?*

—কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, আসানসোল

উত্তর ঃ আমাদের শাস্ত্রেও ভোগের কথা বলা হয়েছে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' (ঈশ উপনিষদ্‌, ১) সনাতন ধর্মে 'ভোগ'-এর কী সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেকথা জানলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। ভোগের প্রকৃত সংজ্ঞা না জানার কারণেই আমাদের 'ভোগ' অপবর্গার্থ (মুক্তির জন্য) না হয়ে বন্ধনের কারণ হয়ে উঠেছে। এব্যাপারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ এবিষয়ে যে-বিশদ আলোচনা করেছিলেন তা 'উদ্বোধন'-এর 'শাস্ত্র' বিভাগে প্রকাশিতও হচ্ছে। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের কথা উপনিষদের ঋষিগণ বলেছেন। মানুষের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি আছে, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য ধর্মের প্রয়োজন। সেই কারণে চার পুরুষার্থের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্থাৎ অর্থ এবং কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে মোক্ষ বা মুক্তিলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। যখন ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থ জাগতিক উন্নতিসাধনে প্রযুক্ত হয়, তখন তাকে 'অভ্যুদয়' বলা হয়। সামাজিক প্রগতি, বৈজ্ঞানিক প্রগতি, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। এই প্রগতি বা উৎকর্ষসাধনের উপায় হলো ধর্ম। 'ধর্মবিহীন ভোগবাদ' আমাদের যুক্তি, বুদ্ধি, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে অসার করে দিচ্ছে—একথা বললেই সমীচীন বলে মনে হয়। কিন্তু আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। যেখানে ধর্মচর্চার মাধ্যমে প্রগতি নষ্ট হয়, যুক্তিহীন গোঁড়ামি পরিপুষ্টি লাভ করে পরস্পরের মধ্যে হিংসা, ক্রোধ বৃদ্ধি পায়, ইন্দ্রিয়লালসা নিয়ন্ত্রিত হয় না—সেই ধর্মচর্চাকে সনাতন ধর্মের ভাষায় 'ধর্ম' না বলে 'ধর্মগ্লানি' বলাই যুক্তিযুক্ত। মানুষের আত্মার অবমাননা করে কেউ কখনো ধার্মিক হয় না। সুতরাং সৎ কার্যে আত্মোৎসর্গ অথবা আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করাই ভোগবাদের চূড়ান্ত ইতিবাচক পরিণতি।

প্রশ্ন ঃ *শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেছিলেন ঃ "তোমায় সংসারে টানতে যাব কেন, তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছি।" আবার কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের "আমিই কি সব করব, তুমি কিছুই করবে না?"—প্রশ্নের জবাবে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?"—কথাদুটি কি পরস্পরবিরোধী? যদি অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে দেন।—গোবিন্দ ভট্টাচার্য, বরানগর*

উত্তর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একদিকে ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী, অপরদিকে তেমনি ছিলেন আদর্শ গৃহী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, একদিকে তিনি যেমন ছিলেন আদর্শ পত্নী, তেমনি আদর্শ গৃহিণী, আবার আদর্শ সন্ন্যাসিনীও। যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, তখন আদর্শ পত্নী হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টপথে সাহায্য করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। সুতরাং তিনি যথার্থই বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাকে তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছি।" অবতারের যা উদ্দেশ্য তা-ই তাঁর 'ইষ্টপথ'। জীবের দুঃখে করুণাপরবশ হয়ে অশেষ কল্যাণসাধনের জন্য এবং জগতে ধর্মগ্লানি দূর করে ঈশ্বরবিমুখ মোহাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিতরণের জন্যই শ্রীভগবান নরশরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হন। এই উদ্দেশ্যসাধনের পথে সাহায্য করতেই শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহুবিধ আচরণের মধ্য দিয়েও একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হলো শ্রীশ্রীমায়ের নিজেকে গোপন রাখার প্রবণতা। যে অচিন্ত্যা মহাশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালিকা, তিনি অনন্ত শক্তিময়ী বলেই নিজেকে গোপন করে একটি ছোটখাট চেহারার নারীমূর্তিতে গ্রামবাংলার অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। নিজেকে গোপন করার অভ্যাস অবগুণ্ঠনবতী মায়ের আমৃত্যু বজায় ছিল। কখনো কখনো সন্তানের আকুতিতে তিনি নিজের স্বরূপ আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। সেই জুগুপ্সার অভ্যাসবশত তিনি লোকসমক্ষে প্রকাশিত বা প্রচারিত হতে চাননি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধের প্রথম প্রতিক্রিয়াই ছিল ঃ "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" অথচ পরবর্তী কালে সন্তানদের ব্যাকুল প্রার্থনায় তিনি নিজেকে জগজ্জননী-রূপে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেছিলেন—জগতে মাতৃভাব বিকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে রেখে গেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই অসাধারণ মাতৃভাবই এযুগে মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখিয়ে চলেছে। তাঁর মাতৃত্ব যেন মনে হয় আগ্রাসী মাতৃত্ব। তৎকালীন ব্রিটিশদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন ঃ "ওরাও তো আমার ছেলে।" বিড়াল, কাক ইত্যাদি পশুপাখি সম্বন্ধেও মায়ের সোচ্চার স্বীকৃতি ছিল ঃ "আমি ওদেরও মা।" কাজেই আপাতবিরোধী মনে হলেও প্রশ্নোক্ত উক্তিদুটির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।
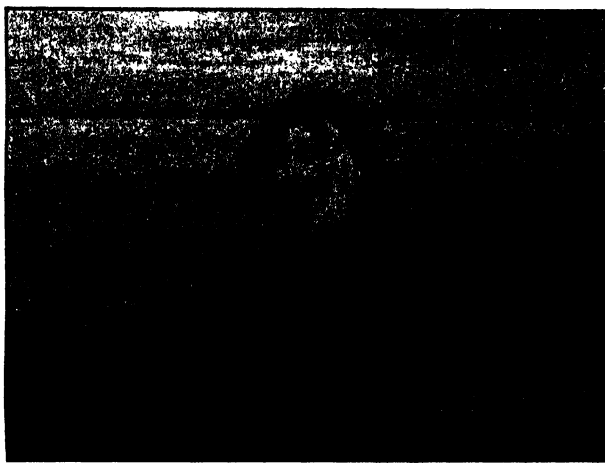
চুপি চুপি

সাগর পাড়ে একলা ছিলাম,
আর ছিল না কেউ।
অথৈ জলে দেখি চেয়ে—
নাচছে হাজার ঢেউ।।

সেদিন যখন একলা ছিলাম;
এক্কেবারে একা—
ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ তুমি
আমায় দিলে দেখা।।

হাওয়ার সাথে সুর মিলিয়ে
গাইলে কত গান।
ব্যথা আমার জুড়িয়ে দিলে,
ভরিয়ে দিলে প্রাণ।।

ছড়া : মধুশ্রী গুপ্ত
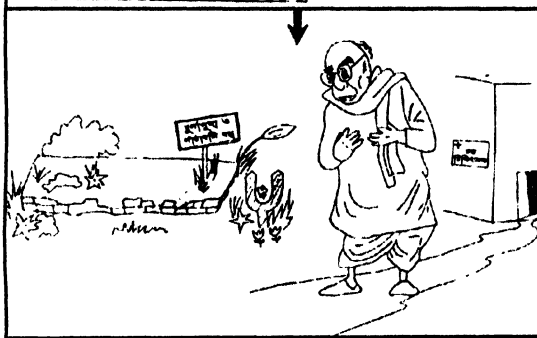
বন্ধ বলি

শোন, সে এক বিপুল ধনী
লোকের কথা বলি,
দুগ্‌গা পুজোয় উদয়-অস্ত
চলত পাঁঠাবলি।
কিন্তু বলি থেমে গেল
কয়েক বছর পরে,
তা দেখে ঐ ধনীটিকে
কেউ জিজ্ঞেস করে :
বাবু, অমন বলির সে ধুম,
আর কেন তা নাই?
বাবু বলেন : কারণ আমার
দাঁত পড়েছে, তাই।

ছড়া : সুনীতি মুখোপাধ্যায়

ছবি : অনুস্মিতা মণ্ডল
দ্বিতীয় শ্রেণি
এম. ডি. বি. ডি. এ. ভি. পাবলিক স্কুল, বাঁকুড়া

আদি শঙ্করাচার্য

শিশু ও কিশোর বিভাগ

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক

ফ্রান্সে 'কল্পতরু উৎসব'

যদিও কয়েক বছর আগেকার কথা, তবু 'উদ্বোধন'-এর পাঠকদের ভাল লাগবে ভেবে লিখছি। 'কল্পতরু উৎসব' পালনের উদ্দেশ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ আমরা লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দর ছেড়ে ফ্রান্সের গ্রেৎজ রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের দিকে রওনা দিলাম। সকলেই জানেন, 'কল্পতরু উৎসব' বিখ্যাত, কারণ কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' (ইচ্ছাপূরণ তরু) হয়েছিলেন এবং তাঁর চারদিকে উপস্থিত প্রত্যেককে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক।" সেই সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরা পূজার্চনার মাধ্যমে এই দিনটিতে 'কল্পতরু উৎসব' পালন করেন।

গ্রেৎজ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বীতমোহানন্দজী ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মে লণ্ডনের বোর্ণ এণ্ড কেন্দ্রে নিভৃত উপাসনার জন্য এসেছিলেন। তখন তিনি গ্রেৎজ কেন্দ্রে 'কল্পতরু উৎসব' পালনের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। তাই আমরা গ্রেৎজ-এ যাওয়ার মনস্থ করি। আমরা দলে পাঁচজন ছিলাম—আমি, আমার স্বামী সুনীতি, আমাদের তেরো বছরের মেয়ে উমা, বন্ধু রসনা (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) এবং বেলা। ফ্রান্সের 'চার্লস দ্য গল' বিমানবন্দর থেকে ভাড়াগাড়িতে আমরা গ্রেৎজ-এর দিকে যাত্রা করলাম। গাড়িতে মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু কেন্দ্রটি খুঁজে বের করতে আমাদের পাঁচ ঘণ্টা লেগেছিল। রাত ১০টার সময় বিধ্বস্ত, শ্রান্ত অবস্থায় আমরা পৌঁছালাম।

স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী (অধুনা প্রয়াত) আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে আমরা যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ অনুভব করলাম। স্বামী দেবাত্মানন্দজীর নেতৃত্বে দেবগৃহ পূর্ণ করে ভক্তরা সুমিষ্ট সুরে গাইছে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'। বেদির ওপর সুসজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণের পট। তিনি পদ্মের ওপর বসে আছেন, ঠোঁটে সুমধুর হাসি, গায়ে শাল—যেন একেবারে জীবন্ত প্রাণোচ্ছল! তাঁকে প্রণাম করে প্রার্থনায় সামিল হলাম আমরা। আনন্দে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর নৈশ আহারের ডাক এল। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী যত্নসহকারে আমাদের খাওয়ালেন। স্বামী বীতমোহানন্দজী রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে সকালে আবার যোগ দিতে বললেন। তিনি জানালেন, ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' সঙ্কীর্তন শুরু হয়েছে রাত্রি ৯টায়, চলবে আগামী কাল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। প্রধান ফটক সারারাত্রি খোলা থাকবে। যেকেউ যেকোন সময় প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। 'শুভরাত্রি' জানিয়ে আমরা ঘরে চলে গেলাম। আনন্দে আমার ঘুমই আসছিল না।

উপাসনাকক্ষ আমাকে টানছে। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনির অনুরণন আমার কানে। উঠে পড়লাম, দ্রুত পায়ে চলে গেলাম মন্দিরে, পরম আনন্দে গলা মেলালাম সঙ্কীর্তনে। ঘণ্টা দুই পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দির থেকে ফিরে এলাম। আবার ভোর ৫টার আগেই ঘুম থেকে উঠে দৌড়ালাম মন্দিরে।

ভোরবেলা মন্দিরে অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। স্বামী বীতমোহানন্দজী সঙ্কীর্তন পরিচালনা করছেন। সঙ্গতে তানপুরা, বেহালা ও হারমোনিয়াম। আমিও যোগ দিলাম। প্রতি ঘণ্টায় নতুন নতুন ব্যক্তি নামগান পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেজন্য নতুন নতুন আঙ্গিকে সুরমূর্ছনার সৃষ্টি হচ্ছিল। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' এরকম বিভিন্ন সুরে যে গাওয়া যেতে পারে তা আমি আগে জানতাম না। এর মাঝেই আমরা প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, চা, রাত্রের খাবার ও অন্যান্য নিত্যকর্ম সেরেছি। সারা দিনরাত আরো ভক্ত আসতে লাগলেন। সন্ধ্যার সময় প্রায় ১০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। দুজন আফ্রিকান এবং আমরা পাঁচজন ভারতীয় ছাড়া বাকি সকলেই ইউরোপীয়। রাত্রি ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত স্বামী বীতমোহানন্দজী স্বয়ং সঙ্কীর্তন পরিচালনা করলেন। ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড নামগানের পর আমাদের হৃদয় আনন্দপূর্ণ। মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হওয়ার পর যেন একটা শূন্যতা অনুভূত হলো! মহারাজ রাত্রি ৯টায় পূজা শুরু করলেন, চলল ২ ঘণ্টা। মহারাজের সুরে সুর মিলিয়ে সকল ভক্ত ১০৮ বার গায়ত্রীমন্ত্র মধুর স্বরে আবৃত্তি করল—'ভূর্ভুবঃ স্বঃ...'।

ইউরোপীয় ভক্তদের কণ্ঠে পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করল। তারপর ১০৮ বার শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো। পূজা অন্তে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ফরাসি ভক্ত জিয়ান কমণ্ডলু থেকে হাতে গঙ্গাজল দিচ্ছিলেন, আর মহারাজ দিচ্ছিলেন অঞ্জলির ফুল।

বাড়ির পিছনদিকের বাগানে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হলো। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, কারণ এই সুন্দর সন্ধ্যায় ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়নি। চারদিকে ইঁট দিয়ে তৈরি একটা বর্গাকৃতি জায়গার মাঝখানে বালি দিয়ে তৈরি হয়েছে হোমকুণ্ড। স্বামী দেবাত্মানন্দজী দুদিকে প্রচুর কাঠের টুকরো জড় করে বহ্ন্যুৎসবের মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সবাই ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচে। স্বামী বীতমোহানন্দজী রাত্রি সাড়ে ১১টায় হোম আরম্ভ করলেন। ভক্তরা সব ঘিরে বসল। মহারাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ...'। পরিষ্কার নীল আকাশ—আমিও এক পলক দেখে নিলাম। পূর্ণাকৃতি চাঁদ আর তাকে ঘিরে চারপাশে ভাসছে ছোট ছোট মেঘ। মহারাজ যখন ঘি ও নারকেল নাড়ু হোমে আহুতি দিচ্ছেন, তখন আমরাও মহারাজের সঙ্গে সমস্বরে ১০৮ বার উচ্চারণ করলাম 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা'। পূজা চলাকালীন বহ্ন্যুৎসবের অগ্নিশিখা আমাদের উষ্ণ রেখেছিল। হোম শেষ হলে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম, মহারাজ আমাদের প্রত্যেকের কপালে তিলক পরিয়ে দিলেন।

এবার আমরা সবাই বাড়ির ভিতরে এসে সাধুদের প্রণাম এবং পরস্পরের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। কারণ, ততক্ষণে পুরনো বছর শেষ হয়ে শুরু হয়েছে নতুন বছর ১৯৯৯ সাল। খাবারঘরে গরম চা, কফি, চকোলেট, কেক, বিস্কুট,

মিষ্টি ইত্যাদি ছিল। এরকম সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিবেশে নববর্ষ উদ্‌যাপন আগে কখনো দেখিনি বা অভিজ্ঞতাও হয়নি। আমরা সকলে তখন আনন্দে ভাসছি। রাত্রি দেড়টায় পরিতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুমাতে গেলাম। উঠতে দেরি হয়ে গেল বলে ভোরের উপাসনায় যোগ দিতে পারিনি। প্রাতরাশ সারতে এসে পুনরায় পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালাম। এই সুযোগে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এখানে চা বা কফি কাপে নয়, বাটিতে করে পান করা হয়। স্বামী বীতমোহানন্দজী সকাল ১০টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করলেন। সাধারণ উৎসবে যোগ দিতে আজ আরো ভক্ত এসেছেন। মন্দিরেই প্রায় ১৫০ জন ভক্ত রয়েছেন। পূজার সময় আমরা ১০৮ বার করে গায়ত্রীমন্ত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্র উচ্চারণের পর অঞ্জলি দিলাম। এরপর ১২টায় মধ্যাহ্নভোজন। গ্রেৎজ কেন্দ্রের বিশেষত্ব হলো ত্রিস্তর মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশাহার।

দুপুর আড়াইটের সময় বক্তৃতাকক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাধারণ উৎসব শুরু হলো। প্রধান বাড়ির বাইরে এই বক্তৃতাকক্ষে মাইক্রোফোনের বন্দোবস্ত-সহ ২০০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। ছাপানো অনুষ্ঠানসূচীতে কাশীপুর উদ্যানবাটীর চিত্র রয়েছে এবং একটি ছোট 'X' চিহ্ন দিয়ে বাগানের যেস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন—সেই স্থানটি চিহ্নিত করা রয়েছে। স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর ফরাসি অনুবাদ থেকে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারির ঘটনা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। ফরাসি ভাষায় পাঠ, সেজন্য একবর্ণও আমরা বুঝতে পারিনি। এরপর ভক্তিগীতি পরিবেশিত হলো। প্রথমেই আমার মেয়ে উমা গান করল। এরপর ভক্তিদাস, এক স্পেনীয় ভক্ত কিছু অসাধারণ ভজন শোনালেন এবং ৪৫ মিনিট সেতার বাজালেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। 'রামকৃষ্ণ শরণম্' গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হলো। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন স্বামী দেবাত্মানন্দজী। বিকাল ৪টায় চা-জলখাবার দেওয়া হলো। ফরাসি ভক্তরা উমাকে অভিনন্দন জানালেন, আবার আমাদেরও বললেন, উমার গান খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু ফরাসি ভাষায় দুর্বলতার জন্য আমরা আর কথাবার্তা চালাতে পারলাম না।

সন্ধ্যারতি সাড়ে ৬টায় শেষ হলো। কল্পতরু উৎসবের পুরো পর্বটা আমি মন একাগ্র করে ভাবার চেষ্টা করলাম। ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অখণ্ড 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' সঙ্কীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা, হোম, তারপর ১লা জানুয়ারি আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা। এইভাবে ভারতের বাইরে সুদূর পশ্চিমে এই কেন্দ্রে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে 'কল্পতরু উৎসব' পালিত হলো। আমার মনে হলো, সকলকে গ্রেৎজ কেন্দ্রের 'কল্পতরু উৎসব'-এর কথা জানাই। এই চমৎকার উৎসবে টেনে আনার জন্য ঠাকুরকে শতকোটি প্রণাম। এই সুখস্মৃতি বাকি জীবন আমি বয়ে বেড়াব। রাত্রে আহারের পর বন্ধু রসনা বলছিল : "এই তিনদিন যা অর্চনা করেছি সারাজীবনেও তা করিনি।" আমরা দারুণ খুশি। এখানে আসা সার্থক হয়েছে আমাদের। এ-আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু একান্তে অনুভব করা যায়।

ইলা বসু, লণ্ডন

[মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন **সৌমিত্র ঘোষাল**]

মনঃসংযোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্য

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত শ্রাবণ ১৪১০ সংখ্যায় 'স্বাস্থ্য' বিভাগে বাণী মার্জিতের লেখা 'সুস্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মজীবন' পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। এই ব্যাপারে 'প্রাণায়াম', 'সিমপ্যাথেটিক' ও 'প্যারা-সিমপ্যাথেটিক' স্নায়ুতন্ত্রকে আয়ত্ত করা সম্বন্ধে বিশদ জানতে চাই।

সুনীলকুমার দাশ

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১ ২৩৫

লেখিকার উত্তর

আমাদের শরীরের যাবতীয় কাজ স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড মিলে 'সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম', 'অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম' এবং 'পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম' গঠিত হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন হাত, পা, শরীরের বহিরাংশ পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত; তেমনি শরীরের ভিতরের আন্তরযন্ত্র হৃদ্‌যন্ত্র, বৃক্ক ইত্যাদি অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। শরীরের এইসব অংশ থেকে সংবেদন বা উত্তেজনা স্নায়ুতন্তু দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডে এবং সেখান থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের ইড়ার (ascending tract) সাহায্যে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালেমাস (আজ্ঞাচক্র), সেখান থেকে থ্যালেমাস (মানসচক্র) হয়ে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে সংবেদনশীল কর্টেক্সে পৌঁছায়। আবার মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স থেকে কর্মাত্মক স্নায়ুতন্তু দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হয়ে বিভিন্ন কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে সিমপ্যাথেটিক ট্রাঙ্ক আবার স্নায়ুতন্তু দ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং আন্তরযন্ত্রে যাওয়ার আগে তারা স্নায়ুজাল—যাকে 'চক্র' বলা হয়—তৈরি করে আন্তরযন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্নায়ুজালের নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। এইরকম স্নায়ুজাল পেলভিক প্লেক্সাস বা মূলাধার চক্রের অবস্থান মলাশয়ের কাছে এবং হাইপো-গ্যাসট্রিক প্লেক্সাস বা স্বাধিষ্ঠান চক্রের অবস্থান নাভিদেশে। এই চক্রগুলি আমাদের শরীরের বৃহদন্ত্রের মলাশয়, জননেন্দ্রিয়, মূত্রাশয় ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মলাশয়ের গাত্রে যে-মাংসপেশী আছে, কর্মাত্মক স্নায়ুতন্তু তাদের সঙ্কোচন ও পায়ুর মাংসপেশীকে শিথিল করে মলত্যাগ করতে সাহায্য করে। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্রে অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের সহাবস্থান সবচেয়ে বেশি এবং এস্থলে স্নায়ুতন্তু দ্বারা মানসিক ও দৈহিক সংযোগ গঠিত হয়। এজন্য এই চক্রে মনঃসংযোগ করতে পারলে অনৈচ্ছিক ও মানসিক কাজকে আয়ত্ত করা যায়। প্রতিদিন সকালে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে প্রাণায়াম এবং ঐ চক্রগুলিতে মনঃসংযোগ করলে চক্রজাল উত্তেজিত হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ধ্যান-জপ মনঃসংযোগের অন্যতম প্রধান উপায়। ঠিক ঠিক চক্রে মনঃসংযোগ করলে এমন এক শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, যার সাহায্যে যেকোন কামনা-বাসনা জয় করে উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব।

বাণী মার্জিত

সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১

আফ্রো-এশিয়াড ২০০৩

ক্রীড়াশক্তি হিসাবে ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসন্ন অলিম্পিকের 'স্টেজ রিহার্সাল' হিসাবে স্বচ্ছন্দে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে হায়দ্রাবাদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান গেমসকে। যদিও এশিয়া ও আফ্রিকা—এই দুই মহাদেশকে নিয়ে এই গেমস, কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম জনবহুল দুটি মহাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে আফ্রো-এশিয়াড সবদিক থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে এক নতুন চিন্তা ও চেতনার জন্ম দিয়ে গেল। 'দুই মহাদেশ, এক ভাবনা, এক চেতনা'—আফ্রো-এশিয়াডের এই মূল নির্যাসটুকু ধরে রাখতে অংশগ্রহণকারী ৯৭টি দেশের প্রতিনিধিরা কখনো লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। 'পদক নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা'—অলিম্পিকের এই চিরন্তন জীবনবোধকেই ঘনীভূত করেছে আফ্রো-এশিয়াড। শান্তি, সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্বের অনির্বাণ আলোকবর্তিকা-রূপে আফ্রো-এশিয়াড ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

মাত্র মাস চারেকের প্রস্তুতিতে এত বড় একটা ক্রীড়াযজ্ঞ সুসম্পন্ন করে বিশ্বের দরবারে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছেন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। হায়দ্রাবাদের মূল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন উঁচু-নিচু টিলা ও ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত গুচিবোলি অঞ্চলটিকে গেমসের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে নিপুণ কর্মদক্ষতা ও সুপরিকল্পনার মাধ্যমে। মূল স্টেডিয়াম, দুটি অ্যাস্ট্রোটার্ফ হকি গ্রাউণ্ড, সাঁতার ও বক্সিঙের দুটি পৃথক কমপ্লেক্স-সহ প্রধান মিডিয়া সেন্টার এই গুচিবোলিতে অবস্থিত। অনতিদূরে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সে হয়েছে শুটিং প্রতিযোগিতা। আর শহরের কেন্দ্রস্থলে লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে ফুটবল, পার্শ্ববর্তী ফতে ময়দানে টেনিস ও ইউসুফগুদা কমপ্লেক্সে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি স্টেডিয়ামেই ছিল অত্যাধুনিক সব ব্যবস্থা, বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের জন্য।

১৯৮২-র দিল্লি এশিয়াডেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল এই ধরনের গেমস আয়োজনের। শেষপর্যন্ত নানা ঘটনাপ্রবাহে প্রায় দু-দশক লেগে গেল গেমস আয়োজনের। হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম আফ্রো-এশিয়ান গেমসে দুই মহাদেশের ৯৭টি দেশের প্রায় ৩,০০০ ক্রীড়াবিদ ও শিল্পী অংশগ্রহণ করেছে। ৮টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল। ভবিষ্যতে অবশ্য ইভেন্টের সংখ্যা বাড়বে। তাছাড়া লোককৃষ্টির বিভিন্ন আঙ্গিকে দুই মহাদেশের শিল্পীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক রূপরেখাকে তুলে ধরেছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তার এক চমকপ্রদ, ছন্দোবদ্ধ মাধুর্য মুগ্ধ করে দিয়েছে মাঠে উপস্থিত ৮০,০০০ দর্শক-সহ টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা ৩০০ কোটি মানুষকে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবশ্য একটি ব্যতিক্রমী নজির দেখা গেল। মার্চপাস্টে দুই মহাদেশের ক্রীড়াবিদ, কর্মকর্তারা একসঙ্গে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করলেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি, দুই মহাদেশের অলিম্পিক কমিটি ও গেমস সংগঠন কমিটির পতাকা সহযোগে এই মার্চপাস্ট দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না গেমসের অন্তর্লীন সারসত্যটুকু।

আফ্রো-এশিয়াড থেকে ভারতের বড় প্রাপ্তি ক্রীড়াবিশ্বে এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে উঠে আসা। আসন্ন অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে তা অবশ্যই এক 'স্টেপিং স্টোন' হিসাবে দেখা হবে। গতবছর ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমস, তারপর বুসান এশিয়াডেই উন্নতির রেখাচিত্রটি বোঝা যাচ্ছিল। আফ্রো-এশিয়াডে তা আরো সুবিন্যস্ত রূপ পেয়েছে। ৯৭টি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত ২য় স্থানে থাকতে পেরেছে—এটা অবশ্যই ভারতবর্ষের ক্রীড়াসমাজের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। সোনা জয়ের নিক্তিতে চিনের থেকে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও পদকপ্রাপ্তির সার্বিক মূল্যায়নে ভারত কিন্তু চিনকে ছাপিয়ে গেছে। চিন ২৫টি সোনা-সহ ৬৭টি পদক পেলেও ভারত ১৯টি সোনা-সহ ৮০টি পদক পেয়েছে। তাৎপর্যের বিষয়—জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশরের মতো উন্নত দেশগুলি একসময়ে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে থেকেও শেষপর্যন্ত পদক-তালিকায় পিছিয়ে যায়।

আফ্রো-এশিয়ান গেমসের বর্ণময় উদ্বোধন—২০০৩

তবে ভারতকে ২য় স্থানে তুলে আনতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন টেনিস তারকারা। আর এই ইভেন্টেই যথার্থ আন্তর্জাতিক মানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব টের পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেনিসে নাম নথীভুক্ত না করায় একপ্রকার বিনা লড়াইতে বাজিমাত করেন ভারতীয়রা। দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগ মিলিয়ে সাতটি সোনার সবকটিই এসেছে ভারতের হেফাজতে। পুরুষ ও মহিলা দুক্ষেত্রে দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা মহেশ ভূপতি ও সানিয়া মির্জার দাপট ও নেতৃত্বের দক্ষতায় সবক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ

ছিলেন ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, নাইজিরিয়া, জিম্বাবোয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরা। কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ-তনয় প্রকাশ অমৃতরাজ এটিপি সার্কিটে এসে নজরকাড়া পারফরমেন্স দেখাতে পারেননি এখনো, তবে হায়দ্রাবাদে দলগত বিভাগে খেলে তাঁর শক্তিশালী সার্ভিস ও গ্রাউণ্ড স্ট্রোকের ঝলকানিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রাখতে পেরেছেন। একই কথা প্রযোজ্য সানিয়া মির্জা সম্পর্কেও। গেমস থেকে সর্বাধিক ৪টি সোনা পেয়েছেন তিনি।

টেনিস ব্যতীত অন্যান্য ইভেন্টে অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ ছিল পুরোমাত্রায়। বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, শুটিং এবং সাঁতারে সব উন্নত দেশই সেরা ক্রীড়াবিদদের নিয়ে এসেছিল হায়দ্রাবাদে। এশিয়ান ও অল আফ্রিকান গেমসে পদকজয়ীদের দেখতে প্রতিটি স্টেডিয়ামেই দর্শকাসন উপচে পড়েছিল। আফ্রো-এশিয়াডের আগেই হয়ে গেছে অল আফ্রিকান গেমস। নাইজিরিয়ার আবুজায় ঐ গেমসের পিঠোপিঠি আফ্রো-এশিয়ান গেমস পড়ে যাওয়ায় আফ্রিকান অ্যাথলিট, ক্রীড়াবিদরা সরাসরিই চলে আসেন ভারতে। তবে কেনিয়া, মরক্কো, জাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের অ্যাথলিট ও বক্সার অবশ্য পরিশ্রান্ত থাকায় আফ্রো-এশিয়াডে আসেননি। তা সত্ত্বেও যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাই বা কম কিসের! নামিবিয়ার বিশ্ববিশ্রুত স্প্রিন্টার ফ্রাঙ্কি ফ্রেডেরিক্স, দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যামার থ্রোয়ার ক্রিশ হার্মেস, ইথিওপিয়ার দূরপাল্লার (মহিলা) দৌড়বীর মেসেরেট ডেফার, ইজিপ্টের মহিলা হ্যামার থ্রোয়ার মারওয়া আহমেদ, ইথিওপিয়ার মাঝারী পাল্লার দৌড়ে মহিলা তারকা তিরুনেস ধীবাবার মতো অনেকেই মাতিয়ে রেখেছিলেন অ্যাথলেটিক্স অঙ্গন।

গেমসের ম্যাসকট শেরু

বক্সিং, সাঁতারেও এরকম অসংখ্য এশীয় ও আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে লড়ে ভারতীয়রা নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। টেনিসের পরই বক্সিঙে ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগী ফাইনালে উঠেছেন। ১২টি ক্যাটাগরির মধ্যে ৭টি ক্ষেত্রে ফাইনালে প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁরা যোগাড় করে নিয়েছেন। সোনা জিতেছেন অবশ্য দুজন— অখিলকুমার ও জিতেন্দারকুমার। বাংলার আলি কামার লাইট ফ্লাইওয়েটে সমানে সমানে লড়েও প্রোগ্রেসিভ পয়েন্টে হারস্বীকার করেন। হেভিওয়েটে ভি. জনসনও একইরকম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন। বক্সিং রিং থেকে ভারতের সংগ্রহ ২টি সোনা, ৫টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ। সাঁতারে সোনা না এলেও ইদানিংকালের সব সেরা পারফরমেন্স দেখা গেল কর্ণাটকী জলকন্যাদের সৌজন্যে। নিশা মিলেট, শিখা ট্যাণ্ডন ও মহারাষ্ট্রের রিচা মিশ্রের মুনশিয়ানায় ভারতীয় সাঁতার এক অন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চিন, কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজিরিয়ার আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারুদের চোখ কপালে তুলে দিয়েছে ভারতীয় ললনারা। বাংলার ছেলে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আকবর আলি মিরও ব্যক্তিগত মেডলিতে ভারতকে রুপো দিয়েছেন। তবে সাঁতারের পুলে সেরা আকর্ষণ ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাতালিয়া ডি. টয়েট। কৃত্রিম পা নিয়েও মনের জোরে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকান মেয়েটি একের পর এক পদক জিতেছেন।

গেমসে প্রথম সোনাটি এসেছে সাঁতারের পুল থেকেই। উজবেকিস্তানের নাচায়েভ রাভিল ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে এই সোনাটি জিতে মিডিয়ার যাবতীয় মনোযোগ টেনে নেন। ভারতের প্রথম সোনাটি জেতেন এক অজ্ঞাতকুলশীল রাজপুত। অভিনব বিন্দ্রা শেষপর্যন্ত নাম তুলে নেওয়ায় তাঁর জায়গায় দলে ঢোকেন গগন নারাং। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে গগন এশিয়ার জবরদস্ত শুটারদের প্রথম থেকেই চাপে রেখে আত্মপ্রত্যয়ী প্রাধান্যে সোনা জয় করেন। গেমসের শপথ নেওয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল সাম্প্রতিক শুটিং সার্কিটে নজরকাড়া পারফরমেন্সের অধিকারিণী অঞ্জলি ভাগবতের ওপর। অলিম্পিকের পদক-প্রত্যাশী অঞ্জলি অবশ্য প্রথম ইভেন্টে (১০ মিটার এয়ার রাইফেল) কোরিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একসময় বেশ পিছিয়ে পড়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ফাইনাল রাউণ্ডে উঠে তাঁকে ধরেও ফেলেছিলেন। তবে শেষমুহূর্তের সামান্য ভুলে তিনি সোনাটি হাতছাড়া করেন। পরদিন অন্য ইভেন্টে আর কোন ভুল করেননি। নিজের সুনাম ধরে রাখতে একটা সোনা খুব জরুরি ছিল তাঁর। শুটিং রেঞ্জ থেকে যশপাল রানা, রাজ্যবর্ধন রাঠোররাও ভারতকে গর্বিত করেছেন। গেমসের প্রথম বিশ্বরেকর্ডটি হয়েছে শুটিংয়ের দৌলতে। কাজাখস্তান-দুহিতা ওলগা ডোভোগান ৫০ মিটার প্রোন রাইফেলে ৬০০-র মধ্যে ৬০০ স্কোর করে নিজের আগের রেকর্ডটি ভেঙে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন।

গেমসের দ্বিতীয় বিশ্বরেকর্ডটি হয় অবশ্য মহিলাদের ভারোত্তোলনে। চিনের সানডান ৭৫ কিলোগ্রাম বিভাগে স্ন্যাচ ও জার্ক মিলিয়ে ২৭৫ কিলোগ্রাম ওজন তুলে রেকর্ডটি করেন। ভারোত্তোলনে শ্রীনিবাস প্রসাদ ভারতকে গেমসের প্রথম পদকটি দিলেও সার্বিকভাবে ভারতীয়দের পারফরমেন্স আশাপ্রদ নয়। অলিম্পিক ব্রোঞ্জ-জয়ী কর্ণম মালেশ্বরী, সোনামচা চানু, কুঞ্জরানী দেবীর মতো আন্তর্জাতিক পদকজয়ীরা না থাকায় শক্তি-শৌর্যের যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায়নি। মালেশ্বরীর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বলে গেমসে নামেননি। তাহলে স্টেডিয়ামে অতটা পথ দৌড়ে গেমসের মশাল হাতে নিয়ে সু-উচ্চ মিনারে পূতাগ্নি প্রজ্বলন করলেন কিভাবে? অবশ্য মালেশ্বরীকে পূতাগ্নি প্রজ্বলনে শেষ ল্যাপে সহযোগিতা করেছিলেন হায়দ্রাবাদের আরেক কৃতী সন্তান হকি অলিম্পিয়ান মুকেশকুমার। চিন, কাজাখস্তান, ইরান-সহ আফ্রিকার দেশগুলি ভারোত্তোলনের মান ও মাত্রাটি আগাগোড়া উঁচু তারে ধরে রেখেছিলেন। গুটিকয়েক ব্রোঞ্জ, নামমাত্র একটি রুপো নিয়েই ভারতকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারোত্তোলনে।

অ্যাথলেটিক্সে প্রত্যাশা অনুযায়ী সোনা জিতেছেন লংজাম্পার অঞ্জু জর্জ, ডিসকাস থ্রোয়ার নীলম জে. সিংহ,

হেপ্টাথলিট জে. শোভা। অ্যাথলেটিক্সে মহিলারাই যে ভারতের রক্ষাকবচ, তা আরেকবার প্রমাণিত। বলা হয়, সব খেলার ধাত্রী অ্যাথলেটিক্স। এ হেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইভেন্টে বছরের পর বছর ভারতের বিজয়কেতন ওড়াচ্ছেন মেয়েরা, যা অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ। হেপ্টাথলনে হট ফেভারিট সোমা বিশ্বাস অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রথমদিনের ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়ে শেষপর্যন্ত ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন। স্প্রিন্টে অপর বঙ্গললনা সরস্বতী সাহা রুপো জিতেছেন তাঁর দ্বিগুণ উচ্চতার আফ্রিকান, এশিয়ান দৌড়বীরদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে। অঞ্জু, নীলম বিশ্বমানের অ্যাথলিট, তাঁদের সোনাজয় তাই অপ্রত্যাশিত নয়। বরং পুরুষদের জ্যাভেলিনে অনিলকুমারের 'ভিকট্রি পোডিয়াম'-এ ওঠাটা বিস্ময়ব্যাঞ্জক ঘটনা। পুরুষ শটপাটার শক্তি সিংহের স্বর্ণপদক অবশ্য তাঁর সুনাম ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অর্জিত। পুরুষ ও মহিলা রিলে দলও নিজেদের ছাপিয়ে গিয়ে শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের প্রকৃত চালচিত্রটি। গেমসের দ্রুততম পুরুষ ও মহিলা দৌড়বীরের সম্মান পেয়েছেন দুই নাইজিরিয়ান যথাক্রমে আডিটোবু ফাসিবা ও এনডুরেন্স ওজোকোনো। স্প্রিন্ট ইভেন্টে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রাধান্য খর্ব করে নাইজিরিয়ার অবিশ্বাস্য উত্থানে গৌরবান্বিত অ্যাথলেটিক্সই। আর মাঝারী ও দূরপাল্লার দৌড়ে নাইজিরিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও মোজাম্বিকের অ্যাথলিটরাই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ও আত্মলব্ধ গরিমায় অতিক্রম করে গিয়েছেন এশিয়ান চ্যালেঞ্জ।

গেমসে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হকির জোড়া সোনা ও ফুটবলে ফাইনালে ওঠা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুবার হারিয়ে পুরুষদের খেতাবজয় আগামী দিনে ভারতীয় হকির পুনর্জাগরণের ইঙ্গিত। মেয়েরা গ্রুপ লিগে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেও ফাইনালে তাঁদের হারিয়েই সোনা জিততে পেরেছেন, এটাও চমকপ্রদ কৃতিত্ব। সেমিফাইনালে তাঁদের হাতে ভূপতিত হকির বড় শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া। আর ফুটবলে ফিফা র‍্যাঙ্কিঙে ১৩০ নম্বরে থাকা ভারত তার থেকে অনেক এগিয়ে থাকা রোয়াণ্ডা ও জিম্বাবোয়েকে যেভাবে হারিয়েছে, তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গতবছর এল. জি. কাপের পর আবার ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবলে দাগ কাটার মতো পারফরমেন্স মেলে ধরতে পেরেছে। ব্রিটিশ কোচ ভারতীয় ফুটবলকে ঠিকপথেই নিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য ফুটবলে দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের দলগুলি যোগ দেয়নি। আসেনি বিশ্বকাপ খেলা নাইজিরিয়া, ক্যামেরুন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজিরিয়া, মরক্কো, ঘানার মতো দলও। যারা এসেছে তারাও পুরোশক্তির দল নিয়ে আসেনি। তবে যেহেতু তারা ফিফা র‍্যাঙ্কিঙে ভারতের অনেক ওপরে অবস্থান করে, তাই মানদণ্ডের বিচারে অবশ্যই শক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবে। যতই ভারতীয় কোচ স্টিফেনের কাজকর্ম নিয়ে চুলচেরা সমালোচনা হোক, ভারতীয় ফুটবলের বন্ধ জানলাটা খুলে দিয়ে তিনি যে টাটকা বাতাস প্রবেশ করাতে পেরেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই স্পিরিটটা ধরে রাখলে এবং পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে পারলে আমাদের ফুটবলও যে কিছু করে দেখাতে পারে, তার প্রমাণ আফ্রো-এশিয়াড।

পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জেতার পর ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের উল্লাস

সবশেষে বলতে হয় হকির কথা। যতই বক্সিং, টেনিস, শুটিং, অ্যাথলেটিক্সের সাফল্য নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা হোক, জাতীয় খেলা হিসাবে হকি যে-পরিমাণ ভারতের গৌরব মন্থন করে, তার সঙ্গে কোনকিছুরই তুলনা চলে না। পুরুষ ও মহিলা হকি দল সোনার পদক নিতে বিজয়মঞ্চে উঠে দাঁড়ানোর সময় দর্শকদের মধ্যে যে আবেগ ও উন্মাদনার সঞ্চার হয়েছিল, তার মধ্যেই লুকিয়েছিল এই সরল সত্যটি। ধনরাজ, দুই বলজিৎ, যুগরাজ-বিহীন হকি দল যেভাবে শক্তিশালী পাকিস্তানকে দুবার জমি ধরিয়ে দিয়েছে, তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ধনরাজদের বিকল্প ব্রিগেড ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎকে যে সুরক্ষা দিতে তৈরি, সেই বার্তাটিই ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন গগন অজিতের নেতৃত্বে তরুণ তুরকিরা। গোলরক্ষক দেবেশ চৌহান, অধিনায়ক দিলীপ টিরকে ভারতীয় রক্ষণব্যূহকে আসল সময়ে নির্ভরতা দিয়েছেন, তাই জয়লাভ সহজসাধ্য হয়েছে। মেয়েরাও দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে পর পর হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুমন বালা, জ্যোতি কুলু ও সুরজ লতার ত্রিমুখী আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যায় দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ফাইনালে বড় চেহারার দক্ষিণ আফ্রিকানদের এই তিন ভারতীয় খেলোয়াড় 'বডি ফেইন্ট' ও 'স্ক্রিনিং স্টিকওয়ার্কে' নাজেহাল করে ছাড়েন।

প্রথম আফ্রো-এশিয়াডের সফল সংগঠন এবং একইসঙ্গে পারফরমেন্সের অবিশ্বাস্য উত্তরণ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের ক্রীড়াসমাজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। ভারতবর্ষের মহিমামণ্ডিত অবস্থান স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানসচক্ষেই দেখেছিলেন। আফ্রো-এশিয়াড ক্রীড়া ও শরীরচর্চায় এই গৌরবোত্থানকেই চিহ্নিত করে। বিশেষ করে ভারতের মেয়েরা এই গৌরবের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছেন। জীবনযুদ্ধে যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যে-গতিতে এগিয়ে চলেছেন ভারতের মহিলা অ্যাথলিটরা, তা ভারতের নারীজাতির শৌর্য-বীর্যেরই প্রতিফলন। ❑

খ্রিস্টধর্ম প্রসারে কয়েকটি মিশনারি পত্র-পত্রিকা

মিনতি মিত্র

[পুর্বানুবৃত্তি]

'উপদেশক' পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে, সেই সময় থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশের খ্রিস্টানদের উপকার সাধনের জন্য একটি সভা স্থাপিত হয়। সেই সংবাদটি এইরকম—

> এতদ্দেশীয় খ্রীস্টীয় যুবলোক কর্তৃক এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে খ্রীস্টীয় মতাবলম্বীদের বর্তমানাবস্থায় অনেক ব্যক্তি নিঃস্ব আছে, অতএব উক্ত যুব মহাশয়েরা অল্পকাল হইল দেবপূজা হইতে রক্ষা পাইয়া এই ক্ষণে খ্রীস্টীয়গণের মধ্যে নিঃস্বলোকদের উপকারের নিমিত্তে মনোযোগী হইয়াছেন ইহা আনন্দজনক বিষয় বটে, এই সভার কার্য কলিকাতায় খ্রীস্টীয় মতাবলম্বি এই দেশীয় লোক কর্তৃক নির্ব্বাহ হইতেছে এবং ঐ সভাভুক্ত কেবল এইদেশীয় লোক আছে।

বস্তুত, ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ ব্যতীত এসকল পত্র-পত্রিকা তখন ছিল অচল। এগুলির প্রধান কাজই ছিল ধর্মীয় বিষয় টেনে এনে নানা মন্তব্য এবং কুৎসা রটনা করা।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর ফলে মিশনারিদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আবার ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সমুলার 'Ramakrishna His life and saying' নামে তাঁর বহুকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি খ্রিস্টানেতর ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় সমগ্র মিশনারি সমাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্মকে হতমান করা। এই উদ্দেশ্যকেই পোষকতা করার জন্য 'ক্রীশ্চান লিটারেচার সোসাইটি' হিন্দুধর্মের গ্লানি উল্লেখ করে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধতার নতুন পথ খুলে দিল। এ হেন জটিল সময়ে ভারতীয় খ্রিস্টান সমাজ দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের বক্তব্য ছিল, ম্যাক্সমুলার কেন হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বই লিখলেন? এই বক্তব্যই 'ক্রীশ্চান লিটারেচার সোসাইটি'র মুখপত্র 'দি ডন ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতে জনৈক লেখক অভিযোগ করেছেন ঃ

> ম্যাক্সমুলার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ছেপে তাদের বিরুদ্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করছেন।...

এর ফল ইংল্যাণ্ডে যত না, ভারতে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর; কারণ এই অভিযোগকারী লেখক জানাচ্ছেন—

> ম্যাক্সমুলারের ডমফাই সত্ত্বেও তাঁর বই ইংলণ্ডে অতি অল্পসংখ্যক লোকই পড়ে, বেশি পড়ে শিক্ষিত ভারতবাসী, যারা অধিকাংশই মূল সংস্কৃত জানে না। ম্যাক্সমুলারের বই পড়ে ধরে নেয়, ভারতীয় শাস্ত্রাদিতেও তাহলে খ্রীস্টীয় নৈতিকতার তুল্য বস্তু আছে।...

আরো বললেন ঃ

> ম্যাক্সমুলারাদির বই হিন্দু উত্থানে মদত দিচ্ছে।

মিশনারি সম্প্রদায়ের একদেশদর্শিতা এবং যেকোন-ভাবেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার পক্ষে এগুলি ছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উপরি উক্ত ঘটনাগুলির আগে এবং পরেও মিশনারিদের এই অপপ্রয়াস চলেছিল বরাবর।

'উপদেশক' পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের পর আরেকটি সংবাদে দেখা যায়, একদিকে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ এবং অপরদিকে বিচ্যুত হিন্দুদের ওপর মিশনারিদের প্রভাববিস্তার একইসঙ্গে চলছিল। সেই সম্পর্কিত একটি সংবাদ—

> অতএব হিন্দু মহাশয়দিগকে আমরা এই পরামর্শ দিতেছি যে, ত্যক্ত ধর্ম্ম ব্যক্তিদের অনিষ্ট করণার্থ শাস্ত্রীয় ব্যবহার পুনঃস্থাপন করিতে উদ্যত হইবেন না। তাহা হইলে বড় বড় রাজাবাহাদুর এবং গোষ্ঠীপতিদিগকে ব্রাহ্মণদিগের গোলাম হইতে হইবে। ঘোষ বসু মিত্র আর কুলীন কায়স্থের অশ্বরথ ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারিবে না। তাঁহারদিগকে ব্রাহ্মণদিগের মোট বহিতে অথবা গৃহমার্জ্জন করিতে কিংবা কাষ্ঠ কাটিতে হইবেক। রাজাবাহাদুরেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন কখনো কখনো ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসেন এবং ধর্ম্মসভায় প্রভুত্ব করেন, শাস্ত্রীয় ব্যবহার প্রবল হইতে

তাহারদিগকে সাবধান হইতে হইবে যেন কোন২ অঙ্গে তপ্ত শলাকার চিহ্ন না পড়ে। (জুলাই ১৮৫৬, পৃঃ ১২-১৩)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যতই অনুকূল অথবা প্রতিকূল হোক না কেন, এইরূপ বিশেষ পত্র-পত্রিকায় সর্বদা মিশনারিদের বিজয়বার্তাই ঘোষিত হতো। এগুলিতে একদিকে খ্রিস্টীয় 'ট্র্যাক্ট' সাহিত্যের বহু উপকরণ, অপরদিকে বাঙলা ভাষার বিশেষ এক সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক রূপ এবং তদানীন্তন লোকজীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

এইসময় 'সত্যার্ণব' নামে আরেকখানি উনিশ শতকীয় খ্রিস্টীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেও হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞা, হিন্দু অবতার সম্বন্ধে কুৎসারটনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ যেন ভিন্ন আধারে ট্র্যাক্টের বিষয়বস্তুই পরিবেশিত হয়েছে। 'সত্যার্ণব' পত্রিকার নামপত্রে প্রায়শই সুন্দর সুন্দর ছবি ছাপা হতো এবং ঐ ছবিগুলির বিষয় দিয়েই পত্রিকা আরম্ভ হতো। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই পত্রিকাতে সংস্কৃত কবিতাও ছাপা হতো। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সত্যার্ণব' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদের নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো—

> ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ প্রতিপাদন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে ব্রাহ্মণ আপনাকে বহুল করণার্থ জগৎ সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ তিনি দেখিয়া ভাবিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব। সুতরাং জগদুৎপত্তিকে ব্রহ্মের জন্ম কহাতে জগৎ এবং ব্রহ্মাকে এক করা হইল। কিন্তু যাঁহারা সৃষ্টিকর্তাকে স্রষ্ট পদার্থের সহিত এক ভাব করান তাঁহাদের কেমন ভয়ানক মতিভ্রম বিবেচনা কর। ব্রহ্মাকে জগৎ কহা বা জগৎকে ব্রহ্মা করা সামান্য আস্পর্দ্ধার কথা নহে। ব্রাহ্মণেরা এইসকল আস্পর্দ্ধার কথা পদে২ প্রকাশ করিতেছেন ইত্যাদি।
>
> এ স্থলে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা বৈদিক ধর্মের শিক্ষা দেন অথবা উপদেশ গ্রহণ করেন তাঁহারদের অধিকাংশ লোক কখন অখিল বেদ নেত্রগোচর করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল মুখে বেদের গৌরব করিয়া থাকেন কিন্তু অখিল বেদ কাহাকে কহে জানেন না দেখেনও নাই। বোধহয় অখিল বেদ বঙ্গভূমির মধ্যে অপ্রাপ্য। ফলে ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা তাহাও সন্দেহ স্থল। শুনিয়াছি বিলাতের মধ্যে একস্থানে অখিল বেদ পাওয়া যায়।

উপরিলিখিত অংশে 'সৃষ্ট' না বলে 'স্রষ্ট', 'আস্পর্দ্ধা' ইত্যাদি শব্দগুলি তো আছেই; সবচেয়ে আশ্চর্য, বেদ বলতে মিশনারিরা কি বুঝেছিল কে জানে!

সেসময় এই পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্যটি সাধারণত প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হতো। এটাই ছিল রেওয়াজ। এই পত্রিকার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর তৃতীয় কাণ্ডে পত্রিকা প্রকাশের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—

> পত্রিকা সম্পাদকেরা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে তাঁহারা সুযোগ পাইলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে রণ করিতে সসজ্জ হয়েন এবং শরক্ষেপ কালে বিজিগীষা ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সত্যাসত্যের প্রভেদ করেন না, শত্রুক্ষয় করিলেই হয় এই ভাবিয়া তর্কবিতর্ক ছল বিতণ্ডা কিছুতেই ত্রুটি করেন না, যাহা মনে আইসে তাহাই লিপিবদ্ধ করেন... ধর্ম্মের বিষয়ে তাঁহাদের মাৎসর্য দর্শনে খ্রীষ্টীয় লোক ক্ষুব্ধ হইতে পারেন।... সুচারু পত্রিকা সকলে মধ্যে২ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ থাকাতে তৎপাঠে আমাদের চিত্ততৃপ্তি হইতে পারে না। একারণ আমরা সঙ্কল্প করিলাম যে, অদ্যাবধি মাসে মাসে 'সত্যার্ণব' নামে পত্রিকা প্রকাশ করিব।

কালে এই পত্রিকাখানি আদর্শ খ্রিস্টীয় পত্রিকায় পরিণত হয়। এই পত্রিকাটিকে সহায়তা করার জন্য আরো কয়েকটি পত্রিকা এগিয়ে এসেছিল।

একথা একাধিকবার এই নিবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে যে, হিন্দুধর্মকে হীনবল করাই ছিল এসকল পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য। এজন্য অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টিতে মানব-মনের গতিপ্রকৃতি বুঝে সন্তর্পণে পা ফেলছিল মিশনারিরা, যাতে মানুষ অসচেতনভাবে মিশনারিদের কৌশলে ধরা পড়ে। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল আগে ধর্মবিজয়, পরে অন্য কিছু। এসকল পত্র-পত্রিকায় কখনো কখনো গুরুশিষ্যের কথোপকথনের আকারেও সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেইরকম একটি সংবাদ এখানে তুলে ধরা হলো—

> বহুসংখ্যক হিন্দুজাতির মধ্যে যে নানাপ্রকার মত প্রচলিত আছে অনুমান করি তন্মধ্যে বৈষ্ণবীয় মত অতি প্রাচীন কারণ সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট; খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে তাহার অনেক মেল আছে এবং তাহা হইতে যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ইহাও অসম্ভব নহে। যদ্যপিও সকল বঙ্গীয় লোক বৈষ্ণব নামে বিখ্যাত নয় তথাপি বিষ্ণু যে পূর্ণব্রহ্ম এবং অন্যান্য দেবতারা তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অত্যল্প লোকে অস্বীকার করে।

কিছু কিছু হাস্যকর সংবাদও এজাতীয় পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখা যেত। 'সত্যার্ণব'-এর তৃতীয় সংখ্যাতেই একটি হাস্যকর সংবাদ পরিবেশিত হয়—

> একদিবস কোন এক দুঃখী ভ্রাতা কোন বিদ্যাবান ভ্রাতার ভবনে অভ্যাগত হইয়া তাহার পত্নীকে মেমসাহেব না বলিয়া মাতাঠাকুরানী বলাতে উভয়ে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত ঘূর্ণায়মান লোচনে প্রাগুক্ত সুদীন ভ্রাতাকে যথোচিত অপমান পুরঃসর বিদায় করিলেন। অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, মাতাঠাকুরানী এই যে ক্রোধান্বিত বাক্য তাহা তিনি অবশ্য জানেন। কিন্তু সাহেবাভিমানে হিন্দু সম্বন্ধে সন্তোষে তাহার ক্রোধোৎপত্তি হইল। বিবেচনা করুন ইহাতে যদি 'ক্রোধোৎপত্তি' হয় তবে প্রেমের স্থান আর কোথায়। (জুন ১৮৬১, পৃঃ ১০-১৪)

উপরি উক্ত সংবাদে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের অধঃপতন, বিদেশীদের কাছে হিন্দুসমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং শিক্ষিত অথচ ভণ্ড সমাজের মূর্খামি—এসকল বক্তব্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'অরুণোদয়' নামে আরেকখানি বহুল প্রচারিত খ্রিস্টীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-র ১৫ সেপ্টেম্বর। হিন্দুধর্ম বিমর্দনের জন্য এই পত্রিকার আবির্ভাব। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সেই কাহিনী শোনা যাক—

কি দুঃখের বিষয়

> এতদ্দেশীয় হিন্দুমাত্রেই দুর্গাপূজার আয়োজনে সম্প্রতি মত্ত হইয়াছেন। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়। বিবেচক লোকেরা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে ভুলিয়া জড় পদার্থ মৃত্তিকার উপাসনা কি প্রকারে করেন, ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। হে জগদীশ্বর প্রতিমাপূজার নাশ করুন, শীঘ্র নাশ করুন, শীঘ্র নাশ করুন।...

অনুরূপ আরেকটি সংবাদ এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। ছন্দে লিখিত এই সংবাদটি এইরকম—

হিন্দু ধর্ম্ম বিমর্দ্দন

হিন্দুদের বিচারাচার

যে কোন উপায়ে হয় করহ অর্থ সঞ্চয়,
ন্যায়ান্যায় নাহিক বিচার।
অর্থার্জ্জনে নাহি দোষ, পূর্ণ কর নিজ কোষ
তবে নাম হইবে প্রচার।।
চাকরিতে ভুরি ভুরি করিতে পারিলে চুরি,
রোজগারী বলিবে নিশ্চয়।
চুরি যদি নাহি জান, ধর্ম্মগণ্ডা ঘরে আন
তবে কবে কর্ম্মদক্ষ নয়।।
লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বুদ্ধি নাই ঘটে
কেমনে করিতে হয় ধন।
বিদ্যাহীন পাকা ছেলে কেনাবেচা হাতে গেলে
ছলেবলে করে উপার্জ্জন।।
কোন জনে বলে ভাই, বেতন নাহিক চাই
আমাদের হস্তেতে হয় ক্রয়।
সাহেব আমাদের বশ পাঁচকে বলিলে দশ
কোনমতে না করে সংশয়।।

আরেকটি ছন্দোবদ্ধ পদে হিন্দুদের বেদবিধির নিন্দাবাদ অকুণ্ঠ ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে—

হিন্দুদের মুক্তি নাই, হিন্দুদের মনে তাই
কোনধর্ম্মে জন্মে না বিশ্বাস
যদি পুণ্য করে অতি তবু তার নাহি গতি
হিন্দুদের শাস্ত্রের বিচারে
হিন্দুদের বেদবিধি কুবিদ্যার বিদ্যানিধি
কুকর্ম্মের তর্কপঞ্চানন
কুবুদ্ধির বাচস্পতি কুজ্ঞানের সরস্বতী
কুযুক্তির সিদ্ধান্ত ভূষণ
কুদীক্ষার শিক্ষাগুরু কুকর্ম্মের কল্পতরু
কুপথের পথপ্রদর্শক!
কুশব্দের অভিধান অন্যায়ের অপাদান
রৌরবের গৌরবগায়ক
এই তো শাস্ত্রের দশা ইহাতে মুক্তির আশা
দুরাগ্রহ দুরাশা কেবল
শ্রমার্ত্ত ঘর্ম্মাক্ত নরে প্রখর রবির করে
তৃপ্তি আশা যেমন বিফল
ভ্রান্ত যত হিন্দুলোক ধ্বান্তকে বুঝি আলোক
বৃথা তার অন্বেষণ করে...
অতএব হিন্দুগণ করি এই নিবেদন
মিথ্যা শাস্ত্র কর পরিহার
ভ্রান্ত হয়ে কতদিন রহিবে হয়ে অধীন
মুক্তিপথ দেখ আপনার।

আরেকখানি উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টীয় পত্রিকা হলো 'জ্যোতিরিঙ্গণ'। এই পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়ার খ্রিস্টান সম্প্রদায় মাইকেল মধুসূদনকে সেখানকার মিশন হাউসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। এই অভ্যর্থনায় প্রীত হয়ে মধুসূদন স্থানীয় খ্রিস্টীয়মণ্ডলীকে সম্বোধন করে একটি চতুর্দশপদী কবিতা উপহার দেন। ১৮৭২ সালের ২ নভেম্বর এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়—

পুরুলিয়ামণ্ডলীর প্রতি

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজফুল, শস্য তথা কখনও কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত মণ্ডলে।
শ্রীভ্রষ্ট সরসসম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এদূরমঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফুটে তব জলে,
পরিমল ধনে ধনী করিয়া অনিলে।
প্রভুর কি অনুগ্রহ ভাবি দেখ মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে
উজ্জ্বলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তা এ প্রার্থনা করি
ভাসুক সভ্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।

মধুসূদনের দ্বিতীয় কবিতাটি রচিত হয় এক হিন্দুর ধর্মান্তরকরণ উপলক্ষ্যে। পুরুলিয়ার জার্মান মিশনের কর্মী কাঙ্গালীচরণ সিংহের এক পুত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এই উপলক্ষ্যেই কবি এই কবিতাটি লেখেন। সম্ভবত কাঙ্গালীচরণের দীক্ষাগ্রহণে কবি তার ধর্মপিতার কাজ করেন। কবিতাটি এইরকম—

কবির ধর্ম্মপুত্র।
।শ্রীমান খ্রীষ্টদাস সিংহ।

কে পুত্র পবিত্রতঃ জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে,
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা।
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে,
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত হিমান্ত কালে। কি ধন পাইলা
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে
দৈববলে বলী তুমি, শুনহে হইলা
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম কর্ম্ম ধরি
পাপরূপ রিপুনাশো এজীবন স্থলে,
বিজয় পতাকা তুলি রথের উপরি,
বিজয়কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ প্রেম কুতূহলে।

'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকাটির নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বৃহৎ জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করতে না পারলেও মৃদু আলোকপাতে আমাদের পথপ্রদর্শন করাবে। এর প্রথম সংখ্যায় দীর্ঘ ভূমিকার সারমর্ম হলো—

এ পত্রিকায় আমোদ এবং নীতি একত্রে প্রকাশিত হয়। কোমল প্রকৃতির পাঠকবর্গের হস্তে সুন্দর২ ছবি, সরল ভাষা, নীতিগর্ভ মিষ্ট মিষ্ট গল্প, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রদান করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হইবে।

এই পত্রিকায় আর কোন্ কোন্ বিষয় প্রকাশিত হতো, নিম্নলিখিত সূচীপত্রের তালিকা থেকে তা জানা যায়—

ভূমিকা, ঈগলপক্ষী, প্রকৃত বীর, স্বর্গের প্রতি ইত্যাদি। আবার অহল্যা, মৈত্রেয়ী, গার্গী,... মন্দোদরী, তারা, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী ইত্যাদি।

এই পত্রিকায় বাইবেল জাতীয় ধর্মপুস্তক থেকে খ্রিস্টধর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ছোট গল্প ও কাহিনী প্রায়শই প্রকাশিত হতো। এধরনের একটি সংবাদ—

সাধু শৌল ও ফিলিপীয় কারারক্ষক।
আশ্চর্য বিবরণ।

...শৌল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে আপনার হিংসা করিও না, আমরা সকলেই এস্থানে আছি। তখন সে প্রদীপ আনিতে কহিয়া লম্ফপূর্বক ভিতরে আসিয়া কম্পবানন হইয়া পৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীস্টকে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবা।

১৮৭২-এ এই পত্রিকায় একটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল—গদ্য এবং পদ্য উভয় বাহনেই। এক খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের অপকর্ষ প্রকাশের একটি কাহিনীর কিছু অংশ—

মাতা— খ্রীষ্টধর্ম্মে এতকাল ঘৃণা যে আছিল,
তোমার কথায় আজি সে সব ঘুচিল,
না জানিয়া সবিশেষ যত মূর্খ নর,
খ্রীষ্টধর্ম্ম নিন্দাবাদ করয়ে বিস্তর।

মালতী— যদ্যপি পবিত্র বলি খ্রীষ্টধর্ম্মে মান,
কাল্পনিক হিন্দুধর্ম্ম ইহা যদি জান,
তবে আর মাতা কেন বিলম্ব করহ,
ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট চরণ ধরহ।

মাতা— আজি হোক কালি হোক মরিব ত্বরায়
খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সময় কোথায়?
মলে যদি নরকুলে লভি গো জনম,
খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মি এ মোর মনন।

এ জন্মে ধর্ম্ম কর্ম্ম হল যা হবার
পুরাহ মনের সাধ জন্মিলে আবার।

'খ্রীষ্টীয়বান্ধব' পত্রিকাটির উদ্দেশ্য এবং বিষয় মোটামুটি তার নাম থেকেই অনুধাবন করা যায়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এর প্রথম প্রকাশ এবং ২২টি খণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর দ্বাদশ সংখ্যাটিতে যে-প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছিল, সেকালের বিচারে কতকটা আধুনিক বলা যায়। যেমন—

অতিথি সৎকার, প্রভু যীশুর দৃষ্টান্ত কথা, স্ত্রীশিক্ষা, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, ক্ষুদ্র জীবন, গুপ্ত পতনের প্রতীকার, নূতন আসামী, বাইবেল, বাঙ্গালোরে ভারতীয় উদ্যোগ সমিতির বিরাট সভা, দুর্ভিক্ষে মিশনারিগণ, নীনবী, রামগড়ের সংবাদ, বিবিধ সংবাদ, মিশন ও মণ্ডলী সংবাদ, কনফারেন্স, শোকসংবাদ।

এই সংবাদগুলির সবকটিই খ্রিস্টীয় সমাজকে ঘিরেই পরিবেশিত হয়েছিল। ১৯০০ শতকে 'স্ত্রীশিক্ষা' শিরোনামে সুলোচনা নাথ লিখিত একটি সংবাদে তৎকালীন বঙ্গ মহিলাদের গদ্যরচনার একটি নমুনা পাওয়া যায়। সংবাদটি এরকম—

ললনাগণ, চলুন আমরা একবার ইফ্রাইস পর্বতে রামার ও বৈথেলের মধ্যস্থিত দরোবার খর্জ্জুর নামক বৃক্ষের তলে যাই, সে স্থানে উপনীত হইলে পর কি দেখিব? দেখিব মৎ সদৃশ জনৈক অবলা ললনা অসংখ্য ইস্রায়েল সন্তানদের বিচারে ব্যাপৃতা আছেন। কি আশ্চর্য। উনি কি সেই লোপ্পীদোতের ভার্যা-দারারা নহেন? দুর্বলা রমণীর হৃদয়ের কোথা হইতে এত জ্ঞান ও পারদর্শিতা উৎপন্ন হইল। যে ইস্রায়েল সন্তানের বিচারের জন্য দায়ুদনন্দন রাজা সলোমন ঈশ্বরের নিকটে বিজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহারা কি ইস্রায়েল সন্তান নয়? হ্যাঁ, তাঁহাই বটে। প্রভুর সমক্ষে নরনারী উভয়েই সমান, তিনি উভয়কেই আশীর্ব্বাদ করণার্থ করযুগল প্রসারিত করিয়া আছেন। তিনিই দুর্ব্বলা দবোরাকে উপযুক্ত জ্ঞান ও পারদর্শিতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কারণে দবোরা অবলা হইয়াও এইপ্রকার মহৎ কার্য সাধন করিয়া মহিলাকুলের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন। ধন্য রমণী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি এই দীর্ঘ সময়সীমা জুড়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্টীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশে যে নিষ্ঠা এবং খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে বিপুল আগ্রহ, তা একটি জাতির মূলগত চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। [সমাপ্ত] ❑

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ মাঘ ১৪১০
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী ব্রহ্মানন্দ**
মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া
৮ মাঘ, শুক্রবার
(২৩ জানুয়ারি ২০০৪)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
মাঘ শুক্লা চতুর্থী
১০ মাঘ, রবিবার
(২৫ জানুয়ারি ২০০৪)

স্বামী অদ্ভুতানন্দ
মাঘ পূর্ণিমা
২২ মাঘ, শুক্রবার
(৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা**
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী
১১ মাঘ, সোমবার
(২৬ জানুয়ারি ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ৩, ১৮ মাঘ
রবিবার, সোমবার
(১৮ জানুয়ারি, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ২৮

পাশাপাশি ঃ (১) আগমন, (৩) ভবরানী, (৬) শব, (৭) বিরাম, (৯) টাকা, (১২) জীবন, (১৩) প্রণব, (১৭) গজ, (১৮) সমাধি, (১৯) সুধা, (২২) রণময়ী, (২৩) পাগলিনী।

ওপর-নিচ ঃ (১) আদ্যাশক্তি, (২) মন, (৪) বন্ধু, (৫) নীলকান্ত, (৮) রাম, (১০) দিবস, (১১) প্রণতি, (১৪) দিগম্বর, (১৫) উমা, (১৬) বিধায়িনী, (২০) নাম, (২১) জাগ।

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

রঞ্জন বসাক, ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অদিতি রায়, পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের প্রয়াস

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
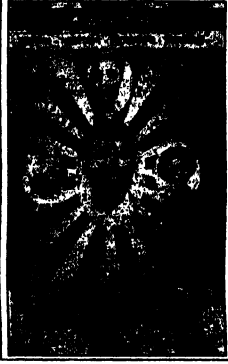
শতবর্ষ পর ঃ
রামকৃষ্ণ-সারদামণি-
বিবেকানন্দ-নিবেদিতা
—ডঃ শিশির কর
প্রকাশক ঃ গৌতম সরকার
সরকার বুক স্টোর
৮০/৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯
মূল্য ঃ ৪০ টাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৬+৯৬
প্রকাশকাল ঃ ২০০০

মাত্র ৯৬ পৃষ্ঠার **'শতবর্ষ পর ঃ রামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা'** গ্রন্থে এঁদের সম্বন্ধে এবং একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করেছেন গবেষক ও সাংবাদিক ডঃ শিশির কর। তিনি পেশায় ছিলেন মূলত সাংবাদিক, সেজন্য সাংবাদিকতার দাবিমতো ছোট ছোট ২৬টি নিবন্ধ লেখেন বিভিন্ন সময়ে। পরে সেগুলি একত্র করেই এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিরাট কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা নেই—একথা লেখক নিজেই বলেছেন। বিভিন্ন গবেষক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই ডঃ কর গ্রন্থটি সাজিয়েছেন গত একশো বছরের প্রেক্ষিতে। তাঁর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা, শিকগোর ধর্মমহাসম্মেলন, বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের অভিনন্দন, বেলুড় মঠের স্থাপত্য, মঠের প্রথম মহা-সম্মেলন (১৯২৬), শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন (১৯৩৬), প্রতীচ্যে প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম ও বেদান্ত সোসাইটির ইতিবৃত্ত, সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর ভূমিকা, ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সংগ্রাম, আত্মমুক্তি ও জগৎকল্যাণের লক্ষ্যে বিবেকানন্দের নিরলস প্রয়াস, মিশন-নিবেদিতা সম্পর্ক, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের ব্যবহার, ভারতীয়দের জাতীয় গর্ববোধ গড়ে তোলায় নিবেদিতার দান ইত্যাদি। আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন স্থানে স্বামী গম্ভীরানন্দের 'হিস্ট্রি অফ দ্য রামকৃষ্ণ মঠ অ্যাণ্ড মিশন' গ্রন্থটি থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন লেখক। কোথাও কোথাও বক্তব্য সম্প্রসারণের জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি রয়েছে। বোঝাই যায়, লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। যেসব মূল্যবান বক্তব্য বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, লেখক সেগুলি একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন এবং যাঁরা এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পড়াশোনা করে উঠতে পারেননি, তাঁদের হাতের কাছে এই মূল্যবান বক্তব্য ও তথ্য সরাসরি পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বুদ্ধিজীবিগণ সাম্প্রতিক কালেও কী ধরনের চিন্তাভাবনা করছেন, তার খবরও পাওয়া যাবে ডঃ করের এই গ্রন্থ থেকে।

লেখক শুধু সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদন পেশ করেননি, তিনি সুন্দরভাবে অথচ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে পাঠককে বিষয়ের নির্যাস দিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যে-বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা ঃ মনীষীদের চোখে' অধ্যায়ে লেখক স্বামীজীর প্রতি বিভিন্ন মনীষীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সুব্রহ্মণ্য ভারতী, প্রেমচন্দ্র প্রমুখ। আবার 'জন্ম শতবর্ষ পরেই মায়ের ব্যাপক পরিচিতি' অধ্যায়ে ডঃ কর শ্রীশ্রীমায়ের মহিমান্বিত রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মতো এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘজননী-রূপে তাঁর অবদান যে সর্বাধিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারী হিসাবে দেখা দিলে স্বামীজী তার মোকাবিলায় অর্থের সংস্থান করার জন্য বেলুড় মঠের সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে মনস্থ করেন। শ্রীমার অনুমতি নিতে গেলে তিনি স্বামীজীকে বলেন ঃ "মঠস্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ—প্রভাস দাশ।** প্রকাশক ঃ পেলিকান প্রেস, ৮৫ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ১২৪। মূল্য ঃ ৩৫ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০২।
- **গৃহীর আদর্শ মা সারদা—দীপ্তিকুমার শীল।** প্রকাশক ঃ লেখক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৩২। মূল্য ঃ ৮ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৭।
- **শ্রীশ্রীমা ঃ সারদা-সরস্বতী—দীপ্তিকুমার শীল।** প্রকাশক ঃ লেখক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৬৪। মূল্য ঃ ১২ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৬।
- **শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে—সম্পাদক ও সঙ্কলক ঃ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়।** প্রকাশক ঃ ডাঃ রণজিৎকুমার রায় ও অশোককুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা গবেষণা কেন্দ্র, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ স্মৃতি মন্দির ও আশ্রম, পারুল, পোঃ আরামবাগ, হুগলি-৭১২৬০১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৬৮। মূল্য ঃ ২০ টাকা। প্রকাশকাল ঃ ২০০২।

ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ। তোমার ওসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়?" বস্তুত, শ্রীমা ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘজননী, অভিভাবিকা ও নেত্রী। একজন অতি সাধারণ গ্রাম্য মহিলা হয়েও তিনি ছিলেন উদার, পরমতসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণতামুক্ত, সাহসী এবং নিবেদিতার ভাষায় "পৃথিবীর মহত্তমা নারী"। তিনি ছিলেন সরলতা, কোমলতা ও কারুণ্যের চিন্ময়ী প্রতিমা। আধ্যাত্মিকতা, উদারতা, পবিত্রতা ও ভালবাসায় ভরা ছিল তাঁর জীবন।

একইরকম সহজভাবে গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সংক্ষেপে নির্দেশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র তত্ত্বকে কাজে রূপায়িত করা, তাঁর সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরমতসহিষ্ণুতা, "যত মত তত পথ" বাণী সারা বিশ্বে প্রচার করা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি দান করা, দেশসেবার অর্থ যে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের সেবা তা সর্বপ্রথম সোচ্চারে ঘোষণা করা, ধর্মাচরণের নামে প্রচলিত ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেওয়া এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা—এসব কাজের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মানুষ স্বামীজীকে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। ডঃ কর অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বলেছেন। বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা নিয়ে আয়ারল্যাণ্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভারত-ভগিনী নিবেদিতা হয়েছিলেন এবং তাঁর গুরুর আদর্শ অনুসরণ করেই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। মনে হয়, নিবেদিতার যথার্থ মূল্যায়ন এখনো হয়নি। ভারতে স্বাদেশিকতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে তাঁর গতিময় ব্যক্তিত্ব ও আত্মোৎসর্গ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযথ সুবিচার করা হয়নি বলেই লেখকের মনে হয়েছে এবং তাঁর এই মত সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

ডঃ কর দু-একটি লেখাতে বেশ নতুন তথ্য দিয়েছেন, যা পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব যে কত গভীর তা বোঝা যায়। 'নানক, কবীর ও স্বামীজী', 'দেশের সেরা কৃষিগবেষণা কেন্দ্র স্বামীজীর প্রেরণায়', 'বেলুড়ের মন্দির: আধুনিক ভারতের সেরা স্থাপত্য' প্রভৃতি মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করে কিছু নতুন কথা জানা যায়।

ডঃ কর-কে আন্তরিক ধন্যবাদ এই সুলিখিত গ্রন্থটির জন্য। শুধু একটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পুনর্বিবেচনা দাবি করে। তাঁর মতে—"ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।" এই বক্তব্য সঠিক এবং সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খটকা লাগে যখন তিনি বলেন: "সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাই হচ্ছে সেকুলারিজম" এবং "সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলকথা।" (পৃঃ ৯১) 'সেকুলারিজম' মূলত একটি ইউরোপীয় মূল্যবোধ, যার জন্ম হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সঙ্ঘাতের প্রেক্ষিতে এবং এই সঙ্ঘাতের সমাধান হয়েছিল যখন রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের অভিভাবকত্বের বাঁধন থেকে মুক্ত করে। ইউরোপে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়েছিল 'সেকুলারিজম' গ্রহণ করেই। সব ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা করার মধ্যে সর্বধর্মকে রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সাহায্য দেওয়ার ধারণা থেকেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে। রাষ্ট্র নিজেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে যত বেশি দূরত্বে রাখবে, ততই মঙ্গল।

যেহেতু নিবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল, সেই কারণে অনেক জায়গায় একই বিষয়ের এবং একই বক্তব্যের পুনরুক্তি আছে। কারণটি বোঝার পর আর কোন অনুযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু শেষে একটি কথা না বলে পারা যাচ্ছে না। গ্রন্থটিতে যেখানে যেখানে ইংরেজি উদ্ধৃতি আছে, তার অধিকাংশেই রয়েছে অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ। একটু যত্ন নিয়ে মুদ্রণের কাজটি করতে পারলে এই ধরনের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। যদি ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হয়, তাহলে গ্রন্থকার ও প্রকাশক এই ব্যাপারে মনোযোগী হবেন আশা করা যায়। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

এবারের প্রচ্ছদে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের চিত্র দেখা যাচ্ছে। বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি'তে শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবসান হয়। তাঁর পূত শরীর বরানগরের কুঠিঘাট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে নৌকাযোগে বেলুড় মঠে আনীত হয়। যেখানে শ্রীশ্রীমায়ের মরশরীর দাহ করা হয়েছিল, সেখানেই পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির—রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘে যা ৫১ পীঠের সমাহার বলে কথিত। এই চিত্রের পশ্চাতে 'শ্রীযন্ত্র'-এর প্রতিভাস। তন্ত্রসাধনায় আদ্যাশক্তি মহামায়ার উপাসনা এই শ্রীযন্ত্রের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। অন্যান্য তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহের মধ্যে ষোড়শী সাধনার প্রধান উপচার এই শ্রীযন্ত্রের স্থান শীর্ষে। দক্ষিণ ভারতে শ্রীকুলের সাধকগণ শিবের সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব স্বীকার করেন। শক্তি সেখানে বিমর্শিনী অর্থাৎ অদ্বিতীয় শিবের স্বতঃসিদ্ধা স্পন্দরূপিণী। এই বিমর্শ শক্তিই বৈষ্ণবদের নিত্যা-হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধাস্বরূপিণী। মাতৃমন্দিরের চিত্রটির ধারে রক্তবর্ণের যে 'ভূপুর'টি দেখা যাচ্ছে, তা হোমকুণ্ডেও অঙ্কিত থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সারা বছর ধরে 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদে মাতৃস্মৃতিধন্য স্থানগুলি উপস্থাপন করে যে-হোমার্চনা আমরা এতদিন নিবেদন করেছি, এই সংখ্যায় যেন তারই পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হলো।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ২-৫ অক্টোবর ২০০৩ বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মাঝে মাঝে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পূজার চারদিনে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। তন্মধ্যে কুমারীপূজা ছিল সর্বাধিক আকর্ষণীয়। গত বছরের মতো এবছরও কলকাতা দূরদর্শন এই কয়দিন বিভিন্ন সময়ে পূজার সরাসরি সম্প্রচার করেছে। পূজার দিনগুলিতে প্রায় ৬৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়।

বেলুড় মঠ ভিন্ন অন্যান্য কেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠ ভিন্ন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে গত ২-৫ অক্টোবর ২০০৩ ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ঃ আঁটপুর (হুগলি), আসানসোল (বর্ধমান), বারাসত (উত্তর চব্বিশ পরগনা), কাঁথি (পূর্ব মেদিনীপুর), ধলেশ্বর (ত্রিপুরা), গুয়াহাটি (অসম), জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড), জয়রামবাটী (বাঁকুড়া), কামারপুকুর (হুগলি), করিমগঞ্জ (অসম), লখনৌ (উত্তর প্রদেশ), মালদা, মনসাদ্বীপ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), মেদিনীপুর (পূর্ব মেদিনীপুর), মুম্বাই (মহারাষ্ট্র), পাটনা (বিহার), রহড়া (কলকাতা), শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং (মেঘালয়), শিলচর (অসম) এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম (উত্তর প্রদেশ)।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মহীশূর আশ্রম (কর্ণাটক)ঃ গত ৫ অক্টোবর ২০০৩ বিজয়া দশমীর দিন 'জ্ঞানবাহিনী' নামে বর্ষব্যাপী এক প্রচার-প্রকল্প শুরু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুস্তকবিক্রয়, প্রদর্শনী, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী প্রচার করা।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বাঁকুড়া)ঃ গত ১২ অক্টোবর ২০০৩ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদিক স্তোত্র ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। সম্মেলনের উদ্বোধন ও স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুব্রত ভট্টাচার্য। 'কথামৃত' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দজী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী এবং স্বামী অজরানন্দজী ও সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে কলকাতা, বর্ধমান ও বাঁকুড়া থেকে প্রায় ৫০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

বহির্ভারতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বাংলাদেশের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে—বালিয়াটি, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং সিলেট। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাদেক হোসেন খোকা প্রমুখ পূজার বিভিন্ন দিনে ঢাকা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম আশ্রমে প্রথম দুর্গাপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিদিন বহু ভক্ত দর্শনার্থী পূজারতি দর্শন করেন। বিজয়া দশমীর দিন সকালে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের পর আশ্রম-সম্পাদক স্বামী শক্তিনাথানন্দজী মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরপর শান্তিবারি প্রদান এবং উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি (২০০৩) মাসে এই কেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মরিশাস আশ্রমে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী স্কন্দানন্দজী (শিবদাস মহারাজ) গত ১২ অক্টোবর ২০০৩ সকাল ১০টা ৭ মিনিটে বেলঘরিয়ার 'কলকাতা স্টুডেন্টস হোম'-এ দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। গত ৩ বছর ধরে তিনি অবসরজীবন যাপন করছিলেন এবং পালমোনারি থ্রম্বো-এম্বোলিজম, আলজিমার ও মূত্রাশয়-জনিত রোগে ভুগছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ছিলেন কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৪০ সালে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪২ সালে স্টুডেন্টস হোমে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা হয়। নানা কাজের মধ্যেও তাঁর দীর্ঘ ৫৮ বছরের সাধুজীবনে হোমের রান্নাঘর দেখাশোনা করতেন। সরলতা, কৃচ্ছ্রতা ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ৫ ও ৭ নভেম্বর ২০০৩ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা

করেন যথাক্রমে স্বামী হররূপানন্দজী এবং স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৫০)ঃ গত ২১-২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দজী, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজী, স্বামী দিব্যব্রতানন্দজী, সুকুমার বাউরী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে 'নদের নিমাই—নীলাচল লীলা' যাত্রানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া)ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০৩ মহাসপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের পটে বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ১৬০ জন প্রতিবন্ধী মানুষকে নতুন বস্ত্র ও বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হাইলাকান্দি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম)ঃ গত ২-৪ অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ ও ১০৩ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কোচবিহার)ঃ গত ২-৪ অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ৬০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৪২৫টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (অসম)ঃ গত ২-৪ অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, প্রায় ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং দুঃস্থ মানুষদের ৭০টি ধুতি ও শাড়ি প্রদান করা হয়।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (শোণিতপুর, অসম)ঃ গত ২-৫ অক্টোবর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, প্রায় ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং ৫ জন দরিদ্র মানুষকে ধুতি প্রদান করা হয়।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম)ঃ গত ৩ অক্টোবর ২০০৩ মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের পটে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও প্রায় ৪০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে জামা-প্যান্ট এবং ২৩ জন মহিলাকে শাড়ি প্রদান করা হয়।

কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম)ঃ গত ৮ অক্টোবর ২০০৩ সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যাপীঠ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবনাথানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, প্রায় ২,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কৃষ্ণা দাস, গোপালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী, স্বামী কল্যাণানন্দ পুরী প্রমুখ।

সেবাব্রত

বিদ্যালঙ্কা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (চন্দননগর, হুগলি)ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সমাজের দুঃস্থ নরনারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ৬৩ জন দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে শাড়ি, ধুতি ও জামা-প্যান্ট প্রদান করা হয়।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন ১৭৫টি শাড়ি, ৩৫টি ধুতি, ১২৫টি জামা ও ৪৫টি প্যান্ট বিতরণ করা হয়।

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর)ঃ গত ২৫ অক্টোবর ২০০৩ শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে ৭০ জন দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৭-১০ অক্টোবর ৭৫ জনের চক্ষু অস্ত্রোপচার এবং ৪২০ জনের চক্ষুরোগ পরীক্ষা করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, ভার্জিনিয়া (আমেরিকা)-নিবাসিনী শিবানী চক্রবর্তী গত ১৩ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী জয়াবতী দত্ত গত ১৮ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পাড়াতল-নিবাসী (বর্ধমান) মহাদেব চক্রবর্তী গত ১৮ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। নিষ্কাম সেবা ও সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী সুনীলচন্দ্র দত্ত গত ১৯ মে ২০০৩

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সরল ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, তেজপুর (অসম)-নিবাসিনী শেফালী রায় গত ২১ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তাঁর ব্যবহার ছিল সরল ও সুমধুর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাবড়া (উত্তর চব্বিশ পরগনা)-নিবাসী নির্মলা মুখোপাধ্যায় গত ২৫ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ছিলেন তাঁর আপন মেজদা এবং স্বামী প্রেমরূপানন্দজী ছিলেন তাঁর খুড়তুতো দাদা। সহজ-সরল ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী ডাঃ শান্তিপ্রিয় বসু গত ২৭ মে ২০০৩ জপরত অবস্থায় বেহালায় নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী উষারানী ঘোষ গত ২৭ মে ২০০৩ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক ব্রহ্মচারী নিমাই মহারাজ গত ২ জুন ২০০৩ আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হরেন মহারাজের সান্নিধ্যে বাস করতে থাকেন। পরে সম্পাদক-পদে ব্রতী হয়ে তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করেন।

আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক, ধর্মনগর-নিবাসী সুমিত চৌধুরী গত ১২ জুন ২০০৩ বাস দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও সদা হাস্যময় স্বভাবের।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, চম্পাহাটী (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)-নিবাসী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯ জুন ২০০৩ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার টালিগঞ্জ-নিবাসিনী এবং 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ডঃ জলধিকুমার সরকারের সহধর্মিণী গীতা সরকার গত ২২ জুন ২০০৩ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সেবাপরায়ণতা ও সরলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে

দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

১০৫ তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৯ থেকে পৌষ ১৪১০

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৩

সম্পাদক

স্বামী সর্বগানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা ❑ সডাক ঃ পঁচানব্বই টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা ❑
❑ শারদীয়া সংখ্যা ঃ পঞ্চাশ টাকা ❑

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উদ্বোধন

১০৫তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩

বর্ষসূচী

ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রম্যরচনা, নারীশিক্ষা, গবেষণা, শ্রদ্ধার্ঘ্য ইত্যাদি

ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র, শাস্ত্র আলোচনা, পৌরাণিকী, দুর্গোৎসব, স্মৃতিকথা ইত্যাদি

পরিক্রমা, মাতৃতীর্থপরিক্রমা, ক্রীড়াজগৎ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি

বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমাজভাবনা, অর্থনীতি ইত্যাদি

কবিতা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্ষ শুরু মাঘ (জানুয়ারি) মাস থেকে। প্রতিবছর 'শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করছি'—এই মনোভাব নিয়ে নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। মূল্যবান রচনা পাঠানোর জন্য লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, অর্থদাতা, গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র এবং সম্পাদনার কাজে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেন, তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। প্রচ্ছদের গ্রাফিক্সের কাজ করেছেন স্বামী হররূপানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন সোমনাথ ভট্টাচার্য, মুদ্রণের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস-এর কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন জলধিকুমার সরকার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বামীজীর পত্রাবলীর অনুবাদ করেছেন সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত। অন্যান্য অনুবাদে রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র ঘোষাল, জয়দীপ ঘোষ প্রমুখ। আরো অনেক নাম অনুল্লেখিত রইল। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ এবং সকলের সমবেত প্রয়াসে 'উদ্বোধন'-এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রচারও বেড়েছে যথেষ্ট। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।—সম্পাদক

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

No work is secular. All work is adoration and worship.
SWAMI VIVEKANANDA

জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

*

কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। **স্বামী বিবেকানন্দ**

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম,** আসানসোল-৭১৩৩০১
  ফোন ঃ ০৩৪১-২২০৮৩৭৩/২২৫২৩৭৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব),** বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রিসম স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক,** ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেণ্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ২৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
  ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৩৫০০৫
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেণ্টার**
  গুসকরা-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন)
  কাটোয়া-৭১৩১৩০, ফোন ঃ ০৩৪৫৩-২৫৬০০৩
- **ডঃ শীতল ব্যানার্জি**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
  ফোন ঃ ৯৫৩৪৫৩-২৬১২৩৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ,** সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম,
  গ্রাম+পোঃ—বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন ঃ ২৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ-৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৮৩৮৮
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১, ফোন ঃ ০৩৫১২-২৫২৪৭৯
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপুর (হোসেনপুর), বেলতলা পার্ক
  বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
  ফোন ঃ ০৩৫২২-২৫৮২৯৬
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউমার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার**
  অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২২৮৬৮৮
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ, ফোন ঃ ২৬৫৪-৫৮৯২/৬০৮০
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **সর্বোদয় বুক স্টল**
  হাওড়া রেলস্টেশন

যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী —কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে।... যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

Vibrations of light are everywhere, even in the darkest corners; but it is only in the lamp that it becomes visible to man. Similarly God, though everywhere, we can only conceive Him as a big man.

Swami Vivekananda

UDBODHAN
website: www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net
Phone : 2554-2248, 2554-2403

Vol. 105
No. 12
DECEMBER
2003

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. MM&PO/WB-RNP-15/LPWP-01/2003
ISSN 0971-4316 R.N.8793/57
Postal Regn. No. MM&PO/WB/RNP-15/2003

ISSN 0971-4316

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ আগামী ১লা মাঘ ১৪১০ (১৬ জানুয়ারি ২০০৪) 'উদ্বোধন' ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করবে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৫ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✿ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' আপনাকে পড়তে হবে।

✿ 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, 'উদ্বোধন'-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✿ ২০০৪ সালের জন্য 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য বাধ্য হয়ে মাত্র ৫ টাকা বাড়াতে হয়েছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই কষ্ট অনুগ্রহ করে স্বীকার করে নেবেন—এই ভরসা আমাদের আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রাহক-প্রতি ১২টি সংখ্যার জন্য মোট খরচ পড়ে প্রায় ১১০ টাকা। স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দিতে হবে। 'উদ্বোধন' একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা। প্রত্যেক গ্রাহক/গ্রাহিকা যদি একজন করে নতুন গ্রাহকের নাম নথিভুক্ত করেন, তাহলেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ স্পর্শ করবে। এভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

✿ 'উদ্বোধন'-এর সেবায় সাতটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য ছয়টি স্মৃতি তহবিল যথাক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের নামে উৎসর্গীকৃত। 'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'** —এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানাঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠাবেন।

সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। সডাক ১০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি ঃ শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত হাতে হাতে দেওয়া হবে। যাঁরা ডাকে নেবেন, আশা করা যায় তাঁরা ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর ২য় সপ্তাহেই সংখ্যাটি পেয়ে যাবেন।

ব্যবস্থাপক সম্পাদকঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩